সূচীপত্র

◆ বিভাগ ঃ ক

সাম্প্রতিক বিশ্ব
Contemporary World

চলমান বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সংকট
Current World Politics & International Conflict

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ১-১৮

সাম্প্রতিক : ১

ইয়েমেন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষিত
Yemen Crisis: Present Perspective

১.১ ভূমিকা ১.২০
১.২ ইয়েমেন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১.২০
১.৩ সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট ১.২৪
১.৪ ইয়েমেন সংকটে আন্তর্জাতিক আইনের অসহায়ত ১.২৬
১.৫ আরব বসন্ত ও ইয়েমেন ১.২৭
১.৬ সংঘাতে হুথিদের সম্পৃক্ততা ১.২৭
১.৭ যুদ্ধের ময়দানে সৌদি আরব ১.২৭
১.৯ হুথিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি ১.২৭
১.১০ জাতিসংঘ দূতের পদত্যাগ ১.২৭
১.১১ ইয়েমেন সংকটে বাংলাদেশের অবস্থান ১.২৭
১.১২ মূল্যায়ণ ১.২৮

সাম্প্রতিক : ২

দক্ষিণ-পূর্বএশিয়া এবং পূর্ব-এশিয়াদেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ
Territorial disputes in Southeast and East Asia

২.১ ভূমিকা ১.২৯
২.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক ১.৩০
২.৩ দক্ষিণ চীন সাগরের গুরুত্বের কারণসমূহ ১.৩১
২.৪ দাবি করার কারণসমূহ ১.৩২
২.৫ সংকট সমূহের ব্যাখ্যা ১.৩৪
২.৬ দেশভিত্তিক আলোচনা ১.৩৪
২.৬.১ ভিয়েতনাম ১.৩৪
২.৬.২ ফিলিপাইন ১.৩৫
২.৬.৩ মালয়েশিয়া ১.৩৬
২.৬.৪ তাইওয়ান ১.৩৭
২.৭ চীন এবং দক্ষিণ-চীনসাগর ১.৩৭

সাম্প্রতিক : ৩

প্যালেস্টাইন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Plaestine Crisis : Presnet Perspective

৩.১ ভূমিকা ১.৪০
৩.২ ফিলিস্তিন এর ইতিহাস ১.৪১
৩.৩ কিভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম ১.৪২
৩.৪ এক নজরে ইসরাইল-ফিলিস্তিনিকার্যক্রম(১৯৪৭-২০১৪)..... ১.৪৩
৩.৫ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের অন্তরায় ১.৪৬
৩.৬ রোডম্যাপ পরিকল্পনা ১.৫০
৩.৭ এক নজরে ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া ১.৫১
৩.৮ এক নজরে ফিলিস্তিনের গেরিলা সংগঠন ১.৫২
৩.৯ কোয়ফেট অন দ্যা মিডলইস্ট ১.৫২
৩.১০ ফিলিস্তিন সমস্যা সমসাধানে প্রনিত রোডম্যাপের গুরুত্ব ১.৫২
৩.১২ পর্যবেক্ষক ভূখণ্ড থেকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ১.৫২

সাম্প্রতিক : ৪

ইরানের পরমাণু সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Nuclear Crisis of Iran : Presnet Perspective

৪.১ ভূমিকা..... ১.৫৯
৪.২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা..... ১.৬০
৪.৩ সামরিক মহড়া ১.৬০
৪.৪ অবরোধ ১.৬১
৪.৫ হরমুজ প্রণালি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১.৬২
৪.৬ আই.এম.এফ ও ইরান ১.৬২
৪.৭ ইরান ও আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) ১.৬২

৪.৮ ন্যাম সম্মেলন ও ইরানের পরমাণু কূটনীতি ১.৬২
৪.৯ বিরোধের পটভূমি ১.৬২
৪.৯ (১) সাম্প্রতিক বিরোধের পটভূমি ১.৬৩
৪.৯ (২) ইরানের ওপর জাতিসংঘের অবরোধ ১.৬৩
৪.৯ (৩) জাতিসংঘ অবরোধ প্রস্তাবের মূল বিষয় ১.৬৩
৪.১০ ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা অভিযোগ ১.৬৩
৪.১১ পশ্চিমা বিশ্বের অভিযোগে ইরানের জবাব ১.৬৪
৪.১২ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নিয়ে বিতর্ক ১.৬৪
৪.১৩ সংকট নিরসনে ৫+১ গ্রুপ ১.৬৪
৪.১৪ ইউরেনিয়াম খনি ও পরমানু কেন্দ্র ১.৬৫
৪.১৫ পরমাণু কর্মসূচি এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ভূমিকা ১.৬৫
৪.১৬ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধের ভবিষ্যৎ সংকটসমূহ ১.৬৫
৪.১৭ সাম্প্রতিক ইরান ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ১.৬৭
৪.১৮ ইরানের সাথে ভয়জাতির পরমাণু ইস্যুর চুক্তি ১.৬৮
৪.১৯ পারমাণবিক কর্মসূচীতে ইরান ষড়শক্তি সমঝোতা ১.৬৯

সাম্প্রতিক : ৫

আরব বসন্ত : বর্তমান প্রেক্ষাপট
The Arab Spring: Presnet Perspective

৫.১ আরব বসন্ত ১.৭৩
৫.২ আরব বসন্ত ও মিশর ১.৭৪
৫.৩ রাজনৈতিক ইতিহাস ১.৭৫
৫.৪ যেভাবে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা ১.৭৬
৫.৫ মুসলিম ব্রাদারহুড ১.৭৬
৫.৬ তাহরির স্কয়ার ১.৭৭
৫.৭ প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুরসির ক্ষমতা গ্রহণ ১.৭৭
৫.৮ মোবারকের যাবজ্জীবন ১.৭৭
৫.৯ SCAF ১.৭৭
৫.১০ প্রেসিডেন্ট-আদালতও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্টতা ১.৭৭
৫.১১ মিসরের স্থগিত এবং খসড়া সংবিধানের তুলনা ১.৭৮
৫.১২ মুরসির চ্যালেঞ্জসমূহ ১.৭৯
৫.১৩ মুরসির ব্যর্থতা ও পতনের কারণ ১.৭৯
৫.১৪ মিশরে অভ্যুত্থান এবং আন্তর্জাতিক মহলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ১.৮০
৫.১৫ নতুন নির্বাচনের রূপরেখা ১.৮১
৫.১৬ চ্যালেঞ্জের মুখে মিসরের গণতন্ত্র ১.৮১
৫.১৭ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মিসরের করণীয় ১.৮২
৫.১৮ মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ ১.৮৩
৫.১৯ আরব বসন্ত ও লিবিয়া ১.৮৪
৫.২০ ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস ১.৮৪
৫০২১ আরব বসন্তের জোয়ারে লিবিয়া ১.৮৪
৫.২২ গাদ্দাফির পতনের কারণসমূহ ১.৮৫
৫.২৩ ২০১২ সালের সাধারন নির্বাচন পরবর্তী লিবিয়া ১.৮৬
৫.২৪ লিবিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট ১.৮৭
৫.২৫ ভবিষৎ স্থিতিশীল লিবিয়ার জন্য করনীয় ১.৮৭

সাম্প্রতিক : ৬

সিরিয়া সংকট এবং ইসলামিক স্টেট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Syria Crisis & Islamic State: Presnet Perspective

৬.১ ভূমিকা ১.৯১
৬.২ সিরিয়ার ইতিহাস ১.৯২
৬.৩ যেভাবে সিরিয়া সংকট শুরু ১.৯২
৬.৪ সিরিয়ায় সহিংস আন্দোলন ১.৯৩
৬.৫ সিরিয়ায় নতুন সংবিধান ১.৯৪
৬.৬ ফ্রেন্ডস অব সিরিয়া ১.৯৪
৬.৭ সিরিয়া বৃহৎ শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত প্রান্তর ১.৯৫
৬.৮ সিরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ ১.৯৫
৬.৯ আন্দোলন সাফল্য লাভ না করার কারণ সমূহ ১.৯৭
৬.১০ সিরিয়ার সংকট সমাধানে গৃহীত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ ১.৯৮
৬.১১ সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ও তার প্রতিবেশীদের ভূমিকা ১.১০১
৬.১২ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্রের হামলা ১.১০৪
৬.১৩ রাশিয়ার প্রস্তাব এবং রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি ১.১০৪
৬.১৪ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত মিশন শুরু ১.১০৫
৬.১৫ বর্তমান সিরিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ১.১০৫
৬.১৬ সিরীয় শরনার্থীদের বর্তমান মানবিক বিপর্যয় ১.১০৫
৬.১৭ আই এস যোদ্ধাদের উপর যৌথ সামরিক অভিযান ১.১০৬

সাম্প্রতিক : ৭

পারস্য উপসাগরীয় সংঘাত : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Persian Gulf Conflict: Presnet Perspective

৭.১ ইরাকের ইতিহাস ১.১০৯
৭.২ ইরাক যুদ্ধের পটভূমি ১.১০৯
৭.৩ ইরাক যুদ্ধের প্রধান কারণ সমূহ ১.১১১
৭.৪ ইরাক যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও অবস্থান ১.১১২
৭.৫ বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার পরবর্তী ইরাকের সংকট এবং তা সমাধানের উপায়সমূহ ১.১১৮

সাম্প্রতিক : ৮

ইউক্রেন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Ukranine Crisis: Presnet Perspective

৮.১ ক্রিমিয়ার ইতিহাস ১.১২২
৮.২ ক্রিমিয়া সংকটের বহুমুখী কারণ ১.১২২
৮.৩ ২১ মে, ২০১২ ন্যাটোর শিকাগো সম্মেলন ১.১২৩
৮.৪ ক্রিমিয়ার গণভোট ১.১২৪
৮.৫ ক্রিমিয়া/ ইউক্রেন সংকট ১.১২৪
৮.৬. ক্রিমিয়া এখন রাশিয়া ১.১২৫
৮.৭ ইউক্রেন সংকটের সূত্রপাত ১.১২৫
৮.৮ ক্রিমিয়ার গণভোট ও জাতিসংঘের প্রস্তাব ১.১২৫
৮.৯ ক্রিমিয়ায় রুশপন্থিদের আন্দোলন ১.১২৫
৮.১০ Geneva Statement of April 17 ..... ১.১২৬

৮.১১ ইউক্রেন সংকট ও ঠাণ্ডাযুদ্ধের সূচনা ১.১২৬
৮.১২ ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ১.১২৯

সাম্প্রতিক : ৯

কোরীয় সংকটের পটভূমি : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Korean Crisis: Presnet Perspective

৯.১ ভূমিকা ১.১৩২
৯.২ সংকট সৃষ্টির পটভূমি ১.১৩৩
৯.৩ বিরোধের বর্তমান প্রেক্ষাপট ১.১৩৫
৯.৩(১) যুদ্ধজাহাজ চোওনান ডুবি এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা ১.১৩৭
৯.৪ উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ১.১৩৮
৯.৫ কোরিয়া শান্তির অন্বেষণে ১.১৩৮
৯.৬ দুই কোরিয়া পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা এবং গৃহীত পদক্ষেপ ১.১৪০
৯.৭ উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণের ভবিষ্যৎ ১.১৪০

সাম্প্রতিক : ১০

কাশ্মীর সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Kasmir Crisis: Presnet Perspective

১০.১ ভূমিকা ১.১৪৩
১০.২ কাশ্মীর পরিচয় ১.১৪৪
১০.৩ কাশ্মীর ইতিহাস ১.৪৪
১০.৪ কাশ্মীর সমস্যার পটভূমি ১.১৪৫
১০.৫ বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক চেষ্টা ১.৪৭
১০.৬ ব্রিটিশ সমীক্ষা রিপোর্ট ১.১৪৮
১০.৭ কাশ্মীরে শান্তি আনয়নের পন্থাসমূহ ১.১৫০
১০.৮ কাশ্মীর সমস্যার পেছনের কারণগুলো ১.১৫০
১০.৯ কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থান ১.১৫০
১০.১০ কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ ১.১৫১

সাম্প্রতিক : ১১

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Middle East & Middle Asia in International

১১.১ ভূমিকা ১.১৫৪
১১..২ মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান ১.১৫৫
১১.৩ মধ্য এশিয়ার অবস্থান ১.১৫৬
১১.৪ মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল ১.১৫৬
১১.৫ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার গুরুত্বসমূহ ১.১৫৬
১১.৫.১ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব ১.১৫৬
১১.৫ (২) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্য এশিয়া যে সব কারণে গুরুত্বপূর্ণ ১.১৬০
১১.৬ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার পটভূমি ১.১৬২
১১.৭ বর্তমান প্রেক্ষাপট ১.১৬৩

১১.৭.১ ফিলিস্তিন প্রশ্নে বর্তমান মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ১.১৬৪
১১.৭.২ জন কেরির শান্তি আলোচনা প্রস্তাব ১.১৬৪
১১.৮ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সমূহ ১.১৬৪
১১.৯ মধ্য এশিয়ার সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের ভূমিকা ১.১৬৬

সাম্প্রতিক : ১২

চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশ্ব রাজনীতি
Economic Development of China & World Politics

১২.১ ভূমিকা ১.১৬৮
১২.২ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা ১.১৬৯
১২.৩ সাম্প্রতিক সময়ে চীন ১.১৭৫
১২.৪ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মেরুকরণ ১.১৭৫
১২.৫ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাব ১.১৭৭
১২.৬ অর্থনৈতিক আধিপত্যে চীন-যুক্তরাষ্ট্রদ্বন্দ্ব ১.১৮০
১২.৭ সাম্প্রতিক চীনের অর্থনীতি ১.১৮২
১২.৮ ডেন শুয়াংচেং-কেনিয়ে সম্পর্ক টানাপোড়েন ১.১৮২
১২.৯ যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ১.১৮২
১২.১০ বর্তমান পরিস্থিতি ১.১৮২
১২.১১ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই ১.১৮৪
১২.১২ আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রঠাণ্ডা লড়াই ১.১৮৪
১২.১৩ যুক্তরাষ্ট্র-চীনসম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ১.১৮৫

আফগানিস্তান সমস্যা : বর্তমান মূল্যায়ন
Afganistan Cristis, Present Evaluation

১৩.১ ভূমিকা ১.১৮৮
১৩.২ ইতিহাসে আফগানিস্তান ১.১৮৯
১৩.৩ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধ ১.১৮৯
১৩.৩ .১ সোভিয়েত মার্কিন দ্বন্দ্ব ১.১৮৯
১৩.৩ .২ সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ১.১৯০
১৩.৩ .৩ সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার ১.১৯১
১৩.৪ নাজিবুল্লার অপসারণ ১.১৯১
১৩.৫ তালিবানদের ক্ষমতা দখল ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া ১.১৯২
১৩.৬ ইরানের ভূমিকা ১.১৯২
১৩.৭ ওআইসির ভূমিকা ১.১৯২
১৩.৮ ভারতের ভূমিকা ১.১৯২
১৩.৯ বাংলাদেশের ভূমিকা ১.১৯৩
১৩.১০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ১.১৯৩
১৩.১১ মধ্য এশিয়ায় প্রভাব ১.১৯৩
১৩.১২ পাকিস্তানের ভূমিকা ১.১৯৩
১৩.১৩ আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধের সমাধানে জাতিসংঘের উদ্যোগ ১.১৯৪
১৩.১৪ আফগানিস্তানে মার্কিন জোট বাহিনীর হামলা ১.১৯৪
১৩.১৫ তালেবানদের সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা ১.১৯৫
১৩.১৬ অস্ত্র ছেড়ে রাজনীতিতে আসার আহবান ১.১৯৫

১৩.১৮	আফগান যুদ্ধের দশ বছর	১.১৯৬
১৩.১৯	আফগান সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ	১.১৯৬
১৩.২০	মূল বক্তব্যসমূহ	১.২০০
১৩.২১	আফগানিস্তানের ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার	১.২০১
১৩.২২	ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ	১.২০২
১৩.২৩	ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা	১.২০৫
১৩.২৪	তালেবানদের পতন এবং আফগানিস্তানের গণতন্ত্র	১.২০৬
১৩.২৫	আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন	১.২০৭
১৩.২৬	ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা	১.২০৮

সাম্প্রতিক : ১৪

চীন ও তার তিব্বতীয় সংকট ঃ বর্তমান মূল্যায়ন
China and Tibetan Crisis

১৪.১	ভূমিকা	১.২১৪
১৪.২	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১.২১৪
১৪.৩	তিব্বতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি	১.২১৬

সাম্প্রতিক : ১৫

একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য
One Axis World Order: USA Power

১৫.১	ভূমিকা	১.২২১
১৫.২	একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট	১.২২২
১৫.৩	বিগত দিনের পররাষ্ট্রনীতির যে ধারা আমরা দেখতে পাই	১.২২২
১৫.৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতি	১.২২৩
১৫.৫	মার্কিন সামরিক ও অর্থনীতির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক	১.২২৪
১৫.৬	বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব	১.২২৫
১৫.৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন	১.২২৬
১৫.৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ	১.২২৭
১৫.৯	যে সকল কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হতে পারে	১.২২৯

প্রয়োজনীয় পাঠ : মানচিত্র অনুশীলন

১৬.১	ভূমিকা	১.২৩১
১৬.২	মানচিত্র তৈরীর ইতিহাস	১.২৩১
১৬.৩	মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজনীয় উপাদান	১.২৩২
১৬.৪	মানচিত্র অংকন কৌশল	১.২৩২
১৬.৫	মানচিত্র অংকন পদ্ধতি	১.২৩৩
১৬.৬	বর্গাকার ছক পদ্ধতিতে মানচিত্র অংকন কৌশল	১.২৩৪
১৬.৭	পৃথিবীর মানচিত্র অংকন কৌশল	১.২৩৫
১৬.৮	বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন কৌশল	১.২৩৬

সাজেশন্স : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোর ১.২৩৮-১.২৫৬

বিভাগ ঃ খ

ধারণাগত বিষয়সমূহ
Conceptual Issues

অধ্যায় : ১

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
International Relaton & International Politics

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.১	ভূমিকা	২.২
১.২	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা	২.৩
১:৪	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি বা বিষয়বস্তু	২.৪
১.৫	আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করার দাবি	২.৫
১.৬	আন্তর্জাতিক রাজনীতি	২.৬
১.৭	আন্তর্জাতিক রাজনীতি কী	২.৬
১.৮	আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি	২.৭
১.৯	আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু	২.৮
১.১০	আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্প্রসারিত রূপ	২.৯
১.১১	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য	২.১১
১.১২	জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি	২.১২

অধ্যায় : ২

বিশ্বে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী
Actors in the world

২.১	ভূমিকা	২.১৭
২.২	সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী	২.১৭
২.২.১	সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের শ্রেণীবিভাজন	২.১৮
২.২.২	আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা	২.১৮
২.৩	অ-রাষ্ট্রীয়ভূমিকা পালনকারী	২.১৯
২.৩.১	অ-রাষ্ট্রীয়সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীগণ	২.১৯
২.৩.২	অরাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী (Non State actors) হিসেবে স্বীকৃতি শত	২.২০
২.৩.৩	অ-রাষ্ট্রীয়ভূমিকা পালনকারীদের শ্রেণীবিভাগ	২.২০
২.৪	আধুনিক রাষ্ট্র	২.২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
২.৪.১	আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী	২.২৩
২.৪.২	অপরিহার্য কার্যাবলি	২.২৩
২.৪.৩	ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি	২.২৪
২.৫	রাষ্ট্র কাকে বলে	২.২৬
২.৫.১	রাষ্ট্রের সংজ্ঞা	২.২৬
২.৬	রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ	২.২৭
২.৭	রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহ	২.২৭
২.৮	সামাজিক চুক্তি মতবাদ	২.২৮
২.৯	হবস্, লক্ ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ	২.২৮
২.৯.১	টমাস হবসের মতবাদ	২.২৮
২.৯.২	জন লকের মতবাদ	২.২৯
২.৯.৩	রুশোর মতবাদ	২.২৯
২.১০	রাষ্ট্রের প্রকারভেদ	২.২৯
২.১১	ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২.৩১
২.১২	নিরাপত্তা কী	২.৩১
২.১২.১	ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত হুমকি	২.৩১
২.১৩	ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার কৌশল	২.৩২
২.১৪	রাষ্ট্রের কার্যাবলি/আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি	২.৩৪
২.১৪.২	রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি	২.৩৫
২.১৫	আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্র ও এর উপাদান	২.৩৫
২.১৫.১	রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ	২.৩৬
২.১৬	রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড	২.৩৭
২.১৬.১	রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের গঠন	২.৩৮
২.১৬.২	রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডঅর্জনের পন্থাসমূহ	২.৩৮
২.১৭	কল্যাণ রাষ্ট্র এবং বৈশিষ্ট্য/কার্যাবলি	২.৪০

অধ্যায় : ৩

শক্তি, জাতীয় শক্তি, শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব এবং যৌথ নিরাপত্তা

National Power, Balance of Power Theroy & Cullective Security

৩.১	ভূমিকা	২.৪৩
৩.২	জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ	২.৪৩
৩.৩	অবস্থান	২.৪৪
৩.৪	আয়তন	২.৪৫
৩.৫	জলবায়ু	২.৪৫
৩.৬	ভূপ্রকৃতি	২.৪৫
৩.৭	প্রাকৃতিক সম্পদ	২.৪৬
৩.৮	জনসংখ্যা	২.৪৭
৩.৯	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	২.৪৯
৩.১০	সামরিক ক্ষমতা	২.৫০
৩.১১	রাজনৈতিক-প্রশাসনিকউপাদান	২.৫০
৩.১২	সামাজিক উপাদান	২.৫২
৩.১৩	মনস্তাত্ত্বিক উপাদান	২.৫২

৩.১৪	জাতীয় মর্যাদা	২.৫৩
৩.১৫	রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা	২.৫৪
৩.১৬	মতাদর্শ	২.৫৪
৩.১৭	জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক	২.৫৬
৩.১৮	শক্তিসাম্য	২.৫৯
৩.১৯	শক্তি সাম্যের বিকাশ	২.৬২
৩.২০	শক্তিসাম্যের বিভিন্ন রূপ	২.৬৩
৩.২১	শক্তিসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতিসমূহ	২.৬৪
৩.২২	বিভেদ ও শাসন নীতি	২.৬৫
৩.২৩	ক্ষতিপূরণ	২.৬৫
৩.২৪	বাফার রাষ্ট্র	২.৬৫
৩.২৫	অস্ত্রসজ্জা ও নিরস্ত্রীকরণ	২.৬৫
৩.২৬	হস্তক্ষেপ থেকে বিরতি	২.৬৫
৩.২৭	জোট ও বিরুদ্ধ জোট গঠন	২.৬৫
৩.২৮	শক্তিসাম্যের কার্য	২.৬৬
৩.২৯	সমালোচনা	২.৬৬
৩.৩১	যৌথ নিরাপত্তা	২.৬৭
৩.৩২	শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তার সম্পর্ক	২.৬৮

অধ্যায় : ৪

অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ

Armament & Disarmament

৪.১	ভূমিকা	২.৭৩
৪.২	নিরস্ত্রীকরণ	২.৭৪
৪.৩	নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে যুক্তি/আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব	২.৭৫
৪.৪	নিরস্ত্রীকরণের সফলতার পথে অন্তরায় বা নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাসমূহ	২.৭৭
৪.৫	পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগীতা শুরু	২.৭৯
৪.৬	বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রের দেশসমূহ	২.৮১
৪.৭	বিভিন্ন দেশের কাছে মজুত পরমাণু অস্ত্রের মোট পরিমাণ	২.৮২
৪.৮	পরমাণুর অস্ত্রবিস্তার রোধ কেন প্রয়োজন	২.৮২
৪.৯	NPTএর বিরোধীতার কারণ	২.৮৩
৪.১০	Nuclear Non Proliferation (NPT)	২.৮৪
৪.১১	NPT এর চুক্তি স্বাক্ষর	২.৮৫
৪.১২	পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি	২.৮৫
৪.১৩	NPT এর মূল্যায়ন	২.৮৫
৪.১৪	NPT বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	২.৮৬
৪.১৫	সিটিবিটি কি? এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য	২.৮৭
৪.১৬	জেনেভার সিটিবিটি বৈঠক ও তার ফলাফল	২.৮৮
৪.১৭	সিটিবিট সম্পর্কে অভিযোগসমূহ	২.৮৯
৪.১৮	সিটিবিটি-রঅনুমোদন	২.৯১
৪.২৯	'বিগ ফাইভ' এর অঙ্গীকার	২.৯২

অধ্যায় : ৫

ভূ-রাজনীতি
G-eopolitics

৫.১ ভূমিকা ২.৯৫
৫.২ ভূ-রাজনীতিরসংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশ ২.৯৬
৫.৩ ভূ-রাজনৈতিকউপাদান সমূহ ২.৯৭
৫.৩.১ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ভূ-রাজনৈতিকভূমিকা ২.৯৮
৫.৪ ভূ-রাজনৈতিকগুরুত্ব ২.৯৯
৫.৪.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভূ-রাজনীতি ২.১০০
৫.৫ ভূ-রাজনৈতিকসমুদ্রসীমার গুরুত্ব ২.১০১
৫.৬ বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিকগুরুত্ব ২.১০১
৫.৬.১ একনজরে বঙ্গোপসাগর ২.১০২
৫.৬.২ ভূ-রাজনৈতিকগুরুত্বসমূহ ২.১০২
৫.৬.৩ বাংলাদেশ বনাম ভারত ২.১০৩
৫.৬.৪ বাংলাদেশের অবস্থান ২.১০৫
৫.৭ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিলোপ ও বৃহৎশক্তির অভ্যুত্থান ২.১০৮
৫.৭.১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রতিক ২.১০৮
৫.৮ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ভূ-রাজনীতি ২.১০৯
৫.৮.১ বঙ্গোপসাগর : বাংলাদেশের সম্ভাবনার সোনালি সম্ভার ২.১০৯
৫.৮.২ মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশিয়ার ভূ-রাজনৈতিকগুরুত্ব ২.১১০
৫.৮.৩ চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভূ-রাজনৈতিকগুরুত্ব ২.১১১
৫.৮.৪ ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিকগুরুত্ব ২.১১১

অধ্যায় : ৬

সন্ত্রাসবাদ : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
Terrorism: International Perspective

৬.১ ভূমিকা ২.১১৫
৬.২ সন্ত্রাসবাদ কী ২.১১৫
৬.৩ সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস ২.১১৬
৬.৪ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ২.১১৭
৬.৫ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ২.১১৭
৬.৬ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের বিবরণ ২.১১৮
৬.৭ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ২.১২১
৬.৮ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ২.১২১
৬.৯ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাফল্য ২.১২২
৬.১০ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ২.১২৪

অধ্যায় : ৭

জাতীয়তাবাদ
Nationalism

৭.১ ভূমিকা ২.১২৬
৭.২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ২.১২৭
৭.৩ জাতীয়তাবাদের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য ২.১২৭
৭.৪ জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ/সভ্যতা ২.১৩০

অধ্যায় : ৮

সাম্রাজ্যবাদ
Imperialism

৮.১ ভূমিকা ২.১৩৪
৮.২ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা ২.১৩৫
৮.৩ সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ২.১৩৫
৮.৪ সাম্রাজ্যবাদের স্তর ২.১৩৭
৮.৫ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ ২.১৩৮
৮.৬ ডলার সাম্রাজ্যবাদ ২.১৪০
৮.৭ সাম্রাজ্যবাদের কি অবসান হয়েছে ২.১৪১

অধ্যায় : ৯

উপনিবেশবাদ ও নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ
Colonialism & Neo-Colonialism

৯.১ ভূমিকা ২.১৪৪
৯.২ উপনিবেশবাদ ২.১৪৪
৯.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায় ২.১৪৫
৯.৪ নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ ২.১৪৭
৯.৫ নব্য উপনিবেশবাদের প্রভাব/বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি ২.১৫০

অধ্যায় : ১০

বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা
Globalisation & New World Order

১০.১ ভূমিকা ২.১৫৬
১০.২ বিশ্বায়নের সংজ্ঞা ২.১৫৭
১০.৩ বিশ্বায়ন ও প্রত্যাশা ২.১৫৯

১০.৪ বৈশিষ্ট্যসমূহ ২.১৫৯
১০.৫ বিশ্বায়নের প্রভাব ২.১৬২
১০.৬ ইতিবাচক প্রভাবসমূহ ২.১৬২
১০.৭ নেতিবাচক প্রভাবসমূহ ২.১৬৪
১০.৮ নয়া বিশ্বব্যবস্থা ২.১৬৮
১০.৯ আমেরিকার নয়া বিশ্ব পরিকল্পনা ২.১৬৮
১০.১০ নব্য বিশ্ব ব্যবস্থা ও সভ্যতার সংঘাত ২.১৬৯
১০.১১ ইসলামী মৌলবাদ : বিশ্বের বিপদসংকেত ২.১৭০
১০.১২ মার্কিন অধিপত্যবাদের সংকোচনের প্রয়াস ২.১৭১

অধ্যায় : ১১

উত্তর আধুনিকতাবাদ
postmoderism

১১.১ ভূমিকা ২.১৭৪
১১.২ পোস্ট মর্ডানিজম ধারনাটির বিকাশ ২.১৭৪
১১.৩ পোস্ট মর্ডানিজম কী? ২.১৭৫
১১.৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পোস্ট মর্ডানিজম ২.১৭৫
১১.৪(১) পোস্টমর্ডানিজম এর অবদানসমূহ ২.১৭৬
১১.৫ উত্তর আধুনিকতাবাদের গণমাধ্যমের প্রভাব ২.১৭৭
১১.৬ বাংলাদেশ ও উত্তর আধুনিকতাবাদ ২.১৭৭
১১.৭ পোস্টমর্ডানিজম দুর্বল দিকসমূহ ২.১৭৮
১১.৮ মূল্যায়ণ ২.১৭৮

অধ্যায় : ১২

স্নায়ুযুদ্ধ
Cold War

১২.১ স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞা ২.১৭৯
১২.২ স্নায়ুযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ২.১৮০
১২.৩ স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তি ২.১৮১
১২.৪ স্নায়ুযুদ্ধের কারণ ২.১৮১
১২.৫ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ২.১৮৩
১২.৬ স্নায়ুযুদ্ধের প্রকৃতি ২.১৮৫
১২.৭ স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডাযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় ২.১৮৫
১২.৭.১ প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-১৯৫০) ২.১৮৫
১২.৭.২ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫০-১৯৫৩) ২.১৮৭
১২.৭.৩ তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৩-১৯৫৯) ২.১৮৮
১২.৭.৪ চতুর্থ পর্যায় (১৯৫৯-১৯৬২) ২.১৮৯
১২.৮ জাতিসংঘের উপর স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ২.১৯১

অধ্যায় : ১৩

পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি
Foreign policy and Diplomacy

১৩.১ ভূমিকা ২.১৯৬
১৩.২ কূটনৈতিক সম্পর্কে ধারণা ২.১৯৭
১৩.৩ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ২.১৯৮
১৩.৪ কূটনীতিবিদের কার্যাবলি ২.১৯৯
১৩.৫ কূটনৈতিকদের দায়মুক্তি ২.২০১
১৩.৬ পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির সম্পর্ক ও পার্থক্য ২.২০১
১৩.৭ কূটনৈতিক অব্যাহতি বা বিমুক্তি বা কূটনীতিকদের সুযোগ সুবিধা ২.২০৪
১৩.৮ সফল কূটনীতিবিদের গুণাবলি ২.২০৬
১৩.৯ অর্থনৈতিক কূটনীতি ২.২০৬

অধ্যায় : ১৪

বৈশ্বিক পরিবেশ ও বিশ্ব রাজনীতি
Global Environment & World Politics

১৪.১ ভূমিকা ২.২১৩
১৪.২ জলবায়ুর পরিবর্তন ২.২১৩
১৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ ২.২১৪
১৪.৩.১ মানব সৃষ্ট কারণ ২.২১৪
১৪.৩.২ প্রাকৃতিক কারণসমূহ ২.২১৬
১৪.৪ অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর জলবায়ুর পরিবর্তন তথা পরিবেশ বিপর্যয়ের হুমকিসমূহ ২.২১৭
১৪.৫ জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় ২.২১৯
১৪.৬ জলবায়ুর পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ২.২২১
১৪.৭ দূষণমুক্ত বিশ্ব গড়তে পরাশক্তির ভূমিকা ২.২২২
১৪.৮ দূষণ সৃষ্টিতে বিশ্ব পরাশক্তির ভূমিকা ২.২২৩
১৪.৯ জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ ২.২২৩
১৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ২.২২৫
১৪.১১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে বাংলাদেশের ভূমিকা ২.২২৭
১৪.১২ জলবায়ু পরিবর্তনের বিপক্ষে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ ২.২২৯
১৪.১৩ বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming) ২.২২৯
১৪.১৪ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ২.২৩০
১৪.১৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অভিযোজন ২.২৩০
১৪.১৬ জলবায়ু কূটনীতি ২.২৩২
১৪.১৭ পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সম্মেলন ২.২৩২
১৪.১৮ পরিবেশ কী ও বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনসমূহ ২.২৩৩
১৪.১৯ কাপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলন ২.২৩৪
১৪.২০ কানকুন জলবায়ু সম্মেলন ২.২৩৫
১৪.২১ ডারবানে জলবায়ু সম্মেলন-২০১১ ..... ২.২৩৫
১৪.২২ কোপেনহেগেন সম্মেলন ও বিশ্ব জলবায়ু ২.২৩৬
১৪.২৩ ৪ Cop-20 বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ২.২৩৭
১৪.২৪ সাম্প্রতিক জলবায়ু সম্মেলনের প্রাপ্তি নিয়ে সংশয় ২.২৩৯
১৪.২৪ পরিবেশ সংরক্ষণে রিও +২০ সম্মেলন ও বিশ্ব ভাবনা ২.২৪০
১৪.২৫ রিও পরিবেশ সম্মেলন এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা ২.২৪১
সাজেশন : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোর ২.২৫০-২.২৭২

বিভাগ ঃ গ

অর্জিত বিষয়সমূহ

Empirical Issues

অধ্যায় : ১

জাতিসংঘ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
The United Nations: Present, Past & Future

১.১ ভূমিকা ৩.৪
১.২ গঠন ৩.৫
১.৩ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ ৩.৬
১.৪ জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ ৩.৬
১.৫ লীগ অব নেশন'স এবং জাতিসংঘের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ৩.৬
১.৬ সাদৃশ্য ৩.৭
১.৭ পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য ৩.৮
১.৮ জাতিসংঘের গঠন ও কার্যাবলি ৩.১০
১.৯ সাধারণ পরিষদ ৩.১০
১.৯(১) সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি ৩.১১
১.৯(২) সাধারণ পরিষদের মূল্যায়ন ৩.১২
১.১০ নিরাপত্তা পরিষদ ৩.১৩
১.১০(১) নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালী ৩.১৩
১.১০(২) নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি ৩.১৪
১.১০(৩) নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ৩.১৬
১.১০(৪) নিরাপত্তা পরিষদকে আরো কার্যকর করার জন্য সুপরিশমালা ৩.১৭
১.১০ (৫) জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান এর নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করতে মডেল ৩.১৭
১.১০(৬) নিরাপত্তা পরিষদের মূল্যায়ন ৩.১৮
১.১০(৭) নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভেটো ক্ষমতা মূল্যায়ন ৩.১৮
১.১১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ৩.১৯
১.১১(১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন প্রণালী ৩.২০
১.১১(২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি ৩.২০
১.১২ অছি পরিষদ ৩.২১
১.১২(১) অছি পরিষদের গঠন ৩.২১

১.১২(২) অছি পরিষদের কার্যাবলি ৩.২২
১.১২(৩) বর্তমান অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত ৩.২২
১.১৩ আন্তর্জাতিক আদালত ৩.২২
১.১৩(১) আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনপ্রণালী ৩.২২
১.১৩(২) আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যাবলি ৩.২২
১.১৪ সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর ৩.২৩
১.১৪(১) সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর এর গঠন ৩.২৩
১.১৪(২) সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ ৩.২৪
১.১৫ জাতিসংঘের ভূমিকা বা সাফল্য ও ব্যর্থতা ৩.২৪
১.১৫(১) জাতিসংঘের সাফল্য ৩.২৫
১.১৫(২) জাতিসংঘের বিগত দিনের সফলতা ৩.২৫
১.১৬ সম্মিলিত জাতিসংঘের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক ৩.২৯
১.১৭ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ৩.৩১
১.১৭(১) নতুন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ৩.৩১
১.১৭(২) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক ৩.৩১
১.১৭(৩) শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যাবলি ৩.৩১
১.১৭(৪) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা ৩.৩২
১.১৭(৫) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ ৩.৩৩
১.১৭(৬) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সুফল ৩.৩৫
১.১৭(৭) শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের কুফল ৩.৩৫
১.১৮ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ৩.৩৬
১.১৮(১) সিডও ১৯৭৯ ..... ৩.৩৬
১.১৯ জাতিসংঘ সংস্কার ৩.৩৭
১.১৯(১) জাতিসংঘের সংস্কার কেন দরকার ৩.৩৭
১.১৯(২) জাতিসংঘের সংস্কারের পথে বাধাগুলো ৩.৩৮
১.১৯(৩) জাতিসংঘের সংস্কারের রূপরেখা ৩.৩৯
১.১৯(৪) জাতিসংঘের সংস্কারের রূপরেখা সম্পর্কে মতামত গুলো ৩.৪০
১.১৯(৫) জাতিসংঘের সংস্কারের মূল্যায়ণ ৩.৪২
১.২০ জাতিসংঘের সামগ্রিক মূল্যায়ণ : জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ ৩.৪২
১.২১ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত ৩.৪৩
১.২১ (১) নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কাঠামোগত সুপারিশ ৩.৪৫
১.২২ UN Woman ৩.৪৬
১.২৩ বাংলাদেশের জাতিসংঘ সম্পর্ক ৩.৪৬
১.২৩(১) বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্য পদ লাভ ৩.৪৬
১.২৩(২) জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র ৩.৪৭
১.২৩(২) জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে প্রথম বাংলা ভাষণ ৩.৪৭
১.২৪ এক নজরে জাতিসংঘ ৩.৫০
১.২৬ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ৩.৫৫
১.২৭ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ৩.৫৭
১.২৮ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ ৩.৫৭
১.২৯ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি ৩.৬০

বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
Global Initiatives & Institutions

অধ্যায় : ২

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জি-৮এবং জি-৭৭
World Bank, IMF, ADB, G-8 & G-77

২.১ ভূমিকা ৩.৬৯
২.২ গঠন ৩.৭০
২.৩ এক নজরে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন ৩.৭১
২.৪ বিশ্বব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ৩.৭১
২.৫ তহবিলের উৎস ৩.৭২
২.৬ পরিচালনা পর্ষদ ৩.৭৩
২.৭ বিশ্বব্যাংকের কার্যাবলি ৩.৭৩
২.৮ বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ৩.৭৪
২.৯ ভোটিং পাওয়ার ৩.৭৫
২.১০ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ৩.৭৫
২.১০ (১) বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ৩.৭৫
২.১১ বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ৩.৭৬
২.১২ ঋণদান পদ্ধতি ৩.৭৬
২.১৪ বিশ্বব্যাংকের ঋণ ৩.৭৬
২.১৪(১) উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে বিশ্বব্যাংকের ঋণদাননীতি ৩.৭৭
২.১৪(২) বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয় ৩.৭৭
২.১৪(৩) বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী ৩.৭৭
২.১৪(৪) বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রদান নীতির সমালোচনা ৩.৭৮
২.১৫ বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক ৩.৭৮
২.১৫(১) বিশ্বব্যাংকের পদ্মাসেতু ঋণ চুক্তি বাতিল ৩.৮০
২.১৬ IMF (International Monetary Fund) ৩.৮২
২.১৬(১) IMF এর লক্ষ্য সমূহ ৩.৮৩
২.১৬(২) IMF এর তহবিলের উৎস ৩.৮৩
২.১৬(৩) যারা ঋণ/সাহায্য পেতে পারে ৩.৮৩
২.১৬(৪) IMF এর কার্যাবলি ৩.৮৪
২.১৭ IMF এর ঋণদান পদ্ধতি ৩.৮৪
২.১৮ এক নজরে বিশ্বব্যাংক ও IMF এর মধ্যে পার্থক্য ৩.৮৫
২.১৮ একনজরে বিশ্বব্যাংক ৩.৮৫
২.১৯ বাংলাদেশ ও আইএমএফ সম্পর্ক ৩.৮৫
২.২০ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৩.৮৭
২.২০(১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের লক্ষ হলো ৩.৮৭
২.২০(২) বাংলাদেশ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সম্পর্ক ৩.৮৭
২.২৩ জি-৮ ..... ৩.৮৯
২.২৪ জি-৭৭ ..... ৩.৯০
২.৩০ একনজরে বিশ্বব্যাংক ৩.৯০

অধ্যায় : ৩

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
World Trade Organization

৩.১ ভূমিকা ৩.৯৪
৩.২ উৎপত্তি ৩.৯৪
৩.৩ গ্যাট থেকে WTO এর রূপান্তর ৩.৯৫
৩.৪ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ৩.৯৬
৩.৫ WTO এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩.৯৬
৩.৬ WTO এর মৌলিক নীতিমালা ৩.৯৭
৩.৭ WTO-এর প্রধান কার্যাবলি ৩.৯৭
৩.৮ WTO-এর সাংগঠনিক কাঠামো ৩.৯৭
৩.৯ বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ৩.৯৭
৩.১০ WTO-চুক্তিতেস্বাক্ষরিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ৩.৯৮
৩.১১ WTO-এরমন্ত্রী সম্মেলন ৩.৯৮
৩.১২ একনজরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ৩.১০০
৩.১৩ WTO and Least Developed Countries (LDCs) ৩.১০০
৩.১৪ WTO ও বাংলাদেশ ৩.১০১
৩.১৫ WTO ও তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ ৩.১০৩

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
Regional Institutions

অধ্যায় : ৪

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা : সার্ক
South Asian Association For Regional Cooperation

৪.১ ভূমিকা ৩.১০৭
৪.২ সার্ক গঠনের পটভূমি ৩.১০৮
৪.৩ সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৩.১০৯
৪.৪ সার্কের নীতিমালা ৩.১১০
৪.৫ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা ৩.১১১
৪.৬ সার্কের সফলতা ও ব্যর্থতা ৩.১১৩
৪.৭ সার্কের ব্যর্থতা ৩.১১৫
৪.৮ সার্ক-এরদুর্বলতা ও মূল্যায়ন ৩.১১৬
৪.৯ সার্কের ভবিষ্যৎ ৩.১১৭
৪.১০ সাপটা ও সাফটা সম্পর্কে আলোচনা ৩.১১৮
৪.১১ দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবস্থা (SAPTA) ৩.১১৯
৪.১২ সাফটা (SAFTA) ৩.১২১
৪.১৩ সাপটা ও সাফটার মধ্যে তফাৎ ৩.১২২

অধ্যায় : ৫

বিমসটেক
BIMSTEC

৫.১ ভূমিকা ৩.১৩০
৫.২ দক্ষিণ এশিয়ার বর্ণনা (সার্ক) ৩.১৩০
৫.৩ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বর্ণনা/আসিয়ান ৩.১৩১
৫.৪ বিমসটেক এর বর্ণনা ৩.১৩২
৫.৫ বিমসটেকের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ৩.১৩২
৫.৬ বিমসটেকের উদ্দেশ্যা, লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তা ৩.১৩২
৫.৭ প্রয়োজনীয়তা ৩.১৩৩
৫.৮ ঢাকায় বিমসটেক এর সচিবালয় ৩.১৩৩
৫.৯ চুক্তির বিষয়বস্তু ৩.১৩৩
৫.১০ দক্ষিণ এশিয়া-দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি ৩.১৩৪

অধ্যায় : ৬

ইউরোপীয় ইউনিয়ন
European Union
European Union

৬.১ ভূমিকা ৩.১৩৯
৬.২ সম্প্রসারিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৩.১৪০
৬.৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ এর বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হালচাল ৩.১৪১
৬.৪ ইইউ গঠিত হওয়ার পর ইউরোপের অর্থনীতিতে প্রভাব ৩.১৪২
৬.৫ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইউরোর প্রভাব ৩.১৪২
৬.৬ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ৩.১৪৩
৬.৭ সম্প্রসারিত ইইউ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতি ও রাজনীতি ৩.১৪৩
৬.৭(১) বাণিজ্য ৩.১৪৩
৬.৭(২) বিশ্ব অর্থনীতিতে ইইউ এর গুরুত্ব ৩.১৪৪
৬.৭(৩) EU এর বিস্তার বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ৩.১৪৫
৬.৮ EURO ৩.১৪৮
৬.৯ ইউরো কি? ৩.১৪৮
৬.১০ ইউরো গঠনের ইতিহাস ৩.১৪৯
৬.১১ ইউরো'র প্রভাব ৩.১৪৯
৬.১২ ইউরো চালু করার শর্তসমূহ ৩.১৪৯
৬.১৩ ইউরোর নোট ও মুদ্রা ৩.১৫০
৬.১৪ ইউরোর অর্থনীতিতে প্রভাব ৩.১৫০
৬.১৫ ইউরো ও একক বাজার ৩.১৫১
৬.১৬ ভবিষ্যৎ বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে ইউরো ৩.১৫১
৬.১৭ মূল্যায়ন ৩.১৫৩

অধ্যায় : ৭

দক্ষিণ-পূর্বএশীয় জাতিসমূহের সংস্থা : আসিয়ান
Association of South-East Asian Nations

৭.১ ভূমিকা ৩.১৫৭
৭.২ আসিয়ান প্রতিষ্ঠার কারণ ৩.১৫৮
৭.৩ আসিয়ানের গঠনের ইতিহাস ৩.১৫৯
৭.৪ আসিয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩.১৬০
৭.৫ সহযোগিতা ও অগ্রগতি ৩.১৬২
৭.৬ আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ১০ দেশের আর্থ-সামাজিকপরিস্থিতি ৩.১৬৩
৭.৭ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ান এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ৩.১৬৬
৭.৮ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে আসিয়ান ৩.১৭০
৭.৯ যে সকল কারণে বাংলাদেশ আসিয়ান এর সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা ৩.১৭১
৭.১০ সাফল্য ও ব্যর্থতা ৩.১৭২
৭.১১ আসিয়ানের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা ৩.১৭৩

অধ্যায় : ৮

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা : ন্যাটো
North Atlantic Treaty Organization

৮.১ ভূমিকা ৩.১৭৭
৮.২ ন্যাটোর সৃষ্টি ৩.১৭৭
৮.৩ ন্যাটো গঠনের পটভূমি ৩.১৭৮
৮.৫ ন্যাটো গঠনের কারণ ৩.১৭৮
৮.৬ ন্যাটো (NATO) এর উদ্দেশ্য ৩.১৭৯
৮.৭ ন্যাটো-এরগঠন ৩.১৮০
৮.৮ একনজরে ন্যাটোর সম্প্রসারণ ৩.১৮০
৮.৯ ন্যাটো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ৩.১৮১
৮.১০ পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ৩.১৮২
৮.১১ সম্প্রসারণ নয় ন্যাটোর রূপান্তর প্রয়োজন ৩.১৮৪

অধ্যায় : ৯

এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনঃ অ্যাপেক
Asia Pacific Economic Co-operation

৯.১ ভূমিকা ৩.১৮৮
৯.২ বৈশিষ্ট্য ৩.১৮৮
৯.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩.১৮৯
৯.৪ সদস্য দেশসমূহ (২১টি) ৩.১৮৯
৯.৫ বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা ৩.১৯০
৯.৬ এ্যাপেক ও বিশ্বায়ন ৩.১৯০
৯.৭ এ্যাপেকের কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকরী কর্মসূচী ৩.১৯১

অধ্যায়:১০

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা
Organization Of Islamic Co-operation

১০.১ ভূমিকা ৩.১৯৬
১০.২ ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ৩.১৯৭
১০.৩ ও.আই.সি এর নতুন সনদ ৩.১৯৮
১০.৪ ওআইসি'র সাংগঠনিক কাঠামো ৩.১৯৯
১০.৫ ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ ৩.২০০
১০.৬ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন ৩.২০০
১০.৭ ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ ৩.২০১
১০.৮ নীতিমালাসমূহ ৩.২০১
১০.৯ সহযোগী সংস্থা ৩.২০২
১০.১০ ও.আই.সি'র কার্যক্রমসমূহ ৩.২০২
১০.১১ অঙ্গ সংগঠন সমূহ ৩.২০৫
১০.১২ মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় ও.আই.সি'র ভূমিকা ৩.২০৫
১০.১৩ ওআইসিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ৩.২০৭
১০.১৪ আর্থ-সামাজিকউন্নয়ন ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ও. আই সি'র ভূমিকা ৩.২০৮
১০.১৫ ও.আই.সি.'এর সফলতা ৩.২০৯
১০.১৬ বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক ৩.২১০
১০.১৭ ওআইসি -এরকার্যক্রম মূল্যায়ন ৩.২১১

অধ্যায়:১১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি
The Foreign Policy of the United States

২৬.১ ভূমিকা ৩.২১৫
২৬.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ৩.২১৫
২৬.৩ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিসমূহ ৩.২১৬
২৬.৪ ট্রুম্যান যুগ (১৯৪৫-১৯৫৩) ৩.২১৭
২৬.৫ আইসেনহাওয়ার যুগ (১৯৫৩-১৯৬০) ৩.২১৮
২৬.৬ কেনেডী যুগ (১৯৬০-১৯৬৩) ৩.২১৮
২৬.৭ জনসন যুগ (১৯৬৩-১৯৬৮) ৩.২১৮
২৬.৮ নিক্সন যুগ (১৯৬৯-১৯৭৬) ৩.২১৮
২৬.৯ কার্টার যুগ (১৯৯৭-১৯৮০) ৩.২১৯
২৬.১০ রিগান যুগ (১৯৮১-১৯৮৮) ৩.২১৯
২৬.১১ জর্জ ওয়াকার বুশের যুগ (১৯৮৯-১৯৯৩) ৩.২২০
২৬.১২ বিল ক্লিন্টন ৩.২২০
২৬.১৩ জর্জ বুশ ৩.২২০
২৬.১৪ বারাক ওবামা প্রথম যুগ ৩.২২০
২৬.১৫ বারাক ওবামা দ্বিতীয় যুগ(২০১২-বর্তমান) ৩.২২০
২৬.১৬ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ৩.২২৩
২৬.১৭ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য ও ব্যর্থতা ৩.২২৪
২৬.১৮ এশিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ৩.২২৫
২৬.১৯ এশিয়ান মুসলিম রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ৩.২২৮

অধ্যায়:১২

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি
The Foreing Policy of India

১২.১ ভূমিকা ৩.২২৯
১২.২ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ ৩.২২৯
১২.৩ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ ৩.২৩২
১২.৪ ভারতের সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতি ৩.২৩৩
১২.৫ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা ৩.২৩৫

অধ্যায়:১৩

পররাষ্ট্রনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ
Foreign Policy:Bangladesh Perspective

১৩.১ ভূমিকা ৩.২৩৬
১৩.২ পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা ৩.২৩৭
১৩.৩ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাংবিধানিক মূলনীতি ৩.২৩৭
১৩.৪ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভৌগোলিক ও ভূরাজনৈতিক ভিত্তি ৩.২৩৮
১৩.৫ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উপাদান ৩.২৩৮
১৩.৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভৌগোলিক ভিত্তি ৩.২৪০
১৩.৭ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩.২৪০
১৩.৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভূরাজনৈতিক ভিত্তি ৩.২৪০
১৩.১০ শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭২-১৯৭৫) ৩.২৪৪
১৩.১১ জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭৬-১৯৮১) ৩.২৪৭
১৩.১২ হোসেইন মোহম্মদ এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৮২-১৯৯০) ৩.২৫০
১৩.১৩ বেগম খালেদা জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি (১৯৯১-১৯৯৫) ৩.২৫২
১৩.১৪ শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি (১৯৯৬-২০০১) ৩.২৫৩
১৩.১৬ ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদের পররাষ্ট্রনীতি (২০০৭-২০০৮) ৩.২৫৭
১৩.১৭ শেখ হাসিনা বা মহাজোট সরকারের পররাষ্ট্রনীতি (২০০৯-বর্তমান) ৩.২৫৭
১৩.১৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বল দিকঅধ্যায় ৩.২৬২

অধ্যায়:১৪

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বৃহৎ শক্তির পররাষ্ট্রনীতি
Big Power Foreign Policy During the Bangladesh Libaration War

১৪.১ ভূমিকা ৩.২৬৭
১৪.২ মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি ৩.২৬৭
১৪.২.১ মার্কিন নীতির প্রথম পর্যায় ৩.২৬৭
১৪.২.২ মার্কিন নীতি দ্বিতীয় পর্যায় ৩.২৬৯
১৪.২.৩ মার্কিন নীতির তৃতীয় পর্যায়ে (সেপ্টেম্বর-৩ ডিসেম্বর ১৯৭১) ৩.২৬৯
১৪.২.৪ মার্কিন নীতির চতুর্থ পর্যায় (ডিসেম্বর-১৯৭১) ৩.২৬৯
১৪.২.৫ মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি পর্যায়ে ভূমিকা ৩.২৭০

১৪.৩ মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ৩.২৭১
১৪.৩.১ সোভিয়েত নীতি প্রথম পর্যায় (মার্চ ১৯৭১-জুন১৯৭১) ৩.২৭১
১৪.৩.২ সোভিয়েত নীতির দ্বিতীয় পর্যায় (জুলাই ১৯৭১-নভেম্বর১৯৭১)..... ৩.২৭১
১৪.৩.৪ সোভিয়েত নীতির শেষ পর্যায় ৩.২৭১
১৪.৪ মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা ৩.২৭২
১৪.৪.১ চৈনিক নীতির প্রথম পর্যায় (এপ্রিল ১৯৭১-নভেম্বর১৯৭১)..... ৩.২৭২
১৪.৫ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ৩.২৭৫
১৪.৫.৪ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বেসরকারী সহযোগিতা ৩.২৭৫
১৪.৬ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রভাব ৩.২৭৫

অধ্যায়:১৫

দ্বি-পাক্ষিকসম্পর্ক : বাংলাদেশ ও বৃহৎ শক্তিসমূহ
By-Lateral Relation : Bangladesh & Major Power

১৫.১ বাংলাদেশ-ভারতসম্পর্কের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৩.২৭৮
১৫.২ মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্পর্কে ৩.২৭৯
১৫.৩ সীমান্ত সম্পর্ক ৩.২৮০
১৫.৪ স্থলসীমান্ত চুক্তির ৩.২৮১
১৫.৫ পানিবণ্টন ৩.২৮২
১৫.৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ৩.২৮৩
১৫.৮ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক ৩.২৮৪
১৫.৯ বাংলাদেশ-মায়ানমারসম্পর্ক ৩.২৮৪
১৫.১০ বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক ৩.২৮৬
১৫.১২ বাংলাদেশ-আমেরিকাসম্পর্ক ৩.২৮৭
১৫.১৫ বাংলাদেশ-জার্মানীসম্পর্ক ৩.২৯৬

অধ্যায়:১৬

বহু-পাক্ষিকসম্পর্ক
Multilateral Relation

১৬.১ ভূমিকা ৩.৩০০
১৬.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কিউবার সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ..... ৩.৩০০
১৬.৩ এক নজরে যুক্তরাষ্ট্র-কিউবাদ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..... ৩.৩০০
১৬.৫ সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বৈধকে মার্কিন-কিউবানেতৃত্ব..... ৩.৩০২

সাজেশন্স : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোর..... ৩.৩০৫-৩.৩১২

বিভাগ ঃ ঘ

বিবিধ
Miscellaneous

১. সাম্প্রতিক আলোচিত টীকা

ইসলামিক স্টেটস (আইএস)..... ৪.২
ওকারোধে আন্তর্জাতিক জোট..... ৪.৩
সিল্ক রোড..... ৪.৩
ঘরনি উদ্যাবষড়ঢ়সবহঃ ইধহশ..... ৪.৪
ব্রিটকয়েন..... ৪.৪
বিগ - বি..... ৪.৪
তরুমার ভারত সফর..... ৪.৫
শার্লি হেবদো..... ৪.৫
বিশ্ব অর্থনিতির পরাশক্তি চীন..... ৪.৬
ছাতা বিপ্লব..... ৪.৬
বাংলাদেশ চীন ভারত মিয়ানমার করিডোর... ৪.৬
বিমসটেক সচিবালয়..... ৪.৭
'অওওই (বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প)..... ৪.৭
কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থান... ৪.৮
ক্রিমিয়া সংকট ৪.৮
গউএ এর পর কউএ ৪.৯
গাজা সংকট ও বিশ্ব মানবতা ৪.৯
প্রাণঘাতি ইবোলা ভাইরাস ৪.১০
ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ ৪.১০
স্কটলান্ডের গনভোট ৪.১১
আন্তর্জাতিক নদীধারা সনদ কার্যকর ৪.১১
নতুন সামরীক কৌশল ৪.১২
নাসাকা বাহিনী ৪.১২
এক সুবিধা ও বাংলাদেশের শ্রম আইন.. ৪.১৩
ইউরোপে নতুন জিএসপি..... ৪.১৩
তেলেঙ্গানা: ভারতের নতুন রাজ্য..... ৪.১৪
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান... ৪.১৫
মিয়ানমারে কাচিন বিদ্রোহ..... ৪.১৫
দক্ষিণ এশীয় ট্রাস্কফোর্স..... ৪.১৫
হারাক..... ৪.১৬
কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি..... ৪.১৬
বঙ্গোপসাগরে সম্পদ আহরণ..... ৪.১৬
এমডিজি ও বাংলাদেশ..... ৪.১৭
ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক..... ৪.১৭
সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল..... ৪.১৭
ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস..... ৪.১৭
হামাস-ফাতাহ ঐতিহাসিক ঐক্যচুক্তি..... ৪.১৮
নেক্সি সিল..... ৪.১৮
অ্যাবোটাবাদ..... ৪.১৮
অপারেশন জেরোনিমো..... ৪.১৯
বোয়াজিজি..... ৪.১৯
ঊষাসরবহ অবড়ৎঁরড়হ..... ৪.১৯
খালিদ সাইদ..... ৪.২০
তাহরির স্কয়ার..... ৪.২০
গ্রিন স্কয়ার..... ৪.২০
অপারেশন ওডিসি ডন..... ৪.২০
"এসরহঃ ইড়ভস"..... ৪.২১
আফগান শান্তি পরিষদ..... ৪.২১
ভাষা কোরো..... ৪.২১
ওড়ঢ়ষংরড়হবংরাসেবা নিঃসঙ্গবাদ..... ৪.২১
ওহ-ইয়ুন-সুন..... ৪.২২
বৈশ্বিক উষ্ণতা ও উন্নয়নশীল দেশ..... ৪.২২
জলবায়ু শরণার্থী..... ৪.২৩

২. আলোচিত ব্যক্তিত্ব

হাসান রুহানি..... ৪.২৩
মালালা ইউসুফজাঈ..... ৪.২৪
ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী..... ৪.২৪
ট্রায়বন মার্টিন..... ৪.২৪
গবরহ ঙবসধ..... ৪.২৫
আরাফাত ও পলোনিয়াম বিতর্ক..... ৪.২৫
মাইকেল ফেলপস..... ৪.২৬
বেনজির ভুট্টো..... ৪.২৬
রাউল ক্যাস্ট্রো..... ৪.২৬
কিম জং ইল..... ৪.২৬
বান কি মুন..... ৪.২৬

বান কি মুন ৪.২৬
হুগো শ্যাভেজ ৪.২৭
অংসান সুচি ৪.২৭
ফিদেল ক্যাস্ট্রো ৪.২৭
সাদ্দাম হোসেন ৪.২৭
অমর্ত্য সেন ৪.২৯
সিদ্ধার্থ শংকর রায় ৪.২৯
লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ৪.২৯
কমলাপ্রসাদ বিশ্বেশ্বর ৪.৩০
মাদার তেরেসা ৪.৩০
জাননা গুসমাও ৪.৩০

৫. আলোচিত স্থান

ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্ব ৪.৩৬
নাথুলা পাস ৪.৩৬
গিলগিট-বালতিস্থান ৪.৩৭
দক্ষিণ ওসেটিয়া ৪.৩৭
আবু গারীব ৪.৩৭
সুবিকবে ৪.৩৭
গুয়াম ৪.৩৮
হেইজিআইজি ৪.৩৮
ফালুজা ৪.৩৮
সেভেন সিস্টার ৪.৩৮
গাজা ৪.৩৮
হোয়াইট হাউস ৪.৩৯
গ্রাউন্ড জিরো ৪.৩৯
তিকরিত ৪.৩৯
কারবালা ৪.৩৯
তিব্বত ৪.৪০
নাগাসাকি ৪.৪০
গোলান মালভূমি ৪.৪০
ম্যাকাও ৪.৪১
মাজার-ই-শরীফ ৪.৪১
ওয়াটার লু ৪.৪১
হিরোশিমা ৪.৪১
বাস্তিল দুর্গ ৪.৪২
চীনের প্রাচীর ৪.৪২
হেরবন মসজিদ ৪.৪২
হযরতবাল মসজিদ ৪.৪২
আল আকসা মসজিদ ৪.৪৩
চারাই-ই-শরীফ ৪.৪৩
বাবরী মসজিদ ৪.৪৩
আইফেল টাওয়ার ৪.৪৩
'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' ৪.৪৩

৬.জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠন

জাতিসংঘ ৪.৪৪
'ভেটো' ক্ষমতা ৪.৪৫
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আসং) ৪.৪৫
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ৪.৪৫
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ৪.৪৬
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ৪.৪৬
ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও) ৪.৪৬
ইউএনডিপি (ইউএনডিপি) ৪.৪৬
সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ৪.৪৭
ইউ এন সংঘ ৪.৪৭
জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪৭
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (প্রজপ) ৪.৪৮
ইউএনওজি ৪.৪৮
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা ৪.৪৮
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি ৪.৪৮
বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (ইউ পি) ৪.৪৯
আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আই) ৪.৪৯
জাতিসংঘ শিক্ষোন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ৪.৪৯
বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) ৪.৪৯
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (আইফাদ) ৪.৪৯
আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (আইএমও) ৪.৫০
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ৪.৫০
জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন ৪.৫০
জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (ইনউ) ৪.৫০
ঘটকং ঘ ৪.৫১
শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ ৪.৫১
এসকাপ (ইএসক্যাপ) ৪.৫১
পূর্ব তিমুরে সমন্বিত জাতিসংঘ মিশন ৪.৫১
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ৪.৫১

৭. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট

সার্ক (সাফআরসি) ৪.৫২
সার্ক গণতন্ত্র সনদ ৪.৫৩
সার্ক অ্যাওয়ার্ড ৪.৫২
সার্ক ফুড ব্যাংক ৪.৫২
কসওই ৪.৫২
সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ৪.৫৪
আসিয়ান ৪.৫৪
আরব লীগ (পবসমর্থন মুক্তঅঞ্চল বাংলা) ৪.৫৫
বিমসটেক (ইংগাকঞ্জউষ) ৪.৫৫
সি আই এস ৪.৫৬
উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (এসসি) ৪.৫৬
আমেরিকান দেশসমূহের সংস্থা (ওআস) ৪.৫৬
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (নঅম) ৪.৫৬
কমনওয়েলথ ৪.৫৭
কমনওয়েলথ-এর নতুন সনদ ৪.৫৭
সি আই এস ৪.৫৮
ওআইসি (ওওসি) ৪.৫৮
সিয়ভাপ (ইওজউঅ) ৪.৫৯
ক্লাইমেট এন্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন ৪.৫৯
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৪.৫৯

ইউরোপীয় মুদ্রা 'ইউরো' ৪.৬০
আকু (Asian Clearing Union) ৪.৬০
ASEM ৪.৬০

৮. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট

৭৭ জাতিগোষ্ঠী ৪.৬১
ও-২০ ..... ৪.৬৭
জি-৮ (G-8) ৪.৬১
ডি-৮ (D-8) ৪.৬১
উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC) ৪.৬২
ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন ৪.৬২
ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি ৪.৬২
ইকো (ECO) ৪.৬২
ওপেক (OPEC) ৪.৬২
এপেক ৪.৬৩

৯. সামরিক জোট

ন্যাটো (NATO) ৪.৬৩
আনজুস (ANZUS) ৪.৬৩

১০. আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বিশ্ব ব্যাংক ৪.৬৩
আইএমএফ ৪.৬৪
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৪.৬৫
বিশ্ব অর্থ সংস্থা ৪.৬৫
ব্রিকস (BRICS) ৪.৬৫
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক ৪.৬৬
ই বি আর ডি ৪.৬৬
ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) ৪.৬৬

১১. আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা

রেডক্রস (Red Cross) ৪.৬৭
অরবিস ইন্টারন্যাশনাল ৪.৬৭
টুইসডে গ্রুপ ৪.৬৭
রোটারি ক্লাব ৪.৬৮
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ৪.৬৮
মানবাধিকার কমিশন ৫৭৬

১২. আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা

ইন্টারপোল (Interpol) ৪.৬৮
এফবিআই (FBI) ৪.৬৮
আই.এস.আই ৪.৬৮
সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (ইএম) ৪.৫৯

১৩. আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক চুক্তি ও সনদ

টিকফা (TICFA) ৪.৬৯
লিসবন চুক্তি ৪.৭০
অস্ত্র বাণিজ্য রোধে জাতিসংঘ চুক্তি ৪.৭১
সিজো ৪.৭১
জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সংক্রান্ত সনদ ৪.৭১
সাপটা ও সাফটা ৪.৭১
নাফটা (NAFTA) ৪.৭২
আফটা (AFTA) ৪.৭২
লাফটা (LAFTA) ৪.৭২
ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ৪.৭২
সিমলা চুক্তি ৪.৭৩
মাসট্রিস্ট চুক্তি (MaastrichtTreaty) ৪.৭৩
ম্যাগনাকার্টা ৪.৭৪
ATT ৪.৭৪
ট্রিপস ৪.৭৪
মার্কিন প্রিজম কর্মসূচী ৪.৭৫
নতুন আসিয়ান সনদ ৪.৭৫
মদিনা সনদ ৪.৭৫

১৪. আলোচিত গণমাধ্যম

আল জাজিরা ৪.৭৫
আল হুরবা ৪.৭৬
বিবিসি ৪.৭৬
ভয়েজ অব আমেরিকা ৪.৭৬
সিএনএন ৪.৭৬
রয়টার্স ৪.৭৭
আল জাজিরা ইন্টারন্যাশনাল ৪.৭৭

১৫. আলোচিত গেরিলা সংগঠন

ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (PLO) ৪.৭৭
হামাস ৪.৭৭
ফাতাহ ৪.৭৮
হিজবুল্লাহ ৪.৭৮
আল কায়েদা ৪.৭৮
তালেবান ৪.৭৮
খেমারুজ ৪.৭৮
উলফা ৪.৭৯
এলটিটিই ৪.৭৯
জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট ৪.৮০

১৬. আন্তর্জাতিক সীমারেখা, গুরুত্বপূর্ণ

সপ্তদশ অক্ষরেখা (17th Parallel) ৪.৮০
সপ্তদশ অক্ষরেখা ৪.৮০
৩৮তম অক্ষরেখা ৪.৮০
ম্যাকমোহন লাইন ৪.৮১
পারস্য উপসাগর (The Gulf Sea) ৪.৮১
হরমুজ প্রণালী ৪.৮১
সুয়েজ খাল ৪.৮২
পানামা খাল (Panama Canal) ৪.৮২
পক প্রণালী ৪.৮২

লোহিত সাগর ৪.৮৩
সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ ৪.৮৩
চাগোস দ্বীপপুঞ্জ ৪.৮৩
ফকল্যান্ড ৪.৮৪
জাফনা দ্বীপ ৪.৮৪
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৪.৮৪
আবু মুসা দ্বীপ ৪.৮৪
স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ ৪.৮৪

১৭. আলোচিত মারণাস্ত্র ও পারমাণবিক বিশ্ব

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী ৪.৮৫
পরমাণু প্রকল্প ৪.৮৫
উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচী ... ৪.৮৫
জীবানু অস্ত্র ৪.৮৬
WMD -গণবিধ্বংসী অস্ত্র ৪.৮৬
এনএমডি ৪.৮৫

১৮. আলোচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ঈশ্বর কণার সন্ধানে ৪.৮৭
নাসা(NASA) ৪.৮৭
WWW ৪.৮৭
Galice'Project ৪.৮৭
ফেসবুস ৪.৮৮
মজিলা ফায়ারফক্স ৪.৮৮
ব্লগিং ৪.৮৮
উইকিলিকস ৪.৮৮
Twitter ৪.৮৯
গুগল প্লাস (Google Plus) ৪.৮৯
ইউটিউব (You Tube) ৪.৮৯
Electronic Voting Maching (EVM) ৪.৮৯
ভিওআইপি ৪.৯০
কোয়ান্টাম তত্ত্ব ৪.৯০
বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব ৪.৯০

১৯. আলোচিত বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪.৯১
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৪.৯১
বেলফোর ঘোষণা ৪.৯১
নুরেমবার্গ আদালত ৪.৯২

২০. বিশ্বের বিখ্যাত কেলেংকারি

ওয়াটারগেট ৪.৯২
ইরান-কন্ট্রা ৪.৯২
হাওয়ালা ৪.৯২
লাকহীড ৪.৯৩
বোফোর্স ৪.৯৩
ব্লাকওয়াটার কেলেঙ্কারি ৪.৯৩
আজাদ কাশ্মীর ৪.৯৩
নোম্যানস ল্যান্ড ৪.৯৩
তৃতীয় বিশ্ব ৪.৯৪
চতুর্থ বিশ্ব ৪.৯৪
উন্নত বিশ্ব ৪.৯৪
লয়া জিরগা ৪.৯৫
কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা ৪.৯৫
'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি ৪.৯৫
সাম্যবাদ ৪.৯৫
কনফেডারেশন ৪.৯৬
একনায়কতন্ত্র ৪.৯৬
মৌলিক অধিকার ৪.৯৬

২১. আলোচিত কূটনৈতিক

প্রোটোকল ৪.৯৬
কোয়ের্টে অন দ্য মিডল ইস্ট ৪.৯৬
প্লাটফরম অপর অ্যাকশন ৪.৯৭
Mein Kamp ৪.৯৭
Poor Colonial Club ৪.৯৭
আয়রন কার্টেন ৪.৯৬
পিং পং কূটনীতি ৪.৯৭
নিক্সন ডকট্রিন ৪.৯৭
ডোমিনো থিউরি ৪.৯৮
ট্রুম্যান ডকট্রিন ৪.৯৮
অপারেশন হাস্কি ৪.৯৮
অপারেশন বারবারোস ৪.৯৮
ক্রীড়াতত্ত্ব ৪.৯৯
শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব ৪.৯৯
শ্বেতাঙ্গদের বোঝা ৪.৯৯
আধিপত্যবাদ ৪.৯৯
গণতান্ত্রিক কূটনীতি ৪.৯৯
ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী ৪.১০০
গার্ডিয়ান কাউন্সিল ৪.১০০
সুপ্রিম লিডার ৪.১০০
ব্যর্থ রাষ্ট্র ৪.১০০
প্যারেস্ত্রাইকা ৪.১০০
ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ৪.১০০
ট্রাক কূটনীতি ৪.১০১
সাইডলাইন কূটনীতি ৪.১০১
ব্যক্তিগত কূটনীতি ৪.১০০
টেলিফোন কূটনীতি ৪.১০০

অধ্যায় : ২

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- বিশ্বের মহাদেশ পরিচিতি ৪.১০২
- বিশ্ব ইতিহাস (এশিয়া মহাদেশ) ৪.১০২
- অঞ্চলভিত্তিক এশিয়া ৪.১০৩
- তথ্য কণিকা : দূরপ্রাচ্য ৪.১০৩
- তথ্য কণিকা : মধ্য প্রাচ্য ৪.১০৪
- তথ্য কণিকা : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৪.১০৪
- দক্ষিণ এশিয়া ৪.১০৪
- এশিয়ার পাহাড়/পর্বত ৪.১০৪
- এশিয়ার প্রণালী ৪.১০৫
- এশিয়া দ্বীপ ৪.১০৫
- এশিয়ার অন্তর্গত কী, কোথায় অবস্থিত ৪.১০৫
- এশিয়ার স্মরণীয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিকর্ম ৪.১০৬
- এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রীয় বিবরণ : পরিচিতি,রাজনীতি ও অর্থনীতি ৪.১০৭
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ৪.১১৩
- দূর প্রাচ্য ৪.১১৭
- মধ্যপ্রাচ্য ৪.১২৪
- উত্তর পশ্চিম এশিয়া ৪.১২৭
- ইউরোপ ভৌগোলিক বিবরণ ৪.১২৮
- তথ্য তরঙ্গে ইউরোপ মহাদেশ ৪.১২৮
- ইউরোপের প্রণালী ৪.১২৮
- ইউরোপের নদ-নদী ৪.১২৯
- ইউরোপের দ্বীপ ৪.১২৯
- বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাস (ইউরোপ মহাদেশ) ৪.১২৯
- তথ্য তরঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশ ৪.১৩৩
- বিশ্ব পরিমণ্ডলে আফ্রিকা ৪.১৩৩
- বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাস (আফ্রিকা মহাদেশ) ৪.১৩৪
- বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাস (ওশেনিয়া মহাদেশ) ৪.১৩৫
- তথ্য তরঙ্গে উত্তর আমেরিকা ৪.১৩৬
- বিশ্ব পরিমণ্ডলে উত্তর আমেরিকা ৪.১৩৭
- অঞ্চল ভিত্তিক উত্তর আমেরিকা ৪.১৩৭
- তথ্য তরঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ ৪.১৩৮
- বিশ্ব ইতিহাস ও রাজনীতি (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ) ৪.১৩৮
- দেশ সম্পর্কিত ভৌগলিক তথ্য ৪.১৪০
- বিভিন্ন দেশ ও স্থানের নামকরণের ইতিহাস ৪.১৪২
- বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি ৪.১৪৩
- আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪.১৪৪
- ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম ৪.১৪৫

- রুশ বিপ্লব ৪.১৪৬
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলার ৪.১৪৭
- জানা- অজানা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক টুকিটাকি ৪.১৪৯
- তথ্যগুলো অবশ্যই জেনে রাখা ভাল ৪.১৫৫
- বিশ্ব কূটনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক পরিভাষা ৪.১৫৮
- আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি ৪.১৬৪
- বিখ্যাত সামরিক অভিযান ৪.১৬৬
- তথ্য কণিকায় ভূ-রাজনীতি ৪.১৬৮
- বঙ্গোপসাগরের ভৌগলিক বৈশিষ্ট ৪.১৬৯
- বঙ্গোপসাগরের সম্পদ ৪.১৬৯
- আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি ৪.১৬৯
- এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ ৪.১৭৪
- এক নজরে বিশ্বের ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মগ্রন্থ ৪.১৭৫
- এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ ৪.১৭৫
- এক নজরে বিখ্যাত প্রণালীসমূহ ৪.১৭৮
- এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাসভবন ৪.১৭৬
- পৃথিবীর মহাসাগর সমূহ ৪.১৭৮
- এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থাপনা ৪.১৭৬
- এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় সমূহ ৪.১৭৭
- পৃথিবীর মহাসাগর সমূহ ৪.১৭৮
- *বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলী* *৪.১৭৯-৪.১৯৪*
- *বিগত বিসিএস ব্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পরীক্ষার প্রশ্নাবলী* ৪.১৯৫-৪.১৯৮
- *সহায়ক গ্রন্থাবলি* *৪.১৯৯.৪.২২*

KEY TO B C S

&

WAY TO INTERNATIONAL RELATION

গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি
Chronology of Important International Events

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯০০ ঃ ◆ চীনে বক্সার বিদ্রোহ।

১৯০১ ঃ ◆ ফিলিপাইনে বিদ্রোহ।

◆ ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়।

◆ নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন (সুইডেনে)।

◆ কমনওয়েল অব অস্ট্রেলিয়া গঠিত হয়।

১৯০৪ ঃ ◆ রাশিয়া-জাপান যুদ্ধ শুরু–রাশিয়া জাপানের সঙ্গে ১৯০৬ সালে শান্তি স্থাপন করে।

১৯০৫ ঃ ◆ রাশিয়ার অস্থিরতা–রুশ বিপ্লবের প্রস্তুতি।

◆ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন।

◆ ১৬ অক্টোবর : বঙ্গভঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন এবং ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী ঘোষণা।

১৯০৬ ঃ ◆ ৩০ ডিসেম্বর : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠাতা-নবাব সলিমুল্লাহ)।

১৯০৭ ঃ ◆ ত্রিদেশীয় আঁতাত।

১৯০৮ ঃ ◆ দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বশাসন। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া হারজেগোভিনা দখল।

১৯০৯ ঃ ◆ কমান্ডার রবার্ট পিয়েরে কর্তৃক উত্তরমেরু আবিষ্কার।

১৯১০ ঃ ◆ ২২ আগস্ট: জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল।

১৯১১ ঃ ◆ চীনে মাঞ্চু রাজবংশের পতন এবং প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

১৯১২ ঃ ◆ চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ফ্রান্স মরক্কোয় উপনিবেশ স্থাপন। বলকান যুদ্ধ।

১৯১৩ ঃ ◆ ১৫ নভেম্বর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ (গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য)।

১৯১৪ ঃ ◆ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে প্রথমবারের মতো রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় প্রতিপক্ষের ওপর। নোবেল বিজয়ী জার্মান রসায়নবিদ ফ্রিটজ হেবার এ কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

◆ পানামা খাল খুলে দেওয়া হয়।

আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো গঠন করে।

- জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৫০ ঃ
- কোরিয়ার যুদ্ধ; চীন তিব্বত দখল করে।
- সুম্যান পরিকল্পনা ঘোষণা।

১৯৫১ ঃ
- জাপান শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

১৯৫২ ঃ
- মিসরের রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করা হয়।
- ব্রিটেন কর্তৃক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।
- রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ।

১৯৫৩ ঃ
- জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কোরিয়ায় যুদ্ধ অবসান ঘটে।
- মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শান্তির জন্য আণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপন।

১৯৫৪ ঃ
- পশ্চিম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্থাপন।
- জার্মানিতে গণপ্রজাতন্ত্র স্থাপন।
- আমেরিকা প্রথম হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করে।

১৯৫৫ ঃ
- ওয়ারস প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৫৬ ঃ
- হাঙ্গেরির গণঅসন্তোষ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক গণঅসন্তোষ দমন।
- মিসরে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ইসরাইলের আক্রমণ।
- সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করা হয়।

১৯৫৭ ঃ
- ব্রিটেন থেকে মালয়েশিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা লাভ।
- প্রথম মনুষ্য তৈরি স্যাটেলাইট স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপণ করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

১৯৫৮ ঃ
- ইরাক থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ।
- সিরিয়া ও মিসর একত্রিত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র।
- দ্বিতীয় বার্লিন সংকট শুরু।

১৯৫৯ ঃ
- তিব্বতে বিদ্রোহ।
- কিউবাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ।

১৯৬০ ঃ
- ফরাসি আফ্রিকান উপনিবেশগুলোর ১৬টি আফ্রিকার দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।
- জাতিসংঘের সাধারণ সভা কর্তৃক উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা দান বিষয়ক ঘোষণাপত্র গ্রহণ।
- ফ্রান্স কর্তৃক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

১৯৬১ ঃ
- বার্লিন প্রাচীর গঠন এবং বার্লিন সমস্যার উদ্ভব (পূর্ব জার্মানি কর্তৃক)।
- বেলগ্রেডে প্রথম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা।
- কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কচ্ছেদ।
- 'বে অফ পিগস' এ ব্যর্থ অভিযান।
- জন এফ কেনেডি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হন।
- তিব্বত বিদ্রোহ ও দালাইলামার সরকার গঠন।

- প্রথম মানুষ হিসেবে সোভিয়েত নভোচারী ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশ যাত্রা।

১৯৬২ ঃ
- আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।
- চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ (তখন থেকে নথুলা পাস বন্ধ ২০০৬ সাল পর্যন্ত)।
- কিউবান মিসাইল সংকট।

১৯৬৩ ঃ
- ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু যা ১৯৭৫ সালে শেষ হয়।
- ১৬ জুন : প্রথম নারী নভোচারী হিসেবে সোভিয়েত নভোচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা 'ভস্টক ৬' মহাকাশযানে ৪৮ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে মহাকাশ জয় করেন।

১৯৬৪ ঃ
- চীন কর্তৃক প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিগ্রোদের সমান অধিকার দেবার জন্য সিভিল রাইট বিল পাস করেন।
- নেলসন মেন্ডেলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসন।

১৯৬৫ ঃ
- ৬ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় ২৩ সেপ্টেম্বর সমাপ্তি (যুদ্ধ ১৭ দিন স্থায়ী ছিল)।

১৯৬৬ ঃ
- ১০ জানুয়ারি : তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৬৭ ঃ
- তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সূচনা।

১৯৬৮ ঃ
- মার্টিন লুথারকে হত্যা করা হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা ভিয়েতনামের মালাই গ্রামে হাজার হাজার নিরীহ লোক হত্যা করে।

১৯৬৯ ঃ
- চীন-রাশিয়ার সীমান্ত বিরোধের সূচনা।
- ১ সেপ্টেম্বর : লিবিয়ার রাজা ইদ্রিসকে সরিয়ে কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি ক্ষমতা দখল করেন।
- ২৭ অক্টোবর: নিল আর্মস্ট্রং বাংলাদেশ সফর করেন।

১৯৭০ ঃ
- পশ্চিম জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৭১ ঃ
- শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।
- ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীনতা অর্জন করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান।
- চীনের জাতিসংঘে যোগদান, তাইওয়ানকে বহিষ্কার।

১৯৭২ ঃ
- সিংহল প্রজাতন্ত্র শ্রীলংকা নামে পরিচিত।
- শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন (১০ জানুয়ারি)।
- ব্রিটেনের সরাসরি শাসনে উত্তর আয়ারল্যান্ড।
- চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ।

১৯৭৩ ঃ
- আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।
- ১০ এপ্রিল : পাকিস্তানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।

১৯৭৪ ঃ
- সাধারণ সভা কর্তৃক রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ক জাতিসংঘের সনদ গ্রহণ।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের OIC- এর সদস্যপদ লাভ।
- ১৬ মে : মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি।
- ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ করে।

- ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর পদত্যাগে বাধ্য হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন।

১৯৭৫ ঃ
- ১৫ আগস্ট : বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

১৯৭৬ ঃ
- চীনের মাও সেতুং মারা যান।
- বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ফারাক্কা ইস্যুটি উত্থাপিত হয়।

১৯৭৭ ঃ
- মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।

১৯৭৮ ঃ
- আফগানিস্তানে সামরিক শাসন এবং প্রেসিডেন্ট দাউদ নিহত।

১৯৭৯ ঃ
- যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরস্পরকে স্বীকৃতি।
- আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক হস্তক্ষেপ।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর।
- ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত।
- সাদ্দাম হোসেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

১৯৮০ ঃ
- রোনাল্ড রিগ্যান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হন।
- যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো মারা যান।

১৯৮১ ঃ
- পোল্যান্ডে 'সলিডারিটি' আন্দোলনের জন্ম।
- মিসরের রাষ্ট্রপতি সাদাত্ এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়।

১৯৮২ ঃ
- ১৫ বছর ধরে ইসরাইলের অধিকারে থাকা সিনাই উপদ্বীপ, সরকারিভাবে মিসরকে প্রত্যর্পণ করা হয়।
- ১০ ডিসেম্বর : জাতিসংঘ সমুদ্র কনভেনশন স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং একই দিনে বাংলাদেশ এই আইনে স্বাক্ষর করে।

১৯৮৪ ঃ
- চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে চুক্তি হয় যে ব্রিটেন চীনকে হংকং ফিরিয়ে দেবে ১৯৯৭ সালে।

১৯৮৫ ঃ
- সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচেভের ক্ষমতা গ্রহণ।
- SAARC প্রতিষ্ঠা।

১৯৮৭ ঃ
- জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সূচনা।

১৯৮৮ ঃ
- সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৮৯ এর মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।
- পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইনের রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমের নাম ঘোষণা করেন।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য নিয়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

১৯৮৯ ঃ
- ইরানের নেতা আয়াতুল্লাহ্ খোমেনি মারা যান।
- ৯ নভেম্বর : বার্লিন প্রাচীর ধ্বংস হয় এবং এর দৈর্ঘ্য ১৫৫ কি.মি. দীর্ঘ প্রাচীর, ৫ মিটার উঁচু এবং ৫ ফুট চওড়া। উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সালে দুই জার্মনীর মধ্যে বিভাজনের জন্য বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল।

- চীনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে ট্যাংক ব্যবহার।

১৯৯০ ঃ
- ইরাক, কুয়েত দখল করে এবং কুয়েতের আমির সৌদি আরবে পালিয়ে যান।
- পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়।
- সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রেরণ।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত থেকে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, বেলারুশি ও কাজাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৯১ ঃ
- রাশিয়া ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বরিস ইয়েলৎসিনের বিজয়।
- স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েল্থ প্রতিষ্ঠা।
- বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়।
- কুয়েত শত্রু মুক্ত করতে ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সেনা অভিযান।

১৯৯২ ঃ
- ব্রাজিলের রিও ডি জিনেরিওতে প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন।

১৯৯৩ ঃ
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠন।
- রাশিয়াতে কমিউনিস্টদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান।
- বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে (World Trade Centre) বোমা বিস্ফোরণ হয়।
- ১০ সেপ্টেম্বর : ইসরাইল-ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসন চুক্তি।

১৯৯৪ ঃ
- গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর।
- NAFTA চুক্তি স্বাক্ষর।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ প্রথার বিলোপ, অবাধ নির্বাচন এবং নেলসন মেন্ডেলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।
- চ্যানেল ট্যানেল উন্মুক্ত ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলো ব্রিটেন।

১৯৯৫ ঃ
- ১ জানুয়ারি : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠন (সদর দফতর- জেনেভা)।
- বেইজিং-এ জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলন উদ্বোধন।

১৯৯৬ ঃ
- গঙ্গা পানি চুক্তি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে।
- জাতিসংঘের সাধারণ সভা কর্তৃক CTBT অনুমোদিত।
- বসনিয়ায় ন্যাটো বাহিনীর হস্তক্ষেপ।
- বরিস ইয়েলৎসিন দ্বিতীয় মেয়াদে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

১৯৯৭ ঃ
- চীনের নিকট হংকং হস্তান্তর (এক দেশ দুই নীতি চালু করে)।
- ১১ ডিসেম্বর : কিয়াটোতে বিশ্বের উষ্ণতারোধ জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত একটি পরিবেশ সম্মেলনে কিয়াটো স্বাক্ষর।
- নিউইয়র্কে দ্বিতীয় পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন।

১৯৯৮ ঃ
- ২৮ মে : ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক পর পর কয়েকটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।
- ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে 'উই রিভার' চুক্তি স্বাক্ষর।
- উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৯৯ ঃ
- চারটি ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রের ন্যাটোতে যোগদান।

- চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন।
- পূর্ব তিমুরে স্বাধীনতার পক্ষে গণভোট।
- ন্যাটো কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ।
- ১৭ নভেম্বর : UNESCO কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে।
- পানামা খাল যুক্তরাষ্ট্র পানামাকে হস্তান্তর করে।
- ১৯ ডিসেম্বর : পর্তুগাল ম্যাকাও দ্বীপ চীনের কাছে হস্তান্তর করে।
- ইউরোপের বাইরে সর্বপ্রথম 'ইউরো মুদ্রা' চালু হয় ভারতে।

২০০০ ঃ
- নিউইয়র্কে সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- আফগানিস্তানে তালেবানদের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলীয় জোট গঠন।

চলমান একবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা

২০০১ ঃ
- ১১ সেপ্টেম্বর: নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে, আর্লিংগটনের পেন্টাগন-এ ভার্জিনিয়ায় এবং পেনসিলভেনিয়া অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়।
- ভারতের গুজরাটের ভূমিকম্পে ২০,০০০-এর বেশি লোক মারা যায়।
- জাপানের ৩টি শহর উরাওয়া, ওমা এবং ইওনো মিলিত হয়ে সাইতামা শহর গঠিত হয়।
- আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার মুখে তালেবান শাসনের অবসান।

২০০২ ঃ
- জাতিসংঘের উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহাসেনবার্গে দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত দেশগুলোর মধ্যে 'ইউরো' নোট ও মুদ্রা চালু হয়।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট- এর মধ্যে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি লাঘবের লক্ষ্যে পরমাণু অস্ত্রের মজুদ হ্রাস চুক্তি বা স্ট্রেটেজিক নিউক্লিয়াস উইপনস ট্রিটি স্বাক্ষর।

২০০৩ ঃ
- জাতিসংঘের অনুমতি না নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ইরাক যুদ্ধ শুরু ও অবশেষে ইরাক দখল।
- নেদারল্যান্ডের হেগে বিশ্বে প্রথম স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)-এর যাত্রা শুরু।
- ৭৪ বছর আগে গোড়াপত্তন হওয়া যুগোশ্লাভিয়া নামক রাষ্ট্রের বিলুপ্তি হয়ে সে স্থলে 'সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো' হিসেবে দেশটির নাম গ্রহণ।
- মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মুহাম্মাদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ঘোষণা।

২০০৪ ঃ
- EU-তে নতুন ১০ সদস্যের এবং ন্যাটোতে ৭টি সদস্যের যোগদান।
- আফগানিস্তানে নতুন সংবিধান প্রণয়ন।
- ১১ নভেম্বর প্যারিসের ক্লামারে অবস্থিত মিলিটারি হাসপাতালে ৭৫ বছর বয়স্ক মি. প্যালেস্টাইন খ্যাত ফিলিস্তিনির অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু।
- ১৯ জুন EU-এর নেতাদের কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে EU-এর নতুন খসড়া সংবিধান অনুমোদন।
- ফিলিস্তিনি হামাস নেতা শেখ আহমদ ইয়াছিন ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্রে শাহাদতবরণ করেন।

২০০৫ ঃ
- ৩০ জানুয়ারি ইরাকের ৫০ বছরের ইতিহাসে ব্যাপক গেরিলা হামলা, গোলযোগ, অনিশ্চয়তা ও চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তথাকথিত প্রথম

গণতান্ত্রিক সংসদ নির্বাচন।
- ১ ফেব্রুয়ারি নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দিউবাকে বরখাস্ত করে ক্ষমতা নিজ হাতে আনয়ন করে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

২০০৬ ঃ
- ১ জুলাই : সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সাফটা চুক্তি কার্যকর।
- ১১ মার্চ : যুদ্ধাপরাধী সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের কারাগারে মৃত্যু।
- ৩ জুন : গণভোটে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন মন্টিনিগ্রো রাষ্ট্রের ঘোষণা।
- ৯ অক্টোবর : উত্তর কোরিয়া পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়; এর মাধ্যমে দেশটি নবম পরমাণু শক্তির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- ইরাকের ১০ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান এবং ৩১ ডিসেম্বর ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি কার্যকর।
- জাতিসংঘের War Crime Tribunal এর detention-এ স্লোবোদান মিলোসেবিকের মৃতদেহ পাওয়া গেল।
- ১৩ অক্টোবর : ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।

২০০৭ ঃ
- ১ জানুয়ারি : দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক বান কি মুনের জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।
- ২৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো আততায়ীর হামলায় নিহত হন।

২০০৮ ঃ
- ২৮ মে : নেপালে ২৩৯ বছরের রাজতন্ত্রের পতন, প্রজাতন্ত্রের পথে যাত্রা।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি : কসোভো স্বাধীনতা লাভ করে সার্বিয়া থেকে।
- ভুটানের প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন।
- ৩০ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত আকাশ নীতি কার্যকর।
- ৪ মে : মায়ানমারে নার্গিস সাইক্লোনে ২২,৫০০ মানুষের মৃত্যু এবং ১ মিলিয়ন লোক গৃহহীন।

২০০৯ ঃ
- ২০ জানুয়ারি : বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ।
- ৩ ফেব্রুয়ারি : ইরান প্রথম বারের মতো 'ওমিড' কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করে।
- ১০ ফেব্রুয়ারি : মহাশূন্যে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে।
- ২৫ জুন : লস এঞ্জেলস-এ পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জীবনাবসান।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি : ইন্দোনেশিয়ার আচেহতে সুনামি জাদুঘর উদ্বোধন।
- ১৮ নভেম্বর : রাশিয়ায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল।

২০১০ ঃ
- ৪ জানুয়ারি : বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন ' বুর্জ খলিফা' (দুবাই) উদ্বোধন।
- HIV/AIDS আক্রান্তদের যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশের উপর ২২ বছর পর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।
- ১৩ ফেব্রুয়ারি : আফগানিস্তানে তালেবান নিধনে অপারেশন মুশতারাক শুরু।
- ২১ মার্চ : বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে ভারত 'ব্রহ্ম' হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল পরীক্ষা চালায়।
- ২১ আগস্ট ; ইরানের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র 'বুশ' চালু হয়।
- ১৩ নভেম্বর ; মিয়ানমারের গণতন্ত্রীপন্থী নেত্রী অংসান সূচী গৃহবন্দী থেকে মুক্তি পান।

- ১৭ ডিসেম্বর : এই দিন থেকে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বয়ে যাওয়া বিপ্লবের ঝড়কে আরব বসন্ত (Arab Spring) বলে। এ বিপ্লব আরব জাগরণ (Arab Awakening), আরব অভ্যুত্থান (Arab Uprisings) নামেও পরিচিত।

২০১১ ঃ

- ১৪ জানুয়ারি : আরব বসন্তের সূতিকাগার তিউনিসিয়ায় জুঁই বিপ্লব (Jasmine Revolution) সংঘটিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসক আলী আব্দুল্লাহ সালেহ-এর ৩৩ বছরের (১৯৭৮-২০১১) ক্ষমতার পতন ঘটে।
- ১১ ফেব্রুয়ারি : গণ-আন্দোলনের ফলে মিসরের প্রেসিডেন্ট মোবারকের ৩০ বছরের (১৯৮১-২০১১) ক্ষমতার পতন ঘটে।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি : লিবিয়ার বিদ্রোহীরা বেনগাজিভিত্তিক অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় পরিষদ (National Transitional Council-NTC) গঠন করে এবং এর প্রধান ছিলেন মুস্তফা আবদেল জলিল।
- ২৩ মার্চ : FAO কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে গম উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশ চীন।
- ১৯ এপ্রিল : সিরিয়া দীর্ঘ ৪৮ বছর (১৯৬৩ সালের) পর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে।
- ২ মে : আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা হয় পাকিস্তানের অ্যাবেটাবাদে এবং এই হত্যা মিশনের সাংকেতিক নাম অপারেশন জেরোনিমো।
- ৯ জুলাই : দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে এবং এই দেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ সুদান।
- ১৬ জুলাই : বাংলাদেশের পঞ্চম আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা- ১৪,৮০,০০,০০০ জন।
- ২০ আগস্ট : বাংলাদেশ-ভারত স্ট্রিপ মানচিত্রে স্বাক্ষর করে।
- ২৩ সেপ্টেম্বর : ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং যুক্তরাষ্ট্র তাতে (৪৩ বারের মতো) ভেটো দেয়।
- ২৫ সেপ্টেম্বর : বাদশাহ আবদুল্লাহ সৌদি আরবে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের ঘোষণা দেন।
- পশ্চিমা বিশ্বের যৌথবাহিনী লিবিয়ায় অপারেশন ওডিসি ডন নামে সামরিক হামলা শুরু করে এবং লিবিয়ায় ন্যাটোর মিশন (অর্থাৎ যুদ্ধ) -এর সময়কাল ১৯ মার্চ-৩১ অক্টোবর।
- ২০ অক্টোবর : আফ্রিকা ও আরব বিশ্বের দীর্ঘ সময়ের শাসক ৪২ বছরের (১৯৬৯-২০১১) কর্ণেল মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে তার জন্মভূমি সিরতে হত্যা করা হয়।
- ৩১ অক্টোবর : জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) এর মতে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ কোটিতে পৌঁছায়।
- ২০১১ সালে প্রবাসী রেমিটেন্স গ্রহণে শীর্ষ দেশ - প্রথম ভারত (৬৩,৬৬৩ মিলিয়ন); দ্বিতীয় চীন (৬২,৪৯৭ মিলিয়ন) ও তৃতীয় মেক্সিকো (২৩,৬১০ মিলিয়ন)।
- ২০১১ সালে স্বর্ণ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ - প্রথম চীন ; দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া; আমদানিতে ভারত।
- ২ নভেম্বর : বাংলাদেশ-রাশিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (চুক্তি অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে ২০১৮ সালে)।
- ১৭ ডিসেম্বর : উত্তর কোরিয়ার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ নেতা কিম জং ইল মারা যান।

২০১২ ঃ

- ২৪ জানুয়ারি
- ৬ ফেব্রুয়ারি
- ১ এপ্রিল
- ১৯ জু
- ২২ জুলাই : ভারতের প্রথম বাঘ
- বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিবেদন অনুযায়ী এই বছ
- বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিবেদন অনুযায়ী এই বছরে আ
- ৮ আগস্ট : লিবিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ NTC
- ২৫ আগস্ট : চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মানব মার্কিন নাগরিক নীল
- ২০১২ সালে FAO- এর রিপোর্ট অনুযায়ী মৎস উৎপাদন ও
- ৬ নভেম্বর : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন বারাক ওবামা।
- ২৯ নভেম্বর : এই দিনটিতে ফিলিস্তিন স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির আরো এক ধাপ আগানোর জন্য এবার পর্যবেক্ষক অ-সদস্য রাষ্ট্রে উন্নীত করা উচিত ফিলিস্তিনকে- এমন প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্যভুক্ত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি দেশ। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১৩৮-৯ ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাব পাস হয়েছে ফিলিস্তিনের পক্ষে। ভোটদানে বিরত থেকেছে ৪১টি দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, ব্রিটেন, জার্মানিসহ মোট ৯টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়।
- ৮ ডিসেম্বর : সাবমেরিন ক্যাবলের বিকল্প ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ।
- ৯ ডিসেম্বর : বঙ্গোপসাগরে ১২টি ব্লকে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে 'অফসোর বিডিং রাউন্ড ২০১২' ঘোষণা দেয়।
- ১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ক্ষমতায়ণ এবং

'শান্তির সংস্কৃতি' শীর্ষক দুটি প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করার মধ্য দিয়ে 'শান্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নের' যে মডেল তুলে ধরেছিলেন, তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিসদের ৬৭তম অধিবেশনে।

- ১৯ ডিসেম্বর : বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নিউ ফ্রন্টিয়ার পার্টির ৬০ বছর বয়সী চিরকুমারী পার্ক জিউন হাই।

২০১৩ ঃ

- ২১ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ২০ তম সংশোধনী অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি দুপুর থেকে প্রেসিডেন্টের ৪ বছরের মেয়াদ শুরু হয়। কিন্তু শপথের দিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি, ২০১৩ রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় নিয়ম রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করলেও পরদিন ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ সোমবার পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্যাপিটাল হিলে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ গ্রহণ করেন বারাক ওবামা।
- ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তর কোরিয়ার তৃতীয় সফল পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পন্ন।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি : ছয় শতকের মধ্যে প্রথমবারের মতো পোপের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট।
- ১৪ মার্চ : চীনের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শি জিনপিং। ওইদিন চীনের পার্লামেন্টে 'ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস' জিনপিংকে ১০ বছরের জন্য দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে।
- ১৫ মার্চ : চীনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন লি কেকিয়াং। তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা।
- ১৬ মার্চ : চীনের প্রথম নারী উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন লিউ ইয়াং ডং।
- ১৯ মার্চ : ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নতুন ধর্মগুরু বা ২৬৬তম পোপ আর্জেন্টিনার হোর্হে মারিও বেরগোগলিও (প্রথম ফ্রান্সিস)। তিনি হলেন প্রথম ল্যাটিন পোপ।
- ২ এপ্রিল : জাতিসংঘ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি পাস হয়। পক্ষে ভোট-১৫৪টি, বিপক্ষে ভোট-৩টি (ইরান, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া)। ভোট দানে বিরত থাকে ২৩টি রাষ্ট্র (রাশিয়াসহ)।
- ৮ এপ্রিল : যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী 'লৌহমানব' খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রক্ষণশীল দল থেকে ১৯৭৯, ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে ৩ মেয়াদে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- ১৪ এপ্রিল : টেস্টটিউব বেবির জনক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার এডওয়ার্ড মৃত্যুবরণ করেন (বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবির নাম লুইস ব্রাউন, জন্ম ১৯৭৮ সালে। এই অবদানের জন্য তিনি ২০১০ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- ৩০ এপ্রিল : বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার নির্বাচিত হন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
- ৩ জুন : সুইডেনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরমাণু অস্ত্রের মজুদ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর নিকট বর্তমানে মোট ১৭২৬৫টি পরমাণু রয়েছে।
- ৫ জুন : পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ৬৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিকভাবে

২০১৩ ঃ

- ২১ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ২০ তম সংশোধনী অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি দুপুর থেকে প্রেসিডেন্টের ৪ বছরের মেয়াদ শুরু হয়। কিন্তু শপথের দিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি, ২০১৩ রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় নিয়ম রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করলেও পরদিন ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ সোমবার পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্যাপিটাল হিলে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ গ্রহণ করেন বারাক ওবামা।
- ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তর কোরিয়ার তৃতীয় সফল পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পন্ন।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) (সংশোধন) বিল-২০১৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাস।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি : ছয় শতকের মধ্যে প্রথমবারের মতো পোপের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট।
- ১৪ মার্চ : চীনের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শি জিনপিং। ওইদিন চীনের পার্লামেন্টে 'ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস' জিনপিংকে ১০ বছরের জন্য দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে।
- ১৫ মার্চ : চীনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন লি কেকিয়াং। তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা।
- ১৬ মার্চ : চীনের প্রথম নারী উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন লিউ ইয়াং ডং।
- ১৯ মার্চ : ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নতুন ধর্মগুরু বা ২৬৬তম পোপ আর্জেন্টিনার হোর্হে মারিও বেরগোগলিও (প্রথম ফ্রান্সিস)। তিনি হলেন প্রথম ল্যাটিন পোপ।
- ২ এপ্রিল : জাতিসংঘ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি পাস হয়। পক্ষে ভোট-১৫৪টি, বিপক্ষে ভোট-৩টি (ইরান, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া)। ভোট দানে বিরত থাকে ২৩টি রাষ্ট্র (রাশিয়াসহ)।
- ৮ এপ্রিল : যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী 'লৌহমানব' খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রক্ষণশীল দল থেকে ১৯৭৯, ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে ৩ মেয়াদে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- ১৪ এপ্রিল : টেস্টটিউব বেবির জনক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার এডওয়ার্ড মৃত্যুবরণ করেন (বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবির নাম লুইস ব্রাউন, জন্ম ১৯৭৮ সালে। এই অবদানের জন্য তিনি ২০১০ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- ৩০ এপ্রিল : বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার নির্বাচিত হন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
- ৩ জুন : সুইডেনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরমাণু অস্ত্রের মজুদ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর নিকট বর্তমানে মোট ১৭২৬৫ টি পরমাণু রয়েছে।
- ৫ জুন : পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ৬৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেওয়াজ (পিএমএল-এন) প্রধান মিয়া মোহাম্মদ নওয়াজ শরিফ ১৮তম প্রধানমন্ত্রী হন।
- ১৪ জুন : ইরানের ১১তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৬৪ বছর বয়স্ক সংস্কার ও মধ্যপন্থী নেতা হাসান রুহানি আধুনিক ইরানের ৭ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে ৩ আগস্ট, ২০১৩ সালে।
- ১৪ জুন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (UNGA)-এর ৬৮তম অধিবেশনের সভাপতি এন্টিগুয়া

অ্যান্ড বারমুডার জন উইলিয়াম (John William Ashe) নির্বাচিত হন। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ (UNGA)-এর ৬৭তম অধিবেশনের সভাপতি সার্বিয়ার ভুক জেরেমিচের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

- ১৮ জুন : ন্যাটো বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানের হাতে দেশটির নিরাপত্তার দায়িত্বভার হস্তান্তর করে। এর মধ্য দিয়ে ১২ বছর পর আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অবসান হলো।
- ১ জুলাই : মালিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে নতুন জাতিসংঘ ৬৭তম শান্তিরক্ষা মিশন The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).
- ৩ জুলাই : রাতে গণবিক্ষোভের মুখে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক বছরের মাথায় প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মিসরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে সরিয়ে দিয়েছে সেনাবহিনীর প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। একই সঙ্গে সংবিধান স্থগিত করে প্রধান বিচারপতি আদলি মানসুরকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করা হয়েছে।
- ১২ জুলাই : দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর দায়িত্ব পালনকারী সীমান্তরক্ষী নাসাকা (NASAKA) বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। নাসাকার বদলে বাংলাদেশ সীমান্তে সেদেশের আধা-সামরিক বাহিনী লুনথিনকে বসানো হয়।
- ১৯ জুলাই : বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলায় জিয়ান পিয়েরে কটককে নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইনবিষয়ক ট্রাইব্যুনাল (ইটলাস)।
- ২২ জুলাই : ডিউক ও ডায়েচ অব ক্যামব্রিজ উইলিয়াম-কেট মিডলটন দম্পতির ঘর আলোকিত করে ব্রিটিশ সিংহাসনের তৃতীয় উত্তরাধিকারী রাজপরিবারে রাজপুত্রের নাম রাখা হয় জর্জ আলেকজান্ডার লুইস।
- ৩০ জুলাই : পাকিস্তানের ১২তম প্রেসিডেন্ট ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৭৩ বছর বয়সী মামনুন হুসাইন নির্বাচিত হন এবং ৯ সেপ্টেম্বর শপথ নেবেন নতুন প্রেসিডেন্ট।
- ১৪ আগস্ট : জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন মিলনায়তনকে 'বঙ্গবন্ধু মিলনায়তন' নামকরণ।
- ১৮ আগস্ট : বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের দ্বারা দেশি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের সাফল্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। পাট নিয়ে এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম।
- ৭ সেপ্টেম্বর : ২০২০ সালের ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের স্বাগতিক শহর হিসেবে জাপানের টোকিও নির্বাচিত।
- ১২ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের সর্বশেষ ও ১৯তম অধিবেশন শুরু।
- ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪২ বছর পর একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আবদুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসির চূড়ান্ত রায় দেন।
- ২৬ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ।
- ৩০ সেপ্টেম্বর : জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে, 'কন্যা মানেই বোঝা নয়, করবে তারা বিশ্ব জয়'।
- ৫ অক্টোবর : রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা ও মনমোহন সিং।
- ১৪ অক্টোবর : সিরিয়া রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তির আওতাভুক্ত দেশ হিসেবে গণ্য হয় এবং

রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সংস্থা (OPCW)-এর ১৯০তম সদস্যপদ লাভ করে।

- ১৫ ডিসেম্বর : ম্যান্ডেলাকে কুনু গ্রাসে সমাহিত করা হয়। কুনু দাস আফ্রিকার ইস্টার্ন কেপ প্রদেশে প্রদেশ।
- ১৬ ডিসেম্বর প্রিটোরিয়ার ইউনিয়ন বিল্ডিংয়ের সামনে ম্যান্ডেলার একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয়। এর উচ্চতা ৯ মিটার এবং ৩০ ফুট।
- ১৬ ডিসেম্বর : জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে "লাল সবুজের বিশ্বজয়" শিরোনামে সবচেয়ে বড় মানব পতাকা গড়া হয়। এই পতাকা গড়তে ২৭ হাজার ১১৭ জন মানুষ অংশ গ্রহণ করে।
- ১৮ ডিসেম্বর'১৩ টানা ৮ বার বাংলা চ্যানেল সাঁতারে পার হন লিপটন সরকার, টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার।

- ১৭ জানুয়ারি : মহানায়িকা সুচিত্রা সেন মারা যান ।
- ২৫ জানুয়ারি : ভারত বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান করেন।

  Note: ভারত তার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এ উপাধি ঘোষণা করে। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারি। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত তার সংবিধান বলবৎ করে। এ কারণে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। এ বছর পদ্মভূষণ পেয়েছেন ২ জন। পদ্মভূষণ পেয়েছেন ১৪ জন পদ্মশ্রী পেয়েছেন ১০১ জন।
- ১০ ফেব্রুয়ারি : নেপালের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন সুশীল কৈরালা। নেপালি কংগ্রেস দলের প্রধান নেতা। তিনি ৫৫৩ ভোটের মধ্যে ৪০৫টি ভোট পান।
- ৮ মার্চ : মালয়েশিয়ার যে নির্মাণটি হারিয়ে যায় সে বিমানটি কুয়ালালামপুর থেকে চীনের রাজধানী বেইজিং যাচ্ছিল।
- ১ জুন : সাবেক গেরিলা নেতা সালভাদের সানচেজ সেনের এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ২ জুন : ৪০ বছর দায়িত্ব পালন শেষে স্পেনের রাজা হুয়ান কার্লোস সিংহাসন ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন।
- ২ জুন : ভারতের ২৯ রাজ্য হিসেবে তেলেঙ্গানা আত্মপ্রকাশ করে।
- ৫ জুন : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও রাশিয়ার এটমস্ট্রয় এক্সপোর্টের মধ্যে ১৯ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ৫ জুন : জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করেন।
- ৫ জুন : বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে দুই দিনব্যাপী জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন শুরু।
- ৬ জুন : ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেত্রো পোরোশেঙ্কো শপথ গ্রহণ করেন।
- ৬ জুন : সাবেক সেনাপ্রধান আদবদেল ফাত্তাহ আল সিসি মিসরের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।
- ১১ জুন : ২০তম বিশ্বকাপ ফুটবলের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন।
- ১৫ জুন : কলম্বিয়ায় হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস দ্বিতীয়বারের মতো ৪ বছর মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ১৬ জুন : কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বড় পাঁচ প্রকল্পের অর্থায়নে লক্ষ্যে বাংলাদেশ

ও জাপানভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা JICA র মধ্যে ১৮৮ কোটি ডলার বা ৯১৮৬ কোটি টাকার ঋন সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৯ জুন : ৪৬ বছর বয়সী ফেলিপ দে বর্বোনকে রাজা ষষ্ঠ ফেলিপ হিসেবে রাজত্ব পরিচালনার জন্য স্পেনের রাজা ঘোষণা করা হয়।
- ২৭ জুন : ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সাথে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐতিহাসিক চুক্তি করেন।
- ২৯ জুন : আইএস খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে।
- ৩০ জুন : BBS এর হিসেব মতে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৫.৬% শতাংশ। Note: ২০০০ সালের জরিপে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯%। ২০০৫ সালে সেটি কমে দাড়িয়েছিল ৪০% ২০১০ সালের জরিপে সেটি আরো কমে দাঁড়ায় ৩১.৫%।
- ৩১ জুন : মালাবি'র প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন পিটার মুথারিকা।
- ১ জুলাই : চীন ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয়।
- ৩ জুলাই : দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (IMO) ৫৫তম আসর শুরু হয়।
- ১৩ জুলাই : জার্মান ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪ এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৪ জুলাই : গির্জার শত শত বছরের ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো নারী বিশপ নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চার্জ অব ইংল্যান্ডের নীতি নির্ধারকরা।
- ১৫ জুলাই : ব্রাজিলে ফোর্তলেজা শহরে দুই দিন ব্যাপি ৬ষ্ঠ ব্রিকস সম্মেলন শুরু হয়।
- ১৫ জুলাই : BRICS ভূক্ত ৫টি দেশের নেতারা 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' নামে নতুন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
- ১৭ জুলাই : মালেশিয়ার বোয়িং বিমান ৭৭৭ ২৯৮ জন আরোহী নিয়ে বিদ্ধস্ত হয়।
- ১৭ জুলাই : মালয়েশিয়ার একটি বিমান ইউক্রেনের আকাশ সীমার পেনাল্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে ধ্বংশ করা হয়।
- ২০ জুলাই : অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ৬ দিন ব্যাপি ২০ দিনের আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন শুরু হয়।
- ২৩ জুলাই : ব্রিটেনের রনী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্কটল্যান্ডের গ-াসগোর সেল্টিক পার্কে ২০ তম কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধন করেন।
- ২৫ জুলাই : একজনকে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' দেওয়া হয়েছে তিনি হলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। প্রথম কিস্তিতে তাকে মণোত্তর এ পদক প্রদান করা হয়। এ পদক গ্রহণ করেন সোনিয়া গান্ধী।
- ১ আগস্ট : নারী নির্যাতন রোধ সম্পর্কিত ইউরোপীয় কাউন্সিলের নতুন সনদ কার্যকর হয়।
- ১ আগস্ট : আনসার আল শরিয়া লিবিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তর নগরী বেনগাজির নিয়ন্ত্রন নিয়ে ইসলামিক এমিরেট ঘোষনা করে।
- ৫ আগস্ট : গাজা উস্যুতে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা থেকে সাইয়েদা হুসেইন ওয়ার্সি পদত্যাগ করেন।
- ৬ আগস্ট : সৌদি পুরুষদের জন্য বাংলাদেশ সহ চারটি দেশে বিয়ের ক্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করে আইন প্রনয়ন করে সৌদি সরকার।

- ৬ আগস্ট : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের পর প্রথমবারের মতো বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করতে মেক্সিকোর সিনেট জ্বালানি খাত উন্মুক্ত করনের প্রস্তাব সংবলিত বিলে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।
- ৭ আগস্ট : কম্বোডিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত খেমারুজ নেতা খিউ সাম্পানকে আজীবন কারাদন্ড প্রদান করেন।
- ৮ আগষ্ট : যুক্তরাষ্টের ওয়াসিংটনে তিনদিনব্যাপি আফ্রিকা সম্মেলন শুরু হয়।
- ৮ আগস্ট : দ্বিতীয় মেয়াদে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে জুয়ান ম্যানুয়েল সান্টোস শপথ গ্রহন করেন।
- ৮ আগস্ট : আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের তিনদিন ব্যাপি মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে শুরু হয়।
- ৯ আগস্ট : মিশরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলাম পন্থী সংগঠন মুসলিম ব্রাদাসহুড সমর্থিত রাজনৈতিক দল ফ্রিডম অ্যান্ড জাষ্টিস পার্টিকে দেশের একটি আদালত বিলুপ্ত ঘোষনা করেন।
- ১০ আগস্ট : মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে প্রথম মুসলমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ কামুন নিযুক্ত হন।
- ১৫ আগস্ট : আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চাপের মুখে ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর পদ নুরি আল মালিকি থেকে সরে দাঁড়ান।
- ১৭ আগস্ট : জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদীধারা সনদ কার্যকর হয়।
- ২১ আগস্ট : থাই জান্তা প্রধান প্রাইউথ শান-ওশা দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন।
- ২১ আগস্ট : ভারত ও বাংলাদেশের সিমান্ত- রক্ষী বাহিনীর প্রধানদের ৫ দিন ব্যাপি বৈঠক দিলি-তে শুরু হয়
- ২৬ আগস্ট : টেকসই উন্নয়নের জন্য সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের জন্য ঢাকায় আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬ আগস্ট : তুরস্কের স্বদশ প্রেসিডেন্ট হিসেবে রেসেপ তায়েপ এরদোগান শপথ গ্রহন করেন।
- ২৬ আগস্ট : তুরস্কের ২৬ তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ড. আহমেদ দাহুতোগলু শপথ গ্রহন করেন।
- ২৬ আগস্ট : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টে পেত্রো পোরোশেঙ্কো পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষনা করেন।
- ৬ সেপ্টেম্বর : জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে বাংলাদেশ সফর করেন।
- ১৮ সেপ্টেম্বর : যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট হয়।
- ১৩ অক্টোবর : ব্রিটেন ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
- ২০ অক্টোবর : ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জোকো উইদোদোর শপথ গ্রহণ।
- ২১ অক্টোবর : ২০১৫-১৭ মেয়াদের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের (UNHRC) সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ।
- ২৪ অক্টোবর : এশিয়ান ইনস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (AIIB) সাথে বাংলাদেশসহ ২১ দেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।
- ২৪ অক্টোবর : গ্রিণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ক একটি যুগান্তকারী চুক্তি স্বাক্ষর করে EU- র ২৮ সদস্য দেশের নেতৃবৃন্দ।
- ২৬ অক্টোবর : শেষ ঘাঁটি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধভিযান শেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য।

- ২৮ অক্টোবর : জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কিং কোবরা খ্যাত, মিখাইয়েল সাতা লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
- ১ নভেম্বর : বুরকিনা ফাকরোর প্রেসিডেন্ট ব্লেইস কম পাওরে অভ্যুত্থান।

২০১৫
- ৮ জানুয়ারি : শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রাজাপরে বিরুদ্ধে মাইথ্রিপালা, সিরিসেনা জয়লাভ করেন। নির্বাচনে রাজা পাকশে ৪৭.৫৮% ভোট আর সিরিসেনা পেয়েছেন ৫১.২৮%।
- ১৭ জানুয়ারি : গোবিন্দ হালদার মারা যান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে উৎসাহ জাগানিয়া তার লেখা গান পরিবেশন করা হতো।
- ১৮ জানুয়ারি : ৩১ বলে সেঞ্চুরি করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডিভিলিয়ার্স। তিনি একই সাথে ১৬ বলে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন। খেলাটি হয় জোহ্যানেসবার্গের মাঠে। প্রতিপক্ষ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- ৩০ জানুয়ারি : AU এর নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে।
- ৬ ফেব্রুয়ারী : তিউনিশিয়ার ২২ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১৬ ফব্রুয়ারী : দক্ষিন কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লি ওয়ান কু দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ১৯ ফব্রুয়ারী : ক্রোয়েশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কোলিন্দা গ্রাবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন।
- ১৩ মার্চ : গ্রিসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন প্রোকোপিস পাভলোপোল্যাস
- ১ এপ্রিল : ফিলিস্তিন কতৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিস এর ১২৩ তম সদস্যপদ লাভ করে।
- ১ এপ্রিল : ইরানের পারমানবিক চুক্তি জাতিসংঘের ৫ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে সমঝোতা হয়।
- ১১ এপ্রিল :ঐতিহাসিক কিউবা মার্কিন সম্পর্ক নতুনভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃস্টি হয় এবং কিউবাকে কালো তালিকা থেকে অভ্যহতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র।
- ৬ মে : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তির বিলটি সংবিধান সংশোধনের জণ্য সিদ্ধান্ত হয়।

◆ বিভাগ ঃ ক

সাম্প্রতিক বিশ্ব

Contemporary World

সাম্প্রতিক : ১ ইয়েমেন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব-এশিয়া দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ
সাম্প্রতিক : ৩ প্যালেস্টাইন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ৪ ইরানের পরমাণু সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ৫ আরব বসন্ত : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ৬ সিরিয়া সংকট এবং ইসলামিক স্টেট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ৭ পারস্য উপসাগরীয় সংঘাত : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ৮ ইউক্রেন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ৯ কোরীয় সংকটের পটভূমি : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ১০ কাশ্মীর সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ১১ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া : বর্তমান প্রেক্ষাপট
সাম্প্রতিক : ১২ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশ্ব রাজনীতি
সাম্প্রতিক : ১৩ আফগানিস্তান সমস্যা : বর্তমান মূল্যায়ন
সাম্প্রতিক : ১৪ চীন ও তার তিব্বতীয় সংকট : বর্তমান মূল্যায়ন
সাম্প্রতিক : ১৫ একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য
সাম্প্রতিক : ১৬ প্রয়োজনীয় পাঠ : মানচিত্র অনুশীলন
সাম্প্রতিক : ১৭ সাজেশন্স : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

সাম্প্রতিক বিশ্ব ০১

ইয়েমেন সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Crisis of Yeamen:Present Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১.১ ভূমিকা
১.২ ইয়েমেন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
১.৩ সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট
১.৪ ইয়েমেন সংকটে আন্তর্জাতিক আইনের অসহায়ত্ব
১.৫ আরব বসন্ত ও ইয়েমেন
১.৬ সংঘাতে হুথিদের সম্পৃক্ততা
১.৭ যুদ্ধের ময়দানে সৌদি আরব
১.৯ হুথিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি
১.১০ জাতিসংঘ দূতের পদত্যাগ
১.১১ ইয়েমেন সংকটে বাংলাদেশের অবস্থান
১.১২ মূল্যায়ণ

১.১ ভূমিকা

ইয়েমেন পশ্চিম এশিয়ার দেশ। মিশরীয় এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠার সময় ইয়েমেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্য এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো। ১৯১৮ সালে উত্তর ইয়েমেন তুরস্কের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। দক্ষিণ ইয়েমেনে ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হয় ১৮৩৯ সালে এবং ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ইয়েমেন ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর ২২ মে ১৯৯০ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন একত্র হয়। এর আগে উত্তর ইয়েমেনের নাম ছিল ইয়েমেন আরব সাধারণতন্ত্র ও দক্ষিণ ইয়েমেনের নাম ছিল ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। এখানে ইসলামিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ১১২টি দ্বীপ এর রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য দ্বীপগুলো হলো লোহিত সাগরের মধ্যে কামারান (১৮১ বর্গ কিলোমিটার) ও বেরিম (৩০০ বর্গকিলোমিটার) এবং এডেন গাল্ফে সোকোত্রা (৩৫০০ বর্গকিলোমিটার)।

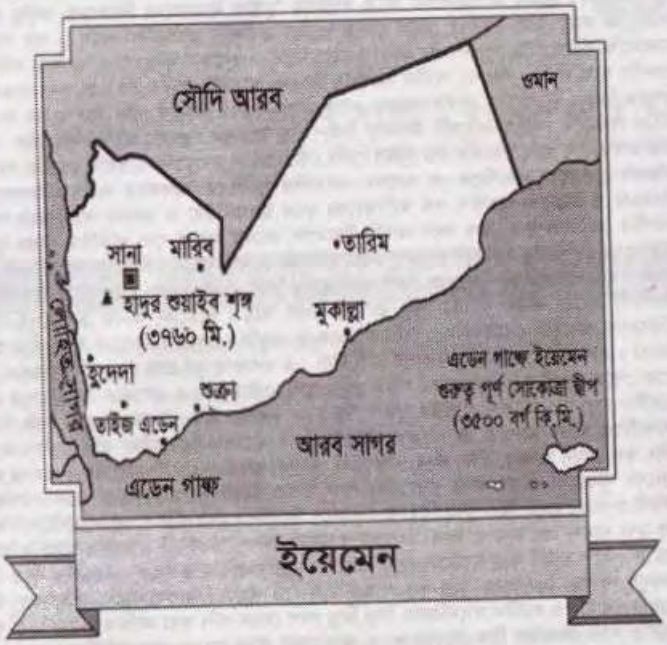
১.২ ইয়েমেন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বহু পুরান সভ্যতার দেশ ইয়েমেন। জানা যায় এ অঞ্চলে খ্রিষ্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে মিনিয়ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এলাকায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ পর্যন্ত ২৬ জন রাজা এ এলাকায় রাজত্ব করেছেন। সে সময় ইয়েমেন আর যে সকল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সবের মাঝে 'কাতাবান', 'হাজরামাউত' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইয়েমেনের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরো কিছু রাজ্য। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত

সার্বিয়ান রাজ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ পর্যন্ত এ রাজ্য হমকভয়ী হয়েছিল। যীশুখ্রিষ্টের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে হিমারিয় রাজ্য নামে একটি রাজ্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। জানা যায় কাল আফ্রিকান আবিসিনিয়গণ খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সাথে সংঘর্ষের সুযোগ ইয়েমেনের নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় তারা যোফার থেকে সানায় তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মারিবের জলাধার ধ্বংস হওয়ার ফলে এ এলাকায় কৃষিকার্য ও ব্যবসায় বাণিজ্যের অবনতি হতে থাকে। উল্লেখ্য, প্রাচীন সার্বিয়ান রাজ্যের রাজধানী মারিব এর বৃহৎ জলাধারের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইয়েমেনের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে যাওয়া মৌসুমি পানি ধরে রাখার জন্য সে প্রাচীন আমলেই মারিবে কয়েকটি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এদের মাঝে বড়টি ছিল দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল এবং উচ্চতায় ৫০ ফুটের বেশি। ইয়েমেনের মধ্যযুগের ইতিহাস গোত্রীয় সংঘর্ষের ইতিহাস। ষোড়শ শতাব্দীতে এ এলাকা ওসমানিয় তুর্কিদের অধিকারে আসে। জলদস্যুদের অত্যাচার ও উত্তমাশা অন্তরীপ পথ আবিস্কারের ফলে উসমানীয়রা এ এলাকা ত্যাগ করে সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। এর ফলে জায়দি ইমামগণ তাদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ প্রায়। ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে আবদালি গোত্রের শেখ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি সুলতান উপাধী গ্রহণ করেন। তার রাজধানী ছিল লাহেজ। তার বংশধরদের নিকট থেকে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এডেন বন্দর ও এর কিছু এলাকা দখল করে। ইয়েমেন আবর উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি দেশ। বৈচিত্রময় এর ভূ-প্রকৃতি। লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল তিহামা। এলাকাটির জলবায়ু অদ্রতাপূর্ণ এবং উষ্ণ। এ এলাকার পূর্ব প্রান্ত হতে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পেতে দেশটির মধ্য অঞ্চলের পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত পৌছেছে। এ এলাকার পর্বতগুলোর কোন কোনটির চূড়া ১০ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। এ এলাকা এবং উপত্যকাসমূহ খুবই উর্বর। এলাকাটিতে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং ইয়েমেনের এ এলাকার অধিবাসীরা কৃষি নির্ভর। এখানে বিবিধ ফল যেমন আঙ্গুর, পীচ, আম, নাশপাতি, কমলা, কলা, খেজুর ইত্যাদি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এদেশের কৃষকেরা বিবিধ খাদ্য শস্য এবং শাক-সব্জিও যথেষ্ট উৎপাদন করে থাকে। এদেশের অর্থকরী ফসলের মাঝে কফি খুবই বিখ্যাত। এদেশে উৎপাদিত মুখা কফি পাশ্চাত্যে খুবই পরিচিত। আল-মুখা নামক এলাকায় এ কফি উৎপাদন হওয়ার কারণে এ পন্যটি উল্লিখিত নামে পরিচিতি পেয়েছে। কফি রপ্তানি করে ইয়েমেন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। এদেশের ক্বাত নামে মাদকগুণ সম্পন্ন একধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের চাষ হয়ে থাকে। আফগানিস্তান, থাইল্যান্ড, চীন, মায়ানমার(বার্মা) ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু কিছু দেশ যেমন পপি তথা আফিম চাষের জন্য খুবই পরিচিতি লাভ করেছিল ঠিক ইয়েমেনও এ মাদকপন্য ক্বাত চাষের জন্য পরিচিত। এ গাছের কচিপাতা ও কান্ড চিবিয়ে রস খেয়ে নেশা করা হয়। এর রস অন্যান্য মাদকের মত গ্রহণকারীকে আবেশাচ্ছন্ন করে রাখার গুণসম্পন্ন অর্থাৎ এর রস সাময়িকভাবে স্নায়ুতন্ত্রের ওপর ক্রিয়া করে থাকে। উল্লেখ্য ক্বাতের রস পান শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর। তবুও এদেশের বহু নেশাখোর একসময় শহরগুলোর বিভিন্ন স্থানে সাধারণত বিকালের দিকে মজমা বসিয়ে একসাথে ক্বাতের রস গ্রহণ করত। সূর্য ডুবার পরও এরা নেশায় বুদ হয়ে থেকে একসময় মজমা ভেঙ্গে নিজ নিজ গৃহে চলে যেত। ব্যাপক প্রচারণা, ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার প্রসারের ফলে ইয়েমেনে এখন ক্বাত গ্রহণকারী সংখ্যা ক্রমাগত কমছে।

ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিতে এদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান। খ্রিষ্টিয় নবম শতাব্দীতে ইয়েমেনে জায়দি ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এদেশের জনগণের অধিকাংশ জায়দি শিয়া ও শাফেয়ী সুন্নি মতবাদের অনুসারী। জায়দি শীয়াগণের বসবাস দেশের মধ্য ও উত্তর অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। দেশের দক্ষিণে বিশেষ করে তিহামা অঞ্চলে শাফেয়ীগন ব্যবসা করে। পরিবার পরিজনসহ দলে দলে ইসরাইলে চলে যাওয়ার পূর্বে এদেশের ৬০ থেকে ৭০ হাজার ইহুদি ধর্মাবলম্বী বসবাস করত। এদেশে অবশ্য ধর্মীয় সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। এদেশের মুসলমানরা তাদের সাথে ভাল আচরণ করত। তারা মূলত ব্যবসায়ী ছিল। তাদের অনেকেই হস্তশিল্পে দক্ষ ছিল। যেহেতু তারা অন্য একটি ধর্মের অনুসারী ছিল তাই ইয়েমেনে তারা জিম্মি নাগরিকদের মর্যাদা লাভ করত এবং তাদের জিজিয়া কর প্রদান করতে হয়। ইহুদিদের অধিকাংশেই ১৯৫০-৫১ সালে ইয়েমেন ত্যাগ করে ইসরাইল গমন

করে। অবশ্য এখানো ইয়েমেনে বহু ইহুদী বসবাস করছে। ইয়েমেনের বর্তমান বাসিন্দাদের মাঝে শহরে স্থায়ী বাসিন্দা যেমন আছে ঠিক তেমনই বেদুঈন তথা যাযাবর জনগোষ্ঠীরও দেখা মেলে।



তাদের মাঝে তেমন সৌহার্দ নাই এবং একে অপরকে সন্দেহ করে থাকে। তারা এখনো তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে যে গোত্র ছিল সে সর্ব গোত্র বলে দাবি করে। জায়দি শীয়াগণ ইমামী শাসকদের কাল থেকেই বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। সুতরাং এখনো তারা খুবই প্রভাবশালী। উল্লেখ্য, জায়দি শীয়া গোত্রগুলো আভিজাত্যের দাবিদার। ইমামী শাসকদের শাসনকালে যারা সৈয়দ উপাধীধারী মহানবীর বংশধর বলে দাবি করতেন তাদের ছিল নিরংকুশ প্রাধান্য। রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলো সৈয়দদের দখলেই থাকত। ১৮২৯ সালে সরকার পুনরায় ইয়েমেনের হোদায়দা বন্দর ও তিহামার একাংশ দখল করে। এরপর তারা বহুদিন ইয়েমেন দখলে কোন তৎপরতা প্রদর্শন করে নি। পরে অবশ্য তারা সানাসহ মধ্য ইয়েমেনের বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। একজন পাশাকে ইয়েমেনের ওয়ালি পদ প্রদান করা হয়। সে সময় ইমাম পদের দাবিদার হামীদ উদ্দিনের বংশরেরা ওসমানিয়দের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতে থাকে। ১৮৯১ ও ১৯০৪ সালের বিদ্রোহ খুবই গুরুতর ছিল। ১৯০৪ সালে ইঙ্গ-উসমানিয় সীমানা কমিশন উসমানিয়দের ইয়েমেন প্রদেশ এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত রক্ষিত এডেন এর সীমানা চিহ্নিত করে। এ সময় ইমাম ইয়াহিয়া নিজেকে ইয়েমেনে বৈধ পার্থিব ও ধর্মীয় নেতা মনে করতেন। সুতরাং তার ও তার অনুসারীদের নিকট নতুন সীমানা অর্থহীন ছিল। ওসমানিয়গণ একে একে পূর্বের জনপ্রিয় ওয়ালি আহমদ ফারদী পাশা, হাসান তাহসীন পাশা মুহাম্মদ আলী পাশাকে ওয়ালী নিযুক্ত করেন। ওয়ালী মুহাম্মদদ আলী পাশার কঠোর নীতির ফলে ইমাম ইয়াহীয়া ও তার অনুচরগণকে পুনরায়

বিদ্রোহী করে তোলে। ১৯১১ সালে তারা সানা অবরোধ করেন। আহমদ ইজ্জত পাশার নেতৃত্বে সানার নিয়ন্ত্রণ উসমানিয় বাহিনী নিতে পারলেও তারই নেতৃত্বে উসমানিয়গণ ইমাম ইয়াহিয়ার সাথে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে একটি চুক্তিতে উপনিত হয়। এতে ইমাম ইয়াহিয়াকে জায়দি শীয়াদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেতা বলে স্বীকার করা হয়। জায়দি শীয়া এলাকায় শরীয়া আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন স্বীকার করা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং করারোপে ইমামের অধিকার স্বীকার করা হয়। ইমাম ও সংগৃহীত করের এক দশমাংশ উসমানিয় সরকারের নিকট দেওয়ার কথা স্বীকার করে। চুক্তিতে ইমামকে বাৎসারিক ২৫০০ পাউন্ড প্রদানের কথাও চুক্তিতে উল্লেখ ছিল। এ ছাড়া এ চুক্তিতে ইমাম নির্দেশিত বিশেষ কয়েকটি এলাকার কর দশ বছরের জন্য মওকুফের কথা স্বীকার করে নেওয়া ইয়েছিল। দাআন নামে পরিচিত এ চুক্তিটির মাধ্যমে ইমাম ইয়াহিয়ার ক্ষমতার দাবি আইন-সিন্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তার এ ক্ষমতার দাবি জায়দি শীয়াদের মাঝে সীমাবন্ধ ছিল।

১৯১৮ সালে ওসমানিয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। শূন্যতা পুরনের সুযোগ ইমাম ইয়াহিয়া সমগ্র ইয়েমেনের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পূর্বে ইয়েমেনের শক্তিশালী গোত্রগুলোকে অনুদান দিয়ে অনুগত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। উসমানিয়দের ইয়েমেন ত্যাগ করার পর অনুদান ব্যবস্থারও অবসান হয়। বিধি গোত্র ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইমাম সরকার নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়াসে বিধিধ গোত্র থেকে সেনা সংগ্রহ শুরু করলে বিবিধ গোত্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। কিছু গোত্র বিদ্রোহ করে। তাদের বিদ্রোহ দমন করা হয়। ইমামের বাহিনী তিহামা অঞ্চল দখল করে নিলে ১৯২৬- ২৭ ও ১৯২৮-২৯ সালে শাফেয়ীগণ বিদ্রোহ করে। এ সব বিদ্রোহ ইমাম বাহিনী দমন করতে সমর্থ হয়। ইয়েমেনের পূর্বাঞ্চলে জওফ ও আল মাশরিক এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দিলে ১৯২৯-৩০ সালে তা আংশিক দমন সম্ভব হয়। অত:পর ১৯৩২-৩৩ সালে বিদ্রোহীদের দশন করে ইমামের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ১৯৯০ সালের ২২ শে মে দুই ইয়েমেন অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন একত্রিত হয়ে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছিল। একীভূক্ত ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ইন আলী আব্দুল্লাহ আল সালেহ। তিনি ছিলেন উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট। সাবেক দক্ষিণ ইয়েমেনের সোশালিষ্ট পার্টির নেতা আলী সালিম আল বায়িদ দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সত্বর দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শের সংঘাত শুরু হয়। ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও বঞ্চিত মানসিকতার ক্ষোভ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের অনুগত বাহিনীছয় সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উভয় ইয়েমেন একত্রিত হওয়ার পূর্বে দক্ষিণ ইয়েমেনের রাজধানী ছিল এডেন উত্তর ইয়েমেনের রাজধানী ছিল এডেন উত্তর ইয়েমেনের রাজধানী ছিল সানা। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ ইয়েমেন সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্ভক্ত হয়। তারা সেখানে সোভিয়েত সামরিক ঘাটি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। দেশটিতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে। বিধি স্থানের লড়াইয়েও দেশটি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়। সেসময় দক্ষিণ ইয়েমেনে প্রচন্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। একই সময় বিবিধ কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নও পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হয়েছিল। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় দুই ইয়েমেনের একত্রীকরণ সম্ভব হয়েছিল। সে সময়ের একীভূত হওয়ার দর্শনের অগ্রপথিক ছিলেন একীভূত ইয়েমেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলী সালেহ আল বায়িদ। তিনিই পরবর্তীকালের গৃহযুদ্ধটির একাংশের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ গৃহযুদ্ধের ফলে ইয়েমেনের জনগণের শান্তি নিরাপত্তা ও বিশ্বাসে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে।

১৯৯৪ সালে মে মাসে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ৫ মে ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ১১ মে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ফলে ১৫ জন ইয়েমেনি নিহত হয়। ১৩ মে আবরলীণ যুদ্ধ বিরতি প্রচেষ্টায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৫ সেপ্টেম্বর বিবাদমান দুই দলের গোলাগুলির ফলে একটি শরণার্থী শিবিরের ৪৭০ জন সোমালী নিহত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর গৃহযুদ্ধ অবসানে ইয়েমেনে সরকার আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। ৭



মধ্যপ্রাচ্যে ইয়েমেনের এডেন উপসাগরের গুরুত্ব

জুলাই দক্ষিণ ইয়েমেনি নেতাগণ পলায়ন করেন এবং সমগ্র ইয়েমেনে উত্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের ৮ জুলাই তখনকার মত দেশটিতে দু'মাস ব্যাপি গৃহযুদ্ধের অবসান হয়।

২০০৬ সালের সেপ্টের মাসের ২২ তারিখে ইয়েমেনে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের একত্রীকরণের পর এটি ছিল।

১.৩ সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনে চলছে যুদ্ধ। শুরুতে গৃহযুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে এটি একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের নেতৃত্বে ১০টি রাষ্ট্রের একটি জোট ইয়েমেনের বৈধ সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। এ অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দরিদ্র কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্র চরম সংকটে পতিত হয়েছে। এই সংকটের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৬৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন তথা ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের পরে উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিন ইয়েমেন নাম দুটো নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইয়েমেনিদের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার গোড়া পত্তন ঘটে। জাতি হিসাবে এই বিভক্তি তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম সবকিছুকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে দুই ইয়েমেন একত্রিত হলেও দেশটির রাজনৈতিক সংকট কখনোই দূরীভূত হয় নি।

১৯৯৪ সালে এমনই একটি গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। যেখানে সৌদি আরব দক্ষিণ ইয়েমেনের দক্ষিণ অংশকে সমর্থন দিয়েছিল।

ইয়েমেনের বর্তমান সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, ইয়েমেন

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা, যা সব সময়ই বিভক্ত ও অস্থিতিশীল হিসেবে পরিগণিত। উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিন ইয়েমেনের ঐতিহাসিক বিভক্তি থেকে রাষ্ট্রটি কখনো বের হতে পারে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব। মুসলিম বিশ্বে শিয়া-সুন্নী বিরোধ কারও অজানা নয়। কিন্তু ইয়েমেনে এ বিরোধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে আছে। যে কারণে কোন সরকার সফলভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারছে না। ইয়েমেনের বর্তমান হাদী সরকার সফলভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারছে না। ইয়েমেনের বর্তমান হাদী সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে দীর্ঘ সময় আলী আবদুল্লাহ সালেহ ঐক্যবদ্ধ ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি ছিল। সালেহ সরকার একই ধরনে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিল। ইয়েমেনের শিয়া গ্রুপ সব সময়ই ক্ষমতাসীন সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। যে কারণে তার বিদ্রোহী গ্রুপটি হুতি নামে পরিচিত। তাদের আর একটি উৎস হচ্ছে যাইদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা। অন্যদিকে সুন্নী গোষ্ঠী বরাবরই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। গোষ্ঠী বরাবরই এই অঞ্চলে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত। দেশটির প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যখন ব্যাপক অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ইয়েমেন রাষ্ট্রটি তখন ক্রমাগত দারিদ্র্যের কবলে নিমজ্জিত। মাত্র ১২০০ মার্কিন ডলারের মাথা পিছু আয় নিয়ে দেশটি একটি ব্যতিক্রমি দেশ হিসাবে টিকে আছে অথচ প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে আড়াই কোটি মানুষ দেশটিতে বসবাস করছে। এডেনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর রয়েছে। যে বন্দর দিয়ে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার জাহাজ চলাফেরা করে। অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার আর একটি দিক হচ্ছে দুর্বল শাসন ব্যবস্থা। ১৯৯০ সালের দুই ইয়েমেন একত্রিত হলেও ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে সব সময়ই উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ লেগে আছে।

অভ্যন্তরীণ বাস্তবতায় এই প্রেক্ষাপটে ইয়েমেন সংকটের আর একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ। বর্তমান সংকটের প্রধান দিক হচ্ছে আরবী লীগ ও জিসিসি সমর্থিত সৌদি আরবের নেতৃত্বের সামরিক হামলার ঘটনা। বর্তমান বাস্তবতায় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের ফলে ইয়েমেন সংকটটিকে এক ধরনের প্রক্সি যুদ্ধ বলা যেতে পারে। একদিকে ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী, অন্যদিকে সৌদি আরবসহ সুন্নী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থনপুষ্ট ইয়েমেন সরকার। ইয়েমেনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ হাদী পালিয়ে সৌদি আরবে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই এই আশ্রয় সৌদি আরবের সমর্থনের ইঙ্গিত বহন করে। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বিষয়টি ইয়েমেনে অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। ১৯৬০-এর দশকে মিশরের নাসের সরকার বিমানবাহিনী পাঠিয়েছিল তৎকালীন রিপাবলিকান পন্থিদের সাহায্য করবার জন্য। তাছাড়া যখনই ইয়েমেনে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তখনই সৌদি আরব ইরানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে।

ইয়েমেনের বর্তমান সংকটটি মধ্যপ্রাচ্যের ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিয়া-সুন্নীর বিরোধক ছাপিয়ে বর্তমান ইয়েমেন সংকট বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা যেমন ইয়েমেনে দৃশ্যত সুন্নী সরকার ও হুতি বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ দেখছি পাশাপাশি দুটি ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী সামরিক দিক থেকে সক্রিয় এবং তাদের স্বার্থ ভিন্ন। এর একটি হচ্ছে একাপ অর্থাৎ আল কায়দা ইন দা এরাবিয়ান পেনিনসুলা। অন্যটি হচ্ছে ইসলামী ষ্টেট, যে গোষ্ঠীটি ইরাক, সিরিয়ায় ব্যাপকভাবে তৎপর। ইয়েমেনের অস্থিতিশীল রাজনীতি এবং পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়ে আল কায়দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী শক্তিশালী ভিত তৈরী করে আছে। ফলে এই সংকটে আইএস চাচ্ছে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে অন্যদিকে একাপ চাচ্ছে তাদের প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে। হুতি বিদ্রোহীরা চাচ্ছে শিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে সুন্নীগোষ্ঠী হাদী সরকারের অবস্থানকে চাচ্ছে আরও সুদৃঢ় করতে। আর লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব চাচ্ছে ইয়েমেনে তাদের ভূ-রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে। এক্ষেত্রে সৌদি আরব কিংবা আর লীগ তাদের প্রক্সি হিসাবে কাজ করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে ইয়েমেন রাষ্ট্রটি গভীর থেকে গভীরতর সামরিক সংকটে নিপতিত হচ্ছে। যেখানে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ক্রমাগত দৃশ্যমান। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে যাকে বলা যেতে পারে একটি টক্সিক বাস্তবতা। এই সংকট থেকে বের হওয়া একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ।

১.৪ ইয়েমেন সংকটে আন্তর্জাতিক আইনের অসহায়ত্ব

আজকের ইয়েমেন সংকটের শুরু ২০০৪ সালে এবং তখন এ সংকটের পটভূমি ছিল শিয়া-সুন্নির মধ্যকার বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিয়াদের তরফ থেকে সুন্নি নিয়ন্ত্রিত সরকারের বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিয়াদের তরফ থেকে সুন্নি নিয়ন্ত্রিত সরকারের বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিয়াদের সংগঠিত হওয়া। কিন্তু সৌদি আরবের পক্ষ থেকে এ তৎপরতা রোধে সৌদি আরব হুথিদের ওপর হামলার জন্য ইয়েমেনের সরকারকে তার ঘাটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ফলে সংঘর্ষ নতুন মোড় নিয়েছে। সৌদি আরব ইয়েমেন সীমান্তের জাবাল দোখান ঘাটিটি হুথিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইয়েমেনকে অনুমতি দেওয়ার পরপরই হুথিরা তা দখল করে নেয়। এর পর এই অজুহাতে সৌদি আরব হুথিদের ওপর সরাসরি হামলা শুরু করে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। হুথিরা কয়েকজন সৌদি সেনাকে হত্যা ও বন্দি করার দাবি করেছে। সৌদি আরবও কয়েকজন হুথি যোদ্ধাকে হত্যার দাবি করেছে। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, হুথিবিরোধী এ হামলায় মানবাধিকারের লঙ্ঘন হচ্ছে চরমভাবে। এরই মধ্যে সৌদি অভিযানে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ৪০ জন নিহত হয়েছে। হুথিরা সৌদি আরবের এ পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইনে স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেছে। এখানে উল্লেখ্য, হুথিবিরোধী বর্তমান যে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, তা কতটুকু আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে সে বিষয়টি নিয়ে ভাবা এখন অত্যাবশক হলেও আন্তর্জাতিক আইনের সবচেয়ে বড় ধারক জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কোন ধরনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

প্রথমত : জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৩৩-৩৮ অনুচ্ছেদে) বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে সব ধরনের করনীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেখানে বর্তমান সময়ের রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই, বরং আলাপ-আলোচনাই সংকটের সমাধান হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয়ত : জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ে (৩৯-৫১ অনুচ্ছেদে) সম্মিলিত নিরাত্তা নিশ্চিতকল্পে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে শক্তি প্রয়োগের বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে স্বঃপ্রণোদিত হয়ে আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার কোন বিধান নেই। সুতরাং যে কথাটি বলা হচ্ছে, ইয়েমেন সরকারের অনুরোধে সৌদি আরবের নেতৃত্বে আরব জোটের এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, আদতে তা আন্তর্জাতিক আইনের চরম সনদ অনুযায়ী আঞ্চলিক সংস্থার হস্তক্ষেপেরও সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংস্থারও স্বঃপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে কেবল সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের (৩৩-৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) পথ রুদ্ধ হলেই নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতিক্রমে তার সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারে।

তৃতীয়ত : জাতিসংঘ সনদের ৫৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদ আঞ্চলিক সংস্থাকে সম্পৃক্ত করতে পারে, তবে কোনো অবস্থায়ই নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে আঞ্চলিক সংস্থার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বর্তমান ইয়েমেন সংকট কেব ইয়েমেন তথা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা সংকটের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার ভূমিকা পালন করবে তা-ই নয়। তার চেয়ে বড় আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, এত দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে বহিঃশক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের নতুন সংস্করণ হচ্ছে তাদের পরোক্ষ মদদে বর্তমানে নিজেরাই এমন সংকটে জড়িয়ে পড়ছে, যা সমগ্র আরবের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তুলবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইয়েমেন সংকট সমাধানে বর্তমানে সৌদি আরব ও ইরানের ভূমিকা অপরিহার্য হলেও এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় তারা সহমত পোষণ করার পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়ায় পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে নিজেদের মধ্যকার দুরত্বকে আরো বিস্তৃত করছে।

১.৫ আরব বসন্ত ও ইয়েমেন

আরব বসন্তের প্রথম ধাক্কায় তিউনিসিয়ার পর দীর্ঘ সময়ের একনায়ক আলী আবদুল্লাহ সালেহ সরকারের পতনের পর মনসুর হাদি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলেও পুরো দেশের সব জাতিগোষ্ঠীকে একত্র করে একটি জাতীয় সরকার পরিচালনার পরিবর্তে মূলত সৌদি আরবের এবং পশ্চিমা পরামর্শে রাষ্ট্র শাসনের ফলে আজকের এ অবস্থা অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্র শাসন করলেও নিজের ক্ষমতার ভিত টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী ছিলেন না। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতার মূল শিকড় ছিল অন্যত্র। ফলে আজকের সংকটও বহুমাত্রিক ও অন্যতম কারণ। নিরাপত্তা বাহিনীর এই বিভক্তি মূলত তিনটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট একটি অংশ সরাসরি প্রেসিডেন্ট হাদির অনুগত হলেও তাদের মধ্যে হুতিপন্থী এবং সাবেক একনায়ক সালেহপন্থীদের সংখ্যাও কম নয়। সেই সঙ্গে ঘাপটি মেরে থাকাব আল-কায়েদার অনুগতরা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভেতরে থাকার আশঙ্কাও অনেক, যা ২ এপ্রিল ২০১৫ সালে কারাগারে আক্রমণ করে জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন বর্তা বহন করে।

১.৬ সংঘাতে হুথিদের সম্পৃক্ততা

২০০ সালে স্বৈরশাসক সালেহর বিরুদ্ধে হুথিরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হুথিদের সেই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন হুসেইন বদর আল দ্বীন আল 'নথি'। তখন থেকেই তারা হুথি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। তাদের দাবি, ছিল, ইয়েমেনের সবচেয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত উত্তরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু সালেহ সেনাবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চালান। সেনারা আল হুথিকে হত্যা করে এ ঘটনায় হুথিরা দীর্ঘ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে, যা ২০১০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতি থাকে। এর পর ২০১১ সালে ইয়েমেনেও আরব বসন্ে-র হাওয়া লাগে। হুথিরা সালেহ বিরোধী সে বিক্ষোভে যোগ দেয়। ব্যাপক প্রণবিক্ষোভের মুখে সালেহ ক্ষমতা ছাড়লে তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদি আন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব নেন। অবশ্য ক্ষমতা গ্রহণ করলেও হাদি পরিস্থিতি সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে নি। এরই মধ্যে ২০১৪ সালে দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও ছয় অঞ্চল বিশিষ্ট ফেডারেল ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু হুথিরা তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং ফের লড়াইয়ের ঘোষণা দেয়।

১.৭ যুদ্ধের ময়দানে সৌদি আরব

দীর্ঘ ৯০ বছর পর সৌদি আরব পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। ইয়েমেনে বিরুদ্ধে সৌদিআরব সাম্প্রতিককালে যে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে তার আগে সৌদিরা সর্বশেষ যুদ্ধ করেছিল ১৯২৪-২৫ সালে, হেজাজের হাশেমি রাজ্যে বিরুদ্ধে। সেটি ছিল তালেয়ারের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে ইবনে সউল হাশেমীদের পরাজিত করেন এবং মক্কা মদীনা শহরের প্রদেশ হেজাজ দখল করেন এরপর ২৫ মার্চ ২০১৫ জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই সৌদির নেতৃত্বে ইয়েমেনে বোমা বর্ষণ শুরুর মাধ্যমে আবারো সরাসরি যুদ্ধে নামে দেশটি।

১.৯ হুথিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি

ইয়েমেনের ভাগ এলাকা এলাকা দখল করে নেয়া শিয়া হুথি ও তানা বিদ্রোহীদের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। জর্ডান ও উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর প্রস্তাবে ১৪ এপ্রিল ২০১৫ ভোটাভুটির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভেটো মতাধারী রাশিয়া ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ছাড়া বাকি ১৪ সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়।

১.১০ জাতিসংঘ দূতের পদত্যাগ

ইয়েমেনের চলমান সংকটের মাধে পদত্যাগ করেন ইয়েমেনে নিযুক্ত জাতিসংঘের দূত মরক্কোর কূটনীতিক জামাল বেনোমার।

১.১১ ইয়েমেন সংকটে বাংলাদেশের অবস্থান

এ সংকটে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে চলমান এ সংকটে বাংলাদেশ সৌদি আরবের নেতৃত্বে সামরিক জোটের কর্মকান্ডকে কূটনৈতিকভাবে সমর্থন করবে। যেহেতু সৌদি আরবের পেছনে আরব লীগ এবং জিসিসির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে সেহেতু এ জোটটির গ্রহণযোগ্যতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ এ জোটকে বিভিন্ন ভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে। অন্যদিকে রাশিয়া এবং চীন কৌশলগতভাবে এক ধরনের নিরবতা পালন করছে, যা হয়তো ইরানের অবস্থানকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের এ সমর্থন মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে সৌদি আরব, কুয়েত এবং আর আমিরাতে শ্রম বাজারের ওপর নির্ভরশীলতার একটি প্রতিফলন। তাছাড়া ইরাক, মিসর, লিবিয়াসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবকে সমর্থন করছে। তা ছাড়া একটি বৈধ সরকারকে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে উৎখাত করা একটি অবৈধ তৎপরতা। এই তৎপরতাকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। ফলে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। আরও একটি বিষয় গুরুত্বের দাবি করে সেটি হচ্ছে, ইয়েমেনে অবস্থিত প্রায় ৫ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক যারা এই সংকটের কারণে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাদেরকে অনতিবিলম্বে উদ্ধার করা বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইতোমধ্যে উদ্ধারের কাজ বাংলাদেশ সরকার শুরু করেছে।

১.১২ মূল্যায়ণ

অন্য আরব দেশগুলোর তুলনায় ইয়েমেন অর্থনৈতিভাবে ততটা সচ্ছল না হলেও সৌদি আরব ও ইরান উভয়েরই ইয়েমনের সঙ্গে অভিন্ন সীমান্ত থাকায় উভয়েই শিয়া-সুন্নী বিরোধকে তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে যেমন কাজে লাগাতে চাইছে, অন্যদিকে ইয়েমেনের কৌশলগত অবস্থান বিবেচনায় সৌদি আরব ও মিসর হুথিদের প্রতি ইরানের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে যতেষ্ট চিন্তিত। কারণ দক্ষিণাঞ্চলের এডেন উপসাগর সরাসরি একটি সংকীর্ণ জলরাশি দ্বারা লোহিত সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, যা দিয়ে বিশ্বের তেলবাণী জাহাজের একটা বড় অংশ চলাচল করে। এ এডেন বন্দর যদি হুথিদের দখলে চলে যায় , যার জন্য তারা বর্তমানে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে, তবে তাজ হবে মধ্যপ্রাচ্যের সার্বিক নিরাপত্তা তথা বৈশ্বিক তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে একটি বড় হুমকি। ইয়েমেন সংকটের প্রভাব গালফ কিংবা মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়াতেও পড়ছে। অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক বিচারে এই সংকটটি অত্যন্ত জটিল হলেও এর দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। কারন, জঙ্গিবাদসহ আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি এই সংকটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্নমুখী স্বার্থ থাকলেও মূল বিবেচনাধীন হওয়া উচিত এই সংকটের আশু সমাধান। আর এই সমাধানের ভিত্তি হওয়া উচিত ইয়েমেনের বৈধ সরকারকে দ্রুত পুর্নবাসিত করা এবং রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য একটি জাতীয় সংলাপ প্রক্রিয়া চালু করা ২১ এপ্রিল ২০১৫ ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শেষ করার ঘোষণা দেয় সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট। বিমান হামলা সমাপ্তির ঘোষণা দুই দিনের মধ্যে ২৩ এপ্রিল ২০১৫ আবার সেখানে বিমান হামলা চালায় সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী। নতুন দফা এ হামলার নাম দেয় হয় Operation Renewal Hope . তবে অবস্থাদৃষ্টে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় , শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যদিও সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়, তবে তা আরো বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে বরং সর্বাগ্রে প্রয়োজন আরব দেশগুলোর মতৈক্য।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. ইয়েমেন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন?
২. সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট সম্পর্কে আলোচনা করুন?
৩. উত্তর দক্ষিণ ইয়েমেন এর একত্রিত করন আলোচনা করুন?
৪. ইয়েমেন ও আরব বসন্ত সম্পর্কে তুলনা করুন?

সাম্প্রতিক বিশ্ব ০২

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়া দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ

Territorial Dispute in South East Asia and East Asia

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

২.১	ভূমিকা
২.২	দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক
২.৩	দক্ষিণ চীন সাগরের গুরুত্বের কারণসমূহ
২.৪	দাবি করার কারণসমূহ
২.৫	সংকট সমূহের ব্যাখ্যা
২.৬	দেশভিত্তিক আলোচনা
২.৬.১	ভিয়েতনাম
২.৬.২	ফিলিপাইন
২.৬.৩	মালয়েশিয়া
২.৬.৪	তাইওয়ান
২.৭	চীন এবং দক্ষিণ-চীন সাগর

২.১ ভূমিকা

"দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া" এই শব্দটি খুব বেশি পুরোনো নয়। এটি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক জনপ্রিয় হতে শুরু করে। বেশির ভাগ পন্ডিতদের মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে বার্মা (মায়ানমার) ব্রুনেই, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, পূর্ব তিমুর, চীন, লাউস, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর এ দেশগুলোর সীমানায় একত্র রূপের যে ভৌগোলিক সীমা তাকে বোঝায়। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনৈতিক ভূগোলবিদ Halford Mackinder, South east Asia is a Peripageral region, a part of the rimland" Mackinder এর ভৌগোলিক

সংজ্ঞায় একে Heartland of the world বলা চলে বর্তমানে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান এর মতো শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারনে অনেক বেশি পরিমানে আগ্রহী।

২.২ দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ধর্মীয়, ঐতিহ্যবাহী, ভৌগোলিক কিংবা নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে একক কোন সংজ্ঞা নয়। এ অঞ্চলে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান অন্তত এ ৪টি ভিন্ন ধর্ম বিরাজমান। ঐতিহাসিক ভাবে ও এদের মধ্যে কোনো ধরনের মিল বা সমতা কিংবা গভীর কোনো ইতিবাচক সম্পর্ক লনীয় নয়। ৫টি অ-এশিয় ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রসমূহ। ব্রিটিশরা শাসন করেছে বার্মা এবং মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড করে ইন্দোনেশিয়া, লাওসে করে ফ্রান্স। অন্যদিকে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ফিলিপাইনে ছিল ইউ.এস.এ এর উপনিবেশ এবং তিমুর পর্তুগীজের উপনিবেশ ছিল একমাত্র স্বাধীন দেশ ছিল থাইল্যান্ড। এর সামগ্রিক প্রভাব দেশসমূহের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে বিপুল মাত্রায় দেখা যায়।

৫০০ মিলিয়ন জন সম্পদ নিয়ে, বিপুল অর্থের প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এ অঞ্চলটি তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অপূর্ব হার থাকা সত্ত্বেও, অভ্যন্তরীন এশিয়া ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিসাম্যে ক্ষেত্রে হওয়ার পরেও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় কোন্দল কিংবা Teroritorial disputes এর দরুন নিজেদের অপার সম্ভাবনা ১০০ ভাগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হ"ছে। আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধগুলো ১টি Case Study এর মাধ্যমে আলোচনা করতে পারি। আমরা এক্ষেত্রে এমন একটি বিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে পারি যা নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র বিরোধে লিপ্ত। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ- চীন সাগরে বিরোধের কোন বিকল্প হতে পারে না।



চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ

South East Asia: Territorial Dispute
Case Study (South China sea Dispute)

South China Sea:

দক্ষিণ- চীন সাগর চরম পর্যায়ে বিরোধপূর্ণ প্যাসিফিক সাগরের ৩,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ১,৪০০,০০ বর্গমাইল ন্যাটিক্যাল অঞ্চল জুড়ে একটি সাগর। এখানে তেল, গ্যাস সহ নানা খনিজ রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ব্যস্ত বাণিজ্যিক পথ হওয়ার পথে। এ সাগরে ২৫০টি দ্বীপ, উপহ্রদ, মৌল শ্রেণী রয়েছে। কিন্তু দ্বীপপুঞ্জ ও রয়েছে যার মধ্যে উলে-খযোগ্য দুটি হলো স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ এবং প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জ দুটি রয়েছে চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ভিয়েতমান, মালয়েশিয়া ব্রুনেই যারা দাবি করছে এর মালিকানা।

২.৩ দক্ষিণ চীন সাগরের গুরুত্বের কারণসমূহ

ভূ -রাজনীতির কারনে এ অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ চীন সাগরের গুরুত্ব অনেক। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে নিম্নে গুরুত্বের কারণসমূহ তুলে ধরা হলো :

বাণিজ্য সারা বিশ্বের (প্রতিবছর) অর্ধেকেরও বেশি জাহাজ অর্থাৎ বাণিজ্য জাহাজ এ পথে চলাচল করে, মালাক্কা, সুন্দা, লম্বক প্রনালীর মধ্য দিয়ে। মালাক্কা প্রণালী দিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে প্রবাহিত ট্যাংকারের সংখ্যা ও সুয়েজ খালের ৩ গুণ এবং পানামা খালের ৫ গুণ বেশি।

প্রাকৃতিক সম্পদ:

অনুমান করা হয়ে থাকে যে- দক্ষিণ চীন সাগরে ৭.৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল (টক্স এর মতে) অথবা ১৭.৭ বিলিয়ন টন (চীন এর মতে) অথবা ১৩ বিলিয়ন টন (কুয়েতের হিসেবে) তেল আছে। তবে US Enrgy Information Administration (FIA) এর মতে ৩০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস রয়েছে।

মৎস সম্পদ:

একে মৎস সম্পদের প্রাচুর্য ও বলা চলে। ১৯৮৮ সালের এক হিসাব অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে যে ৮% বিশ্বের মোট মৎস্য সম্পদের ৮% এখান থেকে পাওয়া যায় প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

CLAIMS BY COUNTRIES

Country	South	Spartly Chaina sea	Paracel Islands	Gulf of Islands
Thailand				
Brunei	UNCLOS	No Formal	No	N/A
Combodia	Not applicable	N/A	N/A	UNCLOS
China	All	All		All N/A
Indonesia	UNCLOS	3 Islands	No	N/A
Malaysia	UNCLOS	8 Islands	No	UNCLOS
Plilippines	Significant	All	No	N/A
Taiwan	All	N/A		All N/A
Thailand	N/A	All	N/A	UNCLOS
Vietnam	All	All	All	UNCLO



দাবিকারী রাষ্ট্রসমূহ ও দাবি সমূহঃ দাবিকারী রাষ্ট্রগুলো হলো:

(১) চায়না (৪) কম্বোডিয়া (৭) মালয়েশিয়া
(২) ভিয়েতনাম (৫) তাইওয়ান
(৩) ইন্দোনেশিয়া (৬) ফিলিপাইন

১৯৪৭ সালে চীন এ সংক্রান্ত মানচিত্র প্রনয়ন করে। যেখানে লনীয় পুরো দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল জুড়ে স্প্রাটলি এবং প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ প্রবাহিত। যার মূল অংশ Nine Dotted line নামে অভিহিত এবং সম্পূর্ণ অংশটুকুই ভিয়েতনাম, চীন দাবি করে চলেছে।

২.৪ দাবি করার কারণসমূহ

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যথাঃ
দক্ষিণ চীন সাগর দ্বন্দ্বের বা সংঘাতের প্রধান কারণগুলো হলো: Hydor-Carbon সম্ভার মৎস্য সম্ভার, সামরিক শক্তি প্রদর্শন জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নীচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলোঃ

i) Hydro Carbons:

সাম্প্রতিক সময় খনিজ সম্পদ আরোহন আন্তঃ রাষ্ট্রীয় বিরোধসমূহের অন্যতম প্রধান কারণ। ADEAN কূটনীতিক বলেন- এক পর্যায়ে এ অঞ্চলের কিছু দেশকে খনিজ সম্পদের জন্য South China Sea এর ওপর নির্ভর করতে হবে যার মালিকানা বিরোধপূর্ণ বিষয়।

চায়নার সরকারি খনিজ উত্তোলন কোম্পানী গভীর সমুদ্র খনন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করছে। তাইওয়ান ও একই চিন্তা করছে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের অনিয়ন্ত্রণভাবে খাদ্যদ্রব্য দাম বৃদ্ধি বেকারত্বের মতো সমস্যার কারণে South China Sea এর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হচ্ছে। এর ওপর এখন ভিয়েতনাম (সমুদ্র তল) এর ওপর নির্ভরশীল নিজেদের

জাতীয় আয়ের ত্রে যা ২০০৫ সালে ৪৮% ছিল তা ২০২০ এ ৫৫% করার ল আছে ভিয়েতনামে এবং এ লে তারা গধৎরঃরসব ঝঃৎধঃবমু ২০২০ পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ফিলিপাইপের মতো রাষ্ট্র যে কিনা তেল আমদানিকারী দেশ তার জন্য খনিজ সম্পদ সুরকার ত্রে ঝঈঝ এর ভূমিকা খুব বেশি।

আর চীনের জন্য এটি তার শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। মূলত দক্ষিণ চীন সাগর ইস্যু চীনের জন্য যতটা অর্থনৈতিক ভাবে
গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে শতগুণ বেশি সামরিক শক্তি প্রদর্শন বিশ্বে নিজে শক্তিশালী অবস্থন কিংবা বর্তমান "Multi Polar world System" এর সভ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে।
অন্যদিকে চীন ২০০৫ সালে SCS কে তাদের প্রধান ১০টি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি বলে চিহ্নিত করেছে। ২০১১ এর মে এবং জুনের ভিয়েতনাম ও চীনের Cable- cutting ঘটনাটিকে ভিয়েতমানের একচ্ছত্র আধিপাত্য বিস্তারের চেষ্টার জবাব বলে আখ্যা দিয়েছে চীনের বিশ্লেষকগণ। এই বিষয়টি ঝঈঝ নিয়ে চীনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি।

ii) Fisheries

চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভোক্তা এত্রে এবং তারা সবচেয়ে বড় রপ্তানী করা (মৎস্য) দেশও বটে। অন্যদিকে চীনের ২য় রপ্তানিকারক পন্য হলো মৎস্য। ২০১০ সালের হিসাব মতে ৭১.৬ বিলিয়ন এর ৭% এখাত থেকে আসে। তাকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও অর্ধেক এ খাত থেকে পূরণ হয়। এ সকল কারণ ভিয়েতনামকে প্রেষনা দিয়ে চলেছে। SCS তে মৎস্য আরোহন করার। যার ফলে চীনের সাথে তাদের বিরোধের মাত্রা বেড়ে চলেছে। একই ভাবে ফিলিপাইন তাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষে একই মনোভাব পোষণ করে। মৎস্য শিল্পের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান ৫% এর ও কম হলে ও ১.৫ মিলিয়ন মানুষ এ দেশের মৎস্য খাতের উপর নির্ভরশীল।
চীন এলে তার জেলেদের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সাহায্য করছে। উন্নত প্রযুক্তি, সামরিক বাহিনী, উন্নত মাছ ধরার সরঞ্জাম সহ নানান সুবিধা নিশ্চিত করছে। ভিয়েতনামের একজন বিশে-ষক বলেন- "সমুদ্রে জলদস্যু আর চীনাদের আচরণবিধির মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ছে" এ বক্তব্যের মাধ্যমে South China Sea তে চীনের তৎপরতা স্পষ্ট।

iii) Increased Militarization and civilian patrols:

South China Sea ইস্যু বর্তমানে নিরাপত্তার ইস্যু হয়ে উঠেছে। তবে চায়নার শক্তিশালী, বিশাল এবং প্রযুক্তিগত উন্নত সামরিক বাহিনীর তুলনায় অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের বাহিনী সমুদ্রসীমা প্রহরী বাহিনী অনেকটাই দূর্বল। উদাহরনস্বরূপ বরা চলে ভিয়েতনামে মেরিন পুলিশ স্বাধীন বাহিনী হয় ২০০৮ এ মাত্র ১০০০ সৈন্য বিশিষ্ট। তবে এ সব ব্যবহারের মাধ্যমে সংকট কমছে না বরঞ্চ বেড়ে চলেছে।

iv) Nationalism

এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ ও অনেককিছু প্রভাবিত করছে। ভিয়েতনামের জন্য বিষয়টি আরও জটিল। কেননা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চীত করণের লে চীনের বিপে অবস্থান এবং কমিউনিজম মতবাদ এর ওপর ভিত্তি করে স্বপক্ষে অবস্থন নিয়ে ভিয়েতনাম সম্পূর্ণ এক ভয়ংকর দ্বন্দ্বে বিরাজমান। তবে এক পর্যায়ে যখন চীনের বিষয়ে ব্যাপক জনগণ এর অবস্থান চীন বিরোধী আন্দোলনের সঞ্চার হয়, কম্যুনিজম বিরোধী বিভে বেড়ে চলে তখন ভিয়েতনাম সরকার তার অবস্থান স্পষ্ট করতে সমর্থ হয়। To hell with the Northanger communist party এর মতো শে-গান দিতে থাকে ভিয়েতনামের সাধারণ জনগণ।
ফিলিপাইন মূল South China Sea অথবা চীন ইস্যু থেকে ফিলিপাইনের কাছে আভ্যন্তরীন কোন্দল সমাধান বেশি জরুরি।

২.৫ সংকট সমূহের ব্যাখ্যা

South China Sea নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলোর বিরোধকে ২ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা:

ক. ঘটনাক্রমিক ব্যাখ্যা/ আলোচনা খ. দেশ ভিত্তিক আলোচনা

গ. ঘটনাক্রমিক আলোচনা

দক্ষিণ- চীন সাগর সংকট ভয়ংকর রূপ নেয় ২০১১ এর মাঝামাঝি থেকে। সে সময় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং উলে-খযোগ্য ঘটনাগুলো হলো:

৪ মার্চ : ফিলিপাইনের জাগাজকে পেট্রোল নৌকা দিয়ে চীনের ভয় প্রদর্শন।

২০ মে : স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জে ফিলিপাইনের বিমান বাহিনী কে চীন বিমান বাহিনীর ভয় প্রদর্শন।

২১ মে: চীন প্রতিরা মন্ত্রীর সংলাপের জন্য ম্যানিলা গমন।

৫ জুন : সংলাপে চীনের প্রতিরা মন্ত্রী সিংঙ্গাপুরে বলেন, চীন ঝঈঝ তে শান্তি রায় বদ্ধ পরিকর।

২১ জুলাই : চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে নিঃসন্দেহে চায়নার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব রয়েছে ঝঈঝ তে এবং ফিলিপাইনের কার্যক্রম তা লড়ঘন করছে।

১০ আগস্ট :চীন সর্বপ্রথম অরৎপৎধভ+ পধৎরবৎ প্রতিস্থাপন করে। যা এ অঞ্চলে নিজের শক্তি প্রদর্শনে সাহায্য করে।

২১ সেপ্টেম্বর: জাপান এই ইস্যুর সমাধানে মধ্যস্তা করার চেষ্টা চালায়।

১২ অক্টোবর : চীন ও ভিয়েতনাম ঝঈঝ সংকট সমাধানে চুক্তি করে এবং বছরে ২ বার এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বৈঠকের পরিকল্পনা করে।

২৬ অক্টোবর : ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম তথ্য আদান প্রদান এবং যৌথ সুরা (সামুদ্রিক সম্পদ) এর উদ্দেশ্য চুক্তি স্বার করে।

৪ নভেম্বর : ভিয়েতনাম কুটনীতিকবিদ বলেন, South China Sea সংকট Full scale confict এ পরিণত হতে পারে যদি না দ্বন্দ্বে জড়িত রাষ্ট্র সমূহ আইনের ভিত্তিতে সমঝোতায় না আসে।

২.৬.১ ভিয়েতনাম

ভিয়েতনাম সবসময় চেষ্টা চালায় ওয়াশিংটনকে South China Sea ইস্যুতে যুক্ত করার। এর পেছনে ভিয়েতনামের দুটি যুক্ত কাজ করে।

ক. সংকট সমাধানের মূল ক্ষেত্রে হিসেবে ASEAN কে প্রতিষ্ঠা করা।

খ. শক্তি সাম্য নিশ্চত করা।

ভিয়েতনাম ২০১০ ASEAN এর সভাপতি হিসেবে সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে Vietnam অনেকভাবে Washington কে কাজে লাগায় অন্য সকল দেশ যাতে চীনের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। মূলত চীন ও ভিয়েতনাম এর মধ্যে সংকট সবচেয়ে বেশি এ নিয়ে। SCS নিয়ে এখন পর্যন্ত তারা ২ বার (১৯৭৪, ১৯৮৮) যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে তাদের অনেকটা নির্ভরশীলতা রয়েছে চীনের ওপর অন্যদিকে তারা অল্প সংখ্যক কম্যুনিস্ট দেশসমূহের দুটি। SCS নিয়ে তাদের সংকটের মাত্রা বাড়ে ২০০৯ থেকেই যখন চীন SCS তে তার I-doshed line জমা দেয় UN commission on the limit of the continental shelf কেননা এ Nine- Dashed Line এর সাথে Vietnam এর EEZ এর ২ dash overlap করে এ পর্যায়ে ভিয়েতনাম নিজের দাবি আদায়ে প্রতিরা বাজেট বাড়ায় ASEAN কে ব্যবহার করার চেষ্টা চালায় USA এর সাথে সর্ম্পক জোড়দার করে চীনের সঙ্গে

বিভিন্ন চুক্তি করে। এরই পরিপ্রেতিতে ২০১০ এর July ২০১০ এ US এর সেক্রেটারি অফ স্টেট Hillary Clinton- Ses কে ASEAN Regional Frowm (ARF) এর হ্যানয় সম্মেলনের প্রধান ইস্যু করে। Vietnam এর পরিকল্পনা মোটামুটি ভাবে সফল হয় কেননা ১২টি রাষ্ট্র (ASEAN সহ) নিজেদের মতামত প্রদান করেন এবং চীনকে কমিটি পর্যায়ে আলোচনার জন্য চাপ দিতে একমত পোষণ করে, তবে হ্যানয় কখনো কোন একটি দেশের সাথে অনেক বেশি নির্ভরশীলতার সর্ম্পক স্থাপনের বিপক্ষে ছিল। ভিয়েতনামদের নীতি ছিল- ৩ নীতির সমষ্টি- সামরিক বাহিনীকে না, কোন ধরনের জোটকে না, নির্দিষ্ট দেশের প্রতি অতিমাত্রার বেনাককে না।



ভিয়েতনাম

হ্যানয় এ বিষয়টিয়ে জানে Waslington সে কোন ধরনের সম্পর্কের ত্রে নিজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু Waskington এর মাধ্যমে শক্তিসাম্য বজায় রাখাটাই ঈষরহয় কে প্রতিহত করার জন্য হ্যানয় যথেস্ট বলে বিশআবাস করে যার প্রশানস্বরূপ ভিয়েতনামের একজন কুটনৈতিক বক্তি বলেন যে- They talk to us now (ARF ২০১০ সম্মেলনে)

২.৬.২ ফিলিপাইন:

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যকার সঙ্কট তীব্রতা পায় Besigso aquino এর ক্ষমতা গ্রহণ (২০১০ সাল) এর সময় থেকে। সাগরটি (২০১০ সাল) এর সময় থেকে ফিলিপাইন নীতিনির্ধারকগণ এ এর নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে ১৯৯৪ সাল চীন যখন Spratly দ্বীপপুঞ্জের মিসচিফ শৈলশ্রেনী (Misclief Reef) দখল করার চেষ্টা চালায় বিশেষ করে গধহরষধ যখন আবিস্কার করে চীন নিজের পরিকল্পনা সম্পূনরূপে বাস্তবায়নের পথে রয়েছে ১৯৯৫ সালে এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চরমপর্যয়ের বাগবিতন্ডা ঘটে। এর পরবর্তীতেই ফিলিপাইনের নীতি নির্ধারকেরা নিজেদের সামরিক বাহিনীর দূর্বলতা লক্ষ করে। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ২০১১ সালের জুলাই মাসে ঘোষনা দেয় " what is ours js ours " যা তিনি



ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ

Spratly দ্বীপপুঞ্জের Reed Bank দখল প্রসঙ্গে বলেন। একটা সময় ফিলিপাইন Washington এর সাথস্য লাভ করতে থাকল এ বিষয়ে। ২০১২ সালে রাষ্ট্রপতি Aoruino এর Washington সফরের পরে তিনি বলেন ফিলিপাইন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের অর্থনৈকিত, সামরকি সম্পর্কের এক নতুন দিগন্তে পৌছল" ২০১১ সাল থেকে আরও একজন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে ফিলিপাইনের জন্য যার নাম Albert Del Rosario তিনি প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিজেদের দাবি সমূহ চিহ্নিত করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং শান্তিপূর্ন ভাবে, স্বাধীনতা বন্ধুত্ব সহযোগিতার ভিত্তিতে South China Sea এর সংকট দূরীকরন সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। তবে ফিলিপাইনের মতে এর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে চীন।

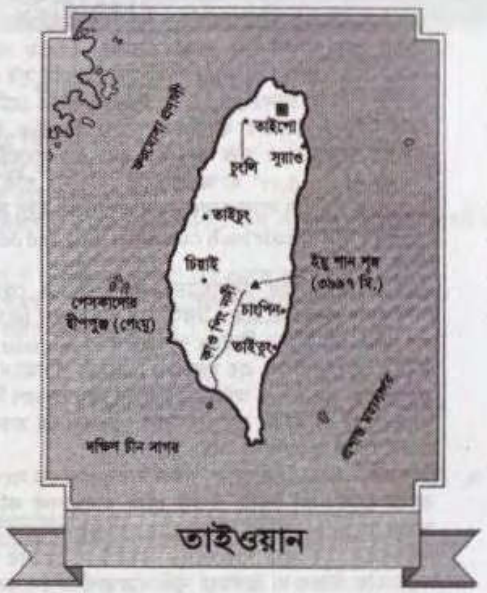
২.৬.৩ মালয়েশিয়া

মালেয়শিয়া সবসময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিরাজমান রাখা লক্ষে চীনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রেখে চলছে দেশে কোন চাপ সৃষ্টি কারী গোষ্টীর উপস্থিতি না থাকার কারণে ও মালেয়শিয়া সরকার South China Sea নিয়ে কোন ধরনের বিরোধে লিপ্ত হতে আগ্রহী নয় এর চেয়ে এ দেশটি নিজেকে আরও অনেকে বেশি পরিমাণ অর্থনেতিক ভাবে সমৃদ্ধশালী দেখতে বেশী আগ্রহী এসসিএস এর সংকট সমাধান চয়ন মালেয়শিয়া তবে তা মালেয়শিয়ার পররাষ্ট্র নীতির মূল ইসু নয় এ দেশের জনগন ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সমুদ্র সীমানা নির্ধারনের জন্য বেশি চিন্তিত। মালেয়শিয়া এর সবচেয়ে বড় Trade Partner ছিল চীন ২০১০ অন্যদিকে USA ছিল সবচেয়ে বড় Military Partner চীনের সাথে সম্পর্কে ঠিক রাখতে মিলিটারী সহযোগিতার পরিমাণ কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে মালেয়শিয়ার এক কথায় বলা চলে চীনের এক মাত্র সমর্থক হল মালেয়শিয়া দক্ষিন পুর্ব চীন সাগর সংকট।



২.৬.৪ তাইওয়ান :

বেইজিং এর " One China " নীতির দরুন তাইওয়নের জন্য এসসিএস সংকট বিষয়ে AS & AN, কিংবা কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে এমনকি দ্বিপাক্ষিক কোন আলোচনায় ও অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। যদিও তাইওয়ান সরকার শান্তিপূর্ন সমাধান চায় কিন্তু কতিপয় নীতি নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, বিরোধী দল, এমনকি প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ আরও অনেক জোরালো ভূমিকার পক্ষে অবস্থান নেয়।



২.৭ চীন এবং দক্ষিণ-চীন সাগর

চীন "দক্ষিণ-চীন সাগর" ইস্যু টিকে নিজের সামর্থ সেটা অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রতিরক্ষা, সকল ক্ষেত্রে নিজের দাবি আদায়ের শক্তি, বর্তমান বিশ্বে টহরঢ়ড়ষধৎ ঝুংরবস এর সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্র হিসেবে মনে করে থাকে। তাই এই ইস্যুতে টঋঅ এর অংশগ্রহণ করা বা এর প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকে চীন এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের ষতযন্ত্র বলে মনে করে, নিজের অবস্থানকে জয়যুক্ত করতে চীনের পরিকল্পনা গুলো হল :-

১. দাবিকারী রাষ্ট্রসমূহের চীন নির্ভরতার ক্ষেত্রেসমূহ আরও বৃদ্ধি করা।
২. বিতর্কিত অঞ্চলগুলোতে কোন রকম অবস্থান নেয়ার সুযোগ না দেয়া।
৩. এ ইস্যু নিয়ে USA এর সাথে কোন ধরনের সংঘর্ষে জড়ানো থেকে বিমত থাকা।

এ লক্ষে চীন প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমুহের সাথে বিনিযোগ বানিজ্য সম্পর্কের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সংকট নিরসরে পথ সমূহ :

১. আন্তর্জাতিক আইন দক্ষিন চীন সাগর সংকট সমাধানের প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিৎ। তবে তীব্র জাতীয়তাবোধের দরুন রাষ্ট্র সমূহ বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজী নয় যার কালে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিও হয়ে উঠছে কঠিন।

মূলত প্রতিটি দাবিকারী রাষ্ট্রসমূহ রয়েছে নিজেস্ব। দাবি সমূহের পেছনে জোরালো যুক্তি। যা সম্পুর্ন বিষয়টি করে তুলেছে অনেক বেশি জটিল। চীনের UNCLOS কিংবা যে কোন সালিশী আদালতকে অস্বীকার করার বিষয়টিকে এ সমস্যা সমাধানের প্রদান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. AS & AN প্রতিষ্ঠানিক একটি আলোচনা ক্ষেত্রে হিসেবে কাজ করতে পারে এর সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে ১৯৯২ সালের থেকে আসিয়ানের ভূমিকা রয়েছে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯২ এর দক্ষিণ-চীন সাগর ঘোষনা, ২০০২ সালের দাবিকারী রাষ্ট্র সমূহের আচরণবিধি ঘোষনা এ সঙ্কট সামাধানের একটি সুষ্ট পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে কাজ করেছে। অন্য চীনের Niselaief Reef দখলের প্রেক্ষিতে অঝ AN এর চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যকার দ্বীপাক্ষিক চুক্তির প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। যদিও খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এ চুক্তি ব্যর্থ হয় এবং এর পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোন ধরনের "Code of Conduct" বা আচরণবিধি প্রনয়নের গতি ছিল খুবই মন্তর, মূলত চীনের দ্বীপাক্ষিক সমাধান মনোভাবের দরুন এসসিএস ইস্যু সমাধান কঠিন হয়ে পড়ছে। চীন অনুসরন করে "Trade each case differently and defeat each one separate" এই নীতি।

এক্ষেত্রে USA এর আসিয়ানের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টার একটি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। টঝঅ চায় আসিয়ানে নিজের প্রভাব খাটিয়ে এ অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহ কে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে enipolar world system ধরে রাখতে। অন্য দিকে চীন টঝঅ এর হস্তক্ষেপ বিন্দুমাত্র পরিমানে মেনে নিতে রাজী নয়।

প্রকৃতপক্ষে যদি চীন ও আসিয়ান সাধারণ কিছু আচরণ বিধিতে যদি ঐক্যমতে পৌছাতে পারে তবেই এ সংকট সমাধান সম্ভব। কেননা তা সকল দাবিকারী রাষ্ট্র সমূহকে কিছু অবশ্য পালনীয় আইনের মধ্যে বেধে ফেলবে।

৩. বিশেষজ্ঞরা সহযোগিতামূলক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কে সংকট সমাধানের আরেকটি উপায় ব্যাখ্যা দেন। সে ক্ষেত্রে একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যম সমুদ্রের অন্যতম সম্পদ মৎস্য ও খনিজ্য সম্পদ আরোহোনের সমতার ভিত্তিতে অধিকার থাকে। তবে ফিলিপাইন এর মতে সার্বভেত্বের বিষয়টি সমাধানের আগ পর্যন্ত এটি কার্যকর করা সম্ভব হয়ে উঠবে না একমাত্র যুক্ত ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ যা Joint Marine Seismic undertaking (JMSU)" নামে অভিহিত এবং চীন, ভিয়েতনশি ও ফিলিপাইনের মধ্যে কার্যকর ছিল এর ব্যর্থতার পরে দেশগুলো আরও

অনেক বেশি নিজেকে স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত হতে শুরু করে।

মূল্যায়ণ

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট সমাধানের ব্যর্থতার পেছনে আভ্যন্তরী দ্বন্দ, অর্থনীতি রাজনৈতিক উপাদান সমূহ জাতীয়তাবোধে, ছাড় না দেয়ার মানসিকতা এবং চীনের একঘুয়েমিতা ও অনেকংশ টঝঅ এর ভূমিকা স্থায়ী, চীন চায় ঝঈঝ তে একচ্ছত্র ভূমিকা ব্যাখ্যা রেখে নিজের অর্থনেতিক ভাবে আর ও শক্তিশালী করতে এ অঞ্চলে নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী করে তুলতে নিজের প্রভাব খাটিয়ে প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে, পুরো বিশ্বে নিজেকে সামরিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিকে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে ধরে রাখতে। অন্যদিকে USA এই ইস্যুকে ব্যবহার করে চীনের চলার পথের অন্তরায় হিসেবে ভূমিকা পালন করে Unipolar World System এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

১. দক্ষিণ চীন সাগর সংকট কি?
২. দক্ষিণ চীন সাগর সঙ্কটের কারণ লিখ।
৩. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এর রাষ্ট্র সমূহ কী কী?
৪. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন দেশটি মূল প্রভাবক হিসেবে বিবেচিত হবে?
৫. ভূরাজনীতিগত দিক থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এর গুরুত্ব কতটুকু?
৬. দক্ষিণ চীন সাগর এর অবস্থান ও অধিকারী রাষ্ট্রগুলোর নাম লিখুন।
৭. দক্ষিণ চীন সাগর এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. দক্ষিণ চীন সাগর এর আলোকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সম্পর্কে আলোচনা করুন। এর বৈশ্বিক প্রভাব লিখুন।
২. দক্ষিণ চীন সাগর এর সংকট সমাধান গুলো কি কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
৩. দক্ষিণ চীন সাগর সংকট নিয়ে দেশ ভিত্তিক আলোচনা কর।
৪. দক্ষিণ-পূর্ব এর আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে চীন এর সুপার পাওয়ার হিসেবে বিকাশ ব্যাখ্যা কর।
৫. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে আঞ্চলিক রাজনীতি হচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ৩

প্যালেস্টাইন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান সমস্যা সমাধানের স্বরূপ

Historical Background of the Palestine Problem and Way to Solve

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৩.১ ভূমিকা
৩.২ ফিলিস্তিন এর ইতিহাস
৩.৩ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ
৩.৪ জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন
৩.৫ এক নজরে ইসরাইল-ফিলিস্তিনি কার্যক্রম(১৯৪৭-২০১৪)
৩.৬ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের অন্তরায়
৩.৭ রোডম্যাপ পরিকল্পনা
৩.৮ এক নজরে ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া
৩.৯ কোয়ফেট অন দ্যা মিডলইস্ট
৩.১০ এক নজরে ফিলিস্তিনের গেরিলা সংগঠন
৩.১১ ফিলিস্তিন সমস্যা সমসাধানে প্রনিত রোডম্যাপের গুরুত্ব
৩.১২ পর্যবেক্ষক ভূখণ্ড থেকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র
৩.১৩ ফিলিস্তিনের জাতিসংঘ জয় তৎপরবর্তী প্রভাব
৩.১৪ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ
৩.১৫ শান্তি আলোচনায় বাধাসমূহ
৩.১৬ গাজার বর্তমান সংকট

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

স্মরণাতীত কাল থেকে ফিলিস্তিন মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে অবস্থিত যে প্রাচীন ভূমির অধিকাংশে আধুনিক ইসরাইল ও কিছুটা জর্ডান ও মিসরের দখলে তাই ফিলিস্তিন নামে পরিচিত। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে পূর্বদিকে জর্ডান নদী অতিক্রম করে আরব মরুভূমি পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে নিম্ন লিটানি নদী থেকে দক্ষিণে গাজা উপত্যকা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে কারণে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল, সমগ্র বিশ্বের শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ তেল উৎপাদন এবং এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে হ্রস্বতম সমুদ্র ও আকাশ পথের দূরত্ব যোগায় ঠিক সেই কারণেই ফিলিস্তিনও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৩.২ ফিলিস্তিন- এর ইতিহাস (History of Palestine)

ফিলিস্তিন ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদি এ তিন ধর্মাবলম্বী মানুষের নিকট পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃত। মুসলমানগণ একে পবিত্র মনে করে কারণ দ্বিতীয় কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস জেরুজালেমে অবস্থিত। খ্রিস্টানগণ একে পুণ্যভূমি হিসেবে গণ্য করে কারণ যীশুখ্রিস্ট বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে ধর্মপ্রচার করেন। আর ইহুদিরাও ফিলিস্তিনকে তাদের আদি বাসভূমি মনে করে। এ তিন ধর্মাবলম্বীর জনগণই ফিলিস্তিনকে নিজেদের বলে দাবি করে। এর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে অতীতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে এবং অনেকবার এর হাতবদল হয়েছে। ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস করে দেয়ার পর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের প্রাধান্য লোপ পায় এবং অধিকাংশ ইহুদি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ইহুদিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারা ড. ওয়াইজম্যান এর নেতৃত্বে লন্ডনে কাজ শুরু করে দেয়। ইতোমধ্যে ড. ওয়াইজম্যান কৃত্রিম উপায়ে এসেটিলিন আবিষ্কার করে বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অবদান রাখায় এবং তারা যখন বুঝতে সক্ষম হয় যে ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিতব্য আবাসভূমি সুয়েজ খালের পার্শ্বে অবস্থিত হবে বলে এর ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ব্রিটেনের প্রভাব বলয়ে থাকবে তখন পররাষ্ট্র সচিব লর্ড বেলফোর আশ্বস্ত হন। তিনি ১৯১৭ সালে ২ নভেম্বর লর্ড রথশিল্ডকে লেখেন; 'ব্রিটিশ সরকার ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি সরকার যেন বিচার করে। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলার এর ক্ষমতা দখলের পর তাঁর ইহুদি নির্যাতনের নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে হাজার হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ফিলিস্তিনে আবার নতুন করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকারের ১৯৩৯ সালে শ্বেতপত্র ফিলিস্তিনের ভবিষ্যতকে হিমাগারে নিক্ষেপ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ফিলিস্তিনে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যকার চিরশত্রুতা নতুন করে বৃদ্ধি পায়। কারণ ইতোমধ্যে ইহুদিরা তাদের বহিরাগমনের ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করে।



১৯৪৭ সালে সাধারণ পরিষদে ভোটের মাধ্যমে একটি অর্থনৈতিক সংযোগসহ ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার সুপারিশ করে । এতে করে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈধতা অর্জন করে।


ইয়াসির আরাফাত

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে এবং প্রথম ফিলিস্তিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় এ যুদ্ধে ইসরাইল ফিলিস্তিনের ৭৮% ভূমি দখল করে নেয়। মূলত ১৯৪৮ সাল থেকে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা অদ্যাবধি চলছে। ১৯৫৬ সালে মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল মিশর আক্রমণ করে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক মিসর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ ও সিনাই, পশ্চিমতীর গাজা ও সিরিয়ান গোলান উপত্যকা দখল করে নেয় । ১৯৬৭ সালের ৩য় আরব ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ২২% এলাকা দখল করে নেয়। ফলে ফিলিস্তিনরা নিজ ভূখণ্ডে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৪ সালে গঠন করা হয় PLO। ১৯৬৮ সালে ইয়াসির আরাফাত PLO- এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।


গাজার হামাস নেতা খালেদ মেশাল (উপরে) ও ইসমাইল হানিয়া (নীচে)

১৯৮৮ সালে ইয়াসির আরাফাত তিউনিসিয়া থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৯০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। শুরু হয় অসলোতে PLO ইসরাইল শান্তি আলোচনা। এ প্রেক্ষিতে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ পিএলও ইসরাইলকে এবং ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ইসরাইল পিএলওকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ওয়াশিংটনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে এ চুক্তির তেমন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় নি। ২০০৩ সালে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সমর্থনে রোডম্যাপ ঘোষিত হয়। ঘোষিত রোডম্যাপে ২০০৫ সালের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার কথা বলা হয়। অসলো চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের মে মাসের মধ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে চূড়ান্ত আপস নিষ্পত্তি হওয়ার কথা। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালের মে মাসে ফিলিস্তিনি শাসিত এলাকায় ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৮ সনে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সই হয়। সিনাই থেকে ইসরাইলের সৈন্য প্রত্যাহার, মিসরের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয়।

৩.৩ কিভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম

⇨ ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর ২ নভেম্বর, ১৯১৭ এক বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেন ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। তার এ ঘোষণাকে ইতিহাসে "বেলফোর" ঘোষণা নামে খ্যাত।

⇨ ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার সময় প্যালেস্টাইন ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত । উল্লেখ্য যে, ১৫১৭ সালে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্য পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়।

⇨ ৯ ডিসেম্বর, ১৯১৭ লর্ড এলেনবীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী প্যালেস্টাইন অঞ্চল দখল করে। অবসান ঘটে তুর্কি সাম্রাজ্যের ।

⇨ ১৯১৯ সালে লীগ অব নেশনস গঠনের পর প্যালেস্টাইনের শাসনভার দেওয়া হয় ব্রিটেনকে। এর মেয়াদ ছিল ১৪ মে, ১৯৪৮ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের ২৮১ নং প্রস্তাবে



১৯৬৭-এর আরব ইসরাইল যুদ্ধ-পরবর্তী আরব দুনিয়া

প্যালেস্টাইন অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন নামের দুটি স্বাধীন দেশ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রস্তাব কার্যকর হয় নি।

⇨ ১৪ মে, ১৯৪৮ প্যালেস্টাইন অঞ্চল হতে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট- এর অবসান ঘটলে ঐ রাতেই ইসরাইলের ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। "চীম ওয়াইজম্যান" ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

⇨ শুরু হয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ : এ পর্যন্ত মোট চারটি যুদ্ধ হয়েছে।
- প্রথম : ১৯৪৮ সালে, দ্বিতীয় : ১৯৫৬ সালে,
- তৃতীয় : ১৯৬৭ সালে, চতুর্থ : ১৯৭৩ সালে

৩.৪ এক নজরে ইসরাইল-ফিলিস্তিনি কার্যক্রম (১৯৪৭-২০১৪)

১৯৪৭ : ২৯ নভেম্বর-জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনি এলাকা বিভক্তির সিদ্ধান্ত এবং ব্রিটিশ শাসিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে দু'ভাগ করে এর একভাগে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৪৮ : ১৪ মে-'বেলফোর ঘোষণা'র ভিত্তিতে ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সিরিয়া, মিসর, ফ্রান্স, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ।

১৯৫৬ : মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল কর্তৃক মিসর আক্রমণ।

১৯৬৪ : আরবলীগের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে PLO গঠন করা হয় নির্যাতিত প্যালেস্টাইনদের মাতৃভূমির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

১৯৬৭ : ইসরাইল কর্তৃক মিসর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ ও সিনাই, পশ্চিম তীর, গাজা ও সিরিয়ার গোলান উপত্যকা দখল।

১৯৭৩ : অধিকৃত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে মিসর ও সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে জেনেভা শান্তি আলোচনা শুরু। ইসরাইল, জর্ডান ও মিসরের অংশগ্রহণ। সিরিয়ার বয়কট।

১৯৭৮ : ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। সিনাই থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহার। মিসরের সাথে ইসরাইলের

কূটনৈতিক সম্পর্ক। ৫ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা।

১৯৮১ : ইসরাইল কর্তৃক ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্রে বোমাবর্ষণ।

১৯৮২ : লেবাননে ইসরাইলি হামলা ও পিএলও-কে বাধ্য করা লেবানন ছেড়ে দিতে। অধিকৃত এলাকা ও জর্ডান নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে রিগ্যানের প্রস্তাব। আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যাখ্যান। ফেজে (মরক্কো) আরব লীগের সম্মেলনে আরব রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রস্তাব। শর্ত ইসরাইলকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইসরাইল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৮৭ : অধিকৃত ইসরাইলি এলাকায় 'ইন্তিফাদা বা ফিলিস্তিনি গণঅভ্যুত্থান শুরু।

১৯৮৮ : ১৫ নভেম্বর-পিএলও'র আলজিয়ার্স সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা।

১৯৯১ : মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন শুরু। ইসরাইল, মিসর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের অংশগ্রহণ। আরব রাষ্ট্রগুলো ও ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।

১৯৯২ : রোম, মরক্কো, ওয়াশিংটনে শান্তি আলোচনা অব্যাহত। ইসরাইলে নির্বাচনে লিকুদ পার্টির পরাজয় ও লেবার পার্টির সরকার গঠন। রবিন নতুন প্রধানমন্ত্রী। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।

১৯৯৩ : ওয়াশিংটনে নবম ও দশম রাউন্ড শান্তি আলোচনা শুরু। ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি। ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও পিএলও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৯৬ : স্বশাসিত ফিলিস্তিন এলাকায় প্রথম নির্বাচন। আরাফাতের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়।

১৯৯৮ : অক্টোবর ওয়াশিংটনের অদূরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের মধ্যে ওয়াইরিভার চুক্তি স্বাক্ষর হয় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে।

২০০১ : ইসরাইলের সাধারণ নির্বাচনে ডানপন্থি লিকুদ পার্টির বিজয়। এরিয়েল শ্যারন প্রধানমন্ত্রী, সিমন পেরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত।

২০০২ : ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব। ইসরাইলি নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ শুরু।

২০০৩ : ২০ মার্চ: ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাক আক্রমণ। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া অনিশ্চিত।

২০০৩ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ এপ্রিল ফিলিস্তিন ইসরাইল সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে প্রণীত একটি শান্তি পরিকল্পনা 'রোডম্যাপ' আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, এবং রাশিয়া সমন্বিতভাবে প্রস্তাবিত এ রোডম্যাপের খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদন করে।

২০০৪ : ২২ মার্চ ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হামাস নেতা শেখ ইয়াসিন নিহত। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত।

২০০৪ : ১৭ এপ্রিল: হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা আবদেল আজিজ রানতিসি ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত।

২০০৭ : হামাস-ফাতাহ্ দ্বন্দ্ব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হানিয়ার পদত্যাগ। নভেম্বরে অ্যানাপোলিসে ওলমার্ট-আব্বাস শীর্ষ সম্মেলন।

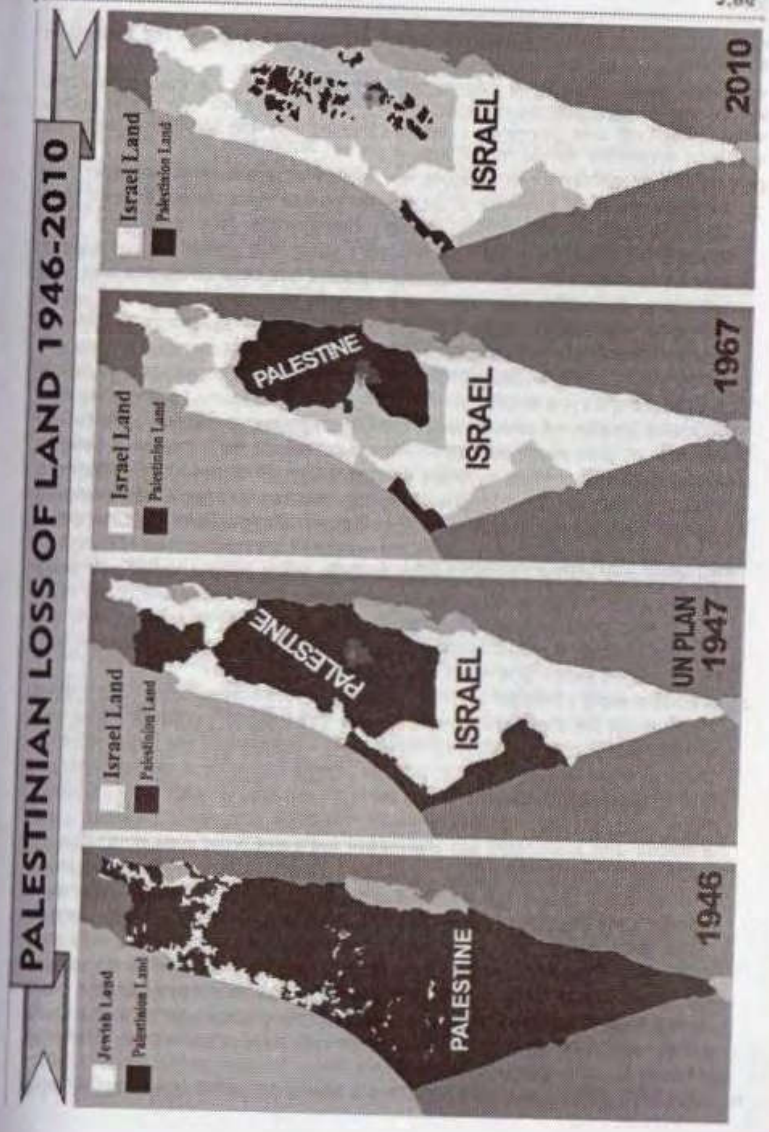
২০০৮ : বুশের ইসরাইল সফর।

২০১১ : ২৩ সেপ্টেম্বর : ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং যুক্তরাষ্ট্র তাতে (৪৩ বারের মতো) ভেটো দেয়।

২০১২ : ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ : ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে ডানপন্থি লিকুদ পার্টি এবং বেইতেনু পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেনজামিন নেতানিয়াহু পুনরায় প্রধানমন্ত্রী এবং সিমন পেরেজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

২০১৪ : ২ জুন তিন ইহুদি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার মধ্য দিয়ে বিবাদ শুরু হয়। ৮ জুলাই থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় Oparation Protective Age নামে সাংকেতিক আগ্রাসন শুরু করে এবং এ পর্যন্ত এ হামলায় প্রায় ২১০৬ জন মারা যায়। ইসরাইল এ হামলায় Dense Insert Metal Explosive (DIME) ব্যাবহার করে। এ DIME বোমাগুলো আকারে ছোট হলেও এর ধ্বংস ক্ষমতা মারাত্মক।



৩.৫ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের অন্তরায় (Obstacles to Solve the Palestine Problems)

প্যালেস্টাইন সমস্যা বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা। এ সমস্যা শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দিনের পর দিন শান্তি প্রক্রিয়া চললেও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র এখন সুদূরপরাহত। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে শান্তি প্রক্রিয়া ভেঙে যাচ্ছে বার বার। ফলে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

যে সকল বাধা প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের পথে অন্তরায় তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জেরুজালেমের কর্তৃত্ব :** ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেরুজালেম সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই মূলত আরব ইসরাইল দীর্ঘ ঐতিহাসিক সংকটের প্রেক্ষিত সৃষ্টি। ১৯৬৭ পর্যন্ত জেরুজালেম ছিল জর্ডানের অংশ। ১৯৬৭ সালের ৩য় আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জর্ডানের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করে নেয়। অতঃপর ইসরাইল তেল আবিব থেকে রাজধানী জেরুজালেম নিয়ে আসে। এদিকে ফিলিস্তিনরা জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী মনে করে। এমনকি ১৯৮৮ সালে তিউনিসিয়ায় যখন ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়। ফিলিস্তিন বরাবরই দাবী করে আসছে যে পূর্ব জেরুজালেম হবে নতুন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী। কিন্তু ইসরাইল এ দাবি কখনো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ক্যাম্পডেভিড শান্তি আলোচনায় ইসরাইল পূর্ব জেরুজালেমে যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। আসলে জেরুজালেম প্রশ্নটি ইসরাইল ও ফিলিস্তিন উভয়ের জন্যই খুবই স্পর্শকাতর। নগরীর মধ্যভাগে অবস্থিত টেম্পল অব দ্যা মাউন্ট ইহুদিদের নিকট অতি পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে শত সহস্র বছর ধরে। ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে থাকেন যে, এ টেম্পলে একদিন মুসা নবীর পুনরাবির্ভাব ঘটবে এবং সেদিন তাদের মুক্তি আসবে। পক্ষান্তরে, এ টেম্পল অব দ্যা মাউন্টই মুসলমানদের নিকট পবিত্র হারেম-উস-শরিফ নামে পরিচিত। এখানেই অবস্থিত মসজিদুল আকসা। আর এ মসজিদ হতে হযরত মোহাম্মদ (স.) বোরাকে সওয়ার হয়েছিলেন এবং আল্লাহর দিদার লাভের জন্য মেরাজ শরীফ গমন করেন। খ্রিস্টানদের নিকটও টেম্পল মাউন্ট পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত। তারা বিশ্বাস করে থাকেন যে যীশুখ্রিস্টকে এখানেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যাটি ধামাচাপা দিয়ে যেন তিন প্রকার সমাধান খুঁজে পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন।

২. **রাজনৈতিক গুরুত্ব :** ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেলের প্রাচুর্যের কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য এলাকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুয়েজখাল খননের ফলে জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচলে ফিলিস্তিন অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ অঞ্চল এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যোগসূত্র। এখান থেকে জল, স্থল ও আকাশ পথে স্বল্প দূরত্বে উক্ত তিন মহাদেশের সাথে যোগাযোগ করা যায়। এ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ, হরমুজ প্রণালি, বাব-আল-মান্দেব প্রণালি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পথ রয়েছে। তাই এ অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলো উদগ্রীব। এ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সংকট। মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বের ৭৬% জ্বালানি তেলের মজুদ এ কারণে তেলের সুষ্ঠু সরবরাহের ওপর বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর শিল্পপ্রধান দেশসমূহ মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য দেশসমূহ তেলের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট এবং মিত্ররাষ্ট্র ইসরাইলকে সর্বাত্মক সক্রিয় সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য অন্তরায় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ ভার বজায় থাকলে একদিকে যেমন বিশ্বের সকল এলাকা নিয়ন্ত্রণে অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপরও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। তাই এ বিশাল রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকায় বিশ্বের পরাশক্তিগুলো চায় মধ্যপ্রাচ্যে সব সময় অস্থিতিশীল রাখতে।

৩. **জর্ডান নদীর পানি :** ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানে বহুবিধ কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয়। ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের এ এলাকাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে প্রভাবাধীন রাখার রণ কৌশল হিসেবে অত্র এলাকার পানির উৎসকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। প্রথম থেকেই ইসরাইল জর্ডান নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। একই সাথে গোলান মালভূমির হারমানের দিকেও প্রভাব বিস্তার করে। কারণ জর্ডান ও লিটানি নদীর পানির উৎস এখানেই। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল পানি উৎসব এসকল এলাকা দখল করে নেয়। ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে ইসরাইল লিটানি নদীর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এভাবে ইসরাইল পশ্চিম তীরের জলাধারের ৮০% পানি নিয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে নতুন কূপ খননের ওপর। ইসরাইল তার প্রয়োজনীয় পানির অর্ধেক পায় ১৯৬৭ সালের দখল করা এলাকা থেকে। এ পানি পাওয়ার কারণে ইসরাইলের প্রতিবছর শত শত কোটি ডলার সাশ্রয় হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইল ও জর্ডান, জর্ডান নদীর পানি ভাগ করে নিবে। অথচ এ জর্ডান নদীর তীরে জেরিকো শহর। জেরিকো ফিলিস্তিনিদের স্বশাসিত এলাকা। জেরিকো শহরের পানির বিষয়ে ফিলিস্তিনকে জর্ডান-ইসরাইলের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার এ জর্ডান নদীর তীরে গোলান মালভূমি। সিরিয়ার গোলান এলাকা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল দখল করে নেয়। ভবিষ্যতে সিরিয়া-ইসরাইল শান্তিচুক্তির মাধ্যমে গোলান সিরিয়াকে ফেরত দেওয়া হতে পারে। এতে করে ফিলিস্তিন সংকটে পড়বে। কারণ সিরিয়া-ইসরাইলের মধ্যে গোলান সমস্যার সমাধান বা জর্ডান-ইসরাইলের মধ্যে পানি নিয়ে শান্তিচুক্তি হলেও ফিলিস্তিনিরা পানির সংকট থেকে মুক্তি পাবে না, যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় বা ফিলিস্তিনির স্বাধীনতায় বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

মনে রাখার Technique & Tips

- ৮ জুলাই, ২০১৪ থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় Oparation Protective Age নামে সাংকেতিক আগ্রাসন শুরু করে এবং এ পর্যন্ত এ হামলায় প্রায় ২১০৬ জন মারা যায়।
- ২৫ জুলাই, ২০১৪ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফরাসি আইনজীবী গিলস ডেভাস আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা দায়ের করেন।
- ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম - Iron Dome Anti Missile System.
- যীশু খ্রিষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন- প্যালেস্টাইনের বেথেম হেম শহরে।
- ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম - Israili Defence Force.
- ইয়াসির আরাফাত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন- ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮ সালে আলজিরিয়ে।
- স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়-আলজেরিয়া (১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮)।
- দক্ষিণ এশিয়ার ১ম দেশ হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়- আফগানিস্তান (১৬ নভেম্বর, ১৯৮৮)
- দক্ষিণ এশিয়ার ২য় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়- ১৬ নভেম্বর ১৯৮৮।

প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের বাধা সমূহ

- জেরুজালেমের কর্তৃত্ব।
- মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব।
- মার্কিন স্বার্থ।
- হামাস ও ইন্তিফাদা আন্দোলন।
- আরবদের অনৈক্য।
- লিকুদ পার্টি ও শ্যারনের বিরোধীতা।
- জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা।
- ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু সমস্যা।

৪. **মার্কিন স্বার্থ :** অতীতের মতো বর্তমানেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পথে মূল প্রতিবন্ধকতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের কারণে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসরাইলকে টিকিয়ে রাখা এবং সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মূলত এ অঞ্চলে একটি নিরাপত্তারক্ষী তৈরি করেছে যে সর্বদা মার্কিন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখবে। যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ তেল মজুদ থাকলেও দেশটি মধ্যপ্রাচ্য হতে তেল আমদানি করে। এদেশের অনেকগুলো কোম্পানি মধ্যপ্রাচ্যে তেল ব্যবসায় নিয়োজিত। খনিজ তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট। মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন অস্ত্র ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। প্যালেস্টাইন -

সমস্যা বিলম্বিত করার মাধ্যমে আরব-ইসরাইল বিরোধ অব্যাহত থাকলে তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলো ইসরাইলের মোকাবেলায় প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করবে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র একদিকে প্যালেস্টাইনে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা তৈরির লক্ষ্যে ইসরাইলকে সমরাস্ত্র সরবরাহ করছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অপণতান্ত্রিক দেশগুলোর নিকট অস্ত্র সরবরাহ করে উভয় পক্ষকে মুখোমুখি অবস্থানে রেখে মার্কিন স্বার্থ হাসিল করছে।

৫. **যুক্তরাষ্ট্র সরকারে ইহুদি লবীর প্রভাব :** যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে সরকারের ওপর সব সময় ইহুদি লবীর এক বিশাল প্রভাব বিরাজমান। মার্কিন প্রশাসন, সামরিক ও শিল্প ক্ষেত্রে ইহুদি লবীর প্রভাব বিস্তারের কারণে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বার বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত ক্লিনটন সরকারের শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বেশ আশার আলো জ্বালিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বুশ প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে কট্টর মার্কিন নীতির প্রতিফলন ঘটে। তার পেছনে রয়েছে বুশ প্রশাসনে প্রভাবশালী ইহুদি কর্তাদের প্রভাব।

৬. **হামাস ও ইন্তিফাদা আন্দোলন :** ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জঙ্গি গ্রুপের আন্দোলনকে ইন্তিফাদা আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা পালন করছে হামাস। হামাস কখনই ১৯৯৩ সালের শান্তিচুক্তি মেনে নেয় নি আবার উগ্রবাদী ইহুদীরা এ চুক্তি মেনে নেয় নি। ইসরাইল হামাসকে শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা মনে করে। এ কারণে মে, ২০১১ মিসরের মধ্যস্থতায় হামাস ও কাজাহির মধ্যে ঐক্যের চুক্তিকে মেনে নিতে পারে নি। ফিলিস্তিন মিসরের শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার এ হামাস এবং ইন্তিফাদা আন্দোলনকে দায়ী করছে। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে অস্ত্র বিরতির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বহু আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কোনো সফলতা আসে নি। তার পেছনেও এ ইন্তিফাদা দায়ী করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে নিরপরাধ ফিলিস্তিন নিহত হলে মার্কিন প্রশাসন চুপ থাকে, অপরদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনরত জঙ্গি হামাস নেতারা তাদের জনগণের হত্যার প্রতিশোধ নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে হামাসের কারণেই নাকি বার বার শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৭. **আরবদের অনৈক্য :** ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান বাধা হিসেবে আবদের অনৈক্যকে দায়ী করা হয়। বার বার আরব, ইসরাইল যুদ্ধ হলেও কখনই আরবগণ ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় নি। এমনকি সর্বশেষ ইরাক যুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনে আরব রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হতে ব্যর্থ হয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে একে অন্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারছে না। PLO এর আন্তঃবিরোধ স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিন সংগঠনগুলোর অনৈক্যের কারণে ইসরাইলবিরোধী কঠোর আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে জাতিগত দাঙ্গা, শিয়া-সুন্নি বিরোধ, উপজাতিগত সমস্যা, ধর্মীয় উগ্রপন্থি সংগঠন, নেতৃত্বের সংকট, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব যা মধ্যপ্রাচ্যকে কখনই একটি প্লাটফর্ম দাড় করাতে বাধা দিয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি। সর্বপরি নিজেদের স্বার্থে মার্কিন তোষণনীতি আরবদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে নি। আর এর ফলে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা আন্দোলন তেমনি শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে পারে নি।

৮. **সীমান্ত সমস্যা :** ১৯৪৮ সালের পর থেকে ইসরাইল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইল তার ভূখণ্ড প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণ করার পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে ফলে এখনও ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা সীমানা নির্দিষ্ট করা হয় নি। ফিলিস্তিন ইসরাইলের সীমান্ত সমস্যা স্বাধীন ফিলিস্তিন গড়ার ক্ষেত্রে আর এক অন্তরায়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব উথাপন করা হয়। অথচ ফিলিস্তিনিদের সীমানা এখনও চিহ্নিত করা হয় নি। ২০১১-এর ১৯ মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সীমানাকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমানা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২০০২ সালে সৌদি আরব আরবলীগের সমর্থন নিয়ে যে প্রস্তাব রেখেছিল তাতে বলা হয় ইসরাইল ১৯৬৭ সালের সীমান্তরেখায় প্রত্যাবর্তন করলে আরব বিশ্ব

ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেবে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ২০০৮ সালের ১০ জানুয়ারি এক বক্তৃতায় বলেন, ১৯৪৯ সালের যুদ্ধ বিরতি রেখা ইসরাইল-ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমান্ত বলে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। জর্জ বুশের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৭ সালের জুন মাসের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সীমান্ত। আন্তর্জাতিক সকল প্রস্তাবেই ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সীমান্ত রেখাকে ফিলিস্তিন-ইসরাইল সীমান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১১ সালের ১৯ মে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বারাক ওবামার প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে সংঘটিত ৩য় আরব ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরাইল পশ্চিমতীর,গাজা উপত্যকা, গোলান মালভূমি, সিনাই উপত্যকা এবং পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। ওবামার প্রস্তাব মেনে নিলে ইসরাইলকে এ সমস্ত এলাকা ছেড়ে দিতে হবে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতা নিয়াহু যদিও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন ইসরাইল এ প্রস্তাব মেনে নিলে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ইসরায়েলের একগুয়েমি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধীরে চল নীতি সীমান্ত সমস্যা সমাধানে প্রধান বাধা যা দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনে এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯. **লিকুদ পার্টি ও শ্যারন :** মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে শান্তি প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে ইসরাইলের ডানপন্থি রাজনৈতিক দল লিকুদ পার্টি এবং তাদের নেতা এরিয়েল শ্যারন। ১৯৮২ সালে তৎকালীন ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের মদদে ইসরাইলি সৈন্যবাহিনী বৈরুতের মারবা ও শাতিলা নামক দুটি ফিলিস্তিন শিবিরে পাশবিকভাবে গণহত্যা চালিয়ে প্রায় ৮০০ নিরপরাধ ফিলিস্তিনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২০০১ সালের নির্বাচনে এরিয়েল শ্যারনের লিকুদ পার্টি বিজয়ী হলে শ্যারন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে মধ্যপ্রাচ্যে আবার সহিংসতা শুরু হয়। ২০০২ সালে শ্যারন নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির নামে ফিলিস্তিনের ভূমি অধিগ্রহণের নীল নকশা হাতে নিয়েছে। ২০০৪ সালের ২২ মার্চ হামাস নেতা শেখ ইয়াসিনকে এবং ১৭ এপ্রিল, ২০০৪ আবদেল আজিজ রানতিসিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে এবং এর সঙ্গে গত ২২ বছরে হত্যা করেছে অসংখ্য ফিলিস্তিন নাগরিককে। শ্যারন ফিলিস্তিন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ইয়াসির আরাফাতকেও হত্যার হুমকি দিয়েছিল। শ্যারনের দীর্ঘদিনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে তিনি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন

মনে রাখার Technique & Tips

PLO

- PLO-এরপূর্ণরূপ-Palestine Liberation Organization.
- PLO-গঠিত হয়-১৯৬৪ সালে (আরব লীগের সমর্থনে)।
- প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন-আহমেদ সুকেরী (১৯৬৪)।
- ইয়াসির আরাফাত চেয়ারম্যান হন-১৯৬৯ (৩য় চেয়ারম্যান)।
- সদর দপ্তর-তিউনিসিয়া।

PNA

- PNA-এর পূর্ণরূপ-Palestinian National Authority.
- PNA- প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৯৪ সনে।
- PNA-এর চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল-৪ বছর।
- PNA-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন-সরাসরি জনগণের ভোটে।
- ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়-রামাল্লাহ।
- PNA-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট-মাহমুদ আব্বাস (১৫ জানুয়ারি ২০০৫-বর্তমান)।
- মাহমুদ আব্বাসের ডাক নাম-আবু মাজেন।

ফাতাহ

- ফাতাহ শব্দের অর্থ-বিজয়।
- প্রতিষ্ঠা-১৯৫৯ সালের ১০ অক্টোবর।
- প্রতিষ্ঠাতা-ইয়াসির আরাফাত।
- বর্তমান প্রধান-প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

হামাস

- 'হামাস' শব্দের অর্থ-সঙ্কীর্ণতা ও উন্মাদনা।
- প্রতিষ্ঠা-১৯৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
- প্রতিষ্ঠাতা-শেখ আহমদ ইয়াসিন।
- বর্তমান প্রধান-সিরিয়ায় নির্বাসিত নেতা খালেদ মেশাল।
- পূর্ণনাম-'হরকাতুল মুকাওয়ামা আল ইসলামিয়া'

ফিলিস্তিন স্বাধীনতা অর্জনের সকল পথ বন্ধ করে রাখবেন।

১০. **জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা :** ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় বিগত দিনের জাতিসংঘের ভূমিকা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছিল ১৯৪৮ সালে ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের পর। কিন্তু শান্তিরক্ষকের ভূমিকা লাভ করেছে ১৯৯১ সালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ অবসানের পর। ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে একথা নিশ্চিত বলা যায়। ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের পরিবর্তে বৃহৎ শক্তির তাবেদার নির্দেশ বা মধ্যস্থতাই প্রাধান্য পাচ্ছে। ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ পরিণত হয়েছে একটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগ ও প্রতিহত করতে পারে নি।

১১. **ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু সমস্যা :** নরওয়ের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াগলান্দ কর্তৃক শান্তি প্রস্তাবের মতে, ইসরাইলে ফিলিস্তিন শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু বিষয় সমস্যা সমাধানে ইয়াসির আরাফাতের দাবি। তিনি মনে করেন বিশ্বের প্রায় ১৫ লক্ষ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুকে ইসরাইলে পুনর্বাসনের দাবিতে পিএলও যেভাবে অনড় রয়েছে সেটাকে তিনি শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন। কারণ ইসরাইল বরাবরই এ দাবির বিরোধিতা করেছে। ইসরাইল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মেনে নেবে না। ইয়াসির আরাফাতের মতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে উদ্বাস্তু সমস্যাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে ইসরাইল উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের বিরোধি।

১২. **অধিকৃত ভূমিতে ইহুদি বসতি :** ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদ নীতি তাকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখলে উন্মত্ততা জুগিয়েছে। বিভিন্ন সময় নানা অযুহাত বা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে নেয়। পরবর্তীতে এ সকল অধিকৃত ভূমিতে ইসরাইল বসতি গড়ে তোলে। জাতিসংঘের ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইসরাইল দখলকৃত ঐসব এলাকা থেকে মূল আদিবাসী ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন করে সেখানে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি গড়ে তুলেছে। ২০১০ সালে বারাক ওবামার আহবানে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল শান্তি আলোচনা শুরু করে। ইসরাইলকে ইহুদি বসতি বন্ধ করার আহবান জানানো সত্ত্বেও আলোচনার শুরুতেই বসতি গড়ে তোলা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যা ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়ায় বড় বাধা। ফলে শান্তি আলোচনা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে হারিয়ে ফেলে। ফিলিস্তিনির স্বাধীনতার পূর্বশর্তই হচ্ছে ফিলিস্তিনির দখলকৃত ভূমি ইসরাইলকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে বসতি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

৩.৬ রোডম্যাপ পরিকল্পনা (Roadmap Plan) :

রোডম্যাপে ২০০৩ সালের ১ মে থেকে ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে কোনো পথে শান্তি আসবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পক্ষ বিবদমান পক্ষদ্বয়ের ভূমিকা কী হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। রোডম্যাপ পরিকল্পনা তিন ধাপে বিভক্ত :

প্রথম ধাপ : প্রথম ধাপের মেয়াদকাল ১ থেকে ৩১ মে, ২০০৩। এতে বলা হয়েছে এ সময়ের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রথমে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নিঃশর্ত ও একতরফা ঘোষণা দিতে হবে এবং সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে 'সন্ত্রাসী কাঠামো' ভেঙে দিয়ে সকল নিরাপত্তা সংগঠন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। সেই সাথে গণতন্ত্রের বিকাশে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। অন্যদিকে ইসরাইলকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ ঘোষণা দিতে হবে। ইহুদি স্থাপন বন্ধ করতে হবে এবং ২০০১ সালের মার্চের পর ফিলিস্তিনি এলাকায় যেসব ইহুদি স্থাপনা ও বসতি স্থাপিত হয়েছে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগ্রামীদের বাড়িঘর ধ্বংস করা স্থগিত রাখতে হবে এবং ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা যা জবর দখল করা হয়েছে সেখান থেকে ইহুদি বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপের মেয়াদকাল ২০০৩ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইসরাইলকে ফিলিস্তিনিদের জন্য সর্বাধিক এলাকা ছেড়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে। ফিলিস্তিনিদের সংবিধান অনুমোদন এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমানা প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এ সম্মেলনেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হবে। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাতিসংঘ ও রাশিয়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির বিষয়ে উদ্যোগ নেবে।



প্রয়াসীন তিনি'র মোকাবী হাউজে অনেক দুঃখ স্বাক্ষরের পর ইজরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইয়াসাকে রাবিন ও ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত করমর্দন করছেন। মাঝখানে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে দেখা যাচ্ছে

তৃতীয় ধাপ : তৃতীয় বা চূড়ান্ত ধাপের মেয়াদ ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০০৫ সাল। ২০০৫ সালে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমানা জেরুজালেম, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং ইসরাইল ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত করা হবে।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিদের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ৭ মার্চ, ২০০৩ মাহমুদ আব্বাসকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনি ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার (PLO) কার্যনির্বাহী কমিটির মহাসচিব এবং ফাতাহ আন্দোলনের একজন নেতা মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিন এবং ইসরাইল উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার শান্তি আলোচনা আশার আলো তৈরি হয়।

৩.৭ ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়া

১৯৬৭ সালের পর থেকে উল্লেখযোগ্য শান্তি প্রস্তাবগুলো হচ্ছে :

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং প্রস্তাব
- ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড প্রস্তাব
- ১৯৯১ সালের মাদ্রিদ সম্মেলন
- ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি
- ২০০০ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি
- ২০০১ সালের টাবা
- ২০০২ সালের সউদি পরিকল্পনা
- ২০০৩ সালের রোডম্যাপ ও
- ২০০৩ সালের জেনেভা চুক্তি।

এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ও ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি সর্বাপেক্ষা আলোড়ন ও আশা জাগিয়েছিল তৎকালীন প্রেক্ষাপটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব সমাধান করতে পারে নি।

৩.৮ এক নজরে ফিলিস্তিনের গেরিলা সংগঠন

গেরিলা সংগঠন	পূর্ণরূপ	প্রতিষ্ঠা	দেশ
এএনও (ANO)	Abu Nidal Organization	১৯৭৪	ফিলিস্তিন
এএএমবি (AAMB)	Al-AQsa Martyrs Brigade	২০০০	
ব্লাক সেপ্টেম্বর	Black September	সেপ্টেম্বর ১৯৭০	ফিলিস্তিন
পিএলএফ (PLF)	Palestine Liberation Front	১৯৬১	ফিলিস্তিন
পিআইজে (PIJ)	Palestinian Islamic Jihad	১৯৭৯/৮০	ফিলিস্তিন
পিএফএলএফ (PFLF)	Popular Front for the Liberation of Palestine	১৯৬৭	ফিলিস্তিন

৩.৯ কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইস্ট (Quartat on the Middle East)

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারী গ্রুপ-এর নাম কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইস্ট (Quartet on the Middle East)। ২০০২ সালে স্পেনের মাদ্রিদে গ্রুপ আত্মপ্রকাশ বা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইষ্ট ডিপ্লোমেটিক কোয়ার্টেট (Diplomatic Quartet) বা মাদ্রিদ কোয়ার্টেট (Madrid Quartet) নামেও পরিচিত। গ্রুপের সদস্য হলো ৪টি দেশ ও সংস্থা। এগুলো হচ্ছে-জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কোয়ার্টেট গ্রুপের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন ২০০৮ সালে। ২০১০ সালের মার্চে দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেমে নতুন বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিলে ১৯ মার্চ ২০১০ রাশিয়ার মস্কোতে কোয়ার্টেটের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইসরাইলের বসতি স্থাপনের নিন্দা এবং ফিলিস্তিন ও ইসরাইলকে শান্তি আলোচনায় বসার আহবান জানানো হয়।

৩.১০ ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে প্রণীত রোডম্যাপের গুরুত্ব (Importent of Roadmap)

বিগত ৬৫ বছর ধরে হত্যা, ধ্বংস এবং নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে চলছে ইসরাইল ফিলিস্তিন সম্পর্ক। বিগত দিনে অনেকবার শান্তিপ্রক্রিয়া স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা বাস্তবায়ন হয় নি। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের জন্য 'রোডম্যাপ' এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ দিনের পর দিন নির্যাতিত নিপৃহীত ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এখন সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আর সেই আশায় ফিলিস্তিন জনগণ ও বিশ্ব জনমত তাকিয়ে ছিল বহু প্রতীক্ষিত রোডম্যাপ পরিকল্পনার দিকে। কিন্তু ইসরাইলের একের পর এক শান্তি প্রক্রিয়া বিরোধি কর্মকাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলি নীতির কারণে রোডম্যাপ পরিকল্পনা তার গুরুত্ব হারিয়েছে।

৩.১২ পর্যবেক্ষক ভূখণ্ড থেকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হলো ফিলিস্তিন,স্বাধীনতা কতদূর ?

প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও শুভবোধের জয় হয়েছে জাতিসংঘের। ২৯ নভেম্বর ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনকে বাধ্যতামূলকভাবে বিভক্ত করার ঠিক ৬৫ বছরের মাথায় এ ঘটনা ঘটল। উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন জাতিসংঘে "অ-সদস্য পর্যবেক্ষক সত্তা"র মর্যাদা পেত; এবার তা "অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র"-এর মর্যাদায় উন্নীত হলো। এতদিন পর্যন্ত শুধু ভ্যাটিকানের এ মর্যাদা ছিল।

১. **পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা :** ফিলিস্তিন স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির আরো এক ধাপ এগনোর জন্য ২৯ নভেম্বর, ২০১২ সাল দিনটিতে এবার পর্যবেক্ষক অ-সদস্য রাষ্ট্রে উন্নীত করা উচিত ফিলিস্তিনকে- এমন প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্যভুক্ত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি দেশ। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে অভাবিত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ১৩৮-৯ ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাব পাস হয়েছে ফিলিস্তিনের পক্ষে। ভোটদানে বিরত থেকেছে ৪১টি দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, ব্রিটেন, জার্মানিসহ মোট ৯টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়।

২. **চ্যালেঞ্জ :** ঘটনাক্রমে জাতিসংঘে ভোটাভুটি হয়েছে হামাস-ইসরাইল সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির কয়েক দিনের মাথায়। তবে পরিস্থিতি বলছে- একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের বিরোধিতা, অন্য দিকে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বড় চ্যালেঞ্জ হয়েই থাকবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা পাওয়ার পথে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হামাস কিন্তু ভোটাভুটির ফল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে রাজি হয় নি। ফিলিস্তিন ন্যাশনাল অথরিটির প্রেসিডেন্ট ও ফাতাহ গোষ্ঠীর প্রধান মাহমুদ আব্বাস তখন উপস্থিত সেখানে। ইলেক্ট্রনিক স্কোরবোর্ডে ভোটের ফল ঘোষণা হতেই আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিনিধির সামনে তোলা হয়েছে জাতিসংঘের পতাকা। আব্বাস বলেছেন,'জাতিসংঘের সাধারণ সভা আজ ফিলিস্তিনের ব্যর্থ সার্টিফিকেটে সই দিল। এ মুহূর্তটা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে চলে আসা দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান খোঁজার শেষ সুযোগ;

৩. **সম্ভাবনা :** জাতিসংঘের রায় পক্ষে গেলেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা প্রাপ্তির রাস্তাটা সহজ হবে না বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এ দিনের ভোটের অর্থ-১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে পূর্ব জেরুজালেম, গাজা স্ট্রিপ ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের যে যে অংশ ইসরাইল দখল করেছিল, তা এবার চলে আসবে ফিলিস্তিনের দখলে সবচেয়ে বড় কথা- এবার থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে ফিলিস্তিন। যুদ্ধে জিতে যে জমি দখল করে নিয়েছিল ইসরাইল, সেই ভূ-খণ্ডে 'অবৈধ নির্মাণ' বা যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন আবেদন করতে পারবে আন্তর্জাতিক আদালতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে এখনও অনেক দেরি। কারণ, তার সম্ভবত শান্তি মধ্যস্থতায় যেতে হবে ইসরাইলের সঙ্গে। ফিলিস্তিনের চিরবৈরী প্রতিবেশী ইহুদি রাষ্ট্রটি আগেই ঘোষণা করেছে ইসরাইল-ফিলিস্তিনের চিরন্তন সমস্যার যা সমাধান

মনে রাখার Technique & Tips

ইয়াসির আরাফাত

- ১৯২৯ ২৪ আগস্ট : কায়রো, মিসরে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৪৭: জেরুজালেমে মুফতিদের পক্ষে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।
- ১৯৪৮: ফিলিস্তিন ছেড়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হন। এ সময় ইসরাইলের জন্ম হয়।
- ১৯৫২: ফিলিস্তিন ইউনিয়নে যোগ দেন। পরবর্তীতে সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৬: মিশরের সামরিক বাহিনীর সুয়েজ খাল কর্মসূচীতে যোগ দেন। পরবর্তীতে কুয়েতে গিয়ে নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
- ১৯৫৭: আল-ফাতাহ গঠিত হয়। পরবর্তীতে আল-ফাতাহ, পিএলও-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।
- ১৯৬৪: আরব লীগের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (Palestine Liberation Organization-PLO) গঠিত। এ বছরই Palestine Liberation Army গঠিত হয়।
- ১৯৬৯: পিএলও-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
- ১৯৭৪: জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।
- ১৯৮২: ইসরাইলের আক্রমণের কারণে লেবানন থেকে পিএলও সরিয়ে নেয়া হয়। তিউনিশিয়াতে নতুন হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৮ ১৫ নভেম্বর: PLO-এর জাতীয় পরিষদ আলজেরিয়ার আলজিয়ার্সে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।
- ১৯৯১: মাদ্রিদে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়।
- ১৯৯৩: অসলোর আলোচনা শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে আশার আলো জাগিয়ে তোলে। ঐ বছর আরাফাত ইসরাইলের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেন।
- ১৯৯৪: মে মাসে ইসরাইলি সৈন্য জেরিকো গ্রাম থেকে প্রত্যাহৃত হয়। জুলাইয়ে আরাফাত দেশে ফিরে আসেন।
- ১৯৯৪: শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
- ১৯৯৬: ২০ জানুয়ারি-৮৮% ভোটে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
- ২০০২ ১৮ জানুয়ারি: পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরে গৃহবন্দি হন।
- ২০০৪ ১১ নভেম্বর : ইয়াসির আরাফাত(ডাক নাম-আবু আমর) মৃত্যুবরণ করেন।
- ইয়াসির আরাফাতকে সমাহিত করা হয় রামাল্লার পিএলও সদর দপ্তরের মুকাতায়।

হতে পারত, জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত তা শুধু দেরিই করবে।

৪. **ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া :** প্রত্যাশিতভাবেই জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছে ইসরাইল। এ ভোটাভুটিকে 'অর্থহীন' বলে আখ্যা দিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আব্বাসের বক্তব্যকে তিনি নস্যাৎ করেছেন, 'নোংরা, অপমানজনক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার' বলে। নেতানিয়াহুর কথায়, 'জাতিসংঘে যে প্রস্তাবনা গৃহিত হয়েছে, তার জন্য বাস্তবে কিছু বদলাবে না। এ সিদ্ধান্তের ফলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতো এগোবে না, বরং পিছিয়ে যাবে অনেকটা।

৫. **যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া :** ইসরাইলের সুরে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রও। হিলারি ক্লিনটন এ ভোটাভুটিকে বর্ণনা করেছেন 'দুর্ভাগ্যজনক ও বাস্তবতা বিরোধী' হিসেবে। তার কথায়, 'আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে, একমাত্র মধ্যস্থতার মাধ্যমেই শান্তির লক্ষ্যে পৌছতে পারবে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন। সেই শান্তি দুই দেশের প্রাপ্য যা হওয়া উচিত, তা-ই হলো-একদিকে সার্বভৌম, স্বাধীন ফিলিস্তিন এবং অন্যদিকে ইহুদি অধ্যুষিত গণতান্ত্রিক ইসরাইলের শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত সহাবস্থান। কিন্তু ভোটাভুটিতে গৃহীত এ সিদ্ধান্ত তা করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

৬. **অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া :** বাইরে ইসরাইল আমেরিকার চড়া বিরোধিতাই নয়, ঘরেও সম্ভবত যথেষ্ট বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে মাহমুদ আব্বাসকে। ২০০৪ সালে ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর কট্টরপন্থী হামাস এবং মধ্যপন্থি ফাতাহ এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিরা। তারপর থেকে ক্রমশ শক্তি বেড়েছে হামাসের, আর দুর্বলতর হয়েছে আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ছাড়া ইসরাইল-ফিলিস্তিন বিতর্কিত ভূখণ্ডের প্রায় কোনো অংশই এখন আব্বাসের দখল নেই। বরং গাজা স্ট্রিপের মতো শরণার্থী-অধ্যুষিত ঘন জনবসতিপূর্ণ ভূখণ্ডের দখল নিয়ে রেখেছে হামাস। বার বার আগ্রাসন দেখানো সত্ত্বেও গাজার দখল শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাতে নিতে পারে নি ইসরাইল। অক্টোবর ২০১২ সালে দুই পক্ষের হিংসা বন্ধ হয়েছে আট দিন পর যুদ্ধবিরতিতে।

৭. **জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের প্রতিক্রিয়া :** এদিকে কৌশলগতভাবে স্পর্শকাতর পূর্ব জেরুজালেমের কাছে ইসরাইলের বসতি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তকে শান্তির জন্য 'মারাত্মক আঘাত' বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন। তিনি বলেন, এর ফলে পূর্ব জেরুজালেমের ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। প্রসঙ্গত, জাতিসংঘে ফিলিস্তিন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার পর ইসরাইল তিন হাজার নতুন বসতি স্থাপনের প্রতিশোধমূলক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

৩.১৩ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ (UN Visitor Elected)

১৯৪৭ সালে সাধারণ পরিষদের ৩২৩ নং প্রস্তাব অনুযায়ী পিএলও জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘ পিএলও-এর পরিবর্তে ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়। ১৯৪৭ সালে সাধারণ পরিষদের গৃহীত ১৮১ নং প্রস্তাবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলেও ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল আপত্তি ও অনীহা এ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে প্রধান অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

৩.১৭ এক নজরে গাজায় ইসরাইলি বর্বর হামলা

ভৌগোলিকভাবে ইসরাইল ও মিসরের মাঝখানে অবস্থিত গাজা উপত্যকা ২০০৬ সাল থেকে কার্যত অবরুদ্ধ। এ সময়কালে ইসরাইল গাজায় এবার নিয়ে তিনবার পূর্ণমাত্রায় সামরিক আগ্রাসন ও গণহত্যা চালায়। অভিযানগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান।

৩.১৮ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা প্রশ্নে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রবণতা

অতীতে ও দেখা গিয়েছে যে, ফিলিস্তিন সংকট মোকাবিলার জন্য যখনই বহুপাক্ষিক আলোচনার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই বিবিধ অজুহাতে তা আটকে দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে ১৯৪০ সালের দিকে। সেই সময় আন্তর্জাতিক মহল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের প্রতি জোর সমর্থনও জানিয়েছিল। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ ১৯৪৭ সালে

অনুমোদিত ১৮১ নম্বর প্রস্তাবি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের আবাসভূমি দুই ভাগ করে শতকরা ৫০ ভাগ ভূমির ওপর স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বাকি ৫০ ভাগ দেওয়া হয়েছে ইসরাইলকে। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে অনুমোদিত ১৯৪ নম্বর প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের পাশাপাশি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদেরও তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়ার কথাও বলা

সময়কাল	নাম	মৃত্যুর খতিয়ান
২৭.১২.২০০৯-১৮.০১.২০০৯	অপারেশন কাস্ট লিড	ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয় ১৩৯১ জন, যার মধ্যে ৭৫৯ জনই বেসামরিক। নিহতের মধ্যে ৩৪৪জন শিশু ও ১১০ জন নারী। ইসরাইলের নিহত ৯জন সেনা সদস্য ৬জন ও বেসামরিক ৩জন।
১৪.১১.২০১২-২১.১১.২০১২	অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স	১৬৭ জন ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়, যার মধ্যে ৮৭ জনই বেসামরিক নাগরিক। ইসরাইলের ক্ষেত্রে ২ জন সেনা ও ৪ জন বেসামরিক নাগরিকসহ মাত্র ৬ জন নিহত হয়।
০৮.০৭.২০১৪-বর্তমান (অক্টোবর পর্যন্ত)	অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ	২১০৬ জন ফিলিস্তিনি মারা যায়, যার ৮০ শতাংশই বেসামরিক নাগরিক। অন্যদিকে ইসরাইলে ৬৪ জন সেনা সদস্য, ৩ জন বেসামরিক ও ১ জন থাই কর্মী নিহত হয়।

হয়েছে। কিন্তু নানা জটিলতার ফিলিস্তিনিরা বিগত সাত দশকে স্বাধীন দেশ গঠন করতে পারে নি, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা স্বদেশভূমিতেও ফিরে আসতে পারে নি।

তবে সাম্প্রতিকালে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের নতুন বার্তাবরণ তৈরি হয়েছে। ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে ব্রিটেনের হাউস অপ কমন্সও। ছাড়াও সম্প্রতি রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে বেলজিয়াম। দেখা যাচ্ছে,ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ক্রমশ, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র সত্তার ওপর আনীত প্রস্তাবটি এবার নাকচ হলেও তা অন্য ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩.১৯ বিভিন্ন পার্লামেন্টের স্বীকৃতি

ফ্রান্স: ডিসেম্বর ২০১৪ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার্ন্সের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের সদস্যরা। প্রস্তাবটির পক্ষে ৩৩৯ ও বিপক্ষে ১৫১ ভোট পড়ে।

আয়ারল্যান্ড: ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ আয়ার্ল্যান্ডের সংসদের উচ্চকক্ষ সিনেটে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া সংক্রান্ত একটি নিঃশর্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কোনো বিরোধিতা ছাড়াই তা পাস হয়। সিনেট সদস্যরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের প্রতি দাবি জানান।

পর্তুগাল: ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্তুগালের পার্লামেন্টে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পর্তুগাল সরকারের প্রতি আহবান জানান। পরবর্তীতে পার্লামেন্টের এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নীতিগতভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে ভোট দেয়। ফ"ান্সের পূর্বাঞ্চলের স্ট্রসবার্গে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় পার্লামেমেন্টের অধিবেশনে প্রস্তাব পক্ষে ৪৯৮ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৮ ভোট পড়ে। ১১১ জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।

সুইডেন: ৩০ অক্টোবর ২০১৪ ফিলিস্তিনকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় সুইডেন। প্রথম ইউ ভুক্ত দেশ হিসেবে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দিল সুইডেন।

ইইউ-র অন্যান্য দেশ: ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য দেশগুলো স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, চেক রিপাবলিক, হাঙ্গেরি, মাল্টা, পোল্যান্ড ও রোমানিয়া।

স্পেন: ১৮ নভেম্বর ২০১৪ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে একটি প্রস্তাব স্পেনের পার্লামেন্টের পাস হয়।

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন:

৩ এপ্রিল ২০১৪ জাতিসংঘের ১৫টি চুক্তি ও কনভেনশনে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করে ফিলিস্তিন্ এর আগে ১ এপ্রিল ২০১৪ জাতিসংঘের ১৫টি চুক্তি ও কনভেনশনে যোগ দেযার জন্য সংস্থাটির কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেয় ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষ। অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরে নিজ সদর দফতরে এক বৈঠকের পর ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মাহমুদ আব্বাস

৩.২০ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি)

ফিলিস্তিন কর্তৃপ ১ এপ্রিল ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে আ"-র্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদের জন্য রোম সনদে স্বার করার ঠিক ৯০ দিন পর ১ এপ্রিল ২০১৫ নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে রুদ্ধদ্বার এক অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিন আইসিসি'র সাথে যুক্ত হয়। ফিলিস্তিন যেভাবে সুবিধা পেতে পারে

গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য বিশ্বের একমাত্র স্থায়ী আদালত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। সনদ অনুযায়ী আইসিসি'র কার্যালয়ের কৌঙলি সদস্যরাষ্ট্রের বাইরে যদি কোনো অভিযোগের তদন্ত শুরু করতে চান, সেজন্য অবশ্যই বিচারিক অনুমোদন প্রয়োজন। আইসিসি'র সদস্য হওয়ায় এখন কৌসুলির কাছে অভিযোগের বর্ণনা দিতে পারবে ফিলিস্তিন। সে ক্ষেত্রে কৌসলি বিচারিক অনুমোদন ছাড়াই আনুষ্ঠানিক তদন্তের পদক্ষেপ নিতে পারবেন। শুধু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্যরাষ্ট্রের ক্রে তদন্ত শুরু করার জন্য বিচারিক অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

ফিলিস্তিনের অভিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের কোনো তদন্ত যদি শুরু হয় এবং তদন্তে ইসরায়েল বা ফিলিস্তিনের কোন ব্যক্তি গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আইসিস তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে সংশি-ষ্ট রাষ্ট্রকে অনুরোধ করতে পারে। তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা সহজ হবে না। এর আগে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে দুই দফায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা সত্ত্বেও সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরকে বিচারের আওতায় আনতে পারেনি আইসিসি।

বসতি স্থাপন অপরাধ: রোম সনদের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফিসিস্তিনি ভূখণ্ড অঞ্চলে ইসরায়েলের বসতি স্থাপন-সংক্রান্ত কর্মকান্ড আইসসি তদন্তের আওতায় আসতে পারে। ঐ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো অঞ্চল দখল করে বসতি স্থাপনের বিষয়টি যুদ্ধাপরাধের সমতুল অপরাধ।

অনুশীলনী (Exercise)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

(Brief Questions & Answer)

০১. ফিলিস্তিনের সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রীয় নাম কী ?
উত্তর : State of Palestine.

০২. ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থা (PLO) গঠিত হয় কবে?

উত্তর : ২৮ মে ১৯৬৪।

০৩. ইয়াসির আরাফাতের দলের নাম কী ?
উত্তর : আল ফাতাহ (অর্থ: বিজয়)।

০৪. পিএল ও এবং ইসরাইলের মধ্যে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন স্বায়ত্বশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে ?
উত্তর : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ (যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে)।

০৫. PLO এবং ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় কবে ?
উত্তর : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

০৬. হামাস কী?
উত্তর : ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সংগঠন।

০৭. হামাস কবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কে প্রতিষ্ঠাতা ?
উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৭। শেখ আহমদ ইয়াসিন (ডাক নাম আবু আমর)।

০৮. ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত মারা যান কবে?
উত্তর : ১১ নভেম্বর ২০০৪ (প্যারিসের পার্সি মিলিটারি ট্রেনিং হাসপাতালে)।

০৯. আনরোয়া (UN RWA) কী?
উত্তর : ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থা।

১০. পিএলও'র সদর দপ্তর কোথায় ?
উত্তর : রামাল-া, ফিলিস্তিন।

১১. ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দল 'ফাতাহ' এর বর্তমান প্রধান কে?
উত্তর : মাহমুদ আব্বাস।

১২. ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত গোলান মালভূমি কোন দেশের?
উত্তর : সিরিয়া।

১৩. ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা কে?
উত্তর : হঙ্গেরীতে জন্ম নেয়া সাংবাদিক নট্যকার থিওডোর হার্জেল। ১৮৯৬ সালে তার প্রকাশিত গ্রহ Dear Judenstatit (ইহুদি রাষ্ট্র)-এ তিনি স্বপ্ন দেখেন।

১৪. ইসরাইলের সেনাবাহিনী বিশ্বে কততম?
উত্তর : ৬ষ্ঠতম রাষ্ট্র।

১৫. ৭ জুলাই, ২০১৪ সালে ফিলিস্তিনি ভূমিতে চালিত অভিযানের নাম কী?
উত্তর : Oparation Protective Age.

১৬. ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে কে মামলা দায়ের করেন?
উত্তর : ২৫ জুলাই, ২০১৪ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফরাসি আইনজীবী গিলস ডেভাস আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা দায়ের করেন।

১৭. সম্প্রতি ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য মধ্যস্থতাকারী কে?
উত্তর : মিসর।

১৮. ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম কী?
উত্তর : Iron Dome Anti Missile System.

১৯. হামাস কী ধরনের সংস্থা?
উত্তর : সুন্নী মুসলিম প্রধান সংস্থা।

২০. হামাস কবে গাজা স্ট্রিপের ডি ফ্যাক্টো প্রশাসকের ভূমিকা নেয়?
উত্তর : ২০০৬ সালের নির্বাচনে হামাসের জয় লাভের পর।

২১. যীশু খ্রিষ্ট কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
উত্তর : প্যালেস্টাইনের বেথেম হেম শহরে।

২২. হামাসের যুদ্ধ কৌশল কী?
উত্তর : হামাস যোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন।

২৩. Total War কী?

http://thejobstudy.com Go to Contents

উত্তর : বিমান, নৌ এবং সেনাবাহিনীর একসাথে যুদ্ধ চালালে তাকে Total War বলে।

২৪. ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম কী?
উত্তর : Israili Defence Force.

২৫. জুলাই, ২০১৪ সালে ইসরাইল ও হামাসের যুদ্ধে গাজার হামাস নেতা খালেদ মেশালের যুদ্ধ বিরতির শর্তগুলো কী কী?
উত্তর :
ক. ইসরাইল গাজার ওপর ৮ বছর ধরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে, তা খুলে দিতে হবে।
খ. মিসরের সাথে যে ৯ কি. মি. বাফা এলাকায় ফিলিস্তিনির বর্ডার রয়েছে, তা খুলে দিতে হবে।
গ. ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

২৬. গাজায় যুদ্ধাপরাধ তদন্তে ১১ আগস্ট, ২০১৪ সালে ঘোষিত জাতিসংঘের প্যানেল প্রধানসহ অন্যান্য সদস্যের নাম কী এবং কবে রিপোর্ট প্রদান করবে?
উত্তর : তিন সদস্যের ঐ প্যানেলের প্রধান আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক কানাডীয় অধ্যাপক উইলিয়াম স্ক্যাবাসকে। প্যানেলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সেনেগালের সৌদি এবং লেবানিজ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী আমল আলামুদ্দিন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'স্বাধীন এ দলটি গত ১৩ জুন ২০১৪ থেকে গাজায় সামরিক অভিযানের সময় আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি-না তা তদন্ত করবে।' প্যানেল ২০১৫ সালের মার্চের মধ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. নতুন করে ইসরাইল কেন এবং কখন ফিলিস্তিনির ওপর হামলা শুরু করে?
২. দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিরতিতে ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে দাবীগুলো কী কী?
৩. সাম্প্রতিক সময়ে গাজা এলাকা দখলের জন্য ইসরাইল গাজায় কী মিশন শুরু করে?
৪. ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর কী পরিমান টাকা ইসরাইলকে অনুদান দেয়?
৫. কত বছর যাবৎ ফিলিস্তিন অবরুদ্ধ?
৬. দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিরতির জন্য কে মধ্যস্থতা করে?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের বাধাগুলো আলোচনা করুন ?
২. জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের অর্জনগুলো এর প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন ?
৩. মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনের ইতিহাস আলোচনা করুন ?
৪. ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতি পেতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে আপনি মনে করেন ?
৫. ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং পরাশক্তি হিসেবেমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল– আলোচনা করুন ?
৬. আপনি কী মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যে যতদিন ইসরাইলের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়?

অধ্যায় 8

ইরানের পরমাণু সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Nuclear Crisis in Iran : President Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৪.১ ভূমিকা
৪.২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা
৪.৩ সামরিক মহড়া
৪.৪ অবরোধ
৪.৫ হরমুজ প্রণালি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
৪.৬ আই.এম.এফ ও ইরান
৪.৭ ইরান ও আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)
৪.৮ ন্যাম সম্মেলন ও ইরানের পরমাণু কূটনীতি
৪.৯ বিরোধের পটভূমি
৪.৯ (১) সাম্প্রতিক বিরোধের পটভূমি
৪.৯ (২) ইরানের ওপর জাতিসংঘের অবরোধ
৪.৯ (৩) জাতিসংঘ অবরোধ প্রস্তাবের মূল বিষয়
৪.১০ ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা অভিযোগ
৪.১১ পশ্চিমা বিশ্বের অভিযোগে ইরানের ভাষ্য
৪.১২ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নিয়ে বিতর্ক
৪.৪ সম্প্রতি ইরান ও পশ্চিমা বিশ্ব পরস্পরের প্রতি প্রস্তাব
৪.১৪ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড
৪.১৫ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বৈঠক
৪.১৬ পরমাণু কর্মসূচি এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ভূমিকা
৪.১৭ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধের ভবিষ্যৎ সংকটসমূহ
৪.১৯ ইরানের সাথে ছয় জাতির পরমাণু ইস্যুর চুক্তি ও ফলাফল

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

ইরান বিশ্বের ২য় প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধকারী ও ৪র্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ, বর্তমানে এই দেশটি তার এই প্রাকৃতিক সম্পদ নয় অন্য একটি বিষয়ে জন্য অনেক বেশি আলোচিত। আর তা হল এর পরমানু শক্তি, পরমানু নিয়ে ৮দিন ব্যাপী আলোচনা এবং ২ এপ্রিল ২০১৫ সালের চুক্তি সুইজারল্যান্ডে সংঘটিত হয়।

ইরানের পরমাণু শক্তি সমৃদ্ধ করার পেছনে অনেকগুলো যুক্তি কাজ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: জাতীয় প্রতিরক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা। বিশ্বে নিজেকে অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে

প্রতিষ্ঠা করা প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা কিন্তু এসকল কারণ সমূহ থাকা সত্ত্বেও পরমাণু সংরক্ষন এর থেকে দেশটির জন্য তার অর্থনৈতিক উন্নয়নটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির কাছে। মার্কিন এর অবরোধ ইরানের অর্থনীতিতে অনেক বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যে কারণে অবরোধ তুলে ফেলার শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর ইরানের কাছে বাঞ্ছনিয় বিবেচত।

২ এপ্রিল ২০১৫ চুক্তি অনুযায়ী ২ থেকে ৩ শতাংশ সেন্ট্রিফিউজ কমানো, ১৫ বছরের মধ্যে ৩.৬৭% এর বেশি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ না করণ ইরানের সকল পরামণ কেন্দ্র এর প্রবেশাধিকার, গবেষণার আধিক্ষ, পানি চুক্তি এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী করার শর্তে রাজি আছে ইরান। তবে ৩০ জুন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইরানের শর্ত হলো ইউএসএ, ইইউ এর অবরোধ তুলে নেওয়া। এর ফলে ইরানের তেল ব্যবসায় ১০০ বিলিয়ন ডলার লাভ হবে। ১৯৫৩ সালের পরবর্তী সময় থেকে বৈরী যে সম্পর্ক তা তুলে নিলে বিশ্ব মুক্ত বাজারে ইরানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তেল অবরোধের ফলে ৪০% মুদ্রা স্ফিতি হয়েছে, ইরান এসকল অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে ইরানের জন্য আরও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হওয়ার পথ সুগম হবে।

৪.২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা (Successful Test of Missile)

আগস্ট ২০১২ এর প্রথম সপ্তাহে ফাতেহ ১১০ নামে নতুন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সম্বলিত একটি স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ইরান। নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি ভবিষ্যতে তৈরি করা সব ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। চতুর্থ প্রজন্মের ফাতেহ-১১০ নামের নতুন এ ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা তিনশ কিলোমিটার (১১০ মাইল) ইরানের প্রতিবেশী সব রাষ্ট্র এ ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় পড়বে। শত্রুপক্ষের সদর দপ্তর, ক্ষেপনাস্ত্র স্থাপনা, গোলাবারুদের গুদাম, রাডার ও অন্যান্য স্থাপনাসহ স্থল ও জলপথের যেকোনো লক্ষ্য ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে ফাতেহ-১১০ এর।

৪.৩ সামরিক মহড়া

ইইউভুক্ত দেশসমূহ ও যুক্তরাষ্ট্র ১ জুলাই থেকে ইরানের বিরুদ্ধে তেল অবরোধ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ২,জুলাই ২০১২ থেকে ইরান সেমনান প্রদেশের মরুভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া

মনে রাখার Technique & Tips

- ইরান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯২৫ সালে (ব্রিটেনের কাছ থেকে)।
- ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়- ১ এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে।
- ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৯৭৯ সালে।
- ইরানের পূর্ব নাম পারস্য। (১৯৩৫ সালে ইরান নাম হয়)।
- ইরানের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় না কারণ পতাকাতে কালেমা তাইয়্যেবা লেখা রয়েছে।
- Asian clearing union এর সদর দপ্তর ইরানে।
- Economic Cooperation Organization এর সদর দপ্তর ইরানে।
- ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ।
- কোন দেশের উপসাগরীয় তটরেখায় হরমুজ প্রণালি অবস্থিত -ইরান।
- ইরানের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র 'বুশেহর' চালু হয় - ২১ আগস্ট, ২০১০ (বিশ্বের ৩২ তম দেশ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে।
- জানদাতাত সুন্নি বিদ্রোহী গ্রুপ কোন দেশভিত্তিক - ইরান।
- ইরানের দ্বিতীয় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ গোষনাগার কোন শহরে - কোম (টেহরান, প্রথমটি নাতাঞ্জ শহরে)।
- নোবেল শান্তি বিজয়ী শিরিন এবাদি পরিচালিত মানবাধিকার সংস্থা - Defenders of Human Rights Center
- নাতা পারমাণবিক কেন্দ্রটি ইরানে।
- বিখ্যাত আবাদান দশরী ইরানে।
- আবাদান বন্দরটি ইরানে।
- ইরানের জাতীয় প্রতীক গোলাপ।
- তেলের জন্য বিখ্যাত খুররম শহর ইরানে।
- শান্তিতে নোবেল জয়ী প্রথম মুসলীম নারী শিরিন এবাদি।
- ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানের নাম - গার্ডিয়ান কাউন্সিলর।
- গার্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা-১২।
- ইরানের সফল নির্বাচনের আয়োজন করে- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- শিয়া ধর্মকে ইরানের রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়- ১৫০১ সালে।
- ইরানের সশস্ত্র বাহিনী কয়টি ধারায় বিভক্ত-২টি। বিপ্লবী/রেভ্যুলিউশনারি গার্ড, নিয়মিত সেনা।
- ইরান তেহরান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে - ১৯৫৯ সালে।

চালু করেছে। ইরানের পারমানবিক ক্ষেত্রে কোন বিমান হামলা হতে পারে কিংবা ইসরায়েলের বা যুক্তরাষ্ট্র আক্রমন করলে তা প্রতিহত করতে হবে এ ধরনের ধারণা থেকেই ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া শুরু করেছে ইরান। তিন দিনের এ মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রেট প্রফেট-৭' বা 'মহানবী-৭' মহানবী-৭ মহড়া প্রকল্পে ফাতেহ,এন্দার, জিলজাল, খালিজ, কারস ও কিয়াম ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যমাত্রা ২০ থেকে ৭৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এছাড়া সাহাব-৩ সহ প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এমন ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়াও করা হয়। ইরানের বিপ্লবী গার্ডবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি বজায় রাখাই এ মহড়ার উদ্দেশ্য। এর আগে ইরান সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল। ইসরাইল কোনো হামলা করলে তার জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটিগুলোর উপর আক্রমণ করা হবে।



৪.৪ অবরোধ (Blocade)

১ আগস্ট ২০১২ ইরানের তেল রপ্তানির ওপর নতুন অবরোধ আরোপ সংক্রান্ত বিলে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন। একের পর এক অবরোধ আর আলোচনার মধ্যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ভবিষ্যৎ পশ্চিমা বিশ্বের চাপে বারবার আলোচনার টেবিলে বসলেও বিষয়টির সুরাহা হচ্ছে না। এরপর ইসরাইলের হামলার হুমকিও আছে। পরমাণু অস্ত্রের প্রধান উপাদান ইউরেনিয়াম আর টানা ১৮ বছর ধরে এ ইউরোনিয়ামই সমৃদ্ধ করছে ইরান। ইইউভুক্ত সরকারগুলো গত ২৫ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেছে। যা ১ জুলাই, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়। পাশাপাশি তারা ইরানের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দাবি অনুযায়ী পরমাণু কর্মসূচি গুটিয়ে না আনলে বিভিন্নমুখী চাপ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। এদিকে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র রামিন মেহমান পরাস্ত বলেন ইরানের ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের তেল-অবরোধ সংস্থাটির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থেই আঘাত করবে। ১ জুলাই, ২০১২ থেকে ইরান থেকে আর তেল না নেওয়ার ঘোষণা দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। ইরানি তেলের ওপর ইইউ এর নিষেধাজ্ঞার কারণে দক্ষিণ কোরিয়া এ সিদ্ধান্ত নিল। এর আগে সর্বশেষ গত জানুয়ারি ২০১২– তে ইরানের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা হয়। তাতে ইরানের অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরী পণ্য আমদানীতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে ১ জুলাইয়ের মধ্যেই ইরানের তেল আমদানীতে ছাড় পাওয়া দেশগুলোর ওপর এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ২ জানুয়ারি ২০১৩।

৪.৫ হরমুজ প্রণালি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

তেল রপ্তানির ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলায় ইরান কিছু কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে হরমুজ প্রণালিতে তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের একদিন পরেই অর্থাৎ ২ জুলাই, ২০১২ ইরান এ ঘোষণা দেয় যার লক্ষ্য হবে যেসব পশ্চিমা দেশ ইরান থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ঐসব দেশের তেলবাহী জাহাজকে হরমুজ প্রণালি ব্যবহার করতে না দেওয়া। পারস্য ও ওমান উপসাগরকে সংযুক্তকারী হরমুজ প্রণালি দিয়ে মোট তেল বাণিজ্যেও প্রায় ২ পঞ্চমাংশ পরিবহন করা হয়ে থাকে। ১৬ জুলাই, ২০১২ ইরান ঘোষণা করে যে তার ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হলে আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী ৪ মাইল প্রশস্ত হরমুজ প্রণালি পারস্য উপসাগর থেকে বের হওয়ার একমাত্র জলপথ।

৪.৭ ইরান ও আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) (IRAN & IAEA)

ইরানের সম্ভাব্য পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা নিয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এর সঙ্গে ইরানের কোন সমঝোতা হয় নি এতে ইরানি পরমাণু প্রকল্প নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনার কূটনৈতিক সমাধানের আরো একটি চেষ্টা হোচট খেল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ২৪ আগস্ট, ২০১২ অনুষ্ঠিত আইএইএ ও ইরানের প্রতিনিধিদের মধ্যে সাত ঘন্টা আলোচনার পরও সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে নি দু'পক্ষ।

৪.৯ বিরোধের পটভূমি (Background of Conflict)

ইরান-মার্কিন বিরোধের সূত্রপাত হয় ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের পর। যে ইরান ইসলামিক বিপ্লবের পূর্বে ছিল পশ্চিমা সংস্কৃতি আর তথাকথিত উগ্র হাল-ফ্যাশনের দেশ ও জাতি হিসেবে পরিচিত, সেই ইরানি জাতি রাতারাতি ইসলামি বিপ্লবের ধারায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। ইরান শুধু অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রাতেই পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তন হয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনেও; রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে, রাজতন্ত্রের অধীনে স্যাকুলার থেকে ইসলামিক রিপাবলিকে। আর তা সম্ভব হয়েছিল আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির প্রায় এক যুগের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে। এ বিপ্লবের সময় মার্কিনিরা রাজতন্ত্রের পক্ষে ছিল। আর সেই থেকেই মূলত শত্রুতার শুরু।

ইরান-মার্কিন বিরোধের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই ইসলামিক বিপ্লবের ঠিক পরেই অর্থাৎ ১৯৮০ সালে মার্কিন সাহায্য ও উসকানির ফলে সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক ইরান আক্রমণ। কিন্তু সে লক্ষ্যেও মার্কিন বাহিনী পরাস্ত হয়। ১৯৮৮ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে এক চুক্তির মাধ্যমে ইরাক-ইরান যুদ্ধের

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে ইরানের রাজনীতি ও পরমাণু সঙ্কট

- ব্রেটনউডসনদি গার্ড গঠন করা হয়-১৯৭৯ সালে।
- ইরানের জাতীয় পারমাণবিক দিবস -৯ এপ্রিল।
- ইরান NPT স্বাক্ষর করে- ১৯৬৮ সালে।
- 'বুশাহর, দারখুনিয়া, ইস্পাহান, - ইরানের পরমাণু চুল্লির নাম।
- ইরানের নাতাঞ্জে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প চালু হয় - ২০০৬ সালে।
- ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার প্রযুক্তি আয়ত্ব করে - ২০০২ সালে।
- ইরানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম -বুশাহর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (প্রতিষ্ঠা-১ মে, ১৯৭২)।
- ইরানে ইসলামী বিপ-বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন - আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী।
- ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে কোন দ্বীপ নিয়ে- আবু মুসা।
- ফ্রিডম মুভমেন্ট কোন দেশের সংগঠন- ইরানের।
- ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী - ফারাহ খোশরাভি।
- ইরানের কোন কট্টরপন্থি সংগঠন সালমান রুশদিকে হত্যার জন্য এক লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে - ফোনাডেশন স্ট্যাক ফর দ্য প্রোটেকশন অব মার্টায়ার্স অব দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড।
- সম্প্রতি ইরানের জাতীয় পতাকায় সংযুক্ত করা হয় - কলেমা তাইয়েবা-আসশাহাদুয়ান লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।
- ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর প্রথমবারের মতো মহিলা মন্ত্রী নির্বাচিত হন - মারজিয়া জাহিদ (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)।
- কোন দেশে বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার স্থিত- ইরানে।

অবসান হয়। কিন্তু তাতেও মার্কিন-ইরান সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হয় নি।

১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে নি। পরে ফিলিস্তিন ও লেবাননের সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহকে সহায়তা দানের অভিযোগে ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং ইরান-মার্কিন সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। এ অবরোধের ফলে ইরানের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তবে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এ সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সে প্রক্রিয়া বেশি দিন টেকে নি।

৪.৯ (২) ইরানের ওপর জাতিসংঘের অবরোধ

২০০৯ সালে ৬ জাতি সম্মেলনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয় ইরানকে এবং প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯। কিন্তু তা মেনে না নেওয়ায় ৯ জুন, ২০১০ ইরানের ওপর অবরোধ আরোপের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি হয়। এতে চীন, রাশিয়াসহ অবরোধের পক্ষে ভোট দেয় ১২টি সদস্যরাষ্ট্র। ব্রাজিল ও তুরস্ক এর বিরোধিতা করে। লেবানন ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। ২০০৬ সালের পর থেকে এটি হচ্ছে জাতিসংঘের ইরানের উপর চতুর্থ দফা অবরোধ। জাতিসংঘের এ অবরোধ আরোপের পর পরই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে অবরোধ আরোপের প্রস্তাব করলে ১৭ জুন ২০১২ বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতাদের এক দিনের সম্মেলনে নেতারা মতৈক্যে পৌঁছেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর অবরোধের আওতা বৃদ্ধি করে।

৪.৯ (৩) জাতিসংঘ অবরোধ প্রস্তাবের মূল বিষয়

১. **অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার আওতা বৃদ্ধি :** ইরানের কাছে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, সাঁজোয়া যান, রণতরী, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান বিক্রি করা যাবে না।

২. **বিদেশে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ :** খনি থেকে ইউরেনিয়াম উত্তোলন, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্রযুক্তি সহায়তা ও ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তা দেয়া যাবে না। যেকোনো বন্দর কিংবা সমুদ্রে ইরানগামী জাহাজে অনুসন্ধান চালানো এবং নিষিদ্ধ মালামাল বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৩. **ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা :** পরমাণু অস্ত্র বিস্তারের সাথে জড়িত যেকোনো অর্থের লেনদেন বন্ধ করা হবে। পরমাণু অস্ত্র বিস্তারের বিনিয়োগকারী কোনো ইরানি ব্যাংককে বিদেশে শাখা খোলার অনুমোদন দেওয়া হবে না।

৪.১০ ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা অভিযোগ (Complaint of the Western Country against Iran)

ইরানের সাথে পশ্চিমা তথা ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ অনেক দিনের। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের একমাত্র হুমকি ইরান। তাই পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ইরানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের কেন্দবিন্দু হলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। নিম্নে পশ্চিমা বিশ্বের কতিপয় অভিযোগের চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. ইরান NPT স্বাক্ষরকারী দেশ হয়েও ১৯৮৫ সালে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প হাতে নেয়। তবে ১৯৮৭ সাল থেকে তা জোরদার করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে ইরান কালাইতে ইউরেনিয়াম প্রকল্প পুনঃস্থাপন করে এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প অব্যাহত রাখে।

২. পশ্চিমাদের মতে, ইরান ইস্পাহান শহরে একটি ইউরেনিয়াম রূপান্তর কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে বলে ২০০০ সালে ইরান আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)- কে জানায়।

৩. বিশ্বের ধারণা, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির রাসায়নিক প্রভাবক হিসেবে পরিচিত পলোনিয়াম-২০১ উৎপাদন করেছে।

৪. ইরান রাশিয়ার কাছ থেকে পারমাণবিক বোমা তৈরির অনুঘটক হিসেবে ব্যবহৃত ডিওটেরিয়াম গ্যাস ক্রয়ের চেষ্টা করেছে।

৫. পশ্চিমা বিশ্বের ধারণা, ইরান পাকিস্তানের পরমাণুবিজ্ঞানী ড. আব্দুল কাদির খানের কাছ থেকে চীনের বোমা তৈরির প্ল্যানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পারমাণবিক বোমা তৈরির একটি ডিজাইন ও গাইড লাইন পেয়েছে।

৬. IAEA বলছে, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি ও প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের সঠিক তথ্য দেয় নি। কারণ ২০০৩ সালে ইরান স্বীকার করে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তারা তেহরানের একটি গবেষণাগারে ৩ কেজি ইউরেনিয়াম বিভাজন করে ২০০ মাইক্রোগ্রাম প্লুটোনিয়াম পৃথক করেছে এবং তারপর সব যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করে ফেলে, যা IAEA-এর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি।

৪.১১ পশ্চিমা বিশ্বের অভিযোগে ইরানের ভাষ্য (Position of Iran against Western World)

পশ্চিমা বিশ্ব যখন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পুনরায় চালু নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে, বিপরীতে ইরানও তার অভিমত প্রকাশ করছে বিভিন্ন মাধ্যমে। যথা:

১. ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি সব সময় শান্তিপূর্ণ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। ইরান বলছে, সে তার দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য গবেষণা করে যাচ্ছে। ইরানের কোনো পারমাণবিক বোমা বানানোর অভিলাষ নেই এবং তারা IAEA-এর বিধিমালা মেনে চলছে।

২. ইরান মনে করে, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও গবেষণার মাধ্যমে এর উৎকর্ষ সাধন করা বিশ্বের সকল দেশের অধিকার। পারমাণবিক বোমা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে বহুবিধ উপায়ে পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করা যায়। আর এ লক্ষ্যে প্রতিটি দেশেরই গবেষণা করার অধিকার রয়েছে। তাই ইরানও তার এ অধিকার রক্ষা ও আদায়ে সচেষ্ট। কিন্তু পশ্চিমারা ইরানের একথায় বিশ্বাস করে না।

৩. ইরানের মতে ইরান যে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তার পারমাণবিক গবেষণা চালাচ্ছে, তার প্রমাণ হলো স্বেচ্ছায় IAEA-এর পরিদর্শক দলকে যেকোনো সময় পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করা।

ইরান মনে করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর গবেষণা করার অধিকার সকল দেশেরই রয়েছে। তাই ইরানও এ অধিকার পাওয়ার যোগ্য। তাছাড়া NPT-র চুক্তি অনুযায়ী পরমাণু অস্ত্র তৈরি ব্যতীত যেকোনো শান্তিপূর্ণ ও মানব কল্যাণের স্বার্থে পরমাণু শক্তির গবেষণা সবাই করতে পারবে, ইরানও এর ব্যতিক্রম নয়।

৪.১২ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড (Nuclear Function of Iran And Present Activities)

ইরানের প্রথম পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায়। ১৯৫৯ সালে পারমাণবিক গবেষণার জন্য ইরান তেহরান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার (TNRC) প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র এ সেন্টারের জন্য ৫ মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার সরবরাহ করে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানের পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত হয়ে যায়। পরে ২০০৫ সালে আগস্ট মাসে ইরানের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান গোলাম রেজা আগা জাদেহ বলেন "ইরান তাদের ইস্পাহান প্রকল্পে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ কর্মসূচি পুনরায় চালু করতে যাচ্ছে।" তার এ ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন জল্পনা, কল্পনা। ৯ এপ্রিল, ২০০৯ জাতীয় পারমাণবিক দিবসে ইরান তার প্রথম জ্বালানী উৎপাদন কেন্দ্র বা ফুয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (FMP) উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়। যা একশ ভাগ ইরানি প্রযুক্তিতে তৈরি। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচির উন্নতি ঘটাতে থাকে দ্রুতলয়ে।

৪.১৩ সংকট নিরসনে ৫+১ গ্রুপ

ইরানের পরমাণু সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্যোগে গঠন করা হয় ৫+১ গ্রুপ। নিরাপত্তা পরিষদের ৫ সদস্য ও জার্মানিকে নিয়ে গঠিত এ গ্রুপ ইরানকে তাদের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার ব্যাপারে চাপ প্রদান ও আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু উভয় পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের কারণে এ উদ্যোগ হোঁচট খাচ্ছে বারবার। ইরান এক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ও দ্বৈত আচরণের অভিযোগ তুলে নিজেদের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে। কিন্তু মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব ইরানের এসকল দাবিকে অগ্রাহ্য করে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি বাতিলের জন্য অবরোধ কর্মসূচিসহ বিভি-

ন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলছে। বর্তমান সময়ে এসে ইরানের অনমনীয় মনোভাবের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলার পরিকল্পনাও করছে বলে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মনে করছেন। উল্লেখ্য যে, গত ২ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে মার্কিন সাময়িকী দ্যা আটলান্টিক কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বারাক ওবামা ইরানকে ৬ জাতি গ্রুপের সাথে সংলাপের আহবান জানান এবং হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন "সংলাপ ও বর্তমান অবরোধ ব্যর্থ হলে তিনি সেনাবাহিনীকে ইরান আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করবেন। এসব হুমকির মুখে ইরান ২০১২ সালের এপ্রিলে তাদের পারমাণবিক স্থাপনাসমূহ পরিদর্শনের জন্য IAEA- কে অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু এর মাধ্যমে এ সংকট সমাধানে কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

৪.১৪ ইউরেনিয়াম খনি ও পরমাণু কেন্দ্র

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পরমাণু প্রকল্প ব্যবহার করার মতো পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম খনিজ মজুদ রয়েছে এমন একটি নতুন খনি পাওয়ার ঘোষণা দেয় ইরান। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অংশে নতুন করে ১৬টি পরমাণু কেন্দ্র স্থাপন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কাস্পিয়ান সাগর, পারস্য উপসাগর, ওমান সাগর, উপকূলীয় এলাকা, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খুজেস্তান এবং দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশে এ ১৬টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

৪.১৫ পরমাণু কর্মসূচি এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ভূমিকা

ইরানের পরমাণু ইস্যুতে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির সাঙ্গে ৬ বিশ্বশক্তি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন ও জার্মানি) একটি যুক্তিসংগত সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমা বিশ্ব। ইরানের পনমাণু কর্মসূচির কারণে পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘদিনের অবরোধের ফলেই এটি সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছেন। কারণ অর্থনৈতিক অবরোধ কোণঠাসা দেশের অর্থনৈতিক চাঙ্গা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই উদারপন্থি রুহানি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। অন্তত অর্থনৈতিক অবরোধ কিছুটা হলেও লাঘব না করতে পারলে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে পারে। হাসান রুহানি ইরানের পরমাণু কর্মসূচির একজন আলোচক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পূর্বসূরি মাহমুদ আহমাদিনেজাদের চেয়ে বেশি কূটনৈতিক আচরণ করবে বলে পশ্চিমারা মনে করেন। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ নাও হতে পারে। কারণ এরই মধ্যে ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ঘোষণা দিয়েছেন যে পরমাণু কর্মসূচি কোনভাবেই বন্ধ করা যাবে না। তবে তিনি এক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

৪.১৬ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধের ভবিষ্যৎ সংকটসমূহ

তেল মজুদে বিশ্বে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরান অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক বিবেচনায় মধ্যপ্রাচ্যের একটি অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং এর দু'পাশে ইরাক, তুরস্ক, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তবেষ্টিত দেশটিকে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত অবস্থান এনে দিয়েছে। কৌশলগত অবস্থানে থাকা ইরানের সাম্প্রতিক পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ইরানের এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী নানা সংকট দেখা দিবে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সংঘাত :** ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক ক্রমেই সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোর অভিযোগ ইরান বেসামরিক ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির আড়ালে পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমাদের দাবি মতে, ইরান যদি পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ না করে এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরমাণু সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তবে ইরানকে হামলার মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, ইরানের পারমাণবিক সংকটের যদি সহসা কোনো সুরাহা না হয়, তবে ইরানের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের যে সংঘাত ঘটবে তা মোটামুটি নিশ্চিত।

২. **ইরান-ইসরাইল সংঘর্ষ :** আলোচনার মাধ্যমে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সমস্যার সমাধান না হলে ইসরাইল ইরানে হামলা চালানোর হুমকি দিয়ে আসছে। অন্যদিকে ইরানও ইসরাইলকে পাল্টা হুমকি দিয়ে আসছে। যেমন-ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সিনিয়র কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ বলেন, ইসরাইল ইরানে হামলা চালালে সেটি হবে তাদের মারাত্মক ভুল। ইসরাইল যদি ইরানে হামলা করেই বসে তাহলে অবৈধ এ রাষ্ট্রকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা ইরানের জন্য সুযোগ বলে গণ্য হবে। জেনারেল হাজিজাদেহ আরো বলেন, ইসরাইল যেখানে লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো ছোট একটি সংগঠনের কাছে ৩৩ দিনের যুদ্ধে হেরে গেছে সেখানে ইরানের মতো একটি শক্তিশালী দেশের ওপর হামলা চালানোর সাহস দেখায় কীভাবে ? যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবে না। কারণ তারা জানে এ অঞ্চলে তাদের সব সামরিক ঘাঁটি ইরানী ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায়। সুতরাং হুমকি-পাল্টা হুমকি এক সময় এ দু'দেশকে যে সংঘর্ষে জড়াবে এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

৩. **ইরানের ওপর অবরোধ আরোপ ও সংকট :** ইরানের বিতর্কিত পরমাণু ইস্যু নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব ইরানের বিরুদ্ধে একের পর এক অবরোধ করে আসছে। ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে এমন সন্দেহে ২০০৬ সালে দেশটি আন্তর্জাতিক অবরোধের মুখে পড়ে। এরপর ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালেও নতুন করে ইরানের ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়। এসব অবরোধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সকল প্রকার অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ, সকল প্রকার ইউরেনিয়াম গবেষণা ও উন্নয়ন থেকে ইরানকে বিরত থাকতে বলা হয়। ইরানের ওপর একের পর এক অবরোধ অব্যাহত থাকলে ইরান খুব সহজেই যে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পতিত হবে তা পরিষ্কার।

৪. **ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও সংকট :** ইরানের দাবি, তাদের পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি তৈরি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইলসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিযোগ জ্বালানির আড়ালে পরমাণু বোমা তৈরি করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। তাদের এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের তেল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ২৫ জুন ২০১২ ইইউভুক্ত দেশগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে চীন বিরোধিতা করে এবং ইরান থেকে তেল আমদানি করা বেইজিংয়ের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে চীনের সাথে মার্কিন সম্পর্কের অবনতিসহ তেল আমদানিকারক দেশগুলো মারাত্মক জ্বালানি সংকটে পতিত হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল আশঙ্কা করছে।

৫ **ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি :** ইরানের পরমাণু সংকটকে কেন্দ্র করে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ইতোমধ্যে পরমাণু ইস্যুতে পশ্চিমা বিশ্বের অবরোধ আরোপের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ওপর সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার জন্য ইরান দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। শাবাহ-৩ নামের এ ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ২ হাজার কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম। যা দিয়ে ইরান ইসরাইলের মূল ভূখণ্ডে আঘাত করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এর আগে ইরান শাবা-১ ও শাবাহ-২ নামের স্বল্প মাত্রার ২টি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায়। এ ২টি ক্ষেপণাস্ত্র ৩০০ ও ৫০০ কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম। অতএব, ইরানের পরমাণু ইস্যু সংকট দীর্ঘদিন জিইয়ে থাকলে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলায় ইরান যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে তা খুবই স্বাভাবিক। আর এ প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দামামা বয়ে আনবে অনায়াসেই। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে বিশ্বশান্তিকে বিনষ্ট করবে।

৬. **হরমুজ প্রণালি ব্যবহার সংকট :** ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে হরমুজ প্রণালি ব্যবহার নিয়ে ভবিষ্যতে চরম সংকট তথা যুদ্ধাবস্থা দেখা দিবে। ইতোমধ্যে এর কিছু নমুনাও লক্ষ করা গেছে। যেমন-ইরানের ওপর তেল বিক্রির নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী ইউরোপীয় দেশগুলো যাতে হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে তেল পরিবহন করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে

ইরান তাদের পার্লামেন্টে একটি খসড়া আইন স্বাক্ষর করেছে। অন্যদিকে হরমুজ প্রণালি দিয়ে ইউরোপীয় জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে ইরানের এমন সম্ভাব্য হুমকির প্রেক্ষিতে পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে ইরান হরমুজ প্রণালিতে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মার্কিন যুদ্ধ বিমান থেকে ইরানের গভীরে হামলা চালাতে পারে।

৭. **ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি :** ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ধ্বংস করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি করে পরমাণু কর্মসূচির অনেকাংশে ঘায়েল করতে বদ্ধপরিকর। ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতি নষ্ট হওয়ার মতো অনেক কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইরানের চারপাশে তৈরি করে রেখেছে। ইরাক, পারস্য উপসাগর, আফগানিস্তান, আজারবাইজান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ন্যাটো সেনা অর্থাৎ অতিরিক্ত রিজিওনাল ফোর্সের (ইআরএফ) উপস্থিতি ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

৮. **ইরাক-আফগানিস্তান মিশন বাধাগ্রস্ত :** ইরানের অবস্থান এশিয়া-ইউরোপের মাঝখানে। এ কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে ইরানের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া ইরান বিশ্বের অন্যতম খনিজ জ্বালানি ও তেল সরবরাহকারী দেশ। আঞ্চলিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ইরানের তেল রাজনীতির একটা প্রভাব রয়েছে। তাই ইরান চাইলে ইরাক-আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশন বাধাগ্রস্ত করতে পারে। মোট কথা ইরানের স্বার্থে আঘাত লাগলে ইরান মার্কিন স্বার্থেরও ব্যাঘাত ঘটাতে চাইবে এটাই বাস্তবতা।

৯. **ইরান-সৌদি নেতিবাচক সম্পর্ক :** সৌদি আরবের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গলায় গলায় খাতির। ভূ-রাজনৈতিক, কৌশলগত ও স্বার্থ বিবেচনায় সৌদি আরব ইরানকে ঘোরতর শত্রু মনে করে। ধর্মীয় দিক থেকেও দূরত্ব আছে বিস্তর। ইরানে বিপ্লব হওয়ার পর আরব নেতাদের মনে ভয় ঢুকে যায়। ইরানের বিপ্লবী চেতনা ও শিয়া মত তাদের দেশে না আবার আমদানি হয়। ইরান সৌদির এ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালালে সৌদি আরব যে মার্কিন সমর্থন দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তা হলে একদিকে ইরান-সৌদি ঘোরতর নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং আরব বিশ্ব হয়ে পড়বে দ্বিধাবিভক্ত।

১০. **ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত :** ইরান নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের বিরোধের কারণে ইরানের এ প্রকল্প সফল হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। আর যদি তা হয় তাহলে ইরান ভবিষ্যতে গভীর বিদ্যুৎ সংকটে পতিত হবে।

৪.১৭ সাম্প্রতিক ইরান-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন

ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রুহানির সাথে এ প্রথমবারের মতো টেলি-আলোচনা করল বিশ্বের একমাত্র পরাক্রমশালী রাষ্ট্র আমেরিকা। গত ৩৪ বছরের ইতিহাসে ইরান-মার্কিন টেলি-আলোচনার ফল দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কতটুকু ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে তা-ই এখন দেখার বিষয়। ধারণা করা যায় যে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলাপচারিতার এরূপ বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। ১৯৭৯ সাল হতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও সাম্প্রতিককালে দুই প্রেসিডেন্টের এরূপ আলোচনা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাদ পশ্চিমাদের বিষয়ে অনেকটা কঠোর থাকলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট রুহানি হলেন ঠিক তার উল্টো। আর রুহানির এরূপ নমনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের মহাসচিবের দেওয়া ভোজসভায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে রুহানির কুশল বিনিময় হবে বলে ধারণা করা হলেও তা সম্ভব হয় নি। কিন্তু রুহানি নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা তাঁদের মধ্যে টেলিফোন সংযোগ করিয়ে দেন। এ দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে ১৫ মিনিট কথা হয়।

২০০৩ সালে আমেরিকা কর্তৃক ইরাক আক্রমণের পর থেকে যদিও ইরান পশ্চিমা শক্তি তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক ছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইরানের দুর্বল কৌশলগত অবস্থান দেশটিকে হয়তো নমনীয় পররাষ্ট্রনীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আহমেদিনেজাদের লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে দেশটির একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখা। আর এক্ষেত্রে সিরিয়া হচ্ছে ইরানের মিত্র রাষ্ট্র। শুরুর দিকে সিরিয়া-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিরিয়ার কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত না থাকলেও সাম্প্রতিককালের আরব বসন্ত এবং সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদের বিরুদ্ধে যে জনবিক্ষোভ শুরু হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবে সরিয়াকে ইরানের সাহায্য নিতে বাধ্য করে। অর্থাৎ সিরিয়া এখন তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করার জন্য ইরানের সহযোগিতা চাচ্ছে।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্য প্রশমিত করার ক্ষেত্রে রাশিয়াও ইরানের উত্থানকে সমর্থন করে যাচ্ছে। পারমাণবিক ইস্যুসহ অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাই ইরান আর আমেরিকার মধ্যে আনুমানিক ১৯৭৯ সাল থেকেই স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও তারা একে অপরের বিরোধিতা ও নিন্দা করে আসছে। বিগত প্রেসিডেন্টের শাসনামলে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এতটাই বৈরী ছিল যে, আমেরিকা ইরানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকেও সন্দেহের চোখে দেখত। এ প্রেক্ষাপটে শত্রুভাবাপন্ন এরূপ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে যাওয়া আলোচনা তাদের মধ্যে বিরাজমান বৈরী সম্পর্কের পরিধিতে কিছুটা হলেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

অন্যদিকে ফিলিস্তিন-ইসরাইল সমস্যার মূলে তেল আবিবের আগ্রাসী নীতি আমেরিকা কখনই স্বীকার করে না। এতদিন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল আক্রমণকারী এবং আক্রান্তকে সমান দৃষ্টিতে দেখা। বারাক ওবামা প্রথম মেয়াদে ফিলিস্তিন-ইসরাইল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েও সফল হন নি। তারপর জন কেরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ফের মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানে কূটনৈতিক প্রয়াস শুরু হয়। তার তাই বলা যায়, ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রুহানির সাথে বারাক ওবামার সাম্প্রতিক টেলি-বৈঠক এর একটি অংশবিশেষ। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার আর তা হচ্ছে সিরিয়া প্রসঙ্গ। আমেরিকা হয়তো সিরিয়ার ব্যাপারে ইরানের সমর্থন লাভের জন্যই এরূপ হটলাইন কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছে। একটা বিষয় আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার, এরূপ ফোনালাপের ফলে দুই দেশের সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে তার সুফল সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ওপরেই পড়বে।

৪.১৮ ইরানের সাথে ছয় জাতির পরমাণু ইস্যুর চুক্তি ও ফলাফল

২৪ নভেম্বর ২০১৩ P5 বা UN এর নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য +১ বা জার্মানির সাথে পরমাণু ইস্যু একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইরানের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে US এর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৫৩ সালে USA সহায়তাতেই তৎকালীন শাসক রেজাশাহ্ ইরানে পারমাণবিক কর্মসূচী শুরু করেছিল। তখন USA এর ইরানকে বুঝিয়েছিল যে, তাকে পারমাণবিকীরনের পথে এগোতে হবে। USA ইরানকে পারমাণবিকীরণের মধ্যদিয়ে তার কৌশলগত স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইরানে শাসন মতের পরিবর্তন আসায় USA এর সেই পরিকল্পনা সফল হয় নি। এমতাবস্থায় রেজা শাহের সময়ে নির্মিত পারমাণবিক রিয়াক্টরগুলো ধ্বংশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কাজেই বলা যায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচী দীর্ঘদিনের বারাক ওবামা ২০০৯ সালে তার উদ্বোধনী বক্তব্যে ইরানের সাথে খোলাখুলি আলোচনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কিন্তু ইরানের কট্টোরপন্থি প্রেসিডেন্ট আহমেদিনিজাদের কারণে সম্ভব হয় নি। ২০১১ সালে ৬ জাতির সাথে ইরানে আলোচনা শুরু হয় এটি বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করার সুযোগ হয় বারাক ওবামার সাথে হাসান রুহানির টেলিসংলাপের পর। আলোচনা এক পর্যায়ে ২ পক্ষ সমঝোতায় উপনীত হয়। ২৪ নভেম্বর ২০১৩ জেনেভায় ৬ জাতির সাথে ইরানের ৬ মাসের জন্য ১টি অন্তবর্তী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি বারাক ওবামা "ঐতিহাসিক চুক্তি" বলে অভিহিত করেছেন। ২০ জানুয়ারি, ২০১৪ চুক্তিটি কার্যকর হয়। চুক্তি মোতাবেক ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির উপযোগী মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ ৬ মাসের জন্য

স্থগিত রাখবে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৫% পর্যন্ত সমৃদ্ধ করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারবে। এর বিনিময়ে USA, EU সহ পশ্চিমা বিশ্ব ইরানের উপর আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নিবে। তাই আমি মনেকরি, এ চুক্তির ফলে ইরান কী পাবে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

নিম্নে ইরান যে সকল সুযোগ পাবে তা আলোচনা করা হলো :

১. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ :** ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির উপযোগী মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধি করে আসছে বলে তার বিরুদ্ধে নানা ধরণের অবরোধ বহাল রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। এ কারণে ইরানের অর্থনীতি অত্যন্ত কম হয়ে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব এবং ইসরাইলের আচরনের কারণে অনেকেই মনে করে ইরানের পরমাণু অস্ত্রের মালিক হওয়ার চেষ্টা করছে। সেটা করতে গিয়ে ইরান যথেষ্ঠ সমস্যায় পড়েছে। এ কারণে ইরানকে এই ধরণের চুক্তি করতে হয়। চুক্তির ফলে বহুপীয় অবরোধগুলো শিথিল করা হবে। ফলে ইরান তার বিপুল তেল ভান্ডার ও সোনাসহ মূল্যবান ধাতুর কিছু অংশ বিক্রি করে অর্থনীতি স্বস্থি ফেরাতে পারবে।

২. **বিদেশে আটকা অর্থ ফেরৎ পাবে :** P5+1 ও ইরানের মধ্যে স্বারিত পারমাণবিক চুক্তিতে বলা হয়েছে ইরানের তেল বিক্রি কমে যায় এখন কোন উদ্যোগ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো গ্রহন করবে না। এমতাবস্থায় বিভিন্ন দেশে তেল রপ্তানি বাবদ ইরানে প্রাপ্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আটকা ছিল তা ফেরৎ দেয়া হবে। অর্থাৎ চুক্তির ফলে বিদেশে আটকা প্রায় ৪২০ কোটি ডলার ফেৎ পাবে। অন্যান্য অবরোধ স্থগিত রাকায় এই ৬ মাসে ইরানে আয় হতে পারে ৬০০-৭০০ কোটি ডলার হবে।

৩. **ফাইনানসিয়াল চ্যানেল :** বহির্বিশ্বের সঙ্গে ইরানের আর্থিক লেনদেনে অনেকগুলো বিষয়ে ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন বহুজাতিক অনেক ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ও ব্যাংক ইরানে সেবা দেয় না। ইরানের যেসব ছাত্র ইউরোপ USA তে পড়াশুনা করে তারাও সেপথে টিউশনি করে অর্থ নিতে পারে না। খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ অনেক মানবিক সেবা পন্য ইরান আমদানী করতে পারে না। এমনিও UN এর চাঁদা প্রদান করতে পারে না। চুক্তিতে বলা হয়েছে ইরানের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাতে মানবিক সেবা পণ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা দিতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের জন্য একটি ফাইনান্সিয়াল চ্যানেল সৃষ্টি হবে। নির্দিষ্ট কিছু বিদেশি ব্যাংক ও ইরানের ব্যাংক গুলোকে সংযুক্ত করবে।

৪. **নতুন অবরোধ করবে না :** USA ও EU ইরানে পেট্রোকেমিক্যাল, সোনা, ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা ৬ মাসের জন্য স্থগিত রাখবে। রপ্তানীর সংশি-স্ট ইনস্যুরেন্স ও পরিবহণ সেবার উপরে নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হবে। তবে নতুন করে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না। এমনকি UN ও কোন রকমের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না।

৪.১৯ পারমাণবিক কর্মসূচিতে ইরান-ষড়শক্তি সমঝোতা

সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে আট দিন অহর্নিশ সংলাপের পর ২ এপ্রিল ২০১৫ ইরান ও ছয় বিশ্বশক্তির পরমাণু চুক্তির রূপরেখা নিয়ে একটি সমঝোতা হয়। ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে অন্য ছয় বিশ্বশক্তির প্রাথমিক এ সমঝোতার পর ৩০ জুন ২০১৫ এর মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি হওয়ার কথা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরান ষড়শক্তি সমঝোতার বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে এ আয়োজনে।

সমঝোতার প্রক্রিয়া

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে তেহরানে হয়। ২০ জানুয়ারি ২০১৪ এর চুক্তি কার্যকর হয়। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ স্থায়ী চুক্তি নিমিত্তে একটি আলোচনা শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়ে আগে কয়েক দফা সময়সীমা ঘোষণা করা হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ মার্চ ২০১৫-এর মধ্যে একটি রূপরেখা চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। তবে দুই দফায় এক দিন করে সময় বাড়ানোর পর ২ এপ্রিল ২০১৫ দুই প

রূপরেখা চুক্তিতে পৌঁছার কথা জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ জুনের ২০১৫- এর মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি হওয়ার কথা। যেখানে কোন পক্ষ কী করবে, তার বিশদ বর্ণনা দেয়ার কথা রয়েছে।

যা আছে সমঝোতায়: ২ এপ্রিল ২০১৫ ইরান ষড়শক্তি প্রাথমিক সমঝোতা চূড়ান্ত চুক্তিতে পরিণত হলে আগামী ১০-১৫ বছরে ইরানের পারমাণবিক বোমা তৈরির আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে পারমাণু চুক্তির রূপরেখা নিয়ে যে সমঝোতা হয় তাতে যে বিষয়গুলো রয়েছে-

১. আরাক, ফেরদো ও নাতাঞ্জ ইরানের এ তিনটি পরমাণু কেন্দ্র নিয়ে সমঝোতা হবে।
২. আরাকের পরমাণু চুলি- ঢেলে সাজানো হবে। এতে আর পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প-া টোনিয়াম তৈরি হবে না। ফেরদোয় শুধু গবেষণার কাজ চলবে। সব সেন্ট্রিফিউজ এবং পরমাণবিক জ্বালানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
৩. ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধ করার একমাত্র সেন্ট্রিফিউজগুলো থাকবে নাতাঞ্জে।
৪. নতুন কোনও পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরি করবে না ইরান।
৫. ইরান সমৃদ্ধ ইউরোনিয়ামের পরিমাণ ১০ হাজার কিলোগ্রাম থেকে ৩০০ কিলোগ্রামে নামিয়ে আনবে। প্রায় ৯৭ শতাংশ হ্রস। ১৫ বছর ধরে ইরান ইউরেনিয়ামকে ৩.৭ শতাংশ সমৃদ্ধ করবে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগবে। বোমা তৈরির জন্য ইউরেনিয়ামকে ৯০ শতাংশ সমৃদ্ধ করতে হয়।
৬. ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি-র (IAEA) পরিদর্শনে থাকবে-
৭. ফেরদো-সহ সব পারমাণবিক কেন্দ্র
৮. কোনও সন্দেহজনক কেন্দ্র
৯. পারমাণবিক কর্মসূচির সাথে জড়িত যে কোনও লেনদেন। ইরান নিয়মগুলো মেনে চললে ধাপে ধাপে নানা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘসহ নানা দেশ ও প্রতিষ্ঠান। তবে ইরান নিয়ম না মানলে আবার নিষেধাজ্ঞা আসবে।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্ক

- ১৯৮৯ ফেব্রুয়ারি, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি নির্বাসন থেকে দেশে ফেরেন
- নভেম্বর, তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে মার্কিন নাগরিকদের জিম্মি করা হয়।
- ১৯৮০ ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে যুক্তরাষ্ট্র
- ১৯৮৬ প্রেসিডেন্ট রিগান প্রশাসন গোপনে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে বলে খবর প্রকাশ
- ১৯৮৮ ইরানের বিমান ভূপাতিত করে যুক্তরাষ্ট্র
- ১৯৯৩ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র
- ১৯৯৫ ইরানের ওপর তেল ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র
- ২০০২ জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরানকে 'শয়তানের অক্ষশক্তির অংশ' বলে আখ্যা দেন
- ২০০৫ ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি শুরু করে
- ২০১১ মার্কিন ড্রোন (মানুষবিহীন বিমান) ভূপাতিত করার দাবি করে তেহরান।
- ২০১৩ সেপ্টেম্বর ২৬ : ইরান ও জাতিসংঘের মধ্যে পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ে প্রথম আলোচনা।
- ২০১৩ সেপ্টেম্বর ২৭ : প্রেসিডেন্ট ওবামা ও প্রেসিডেন্ট রুহানির মধ্যে ফোনালাপ। ৩৪ বছর পর এমন ঘটনা প্রথম।

চুক্তির 'খসড়া' শুরু: ইরানের সাথে ছয় জাতিগোষ্ঠীর চুক্তির খসড়া তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ২২-২৪ এপ্রিল ২০১৫ ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত তিন দিনের বৈঠকে চূড়ান্ত পরমাণু চুক্তির খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। খসড়ায় তেহরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

ইরানের বিতর্কিত পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে সৃষ্ট সমাধানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ফ্রান্স, জার্মানি

ও যুক্তরাজ্য গঠন করেছিল EU Three (EU3) গ্রুপ। ২০০৬ সালে এ গ্রুপে যুক্ত হয় চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। তখন থেকে এ গ্রুপটি P৫+১ বা EU৩+৩ নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে P বলতে জাতিসংঘের স্থায়ী ৫ সদস্যকে বোঝায়।

সেন্ট্রিফিউজের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনবে ইরান। এখন প্রায় ১৯ হাজার সেন্ট্রিফিউজ কাজ করছে। তা কমে দাঁড়াবে ৬১০৮-এ। এর মধ্যে ৫০৬০টি সেন্ট্রিফিউজে ১০ বছর ধরে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ-এর কাজ চলবে। এ সেন্ট্রিফিউজগুলো প্রথম প্রজন্মের। নতুন প্রজন্মের উন্নতমানের সেন্ট্রিফিউজিগুলো কড়া পরিদর্শনে থাকবে।

মূল্যায়ন

কিন্তু উপরোক্ত মারাত্মক পরিণতি বিবেচনায় এনে পশ্চিমা শক্তি কখনো ইরানে দীর্ঘযুদ্ধের পরিকল্পনা করবে না। পশ্চিমা শক্তি সম্ভবত নতুন নতুন সংলাপের রূপরেখা অংকন করবে এবং ইরানের সাথে অন্য রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃক্রিয়ার নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হবে। যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চ চাপ দিয়ে ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত পর্যায়ে রাখায় বাধ্য করার নিরন্তন চেষ্টা হবে। সম্ভবত ইরানকে আক্রমণ করার ঝুঁকি যুক্তরাষ্ট্র নিতে চাইবে না, আর যুক্তরাষ্ট্রকে অন্ধকারে রেখে ইসরাইলও ইরান আক্রমণের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরান-মার্কিন বিরোধ আজ বিশ্বব্যাপী আলোচিত একটি বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে এ সুযোগে ইরানকে একটি শিক্ষা দিতে। পক্ষান্তরে, ইরান চাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে নিজেদের দাবি আদায় করতে। যদিও উভয় পক্ষই একে অপরেকে দোষারোপ করে চলেছে এবং পশ্চিমা বিশ্বের অব্যাহত হুমকির মুখেও ইরান তার শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. ইরান স্বাধীনতা লাভ করে কবে?
উত্তর: ১৯২৫ সালে (বৃটেনের কাছ থেকে)
২. ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রগঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১এপ্রিল ১৯৭৯ সালে।
৩. একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য কি হয়ে ওঠে?
উত্তর: বিশ্বের একক কর্তৃত্ব।
৪. কোন দিশ বিশ্বে দ্বিতীয় প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদকারী এবং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ?
উত্তর: ইরান
৫. ইরানের জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হয় না কেন?
উত্তর: পতাকাতে কালেমা তাইয়্যেবা লেখা রয়েছে।
৬. ইরানের প্রথম পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি?
উত্তর: বুশাহর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (প্রতিষ্ঠা ১ মে, ১৯৭৫)
৭. ২৬-৩১ আগস্ট ২০১২ ইরানের রাজধানী তেহরানে কি অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৬ তম ন্যাম সম্মেলন।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৮. ১৯৫৯ সালে পারমাণবিক গবেষণার জন্য ইরান কি প্রতিষ্ঠা করে?
উত্তর: তেহরান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার।
৯. ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কে?
উত্তর: ফারাহ খোশরাভি
১০. কত সালে ফাতেহ ১১০ নামে নতুন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সম্বলিত একটি স্বল্পগল্পের ক্ষেপনাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ইরান?
উত্তর: আগস্ট ২০১২ এর প্রথম সপ্তাহে।
১১. ইরানের পূর্ব নাম কি?
উত্তর: পারস্য।
১২. ইরানের প্রথম পারমানবিক কর্মসূচি শুরু হয় কবে? কার সহায়তায়?
উত্তর: ১৯৫০ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায়।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রগঠিত হয় কবে?
খ. ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত বিরোধের ভবিষ্যৎ অরোচনা করুন?
২. ক. ইরানের ইসলামী বিপ্লব অলোচনা করুন?
খ. ইরান মার্কিন সাম্প্রতিক সম্পর্ক আলোচনা করুন?
৩. ক. ইরানের বর্তমান অর্থনীতি ও বানিজ্য আলোচনা করুন?
খ. ইরানের মধ্যপ্রাচ্য নীতি আলোচনা করুন?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

খ-বিভাগ (Part-B)

১. ইরানের ওপর জাতিসংঘের ২০১০ সালের আরোপিত অবরোধের মূল বিষয়গুলো আলোচনা করুন। সাম্প্রতিক কালে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের উদ্বেগের কারণগুলো আলোচনা করুন?
২. মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের পরাশক্তি হয়ে ওঠা ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি আলোচনা করুন?
৩. ইরানের পরমাণু সংকট আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে সকল প্রভাব ফেলেছে তা আলোচনা করুন?
৪. ইরানের পরাশক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধাগুলোর পেছনে প্রধান কারণগুলো আলোচনা করুন?
৫. ইরান ইস্যুতে বিশ্বশক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন?
৬. ইরানে সম্ভাব্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা শক্তির জন্য চ্যালেঞ্জগুলো

অধ্যায় ৫

আরব বসন্ত : বর্তমান প্রেক্ষাপট
The Arab Spring : Present Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৫.১ আরব বসন্ত
৫.২ আরব বসন্ত ও মিশর
৫.৩ রাজনৈতিক ইতিহাস
৫.৪ যেভাবে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা
৫.৫ মুসলিম ব্রাদারহুড
৫.৬ তাহরির স্কয়ার
৫.৭ প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুরসির ক্ষমতা গ্রহণ
৫.৯ SCAF
৫.১০ প্রেসিডেন্ট-আদালত ও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্টতা
৫.১১ মিসরের স্থগিত এবং খসড়া সংবিধানের তুলনা
৫.১২ মুরসির চ্যালেঞ্জসমূহ
৫.১৩ মুরসির ব্যর্থতা ও পতনের কারণ
৫.১৪ মিশরে অভ্যুত্থান এবং আন্তর্জাতিক মহলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া
৫.১৬ চ্যালেঞ্জের মুখে মিসরের গণতন্ত্র
৫.১৭ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মিসরের করণীয়
৫.১৮ মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ
৫.১৯ আরব বসন্ত ও লিবিয়া
৫.২২ গাদ্দাফির পতনের কারণসমূহ

৫.১ আরব বসন্ত (Arab Spring)

২০১০ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া আরব রাষ্ট্রসমূহের জনগণের বিভিন্ন দাবিতে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংঘটিত হয় তাই আরব বসন্ত বা আর-রবিউল আরাবী নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এর আরেক নাম আরব 'গণজাগরণ'। পুলিশের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আত্মাহুতি প্রদানকারী তিউনিশিয়ার নাগরিক মোহাম্মদ বুয়াজিজির মৃত্যুর মাধ্যমে ১৮ ডিসেম্বর ২০১০ সালে এটি শুরু হলেও ক্রমেই তা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিষয় এ আরব

বসন্তের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আরব দেশসমূহে বিদ্যমান রাজতন্ত্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন আরব দেশসমূহে শ্রমিক শোষণ চলছিল।। যার ফলে ভেতরে ভেতরে আরো অনেক আগেই মৃদু প্রতিবাদ দানা বাঁধছিল। বিগত দশকে এ অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং এ গণজাগরণ ত্বরান্বিত হয়। এ গণজাগরণের ফলে তিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবিদিন বেন আলী বরখাস্ত হন এবং পালিয়ে সৌদি আরবে নির্বাসনে যান। ১৪ মার্চ ২০১১ তার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর ক্রমে আলজেরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মৌরিতানিয়া, সুদান, ওমান, সৌদি আরব, মিশর ইয়েমেন, ইরাক, বাহরাইন, লিবিয়া, কুয়েত, মরক্কো, পশ্চিম সাহারা অঞ্চল, সিরিয়া ও ইসরাইলে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এ বিক্ষোভ সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ফেসবুক ও টুইটারের ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। এ বিক্ষোভের ফলে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনির মোবারক পদচ্যুত হন এবং তার সরকার ক্ষমতা হারায় ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১১। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এখনো সেখানে প্রতিরোধ চলছে। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি ২০ অক্টোবর ২০১১ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ বিক্ষোভের মুখে কিছুদিনের মধ্যে ক্ষামতা ছাড়তে সম্মত হন। সিরিয়া এবং বাহরাইনে সরকার পরিবর্তন ঘটলেও বিক্ষোভ চলছে। মূলত গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন এবং স্বৈরাচারী সরকার বদলই এ আরব বসন্তের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা মতে ৩০ হাজার থেকে ৩৭ হাজার লোক এ আরব গণজাগরণে শহীদ হয়েছেন। অভ্যুত্থানে সহযোগিতার মাধ্যমে ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান ২০১১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। আরব বসন্তের তিউনিশিয়ায় শুরু হলেও এর প্রভাব পড়ে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও পড়ে। উদাহরন স্বরূপ মিশর ও লিবিয়ায় আলোচনা করা হলো:

৫.২ আরব বসন্ত ও মিশর (Arab Spring & Egypt)

মিসর হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সভ্যতার লীলাভূমি। সেই প্রাচীনকাল থেকে দেশটিকে

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে মিসরের রাজনীতি

- মিসরীয় সভ্যতা : পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা এবং ৭ হাজারেরও বেশি বছরের পুরানো।
- খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ অব্দে মিসরে প্রথম পিরামিড নির্মিত হয়।
- খ্রিস্টপূর্ব ৯৮০ অব্দে ফারাও মিসরে ঐশ্বরিক রাজা নির্বাচিত হয়।
- ১৫১৭-১৮৬৭ : এই পর্যন্ত মিসর ছিল অটোমেন সাম্রাজ্যের অংশ।
- ১৯২২ : মিসর স্বাধীন রাজতন্ত্রে পরিণত হয়।
- ১৯৫৩ : ১৮ জুন, প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।
- ১৯৫৮ : ১ ফেব্রুয়ারি, মিসর ও সিরিয়া একত্রিত হয়ে গঠন করে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র।
- ১৯৬১ : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়।
- ১৯৮১ : ৬ অক্টোবর আনোয়ার আল সাদাতকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন হোসনি মোবারক।
- ১৮৮২ : যুক্তরাজ্য মিসর দখল করে নেয়।
- ১৮৬৯ : সুয়েজ খাল খনন শেষ হয় (দৈর্ঘ্য-১৬২ কিলোমিটার)।
- ১৮৬৯ : সুয়েজ খাল ব্যবহার শুরু হয় (লোহিত ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছে)।
- ১৯৫৬ : সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করেন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের।
- ১৯৬৭ : মিসর খালটি বন্ধ করে দিয়েছিল।
- ১৯৭৫ : সুয়েজ খালটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়।
- ১৯৮১ : ৬ অক্টোবর, আনোয়ার সাদাত নিহত।
- ১৯৮১ : ক্ষমতায় আসেন হোসনি মোবারক।
- ২০১১ : ১১ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করেন (১৯৮১-২০১১)।
- ২০১২ : ২ জুন মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।
- ২০১২ : ৩০ জুন ড. মোহাম্মদ মুরসি মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ২০১৩ : ৩ জুলাই মিসরে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে এবং ঐ দিনেই প্রেসিডেন্ট মুরসিকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনাবহুল পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থান হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে মিসর মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ। তাই তাকে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রাখতে হয়।

দেশটির জাতীয় রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। ১৯৫২ সালে কর্নেল গামাল আবদেল নাসের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এরপর থেকে সেনাবাহিনী হয়ে উঠে দেশটির প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি। তখন থেকে দেশের প্রধান প্রধান সরকারি-বেসরকারি পদগুলো সামরিক কর্মকর্তাদের অধিকারে। তারা হয়ে ওঠে দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী। গত ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিসর শাসন করেছেন ১. মোহাম্মদ নাগিব, ২. গামাল আব্দুল নাসের, ৩. আনোয়ার সাদাত, ৪. হোসনি মোবারক।

পশ্চিমা বিশ্বের তাবেদারি এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে কৌশলী ভূমিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে হোসনি মোবারক প্রায় ৩০ বছর মিসরের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছরের একনায়কতন্ত্র মিসরবাসীর জীবনযাত্রাকে বিষিয়ে তুলেছিল। তার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে ২০১১ সালের শুরুতে আরব বিশ্বে আরব বসন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই। মোবারক সেনাশক্তি দিয়ে গণআন্দোলন দমন করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং গণআন্দোলনের সময় দমন-পীড়নের জন্য তাকে নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করে। হোসনি মোবারকের পর মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ মুরসি। কিন্তু গত ৩ জুলাই, ২০১৩ তারিখে তিনি সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। এর ফলে মিশরের গনতন্ত্র পুনরায় অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়।

৫.৩ রাজনৈতিক ইতিহাস (Political History)

১৯২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশরা মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯২৩ সাল থেকে নতুন সংবিধান রচিত হলে দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মনে রাখার Technique & Tips

একনজরে মিসরের রাজনীতি

- ২ জুন ২০১২: মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।
- ৩০ জুন ২০১২ : মিশরের প্রথম বেসামরিক ও ইসলামপন্থি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ড. মোহাম্মদ মুরসি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১২ আগস্ট ২০১২ : সেনাবাহিনী খমতা খর্ব করে সংবিধানের একটি অংশ বাতিল ও সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত।
- ২২ নভেম্বর ২০১২ : নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মুরসির ডিক্রি জারি।
- ৩০ নভেম্বর ২০১২ : ইসলামপন্থি প্রাধান্যপুষ্ট সাংবিধানিক পরিষদে মুরসির প্রণীত খসড়া সংবিধান গৃহীত।
- ১৫ ও ২২ নভেম্বর ২০১২ : দুই দফা গনভোটে নতুন সংবিধান পাস। এরপর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে।
- ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ : মুরসি বিরোধী বিক্ষোভকারী ও পুলিশের সংঘর্ষে নিহত ৬০।
- ২ জুন, ২০১৩ : নতুন সংবিধান খসড়া প্রনানকারী সিনেটকে সাম্প্রিমকোর্টের অকার্যকর ঘোষণা।
- ২১ জুন, ২০১৩ : বিরোধীদের বিক্ষোভের আগে মুরসির লক্ষাধিক সমর্থকের শক্তি প্রদর্শন।
- ২৯ জুন, ২০১৩ : মুরসিকে আরও গঠনমূলক হতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আহ্বান।
- ৩০ জুন, ২০১৩ : তাহরি স্কয়ারে মুরসি বিরোধী বিক্ষোভ।
- ১ জুলাই, ২০১৩ : মুরসিকে সেনাবাহিনীর আল্টিমেটাম।
- ৩ জুলাই, ২০১৩ : সেনাবাহিনী কর্তৃক মুরসি ক্ষমতাচ্যুত।
- ১৪ আগস্ট, ২০১৩ : মুরসিপন্থি ও মুসলিম ব্রাদারহুড-এর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর অভিযানে প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত এবং সরকারের ১ মাসের জরুরি অবস্থা ঘোষণা।
- ২৬-২৮ মে, ২০১৪ : মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সিসির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হামদিন সাবাহি। নির্বাচনে ৪৭.৫% ভোট পড়ে এবং ৯৬.৯১% পেয়ে নির্বাচিত হন সিসি, আরসাবাহি পান ৩.০৯% ভোট।
- ৮ জুন, ২০১৪ : মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন আবদেল ফাত্তাহ সাঈদ হোসেন খলিল আল সিসি।

৫.৪ যেভাবে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা

প্রায় ৩০ বছর ধরে মিসরের ক্ষমতার মসনদে ছিলেন একনায়ক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। তার উৎখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ২৮ বছর বয়সী খালিদ সাইদ নামের এক তরুণ। ফেসবুকে সরকারের অপকর্ম প্রকাশের দায়ে প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারের পেটোয়া বাহিনী পিটিয়ে হত্যা করে খালিদ সাইদকে। এ হত্যাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় সরকার পতন আন্দোলন। পুলিশের রক্তচক্ষুতে প্রাণ হারানো খালিদ সাইদের নামে তার বন্ধুরা মিলে তৈরি করে ফেসবুকের একটি গ্রুপ, যার নাম 'খালিদ সাইদ মেমোরিয়াল ফেস'। We are Khalid Sayed নামের ফেসবুকের এ পেজে স্মরণ করা হয়েছিল খালিদ সাইদকে। আর ফেসবুকে আপলোড করা দৃশ্যে দেখানো হয় পুলিশের হামলায় সাইদের বিকৃত লাশের ছবি। এ ভিডিওটিই মোবারক বিরোধী আন্দোলনে বিষবাষ্প ছড়ায়। আর খালিদ হয়ে ওঠে মিসরের চে গুয়েভারা। তার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উই আর অল খালেদ সাইদ' (আমরা সবাই খালেদ সাইদ) নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনে ইসলামি ভাবাপন্ন তরুণ থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী, গামাল আবদেল নাসেরের অনুসারী, উদারপন্থি ব্যক্তিরা যোগ দেন। এর সাথে যুক্ত হন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সাবেক মহাপরিচালক ও নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ এলবারাদি। সংগঠনটির মুখপাত্র হিসেবে তিনি ভূমিকা রাখেন।

৫.৫ মুসলিম ব্রাদারহুড (Muslim Brotherhood)

মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ান আল-মুসলিমিনের জন্ম ১৯২৮ সালে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হাসান আল বান্নার এ দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অজ্ঞাত পরিচয় এক বন্দুকধারীর গুলিতে হাসান আল বান্না নিহত হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দলটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হয়ে মিসরের সবচেয়ে বড় সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল। ইসলামি শাসন আর শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা দলটির মূল লক্ষ্য। শুধু মিসর নয় মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশেই এ দলটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলে। এ পর্যায়ে দলটি মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশের জাতীয় রাজনীতিতে অন্যতম নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতিটি দেশেই তারা দমন-পীড়নের শিকার হয়। মিসরে ১৯৫৪ সালে দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। বেশ কয়েকবার তাদের ওপর বড় আকারের দমন অভিযান চালানো হয়। তারা বরাবরই রাজনীতিতে সেনাবাহিনী এবং



পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। তারা বেশ কয়েকবার সেনাবাহিনীতে প্রবেশের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। সেনাবাহিনীর হাতে তাদের অসংখ্য নেতা-কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এসব কারণে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দলটির সম্পর্ক বেশ শীতল।

৫.৬ তাহরির স্কয়ার (Taherir Square)

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে যে গণবিক্ষোভ হয় তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাহরির স্কয়ার। আরবিতে ডাকা হয় ময়দান আল-তাহরির, ইংরেজিতে 'লিবারেশন স্কয়ার'। এটিই কায়রোর গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থল। জায়গাটিকে আগে ডাকা হতো ইসমাইলিয়া ময়দান নামে। উনিশ শতকের শাসক খেদিভ ইসমাইলের শাসনক্ষমতা অর্পণের মধ্য দিয়ে সেখানে নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠে। এরপর ১৯১৯ সালে ইজিপ্ট বিপ্লবের পর এ স্কয়ার হয়ে ওঠে তাহরির স্কয়ার। কিন্তু ১৯৫২ সালে ইজিপ্ট বিপ্লব পর্যন্ত তাহরির স্কয়ার নামটি সরকারিভাবে ছিল না। কোনো সংগঠনের সদস্য না হয়েও ইন্টারনেটে সরকারবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে গেছে, এমন অনেক তরুণের একজন আহমেদ শাহাই। ২০১১ সনের ২৫ জানুয়ারির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার আগে সে তার ১২২ জন ফেসবুক বন্ধুকেও তার সাথে তাহরির স্কয়ারে যেতে আমন্ত্রণ জানায়। ইন্টারনেট-আন্দোলনের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে মিসর সরকার ২৭ জানুয়ারি, ২০১১ সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো। লোকজন তখন কম্পিউটার ছেড়ে তাহরির স্কয়ারে জমায়েত হয়।

৫.৭ প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুরসির ক্ষমতা গ্রহণ (Mursi as a President)

২০১২ সালের ২৩ ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুরসি মিসরের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। নির্বাচনে মোট ১২জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে সর্বোচ্চ ২৫.৩ শতাংশ ও ২৪.৯ শতাংশ করে ভোট পান যথাক্রমে মুসলিম ব্রাদার হুডের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম এন্ড জাষ্টিস পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ মুরসি ও হোসনি মোবারক আমলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমেদ শফিক। কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়ায় এ দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় দু'দিন ব্যাপী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৬-১৭ জুন ২০১২। ২৪ জুন ২০১২ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে ৫১.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন মুসলিম ব্রাদারহুড-এর প্রার্থী মোহাম্মদ মুরসি আর স্বতন্ত্র প্রার্থী আহমেদ শফিক পান ৪৮.২৭ শতাংশ ভোট। স্বৈরশাসক মোবারকের পতনের পর প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট পেয়েছিল এবং মিসরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

৫.৮ মোবারকের যাবজ্জীবন (Imprisonment of Mubarak)

২ জুন, ২০১২ তারিখে মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় রাজধানী কায়রোর পুলিশ একাডেমির ভিতরে স্থাপিত বিশেষ আদালত। ২০১১ সালে আরব বসন্ত চলাকালে বিক্ষোভকারীদের হত্যার দায়ে এ সাজা দেওয়া হয় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে। ১৯৮১ সালে ক্ষমতায় আসা মোবারক জনবিক্ষোভের মুখে ২০১১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন।

৫.৯ SCAF (Supreme Command of the Armed Forces)

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে হোসনি মোবারকের উৎখাত হওয়ার পর থেকে দেশটি শাসন করছে ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ হোসেন তানতাবির নেতৃত্বাধীন সামরিক জান্তা যার সরকারি নাম সুপ্রিম কাউন্সিল অব দা আর্মড ফোর্সেস বা (Supreme Command of the Armed Forces-SCAF)। ক্ষমতাধর এ জান্তা ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকরী সংবিধান স্থগিত করে।

৫.৯ SCAF

৫.১০ প্রেসিডেন্ট-আদালত ও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্টতা

১৪ জুন, ২০১২ মিসরের সাংবিধানিক আদালত মিসরের নির্বাচিত পার্লামেন্টকে অবৈধ ঘোষণা

করে। বর্তমান মিসরের চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নতুন 'লৌহমানব' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন দেশটির সেনাবহিনীর প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। সেনাবহিনীর প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি দেশটির ইসলামপন্থি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে বিরোধীদের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রশ্নে সমঝোতায় পৌঁছাতে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেন। এরই প্রেক্ষাপটে ৩ জুলাই, ২০১৩ রাতে গণবিক্ষোভের মুখে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক বছরের মাথায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে সরিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী।

৫.১১ মিসরের স্থগিত এবং খসড়া সংবিধানের তুলনা (Comparison Between Postponed & Draft Constitution)

মিসরের গণপরিষদে দেশের খসড়া সংবিধান গৃহীত হয় ৩০ নভেম্বর ,২০১২ নতুন সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে প্রথম দফা গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ডিসেম্বর, ২০১২।

১৯৭১ সালে পাস করা সংবিধান (যা মোবারকের পতনের পর স্থগিত করা হয়) তার সঙ্গে বর্তমান সংবিধানের তুলনা করলে এর সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

১. **রাষ্ট্রের পরিচিতি :** ১৯৭১- এর সংবিধানে মিসর আরব প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমান সংবিধানে মিসর আরব প্রজাতন্ত্র নামের দেশটি একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র, যা কখনো ভাগ হতে পারে না। এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির। মিসরের জনগণ আরবী এবং ইসলামি জাতির অংশ। এর জনগণ নীলনদ এবং আফ্রিকার অংশ এবং এশিয়ার অংশ হয়ে গর্ববোধ করে।

২. **ইসলাম এবং শরীয়াহ (ইসলামিক আইন) :** পূর্বের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২ এ বলা হয়েছে, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম। সরকারি ভাষা আরবি। শরিয়াহর বিধান আইনের প্রধান উৎস। বর্তমানে ২ অনুচ্ছেদে একই। তবে নতুন অনুচ্ছেদ ২১৯- এ বলা হয়েছে, সুন্নি ইসলামের বিধিবিধান, ভিত্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩. **ধর্ম :** রাষ্ট্র সকলের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় অধিকারের স্বাধীনতা দেবে। বর্তমান সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৪৩- বলা হয়েছে আইনের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদী ধর্মীয়দের বিশ্বাস, ধর্মীয় কার্যক্রমের স্বাধীনতা এবং প্রার্থনার স্থানের নিরাপত্তা দেবে। অনুচ্ছেদ ৪৪-এ নবী এবং তার বাহকদের তিরস্কার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৪৫- এ মত এবং চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মৌখিক, লিখিতভাবে অথবা ছবির মাধ্যমে অথবা প্রকাশনার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি মত প্রকাশ করতে পারবে।

৪. **গণতন্ত্র এবং শুরা (পরামর্শভিত্তিক) :** সংবিধান বহুত্ববাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আগের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক পদ্ধতি গণতন্ত্র এবং শুরার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে বলে বর্তমান সংবিধানে আছে।

৫. **নারী :** মোবারক আমলের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০-এ উল্লেখ আছে, নারীর মাতৃত্ব এবং শৈশবকালীন নিরাপত্তা দেবে রাষ্ট্র। শিশু এবং তরুণীদের দেখাশোনা করবে এবং এদের মধ্যে মেধাবীদের উন্নতির জন্য সহায়তা দেবে। অনুচ্ছেদ ১১- তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র পরিবারে এবং সমাজে নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ মর্যাদার নিশ্চয়তা দেবে। ইসলামি আইনের কোনো লঙ্ঘন না করে সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্র নারীর মাতৃত্ব এবং শৈশবের দেখাশোনা করবে বিনামূল্যে। এটা নারীর কর্তব্য এবং বাইরে কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের নিশ্চয়তা দেবে। রাষ্ট্র তালাকপ্রাপ্ত এবং বিধবাদের নিরাপত্তা দেবে। অনুচ্ছেদ ৩০ অনুযায়ী অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান। এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। কিন্তু সেখানে নারীর অধিকার সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই।

৬. **অধিকার এবং স্বাধীনতা :** আগের সংবিধানে অধিকার এবং স্বাধীনতা সংক্রান্ত ২৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। নতুন সংবিধানে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত ৫১টি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করেছে। ৭৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাজ করতে বাধ্য করা,

দাসত্ব এবং যৌন ব্যবসা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য। সংবিধানে মানব পাচারের ওপর সুস্পষ্ট কোনো বিধিনিষেধ নাই এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির বিষয়েও কোনো উল্লেখ নেই।

৭. **সামরিক দিক :** পুরনো সংবিধানে এ সংক্রান্ত কোনো অনুচ্ছেদ ছিল না। বর্তমানে কোনো বেসামরিক নাগরিক যদি এমন কোনো কাজ করে যাতে সামরিক বাহিনীর ক্ষতি হয় তাহলে তার সামরিক আদালতে বিচার হবে।

৮. **গণমাধ্যম :** পুরোনো সংবিধানে এ সম্পর্কিত কোনো অনুচ্ছেদ ছিল না। বর্তমান সংবিধানে ৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গণমাধ্যম সংস্থাগুলো স্থগিত, বন্ধ কিংবা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। কেবল বিচারিক আদেশের বলে করা যাবে। ৪৯ নং যোগ করা হয়েছে, এ বিজ্ঞপ্তি কেবল চালু করার সময় এবং নিজস্ব পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৯. **বিচারালয় :** আগের সংবিধানে এ নিয়ে কোনো অনুচ্ছেদ ছিল না। সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালত প্রেসিডেন্ট এবং ১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। বর্তমানে এ আদালত প্রেসিডেন্ট এবং ১৮ সদস্য নিয়ে গঠিত।

১০. **রাষ্ট্রপতির ম্যান্ডেট সংক্রান্ত :** আগের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মেয়াদ ছিল ৬ বছর। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছামতো নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন। বর্তমানে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ৪ বছর এবং ২ বার নির্বাচন করতে পারবেন। এছাড়া অনুচ্ছেদ ২৩২-এ মোবারক আমলের সব নেতাকে আগামী ১০ বছরের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমানে মিসরের জনগণ এমন একটি রাষ্ট্র কামনা করছে যেখানে তারা স্বাধীনভাবে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারবে। তারা এখন আর সামরিক সরকার, স্বৈরাশাসক এবং ধর্মভিত্তিক কোনো শাসক চায় না। তারা চায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। দেশটির জনগণের জন্য এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সহজ হবে না।

৫.১২ মুরসির চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges faced by President Mursi)

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পেসিডেন্ট মুরসিকে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেগুলো সমাধানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হন। মুরসির অন্যতম চ্যালেঞ্জগুলো ছিল :

প্রথমত, অবশ্যই মিসরের সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়ত, সামরিক জান্তা বা SCAF (Supreme Command of the Armed Forces) বলে যারা পরিচিত তাদের ক্ষমতা খর্ব করে দেশকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালনা করা। যে সকল চ্যালেঞ্জসমূহ মুরসিকে মোকাবেলা করতে হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তা হলো :

১. ক্ষমতাসীন সেনাবাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করে নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
২. দেশের সকল জনসাধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়ন করা।
৩. ইসরাইলের সাথে অতীতে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তি মেনে চলা এবং ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।
৪. ইরানের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর। ১৯৭৮ সালে মিসর ইসরায়েলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইরান মিসরের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। বর্তমানে মুরসির সরকার ইরানের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়না মিসর ইরানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
৫. দেশে জমে থাকা দীর্ঘ দিনের ঘুষ, দুর্নীতি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও নিরাপত্তার মতো গুরুতর সংকট সমাধান করা।
৬. অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বিদেশি বিনিয়োগ আসার পথ মসৃণ করা।

৫.১৩ মুরসির ব্যর্থতা ও পতনের কারণ (Failure and Fall of Mursi)

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির অধীনে এক বছরের শাসনামলে দেশটিকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের চেয়ে বেশি মোকাবেলা করতে হয়েছে অর্থনৈতিক চাপ এবং এটিই দেশের

গনতান্ত্রিক রূপান্তর ও নতুন প্রেসিডেন্টের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে মুরসির ব্যর্থতা ও পতনের কারণ আলোচনা করা হলো :

১. **আর্থিক সংকট :** ২০১১ সালের শুরুতে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আশায় বুক বেঁধেছিল মিসরীয়রা। কিন্তু তাদের সে আশা গুড়ে বালি হয়েছে। মুরসি সরকার ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য যে প্রস্তাবিত বাজেট দিয়েছিল সেখানে নতুন সরকারি বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল মাত্র ৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৯.৬ শতাংশ। যা এর আগের বছর ছিল ১০.৭ শতাংশ। তবে এটি বিশ্বাসযোগ্য ও অর্জনযোগ্য নয় বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন আল-জাজিরার সাংবাদিকরা। তাদের মতে, ঘাটতি কমানোর মতো সক্ষমতাই নেই মুরসি সরকারের। তাদের মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুদ দিতে গিয়েই মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া সম্ভব ছিল না।

২. **বেকারত্ব :** বেকার সমস্যা মিসরে প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। বর্তমান মিসরে ৩৫ লাখ লোক কর্মহীন। যদিও সরকারের লক্ষ ছিল বেকারত্বের হার ১৩ শতাংশের নিচে রাখার এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮০ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি করার। কিন্তু তা বেকারত্বের হার কমাতে মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না কারণ মিসরের চাকরির বাজারে প্রতিবছর প্রায় সমসংখ্যক নতুন চাকরিপ্রার্থী যুক্ত হয়।

৩. **দরিদ্রতা :** মিসরের শতকরা ২৫ জন লোক এখন দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। রাজধানী কায়রোর ফুটপাতে অনেকেই শুয়ে থাকে সাহায্য পাবার আশায়। ৬৭ শতাংশ লোকের কোনো স্বাস্থ্যবীমা নেই। মোবারকের আমলে এতটা খারাপ পরিস্থিতি মিসরে ছিল না।

৪. **বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাওয়া :** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার, উচ্চ বাজেট ঘাটতি, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অধিক প্রত্যাশার কারণে মুরসি সরকার দিশেহারা হয়ে ওঠেছিল। আর এ সকল অর্থনৈতিক সমস্যার ফলে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যাওয়া। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক রিম আব্দ এলহালিম মনে করেন, "মিসরের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ না বাড়লে এবং ইজিপশিয়ান পাউন্ডের ওপর অত্যধিক চাপ না কমলে সমস্যাগুলো সমস্যাই থেকে যাবে, গণতন্ত্রের সুফল আর ভোগ করা হয়ে উঠবে না।
অধ্যাপক এলহালিমের কথা অবশেষে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, বিফলে গেছে তাহরির স্কয়ারের প্রথম গণআন্দোলন। পর্যুদস্ত অর্থনৈতিক চাপ অবশেষে মিসরের জনগণকে পুনরায় মুরসি বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

পতনের কারণ :

১. সংবিধান সংশোধন ও ডিক্রি জারির মাধ্যমে মুরসি ও তার দল ব্রাদারহুড সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।
২. পাশাপাশি শরিয়া আইনের কিছু কিছু বিধান জারি করে, রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণ করার কারনে জনগণের বিরাট অংশ তা মানতে পারে নি।
৩. আইএমএফ- এর নির্দেশে মিসরের অর্থনীতিকে বাজারীকরণ করে এবং রাষ্ট্রীয় সেবা সুবিধা উঠিয়ে নেয়। অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতি মুরসির জন্য রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখা যায়।
৪. মুরসি সংবিধান সংশোধন করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৫. ধর্মের নামে নারী অধিকার হরণ এবং তাদেরকে গৃহকোণে বন্দী করে রাখার প্রয়াস চালায়।
৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান এবং জনগনের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে নি বরং বেড়েছে বিদ্যুৎ সংকটসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম।
৭. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, রাজধানী কায়রোসহ অন্যান্য শহরের রাস্তাঘাটে নিরাপত্তাহীনতা, যানজট, ও আবর্জনা বেড়েছে।
৮. বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটন শিল্পকে জাগিয়ে তুলতে না পারা এবং
৯. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংকট প্রভৃতি ছিল পতনের অন্যতম কারণ।

৫.১৪ মিশরে অভ্যুত্থান এবং আন্তর্জাতিক মহলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

১. **জাতিসংঘ :** জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তেজনা ও

অনিশ্চয়তা খুব বেশি। তিনি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অহিংসে থেকে ধৈর্য ধরে আলোচনায় বসার আহবান জানান।

২. **যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইসরাইল :** মিসরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পশ্চিমা মিত্র যুক্তরাষ্ট্র চলমান এ সংকটের বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘটনাকে এখনো সেনা অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দেয় নি হোয়াইট হাউজ। কারণ ১৯৮৫ সালের মার্কিন আইনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর হাতে কোনো দেশের বৈধ নির্বাচিত সরকার উৎখাত হলে দেশটিতে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা অবশ্যই স্থগিত করা হবে। কাজেই সেনা অভ্যুত্থান হিসেবে স্বীকার করলে আইন অনুযায়ী মিসরের সামরিক বাহিনীকে প্রায় ১৫০ কোটি ডলার সহায়তা বন্ধ করে দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র ইসরাইলও সমর্থন দিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারকে। ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রকে মিসরে আর্থিক সহায়তা বন্ধ না করার সুপারিশ জানিয়েছে। ২০১৩ সালে ১৪ জুলাই, আমেরিকার ২জন প্রভাবশালী সিনেটর লিওসে গ্রাহাম ও জন ম্যাককেইন অ্যাশটন বলেন, মুরসিকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। মুরসিসহ বন্দী রাজনীতিকদের মুক্তি দেবার আহবান জানান তাঁরা।

৩. **যুক্তরাজ্য :** যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন, আমরা কোনো দেশেই সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি সমর্থন করি না। কিন্তু মিসরে গণতন্ত্রের বিকাশ এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

৪. **রাশিয়া :** রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সব রাজনৈতিক শক্তির ধৈর্য্য ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এটা করতে হবে এবং প্রমাণ দিতে হবে, যেকোনো সহিংসেতা ছাড়াই তারা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় থেকে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

৫. **ইউরোপীয় ইউনিয়ন :** ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়ক প্রধান ক্যাথরিন অ্যাস্টন বলেন, মিসরের রাজনৈতিক বন্দীদের শিগগিরই মুক্তি ও নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য দেশটির নতুন নেতাদের প্রতি আহবান জানান। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলামপন্থি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার কারণে আফ্রিকান ইউনিয়ন ৫ জুলাই, ২০১৩ মিসরের সদস্য পদ স্থগিত করে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা সংবিধান পরিপন্থী। মিসরে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশটির এ সদস্য পদ স্থগিত থাকবে।

৬. **সংযুক্ত আরব আমিরাত :** মিসরের পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান মিসরের সামরিক বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, মিসরের জনগণ এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

৭. **সিরিয়া :** সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, মুসলিম ব্রাদারহুডের 'মিথ্যাচার' জনগণের সামনে ফাঁস হয়ে গেছে।

৫.১৫ নতুন নির্বাচনের রূপরেখা

২০১৩ সালের ৮ জুলাই এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ঘোষিত রূপরেখায় অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান আদলি মনসুর বলেন, ২০১৪ সালের প্রথম দিকে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। আগামি ১৫ দিনের মধ্যে স্থগিত করা ব্রাদারহুডের খসড়া সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হবে। তবে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মুরসির রাজনৈতিক দল এ রূপরেখাকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ রূপরেখা জনগণকে আবার তাহরির স্কয়ারের দিকে নিয়ে যাবেন।

৫.১৬ চ্যালেঞ্জের মুখে মিসরের গণতন্ত্র (Obstacles to Introduce Democracy)

শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক মিসর এখনো অনেক দূরে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যে সকল বাধা আসতে পরে সেগুলো হলো :

১. **মিসরীয় সেনাবাহিনী :** মিসরের গণতন্ত্রের পথে প্রধান বাধা ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অবস্থান। মিসরীয় সেনাবাহিনী সত্যিই বিজয়ী প্রার্থীর হাতে সব ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়বে কিনা এ নিয়েও বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। ক্ষমতাসীন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ (স্কাফ) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক সাংবিধানিক প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে সামরিক বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের কোনো হাত থাকবে না। স্কাফ নিজেদের নেতা নিজেরাই নির্বাচন করবে। দেশের বাজেট তাদের হাতে থাকবে। আইনগত বিষয়ও থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণ, নতুন স্থায়ী সংবিধান প্রণীত

না হওয়া পর্যন্ত দেশে সাধারণ নির্বাচন হতে পারবে না। স্কার্ফ অনুমোদন দিলেই কেবল প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

২. **মার্কিন-ইসরাইলের ভূমিকা :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল সরকার দীর্ঘদিন মোবারক সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে তাদের স্বার্থের প্রয়োজনে সেখানে একটি অগণতান্ত্রিক সরকার টিকিয়ে রেখেছিল। মিসরে মুরসি নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হলে সেই সরকার মার্কিন-ইসরাইলের তাবেদারি সরকার হিসেবে কাজ করবে না যা ইসরাইল মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী, ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক মার্কিন-ইসরাইল অক্ষ সেখানে তাদের স্বার্থের বিরোধী কোনো সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে না।

৩. **সাংবিধানিক আদালত :** মিসরের সাংবিধানিক আদালত যা সে দেশের সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ আদালত নিজেদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে দ্বিধাবোধ করে না। উল্লেখ্য যে, মিসরের সাংবিধানিক আদালত জুন, ২০১২ তারিখে গত বছর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে পুনরায় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। পার্লামেন্টকে অবৈধ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে মিশরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুদূর পরাহত হয়। মুবারকের পতনের পর মিসরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আশা সঞ্চারিত হয়েছিল আদালতের এ রায় তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করেছে। এ রায়কে দেশটির রাজনৈতিক নেতারা সেনা অভ্যুত্থানের সামিল বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে সামরিক পরিষদ আদালতের মাধ্যমে তাদের শাসনকে বৈধ করে নিতে চাইছে যা মিসরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

৪. **দ্বিধাবিভক্ত মিসরীয় সমাজ :** মিসরে দীর্ঘদিন গণতন্ত্র না থাকায় সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। যেমন মোবারকপন্থি, মোবারকবিরোধি, আবার ইসলামপন্থি এবং উদারপন্থি, মুসলিম এবং অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার অভাব রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এ সকল সমস্যা সমাধান করাই মুরসির প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৫.১৭ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মিসরের করণীয়

মিসরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে সকল পদক্ষেপ নিতে হবে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **সকলের জন্য সরকার :** গণতন্ত্রের মূল শর্তই হচ্ছে সকলের সমান অধিকার। মিসরে যেমন ৯০% মুসলিম রয়েছে তেমনি ১০% খ্রিস্টান সম্প্রদায় রয়েছে। সেখানে রয়েছে উদার গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণি। মুরসির মুসলিম ব্রাদারহুড একটি ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠন। দলমত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি উদার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার বিরোধী তারা। তারা চায় মিশরে ইসলামি শরিয়া মোতাবেক একটি ইসলামি সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। মিশরে ইসলামি শরিয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে সেখানে খ্রিস্টানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ও উদার মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠির স্বাধীনতা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ বাধাগ্রস্ত হতে পারে যা মিসরের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

৩. **সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন :** শাসন ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর বিশাল প্রভাব রয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাই মোহাম্মদ মুরসিকে দেশ পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীর সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী প্রধান কাজ হবে সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। এ অবস্থায় একদিকে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে সঙ্গে নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করা এবং অন্যদিকে সামরিক বাহিনীকেও যথাসম্ভব সংহত ও নিয়ন্ত্রিত রেখে শাসন প্রণালির গণতান্ত্রিক সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া জরুরি।

৫. **আন্তর্জাতিক চুক্তি ও শর্ত মেনে চলা :** ইসরাইল, পশ্চিমা বিশ্বসহ অতীতে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সকল চুক্তি মোহাম্মদ মুরসিকে মেনে চলতে হবে। কারণ ক্ষমতাসীন হয়ে দ্রুত তাদের অপছন্দের চুক্তিসমূহ বাতিল করতে গেলে তা মিসরে গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হবে। বিশেষ করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক মোহাম্মদ মুরসির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে রইবে। প্রেসিডেন্ট মুরসি অবশ্য ঘোষণা করেছেন যে তার সরকার সব আন্তর্জাতিক ঘোষণা মেনে চলবে, যার মধ্যে ১৯৭৮ সালের ক্যাম্পডেভিড চুক্তি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত।

৬. **পাশ্চাত্যের সাথে সুসম্পর্ক :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। হোসনি মোবারকের আমলে মিসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে

ইসরাইলের পর দ্বিতীয় সাহায্যলাভকারী দেশ ছিল। মিসরে ইইউসহ অনেক মার্কিন বিনিয়োগ আছে যা মিসরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

৭. **ইসরাইলের সাথে সুসম্পর্ক :** ১৯৭৮ সালে মিসর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় এর পর থেকে ইসরাইল এবং পশ্চিমারা হয়ে ওঠে দেশটির ঘনিষ্ঠমিত্র। এ কারণে দেশটিকে আরবলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। মোবারকের আমলে মিসর ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের একমাত্র মিত্র। তারা মিসরের সেনাবাহিনীকে অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করতে থাকে। জনসমর্থন না থাকলেও শুধু সেনাবাহিনীর জোরে তিন দশক ক্ষমতায় ছিলেন হোসনি মোবারক। তিনি ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের যেকোনো নীতি বাস্তবায়নের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।
ইসরাইলের সাথে আরববিশ্বের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে। আরববিশ্বের একমাত্র ব্যতিক্রম মিসর যার ইসরাইলের সাথে সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। মিশরে গত ৩০ বছর মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হোসনি মোবারকের সরকার ইসরাইলের সাথে প্রতিবেশী সুলভ সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। মিসর ১৯৭৮ সালে ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করেছে যা ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি নামে পরিচিত। যদিও এ চুক্তির কারণে মিসর আরববিশ্বে তার অনেক বন্ধু রাষ্ট্র হারিয়েছে। কিন্তু প্রভাবশালী প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ইসরাইলের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটালে পশ্চিমা বিশ্বে ও তার প্রভাব পড়বে। এতে করে মিসর যতটা না লাভবান হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উভয় দেশের সম্পর্কটা দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যাতে সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং মিসরের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে যাকে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসরাইলের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে মিসরের পক্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশ দুরূহ হবে।

৮. **মধ্যপ্রাচ্যসহ আরববিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা :** মিসর ১৯৭৮ সালে ইসরাইলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইরান মিশরের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথেও সম্পর্কের অবনতি হয়। মিসরকে ইরানের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথেও সম্পর্ক উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে করে মিসর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে বহুপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার প্রয়াস পাবে যা মিসরের গণতন্ত্র বিকাশে সহায়ক হবে।

৯. **গণতন্ত্রের বিকাশ :** মিসরে বিগত ৫০০০ বছরের ইতিহাসে এ প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। মিশরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। ক্ষমতা পালাবদলের সকল পন্থা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে যাতে করে সামরিক বাহিনী বা তৃতীয় কোনো অনির্বাচিত শক্তি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে না পারে। গণতন্ত্র বিকাশের মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত মিসরীয় সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

১০. **অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করা :** ৪০ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। গত প্রায় দুই বছরের বিপ্লব সংগ্রাম, জ্বালাও পোড়াও দেশটির বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা কমিয়ে দেওয়ায় সম্ভাবনাময় পর্যটন খাত বিপর্যস্ত। বিদেশি বিনিয়োগ দেশ ছেড়ে গেছে। বহুসংখ্যক কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। ধর্মঘটে বিপর্যস্ত হয়েছে সরকারি বেসরকারি খাত। টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি এবং আরব অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্থবিরতার মধ্যে মুরসিকে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হবে। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে দেশকে একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে হবে কারণ মুরসি পতনের মূলে দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাই প্রধান কারণ ছিল।

১২. **মিসরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন সহযোগিতা :** ৩০ জুন, ২০১২ মিসরের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মুরসিকে শপথ নেওয়ার পর মাত্র এক পক্ষের মাথায় সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ১৪ জুলাই, ২০১২ মিসর সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্র যদিও মুরসি বিজয়ের পর তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং মিসরের গণতান্ত্রিক সরকারকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিল। মিসরের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্র কায়রোকে সহযোগিতা দেবে। মিসরের মাঝারি ও ক্ষুদ্র বাণিজ্যে ২৫ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র-মিসর এন্টারপ্রাইজ ফান্ড নামে ছয় কোটি ডলারের একটি তহবিল খোলার ঘোষণা দেন তিনি।

৫.১৮ মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ

মিসরের একটি আদালত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মুসলিম ব্রাদারহুড সব ধরনের রাজনৈতিক

কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করেছেন। এদিকে, আদালতের রায়ে আরও বলা হয়-মার্চে অনুমোদন পাওয়া মুসলিম ব্রাদারহুডের এনজিওর কোনো আইনী বৈধতা নেই। আদালত এনজিওর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছেন।

মূল্যায়ন

২০১১ সালের আরব বসন্ত মিসরের রাজনীতিতে চেহারার পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃত পরিবর্তন আনতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং মিসরে আবারো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মিসরের সেক্যুলার দলগুলো মূলত শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশ পরিচালনায় ব্রাদারহুডের অযোগ্যতা, আরব বসন্ত পরবর্তী বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষা এ তিনটি কারণে মুরসির বিরুদ্ধে জনগণকে রাস্তায় নামাতে সমর্থ হয়েছে। মিসরের সাম্প্রতিক সেনাবাহিনীর ক্যু' এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতিতে তথা সরকারও প্রাদেশিক প্রশাসনের ওপর ব্রাদারহুডের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে ঠেকানো। সেনাবাহিনী মূলত মিসরের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামিস্ট প্রভাব দেখতে আগ্রহী নয়। তাই মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ পরবর্তী সামরিক জান্তার কোনো ধরনের সমালোচনা না করে আমেরিকা প্রমাণ করেছে তারা জনগণের একাংশের দাবির মুখে সেনাবাহিনীর পদক্ষেপে সন্তুষ্ট। মুরসি বিরোধি জনগণের জাগরনকে আমেরিকা মিসরের রাজনীতিতে শুধুমাত্র ব্রাদারহুডকে নয় এবং ইসলামি রাজনৈতিক উত্থানকে ঠেকানোর সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, মিসরের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রভাব আগের মত বজায় রয়েছে তা মিসরের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো ও নীতিকে প্রভাবিত করছে ও করবে।

৫.১৯ আরব বসন্ত ও লিবিয়া

পূর্বতন তুর্কি প্রদেশ ত্রিপোলি বর্তমানে লিবিয়া হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের অন্যতম তেলসমৃদ্ধ দেশ লিবিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দেশটি একটি পশ্চাদপদ এবং প্রায় একটি মধ্যযুগীয় জনপদ ছিল। বিশাল আয়তনের একটি দেশ লিবিয়ার অধিকাংশই মরু অঞ্চল। লোকজন যাযাবর প্রকৃতির এবং অশিক্ষিত। এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশটি পৃথিবীর নানা জাতি দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হয়েছে। আফ্রিকা তথা আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলমান রাজনৈতিক সুনামির অন্যতম শিকার লিবিয়ার নেতা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিউনিসিয়া ও মিসরের সরকার পতনের পরপরই চার দশকব্যাপী ক্ষমতায় থাকা লিবিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি গাদ্দাফির বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৬৯ সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসরাইল ও পাশ্চাত্যের বিরোধিতার কারণে অনেক মুসলিম জনগণের কাছে একসময় বীর হিসেবে পরিচিত লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির ৪২ বছরের শাসনের অবসান ঘটেছে গণজাগরণ ও সশস্ত্র অভিযানের মুখে। সর্বশেষ ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর লিবিয়ার সিরত নামক শহরে গাদ্দাফি বিরোধী National Transitional Council-এর সদস্য কর্তৃক ধৃত ও পরে নিহত হওয়ার মাধ্যমে অবসান ঘটে গাদ্দাফি যুগের। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন যা লিবিয়ার গণতন্ত্রায়নের পথে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৫.২০ ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস (Geographical Position and History)

সুপ্রাচীন কাল থেকেই লিবিয়া বাইরের শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র লিবিয়া, যার আয়তন ৬,৮০,০০০ বর্গমাইল বা ১৭,৬৯,০০০ বর্গকিলোমিটার। দেশটিতে কোনো নদী এবং প্রকৃত অর্থে কোনো পর্বত নেই। দেশটির একদিকে আরব এবং অপরদিকে আফ্রিকার সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট। লিবিয়ার উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে মিশর, দক্ষিণ-পূর্বে সুদান, দক্ষিণে শাদ ও নাইজার (নাইজারের সঙ্গে লিবিয়ার ৩,৫৩১ মাইল সীমান্ত রয়েছে) এবং পশ্চিমে আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া অবস্থিত। ১৯৫১ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘ লিবিয়াকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়। আধুনিক লিবিয়ার জনসাধারণের প্রধানত আরব ও বার্বার (উত্তর অফ্রিকান) জাতি গোষ্ঠীভুক্ত। জাতিগতভাবে বিরুদ্ধ আরবদের উদাহরণ হলো লিবিয়ার বেদুঈন গোত্রসমূহ। তেল সম্পদের ওপর ভর করে লিবিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করে।

৫.২১ আরব বসন্তের জোয়ারে লিবিয়া (Libia in Arab Spring)

প্রতিবেশী দেশ মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতনের ধারাবাহিকতায় বিদ্রোহীরা সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ফেসবুকের মাধ্যমে গাদ্দাফিকে পদত্যাগের আহ্বান জানান ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১। এর দুই দিন পর অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এক মানবাধিকারকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর বেনগাজিতে দুইশর বেশি মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। অপরদিকে গাদ্দাফির সমর্থকরাও জড়ো হতে থাকে রাস্তায়। ফলে শুরু হয় সহিংসতা এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত নিহত হয় ৮৪ জন। বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করার প্রতিবাদে লিবিয়ার বিচারমন্ত্রী মুস্তফা আব্দুল জলিল পদত্যাগ করেন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১। অতঃপর তার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা এনটিসি গঠন করে গাদ্দাফিকে উৎখাতের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে।

৫.২২ গাদ্দাফির পতনের কারণসমূহ (Causes of Gaddafis Fall)

আরব গণজাগরণের পথ ধরে পতন হলো আরেক একনায়ক লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির। ফেব্রুয়ারিতে গাদ্দাফির পদত্যাগের দাবিতে শুরু হওয়া গণ-আন্দোলনে সরকার দমন-পীড়ন শুরু করলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ন্যাটোর সহায়তায় বিদ্রোহী বাহিনী গাদ্দাফিকে উৎখাত করে। গাদ্দাফির পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উঠে আসে :

১. **গণতন্ত্র নিষিদ্ধ করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা :** ১৯৬৯ সালে রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাদশাহ ইদ্রিসকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে গাদ্দাফি দীর্ঘ ৪২ বছর লিবিয়া শাসন করেন। এ সময় তিনি গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিরোধী কোনো মতকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেন নি। তিনি তার দীর্ঘ শাসনকালে 'গ্রিন বুক' নামক গ্রন্থ লিখে একে তার রাজনৈতিক দর্শনে পরিণত করেন। এ বইয়ে উদার গণতন্ত্র, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ও পুঁজিবাদকে বর্জন করে "প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র" নামক এক দর্শন প্রচার করেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হলো গাদ্দাফির নিয়োগকৃত মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের শাসন। আরব গণজাগরণের ফলে সাধারণ মানুষ গাদ্দাফির এ শৃঙ্খল ভেঙে উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে লিবিয়াকে গড়ার পদক্ষেপ হিসেবে গাদ্দাফির বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহে অংশ নেয়।

২. **অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অনুন্নয়ন :** গোত্রভিত্তিক লিবিয়ার শাসক গাদ্দাফি তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কিছু গোত্রকে তার কাছে টেনে নেন। ফলে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এসকল গোত্রের সাথে দেশের পূর্বাঞ্চলের গোত্রসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফি প্রাকৃতিক সম্পদকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যয় না করে নিজের পরিবার ও সহযোগীদের কোষাগারে জমা করেন। বাব-আল আজিজিয়ার মতো উচ্চাভিলাসী রাজপ্রাসাদ নির্মাণসহ ব্যয়বহুল বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এসকল কারণে দেশবাসী তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়।

৩. **সুশাসনের অভাব :** প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র নামক উদ্ভট এক ব্যবস্থার ফলে লিবিয়ার শাসনক্ষমতা গাদ্দাফি পরিবার ও গাদ্দাফির অনুগত কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এই শাসনব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের মতামতের কোনো প্রকার মূল্যায়ন করা হয় না। শাসকের জন্য জনগণ এ নীতিতে বিশ্বাসী গাদ্দাফি নিজ খেয়ালখুশিমতো দেশ পরিচালনা, আইনের শাসনকে অগ্রাহ্য করে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

৪. **দুর্নীতির প্রসার :** স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ফলাফল হলো দুর্নীতির প্রসার। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে তারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভুতুল্য মনে করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব তাদেরকে দুর্নীতি করতে উৎসাহ জোগায়। যার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় লিবিয়ায়।

৫. **মানবাধিকার লংঘন ও দমন-পীড়ন নীতি :** গাদ্দাফি তার "গ্রিন বুক" কে তার শাসনতন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। যেখানে জনগণের অধিকার সম্পর্কে তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। জনগণের প্রকৃত অধিকার উপেক্ষিত হয় তার শাসনতন্ত্রে। এছাড়া ভিন্ন মতাবলম্বী লোকের ওপর দমন-পীড়ন, ব্যাপক হারে মানবাধিকার লংঘন প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। তার এ দমন-পীড়নে অতিষ্ঠ জনগণ হয় দেশ ছাড়তে বাধ্য হতো, নয়তো কারা প্রকোষ্ঠে পতিত হতো।

৬. **প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৃহৎ শিল্পের ওপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ :** প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ লিবি-

য়ার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার ছিল না। প্রাকৃতিক সম্পদ ও টেলিযোগাযোগ খাতসহ বৃহৎ শিল্পগুলোর ওপর গাদ্দাফি ও তার সন্তানদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসকল ক্ষেত্র থেকে উপার্জিত অর্থ দেশের জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে অল্পই ব্যবহৃত হতো। বিদেশি ব্যাংকগুলোতে অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে তার প্রতিটি সন্তান। ইউরোপের কিছু ফুটবল ক্লাবের সিংহভাগ শেয়ারও কিনে নেয় তার পুত্র সাদ বিন গাদ্দাফি। দেশের সম্পদের এই বিলাসী ব্যবহার দেশে জনগণ মেনে নিতে পারে নি। যার ফলাফল হলো এ বিদ্রোহ।

৭. **সংবাদপত্র ও জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণ :** গণতান্ত্রিক সকল অধিকার হরণের পাশাপাশি জনগণের বাকস্বাধীনতাও হরণ করা হয় গাদ্দাফি তার বিরোধী মতকে সর্বদা কঠোর হস্তে দমন করার নীতি অনুসরণ করে এসেছে। তাছাড়া লিবিয়ায় সরকারি ও পারিবারিক সংবাদ ও প্রচারমাধ্যম ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে জনগণের প্রকৃত অবস্থা ও চাওয়া-পাওয়া সঠিকভাবে কখনোই প্রকাশ পেত না। গাদ্দাফির কঠোর সামরিকতন্ত্রে নিষ্পেষিত জনগণ আরব গণজাগরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দীর্ঘদিনের এ শৃঙ্খল ভাঙতে উদ্বুদ্ধ হন।

৮. **বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা :** আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো লিবিয়াতে খনিজ সম্পদ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ খুবই নগণ্য। ফলে বিশেষ শিল্প গড়ে না ওঠার কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও তৈরি হয় নি। আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত তরুণ ও যুবসমাজ সম্মানজনক কাজের অভাবে হয় বিদেশে যেতে বাধ্য হতো, নয়তো বেকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হতো। যুবসমাজের এই ক্ষোভের ফসল এ বিদ্রোহ।

৯. **গোত্রভিত্তিক সমাজ :** লিবিয়ার অধিকাংশ মানুষ গোত্রভিত্তিক জীবনযাপনে বিশ্বাসী। দেশটিতে প্রায় ১৪০টি উপজাতি রয়েছে। মাত্র ১৫% মানুষ উপজাতিবহির্ভূত। গাদ্দাফি কিছু গোত্রকে সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে বঞ্চিত গোত্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার কারণে এতদিন গাদ্দাফি বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে নি। সাম্প্রতিক বিদ্রোহের সময় এসকল গোত্রসমূহ সুযোগ পায় তাদের বঞ্চনার প্রতিশোধ গ্রহণের।

১০. **সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের স্বার্থ :** লিবিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাশিয়া ও চীনের প্রাধান্য পশ্চিমা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের জন্য আঘাত স্বরূপ। দীর্ঘদিনের অবরোধের সুযোগে লিবিয়ার খনিজ সম্পদের উপর রাশিয়া ও চীন প্রাধান্য বিস্তার করে। এছাড়া লিবিয়ায় রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভূ-গর্ভস্থ সুপেয় পানির রিজার্ভ। এক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে ফ্রান্স সর্ববৃহৎ সুপেয় পানির জোগানদাতা। বিশ্লেষকদের মতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অন্যতম নিয়ন্ত্রক হবে এই সুপেয় পানি। এক্ষত্রে সুপেয় পানির প্রতি ফ্রান্সের আগ্রহ ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের উপর ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ গাদ্দাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার অন্যতম কারণ। প্রথম থেকে বিদ্রোহীদেরকে সমর্থনদানসহ ১৯ মার্চ ২০১১ থেকে পশ্চিমা গোষ্ঠীর সামরিক জোট ন্যাটোর হামলা এক্ষেত্রে অন্যতম উদাহরণ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ন্যাটো লিবিয়ায় প্রায় ৮ হাজার বার বিমান হামলা পরিচালনা করেছে। এছাড়া বিদ্রোহীদের সামরিক কৌশলগত পরামর্শদানের পাশাপাশি আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করে বিদ্রোহীদের বিজয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

৫.২৩ ২০১২ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী লিবিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ (Political Future of Libia After Election in 2012)

লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচনে উদারপন্থী জোট ন্যাশনাল ফোর্সেস এলায়েন্স (এনএফএ) জয় পেয়েছে। চার দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী স্বৈরশাসনের অবসানের পর ২০১২ সালের ৭ জুলাই লিবিয়ার প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে লিবিয়ার জন্য ২০০ সদস্যের একটি অস্থায়ী General National Congress (GNC) বা জাতীয় পরিষদ নির্বাচন করা হয়। এই ২০০ সদস্যের মধ্যে ৮০ জন সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন এবং বাকি ১২০ জন স্বাধীন সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। নির্বাচনে যে দলই জিতুক না কেন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাকে স্বাধীন এই ১২০ সদস্যের কাছে আবেদন করতে হয়। এই পরিষদের মূল কাজ হবে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা এবং লিবিয়ার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী বাছাই করা। নির্বাচনে মাহমুদ জিবরিলের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ফোর্সেস

এলায়েন্স ৪৮ শতাংশ ভোট (৮০টি আসনের মধ্যে ৩৯টি) পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করে।

মুয়াম্মার গাদ্দাফির উৎখাতের পর লিবিয়া ক্ষমতায় আসা জাতীয় অন্তবর্তী পরিষদ দেশবাসীকে দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতিই রাখতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ দশকের মধ্যে প্রথম অবাধ সাধারন নির্বাচন আয়োজন করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে এ কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা নিয়ে আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত নেতাদের মধ্যে টানাপোড়েন অর্থনৈতিক দুরবস্থা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এসব কারনে গত আট মাসের শাসনামলে আর কোন বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি তারা। এজন্য এনটিসি ক্রমশ অজনপ্রিয় হয়ে উঠে। গাদ্দাফি বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের বিদ্রোহী ও সাধারণ মানুষের একটা লক্ষ্য ছিল,অবাধ সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন। সে লক্ষ্য তাদের পূরন হয়েছে এটি তাদের জন্য গনতন্ত্রে উত্তরনের জন্য প্রথম ধাপে পা রাখা। ৯ আগষ্ট ২০১২ মোহাম্মদ আল সাগারিক নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মাগরিক নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবেন। গাদ্দাফি পরবর্তী লিবিয়ার জনগনের যে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা মাগারিককে তার সাথে সমান তালে না চলতে পারলে খুব দ্রুতই যে জনপ্রিয়তা হারাবেন তা প্রায় নিশ্চিত। সরকার গঠন পরবর্তী নাগারিক যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হবেন সেগুলো হলো :

১. কার্যকর বিচার ব্যবস্থা চালু করা গাদ্দাফি জামানাতেও দেশে কোন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ছিল না গাদ্দাফির কথাই চূড়ান্ত আইন বা বিচার ছিল।
২. গাদ্দাফি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য আওতায় নিয়ে আসা।
৩. মিলিশিয়াদের নিরস্ত্রকরে কার্যকর একটি নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলা : কারণ এ সকল মিলিশিয়ারা না শোনে স্থানীয় পরিষদের কথা না মানে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন।
৪. সর্বসম্মত সংবিধান প্রনয়ন : নির্বাচিত নতুন সরকার দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রস্তুত করবে যার আলোকে ২০১৩ সালে লিবিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৫. অবকাঠামোগত উন্নয়ন-গৃহযুদ্ধের পর আটমাসে লিবিয়া অবকাঠামোগত কোন উন্নয়ন হয়নি।
৬ বিদেশি বিনিয়োগ।
৭. আঞ্চলিক বিভেদ দুর করা ত্রিপোলী-বেনগাজী, গাদ্দাফির আমলে পূর্বাঞ্চলীয় শহর বেনগাজী অবহেলিত থাকায় সরকারবিরোধী আন্দোলন প্রানকেন্দ্র হয়ে উঠে। লিবিয়া মূলত তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।
৮. আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন।

৫.২৪ লিবিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট (Newly Elected president of libia)

লিবিয়ার অন্তবর্তীকালীন পরিষদ মুয়াম্মার গাদ্দাফির আমলের বিরোধী নেতা মোহাম্মদ আল মাগারিককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে। পরিষদ ক্ষমতা নেওয়ার একদিন পর গত ৯ আগস্ট ২০১২ ভোটাভুটির মাধ্যমে তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। মাগারিক মধ্য ইসলামপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত। লিবিয়ার অন্তবর্তীকালীন জাতীয় পরিষদ জেনারেল ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ২০০ সদস্যের পরিষদে ১১৩-৮৫ ভোটে মাগারিক স্বতন্ত্র প্রার্থী উদারপন্থী আলী জিদানকে পরাজিত করেন। নতুন প্রেসিডেন্ট মাগারিকের নেতৃত্বে পরিষদ নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবে এবং আগামী বছর নাগাদ নতুন সংবিধান প্রনয়নের পরই নির্বাচন হবে। লিবিয়ার জাতীয় অন্তবর্তী পরিষদ (এনটিসি) গত ৮ আগস্ট ২০১২ নবনির্বাচিত অন্তবর্তী জাতীয় পরিষদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। চার দশকে ধরে শক্ত হাতে দেশ পরিচালনাকারী গাদ্দাফি গত বছর বিদ্রোহীদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হওয়ার পর এনটিসি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল। উল্লেখ্য এর মধ্যে কিন্তু মার্শাল হুসাইন তানভাউই যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ৭ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত লিবিয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের ভোটে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা নির্বাচিত হন। এর আগে ১৯৬৫ সালে দেশটিতে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । তবে সেখানে কোন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনের সুযোগ ছিল না।

৫.২৫ ভবিষ্যৎ স্থিতিশীল লিবিয়ার জন্য করণীয়

২০১২ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে লিবিয়ায় গণতন্ত্রায়ণের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত পশ্চিমা দেশগুলোও। অর্থাৎ এ নির্বাচনের মাধ্যমে লিবিয়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে পেরেছে বেশ ভালোভাবেই। ভবিষ্যতে স্থিতিশীল লিবিয়ার জন্য যে

পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরি সেগুলো হচ্ছে :

১. **সর্বজনগ্রাহ্য ও দক্ষ মন্ত্রিসভা গঠন :** লিবিয়ার রাজনীতির এই সাম্প্রতিক পটপরিবর্তনে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তা নির্মূলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মন্ত্রিসভা গঠন। এক্ষেত্রে দায়িত্বটি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী ন্যাশনাল ফোর্সেস এলায়েন্সের উপরই বর্তায়। তাই মাহমুদ জিবরিলের নেতৃত্বে বিজয়ী এ দলটি যত দ্রুত একটি দক্ষ ও সর্বজনগ্রাহ্য মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে এবং একজন নির্ভরযোগ্য প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিতে পারবে তত দ্রুতই লিবিয়া গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে।

২. **আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন :** যুদ্ধ-পরবর্তী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, লুটপাট ও অন্যান্য সহিংসতামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করাই নির্বাচনে বিজয়ী ন্যাশনাল ফোর্সেস এলায়েন্সের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে গাদ্দাফির অনুসারীরাই সবচেয়ে বড় হুমকি। গাদ্দাফি ও বিরোধী পক্ষের অবাধে অস্ত্র বিতরণ, গাদ্দাফির বিভিন্ন ঘাঁটির পতনের পর লুণ্ঠিত অস্ত্র লিবিয়াকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এসকল অস্ত্র উদ্ধার করা, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই নির্বাচনে বিজয়ী এ দলটির প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে।

৩. **ইসলামি চরমপন্থা নিয়ন্ত্রণ :** নতুন সরকারের আরও একটি চ্যালেঞ্জ ইসলামি চরমপন্থা। বিদ্রোহীদের সামরিক প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ ইউনেস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে যারা ইতোমধ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। লিবিয়ার সামনের দিনগুলোর কেমন যাবে, তা নির্ভর করছে ইসলামি চরম পন্থার নিয়ন্ত্রণের ওপর।

৪. **গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়ন ও অবাধ নির্বাচন :** নতুন সরকারের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি কাজ হলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করা এবং দেশ পরিচালনার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়ন করা। এর মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত মতামতের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে।

৫. **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম :** নতুন সরকার ও নেতারা যদি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পারে, তবে আবারও এই গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। তাছাড়া যেকোনো দেশের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম নিয়ন্ত্রক প্রচার মাধ্যমে বিকাশের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৬. **সম্পদের সুষম বন্টন :** দীর্ঘদিনের অপশাসনে নিমজ্জিত লিবিয়ার সরকারের সঙ্গে বসবাসকারী কিছু মুষ্টিমেয় লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে ছিল পাহাড়সমান বৈষম্য। নতুন সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের এ বৈষম্য হ্রাস করা ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

মূল্যায়ন (Evaluation)

লিবিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পশ্চিমাদের সীমাহীন লোভ রয়েছে। এই সম্পদ তারা ভাগাভাগি করে নিবেই। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের সাবেক সম্পাদক পল ক্রেইন বলেন,"আমরা লিবিয়ায় যা দেখছি তা উপনিবেশবাদের পুনর্জন্ম"। লিবিয়ায় নো ফ্লাই জোন ঘোষণায় ৫টি বৃহৎ রাষ্ট্র বিরত থাকায় প্রস্তাবটি একদিকে মিত্র শক্তিকে যেমন বিস্তৃত সুযোগ ও স্বাধীনতা সহকারে অপারেশন পরিচালার সুযোগ করে দিয়েছে। ২০১২ সালের ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন লিবিয়ার গণতন্ত্রায়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে লিবিয়ার জনগণ তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোও এই নির্বাচনের ব্যাপক প্রশংসা করেছে এবং মেনে নিয়েছে নির্বাচনের ফলাফল। এই নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পশ্চিমা সরকারগুলো মধ্যপন্থী এই দলটি তথা ন্যাশনাল ফোর্সেস এলায়েন্সের প্রতি খুব ইতিবাচক ধারনা পোষণ করে। লিবিয়ায় গাদ্দাফির পতনের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমা তাবেদার সরকার। তাই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সফল এই রাজনৈতিক দলটির পক্ষে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মন্ত্রীসভা গঠন করা খুব বেশি কঠিন হবে না বলেই মত প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

০১. মিসরের ইসলামপন্থি সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ান আল মুসলিমিন-এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ১৯২৮ সালে (প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না)।

০২. মিসরের ইসলামপন্থি সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক দলের নাম কী?
উত্তর : ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (FJP)।

০৩. ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ কে?
উত্তর : মিসর।

০৪. মিসরে প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক বিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার কোন স্থানে ?
উত্তর : তাহরির স্কয়ার।

০৫. মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক কবে ক্ষমতা থেকে ইস্তফা দেন?
উত্তর : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

০৬. বিশ্বে খেজুর উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি ?
উত্তর : মিসর।

০৭. সাবেক সেনাপতি প্রধান ২৬ মার্চ, ২০১৪ সালে পদত্যাগের পর কে মিসরের সেনাপ্রধান হন ?
উত্তর : মিসরের নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল সেদকি সোবহি।

০৮. মিসরের ইতিসাহে এক সঙে ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড এই প্রথম মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির কত হন সমর্থকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত ?
উত্তর : ৫২৯ জন।

০৯. ১৬২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সুয়েজ খালটি কোন দুটি সাগরকে সংযুক্ত করেছে ?
উত্তর : লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্যসাগরকে।

১০. তাহরির স্কয়ারের পূর্ব নাম কী এবং ইংরেজীতে তাহরির স্কয়ারের কে কী নামে ডাকা হয়?
উত্তর : ইসমাইলিয়া ময়দান, লিভারেশান স্কয়ার।

১১. প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী কে এবং কোন দেশের ?
উত্তর : আনোয়ার সাদাত (শান্তি) মিসর (১৯৭৮ সালে)

১২. ১৫১৭-১৮৬৭ সাল পর্যন্ত মিসর কোন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ?
উত্তর : অটোমেন সাম্রাজ্য।

১. লিবিয়ার আয়তন কত?
উত্তরঃ ৬,৮০,০০০ বর্গ মাইল।

২. জাতিসংঘ কবে লিবিয়াকে একটি স্বাধিন স্বার্বভৌমরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষনা দেয়?
উত্তরঃ ১৯৫১ সালের ২৫ ডিসেম্বর।

৩. লিবিয়ায় উপজাতি গোষ্ঠি রয়েছে কতটি?
উত্তরঃ ১৪০টি।

৪. পূর্বেতর তুর্কি প্রদেশ ত্রিপোলি বর্তমানে কি হিসাবে পরিচিত?
উত্তরঃ লিবিয়া।

http://thejobstu...y.com Go to Contents

৫. কত সালে লিবিয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের ভোটে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা নির্বাচিত হন।
উত্তর: ৭ জুলাই ২০১২।

৬. ১৯৭০ সালে কুখ্যাত সন্ত্রাসিদের কে আশ্রয় দেয়?
উত্তর: গাদ্দাফি।

৭. পূর্বতন তুর্কি প্রদেশ ত্রিপোলী বর্তমানে কী হিসেবে পরিচিত?
উত্তর: লিবিয়া।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পর্কে লিখুন?
খ. কবে মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ ঘোসনা করা হয়?

২ ক. প্রেসিডেন্ট মুরসীর পরিচয় দিন?
খ. প্রেসিডেন্ট মুরসীর ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে লিখুন?

৩. ক. তাহরির স্কয়ার কী এবং কোথায় অবস্থিত?
খ. তাহরির স্কয়ার কেন বিখ্যাত?

৪. ক. কোন শাসকের সময় ফাত্তা আল সিসি সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ পান?
খ. মিশরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে লিখুন?

১. ক. গাদ্দাফির একনায়কতন্ত্র আলোচনা কর?
খ. লিবিয়া ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন?

২. ক. আরব বসন্ত ও লিবিয়া আলোচনা করুন?
খ. লিবিয়ার ভৌগলিক অবস্থান বর্ণনা করুন?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. মিসরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর বলে আপনি মনে করে?
২. আরব বসন্ত মিসরের গণতন্ত্র রক্ষায় কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করছে আলোচনা করুন?
৩. মিসরের সাবেক ও বর্তমান সংবিধানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন?
৪. মিসরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কী কী ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে আলোচনা করুন?
৫. সামরিক বাহিনী কর্তৃক মিসরের ক্ষমতা দখল, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কতটা হুমকি?
৬. মুরসীর ব্যর্থতা ও পতনের কারণ আলোচনা করুন?
৭. গাদ্দাফির পতনের কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক ২০১২ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী লিবিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন। ভবিষ্যৎ স্থিতিশীল লিবিয়ার জন্য করণীয় পদক্ষেপসমূহ কী কী ?
৮. আরব বসন্ত লিবিয়ায় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কী প্রভাব ফেলেছে আলোচনা করুন?
৯. গাদ্দাফি পরবর্তী লিবিয়ার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো আলোচনা করুন?

অধ্যায় ৬

সিরিয়ার রাজনৈতিক সংকট উত্তরণ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এবং ইসলামিক স্টেটস এর সাম্প্রতিক তৎপরতা : বর্তমান প্রেক্ষাপট

Recovery of Political Crisis of Syria & Its Democratic Future & Recent Activities of Islamic States: Present Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৬.১ ভূমিকা
৬.২ সিরিয়ার ইতিহাস
৬.৩ যেভাবে সিরিয়া সংকট শুরু
৬.৪ সিরিয়ায় সহিংস আন্দোলন
৬.৫ সিরিয়ায় নতুন সংবিধান
৬.৬ ফ্রেন্ডস অব সিরিয়া
৬.৭ সিরিয়া বৃহৎ শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত প্রান্তর
৬.৮ সিরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ
৬.৯ আন্দোলন সাফল্য লাভ না করার কারণ সমূহ
৬.১০ সিরিয়ার সংকট সমাধানে গৃহীত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ
৬.১১ সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ও তার প্রতিবেশীদের ভূমিকা
৬.১২ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্রের হামলা
৬.১৩ রাশিয়ার প্রস্তাব এবং রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি
৬.১৪ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত মিশন শুরু
৬.১৫ বর্তমান সিরিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা
৬.১৬ সিরীয় শরনার্থীদের বর্তমান মানবিক বিপর্যয়
৬.১৭ আই এস যোদ্ধাদের উপর যৌথ সামরিক অভিযান

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

যুদ্ধ বিগ্রহ সিরিয়ার ইতিহাস নতুন কিছু নয়। একসময় ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশটি। ভৌগলিকভাবেও এটি বিচিত্র এক অঞ্চল একদিকে উর্বর সমতল ভূমি, অন্যদিকে রুক্ষ পাহাড় পর্বত ও উষর মরুপ্রান্তর। অসিরীয় খ্রিস্টান, দ্রুজ, শিয়া, আরব সুন্নি, কুর্দি ও আর্মেনীয় এসব জনগোষ্ঠীতে ভরপুর সিরিয়া। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

৬.২ সিরিয়ার ইতিহাস (Historical Background of Syria)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সিরিয়া তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ফরাসিদের বহু বছর পূর্ব থেকেই সিরিয়ার প্রতি আগ্রহ ছিল। ১৭৯৮-৯৯ সালে নেপোলিয়ন সিরিয়া দখলে রাখার চেষ্টা করেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়ে আরব ও ফরাসিরা সিরিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। আমির ফয়সাল আরবদের নেতৃত্ব দেন। ১৯২০ সালে সিরিয়াকে ফ্রান্সের ম্যান্ডেটরি অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সিরিয়ায় আইন শৃংখলা বজায় রাখার বিষয়ে ফ্রান্স ব্যর্থ হয়। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল সময়ে দ্রুজদের ব্যাপক বিদ্রোহের কারণে রাজধানী দামেস্ক থেকে ফরাসিরা নিজেদের দুইবার প্রত্যাহার করে। ১৯৩৬ সালে পপুলার ফ্রন্ট সরকার ফরাসি নীতি পরিবর্তন করে তিন বছরের মধ্যে সিরিয়ার স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ফ্রান্সের ভিশি সরকারের সমর্থক সরকার সিরিয়ায় কার্যকর থাকে। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ও 'ফ্রি-ফ্রান্স' সরকারের বাহিনী জার্মান ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ার শংকায় সিরিয়া দখল করে নেয়। ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি সিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। কিন্তু ফরাসি বাহিনী তাদের ঘাঁটি প্রত্যাহার করতে সম্মত না হওয়ায় ১৯৪৫ সালে সিরীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশ বাহিনী চূড়ান্তভাবে প্রত্যাহার করা মিশর সিরীয়া একীভূত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত হয়১৯৫৮ সালে। কিন্তু ১৯৬১ সালে সিরিয়া পুনরায় নিজেদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

আরব প্রজাতন্ত্রী সিরিয়া নামের মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির রাষ্ট্রক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ও বাথ পার্টির হাতে। সংবিধান মতে সিরিয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্র হলেও ১৯৬৩ সালে থেকে দেশটিতে জরুরী অবস্থা রয়েছে।

মনে রাখার Technique & Tips

At A Glance Of Syria

- বিখ্যাত গোলান মরুভূমি সিরিয়ায়।
- সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৪৬ সালে।
- সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম হল -সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্র।
- সিরিয়ার আয়তন - ২১৯০৬০০০ বর্গ কি. মি. (৫৪তম)।
- সিরিয়ার রাজধানী - দামেস্ক।
- সিরিয়ার লোকসংখ্যা - ১,৮০,১৬,৮৭৫।
- সিরিয়ার ভাষা - আরবি।
- সিরিয়ার মুদ্রা - পাউন্ড।
- সিরিয়া ১৯৫৮ সালে যোগ দিয়েছিল - মিশরের সঙ্গে।
- সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মূল অভিযোগ- মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম জঙ্গীদের সহায়তা প্রদান।
- সিরিয়া ২৬ বছর পর ২১ নভেম্বর,২০০৬ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে- ইরাকের সাথে।
- সিরিয়ার সংবাদ সংস্থার নাম - সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (SANA)।
- বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা পাওয়া যায় - সিরিয়ার উগারিটে।
- সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয় - সিরিয়াকে।
- ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (Free Syrian Army) - সিরিয়ার সেনাবাহিনী থেকে দলত্যাগী সৈন্যদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (২৯ জুলাই,২০১১-বর্তমান)
- সিরিয়ার বাপায় আল আসাদবিরোধী প্রধান গ্রুপের নাম - সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল (এটি সিরিয়ান ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সিরিয়া নামেও পরিচিত।
- সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হয় - ২১ আগস্ট,২০১১।
- সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল এর সদর দপ্তর - ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- সিরিয়ান রেট্রিয়টিক গ্রুপ গঠিত হয় - ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২।
- সিরিয়ায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে "ফ্রেন্ডস অব সিরিয়া" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - ২৪ ফেব্রুয়ারি,২০১২,তিউনিস,তিউনিসিয়া।
- জাবহাত আল নুসরা হচ্ছে- সিরিয়ার একটি জঙ্গী সংগঠন।

৬.৩ যেভাবে সিরিয়া সংকট শুরু (How to start Syria Crisis)

সিরিয়াতে ঘটনার শুরু হয় ২৬ জানুয়ারি ২০১১ সেদিন তিউনিসিয়ার মতো হাসান আলী আকলেহ নামক এক সিরিয়ান নাগরিক নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহুতি দেন। ২০১১ সালের মার্চের দিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে সরকারী বাহিনী জনতার

উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। সেনাবাহিনীর যারা নাগরিকদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এ সকল সেনা সদস্যরা পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে পরবর্তিতে গঠন করে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি।

৬.৪ সিরিয়ায় সহিংস আন্দোলন (Violent Movement in Syria)

১৮ মার্চ ২০১১ সালে সিরিয়ায় সহিংস আন্দোলন শুরু হয়েছিল দারার শহর থেকে। এর লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক পরিবর্তন, কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ও দুর্নীতির বিরোধীতা করা। প্রথমদিকে এই আন্দোলন ছিল শান্তি পূর্ণ। এই আন্দোলনের সূত্রপাত যারা করেছিল তারা তিনটি বিষয় থেকে সব সময় সতর্ক থেকেছে। তা হচ্ছে সহিংসেতা, বিচ্ছিন্নতা ও বিদেশী হস্তক্ষেপ। এই তিনটি বিষয়কে যদি এড়িয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত তবে সত্যিই সিরিয়া জাতীয় সংহতির দিকে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সিরিয়ার শাসক গোষ্ঠী বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে। ফলে বিভিন্ন আন্দোলনকারী দলগুলোর মধ্যে কোন ঐক্য গড়ে ওঠে নাই। আরব বসন্তের অন্যান্য দেশ থেকে এটা সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এটা সঠিক পথে যেতে পারেনি। কারণ ঐ বিরোধীতা সশস্ত্র রূপ নিয়েছে। যদিও সশস্ত্র আক্রমণটি প্রথম এসেছিল সরকারের পক্ষ থেকেই। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে। সরকার সৈন্য পাঠিয়ে গণহত্যা চালায় দারার শহরসহ বিশেষ তিনিটি শহরে (আবু কামাল, দিয়ার আল জিওর ও হামা) তাও আবার রোজার মাসে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহীদের অনেকেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। এই সশস্ত্র সংগ্রামকে বাইরের শক্তিরাও উৎসাহ দিয়েছিল। শেষে এটা একটা ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। সৌদিআরব, কাতার, কুয়েত এই সব দেশ থেকে অর্থ সাহায্য এসেছিল। গণতন্ত্রের পক্ষের এই আন্দোলনটি ধর্মীয় আন্দোলনর দিকে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়াও রাশিয়া এবং চীন হস্তক্ষেপ করেছিল যাতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একমেরুর পরিবর্তে বহুমেরুর বিশ্ব সৃষ্টির যে প্রয়াস তারা চালিয়ে আসছে তারই অংশ হিসেবে তারাও সিরিয়ার ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। ঠিক সেই একই কারণে সৌদি আরবের প্রভাব এবং মার্কিনমুখী বৈদেশিক নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও একটা সুযোগ তৈরী হয়েছিল। মোটের উপর সিরিয়া এখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এদিকে তুরস্ক সহ বহু সিরীয় নাগরিককে অস্ত্র এবং অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করছে তুরস্কের সামরিক বাহিনী এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দি সিরিয়ান আর্মি বা স্বাধীন সিরিয়া বাহিনী গঠিত হয়েছে। বিদেশ থেকে টাকা আসছে আর তার পরিণতিতে নষ্ট হচ্ছে আন্দোলনের নিজস্বতা ও স্বনির্ভরতা। ব্যাহত হচ্ছে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে সহিংসেতা। সৌদি আরব এবং কাতারের সমর্থনে সিরিয়ার চারিদিকে অস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দুইশত ধর্মীয় বিদেশী জিহাদী সিরিয়ায় প্রবেশ করেছে গত ছয় মাসে এর ফলে গণসমাবেশ সমূহ যা কিনা আগে ছিল বিশাল আকারের তাতেও লোক সমাগম ক্রমেই কমছে। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা মাথাচারা দিয়ে উঠছে। রাজনৈতিক তৎপরতা সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার অন্ধ গলিতে হারিয়ে যাচ্ছে। কফি আনানের শান্তি পরিকল্পনা এই সব সশস্ত্র বিদ্রোহীদের জন্য একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল তারা আবার শান্তিপূর্ণ পথে গণতান্ত্রিক বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হতে পারতো। কফি আনান অস্ত্র বিরতির আবেদন জানিয়েছিলেন এবং বড় শহরগুলো থেকে সেনাবাহিনী ও জঙ্গীদের প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পনের মাসের ধারাবাহিক সংঘর্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দশ লক্ষাধিক মানুষের সাহায্যের জন্য তার বিশেষ পরিকল্পনাও ছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহীরা এটাকে সরকার পক্ষের সময়ক্ষেপণের কৌশল বলে ধারণা করেছিল। আবার অন্যদিকে সিরীয় কর্তৃপক্ষ অস্ত্রবিরতির চুক্তিভঙ্গ করে সামরিক অভিযানে নেমেছিল এবং জনসাধারণের উপর আক্রমণ করেছিল। বিশেষ করে আবু কামাল, দিয়ার আল জিওর ও হামা এই তিনটি শহরে। কফি আনানের পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত বা সফল করার জন্য প্রথমেই পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। যা কিনা করা হয়নি। সিরিয়া প্রসঙ্গে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক যে উদ্যোগ ছিল তাও রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। আসাদের একগুয়েমি আন্দোলনকারীদের হিংস্রতা আর রুশ-মার্কিন স্বার্থের ত্রিমুখী দ্বন্দের টানাপোড়েন সিরিয়ায় সাধারণ জনগণ দিন দিন সবকিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘ দুই বছরের আন্দোলনের কারণে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। লক্ষাধিক লোক আহত হয়েছে অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেছে কিন্তু সমাধানের কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছেনা। জাতিসংঘের তথ্য মতে, সিরিয়ায়

চলমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও সহিংসতায় এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩৫ হাজার লোক মারা গেছে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)। তাদের বেশীর ভাগই বেসামরিক নারী ও শিশু। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বন্দি রয়েছে অন্তত ২৪ হাজার মানুষ।

৬.৫ সিরিয়ায় নতুন সংবিধান (New Constitution of Syria)

সংবিধানে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে :

১. নতুন সংবিধানের আওতায় তিনমাসের মধ্যে বহুদলীয় অংশগ্রহণে পার্লামেন্ট নির্বাচন ।
২. বিদ্যমান সংবিধান আসাদের বাথ পার্টিকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। নতুন সংবিধানে এ ধারা তুলে দেয়ার কথা রয়েছে।
৩. ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনে নিষেধাজ্ঞা রাখা।
৪. আসাদের হাতেও ব্যাপক ক্ষমতা রাখা ।
৫. প্রধানমন্ত্রী ও সরকার নিয়োগ দেবেন প্রেসিডেন্ট । ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন আইন প্রণয়নের বিরোধীতাও করতে পারবেন।
৬. সাত বছর মেয়াদি প্রেসিডেন্ট পদে একজন দু'বার নির্বাচিত হতে পারবেন।
৭. এসব আইন কার্যকর হবে ২০১৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর। অর্থাৎ নতুন সংবিধানে আসাদের জন্য বর্তমান মেয়াদের বাকী দুই বছর ও ভবিষ্যতের দুই মেয়াদসহ মোট ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকার সুযোগ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০০৭ সালে সর্বশেষ পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাশারের বাথ পার্টির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট জয়ী হয়েছিল ।



৬.৬ ফ্রেন্ডস অব সিরিয়া (Friends of Syria)

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে তিউনিসে অনুষ্ঠিত হয় ফ্রেন্ডস অব সিরিয়ার প্রথম সম্মেলন। সম্প্রতি সিরিয়ার সহিংসতার জন্য প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের আনা নিন্দা প্রস্তাবে ভেটো দেয় চীন ও রাশিয়া। এ ঘটনার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে সম্প্রতি ফ্রেন্ডস অব সিরিয়া (Friends of Syria) নামে ঐ জোট গঠন করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), কয়েকটি আরবদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র ঐ জোটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এসএনসি : ২০১২ সালের ১১ নভেম্বর সিরিয়ায় সরকার বিরোধী জাতীয় ফোর্সেস অব দ্যা সিরিয়ান

http://thejobstudy.com
Go to Contents

রেভ্যুলেশন অ্যান্ড অপজিশন (এসএনসি) গঠনে দোহা সম্মেলনে চুক্তি স্বাক্ষর। নবগঠিত বিরোধী জোটকে প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ফ্রান্স এবং জোট হিসেবে আরবলীগ ও ছয় জাতীয় উপসাগরীয় জোট Gulf Co-operation Council (GCC) ১৩ নভেম্বর ২০১২, যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় ১৪ নভেম্বর ২০১২, ব্রিটেন স্বীকৃতি দেয় ২০ নভেম্বর ২০১২।

৬.৭ সিরিয়া বৃহৎ শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত প্রান্তর (Syria, Bloody Field of Super Power)

'সিরিয়া ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ সকল ব্যর্থতার কারণ স্পষ্ট। তাহলো সিরিয়া সমস্যা সমাধানে এদের অনেকেই আন্তরিক নন। অনেকে আবার চান সিরিয়া প্রলম্বিত গৃহযুদ্ধের অভিশাপে জর্জরিত হোক, যাতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী স্বার্থসংরক্ষিত হয়।'

জাতিসংঘ, আরব লীগ ও ইরানের উদ্যোগে আয়োজিত তেহরান সম্মেলন ব্যর্থতার পর সিরিয়া এখন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিসমূহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। সিরিয়া সংকটের গভীরতা বৈচিত্র্যময় স্ববিরোধিতার নানা উপাদানে পরিপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ভূত (domestic ills) এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর হীনমন্যতা, পথভ্রষ্টতা ও দ্বৈতনীতির কারণে সিরীয় সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, একনায়ক আসাদের পতনের পর ক্ষুধার্ত স্বার্থবাদীদের তীব্র লড়াইয়ে ব্যবহৃত হবে সিরিয়ার মাটি ও মানুষ।

প্রথমত : সিরিয়া সংকটের অন্তরালে দৃষ্টি দেয়া যাক। আরব বসন্তের ধারা বেয়ে যে ব্যাপক গণজাগরণ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্টে দিতে চলেছে, সিরিয়ার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। পিতা হাফেজ আল আসাদ এবং পুত্র বাশার আল আসাদের সুদীর্ঘ ৪০ বছরের স্বৈরশাসন অত্যাচারিত সিরিয়াবাসী ফ্রি-সিরিয়ান আর্মির নেতৃত্ব আসাদ সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত : সিরিয়ার জনসাধারণের মাত্র ১৩ শতাংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি জনগোষ্ঠীর উপর সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায়ের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠরা আন্দোলনের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ঢেলে দেয়।

তৃতীয়ত : সিরিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং কায়েমী স্বার্থপর শ্রেণী গণআন্দোলনে স্ব-স্ব স্বার্থ অর্জন করার উন্মত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।

চতুর্থত : সৌদি আরব, কাতার ও তুরস্কসহ আঞ্চলিক সুন্নি বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের সাথে ইরান ও ইরাকের মতো শিয়া শাসিত রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই সিরীয় সংকটকে অধিকতর ঘনীভূত করেছে।

পঞ্চমত : ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনের হামাস পরিচালিত পাশ্চাত্যবিরোধী আন্দোলন স্তিমিত করতে পাশ্চাত্যের চিরবন্ধু ইসরাইলের হঠকারী ও উস্কানিমূলক কর্মকান্ড সিরীয় সংকটে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে রূপ প্রদান করেছে।

ষষ্ঠত : স্নায়ুযুদ্ধের সাবেক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার স্নায়ুযুদ্ধকালের মধ্যপ্রাচ্যীয় ঠান্ডা লড়াই যেন নবতররূপে সিরীয় সংকটে যুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি, পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ শক্তি চীন এবং নিরাপত্তা পরিষদের ইউরোপীয় স্থায়ী রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণ সিরীয় ইস্যুকে অসমাধানযোগ্য সমস্যায় পরিণত করেছে।

সিরীয় সংকটের নেপথ্যে উপরোক্ত কারণসমূহ সংকটটিকে জটিল রূপ দিয়েছে।

৬.৮ সিরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ (Couses of the Democratic Movement of Syria)

সিরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ গুলো হলো বিগত ৫০ বছর সিরিয়া ছিল একনায়কতন্ত্র আসাদ পরিবারের হাতে জিম্মি। শাসকদের মনমতো গণতান্ত্রিক বিধি বিধান সিরিয়ার জনগণের তেমন কোন ভাগ্য পরিবর্তণ করতে পারেনি। ফলে নিজেদের অধিকার আদায়ে তারা ২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে আসাদ বিরোধী আন্দোলনে নামে। সিরিয়ায় এ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার পেছনে মূল কারণ গুলো হলো :

১. **আসাদ পরিবারের একনায়কতন্ত্র :** দীর্ঘ ৫০ বছর আসাদ পরিবার সিরিয়ায় ক্ষমতা নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রেখেছে । ১৯৬৩ সালে হাফিজ আল আসাদ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করে। পরবর্তীতে তার পুত্র বাশার আল আসাদ ২০০০ সালে পিতার পথ অনুসরণ করে

ক্ষমতাসীন হন। মূলতঃ বিগত ৫০ বছর সিরিয়ায় কোন গণতন্ত্র ছিল না। আসাদ পরিবারের নির্দেশেই দেশ চলছে। ফলে সেখানকার জনগণের মধ্যে এ প্রতিক্রিয়া দিন দিন বেড়েই চলছিল।

২. **আরব বসন্ত :** ২০১১ সালের শুরুতে সমগ্র আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের দাবীতে যে আন্দোলন বা আরব বসন্ত শুরু হয়েছিল তার ঢেউ সিরিয়াতেও আছড়ে পড়েছিল তড়িৎ গতিতে । এই আন্দোলনের প্রভাবে সিরিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক এমনকি নিষিদ্ধ সংগঠনসমূহ সরকার বিরোধী আন্দোলনের রাস্তায় নেমে পড়ে।

৩. **রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব :** বিশ্বব্যাপী রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্বের ফলে অনেক নিরীহ জনগণকে মূল্য দিতে হয়েছে। সিরিয়া তার নব্য একটি উদাহরণ। একমেরুকেন্দ্রীক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে রাশিয়া ও চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার খর্ব করার জন্য সিরিয়া সরকারকে পেছন থেকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে আন্দোলনরত বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাচ্ছে ফলে দুই পক্ষই মুখোমুখী অবস্থানে রয়েছে।

৪. **প্রতিবেশীদের ভূমিকা :** সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশ সমূহ যেমন তুরস্ক, সৌদি আরব এবং কাতার আন্দোলকারীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ, অর্থসহ যাবতীয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে । অপরদিকে প্রতিবেশী ইরান, সিরীয়া সরকারকে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তুরস্কের সামরিক বাহিনী এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে দি সিরিয়ান আর্মি বা স্বাধীন সিরিয় বাহিনী গঠিত হয়েছে। বিদেশ থেকে অর্থ আসছে তার পরিণতিতে নষ্ট হচ্ছে আন্দোলনের নিজস্বতা ও স্বনির্ভরতা। ব্যাহত হচ্ছে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা। সৌদি আরব ও কাতারের সমর্থনে সিরিয়ার চারিদিকে অস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে যুদ্ধ চলছেই।

৫. **আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা :** সিরিয়াতে সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো, অস্ত্র, অর্থ, পরামর্শসহ সকল ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। অপরদিকে চীন এবং রাশিয়া আসাদ সরকারকে অস্ত্র, অর্থ, প্রশিক্ষণ জাতিসংঘে ভেটো সহ যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থন যোগাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিক্ষোভকারীদের সশস্ত্র গোষ্ঠী ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (এফ, এস, এ) কে বৈধতা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব ও কাতার এফ এস এ কে ১০ লাখ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো সিরিয়ায় বিক্ষোভকারীদের প্রকাশ্য সংগঠন সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠনে সহায়তা করছে।

৬. **কফি আনানের শান্তি প্রক্রিয়া ব্যহত :** জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব জাতিসংঘের বিশেষ দূত হিসেবে আরবলীগের সহায়তায় কফি আনান এপ্রিল ২০১২ সিরিয়ায় শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে যে অস্ত্র বিরতি প্রস্তাব করেছিলেন কোন পক্ষই তা যথাযথভাবে পালন না করায় যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সেই সাথে বড় বড় শহরগুলো থেকে সেনাবাহিনী ও জঙ্গীদের প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। পনের মাসের ধারাবাহিক সংঘর্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ১০ লক্ষাধিক মানুষের সাহায্যের জন্য তার বিশেষ পরিকল্পনাও ছিল।

৭. **মৌলবাদীদের অংশগ্রহণ :** সিরিয়ায় সরকার বিরোধী আন্দোলন একসময় গণআন্দোলন হলেও পরবর্তীতে দেশের ভিতর এবং বাইরের বিভিন্ন ইসলামী মৌলবাদী দল ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের এই আন্দোলনটি ধর্মীয় আন্দোলনের দিক পরিবর্তনের কারণে মৌলবাদী সংগঠনগুলো নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করছে আন্দোলনকারীদের সহায়তার জন্য ধর্মীয় বিদেশী জিহাদীরা দলে দলে সিরিয়ায় প্রবেশ করছে। ফলে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ সুযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে উগ্রপন্থী গোষ্ঠী আল কায়েদা। লিবিয়া ও আরবদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদীরাও যুক্ত হয়েছে।

৮. **আন্দোলনরত দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব :** সিরিয়া সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রথমদিকে গণআন্দোলনে রূপ নিলেও পরে তা গতি হারিয়ে ফেলে। সিরিয়ার শাসক গোষ্ঠী বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। ফলে বিভিন্ন আন্দোলনকারী দলগুলোর মধ্যে কোন ঐক্য গড়ে উঠে নাই। এমনকি তাদের মধ্যে আদর্শগত বিভেদ থাকার কারণে আন্দোলন বিচ্ছিন্নতায় রূপ নিয়েছে।

৯. **ইরানের প্রভাব :** ইরানের ওপর চাপ বাড়াতেই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র । কারণ সিরিয়া ইরানের অন্যতম সহযোগী।

১০. **মধ্যপ্রাচ্যের তেলের দখল :** উপসাগরীয় অঞ্চল এবং মধ্যএশিয়ায় তেলের দখলের ক্ষেত্রে ইরানকেই প্রধানত পথের কাটা মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার

ছলনায় পুনরায় একটি আগ্রাসী যুদ্ধ সিরিয়ার উপর চাপিয়ে দিতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যার পরিনাম শুধু উপসাগরীয় অঞ্চলেই নয়, ছড়িয়ে পড়বে দূর-দূরান্তে ।

১১. **তুরস্কের সাথে দ্বন্দ্ব :** ২০১২ এর জুনে সিরিয়া সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তে এফ ৪ ফ্যান্টম তুর্কি সামরিক বিমান গুলি করে ভূমধ্যসাগরে ভূপাতিত করে। এতে করে ২জন বৈমানিক সহ বিমানটি ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ হয়ে যায়। তুরস্ক বিষয়টি ন্যাটো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘকে অবহিত করেছে। ভূপাতিত করার পর অপর একটি তুর্কি বিমান ভূপাতিত বিমানের অনুসন্ধানে গেলে সিরিয় সেনা বাহিনী সেটিও লক্ষ্য করে গুলি করে। তুর্কি বিমান ভূপাতিত হওয়ার পর থেকে তুরস্কের সাথে সিরিয়ার সংঘাত মারাত্মক আকার নিয়েছে। ফলে তুরস্ক সিরিয়ার সরকার বিরোধীদের সকল ধরণের সাহায্য সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করেছে যা সরকার বিরোধী আন্দোলনে নতুন করে শক্তি সঞ্চার করছে। এদিকে বিমান ভূপাতিত হওয়ার পর থেকে তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে সাজোয়া বহর থেকে শুরু করে বিমান বিধ্বংসী কামান এবং ক্ষেপণাস্ত্রবাহী বিভিন্ন যান জড়ো করতে শুরু করেছে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম যখন প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নিচ্ছে, ঠিক তখনই প্রতিবেশী তুরস্কের এই সামরিক প্রস্তুতি দুই দেশের সম্পর্ক আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উল্লেখ্য তুরস্ক ২৮ সদস্যভুক্ত সামরিক জোট ন্যাটোর অন্যতম সদস্য।

৬.৯ আন্দোলন সাফল্য লাভ না করার কারণ সমূহ (Causes of Failure of Demonestration)

দীর্ঘ দুই বছরেও সিরিয়ার আন্দোলন সফলতার মুখ না দেখার প্রধান কারণগুলো হলো :

১. **প্রেসিডেন্ট আসাদের সশস্ত্র দমনপীড়ন নীতিমালা :** আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট আসাদ তার সেনাবাহিনী দিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর তীব্র দমনপীড়ন চালান। এতে করে ৩৫ হাজারেরও বেশী লোক নিহত হয়। লক্ষাধিক লোক আহত হন, হাজার হাজার লোক জেলে বন্দী হন এমনকি বহু লোক ঘর-বাড়ি, এলাকা ছেড়ে দেশের বাইরে যেতে বাধ্য হয়। আসাদের এই কঠোর দমন পীড়ন আন্দোলনকারীদের সাফল্য অর্জনে প্রধান বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

২. **আরব বসন্তের ভুল পথে :** আরব বসন্তের অন্যান্য দেশের প্রভাবে এই আন্দোলন সিরিয়াতে সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এটা সঠিক পথে যেতে পারেনি। অন্যান্য আরব দেশে আরব বসন্তের প্রভাবে সুফল অর্জন করলেও সিরিয়ায় তা ব্যর্থতার দিকে যাচ্ছে। এর কারণ এই বিরোধীতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবর্তে সশস্ত্র রূপ নিয়েছে।

৩. **আল কায়েদার সংশ্লিষ্টতা :** বিশ্বব্যাপী আল কায়েদা একটি উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আল কায়েদার বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চলছে তাতে করে আল কায়েদার জন্য বিশ্বে নিরাপদ স্থানের অভাব হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে আল-কায়েদার সশস্ত্র যোদ্ধারা আরব বসন্তের সুযোগ নিয়ে সিরিয়া সহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে গণ আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। এতে করে গণ আন্দোলন মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সশস্ত্র এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের লক্ষ্য পূরণের সহায়ক হয়ে উঠেছে ফলে গণ আন্দোলনে ভাটা পড়েছে। আল কায়েদার জন্য এসকল দেশের ভূ-খণ্ডকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের বিরাট সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই ইসলামী জঙ্গী সংগঠনটি আরব বিশ্বে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

৪. **সিরীয় সৈন্যদের স্বপক্ষ ত্যাগ :** সিরিয় সেনাবাহিনী থেকে প্রায় প্রতিদিনই সামরিক কর্মকর্তাসহ সেনাসদস্যরা স্বপক্ষ ত্যাগ করে তুরস্কে চলে যাচ্ছে। সেখানে তারা আসাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে সিরিয়াতে সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে সিরিয়া সেনাবাহিনীতে একরকম অনিশ্চয়তা তৈরী হয়েছে এবং দিন দিন সরকার বিরোধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনী থেকে একে একে সরকার পক্ষ ত্যাগের ঘটনা ঘটছে গত ২০১১ থেকেই। তুরস্ক সরাসরি সিরিয়ার সরকার বিরোধী পক্ষ ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে সহায়তা করছে। যে গোষ্ঠীর অনেকেই সিরিয়ার পক্ষ ত্যাগী সেনাসদস্য। ফলে সামরিক ও বেসামরিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে সমঝোতার অভাব রয়েছে।

৫. **আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব :** প্রেসিডেন্ট আসাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম দিকে ছিল শুধুমাত্র সিরিয়ার গণতন্ত্র বঞ্চিত সাধারণ জনগণ। যারা দীর্ঘদিন সিরিয়ায় একনায়কতন্ত্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে রয়েছে। কিন্তু আন্দোলন বেগবান হওয়ার সাথে সাথে এর সাথে যুক্ত হয় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী সংগঠন। ফলে আন্দোলনকে যে যার মত করে তার লক্ষ্যে পরিচালনা করা এবং সুবিধা আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ফলে দিন দিন আসাদ বিরোধী আন্দোলন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আসছে।

এতে করে পশ্চিমা শক্তিগুলোও বাহির থেকে আন্দোলনরত গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র, অর্থ, প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বাত্মক সহায়তা করছে ফলে আন্দোলনটি এখন পুরোপুরি সশস্ত্র রূপ নিয়েছে। এতে করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মর্যাদা হারিয়েছে । এই আন্দোলনে যেমন শরীক হয়েছে সিরিয়ার সাধারণ জনগণ যাদের মূল দাবী সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে উগ্র মৌলবাদী ইসলামিক দল ইসলামী ব্রাদারহুড যাদের লক্ষ সিরিয়ায় ইসলামিক শাসনতন্ত্র কায়েম আবার এর সাথে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সংগঠন আল কায়েদা যাদের মূল লক্ষ্য সিরিয়ার ভূখণ্ডকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। বহুবিধ লক্ষ্যের কারণে সিরিয়ায় গণ আন্দোলন কিছুটা হলেও তার মূল লক্ষ্য থেকে পথ হারিয়েছে। এতে সাফল্য অর্জন অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

মনে রাখার Technique & Tips

সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- সিরিয়া বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত- স্টেফান ডি মিস্তুরা (ইতালি)
- সিরিয়ার প্রধান বিরোধী গ্রুপ সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশনের (SNC) বর্তমান প্রেসিডেন্ট- হাদি আল বাহরা (৯ জুলাই২০১৪ তিনি নির্বাচিত হন)
- সিরিয়ার বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রীর নাম- খাসান হিট্টো (১৮ মার্চ ২০১৩-বর্তমান)।
- সিরিয়ার বিরোধীদের জাতীয় পরিষদের নাম Syrian National Council (গঠন ২৩ আগস্ট, ২০১১)
- সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যিক রাজধানী-আলেপ্পো।
- সিরিয়ার গণআন্দোলন বা বিক্ষোভের সূতিকাগার- হোমস শহর।
- 'হামা' যে দেশের শহর-সিরিয়া।

৬. **জাতিগত দ্বন্দ্ব :** সিরিয়ার সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রথমদিকে রাজনৈতিক থাকলেও ধীরে ধীরে এর সঙ্গে জাতিগত ও গোষ্ঠিগত বিভেদ এবং বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট ক্ষোভের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সুন্নি মতাবলম্বী হলেও দেশটির শাসন ক্ষমতা কার্যত শিয়াদের নিয়ন্ত্রণে। সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব প্রতিপ্রতিার বিবেচনাতেও শিয়ারা সুন্নিদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। সুন্নি-শিয়াদের এই বিরোধই মূলত সিরিয়ার সংঘাত বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

৭. **পশ্চিমা বিশ্বের ষড়যন্ত্র :** পশ্চিমা বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যে সবসময়ই সংকট দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে প্রস্তুত থাকে। সিরিয়ার সংকট দীর্ঘায়িত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ এবং তাদের শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত ইরানকে শায়েস্তা করার জন্যই সংকট দীর্ঘস্থায়ী করে রাখে এবং সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ধারা বজায় থাকতে দেয় না। এতে করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সব সময়ই পাশ্চাত্যের দেশগুলোর হিংস্রতার শিকার হয়।

৮. **সিরিয়ায় আন্দোলনকারীদের দুর্নীতি :** সিরীয়ায় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতাদের দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে তারা পিছন থেকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিন্তু সামনে আসছেন না। আন্দোলনের অগোচরে তারা সাধারণ সিরিয়দের বাড়ীঘর থেকে মূল্যবান সামগ্রী চুরি, ডাকাতি ও লুণ্ঠন করে। সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর সম্পদের মালিক হচ্ছেন। ফলে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের সাথে তাদের দূরত্ব তৈরী হচ্ছে। আর এতে করে দিনদিন আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। সিরিয়ায় প্রকৃত বিপ্লব দুর্নীতিতে কলঙ্কিত হচ্ছে।

৬.১০ সিরিয়ার সংকট সমাধানে গৃহীত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ (International Steps Towords Resolve Syrian Crisis)

সিরিয়ায় শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শুরুর বিষয়ে জাতিসংঘ ও আরবলীগের বিশেষ দূত কফি আনান ১০ এপ্রিল ২০১২ যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। তাতে সম্মতি দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ এবং আন্দোলনরত সংগঠনগুলো। কফি আনানের ঐ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে সময় শুরুর ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই সহিংসতা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা। শহর গুলোতে নিরাপত্তাকর্মীদের অভিযান বন্ধ করা এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সেনা প্রত্যাহারের মাধ্যমে সিরিয় সরকার ঐ শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন শুরু করবে। বিদ্রোহীরা কফি আনানের ছয় দফা পরিকল্পনার সব কয়টিকেই মেনে চলতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে। দাবিগুলো হচ্ছে ১. অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করতে হবে, ২. সব ধরণের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে, ৩. বেসামরিক এলাকা থেকে ট্যাংকসহ সব ধরণের যুদ্ধযান

সরিয়ে নিতে হবে, ৪. সব এলাকায় মানবিক সাহায্য পাঠাতে দিতে হবে, ৫. রাজনৈতিক বন্দী ও বিক্ষোভকারীদের মুক্তি দিতে হবে এবং ৬. দেশের সব এলাকায় গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। ১২ এপ্রিল ২০১২ থেকে এই শান্তি প্রস্তাব উভয় পক্ষকেই মেনে চলার জন্য কফি আনানের মধ্যস্ততায় ১২ এপ্রিল, ২০১২ থেকে সিরিয়ার ছয় দফা শান্তি পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। সে অনুযায়ী সরকার ও বিরোধীগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি শুরু হয়েছিল। তবে সরকার বিরোধীরা বলছে আসাদ বাহিনী যুদ্ধ বিরতি মানছে না। তাই তারাও হামলা অব্যাহত রেখেছে। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে ক্রমেই কঠোর হচ্ছে বাশারের সেনা অভিযান। ফলে নির্বিচারে মারা যাচ্ছে নারী ও শিশুসহ বেসামরিক লোক। ফলে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এদিকে প্রেসিডেন্ট আসাদ ২২ জুন, ২০১২ দেশটিতে নতুন সরকার গঠনে একটি ডিক্রি জারি করেছেন। ফলে দেশের সহিংসতা সহজেই থামছেনা। এছাড়া যে সকল পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে সেগুলো হলোঃ

১. **যুক্তরাজ্যের সাহায্য :** ২০১২ সালে ১২ আগস্ট যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে যে সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের ৫০ লাখ পাউণ্ড সহায়তা দেওয়া হবে। যোগাযোগ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম কিনতে এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সিরিয়ার বিদ্রোহীদের ৫০ লাখ পাউণ্ড সহায়তা দেওয়ার ঘোষণাকে সিরিয়া পরিস্থিতির বিষয়ে যুক্তরাজ্যের নীতির পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে।

২. **শান্তিদূত নিয়োগ :** আলজেরিয়ার কূটনৈতিক লাখদার ব্রাহিমি জাতিসংঘ ও আরব লীগের সিরিয়া বিষয়ক দূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। এর আগে সবার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে ঐ পদ ছেড়ে দেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান। ২৩ ফেব্রুয়ারি,২০১২ কফি আনানকে ঐ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং ২ আগস্ট ,২০১২ সিরিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক শান্তিদূতের পদ থেকে ইস্তফা দেন জাতিসংঘের সাবেক ও সপ্তম মহাসচিব কফি আনান। তার পদত্যাগ পাওয়ার পর উত্তরসূরী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় আলজেরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রি লাখদার ব্রাহিমিকে।

৩. **ইরানে সিরিয়া বিষয়ক সম্মেলন :** ইরানের উদ্যোগে দেশটির রাজধানী তেহরানে ২০১২ এর আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে রাশিয়া,চীন,ভারত,পাকিস্তান,জর্ডান,কিউবা,ইরাক,ভেনিজুয়েলা সহ ২৯টি দেশ অংশ নেয়। বৈঠক শেষে দেওয়া এক বিবৃতিতে সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সহিংসতা বন্ধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। সিরিয়ায় জাতীয় সংলাপের ভিত্তিতে বর্তমান পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন কিংবা প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সরে যাওয়ার মতো কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে সিরিয়ার জনগণকে হত্যায় আসাদ সরকারকে সমর্থন দিতেই ইরান তেহরানে এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

৪. **OIC-তে সিরিয়ার সদস্যপদ স্থগিত :** মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় (OIC) সিরিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১৫ আগস্ট, ২০১২। সিরিয়ার সহিংসতা নিয়ে আলোচনার জন্য সৌদি আরবের মক্কা নগরে ১৫ আগস্ট, ২০১২ OIC এর দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৫৭ সদস্য রাষ্ট্রের সংগঠন OIC-তে প্রাথমিকভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সংস্থাটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

৫. **জাতিসংঘের মিশনের মেয়াদ শেষ :** ২০১২ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গঠন করা হয় সিরিয়ার জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন। ১৯ আগস্ট ২০১২ মধ্যরাতে এ মিশনের মেয়াদ আনুষ্ঠানিক শেষ হয় ।

৬. **আরবলীগ থেকে সিরিয়াকে বহিস্কার :** নিজ দেশের জনগণের উপর নির্যাতনের অভিযোগে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের স্বৈরতান্ত্রিক নীতির অনীহা প্রকাশ করে আরবলীগ থেকে সিরিয়াকে ইতোমধ্যে বহিস্কার করা হয়েছে।

৭. **সিরিয়া সংকট নিয়ে ন্যাম সম্মেলন উত্তপ্ত :** সিরিয়া সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের উত্তাপ ২০১২ এর ন্যাম সম্মেলন পর্যন্ত পৌঁছেছে। ৩১ আগস্ট, ২০১২ শেষ হওয়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) সম্মেলনে উত্তাপ ছড়িয়েছিল মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ মুরা-সর বক্তব্য। তিনি সিরিয়ার বিদ্রোহীদের সমর্থনে বক্তব্য দেন। তিনি সিরিয়ার বিদ্রোহকে 'অত্যাচারী শাসন' এর বিরুদ্ধে বিপ্লব বলে অভিহিত করে বলেন, অন্যায় শাসকের বিরুদ্ধে

সিরিয়রা যে সংগ্রাম করছেন, তার সঙ্গে আমাদের সংহতি ঘোষণা করতে হবে। এ শাসন বৈধ্যতা হারিয়েছে। এ আন্দোলনকে সমর্থন করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, এর রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। মুরসি সিরিয়ার সরকার বিরোধী আন্দোলনকে ফিলিস্তিনীদের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, দুই পক্ষেই স্বাধীনতা মর্যাদা ও ন্যায় বিচার চাইছে। রক্তপাত বন্ধ করতে মিশর সব পক্ষের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। সিরিয়ার রক্তপাত নিয়ে সবাই শংঙ্কিত এবং এটি বন্ধ করা সবারই দায়িত্ব। মিশরের এ ভাষণের পর সিরিয়ার প্রতিনিধিরা সম্মেলন থেকে ওয়াক আউট করে। মুরসি সিরিয়ার রক্তপাতে উস্কানি দিচ্ছেন- এমনটাই অভিযোগ তোলেন সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রি।

৮. **চতুর্থপক্ষীয় জোট :** সিরিয়া সংকট সমাধানে ইরানের সহযোগিতায় চতুর্থ পক্ষীয় জোট গঠনের পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের তিন মিত্র মিশর,তুরস্ক ও সৌদিআরব। মিশরের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইরানই পারে সিরিয়াকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে এবং সমস্যা সমাধান করতে। একই সঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

৯. **লাখদার ব্রাহিমির পথ মসৃন নয় :** কফি আনানের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় জাতিসংঘ ও আরবলীগের সিরিয়া বিষয় দূত আলজেরিয়ায় অভিজ্ঞ কূটনৈতিক লাখদার ব্রাহিমির পথ মসৃন নয় তা শুরুতেই তিনি বুঝতে পেরেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে এই শান্তি দূতের মুখে শোনা গেছে শঙ্কাবাণী। সিরিয়ার চলমান সংকট থেকে উত্তরণের ব্যাপারে গভীর হতাশা ব্যক্ত করেছেন ৭৮ বছরের ব্রাহিমি। নবনিযুক্ত এ বিশেষ দূত শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার সফল পরিসমাপ্তির বিষয়টিকে 'প্রায় অসম্ভব' বলে মনে করেন। তার মতে বর্তমান পরিস্থিতি যতদূর বুঝতে পারছেন তা থেকে তিনি পরিত্রাণের কোন পথ দেখতে পারছেন না। তবে সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা'মৌলিক ও জরুরী' বলে মত দেন।

১০. **অন্তবর্তী সরকার পরিকল্পনা সিরিয়ায়:** ২৩ মাস ধরে চলা রক্তপাত বন্ধে এবং একটি অন্তবর্তী সরকার গঠন প্রশ্নে জাতিসংঘ আরবলীগ শান্তিদূত কফি আনানের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছে বিশ্ব শক্তিগুলো। জুন, ২০১২ এর শেষের দিকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত সিরিয়া বিষয়ক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বশক্তিগুলো এ ব্যাপারে নিজেদের সম্মতির কথা জানান। বৈঠকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সবাই একমত হন যে দেশটিতে আর যেন কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ না ঘটে সে লক্ষ্যে একটা অন্তবর্তী সরকার গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। সে মোতাবেক সেখানে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে বাশার সরকার এবং বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ঐকমত্য সরকার গঠন করা হবে। এছাড়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ার পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে কফি আনান বলেন আমি আশাবাদী যে সিরিয়ায় একটি অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হবে এবং তা সরকার ও বিরোধীদের সমন্বয়েই হবে। তিনি বলেন দেশটিতে ভবিষ্যতে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই এটা করতে হবে। তিনি আরও বলেন এটি হবে দেশটির জনগণের জন্য একটি রাজনৈতিক চুক্তি। তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে সংঘাত নিরসনের উপর জোর দেন। বৈঠকের পর পরিপূর্ণ এক ইসতেহারে বলা হয়েছে যে, পরস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই আসাদ প্রশাসনের এবং বিরোধী সব গ্রুপের সমন্বয়ে অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হবে।

১১. **সিরিয়ার উপর অবরোধ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিরিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ২৫ জুন, ২০১২ ইইউ সিরিয়ার উপর অবরোধ আরোপ করেছে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের নেতৃত্বাধীন সিরিয়া সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও একজন ব্যক্তির ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়। এছাড়া সিরিয়ার ওপর অস্ত্রবিষয়ক একটি নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে ইইউ। সিরিয়া সরকারের সম্পদ জব্দ ও দেশটিতে ভ্রমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ১২ জুন ২০১২ পশ্চিমা দেশগুলো প্রেসিডেন্ট আসাদকে ১০ দিন সময় দিয়েছিল ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্য।

১২. **পশ্চিমা দেশগুলো সিরিয়ার বিরুদ্ধে:** অবরোধের কঠোর হুশিয়ারী দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে সিরিয়ায় জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান-সমর্থিত ছয় দফা শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল নজরদারির কাজ করছে। ১৩ জুলাই, ২০১২ এই পর্যবেক্ষকদলের ৯০ দিনের কার্যক্রম শেষ

http://thejobstudy.com
Go to Contents

হয়েছে। রাশিয়া পর্যবেক্ষক দলের মেয়াদ আরও ৯০ দিন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। তবে পশ্চিমা দেশগুলো শুক্রবারের আগেই নিরাপত্তা পরিষদের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সিরিয়াকে অবরোধের হুমকি দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এছাড়া সিরিয়াকে ১০ দিনের মধ্যে বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা এবং সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হলে দামেস্কের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের একটি খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে। রাশিয়া হুশিয়ারী দিয়ে বলেছে, সিরিয়ার ওপর আরো অবরোধ আরোপের জন্য কোন ধরনের প্রস্তাব আনা হলে তাতে ভেটো দেওয়া হবে। এ ধরনের অবরোধ আরোপের প্রস্তাবকে রাশিয়া 'রেড লাইন' বলে অভিহিত করেছে। নতুন এ প্রস্তাবে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি দামেস্ক সরকারের উপর অবরোধ আরোপের আহবান জানিয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সিরিয়ায় যদি ১০ দিনের মধ্যে গোলাযোগপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করে তাহলে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বেসামরিক অবরোধ আরোপ করতে হবে। কিন্তু এ প্রস্তাব আনা হবে জাতিসংঘ সনদের সাত নম্বর অনুচ্ছেদের অধীন যার অর্থই হচ্ছে সিরিয়ার ওপর সামরিক আগ্রাসন অনিবার্য হয়ে উঠবে। অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদের অধীনে কোন প্রস্তাব পাস করা হলে তা সামরিক উপায়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

১৩. **অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অভিযোগ :** সিরিয়ার বাশার আল আসাদ সরকার দেশটিতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে বলে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল অভিযোগ করেছে। সংস্থাটি এ অভিযোগ করার পাশাপাশি দেশটির বিদ্যমান সংকট নিরসনে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে সিরিয়া সরকার প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহীদের উপর দমনাভিযান চালাচ্ছে এবং সংঘবদ্ধভাবেই তারা এ অপরাধ করছে।

১৪. **কর্মকর্তাদের স্বপক্ষ ত্যাগ :** ইরাকে নিযুক্ত সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত নাওয়াফ ফারেস সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছেন। ১১ জুলাই ২০১২তিনি আল-জাজিরা টেলিভিশন ও ফেসবুকে প্রচারিত একটি ভিডিও চিত্রে তিনি এ ঘোষণা দেন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে ২৩ মাস ধরে চলমান আন্দোলন দমনে সরকারের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ফারেসই প্রথম জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক, যিনি স্বপক্ষ ত্যাগ করলেন। এর মাত্র এক সপ্তাহ আগে সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মানাফ তালাস বাশারের পক্ষ ত্যাগ করে সিরিয়া থেকে পালিয়ে যান।

১৫. **সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন সমর্থন :** সিরিয়ার ব্যাপারে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার ঘটনা পরম্পরার বদলে ইয়েমেনের ঘটনা পরম্পরা'র প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ তারা চায় কোন মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে আসাদ যেন সরে যান। সমস্যা হলো বর্তমানে সিরিয়ায় কোন মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ নেই। অর্থাৎ বিরোধীদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দেওয়ার রাস্তা সহজ হচ্ছে। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, সিরিয়ার ক্ষমতা বিরোধীদের হাতে চলে যাওয়ার পক্ষপাতী নয়। তারা মনে করে ইয়েমেনের বা লিবিয়ার চিত্রনাট্য সিরিয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ পাবেনা। এখানে সেই পথেরই সন্ধান করতে হবে যা সিরিয়া এবং সিরিয়ার জনগণের জন্য স্বার্থপূর্ণ বা উপযুক্ত।

৬.১১ সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ও তার প্রতিবেশীদের ভূমিকা

গত দুই দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্য আলাদা দুটি শিবিরে বিভক্ত রয়েছে। একদিকে সৌদি আরবের মধ্যকার সুন্নি রাজতন্ত্রের নেতৃত্বে থাকা সুন্নি শিবির, যারা স্পষ্টতই গত চার দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা আসাদ সরকারকে পতনের তাগিদে বিরোধীপক্ষকে মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মুদ্রার অন্যপিঠের শিবিরটি হলো ইরান, গোটা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে শিয়া শাসিত একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র, যারা বহির্বিশ্বের আধিপত্য ঠেকাতে নিজেরাই মধ্যপ্রাচ্যের গোষ্ঠীবদ্ধতাকে জোরদারে ভূমিকা পালন করছে। তাই এই প্রেক্ষিতে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমাদিনিজাদ বলেন যে, শত্রুপক্ষ মুসলিম দেশগুলোর জ্বালানি ও সম্পদকে অপচয়ের জন্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সংঘাতকে উসকে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সিরিয়ার দীর্ঘ অচলাবস্থা প্রায় ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু ও ২ লক্ষ ২০ হাজার উদ্বাস্তুর জন্ম দিয়েছে। যারা বিভিন্ন সময় সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। এ রকম প্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য

গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সেটার অনুসন্ধান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বের দাবি রাখে।

উপসাগরীয় রাজতন্ত্র (Gulf Monarchy)

বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন, পারস্য উপসাগরীয় কিছু দেশ যারা ইরানে ক্রমাগত পরমানু প্রযুক্তির বিকাশকে ভয় পায় এবং তেহরানে প্রভাব অনুবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রবণতা সেখানে দেখা যায় যে, বাহরাইনে ২০১১ সালে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া বিক্ষোভকারীদের প্রতি ইরান পক্ষপাত নেয়। অবশ্য এর সময় সৌদি আরব ও আরব আমিরাত বাহরাইনে সেনা প্রেরণ করে। একইভাবে, সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ সিরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন প্রকাশ করে এবং উল্লেখ করেন যে, সিরিয়ার সরকারের আর কোন বৈধতা নেই। এরপর ঘটনাটি এমন অভিমুখে যাত্রা করে যেখানে পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহে সিরিয়ার বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগীতা দিতে থাকে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে কিনা এই উপ-অঞ্চলের প্রধান মিত্র হিসেবে পরিচিত, সেও বিভিন্ন পন্থায় সহায়তা বা বন্দোবস্ত করে।

লেবানন (Labanon)

এটা স্মরণযোগ্য যে, কিঞ্চিতকাল পূর্ব পর্যন্ত লেবাননের উপর সিরিয়া দেশটি অভিভাবকত্বসুলভ বিবেচনাহীন আধিপত্য জারি ছিলো এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেখানে সেনা মজুদ করে রেখেছিল। লেবাননের রাজনীতির উপর সতর্কতামূলক সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য আরোপ এবং সিরিয়া ও লেবাননের মধ্যকার বিদ্যমান সংবেদনশীল সম্পর্কের প্রভাব পড়ছে তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। এর ফলে সিরিয়ার সন্দেহভাজন হত্যাকারী দ্বারা লেবাননের রাজনৈতিক নেতাদের খুন করার পাশাপাশি হিজবুল্লার প্রতি সিরিয়া ও ইরানের প্রত্যক্ষ সহায়তার কারণে ইসরাইল বিরোধী শিয়া বাহিনীও লেবাননে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান পোক্ত করছে। যদিও লেবাননের জনগণের একটা বড় অংশের মধ্যে হিজবুল্লাহ সেনাদলের একটা বিস্তৃত প্রভাব প্রচ্ছন্ন বলয় কার্যকর আছে। জাতিসংঘের তথ্য উপাত্তে দেখায় যে, যখন থেকে বাশার আল আসাদ সরকার ২০১১ সালে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে লাঞ্ছিত হতে শুরু করে, তখন থেকে প্রায় এ পর্যন্ত ৪০ হাজার সিরিয়াবাসী লেবাননে উদ্বাস্তু হিসেবে অবস্থান নেয়। এখানে সংযুক্তি হিসেবে আরো বলে রাখা ভালো যে, এসব উদ্বাস্তুদের ভিড় দেশে নতুন করে উত্তেজনা তৈরী করছে প্রতিনিয়ত। উল্লেখ্য যে, এ অঞ্চলে পূর্ববর্তী আরব ইসরাইল যুদ্ধের খেসারত হিসেবে আরও প্রায় ৪০ হাজার ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুর বাস। এসব বিষয় পরিস্থিতিকে আরো বহুমাত্রিকতা দান করার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের আকাশকে ক্রমশই ঘোলাটে করে ফেলছে।

ইরান (Iran)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও তার ইউরোপীয় সহযোগী মিত্ররা ক্রমাগত নিজেদের নিরাপত্তাকে জোরদার করার সাথে সাথে উন্নত পারমানবিক জ্বালানি উৎপাদনের কাজ করছে। ওদিকে তেহরান ক্রমাগত দামেস্কোতে শিয়া নিয়ন্ত্রিত শক্তিপক্ষকে সমর্থন দিয়ে আসছে। প্রতিনিধিত্বশীল শিয়া সম্প্রদায় হিসেবে ইরান আর আসাদ সরকারের সর্বোচ্চরকম সমর্থক হিসেবে কাজ করছে। এই নীতিমালা তারাও অনুসরণ করছে কেননা এটা ইরানের শক্তিঅক্ষকে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত প্রদর্শন করে। সিরিয়া ও লেবাননের উভয়ের শিয়া সমর্থিত হিজবুল্লাহ সেনাদল এই কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। এন্ড্রু ট্যাবলর, ওয়াশিংটন ইনষ্টিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসির অন্যতম রাজনৈতিক বিশ্লেষক এ প্রেক্ষিতে সিরিয়াকে ইরানের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যাখ্যা দেন যা কেবল উপসাগরীয় এলাকায় ইরানের ভূমিকাকে কেবল গুরুত্বপূর্ণই করে তুলবে না, পাশাপাশি আরব মধ্যপ্রাচ্যসহ তুরস্কেও এর ঢেউ এসে লাগবে।

তুরস্ক (Turtey)

প্রদর্শিত সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করার কারণ হিসেবে আসাদ সরকারের মানবিক দায়িত্ববোধের অবনতি লক্ষ্য করা যায়। যেটা শুরু হয়েছিল একটি উদারতা মাখানো অবয়বের হাত ধরে, সেটা আজ কঠিন দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। মাত্র এক বছরের মাথায় এ দেশটিতে প্রায় ৬০ হাজার উদ্বাস্তু জায়গা করে নিয়েছে, যাদের অনেকেই সিরিয়ার বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করে। আসল বিষয়টি হলো, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হয়েছে এবং বর্তমানে তুরস্ক সিরিয়ার বিরোধী পক্ষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে পরিণত হয়েছে, এছাড়া সিরিয়ার যোদ্ধারা তুরস্ককে ব্যবহার করছে অস্ত্র চোরাচালান করে সিরিয়াতে পাচারের জন্য। মধ্যসাগরীয় এলাকায় তুরস্কের যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনার পর

থেকে তুরস্ক নিজেও তুরস্ক সিরিয়া সীমান্ত এলাকায় নিজেদের শক্তিকে জোরদার করেছে। এটা বোধগম্য যে ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আর বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে এ অঞ্চলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিকল্পনা গ্রহনে রাজি হয়েছে, যেটাকে আসাদ সরকারের পতনের পর বাস্তবায়নের দিকে যেতে হবে। কিন্তু তুরস্কের জনগণ, যারা কয়েক দশক ধরে কুর্দিদের সাথে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে লড়াই করে আসছে, তারা আলাদা করে সাম্প্রতিক দৃশ্যপটের উপর মনোযোগী হয়ে উঠছে কেননা চূড়ান্ত বিষয়টি হলো তুরস্ক সরকার মনে করে সিরিয়ার উপ অঞ্চলসমূহে কেন্দ্রে সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা না থাকায় অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। তাদের পক্ষে এই অনিশ্চয়তা প্রবল, কেননা বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিস্তান শ্রমিক দলের পতাকা বিক্ষোভগুলো পার্শ্ববর্তী সীমান্তবর্তী এলাকা দ্বারাই প্রভাবিত হওয়াটাই একান্ত স্বাভাবিক।

ইরাক (Iraq)

প্রতিবেদন ইঙ্গিত দেয় যে, ২০০৩ সালে যখন ইরাকে যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়, প্রায় ৩০ হাজার ইরাকি সিরিয়াতে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় চায়। এটা ছিলো মুলত শিয়া ও সুন্নি দুই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যকার জবর দখলের একটা দীর্ঘ যুদ্ধকালীন অবস্থা, যেটা মার্কিন আগ্রাসনকে অনুসরণ করে। মার্কিন কমান্ডার সিরিয়াকে বছরের পর বছর ধরে দোষারোপ করে আসছে যে, সিরিয়া সরকার যোদ্ধাদেরকে ইরাকে এসে মার্কিন বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজেদের সীমা ব্যবহার করতে দেয়। এ ক্ষেত্রে বর্তমান মার্কিন বাহিনী আশা করছে যে, তারা এ ব্যাপারে আসাদ সরকারের সাথে সমঝোতায় আসতে পারবে। কিন্তু এখন দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। গত বছরের পুরোটা সময় জুড়েই সিরিয়ার প্রায় ২১ হাজার উদ্বাস্তু ইরাকে প্রবেশ করে। এই পরিসংখ্যান পুরো দৃশ্যপটকে আরো জটিল করে তুলেছে। কিছু পশ্চিমা শক্তি এখন ভীত এই ভেবে যে সুন্নি নিয়ন্ত্রিত আল কায়েদা বাহিনী এই সুযোগটি ব্যবহার করে সীমানা অতিক্রম করবে এবং আল আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিদ্রোহীগ্রুপকে সহায়তা করবে। শিয়া নিয়ন্ত্রিত বর্তমানের ইরাকি সরকারও এখন বেশ দুশ্চিন্তায় আছে, কেননা ইরাকের কিছু কিছু জায়গায় এখনও মৌলবাদী সুন্নি জেহাদির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা করছে ইরাকি সরকার, যেটা ভন্ডুলও হতে পারে।

এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, সিরিয়ার এই দৃশ্যমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন করার কাজটা জাতিসংঘ সুষ্ঠু ও সুচারুরুপে করতে পারেনি। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান ইতিমধ্যে বিশেষ দূত হিসেবে নিজের নামটিকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি কাঙ্খিত আন্তর্জাতিক সমর্থন না থাকাকে তার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা বলে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করছেন। একইভাবে, সিরিয়ায় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পঙ্গুত্বের দিকে আমাদের নজর ফেরায়। চীন ও রাশিয়া, উভয় দেশই সিরিয়ার উপর কঠিন প্রস্তাব আরোপ করেছে, এছাড়া তারা আরও তিনটি প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করেছে। বর্তমানে সিরিয়ায় চলমান দ্বন্দের ক্ষেত্রেও একধরনের রুপান্তর দেখা যাচ্ছে। ক্রমশই এটি একটি ভয়াবহ গেরিলা যুদ্ধে রুপান্তরিত হয়ে উঠছে। আরব লীগ ও জাতিসংঘের দূত ব্রাহিমী, কফি আনান এর এই উত্তরাধিকারী সমানভাবে এই কঠিন কাজটি করে চলেছে।

এখন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা তুরস্কের সীমান্ত সংলগ্ন সিরিয়ার কিছু প্রত্যন্ত এলাকায় স্বল্পমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া তারা শহরে অঞ্চলে কিছু গুহাকেও নিজেদের জন্য নিরাপদ করতে পেরেছে। কিন্তু প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে এটা প্রমানিত হয় যে, আসাদ সরকার নিজস্ব জনশক্তির বলে বিদ্রোহীদেরকে তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারে। এদিকে পশ্চিমা বিশ্ব প্রতিনিয়ত সিরিয়ার সেনা সদস্যদেরকে কর্মদক্ষতা কার্যকর অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, তারা এখনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একক নেতৃত্ব তৈরীর ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব প্রতিনিয়ত নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও আর্থিক চাপে রাখতে পারে এ অঞ্চলকে, সেই সাথে সিরিয়ার তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ গোটা আসাদ পরিবারের উপর জারি রাখতে পারে নানা ধরনের বিধিনিষেধ ও আন্তর্জাতিক আইনের বেড়াজাল। আর এসবের বাইরেও প্রতিপক্ষতো সংখ্যালঘু। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এটা দেখাতে হবে যে এত সবের মানে সিরিয়ার জনগণের হাত ছেড়ে দেয়া নয়। কেবল পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উদ্বাস্তু পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে, পাশাপাশি সিরিয়ার মধ্যকার ভয়াবহ খাদ্য সংকট সমাধানে সহযোগীতার হাত বাড়াতে হবে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

এটা বোধগম্য যে, সিরিয়া লিবিয়া নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি পশ্চিমা বিশ্লেষকদেরও সমর্থন পায়। যারা উল্লেখ করেন, এমনকি এখনও সিরিয়ার সামরিক জান্তা ও দামাস্কাসের মধ্যকার নেতৃত্ব সম্পর্কিত সংযোগ ও সম্পর্ক আক্ষরিক অর্থেই গাদ্দাফি'র নিত্য পরিবর্তনশীল শাসনব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। এর ফলে এক অংশের হতাশা, আর ডেভিড মুলার সেই হতাশাকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি জানান যে, সিরিয়ার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এমন কোন বিকল্প নেই যেটা দিয়ে সিরিয়ার বর্তমানের এই পরিস্থিতির বিবর্তন ঘটতে পারে।

৬.১২ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্রের হামলা (Chemicel Weapon Attact on Syria)

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদের পদত্যাগের দাবিতে ২০১১ সালের মার্চে শুরু হওয়া বিক্ষোপ পরে সহিংসতায় রূপ নেয়। যার ধারাবাহিকতায় দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বাহিনী গড়ে ওঠে। এসব সরকার বিরোধি বাহিনীকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদিআরব, তুরস্ক সহ অনেক রাষ্ট্র। প্রায় ২ বছর ধরে চলে আসা সরকারী সেনাবাহিনী এবং সরকার বিরোধিদের মধ্যে চলে আসা বিরোধে সর্বশেষ ২১ শে আগষ্ট ২০১৩ সালে রাজধানী দামেস্কের শহরতলীতে সরকারী বাহিনীর তীব্র গোলাবর্ষনে কয়েক'শ লোক নিহত হয়েছে। সরকার বিরোধি জোট 'সিরিয় ন্যাশনাল কাউন্সিল' ও 'সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন' দাবি করছে যে, দামেস্কের শহরতলীর ঘাউটা এলাকায় সরকারী বাহিনীর গোলাবর্ষনের সময় এই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে ভরা রকেট ব্যবহার করা হয় এবং তাদের দাবি মতে প্রায় ১১৮৮ মানুষ মৃর্তুবরণ করে। এনিয়ে বিশ্বে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পশ্চিমা বিশ্বসহ ৩৭টি দেশ এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘকে চিঠি দেয়। জাতিসংঘ এটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে। অভিযোগ ওঠে যে, রাসায়নিক হামলায় সারিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া সিরিয়া ক্ষতিকর সারিন গ্যাসের পাশাপাশি মাস্টার্ড গ্যাসও ব্যবহার করছে বলে অনেক দেশ দাবি করে আসছে। এত হতাহতের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে সারিন ও মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে তার ভয়াবহতা অনেক। সারিন গ্যাসের প্রভাবে পুরো স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমন করে। লালাগ্রন্থি ও পেশি সংকোচনের সংকেত বন্ধ করে দেয়। ফুসফুসের আশেপাশে পেশি অবস হয়ে যায়। মানুষের অচেতন, পক্ষাঘাত গ্রস্থ ও মৃত্যু হয়। মাস্টার্ড গ্যাসে প্রাথমিকভাবে ফোসকা পড়ে এবং পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপ নেয়। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সংগঠণ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউমান রাইটস ওয়াচ দাবি করছে যে, জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলকে নির্বিঘ্নে এসব স্থানে পরিদর্শন করতে দিতে হবে। অপরদিকে সিরিয়ার বড় মিত্রও দেশ রাশিয়াও অভিযোগ তদন্তে জাতিসংঘের পরিদর্শক দলকে সর্বাত্নক সহযোগিতা দিতে বাশার সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। তবে সিরীয় সেনাবাহিনী দাবি করেছে, বিদ্রোহীরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পরাজয়কে ঢাকা দিতে মিথ্যাচার প্রচারনা চালাচ্ছে। তবে বর্তমানে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শন পর্যবেক্ষন করে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বলা হয়েছে, সিরিয়ার বিভীন্ন পক্ষের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে বিভীন্ন পক্ষের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে শিশু সহ নিরিহ লোকজনের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ঐ হামলায় কে বা কারা দায়ি সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেনি বান কি মুন। যার ফলাফল দেখার জন্য বিশ্বসম্প্রদায় তাকিয়ে আছে যে, এটি প্রকৃতপক্ষে আসাদ সরকারের রাসায়নিক হামলা না আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব, সার্বাত্বেসী আরব বিশ্বের মতাদর্শে সরকারবিরোধি জঙ্গীরাই দায়ী।

৬.১৩ রাশিয়ার প্রস্তাব এবং রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি (Russian Proposal &Chemical Weapon Treaty)

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে জেনেভায় দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে বসেন এবং রাশিয়ার প্রাথমিক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্র। তিন দিন সেই বৈঠকে গত ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং বৈঠকের পর রাশিয়ার প্রস্তাবকে আর একটু সংশোধন করে ঐক্যমতে পৌছায় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। বৈঠকের পর সিরিয়াকে রাসায়নিক অস্ত্র মুক্ত করণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরী ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। চুক্তি অনুযায়ী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালের মধ্যে সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের তথ্য আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থার কাছে হস্তান্তর করে এবং ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সকল রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংশ করবে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে অস্ত্রের তথ্য IAEA কে হস্তান্তর শুরু করে সিরিয়া।

৬.১৪ সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত মিশন শুরু

সিরিয়াকে রাসায়নিক অস্ত্রমুক্তকরার মিশন শুরু করেছে নিরস্ত্রীকরণ দল। ১ অক্টোবর ২০১৩ইং তারিখে নেদারল্যান্ডের হেগভিত্তিক অর্গানাইজেশন ফর দ্যা প্রহিবিশন অব কেমিক্যাল ওয়েপনসের (ওপিসিডব্লিউ) ২০ সদস্যের দল সিরিয়ার দামেস্কে পৌছায়। এর সদস্যরা সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ ধ্বংশ করার বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করবে ধারাবাহিক ভাবে।

৬.১৫ বর্তমান সিরিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা (Present Econocmic & Social Condition)

সিরিয়া ছিল খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। যুদ্ধে সিরিয়ার শহর নগর ও অর্থনীতিকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন সিরিয়াকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। বেকার সমস্যা যেখানে যুদ্ধের আগে তেমন একটা ছিল না, এখন তা শতকরা ৬০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। যেখানে যুদ্ধের আগে তেল উৎপাদন হতো দৈনিক তিন লাখ ৮০ হাজার ব্যারেল, এখন উৎপাদিত হয় সেখানে মাত্র ২০ হাজার ব্যারেল। সিরিয়ার মুদ্রার (পাউন্ড) ব্যাপক দরপতন হয়েছে। আগে এক ডলার পাওয়া যেত ৪৭ মুদ্রায় এখন পাওয়া যায় ২৫০ মুদ্রায়। জনসংখ্যা ৮৯ শতাংশ গরীব হয়ে গেছে যুদ্ধের কারনে। অথচ যুদ্ধের আগে গরীব জনগোষ্ঠির সংখ্যা এক শতাংশের কম ছিল। দেশের স্বাস্থ্যসেবা পরিপূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। দেশের ৭৫টি হাসপাতালের মধ্যে এখন চলছে ৩০টি মাত্র। যুদ্ধের আগে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার এখন তা এক রকম শূন্য।

৬.১৬ সিরীয় শরনার্থীদের বর্তমান মানবিক বিপর্যয়

সিরিয় গত প্রায় দুই বছরের সংঘর্ষে যেমন হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশটি থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। এসব লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ ও কিছু মানবাধিকার সংগঠন বলছে, এখন ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ সালের ফিলিস্তিন সংকটের মতো এসব মানুষের স্থায়ী পুনর্বাসন দরকার। এজন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এ বিপুল শরণার্থী নিয়ে বিপাকে পড়েছে লেবানন ও জর্দানের মতো দেশগুলো।

ইতিমধ্যে ২০ লাখের বেশি লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। লেবাননের মোট জনসংখ্যার প্রতি ছয়জনের একজন হলো সিরীয় শরণার্থী। জর্দানে সিরীদের বড় শরণার্থী শিবিরটি এখন দেশটির চতুর্থ জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়েছে। শুধু এটা নয়, ধারণা করা হয়েছে এর বাইরে আরো ৪০ লক্ষ সিরীয় বাস্তুচ্যুত হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করছে। মোট হিসেবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সিরিয়ার এক-চতুর্থাংশ জনগণ। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার এন্টনিও গুতেরেস এক সাক্ষাৎকারে গার্ডিয়ানকে বলেন, সিরীয় শরণার্থীদের দূর্দশা মাণবিক সংকটকে আগেই ছাড়িয়ে গেছে। আগামী কয়েক মাসে চলমান গৃহযুদ্ধের অবসানের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই এসব শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে পারবে এমন কিছু দেশে তাদের পাঠানোর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে জাতিসংঘ। জার্মানি ইতিমধ্যে ৫০০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তবে অন্য দেশগুলোর প্রস্তাব এতো বেশি নয়।

গত এক বছরে জাতিসংঘ ধীরগতিতে মানবিক সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়েছে। বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এখন পর্যন্ত বিশ্বে একক কোনো সংকটে দেয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ এটি। এর মাধ্যমে শুধু শরণার্থীদের সহায়তা করা হচ্ছে না বরং লেবাননও জর্দানের সামাজিক সমন্বয়ের জন্যও ব্যয় করা হচ্ছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতারসহ আরো কিছু দেশও অর্থ সহায়তা দিচ্ছে। যদিও সংকট মোকাবেলায় আরো অর্থের প্রয়োজন। সিরিয়ায় IS:

আগস্ট ২০১৪ জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনের গত ২০ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ২৫ জুলাই, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সিরীয় সরকার ও বিরোধী অন্যান্য গোষ্ঠীর সংঘঠিত মানবতা বিরোধী ও যুদ্ধপরাধের ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। আই এস যোদ্ধারা সিরিয়ায় 'গণ নৃশংসতা' চালিয়েছে এবং তাদের সদস্য হিসাবে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাছাড়া তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে সমসমাবেশ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ঘটনা একটি সাধারন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় আইএস যোদ্ধারা ১৫ বছর বয়সী কিশোরদেরও শিরচ্ছেদ, অঙ্গহানি ও বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি দিচ্ছে।

৬.১৭ আই এস যোদ্ধাদের উপর যৌথ সামরিক অভিযান

ইরাকে সুন্নীপন্থী বিদ্রোহী সংগঠন ইসলামিক স্টেট এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ইরাকের উত্তরাঞ্চলে নিনেভাহ প্রদেশের ইয়াজিদি সম্প্রদায়। এর কারণ হলো ইয়াজিদের ধর্ম বিশ্বাস। আইএসের ধারণা, ইয়াজিদির ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার (৬৪৭-৬৮৩) বংশধর। ইয়াজিদ উমাইয়াদের কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি। এছাড়া ইয়াজিদিরা দৈনিক পাঁচবার যে মালেক তাউসের প্রার্থনা করে সেই মালেক তাউসের অন্য নাম শয়তান। আরবিতে যার অর্থ 'অশুভ আত্মা' তাই আইএসের ধারণা, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে ইয়াজিদিদের সম্পর্ক নেই। এ শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ ইজিদিস থেকে। যার অর্থ 'ঈশ্বরের পূজারি'। ইরাক ছাড়াও ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের লোকরা সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় বসবাস করে।

আইএসএর উত্থানে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতি সহায়তা করেছে। ইরাক ও সিরিয়ার আঞ্চলিক পরিস্থিতি সংগঠনটিকে এক বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সেজন্য প্রায় ৩০,০০০ সদস্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন ও বহাল রাখা সম্ভব হচ্ছে। গোড়াতে আইএসকে অবশ্য বিদেশি অর্থ বিশেষত সৌদি আরব ও কাতারের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় আইএস এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর আইএস জঙ্গিরা স্থানীয়দের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছে। আইএস এর সম্পদের অন্যতম বড় উৎস তেল। এক হিসাব মতে, ইরাকের আইএস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অন্তত ৪টি তেলক্ষেত্র ৪০-৭০টি তেলকূপ রয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ২৫,০০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন হয়। বাজার দরের অনেক কম মূল্যে (২০-৬০ ডলার) বিক্রি করেও দৈনিক আয় ১.২ মিলিয়ন ডলার। আর এ প্রতিপত্তির জোরেই ইরাক ও সিরিয়ার একটি বড় অংশে আই এস তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে যেখানে খিলাফতের প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে।

আগস্ট ২০১৪ জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনের গত ২০ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ২৫ জুলাই, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সিরীয় সরকার ও বিরোধী অন্যান্য গোষ্ঠীর সংঘঠিত মানবতা বিরোধী ও যুদ্ধপরাধের ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। আই এস যোদ্ধারা সিরিয়ায় 'গণ নৃশংসতা' চালিয়েছে এবং তাদের সদস্য হিসাবে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাছাড়া তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে সমসমাবেশ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ঘটনা একটি সাধারন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় আইএস যোদ্ধারা ১৫ বছর বয়সী কিশোরদেরও শিরচ্ছেদ, অঙ্গহানি ও বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি দিচ্ছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটস (আইএস) জঙ্গীদের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযানের জন্য সহযোগী দেশ খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আই এস বিরোধী অভিযানের জন্য ২৫-৩০টি দেশে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তবে ২০০৩ সালের ইরাক অভিযানের তিক্ত স্মৃতির জন্য United Kingdom France Australia মতো পরীক্ষিত মিত্রদের সাড়া পাওয়া যাওয়া নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে আইএসকে দুর্বল ও ধ্বংশ করতে নতুন কৌশল প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আরএই পরিকল্পনার আলোকেই ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হামলা চালানো হয়।

মার্কিন সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের বিবৃতিতে ইরাকের বাগদাদে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্য বস্তুতে বিমান হামলা চালানোর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সিনজারে বিমান হামলা করে আই এস এর ৬টি যানবাহন ধ্বংশ করা হয়েছে।

এদিকে সিরিয়ার রাকা অঞ্চলে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আইএস যোদ্ধারা একটি জঙ্গী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে বলে জানিয়েছে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (Syrian Observatory form Human Rights)। বিবিসির এক বিশ্লেষনে বলা হয়েছে ওয়াশিংটনের প্রথম মিত্র হিসাবে আইএস এর প্রথম মিত্র হিসাবে আইএসকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা শুরু করেছে ফ্রান্স। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের কার্যালয় থেকে উত্তর-পূর্ব ইরাকের আই এস দপ্তর লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানোর কথা বলা হয়েছে। গত আগস্ট ২০১৪ থেকে এ পর্যন্ত ১৭০ টির বেশি বিমান হামলা চালানো হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৪ প্যারিসে ৩০ এর অধিক দেশের প্রতিনিধিরা আইএস গোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে সামরিক অভিযানের বিকল্প নেই বলে ঐকমত্য প্রকাশ করে। প্যারিস বৈঠক এবং কয়েকদিন আগে দেওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভাষনে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক এই কোয়ালিশনের লক্ষ্য হচ্ছে

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

০১. সিরিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে কবে ?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।

০২. বিশ্বের সবচেয়ে প্রচীন শহর কোনটি ?
উত্তর : দামাস্কাস, সিরিয়া।

০৩. সিরিয়ার বিরোধীদের জাতীয় পরিষদের নাম কী ?
উত্তর : Syrian National Council (গঠন ২৩ আগষ্ট ২০১১)

০৪. সিরিয়ার বিরোধি জোটের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ?
উত্তর : খাসান হিট্রো।

০৫. কোথায় বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা পাওয়া যায় ?
উত্তর : সিরিয়ার উগারিটে।

০৬. ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (Free Syrian Army) কী ?
উত্তর : সিরিয়ার সেনাবাহিনী থেকে দলত্যাগী সৈন্যদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (২৯ জুলাই, ২০১১ থেকে বর্তমান)।

০৭. সিরিয়া ও মিশর কবে একত্রিত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র নামকরণ করে ?
উত্তর : ২১ ফেব্রুয়ারী-১৯৫৮।

০৮. সিরিয়া কোন দেশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং কবে ?
উত্তর : ফ্রান্স, ১৭ এপ্রিল ১৯৪৬ সালে।

০৯. সিরিয়া ও মিশর কবে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হয় ?
উত্তর : ১৩ অক্টোবর, ১৯৬১।

১০. সিরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার নাম কী ?
উত্তর : আল বাথ।

১১. জাতিসংঘ ও আলবলীগের সিরিয়া বিষয়ক দূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে ?
উত্তর : লাখদার ব্রাহিমি।

১২. সিরিয়া ২৬ বছর পর ২১ নভেম্বর, ২০০৬ সালে কূটনৈতিক স্থাপন করে কার সাথে ?
উত্তর : ইরাকের সাথে।

১৩. সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে 'ফ্রেন্ডস অব সিরিয়া' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কবে ?
উত্তর : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সালে তিউনিস।

১৪. সিরিয়ার বাশার আল আসাদ বিরোধি প্রদান গ্রুপের নাম কী ?
উত্তর : সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল (এটি সিরিয়ান ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল যা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সিরিয়া নামেও পরিচিত)।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. সিরিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে কবে ?
   খ. বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহর কোনটি ?
২. ক. সিরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা কর।
   খ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট কে এবং তিনি কোন দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন?
৩. ক. সিরিয়া সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ বর্ণনা কর।
   খ. সিরিয়ার আরব বসন্ত সম্বন্ধে বর্ণনা কর। কেন তারা সফল হতে পারেনি?
৪. ক. বাসার আল সামাদ কবে প্রেসিডেন্ট হন?
   খ. বাথ পার্টি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. ক. আরব লীগ থেকে কেন সিরিয়াকে বহিষ্কার করা হয়?
   খ. সিরিয়ার শিয়া সুন্নী দ্বন্দ্ব বর্ণনা কর।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. সিরিয়ায় কিভাবে সংকট আরম্ভ হয়? সিরিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করুন?
২. সিরিয়ায় আন্দোলনকারীরা সাফল্য লাভ না করার কারণসমূহ আলোচনা করুন?
৩. সিরিয়ার সংকট সমাধানে গৃহীত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন?
৪. বর্তমান পরিস্থিতিতে সিরিয়ার সংকট কেন দীর্ঘায়িত হতে যাচ্ছে তা আপনার স্বপক্ষে যুক্তি দিন?
৫. সিরিয়ায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের কারণগুলো আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ৭

পারস্য উপসাগরীয় সংঘাত : বর্তমান প্রেক্ষাপট
Persian Gulf Conflict :Present Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৭.১ ইরাকের ইতিহাস
৭.২ ইরাক যুদ্ধের পটভূমি
৭.৩ টুইন টাওয়ার ধ্বংস
৭.৪ ইরাক যুদ্ধের প্রধান কারণ সমূহ
৭.৫ যে সকল দেশ ইরাক আক্রমণে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সাথে যোগ দেয়
৭.৬ ইরাক যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও অবস্থান
৭.৭ বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার পরবর্তী ইরাকের সংকট এবং তা সমাধানের উপায়সমূহ

৭.১ ইরাকের ইতিহাস (History of IRAQ)

১৯১৭ সালে অটোমান তুরস্কের কাছ থেকে বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সময় ব্রিটিশ কমান্ডার স্যার ফ্রেডরিক স্ট্যানলি মড ইরাকি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমরা আপনাদের দেশ দখল করতে কিংবা শত্রু হতে আসি নি। আমরা এসেছি আপনাদের মুক্ত করতে।' কিন্তু ইরাকি জনগণ আর যাই পাক, মুক্তি পায় নি সে সময় ব্রিটিশ দখলদারদের হাত থেকে । মুক্ত তারা হয়েছিল আরো পরে ২০০২ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

২০০৩ সালে ইরাকি জনগণের জন্য আরেক মুক্তিদাতা আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ। এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ আদরমাখা কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ইরাকি জনগণ তোমরা ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাদের মুক্তি নিয়ে আসছি।' বাগদাদের পতনের পর দেখা গেছে কিছু লোক নেচে-গেয়ে স্বাগত জানাচ্ছে জোট বাহিনীকে। এসব ইরাকি জনগণ কি বুঝতে পারছে প্রেসিডেন্ট বুশ তাদের জন্য কোনো মুক্তির ডালায় সাজিয়ে বসে আছেন ? ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের একটা গালভরা নাম দিয়েছিল পেন্টাগন। 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম।' আগ্রাসী জোট বারবার বলেছে, সাদ্দামের লৌহ শাসন থেকে ইরাকি জনগণকে মুক্ত করাই এ অপারেশনের লক্ষ্য। অতএব, জোট বাহিনীকে 'মুক্তিদাতা' হিসেবে যেন ইরাকি জনগণ ফুলের মালা গলায় পরিয়ে বরণ করে নেয়। কিন্তু আগ্রাসন শুরুর পর পরই আলফাও উপদ্বীপের একটি সরকারি খাদ্য গুদামের ইরাকি পতাকা নামিয়ে মার্কিন পতাকা তুলে দেওয়া কিংবা বাগদাদ দখলের পর সাদ্দামের প্রতিমূর্তিকে মার্কিন পতাকায় ঢেকে দেওয়া থেকে জোট বাহিনীর উদ্দেশ্য পরিষ্কার; ইরাকের মাটিতে মার্কিন পতাকা উত্তোলনই এ আগ্রাসনের প্রধান লক্ষ্য। ইরাকের জনগণের জন্য এটাই প্রেসিডেন্ট বুশের উপহার। এর নাম 'স্বাধীনতা'।

৭.২ পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের পটভূমি (Background of Persian Gulf War)

বর্তমান ইরাকে যৌথবাহিনীর যে যুদ্ধ তার সূচনা হয় প্রায় দুই যুগ আগে। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট

কুয়েতের সাথে দীর্ঘ বিরোধের প্রেক্ষিতে ইরাক কুয়েতে সামরিক হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাঝে এর চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেয়ে যায় মোক্ষম সুযোগ। কেননা এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ওয়াশিংটন দীর্ঘদিন ধরেই কলকাঠি নাড়ছিল। তাই তৎকালন বুশ প্রশাসন এ সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ। ৬ আগস্ট, ২০০৩ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে। জাতিসংঘের ৬৬০ নং প্রস্তাবে ইরাককে কুয়েত থেকে নিঃশর্ত সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। এ প্রেক্ষিতে বুশ প্রশাসনের নেতৃত্বে ইরাকবিরোধী জোট গঠিত হয়। সে বছরই ডিসেম্বরে (২০০৩) প্রথম দিকে পাস হয় জাতিসংঘের ৬৭৮ নং প্রস্তাব, যাতে সে অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। এরই ভিত্তিতে জাতিসংঘ ইরাকে ১ জানুয়ারি, ২০০৪ চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল এ সময়সীমাকে ১৫ জানুয়ারি, ২০০৪ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি। অবশেষে ১৭ জানুয়ারি ১৯৯১ শুরু হয় ইরাক-বহুজাতিক বাহিনী যুদ্ধ। প্রথম দিকে ইরাক পাল্টা হামলা চালালেও শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি রেডিও বাগদাদে কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। অবশেষে ২৭ ফেব্রুয়ারি ইরাক জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সকল শর্ত মেনে নিয়ে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করলে ৪৩ দিনের সম্মুখ সমরের ইতি ঘটে।

২০০৩ সালের ২০শে মার্চ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাকি আক্রমণের নাম দিয়েছে 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম'। এর নেতৃত্বে ছিলেন মার্কিন জেনারেল টমি ফ্রাংক। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে আগ্রাসন চালায় ৩০ শে এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত। প্রথম দিকে মার্কিন বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও মাঝামাঝিতে ইরাকিদের গেরিলা আক্রমণে এবং মার্চ, ২০০৪ থেকে ইরাকিদের শিয়া ধর্মীয় নেতা মুকতাদার আল-সদরের অনুসারীদের আক্রমণে জোট বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর ৮০০ সৈন্যসহ প্রায় ১১০০ সৈন্য নিহত হয়েছে। যুদ্ধে মার্কিন খরচ হয়েছে ৯১ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে ইরাক

- পার্লামেন্ট : প্রজাতন্ত্রী ইরাক
- রাজধানী : বাগদাদ
- আয়তন : ৪, ৩৮, ৪৪৬ বর্গ কিঃ মিঃ
- জনসংখ্যা : ৩ কোটি, ২৭ লক্ষ
- ভাষা : আরবি (সরকারি), কুর্দিশ
- ধর্ম : ইসলাম
- মুদ্রা : ইরাকি দিনার
- প্রদেশ : ১৮ টি
- গেরিলা সংগঠন : ফিফটিন মে অর্গানাইজে
- প্রাচীন নাম : মেসোপটেমিয়া (মেসো-মধ্য পটেমিয়া-নদীসমূহ)
- ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যে এই দেশ অবস্থিত
- পারমাণবিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ : কেমিকেল আলী
- সাদ্দামের নিহত দুই পুত্র : উদয় ও কোরেসি।
- ইরাকের অষ্টম শাসক : সাদ্দাম।
- সাদ্দামের রাজনৈতিক দল : বাথ পার্টি।
- জোট বাহিনী দখলের পর মুদ্রা চালু করেছিল : ডলার।
- সাদ্দামের বিশাল আকৃতির মূর্তি ছিল : প্যারাডাইস স্কয়ার।
- সাদ্দাম হোসেন যে শহর থেকে গ্রেপ্তার হয় : তিকরিত।
- সাদ্দাম হোসেন যে তারিখে গ্রেপ্তার হয় : ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৩।
- আলোচিত টিভি চ্যানেল : আলজাজিরা কাতার।
- যৌথ বাহিনীর সদর দপ্তর : কাতার, আসসাইয়া।
- উপসাগরে মোতায়েনকৃত ব্রিটিশ হাসপাতালে জাহাজ : আরগুস।
- সাদ্দামকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানে আগ্রহী দেশ ছিল : কোরিয়া ও বাহরাইন।
- সাদ্দামের পক্ষে কৌসুলী কোন দেশের : ফরাসি।
- সাদ্দামকে গ্রেপ্তারে সহায়তাকারী : দেহরক্ষী মোহাম্মদ ইব্রাহীম ওমর আল মুসলিত।
- ইরাকের প্রথম প্রেসিডেন্ট : মোহাম্মদ নাজিব আল-কুরবাই (১৪ জুলাই ১৯৫৮- ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)
- সাদ্দাম হোসেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন : ১৬ জুলাই ১৯৭৯- ৯ এপ্রিল ২০০৩)
- ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : জালাল তালাবানি (৬ এপ্রিল ২০০৫-বর্তমান)

ওমাবা মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ সালে। এরই প্রেক্ষিতে ইরাকি বাহিনীর কাছে সামরিক দায়িত্ব হস্তান্তর করে ৬ আগস্ট ২০১০ সালে। অতঃপর ৩১ আগস্ট ২০১০ সালে ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। পরিশেষে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ৪৭ হাজার ৭০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন থাকলেও তারা কোন লড়াইয়ে অংশ নেবেন না। কেবল ইরাকি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেবে। ১৬ মাসের জন্য পরিকল্পিত এ নতুন মিশনের নাম অপারেশন নিউ ডন এবং যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনী ইরাকি সেনাদের প্রশিক্ষণ দেন সে অপারেশনরে নাম 'অপারেশন টেলিক'। যুদ্ধে ১৭৯ জন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হন এবং যুক্তরাজ্য দীর্ঘ ৮ বছরের সামরিক অভিযান ২২ মে ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি হয়।

৭.৩ ইরাক যুদ্ধের প্রধান কারণ সমূহ (Major Causes of IRAQ War)

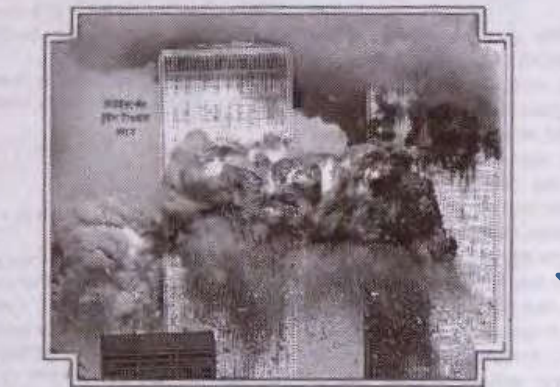
১. **মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য :** ইরাককে দখল করে আফগানিস্তানের কারজাই সরকারের মতো একটি তাবেদার সরকার গঠন করে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর ইঙ্গ-মার্কিনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

২. **ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রাখার অভিযোগ:** যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেন ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী রাসায়নিক, জৈব এবং পারমাণবিক অস্ত্র রাখার অভিযোগে ইরাকের ওপর হামলা করেছিল অস্ত্রমুক্ত করার জন্য। যা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

৩. **মার্কিন মন্দা অর্থনীতি চাঙ্গা করতে :** একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে যেমন এনরন, ওয়ার্ল্ডকমের পতন, এ মন্দা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন।

৪. **আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক :** বুশ প্রশাসন অভিযোগ করেছিল ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এক মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

৫. **অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারীতা পরীক্ষা :** ভবিষ্যতের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তৈরি উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা। যেমন GBU – 28 এবং GBU – 37 নামে লেসার ও উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত বাংকার বাস্টার বোমা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্রের মহড়ার মাধ্যমে অস্ত্র বিক্রির বাজার তৈরি করে বিশেষ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা। কারণ আমেরিকায় বর্তমান প্রশাসন তেল এবং অস্ত্র ব্যবসার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত।



নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস

http://thejobstudy.com Go to Contents

৬. মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের কর্তৃত্ব ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের প্রধান আতঙ্কে ইরাকিদের সামরিক শক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ইহুদি লবি জোরদার করার জন্য ইরাকে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

যে সকল দেশ ইরাক আক্রমণে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সাথে যোগ দেয়

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হাঙ্গেরি, স্পেন, হন্ডুরাস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

যে সকল অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়

টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র, এ্যাপাচি যুদ্ধবিমান, B–52 বোমারু বিমান, অব্রাহাম ট্যাংক, মনুষ্যবিহীন গোয়েন্দা বিমান, ক্লাস্টার বোম, GBU-28, GBU-37 নামের ক্লাস্টার ব্যাংকার বোমা ইত্যাদি। ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনা এবং অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচিত সরকার সাদ্দাম হোসেনের বিচার, রাজনৈতিক বাহিনী প্রত্যাহার।

৭.৪ ইরাক যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও অবস্থান

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকেই আল-কায়েদা নির্মূল এবং তার মদদদাতা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে সাদ্দাম হোসেনকে অভিযুক্ত করে আসছে এবং পরবর্তীতে ইরাকে মারণাস্ত্রের মজুদ রয়েছে, পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র গোপনে ইরাক তৈরি করছে এবং এর জন্য তারা নাইজার থেকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করছে এ অভিযোগ তুলে ইরাকে নিরস্ত্র করার জন্য মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ব্রিটেন এবং স্পেনের সাথে আলোচনাও করে নেয়। এবং যেকোনো উপায়ে হোক ইরাক আক্রমণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইরাককে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ১৪৪১ নং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ইরাকি পার্লামেন্ট নিরাপত্তা পরিষদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইরাক আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে ইরাক

মনে রাখার Technique & Tips

ইরাকে পরিচালিত অভিযানসমূহ

অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম : ১৯৯১ কুয়েত দখলের পর।
অপারেশন ডেজার্ট শীল্ড। ১৯৯১ সৌদি আরবকে রক্ষার্থে।
অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম : ২০০৩ ইরাক আক্রমণ।
অপারেশন রেড ডন। এ অপারেশনে ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩ সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।
অপারেশন টেলিক : যুক্তরাজ্যের রাজকীয় সৌবাহিনি ইরাকি সেনাদের প্রশিক্ষণ দেন সে অপারেশনের নাম।
অপারেশন নিউ ডন : ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ৪৭ হাজার ৭০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন থাকলেও তারা কোনো লড়াইয়ে অংশ নেবেন না। কেবল ইরাকি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেবে। ১৬ষ মাসের জন্য পরিকল্পিত এ নতুন মিসনের নাম অপারেশন নিউ ডন।

ইরাক যুদ্ধের সমর্থনকারী দেশ

অষ্ট্রেলিয়া, স্পেন, ইটালি, জাপান, নেদারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, জার্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, কলম্বিয়া, এলসালভাদোর, হাঙ্গেরিয়া, ইথিওপিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও মেসিডোনিয়া।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১৯৭২-৭৫ ইরানের শাহ ও ইরাকের কুর্দি বিদ্রোহীদের প্ররোচিত করে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালায়।
- ১৯৮০ খোমেনি ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৯১ সিনিয়র বুশ অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম চালায়।
- ১৯৯৫-৯৬ যুক্তরাষ্ট্র গোপন অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেয়। কুর্দিদের সাথে ভুল বোঝাবুঝিতে তা ভেস্তে যায়।
- ২০০৩ অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম চালিয়ে উৎখাত করে।
- ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ -সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির রায় কার্যকর হলে সাদ্দাম যুগের অবসান ঘটে।
- ১ জানুয়ারি ২০০৯ -মার্কিন বাহিনী সুরক্ষিত গ্রিন জোন ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করে।
- ৩১ আগস্ট ২০১০-ইরাকে দখলদার মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়।

২০০২ সালের ১৩ নভেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাব নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়। ফলে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দল ইরাকে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এবং একটি ভয়াবহ যুদ্ধের আশংকা তখন তিরোহিত হয়। জাতিসংঘের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ হ্যান্স ব্লিক্সের নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি দল ইরাকে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে পান নি বলে রিপোর্ট পেশ করেন।

২০০১ সালের ১০ই অক্টোবর বুশকে ইরাক আক্রমণের সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে মার্কিন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে প্রস্তাব পাস হয়। জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দল ইরাকে মারণাস্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র পরিদর্শক দলের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সরকার ইরাকে মারণাস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে একথা জোর দিয়ে বলতে থাকে এবং প্রয়োজনে বল প্রয়োগে ইরাককে নিরস্ত্র করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এরই প্রেক্ষিতে ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকে আক্রমণের প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ফ্রান্স, রাশিয়া এবং অস্থায়ী সদস্য জার্মানির তীব্র বিরোধিতার মুখে নিরাপত্তা পরিষদে এ প্রস্তাব পাস করাতে ব্যর্থ হয়। মূলত ইরাক প্রশ্নে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ তখন থেকেই দ্বিধাবিভক্তি হয়ে পড়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর এই প্রথম কোন মার্কিনবিরোধী জোট আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, স্পেন -এর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ অপরদিকে রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানির নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদ সরাসরি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৎকালীন জাতিসংঘের মোট ১৯১টি সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫০টি দেশ ইঙ্গ-মার্কিন জোটের ইরাক আক্রমণ সমর্থন করে বাকি ১৪১টি দেশ বিরোধিতা করে। এতগুলো দেশের বিরোধিতা এবং নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই ইঙ্গ-মার্কিন জোট ইরাকে আক্রমণের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর থাকে। এ প্রেক্ষিতে ইরাক বিষয়ে পর্তুগালের আটলান্টিক মহাসাগরীয় আজোয় দ্বীপে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী জোসে মারিয়া আজনার এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৬ মার্চ ২০০৩। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও অবস্থান এখন পরিষ্কারভাবে বোঝা না গেলেও যে সকল ক্ষেত্রে ধারণা পাওয়া যায় সে সকল ক্ষেত্র নিম্নে



আলোচনা করা হলো :

১. **একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ীকরণ :** নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে যে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়েছে মূলত তার অবস্থান আরও দৃঢ় করতে ইরাকে যুদ্ধ বাধানো হয়েছে। একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখতেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাসীকে এর সামরিক শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য ইরাকে আক্রমণ করেছে।

২. **সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদেশ UNSC -এর সদস্য ব্রিটেন ও স্পেনের সহযোগিতা নিয়ে যেমন ইরাকে আক্রমণ করেছে অপরদিকে নিরাপত্তা পরিষদের অপর সদস্য দেশ ফ্রান্স, জার্মানি এবং রাশিয়া এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। ফলে প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ ইরাক যুদ্ধের বিপক্ষে সরাসরি বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্যর মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন জোট মাত্র ৫০টি দেশের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল; বাকি ১৪১টি দেশ ইরাক আক্রমণের বিপক্ষে ছিল। ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি নতুন মার্কিনবিরোধী জোট আবির্ভূত হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য খর্ব করার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

৩. **ইরাকে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা :** ২০০৪ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ইরাকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকের নিয়ন্ত্রণ ভার অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্তবর্তী সরকার গঠন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে যে অন্ত বর্তী সরকার গঠিত হবে সে সরকার যেন তাদের অনুগত হয়। অপরদিকে ফ্রান্স, জাপানসহ অন্যান্য মার্কিনবিরোধী দেশসমূহ বলেছে অন্তর্বর্তী সরকারে ইরাকের জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অবশ্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের যে প্রক্রিয়া ছিল তাতে ইরাকি জনগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে অন্তর্বর্তী সরকার ইরাকের জনগণের অনুগত না হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করছে ইরাকের জনগণ এ প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার ১লা জানুয়ারি ২০০৪ এর পূর্বে একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সকল দায়িত্ব পালন করে। এদিকে ফ্রান্স বলেছে যে ইরাকিদের হাতে ইরাকের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তারা আমেরিকার কোন কথাই শুনবে না। ১লা মে ২০০৪ সালে ইরাকের অন্তর্বর্তী সরকারকে জাতিসংঘ অনুমোদন দিয়েছিল। এ সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছিল সুন্নি উপজাতি নেতা গাজি ইয়াওয়ার।

৪. **বিশ্বব্যাপী মার্কিনবিরোধী মনোভাব তীব্র হচ্ছে :** ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে আক্রমণ শুরু করলে খোদ ব্রিটেন, আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। সাবেক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন কুক এ যুদ্ধের বিরোধিতা করে কমন্সসভার নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। অপরদিকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী ক্লেয়ার শর্টও মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এ যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। দুজন নোবেল বিজয়ী মেউবিড কোরিগান ও ম্যাডায়ার জোডি উইলিয়াম এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাস্তায় বিক্ষোভ করেছেন। সর্বোপরি এ যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অন্যতম সহযোগী স্পেনের গত এপ্রিল, ২০০৪ সালের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলে নতুন সরকার ইরাক থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এছাড়া হন্ডুরাস, ডোমিনিকান রিপাবলিক ইরাক থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা দেয়। অপরদিকে গত ২০শে মার্চ ২০০৪ সালে বিশ্বব্যাপী ইরাক আক্রমণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ইরাক আক্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ছাড়াও এ যুদ্ধের সমর্থক দেশ অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের বিভিন্ন শহরেও হাজার হাজার বিক্ষোভকারী শ্লোগান, ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে, ইরাকের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর আক্রমণ ছিল অবৈধ। দিন দিন বিশ্বব্যাপী আমেরিকার বিরুদ্ধে জনমত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলদারিত্বের অবসানের উদ্যোগ নিয়েছিল নবনির্বাচিত স্পেনের প্রধানমন্ত্রী হোসে লুট রডিগ্রজাপাটেরো তিনি এ ব্যাপারে ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

৫. **দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে জাতিসংঘের অনুমোদন ব্যতীত ইরাকে হামলা করেছে এতে করে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই

দুর্বল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। ইরাকে মার্কিন হামলা জাতিসংঘ ঠেকাতে না পারায় বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন নীতির বিরোধী অনেক দেশই আছে যারা এখন সবচেয়ে বেশি ভীত যেমন-ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি। আবার বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশ আছে যারা এখন আর আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছে না। এমনকি মার্কিন স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করা প্রায় একরকম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া যে সকল ছোট রাষ্ট্রের সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে সে সকল রাষ্ট্র এখন থেকে বাজেটে কৃষি, শিক্ষার স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। ফলে দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়বে।

৬. **তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ :** ইরাক বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। যুদ্ধোত্তর ইরাকের তেল স্থাপনাগুলো মার্কিন তেল কোম্পানির অধীনে চলে যাবে এবং এসকল কোম্পানি আমেরিকার স্বার্থের অনুকূলে তেল উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থা মেনে চলবে। ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যা দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করবে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল তেলের ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বের প্রধান তেল ব্যবহারকারী দেশ যেমন-জাপান, চীন, ভারত, ফ্রান্সের শিল্পকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা আমেরিকার জন্য জরুরি।

৭. **জাতিসংঘের গুরুত্ব কমে যাবে :** মার্কিনিদের নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দীতে যে চরম মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে জাতিসংঘ তা থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। ইরাক যুদ্ধের দীর্ঘসময় পার হলেও জাতিসংঘ এ পর্যন্ত মার্কিনিদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে নি যা জাতিসংঘের কার্যক্রমকে সন্দেহের কারণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই এখন বিশ্ব জনমত জাতিসংঘের ব্যর্থতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্ববাসী এখন মনে করে জাতিসংঘ মার্কিনিদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানত জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হলেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম রাজনৈতিক লক্ষ্য। কেননা বিশ্ব ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে জাতিসংঘকে থাকতে হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।

৮. **মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হবে :** ইরাকে আগ্রাসনের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইসরাইল এবং আরব দেশগুলোর মধ্যে একটি শক্তির ভারসাম্য বিরাজমান ছিল। মধ্যপ্রাচ্য শক্তির অন্যতম প্রভাবক ছিল ইরাক। কিন্তু সেই ইরাককে ধ্বংস করায় মধ্যপ্রাচ্য ইসরাইলের একক কর্তৃত্বে চলে যাবে। ফলে ২০০২ সালে ঘোষিত ফিলিস্তিন স্বাধীনতার রোডম্যাপ কর্মসূচি অনুযায়ী ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে এপ্রিল ২০০৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অবশ্য ঘোষণা করেছেন যে, রোডম্যাপ বাস্তবায়নের মতো অবস্থা এখন আর মধ্যপ্রাচ্যে নেই। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অনিশ্চিত। মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মার্কিন- ইসরাইল এর নিয়ন্ত্রণে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পথ রুদ্ধ হয়ে গেল।

৯. **পরাশক্তির প্রভাব বেড়ে যাবে :** জাতিসংঘ এবং বিশ্ব জনমতকে অবহেলা করে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ইরাকে আক্রমণ অন্যান্য পরাশক্তিসমূহ এবং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী কোনো ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে মেনে চলার প্রয়াস নাও থাকতে পারে। জাতিসংঘকে পাশ কাটানোর যে সংস্কৃতি যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে তা অন্যান্য পরাশক্তির মধ্যে সংক্রমিত হলে বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে পড়বে। আর এ ধরনের নজির ইতোমধ্যেই সৃষ্টি করেছে ইসরাইল।

১০. **আরব লীগের ভবিষ্যৎ সংকটের মুখোমুখী :** আরব লীগ গঠিত হয়েছিল আবর মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য। ইরাক সংকটের আপাতত অবসান হয়েছে ইরাকে মার্কিন সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে। ফলে নতুন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ইরাকের সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে। আরব লীগের ভবিষ্যৎ এখন সংকটের মুখে কেননা ইরাক আরব লীগের অন্যতম সদস্য ইরাকের কর্তৃত্ব মার্কিনিদের হাতে চলে যাওয়ায় ইতোপূর্বে আরব লীগের সদস্যসমূহের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যমত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা টিকে থাকায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ পূর্বতন আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা এবং মার্কিন কর্তৃত্ববাদী প্রত্যাশা এক হবে না।

১১. **নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রভাবিত করার জন্য :** নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান কার্যক্রম

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং বিশ্বের বিপুল জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই সম্মতি প্রদান করেছে। নিরাপত্তা পরিষদে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য মার্কিনিদের ইরাক আক্রমণের কারণ হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদে শীঘ্রই সদস্য অন্তর্ভুক্তি বা স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে জার্মানি, চীন, জাপান ও ভারত। এ চারটি দেশই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যার মূলে রয়েছে জ্বালানির অবাধ প্রবাহ। কাজেই এ সম্ভাব্য সদস্যবৃন্দকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব।

১২. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অনীহা :** বর্তমান বিশ্বে একমাত্র গণতন্ত্রই বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা যেমন ব্যাহত হয়েছে তেমনি গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা হয়েছে অব্যাহতভাবে প্রসারিত। গণতন্ত্রকেই বিবেচনা করা হয়েছে জনকল্যাণে নিবেদিত এবং সর্বজন গ্রহণীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গণতন্ত্রের অন্যতম মডেল হিসেবে বারবার বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নাম। কিন্তু গণতন্ত্রের লেবাসধারী উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলো এদের আগ্রাসী চরিত্রের নগ্ন উন্মোচন ঘটিয়ে কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে আজ বিতর্কিত করে ফেলেছে। এ অন্যায় যুদ্ধের ফলে সমাজতন্ত্রসহ কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থায় অন্যান্য বিকল্পের প্রতি বিশ্ববাসীর এখন নতুন করে মনোযোগ আকর্ষিত হবে বলে মনে হয়। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র অবশ্যই একটি জনকল্যাণকামী শাসন ব্যবস্থা হলেও এ আদর্শের তথাকথিত চর্চাকারীদের কুকর্মের কারণে গণতন্ত্রের প্রসার ও অগ্রযাত্রার যে ক্ষতি হলো তার প্রভাব আগামী দশকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপর পরিলক্ষিত হবে।

১৩. **মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে :** বুশ ও ব্লেয়ার সাহেবরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চন্দ্ববরণে আজ যেন মুসলিম দেশগুলোকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সন্দেহভাজন দেশগুলোর তালিকায় ব্যতিক্রমভাবে দু একটি দেশ বাদ দিলে প্রায় সব মুসলিম দেশকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লাদেন এবং আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ জুজুর ভয় দেখিয়ে আমেরিকা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে চাপে রেখেছে এবং ভয় দেখিয়ে তাদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে এবং এখনও করছে। আমেরিকা তার আগ্রাসী শক্তি ব্যবহার করে আজ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য কব্জা করতে উদ্যোগ নিয়েছে। যৌথ বাহিনীর ইরাক আগ্রাসনের পর সিরিয়া ও ইরানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব দিন দিন আরো প্রবল হচ্ছে যা ক্রমান্বয়ে বিশ্ব জুড়ে আরো লাদেন এবং আরো আল-কায়েদার জন্ম ঘটাবে বলে মনে করা হয়।

১৪. **মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে নতুন কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে :** বিভেদ এবং বিভক্তি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার সাম্প্রতিক ইরাক আগ্রাসনের পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির এ ধারায় পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। কারণ, এ দেশগুলো এখন আমেরিকার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে। ইরাক আগ্রাসন থেকে শিক্ষা নিয়ে এ অঞ্চলের অনেক দেশই এখন নিজেদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য আগ্রাসী আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের ওপর এবং প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। সেজন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনের পর নতুন ধরনের আঞ্চলিক কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেবে। এছাড়াও যুদ্ধের প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সামরিক স্বনির্ভরতা অর্জন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

১৫. **অস্ত্রের প্রবাহ বেড়ে যাবে :** অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন মার্কিনিদের ইরাক আক্রমণের একটি প্রধান কারণ ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ করা। যদি তাই হয় তাহলে আগামী দশকে বিশ্বে অস্ত্রের প্রবাহ বেড়ে যাবে বহুগুণে। অনেক দুর্বল রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার

অজুহাত দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাছে অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করবে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং তাইওয়ান। বিগত দুই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ তিনটি দেশের নিরাপত্তার অজুহাতে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করেছে এবং এসকল অস্ত্র মূলত এ সকল দেশে অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। আবার অনেক দেশের অস্ত্র সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর কাছে চলে যায় এবং প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র সরকার বিরোধী বা প্রতিপক্ষ দলগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা জিইয়ে রাখে। ফলে এর প্রভাব পড়বে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর।

১৬. **ওআইসি -এর ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্মুখীন হবে :** ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের পর ওআইসির ভূমিকা তেমন জোরালো ছিল না অথচ এই ওআইসি গঠিত হয়েছে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার জন্য। গত ২০০৩ সালের অক্টোবরে ওআইসির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্মেলনে ওআইসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক ত্যাগের একটি সময়সীমা নির্ধারণের আহবান জানায়। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্য বিস্তার হলে ইরাকসহ আরও একাধিক দেশে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ওআইসি তার স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে যে বাধাগ্রস্ত হবে সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তাই অদূর ভবিষ্যতে ওআইসিকে টিকে থাকতে হলে মার্কিন প্রভাবাধীন হয়ে টিকে থাকতে হবে নয়তো কাগুজে সংগঠনে পরিণত হতে পারে।

১৭. **ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার :** ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী ইরাকে যে নগ্ন হামলা চালিয়েছিল ২০১০ সালে এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইরাক থেকে বহুজাতিক বাহিনী চলে গেলেও সেখানে রেখে গেছে জাতিগত, গোত্রগত দ্বন্দ্ব যা ইরাকের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেছে। ২০০৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে এক প্রচার অনুষ্ঠানে বারাক ওবামা ঘোষণা করেছিলেন তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইরাক থেকে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করে নিবেন। নির্বাচনে জয়লাভ করে বারাক ওবামা ইরাক থেকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সৈন্য প্রত্যাহার করার দিন তারিখ ঘোষণা করেন। ২০০৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় ওবামা ঘোষণা করেন ২০১০ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। দীর্ঘ ৭ বছর ১০ দিনের সমরভিযান শেষে মার্কিন বাহিনী ইরাক থেকে দেশে ফিরে আসে। ওবামার পরিকল্পনা মতে, ঐ তারিখের মধ্যে সেনা প্রত্যাহার করা হয়। তবে ২০১০ সালের আগস্টের পর সবকিছু গুটিয়ে আনার জন্য ৩৫ থেকে ৫০ হাজার সৈন্য ইরাকে থাকবে। তারা ইরাকি সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সহায়তার জন্য ২০১১ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে। ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনীর পাশাপাশি বহুজাতিক বাহিনীর সকল সৈন্য পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হয়। ১ লাখ ৪২ হাজারের মার্কিন সেনাবহর প্রতিশ্রুতি অস্থায়ী । অধিকাংশে সেনা ইরাক ত্যাগ করেছে। বাকি ৫০ হাজার সৈন্য ২০১২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ইরাক ত্যাগ করে।

১৮. **ইরাকের পুনর্গঠন :** ইরাক থেকে বহুজাতিক বাহিনী প্রত্যাহারের পর সেখানকার নিরাপত্তা ও অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব তা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এ কারণে ইরাকের অন্তর্বর্তী সরকার এবং তার নিরাপত্তা বাহিনী ইরাকের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে যে যথেষ্ট ছিল না বিগত ২ বছরের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, বোমাবাজি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব তার বড় প্রমাণ। সেখানকার প্রশাসনিক বাহিনী ইরাকের নিরাপত্তা রক্ষায় যথাযথভাবে সক্ষম হচ্ছে না। বহুজাতিক বাহিনী চলে যাবার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে ইরাকি অভ্যন্তরীণ বাহিনী তা পূরণে সমর্থ ছিল না। ফলে সেখানকার বিদ্রোহী গ্রুপগুলো প্রতিনিয়ত হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে যা ইরাকের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুজাতিক সৈন্য ইরাক আক্রমণে যেমন ইরানের নিরাপত্তা, অবকাঠামো, মানুষের জানমাল প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছিল তেমনি বহুজাতিক বাহিনী ইরাক থেকে চলে যাওয়ার পর একই ধ্বংসাত্মক কাণ্ডবয়ে চলেছে। পার্থক্য শুধু বহুজাতিক বাহিনীর পরিবর্তে ইরাকের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর সংঘাত। দেশে প্রায় প্রতিনিয়ত বোমা বিস্ফোরণে মানুষ মারা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সেখানকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিরাপত্তা রক্ষায় পদক্ষেপগুলো জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন।

৭.৫ বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার পরবর্তী ইরাকের সংকট এবং তা সমাধানের উপায়সমূহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনীর দীর্ঘ ৭ বছরের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে সেখানকার গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। মার্কিন আগ্রাসনের পর ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের একনায়কতন্ত্রের অবসান হলেও মার্কিন নিয়ন্ত্রিত পুতুল সরকার যে ইরাকিদের জন্য কোনো মঙ্গলজনক ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে না। তা বুঝতে পেরেই তারা অত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে এখনো কার্যকর অর্থে কোনো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। ইরাকের কাছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র রয়েছে এবং তা বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এ যুক্তি তুলে ধরে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাক আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মহলে বুশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলেও ইরাক আক্রমণ থেকে মার্কিন প্রশাসন পিছপা হয় নি। বরং জাতিসংঘ গঠনের পর এর অনুমতি ছাড়া কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লংঘনের যে নজির মার্কিন প্রশাসন সৃষ্টি করল তা ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে রইল। বহুজাতিক বাহিনী ইরাক ত্যাগের পর সেখানে যে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

মনে রাখার Technique & Tips

- ইরাক যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও অবস্থান
- এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বকরণ।
- সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণ।
- ইরাকে অন্তবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠায় মার্কিন প্রভাব।
- বিশ্বব্যাপী মার্কিন বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।
- দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হবে।
- তেলের বাজার মার্কিন নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।
- জাতিসংঘের গুরুত্ব কমে যাবে।
- মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ভারসাম্য নষ্ট হবে।
- পরাশক্তি সমূহের প্রভাব বেড়ে যাবে।
- আরব লীগের অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হবে।
- ভারত মহাসাগরে বিশাল এলাকা মার্কিন নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাবে।
- মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে।
- মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নতুন ভূ-রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে।
- জঙ্গির প্রবাহ বেড়ে যাবে।

১. **গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :** পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল সাদ্দাম হোসেন ইরাকে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে সেখানে জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। ইরাকে গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। তাই সেখানে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। ২০০৩ সালের Operation Iraqi Freedom নামে সাদ্দাম হোসেন উৎখাতের যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল বহুজাতিক বাহিনী তাতে সাদ্দাম হোসেন উৎখাত হলেও ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি আজও। বহুজাতিক বাহিনী ইরাক ত্যাগ করে সেখানে মার্কিন সরকারের সমর্থনপুষ্ট একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। যা ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নয় বরং মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘ ৭ বছরের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ব্যাপক ধ্বংস লীলা ইরাকের সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে।

২. **গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব বন্ধ করা :** ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বহুজাতিক বাহিনীর প্রত্যাহার প্রায় দুই বছর হয়ে গেলো সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভঙ্গুর অবস্থা। এ সুযোগে সেখানে বিভিন্ন জাতি, গোত্র এবং সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সাদ্দাম হোসেনের আমলে কঠোর শাসন ব্যবস্থার কারণে সেখানে অন্তদ্বন্দ্ব ছিল না বললেই চলে। ইরাকে একদিকে যেমন রয়েছে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব তেমনি অপরদিকে রয়েছে কুর্দি-শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব। কেউ কারো কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারছে না। বর্তমানে সেখানে সুন্নি সম্প্রদায় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শিয়ারা তা মেনে নিতে পারছে না। কারণ পূর্বে সেখানে শিয়া এবং সুন্নি উভয় সম্প্রদায় কুর্দিদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল। ইরাকের গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সেখানে শিয়া-সুন্নি এবং কুর্দিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে দ্রুত। ইরাকে শিয়া, সুন্নি সম্পর্ক যেমন ভালো নয় তেমনি শিয়াদের মধ্যেও রয়েছে চরম বিভক্তি। একদিকে রয়েছে পশ্চিমাপন্থি আয়াতুল্লাহ বকর আল হাকিম ও তার অনুসারী অপরদিকে রয়েছে মুক্তদা আল-সদর ও তার অনুসারী যারা ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থার

পক্ষে।

৩. **আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা :** সাদ্দাম হোসেনের সময় ইরাকে যে স্বৈরতন্ত্র বিদ্যমান ছিল তাতে সেখানে সাদ্দাম হোসেনের কথাই ছিল আইনকানুন। দেশে প্রকৃত আইনকানুন বলতে কিছু ছিলনা। আবার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ৭ বছরের সামরিক অভিযানে সেখানে বহুজাতিক বাহিনীর কথাই ছিল আইনকানুন বিগত দুই বছর বহুজাতিক বাহিনী ইরাক ত্যাগকরলেও সেখানে সত্যিকারের শৃংখলা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বরং আইনশৃংখলার আর অবনতি ঘটেছে। যা ইরাকের গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় বাধা হয়ে রয়েছে। তাই অতিদ্রুত সেখানে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সকল জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে যথাযথ আইন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে অতি দ্রুত।

৪. **গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি :** সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্ব দীর্ঘ ৭ বছর ইরাককে শাসন করেছে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছিলেন তারা ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সকল ধরনের সহযোগিতা করবে। বস্তুত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক ত্যাগের পর সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করে গেছে। সাদ্দামের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ইরাককে যেভাবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণে সহায়তা করেছিল সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকে সে নেতৃত্বের তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও সাদ্দামের একক ও দীর্ঘ শাসনামলে সেখানে সাদ্দাম হোসেনের বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে নি। আবার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সেখানে সত্যিকারের জনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। তারা সব সময় সেখানে একটি অনুগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বেশি তৎপর। ফলে ইরাকের ইঙ্গ-মার্কিন তাবেদার সরকার সেখানকার জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইরাকে বর্তমানে দরকার সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব দেশের অভ্যন্তর এবং বাহির সকল ক্ষেত্রে দেশের আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারে।

৫. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** দীর্ঘ ৭ বছর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ইরাকের অবকাঠামো ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। দেশে পুনরায় গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, ঘর-বাড়ী এমন কিছু নেই যার অবকাঠামো ভাল রয়েছে। এসব কিছুর অবকাঠামো দ্রুত পুনঃনির্মাণ আবশ্যক। এতে করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সামাজিক গতিশীলতা সবকিছুই বৃদ্ধি পাবে। তাই এ জন্য অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

৬. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পরবর্তী ইরাকের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটি তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই মুহূর্তে ইরাকের সার্বিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সেখানে ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ৭ বছরের ধ্বংসের কারণে সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা সব ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়েছে। স্থবির হয়ে পড়েছে ইরাকের অর্থনীতি। এ অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণে অর্থনৈতিক উন্নয়নই একমাত্র চাবিকাঠি।

৭. **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার :** ইরাকের দীর্ঘদিনের অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার কারণে সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস অথবা অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে সেখানকার পার্লামেন্ট, সংবিধান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগ, প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত অকার্যকর থাকায় সেখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ধ্বংস হতে বসেছে। ইরাকের স্থিতাবস্থা এবং শান্তি শৃংখলার জন্য এসকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বা পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরি। যা ইরাকের বর্তমান প্রশাসনের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৮. **সন্ত্রাসের বিস্তৃতি :** ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক থেকে চলে যাবার পর সেখানকার প্রশাসন যে সমস্যাটি মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে তা হল সন্ত্রাসবাদ। ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের সময় দেশের সকল মার্কিনবিরোধী সংগঠন বিভিন্ন দেশ থেকে বা সংগঠন থেকে সামরিক সাহায্যে

বলীয়ান হয়ে বহুজাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বহুজাতিক বাহিনী ইরাক ত্যাগের পর এসকল সংগঠনের কিছু কিছু মূল রাজনীতিতে ফিরে আসলেও অনেক সংগঠন আছে যারা ধর্মীয়, আঞ্চলিক বা কোনো একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এখন সশস্ত্র সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এদের সহিংসতায় প্রতিদিন ইরাকে ব্যাপক বোমাবাজি, গোলাগুলিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে বহু লোক মারা যাচ্ছে। বর্তমানে ইরাকের প্রশাসনের কাছে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে এসকল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর নির্মূল করে অথবা এদের মূলধারার রাজনীতিতে দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হবে। এসকল সংগঠনগুলোর কোনোটির সাথে আবার আল-কায়েদার মতো আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে সজ্ঞবদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের সম্পর্ক রয়েছে। এ সুযোগে আল-কায়েদার সদস্যবৃন্দ ইরাকে তাদের ঘাঁটি তৈরি করে সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা ও মদদ দিয়ে ইরাকের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইরাক থেকে এসকল সন্ত্রাসী সংগঠন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারলেই সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ইরাকে একটি মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সরকার গঠন করা যা আমেরিকাকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কর্তৃত্ব এনে দিবে। এই অন্তর্বর্তী সরকারকে জাতিসংঘ অনুমোদন দিয়েছে। যদিও এ সরকার মার্কিনিদের প্রভাব বজায় থাকবে একথা সহজে বলা যায়। সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাজনৈতিক কূটকৌশল ছড়িয়ে দিয়েছে তার পরিমাণ যে শুভ নয় তা সময়ই বলে দিবে। এদিকে মে ২০০৪ সালে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ড বলেছিলেন, ইরাকে মার্কিন অভিযান শেষ হওয়ার অর্থ এই নয় যে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস দমনে মার্কিনিদের কাজ শেষ। তার মতে ইরাকে সন্ত্রাস নির্মূলের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূলে মার্কিন অভিযান কেবলমাত্র শুরু হলো। ইরাক আক্রমণে মার্কিন জোটের বিরোধীতা করে ফ্রান্স, জার্মান যে নতুন মার্কিনবিরোধী অক্ষ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। তাছাড়া ইরাক পুনর্গঠনে অংশ নেওয়ার জন্য রাশিয়াসহ অন্যান্য মার্কিন বিরোধী অনেক দেশই এখন আমেরিকাকে নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তাই আগামী দিনে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা আমেরিকা হাতে নিয়েছে তা প্রতিরোধ করা এখন বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ, সাহায্য এবং সহযোগিতা মার্কিনবিরোধী প্রচারণাকে দুর্বল করে দিবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আর এরই প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র আগামীতে তার পরিকল্পনা কৌশল হিসেবে আরও ভয়ংকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আর এ সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘকে টিকিয়ে রাখবে। প্রয়োজনে জাতিসংঘকে ব্যবহার করবে। প্রয়োজনে এড়িয়ে চলবে। তাই এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব রাজনীতিতে একক আধিপত্যকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সকল দেশ এক হয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার সাধন না করে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **ইরাকের প্রদেশ কতটি ?**
উত্তর: ১৮টি।

২. **ইরাকের গেরিলা সংগঠনের নাম কি?**
উত্তর: ফিফটিন মে অর্গানইজে।

২ **ইরাকের প্রাচীন নাম কি?**
উত্তর: মেযোপটেমিয়া।

৩. **ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যে কোন দেশ অবস্থিত?**
উত্তর: ইরাক।

৪. **ইরাকের অষ্টম শাষক কে?**
উত্তর: সাদ্দাম হোসেন।

৫. **সাদ্দামের রাজনৈতিক দলের নাম কি?**
উত্তর: বাম পার্টি।

৬. **সাদ্দামের বিশাল আকৃতির মূর্তি ছিল কোথায়?**
উত্তর: প্যারাডাইস স্কয়ার।

৭. **সাদ্দাম হোসেন কোন শহর থেকে গ্রেপ্তার হন?**
উত্তর: তিকরিত।

৮. **সাদ্দাম হোসেন কত তারিখে গ্রেপ্তার হন?**
উত্তর: ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩।

৯. **ইরাকের আলোচিত টিভির নাম কি?**
উত্তর: আলজাজিরা কাতার।

১০. **সাদ্দাম হোসেনকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানে আত্মহীন দেশ ছিলো কারা?**
উত্তর: কোরিয়া ও কাহরাইন।

১১. **সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তারে সহায়তাকারী কে?**
উত্তর: দেহরক্ষী মোহামমদ ইব্রাহীম ওসর আল মুসরিত।

১২. **ইঙ্গ মার্কিন বাহিনী ইরাকে আগ্রাসন চালায়-**
উত্তর: ৩০ শে এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত।

১৩. **কত সালে ইরাকে দখলদার মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ-**
উত্তর: ৩১ আগষ্ট- ২০১০।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. ইরাকের ভৌগলিক অবস্থান বর্ননা করুন?
খ. কুয়েতের ভৌগলিক অবস্থান বর্ননা করুন?

২ ক. সাদ্দাম হোসেন কে ছিলেন?
খ. ইরাক ইরান যুদ্ধের বর্ণনা কর

৩. ক. ইরাকর কুয়েত দখল করে কেন?
খ. ইরাকে পরিচালিত অভিযান গুলো বর্ণনা কর।

৪ ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে হামলা করে কেন?
খ. ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনী কবে চলে যায়?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. ইরাক জাতিসংঘ বহির্ভূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে আগ্রাসন চালানো হয়েছিল তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন ?

২. ইরাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন মার্কিন স্বার্থ হাসিলে কতটুকু সহায়ক হয়েছে মূল্যায়ন করুন ?

৩. ইরাক যুদ্ধের প্রধান কারণগুলো আলোচনা করুন ?

৪. বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার পরবর্তী ইরাকের সংকট এবং তা সমাধানের উপায়সমূহ আলোচনা করুন?

৫. ইরাকের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করুন ?

http://thejobstudy.com
Go to Contents

অধ্যায় ৮

ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া সংকট : বর্তমান প্রেক্ষাপট

Ukraine & Crimia Crisis : Present Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৮.১ ক্রিমিয়ার ইতিহাস
৮.২ ক্রিমিয়া সংকটের বহুমুখী কারণ
৮.৩ ২১ মে, ২০১২ ন্যাটোর শিকাগো সম্মেলন
৮.৪ ক্রিমিয়ার গণভোট
৮.৫ ক্রিমিয়া/ ইউক্রেন সংকট
৮.৬. ক্রিমিয়া এখন রাশিয়া
৮.৭ ইউক্রেন সংকটের সূত্রপাত
৮.৮ ক্রিমিয়ার গণভোট ও জাতিসংঘের প্রস্তাব
৮.৯ ক্রিমিয়ায় রুশপন্থিদের আন্দোলন
৮.১০ Geneva Statement of April 17
৮.১১ ইউক্রেন সংকট ও ঠান্ডাযুদ্ধের সূচনা
৮.১২ ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

৮.১ ক্রিমিয়ার ইতিহাস

দুই শতাব্দী পূর্বে উসমানীর খেলাফতের সময়ও ক্রিমিয়ায় তাতার মুসলমানরা স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসী হিসেবে মর্যাদা ভোগ করত। তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ক্রিমিয়ার আদি বাসিন্দা।

পরবর্তীতে রাশিয়ান সাম্রাজ্যে একীভূত হওয়ার পর থেকে এবং সোভিয়েত আমলে ক্রিমিয়ায় তাতার মুসলমানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পক্ষ নেওয়ায়, অভিযানে রুশ শাসক স্তালিনের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও বিতাড়নের শিকার হয়। আজকের ক্রিমিয়ায় তাতার জনগোষ্ঠী একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ানদের ব্যাপক নিগ্রহ ও বিতাড়নের শিকার লাখ লাখ তাতার মুসলমান ইউক্রেন, তুরস্ক, মধ্যএশিয়া ও পূর্ব ইউরিপের দেশগুলোতে পাড়ি জমায় এবং এই সুযোগে রুশ জনগোষ্ঠীকে ব্যাপক হারে ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করানো হয়। সেখানে রুশরা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

উল্লেখ যে, ইউক্রেন ক্রিমিয়াকে কেন্দ্র করে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে যে সংকট তৈরী হলো-তা সেই ঐতিহ্যবাহী স্নায়ুযুদ্ধই নতুন রূপে হাজির হয়েছে।

৮.২ ক্রিমিয়া সংকটের বহুমুখী কারণ

১৯৯৪ সালে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে সম্পাদিত 'বুদাপেস্ট সমঝোতা স্মারকচুক্তি'

১. যেখানে বলা হয় ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অংশ হয়ে থাকবে এবং ইউক্রেনের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে ত্রিপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বজায় থাকবে। কিন্তু বর্তমান রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, তেমনি অন্যদিকে এই চুক্তি বলে পশ্চিমা সংঘও রাশিয়াকে কোনঠাসা করার মওকা নিচ্ছে।

২. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ইউক্রেন যা প্রত্যাখান করেন ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ।

৩. ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণ মর্যাদার সদস্য লাভের প্রচেষ্টা।

৪. ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্যই চায় এবং USA এর ক্রিমিয়া সংকট নিয়ে উদ্বেগ।

গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ :

ক. সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউলিয়া তিমোশেংকো কারাবন্দী হলে আসেনি ইয়াতসেন ইউকোর নেতৃত্বে চালিত দলগুলোর "ফাদার ল্যান্ড" নামের জোট মূল ভূমিকা রাখে ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে।

খ. অন্যদিকে "সবোদা" বা ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স ফর রিফর্ম" এর ব্যানারে সরকার বিরোধি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয় অন্য দুটি দল।

"সবোদা" হচ্ছে একটি জাতীয়তাবাদী জোট। নেতৃত্বে থেকেছেন জনপ্রিয় নেতা ওলেহ তিয়াহমিযক। অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স ফর রিফর্ম এর নেতৃত্বে থেকেছেন ইতালি।

৮.৩ ২১ মে, ২০১২ ন্যাটোর শিকাগো সম্মেলন

শিকাগো সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পূর্ব ইউরোপে ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা (এমডি এস) কার্যকর করার ঘোষণা দেন।

ন্যাটোর তত্ত্বাবধানে পোল্যান্ডে মোতায়েন থাকবে সিলো ক্ষেপনাস্ত্র; চেক প্রজাতন্ত্রে বসানো হবে (রাডার ট্রেকিং স্টেশন)

এসবের লক্ষ্য যে মূলত রাশিয়াকে চাপে রাখা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মস্কোকে জানান দেওয়া যে, তাদের (ICBM) Inter Continental Ballistic Missile-এর উপর দিন রাত নজরদারি চালাচ্ছে NATO এর MDS.



ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন-এই অজুহাতে তার বিশ্ব মোড়লীপনা চালিয়ে যাচ্ছে-তুরস্ক, স্পেন, রোমানিয়া এবং পোল্যান্ডে ন্যাটোর ক্ষেপনাস্ত্র বসিয়ে অপরদিকে নেদারল্যান্ডেও উন্নীত করেছে রাডার ব্যাবস্থাকে এবং জর্জিয়াকেও এই ছকে যুক্ত করতে প্রয়াস চালাচ্ছে।
অন্যদিকে ন্যাটোর সম্মেলনে রাশিয়াও কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। ন্যাটো কর্তৃক MDS বসানো হলে রাশিয়া পোল্যান্ড ও রোমানিয়ায় হামলা চালানোর হুমকীর ঘোষণাও দিয়েছেন।

উল্লেখ্য রাশিয়াকে কোনঠাসা করার জন্য পূর্ব ইউরোপের বহুদেশ ন্যাটোতে যোগদান করে। ১৯৯৪ সালে ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য না হলেও ন্যাটের "পার্টনারশীপ ফর দ্য পিস" অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

৮.৪ ক্রিমিয়ার গণভোট

পূর্ব ইউরোপের দেশ ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়া নাটকীয়ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এক দশক পূর্বে ২০০৪ সালে ইউক্রেনে অরেঞ্জ বিপ্লবের সূচনা হলে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা শক্তির একটি সংঘাতপূর্ণ অবস্থান তৈরি হয়। তারপর গত এক দশকেও ইউক্রেনে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
ক্রিমিয়ায় একটি রেফারেন্ডাম (গণভোট) অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ ভোটার ক্রিমিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছে। একই সঙ্গে ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট রাশিয়ান ফেডারেশনের যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ক্রিমিয়া ইউক্রেনের একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র হলেও এর জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় ৫৮%) অংশই রুশ বংশোদ্ভূত নাগরিক। ইউক্রেনের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশ হওয়ায় ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। অপরদিকে ইউক্রেনে পশ্চিমাদের প্রভাব ক্রমে প্রবল হয়ে উঠায় এবং সাম্প্রতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পশ্চিমাদের দ্বারা ইন্ধন দেয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবেও রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর খবরদারি বাড়িয়ে দেয়।
অতএব, ইউক্রেনের ভূমিকা এবং ক্রিমিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ও রাশিয়ায় যোগ দেয়ার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিক ঘটনাবলীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) অপরাজনীতির ফল হিসেবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।
ক্রিমিয়া উপদ্বীপে রাশিয়ান সেনা উপস্থিতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত গণভোট নিয়েও প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক।
একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইউক্রেন তার সমগ্র ভূখণ্ডের ওপর স্বাধীনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে। সেখানে একদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমাদের অতি রাজনীতি, আবার অন্যদিকে রাশিয়ার অন্যায় আগ্রাসন পুরো অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে হুমকীর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

৮.৫ ক্রিমিয়া/ ইউক্রেন সংকট

২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউক্রেনের রুশপন্থী প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটি বাণিজ্যচুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর থেকেই ইউক্রেনে বিরোধীদলের আন্দোলন উত্তাল হয়। পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, দেশ ত্যাগ এবং পশ্চিমা-রাশিয়া দ্বন্দ্বের সূত্রধরে রুশ সীমান্তে অবস্থিত ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়ায় সেনা মোতায়েন করে রাশিয়া। সর্বশেষ জনগণের ভোটে রাশিয়া ফেডারেশনে যোগ দেয় ক্রিমিয়া।
কৃষ্ণ সাগরের উভয় উপকূলে অবস্থিত ছোট কেটি উপদ্বীপ ক্রিমিয়া। শতকের পর শতক ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয় ভূখণ্ডটি। সবচেয়ে বেশি সময় অবস্থান করে, তার্কিভাষি মোঙ্গলিয়া। তারা স্থানীয়দের মধ্যে মিশে গিয়ে "ক্রিমিয়ান তাতার" জাতিগোষ্ঠীর প্রবর্তন করে। "গোল্ডেন হার্ড" থেকে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এটি তুর্কি উপনিবেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতকে হতে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ের পর হতে রাশিয়ার প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৭৪ সালে "কুচুক কাইনায়াজ শান্তিচুক্তি" তে ক্রিমিয়া রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয় এবং ইউরোপ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক) মাঝে সংঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ক্রিমিয়া, বিংশ শতকে ক্রিমিয়া পরিণত হয় রাশিয়ান, ক্রিমিয়ান, তাতার, ইউক্রেন ও ইহুদিদের মিলিত আবাসভূমিতে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ক্রিমিয়াও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অনেক ক্রিমিয়ান তাতার জার্মান দোসরে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও বিতাড়িত হয় বহু তাতার। তবে অনেক কমিউনিস্ট নেতার সমর্থনে আশির দশকে তাতাররা আবার

ক্রিমিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ পায়।

১৯৫৪ সালে একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে ইউক্রেন প্রশাসনকে উপহার দেন। তবে উপদ্বীপটির সেভাস্টোপোল শহরে রাশিয়ান নৌঘাঁটি রেখে দেয়া হয়। নব্বইয়ের দশক থেকেই এ নৌঘাঁটি রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করতে থাকে।

৮.৬ ক্রিমিয়া এখন রাশিয়া :

১৬ মার্চ ২০১৪ ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৬.০৬ শতাংশ ভোটার রাশিয়ার সাথে একীভূত হয়ে যাবার পক্ষে রায় দেয়। ঐ গণভোটের পর ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ১৭ মার্চ, ২০১৪ সালে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেয় এবং রুশ ফেডারেশনে যোগ দেয়ার আনুষ্ঠানিক আবেদন জানায়। ক্রিমিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে ডিক্রী জারি করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তারপর ১৮ মার্চ রাশিয়ায় ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে রুশ প্রেসিডেন্টও ক্রিমিয়ার নেতারা। এর মাধ্যমে একদিনের স্বাধীন ক্রিমিয়ায় স্বাধীন অস্তিত্ব আর সম্ভবত এটাই হচ্ছে ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্পায়ু স্বাধীন রাষ্ট্র। ২১ মার্চ, ২০১৪ সালে ফেডারেল অ্যাসেম্বলির উচ্চকক্ষে ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তিটি সর্বসম্মত ক্রমে অনুমোদিত হয়। নতুন আইন অনুযায়ী, ক্রিমিয়ায় এখন রুশ শাসিত দুটো নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল গঠিত হলো-ক্রিমিয়া এবং বন্দর নগর সেভাস্তোপোল।

৮.৭ ইউক্রেন সংকটের সূত্রপাত

ইউক্রেন সংকটের উৎস ২০০৪ সালে। সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করেন। ২০০৪ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতায় অরেঞ্জ বিপ্লব (Orange Revolution) সংঘটিত হলে ক্ষমতায় আসেন এই বিপ্লবের মূল নায়ক ইয়ুশ্চেনকো। ২০০৭ সালে ব্যাপক দুর্নীতিতে পতিত সরকার পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মস্কোর সাথে অযাচিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে ক্ষমতা হারান ভিক্টর ইয়ুশ্চেনকো। ২০১০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। তিনি বিজয়ী হয়ে এপ্রিল ২০১০ সোভাস্তোপোলের রুশ নৌঘাঁটির ইজারের মেয়াদ ২০৪২ সালে পর্যন্ত বাড়ালে মস্কো-কিয়েভ সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উপনীত হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার কাছ থেকে দেড় হাজার কোটি ডলার ঋণ নেয়া চুক্তিতে উপনীত হয় ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। এ সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের পাশ্চাত্যপন্থীরা মেনে নিতে পারে নি। তখন থেকেই তারা রাশিয়ার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল এবং ইউ-এর সাথে চুক্তি পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ রাজধানী কিয়েভ ছেড়ে যান। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ইউক্রেনের অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওলেক্সান্দির তুর্কিনোভ।

৮.৮ ক্রিমিয়ার গণভোট ও জাতিসংঘের প্রস্তাব

রাশিয়ায় যোগ দেয়া প্রশ্নে অনুষ্ঠিত ক্রিমিয়ার গণভোটকে অবৈধ ঘোষণা করে ২৭ মার্চ, ২০১৪ জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব পাস হয়। ইউক্রেনের পেশ করা এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে ক্রিমিয়াকে একীভূত করে মস্কোর নেওয়া পদক্ষেপকেও বৈধতা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেয় ১০০টি বিপক্ষে ভোট দেয় ১১টি। ৫৮টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। ২৪টি দেশ ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় নি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ক্রিমিয়া ইস্যুতে অংশ নেয় নি বাংলাদেশ, চীন এবং সার্কভুক্ত সবগুলো দেশই ভোটদানে বিরত ছিল।

৮.৯ ক্রিমিয়ায় রুশপন্থিদের আন্দোলন :

ইউক্রেনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রজাতন্ত্র ক্রিমিয়া দেশটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয় যোগ দেয়ার পর ৭ এপ্রিল ২০১৪ পূর্বাঞ্চলীয় দোনেত্শ (Donetsh) শহরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশপন্থিরা স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে সে দেশের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের রুশপন্থিরা ও ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। তাদের মধ্যে বহু সশস্ত্র ব্যক্তি ইউক্রেনের বহু সরকারি ভবন ও থানা দখল করে নেয়।

৮.১০ Geneva Statement of April 17, 2014

ইউক্রেন সংকট নিরসনে ১৭ এপ্রিল, ২০১৪ সুইজারল্যান্ড জেনেভা শহরে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউক্রেনের কূটনীতিকদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে চতুর্পক্ষীয় (জেনেভা স্টেটমেন্ট অব এপ্রিল ১৭, ২০১৪/ Geneva Statement of April 17, 2014) নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তির হাইলাইটস :

১. সব অবৈধ অস্ত্রধারীকে নিরস্ত্র হতে হবে এবং দখল হয়ে যাওয়া সব ভবন ও জায়গা বৈধ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।
২. ইউক্রেনের সাংবিধানিক সংস্কার করতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে এ সংস্কার প্রক্রিয়া চলবে।
৩. চলতি গণ-আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়া হবে।
৪. হত্যাকান্ডে জড়িত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে।
৫. ইউক্রেনে গঠিত সমস্ত সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হবে।

৮.১১ ইউক্রেন সংকট ও ঠান্ডাযুদ্ধের সূচনা

প্রথমে ক্রিমিয়ার গণভোট ও পরবর্তী সময়ে ক্রিমিয়ার রশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি। এরপর ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও সীমান্ত রাশিয়ার সেনা মোতায়েন। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন ইউক্রেনে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ। আর সর্বশেষ ঘটনায় একটি মালয়েশিয়ান বিমান (ফ্লাইট এমএইচ ১৭) ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত ও ২৯৫ জন আরোহীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে এবং নতুন করে এক ধরনের স-য়ুযুদ্ধের জন্ম হয়েছে। বলা ভালো, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছিল ২৩ বছর আগে, ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর। এরপর দীর্ঘ সময় চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ইস্যুতে মতপার্থক্য থাকলেও (ইরাক, আফগানিস্তান, ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প ইত্যাদি) কখনো পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ পর্যায়ে পৌছায় নি। কিন্তু ইউক্রেনের পরিস্থিতিতে দুই পরাশক্তির মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। স-য়ুযুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ছে। ক্রিমিয়ার ঘটনার পরই নতুন করে স-য়ুযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। এটা বাহ্যত পরিণত হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বন্দ্বে। এখন এই দ্বন্দ্ব ক্রিমিয়া ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে, যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে। অনেকে স্মরণ করতে পারেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের প্রভাববলয় বিস্তারের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে জন্ম হয়েছিল স্নায়ু-যুদ্ধের। সেটা ছিল মূলত আদর্শিক দ্বন্দ্ব একদিকে ছিল পুঁজিবাদ, অন্যদিকে সাম্যবাদ। একসময় ১৯৪৯ সালে এই সাম্যবাদের প্রভাব ঠেকাতেই পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জন্ম হয়েছিল সামরিক জোট ন্যাটোর। অপরদিকে পূর্ব ইউরোপ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে ১৯৫৫ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করেছিল সামরিক জোট ওয়ারশ। একপর্যায়ে সেখানে 'যুদ্ধের আশঙ্কারও জন্ম হয়েছিল। যদিও যুদ্ধ হয় নি। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এই 'যুদ্ধ' জড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটে স্নায়ুযুদ্ধের। আজ প্রায় ২৩ বছর পর নতুন আঙ্গিকে স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হচ্ছে! এখানে আদর্শিক দ্বন্দ্ব নেই বটে, কিন্তু প্রভাববলয় বিস্তারের এক ধরনের নগ্ন প্রতিযোগিতা আছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব করার যে প্রবণতা ও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব করার যে প্রবণথা ও রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার ন্যাটোর যে ষ্ট্রাটেজি, তা রাশিয়ার সমরনায়কদের অজানা নয়। ভুলে গেলে চলবে না, ক্রিমিয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার স্বার্থ ছিল অনেক। ক্রিমিয়ার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণসাগর বা ব্ল্যাক সির পশ্চিম পাশে রুমানিয়া মিহাইল কোগাল নাই সে আনুতে রয়েছে ন্যাটোর বিমান ঘাঁটি। এই বিমান ঘাঁটির গুরুত্ব অনেক। আফগানিস্তানে সেনা ও রসদ সরবরাহের জন্য ট্রানজিট রুট হিসেবে এই বিমান ঘাঁটিটি ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ সাগরের গুরুত্ব আরো একটি কারণে। এখানে অবস্থান রয়েছে ন্যাটোর জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স ইষ্টের। কৃষ্ণসাগরভুক্ত তিনটি দেশ রুমানিয়া, বুলগেরিয়া আর তুরস্ককে নিয়ে ন্যাটো গেল বছর তাদের তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছিল। এটা রাশিয়ার ওপর এক ধরনে স্নায়ুবিক চাপ। ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন থেকেই

কৃষ্ণসাগরভুক্ত এলাকা সেই সঙ্গে কাস্পিয়ান সাগরভুক্ত অঞ্চলকে 'হট এরিয়া', অর্থাৎ উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে আসছেন। সুতরাং ক্রিমিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাশিয়ানদের (জনসংখ্যার ৫৯ ভাগ, প্রায় ২০ লাখ) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে শুধু রাশিয়াই হস্তক্ষেপ করেছিল তা বিবেচনায় নিলে ঠিক হবে না। রাশিয়ায় নয়া জার নেতৃত্ব রাশিয়ার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ক্রিমিয়ায় বসবাসকারী রাশিয়ানদের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের নিজেদের ভূখণ্ডগত নিরাপত্তার বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরো কৃষ্ণসাগরভুক্ত অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব করার জন্যই ন্যাটোর দরকার জর্জিয়া ও ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়া। তাহলে রাশিয়ার সীমান্ত উপস্থিত থাকবে ন্যাটোর সেনাবাহিনী। এটা রাশিয়ার ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ। রাশিয়ার সমরনায়করা এটা যে মেনে নেবেন না, এটাই স্বাভাবিক। উলে-খ্য, গেল বছর কৃষ্ণসাগরে ন্যাটো ও জর্জিয়ার নৌবাহিনী যৌথভাবে একটি সামরিক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল, যা রাশিয়ার খুব সহজভাবে নেয়নি। ক্রিমিয়ার ঘটনার রেশ ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে। কার্যত ইউক্রেনের পূবাঞ্চলে এখন আর ইউক্রেন সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই। এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব করে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা, যারা ক্রিমিয়ার মতোই রাশিয়ার অংশ হতে চায়। আর এই অঞ্চলেই মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসের বিমানটিতে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালানো হলো। তবে এই হামলা কারা চালিয়েছে, তা নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন। অভিযুক্তদের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। তারা অবশ্যই হামলা চালানোর কথা অস্বীকার করেছে। ইউক্রেনে সরকারকেও অভিযুক্ত করা হচ্ছে। মার্কিনি ভূমিকাও সন্দেহের বাইরে নয়। কোনো ন্যাটোর যে সম্প্রসারণ, তার প্রধান উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দিন ধরেই চাচ্ছে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দুটো দেশ-জর্জিয়া ও ইউক্রেন ন্যাটোর পূর্ন সদস্য হোক। তাহলে ন্যাটোর তথা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এই দুই দেশে মোতায়েন করা যাবে। ফলে 'চাপের' মুখে রাখা যাবে রাশিয়াকে। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়ার জ্বালানি সম্পদ, বিশেষ করে গ্যাসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হবে। তাই পুতিন যে এই মার্কিন ষ্ট্রাটেজি বোঝেন না, এটা ভাবা ছিল ভুল। ২০০৮ সালে রাশিয়া জর্জিয়ার সঙ্গে সীমিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল একটাই রাশিয়ার সীমান্তে ন্যাটোর উপস্থিতি রাশিয়া মেনে নেবে না। এর পরই ইউক্রেন সংকটকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের ও রাশিয়া পরস্পর 'বাকযুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়। ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য ও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল ইউক্রেনকে রাশিয়া তার ইউক্রেন পাইপলাইন বন্ধ করে দিয়েছে। আর এতে করে বুলগেরিয়া রুমানিয়া আর সার্বিয়ায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এই তিন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্যাসের অভাবে বন্ধ

মনে রাখার Technique & Tips

- ১৯৯১ সালের ২৪ আগস্ট ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।
- ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক কেন্দ্রে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।
- আয়তন : ৬,০৩,৫৫০ বর্গ কি.মি.
- সরকার ব্যবস্থা : প্রজাতন্ত্র।
- রাজধানী : কিয়েভ।
- প্রধান ভাষা : ইউক্রেনীয় ও রুশ।
- মুদ্রার নাম : ইরেভনিয়া।
- ক্রিমিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সালে মুক্ত বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি ইউরোপিয় ইউনিয়নের সাথে না করতে চাইলে ইউক্রেনের রুশপন্থি প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতাচ্যুত হন।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ইউক্রেনের অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয় পশ্চিমাপন্থীদের মনোনিত নেতা ওলেক্সান্দর তুর্কিনোভ।
- ১৬ মার্চ, ২০১৪ ক্রিমিয়াতে গনভোট অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৭ মার্চ, ২০১৪ ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে।
- ২১ মার্চ, ২০১৪ ক্রিমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ২৭ জুন, ২০১৪ সালে ইউক্রেন ইউরোপিয় ইউনিয়নের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। মুক্ত বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা ছিল এ চুক্তির বিষয়।

হয়ে যাবে। পরিসংখ্যান বলছে, রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ সংস্থা গ্যাসপ্রম (Gasprom) এর ইউক্রেনের কাছে পাওনা রয়েছে দুই বিলিয়ন ডলার। এ টাকা এখন ইউক্রেন কিভাবে শোধ করবে? এই সংকট এখানে যুদ্ধের আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে। রাশিয়া ইতোমধ্যে ইউক্রেনকে বাইপাস করে কৃষ্ণসাগরের নিচে দিয়ে একটি পাইপলাইন তৈরি করছে। সমগ্র ইইউয়ের গ্যাসের চাহিদা ৩০ ভাগ একা জোগান দেয় রাশিয়া। আর জার্মানির ৪০ ভাগ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এই গ্যাস আগামী দিনে অন্যতম একটি ফ্যাক্টর হবে ইউরোপের রাজনীতিতে। অনেকেই স্মরণ করতে পারেন, মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, বিশেষ করে ইরাক ও লিবিয়ায়, তার পেছনের মূল কারণ ছিল তেল। ইরাক ও লিবিয়ার তেলের সহজ লভ্যতার কারণে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর মদদে সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধে ইরাককে ধ্বংস করে দিয়ে এখন মার্কিন কোম্পানিগুলোই ওই তেল বিক্রির টাকায় ইরাক পুনর্গঠনের কাজ করছে। আর লিবিয়ার তেল ও গ্যাস যায় ইতালিতে। গাদ্দাফির প্রাণ দিতে হয়েছিল এই তেল গাসের কারণেই। সুতরাং রাশিয়ার গ্যাসের ওপর পুরো ইউরোপের নির্ভরতা সেখানে নতুন করে 'গ্যাসযুদ্ধে' এর সূচনা করবে। তবে পার্থক্য একটাই রাশিয়া ইরাক কিংবা লিবিয়া নয়। পুতিনের পেছনে রয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। সুতরাং ওবামা ও অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কোনো সুবিধা করতে পারবে না। অনেকেই স্মরণ করতে পারেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ যখন সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তখন একপর্যায়ে পশ্চিমা জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কে রচনা করে 'পূর্ব-পশ্চিম,' রাজনীতির এক নয়া দিগন্ত উন্মোচনা করেছিলেন। ব্রান্ট বুঝতে পেরেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্ব-উদ্যোগে প্রথমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সেই সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে একটি 'মডেল' হিসেবে গন্য করা হয়েছিল। এমনকি গরবাচেভও চেষ্টা করেছিলেন 'কমন ইউরোপিয়ান হোম' এর তত্ত্ব উপস্থাপন করে ইউরোপীয় সংস্কৃতির আদলে এক ইউরোপ গড়ে তুলতে। তিনি ১৯৮৮ সালেই ওয়ারশ সামরিক জোট ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন ন্যাটোর কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয় নি; বরং ন্যাটোকে এখন একটি বিশ্ব সংস্থায় পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একদিকে পূর্ব ইউরোপ ন্যাটোর যেমনি সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব দেশ যখন ন্যাটোর সদস্য, ঠিক তখনই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে আলাদা আলাদা সংস্থা গঠন করে ন্যাটোর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা বাড়ানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, দুটো বড় বড় শক্তি রাশিয়া ও চীনকে নিয়ন্ত্রণে আনা ও দেশ দুটো থেকে স্বার্থ আদায় করা। তাই ইউক্রেন সংকট, সেখানে তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থানের নামে ইয়ানুকোভিচ সরকারের পতন ঘটানো এবং সর্বশেষ ঘটনায় বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রে যত বেশি জড়িত হবে, তত বেশি রাশিয়া আগ্রাসী হবে। রাশিয়া সীমান্তে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মনে থাকার কথা, ২০০৮ সালে রাশিয়া তার সীমান্তবর্তী জর্জিয়ার দুটো অংশ দখল করে নিয়েছিল। এখন জর্জিয়ার আবখাজিয়া (২০০৮), কিংবা ইউক্রেনের ক্রিমিয়ার পর মলদোভার ট্রান্স দায়িয়েস্টা ও অপর একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গাগাউজিয়াতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। কাজাখস্তান ও আরজারবাইজান নিয়েও রয়েছে একই প্রশ্ন। ইউক্রেনের পর রুশ বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বাস করে কাজাখস্তানে। এসব অঞ্চলে রাশিয়ার কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে। যেকোনো ধরনের ন্যাটোর আগ্রাসন, রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করবে এসব অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে। তবে আমার ধারণা, ক্রিমিয়ার পর রাশিয়া একটা 'ষ্ট্যাটাস কো' অবলম্বন করছে। অর্থাৎ যে যেখানে আছে, সে সেখানে অবস্থান করবে। রাশিয়া এই মূহুর্তে তার সীমান্ত বাড়াবে না। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমা বিশ্বের প্রয়োজন রয়েছে রাশিয়াকে। বিশ্বের নবম অর্থনীতি হচ্ছে রাশিয়া। পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে রাশিয়ার এখন বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ রাশিয়ার সম্পদ ফ্রিজ করায় তা রাশিয়ার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। এটা কাটিয়ে ওঠতে রাশিয়া এখন ব্রিকসভুক্ত (BRICS) দেশগুলোকে নিয়ে আলাদা একটি অর্থনৈতিক ব-ক গড়ে তুলছে। বিশ্বব্যাংকের বিকল্প একটি ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিকস। চীন ও ভারত এই ব্রিকস এর সদস্য। ক্রিমিয়া সংকটে চীন ও ভারত রাশিয়ার অবস্থানকে সমর্থন করেছিল। এই সংকট রাশিয়া-চীন সম্পর্ককে আরো জোরদার করেছে।

৮.১২ ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

২৫ আগস্ট, ২০১৪ সালে বেলারুশে এক আঞ্চলিক বৈঠকের পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক বৈঠকের পর ইউক্রেনের সরকারি বাহিনী ও রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতা বাদীদের সবে লড়াই বন্ধ করার জন্য একটি রুফরেখা তৈরির ঘোষণা দেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো।

ইউক্রেন ছাড়াও পশ্চিমা দেশগুলো অভিযোগ করেছে ইউক্রেনের বিদ্রোহীদের রাশিয়া মদদ দিচ্ছে, যদিও মস্কো এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ২৮ আগস্ট, ২০১৪ সালে পেলো পোরোশেঙ্গে তার নির্ধারিত তুরস্ক সফর বাতিল করেছে। এদিকে একই দিনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইউক্রেন সংকট নিয়ে জরুরী বৈঠক রয়েছে। ২৯ আগষ্ট, ২০১৪ সালে এক জরুরী বৈঠক শেষে NATO বলেছে ইউক্রেনের সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাশিয়া অন্তত ১০০০ সেনা অংশ নিয়েছে। NATO কৃত্রিম উপগ্রহের (Stellite) তোলা ছবি দেখিয়ে বলেছে, এতে ইউক্রেনের অভ্যন্তরে রুশ সেনাদের উপস্থিতি দেখা গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাশিয়া উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ও বারবার ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখন্ডতা লংঘন করেছে। দেশটির অভ্যন্তরে চলমান আক্রমণের জন্য মস্কোকে আরো মাসুল দিতে হবে।

রুশপন্থী বিদ্রোহীদের স্বশাসন দিচ্ছে ইউক্রেন ইউক্রেনের পার্লামেন্টে দেশটির পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ রাশিয়ার মধ্যস্থতার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষরিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির আলোকের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হলো। একই সঙ্গে EU এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার লক্ষ্যে বিতর্কিত চুক্তিটিও অনুমোদন করেছে পার্লামেন্ট। ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে অনুমোদিত এ চুক্তিটির ইউক্রেনে চলমান সংকটের মূল কারন। ইউক্রেনের মাঝে রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিউ এই চুক্তির বিপক্ষে ছিলেন। পরে গণ আন্দোলনে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পূর্ব ইউক্রেনের রুরূপন্থী অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়।

EU র সঙ্গে সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তিটির European Parliament এর আইনপ্রনেতারাও ফ্রান্সের হ্যাসবর্গ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুমোদন করেন। তবে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতায় ও চুক্তির মুক্তবাণিজ্য বিষয়ক অংশটি ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

পশ্চিমা নেতারা ব্রাসেলসে ইইউর সম্মেলনে অভিযোগ করেন, রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ইউক্রেনের অভ্যন্তরে নিয়মিত তৎপরতা চালাচ্ছে। ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে রাশিয়ার ওপর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, প্রতিরক্ষা উপকরণ রপ্তানি ও তেল রপ্তানির মতো কয়েকটি খাতে অবরোধ আরোপ করেছে।

রাশিয়ার ট্যাংক হামলার ইউক্রেনের ছোট সীমান্ত শহর নভোসভিৎলিভকা ধ্বংশ হয়ে গেছে। রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব ইউক্রেনের বেশ কিছু এলাকা দখল করেছে। রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপদ্বীপ নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেওয়ার পর গত এপ্রিলে শুরু হওয়া লড়াইয়ে এ পর্যন্ত ২৬০০ জন প্রাণ হারায়।

যুক্তরাজ্যের ওয়েলসে সম্মেলনের পর NATO মহাসচিব অ্যান্ডার্স কড়া রামসুসেন ইউক্রেন থেকে সেনা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

মূল্যায়ন

অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী ২০৫০ সালে 'ব্রিকস' এর অর্থনীতি গিয়ে দাড়াবে ১২৮ ট্রিলিয়ন ডলার (এক হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন) তখন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পরিমাণ দাড়াবে মাত্র ৩৮.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। একই সঙ্গে রাশিয়া চীনকে সঙ্গে নিয়ে সাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশনকে শক্তিশালী করছে। আর সাবেক সোভিয়েত বলয়ভূক্ত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে একটি শক্তিশালী সামরিক জোট কালেকটিভ ট্রিভি অর্গানাইজেশন গঠন এখন সময়ের ব্যাপারে মাত্র। এটা হতে পারে ওয়ারশ জোটের পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রেসিডেন্ট ওবামার ইউক্রেনকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করা ও সেখানে ন্যাটোর সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে বাস্তবে রুশ দেওয়া পুরো ইউরোপকে আবারও অস্থিতিশীল করে তুলবে। এর প্রভাব গিয়ে পড়বে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে, সেখানে ইসলামী জঙ্গিরা তাদের অবস্থান শক্তিশালী করে সনাতন ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করার কথা ঘোষণা করেছে। সুতরাং 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' অনুযায়ী মালয়েশিয়ান বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাকে হালকাভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। একাধিক আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদের রিপোর্ট ও জাতিসংঘের ভূমিকার দিকেএখন তাকিয়ে থাকবে সারা বিশ্ব। তবে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা কারো জন্যই কোন মঙ্গল ডেকে আনবে না।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (Part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

০১. ক্রিমিয়াতে গণভোট কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৬ মার্চ, ২০১৪।

০২. ক্রিমিয়া কবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়?
উত্তর: ২১ মার্চ, ২০১৪।

০৩. ইউক্রেনের সাথে ইউরোপিয় ইউনিয়ন কবে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করে?
উত্তর: ২৭ জুন, ২০১৪।

০৪. কখন বুদাপেষ্ট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়?
উত্তর: ১৯৯৪ সালে রাশিয়া, আমেরিকা, এবং ইউক্রেনের সাথে।

০৫. ICBM কী?
উত্তর: Inter Continental Ballistic Messile.

০৬. ইউক্রেন Partnership for Peace কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯৯৪ সালে।

০৭. ১৬ মার্চ ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে কত শতকরা ভোটার রাশিয়ার পক্ষে ভোট দেয়?
উত্তর: ৯৬.৬%।

০৯. ক্রিমিয়ার রাজধানী কোথায়?
উত্তর: সিমফারপোল।

১০. উইক্রেনের রাজধানী কোথায়?
উত্তর: কিয়েভ।

১১. Bread basket (রুটির ঝুড়ি) of Soviet Union বলা হয় কোন দেশকে?
উত্তর: ইউক্রেনকে।

১২ ইউক্রেনে অরেঞ্জ (কমলা) বিপ্লব সংগটিত হয় কবে?
উত্তর: ২০০৪ সালে।

০৮. ক্রিমিয়ার কোন অবতলে রাশিয়ার নৌঘাটি আছে?
উত্তর: সেভোস্টোপোল শহরে।

১৩. কবে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল দোনেৎস্ক প্রদেশে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ভূপাতিত হয় মালয়েশীয় এয়ারলইনস এর ফ্লাইট MH 17 এবং কতজন আরোহী নিয়ে কোন গ্রামে বিধ্বস্ত হয়?
উত্তর: ১৭ জুলাই, ২০১৪ নেদারল্যান্ড এর আর্মস্টার্ডাম থেকে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালামপুরে যাওয়ার পথে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে গ্রাবোভে গ্রামের ওপর ২৯৮ জন আরোহী নিয়ে বিধ্বস্ত হয় বোয়িং ৭৭৭।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) ক্রিমিয়া সংকটের বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন?
(খ) ক্রিমিয়ার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেন?

২. (ক) ক্রিমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করুন?
(খ) জেনেভা স্টেটমেন্ট কী?

৩. (ক) ICBM কী?
(খ) ইউক্রেনে অরেঞ্জ (কমলা) বিপ্লব সংগটিত হয় কবে?

৪. (ক) ক্রিমিয়ার কোন অবতলে রাশিয়ার নৌঘাটি আছে?
(খ) ক্রিমিয়ার রাজধানী কোথায়?

http://thejobstudy.com Go to Contents

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. "বর্তমান ইউক্রেনে সৃষ্ট সংকটকে কেন্দ্র করে বিশ্বে আবার স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে" আপনি কী একমত ব্যাখ্যা করুন?

২. ক্রিমিয়া সংকটের কারণ এবং তা সমাধানের উপায় আলোচনা করুন।

৩. "ক্রিমিয়া বিষয়ে বিশ্ব দ্বিমেরুতে পরিণত হয়েছে" আপনি কী এক মত ব্যাখ্যা করুন।

৪. ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করুন।

৫. ক্রিমিয়া পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী স্বাধীন রাষ্ট্র কেন আপনার মতামত দিন?

৬. রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে কৃষ্ণসাগরের নৌ-বাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ কেন বর্ণনা করুন?

অধ্যায় ৯

কোরীয় সংকটের পটভূমি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

Background of Korean crisis and its present situation

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৯.১ ভূমিকা
৯.২ সংকট সৃষ্টির পটভূমি
৯.৩ বিরোধের বর্তমান প্রেক্ষাপট
৯.৩(১) যুদ্ধজাহাজ চোওনান ডুবি এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা
৯.৪ উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ
৯.৫ কোরিয়া শান্তির অন্বেষণে
৯ .৬ দুই কোরিয়া পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা এবং গৃহীত পদক্ষেপ
৯.৭ উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণের ভবিষ্যৎ

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

এশিয়ার পূর্ব উপকূলে কোরীয় উপদ্বীপের (Korean peninsula) উপস্থিতি। সমগ্র কোরিয়ার আয়তন প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার ৭৬০ বর্গকিলোমিটার। কোরিয়া বর্তমানে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া এই দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত। উত্তর কোরিয়ার আয়তন হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫ শত ৪০ বর্গকিলোমিটার বা ৪৬ হাজার ৫২৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ২৪ কোটি ৫ লক্ষ। অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার আয়তন প্রায় ৯৮ হাজার ৪৮০ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ। সমগ্র কোরিয়ার উত্তর সীমান্তে রয়েছে মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণে পূর্ব চীন সাগর এবং পূর্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে জাপান এবং পীত সাগর। কোরিয়ার জনগণ বিভিন্ন মঙ্গোলীয় উপজাতির বংশধর। মূলত তাদের আদি বাসস্থান ছিল মাঞ্চুরিয়া। চীন এবং জাপান দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে এ উপদ্বীপ অঞ্চলটি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ায় গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছিল। এ সংকট সৃষ্টি হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণভার নিয়ে, যাতে জড়িত হয়ে পড়েছিল তৎকালীন দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশাল শক্তিধর রাষ্ট্র চীন। সে সময়ের এ সংকট বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মদদপুষ্ট উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ১৯৫৩ সালের জুন মাসে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এর পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও পরস্পর যুদ্ধংদেহী মনোভাব বজায় থাকে। পরবর্তীতে সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৯৪ সালে দুই কোরিয়ার মধ্যে পুনরায় চরম বিরোধ দেখা দেয় যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িত হয়ে পড়ে। এ বিরোধ হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচিকে নিয়ে। এ সময়ে উত্তর কোরিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যদিও এ বিরোধের

আপাতত নিষ্পত্তি হয়েছে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। এ সমস্ত কারণে কোরিয়া উপ-দ্বীপটি সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা যে কোনো সময় বিশ্ব রাজনীতিতে জরুরি পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে।

৯.২ সংকট সৃষ্টির পটভূমি (Background of the rise of Crisis)

৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়া সিলা রাজবংশের অধীনে একটি রাজ্যে পরিণত হয়। চীনের দীর্ঘকালের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটিয়ে ১৮৯৫ সালে কোরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধের মাধ্যমে কোরিয়া জাপানের সংরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে কোরীয় উপদ্বীপে মার্কিন এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করে। তখন সামরিক কৌশলগত কারণে ৩৮ ডিগ্রি সমান্তরাল সীমারেখা বরাবর কোরিয়াকে উত্তর ও দক্ষিণ এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। এ অবস্থায় উত্তরাংশে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণাংশে মার্কিন সেনাবাহিনীর দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের বিষয়ে মস্কোতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী কোরীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের মে মাসে কোরিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারণের ব্যাপারে রুশ-মার্কিন বিরোধ দেখা দেয় এবং এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দুই শক্তির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই প্রকট হয়। ফলে কোরিয়ার দুই অংশে দুই শক্তি নিজস্ব স্বার্থানুযায়ী কর্তৃত্ব চালাতে থাকে। জাতিসংঘ কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য রুশ-মার্কিন সমঝোতা স্থাপনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ সালের ১০ মে মার্কিন দখলদার বাহিনীর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ায় সীংম্যানরি এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র ওই সরকারকে কোরিয়ার জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরিয়ার

মনে রাখার Technique & Tips

উত্তর কোরিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- উত্তর কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে-৯ সেপ্টম্বর ১৯৪৮ সালে।
- উত্তর কোরিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে-১৭ সেপ্টম্বর ১৯৯২ সালে।
- উত্তর কোরিয়ার একমাত্র পত্রিকার নাম-টঙ্গিন শিনবু।
- উত্তর কোরিয়ার একমাত্র রাজনৈতিক দল-কোরিয়ান ওয়ার্কাস পার্টি, প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫ সালে।
- উত্তর কোরিয়ার জাতির জনক-কিম ইল সাং।
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় শাসন করেন-উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সাং (১৯৪৮-১৯৯৪ পর্যন্ত)।
- উত্তর কোরিয়ার সংবিধান ঘোষণা করা হয়-২৭ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করে-২৫ জুন ১৯৫০ সালে।
- উত্তর কোরিয়ার পরমাণুবিষয়ক আলোচনায় জড়িত-৬টি দেশ (চীন, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া)।
- পৃথিবীর সর্বশেষ পারমাণবিক রাষ্ট্র (৮ম)
- উত্তর কোরিয়া প্রথম ৯ অক্টোবর, ২০০৬ সালে পারমানবিক বোমার সফল বিস্ফোরন ঘটায়।
- উত্তর কোরিয়া দ্বিতীয় ২৫ এপ্রিল, ২০০৯ সালে সফল পরীক্ষা চালায়।
- উত্তর কোরিয়া তৃতীয়বারের মতো সফল পরীক্ষা চালায় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে।
- উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে পানমুনজাম গ্রাম রয়েছে।
- উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে সানশাইন পলিসি চালু আছে।
- উত্তর কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।
- উত্তর কোরিয়ার আইনসভার নাম পিপলস অ্যাসেম্বলি।
- উত্তর কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল নিহত হন ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সালে।
- উত্তর কোরিয়ার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ নেতা কিম জং ইল মারা যান--১৭ ডিসেম্বর ২০১১ (জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২)।
- উত্তর কোরিয়ার বর্তমান নেতা -কিম জং উন।
- উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের নাম-ওয়ার্কাস পার্টি।
- উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার নাম - রোডং সিনমুন।
- নর্দন লিমিট লাইন কোন দুটি দেশের বিরোধপূর্ণ স্থান - উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া।

ওই সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং মার্কিন নীতির ঘোর বিরোধিতা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৪৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কিম ইল সুং এর নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়াকে জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোরীয় প্রজাতন্ত্র বা দক্ষিণ কোরিয়া এবং অপরদিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা উত্তর কোরিয়া। এ উত্তর কোরীয় সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় নি এবং এটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে।



দুই কোরিয়াই সমগ্র কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায়। দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণ সাহায্য লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান করে এবং উত্তর কোরিয়া দখলের জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও ইন্ধন যোগায়। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদিও উত্তর কোরিয়া থেকে তার সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়, তবুও সে উত্তর কোরিয়াকে প্রচুর পরিমাণে সামরিক সাহায্য প্রদান করতে থাকে এবং উত্তর কোরিয়া অল্প দিনের মধ্যে সামরিক দিক থেকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। চীনও উত্তর কোরিয়াকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখে। এ অবস্থায় উত্তর কোরিয়াও দক্ষিণ কোরিয়াকে দখল করে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি উত্তর কোরিয়াকে মোকাবেলা করার নীতি গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় কয়েক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। ফলে ১৯৫০ সালে দুই কোরিয়ার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৫০ সালের ২৫ জুন উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী ৩৮ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় ঢুকে পড়ে। যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে উপস্থিত হয়। ফলে চীন সরাসরি উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একদিকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরদিকে যুদ্ধে অংশ নেয় উত্তর কোরিয়া ও চীন এবং তাদের সার্বিক সামরিক সাহায্য প্রদান করে সোভিয়েত রাশিয়া। এভাবে দীর্ঘ ০৩(তিন) বছর প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কয়েক লক্ষ লোক নিহত হয় এবং ৫৫ হাজারের মতো মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র মারাত্মক সামরিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং একভাবে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৫১ সালের ২৪ জুনের প্রস্তাব মতে ১৯৫৩

সালের ২৭ জুলাই কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ভীষণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছিল। এর ফলে ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৩ ঘন্টার নোটিশে একত্রিত হয়ে "শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব" গ্রহণ করেছিল। যাহোক, অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মতোই যুদ্ধ অবসানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৯.৩ বিরোধের বর্তমান প্রেক্ষাপট (Present perspective of Conflict)

উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে সামরিক দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। সে মধ্যপ্রাচ্যে সমরাস্ত্র রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। উত্তর কোরিয়া মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন করতে সক্ষম। উত্তর কোরিয়া ১৯৯০ সালে IAEA এর সদস্য হয়। সে ১৯৯২ সালের ৩০ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা এর সাথে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। IAEA এর কাজ হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে তদন্ত করা। IAEA এর তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। উত্তর কোরিয়া IAEA-কে তার সকল এলাকায় প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে। ফলে তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সাথে IAEA-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাদানুবাদ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে ১৯৯৩ এর ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর কোরিয়া IAEA-এর সদস্যপদ ত্যাগ করার হুমকি দেয়। এতে IAEA তথা যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা জন্মে যে উত্তর কোরিয়ার নিকট পারমাণবিক বোমা রয়েছে। ফলে উত্তর কোরিয়ার সাথে দক্ষিণ কোরিয়া তথা যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর বিরোধ দেখা দেয় এবং এ বিরোধ যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থায় উত্তর কোরিয়াকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে টিম স্পিরিট নামক যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন করেন এবং উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য বলেন। পক্ষান্তরে, উত্তর কোরিয়াও বিষয়টিকে ভীষণভাবে গ্রহণ করে এবং মার্কিনিদের যে কোনো হস্তক্ষেপকে কঠোর হস্তে প্রতিহত করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে উত্তর কোরিয়া আরও অধিকভাবে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হুঁশিয়ারী প্রদানের পরে কোরিয়া উপদ্বীপে নতুনভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং উত্তর কোরিয়া কঠোর নীতি ও ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি জেট

মনে রাখার Technique & Tips

দক্ষিণ কোরিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- অবিভক্ত কোরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে-১ মার্চ ১৯১৯ সালে।
- রিপাবলিক অব কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়া)-এর প্রতিষ্ঠা-১৫ আগস্ট ১৯৪৮ সালে।
- অবিভক্ত কোরিয়া দখলে ছিল-জাপান।
- দক্ষিণ কোরিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে-১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে।
- জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করেছে কোরিয়া প্রণালি।
- ইহন পিহন দ্বীপ-দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বীপ। ২৩ নভেম্বর ২০১০ সালে উত্তর কোরিয়া এ দ্বীপে গোলাবর্ষণ করে।
- বর্তমান দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট পার্ক জিউন হি।
- জাতিসংঘের ৮ম মহাসচিব বান কি মুন দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী।
- দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম "ব্লু হাউস"।
- দক্ষিণ কোরিয়ার পশ্চিমে রয়েছে পীতসাগর (The yellow sea)।
- দক্ষিণ কোরিয়া পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল।
- বুসান বন্দরটি দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া জাপানের অধীনে ছিল।
- ৩৮০ অক্ষরেখা-উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে বিভক্তকারী সীমারেখা।

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া

- কোরিয়া যুদ্ধে জাতিসংঘ বাহিনীর প্রধান ছিলেন-জেনারেল ম্যাক আর্থার।
- কোরিয়া যুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন-ট্রুম্যান।
- জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়-১৯০৫ সালে।
- উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া পৃথক হয়- ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ সালে।
- উত্তর কোরিয়া ও চীন সিউল অধিকার করেছিল-১৯৫১ সালে ৪ জানুয়ারি।
- উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে-১৯৫০ সালের ২৫ জুন।
- কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হয়-২৭ জুলাই ১৯৫৩।

বিমান উত্তর কোরিয়ার আকাশ সীমা লংঘন করলে উত্তর কোরিয়া গুলি করে তাকে ভূপাতিত করে। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি, কারণ তা করতে গেলেই যুদ্ধ আরম্ভ হতো বলে মনে করা হয়।

কোরিয়া উপদ্বীপে নতুন করে এ উত্তেজনা দেখা দিলে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার সংকট নিরসনের জন্য উত্তর কোরিয়া সফর করেন। তার মধ্যস্থতায় পারমাণবিক অস্ত্র তথা অন্যান্য বিষয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে ১৯৯৪ সালের ২১ অক্টোবর জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া কোরীয় উপদ্বীপের বিরোধ ও পারমাণবিক ভীতি দূর করার জন্য একটি ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আলোচক রবার্ট গালোচি এবং উত্তর কোরিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্যাঙ সকজু। এই চুক্তির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

১. উত্তর কোরিয়া শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারবে।
২. যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা নিবে এবং কোরীয় উপদ্বীপকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে গঠনের জন্য কাজ করবে।
৩. যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়াকে হালকা পানি রিঅ্যাক্টর সরবরাহ করবে যা উত্তর কোরিয়ার বর্তমান পারমাণবিক পদ্ধতির চেয়ে হালকা প্লাটোনিয়াম উৎপাদন করবে।
৪. উত্তর কোরিয়া তার বর্তমান পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ রাখার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাকে যে কোন ভীতি থেকে মুক্ত রাখার নিশ্চয়তা দিবে।
৫. চুক্তি স্বাক্ষরের এক মাসের মধ্যে উত্তর কোরিয়া তার বর্তমান গ্রাফাইট আধুনিক রিঅ্যাক্টর অবসান করবে এবং সেক্ষেত্রে IAEA এর তদারকি মেনে নিবে।

১৯৯৬ সালের শেষে দিকে এবং ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই কোরিয়ার সাথে নতুন করে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা স্বপক্ষ ত্যাগ করে বেইজিংস্থ দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে উত্তর কোরিয়ার একদল সাবমেরিন কমান্ডো উত্তর কোরিয়ার সমুদ্র অঞ্চলে পদার্পন করে। বিষয়টি দক্ষিণ কোরীয় টহল বাহিনীর নজরে আসলে তারা ঐ কমান্ডোদেরকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করার পূর্বেই তারা আত্মহত্যা করে। এ বিষয় নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে মারাত্মক সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে দুই কোরিয়ার মধ্যে সরাসরি সংঘাতের পথ পরিহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং সামরিক উত্তেজনার অবসান ঘটে।

২০০০ সালের ১৩ জুন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিমদায়ে জং উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং সফর করেন। এ সফরের সময় উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং ইলের সাথে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বলে বিবেচিত। কারণ কোরিয়া বিভক্ত হয়ে যাবার ৬৮ বছর পরে প্রথমবারের মত এরূপ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন যা উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃক স্বাগত জানানো হয়। এরূপ পারস্পরিক সানসাইন নীতির প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত ১৬ জুন শীর্ষ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে দুই কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে :

ক. ১৯৪৫ সালে কোরীয় উপদ্বীপের বিভক্তি এবং গৃহযুদ্ধের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোকে সফর বিনিময়ের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এ চুক্তির মাধ্যমে।
খ. এ চুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক অনুন্নত উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
গ. কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে দুই দেশের সেনা প্রধানরা হটলাইনের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে শান্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
ঘ. চুক্তি অনুযায়ী দুই কোরিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়।

এ চুক্তিটি দুই কোরিয়ার একত্রিকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। দুই কোরিয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও পর্যায়ক্রমে একত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হলে সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে এ অঞ্চল থেকে তার ৩৭,০০০ সৈন্যকে সরিয়ে নিতে হবে। ঐরূপ সম্ভাবনার সৃষ্টি হলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তর কোরিয়ার সামরিক উত্তেজনা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে নতুন করে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সামরিক উত্তেজনা দেখা দেয়। বুশ প্রশাসন উত্তর কোরিয়াকে ইরাক ও ইরানের মতো যুক্তরাষ্ট্রের নিকট একটি শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করে এবং শয়তানের রাষ্ট্র হিসেবে গালমন্দ করে। ফলে উত্তর কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুনভাবে সামরিক উত্তেজনা দেখা দেয়। এরূপ অবনতিশীল সম্পর্কের কারণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া শান্তি চুক্তির শর্তাবলিকে লঙ্ঘনকে দায়ী করা হয়। উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক পরীক্ষা গোপনভাবে চালাচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্র তার গোয়েন্দা প্রতিবেদনে নিশ্চিত হয়। ফলে উত্তর কোরিয়াকে সামরিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকেও সামরিকভাবে প্রতিহত করার জন্য পাল্টা নীতি গ্রহণ করে এবং ২০০২ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এবং নতুনভাবে আরও পারমাণবিক পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া পরস্পর যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতে থাকে। কিন্তু উত্তর কোরিয়া সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী থাকায় ইরাকের মতো এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং উত্তর কোরিয়াকে একঘরে করে রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের এ নীতি মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানায় এবং দুই কোরিয়ার একত্রিকরণের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রসর হওয়ায় নীতিতে অবিচল থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া বিরোধ নিরসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন ও রাশিয়ার সমন্বয়ে গঠিত ৬(ছয়) জাতি শান্তি আলোচনা ধীরগতিতে চলছে। বেইজিংয়ে কয়েকটি সভা হলেও বাস্তব ফলাফল অর্জিত হয় নি।

এক নজরে দুই কোরিয়ার সামরিক ব্যয়

পার্থক্যের বিষয়	উত্তর কোরিয়া	দক্ষিণ কোরিয়া
বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ	৬ বিলিয়ন	৪ বিলিয়ন
সৈন্য সংখ্যা	১১ লাখ ৬ হাজার	৬ লাখ ৫০ হজার
GDP অংশ	১৫ শতাংশ	২.৬ শতাংশ
আধুনিক যুদ্ধবিমান	আইএল-৭৬	এফ-১৫কে, এফ-১৫ই

৯.৩(১) যুদ্ধজাহাজ চোওনান ডুবি এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা

২০১০ সালের ২৬ মার্চে পীত সাগরে দক্ষিণ কোরিয়ার 'চোওনান' নামক যুদ্ধ জাহাজটিকে উত্তর কোরিয়া টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস করলে জাহাজটির ৪৬ জন নাবিকের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই কোরিয়ার মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও দুই কোরিয়ার মধ্যে বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজ ডুবির ঘটনায় ১৩ জুলাই ২০১০ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত পানমুনজাম গ্রামে আলোচনার স্থান নির্ধারিত হয়। এ বৈঠকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘের কমান্ডের সঙ্গে দুই কোরিয়ার মধ্যস্থতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠক শুরুর ১ ঘন্টা আগে উত্তর কোরিয়া বৈঠকে বসার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে করে চোওনান ডুবির ঘটনায় দুই কোরিয়ার মধ্যে সমঝোতা আপাতত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্পর্কের শীতলতা রয়েই গেল। উল্লেখ্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘের কমান্ড দুই কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধে ১৯৫৩ সনে স্বাক্ষরিত চুক্তির তত্ত্বাবধান করে। পীত সাগরে দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধ জাহাজ ডুবির ঘটনায় উত্তর কোরিয়া ঐ চুক্তির লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আন্তর্জাতিক তদন্তে উত্তর কোরিয়ার তৈরি টর্পেডোর আঘাতে চোওনান ডুবির ঘটনা ঘটে বলে প্রমাণ মিলেছে। তবে উত্তর কোরিয়া এ তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যাণ করে এ ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

৯.৪ উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ

বিশ্বের অষ্টম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ উত্তর কোরিয়া তৃতীয়বারের মতো ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে নতুন করে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে কোরীয় দ্বীপে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এবারের পরীক্ষায় খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরোনিয়াম ব্যবহার করেছে। এর আগের পরীক্ষাগুলোতে তারা প্লাটোনিয়াম ব্যবহার করেছিল। এ পরীক্ষায় রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪-৯। পিয়ংইয়ং বলেছে উত্তর কোরিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত হুমকির জবাবে এ পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। দেশটির নতুন নেতা কিম জং উনের শাসনামলে এই প্রথম এ ধরনের পরীক্ষা চালানো হলো। ৯ অক্টোবর, ২০০৬ সালে ও ২৫ মে, ২০০৮ সালের পর এবার তৃতীয়বারের মতো পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া। জাতিসংঘ, ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়াসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এর আগে উত্তর কোরিয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে ১২ ডিসেম্বর ২০১২ এবং গোপনে পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে গত ২২ জানুয়ারি ২০১৩ সালে উত্তর কোরিয়ার ওপর নতুন করে অবরোধ আরোপের ঘোষণা করে জাতিসংঘ। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৯.৫ কোরিয়া শান্তির অন্বেষণে

উত্তেজনার পাশাপাশি দুই কোরিয়ার সংযুক্তির প্রশ্নে এক ধরনের আলোচনা চলে আসছিল। অনেক দিন থেকে। এ ব্যাপারে একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং। ২০০০ সালের ১৩-১৫ জুন দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা একটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। কোরিয়া বিভক্তকারী অসামরিক গ্রাম-পানমুনজনে কিম মিলিত হয়েছিলেন প্রয়াত উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং ইলের সাথে। এ অঞ্চলের গত ৫৩ বছরের রাজনীতিতে দুই কোরিয়ার নেতারা এর আগে আর কোনো শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন নি। এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ঠিক সাত বছর পর ২০০৭ সালের ২-৪ অক্টোবর তৎকালীন দুই নেতা রোহ মু হিউন (দক্ষিণ কোরিয়া) ও কিম জং ইল (উত্তর কোরিয়া) মিলিত হয়েছিলেন দ্বিতীয়বারের মতো।

সানসাইন পলিসি : দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করে সৌহার্দপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ বজায় রাখার লক্ষ্যে যে পলিসি গ্রহণ করা হয় তাই সানসাইন পলিসি। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং-এর উদ্যোগে এ নীতি গ্রহণ করা হয়। কিম দায়ে জং এ নীতির জন্য ২০০০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

পানমুনজন : উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত এলাকার একটি গ্রাম যা 'শান্তি গ্রাম' নামে পরিচিত।

রণোত্তাল কোরীয় উপদ্বীপ

উত্তর কোরিয়া ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর দূরপাল্লার রকেট উৎক্ষেপণের পর থেকেই কোরীয় উপদ্বীপ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর নতুন বছর ২০১৩ সালে যেভাবে রণোত্তাল হয়ে ওঠে কোরীয় উপদ্বীপ তার একটি দিনপঞ্জি দেওয়া হলো :

২০১৩ সালের কোরীয় উপদ্বীপে রণোত্তালের একটি দিনপঞ্জি

- ২২ জানুয়ারি : রকেট উৎক্ষেপণের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাস ও নিষেধাজ্ঞাগুলো আরও কঠোর করে।
- ১২ ফেব্রুয়ারি : তৃতীয় পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি : 'সত্যিকার যুদ্ধের' মহড়া উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর।
- ১ মার্চ : দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া শুরু।
- ৫ মার্চ : ১৯৫০-৫৩ সালের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো অস্ত্রবিরতি চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে পিয়ংইয়ং।
- ৭ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পরমাণু হামলা চালানোর হুমকি দেয় উত্তর কোরিয়া।
- ৮ মার্চ : দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সম্পাদিত একটি আগ্রাসনবিরোধী চুক্তি বাতিল করে পিয়ংইয়ং।
- ১৫ মার্চ : উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।
- ১৯ মার্চ : মহড়ায় অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম বোমারু বিমান বি-৫২র দক্ষিণ

কোরিয়া অভিমুখে যাত্রা।
- ২১ মার্চ : জাপান ও গুয়ামে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার হুমকি দেয় উত্তর কোরিয়া।
- ২৬ মার্চ : কৌশলগত রকেট ইউনিটের যুদ্ধ প্রস্তুতি উত্তর কোরিয়ার। গুয়াম ও হাওয়াইসহ যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ায় হামলার হুমকি।
- ২৭ মার্চ : দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সর্বশেষ সামরিক হটলাইনও বিচ্ছিন্ন করে উত্তর কোরিয়া।
- ২৮ মার্চ : দক্ষিণ কোরিয়া অভিমুখে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম বোমারু বিমান বি-৫২র যাত্রা।
- ২৯ মার্চ : মার্কিন ভূখণ্ড ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র তাক উত্তর কোরিয়ার।
- ৩০ মার্চ : দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে 'যুদ্ধাবস্থা'র ঘোষণা উত্তর কোরিয়ার।
- ৩ এপ্রিল : দুই কোরিয়ার যৌথ শিল্পাঞ্চল কায়েসং-এ দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিকদের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করে উত্তর কোরিয়া।
- ৮ এপ্রিল : উত্তর কোরিয়া কায়েসং যৌথ শিল্পাঞ্চল বন্ধ করে।

এক নজরে রণাঙ্গনে দুই কোরিয়া

পার্থক্যের মাপকাঠি	উত্তর কোরিয়া কোরিয়ান পিপলস্ আর্মি	দক্ষিণ কোরিয়া রিপাবলিক অব কোরিয়া আর্মি
বাৎসরিক বাজে বরাদ্দ	৬ বিলিয়ন (ইউএস ডলার)	৪ বিলিয়ন (ইউএস ডলার)
নিয়মিত সৈন্য	১৬ লাখ ৬ হাজার	৬ লাখ পঞ্চাশ হাজার
মোট জিডিপিতে বরাদ্দ	১৫ শতাংশ	২.৬ শতাংশ
অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান	আইএল-৭৬	এফ-১৫-কে-এফ-৪ই
পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা	২০০৬,২০০৯ ও ২০১৩ সালে	যুক্তরাষ্ট্রের 'পারমাণবিক অস্ত্রের ছাতার' ওপর নির্ভরশীল
বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান	১৭ বছর বয়সে	২২ বছর বয়সে
সেনাবাহিনী		
সক্রিয় সেনা	১২ লাখ	৬.৫ লাখ
রিজার্ভ সেনা	৭৭ লাখ	৩০ লাখ
ট্যাঙ্ক	৪১০০	২৪০০
সাঁজোয়া যান	২৫০০	২৬০০
কামান	৮৫০০	৫২০০
রকেট লাঞ্চার	৫০০০	২০০
মর্টার	৭৫০০	৬৫০০
বিমান বাহিনী		
যুদ্ধ বিমান	৮২০	৪৬০
হেলিকপ্টার	৩০০টি	৬৮০টি
নৌবাহিনী		
যুদ্ধজাহাজ	৩টি	১৯টি
প্রহরী ও উপকূলবর্তী		
জাহাজ	৩৩৮টি	১১১টি
সাবমেরিন	৭০টি	২৩টি

৯.৬ দুই কোরিয়া পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা এবং গৃহীত পদক্ষেপ

দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের সম্ভাবনায় যে সকল বিষয় সকলকে আশান্বিত করেছে, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. দুই কোরিয়ার জনগণের চিন্তাধারার পরিবর্তন।
২. দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি, সেই সাথে এদেশের জনগণের চিন্তাধারার উন্নয়ন।
৩. দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর উত্তর কোরিয়ার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা।
৪. দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ কর্তৃক এ দেশ থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি।
৫. উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি যে দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশি হুমকি নয়, তা উভয় কোরিয়ারই বোধগম্য হওয়া।
৬. জাতিগত প্রকল্প পুনঃএকত্রীকরণ।
৭. প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং-এর সানসাইন নীতি।

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণ প্রশ্নে যে সকল প্রশংসনীয় উদ্যোগ এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. সানসাইন পলিসি : উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্কোন্নয়নে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং। এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক সানসাইন পলিসি, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংঘাতে পথ পরিহার করে সহযোগিতা নীতি অনুসরণ করা। এ ছাড়া উত্তর কোরিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তিশালী করা এ পলিসির মূল উদ্দেশ্য। সানসাইন পলিসি তৎকালে সমালোচিত হলেও বর্তমানে তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। উভয় কোরিয়ার খুব ধীরে সতর্কতার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

খ. পিয়ং ইয়ং বৈঠক : সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পিয়ং ইয়ং বৈঠকে এ ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে ক্রমেই উৎসাহী হয়ে উঠছে। দুই দেশের মধ্যে যে সকল অনিবার্য বিরোধ দেখা দিয়েছিল তা অনেকাংশেই কমে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার আস্থা জন্ম নিয়েছে এই মর্মে যে, উত্তর কোরিয়ার আণবিক অস্ত্র তাদের জন্য হুমকি নয়।

গ. যৌথ আলোচনা : ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৯৩ এবং ২০০০ সালে দুই কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের বিষয়ে যৌথ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে মতাদর্শগত বিরোধ থাকায় তাদের মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলেও এ ধরনের আলোচনা তাদের আন্তঃসম্পর্কে আস্থা নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

ঘ. ২০০০ সালের শীর্ষ সম্মেলন : ২০০০ সালের ১৩ জুন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং এবং উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল প্রথমবারের মতো যে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন, তা গোটা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয় নেতাই আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে পুনঃএকত্রীকরণের প্রশ্নে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের পর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও পুনঃএকত্রীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা উভয় দেশের সম্পর্কোন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৯.৭ উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণের ভবিষ্যৎ

১৯৫৩ সালের পর থেকে দুই কোরিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক মোটামুটি স্থিতাবস্থায় থাকলেও বিভিন্ন সময়ে দুই কোরিয়ার মধ্যে কখনও যুদ্ধংদেহী মনোভাব আবার কখনও একত্রীকরণের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র নেয় এবং সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েনের আইনগত ভিত্তি যথাযথ করে। অপরদিকে উত্তর কোরিয়া ১৯৬১ সালে চীনের সাথে একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এভাবে দুই কোরিয়া তাদের চলার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে দুই কোরিয়ার সম্পর্ক উন্নত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলেছে। দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উদ্যগ পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণের বিষয়ে যৌথ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৯১ এবং ১৯৯৩

সালে দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুই কোরিয়ার মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধ ও নীতির প্রশ্নে একমত হতে না পারায় তাদের ঐক্য প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বর্তমানে চীনের সহযোগিতা ছাড়া দুই কোরিয়ার মাঝে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ সম্ভব নয়। আবার যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছাড়াও এ অঞ্চলের শান্তি ফিরে আসবে না। ক্লিনটন তার পররাষ্ট্রনীতিতে চীনকে গুরুত্ব দিয়ে একটি কৌশলগত বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বুশ তার পররাষ্ট্রনীতিতে চীনের গুরুত্ব হ্রাস করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়ায় চীন ও উত্তর কোরিয়া এখন যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখছে। এতকিছু সত্তেও কোরীয় উপদ্বীপে শান্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে দুই কোরিয়ার সহাবস্থান।

মূল্যায়ন (Evaluation)

কোরীয় উপদ্বীপের পারমাণবিক উত্তেজনা শুধুমাত্র পূর্ব এশিয়ার জন্যই হুমকি নয়, বরং তা সমগ্র বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি স্বরূপ। দুই কোরিয়ার মধ্যকার আলোচনার মাধ্যমেই কোরীয় উপদ্বীপের দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটতে পারে এবং দুই কোরিয়ার একত্রিকরণও এভাবেই সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দুই পরাশক্তির মধ্যকার ঠাণ্ডা লড়াই আর নেই। বর্তমান বিশ্বে দুই জার্মানিরও একত্রিকরণ সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সে বিচারে দুই কোরিয়ার একত্রিকরণ সময়ের বিবর্তনে সম্ভব হবে বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **সমগ্র কোরিয়ার আয়তন কত?**
উত্তর: ২,২৫,৭৬০ বর্গ কিলোমিটার

২. **কোরিয়া বর্তমানে কয়টি রাষ্ট্রে বিভক্ত?**
উত্তর: দু'টি

৩. **কোরিয়ার জনগণ কাদের বংশধর।**
উত্তর: বিভিন্ন মঙ্গোলীয় উপজাতির।

৪. **কবে কোরিয়ায় গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছিল।**
উত্তর: পর্বতাশের দশকে।

৫. **উত্তর কোরিয়ার একমাত্র পত্রিকার নাম কি?**
উত্তর: টঙিন শিনবু

৬. **উত্তর কোরিয়ার আইনসভার নাম কি?**
উত্তর: পিপলস অ্যাসেম্বলি

৭. **কত সালে দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়?**
উত্তর: ১৯৫০ সালে

৮. **উত্তর কোরিয়ার জাতির জনক কে?**
উত্তর: কিম ইল সাং।

৯. **উত্তর কোরিয়া কত সালে IAEA এর সদস্য হয়?**
উত্তর: ১৯৯৩

১০. **রিপাবলিক অব কোরিয়া কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর: ১৫ আগস্ট ১৯৪৮ সাল।

১১. **বুসান বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর:দক্ষিণ কোরিয়ায়।

http://thejobstudy.com Go to Contents

১২. বিশ্বের অষ্টম পারমানবিক শক্তিধর কোনটি?
উত্তর: উত্তর কোরিয়া
১৩. উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিন কোরিয়া সীমান্ত এলাকায় একটি গ্রাম সেটি কি নামে পরিচিত।
উত্তর: শান্তি গ্রাম।
১৪. উত্তর কোরিয়ার পারমানবিক বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপন করে কবে?
উত্তর: ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩
১৫. কিম দায়ে জং কবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: ২০০০ সালে
১৬. কবে তৃতীয় পরমানু বোমার পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া?
উত্তর: ২০১৩ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী
১৭. উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া পৃথক করা হয় কবে?
উত্তর: ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ সালে।
১৮. ব্লু হাউস কি?
উত্তর: দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাস ভবনের নাম।
১৯. দক্ষিণ কোরিয়ার লোকসংখ্যা কত?
উত্তর: প্রায় ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ
২০. উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত এলাকার একটি গ্রাম কি নামে পরিচিত?
উত্তর: শান্তি গ্রাম

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার সাদৃস ও বৈসাদৃস বর্ণনা করুন?
খ. দুই কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করুন?
২. ক. দুই কোরিয়া পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা আছে কী?
খ. সানসাইন পলিসি কী?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. কোরীয় সংকটের পটভূমি বর্ণনা করুন?
২. দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করুন?
৩. যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার সর্বশেষ চুক্তিটি বর্ণনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে কোরীয় উপদ্বীপকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত এলাকায় পরিণত করা সম্ভব?
৪. যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক মূল্যায়ন করুন?
৫. উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক পরীক্ষা কোরীয় দ্বীপে শান্তি বিনষ্টে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন ?
৬. বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তর কোরিয়া সংকট কী কী প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যায় ১০

কাশ্মীর সমস্যার স্বরূপ এবং পাক-ভারত সংঘাত : বর্তমান প্রেক্ষাপট

Kashmir Crisis & Indo - Pak Conflict : Present Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১০.১ ভূমিকা
১০.২ কাশ্মীর পরিচয়
১০.৩ কাশ্মীর ইতিহাস
১০.৪ কাশ্মীর সমস্যার পটভূমি
১০.৫ বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক চেষ্টা
১০.৬ ব্রিটিশ সমীক্ষা রিপোর্ট
১০.৭ কাশ্মীরে শান্তি আনয়নের পন্থাসমূহ
১০.৮ কাশ্মীর সমস্যার পেছনের কারণগুলো
১০.৯ কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থান
১০.১০ কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভ করলেও ১৯৪৭ সাল থেকেই উভয় উভয়ের শত্রুতে পরিণত হয়। ভারত-পাকিস্তান পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারত পাকিস্তানের সম্পর্ক অবনতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাশ্মীর সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ৪টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার তিনটিই হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে। কাশ্মীর সমস্যার কারণে উভয় দেশই আস্তে আস্তে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে থাকে। সীমান্তে বিশাল আকারের সৈন্য এবং অস্ত্র সমাবেশ করতে থাকে উভয়ই। বাজেটের বিরাট অংশ দারিদ্র্য হ্রাসে বরাদ্দ না করে বরাদ্দ করা হয় সামরিক খাতে। এতে করে উভয় দেশই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে, বাড়তে থাকে দারিদ্র্য। দুটি দেশের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব ক্রমেই রাজনৈতিক হাতিয়ারে রূপ নেয়। ফলে ভারত পাকিস্তান উভয় দেশের রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু। কাশ্মীর সেই ইস্যুর মূল বিষয়বস্তু। ১৯৪৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারত পাকিস্তান পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করলেও তেমন কোনো সুফল বয়ে আসে নি। কারণ চির প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র দুটো কোনো নিরপেক্ষ বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়নে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠন শুধু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়, এটি ভারত এবং

পাকিস্তানকে একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ করতে পেরেছিল। মূলত সার্ক গঠন হওয়ার পর থেকেই ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়নে সার্ক কাঠামোগতভাবে তেমন কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ না পেলেও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠিত হয় মূলত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য। সার্ককে আরও কার্যকর করার জন্য ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় সাপটা, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং নব্বইয়ের দশকে উভয় দেশের মধ্যে শীতল যুদ্ধের রূপ নেয়। যার প্রভাব পড়ে সার্ক ও সাপটা কার্যক্রমে। উভয় দেশের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণ বিগত দিনে সার্ক ও সাপটা তার কার্যক্রম সফলভাবে চালিয়ে যেতে পারে নি। আর এর মূল কারণ হিসেবে ভারত–পাকিস্তানের কাশ্মীর দ্বন্দ্ব। শুধু কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭, ৬৫, ৭১ ও ৯৯ এ ৪ বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কোনো যুদ্ধেই সমস্যার সমাধান হয় নি। ভারত ও পাকিস্তানের সংকট শুধুমাত্র এ দুই দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং তা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে।কাশ্মির সমস্যার স্বরূপ এবং পাক-ভারত সংঘাত



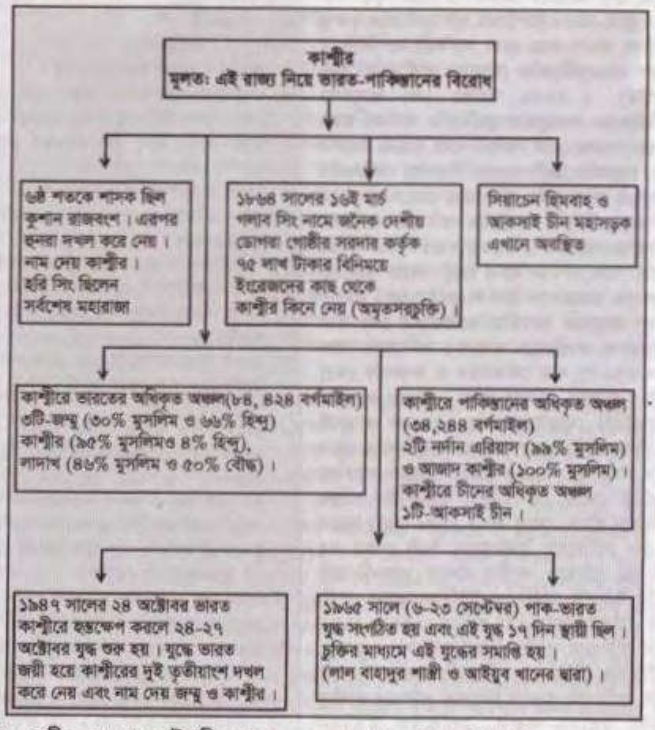
১০.২ কাশ্মীর পরিচয় (Background of Kashmir)

ভারত উপমহাদেশের দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে কাশ্মীর হলো সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ২ লাখ ২২ হাজার ২ শত ৩৬ বর্গকিলোমিটার। জম্মু ও কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ। তার মধ্যে ৬০% মুসলমান, ৩২% হিন্দু এবং অবশিষ্ট অন্যান্য।

১০.৩ কাশ্মীর ইতিহাস (History of Kashmir)

প্রাক–ইসলামি যুগে কাশ্মীর হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু রাজন্যবর্গ কর্তৃক শাসিত হয়। খ্রীস্টিয় দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে এটি উত্তর ভারতের কুশান বংশের সুবিশাল রাজত্বের একটি অংশ ছিল বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীর কুশান বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের শাসনাধীন ছিল। এ সময়

"হুন" শাসকগণ কাশ্মীর দখল করে এবং এ অঞ্চলের নাম করেন "কাশ্মীর"। "কাশি"র নাম থেকে উদ্ভূত। মুসলমানদের সিন্ধু জয়ের পর পরই কাশ্মীরে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় কাশ্মীর কখনো দিল্লী নিয়ন্ত্রিত, কখনো বা আঞ্চলিক শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হয়। ১৮৬৪ সালে অমৃতসর চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার ৭৫ লাখ টাকার বিনিময়ে গলাব সিং নামক এক হিন্দু জমিদারের নিকট কাশ্মীরকে বিক্রি করে। তখন থেকে কাশ্মীর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ভোগ করে আসছিল।



১০.৪ কাশ্মীর সমস্যার পটভূমি (Background of Kashmir Crisis)

কাশ্মীর সমস্যা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকরা ধর্মের উপর ভিত্তি করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পাকিস্তান এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে হিন্দুস্তান বা ভারত গঠন করলেও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত দেয় নি। এ সময় গলাব সিং–এর বংশধর হরি সিং ছিলেন কাশ্মীরের শাসনকর্তা। তিনি কাশ্মীরকে একটি নিরপেক্ষ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে নেহেরু ও জিন্নাহ্ উভয়ের বিরাগভাজন হন। পাকিস্তান প্রথম থেকেই মুসলিম এলাকা হিসেবে কাশ্মীরের ওপর নৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করে। ১৯৪৭ সালে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের ইসলামি জাতীয়তাবাদী দলগুলো পাকিস্তানের সহায়তায় হিন্দু রাজার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলে হিন্দু মহারাজা হরি সিং ভারতবন্ধু নামে কথিত শেখ আব্দুল্লাহর পরামর্শে ভারতের সামরিক সাহায্য কামনা করে। ভারত কাশ্মীরকে ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার শর্তে সামরিক সহায়তা প্রদানে রাজি হয়। ১৯৪৭ সালের ২৪ শে অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে ২৪-২৭শে অক্টোবর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ভারত কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশে (জম্মু কাশ্মীর) দখল করে এবং পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসে এক-তৃতীয়াংশে (আজাদ কাশ্মীর বা মুক্ত কাশ্মীর)। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে গঠিত শান্তি কমিশনের প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরের জনগণের মতামত (গণভোট)-এর ওপর নির্ভর করবে বলে সম্মত হয়। কিন্তু ভারত কাশ্মীরী জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে ১৯৫৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারা মোতাবেক কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ৩৭০ নং ধারা মোতাবেক এ অঞ্চলকে কেন্দ্র শাসিত প্রদেশে পরিণত করে সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। স্বভাবত কারণেই পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের এ ভূমিকাকে মেনে নিতে পারে নি। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান পাশ্চাত্য সামরিক জোটে যোগ দিলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পাকিস্তান প্রীতি বেড়ে যায়। ১৯৫৫ সালে ভারত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তির পর নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতবিরোধী প্রস্তাব উঠলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে ভেটো দিত একতরফাভাবে। সে কারণে ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তান কাশ্মীর বিতর্ক জাতিসংঘে তুললে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এর বিরোধিতা করে। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে শুধু সমর্থনই করে নি বরং কাশ্মীরকে ভারতের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ যা কাশ্মীর জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে বলে বর্ণনা করেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মূল কারণ ছিল কাশ্মীর। সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলটি অধিকার ভোগ করতে দুটি দেশই এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি ছাড়তে নারাজ। সেই সময় পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে জম্মু ও কাশ্মীর

রাজধানী : শ্রীনগর
ভাষা : উর্দু,কাশ্মীরি,ডোগরি, লাদাখি ইত্যাদি।
আয়তন : ২, ২২, ২৩৬ বর্গকিলোমিটার।
জনসংখ্যা : ১০০,৬৯,৯১৭(৬০%মুসলিম,৩২% হিন্দু)
সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র : পাকিস্তান, চীন ও আফগানিস্তান।
Status : স্বায়ত্তশাসন

- কাশ্মীর ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য।
- কাশ্মীরে ভারতের অধিকৃত অঞ্চল - ৩টি -জম্মু (৩০% মুসলিম৩ ৬৬% হিন্দু), কাশ্মির (৯৫ মুসলিম ও ৪% হিন্দু), লাদাখ (৪৬% মুসলিম ও ৫০% বৌদ্ধ)।
- কাশ্মীরে পাকিস্তানের অধিকৃত অঞ্চল -২টি নর্দান এরিয়াস (৯৯% মুসলিম) ও আজাদ কাশ্মির (১০০% মুসলিম)।
- কাশ্মীরে চীনের অধিকৃত অঞ্চল - ১টি-আকসাই চীন
- ৬ষ্ঠ শতকে শাসক ছিল কুশান রাজবংশ। এরপর হুনরা দখল করে নেয়। নাম দেয় কাশ্মীর।
- ১৯৬৪ সালে গলাব সিং ৭৫ লাখ রুপিতে ইংরেজদের কাছ থেকে কাশ্মীর কিনে নেয় (অমৃতসর চুক্তি)।
- ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এখানে ব্রিটিশদের আধিপত্য বজায় ছিল।
- স্বাধীনতার পর যখন সব দেশীয় রাজ্য গুলোকেই ভারত অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথা বলা হয় তখন কাশ্মীর নিয়ে দু'পক্ষেরই দাবি থাকার ফলে প্রাথমিকভাবে এক দ্বিধাবস্থা তৈরি হয়।
- ভারত বন্ধু আব্দুল্লাহর পরামর্শে গলাব সিং ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করে।
- ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে ২৪-২৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ভারত জয়ী হয়ে কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ দখল করে নেয় এবং নাম দেয় জম্মু কাশ্মীর এবং পাকিস্তান এক তৃতীয়াংশ ভাগ দখল করে এর নাম দেয় আজাদ কাশ্মীর।
- ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১লা জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। ৫ জানুয়ারি জাতিসংঘ গণভোটের সিদ্ধান্ত নেয়।

ভুট্টোর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কচ্ছ বিরোধের অব্যাহতির পরেই ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ও লাদাকের যোগাযোগ পথের ওপর কারগিল ঘাঁটি থেকে ভারতীয় সৈন্যের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে।

১৭ দিন ব্যাপী দ্বিতীয় পাক–ভারত যুদ্ধের সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের কারগিলের দুটি ঘাঁটি দখল করে নেয়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসিগানের আমন্ত্রণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাসখন্দে মিলিত হয়ে "তাসখন্দ চুক্তি" স্বাক্ষর করে ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি। এ চুক্তি অনুসারে উভয় রাষ্ট্র ১৯৬৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী আগের নির্ধারিত সীমানায় ফিরে যাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ভারত অধিকৃত কারগিলের ঘাঁটি দুটি ফেরত পায়।

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাক-ভারত তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পর্যুদস্ত হয় নি, পশ্চিম সীমান্তেও পর্যুদস্ত হয়। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট জানান পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারত কখনো স্বীকার করে না এবং তিনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করার চেষ্টা চালান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুঁশিয়ার করে দেয় যে, ভারত যদি কাশ্মীরকে মুক্ত করতে চায় তবে মার্কিন নৌবাহিনী ভারতের ওপর পাল্টা আঘাত হানবে। কারণ, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকলে দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ক্ষমতা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগানের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। ১৯৯০–এর দশকে কাশ্মীর পরিস্থিতি সহিংসতায় রূপ নেয়। এ সময় কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামীরা সশস্ত্র আন্দোলন বেগবান করলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যাপক দমন নীতি গ্রহণ করে। এতে করে সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যায় এবং ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

১৯৭২ সালে পুরীতে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি, বিবাদ দূর করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৯৭২ সালেই স্বাক্ষরিত হয় "সিমলা চুক্তি"। ভারতের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের পক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তিতে বলা হয়েছিল "ভারত ও পাকিস্তান সরকার সংঘর্ষের ঘটনা, যা উভয় দেশের মধ্যে এতকালের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, তার অবসান করে, সদিচ্ছা, সহযোগিতা, সম্পর্কের উন্নয়ন এবং স্থায়ী শান্তিপূর্ণ দ্বি-পাক্ষিক আপোস আলোচনার পদ্ধতিতে বা উভয়দেশ ঐকমত্য হলে অন্য কোনও শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের মতানৈক্যের অবসান করবে"। চুক্তি স্বাক্ষরের দু'যুগ অতিবাহিত হলেও, দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততার অবসান আজও ঘটে নি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর দীর্ঘ ২০ বছর পর আবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মুখোমুখি হয় ১৯৯৯ সালে উভয় দেশ কারগিল সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র মোতায়েন করে। ১৯৯৯ সালে কারগিল সীমান্তে পাকিস্তান সৈন্য সমাবেশ ও ভারতীয় সৈন্যদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ বেধে যায়। এতে দুই দেশের অনেক সৈন্য মারা যায় এবং বহু হতাহত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সীমান্তে পাকিস্তানি সৈন্য সরিয়ে নিতে ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করলে পাকিস্তান সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে সে যাত্রায় ভারত-পাকিস্তান ব্যাপক যুদ্ধের ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।

১০.৫ বিরোধ মেটাতে আন্তর্জাতিক চেষ্টা (International Steps for Conflict Resolution)

কাজাকিস্তানের রাজধানী আলিমাটিতে অনুষ্ঠিত এশীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের চেষ্টা করেছিলেন। এর আগেও একবার রাশিয়ার (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি তাঁর আগের বক্তব্য থেকে একচুলও সরে আসেন নি। পাকিস্তান যতদিন না সন্ত্রাসবাদীদের মদদ দেওয়া বন্ধ করবে, ততদিন ভারত কোনো আলোচনা বৈঠকে বসবে না।

আলমাটিতে ভারত পাকিস্তানের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দেয়। বাজপেয়ি তাঁর প্রস্তাবে সীমান্তে যৌথ টহলদারির কথা বলেছে। ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যৌথভাবে সীমান্তপারের সন্ত্রাস অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে কিনা তদন্ত করে দেখার প্রস্তাব করে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ টহলদারির ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনও দেশের উপস্থিতির কথা বলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাও এ প্রসঙ্গে টানেন। কিন্তু ভারত তৃতীয়পক্ষের নাক গলানোর বিরোধিতা করে। তবে আলমাটি সম্মেলনের পর এ উপমহাদেশে পরমাণু অথবা অ-পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে।

তৎকালীন মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড আর্মিটেজকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশে তার দেশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার না হলেও নৌ যুদ্ধ জাহাজ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আগ্রা থেকে আলামাটি এক বছরের বারদঠাসা পথ পরিক্রমায় ভারত কূটনৈতিক যুদ্ধে পাকিস্তানকে বার বার হারিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অন্তত সেই রকমই দাবি করছেন। আগ্রা সম্মেলনে মোশাররফ সন্ত্রাসবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে 'সার্টিফিকেট' দিয়েছিলেন। এখন সেই তিনিই আবার বলছেন, জঙ্গি অনুপ্রবেশে স্থায়ী ব্যবস্থা নেবেন। এদিকে লাগাতার ভারত বিরোধিতা করেও মোশাররফ দেশের মাটিতে একঘরে হয়ে পড়েছেন। ১৫ দলের অ্যালায়েন্স ফর রেস্টোরেশন ফর ডেমোক্রেসি সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনও আলোচনাতেই আসতে চাইছে না। বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরিফকে নির্বাসনে পাঠিয়ে মোশাররফ ভেবেছিলেন দেশের রাজনীতিতে উত্থানের রাস্তা পাকা করলেন। কিন্তু আফগান যুদ্ধের পর সে সুখ স্বপ্নও বিলীন হয়ে গেছে।

মনে রাখার Technique & Tips

- ১৯৫৭ সালে ভারত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত না মেনে সংবিধানের ১নং ধারা অনুসারে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং সেনা মোতায়েন করে।
- ১৯৫২ সালে জাতিসংঘে পুনরায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে আলোচনা করে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদান করে।
- ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- ১৯৬৫ সালে (৬-২৩ সেপ্টেম্বর) পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধ ১৭ দিন স্থায়ী হয়।
- ১৯৬৬ সালে ১০ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয় (লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও আইয়ুব খানের দ্বারা)।
- ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরে পাকিস্তান আবার আক্রমণ করলে আবার শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ।
- ১৯৭২ সালে জুলাই মাসে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয়।
- ১৯৯০ সালে ১৯ জানুয়ারি রাজ্যটিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।
- ১৯৯৬ সালে ৯ অক্টোবর ফারুক আব্দুল্লাহ জম্মু ও কাশ্মীরের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

১০.৬ ব্রিটিশ সমীক্ষা রিপোর্ট (British Survey Report)

সম্প্রতি একটি ব্রিটিশ সমীক্ষা রিপোর্ট হাতের কাছে পেয়ে যাওয়ায় ভারতের কূটনৈতিক দিকে পাকিস্তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে বেশ সুবিধা হয়ে গিয়েছে। লন্ডনের মার্কে রিসার্চ সংস্থা 'মোরি' কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে সমীক্ষা পেশ করেছে তাতে কাশ্মীর রাজ্যের মানুষ ভারতের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছে। সীমান্তপারের সন্ত্রাসকে কড়া ভাষায় ধমক দিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষ বলেছে, এটা চিরদিনের জন্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ৬৫ শতাংশ মানুষ মনে করে, তাদের দাবি ও চাহিদার পথে সীমান্ত পারের সন্ত্রাস প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মহলে সুযোগ পেলেই কাশ্মীরিদের 'ভারত বিরোধিতার' জিগির তুলে বাজার গরম করতে চায়। কিন্তু মোরির সমীক্ষা রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। তারা জানিয়েছে, ৬১ শতাংশ কাশ্মীরি মনে করে, ভারতের সঙ্গে থাকলে তাদের লাভই হবে। মাত্র ৬ শতাংশ মানুষই মনে করে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসবে। অবাধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সবচেয়ে জরুরি।

তবে ৫৫ শতাংশ কাশ্মীরি জনগণ মনে করেন, রাজ্যবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় উপহার হবে স্বশাসন।

নির্দিষ্টভাবে শান্তির লক্ষ্যে স্বশাসন সব থেকে জরুরি। যুদ্ধ কাশ্মীরি জনগণের কাছে একদমই না পছন্দ। ৬৩ শতাংশ মানুষ এমনই কথা বলেছে।

১০.৭ কাশ্মীরে শান্তি আনয়নের পন্থাসমূহ (Ways to Bring Peace in Kashmir)

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীর এবং ভারত অধিকৃত জম্মু কাশ্মীর উভয় অংশে গণভোটের ব্যবস্থা করা। গণভোটের রায় অনুযায়ী কাশ্মীরের জনগণকে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে দেওয়া হবে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পন্থায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান ও ভারতকে চাপ প্রয়োগে এ প্রস্তাব মানতে রাজি করাতে হবে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় সরকার কাশ্মীরে শান্তি আনার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলো হলো :

১. স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কাশ্মীরিদের নতুন আশার আলো দেখাতে পারে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত, তার কতটা ভারত সরকার ফিরিয়ে দেবে সেটাই দেখার বিষয়। স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসনের আর্জি জানিয়েছেন ভারতের বহু বুদ্ধিজীবী। কিন্তু এ স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসনের বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি। তারা চায় কাশ্মীর ভারতের অন্যসব অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা পাক। কাশ্মীর এখনও সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বলে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে। বিজেপি এই 'বিশেষ ক্ষমতা' ভোগ করারও বিরোধী। তারা কাশ্মীর ভাগ করার বিরোধী। হরিসিং এর গোটা কাশ্মীর রাজ্যটাকেই ভারতের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন তারা।

২. প্রতিটি সম্প্রদায়ের মতামতকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই শান্তি ফিরে আসবে। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী (বর্তমান প্রেসিডেন্ট) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কাশ্মীরের বিপথগামী ও উগ্রপন্থিরা যদি ভারতের নাগরিক হয়, তবে তাদের সঙ্গেও ভারত সরকার কথা বলবে।

৩. কাশ্মীর সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ হয়ে থাকে, দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতেই হওয়া প্রয়োজন। আর সে আলোচনার ভিত্তি হবে সিমলা চুক্তি। ভারত নিজে কাশ্মীর প্রশ্নের সমাধানে আন্তর্জাতিক মীমাংসায় আগ্রহী নয়। ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তান যে স্তরে যেখানে আলোচনা চায় ভারত তাতে রাজি।

৪. কাশ্মীর উপত্যকায় শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। স্বাধীনতার ৬৬ বছর (১৯৭৪-২০১৩) পরও আজ উপত্যকায় কোনো শিল্প পরিকাঠামো গড়ে ওঠে নি। রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ভারত সরকার ১৫০০ কোটি টাকার এক নতুন তহবিল গড়ে তুলেছেন। যা সেই রাজ্যের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড।

৫. চারাই শরিফের ঘটনায় স্থানীয় মানুষের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তাকে উপশম করা প্রয়োজন।

৬. কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

৭. শান্তিপূর্ণ ও সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজয়ী জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা প্রদান। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দান।

কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে কাশ্মীর বার অ্যাসোসিয়েশন এক অভিনব পরিকল্পনা নিয়েছে। তাদের এ প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য হলো ভারতের চিন্তাবিদদের কাশ্মীরের এবং কাশ্মীরিদের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের দাবিগুলো সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের দিয়েই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য দিল্লি সরকারকে অনুরোধ জানানো। ভারতে বিশিষ্ট আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও মানবাধিকার সংগঠনের কাছে কাশ্মীর সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে তারা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বার অ্যাসোসিয়েশন মনে করে দিল্লি সরকার কাশ্মীর সংক্রান্ত তথ্য বিকৃত করে ভারতের জনগণের মনে কাশ্মীরিদের সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে।

" জম্মু ও কাশ্মীরের কারগিল ও দ্রাস সেক্টরে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাবাহিনীর ব্যাপক গোলা বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে '৯৯-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কারগিল ও দ্রাস হচ্ছে কাশ্মীরে পাকিস্তান ও ভারতের নিয়ন্ত্রণ রেখার নিকটবর্তী দুটি শহর, যার ওপর দিয়ে চলে গেছে শ্রীনগর ও লেহর সংযোগকারী ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ন্যাশনাল হাইওয়ে। জাতিসংঘের মহাসচিব ২৫ মে '৯৯ এ সংঘর্ষ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মহাসচিব উভয় পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর

সমস্যার সমাধান করতে বলেছেন। ২৭ মে ১৯৯৯ কমনওয়েলথ মহাসচিবও একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলোচনার আহবান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফও যথারীতি আলোচনায় জাতিসংঘকে মধ্যস্থতা করার কথা বলেছেন।"

১০.৮ কাশ্মীর সমস্যার পেছনের কারণগুলো (Reasons Behind Kashmir Crisis)

১. ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত-পাকিস্তান চিরশত্রুতা।
২. কাশ্মীর মুসলিম প্রধান রাজ্য হিসেবে হিন্দু প্রধান ভারতের অধীনে থাকতে অনীহা ।
৩. কাশ্মীরে তৎকালীন মহারাজা হরিসিং মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যের প্রধান হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি বিন্দুমাত্র সৌহার্দ্য ছিল না কিন্তু এর বিপরীত ছিল পাকিস্তানের সাথে কাশ্মিরের জনগণের ।
৪. কাশ্মিরের জনগণকে ভারতবিরোধী মনোভাব তৈরীতে প্রভাবিত করতে পাকিস্তানের প্রাণপণ চেষ্টা।
৫. কাশ্মিরের জনগণকে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, অর্থসহ সকল ধরনের সমর্থন দান।
৬. কাশ্মিরে ভারত সরকারের দমন পীড়ন নীতি।
৭. কাশ্মিরের জনগণের মতামতকে ভারত সরকার যথাযথ মূল্যায়ন না করা ।
৮. ভারত-পাকিস্তানকে যুদ্ধের মুখোমুখী রাখতে স্বাধীনতার সময় ভারত বিভক্তিতে ব্রিটিশদের সুদূরপ্রসারী কূটকৌশল।
৯. পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ নীতি ইত্যাদি। কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থান

১০.৯ কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থান

নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ক্ষমতায় আসার সাথেই সাথেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক যেই আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। বন্ধুত্বের সব আবহ কেটে যায় আগস্টে, ২০১৪ সালে । ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার হুরিয়াতের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক করার পর ভারত হঠাৎ করেই দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনা বাতিল করে। ভারতের তড়িঘড়ি করে এ আলোচনা বাতিল নওয়াজ শরীফ পাকিস্তানে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। ফলে পাকিস্তানের সামগ্রিক বলয়ে ভারতের প্রতি ঘৃণা আরো বেড়ে যায়।

তারপরও ভারত এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে জাতিসংঘ অধিবেশনের সময় নরেন্দ্র মোদী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে মিলিত হবেন না। আর এখন দুই দেশ কাশ্মীরে একে অপরের বিরুদ্ধে কামান দাগাচ্ছে।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে কাশ্মির ইস্যুতে ভারত খুবই আক্রমণাত্মক। ২০১৪ এর শেষে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকা কাশ্মির (ভারত-অংশ) ঘুরে এসে নরেন্দ্র মোদী মুসলিম কাশ্মিরি নেতা ও দেলগুলোর বিরুদ্ধে হিন্দু অনুভূতি উসকে দিয়েছেন। এমনকি তিনি সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করার কথা বলেছেন যেখানে বলা হয়েছে, কাশ্মির ভারতে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করবে।

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ভারত পাকিস্তান প্রশ্নে দুটি বিপরীত ধর্মী সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত কট্টর হিন্দু বাদী হওয়ায় মোদী পাকিস্তানের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেবেন দ্বিতীয়ত (শান্তিকামীদের মতে) মোদী একজন ব্যবসাবান্ধব ব্যক্তি হওয়ায় পূর্বসূরী বাজপেয়ি ও আদভানির মতো তার দেশ প্রেমিক ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করবেন।

পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল হওয়ায় নওয়াজ শরীফ যথেষ্ট দুঃখ পান। কেননা ২০১৩ সালে শপথ নেওয়ার পরই ভারতের প্রতি নিঃশর্ত বন্ধুতার হাত বাড়ান নওয়াজ। যে সময়ের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তা প্রত্যাক্ষাত হয়। এরপর ভারত-পাকিস্তান মুক্তি বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার কথা থাকলে এ বছর ২০১৪ ভারতের নির্বাচনের কারনে স্থগিত হয়।

অপ্যাদদৃস্টিতে মনে হচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনা শিগগিরই প্রশমত হচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদী ভালো কর্মে থাকলেও পাক সাময়িক বলয়ে নওয়াজ শরীফের গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোটায় এসে ঠেকেছে।

১০.১০ কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ (Possible Ways to Solve Kashmir Problems)

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ের প্রাচীন কাশ্মীর সমস্যা দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে লম্বা প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রনীতিবিদরা মনে করেন বিশ্ব রাজনীতির পালাবদলের সময় দুটি পক্ষকেই "ত্যাগ" স্বীকারের মাধ্যমে এগুতে হবে। দুটি দেশের মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র খোঁজ করতে হবে। এ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয়। সমাধান সূত্রে পৌঁছানোর আগে জনমত সমীক্ষারও প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠনে হাত দিতে হবে। এর ফলে যেমন পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়বে, অশান্তিও এড়ানো সম্ভব হবে। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে :

প্রথমত : অতীতের কাসুন্দি না ঘেটে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। ভারত যেমন কাশ্মীরকে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে তেমনই পাকিস্তান কাশ্মীরের জঙ্গি তৎপরতাকে কাশ্মীরিদের স্বাধীনতার আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ প্রক্রিয়া বেশিদিন চলতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : আন্তর্জাতিক মহল মনে করছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোবিশিষ্ট ইউনিয়ন গঠন করা যেতে পারে। ঐ ইউনিয়নের মধ্যে কাশ্মীরকে দেওয়া হবে ভারত-পাকিস্তানের সমতুল্য স্বীকৃতি। অর্থাৎ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল বলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং ভারতের কাশ্মীরকে জুড়ে দিয়ে ভারত পাকিস্তান ইউনিয়নের মধ্যে একটি অভিন্ন কাশ্মীর গঠন করা।

তৃতীয়ত : এই ব্যপক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই বিদেশনীতি, অর্থ ও নিরাপত্তা তিনটি বিষয় থাকবে। অপরদিকে পরোক্ষ বিষয়ের তালিকাভুক্ত হবে ধর্ম ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ভিত্তিক বিচার।

চতুর্থত : জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাক। জম্মু হিন্দু প্রধান, লাদাক বৌদ্ধ প্রধান এবং কাশ্মীর মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। জম্মু ও লাদাকের মানুষের অবিচ্ছেদ্যভাবে ভারতে থাকার পক্ষে মত দিয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে এ অঞ্চলের মানুষেরা অখণ্ড ভারতের কাছে দায়বদ্ধ। কাশ্মীর রাজনীতির মধ্যমণি হিসাবে পরিচিত হুরিয়াত কনফারেন্স সম্প্রতি কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার টেবিল বসে একটি রাজনৈতিক সমাধান চাইছে। এতদিন পর্যন্ত তারা পাকিস্তানের উপস্থিতিতে আলোচনায় আগ্রহী ছিল তাদের মতের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত সরকার যদি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিবর্তন চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে হুরিয়াত কনফারেন্সের সঙ্গে সমঝোতায় আসে তাহলে এ দীর্ঘ প্রলম্বিত সমস্যার সমাধান হবে।

পঞ্চমত : ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের শায়ত্তশাসনে রাজি। ভারত ও পাকিস্তান যদি অখণ্ড (পাক অধিকৃত কাশ্মীরসহ) কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনে রাজি হয় তাহলেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত : এক শ্রেণির রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিয়ে বলা যেতে পারে ব্যাপক অর্থে ভারত-পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হলে একটি চিরস্থায়ী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে তার জীবন্ত রূপ দিতে হবে।

সপ্তমত : দিল্লির পক্ষে কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয়। কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তান তার পুরানো অবস্থান থেকে ফিরে আসতে পারছে না। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের বিভাজন রেখাকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে ভারত মেনে নিতে রাজি। কিন্তু পাকিস্তান এ ব্যাপারে সম্মত হচ্ছে না। এ সমস্যা সমাধানে "ত্যাগের রাজনীতিকে" প্রশ্রয় দিতে হবে।

অষ্টমত : AL ইউনিয়নে বহু ধর্ম জাতীয় ভাষায় সমাবেশ থাকবে বলে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে ভিত্তি করে পথ চলতে হবে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

নবমত : কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশকেই "অস্ত্রের কূটনীতি" পরিত্যাগ করতে হবে। দুটি দেশের সমস্যাগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে নিয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী তার বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হবে। ২০০৪ এর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ইসলামাবাদ সার্ক সম্মেলনে বিবদমান দুটি দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলোচনার টেবিলেই সমস্যার সমাধান হবে। দীর্ঘ আড়াই বছর পর অনুষ্ঠিত বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে কাশ্মীর বিষয়ে বরফ গলার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

১৯৪৭ সাল থেকেই কাশ্মীর ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্বের প্রধান অনুঘটক। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তিতে দুই দেশই কাশ্মীরের বর্তমান সীমানা মেনে নিলেও পরস্পরের প্রতি বৈরিতা দূর করতে পারে নি। জাতিসংঘসহ, মার্কিন যুক্তরাজ্য, রাশিয়া এবং পাশ্চাত্য বিশ্বও বহুবার ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব নিরসনে হস্তক্ষেপ করেছে। পাকিস্তানের ভারত বিরোধী নীতি, সন্ত্রাসবাদ লালনানীতি এবং ভারতের আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার বাসনা ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বকে দীর্ঘায়িত করেছে। আর এর প্রধান স্বীকার কাশ্মীরের জনগণ। কাশ্মীরের ভাগ্য কাশ্মীরের জনগণের হাতে ছেড়ে দিলে এ সংকট সমাধান খুব দ্রুত হবে বলেই সবার বিশ্বাস।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. বৃটিশদের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান কবে স্বাধীনতা লাভ করে?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে।

২. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মোট কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?
উত্তর: ৪টি

৩. ভারত উপ মহাদেশের দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে কোনটি সর্ববৃহৎ?
উত্তর: কাশ্মীর

৪. কাশ্মীর কার নাম থেকে উদ্ভুত?
উত্তর: "কাশি"র

৫. কাশ্মীর জনসংখ্যার মধ্যে কত লোক মুসলমান?
উত্তর: ৬০%

৬. ইসলাম জাতীয়তাবাদী দলগুলো করো করেছিল?
উত্তর: কাশ্মীর

৭. কাশ্মীরে চীনের অধিকৃত অঞ্চলের নাম কি?
উত্তর: আফসাইন চীন।

৮. কত সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়।
উত্তর: ১৯৪৯ সালের ১লা জানুীর।

০৯. 'অমখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৬৬ সালে ১০ জানুয়ারিৎ

১০. কত সালে 'সিমলা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯৭২

১১. কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে?
উত্তর: জাতীয় ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থান।
খ. কাশ্মীরের সমস্যা

২. ক. পৃথিবীর ভূস্বর্গ বলা হয় কাকে এবং কেন?
খ. জম্মু ও কাশ্মীর পরিচিতি দাও।

৩ ক. সিয়াচেন হিমবাহ কোথায়?

http://thejobstudy.com Go to Contents

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. কাশ্মীর সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনাপূর্বক সংকট সমাধানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন ?

২. কাশ্মীর সমস্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

৩. কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুপারিশ কী হতে পারে? আলোচনা করুন।

৪. "কাশ্মীর সমস্যা যে কোনো মুহূর্তে পাক-ভারত যুদ্ধের অবতারণা করতে পারে"-আলোচনা করুন।

৫. সম্প্রতি কাশ্মীর সীমান্তে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে গুলি বিনিময়ে উদ্ভব পরিস্থিতি আলোচনা করুন?

৬. ভারতীয় সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আলোচনা করুন?

৭. কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

অধ্যায় ১১

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া

Middle East & Middle Asia in International Politics

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১১.১ ভূমিকা
১১..২ মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান
১১.৩ মধ্য এশিয়ার অবস্থান
১১.৪ মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল
১১.৫ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার গুরুত্বসমূহ
১১.৫.১ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব
১১.৫ (২) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্য এশিয়া যে সব কারণে গুরুত্বপূর্ণ
১১.৬ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার পটভূমি
১১.৭ সমস্যার বর্তমান প্রেক্ষাপট
১১.৭.১ ফিলিস্তিন প্রশ্নে বর্তমান মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি
১১.৭.২ জন কেরির শান্তি আলোচনা প্রস্তাব
১১.৮ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সমূহ
১১.৯ মধ্য এশিয়ার সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের ভূমিকা

১১.১ ভূমিকা (Introduction)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া ইস্যু বিগত শতাব্দী থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে যখন ফিলিস্তিনিদের চিরতরে নির্মূল করার মানসে তাদের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় খুঁজছিল। তারও পূর্ব থেকে বর্তমান বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিকভাবে মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব পরাশক্তিগুলোর মধ্যে দেখা যায়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে মধ্যপ্রাচ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে বলকান অঞ্চল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পূর্ব ইউরোপ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমনিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ৯০ এর দশকের প্রথম থেকে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে মধ্য এশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উভয় স্থানই গুরুত্বের দিক দিয়ে বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়।

২০০৩ সালের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাক সমরাভিযান, ২০১০ সালে সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ২০১১ সালে লিবিয়ায় মুহাম্মদ গাদ্দাফি উৎখাতে পাশ্চাত্যের সামরিক সাহায্য, মিসরের গণআন্দোলনে হোসনি মোবারককে উৎখাতে গণআন্দোলনে সহায়তা এবং মিসরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ড. মুরসি সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস। ২০১১ সাল থেকে বলে আসা সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে পাশ্চাত্যের সকল ধরনের সহযোগিতা। মধ্যপ্রাচ্যে

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য দেশগুলোর সহযোগিতার আশ্বাস সবকিছুই মধ্যপ্রাচ্যে। ২০১৩ সালের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ করে রেখেছে।

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ছোট ও ভঙ্গুর রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যখন ভূ-অবস্থানগত কারণে ছোট রাষ্ট্রগুলো সমস্যায় পরিণত হয়, তখন এ সুযোগে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো তাদের ভূ-রাজনীতির প্রভাব ঘটিয়ে থাকে। ভূ-রাজনীতির উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখা যায় বর্তমানে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং এশিয়ার দেশগুলোতে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমেরিকা ইসরাইলকে তাদের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এশিয়ায় USA উত্তর কোরিয়াকে নিয়ন্ত্রণের নামে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আরও কিছু দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পুরো এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্ব হয়ে ওঠার পেছনে যে দুটি বিষয় সবচাইতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা হলো :

ক. ভূ-রাজনৈতিক / ভৌগোলিক অবস্থান ।
খ. খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার ঘটনাবলি বিশ্বরাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পরাশক্তির রাজনৈতিক কৌশলের স্বীকার হয়ে প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুটি এখন সারা বিশ্বে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে বিশ্ব রাজনীতিবিদদের ধারণা মধ্য এশিয়া আগামী দশকে মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।



১১.২ মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান (Location of Middle East)

মধ্যপ্রাচ্য বলতে ভূ-মধ্যসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর ও মধ্য এশিয়ার CIS ভুক্ত কয়েকটি দেশ দ্বারা বেষ্টিত এলাকা। মূলত এটি এশিয়ার পূর্ব সীমান্তবর্তী দেশসমূহ। মধ্য প্রাচ্যের অবস্থান থেকে দেখা যায় যে ১৫টির মতো দেশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। সকল রাষ্ট্রই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাহরাইন, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া,

তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন। ইসরাইল এবং সাইপ্রাস বাদে আর সব দেশই মুসলিম। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলমান। তবে খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকজনও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থল। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নৌ-পথ এই এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত।



১১.৩ মধ্য এশিয়ার অবস্থান (Location of Middle Asia)

মধ্য এশিয়া এশিয়ার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এর নাম হয়েছে মধ্য এশিয়া। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের অংশ হিসেবে এতদঞ্চলের পাঁচটি দেশ, যেমন-কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান এবং একই সাথে কাস্পিয়ান সাগরের অপর পাড়ে আজারবাইজান স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই ৬টি দেশ নিয়েই মধ্য এশিয়া গঠিত। মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, উত্তরে রাশিয়া, পশ্চিমে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশ এবং পূর্বে চীন অবস্থিত। মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপ, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ওপর দিয়ে আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মধ্য এশিয়ার ৬টি দেশই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তবে কিছু কিছু খ্রিস্টান জনসংখ্যা রয়েছে।

১১.৪ মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল (Similarities Between Middle East and Middle Asia)

ক. উভয় অঞ্চলই বিশ্ব মানচিত্রের মাঝখানে অবস্থান করায় ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে কৌশলগত এলাকা হিসেবে পরিচিত।

খ. উভয় অঞ্চলেই খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে।

গ. মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

১১.৫ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার গুরুত্বসমূহ

১১.৫ (১) মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব : বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব অপরিসীম একথা এখন প্রমাণিত। বিগত দুই দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে টালমাটাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এই ঘটনাসমূহ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে

মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়ামের ব্যাপক সম্ভাবনা যখন বৃহৎ শক্তিগুলোর দৃষ্টি কাড়ল। তখন থেকেই এ অঞ্চলে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা চরমভাবে অনুভব করল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বসমূহ (Importance of Middle East in International Politics)

১. **ভৌগোলিক অবস্থান :** ভূ-কৌশলগত দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। ফলে যে দেশ বা শক্তি এ অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করবে তারা আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় এর অবস্থান থেকে অনেকটা লাভবান হবে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশের মিলনস্থানে অবস্থিত। কোন বৃহৎশক্তি যদি এ এলাকায় তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে তাহলে এ তিনটি মহাদেশেই কমবেশি তার প্রভাবাধীন থাকবে। এছাড়াও ভৌগোলিকগত কারণে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও জলপথ যাওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাশিয়ার বিশাল এলাকা, ইউরোপের বাকি অংশ এবং রাশিয়া, চীন ও ভারতের ওপর নজরদারী করা খুব সহজ এ এলাকা থেকে।

২. **রাজনৈতিক ঘটনাবলি :** বলা হয় মধ্যপ্রাচ্য হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিটি ইস্যুতে কোনো না কোনোভাবে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ, জাতি বা গোষ্ঠী ও গ্রুপের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায়। এমনকি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনলে দেখা যাবে যে, এর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। ৯০ এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ইরাকের ভুলের সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে তার একক শক্তিমত্তার পরীক্ষাটাও চালাল। এ এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব এককভাবে স্থাপন করল। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল ফিলিস্তিন সংকট দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব রাজনীতির একটি অমীমাংসিত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রয়েছে। ২০০১ সালের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আফগানিস্তানে যে মার্কিন সমর্থনগোষ্ঠীর যুদ্ধ তাও ছিল মধ্যপ্রাচ্যে পরাশক্তির রাজনৈতিক কৌশলের বহিঃপ্রকাশ। সর্বশেষ ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন

মনে রাখার Technique & Tips

মধ্যপ্রাচ্য

ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও কয়েকটি CIS ভুক্ত দেশ দ্বারা বেষ্টিত আরব এলাকা। এটি মূলত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থল। মোট দেশ ১৫টি, সেগুলো হলো-বাহরাইন, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।

মধ্য এশিয়া

নব্বই-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের ফলে এ অঞ্চলে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ৬টি দেশ যেমন-কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং আজারবাইজান। মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে মধ্যপ্রাচ্য আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, উত্তরে রাশিয়া, পশ্চিমে ইউরোপ এবং পূর্বে চীন অবস্থিত।

মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার বৈশিষ্ট্য

- এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগ স্থলে হওয়ায় ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে কৌশলগত এলাকা হিসেবে পরিচিত।
- খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য।
- মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ

মধ্যপ্রাচ্য	মধ্য এশিয়া
১. ভৌগোলিক অবস্থান	১. ভৌগোলিক অবস্থান
২. রাজনৈতিক ঘটনাবলি	২. খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য
৩. খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য	৩. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা	৪. অর্থনৈতিক কারণ
৫. ধর্মীয় গুরুত্ব	৫. ধর্মীয় কারণ
৬. অর্থপ্রেতিক কার্যাবলি	৬. পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান এর ওপর প্রভাব বিস্তারের কারণে
৭. অস্ত্র ব্যবসায় সম্ভাবনাময় এলাকা	৭. মার্কিন স্বার্থ।
৮. ফিলিস্তিন সংকট	
৯. মার্কিন স্বার্থ।	

যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে ইরাকে যে মার্কিন আগ্রাসন পরিচালিত হয়েছে তা থেকেই অনুমান করা যায় যে বিশ্ব রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ পরাশক্তিসমূহের জন্য কত প্রয়োজন।

৩. **তেল সম্পদের প্রাচুর্য :** বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর বিশ্ব অর্থনীতি নির্ভরশীল। গুপেকের মতে বিশ্বের মোট মজুদ তেলের দুই তৃতীয়াংশ মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, বাহরাইন প্রভৃতি দেশে যে পরিমাণ তেল সঞ্চিত আছে তাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জ্বালানি চাহিদার একমাত্র অবলম্বন। কেননা তেলের বিকল্প জ্বালানি কার্যকর অর্থে এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তাছাড়া ব্রিটেনের নর্থরিজ্ঞ তেলকূপগুলোর উত্তোলন এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, রাশিয়া ও নরওয়ের মজুদ ভাটার পথে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল সরবরাহ ও ১৯৭০ সালের পর থেকেই নিম্নগামী। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি পরাশক্তির নজরই মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। কেননা মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো সুবিধামতো এ অঞ্চলের তেল সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলো তাদের শিল্পনির্ভর অর্থনীতি হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য তেলের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ দরকার। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে বর্তমানে চীন, ভারত, জার্মানের মতো দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রসরমান দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে উৎপাদনের প্রধান শক্তি জ্বালানি তেলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে করে এ সকল দেশ মার্কিন বাজারকে প্রভাবিত করতে না পারে আর এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে একক আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট।

৪. **যোগাযোগের গুরুত্ব :** মধ্যপ্রাচ্য ভৌগোলিকভাবে বিশ্ব মানচিত্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত হওয়ায় এখান থেকে বিশ্বের যে কোনো এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিমান ও নৌ-পথে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এর সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। সুয়েজ খাল খননের ফলে জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচলে মধ্যপ্রাচ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ সুয়েজ খাল এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপ ও উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল দূরত্ব ও খরচ হ্রাস করেছে। এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি, বাব-আল-মানদেব প্রণালি, পারস্য উপসাগর প্রভৃতি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য প্রসিদ্ধ।

৫. **আদর্শগত বা ধর্মীয় গুরুত্ব :** আদর্শগত তথা ধর্মীয় দিক থেকেও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম পৃথিবীর সকল মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত। মক্কা ও মদিনায় যথাক্রমে পবিত্র কাবা শরিফ ও রাসূল (স:)-এর জন্মস্থান এবং রওজা শরিফ অবস্থিত হওয়ায় মুসলমানদের কাছে এ স্থানগুলোর গুরুত্ব অসীম। এ সকল স্থানের ওপর কোনো ধরনের আঘাত হলে গোটা বিশ্ব সম্প্রদায়কে কোনো না কোনোভাবে নাড়া দেবে। প্যালেস্টাইনে হযরত সুলায়মান (আ:) মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ করেন। এটা খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক ঈসা (আ:) এর জন্মস্থান এখানে ইহুদিদের নবী হযরত মুসা ফেরাউনের হাত থেকে পালিয়ে বনি ইসরাইলীদের নিয়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চল তিন ধর্মের লোকদের নিকট পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃত। অথচ শান্তি ও পবিত্রতার এ মহান ভূমি যুগে যুগে রঞ্জিত হয়েছে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে। পৃথিবীতে একমাত্র মধ্যপ্রাচ্যই যেখানে ধর্মীয় বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক রাজনীতি হস্তক্ষেপ করে থাকে। ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এখানে রাজনীতিতে রূপ নিয়েছে। সব ধর্মাবলম্বীরাই চায় এখানে তাদের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হোক।

৬. **অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত সুয়েজ খাল বিশ্ব বাণিজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সুয়েজ খালের কারণে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার দূরত্ব কমে গেছে প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ। ফলে জাহাজ চলাচলে খরচ এবং সময় দুইই বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এতে করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লাভবান হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের বাজার বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কারণ তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তেল উৎপাদন ও সরবরাহ পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে স্থিতিশীল করতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে আসছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যদি মনে করে তারা তাদের তেলের উৎপাদন এবং সরবরাহ কমিয়ে দিবে তাহলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে বাধ্য। অপরদিকে সুয়েজ খালের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌ যাতায়াত পথ বন্ধ না হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।

৭. **অস্ত্র ব্যবসার সম্ভাবনাময় এলাকা :** মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান। এখানকার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পেছনে যেমন আরবরা নিজেদের দায়ী করেন, অপরদিকে শক্তিধর রাষ্ট্রের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও অনেকাংশে দায়ী। এ অঞ্চলে যেমন রয়েছে দেশসমূহের মধ্যে সীমান্ত ও আঞ্চলিক সংঘাত তেমনি রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী, সংগঠন। তারা মূল ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আবার ধর্মীয় উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তও আছে। এসকল দল ও সংগঠনের মধ্যে অস্থিতিশীলতা এবং দেশগুলোর মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক বিরাজমান রাখতে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো অস্ত্র বিক্রির রাস্তা তৈরি করেছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আঞ্চলিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে দেখা যায় এটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার। এ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রেখে অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যেই গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বৃহৎ শক্তিগুলো এ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে কূটকৌশল চালাচ্ছে। এক দেশের সাথে আরেক দেশের দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে কিংবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্র তৈরি করছে। যা একদিকে মধ্যপ্রাচ্যকে দিন দিন সংঘাতময় এলাকা হিসেবে পরিচিত করে তুলছে অন্যদিকে অস্ত্র ব্যবসায়ী দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক মুনাফা লাভ করে ধনী হচ্ছে।



উপসাগরীয় তেল-কূটনীতির ক্ষেত্র

৮. **ফিলিস্তিন সংকট :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফিলিস্তিন সংকট তথা ইসরাইল-প্যালেস্টাইন শান্তি প্রক্রিয়া বিশেষ স্থান দখল করায় মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে। ফিলিস্তিন সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে অবদান রেখে আসছে। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরাইল আরব দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে আরব ও ইসরাইলিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া ফিলিস্তিনি ও ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ অবিরামভাবে

চলছে। আর এ সংকটের আবর্তে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলোও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন সমীকরণে অঙ্ক কষে প্রত্যেকেই নিজেদের সুবিধা মতো কখনো কোনো পক্ষকে সমর্থন দিচ্ছে কিংবা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সব সময়ই তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মেরুকরণেও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

৯. **মার্কিন স্বার্থ :** মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে বিশাল মার্কিন স্বার্থ। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতিশীলতার প্রবাহ বজায় রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের তেলের অবাধ প্রবাহ বজায় রাখা দরকার। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক ধর্মীয় ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখে অস্ত্র ব্যবসার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

১০. **ইসরাইলের অবস্থান :** বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে। ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের পাহারাদার হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ইহুদিদের বিরাট প্রভাব রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং ইসরাইলের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাশত্রু ইরান, সিরিয়াকে হুমকির মধ্যে রাখতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ বহন করে।

১১.৫ (২) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্য এশিয়া যে সব কারণে গুরুত্বপূর্ণ

১. **ভৌগোলিক অবস্থান :** ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মধ্য এশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইসরাইল যখন ফিলিস্তিনিদের চিরতরে নির্মূল করার মানসে তাদের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় খুঁজছিল তারও পূর্ব থেকে বিশ্ব ভূরাজনৈতিকভাবে মধ্য এশিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে বিরাজমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য এশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফন্দি আটতে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক সম্পর্কে বলা যায় যে, অঞ্চলটি আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ রাশিয়া ও জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম দেশ চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিরাজমান একক পরাশক্তিটির পর সবচেয়ে শক্তিশালী এ দুটো প্রবল প্রতিবেশীর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দাবার ছকে পরিণত হবার আশঙ্কা প্রবল। এছাড়াও বিশ্বের প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণোন্মুখ এলাকা মধ্যপ্রাচ্যের নৈকট্যও তার অবস্থাগত গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে উত্তর দিকে রাশিয়া, পূর্বদিকে চীন, দক্ষিণ দিকে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম দিকে ইউরোপের মতো ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক অঞ্চলসমূহের ওপর খবরদারি করা সহজতর।

মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের পরিচিতি

দেশের নাম	রাজধানী	আয়তন (বর্গমিল)	লোকসংখ্যা	ভাষা	স্বাধীনতা লাভ
কাজাখস্তান	আস্তানা	২৭,১৭,৩০০	১ কোটি ৬৪ লাখ	কাজাখ	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১
কিরগিজস্তান	বিশকেক	১,৯৮,৫০০	৫৪ লাখ	কিরগিজ	৩১ আগস্ট ১৯৯১
তাজিকিস্তান	দুশানবে	১,৪৩,১০০	৭১ লাখ	তাজিক	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
তুর্কমেনিস্তান	আসখাবাদ	৪,৮৮,১০০	৫২ লাখ	তুর্কমেন	২৭ অক্টোবর ১৯৯১
উজবেকিস্তান	তাসখন্দ	৪,৪৭,৪০০	২ কোটি ৮১ লাখ	উজবেক	১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
আজারবাইজান	বাকু	৮৬, ৬০০	৯৪ লাখ	আজারবাইজান	১৮ অক্টোবর ১৯৯১

http://thejobstudy.com Go to Contents

২. **খনিজ সম্পদ :** ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মধ্য এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদরাজি বিরাজমান থাকায় পরাশক্তির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অঞ্চলটির বিরাট দখল থাকায় পরাশক্তিসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ওপর এখন অনেক বেশি। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর যুগে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পর মধ্য এশীয় অঞ্চলটিতে বিপুল খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু ইত্যাদির সম্ভাবনা নিয়ে বিরাজমান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের লালসার শিকারে পরিণত হয়েছে। অনেক পণ্ডিতের মতে, এতদঞ্চলের তেল ও গ্যাস ভাণ্ডারের দখল নিয়ে বিশেষত অঞ্চলটি স্থলবেষ্টিত হবার কারণে খনিজ সম্পদের ওপর দখল ও পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে সেগুলো পরিবহন করে নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট এলাকায় পাচার করার সুবিধা থাকার কারণে মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব বেড়ে গেছে পরাশক্তির কাছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মধ্য প্রাচ্যের সম্পদ পাচার কারার জন্য নিরাপদ রুট হিসেবে আফগানিস্তানকে ব্যবহার করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অজুহাতে আফগানিস্তান দখল করে।

৩. **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে :** নিকট অতীতে অঞ্চলটি সোভিয়েত কমিউনিস্ট শক্তির অধীনে থাকায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত ছিল। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের অংশ হিসেবে এ অঞ্চলের দেশগুলো স্বাধীন, সার্বভৌম মুসলিম প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট শাসন দ্বারা পরিচালিত থাকার কারণে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলোতে কমিউনিস্ট শাসনের প্রভাবমুক্ত এবং গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অপরদিকে সদ্য স্বাধীন দেশগুলো মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছেও এ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া মধ্য এশিয়া থেকে রাশিয়ার পরমাণু ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত ইউক্রেন সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। অপরদিকে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী কাজাখস্তান বা অন্য কোনো রাষ্ট্র যাতে কোনো মারণাস্ত্র তৈরি করতে না পারে এবং সেগুলো যাতে মুসলিম বিশ্বের হাতে বা কোনো মার্কিনবিরোধী শক্তির হাতে না যেতে পারে সেটিও গণতন্ত্রকামী পরাশক্তির জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে রাজনৈতিকভাবে মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে আফগানিস্তানকে লোক দেখানো আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তার নামে তালেবানদের উৎখাত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক পরিসরে ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আবির্ভূত মধ্য এশীয় অঞ্চলে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে।

৪. **অর্থনৈতিক কারণ :** মধ্য এশিয়ার এ অঞ্চলটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন থাকার কারণে বিদেশি পণ্যের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। স্বাধীন হওয়ার ফলে এ অঞ্চলের দেশগুলো প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য সুসংবাদ বয়ে আনে। এ অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত বিশাল খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হলে তা বিশ্ব অর্থনীতির চাকাকে যে আরও গতিশীল করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই সাথে এ অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মধ্য এশিয়া অঞ্চলটি ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে ভূ-রাজনৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহের চেয়ে ভূ-অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা অধিক গুরুত্ব লাভ করে। এ অঞ্চলটি ভূখণ্ডবেষ্টিত হওয়ায় এখানে উৎপাদিত তেল, গ্যাস খুব সহজেই এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে সরবরাহ করা যাবে। পরিবহন ব্যবস্থার এ সুযোগ এ অঞ্চলের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৫. **ধর্মীয় কারণ :** মধ্য এশিয়ার দেশগুলো দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট শাসিত থাকার পর স্বাধীনতা লাভ করলে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম থাকার কারণে মুসলিম বিশ্বে দেশগুলোর গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইসলামের সম্প্রসারণ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের সন্নিকটে হওয়ার কারণে এখানে ইসলাম আরও দ্রুত সম্প্রসারণ করার জন্য আরব বিশ্ব প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে মধ্য এশিয়ার দ্রুত সম্প্রসারণশীল ইসলাম যেন তার আশেপাশের এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে

পড়তে না পারে এবং সেগুলো যেন রাশিয়া বা আমেরিকা কারো জন্য হুমকির কারণ না হতে পারে সেজন্য পরাশক্তিদ্বয় এ অঞ্চলে বিশেষে নজর রাখছে। এছাড়াও হান্টিংটনের 'সভ্যতাসমূহের মধ্যকার সংঘাত' থিসিসকে গুরুত্ব দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের চারপাশে অবস্থিত মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে যাতে সম্মিলিতভাবে ইসলামি শক্তির উত্থানকে রোধ করা যায় তাও নিশ্চিত করতে চাচ্ছে।

৬. **পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য :** মধ্য এশিয়ার অবস্থান এমন একটি জায়গায় যেখান থেকে খুব সহজে বিশ্বের স্বঘোষিত একমাত্র মুসলিম পরমাণু শক্তিধর দেশ পাকিস্তান, অঘোষিত পরমাণু শক্তিধর দেশ ইরান এবং ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে কৌশলগত অবস্থানে থাকা আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কারণ পরাশক্তিগুলো চায় না পাকিস্তান ও ইরান দেশ থেকে কোনো পরমাণু সংক্রান্ত তথ্য অন্য কোনো রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছাক।

৭. **মার্কিন স্বার্থ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা ভালোই জানে যে মধ্য এশিয়ার মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এবং বিশেষত তার জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ শক্তির অধিকারী দুটো দেশ চীন ও রাশিয়ার বাধার সম্মুখীন হবে। তাই সে আঁটঘাট বেঁধে নামার পরিকল্পনা হিসেবে মধ্য এশীয় রাষ্ট্র তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও কিরগিজিস্তানের সাথে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছে বলেও বিশ্লেষকগণ মনে করেন। এছাড়া মধ্য এশিয়ার তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহের সাথে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো জড়িত। মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর যাতে স্বার্থে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্যে যুক্তরাষ্ট্র এ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। অপরদিকে সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বলয় থেকে মুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তরাষ্ট্র এবং অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত কলহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে এ এলাকায় অস্ত্রের ব্যবসা সম্প্রসারণ করার কাজ হাতে নিয়েছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব যেমন বেড়েছে তেমনি এ অঞ্চলগুলোতে অস্থিরতাও বাড়ছে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে দুটি অঞ্চল একই রকম এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব একই কারণে বিস্তার লাভ করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য যেমন অঞ্চল দুটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বী হবার পথ খুলে দিয়েছে তেমনি একই কারণে অঞ্চল দুটিতে বিরাজমান পরাশক্তির আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। বিগত অর্ধ শতক ধরে মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব রাজনীতিতে একটি বিশাল গুরুত্ব বহন করে আসছে। মূলত খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেই অঞ্চল দুটি পরাশক্তির দৃষ্টির ছায়া হয়ে আছে। বিগত বছরে মধ্যপ্রাচ্য তাই পরাশক্তিদের রাজনৈতিক চক্রান্তের স্বীকার হয়ে অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। থেমে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তি ও নিরাপত্তার গতিধারা। এ অবস্থার শেষ আছে কিনা তা সময়ই বলে দিতে পারে। অপরদিকে মধ্য এশিয়ায় এখনো অস্থিতিশীলতার বীজ পূর্ণাঙ্গ রূপ না নিলেও বিশ্ব পণ্ডিতদের মতে আগামী দশকে মধ্য এশিয়াই হবে বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। এ অবস্থাকে উত্তরণের একমাত্র পথ এই অঞ্চলের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে যাবতীয় বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলা এবং পরাশক্তিসমূহ থেকে দূরে থাকা। যদি এ অঞ্চল দুটির রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে শান্তির ঐক্যে পৌঁছাতে পারে তাহলে আগামী দশকের বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া। তবে সময় বলে দিবে আগামী দিনের বাস্তবতা।

১১.৬ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার পটভূমি

মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্মের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. জে. বেলফোর মধ্যপ্রাচ্যে একটি ইহুদি আবাসভূমি গঠনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ জায়নিস্ট ফেডারেশনের সভাপতিকে একটি পত্র দেন। ইতিহাসে এটি বেলফোর ঘোষণা হিসেবে পরিচিত। এর পর পরই ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে ইহুদিরা দলে দলে এসে প্যালেস্টাইনে বসতি গড়তে শুরু করে। উল্লেখ্য, ১৯২২ সালে 'লীগ অব নেশনস'

ব্রিটেনকে প্যালেস্টাইনের ওপর ম্যান্ডেট প্রদান করেছিল। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন অধ্যুষিত আরব এলাকাকে বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর ১৯৪৮ সালের শুরুতে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সমাপ্তি ঘোষিত হলে ইসরাইল 'স্বাধীন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণার সাথে সাথে মিসর, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরায়েল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেটা ছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসরাইলের প্রথম যুদ্ধ। পরে ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আরব রাষ্ট্রগুলো আরো দুবার ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এসব যুদ্ধে আরবের এক বিরাট এলাকা ইসরাইল দখল করে নেয় এবং ধীরে ধীরে অধিকৃত এলাকায় ইহুদি সম্রাজ্য গড়ে তোলে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে মিসরের সিনাই ও সিরিয়ার গোলান উপত্যকা ইসরাইল দখল করে নিয়েছিল। ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে মিসর সিনাই এলাকা ফিরে পেলেও সিরিয়া তার গোলান উপত্যকা আজও ফেরত পায়নি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল প্যালেস্টাইনের গাজা, পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেম ও সেখানে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসা দখল করে নিয়েছিল। ইসরাইল এখন এ এলাকা তাদের পবিত্র স্থান বলে দাবি করছে।

ইসরাইলের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু নমনীয় ভাব গ্রহণ করলেও ইসরাইল কখনো তার একগুঁয়েমি মনোভাব পরিত্যাগ করে নি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩০৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী অধিকৃত আরব এলাকা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের সে সিদ্ধান্ত কখনো কার্যকর করে নি। ইরাকসহ অন্যান্য দেশে জাতিসংঘের উদ্যোগে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশকে সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করা হলেও ইসরাইলের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ফলে ইসরাইল তার মর্জিমতো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছে, যা প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানকে বারবার বিঘ্নিত করেছে।

১১.৭ সমস্যার বর্তমান প্রেক্ষাপট

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ আরাফাত প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হলে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার ফাতাহ্ গ্রুপ ওই দিন থেকেই পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় 'ইন্তিফাদা' শুরু করে, যা ক্রমশ পূর্ব জেরুজালেমসহ সকল ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ২০০১ সালের শুরুতে ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। জানুয়ারিতে বুশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং ফেব্রুয়ারির অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বুলডোজার খ্যাত এরিয়েল শ্যারন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে। ফলে পাল্টে যেতে থাকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রচেষ্টার সকল সম্ভাবনা। শ্যারন সামান্য অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের ওপর একের পর এক হামলা চালাতে থাকে। শুরু হয় নতুন আগ্রাসন। এর মধ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ আমেরিকার টুইন টাওয়ার সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেনকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে তালেবানদের হটিয়ে দিলে প্যালেস্টাইনে ইসরাইল নতুন উদ্যমে হামলা চালাতে শুরু করে।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষ বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আরো একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে যুক্তরাষ্ট্র আবারো তাতে ভেটো দেয়। জানুয়ারি ২০০২-এ ইসরাইল দীর্ঘকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালায়। ১৮ জানুয়ারি ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী ডিনামাইটের সাহায্যে প্যালেস্টাইনি রেডিও স্টেশন ধ্বংস করে দেয়। তারা রামাল্লায় প্রেসিডেন্টের ভবন ট্যাংক দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আরাফাতকে গৃহবন্দী করে রাখে। ২১ জানুয়ারি তারা তুলকারম-এ ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে বহু ফিলিস্তিনি আবাসস্থল গুঁড়িয়ে দেয়। তারপরেও যুক্তরাষ্ট্র আরাফাতকে দায়ী করে এবং সংঘর্ষের জন্য শ্যারনকে ছাড় দেয়। অবশেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ইসরাইল প্রেসিডেন্ট ভবনের চারদিক থেকে ট্যাংক সরিয়ে নেয়। তবে আরাফাতকে কেবল রামাল্লার চলাচলের অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১১ নভেম্বর ২০০৪ প্যালেস্টাইনের এই অবিসংবাদিত নেতা মৃত্যুকোলে ঢলে পড়েন। এরপর ২০০৭ সালের জুন মাসে ইসরায়েল গাজার উপর অবরোধ আরোপ করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসরায়েল গাজার ওপর বর্বরোচিত

হামলা করে হাজার হাজার নারী ও শিশুসহ সাধারণ জনগণ হত্যা করে। মানবিক সাহায্য নিয়ে গাজা অভিমুখী নৌবহর ফ্রিডম ফ্লোটিলাই ২০১০ সালের ৩১ মে ইসরাইল হামলা করে কমপক্ষে ২০ জনকে হত্যা ও ৩৬ জনকে আহত করে।

১১.৭(১) ফিলিস্তিন প্রশ্নে বর্তমান মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

সম্প্রতি ১৯ মে ২০১১ তারিখে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইসরাইলকে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ পূর্ববর্তী সীমানায় ফিরে যাওয়ার আহবান জানান। কিন্তু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শান্তির লক্ষ্যে শর্তসাপেক্ষে কিছু ভূমি ছাড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন, "ভবিষ্যতের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আকারের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব নমনীয়। পীড়াদায়ক হলেও ঐতিহাসিক এ শান্তি স্থাপনে কিছু ভূমি ছাড় দিতে আমি রাজি। ইসরাইলের নেতা হিসেবে এটি আমার দায়িত্ব।" তবে তিনি আরও বলেন "জেরুজালেমকে আর বিভক্ত হতে দেওয়া যাবে না। এটি ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে টিকে থাকবে।" গত দুই দশকেও শান্তিচুক্তিতে পৌঁছাতে না পারার ব্যর্থতার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন তিনি। নেতানিয়াহুর এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেন "সংকট নিরসনে নেতানিয়াহুর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার প্রাক্কালে আরো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

১১.৭(২) জন কেরির শান্তি আলোচনা প্রস্তাব

২০১৩ সালের জুলাই মাসে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে বৈঠককরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি মধ্য প্রাচ্যের সংকট নিরসনে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে পুনরায় শান্তি আলোচনা শুরু করতে উদ্যোগী হন। আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরুর পর দুই পক্ষ আলোচনায় বসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এটি এখনও সুস্পষ্ট নয় যে, এ আলোচনা শান্তির জন্য হবে নাকি শুধু প্রক্রিয়ার জন্য হবে। কিন্তু বিষয়টি খুব সহজ হবে না কারণ দুই পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইসরাইল পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে বসতি স্থাপন চালু রেখেই শান্তি আলোচনায় অংশ নেওয়ার পক্ষে। অপরদিকে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের ভাস্য, ইসরাইলি বসতি স্থাপন স্থগিত রেখে বসলেই তাঁরা শান্তি আলোচনায় যেতে আগ্রহী। তাই, শান্তি আলোচনার সংকট নিরসনে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

১১.৮ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সমূহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকট বিশ্বরাজনীতির এক অন্যতম সমস্যা। গত অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে জ্বলছে অশান্তির আগুন। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বহু জানমালের, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে একাধিক, জাতিসংঘও গ্রহণ করেছে একাধিক প্রস্তাব, কিন্তু তাতেও স্থায়ী শান্তির পথ সুগম হয় নি। বিদ্যমান সমস্যারও কোনো সমাধান হয় নি। ইসরাইলি নেতৃত্বের একগুঁয়েমি ও শান্তির জন্য কোনো প্রকার ছাড় না দেওয়ার মনোভাবের কারণেই ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয় নি। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পেছনের বাধাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা :** মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের একক ভূমিকা রয়েছে। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের অন্যতম মিত্র ও মুরুব্বি হলো যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলের অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্র প্রধান সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে ইহুদিদের প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে ইসরাইল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। '৯০-এর দশকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলে যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী আগামীতে ইসলামিক শক্তির উত্থান এবং বিশ্বরাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যুক্তরাষ্ট্র কোনোক্রমেই চাইবে না ইসলামিক শক্তির উত্থান ঘটুক, তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও

পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ইসলামিক শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে তৎপর। তাই যুক্তরাষ্ট্র সবসময় ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে আসছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আনীত ৭০টির বেশি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে। জাতিসংঘ প্রস্তাব ২৪২ ও ৩৩৮ নিরাপত্তা পরিষদে পাস হলেও ইসরায়েল এগুলো মানছে না এবং ইসরাইলকে এসব প্রস্তাব মানতে বাধ্য করাও হচ্ছে না। অথচ অন্য যেকোনো দেশ জাতিসংঘের প্রস্তাব না মেনে নিলে তাকে তা মানতে বাধ্য করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার মিত্র ইসরাইলের সরাসরি মদদদানকারী। যতদিন না যুক্তরাষ্ট্র তার বর্তমান মতবাদ পরিবর্তন করে সর্তিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে, ততদিন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

২. **ইসরাইলের একগুঁয়েমি :** ইসরাইল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করলেও সেগুলোর বাস্তবায়নে প্রায়ই গড়িমসি করছে। আবার কখনো দেখা গেছে সামান্য অজুহাতে চুক্তি বাস্তবায়ন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের প্রশ্নে ইসরাইলের একগুঁয়ে মনোভাব ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ সম্মেলনে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল।

৩. **ইসরাইলি নিরাপত্তা :** শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকার ইহুদিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনোক্রমে একটি আবাসভূমি পেলেও তার নিরাপত্তার প্রশ্নে কখনই নিশ্চিত হতে পারে নি। জন্মের পর থেকে চারবার আরবদের সাথে যুদ্ধ বেধেছে। আরো একবার যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে। ফলে তারা চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখতে পারছে না। ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষরিত "শান্তির বিনিময়ে ভূমি" চুক্তি তার প্রমাণ। এমতাবস্থায় যতক্ষণ না ইসরাইলের এ মনোভাব পরিবর্তন হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

৪. **ইসরাইলি সমর শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব :** মার্কিন প্রযুক্তি ও সহায়তায় গড়ে ওঠা ইসরাইলের সমরাস্ত্র ভান্ডার ও প্রযুক্তি পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলোর মতো। ফলে ১৯৪৮, '৫৬, '৬৭, ও '৭৩ সালের প্রতিটি যুদ্ধে আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হয়। এসব বিজয় ইসরাইলের মনে এ আস্থা এনে দিয়েছে যে যুদ্ধ করে আরবরা কখনই ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে না। ফলে তারা ফিলিস্তিনের ওপর অত্যাচার ও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন বা আন্তর্জাতিক আহবানে কোনো সাড়া দিচ্ছে না।

৫. **আরব দেশগুলোর অন্তঃকোন্দল :** মধ্যপ্রাচ্যসহ আরব দেশগুলোর প্রায় সকলের মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সৌদি আরব, মিসর, জর্ডান প্রভৃতি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে অন্তঃকোন্দল বিদ্যমান থাকায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে আরব রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরবসহ প্রতিটি আরব দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব তো রয়েছেই। ফলে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোর অবস্থান কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতিসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। আর এতে ইসরাইল ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে আরো সাহসী হয়ে উঠেছে।

৬. **ধর্মীয় কারণ :** ধর্মীয় কারণ ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বাধা। এখানে ইসলাম, ইহুদি আর খ্রিস্টান এ তিনটি প্রধান ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলো পাশাপাশি হওয়ায় মুসলমান ও ইহুদি উভয় পক্ষই এর নিয়ন্ত্রণ চায়। এ কারণে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল উভয়েই জেরুজালেমকে তাদের অখণ্ড রাজধানী হিসেবে দেখতে চায়, যা শান্তি-প্রক্রিয়ায় একটি বড় বাধা।

মূল্যায়ন

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা বর্তমান বিশ্বরাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিশ্বের সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হলো এ মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার জন্য বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে ইসরাইলের আগ্রাসী মনোভাব এবং আমেরিকার কর্তৃত্ববাদী শর্ত সংরক্ষণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিন।

৯.৯ মধ্য এশিয়ার সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে কিরগিজস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে কিরগিজ ও উজবেকদের মধ্যে যে সহিংসতা দেখা যায় তা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো খুবই উদ্বিগ্ন। কেননা মধ্য এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার বিস্তার এখান থেকেই ঘটতে পারে।

রাশিয়া ও পশ্চিমাদের ভয়, এ সহিংসেতার কারণে এক শূন্যতা তৈরি হবে এবং রাষ্ট্র যে কতটা আকর্কির তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ সুযোগে জঙ্গিবাদ ও সংঘবদ্ধ অপরাধীচক্র তাদের নিরাপদ আস্তানা গেড়ে বসবে। কিরগিজস্তান রাষ্ট্র অকার্যকর হয়ে পড়তে থাকলে তা রাশিয়া ও চীনে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব বাড়াবে। পাশাপাশি উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কাজাকিস্তানের ওপর এর প্রভাব পড়বে। এ সংঘাতের তাৎপর্য কিরগিজস্তানের সীমান্তের মধ্যে আটকা থাকবে না। পুরো অঞ্চলের অস্থিতিশীলতার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ : রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিরগিজস্তানই একমাত্র দেশ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এই ছোট দেশটি দুই দেশের জন্যই কৌশলগত কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালানোর জন্য NATO বাহিনীকে সহায়তা ও সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য মানাস সামরিক ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিরগিজস্তানে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক গোয়েন্দা উপস্থিতিও বাড়াতে চাচ্ছে। অশ শহরে সন্ত্রাসবিরোধী একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে এ অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়ে চলছে ওয়াশিংটন। কিন্তু, তাদের আসল লক্ষ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

চীনের স্বার্থ : কিরগিজস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে চীনেরও উদ্বেগ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। চীনের জিনজিয়ান প্রদেশের সঙ্গে কিরগিজস্তানের ৫৩০ কি.মি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। জিনজিয়ান প্রদেশে গত বছর ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছিল। সেখানকার মুসলমান উইঘুর জনগোষ্ঠী স্বাধীন রাষ্ট্র চায়। এ পরিস্থিতিতে সীমান্তের খুব কাছাকাছি মার্কিন ঘাঁটি তাদের জন্য উদ্বেগজনক।

কিরগিজস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির দায় বৃহৎ শক্তিগুলো এড়াতে পারবে না, যেমন: সাম্প্রতিক সহিংসেতার সময় কিরগিজ সেনাবাহিনী উজবেকদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। মাত্র কয়েক মাস আগেই এ সেনাবাহিনীকে অর্থ ও প্রশিক্ষণের সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিভিন্ন সময়ে বার বার দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের পার্শে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের বিবেচনা সামনে আসে নি। মধ্য এশিয়ার স্বৈরশাসকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পেন্টাগণ এ নীতিই অনুসরণ করছে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জনগোষ্ঠীর কত শতাংশ বেশি মুসলমান?**
উত্তর: ৯০ শতাংশের ও বেশি

২. **মধ্যপ্রাচ্য হল আন্তর্জাতিক রাজনীতি-**
উত্তর: মূল কেন্দ্র বিন্দু

৩. **ওপেকের মতে বিশ্বের মোট তেলের দুই তৃতীয়াংশ কোথায় রয়েছে?**
উত্তর: মধ্যপ্রাচ্যে

৪. **কত সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. জে. বেলফোর মধ্যপ্রাচ্যের একটি ইহুদি আবাস ভূমি গঠনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ জায়নিস্ট ফেজারেশনের সভাপতিকে একটি পত্র দেন?**
উত্তর: ১৯১৭ সালে।

৬. **মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত কোন দুটি দেশ মুসলিম নয়?**
উত্তর: ইসরাইল ও সাইপ্রাস।

৭. **বিশ্ব অর্থনীতি নির্ভরশীল।**
উত্তর: তেল

৮. **পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃত?**
উত্তর: প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম

৯. **কেবল বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ করেন কোথায়?**
উত্তর: প্যালেস্টাইনে

১০. **বিশ্বের একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র কোনটি?**
উত্তর: ইসরায়েল

১১. **প্যালেস্টাইলের উপর ম্যান্ডেট প্রমান করেছিল।**
উত্তর: ১৯২২ সালে

১২. **আজার বাইজান এর রাজধানী কোথায়?**
উত্তর: বাকু

১৩. **কাজাখিস্তান কবে স্বাধীনতা লাভ করে।**
উত্তর: ডিসেম্বর ১৯৯১

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. মধ্য প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার মিল ও পার্থক্য বর্ণনা কর।
খ. মধ্য প্রাচ্য সমস্যা বর্ণনা কর।

২. ক. মধ্য এশিয়ার অবস্থান
খ. মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর পরিস্থিতি

৩. ক. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্য প্রাচ্যের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
খ. মধ্য প্রাচ্য দেশসমূহের নাম লিখুন?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করুন ?
২. মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন?
৩. মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল এবং অমিল আলোচনা করুন ?

অধ্যায় ১২

চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশ্ব রাজনীতি
Economic Development of China & World Politics

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১২.১ ভূমিকা
১২.২ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা
১২.৩ সাম্প্রতিক সময়ে চীন
১২.৪ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মেরুকরণ
১২.৫ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাব
১২.৬ অর্থনৈতিক আধিপত্যে চীন-যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব
১২.৭ সাম্প্রতিক চীনের অর্থনীতি
১২.৭ চেন গুয়াংচেং-কে নিয়ে সম্পর্ক টানাপোড়েন
১২.৮ যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি
১২.৯ বর্তমান পরিস্থিতি
১২.১০ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই
১২.১১ আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র ঠাণ্ডা লড়াই
১২.১২ যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা

১২.১ ভূমিকা (Introduction)

১৪০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত চীনের আয়তন ৯৫ লক্ষ ৬১ হাজার বর্গকিলোমিটার। ১৯৪৯ সালে মাও সে তুং ক্ষমতায় আসার পূর্বে চীনের ঐক্য ও সংহতি বলতে কিছু ছিল না। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং- এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে চিয়াং কাইশেককে পরাজিত করে চীন বিশ্বের কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গত ৬৩ বছরে চীন বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত মেরুকরণ প্রক্রিয়া এবং তৎপরবর্তী ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে ভারসাম্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে সকলের ধারণা। চীন বিশ্বের অন্যতম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভূমিকা রাখছে। ফলে চীন বর্তমান আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বগুলোতে নিজস্ব স্বকীয়তা উপস্থাপন করেছে। অর্থনৈতিক কূটনীতি প্রসার ঘটছে দ্রুত। অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরোক্ষ সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক নীতিতেও এর প্রভাব পড়ছে।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

১২.২ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা (Introducing Economic Development)

চীনে এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় বিষয় হলো তার জাতীয় আয়ের পরিমাণ বর্তমানে চীনের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার রীতিমতো উর্ধ্বগামী। বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের উদ্বৃত্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিক শিক্ষার আয়োজন, কার্যকর গণবন্টন ব্যবস্থা, কর্মনিষ্ঠ শ্রমশক্তি এবং সর্বোপরি জাতীয় চেতনা এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে চীন এখন রীতিমতো নিজেকে সমগ্র বিশ্বের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মানুষের জীবনযাপন, চিন্তা-ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তথাকথিত পাশ্চাত্য আধুনিকতার বহু উপকরণ বা এর উপস্থিতি এখন চীনে লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ন্যায় পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যথারীতি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯৯২ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলনীতি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলার কর্মসূচী গৃহীত হয়। ইতোমধ্যেই ৮০ এর দশক থেকেই চীনের রাষ্ট্রনীতি হিসেবে মুক্তবাজার নীতির কথা ঘোষিত হয়েছিল। অর্থনীতির বিকাশ আধুনিকীকরণ এবং পুনর্গঠনের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের পণ্যের প্রবেশ, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এবং একইভাবে বিদেশি বিনিয়োগে আহবান করার ক্ষেত্রে চীন নানাবিধ ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। প্রাথমিক পর্বে ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৪টি উপকূলবর্তী শহর এবং হাইনান দ্বীপপুঞ্জকে বিদেশি বাণিজ্যের জন্য মুক্ত রাখা হবে। বিদেশি পুঁজি আকর্ষণের জন্য যতখানি সম্ভব নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হবে।



চীন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে যেমন উৎপাদিকা শক্তি প্রসারিত হয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের পদ্ধতি আধুনিক ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়েছে।

রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতিতেও চীন এখন রীতিমতো বাস্তববাদী। বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চীন নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চায়। ১৯৮০ সালে চীন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) এবং বিশ্বব্যাংক (World Bank)- এ যোগদান করে। এছাড়া অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠন যেমন

ASEAN এবং APEC এ চীনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সাথে চীন নিজেকে ক্রমশ প্রস্তুত করে তুলেছে। এভাবে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা অর্জনের যে লক্ষ্যকে তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তাতে চীন অনেকটাই সফল। ২০০১ সালে ১১ই ডিসেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় চীন তার নিজের ভূমিকাকে অনেক সুদৃঢ় করেছে। এই কারণে চীনের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব সে দেশের আইন-কানুন, প্রশাসন পরিচালনা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টাও করছে। এসবের উদ্দেশ্য হলো বাজার অর্থনীতির সুযোগকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৬তম কংগ্রেসে দলের প্রবীণ নেতারা নতুনদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ২০০৩ সালে জিয়াং জেমিন প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেন হু জিনতাও এর হাতে। জিয়াং জেমিনের গত এক দশকের শাসনামলে চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া লেগেছে হু জিনতাও আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি জিয়াং জেমিনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও বাজার খুলে দেওয়ার নীতি থেকে সরে আসবেন না বরং পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরো সফল হবেন। চীনের যে সকল পদক্ষেপ থাকে তাকে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত করেছে তা হলো :

১. **জিয়াং জেমিনের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ :** চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৬তম কংগ্রেসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জিয়াং জেমিনের তিন প্রতীক তত্ত্ব এর আগে দলের গঠণতন্ত্র ব্যবসায়ীদের সদস্য এবং সরকার যন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল নিষিদ্ধ। জেমিনের তত্ত্বে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহবান জানানো হয়। কমিউনিস্ট পার্টি বাজার সংস্কারের পথে এগোনোয় জেমিন পুঁজিবাদী বাজারের প্রতি বেইজিং সরকারের অধ্যবসায়ী হওয়ার আহবান জানান। সেই সঙ্গে তিনি দেশের ব্যবসায়ীদের সাংবিধানিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর জোর দেন।

২. **অর্থনৈতিক সংস্কারে দেং জিয়াও পিং এর পদক্ষেপ :** চীনের প্রয়াত নেতা দেং জিয়াও পিং ১৯৭৯ সালে চীনকে পুঁজিবাদী বাজারে উন্মুক্ত করেন। তিনি হংকং ও তাইওয়ানের অভিবাসী চীনাদের কাছ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্রিয় হয়েছিলেন।

৩. **প্রবৃদ্ধিমুখী নীতি গ্রহণ :** প্রবৃদ্ধিমুখী নীতি গ্রহণ ও ট্রেড ইউনিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কমিউনিস্ট সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমা কূটনীতিকদের মতে, চীন ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ মার্কিনিদের কাছে স্বপ্নের মতো। কমিউনিষ্ট পার্টির এই অর্থনৈতিক উদারনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব এখন প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও এর কাঁধে। সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় যে বিষয়টি তা হলো কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের প্রবেশের দ্বারা উন্মুক্ত হওয়ায় চীনের জনগণ মহাখুশী। এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে চীন ৭-৮ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে। ২০০২ সালে রপ্তানি ২১ শতাংশ বেড়ে ৩২২০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে।

৪. **আসিয়ানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি :** বিশেষজ্ঞদের মতে চীন যে হারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে এগোচ্ছে তাতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকামী দেশগুলোর কাছে বেইজিং বড় ভাইয়ে পরিণত হবে। ২০০৩ সালে বেইজিং এবং ১০ সদস্যবিশিষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোটের (আসিয়ান) মধ্যে চারটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর একটি হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্য এবং আর একটি হচ্ছে দক্ষিণ চীন সাগরের স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা বিরোধ নিস্পত্তির ঐতিহাসিক ঘোষণা। বিশ্লেষকদের মতে এ দুটি চুক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মুক্তবাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে চীন আসিয়ান সম্পর্কে অর্থনৈতিক ভিত্তি আর দক্ষিণ চীন সাগরের দ্বীপপুঞ্জের বিরোধ নিস্পত্তির ঘোষণা হচ্ছে রাজনৈতিক ভিত্তি। মূলত চীন ও আসিয়ান নিজেদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রত্যাশী। চীন-আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য চুক্তি একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। কেননা এটি বাস্তবায়ন হলে দু'পক্ষের বাণিজ্য এলাকা খুব দ্রুত দক্ষিণের দেশগুলোতে সম্প্রসারিত হবে। প্রকৃত অর্থে এই চুক্তিগুলো আসিয়ানের সঙ্গে চীনের অটুট সম্পর্কের প্রতীক। এগুলো দু'পক্ষের মধ্যে নতুন করে বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি হিসেবে

অবদান রাখবে। আর এর মধ্য দিয়েই বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার অর্থনৈতিক অবস্থান নিরাপত্তা শক্তিশালী করবে। এশিয়া প্যাসিফিক এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয় প্রতিহত করবে।

৫. **বিনিয়োগ আকৃষ্ট :** মূলত নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই চীনে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে শুরু করে। 'চুগোকু শোকু' শব্দ যুগলটি এখন জাপানে বহুল আলোচিত এবং উচ্চারিত। এর অর্থ 'চায়না শক' বা চীনা ধাক্কা। কম দামে মানসম্পন্ন পণ্য তৈরিতে চীনের সাফল্য ব্যাপকভাবে বিদেশি উদ্যোক্তাদের টেনে আনছে সে দেশে। চীনের উন্নয়নশীল প্রতিবেশীদের জন্য ব্যাপারটি অনেকটা টেনে নেওয়ার মতো। '৯৭ সালে এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের আগ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ছিল বিশ্বের মূলধন বিনিয়োগের আদর্শ স্থান। অর্থনৈতিক সংকট কেটে যাবার পর থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়া আশা করেছিল বিদেশি বিনিয়োগের আরেক দফা প্লাবনে তাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল, ম্যানুফ্যাকচারিং ইনভেস্টমেন্টের সিংহভাগই দৌড় দিয়েছে চীনের দিকে। ২০০২ সালে চীনের এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) পরিমাণ দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার সম্মিলিত বিদেশি বিনিয়োগের চেয়ে বেশী। চীনের বর্তমান প্রবৃদ্ধির মূল কারণ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ। প্রতিবছর চীনে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০২ সালে FDI এর পরিমাণ ছিল যেখানে ৫২.৭ বিলিয়ন ডলার সেখানে ২০০৪ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৬০.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে চীনে যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে তা মূলত শ্রমনির্ভর সেক্টরে। চীনে যে পরিমান FDI হয় তার ৭০% পণ্য প্রস্তুত খাতে এবং এ খাতের ৭০% আয় সরাসরি শ্রমনির্ভর খাত থেকে। বহির্বিশ্বে ৬০ মিলিয়ন চীনাদের বসবাস। তাদের নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে বিশাল অর্থনৈতিক

মনে রাখার Technique & Tips

চীন

- রাজধানী : বেইজিং (মিং রাজবংশ স্থাপন করে প্রথম)।
- আয়তন : ৯৫ লক্ষ ৯৬,৯৬০ বর্গ কিলোমিঃ।
- জনসংখ্যা : ১৪০ কোটি ।
- ভাষা : চীনা (মান্দারীন)।
- ধর্ম : বৌদ্ধ, কনফুশীয় ও তাওবাদ (নাস্তিক)।
- মুদ্রা : ইউয়ান।
- প্রদেশ : ২২টি।
- স্বশাসিত অঞ্চল : ৫টি।
- দুই তৃতীয়াংশ হলো পার্বত্য বা মরুভূমি।
- কাইসেক ১৯৫০ এ চীনের সদর দফতর স্থাপন করেন তাইওয়ানে।
- ১৯৭১ সনে তাইওয়ানের সদস্য পদ খারিজ করে বর্তমান চীনকে পদটি দেওয়া হয়।
- কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচিত মোট সদস্য ঃ ৩৫৬ জন।
- কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ সদস্য ১৯৮ জন, ১৫৮ জন হলেন পালাক্রমিক সদস্য।
- ৩৫৬ জনের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয় পলিট ব্যুরো ২৪ জন।
- পলিটব্যুরোর ২৪ জনের মধ্য থেকে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় পলিটব্যুরো স্থায়ী কমিটি সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু।
- বর্তমান শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত হুন, মোঙ্গল ও মাঞ্চু রাজবংশের রাজত্ব ছিল।
- ইংরেজ বণিকদের সাথে চীনারা জড়িয়ে পরে- আফিম ব্যবসা নিয়ে।
- হুন রাজা পরাজিত হবার পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশদের দিতে হয়েছিল-হংকং।
- চীনের অনেক অংশের ইজারা নিয়ে নেয়ঃ ফ্রান্স, বৃটেন ও জার্মানী।
- জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত হয়েছিল : চীনা বিপ-বী লীগ।
- কমিউনিষ্টরা গঠন করেছিল ঃ গণমুক্তি ফৌজ।
- চিয়া, কাইসেক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাইওয়ানে; গঠন করেন রাজাতন্ত্রী চীন।
- মাও জে সং এর পত্নী চ্যাংচিং এর নেতৃত্বাধীন চরমপন্থী সংগঠন 'গ্যাং অব ফোর"।
- ১৯৭০ সনে প্রথম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠায়।
- ২০১০ সনের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূণ্যে আনার লক্ষ্যে মাত্রা স্থির করে।
- এক দেশ দুই নীতি প্রযোজ্য : হংকং (ম্যাকাওয়েও চলবে বলে চীন জানিয়েছে)।

সম্পদ। তারাও ব্যাপকহারে চীনে বিনিয়োগ করেছে। ১৯৮৫ সালে যেখানে চীনাদের গড় আয় ছিল ২৮০ মার্কিন ডলা সেখানে ২০০৫ সালে গড় আয় দাঁড়িয়েছে ১২৯০ মার্কিন ডলার। ২০১১ সালে তা ৭৫১৮ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী লি হিসেন লুঙ্গের মতে চীন সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোর সামনে রাখা পনিরের বাটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের সাম্প্রতিক ব্যবস্থা হিসেবে চীন বিদেশিদের কাছে শেয়ার বিক্রয় শুরু করেছে। বিদেশি পুঁজিকে আকর্ষণ করার জন্যই এ

ব্যবস্থা। আপাতত দুটি স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এ দেশের শেয়ার বিদেশিদের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ এবং শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ। চীনাদের বাইরের পুঁজি আকর্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং রীতিনীতির কারণে চীনের অদক্ষ রাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলোর যে পশ্চাৎপদতা এবং ঘাটতি রয়েছে তা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে হলে এ যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক লেনদেন ও আদান-প্রদান জরুরি বলে চীনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন। আশা করা হচ্ছে এ বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চীনা ব্যবস্থাপকরা আন্তর্জাতিক হিসাব রীতি এবং বাণিজ্য কৌশলের সাথে যেমন পরিচিত হতে পারবে তেমনি সংগৃহীত হবে আকাংক্ষিত মূলধন। এছাড়া চীন সরকার বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে ব্যাপক ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছে। আজকে এসব উদ্যোগের সফলতা পাচ্ছে চীন।

৬. **দক্ষ জনশক্তি তৈরি :** একসময় চীনের জনশক্তির মান নিয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু বর্তমানে চীনের শ্রমশক্তি কেবল সংখ্যায় বেশি বা সস্তাই নয় শিক্ষিত এবং সুশৃংখলও বটে। দক্ষিণ কোরিয়া বা মালয়েশিয়ার দক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো শ্রমিকের অভাব চীনে আর নেই। দেশে এখন বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রকৌশলী তৈরি হয়েছে যাদের নিয়োগ দিচ্ছে বিদেশি কোম্পানিগুলো। বর্তমানে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ চীন দেশে ফিরে। এরাই চীনকে বিশ্ব বাজারে বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। চীনে বর্তমানে ১৪০কোটি জনসংখ্যা। জনসংখ্যা অধিকাংশই জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রম কৃষি থেকে শিল্পে প্রসার ঘটছে। প্রতি বছর ৯০ মিলিয়ন শ্রমিক কৃষি থেকে শিল্পে আসছে। ফলে শিল্প দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে।

৭. **হংকং অন্তর্ভুক্তি :** চীনের অর্থনীতিতে নবজাগরণের সূচনা ঘটে ১৯৯৭ সনের ১ জুলাই তারিখে। ব্রিটেনের কাছে থেকে ১৫৪ বছর পর চীন হংকং ফিরে পায়। হংকং এর উদীয়মান অর্থনীতি, মুক্তবাজার এবং গণতন্ত্র প্রক্রিয়া চীনের বিপরীত আদর্শ হলেও চীন 'একদেশ দুই নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করে হংকং উদীয়মান অর্থনীতির সুবিধাগুলো চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগায়। হংকংকে চীনা মূল ভূখণ্ডে ফিরে পাবার পর দেশের নেতৃবৃন্দও অধিক জোরেশোরে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাব বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

৮. **ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা :** ২০০৪ সালের মার্চ মাসে চীনের সংসদ ন্যাশনাল পিপল্‌স কংগ্রেস সে দেশের সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা রক্ষাবিষয়ক একটি যুগান্তকারী সংশোধনী অনুমোদন করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর এই প্রথম ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির ওপর অধিকার সংরক্ষিত হলো। সংসদের এ সিদ্ধান্তের ফলে চীন এই প্রথম বারের মতো কমিউনিজমের একটি অন্যতম আদর্শ বাতিল করল। ফলে চীন মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

৯. **WTO-তে অন্তর্ভুক্তি :** ১৯৯৮ সনের জুন মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন চীন সফর করেন তখন চীনা নেতৃবৃন্দকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রবেশাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ১৯৯৯ সনের এপ্রিল মাসে চীনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝুরংঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় এটা বাস্তবায়িত না হলে তিনি বিরস বদনে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে সাত মাস পরে অর্থাৎ ১৯৯৯ সনের নভেম্বর মাসে চীনের বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০১ সালের ১০ নভেম্বর চীন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করলে বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের প্রভাব বিস্তারের পথ খুলে যায়।। ফলে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্যও তা সুফল বয়ে আনতে

http://thejobstudy.com Go to Contents

পারে যদি তারা সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চীনের অংশগ্রহণ বিশ্ব বাজারের বিরাট অংশ যে চীনের দখলে চলে যাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এতে বেশি ক্ষতি হবে বিশ্বের প্রধান দুই পুঁজিপতি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের।

১০. **অগ্রগতির ধারা :** ধারণা করা হচ্ছে, ২০২০ সাল নাগাদ চীন পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ বাণিজ্যভূমিতে পরিণত হবে। এই উন্নতি পুরো অঞ্চলের অর্থনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন আনবে। গত বছর পূর্ব এশিয়ার থেকে চীনের আমদানি বেড়েছে একতৃতীয়াংশ। চীন যেমন জাপানের আমদানির সবচেয়ে বড় উৎস পরিণত হয়েছে, তেমনি চীনের জাপানে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৩২ শতাংশ। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও লাভবান হয়েছে চীনের জিডিপি বৃদ্ধিতে। মর্গান স্ট্যানলির প্রধান অর্থনীতিবিদ স্টিভ রজার বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার মধ্যে চীনের অর্থনীতিকে 'মরুভূমির' মরূদ্যানের সঙ্গে তুলনা করে এর তিনটি কারণ তুলে ধরেছেন। প্রথমত, রপ্তানির ২৫% বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, অবকাঠামোগত ব্যয়ে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বিপুল বিদেশি বিনিয়োগ। সব মিলিয়ে চীনের শিল্পখাতে উৎপাদন বেড়েছে ১৩ শতাংশ। রজারের মতে চীনের অর্থনীতির এ ইতিবাচক দিক থেকে পুরো বিশ্ব অর্থনীতি লাভবান হতে পারে।

১১. **রাজনৈতিক সংস্কার :** চীনের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে তথাকথিত ডান এবং বামের সংঘাত এবং টানাপোড়েন বরাবরই ছিল। সমাজতান্ত্রিক বামপন্থিরা যখন রাজনীতিকে উন্নয়ন এবং সমাজ নির্মাণের নিয়ামত বলে মনে করতেন ডানরা তখন অর্থনীতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিবর্তনের কথা ভাবতেন। মাও সে তুং চীনা সমাজতন্ত্রের যে পথ পরিদর্শন করে গেছেন তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরবর্তী সময়ের নেতৃবৃন্দের নিকট পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয় নি। তারা তাকে সঠিক রাজনীতির পুরোধা ভাবতে পারেন নি। এদিকে

মনে রাখার Technique & Tips

তিব্বত
- জনসংখ্যা : ২৪.৪ লক্ষ (৫ লক্ষ তিব্বতী, বাকি চীনা)
- রাজধানী : লাসা
- ১৯৫৩ : বৌদ্ধ লামাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে কমিউনিস্ট সরকার গঠন।
- ১৯৫৯ : লামাদের বিদ্রোহ দমন। দালাই লামা একলক্ষ তিব্বতীসহ ভারতে আশ্রয় নেন।

হংকং
- ক্যান্টন নদীর মোহনায় অবস্থিত।
- উপদ্বীপ : কাউলুন, নিউটেরিটরিজ।
- ছোট দ্বীপের সংখ্যা : ২৩০টি।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ হয় : ১৮৪৩ সালে।
- রাজধানী : ভিক্টোরিয়া।
- মুদ্রা : হংকং ডলার।
- আয়তন : ১০৭১ বর্গকিলোমিটার।
- চীফ এক্সিকিউটিভ : তুং চি হোয়া।
- জনসংখ্যা : ৬৮ লক্ষ।
- ভাষা : ইংরেজি ও ক্যান্টনিজ।
- ৯৯ বছরের লিজে নিউ টেরিটরিজ ব্রিটিশরা অধিকার করে : ১৮৯৮।
- ১৫৩ বছরের শাসন শেষে চীনের হাতে আসে : ১ জুলাই, ১৯৯৭।

ম্যাকাও
- আয়তন : ১৫.৫ বর্গকিলোমিটার।
- জনসংখ্যা : ৪লক্ষ ৪৫ হাজার।
- ভাষা : পর্তুগিজ ও ক্যান্টনিজ।
- ধর্ম : কনফুশীয়।
- মুদ্রা : পাটাকা।
- চিফ এক্সিকিউটিভ : হাও-ওয়াই।
- ক্যান্টন নদীর মোহনায় অবস্থিত।
- পর্তুগীজ উপনিবেশ ছিল।
- তাইপা ও কোলোনে দ্বীপ এবং ম্যাকাও উপদ্বীপ নিয়ে এ অঞ্চল।
- পর্তুগীজ স্বায়ত্তশাসন দেয় : ১৯৭৬ সালে।
- পর্তুগাল ও চীনের চুক্তি অনুযায়ী চীনের অন্তর্ভুক্ত হয় : ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯।
- সোনার খোলা বাজার আছে।
- ২১৬-২২০ খ্রিস্টাব্দ : কনফুশীয় দর্শনের প্রচলন। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ।
- ৬১৮-৯০৬ খ্রিস্টাব্দ-ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হওয়া চীন ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে (তাং রাজবংশের রাজত্ব)।
- ৯৬০-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ : আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু (সুং রাজবংশ)। এরপর মোঙ্গলদের কর্তৃক চীন আক্রমণ ও ইয়ুয়ান রাজবংশের পত্তন। মোঙ্গলদের পতনের পর মিং রাজবংশের পত্তন। মিংরা বেজিং এ রাজধানী স্থাপন করে।
- ১৫১৬ : পর্তুগীজদের আগমন।
- ১৬২২ : ওলন্দাজদের আগমন।

১৯৬৬ সালে চীন যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার নেতারা তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করে দেং জিয়াওপেং এবং লিউকে অপসারিত করলেও পরবর্তী সময়ে এসব নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হন। চীনের বর্তমান নেতৃত্ব এখন দ্রুত একটি পরিবর্তনের দিকে এগুচ্ছে এবং অসাময়িক বিশ্বের স্রোতের সাথে চীনকে এডজাস্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অনেকেই বলছেন সমাজতন্ত্রের বর্তমান সংকটের প্রেক্ষাপটে চীনা রাজনীতির স্থবিরতা কেটে ওঠার জন্যই এ পরিবর্তনের পালা। বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৭৬ সালে মাও সে তুংয়ের মৃত্যুর পর চীনের ক্ষমতায় দেং জিয়াওপিং-এর আগমনের সময় হতেই চীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের শুরু হয়। ক্ষমতাসীন হবার পর দেং জিয়াওপিং চীনে বাজার অর্থনীতির শ্লোগান উচ্চারিত করে। দেং এখন ক্ষমতায় না থাকলেও তিনিই যে চীনা ক্ষমতাসীন নেতৃত্বকে গাইড করতেন একথা সবাই জানে। দেং বিগত ২২ বছর যাবত চীনের রাজনীতিকে নমনীয়তার দিকে নিয়ে যাবার যে প্রয়াস চালিয়েছেন তা নতুন নেতৃত্বকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই নেতৃত্বের ২০ সদস্যের পলিটব্যুরোতে ৬ জন ছাড়া বাকি সবাই নতুন প্রজন্মের ধারক। নয়া চীন গড়ার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত এসব সদস্যরা ক্ষমতার রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানকে ক্রমেই দৃঢ় করেছেন। যে কারণেই পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, "চীনে দেয়ালে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান সম্বলিত লাল ব্যানার টানানো থাকলেও চীনে সমাজাস্ত্রিক রাজনীতির পতন হয়েছে"। চীনের অনেক বুদ্ধিজীবীর মতে, "চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমরা এখন পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।"

১২. **খোলা বা মুক্তবাজার নীতি :** সমাজতন্ত্রের বদ্ধ দুয়ার চীনের জনগণকে বহির্বিশ্বের সাথে অপরিচিত করে রেখেছিল বহুকাল ধরে। কমিউনিজমের প্রাচীর চীনা জনগণের জীবনের বাস্তবতা বাইরের মানুষকে অবহিত হতে দেয় নি। ফলে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে চীনা সমাজ সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। চীনের শাসকবর্গ এ বাস্তবতা বুঝতে পেরে সমাজতন্ত্রের কঠিন আবরণ হতে বেরিয়ে আসেন এক সময়। হাতে নেন সংস্কারের কর্মসূচি। বিদেশি পুঁজি সংগ্রহ, অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন, বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য চীনের বিখ্যাত এলাকাগুলোতে পর্যবেক্ষণের জন্য খুলে দেওয়াসহ অন্যান্য উন্মুক্ত দ্বারনীতি বর্তমান চীন সরকার গ্রহণ করেছেন। আজকের চীনের সংস্কার কর্মসূচির প্রবর্তক দেং জিয়াও পেংয়ের বিগত প্রায় ২২ বছরের উন্মুক্ত দ্বারনীতির ফলে চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। চীনের অর্থনীতি পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিশনের সেক্রেটারি হোংহুর মতে, "খোলানীতির ফলে চীনে এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিদেশি এবং যৌথ মালিকানাধীন প্রায় সাত সহস্র প্রকল্প নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নতুন নীতি প্রবর্তনের পর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই চীনের সাথে ১৭৪টি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা পঞ্চাশের দশকে ছিল মাত্র ১৯টি দেশের সাথে এবং ষাটের দশকে এ সম্পর্ক ছিল ৩০টি দেশের সাথে।"

চীন সরকারের খোলা বাজার নীতির ফলে চীনা ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার ব্যাপকতা খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। চীনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সবখানেই ফ্রি মার্কেট দেখতে পাওয়া যায়। সব ধরনের গৃহস্থালি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেকোনো লোক খোলাবাজার হতে কিনতে পারেন। সরকারি লাইসেন্সে চীনের ব্যবসায়ীরা বর্তমানে চীনের সব স্থানেই ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ পাওয়ায় জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক যুগের বিরক্তি এবং ক্রোধের অনেকটা লাঘব হয়েছে বলেই মনে হয়। ধারণা করা হচ্ছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের সমাজ খোলা দুনিয়ার মানুষের সুযোগ-সুবিধার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়াস পাবে। চীন হয়ে উঠছে আরেকটি বিশাল মুক্ত দেশ।

চীনে এখন সর্বহারার একনায়কতন্ত্র আর নেই। সর্বত্র এখন জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্লোগান। অতীতে চীনে ককমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া সব দল এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনই নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে সেখানে সাবেক কুয়োমিনটাং পার্টিসহ আটটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন। উৎসুকি পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা চীনা অর্থনৈতিক সংস্কারের পথ ধরেই অনতিবিলম্বে চীন নিশ্চিত গণতন্ত্রের ধারায় ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ১৯৮৯ সালে ছাত্রদের উদ্যোগে তিয়েন

আনমেন স্কোয়ারে যে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট সংগঠিত হয়েছিল তা কঠোর হস্তে দমন করা হলেও এর ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে চীন নেতাদের অভিযাত্রা অগ্রসর হচ্ছে বলেই ধারণা।

১২.৩ সাম্প্রতিক সময়ে চীন (Present Situation of China)

চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজকাল রক্ষণশীলতার গণ্ডি পেরিয়ে মুক্ত বাতাসের ছোঁয়ায় খানিকটা যে অভিষিক্ত এ লক্ষণ বেশ আগে থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ধারণা চীনের বাজার অর্থনীতির ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে বৈকি। সেখানকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সামাজিক গবেষকরা খোলা দুনিয়ার চাকচিক্য এবং সমৃদ্ধি দেখে আজ আর চুপ করে বসে থাকার পক্ষপাতী নন। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি পরিবর্তিত এবং যুগোপযোগী অর্থ ব্যবস্থার কার্যক্রম চীনে গৃহীত হয়েছে। "নতুন বিপ্লব" নামে চীনের গোটা সমাজদেহে এখন বিবর্তনের পালা। খোলা অর্থনীতির অনুকূল প্রভাব ইতোমধ্যেই চীনের অর্থব্যবস্থায় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। চীনের উৎপাদন ব্যবস্থায় সঞ্চারিত হয়েছে নতুন গতি। বিশ্ব বাণিজ্যে চীন এখন উদ্বৃত্ত অর্থনীতির দেশ। গত পাঁচ বছরে চীনের মাথাপিছু আয় ২৭০ ডলার হতে উঠে ৭৫১৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। রপ্তানি বেড়েছে বহুগুণ। দেং জিয়াওপেং গৃহীত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আধুনিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সাথে চীনা সমাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির পথে। সংস্কারের কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পলিট ব্যুরোতে উদারপন্থিদের সংখ্যা বেড়েছে। দুনিয়া জোড়া সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে চীনা নেতৃত্ব এখন এক নতুন চীন গড়ার শপথে প্রত্যয়ী। বিশাল ভূ-খণ্ড জুড়ে প্রায় দেড় শত কোটি মানুষের চীন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

মনে রাখার Technique & Tips

- ১৯৩৭-ইংরাজদের আগমন।
- ১৬৬৪-যাযাবর মাঞ্চুরা চীনের প্রাচীর ভেদ করে বেইজিং দখল করে ও চিং রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে (১৯১২ পর্যন্ত)।
- ১৮৬০-ব্রিটিশ ও ফরাসি কর্তৃক বেইজিং দখল।
- ১৮৯৫ জাপানের কাছে পরাজিত; কোরিয়া ও তাইওয়ান জাপানের হাতে তুলে দেয়।
- ১৯০০-পশ্চিমা বাহিনী কর্তৃক "বক্সার বিদ্রোহ" দমন।
- ১৯০৫-সান ইয়াৎ সেন কুওমিনটাং (জাতীয়তাবাদী পার্টি) গঠন করে।
- ১৯১২-১ জানুয়ারি সোভিয়েতপন্থি ইয়াৎসেন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রী চীন গঠিত।
- ১৯২১-কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত।
- ১৯২৬-কুওমিনটাংয়ের নেতৃত্ব যায় চিয়াং কাইশেকের হাতে।
- ১৯৩১-জাপান কর্তৃক আক্রমণ।
- ১৯৩৭-চিয়াং কাই শেকের কমিউনিস্ট বিরোধিতা শুরু, জাপান কর্তৃক পুনরায় আক্রমন।
- ১৯৪৯-১ অক্টোবর মাও জেংদং কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী চীন গঠিত।
- ১৯৭৬-মাও জেদেং এর মৃত্যু।
- ১৯৮৯-তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের দাবিতে বিক্ষোভ।
- ১৯৯৭-১লা জুলাই ১৫৬ বছরের শাসন শেষে ব্রিটিশদের কাছ থেকে হংকং ফেরত পায়।
- ১৯৯৯-২০ ডিসেম্বর ম্যাকাও চীনের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ২০০১-মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি বিমান অবতরণে বাধ্য হয়।
- ২০০২-WTO-র সদস্যপদ লাভ।
- ২০০৩-১৫ মার্চ ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস কর্তৃক হু জিনটাও নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। অক্টোবরের প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের যাত্রা।
- ২০০৮-প্রথম অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়।

১২.৪ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মেরুকরণ (Chaina- USA Relationship Regarding Economic Development of China)

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকলেও এ দুটো দেশের মাঝে সম্পর্কের অবনতি হোক তা অনেকেই চাইবেন না। যদি সম্পর্কের অবনতি ঘটে তা হলে তা বিশ্ব রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে।

নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চীনের যেমনি প্রয়োজন

রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার ঠিক তেনি যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রয়োজন রয়েছে চীনের। চীনের নিজের স্বার্থেই সম্পর্কটা গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে চীন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের প্রয়োজন রয়েছে চীনের সহযোগিতায়।

যে সকল বিষয় নিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে

১. **চীনে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হওয়া :** যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নেতারা বেশ কিছুদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে যে, চীনে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং চীনে গণতন্ত্রকামীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। চীন এ অভিযোগ বার বার অস্বীকার করে আসছে। চীন বলছে, যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নটি দেখে চীন সেভাবে দেখে না। চীন এটাও বলেছে মানবাধিকার ব্যাপারটি সম্পূর্ণই চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে অন্য দেশের কোনোকিছু করণীয় নেই। মার্কিনি চাপের মুখে হোক কিংবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক তিয়েন আনমেনের ঘটনাবলির কারণে যারা গ্রেফতার হয়েছিল, চীন প্রায় সবাইকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে। এদের অনেকেই এখন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। চীনে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যাদেরকে চিহ্নিত করেছে। চীন বলেছে এরা চীনের ফৌজদারি আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত এবং সেই আইন অনুযায়ী বিচার হবে।

২. **তাইওয়ান প্রশ্নে :** তাইওয়ান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে সমালোচনা করেছে চীন। যুক্তরাষ্ট্র এখন অবশ্য তাইওয়ানকে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয় না। তাইওয়ানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাইওয়ানের অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। চীন তাইওয়ানকে নিজের একটি অংশ বলেই মনে করে এবং বিশ্বাস করে ১৯৮০ সালে দেং জিয়াও পিং যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন (এক দেশ দুই নীতি) সেই তত্ত্ব অনুযায়ী তাইওয়ান একদিন চীনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমনটি হয়েছে হংকং। তাইওয়ানের নেতারা অবশ্য এই তত্ত্বে আস্থাশীল নন। তারা তাইওয়ানের স্বাধীনতা চাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের স্বাধীনতা না চাইলে তাইওয়ানের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছে। তাইওয়ান প্রশ্নে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরেছে। ওবামা প্রশাসন বলেছে বর্তমান প্রশাসন পূর্বের তাইওয়ান নীতি অনুসরণ করবে না। চীন তাইওয়ানকে তার একটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশ বলেই মনে করে। ক্লিনটন প্রশাসন এই চীনা নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ২৯ জানুয়ারি, ২০১০ ওবামা প্রশাসন কংগ্রেসকে জানায় তাইওয়ানের কাছে ছয় মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে হোয়াইট হাউস। হোয়াইট হাউসের ঘোষণার পর পরই বেইজিং-এ নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। একই সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ২২টির মতো সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্থগিত করার কথাও জানিয়ে দেয় চীন। ভবিষ্যতে তাইওয়ান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের কার্যকলাপ চীনের স্বার্থ পরিপন্থী বলেও যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই তাইওয়ান প্রশ্নটি নিয়েই ভবিষ্যতে চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

৩. **তিব্বত ইস্যু :** তিব্বতের প্রশ্নেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। ওবামা প্রশাসন তিব্বত ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বের নীতিকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। ওবামা প্রশাসন তিব্বত ইস্যুতে চীনের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিলেও তিব্বতে মানবাধিকার প্রশ্নে তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বারাক ওবামা তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামার সাথে বৈঠক করলে চীন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। ২০১১ সালে তিব্বতে চীনা পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলে চীন তাকে কঠোর হস্তে দমন করে। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে তিব্বতে একজন কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে চীন। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে চীনা নেতাদের উচিত ধর্মীয় নেতা দলাইলামার সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করা। চীন এ ধরনের আলোচনা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে

আসছে। চীন তিব্বতকে তার একটি অংশ বলেই মনে করে। ১৯৫৯ সালে চীন তিব্বত দখল করে নিয়েছিল। সেই থেকে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামা ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপন করে আসছেন।

৪. **চীনে ধর্মীয় অধিকারের বিষয় :** যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে ধর্মীয় অধিকারের প্রশ্নটি এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে জিয়াং জেমিনের ওয়াশিংটন সফরের সময় তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ম্যাডেলিন অলব্রাইট প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছিলেন যে চীনে ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। চীনে মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সমস্যা আছে এমন অভিযোগও শোনা যায়। ভবিষ্যতে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্ন এই ধর্মীয় অধিকারের প্রশ্নটি একটি ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৫. **চীনের পাকিস্তানে পারমাণবিক প্রযুক্তি সরবরাহ :** চীন পাকিস্তানে পারমাণবিক প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে এমন অভিযোগও ওয়াশিংটনের শোনা যায়। পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণে পর চীনের ওপর সঙ্গতকারণেই ওয়াশিংটনের সন্দেহ আরো বাড়ছে।

মনে রাখার Technique & Tips

চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে প্রধান ভূমিকাগুলো

- জিয়াং জেমিন দলের গঠনতন্ত্রে ব্যবসায়ীদের সদস্য এবং সরকার যন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত উন্মুক্ত করেন।
- দেং জিয়াও পিং ১৯৭৯ সালে চীনকে পুঁজিবাদী বাজারে উন্মুক্ত করেন।
- প্রবৃদ্ধিমুখী অর্থনীতি ও ট্রেড ইউনিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কমিউনিস্ট সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।
- আসিয়ানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি।
- বিনিয়োগ আকৃষ্ট।
- দক্ষ জনশক্তি তৈরি।
- হংকং অন্তর্ভুক্তি।
- WTO-তে চীনের অন্তর্ভুক্তি।
- জমিতে ব্যক্তি মালিকানা।
- রাজনৈতিক সংস্কার।
- মুক্তবাজার নীতি।

৬. **বাণিজ্য ঘাটতি :** বাণিজ্য ঘাটতি চীনের অনুকূলে। যুক্তরাষ্ট্র এই ঘাটতি কমানোর আহ্বান জানালেও চীনের উদ্যোগ তেমন একটা ছিল না। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মতে এই ঘাটতি ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চীন তার অনুকূলে এই ঘাটতি স্বীকার করে ১৬৪ কোটি ডলার। হংকং- এর মাধ্যমে পণ্য চালানোর দিকটি চীন হিসাবের মধ্যে ধরে না। ঘাটতি কমানোর জন্য চীন কয়েক বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলের জন্য কয়েকটি বোয়িং বিমান ক্রয় করার জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। আপামীতে যুক্তরাষ্ট্র চীনে অত্যাধুনিক কম্পিউটার ও এফ-২০ যুদ্ধ বিমান বিক্রয় করবে। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসতে পারে।

১২.৫ চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাব খর্ব হওয়ার যৌক্তিকতা

১. চীনের যোগ্যতা।
২. সামরিক শক্তিকে আধুনিকীকরণ।
৩. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন।
৪. চীন–আসিয়ান সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া।

চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব যে খর্ব করবে, সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

গত এক দশকে চীন যে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত দুই দশক ধরে অর্থনৈতিকভাবে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। হঠাৎ করেই চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে হয়তো সময়ই নির্ধারণ করে দেবে সবকিছু।

যে সকল কারণে চীন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করবে বলে মনে করা হয় তা হলো :

১. **চীনের যোগ্যতা :** ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করার পিছনে বেশ কয়েকটি যুক্তি আছে।

প্রথমত : চীনের অপরিমেয় অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত : চীনের সামরিক শক্তি (সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বিবেচনা করলে চীন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়: ৩০ লক্ষেরও অধিক)।

তৃতীয়ত : সাম্প্রতিককালে এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ১৫টি দেশের সাথে তার সীমানা আছে যেগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ যথা মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহের অন্তর্ভুক্তি।

চতুর্থত : বিদেশি উপনিবেশিক শক্তিসমূহ-গত দু'শতাব্দী ধরে নিজেদের অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে চীনকে অনেক সময় অহেতুক অপমান করেছে যার জন্য প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে গৌরবান্বিত বর্তমানে অধিক শক্তি অর্জনকারী এ দেশটি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ বশে বিশ্ব শান্তি বিনষ্টকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

পঞ্চমত : বিশ্বের সবচেয়ে অধিক জনবহুল দেশ হবার কারণে জনসংখ্যাধিক্যজনিত সমস্যা এবং শহরগামী পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা নিরসন করতে হলে চীনের সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশটির গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে।

২. **সামরিক আধুনিকীকরণ :** বিশ্বভূমিকা পালনের লক্ষ্যে চীন প্রথমত তার সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। একই সাথে সে এক শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ যখন তাঁর দেশের জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেন তখন রাশিয়া ও চীন তার বিপক্ষে অভিন্ন ফ্রন্ট উপস্থাপনের ব্যাপারে একমত পোষণ করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট জেমিন ২০০১ সনের ১৬ই আগস্ট তারিখে মস্কোর ক্রেমলিনে এক বহুত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বস্তুত চীন তার নিরাপত্তা রণকৌশলকে দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকা প্রতিরক্ষামূলক থেকে আক্রমণাত্মক রূপ দিতে তৎপর। এর আসল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার ধারক মার্কিনিদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়ে ঐ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ব্যাপারে অধিক উপযোগী বলে বিবেচিত বহুমেরু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা । এমতাবস্থায় এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বিশেষত সাবেক কট্টরপন্থি প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড, চীনকে তাদের পয়লা নম্বর শত্রু বলে মনে করতেন।

৩. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি :** চীন এ ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে অবগত যে তার সামরিক, বিশেষত ক্ষেপণাস্ত্র, কার্যক্রমকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক সাফল্য লাভের কোনো বিকল্প নেই। বাস্তবে দেখা যায় যে চীন অতি দ্রুত বেগে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে এটা বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। এমতাবস্থায় সে দেশটি অর্থনৈতিক নেতৃত্বের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমবর্ধমানভাবে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৯৫ সনে চীনের মোট জাতীয় আয় (GNP) ছিল ৩ ট্রিলিয়ন ডলারেরও উপরে যা জাপানের মোট জাতীয় আয় ২.৬ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি কিন্তু শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয় ৬.৭ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে কম। যদি চীনের অর্থনীতি প্রতি আট বছরে দ্বিগুণ হয় তবে ২০২০ সাল নাগাদ এটা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

৪. **চীন-আসিয়ান সম্পর্ক :** চীন-আসিয়ান মুক্তবাণিজ্য চুক্তি এই দুটির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত হলে এবং নিরাপত্তা সম্পর্ক দৃঢ় হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব আরও বিস্তৃত হবে যা USA এর Asia Pacific এলাকায় প্রভাববলয় প্রতিহত করবে। চীন প্রকৃতপক্ষে এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করছে। একক পরাশক্তি

নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থায় নিজেকে পরাশক্তি হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলা প্রয়োজন চীন দৃঢ় পদক্ষেপে সেদিকে এগিয়ে চলছে। ২০১৩ সাল নাগাদ চীন বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ততদিন পর্যন্ত পরাশক্তির পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করতে চীন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে।

মনে রাখার Technique & Tips

- বিশ্বের বিস্তীর্ণ উচ্চগতি সম্পন্ন রেলপথের শীর্ষে দেশ-চীন (দ্বিতীয় স্পেন)
- বৈদ্যুতিক রেলপথের দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শীর্ষে-চীন (দ্বিতীয়-রাশিয়া, তৃতীয়-জার্মানি, চতুর্থ ভারত ও পঞ্চম-জাপান)
- চীনের প্রথম বিমানবাহী রনতরীর নাম-লিয়াওনিং।
- দ্রুততম ট্রেনের জন্য বিশ্বে দীর্ঘতম রেলপথ চালু করছে-চীন। ২০১২ সালের ২৬ ডিসেম্বর ২,২৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ রেলপথ উদ্বোধন করা হয়।
- গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরনের শীর্ষ দেশ-চীন।
- 'জে-২০' যে দেশটিকে যুদ্ধ বিমান-চীন।
- বিশ্বের প্রথম মেধাভিত্তিক সিটিল সার্ভিসের সূচনা হয়-চীনে।
- চীনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করে-জিনজিয়াং প্রদেশে।

৫. **চীন-ভারত দ্বীপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি :** বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ লোকের বসবাস মাত্র ভারত ও চীনে। কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শিল্পে উন্নীয়মান দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুটি দেশের ২৭০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাজার বিশ্বের যে কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলের চেয়ে সমৃদ্ধ। চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে বেগবান রাখতে সে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী জেমিন পরস্পরের দেশ সফর করেছেন। উভয় দেশের মধ্যে অনেক বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে যা উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করতে সহায়ক হবে। ভারত-চীন ইতোমধ্যে উভয় দেশের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি একমত হয়েছে। বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে নাথুলা পাস। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সামরিক আদান প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়া চীনের প্রভাব দুর্বল করার জন্য ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তাগিদ অনুভব করছে। যদিও চীন-ভারত কেউই দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন খবর পছন্দ করে না।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৬. **রপ্তানিনির্ভর বিনিয়োগ :** উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি পরিকল্পনা চীনের অর্থনীতিতে নতুন হাওয়া যোগ করেছে। চীনে মূলত পণ্য প্রস্তুত এবং শ্রমনির্ভর খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাথে এখানেই চীনের পার্থক্য। এ বিনিয়োগের ফলে রপ্তানিনির্ভর বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ১৯৯৫ সালে রপ্তানিতে প্রক্রিয়াজাত বাণিজ্য ছিল ৫০% এর বেশি। আর ২০০১ সালে ৫০% এর বেশি অংশ দখল রেখেছে সে খাত। ১৯৯৬ সাল থেকে চীনে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার প্রতিবছর বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে। যার ৯০% এর বেশি পণ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে। সুতরাং রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. **আমদানী বৃদ্ধি :** রপ্তানিমুখী অর্থনীতির কারণে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামালের জন্য আমদানিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ পণ্য প্রস্তুত এবং প্রক্রিয়াজাত করার কাঁচামাল চীন অভ্যন্তরীণ অংশ থেকে মেটাতে পারছেনা। এতে করে অর্থনীতি ভারসাম্য বজায় রেখেছে। ১৯৮৫-২০০৩ সাল পর্যন্ত চীনে মোট বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬১.৬৪%, যার ৬২.৪১% রপ্তানিতে এবং ৬০.৯১% আমদানিতে। চীনের এ আমদানি বাণিজ্য রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ সালে চীন আমদানি করে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এশিয়ার সর্বোচ্চ আমদানি বাজার এবং ২০০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তাছাড়া চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নিজের জনগণের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন আয় বৃদ্ধির ফলে মোটর গাড়ির পরিমাণ বাড়ছে এবং তার সাথে তেলের চাহিদাও বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই প্রাকৃতিক জ্বালানি ক্রয়ে চীনের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। রপ্তানিখাত সচল রাখার জন্য আমদানি নীতিও ব্যাপক পরিবর্তন করেছে চীন।

৮. **আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি :** পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম জনবহুল বাজার। চীনের উৎপাদিত পণ্যর জন্য যা সহজ বিপণন ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি রয়েছে। এছাড়া এসব এলাকার কাঁচামাল চীনের উৎপাদিত পণ্যের জন্য সহজলভ্য হবে। চীন মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি করে থাকে। ফলে এশিয়ার সাথে উন্নত দেশগুলোর যে বাণিজ্য ঘাটতি, তা পূরণের মাধ্যমে একদিকে এশিয়া অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত থাকছে, তা দিয়ে এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলো জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও জার্মানির কাছ থেকে আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য স্থাপন করছে। ২০০৪ সালে IMF-এর এক জরিপে দেখা যায়, চীনের সাধারণ বাণিজ্য তার ব্যবসায়ী অংশীদার বিশেষত এশিয়ায় অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন-চীনের সাধারণ বাণিজ্য ১০% হ্রাস পেলে এশিয়ায় GDP ০.৪% কমে যাবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষায়ও চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৯. **দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন :** চীন গত দুই দশক ধরে দ্রুত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। চীনের অর্থনীতিতে যে প্রবৃদ্ধির হার তা ব্যতিক্রম কিছু নয়। চীনের প্রবৃদ্ধির হার ৯.৫% এই ধারাবাহিকতা চলছে কয়েক বছর ধরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চীনের ১,১৫৪.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একটি রেকর্ড এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩৫.৭% গত কয়েক বছর বিশ্ব-অর্থনীতিতে মন্দাভাব সত্ত্বেও চীনের প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত। ২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ব-অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৫%, ২%, ৩% এবং ৩.৯% সেখানে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩% এর বেশি। এছাড়া ২০০৪ সালে চীনে বিনিয়োগ হয়েছে ৬০.৬৩ বিলিয়ন ডলার। আর ৫৩.৫ বিলিয়ন, ৫২.৭ বিলিয়ন, ৪৬.৮ বিলিয়ন এবং ৪০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ২০০৩, ২০০২, ২০০১ ও ২০০০ সালে। বিশ্বে বৈদেশিক বিনিয়োগ যেখানে কমছে সেখানে চীনে বিনিয়োগ বাড়ছে। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্প অঞ্চলগুলোতে উৎপাদন খরচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ সস্তা শ্রমভিত্তিক চীনে চলে যাচ্ছে। চীনের এ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি অর্থনীতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছতে তাকে সহায়তা করছে।

১২.৬ অর্থনৈতিক আধিপত্যে চীন-যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব (Chaina-USA Conflict Regarding Economic Leadership)

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বর্তমান সংকট : ২০১১ সালে বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল চীন। জনসংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম চীন; যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয়। মোটরযান ও তেলের অন্যতম বড় ক্রেতাও তারা। আবার গ্রিন হাউস নিঃসরণের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান প্রথম সারিতে যুক্তরাষ্ট্র ১ নম্বর চীন ২ নম্বরে। বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদের উৎখাত ও পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ ইস্যুতেও তারা একমত। এসব দিক দিয়ে তাদের আগ্রহের জায়গাটা এক হলেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে চরম শত্রু বা মিত্র নয় পরস্পর। সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেশ দুটি প্রতিপক্ষ নয় বরং প্রতিযোগী।

স্বীকৃতি সংকট : স্বাধীনতা লাভের তিন দশক পরও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকৃতি দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। তাইওয়ানের মাধ্যমে তারা চীন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখত। সমাজতান্ত্রিক চীনকেও সহজে মেনে নিতে পারে নি যুক্তরাষ্ট্র। আর পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও বিশ্বাস ছিল না চীনের। ১৯৫০ সালে দুই কোরিয়ার যুদ্ধের সময় একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে। এছাড়া ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু হওয়া ভিয়েতনাম যুদ্ধেও তাদের অবস্থান ছিল বিপরীতমুখী। এ কারণে জাতিসংঘে সদস্য পদ পওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র। পরে অবশ্য এ দেশ দুটি নিজেদের স্বার্থেই দ্বিপাক্ষীক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়।

কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা : অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে দুই দেশই তাদের দূতাবাস খোলে এবং রাষ্ট্রদূত পাঠায়। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। এ সময় বেইজিংয়ে লিয়াজোঁ অফিস খোলে যুক্তরাষ্ট্র। একইসঙ্গে ওয়াশিংটন ডিসিতে চীন তাদের কার্যালয় খোলে। টানা পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের সূচনা হয়।

অর্থনৈতিক যাত্রা : ১৯৭২-৭৩ সালে সিনো-আমেরিকান বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজারের বেশি প্রকল্পে চীন-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। মূল ভূ-খণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ১০০টি বহুজাতিক প্রকল্পের কাজ চলছে। রাজনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হলেও তার খুব একটা প্রভাব কখনই অর্থনৈতিক সম্পর্কে পড়ে নি।

অস্থিরতা : ১৯৮৯ সালে তিয়েনআনমেন স্কয়ারের ঘটনায় চীনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্কে সংকট দেখা দেয়। এ ঘটনায় চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশের সরকার নানা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়। যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চীনের ওপর। ফলে বিশ্ব-নেতারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-বিশেষ করে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ২০০১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখে চীনের ওপর। পরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এ নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে। ১৯৯৬ সালে তাইওয়ানের জলসীমায় চীনের সামরিক মহড়া নিয়ে বেইজিং-ওয়াশিংটন উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯৯ সালে বেলগ্রেডে চীনের দূতাবাসে ন্যাটোর বোমা বর্ষণ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিলেও দুই দেশই তাদের বিভেদ দূর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ২০১০ সালে তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামার সঙ্গে ওবামার বৈঠক নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ বৈঠকের পর বেইজিংয়স্থ মার্কিন দূতাবাসের বিরুদ্ধে সমন জারি করে চীন। এ নিয়ে কিছু দিন টানাপোড়েন চলে।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ভেতরে ভেতরে অনেকটাই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্কের মতো। প্রকাশ্যে, বাণিজ্যে, কৌশলগত দিক থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না দেশ দুটি। তবে বেশ কিছুদিন ধরে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে কখনো মার্কিন-কর্তারা ছুটে গেছেন বেইজিংয়ে। কখনো চীন-কর্তারা গেছেন ওয়াশিংটনে। দুই দেশের উদ্দেশ্য একটাই কোনো কারণে তাদের মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন-বেইজিং ও ওয়াশিংটন দুই পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। কারণ, দুটি দেশ কেউ কারো ছাড়তে রাজি নয়। এছাড়া তাদের একের জন্য অপরের সহযোগিতারও প্রয়োজন পড়ে।

আমেরিকার কিছু কৌশলগত নীতি-বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের ধারণা-প্রশান্ত মাহসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করে চীন তার উপস্থিতি বাড়াতে চায়। আর এশিয়ায় একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেতে তো চায়-ই। তবে চীনের সামরিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সমপর্যায়ের নয়। ক্ষেপণাস্ত্র মজুদের দিক দিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াতে পারবে না চীন। এ কারণে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তারা এড়িয়ে চলে। তবে বিভিন্ন দ্বীপে নৌ-বাহিনী মোতায়েন করে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর মহড়ায় নেমেছে চীন।

সম্পর্ক জোরদার করতে চলতি বছরের জানুয়ারিতে চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও ওয়াশিংটন সফর করেন। ওই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও জিনতাও এক যৌথ বিবৃতি দেন। এতে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক 'ইতিবাচক, সহযোগিতামূলক ও সমন্বিত' বলে অভিহিত করা হয়। এরপরও গত ছয় মাসে দুই দেশের সম্পর্কে অনেক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে-কখনো চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে, কখনোবা আন্তর্জাতিক সীমায় দুই দেশের প্রভাব বিস্তার নিয়ে।

১২.৭ সাম্প্রতিক চীনের অর্থনীতি

যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির স্থানটি চীন দখল করেছে। IMF এর হিসাব অনুযায়ী চীনের অর্থনীতির আকার ১১ ট্রিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের ১০.৮ ট্রিলিয়ন। ১৮৭২ সালে যুক্তরাজ্যকে পিছনে ফেলে বৃহত্তম অর্থনীতির স্থানটি যুক্তরাজ্য দখল করে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর সাথে, অর্থাৎ ১৪২ বছরের মাথায় চীনের কাছে শীর্ষস্থানটি হাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গত কয়েক দশকে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়, তাতে পিছিয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। ক্রম মতার সমর্তার (Parchariy Powr Parity ev PPP) ভিত্তিতে অর্থনীতির আকার নির্ধারন করেছে IMF তবে জীবনের যাপনের ব্যয় আমলে নেয়া হয়নি। এটি করা হলো চীনের অর্থনীতির আকার এখনো যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ছোট। IMF এক হিসাবে বলেছে ২০১৯ সাল ন্যাগাদ চীনের অর্থনীতির আকার ১৬.৭ ট্রিলিয়ন পাউন্ড হবে; তখন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির দাঁড়াবে ১৩.৮ ট্রিলিয়ন পাউন্ডে।

১২.৮ চেন গুয়াংচেং-কে নিয়ে সম্পর্ক টানাপোড়েন

চীনের ভিন্নমতাবলম্বী মানবাধিকার কর্মী চেন গুয়াংচেং এপ্রিলে ২০১২ বেইজিংস্থ মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নেন। এ নিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয় দোষারোপের পর্ব। কিছুটা উত্তেজনাও দেখা দেয়। মার্কিন দূতাবাসে চেন প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে মুখ না খুললেও পরে দেশটির তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের পূর্বনির্ধারিত চীন পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টা পরে দূতাবাস ছাড়েন চেন। বেইজিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ার পরই তিনি দূতাবাস ছাড়তে রাজি হন। পূর্বাঞ্চলীয় শানডং প্রদেশে নিজ বাড়িতেই গৃহবন্দী ছিলেন জন্মান্ধ চেন। ২২ এপ্রিল, ২০১২ তিনি নিরাপত্তা প্রহরীদের চোখে ধুলা দিয়ে বাড়ির উঁচু দেয়াল টপকে বাইরে বেরিয়ে যান। এরপর কয়েকশ কিলোমিটার পথ গাড়ি চালিয়ে বেইজিং পৌঁছান তিনি। চেন অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও কী ভাবে এই অসাধ্য সাধন করলেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেছে।

চীনের এক সন্তান নীতি ও জোরপূর্বক গর্ভপাতের বিরোধিতা করে ২০০৫ সালে আলোচনায় আসেন চেন। দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় শানডং প্রদেশের স্থানীয় কর্মকর্তাদের বিরাগভাজন হন তিনি। সরকারের নীতির বিরোধিতার কারণে তাকে চার বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই চেনকে নিজ বাড়িতে বন্দী রাখা হয়। এ সময় চেন এবং তার পরিবারের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ করেছেন তিনি। চেন প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কোনো কথাই বলেন নি। তবে পরে নিজের এবং নিজ পরিবারের নিরাপত্তা হুমকির মুখে-এ কারণ দেখিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। জন্মান্ধ চেনের অভিযোগ, বেইজিং কর্তৃপক্ষ তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে।

চেন জানান, চীন তাকে এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার পরই মার্কিন দূতাবাস ছাড়েন তিনি। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি ভেঙে তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে বলতে চাই যে আমাকে এখান (চীন) থেকে বের করার জন্য আপনি কিছু করুন। নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। সম্ভব হলে আমাকে হিলারির সঙ্গে দেশত্যাগের ব্যবস্থা করে দিন।

বেইজিং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র। অবশেষে চেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে যাওয়ার সুযোগ দেয় চীন। ১৫ দিনের মধ্যেই তার কাগজপত্র প্রস্তুত করার কথা জানিয়েছিলেন কর্মকর্তারা। তবে জরুরি ভিত্তিতে তিন দিনের মধ্যে তার পাসপোর্ট ইস্যু করে বেইজিং। এরপর নিউইয়র্কে সপরিবারে পাড়ি জমান চেন। তার চীন ছাড়ার মধ্য দিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার একটি বড় কূটনীতিক বিবাদের অবসান হলো।

১২.৯ যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি

চেনের ঘটনার যবনিকা না ঘটতেই চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে শুরু হয় নতুন টানাপোড়েন। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে গোয়েন্দা অভিযোগ হংকং থেকে চীনা নিরাপত্তা-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে দেশের গোপনীয় ও স্পর্শকাতর তথ্য পাচারের অভিযোগও ওঠে। ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের কোনো এক সময়ে ওই কর্মকর্তাকে আটক করে চীন। তবে কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করে নি বেইজিং। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য কোন মন্তব্য করে নি। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি চীনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ মন্ত্রণালয় চীনের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে পরিচিত। তবে ওই মন্ত্রীর নাম জানা যায় নি। এ ঘটনার পর ওই মন্ত্রীকেও তার কাজ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে ১৯৮৫ সালের পর চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ উচ্চপর্যায়ের গোয়েন্দাগিরির ঘটনা হবে।

১২.১০ বর্তমান পরিস্থিতি (Present Situation)

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সেনা উপস্থিতি বাড়াতে নতুন পরিকল্পনার কথা বলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেটা জানান, ২০২০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ ভাগ রণতরী এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। তাদের এ ঘোষণায় কিছুটা শঙ্কিত চীন। কারণ, এ অঞ্চলে ওয়াশিংটনের উপস্থিতি বেইজিংয়ের কাছে কখনই কাম্য

নয়। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে গত জানুয়ারিতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এশিয়ায় মনোযোগ বাড়ানোর ঘোষণা দেন। চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি মোকাবিলা করাও মার্কিন এ ঘোষণার একটি উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল। তবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বড় ধরনের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র এখানে নৌ-বাহিনীর জাহাজ, বিমান ও সেনার সংখ্যা বাড়াতে চাচ্ছে। যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণ ও অভিযানের মতো অস্থায়ী উদ্যোগের মাধ্যমে এ অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে তারা। এসবের মাধ্যমে অংশীদার দেশগুলোর বন্দর, বিমানঘাঁটি এবং অন্যান্য স্থাপনায় প্রবেশের সুযোগ চাচ্ছে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক মিত্র রাষ্ট্রগুলো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এশিয়ার উদীয়মান শক্তি চীনের সঙ্গে এ অঞ্চলের অনেক দেশেরই দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও রয়েছে তাদের প্রতিরক্ষা যোগাযোগ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে চীনের শক্তিমত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত এবং সে দেশটির সাথে নতুন ধরনের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জড়িত হয়ে পড়ার বিষয়ে সন্দেহাতীত থাকলেও আপাতত তার রণকৌশলগত এবং একই সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য চীনের সাথে কাজ চালানো গোছের সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। বিশ্ব পরিসরে তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে চীন অতিশয় সজাগ। এজন্যই ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে একচ্ছত্র পরাশক্তি হিসেবে বিরাজমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যখন চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে তখন দেং জিয়াও পিং বলেছিলেন: "যদি তোমরা চাও চীন ক্ষমা ভিক্ষা করুক তবে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। যদি ১০০ বছরও চলতে থাকে তবু চীনের জনগণ অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য নতজানু হবে না।" আর তাঁর উত্তরাধিকারী জিয়াংজেমিন জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বক্রোক্তি করে 'কোনো কোনো বৃহৎ শক্তি'কে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ছুতায় অন্য রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব সীমা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের ওপর এ ধরনের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। এর এরূপ ঘোষণা ইঙ্গিত দেয় যে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে চীন অত্যধিক শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে এবং তার এরূপ শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব পরিসরে অধিকতর জোরালো ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর যা বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করবে। আর চীনের এসবই সম্ভব হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদৌলতে।

৬.৯(১) পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র বৃদ্ধি : ৩ জুন ২০১৩ সালে প্রকাশিত সুইডেনের স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (SIPRI)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী চীন, ভারত ও পাকিস্তান-এই তিনটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণ বাড়িয়েছে। অপরদিকে দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র গত বছর তাদের পারমাণবিক সামর্থ্য হ্রাস করেছে। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল পারমাণবিক অস্ত্রের সামর্থ্য স্থিতিশীল রেখেছে।

ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর বর্তমান পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের সংখ্যা নিম্নরূপ :

৬.৯(২) মহাকাশ গবেষণায় চীন-যুক্তরাষ্ট্র সমকক্ষ : খুব দ্রুত মহাকাশ গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপের পর্যায়ে সক্ষম হবে চীন। চীন যে ক্রমশই মহাকাশে তাদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে তা তাদের সাম্প্রতিক মহাকাশ অভিযান থেকে স্পষ্ট হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বিষয়ক সংস্থা নাসা'র মহাকাশ বিভাগনী ৫. অমিতাভ ঘোষ বলেন, চীন ১০ বছরের মধ্যে মহাকাশ গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপের পর্যায়ে চলে যাবে। মহাকাশ অভিযানের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করার কারণ হচ্ছে এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনাকারী দেশগুলো প্রযুক্তিতে অন্য দেশের চেয়ে অগ্রগতি অর্জন করে। তাছাড়াও মহাকাশ প্রযুক্তি সামরিক বাহিনীতেও ব্যবহার করা যায়।

১২.১১ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই

দেশ	আগের সংখ্যা	বর্তমান সংখ্যা
রাশিয়া	১০,০০০	৮,৫০০
যুক্তরাষ্ট্র	৮,০০০	৭,৭০০
ফ্রান্স	৩০০	৩০০
চীন	৯০-১০০	৯০-১০০
ভারত	৯০-১০০	১০০-১২০
পাকিস্তান	১০০-১০০	১০০-১২০

চীন ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কৌশলগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল ও নীতি প্রণয়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০১৩ সালের ৬-১০ জুন চীনের কুনসিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'চীন-দক্ষিণ এশিয়া এক্সপজিশন ও ফোরাম।' এই এক্সপজিশনের অন্যতম রাজনৈতিক তাৎপর্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে চীনের বহুমাত্রিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। কারণ বর্তমান বিশ্বের ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দক্ষিণ এশিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে চীন এ অঞ্চলে কৌশলগত অংশীদার থেকে পিছিয়ে থাকবে না।

এশিয়ার ভারসাম্যের পুনর্বিন্যাস'-এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। তাছাড়া ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের কোল ঘেঁষে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থানের কারণে এ অঞ্চল একটি ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত স্থানে পৌঁছেছে। আর তাই চীন তার আধিপত্যবলয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগরকে মুক্তার মালার মতো বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নৌবন্দর দিয়ে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের গোয়াদার ও শ্রীলংকার হাম্বানটোটায় তারা বন্দর স্থাপন করেছে। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রও তাদের মিত্র দেশগুলো-ভারত মহাসাগরে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে অগ্রসর হয়েছে। যেমন: ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী এবং তার আরো চারটি মিত্র দেশ যথা ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপান ভারত মহাসাগরে মলাবার নামক একটি বৃহৎ নৌমহড়া করে, যার মাধ্যমে এ নৌঅঞ্চলে প্রথমবারের মতো দুটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার গ্রুপ অবস্থান নেয়। লক্ষণীয় যে, এ মহড়ায় চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি এবং তার পর পরই চীন ভারত মহাসাগরে তাদের অবস্থান আরো জোরদার করতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গতদিক থেকে প্রতিযোগী চীন। তাই দক্ষিণ এশিয়া যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে চলে না যায়, চীন সে কারণেই নানা উদ্যোগ ও কৌশল নিচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে যে নতুন শক্তির উত্থান হচ্ছে, তার কার্যত প্রতিযোগিতার প্রধান স্থান হতে যাচ্ছে ভারত মহাসাগর। আর তাই একই অঞ্চলের দেশ হিসেবে চীন কখনই চাইবে না যে, দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রভাব ক্ষুণ্ন হোক।

১২.১২ আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র ঠাণ্ডা লড়াই

আফ্রিকা মহাদেশে বিনিয়োগ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। ২৯ জুন, ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আফ্রিকা সফরের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। যেমন: চীন গতবছর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ১০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৯০০০ কোটি ডলারে যেতে পারে। এছাড়াও চীন আফ্রিকায় নিজ দেশের শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করে। চীন আফ্রিকা থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে নিয়ে তা রূপান্তরিত করে এবং সেই পণ্য আবার বিক্রি করে। এ

http://thejobstudy.com
Go to Contents

প্রসঙ্গে বারাক ওবামাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে সতর্ক করে বলেন বিদেশি কোম্পানিগুলো যেন এ দেশের শ্রমিক নিয়োগ করে সেই বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে এবং ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখে তিনি আফ্রিকার বৃহৎ সমস্যা সমাধানে ৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বৃহৎ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হবে প্রায় ৩ শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সাম্প্রতিককালে, দুই দেশের নীতি নির্ধারকদের বক্তব্য-বিবৃতিতেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের নেতারা আফ্রিকার দেশগুলোতে কয়েকবার সফর করেছেন এবং প্রাকৃতিক ও অবকাঠামো খাতে প্রচুর বিনিয়োগে গুরুত্ব দিয়েছেন। চীনের নেতারা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কেবল উঠতি দেশগুলোতে চারা রোপণ করে, অনুন্নত দেশে নয়।

১২.১৩ যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা

৭ জুন, ২০১৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে সফররত চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে এক শীর্ষ বৈঠকে মত পার্থক্য কাটিয়ে উঠে সহযোগিতামূলক নতুন সম্পর্ক গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার উত্তেজনার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চীনের বিরুদ্ধে সাইবার হামলার অভিযোগ ও বাণিজ্যিক গোয়েন্দাগিরি। এছাড়া চীনের মিত্র উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। দুই নেতা মতভেদ দূর করে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছেন।

এ বৈঠক প্রসঙ্গে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ পথের রূপরেখা তৈরি করতেই তারা বৈঠকে বসেছেন। এবং তিনি দুই দেশের মধ্যে গভীর সহযোগিতার প্রত্যাশা করে বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বড় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের একটি নতুন মডেল গড়তে পারে

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **বর্তমানে কোন দেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি?**
উত্তর: চীন।

২. **কত সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল?**
উত্তর: ১৯৯২

৩. **কত সালে চীন আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (IMF) এবং বিশ্বব্যাংক (World Bank) এ যোগদান করেন?**
উত্তর: ১৯৮০ সালে।

৪. **গত পাঁচ বছরে চীনের মাথাপিছু আয় কত থেকে কত ডলারে উত্তীর্ণ হয়েছে?**
উত্তর: ২৭০ ডলার থেকে ৭৫১৮ ডলার।

৫. **কত সালের কত তারিখে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয়?**
উত্তর: ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর।

৬. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেটা জানান ২০২০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কত ভাগ রনতরী এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে?
উত্তর: ৬০ ভাগ।

৭. কত সালে অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২০০৮

৮. চীনের আয়তন কত?
উত্তর: ৯৮ লক্ষ ৬১ হাজার বর্গকিলোমিটার।

৯. কত সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রবেশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় চীন তার নিজের ভূমিকাকে অনেক সুদৃঢ় করেছে?
উত্তর: ২০০১ সালে ১১ই ডিসেম্বর।

১০. চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে আর কোন বিষয়ে এর প্রভাব পড়ছে?
উত্তর: পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক নীতি।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. একদেশে দুই নীতি কোথায় প্রচলিত আছে এবং কেন?
খ. চীন বর্তমান অর্থনীতিতে পরাক্রমশালী ব্যাখ্যা কর।

২. ক. চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে হবে রোল মডেল, যুক্তি দেখাও।
খ. ম্যাকাও দ্বীপ, তিব্বত ও হংকং বর্ণনা কর।

৩. ক. মুক্ত বাজার নীতি কী?
খ. চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

৪. ক. চীন ভারত দ্বীপাক্ষিক চুক্তি
খ. চীনের তিব্বত নীতি ব্যাখ্যা কর?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. "চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে খর্ব করবে"- মতামত দিন?

২. চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয় রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারে বলে মনে করেন ?

৩. চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে প্রধান ভূমিকাগুলো আলোচনা করুন ?

৪. যে সকল বিষয় নিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে তা আলোচনা করুন ?

অধ্যায় ১৩

আফগানিস্তান সমস্যার বর্তমান মূল্যায়ন
Afganistan Crisis, Present Aspect & Evaluation

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৩.১ ভূমিকা
১৩.২ ইতিহাসে আফগানিস্তান
১৩.৩ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধ
১৩.৩.১ সোভিয়েত মার্কিন দ্বন্দ্ব
১৩.৩.২ সোভিয়েত হস্তক্ষেপ
১৩.৩.৩ সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার
১৩.৪ নাজিবুল্লার অপসারণ
১৩.৫ তালিবানদের ক্ষমতা দখল ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া
১৩.৬ ইরানের ভূমিকা
১৩.৭ ওআইসির ভূমিকা
১৩.৮ ভারতের ভূমিকা
১৩.৯ বাংলাদেশের ভূমিকা
১৩.১০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা
১৩.১১ মধ্য এশিয়ায় প্রভাব
১৩.১২ পাকিস্তানের ভূমিকা
১৩.১৩ আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধের সমাধানে জাতিসংঘের উদ্যোগ
১৩.১৪ আফগানিস্তানে মার্কিন জোট বাহিনীর হামলা
১৩.১৫ তালেবানদের সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা
১৩.১৬ অস্ত্র ছেড়ে রাজনীতিতে আসার আহবান
১৩.১৮ আফগান যুদ্ধের দশ বছর
১৩.১৯ আফগান সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ
১৩.২০ মূল বক্তব্যসমূহ
১৩.২১ আফগানিস্তানের ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার
১৩.২২ ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ
১৩.২৩ ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা
১৩.২৪ তালেবানদের পতন এবং আফগানিস্তানের গণতন্ত্র
১৩.২৫ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন
১৩.২৬ ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা

১৩.১ ভূমিকা (Introduction)

আফগানিস্তানের দীর্ঘ ৪০ বছরের ইতিহাসে সেখানে মার্কিন রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৭৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাদশাহ জহির শাহকে উৎখাত করে আফগানিস্তানে সোভিয়েতপন্থি সরকার প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তারের জন্য সুকৌশলে এগোতে থাকে। ১৯৭৮ সালে কাবুল-মস্কো সামরিক চুক্তি সই হয়। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক বাহিনী প্রবেশ করে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত দখলদারিত্ব হটিয়ে সেখানে মার্কিন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তালেবানদের অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণসহ সকল ধরনের সহায়তা দিয়ে তাদেরকে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নামিয়ে দেয়। শুরু হয় আফগান সেনাদের সাথে তালেবানদের দীর্ঘ সংগ্রাম। আফগানিস্তানের প্রতিকূল পরিবেশে সোভিয়েত বাহিনী তালেবানদের সাথে পেরে উঠতে না পেরে ১৯৮৯ সালে সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। শুরু হয় মার্কিন কর্তৃত্ব বিস্তার। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আফগানিস্তান বিশ্ব রাজনীতির আলোচনায় চলে আসে। এর আগে আফগানিস্তান মূলত একটি তালেবান রাষ্ট্র ছিল। বিশ্ব রাজনীতি থেকে দেশটি বিচ্ছিন্ন ছিল। মাত্র তিনটি দেশের সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল: পাকিস্তান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সবকিছু উলট-পালট করে দেন। আন্তর্জাতিক সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা মতে, আগামী দিনে আফগানিস্তানে ভারত, চীন, পাকিস্তান, ইরান তাদের নিজ নিজ স্বার্থের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রাখবে। আফগানিস্তানে সমস্যার কারণে পাকিস্তানে ঘটেছে ব্যাপক তালেবান সংক্রমণ। আফগানিস্তানে ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে তালেবান শক্তি পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অপরদিকে, ইরান চাইছে আফগানিস্তানে তালেবান ও মার্কিন প্রভাবমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক সরকার।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে আফগানিস্তান

১৯১৯ → আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।
↓
১৯২৬ → ৯ জুন আফগানিস্তানের রাজতন্ত্র শুরু হয়।
↓
১৯৩৩ → বাদশাহ জহির শাহ আফগানিস্তানের দায়িত্ব নেন।
↓
১৯৫৭ → দেশে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা।
↓
১৯৬৪ → দেশে নতুন সংবিধান এবং সংসদ চালু হয়।
↓
১৯৭৩ → ১৭ জুলাই, আফগানিস্তানের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।
↓
১৯৭৩ → সালে মুহম্মদ দাউদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত।
↓
১৯৭৮ → বিপ্লবী কাউন্সিলের সভাপতি নূর মোহম্মদ তারাকি দেশের প্রধান হন।
↓
১৯৮৯ → ক্ষমতায় আসেন হাফিজুল্লাহ আমিন।
↓
১৯৯৭ → ক্ষমতায় আসেন সৈয়দ নজিবুল্লাহ।
↓
১৯৭৯ → পর্যন্ত রাজা-বাদশারা আফগানিস্তানে শাসনকার্য পরিচালনা করত।
↓
১৯৭৯ → ২৪ ডিসেম্বর, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠায় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ সালে যুদ্ধ শেষ হয়।
↓
১৯৮৯ → সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান ত্যাগ করে।
↓
১৯৯৬ → ক্ষমতায় আসে তালেবান গোষ্ঠী।
↓
২০০১ → সালের ১০ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়।
↓
২০০১ → সালের ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের উপর আক্রমণ চালায়।
↓
২০০১ → ২২ ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হামিদ কারজাই শপথ নেন।
↓
২০০৪ → হামিদ কারজাই সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।
↓
২০১১ → থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়।
২০১৪ → সালের মধ্যে ন্যাটোর সকল সৈন্য প্রত্যাহার হবে।

১৩.২ ইতিহাসে আফগানিস্তান
(Backgeound of Afganistan)

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি দেশ আফগানিস্তানের খানাখন্দ জুড়ে শুধুই রাজনৈতিক ঘনঘটা। রাজা জহির শাহ ১৯৩৩ সালে আফগানিস্তানের দায়িত্ব নেন। টানা চল্লিশ বছর দেশে রাজতন্ত্র কায়েম থাকার পর প্রজাতন্ত্রের জমানা ফিরে আসে ১৯৭৩ সালে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জহির শাহ তার রাজ্যপটে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া তোলেন। দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। ৬৪-তে দেশে নতুন সংবিধান এবং সংসদ গঠিত হয়। এরপর থেকে আফগানিস্তানের রাজতন্ত্র মৌলবাদী ও জোতদার, জমিদারদের কুনজরে পড়ে। সামরিক বিভাগের আধিকারিকদের কুটকৌশলে সংসদ, সংবিধানসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক কাঠামো অচল হয়ে পড়ে। সামরিক অফিসারদের সঙ্গে যোগ দেন কিছু মতলববাজ অসামরিক ব্যক্তি। ১৭ জুন ১৯৭৩ আফগানিস্তানে মুহম্মদ দাউদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। সমাজে সর্বাঙ্গীন সংস্কারের কথা বললেও দাউদের সরকার কিছুই করতে পারে নি। ১৯৭৮ সালে জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের সভাপতি নূর মোহম্মদ তারাকি দেশের প্রধান হন। দেশের নতুন নাম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান। এ সময় থেকে আফগানিস্তানের সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৯৭৯ সালে নূর মুহাম্মদ তারাকির পরিবর্তে ক্ষমতায় আসলেন হাফিজুল্লা আমিন। আমিন সাহেবও বেশি দিন টিকলেন না। বাবরাক কারমাল দেশ শাসনের দায়িত্বভার বুঝে নিলেন। বাবরাক কারমাল সরকারকে মদদ দিল সোভিয়েত রাশিয়া। অন্যদিকে সরকারবিরোধী জোটকে সাহায্য করল পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক সাহায্য ব্যাপকভাবে আসতে লাগল পাহাড় আর খানাখন্দে ভরা আফগানিস্তানে। পাকিস্তানে যখন মাদ্রাসাতে তালেবানদের ধর্মীয় শাসনে দীক্ষিত করার অনুশীলন চলছে, তখন সামরিক কুচকাওয়াজেও গা-গরম করার সুযোগ পেয়ে গেল তালেবানরা। সে সময় সৌদি ধনকুবের সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়নমনি। সোভিয়েতের প্রতিপত্তি হ্রাস করতে ওসামাকে তারা চেয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে বাবরাক কারমালের পরিবর্তে ক্ষমতায় আসেন সৈয়দ নাজিবুল্লা। সেই নাজিবুল্লা সরকার সোভিয়েত মদদে দীর্ঘ কয়েক বছর ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। সোভিয়েত জামানার অবসানের পর নাজিবুল্লা সরকারেরও বিপর্যয় ঘটে। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ এই ৪ বছর ধরে আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রায় বিনা যুদ্ধে তালেবান গেরিলাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানি এবং প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবান মিলিশিয়াদের উত্থান সেদেশে এক নতুন যুগের সূচনা করে। মোল্লা মুহম্মদ রাব্বানির নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় কাবুলে। বিশুদ্ধ ইসলামী রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় তালেবানরা 'শরীয়তি আইনে' বেঁধে ফেলে আফগানিস্তানকে। ৩২টি প্রদেশের মধ্যে ২০টিতেই তালেবানরা নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে। ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৬ এর আগে' ৯৫ এর নভেম্বরেও কাবুলে রাব্বানি সরকারকে জবরদস্ত শিক্ষা দেয় তালেবানরা। আর আজকের তালেবানদের 'শিক্ষা' দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদাজল খেয়ে নেমেছে।

পরবর্তী অর্থাৎ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দায়ে অভিযুক্ত ল্যাদেনকে ধরতে এবং তার রাজনৈতিক সংগঠন আল-কায়েদাকে নির্মূল করতে মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী ২০০১ সালে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে। ২০১৩ সালের আগষ্ট পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ বছর সেখানে আল-কায়েদা ও তালেবান নির্মূলের নামে ব্যপক হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞ পরিচালিত হলেও আল-কায়েদা ও তালেবান সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৩.৩ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধ (Afgan Civilwar in History)

১৩.৩ (১) সোভিয়েত মার্কিন দ্বন্দ্ব

গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূচনা সত্তর দশকের প্রথম দিক থেকে। রাজনীতির পাশাখেলায় কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার লড়াইয়ের রক্তস্রোত হয়েছে মধ্য

এশিয়ার স্থলবিশিষ্ট এই প্রজাতন্ত্র। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে ১৯৭৩ সালে বাদশাহ জহির শাহর রাজতন্ত্রের উৎখাত দিয়ে যদি এর সূচনা ধরা হয়, তবে ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্তও এর শেষ কোথায় তার হদিস পাওয়া কঠিন। এই সুযোগে পৃথিবীর দুই বৃহৎশক্তির টানাটানি মনোভাব আফগানিস্তানের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদেশের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সুযোগ বুঝে সোভিয়েত বিরোধী গোষ্ঠীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়েছে। আর আফগানিস্তানের অর্থনীতি মাটিতে মিশে গিয়ে লক্ষ লক্ষ আফগান নাগরিক পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে।



১৩.৩ (২) সোভিয়েত হস্তক্ষেপ

আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের সূচনা ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে। ১৯৭৩ সালে রাজতন্ত্র উৎখাত হওয়ার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নজর ছিল আফগানিস্তানের দিকে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েতরা পিছনে থেকে জেনারেল নূর মহম্মদ তারাকিকে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সে দেশের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অজুহাত দেখিয়ে ৫টি ডিভিশনে প্রায় ১ লক্ষ সেনা পাঠায়। এরপর থেকে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আশংকাজনক ভাবে বদলাতে থাকে। এর আগে আফগানিস্তানে কমিউনিজমের অবস্থা মজবুত করতে প্রায় ২৫ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র পাঠায়। সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বে ঝড় ওঠে। পশ্চিমা শক্তি, এশিয়ারও বিভিন্ন দেশ সোভিয়েত আচরণের তীব্র নিন্দা করে। এমনকি বহুদেশ ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকও বয়কট করে। আফগানিস্তান হয়ে উঠল সোভিয়েত মদদপুষ্ট সরকারি সেনাদল এবং বিদ্রোহী সেনাদলের রণক্ষেত্র। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই অবস্থা চরমে ওঠে। প্রতিদিনই শত শত মানুষ নিহত হয়। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সরকারি সেনাদলের তাড়া খেয়ে পাকিস্তানে ঘাঁটি গাড়ে বিরোধীরা। ৮০ সালের শেষ দিকে দশ লক্ষ আফগান শরনার্থী সীমান্ত টপকে পাকিস্তানে পালিয়ে আসে। এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান বা পিডিপিএ। সোভিয়েত ছত্র ছায়ায় গড়ে ওঠা এই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ছিল সরকার বিরোধী যে কোনও রকম আন্দোলন শুরুতেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। সরকারি সেনা বাহিনীর তাড়া খেয়ে

http://thejobstudy.com Go to Contents

পালিয়ে আসা হাজার হাজার মুজাহিদিনরা তলে তলে সামরিক শক্তিতে তৈরি হতে লাগল সোভিয়েত জুজুর ভয় দেখিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগানিস্তানের সোভিয়েত বিরোধী শক্তির হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে লাগল। বিদ্রোহী সৈন্যরা নৃশংসভাবে খুন হতে থাকল আফগানিস্তানে। এসবের মধ্যেই নূর মহম্মদ তারাকি মারা গেলেন। সোভিয়েত পরামর্শে ক্ষমতার অলিন্দে উঠে আসলেন বাবরাক কামাল (Babrak Kamal)। তার দীর্ঘ ৭ বছরের জামানায় কত লক্ষ 'বিদ্রোহী' যে খুন হয়েছেন, তার হিসেব মেলা কঠিন। অন্তত ছয় লক্ষ আফগান মানুষের মৃত্যুর জন্য কামালকে দায়ী করা হয়। ১৯৯৭ সালে সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ আফগানিস্তানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার পর আনুমানিক দশ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। ইরান এবং পাকিস্তানে পালিয়ে বেঁচেছেন ৩০ লক্ষ মানুষ। সোভিয়েত দখল দারিত্বের সেই সময় আফগানিস্তানে বিরোধীদের সাথে যুদ্ধে মারা যায় ১৫০০ সৈন্য আফগানিস্তানের গিরিপথে।

১৩.৩ (৩) সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার (soviet Convey Return)

১৯৮৫-৮৬ সাল থেকেই আফগানিস্তানের চেহারা আবার নতুন দিকে মোড় নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংকট জোরালো হয়ে ওঠে। আফগানিস্তানে বিপুল সেনা পাঠানোর ব্যয়ভার বহণ করা সোভিয়েতের কাছে হাতি পোষার মতো হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র এবং পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত মিত্র জোট, সোভিয়েতের বিরুদ্ধেই গলা তুলতে শুরু করে। ১৯৮৬ সালের শেষ দিকে ডঃ সঈদ মুহম্মদ নাজিবুল্লা আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হন। এদিকে সোভিয়েত সেনাদলের আফগানিস্তান থেকে চলে আসার দিনক্ষণ নিয়েও আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। অবস্থা বুঝে ডঃ নাজিবুল্লা ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে মুজাহিদিনদের প্রতি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন। আফগানিস্তানের বিদ্রোহী মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নানা দল উপদলের সৃষ্টি হয়। গোলা বারুদের লড়াইয়ে গোটা আফগানিস্তান যেন যুদ্ধবিগ্রহের বদ্ধভূমিতে পরিণত হয়। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাস থেকে আফগানিস্তানে রুশ সেনা অপসারণ শুরু হয়। নব নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে ঠেলে দিল মুজাহিদিনরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মুজাহিদিনদের অস্ত্র দেওয়া অব্যাহত রাখল। মার্কিন সংবাদ সংস্থার খবরেই প্রকাশ পেয়েছে রিগ্যান প্রশাসন প্রায় ৩০ কোটি ডলার দামের নতুন অস্ত্র সরবরাহ করেছে আফগান বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে। আফগানিস্তানে সংঘর্ষ থামাতে শান্তি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার সময় এই ধরণের সাহায্য গোটা পরিবেশকেই জটিল করে তুলেছিল। মুজাহিদিনরাও ডঃ নাজিবুল্লার শেষ দেখতে চেয়েছিলেন। আফগানিস্তান থেকে হাত গুঁটালেও মস্কোর বড় ভরসা ছিলেন নাজিবুল্লা। পাততাড়ি গুটানোর আগে কাবুলের রাজনীতিতে এমন 'ইয়েস ম্যান' রাখার লোভ ছাড়তে পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লে মস্কোর অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান শীর্ষ বৈঠক করে আফগানিস্তান থেকে পাকাপাকিভাবে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবার সময়সীমা স্থির করে। নাজিবুল্লারও দিন ফুরিয়ে আসছে দেখে আফগানিস্তানের মুজাহিদিন গেরিলাগোষ্ঠী তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ হানতে থাকেন কাবুল সরকার বিরুদ্ধে। তাঁর সময়ে অন্তত ১০ হাজার আফগান গোয়েন্দা পুলিশের হাতে নিহত হন বলে অভিযোগ। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী তুলে নেবার পরও বেশ কয়েক বছর ক্ষমতায় ছিলেন ডঃ নাজিবুল্লা।

১৩.৪ নাজিবুল্লার অপসারণ (Suspension of Nozibullah)

মুজাহিদীন গেরিলা গোষ্ঠী কাবুল দখলের কাছাকাছি চলে এলে নাজিবুল্লা ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। নাজিবুল্লার অপসারণের পরই দীর্ঘ ৪ বছর ধরে চলতে থাকে আফগানিস্তানের বিভিন্ন গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীগত কোন্দল। মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলোই একে অন্যের দিকে বন্দুকের নল তাক করে থাকে। একদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদের অনুগত সৈন্য, অন্যদিকে গুলবুদ্দিনের হেজব-ই-ইসলামি।

এরই মধ্যে তলে তলে তৈরি হতে থাকে তালিবান গেরিলা গোষ্ঠী। সদর দফতর কান্দাহার থেকে গোটা দক্ষিণ অঞ্চলে ডালপালা মেলতে থাকে তালিবানরা। ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে সংগঠিত হতে শুরু করে এই মৌলবাদী শক্তি গোটা আফগানিস্তানকেই গ্রাস করতে থাকে। ১৯৯৬ সালের ২৭ শে

সেপ্টেম্বর তারা কাবুল দখল করে নেয়।

১৩.৫ তালিবানদের ক্ষমতা দখল ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পালাবদলের পালায় ইসলামী মৌলবাদীরাই ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসে। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রায় বিনা রক্তপাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বুরহানুদ্দিন রাব্বানি এবং প্রধানমন্ত্রি গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে পদচ্যুত করার মাধ্যমে তালিবানরা আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুনযুগের সূচনা করে। বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় সদস্যের অন্তবর্তী কালীন সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তালিবানরা ৩২টি প্রদেশের মধ্যে ২০টির শাসনভার নিজেদের দখলে আনে। আফগানিস্তানের এই পালাবদলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার দেশগুলো ইসলামি মৌলবাদী শক্তির উত্থানে আতংকিত হয়ে পড়ে। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়ার মুসলিম প্রধান তাতারস্তান, দাগেস্তান, ওসেশিয়া এবং ককেশীয় অঞ্চলগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। শিয়াপন্থী ইরানেও যথেষ্ট মাথা ব্যাথার কারণ ছিল তালিবানরা। খোমেনি জামানার শাসন থেকে ইরান যখন সহজ সরল ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে তখন মৌলবাদি তালিবানদের আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বেড়া ডিঙ্গিয়ে মধ্য এশিয়ার মানচিত্রে ঢুকে পড়ার প্রবণতা তাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য ছিলনা।

১৩.৬ ইরানের ভূমিকা (Role of Iran)

আফগানিস্তানের শান্তি আনতে ইরান নিজে উদ্যোগ নিয়ে আঞ্চলিক সম্মেলন (Regional Conference) ডাকে ১৯৯৬ এর অক্টোবরের ২৯ তারিখ। দুইদিনের এই সম্মেলনে জট খোলার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সমাধানের পথ দেখা যায়নি। রাশিয়া তার সাবেক অঙ্গরাজ্য এবং নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। চেচনিয়ার ঘা শুকাতে না শুকাতে তালিবান মৌলবাদীদের উত্থান রাশিয়ার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য এ তল্লাটের দেশগুলো নিয়ে একটি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তৎকালীন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেতসিন। এর জন্য তিনি আঞ্চলিক সম্মেলনেরও ডাক দেন। রাশিয়ার সাবেক নিরাপত্তা সচিব আলেকজান্দার লেবেদ খোলাখুলিই বলেন, আফগানিস্তানের পালাবদল, রাশিয়ার নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল।

তালিবান নেতাদের কথাতেও ছিল বৃহত্তম আফগানিস্তানের স্বপ্ন। তাঁরাও কেবল মাত্র আফগানিস্তানের মধ্যেই 'পবিত্র ইসলামি আইন' কার্যকর করতে চায়নি। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতেও ঢুকে পড়তে চেয়েছিল। মার্চ মাসে (১৯৯৭) উত্তরাঞ্চলে মাসুদ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে উত্তর আফগান সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছিল তালিবানরা।

১৩.৭ ওআইসির ভূমিকা (Role of OIC)

OIC (Organization of Islamic Conference) গোষ্ঠীভূক্ত দেশগুলো আফগানিস্তানের পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোকে শর্তহীনভাবে যুদ্ধ বিরতি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিল। OIC ঘোষণা করে তালিবান এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো যুদ্ধ বিরতি মেনে চললে আফগানিস্তানের নির্বাচন এবং ক্ষমতা বণ্টনের সূত্র নিয়ে আলোচনা হবে। ডিসেম্বর '৯৭ এ ইরানে অনুষ্ঠিত OIC এর শীর্ষ সম্মেলনে বুরহানুদ্দিন রাব্বানী ও মোল্লা মোহম্মদ ওমর দু'জনই নিজেকে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট দাবী করে সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে সম্মেলনে আফগানিস্তানের পদ খালি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৩.৮ ভারতের ভূমিকা (Role of India)

আফগানিস্তানে তালেবান শাসন কায়েম হওয়ায় ভারতেও যথেষ্ট মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাবেক কমিউনিষ্ট শাসক ডঃ নাজিবুল্লার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ভারতের। নিহত নাজিবুল্লার স্ত্রী ফাতেমা নাজিবুল্লা ও তার তিন মেয়ে দিল্লিতেই থাকতেন। পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানীর সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক রেখে চলত। তালিবানরা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসায় ভারতের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। আফগানিস্তানে হামিদ কারজাই সরকার গঠন হওয়ার পর ভারত সেখানে অবকাঠামো উন্নয়ন, তেল, গ্যাস, শিল্পায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় মাপের বিনিয়োগ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কারজাই সরকারকে সর্বত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

১৩.৯ বাংলাদেশের ভূমিকা (Role of Bangladesh)

বাংলাদেশও আফগানিস্তানের এই পালাবদলকে স্বীকৃতি জানাতে অস্বীকার করেছিল। পাকিস্তান বাংলাদেশকে অনুরোধ করেছিল, তালিবানদের স্বীকৃতি দিতে। বাংলাদেশ তাতে কর্ণপাত করেনি। তবে পাকিস্তানের নাম না করে আফগানিস্তানে কোনও রকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন তালিবানদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। তবে হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশ তাকে স্বাগত জানায়।

১৩.১০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা (Role of USA)

তালিবানদের উত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণে গোটা বিশ্ব বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন পর্যন্ত অন্ধ কুসংস্কার বিধি নিষেধ মৌলবাদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে, তারাই তালিবানদের হয়ে গলা চড়ালে বিশ্বজনমত হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি ক্লিনটনদের আচরণ। তবে একথা সত্য, ১৯৭৯ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠালে বিশ্বের শক্তিসাম্য নীতি (Ballance of Power) বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদিনদের মদদ দিয়ে এসেছে। ১৯৭৯ সালে কাবুলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত অ্যাডলফ ডাসে নিহত হলে দু'টি দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। দুচোখের বিষ কমিউনিস্ট শাসন নাজিবুল্লার আমলে অস্ত্র সরবরাহ করেও বিরোধী গোষ্ঠীলোকে রসদ জুগিয়ে ছিল। তালিবানদের কাবুল দখলের প্রায় একমাস পরে ২৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীতি পাল্টে তাদের প্রতি সমর্থন তুলে নেবার ইঙ্গিত দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ দফতরের এক কর্মকর্তা ওয়াশিংটন টাইমসকে বলেন, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে তারা তালিবানদের প্রশ্রয় দেওয়া নীতি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কারণ তালিবানদের বিজয়ে পাকিস্তানের পরিস্থিতি নড়বড়ে হয়ে উঠতে পারে। কারণ ওখানে একাধিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর ঘাঁটি আছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে, তাদের ২০ বছরের আফগান নীতিতে গলদ ছিল। সোভিয়েত সেনা ঠেকাতে যে অস্ত্র তারা মুজাহিদদের দিয়েছিল, তাই মার্কিন স্বার্থের বিরোধী হিসেবে কাজে লেগেছিল।

১৯৯৯ এ তালিবান মিলিশিয়ারা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বিরোধী ঘাটিগুলোকেও প্রায় নিজেদের কব্জায় এনে ফেলে।

১৯৯৯ এর জুলাইয়ের শেষ দিকে উত্তরাঞ্চলের আহমদ শাহ মাসুদের ঘাঁটিগুলোতে জোরদার আক্রমণ চালায়। ২রা আগস্ট ' ৯৯ তালিবান জঙ্গীবাদীরা পারওয়ান প্রদেশের রাজধানী চেরিকার দখল করে জবল-আশ-সিরাজে ঢুকে পড়ে। ২০০১ সালে তালেবান উৎখাতে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক অভিযান চালায়। ২০০৪ সালে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হামিদ কারজাই সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আফগানিস্তানে তালেবান এবং ন্যাটো পরবর্তী অবকাঠামোগত উন্নয়নে ২০১২ সালের জুলাই মাসের মার্কিন সরকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৩.১১ মধ্য এশিয়ায় প্রভাব (Role of Middle Asia)

আফগানিস্তানের তালেবান মৌলবাদীরা মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর কাছেও গোটা ' ৯৯ সাল জুড়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৯৯৮ সালে মাজার-এ-শরীফে ৮ জন ইরানী কূটনীতিবিদ ও একজন সাংবাদিককে তালেবানরা হত্যা করে। উত্তরাঞ্চলের সম্মিলিত জোটের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের কাজ এগোয়নি বলে ইরান জাতিসংঘের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়ে ছিল। এ নারকীয় ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ৮টি দেশ তালেবানদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তালেবানরা কোন আপোষ মীমাংসায় আসতে অস্বীকার করে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি ফ্রেড এথহার্ড জানিয়ে ছিলেন তালেবানরা গোটা আফগানিস্তান "জোর যার মুলুক তার" এর রাজনীতি কায়েম করে।

অন্যদিকে অক্টোবর ১৯৯৬ কাজাকিস্তানের রাজধানীতে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যথা কাজাকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও রাশিয়ার নেতারা মিলিত হয়ে তালেবানদের কাবুল

দখলের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দেশের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। আফগান প্রসঙ্গে ইরানের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৯ অক্টোবর ১৯৯৬ এর দু'দিনের বৈঠকে মধ্য এশিয়ার সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসহ চীন, ভারত OIC-র দেশগুলো অংশগ্রহণ করে। পর্যবেক্ষকের তালিকায় ছিল ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগীতা সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

১৩.১২ পাকিস্তানের ভূমিকা (Role of Pakistan)

আফগানিস্তানের সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়েও খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্কের সূচনা হয়। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জঙ্গি ঘাঁটিতে তালিবান মিলিশিয়াদের সব ধরণের সাহায্য দেবার প্রামাণ পাওয়া যায়। ১৯৯৯ এর আগষ্টের ২৪ তারিখে একটি পাক প্রতিনিধি দল আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের সমাধানে বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়। পর্যবেক্ষক মহল অবশ্য বলছে তালিবানদের ক্রমাগত সাহায্য করে এসে পাকিস্তান এখন বেকায়দতায় পড়েছে। পরিস্থিতিকে সহজ করে তুলতে এখন তাঁরা তালিবান বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছিল। তালিবান বিরোধী গোষ্ঠীগুলো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে চাইলে প্রথমেই তাঁদের তালিবানদের অর্থ সাহায্য বন্ধ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রও পরস্পর বিরোধী দুই গোষ্ঠীকে এক টেবিলে নিয়ে আসার একাধিকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি।

তালেবানরা সমাজ জীবনে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করায় ২৭ শে সেপ্টেম্বরের (১৯৯৯) পর থেকে বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হাত গুটিয়ে নেয়। কারণ এদের অধিকাংশ কর্মীই ছিল মহিলা। জাতিসংঘের প্রতিনিধি নরবার্ট হলও তালিবানদের কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সেভ দ্য চাইল্ড' সংগঠনটিও কাজ বন্ধ করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতেরাও আফগানিস্তান থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যান।

১৩.১৩ আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধের সমাধানে জাতিসংঘের উদ্যোগ (US Role in Afganistan for Stop Civilwar)

আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের সমাধানে জাতিসংঘ ১৯৯৮ এর ১৭ই এপ্রিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত Bill Richardson এর তত্ত্বাবধানে তলেবান জঙ্গি গোষ্ঠী এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালেবান বিরোধী জোট গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে মিলিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে OIC এবং পাকিস্তান মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল আশা করেছিল এবার বোধ হয় আফগানিস্তান সমস্যার বরফ গলতে শুরু করলো। পাঁচ সদস্যের তালেবান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সম্মিলিত বিরোধী জোটের ৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশেই আলোচনা শুরু করেছিলেন। ১৯৯৬ এর ২৭ শে সেপ্টেম্বর তালিবান জঙ্গী বাহিনী কাবুল দখল করে নেবার পর দেশের ৮৫ ভাগ অংশই তারা দখল করে নেয়। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের ১৫ ভাগ অঞ্চল জুড়ে ছিল তালেবান বিদ্রোহীদের দাপট। জাতিসংঘের মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিল রিচার্ডসনই ছিলেন প্রথম ক্যাবিনেট পর্যায়ে মার্কিন আমলা যিনি দীর্ঘ ২০ বছর পর আফগানিস্তান সফরে এসেছিলেন গৃহযুদ্ধের সমাধান সূত্র খুঁজতে। কিন্তু আলোচ্য বৈঠকে উভয় পক্ষের একরোখা মনোভাবের জন্য সমাধান সূত্রে পৌঁছানো প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। মূলত চারটি সূত্র ধরেই আলোচনা এগোচ্ছিল ঃ-

১. উলেমা কমিশন গঠন
২. যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবন্দিদের হস্তান্তর
৩. সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়া এবং
৪. দ্বিতীয় বৈঠকের স্থান এবং সময় চিহ্নিত করা।

১৩.১৪ আফগানিস্তানে মার্কিন জোট বাহিনীর হামলা (US Allied Forces Attack in Afganistan)

২০০১ সালে ৭ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী টুইন টওয়ার ধ্বংসের দায়ে

অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে আফগানিস্তানে সামরিক হামলা চালায়। দীর্ঘ ১২ বছর আফগানিস্তানে মার্কিন জোট বাহিনীর ব্যাপক হামলা জনগণের মধ্যে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছে। আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই সম্প্রতি বলেছেন যে, জোট বাহিনী আফগানিস্তানে নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের মাটি ব্যবহার করছে। তাছাড়া আফগান জনগণকে হত্যার পাশাপাশি আফগানিস্তানের পরিবেশ দূষণ করছে। এতে করে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে আফগানিস্তানের জনগণ মরছে এবং পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আরো অভিযোগ করেন-জোট বাহিনী এমন কিছু অস্ত্র ব্যবহার করছে, যাতে পারমাণবিক উপাদান রয়েছে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থও রয়েছে এই সকল বিস্ফোরকের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের পরিবেশের, জনগণ ও প্রাণীর উপর। তাছাড়া ন্যাটো বাহিনীর যে সকল ভারী ট্রাকগুলো চলাচল করছে এতেকরে রাস্তাঘাট বিনষ্ট হচ্ছে এবং রাস্তাঘাটের কোন সংস্কারে কাজের কোন উদ্যোগ তারা গ্রহণ করছেনা। জোট বাহিনীর ব্যাপক বোমাবাজিতে সেখানকার নারী, শিশুসহ সাধারণ মানুষেরও ব্যাপক মৃত্যু ঘটছে প্রতিনিয়ত। এদের চিকিৎসা বা ক্ষতিপূরণ বাবদ জোট বাহিনীর কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ : আফগানিস্তান দীর্ঘ দিন ধরে অভিযোগ করে আসছে যে, পাকিস্তানী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়ে আসছে। আফগানিস্তানে হামলা পরিচালনাকারী পাকিস্তানী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসলামাবাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই। কারণ পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তালেবান যোদ্ধাদের আফগানিস্তানে হামলা পরিচালনা করার জন্য তাদের ভূমি ব্যবহার করতে দিচ্ছে। পাকিস্তান দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নালিশ করার হুমকি দিয়েছে আফগানিস্তান প্রেসিডেন্ট।

আফগানিস্তানে পাকিস্তানী রকেট হামলা : আফগানিস্তান অভিযোগ করেছে মার্চ,২০১২ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ভূখণ্ডে শত শত রকেট হামলা চালিয়েছে। গত চার মাসে এই হামলায় অনেক বেসামরিক লোকের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তারা ইসলামাবাদকে জানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করারও হুমকি দিয়েছে দেশটি। ইতোমধ্যে প্রতিবেশী এই দুই দেশের মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর সমস্যাগ্রস্থ সীমান্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এখন থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তান। আফগানিস্তান বরাবরই অভিযোগ করে আসছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সমর্থিত জঙ্গীরা যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত আফগান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। আফগানিস্তান সরাসরি পাকিস্তানকে তাদের সীমান্তবর্তী কুনার প্রদেশের বনভূমি অঞ্চলে শত শত রকেট হামলার জন্য দায়ী করেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তানের এই হামলা অব্যাহত থাকলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ জানাবে। যদিও পাকিস্তান ইতোমধ্যে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে দেশটিতে জঙ্গী ঘাটি নির্মূলে আফগানিস্তান যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান উভয় রাষ্ট্রই এর আগে অভিযোগ করেছিল কুনারে তালেবান জঙ্গীরা বিভিন্ন হামলা চালাচ্ছে।

১৩.১৫ তালেবানদের সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা (Negotiation Steps With Taleban)

১৯৯৬ সালে তালেবানরা আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে দেশে একটি মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। ২০০১ সালে বহুজাতিক বাহিনীর আক্রমণ ও অন্তবর্তী সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তালেবানী শাসন কায়েম ছিল। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছেন, তালেবানদের সাথে একটি সমঝোতা পৌঁছার ব্যাপারে। এর মাধ্যমে আফগানিস্তানের ১৩ বছর ধরে চলা যুদ্ধের একটি ইতি টানতে চাইছেন।

১৩.১৬ অস্ত্র ছেড়ে রাজনীতিতে আসার আহবান (Call for Politics)

জুলাই ১৪, ২০১২, আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তালেবান প্রধান মোল্লা ওমরকে রাজনীতিতে ফেরার আহবান জানিয়েছেন। আফগানিস্তানের বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। ২০০১ সালে

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করলে মাত্র কয়েকদিন প্রতিরোধের পরই তৎকালীন তালেবান সরকারের পতন ঘটে। এরপর থেকেই তালেবান নেতা মোল্লা ওমর পালিয়ে আছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। এখন তার নেতৃত্বে কারজাই সরকারকে হটাতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে তালেবান। কারজাই অবশ্য মোল্লা ওমর এবং আফগানিস্তানের অন্য জঙ্গী সংগঠনগুলোকে অস্ত্র ছেড়ে শান্তির পথে আসার আহবান জানিয়ে আসছেন। এর বিনিময়ে তাদের আফগান প্রশাসনে স্থান দেওয়ার কথা বলেছেন। কারজাই আরো বলেছেন যারা অন্যের হাতের পুতুল নয় এবং দেশের ব্যাপারে একই ইস্যুতে একমত তারা যে কোন আলোচনায় বসতে চাইলে স্বাগত জানানো হবে। তিনি বলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আফগানিস্তানে যে অঞ্চলে খুশি অবস্থান করতে পারবেন। তিনি প্রকাশ্যে তার রাজনৈতিক কার্যালয় খুলতে পারবেন। তবে তার আগে তাকে অস্ত্র ছাড়তে হবে। কারজাই আরো বলেন, তিনি এবং তার সহযোগীরা এসে তাদের রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন। যদি জনগণ তাকে ভোট দেয় তাহলে তার জন্যই ভাল। তখন তিনি দেশের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিতে পারেন। অবশ্য তালেবান এর আগে একাধিকবার কারজাইয়ের এ ধরণের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০১২ প্রথম দিকে কাতারে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাথমিক শান্তি আলোচনা স্থগিত করেছে তালেবান। তালেবানরা কারজাই সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল সরকার তার সাথে কোন আলোচনায় বসতে রাজী নয়।

১৩.১৭ আফগানিস্তানে তালেবানদের প্রভাব বিস্তার (Taleban influence in Afganistan)

১৯৯৬ সালে তালেবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে সেখানে এমন এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে যা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে। দীর্ঘ ৬ বছরের তালেবানি শাসনে সেখানে একটি শক্তিশালী তালেবান সমর্থক দল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত তালেবানদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিশ্বাসী তাদের এ অবস্থান আফগানিস্তানে বরাবরই ছিল। দীর্ঘ ১২ বছরে আফগানিস্তানে সংঘাত, মৃত্যু, ধ্বংস, আত্মঘাতী হামলা, ড্রোন, বিমান আক্রমণ, আর বিদেশি সেনার মৃত্যু ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। অনুষ্ঠিত হয়েছে কারচুপির নিকৃষ্টতম নির্বাচন। এখন কাবুলে চলছে গণতন্ত্রের মহড়া। আফগানিস্তান চলছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে। মার্কিন জোট বাহিনী আফগানিস্তান থেকে বিগত (২০০১-২০১৩) ১৩ বছরে তালেবানদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তাদের দীর্ঘ ১২ বছরের সমরাভিযানে দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক মার্কিন বিরোধিতা লক্ষ করা যায় আর এরই ফলশ্রুতিতে তালেবানরা জনগণের সহানুভূতি অর্জনে সহায়ক পরিস্থিতি পাচ্ছে।

১৩.১৮ আফগান যুদ্ধের দশ বছর (Ten Years of Afgan War)

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। ২০১১ সালের ৭ অক্টোবর এ আগ্রাসনের ১০ বছর পূর্তি হয়। আফগানিস্তানে ১০ বছরের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটবাহিনী কাঙ্ক্ষিতসাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ২০১১ সালের শেষ নাগাদ আফগানিস্তান থেকে ১০ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার এবং ২০১২ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে আরো ২৩ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এভাবে ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তানে মোতায়েন বিদেশি সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে আফগান সেনাবাহিনীর হাতে দেশটির নিরাপত্তার ভার তুলে দেয়া হবে।

১৩.১৯ আফগান সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ (Step to Solve Afgan Problem)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তারের কৌশল নিয়েছে। বর্তমানে আফগানিস্তান সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে দেশটিকে ভাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ প্রস্তাবটি দিয়েছেন তারতে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ব্লাকওয়েল। তিনি বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্য কার্যত আফগানিস্তান বিভক্ত করাই হলো সর্বোত্তম নীতি। তিনি আরো মন্তব্য করেন আফগানিস্তানে ওবামা প্রশাসনের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কৌশল ব্যর্থতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, এবং

আফগানিস্তান বিভক্ত করা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে সর্বোত্তম বিকল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বছরের পর বছর ত্রুটিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করায় বর্তমানে মারাত্মক এ চোরাবালি থেকে বের হয়ে আসার আর কোনো দ্রুত, সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত পথ খোলা নেই। তবে সকল সমস্যা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের বিভক্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পরাজয়ের বিপরীতে সর্বোত্তম বিকল্প। কারণ আফগানিস্তান বিভক্তি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ এবং অভ্যন্তরীণ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সর্বোত্তম উপায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। ভারত-পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য সম্পর্কের উন্নতি হলে আফগানিস্তানের ব্যর্থতা তিনি তাদের মাথায় দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের টেকসই উন্নতি সম্ভব নয় কারণ এর মূলে রয়েছে কাশ্মির সমস্যা। আফগানিস্তানে আক্রমণের সময় বন্ধুপ্রতীম পাকিস্তানেও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব লক্ষনিয়। কারণ এই বন্ধু প্রতীম দেশেও যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন বিমান পাকিস্তানেও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব লক্ষনিয়। কারণ এই বন্ধু প্রতীম দেশেও যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তালেবান নির্মূলের উদ্দেশ্যে। যা পাকিস্তান এখন সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা বলে মনে করে। আবার ওবামা প্রশাসন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে উদগ্রীব। ফলে পাকিস্তানের বড় আকারের অর্থাৎ ১৬০০ কোটি ডলার অনুদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মার্কিন প্রশাসনসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। তবে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ওপর। এ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা পাকিস্তানের কাছে ক্লেশদায়ক। তাই আফগান সরকারের ওপর রাজনৈতিক প্রভাবসহ সকল কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। আফগান সমস্যা সমাধানে গৃহীত মার্কিন পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ :

১. **পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন :** যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১১ সালের ২রা মে পকিস্তানে মার্কিন মেরিন বাহিনীর অভিযানে ওসামা বিন লাদেন হত্যা, নভেম্বরে মার্কিন ড্রোন বিমান হামলায় ৪০ জন পাকসেনা নিহত পাক-মার্কিন সম্পর্কে ব্যাপক অবনতি ঘটে। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানর সাথে পুরনো বন্ধুত্ব ফিরে পেতে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল জন অ্যালেন ১ আগস্ট ২০১২ আফগান-পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়নে ইসলামাবাদ সফর করেন। তিনি আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি এবং আফগান মূলক পাকিস্তান ও ন্যাটো সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তাদের পারস্পরিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির কারণে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও আফগানিস্তানে নিযুক্ত বিদেশি সেনাদের কৌশলগত বোঝাপড়ায় সহায়তা করবে। ৩১ জুলাই ২০১২ ওয়াশিংটনের সাথে ইসলামাবাদের এক চুক্তি সাক্ষর হয়। এ চুক্তির আওতায় পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর জন্য রসদ সরবরাহের পথ ২০১৫ সাল পর্যন্ত খোলা রাখা হবে। উল্লেখ্য ৩ জুলাই পাকিস্তান রসদ সরবরাহের পথ খুলে দেয়।

২. **চীনের প্রভাব থেকে পাকিস্তানকে মুক্ত রাখা :** একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে চীন-মার্কিন দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ২০১১ সালের ২ মে পকিস্তানে মার্কিন মেরিন বাহিনীর অভিযানে ওসামা বিন লাদেন হত্যা, নভেম্বরে মার্কিন ড্রোন বিমান হামলায় ৪০ জন পাকসেনা নিহত পাক-মার্কিন সম্পর্কের ব্যাপকভাবে অবনতি ঘটে। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তান দ্রুত চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা আফগানিস্তানে মার্কিন স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে চীন-পাকিস্তান সম্পর্কের চালিকা শক্তি হচ্ছে লাভজনক অর্থনৈতিক সহযোগিতা। বর্তমানে পাকিস্তানে জ্বালানি সংকট খুবই তীব্র। তাই আগামী বছরগুলোতে পাকিস্তান পানি, বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস এবং পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদনে পাকিস্তানকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে চীন। এদিকে আফগানিস্তান তাদের খনিজ সম্পদ, জ্বালানি এবং কাঁচামাল উৎপাদনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে বিদেশীদের জন্য। দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তানের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বাতাস বইতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে চীন কয়েকটি খনিতে কাজ শুরু করেছে। অতএব উন্নয়নের এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে পাকিস্তান-চীন ও আফগানিস্তানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আফগানিস্তান

নিয়ে ক্ষমতা বিস্তারের এ লড়াইয়ে রাশিয়া যে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কর্তৃত্ব বিস্তারের সহায়ক শক্তি হিসেবে সে পাকিস্তানকে পেয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের মাধ্যমে যদি আফগানিস্তানের কতৃত্বও হাতে থাকে তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিকভাবে চীন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। পাকিস্তানকে চীনের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে বিভিন্ন সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে।

৩. **আফগানিস্তানে শান্তির জন্য চাই ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী :** দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত এবং পাকিস্তানের প্রভাব ব্যাপক। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এ দুটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা সুষম ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নানা কারণে জরুরি। কারণ এ অঞ্চলে রয়েছে ইসলামি মৌলবাদের আগ্রাসী উত্থান। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মুখে পড়েছে আফগানিস্তান। একদিকে আলকায়েদা ও তালেবান অন্যদিকে মার্কিন নেতৃত্বে সামরিক অভিযান তা প্রায় এক যুগ জুড়ে। এ যুদ্ধ এমন একটি অবস্থান রূপ নিয়েছে যে, বোমা ফেলে বা কামান দাগিয়ে তালেবানদের দমন করা সম্ভব নয় যা ওয়াশিংটন ইতোমধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছে। ওবামা প্রশাসন আরো বুঝতে পেরেছে যে, অনন্তকাল এদেশটিতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। যেকোনো অবস্থায় নিজেদের জয় ঘোষণা করে আফগানদের হাতে দেশের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব ঠিক রাখা। আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা এবং এ অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব যুগপৎ রাখতে হলে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

→ তালেবানদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি করা।

→ আফগানিস্তান প্রসঙ্গে ভারত-পাকিস্তান ঐকমত্য।

আফগানিস্তানে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে তা স্থিতি করতে প্রয়োজন ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন। ইতোমধ্যেই উভয় দেশ ইঙ্গিত প্রদান করেছে তাদের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক খোলামেলা আলোচনায় আগ্রহী। এ সমস্যা সমাধান না হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উভয় দেশেই রয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দল যারা কোনো অবস্থাতেই সমাধান চায় না। এতে রয়েছে উভয় দেশের রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক ইস্যু।

৪. **আফগানিস্তান দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত :** ২০১২ সালের জুন মাসে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই ঘোষণা করেছেন যে, আফগানিস্তানের দায়িত্ব নিতে আফগান ছেলেরা প্রস্তুত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ২২ হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে। ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করবে। ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে সকল বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার হলে আফগানিস্তানের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চায় আফগান প্রশাসন। কিন্তু আফগান প্রশাসন দাতাদের কোটি কোটি ডলার ত্রাণ নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু তদারকি করতে পারবে কিনা এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও দাতা দেশগুলো উদ্বিগ্ন। তারা আফগান প্রশাসনের কাছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনের নিশ্চয়তা চায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম এর হিসাব মতে, ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। ন্যাটো অভিমত ব্যক্ত করেছে আফগান সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হলেই সেনা প্রত্যাহার শুরু করবে বলে পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ৩/৪টি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ আফগান প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দওয়া হয়েছে। দাতাগোষ্ঠীর অভিমত হলো, যেখানে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনারা তালেবান জঙ্গী দের দমন করতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে আফগান প্রশাসন কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন।

৫. **টোকিওতে আফগানিস্তান বিষয়ক সম্মেলন :** জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৮ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত আফগানিস্তান বিষয়ক সম্মেলনে দাতাদেশগুলো কাবুলকে ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিদেশি সৈনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে যেন নতুন করে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি না হয়। সে লক্ষ্যে এ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

http://thejobstudy.com Go to Contents

সম্মেলনের সমাপনী বিবৃতিতে ২০১৫ সালের মধ্যে আফগানিস্তানের জন্য ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের বেসামরিক সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে সহায়তার অর্থ ছাড়ের বিষয়টি কয়েকটি শর্তের ওপর নির্ভর করছে। এসব শর্তের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর মতো বিষয় অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে।

সম্মেলনে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ও জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তারা আফগানিস্তান থেকে ন্যাটোর সৈনা প্রত্যাহারের পরবর্তী সময়কে কাবুলের উত্তরণের দশক হিসেবে অভিহিত করেন। সমাপনী বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তানের উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কাবুলকে ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশটিকে অন্যান্য সহায়তাও দেওয়া হবে। আফগান সরকারের আয়-ব্যয়ের বিস্তর ফারাক কমানো এবং দেশটির অর্থনীতিতে স্থিতিশীল করার জন্য এ সম্মেলন ডাকা হয়। নিরাপত্তা খরচ বাদে আফগান সরকারের বার্ষিক ব্যয় ৬০০ কোটি ডলার। এর মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ অর্থের জোগান দেওয়া হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। কাজেই দীর্ঘসময় ধরে আফগানিস্তানের অর্থনীতি বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল।

২০১৪ সালে ন্যাটোর সৈনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে আর কোনো বিদেশী সৈনা মারা পরবে না-এই ভেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো অনেকটাই উদ্বেগমুক্ত তবে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী চক্র ও জঙ্গিদের হাতে চলে যেতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র দেশগুলো ভীতসন্ত্রস্ত। সম্মেলনে আফগানিস্তানকে বিপুল সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও অর্থ ছাড়ের জন্য দেশটির প্রশাসনে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়াদুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কঠিন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে প্রাথমিক বক্তৃতায় আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার অঙ্গীকার করেছেন। বান কি মুন বলেছেন নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের কিছুটা অগ্রগতি ঘটিয়েছে তবে এখনো তা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন আইনের শাসন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বেকার সমস্যা সমাধান ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত না করা গেলে বিপুল বিনিয়োগ এবং ১০ বছরের যুদ্ধকালীন উৎসর্গ বৃথা যাবে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এক দশক ধরে আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে তা অব্যাহত রাখার জন্য হোয়াইট হাউস কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাবে। আগামী দুই বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাহিনী আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করার পরও যাতে এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকে সে ব্যবস্থা তারা করবে। তিনি আরো বলেন, সহায়তার অর্থ আফগানিস্তানের অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারে ব্যয় করা হবে।

দাতাদের পক্ষ থেকে জানান, সহায়তার অর্থ দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণে বিফলে যাবে না-এমন শর্তের ভিত্তিতে আফগানিস্তানকে অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া অর্থের যথার্থ ব্যয়ের মাধ্যমে জনগণের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাও পর্যবেক্ষণ করা হবে।

আফগানিস্তান সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দাতাদেশসহ প্রায় ৮০টি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

৬. **ন্যাটোর রসদপথ খুলে দিল পাকিস্তান :** আফগানিস্তানে ন্যাটোর রসদ সরবরাহের পথ নিয়ে পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছিল তার অবসান হয়েছে। জুলাই, ২০১২ এর প্রথমদিকে ন্যাটোর রসদ সরবরাহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। আফগানিস্তানে অবস্থানরত ন্যাটো বাহিনীর রসদ সরবরাহের পথ খুলে দেওয়া নিয়ে দেশ দুটির মধ্যে যে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ আলোচনার পর তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নভেম্বর ২০১১ পাকিস্তানের আফগান সীমান্তবর্তী মোহম্মদ জেলায় ন্যাটোর বিমান হামলায় পাকিস্তানি সৈন্যরা মারা গেলে পাকিস্তান সরকার নিজ ভূ-খন্ডের উপর দিয়ে ন্যাটোর সব ধরনের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এই সৈন্য নিহতের ঘটনাকে তাদের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখন্ডতার ভয়ানক লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে এবং এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানায়।

সম্পর্ক স্থায়ীভাবে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠার আগেই নিজেদের অনড় অবস্থান থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র। সাত মাসের বেশি সময় পর অচলাবস্থা নিরসন করতে পেরেছে দেশ দুটি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ২ জুলাই ২০১২ পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রব্বানী খানকে ফোন করে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে পাকিস্তান অবশেষে রসদ সরবরাহের পথ খুলে দেয়।

৭. **আফগানিস্তান ন্যাটোজোট বহিভূত মার্কিন মিত্র :** আফগানিস্তানকে ন্যাটো জোট বহিভূত বড় মিত্র বলে ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে অনির্ধারিত এক সফরকালে ৭ জুলাই ২০১২ এ ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার ফলে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও আফগানিস্তান দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ নিতে পারবে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে আফগানিস্তানকে প্রথম কোনো দেশ হিসেবে ন্যাটো জোট বহিভূত গুরুত্বপূর্ণ মিত্রের স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর আগে ২০০৪ সালে পাকিস্তানকে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

৮. **আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো জোট প্রত্যাহার :** ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল মার্কিন সৈনা প্রত্যাহার করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ২২ হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করবে। আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী দেশটি ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিদেশি সৈন্যরা বিদায় নিলে প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইর সেনাবাহিনীকে একলা মোকাবেলা করতে হবে শক্তিধর প্রতিপক্ষ তালেবানকে। যদিও মার্কিন প্রশাসন ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশটিতে সকল ধরনের সাহায্য, সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিগত তিন দশকে আফগানিস্তানে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছে এই ধারণাটি খুবই স্পষ্ট যে, এ সংঘাতে জয় অথবা পরাজয় কোনোটাই এক অর্থে সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অপরিণামদর্শী যুদ্ধংদেহী পররাষ্ট্রনীতি, ইসরাইল বান্ধব লবি ইরাকে মিথ্যা অজুহাতে তাণ্ডবলীলা চালানো আর এখন তারা ইরানকে দমিয়ে রাখায় সক্রিয়। এ অবস্থায় আফগান সমস্যাটি কেবল যুক্তরাষ্ট্র বনাম তালেবানদের মধ্যে বিবেচ্য নয়। মার্কিন প্রশাসন যে তালেবানদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করেছে আবার সেই তালেবানদের সাথে পুনরায় সমঝোতা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে, বিশ্ব রাজনীতিতে কেনো জয়, পরাজয় নেই, ছিল শুধু আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থ। বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তার, বিশ্বের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ওপর মার্কিন দখলদারিত্ব, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের বাজার প্রসার করা সবই ছিল আফগানিস্তানে বহুজাতিক বাহিনীর স্বার্থ উদ্ধারের কৌশল মাত্র। বর্তমানে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে টিকে থাকা সত্যিই কষ্টকর হলেও উদাহরণ ইরাক, আফগানিস্তান, আগামী দিনে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পতনই পারে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে।

১৩.২০ মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- আফগানিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার পর্বতসংকুল একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র।
- ১৯১৯ সালে দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর থেকে রাজতন্ত্র সঙ্গী হয়।
- ১৯৩৩ সালে রাজা জহির শাহ্ ক্ষমতা গ্রহণ করে টানা ৪০ বছর রাজতন্ত্র কায়েম থাকার পর ১৯৭৩ সালে প্রজাতন্ত্র ফিরে আসে।
- ১৯৬৪ সালে দেশে সংবিধান প্রণয়ন হলেও ৩৫ বছর দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফগানিস্তানে রুশ-মার্কিন প্রভাব বিস্তার হতে থাকে ফলে সেখানে রাজনৈতিক

অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে ১৯৭৯ সালে রুশ সৈন্য প্রবেশ করে। অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক চাপে অবশেষে ১৯৮৯ সালে রুশ সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ করে।

- এরপর সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মার্কিন তত্ত্বাবধানে রুশবিরোধী কর্মকাণ্ড বাড়তে থাকে।
- রুশবিরোধী কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণায় আফগানিস্তানে ইসলামি মৌলবাদী রাজনীতির নতুন ধারা তালেবানদের উত্থান ঘটে। যার নেতৃতে ছিল আফগান নেতা মোল্লা ওমর।
- ১৯৯৬ সালে তালবানরা রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে আফগানিস্তানে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী শাসন কায়েম করে। আফগানিস্তানে তালবান মৌলবাদীরা ক্ষমতায় আসায় বিশ্বব্যাপী তালেবান মৌলবাদী রাজনীতির প্রসার ঘটে এবং এর সাথে যুক্ত হয় সন্ত্রাসবাদ।
- ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে তালেবান সমর্থিত আল-কায়েদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করলে বিশ্বব্যাপী উগ্র তালেবানি রাজনীতির চেহারা উন্মোচিত হয়ে যায়।
- তালেবান ও আল-কায়েদা দমনের নামে এবং আল-কায়েদা প্রধান বিন-লাদেন ও তালেবান প্রধান মোল্লা ওমরকে ধরার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে হামলা চালায়।
- ২০০১ সালে মার্কিন সামরিক অভিযানে আফগানিস্তান তালেবান মুক্ত হলে হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হয়।
- দীর্ঘ ১২ বছর যুদ্ধ চলার পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী ২০১১ সালে ঘোষণা করে যে, ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে সকল ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়।

১৩.২১ আফগানিস্তানের ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আফগান সরকারের প্রস্তুতি (Withdrawal of NATO from Afganistan and preparation of Afgan for Sovereignty)

১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে তালেবান মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী দেশের কর্তৃত্ব দখল করলে আফগানিস্তানের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিন লাদেনের নেতৃত্বে তালেবান জঙ্গিরা মোল্লা ওমরের সাথে জোট বেঁধে আফগানিস্তানকে একটি তালেবানি বা উগ্র মৌলবাদী ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য সেখানে ইসলামি শরিয়া আইন পালনে বাধ্য করার জন্য জনগণের ওপর নির্যাতন চালায়। তালেবানদের এ হিংস্রতা খুব দ্রুতই দেশটিকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যায়। ক্রমেই তালেবানরা তাদের হিংস্রতা দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আল-কায়েদা টুইন টাওয়ার ধ্বংস করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী ৭ অক্টোবর ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের ওপর সামরিক অভিযান চালায় ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্য। লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আফগান শাসক মোল্লা ওমরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

আত্মরক্ষার্থে মোল্লা ওমর, বিন লাদেনের সাথে আফগান পাহাড়ের গুহায় পলায়ন করলে মূলত: আফগানিস্তান শাসক শূন্য হয়ে পড়ে। ২০০১ সালের ২২ ডিসেম্বর হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। ২০০৪ সালের ৯ অক্টোবর আফগানিস্তানে এক নির্বাচনের মাধ্যমে হামিদ কারজাই জয়লাভ করলে নির্বাচিত সরকার হিসেবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন এবং আফগানিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১০ সালে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে হামিদ কারজাই সরকার পুনরায় নির্বাচিত হয়। দীর্ঘ ১১ বছর আফগানিস্তানে যা কিছু ঘটেছে তা সবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায়। হামিদ কারজাই দুই দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও তিনি সেখানকার জনগণের আস্থাভাজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট এবং হুকুম বাস্তবায়ন করার জন্যই তিনি মার্কিন সহায়তায় ক্ষমতাসীন হন। দীর্ঘ ১১ বছর ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তানে ও তালেবানদের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলেও সেখানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমনকি আল-কায়েদার শীর্ষনেতা ওসামা বিন লাদেন ২ মে ২০১১ এক মার্কিন অভিযানে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে নিহত হলেও দীর্ঘ দেড় বছর পরও ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান তালেবানমুক্ত করতে পারে নি। জুলাই ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে এসেও সেখানে প্রতিনিয়ত তালেবানদের সাথে ন্যাটো

বাহিনীর যুদ্ধ হচ্ছে, উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটছে। ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে প্রায় ২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৮৩৪ জন মার্কিন সৈনা এবং ৪২৫ জন ব্রিটিশ সৈনা প্রাণ হারিয়েছে।

আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলত ২টি প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল, প্রথমত: বিন লাদেনকে হত্যা করা এবং আল-কায়েদার ঘাঁটি নির্মূল করে শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়া, দ্বিতীয়ত: আফগানিস্তানে একটি মার্কিন প্রভাবিত সরকার ক্ষমতায় রাখা যে সরকার প্রতিনিয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদেশ-নির্দেশ পালনে নিয়োজিত থাকবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সকল উদ্দেশ্য অধিকাংশ সফল করতে সক্ষম হয়েছে। বিন লাদেন নিহত হয়েছে এবং আফগানিস্তানে আল কায়েদা অনেকটাই দুর্বল হয়েছে। হামিদ কারজাই- এর নেতৃত্বে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট আফগানিস্তানে ক্ষমতায় রয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য স্বস্তির বিষয়। এমতাবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২৩ জুন ২০১২ এক ভাষণে আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সকল মার্কিন সৈন্যসহ ন্যাটো সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। অর্থাৎ ২০১৪ সালের পর আফগানিস্তানে আর বিদেশি সৈন্য অবস্থান করবে না। আফগানিস্তানকেই তার নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আফগান সরকারের সে ক্ষমতা কতটুকু তা অবশ্যই প্রশ্নের সৃষ্টি করে। যদিও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ ব্যাপারে আফগানিস্তানকে সর্বাত্ম সহযোগিতা করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ন্যাটোর সকল দেশ সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের যে হুমকি দেখা দিবে তা নিরসনে আফগান সরকার নিজেদের নিরাপত্তা বাহিনীর আধুনিকায়ন শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সকল প্রদেশের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছে। ইতোমধ্যে আফগান নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। ন্যাটো বাহিনী ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য একবারে তুলে নিবে না। তারা ধীরে ধীরে সৈন্য প্রত্যাহার করে সে সকল অঞ্চলের দায়িত্ব আফগান বাহিনীর হাতে তুলে দিবে। এতে করে একবারে নিরাপত্তা শূন্যতার সৃষ্টি হবে না আবার আফগান নিরাপত্তা বাহিনীও ধীরে ধীরে কাজগুলো বুঝে নিতে পারবে। ইতোমধ্যে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই ঘোষণা করেছে আফগানিস্তানের নিরাপত্তার দায়িত্ব আফগানেরাই নিবে এজন্য আমরা সঠিকভাবে প্রস্তুত। ২০১১ সালের ২৮ জুলাই ন্যাটো আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পাঞ্জশিরের নিরাপত্তার দায়িত্ব আফগান বাহিনীর কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ২০১১ সালে ন্যাটো কাবুলের নিরাপত্তার দায়িত্ব আফগান বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে। কাবুল ছাড়াও মধ্যাঞ্চলের বামিয়ান প্রদেশ, উত্তরাঞ্চলের শহর মাজার-ই-শরিফ। দক্ষিণের লস্করিসহ, পশ্চিমের হেরাত এবং পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ লাগমানের মেহতার লামের নিরাপত্তার দায়িত্ব আফগান বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে ন্যাটো বাহিনী। ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সৈন্য চলে গেলেও নতুন করে সেখানে যেন কোনো অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি না হয় এজন্য ৮ জুলাই ২০১২ জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত আফগানিস্তান বিষয়ক সম্মেলনে দাতাদেশগুলো কাবুলকে ১৬০০ কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৩.২২ ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ (Afganistan's Future After NATO)

আফগানিস্তানের দীর্ঘ ইতিহাসই দখলদারিত্বের ইতিহাস কখনো অভ্যন্তরীণ শক্তি কখনো বিদেশি শক্তি। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেন ও তার দল আল-কায়েদাকে নির্মূলের জন্য ২০০১ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তানে সামরিক হামলা চালায়। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ন্যাটো বাহিনীর সামরিক হামলা পাশ্চাত্য শক্তির সনির্দিষ্ট শত্রু আল-কায়েদাকে পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয় নি অপরদিকে দিন দিন প্রতিপক্ষের হামলায় ন্যাটো বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে আফগানিস্তানের বিশাল ন্যাটো বাহিনীর সামরিক ব্যয়ভার বহন করা। যার সিংহভাগই বহন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান আফগানিস্তানের ন্যাটো বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন সেখান থেকে ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার করতে একমত হয়েছে। আফগানিস্তানে শান্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার

জন্য এবং সেখান থেকে ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য ২০১২ সালের ২১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে NATO ভুক্ত সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানগণ এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এতে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। এ সম্মেলনে ২০১৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ন্যাটো বাহিনী আফগান বাহিনীর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কৌশলগত প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাটো বাহিনী সীমিত পরিসরে আফগানিস্তানে অবস্থান করবে এবং ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১,৩০,০০০ ন্যাটো সৈন্যের সকল সদস্যই সম্পূর্ণভাবে আফগানিস্তান ত্যাগ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও জুন, ২০১১ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৩৩ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করে এর মধ্যে ২০১১ সালে ১০ হাজার এবং ২০১২ সালের মধ্যে ২৩ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করে। আমেরিকার পর বৃটেন ও ফ্রান্স সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। আফগানিস্তানে অবস্থানরত বাকি ৬৮,০০০ মার্কিন সৈন্য ও সব কম্ব্যাট ২০১৩ সালের মধ্যে আফগানিস্তান ত্যাগ করার কথা। ২০১৪ সালের মধ্যে সব বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহার করে ২০১৪ সালের মধ্যে আফগান কর্তৃপক্ষের হাতে সব দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে ন্যাটোবাহিনী। বারাক ওবামা বলেছেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এটাই সত্য যে, বিদেশি সৈন্যদের উপস্থিতি আফগানিস্তানে স্থিতিশীল রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল নয়। আফগানিস্তান সম্পর্কে নানা কথা বলা হলেও রাজনৈতিক সমাধান কীভাবে অর্জন করা সম্ভব সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা হয় নি। আফগানিস্তানের বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত দেওয়া একান্ত আবশ্যক সেগুলো হলো, ১. অভ্যন্তরীণ, ২. আঞ্চলিক ৩. আন্তর্জাতিক। কীভাবে বিষয়গুলো সমাধান করে একটি স্থিতিশীল আফগানিস্তান গড়া যায় তা আলোচনা করা হলো :

১. অভ্যন্তরীণ সংকট ও তার সমাধান :

ক. **জাতিগত দ্বন্দ্ব :** আফগানিস্তানের সমাজ কাঠামো হলো বিভিন্ন জাতি-গোত্র উপগোত্রভিত্তিক এদের মধ্যে রয়েছে প্রবল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এ কারণে সমগ্র আফগান জনগণের মধ্যে আফগান জাতীয়তাবাদ গড়ে না ওঠায় গোত্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বেশি শক্তিশালী। তাই অভ্যন্তরীণভাবে রাজনৈতিক সমাধানের প্রধান ভিত্তি হতে হবে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার বণ্টন।

খ. **তালেবানদের মূলধারায় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা :** আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবানদের অস্বীকার করে কোনো ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তালেবানদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বিদেশি সেনারা বিদায় নিলে প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সেনাবাহিনীকে একলা মোকাবেলা করতে হবে শক্তিধর প্রতিপক্ষ তালেবান বাহিনীকে। সেক্ষেত্রে তারা কতটা সফল হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পুরো আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে কিনা এবং তালেবানরা পুনরায় ক্ষমতায় আসবে কিনা সে আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে তালেবানদের মূলধারার রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা জরুরী। যদিও ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের সাথে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। হামিদ কারজাই জুলাই, ২০১২ তালেবানদের অস্ত্র ছেড়ে মূলধারায় রাজনীতিতে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। যদিও তালেবানরা এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো সাড়া দেয় নি। তারপরও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তালেবানদের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের মূলধারার আলোচনায় যত দ্রুত ফিরিয়ে আনা যাবে, ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন তত দ্রুতই সম্ভব হবে।

গ. **প্রশাসন শক্তিশালীকরণ :** হামিদ কারজাই সরকারকে শক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ন্যাটো পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য। স্থানীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। আফগান সেনাবাহিনীর পুলিশসহ সকল আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আধুনিকায়ন করতে হবে। কারণ তাদের লড়তে হবে গত একযুগ ধরে আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা তালেবানদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়।

২. আঞ্চলিক সংকট ও তার সমাধান :
দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিকভাবে আফগানিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ভূবেষ্টিত আফগানিস্তানের চারদিকে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও ইরানের মতো প্রভাবশালী রাষ্ট্র। আফগানিস্তানের আঞ্চলিক সংকট সৃষ্টিতে ও তা সমাধানে এ দেশ তিনটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক. **পাকিস্তানের প্রভাব :** আফগানিস্তানের ওপর পাকিস্তানের সরাসরি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানকে সবসময়ই তার রাজনৈতিক সুবিধায় ব্যবহার করেছে। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য হামলা করলে পাকিস্তানে তালেবানদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করেছে। ২০০১ সালে ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালালে সেক্ষেত্রে পাকিস্তান তালেবানদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণসহ সকল ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাকিস্তান চায় সবসময়ই আফগানিস্তান তার অধীনস্থ থাকুক। পাকিস্তান ভুলেই যায় আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এছাড়া ভারত ও ইরানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে সে আফগানিস্তান সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং আঞ্চলিক প্রভাবকে বিস্তৃতি করতে আফগানিস্তানে সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে থাকে। ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো সৈন্য চলে যাওয়ায় সেখানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য এখন থেকেই রকেট হামলা চালিয়ে আফগান সীমান্তের দখল নিতে বদ্ধপরিকর পাকিস্তান। আফগান প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত জুলাই ২০১২ সালে অভিযোগ করে বলেন, আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সম্মান করতে হবে। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে পাকিস্তানকে।

খ. **ভারতের প্রভাব :** আফগানিস্তানের অপর প্রতিবেশী দেশ ভারত দীর্ঘদিন ধরে সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে পাকিস্তানের প্রভাব খর্ব করা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভারত আফগানিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার ঘোষণা দিয়ে আসছে। ভারতের লক্ষ হলো আফগানিস্তানে এমন কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা হতে না দেওয়া যা পাকিস্তানের পতুল সরকারে পরিণত হয়। একারণেই ভারত মনে করে তালেবানের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীন হওয়ার অর্থ হলো ভারতবিরোধী আফগানিস্তান তৈরি হওয়া। গত এক দশকে ভারত আফগানিস্তানে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে এবং সেখানকার অবকাঠামোগত ও রাজনৈতিক সংস্কারে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছে। ১২ নভেম্বর ২০১২ সালে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে খনি ও সার, যুব উন্নয়নপ্রকল্প সহ বিভিন্ন বিষয়ে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গ. **ইরানের প্রভাব :** আফগানিস্তানে কম বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায় অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানের। ইরান আফগানিস্তানে যেমন চায় না তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক তেমনি চায় না সেখানে মার্কিন আধিপত্য বজায় থাকুক। ইরানের জন্য স্থিতিশীল আফগানিস্তান বেশি প্রয়োজন। মার্কিন প্রভাবমুক্ত আফগানিস্তানে এক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা ইরানের প্রত্যাশা। অর্থাৎ আফগানিস্তানের তিন প্রতিবেশী, ভারত, পাকিস্তান, ইরান কেউ চায় না আফগানিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে থাকুক। প্রত্যেকেই নিজস্ব অবস্থানে থেকে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা চিন্তা না করে প্রতিবেশী তিনটি দেশের উচিত হবে আফগানিস্তানে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৩. **আন্তর্জাতিক প্রভাব ও তার সমাধান :**
আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণে সেখানকার সংকটগুলোও আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১ নম্বর শত্রু আল-কায়েদা দীর্ঘদিন

আফগানিস্তানের সহায়তায় মার্কিনবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। কারণ আল-কায়েদা এবং তালেবান সরাসরি পশ্চিমা বিশ্বের বিরোধী। ইতোমধ্যে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু দেশে আল-কায়েদা আক্রমণ চালিয়েছে। ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানে যদি আল-কায়েদা তার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তৃত করতে পারে তাহলে তা হবে পশ্চিমা বিশ্ব এবং আফগানিস্তান উভয়ের জন্যই দুশ্চিন্তার কারণ। এজন্য আফগানিস্তানে দরকার একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার এবং রাজনৈতিক পরিবেশ। যাতে করে তালেবান বা আল-কায়েদা কখনই আফগানিস্তানে শিকড় গাড়তে না পারে। তবে এজন্য সেখানে ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহারের পরবর্তী নিরাপত্তা রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী নিয়োগ করা যেতে পারে। জাতিসংঘের এ সমাধানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলে পরিস্থিতি দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে এবং তালেবান ও আল কায়েদা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তা হামিদ কারজাইর মতো দুর্বল সরকারের পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও কারজাই ইতোমধ্যে বলেছেন আফগানিস্তানের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য আফগান যুবকরা প্রস্তুত কিন্তু আফগান যুবক বা বর্তমান প্রশাসন কি পারবে সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে বহুজাতিক বাহিনীর সাথে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র লড়াই করা আল-কায়েদা ও তালেবান বাহিনীর মোকাবেলা করতে। তবে এক্ষেত্রে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে সেখানকার শান্তিরক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে আফগান যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা তারপর দেশের ভার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উপযুক্ত হবে নচেৎ সেখানে পুনরায় আল-কায়েদার প্রভাবিত তালেবান সরকার ক্ষমতা দখল করলে পুনরায় তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা সহজ হবেনা।

আফগান সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

ক. পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।
খ. চীনের প্রভাব থেকে পাকিস্তানকে মুক্ত রাখা।
গ. ভারত, পাকিস্তান মৈত্রী।
ঘ. তালেবানদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা।
ঙ. আফগানিস্তনের হাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব হস্তান্তর।
চ. আফগান দাতাগোষ্ঠীর সম্মেলনে ১৬০০ কোটি ডলার বেসামরিক সহায়তা ঘোষণা।
ছ. ন্যাটোর রসদপথ খুলে দেওয়া।
জ. আফগানিস্তানকে ন্যাটোজোট বহির্ভূত মার্কিন মিত্র ঘোষণা।
ঝ. ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটোজোট প্রত্যাহার।

ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ :

ক. জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসন।
খ. তালেবানদের মূলধারার রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা।
গ. প্রশাসন শক্তিশালীকরণ।
ঘ. পাকিস্তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা।
ঙ. ভারতের প্রভাব থেকে নিরপেক্ষ থাকা।
চ. ইরানের প্রভাবমুক্ত থাকা।
ছ. আন্তর্জাতিক প্রভাবমুক্ত থাকা।

১৩.২৩ ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে যে সকল পদক্ষেপ প্রয়োজন

১. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ২. তালেবানদের সাথে শান্তি আলোচনা ৩. আফগান সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়ন ৪. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ৫.ধর্মীয় মৌলবাদি দূর করা ৬. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ৭.অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন ৮.জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী নিয়োগ ৯. জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ১০. নারীদের সমান অধিকার ১১. যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা ১২. সহনশীলতা

১৪.বহিঃশক্তির লেজুরবৃত্তি পরিহার করা ১৫. মাদক ব্যবসা পরিহার করা।

১৩.২৪ তালেবানদের পতন এবং আফগানিস্তানের গণতন্ত্র

১৪ নভেম্বর, '৯৯ জাতিসংঘ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেতা রূপে পরিচিত ওসামা বিন লাদেনকে কাবুলে আশ্রয়দান এবং মধ্য এশিয়ার নানা দেশে সন্ত্রাস রপ্তানিকারী হিসাবে তালেবান সরকারের ওপর সৃষ্টি করার জন্যই আমেরিকার উদ্যোগে জাতিসংঘ এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আফ্রিকার দুটি মার্কিন দূতাবাসে সন্ত্রাসী হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র লাদেনকে দায়ী করে তাকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কারের দাবি জানায়। তালেবান সরকার প্রমাণিত হবার আগে লাদেনকে বহিস্কার করতে অস্বীকৃতি জানায়। তালেবান আফগানিস্তান সরকারকে সর্বপ্রকার চাপ প্রয়োগ করে ব্যর্থ হওয়ায় ৭ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সামরিক হামলা শুরু করে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণ প্রথমদিকে আফগানিস্তান বাহিনী কিছুটা প্রতিরোধ করলেও প্রচণ্ড বিমান হামলায় তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তালেবান সরকারের প্রধান মোল্লা ওমর এবং যাকে কেন্দ্র করে এ হামলা সেই লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে থেকে যায় অনিশ্চয়তা। প্রথমদিকে বিমান হামলায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে নি।

অবশেষে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের অবসান ঘটল। গত ২২ ডিসেম্বর, ২০০১ আফগানিস্তানে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে হামিদ কারজাই-এর ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে। রণাঙ্গনে স্তব্ধ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে নতুন ধারার রাজনীতি। অবশ্য তালেবানোত্তর আফগানিস্তানে একটি নতুন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। গত ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০০১ জার্মানির পিটাসবার্গ সম্মেলন কেন্দ্রে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে আফগানিস্তানের বিভিন্ন জাতি-উপজাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। চুক্তির মূল বিষয়গুলো হলো :

১. আফগানিস্তানে ছয় মাসের জন্য একটি ত্রিশ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন স্থাপন।
২. দুইশ সদস্যের একটি পার্লামেন্ট গঠন।
৩. দুই বছরের মধ্যে নতুন সংবিধান রচনার জন্য 'লয়া জিরগা' আহবান করা।
৪. আফগানিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাহিনীর উপস্থিতি মেনে নেয়া। এ চুক্তিতে উল্লেখযোগ্য জোট, সাবেক রাজা জহির শাহের রোম গ্রুপ ও পেশোয়ার গ্রুপ এই তিন পক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেওন।

স্বাক্ষরিত চুক্তির অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে যা আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা অর্জনে অনেকটা সহায়ক হবে। এক. পাশতুন নেতা হামিদ কারজাইকে সরকার প্রধান নির্বাচিত করা চুক্তির অন্যতম একটি সঠিক দিক। কেননা পাশতুন সম্প্রদায় আফগানিস্তানের মূল জনগোষ্ঠীর ৪২% । তাছাড়া কারজাই শিক্ষিত ও প্রশাসনিকভাবে দক্ষ একজন ব্যক্তি। সাবেক আফগান প্রধান জহির শাহের মতো একই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তালেবানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ তালেবান-উত্তর আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কি ফিরে আসবে ? এ প্রশ্নই এখন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। তাই পর্যবেক্ষণ মহল মনে করছেন, দেশটির সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে যার মোকাবিলায় আফগান সরকার ব্যর্থ হলে আফগানিস্তান পুনরায় যে তার অতীত অবস্থায় ফিরে যাবে তা হলফ করে বলা যায়।

প্রথমত : আফগান কারজাই সরকার বিভিন্ন উপদলের মাঝে একতা ও সমন্বয় আনতে কতদূর সার্থকভাবে এগিয়ে যেতে পারবে তারই ওপর নির্ভর করছে আফগানিস্তানের শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং এ নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কেননা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পক্ষ তাদের প্রভাব বজায় রাখতে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যুদ্ধ শেষ হওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও ইরান থেকে শরণার্থী আশা শুরু

করেছে। সেই সাথে দেশে অবস্থানরত আফগানরাতো আছেই এটা সামাজিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

তৃতীয়ত : কাবুল সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারে কিংবা আফগান পরিস্থিতি থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের মাঝে কৌশলগত কূটনীতি ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, যা আফগানিস্তানে নতুন সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

চতুর্থত : আফগানিস্তানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতি নিয়েও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু দল ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম মানতে নারাজ। তারা শান্তিরক্ষা বাহিনীতে জার্মানির নেতৃত্ব দাবি করেছে। এ নিয়েও সমস্যা রয়েছে।

পঞ্চমত : আফগানিস্তানকে নিয়ে আঞ্চলিক রাজনীতিতে মেরুকরণ সৃষ্টি আফগানিস্তানকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে এবং অতীতের ইতিহাস তাই বলে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ বারবারই তাদের প্রভাব বিস্তারে যত্নেষ্ট হয় এবং তজ্জন্য তাদের পছন্দসই দল বা উপদলকে মদদ দান করে, যা আফগানিস্তানকে দীর্ঘ ২৩ বছর যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ষষ্ঠত : সর্বোপরি মার্কিন সৈন্যের দীর্ঘ উপস্থিতিও আফগানিস্তানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা শত বোমা বর্ষণ করলেও তালেবানদের একেবারে নিশ্চিন্ন করা কখনো সম্ভবপর হবেনা।

১৩.২৫ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

আফগানিস্তানের দীর্ঘ ৪০ বছরের ইতিহাসে মার্কিন রাজনীতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ১৯৭৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাদশাহ জহির শাহকে উৎখাত করে আফগানিস্তানে সোভিয়েতপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তারের জন্য সুকৌশলে এগোতে থাকে।

১৯৭৮ সালে কাবুল-মস্কো সামরিক চুক্তি সই হয়। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক বাহিনী প্রবেশ করে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত দখলদারিত্ব হটিয়ে সেখানে মার্কিন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তালেবানদের অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণসহ সকল ধরনের সহায়তা দিয়ে তাদেরকে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে নামিয়ে দেয়। শুরু হয় আফগান সেনাদের সাথে তালেবানদের দীর্ঘ সংগ্রাম। আফগানিস্তানের প্রতিকূল পরিবেশে সোভিয়েত বাহিনী তালেবানদের সাথে না উঠতে পেরে ১৯৭৯ সালে সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। শুরু হয় মার্কিন কর্তৃত্ব বিস্তার।

৯/১১ এর আগে আফগানিস্তান মূলত একটি তালেবান রাষ্ট্র ছিল। তিনটি দেশের সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু ৯/১১ এর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সবকিছু উলট পালট করে দেন। আন্তর্জাতিক সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা মতে, আগামী দিনে আফগানিস্তানে ভারত, চীন, পাকিস্তান, ইরান তাদের নিজ নিজ স্বার্থের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রাখবে। আফগানিস্তানে সমস্যার কারণে পাকিস্তানে ঘটেছে ব্যাপক তালেবান সংক্রমণ। আফগানিস্তানে ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে তালেবান শক্তি পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অপরদিকে ইরান চাচ্ছে পাকিস্তান আফগানিস্তানে তালেবান ও মার্কিন প্রভাবমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক সরকার।

যুদ্ধের অবসান চায় আফগান প্রেসিডেন্ট : ১৯৯৬ সালে তালেবানরা আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে দেশে একটি মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। ২০০১ সালে বহুজাতিক বাহিনীর আক্রমণ ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তালেবানি শাসন কায়েম ছিল। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছেন, তালেবানদের সাথে একটি সমঝোতা পৌঁছার ব্যাপারে। এর মাধ্যমে আফগানিস্তানের ১২ বছর ধরে চলা যুদ্ধের একটি ইতি টানতে চাইছেন। কিন্তু অন্যদিকে তাকালে বুঝা যায় যে, বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা, মানবইতিহাসের এ সংকটময় মুহূর্তটিতে যথাযথ নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের দিকনির্দেশনার অদূরদর্শিতা, তাদের ক্রোধ আমাদের এ নতুন প্রজন্মকে যে ভয়াবহ একটি অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আফগানিস্তানে তালেবানদের প্রভাব বিস্তৃত : ১৯৯৬ সালে তালেবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতার দখল করে সেখানে এমন এক আশন ব্যবস্থা কায়েম করে যা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে। দীর্ঘ ৭/৮ বছরের তালেবানি শাসন সেখানে একটি শক্তিশালী তালেবান সমর্থক দল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত তালেবানদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। তালেবানরা আফগানিস্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিশ্বাসী তাদের এ অবস্থান আফগানিস্তানে বরাবরই ছিল। এই ১২ বছরে আফগানিস্তানে কী ঘটেছে ? সহজ উত্তরে বলা যায়, সংঘাত, মৃত্যু, ধ্বংস, আত্মঘাতী হামলা, ড্রোন, বিমান আক্রমণ, আর মৃত বিদেশি সেনার কফিনের দেশমুখী কাফেলা। অনুষ্ঠিত হয়েছে কারচুপির নিকৃষ্টতম নির্বাচন। এখন কাবুলে চলছে গণতন্ত্রের মহড়া। আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, দাতারা সাহায্য দেওয়া ঘোষণা দেয়, এই হলো আফগানিস্তানে মার্কিন উপহার। মার্কিন জোট বাহিনী আফগানিস্তান থেকে বিগত ১১ বছরের তালেবানদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তাদের দীর্ঘ ১২ বছরের সমরাভিযানে দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক মার্কিন বিরোধিতা লক্ষ করা যায় আর এরই ফলশ্রুতিতে তালেবানরা জনগণের সহানুভূতি অর্জনে সহায়ক পরিস্থিতি পাচ্ছে।

১৩.২৬ ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ

২০০১ সালে আফগানিস্তানে আল-কায়েদা ও তালেবান নির্মূল অভিযানের নামে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ন্যাটো সামরিক অভিযান চালায়। যদিও সে অভিযান ছিল জাতিসংঘের অনুমোদিত, উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে সন্ত্রাস ও জঙ্গি নির্মূল করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা। দীর্ঘ ১১ বছর পর জুলাই ২০১২ এসে এখনো ন্যাটো বাহিনীর বিশাল বহর আফগানিস্তানে জঙ্গি ও সন্ত্রাস নির্মূলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। ন্যাটো বাহিনীর দীর্ঘ ১১ বছরের সমর অভিযানে কাজের তুলনায় সাফল্য ছিল তুলনামূলক কম। এর প্রধান কারণই হচ্ছে ন্যাটো বাহিনীর সামরিক অভিযানে আফগানিস্তানের তৃণমূল মানুষের সমর্থন ছিল না। যদিও তারা আল-কায়েদা এবং তালেবানদের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল। ন্যাটো বাহিনীর এ দীর্ঘ সামরিক অভিযানে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিঘটনা ঘটিয়েছে। যা আফগানিস্তানের জনগণের কাছে ন্যাটোর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ন্যাটোর ভুল অভিযানের শিকার হয়ে সেখানে নারী ও শিশুসহ অনেক বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে যা ন্যাটোর গ্রহণযোগ্যতাকে নিচে নামিয়ে এনেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিশাল বহরের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে। এছাড়া বিশাল ন্যাটো বহরের সামরিক ব্যয়ভার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া এবং পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে লাদেনের হত্যা আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য বিশ্বের নায়ক একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো বাহিনীর প্রস্থানের গ্রহণযোগ্য সময় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এছাড়া হামিদ কারজাই সরকারও জনগণের চাপে সেখানে ন্যাটো বাহিনীর দীর্ঘস্থায়িত্বের পক্ষে ছিলেন না। এমতাবস্থায় ২০১২ এর নভেম্বরে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২৩ জুন ২০১১ তারিখে ঘোষণা করেন যে, ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ কাজও সমাপ্ত হয়েছে। আফগানিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ ও রাজধানী কাবুলের নিরাপত্তা ন্যাটো বাহিনী, আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করেছে। ন্যাটোর ,মতো বিশাল সামরিক বাহিনী যারা বিশ্বের সবচাইতে আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাদের আফগানিস্তান ত্যাগ করার পর যে শুন্যতা সৃষ্টি হবে আফগান সামরিক বাহিনী তা কতটুকু পূরণ করতে পারবে এ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। কারণ আফগানিস্তানের সার্বিক নিরাপত্তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে দেশটির গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্ব । ২০ নভেম্বর ২০১২ ফরাসি সৈন্যরা আফগানিস্তানে তাদের যুদ্ধ মিশন শেষ করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার কোট অব দ্যা ইউনিয়ন ভাষণে ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে ৩৪০০০ সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। আফগানিস্তানে বর্তমানে ৬৬ হাজার সৈন্য রয়েছে। ২০১৪ সাল নাগাদ আফগানিস্তান থেকে চূড়ান্তভাবে সব মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন তিনি।

http://thejobstudy.com Go to Contents

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যেসব পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :** আফগানিস্তানের দীর্ঘ ৯০ বছরের ইতিহাসে সেখানে গণতন্ত্রের চর্চা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে পেশিশক্তির দ্বারা। এক পক্ষ অপর পক্ষকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে, এ প্রেক্ষিতে সেখানে সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে নি ফলে সেখানকার জনগণের সহমর্মিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র শক্তিশালী গণতান্ত্রিক চর্চাই পারে আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপন করতে। ইতোমধ্যে জুলাই ১৪, ২০১২ আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তালেবান নেতা মোল্লা ওমরকে অস্ত্র ছেড়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফেরার আহবান জানিয়েছেন।

২. **তালেবানদের সাথে শান্তি আলোচনা :** বর্তমান প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবানরা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তালেবানদের বাদ দিয়ে আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই আফগানিস্তান সরকারকে তালেবানদের সাথে শান্তি স্থাপনে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। তালেবানদেরকে রাজনীতির মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে তালেবানদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে গোপনে তালেবানদের সাথে আলোচনা শুরু করেছে। তালেবানদের কাছ থেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এ ব্যাপারে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি এ ব্যাপ তালেবান-আফগান সরকার-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

৩. **আফগান সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়ন :** আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে চলা আসা সশস্ত্র সংগ্রামের বিপরীত পক্ষে রয়েছে তালেবানদের মত জঙ্গি সংগঠন। যাদের রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের সাথে লড়তে হলে আফগান সামরিক বাহিনীও আধুনিক সমরাস্ত্রে প্রশিক্ষিত করতে হবে। যাতে করে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দ্রুত দমন করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়।

৪. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** আফগানিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এর অন্যতম প্রধান কারণ আফগানিস্তানের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, দল, উপদল এবং গোষ্ঠীগত বিভক্তি। এদের মধ্যে রয়েছে আবার দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব। ফলে এখানে নিজেরাই নিজেদের প্রতিপক্ষ এতে এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই থাকে। বিশেষ করে এখানে বসবাসরত পুশতুন, উজবেক, তাজিক, হাজারা, আইম্যাক প্রভৃতি জাতিগুলোর দ্বন্দ্ব উল্লেখ করা যায়। অভ্যন্তরীণ জাতি-গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বাইরের শক্তিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দেয়, এতে করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘায়িত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল শর্তই ,হলো একতাবদ্ধ আফগান জাতি।

৫. **ধর্মীয় মৌলবাদ দূর করা :** আফগানিস্তানে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলো সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তালেবান, আল-কায়েদা, মোল্লা ওমরের সমর্থনপুষ্ঠ রাজনৈতিক দলগুলো আফগানিস্তানে ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ জনগণের ওপর জোরজুলুম করে আসছে। ধর্মীয় শরীয়া আইনের অযুহাতে সেখানে উগ্র ইসলামী মোল্লাতন্ত্র কায়েম করছে। যা দেশের নারী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার জনগোষ্ঠীকে সংকটের মধ্যে ফেলেছে। আফগানিস্তানে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেখান থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ দূর করতে হবে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. **আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা :** আফগানিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় অনুশাসননির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষা যা দেশের একটি বিরাট অংশকে আধুনিক চিন্তা-চেতনা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। একটি জাতির মেরুদণ্ডই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা। কোনো একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মেরদণ্ড যদি ভাঙা থাকে তাহলে সে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। বিগত দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে তালেবান এবং ধর্মীয় মৌলবাদী শাসনব্যবস্থার কারণে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ঘটেনি। এতে করে আফগানিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক প্রযুক্তি

নির্ভর করতে গড়ে তুলতে জন শক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। যাতে বেকারত্বের কারণে যুবকরা বিপদগামী না হতে পারে।

৭. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি :** আফগানিস্তানে সমৃদ্ধি আনয়নের পূর্বশর্তই হলো সেখানকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা। সেখানে দীর্ঘদিন জাতিগত ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে বৈদেশিক বিনিয়োগ এমনকি স্থানীয়ভাবে আধুনিক শিল্পকলকারখানা গড়ে ওঠে নি। ফলে সেখানে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হয় নি সে জন্য জনজীবনে স্থবিরতা লক্ষ করা যায়, যা সেখানকার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। আফগানিস্তানের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সেখানে বৈদেশিক বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সহযোগিতা, দাতাগোষ্ঠীর ঋণ একান্ত অপরিহার্য যা দেশটিকে পুর্নগঠনে সহায়তা করে সমৃদ্ধি আনয়ন করবে। আফগানিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতার জন্য সেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য।

৮. **জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী নিয়োগ :** আফগানিস্তানে দ্বন্দ্বরত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো দমন করে সেখানে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে। ২০১৪ সালে সেখান থেকে ন্যাটো বাহিনী চলে গেলে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আফগানিস্তান সরকার সেখানে দীর্ঘস্থায়ীভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। এতে করে দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা দ্রুত ফিরে আসবে।

৯. **জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর :** আফগানিস্তানে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সংবিধান সংশোধন করে ভিন্ন উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণের সকল পথ বন্ধ করে দিতে হবে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা দেশের গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল রূপ দিতে সহায়তা করবে।

১০. **নারীদের সমান অধিকার :** আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন তালেবান শাসনে সেখানে নারীদের শিক্ষা, চাকরিসহ স্বাভাবিক জীবনধারণের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। সমাজের অর্ধেক অংশই নারী আর এ নারীকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজব্যবস্থা অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। তাই নারীদের সমাজের সর্বস্তরে সমান অধিকার দিয়ে জাতীয় সংহতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে সুযোগ করে দিতে হবে। এতে সমগ্র আফগানিস্তানের জনগণই লাভবান হবে।

১১. **যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা :** আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন কোনো যোগ্য, সৎ ও ত্যাগী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় নি ফলে সেখানকার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে সঠিক দিক নির্দেশনা পাচ্ছিল না। যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে যাতে কর তার নেতৃত্বে সমগ্র আফগানবাসী জাতীয় উন্নয়নে একজোট হয়ে লড়তে পারে। একনায়কতন্ত্র, মৌলবাদ, স্বৈরতন্ত্রের দীর্ঘশাসনে আফগানিস্তান অনেক পিছিয়ে পড়েছে। অতীতের শাসকেরা দেশের চেয়ে নিজের ব্যক্তিসমৃদ্ধি নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিল ফলে সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল। বর্তমানে সেখানে সৎ, যোগ্য ও কঠোর নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলে দ্রুত স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

১২. **সহনশীলতা :** ১৯১৯ সালে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার পর থেকেই সেখানে অবস্থানরত জাতি, গোষ্ঠী, দল, উপদল এবং শাসকদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগে থাকত। দল, উপদল গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠীগত বিভক্তিই ছিল সেখানকার জাতিগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আফগানবাসীদের মধ্যে অতীতের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সহনশীলতার প্রমাণ রাখতে একে অন্যকে সম্মান ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং হিংসা দূর করে ভাতৃত্ব বন্ধনে একে অপরকে আবদ্ধ করতে হবে। তাহলে অতি দ্রুতই সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

১৯১৯ সালে আফগানিস্তান স্বাধীন হবার পর থেকে সেখানে শাসন বা শোষণ করেছে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র। গণতন্ত্রের কনো সুবাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারে নি।

দীর্ঘ দিনের তালেবানি শাসনে আফগানিস্তানের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে ২০০১ সালে সেখানে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সশস্ত্র তালেবান জঙ্গিদের দমনে দীর্ঘ ১১ বছর চেষ্টা করে আসছে। তালেবানদের ক্ষমতা আগের মতো তীব্র না থাকলেও তারা এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তারা যেকোনো সময় সংগঠিত হয়ে যেকোনো অঘটন ঘটাতে পারে। এমতাবস্থায় ২০১৪ সালের মধ্যে ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করবে এবং সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করবে আফগান সেনাবাহিনী। তালেবানদের মতো আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান সেনাবাহিনী কতটা সফলতা অর্জন করবে তা একমাত্র সময়ই বলে দিবে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে; ২০১৪ সালে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার করে নিলে সেখানে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হবে আর এ শূন্যতা পূরণে আফগান সেনাবাহিনী আবার ব্যর্থ হলে সেখানে পুনরায় তালেবান শাসন জাতির মাথার উপরে চেপে বসবে, যা আফগানবাসীর জন্য কোনোভাবেই মঙ্গল বয়ে আনবে না। তাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো হয় ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহারের পর যদি সেখানে দীর্ঘদিনের জন্য জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয় এবং সাথে সাথে আফগান সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নও চলতে থাকবে। আফগান সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি সেখানে জাতিসংঘের নেতৃত্বে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এ মুহূর্তে সকল পক্ষের সমঝোতাই পারে আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে। সমঝোতা ব্যর্থ হলে আবার মুখোমুখি হতে হবে সরকার এবং দ্বন্দ্বরত তালেবানসহ জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে। তাই দেশের বৃহৎ স্বার্থে জাতীয় ঐক্য স্থাপনই সেখানে একান্ত অপরিহার্য।

আফগানিস্তানের জাতীয় মতৈক্যের সরকার

আফগানিস্তানের মতো একটি দেশে যে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব না এই ধারণা থেকেই মুলত দেশটি থেকে আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহার শুরু হয়। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই যে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশটি থেকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় তথা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার সম্মিলিত উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রচেষ্টা।

১৪ জুন ২০১৪ আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী ছিলেন আশরাফ ঘানি ও আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ। প্রাথমিক ফলাফলে আশরাফ ঘানিকে বিজয়ী ঘোষণা করার পর ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে আবদুল্লাহর সমর্থকরা রাস্তায় নেমে আসে। নির্বাচনে আবদুল্লাহ নিজেকে প্রকৃত বিজয়ী বলে দাবি করেন। এমন পরিস্থিতিতে সংকট যখন ঘনীভূত হয়ে পড়ে তখন দুই প্রার্থীর মধ্যে বৈরিতা অবসানে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে আফগানিস্তানের আসেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি। দীর্ঘ আলাপ- আলোচনার পর উভয় প্রার্থী একটি জাতীয় মতৈক্যের সরকার গঠনে সম্মত হয়। সে মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ঐ দুই প্রার্থী। এর মধ্য দিয়ে কয়েক মাস ধরে চলা রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আশরাফ ঘানি প্রেসিডেন্ট এবং আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদায় CEO পদে দায়িত্বগ্রহন করেন।

জাতীয় মতৈক্যের সরকারের রূপরেখা

১. নতুন আফগান সরকারের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে যার প্রধান হবেন প্রেসিডেন্ট।
২. মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী সমতুল্য মর্যাদার একজন CEO থাকবেন, যার দুজন সহকারী থাকবেন।
৩. CEO প্রেসিডেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
৪. প্রেসিডেন্ট কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো নেবেন।
৫. CEO এর নেতৃত্ব দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ করবে মন্ত্রিসভা।

ঐক্য সরকার ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার ও মাসেরও বেশি সময় পর আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি ১২ জানুয়ারি ২০১৫ ঐক্যজোটের সরকারের মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করেন। ২৫ সদস্যের এ

মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন সরকারের প্রধান নির্বাহী ও প্রেসিডেন্ট ঘানির প্রতিপক্ষ আবদুল্লাহ। মন্ত্রিসভায় ৩ জন নারী স্থান লাভ করে। তারা সংস্কৃতি, উচ্চশিক্ষা ও নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয় লাভ করেন। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন ২০১১ সালে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত সাবেক প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দিন রাব্বানীর ছেলে সালাহউদ্দিন রাব্বানী।

চুক্তিতে হয়তো ক্ষমতার ভাগাভাগি হয়েছে। কিন্তু দায়িত্বের ভাগাভাগিটা স্পষ্ট করা হয় নি। আফগানিস্তানের সংবিধানের প্রেসিডেন্টকে একচ্ছত্র ক্ষমা দিয়েছে। তবে আইনের কাছে তিনি দায়বদ্ধ। আর চুক্তি অনুযায়ী সিইও দায়বদ্ধ থাকবেন প্রেসিডেন্টের কাছে। এতে প্রেসিডেন্ট ও সিইওর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। কারন সিইও দৃড়ভাবে মনে করেন, তিনি নির্বাচনে জয় পেয়ে এই পদে এসেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশটিতে খুব সুন্দর করে সরকার পরিচালনা করাটা কঠিন হবে বৈকি।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে?
উত্তর: ১৯১৯

২. আফগানিস্তানে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা করা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৫৭

৩. আফগানিস্তানে কত সালে তালেবান গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে?
উত্তর: ১৯৯৬

৪. টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয় কবে?
উত্তর: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১১

৫. হামিদ কারজাই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন কবে?
উত্তর: ২০০৪ সালে

৬. কত সালে কাবুল মাস্কো আমরিকা চুক্তি সই হয়?
উত্তর: ১৯৭৮ সালে

৭. আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৭৮ সালে এপ্রিল।

৮. আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পালাবদলের পালায় কোন দল ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসে।
উত্তর: ইসলামী মৌলবাদীরাই।

৯. ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে কত ডলার?
উত্তর: প্রায় ২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১০. OIC
উত্তর: Organization of Islamic Conference.

http://thejobstudy.com Go to Contents

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. তালেবান
খ. ওসামা বিন লাদেন।

২. ক হামিদ কারজাই কে
খ. হামিদ কারজাই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন কবে?

৩. ক. আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ আলোচনা কর?
খ. আফগানিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান বর্ণনা কর?

৪. ক. আফগানিস্তানের ন্যাটো বাহিনী?
খ. আফগানিস্তানে কত সালে তালেবান গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন?

২. আফগানিস্তানের দীর্ঘ তিন দশকের রাজনেতিক সংকট আলোচনা করুন ?

৩. আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তালেবানদের ভূমিকা আলোচনা করুন ?

৪. ন্যাটো পরবর্তী আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

৫. আফগানিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।

৬. আফগানিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনাপূর্বক বর্তমান সংকট উত্তরণে উপায়সমূহ আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ১৪

চীন ও তার তিব্বতীয় সংকট : বর্তমান মূল্যায়ন

China and Tibetan Crisis : Present Evaluation

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৪.১ ভূমিকা
১৪.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
১৪.৩ তিব্বতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

১৪.১ ভূমিকা (Introduction)

তিব্বতের অবস্থান চীন এবং ভারতের মধ্যস্থলে হিমালয়ের সুউচ্চ স্তরে। এটি এমন একটি অঞ্চল যার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিব্বতকে কেন্দ্র করে যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৫০-এ যখন সদ্যগঠিত চীন গণপ্রজাতন্ত্রের সৈন্যবাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করে। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল Peaceful Liberation অর্থাৎ তিব্বতের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুক্তি। কারণ চীনের বিবেচনায় তিব্বত দীর্ঘকাল ধরে মূল চীনের এক অখণ্ড অংশ। অথচ কয়েক শতাব্দী ধরে ধর্মীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের শৃঙ্খলে তিব্বত চীনের ভাষায় নির্যাতিত হয়ে চলেছে। অথচ তিব্বতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের চর্চা করলে দেখা যায় যে, তিব্বতের বরাবর একটি স্বতন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

১৪.২ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background)

তিব্বত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাহাড়, মালভূমি ও তুষারাবৃত একটি দেশ। দেশটি এশিয়ার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এর বেশির ভাগই উঁচু ঠাণ্ডা মালভূমি। এদেশ বহুদিন স্বাধীন থাকলেও বর্তমানে চীনের অংশবিশেষ। বৌদ্ধ ভিক্ষু (যাঁদের 'লামা' বলা হয়) তিব্বতের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। দালাইলামা ভারতে পালিয়ে যান। ১৯৬৫ সালে চীন তিব্বতকে কিছু স্বায়ত্তশাসন দিলেও ১৯৬৭ সালে আবার তিব্বতকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তিব্বতের আয়তন প্রায় ১২,০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ২৪.৪ লক্ষ। এর বেশির ভাগ মানুষ দেশের দক্ষিণাংশে বাস করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিব্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৫০০০ মিটার এবং অসংখ্য হ্রদ, অনুর্বর পাহাড়, নুড়ি পাথর ইত্যাদি দ্বারা এটি আবৃত। এশিয়ার অনেক নদী, যেমন- ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মেকং, সালইউন, ইয়াংসি প্রভৃতি নদ-নদীর উৎপত্তি এখান থেকে। ১৯৫৭ সালে তিব্বতে কয়লা, জিপসাম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির সন্ধান লাভ করে। তাছাড়া এখানে সোনা, সোহাগা, লবণ ইত্যাদিও আছে। মাটি অনুর্বর ও ঠাণ্ডা বলে এখানে কৃষিকাজ ভালো হয়। বৃষ্টিপাত ২৫ সে.মি. এর কম। তাপমাত্রা শীত ও গ্রীষ্মে ৪ ডিগ্রি থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করে। তিব্বতীদের ভাষা বর্মীদের মতো এবং তিব্বতীয়রা বেঁটে ও শক্তিশালী। এদের বেশির ভাগই যাযাবর। মেষপালক, কৃষক ও শ্রমিক সব ধরনের লোকই তিব্বতে

দেখা যায়। প্রধান খাদ্য বার্লি এবং চীনা চা প্রধান পানীয়। ইয়াক প্রাণী তিব্বতীদের খুব কাজে লাগে। তার থেকে তারা দুধ, মাখন ও মাংস পায় এবং বোঝা বহনের কাজেও ব্যবহার করে। লাসা তিব্বতের রাজধানী এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। দালাইলামার মঠ পতোলা দেখতে প্রাসাদের মতো এবং এতে প্রায় হাজারটি কক্ষ আছে।

ভারতের সাথে তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক সম্পর্ক সুদীর্ঘকাল ধরে শক্তিশালী হয়েছে। ইংরেজ আমলে তিব্বতের রাজধানী লাসায় একটি ভারতীয় বাণিজ্য দপ্তর অবস্থিত ছিল। তিব্বতের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যেমন বহু প্রাচীন, তেমনি তিব্বতের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক সম্পর্ক অনেককাল ধরে গড়ে উঠেছে। অতীশ দীপঙ্কর থেকে শুরু করে রাহুল সংকৃত্যায়ন এবং একালে আরও জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তির তিব্বত চর্চার মাধ্যমে ভারতের সাথে তিব্বতের সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হয়েছে। অনেকেই বলেন যে, ১৯৫০ সালে চীনের তিব্বত অভিযানের পর চীনের সুরে সুর মিলিয়ে তিব্বতকে চীনের অংশরূপে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা ভারতের পক্ষে এক ভুল পদক্ষেপ হয়েছিল। ইংরেজ আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত অনুসারে ভারতের উচিত ছিল তিব্বতের ওপর চীনের প্রাধান্য (Suzerainty)-কে স্বীকার করা। কিন্তু ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত পানিক্করের মাধ্যমে ভারত চীনের কাছে যে বার্তা প্রেরণ করে সেখানে Suzerainty কথাটির পরিবর্তে Sovereignty অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব কথাটি লিখিত তথা মুদ্রিত হয়েছিল। ফলে শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের পরিবর্তনের কারণে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, ভারত তিব্বতের ওপর চীনের সর্বোচ্চ অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। অবশ্য বিষয়টি এখনও সুস্পষ্ট নয়।

তিব্বত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়ভাবে চীনের প্রতি ভারতের সুনির্দিষ্ট একটি নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল, যাতে ভারতের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু ভারত সরকার খানিকটা আবেগবশত কারণে এবং কিছুটা কূটনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে সেটা করে উঠতে পারে নি। চীন সম্পর্কে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এতই আশাবাদী ছিলেন যে, পাশ্চাত্য দুনিয়ার কঠোর মনোভাবকে অগ্রাহ্য করে জনগণ প্রজাতন্ত্রকে সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দিলেন। এরপর এশীয় রাষ্ট্রগুলোর ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে কূটনৈতিক জগতের এক সম্মানিত আসনে স্থাপন করলেন। চীনের তিব্বত দখল প্রসঙ্গে ভারত সরকার এক মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। ১৯৫৪ সালে চীন গণপ্রজাতন্ত্রের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে পঞ্চশীল চুক্তি বলা হয়। চুক্তির মূল কথা হলো উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সহযোগিতার নীতি অনুসৃত হবে। অদ্ভুত ঘটনা হলো এটাই যে, যখন ১৯৫০ সালে চীনের সৈন্যবাহিনী তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে তখন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এলসালভেডর একটি প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে তিব্বতের ওপর চীনের আক্রমণের নিন্দা করতে চেয়েছিল। একইসাথে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, জাতিসংঘের একটি কমিটি নিয়োগ করা দরকার, যে কমিটি তিব্বত সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু ভারতই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কারণ ভারতের বক্তব্য ছিল এটাই যে, চীন বিষয়টির শান্তি পূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বাস প্রদান করেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে, ভারত যদি সেই সময়ে তার রাজনৈতিক এবং সামরিক কৌশলগত স্বার্থ সঠিকভাবে বিবেচনা করত তাহলে ভারতেরই উচিত ছিল তিব্বতের প্রশ্নে জাতিসংঘের মঞ্চে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করা। অন্ততপক্ষে এলসালভেডরের আনীত প্রস্তাবের সরকারি বিরোধিতা না করে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে পারত। ভারত যতই চীনের প্রতি বহুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখাক ৬০-এর দশকের প্রথমভাগ থেকেই চীনের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এই অবনতির সম্পর্ক চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহণ করে ১৯৬২ সালের শেষভাগে যখন চীন আকস্মিকভাবে ভারত সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ এবং অনুপ্রবেশ করে। বলাবাহুল্য চীনের এই আকস্মিক ভারত আক্রমণ নেহরুর নিজের পক্ষে অত্যন্ত মর্মবেদনার কারণ হয়েছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রস্তুতিহীনতা পরিলক্ষিত হওয়ায় তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন পদত্যাগে বাধ্য হন। ইতোমধ্যেই তিব্বতের ধর্মগুরু এবং সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ নেতা দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় প্রদান

করা হয়। এ সময় স্পষ্টতই ভারতের জনমত দলাই লামার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল।

পরবর্তীকালে চীন নানাভাবে তিব্বতের ওপর তার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে ক্রমশ শক্তিশালী করেছে। এ নিয়ন্ত্রণকে লক্ষ্য রূপে চিহ্নিত করে মূল ভূখণ্ডের সাথে তিব্বতের যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চীন ক্রমশ এতই সুদৃঢ় করেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগকে রীতিমতো বিস্ময়কর এবং প্রশংসনীয় বলা যায়। বিশেষভাবে লাসার সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে গিয়ে অসংখ্য প্রাকৃতিক দুর্গমতাজনিত বাধা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আধুনিক চীন যেভাবে তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষকে উপস্থাপিত করেছে তা নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে তিব্বতের জনগণকে অর্থাৎ তিব্বতি সম্প্রদায়কে। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধাকে সম্বল করে চীনা পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যাগত বিন্যাসের চেহারাকে অনেকটাই পরিবর্তিত করতে পেরেছে। আমরা বলতে চাই যে, তিব্বতিদের অর্থাৎ স্থানীয় মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নানাভাবে ক্ষুন্ন করার জন্য চীনের সরকার প্রয়াসী হয়ছে। দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর সর্বত্র তিব্বতীগণ বার বার এই অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন যে, চীন গণপ্রজাতন্ত্র শুধু তাদের ভূখণ্ড দখল করে আছে তা নয়, তাদের একান্ত নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চীন তার ক্রিয়া কলাপের দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।



তিব্বত: গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অধীনে ১৯৪৯

১৪.৩ তিব্বতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ১৯৫০ সালে তিব্বত দখল করে নিয়েছিল। প্রতিবেশী ভারতের তা পছন্দ না হলেও নেহরু প্রশাসন সেই চীনা আগ্রাসনের কোনোরূপ প্রতিবাদ করে নি। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পঞ্চশীল নীতি গ্রহণের শুরু থেকেই ভারত সরকার তার বিদেশনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অখণ্ড চীনকে মেনে নিয়েছিল। সেই সময় থেকেই তিব্বত সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল। ১২, ২০, ০০০ বর্গ কিমি বিশিষ্ট তিব্বতের জনসংখ্যা ২.৬ মিলিয়ন। তিব্বতের জনগণ কোনোদিনই তিব্বতের চীনভুক্তিকে মেনে নিতে পারে নি। তাই কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই বৌদ্ধ তিব্বত স্বাধীনতার দাবিতে

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। চীনও সেই স্পর্ধাকে ক্ষমার চোখে দেখে নি।

মুক্ত তিব্বতের দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছিল ১৯৫৯ সালে। ঐ বছরে ১০ মার্চ সেই আলোড়নের পরিণতিতে তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক নেতা বৌদ্ধ আচার্য চতুর্দশ দালাই লামা (মূল নাম তেনজিন গ্যাৎসো) ভারতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেই থেকে বরফে ঢাকা হিমালয়ের কোলে ভারতের ম্যাকলিওডগঞ্জ ধর্মশালা হলো দালাই লামাসহ এদেশে আশ্রয় নেওয়া তিব্বতিদের বসবাসস্থল। 'নির্বাসিত' তিব্বতি সরকারের কর্মস্থলও হলো ঐ এলাকা। তিব্বতি জনগণের ওপর তাদের নির্বাসিত ধর্মগুরু দালাই লামার প্রভাব অপরিসীম। তিব্বতে চীনের শাসন-শোষণ-দমনের বিরুদ্ধে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, 'তিয়েন-আনমেন স্কোয়ারের ঘটনা'র বছরে। সেই সময় তিব্বতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন হু জিনতাও। বলাবাহুল্য, চীনা প্রশাসন রীতিমতো কঠোর হাতে সেই ৮৯-এর তিব্বতি অভ্যুত্থানও দমন করেছিল।

সেই ঘটনার প্রায় দুই দশক পরে ২০০৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিব্বতের রাজধানী লাসায় আবার চীনা অপশাসনের বিরোধিতায় ও স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৯ সালের ১০ মার্চ দালাই লামার তিব্বত ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার ঘটনার ৪৯তম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে লাসা-র পথে পথে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমিকদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ জোরদার বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেছিল। বিক্ষোভকারীরা ১৪ মার্চ দিনভর 'নিষিদ্ধ নগরী' লাসার পথে পথে মিছিল ও অবরোধ করে। স্থানে স্থানে পাথর ছোঁড়ে, দোকান-বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়। চীনা পুলিশ প্রশাসনও নীরব থাকে নি। এ ঘটনাকে তারা দালাই লামার প্ররোচনাপ্রসূত বলে উল্লেখ করে কড়া হাতে বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় নামে। বেইজিং প্রশাসন বিক্ষোভের মোকাবেলাকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করে পথে নেমেছিল। দালাই লামার প্রশাসন জানিয়েছিল যে চীনা পুলিশ ও সামরিক বাহিনী তিব্বতিদের মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে অন্তত ১০০-এর মতো মানুষকে হত্যা করেছে। চীনা সরকার অবশ্য প্রথমদিকে কোনো তিব্বতির মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নি। ঘটনাচক্রে হু জিনতাও দ্বিতীয়বারের জন্যে চীনের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হওয়ার সময়েই তিব্বতের বিদ্রোহ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছিল। লাসার বিক্ষোভের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল চীনের অন্যান্য কয়েকটি শহর ও প্রদেশে। সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছিল সিচুয়ান প্রদেশে যেখানে শ'দুয়েক বিক্ষোভকারী পুলিশচৌকিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, যদিও সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। অবশ্য তিব্বতে চীনা প্রশাসনের কঠোর দমন-পীড়ন নীতির প্রতিবাদে সারা বিশ্বজুড়েই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। মার্কিন প্রশাসন চীনকে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ রাখার আর্জি জানায় নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে প্রবাসী তিব্বতি বিক্ষোভকারী এবং তিব্বতের প্রতি সহমর্মী অসংখ্য ব্যক্তি তিব্বতীয় প্রশ্নে জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। তারা চীনে আসন্ন অলিম্পিক গেমস বয়কটেরও আর্জি জানায় যদিও তার প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত হয়নি।

তিব্বত প্রশ্নে প্রতিবেশী ভারত সেই ১৯৫০ সালের মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে। চীনের সঙ্গে যেনতেন প্রকারের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ভারত তিব্বতের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেও চীনের সমালোচনার পথে হাঁটেনি। উপরন্তু মনমোহন সিং প্রশাসন দালাই লামার ওপর পরোক্ষ চাপ বাড়িয়েছিল এবং তাঁকে চীনবিরোধী প্ররোচনামূলক কাজ কর্মে রশে টানতে বলেছিল। এমনকি ধর্মশালায় নির্বাসিত তিব্বতিদের চীনের উদ্দেশে প্রতীকী স্বাধীনতা যাত্রাও ভারতীয় পুলিশ প্রশাসন কঠোর তৎপরতায় রদ করে। এর ফলস্বরূপ চীনের প্রধানমন্ত্রী তিব্বত প্রসঙ্গে ভারতের ভূমিকার প্রশংসাই করেছিলেন।

১৯৯৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে তিব্বতে স্বশাসনের নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তিব্বতের বর্তমান প্রজন্ম সে লাসা অথবা ধর্মশালা যেখানেই বাস করুক না কেন সেই সীমিত স্বশাসনের রামধনুতে সন্তুষ্ট নয় মোটেই। তিব্বতিদের রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব

টিবেট'-এর কর্ণধার যুবনেতা সিমি ইয়ংডাং-এর বক্তব্য এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট। তাঁর মতে দলাই লামার মধ্যপন্থা নীতি অথবা স্বশাসন কোনো সমাধান হতে পারে না। তিব্বতিরা এখন পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, চায় তিব্বত থেকে বিজাতীয় 'ভিন্ন সংস্কৃতি'র হান-দের(চীনা জনজাতি) বিতাড়ন। তিব্বতিদের বক্তব্য হলো দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তাঁরা চীনের শাসন ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন কীভাবে চীন প্রতিনিয়ত তিব্বতি সংস্কৃতির নিজস্বতা ধ্বংস করে চলেছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে তাঁদের আন্দোলন চীনকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। ভারতের কাশ্মীর, রাশিয়ার চেচনিয়ার মতো চীনেরও গলার কাঁটা হয়ে উঠছে তুষার ধবল তিব্বত।

১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মানবাধিকার গোষ্ঠীর (Human Rights Caucus)-এর সামনে প্রদত্ত এক ভাষণে দলাই লামা তিব্বত প্রসঙ্গে তার ৫ দফা শান্তি পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন:

প্রথমত, তিব্বতি জনগোষ্ঠী আধ্যুষিত সমগ্র অঞ্চলটিকে একটি শক্তি ও অহিংসার অঞ্চলরূপে গণ্য করতে হবে। এ অঞ্চলটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চল (Tibet Autonomous Region) এবং দুটি সংলগ্ন তিব্বতি অধ্যুষিত প্রদেশ আমডো (Umdo) এবং খাম (Khum)।

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা স্থানান্তর (Polulation) সংক্রান্ত চীনের নীতির পরিবর্তন করতে হবে। এখানে জনসংখ্যার স্থানান্তর বলতে তিব্বতের অভ্যন্তরে হান গোষ্ঠীর জনগণকে নিয়ে আসার প্রসঙ্গটিকে বোঝাতে হয়েছে।

তৃতীয়ত, তিব্বতি জনগণের মৌলিক এবং মানবিক অধিকার এবং তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

চতুর্থত, তিব্বতে কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করতে হবে। এই অঞ্চলের পরিবেশ এবং প্রকৃতি যথাযথ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত, তিব্বতের ভবিষ্যৎ মর্যাদা (Future Status) নির্ধারণ করার জন্য আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনার সূচনা করতে হবে।

বলাবাহুল্য মূলত এ বক্তব্যকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সদিচ্ছা ও সমর্থন সুনিশ্চিত করার জন্য দলাই লামা অক্লান্তভাবে প্রায় সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা করে চলেছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তিনি একথা বলেছেন যে, যেহেতু তার মূল চিন্তার বিষয় হলো তিব্বতিদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের পথ সেই কারণে তিনি শুধুমাত্র প্রকৃত স্বাধিকার (Genuine Autonomy) চাইছেন। তিনি কখনো চীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা চাইছেন না। বস্তুতপক্ষে ১৯৭৯ সালে চীনের তৎকালীন রাষ্ট্রনায়ক দেং-জিয়াও-পিং (Deng-xiao-Ping) বলেছিলেন যে, "পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি প্রস্তুত।" মূলত এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে দলাই লামার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বেইজিং-এর শাসন কর্তৃপক্ষের ঘরোয়া আলোচনা (Informal Exchange of Views) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি বিশ্বের নানাপ্রান্তে এবং বিশেষভাবে ভারতে মাঝে মাঝে তিব্বতি জনগণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে এবং দীর্ঘকাল একদিকে যেমন তিব্বতিদের বিক্ষোভ প্রদর্শণের ঘটনা ঘটেছে, তেমনি আবার চীনের দ্বারা কঠোরভাবে সেই বিক্ষোভ দমনের ঘটনাও ঘটেছে। ইতোমধ্যে ১৯৯৮ সালে বিল ক্লিন্টনের নেতৃত্বে মার্কিন প্রশাসন চীনকে দলাই লামার সাথে সরাসরি আলোচনায় বসার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শান্তি ও অহিংসার এক মূর্ত প্রতীকরূপে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আজ পর্যন্ত চীন সরকার এবং হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় স্থাপিত দালাই লামার প্রশাসনিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে অন্ততপক্ষে আলোচনার ৫টি পর্ব (Rounds of Discusions) সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু এ সব আলোচনা থেকে কোন ইতিবাচক ফলাফল নির্গত হয় নি। আসলে চীন মনে করে যে, ধর্মশালায় কেন্দ্রীভূত দালাই লামার

নেতৃত্বাধীন তিব্বতিদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামোগত কোনো রাষ্ট্রই সরকারের মর্যাদা দেয় নি। তিব্বতি জনগণের আন্দোলন ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় অনুপ্রেরণার উৎস হলেন দালাই লামা। তাঁর আকর্ষণ ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল এবং তা শুধুমাত্র রাজনীতি ও বুদ্ধিচর্চার জগৎকে স্পর্শ করে নি, তা যথেষ্ট পরিমাণে হলিউডের চলচ্চিত্র জগৎকেও প্রভাবিত করেছে (এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও চলচ্চিত্র বোদ্ধা রিচার্ড গেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)। চীনের প্রত্যাশা হল দালাই লামা যখন থাকবেন না তখন তিব্বতিদের আন্দোলন স্বাভাবিক নিয়মে স্তিমিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো সাম্প্রতিক লামা বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে চীন সরকারের আচরণের প্রতি আবার নতুনভাবে এবং জোরালোভাবে যে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে তা কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে রাষ্ট্রনায়কদের স্তরেও। এমনকি সাবেক ফরাসি রাষ্ট্রপতি সারকোজিসহ বিশ্বের বহু নেতা বেইজিং অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেন।

মূল্যায়ণ (Evaluation)

চীন সরকার যদি হংকং এবং তাইওয়ানের ক্ষেত্রে "এক দেশ, দুই ব্যবস্থা" (One Conuntry, Two Systems) অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দু প্রকারের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করতে পারে তবে তাকে তিব্বতের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে বুঝতে হবে যে, হংকং এবং তাইওয়ান দুটি হলো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ১৯৯৭ সাল ব্রিটেনের প্রাক্তন উপনিবেশ হংকং "এক দেশ, দুই ব্যবস্থা" নীতির ভিত্তিতে চীনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে তাইওয়ান এখনও পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। অথচ তিব্বত তো বরাবরই চীনেরই অংশরূপে পরিগণিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫১ সালে সামরিক অভিযানের পর চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তিব্বতের আঞ্চলিক সরকারের যে ১৭ দফা চুক্তি, স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মূল বক্তব্যটি ছিল এটাই যে, তিব্বতের সনাতন ধর্ম, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং দালাই লামার মর্যাদা সবই ধারাবাহিকভাবে অক্ষত থাকবে। এ চুক্তি প্রমাণ করে যে, চীন স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়েছিল যে, তিব্বতের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ঘটনার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি যেমনই হোক, বিশ্ববাসীকে সম্ভবত তিব্বতের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষায় অতিবাহিত করতে হবে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. তিব্বতের অবস্থান কোথায়?
উত্তর: চীন ও তারথের মধ্যস্থলে হিমালয়ের সুউচ্চস্তরে।

২. তিব্বতের আয়তন কত?
উত্তর: ১২,০০,০০ বর্গ কি.মি।

৩. তাপমাত্রা শীত ও গ্রীষ্মে কেমন ওর্বানামা করে?
উত্তর: ৪ ডিগ্রী থেকে ১ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত।

৪. সমুদ্র পৃষ্ট থেকে এর গড় উচ্চতা কত?
উত্তর: প্রায় ৫০০০ মিটার।

৫. তিব্বতের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কেমন?
উত্তর: বহু প্রাচীন।

৬. কত সালে চীন গণপ্রজাতন্ত্রের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯৫৪ সালে।
৭. এই চুক্তির নাম কি?
উত্তর: পঞ্চশীল চুক্তি।
৮. ১২২০০০০ বর্গ কি.মি বিশিষ্ট তিব্বতের জনসংখ্যা কত?
উত্তর: ২.৬ মিয়িয়ন।
৯. মুক্ত তিব্বতের দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছি কবে?
উত্তর:১৯৫৯ সালে।
১০. তিব্বতে চীনের জনগণের আন্দোলন ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় অনুপ্রেরণার উৎস কি?
উত্তর: দালাই লামা।
১১. ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের প্রাক্তন উপনিবেশ হংকং কোন নীতি ভিত্তিতে চীনের অন্তভূক্ত হয়?
উত্তর: এক দেশ দুই নীতি।
১২. আফ্রিকার ভাগ্যের চাকা সুরল করে থেকে?
উত্তর:প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে।
১৩. পূর্বতন তুর্কি প্রদেশ ত্রিপোলি বর্তমানে কি হিসাবে পরিচিত?
উত্তর: লিবিয়া।
১৪. কত সালে লিবিয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের ভোটে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা নির্বাচিত হন।
উত্তর: ৭ জুলাই ২০১২।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. তিব্বতের ভৌগলিক পরিচিতি অলোচনা করুন?
খ. তিব্বতের আয়তন ও জনসংখ্যা কত?
২. ক. তিব্বত কত সালে চীনের অধীনে আসে?
খ. দালাইলামা সম্পর্কে লিখুন?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

খ-বিভাগ (Part-B)

১. তিব্বতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন?
২. তিব্বতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আলোচনা করুন।

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যায় ১৫

একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য
One Axis World Order: USA Power

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৫.১ ভূমিকা
১৫.২ একমেরু বিশ্ব ব্যাবস্থার পেক্ষাপট
১৫.৩ বিগত দিনের পররাষ্ট্রনীতির যে ধারা আমরা দেখতে পাই
১৫.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতি
১৫.৫ মার্কিন সামরিক ও অর্থনীতির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক
১৫.৬ বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব
১৫.৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন
১৫.৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ
১৫.৯ যে সকল কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হতে পারে

১৫.১ ভূমিকা (Introduction)

১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটে এবং পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের অবসান গোটা বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের যে দ্বিমেরুকরণ হয়েছিল সমাজতন্ত্র জোটের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার নয়া সূচনা লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বদলে যাওয়া বিশ্ব রাজনীতিতে শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশের জোট, অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক জোট। শক্তিসাম্যের (Ballance of Power) নীতির ওপর গড়ে উঠল সামরিক জোট। একদিকে মার্কিন মদদপুষ্ট (North Atlantic Treaty Organisation) অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছত্রছায়ায় ওয়ারশ প্যাক্ট (Warshaw Pact) এই ভাঙনের পর ওয়ারশ প্যাক্টও ভেঙে গেছে। ন্যাটোই এখন গোটা বিশ্বে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকেও (আগে যারা ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত ছিল) ন্যাটো নিজেদের জোটে ধাপে ধাপে আনতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ কথা বলছে, রাশিয়া নখদন্তহীন হয়ে পড়েছে, সেহেতু বিশ্বের দেশগুলো বড় বেশি অসহায় বোধ করছে। এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার কথা মনে রেখেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় দেশ জোটবদ্ধ হচ্ছে। পুরনো শত্রুতা ভুলে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। যেমন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা নিয়ে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার তিনটি দেশ কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরঘিজিস্তান একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের

মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একমুখী প্রবাহ চীন ও রাশিয়াকে ভাবাদর্শগত বিরোধ মিটিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণকে অনেকে পশ্চিম দুনিয়ার সামরিক জোটের আগ্রাসন বলে মনে করছে। এশিয়া অঞ্চলে চীন ও রাশিয়া বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম না করে এ দু'দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা বলেছেন, একইভাবে বিশ্বের কোনো দেশ গোটা পৃথিবীকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসুক এটা তারা চান না।

১৫.২ একমেরু বিশ্ব ব্যাবস্থার পেক্ষাপট (Background of one axis world order)

১৯৯০ সালের আগস্ট ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের প্রেক্ষিতে উপসাগরীয় যুদ্ধ। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আফগানিস্তানে হামলা এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে গত ২০ মার্চ ২০০৩ সালে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ইরাকে হামলা এবং গত ১ জুন ২০০৪ সালে ইরাকে গাজী ইয়াওয়ার এর নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তা বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিকাশেরই বহিঃপ্রকাশ। মূলত ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিকাশ এর যে যাত্রা শুরু গত ২০ মার্চ ২০০৩ সালে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে নগ্ন হামলার মাধ্যমে তার সম্প্রসারণ শুরু হয়। ইরাকে হামলার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের অজুহাত ছিল ইরাক মারণাস্ত্র উৎপাদন করছে এবং আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এর প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন প্রার্থনা করলে ইরাক প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ সরাসরি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে একটি পক্ষ এবং ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানির নেতৃত্বে অপর একটি পক্ষ তৈরি হয়। মূলত স্নায়ুযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যে যে একক মেরুশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল ইরাক প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা অবসানের সূচনা করেছে ফ্রান্স, জার্মানি এবং এতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছে এক সময়কার অপর পরাশক্তি রাশিয়া এবং ভবিষ্যতের পরাশক্তি চীন। তৎকালীন ইরাক প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৪০টি দেশের সমর্থন লাভ করেছিল বাকি ১৫১ টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক নীতিকে সমর্থন করে নি। মূলত ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে একক আধিপত্য বিস্তার করেছিল ২০০৩ সালে ফ্রান্স, জার্মানি সে অবস্থা অবসানের যাত্রা শুরু করেছে বলে বিশ্ববাসী ধারণা করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র বিস্তার আলোচনা করার জন্য আমাদের জানা দরকার বিগত দিনের মার্কিন পররাষ্ট্র এবং সামরিক নীতির উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। "পররাষ্ট্রনীতি" বলতে আমরা বুঝি কোনো রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাপেক্ষে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ এবং তাদের বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে কৌশল গ্রহণ করেছে তা তার দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

১৫.৩ বিগত দিনের পররাষ্ট্রনীতির যে ধারা আমরা দেখতে পাই তা হলো :

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি।
খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি।
গ. স্নায়ু যুদ্ধোত্তর তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্ত পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতি।

১. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কের চেয়ে বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া। প্রেসিডেন্ট মনরো যে পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেন তাতে তিনি উল্লেখ করেন ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ রাখা ও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অংশ ইউরোপীয় তথা বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপনিবেশিক স্বার্থ অর্জনের স্থানে পরিণত হতে না দেওয়াই হবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি।

২. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

পূর্বের নিরপেক্ষনীতি পরিত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ট্রুমান নীতি নামে পরিচিত ছিল। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজমের ধ্বংসসাধন বিস্তার রোধ বা প্রভাব খর্ব করা এবং গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির ষোলকলা পূর্ণ হয় নব্বইয়ের দশকে কমিউনিস্টশাসিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসানে।



৩. **স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি :** ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বিশ্বের একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থের সম্প্রসারণ এবং মার্কিন স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করা। বিশ্ব রাজনীতিতে একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর পররাষ্ট্রনীতির আগ্রাসীভাব আরও ব্যাপক আকার লাভ করে। বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ওবামা একমেরু বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির যে ক্রমবিকাশ এর সরাসরি প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বিগত একদশকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিষয়ে কর্মকাণ্ড মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ ওয়ারশ জোট ১৯৯০ সালে বিলুপ্ত হয় ফলে বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। ১৯৯৪ সালে রাশিয়া NATO-এর সদস্যপদ গ্রহণ করলে বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তারের সকল বাধা দূর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার কূটকৌশল বিস্তৃত করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ঘটে ২০০৩ সালের ২০ এপ্রিলে।

১৫.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতি (Defence Policy of USA)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একক পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতি, সামরিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার নীরব কর্তৃত্ব চলছে। মার্কিন

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চরমপন্থি খ্রিস্টান ও ইহুদি লবির একটা প্রভাব সব সময়ই লক্ষ করা যায়। যারা খুবই শক্তিশালী এবং সংগঠিত। ২০০১ সালে জর্জ ওয়াকার বুশ ক্ষমতায় আসলে নতুন জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করে। বুশ প্রশাসক (National Missile Defence) কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চীন, রাশিয়া ও ইইউ এর বিরোধীতা করে। ১৯৯৯ সালে জানুয়ারি মাসে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেল কংগ্রেসে উত্থাপিত তার প্রস্তাবে বলেছিলেন বিশ্বের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি যেন কোন হুমকি হতে না পারে সেজন্যই NMD কর্মসূচি। তিনি আরো বলেছিলেন ইহা আমাদের মিত্র রাষ্ট্র রাশিয়াসহ অন্য রাষ্ট্রের জন্য কোনরূপ হুমকী নয় এবং ১৯৭২ সালের ABM চুক্তির বিপক্ষেও নয়। বিল ক্লিনটনের সে উদ্যোগ সফল না হলেও পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। তারা বলতে চাচ্ছে এটা চুক্তিটিকে কিছুটা মোডিফিকেশন করা। বুশ প্রশাসনের ঘোষণাঅনুযায়ী এ সিস্টেম যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গরাজ্যেই করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ পরিকল্পনা যে তার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ রাশিয়া, চীনকে ঘিরে তা অনুমান করতে রাশিয়া এবং চীনের দেরি হয়নি। তারা সাথে সাথে এ চুক্তির বিরোধিতা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র ইইউ এ চুক্তির বিরোধিতা করেছে ইইউ এর মতে মার্কিনিদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। ২০০৩ সালে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বেশীরভাগ রাষ্ট্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে আক্রমণ সমর্থন করে নি। আবার ২০০১ সালে জাতিসংঘের সমর্থন নিয়ে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালালেও তা বিশ্বের অনেক দেশ সমর্থন করেনি যদিও যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত সকল যুদ্ধই তার নিরাপত্তার অজুহাতে করেছিল যা বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

১৫.৫ মার্কিন সামরিক ও অর্থনীতির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক (Relation Between Foreign Policy, Military and Economic Policy)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে তাদের সামরিক ও অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিশ্বজুড়ে অস্ত্র বিক্রির যে জাল তারা পেতেছে, তার ফাঁদে পা দিয়েছে ছোট-বড় প্রায় সব দেশ। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলো তাদের বড় ক্রেতা। এ অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে তাদের দুটি কাজ হয়। প্রথমত অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার মুনাফা অর্জন করা, অন্যদিকে এ বিক্রির মাধ্যমে অন্য দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা। অস্ত্র বিক্রি ছাড়াও অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ও মাঝারি মেয়াদি ঋণদানের ক্ষেত্রেও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যাদের সরাসরি যোগ, তাদের প্রতি ঋণদানের ক্ষেত্র যতটা সংকুচিত, ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশগুলোর পক্ষে ততটা নয়। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে অস্ত্র বিক্রি ও অস্ত্র উৎপাদনে শীর্ষে ছিল। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৩৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করেছে ২০১১ সালে পর্যন্ত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বিক্রেতার তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে আছে। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেছেন, ঠাণ্ডা লাড়াইয়ে অবসানের পর তাদের এ বিক্রির হার ১৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসবে। দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বের অস্ত্রবাজার নিয়ন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ শতকরা ৭০ ভাগ। রাশিয়া ও জার্মানি পৃথক পৃথকভাবে দশ শতাংশে করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট অস্ত্র বিক্রির ১৫ শতাংশের খরিদ্দার ভারত ও পাকিস্তান। বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় যাদের বিশেষ দায়িত্ব, তারাই সবচেয়ে বেশি অস্ত্র রপ্তানী করে। দুনিয়াতে যেখানে যত যুদ্ধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ এবং সন্ত্রাস অশান্তি ঘটেছে, সেসব জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিক্রিত অস্ত্রের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। হিসেব নিলে দেখা যাবে ১৯৯২ সালে সারা পৃথিবীতে মোট ১৮ হাজার মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিক্রি করেছে ৮ হাজার মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ৪৪ শতাংশের মতো। অ্যামেনেস্টি ২০১৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই ৩৫% অস্ত্র রপ্তানি করে একক শীর্ষ রপ্তানিকরণ হিসাবে রয়ে গেছে। মার্কিন-রুশ ঠাণ্ডা লড়াই কমার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজুড়ে অস্ত্র ব্যবসা ভাওারে টান পড়েছে। কিন্তু মার্কিনরাই একচ্ছত্র সম্রাট। অস্ত্র কেনা বেচা কমলেও তাদের হাতেই অস্ত্র বিক্রির রশি। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সালে এ চার বছরের ঘটনার দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২টি বৃহৎ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সব সংঘর্ষের ঘটনার মধ্যে মাত্র তিনটির ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের ঘটনা। অন্য ৮৯টি গৃহযুদ্ধের বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা। দেখা গেছে এ ঘটনাগুলোর নেপথ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

মার্কিন বিক্রিত অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনাগুলোর একাধিক ক্ষেত্রে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি প্রভাব ফেলেছিল। ভিয়েতনাম থেকে ইরাক পর্যন্ত সারা বিশ্বে যে সকল যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়েছিল, তার ফলে সেইসব অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নিজের গায়ে তার কোন আঁচড় লাগে নি। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কূটনৈতিক চালই ছিল নিজের দেশকে সব সময় যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে সারা বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেন আওয়ার তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কবর্গের এক বিশাল জটিল জাল। আর তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের প্রভাব। এ মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাফল্যের অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় তাদের পররাষ্ট্রনীতির কার্যকারিতা ও সেই সঙ্গে অস্ত্র কেনাবেচায় বিরাট মুনাফা উন্নতির ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। প্রায় আড়াই'শ বছর ধরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে, যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে, কখনও অভিভাবক সেজে, কখনও বা বল প্রয়োগ করে অবাধে লুণ্ঠন করে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খেতে পাক আর না পাক অস্ত্র আমদানি করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র উৎপাদনে ও বিক্রিতে যে ভাটার টান লক্ষ করা যাচ্ছে, তা চলতে থাকলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কার্যচ্যুত হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেছেন।

১৫.৬ বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব

১. **লাতিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি :** দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ। শক্তিসাম্য নীতিতে বিশ্বাসী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি কৌশলে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। পর্যাপ্ত ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে অস্ত্র বিক্রি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষ হাতে তার পররাষ্ট্রনীতির ছক সাজিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন নীতি সহযোগিতামূলক হলেও কিউবার ক্ষেত্রে ছিল তার বিপরীত। ল্যাটিন আমেরিকাকে সমাজতন্ত্র মুক্ত করতে মার্কিন নীতি অনেক বেশি সক্রিয় সেখানে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতনের পর ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও মার্কিন প্রভাব সেখানে যথেষ্ট বিদ্যমান।

২. **দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব :** ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত যেহেতু সোভিয়েতঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। এ উপমহাদেশে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আফগান সমস্যাকে সামনে রেখে সোভিয়েত আগ্রাসী নীতি সামলাতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ব্যবহার করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ৮ দেশের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান বিবাদকে এ তল্লাটে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার করে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা লুটেছে। ভারতের বিপদে-আপদে যেমন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এদেশের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তেমনই পাকিস্তানকে সাহায্য করে এসেছে। এদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের ১৯৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহ প্রকাশ করেছে। একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের চাইতে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটানোর বেশি প্রয়োজন এবং ভারত, পাকিস্তান উভয় দেশে মার্কিন সামরিক স্বার্থ বজায় রাখতে আমেরিকা উদগ্রিব আর এ প্রেক্ষিতে আমেরিকা নিজে পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অস্ত্র বিক্রি করে যাচ্ছে অপরদিকে ইসরাইলের মাধ্যমে ভারতে অস্ত্র বিক্রি করে উভয় দেশের ওপর প্রভাব বজায় রাখছে।

৩. **মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি :** মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বিশাল স্বার্থ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো খনিজ তেলে সমৃদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ খনিজ তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। খনিজ তেলের লোভে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতা আস্ফালন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থের প্রধান দিক হচ্ছে :
   ক. ইসরাইলের নিরাপত্তা।
   খ. তেল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যপ্রাচ্য নীতির বাস্তব প্রতিফল ঘটানোর জন্য ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাকে একতরফাভাবে হামলা করে এবং ১ জুন' ২০০৪ সালে সেখানে একটি মার্কিন তাবেদার প্রশাসন নিয়োগ করে। ২০১২ সালে মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লিবিয়া, সিরিয়া, তিউনিসিয়া সহ সিরিয়াতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন সমর্থন।

৪. **দূরপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি :** দূরপ্রাচ্যের দুটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ জাপান ও চীন। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি দূরপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব বজায় রাখতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে সৈন্য মোতায়েন করে যা এখনও বজায় আছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অপর প্রতিদ্বন্দ্বি চীনকে তটস্থ রাখতে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সন্নিকটে জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে দীর্ঘদিন ধরে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। এছাড়া চীনের ওপর হুমকি বজায় রাখতে তাইপে সাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। এর পূর্বে কোরিয়ায় যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় সৈন্য মোতায়েন করে। দূরপ্রাচ্যে এশিয়া তার সামরিক প্রভাব বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব এশিয়ায় তার সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে উত্তর কোরিয়ায় পরমাণু কর্মসূচির বিরোধিতা করছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে দূরপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রভাব ক্ষুন্ন হোক এমন কোনো কর্মকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরদাস্ত করবে না।

৫. **দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মার্কিন আধিপত্যের কৌশল :** দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য তেমন সুখকর নয় আর এরই প্রেক্ষিতে ষাট এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় হলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব বাধাগ্রস্থ হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া একমাত্র মার্কিন মিত্র দেশ ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য ফিলিপাইনে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। এ এলাকার অন্যান্য দেশ, লাওস, কম্বোডিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও অভিভাবক কখনও আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়ে যথেচ্ছ ক্ষমতা জাহির করে এসেছে। এ এলাকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রভাব শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রয়াস আফগানিস্তানে হামিদ কারজাই সরকার গঠন। এছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ASEAN এর সদস্য হতে আগ্রহী। সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলেও মালয়েশিয়ার সাথে সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে অবনতি হচ্ছে। এছাড়া আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন বাহিনীর একতরফাভাবে আক্রমণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মেরুকরণ ঘটে। হামলার কারণে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার প্রভাব বজায় রাখতে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬. **ইউরোপের মার্কিন প্রভাব :** ইউরোপের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে মিত্র দেশ ব্রিটেন। ইউরোপে ব্রিটেন, স্পেনের মতো যেমন মিত্র দেশ আছে তেমনি ফ্রান্স, জার্মানির মতো প্রচণ্ড মার্কিনবিরোধী দেশও আছে। যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে NATO-কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে NATO-এর সম্প্রসারণ করে ইউরোপে মার্কিন স্বার্থ দীর্ঘস্থায়ী করছে। মূলত ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তেমন কোন হুমকি এখনও পরিলক্ষিত না হলেও ভবিষ্যতে জার্মান এবং ফ্রান্সকে কেন্দ্র করেই নতুন মার্কিন বিরোধী মেরুকরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপে তার সবচেয়ে বড় মিত্র ব্রিটেনকে সবক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অপরদিকে ফ্রান্স, জার্মানিকে আন্তর্জাতিক সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বর্তমানে মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক সুবিধা পাওয়ায় ইউরোপের একটি বিশাল এলাকায় মার্কিন প্রভাব বজায় থাকবে, মূলত ইউরোপে মার্কিন স্বার্থ বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করেছে।

১৫.৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (USA And Soviet Union)

আশঙ্কা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই সমস্ত বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক জোট। আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট দুনিয়ার প্রাধান্য খর্ব

করা। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিদেশনীতির পরিবর্তন করে যখন বুশের পর ক্লিনটন ক্ষমতায় আসেন। সামরিক দিক দিয়ে সোভিয়েত মদদপুষ্ট ওয়ারশ চুক্তিরও অবসান ঘটেছে। অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য যে, ইয়েলৎসিনের রাশিয়া বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মার্কিন মদদপুষ্ট ন্যাটোর সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছে। ওয়ারশ জোট বিলুপ্ত হওয়ায় রাশিয়ার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা অনেকটা হুমকি হওয়ার প্রেক্ষিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৯৯৪ সালে রাশিয়াকে NATO সদস্যপদ প্রদান করা হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কার তিক্ততার অবসান হলেও এর পরবর্তীকালে রুশ মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর জটিলতা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ৯ মে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ক্লিনটন ও ইয়েলৎসিনের মধ্যে বৈঠক তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ইরাক, চেচনিয়া ও ন্যাটো নিয়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। রাশিয়াকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি করে দিতেও ছাড়েন নি ক্লিনটন। ইরানের কাছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বিক্রি নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে দোষারোপ করে।

ন্যাটোকে কেন্দ্র করে রুশ-মার্কিন টানাপোড়েন ২৭ মে, ৯৭ 'ফাউন্ডিং এ্যাক্ট' চুক্তির মাধ্যমে শেষ হলেও সে সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করার জন্য ২৮ মে ২০০২ ইতালীর রাজধানী রোমে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে রাশিয়া ন্যাটোর সহযোগী দেশের মর্যাদা লাভ করে। ফলে ন্যাটোকে কেন্দ্র করে রুশ-মার্কিন টানাপোড়েন স্থায়ীভাবে শেষ হলেও চেচনিয়া ও ইরাকের ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় রাশিয়া সুকৌশলে ইরাককে সমর্থন করে। ২০ মার্চ, ২০০৩ এই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে আক্রমণ চালালে রাশিয়া প্রথমদিকে সরাসরি বিপক্ষে অবস্থান নেয়। চেচনিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই রাশিয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

১৫.৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ২০ মার্চ, ২০০৩ সালে মার্কিন জোট বাহিনীর ইরাকে নগ্ন হামলা।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই মার্কিন বাহিনী দাবি করে আসছিল যে ইরাক আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এবং এর সঙ্গে আরও একটি অভিযোগ করে তাহলো ইরাক মারণাস্ত্র তৈরি করছে। এর প্রেক্ষিতে ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের প্রস্তাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ৮ নভেম্বর ২০০২, ১৪৪১ নম্বর রেজ্যুলেশন অনুমোদন দেয়। এতে ইরাককে সব প্রকার ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সমর্পণের কথা বলা হয় অন্যথায় তার ভয়ংকর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ হ্যান্স ব্লিক্স এর নেতৃত্বে যে অস্ত্র পরিদর্শক দল ইরাকে অস্ত্র পরিদর্শনে প্রেরণ করে এই দলটি ৭ ডিসেম্বর ২০০২ সালে যে রিপোর্ট জাতিসংঘে পেশ করে তাতে জাতিসংঘ ইরাকে কোন মারণাস্ত্র না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। জাতিসংঘে ইরাকের পেশকৃত অস্ত্র বিবরণী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখ করে এতে উপকরণ গত ঘাটতি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যে ওই তালিকা অসম্পূর্ণ। ২৮ জানুয়ারি ২০০৩ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ইরাক জাতিসংঘের কাছে মারণাস্ত্র সমর্পণ না করলে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুমকি দেন তিনি। এর প্রেক্ষিতে ইঙ্গ-মার্কিন সরকার নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের ওপর আক্রমণের প্রস্তাব উত্থাপন করলে ফ্রান্স তাতে ভেটো প্রয়োগ করে ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাকে আক্রমণের প্রস্তাব জাতিসংঘে অনুমোদন পেল না। ১৭ মার্চ, ২০০৩ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাদ্দাম হোসেন ও তার ছেলেদের ইরাক ত্যাগ অথবা যুদ্ধ মোকাবেলা করার আল্টিমেটাম দেন। ২০ মার্চ ২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী জাতিসংঘ ও বিশ্ব জনমতের বিরোধিতা করে ইরাকে হামলা চালায়। মূলত ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর বিষয় নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ইঙ্গ-মার্কিন স্পেনের নেতৃত্বে এবং ফ্রান্স, জার্মানি সরাসরি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার

করেছিল। একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটিয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদে ইরাক প্রশ্নে ফ্রান্স-জার্মান তার সরাসরি বিরোধীতা করে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা অবসানে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সূচনা করেছে বলে রাজনীতিবিদদের অভিমত। ইরাক প্রশ্নে জাতিসংঘের তৎকালিন ১৯১টি সদস্য দেশের মধ্যে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দিয়েছে মাত্র ৪০টি রাষ্ট্র বাকি ১৫১টি রাষ্ট্র ইরাক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে সমর্থন দেয়নি। মূলত এখনো থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন বিরোধী নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

২০০৩ সালের ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনে বিরোধিতা করে ফ্রান্স ও জার্মানি প্রথম বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। যদিও সে যাত্রায় ফ্রান্স-জার্মানিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল রাশিয়া ও চীন। ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করাটা ফ্রান্সের জন্য ঐতিহাসিক বলেই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল জার্মানির ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করাটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায় বলে মনে করছেন। কারণ এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে সক্রিয় একটি পররাষ্ট্রনীতিই গ্রহণ করেনি বরং তার ঐতিহাসিক শত্রু ফ্রান্সের সাথে মার্কিন বিরোধিতায় একতাবদ্ধ হয়। এমনকি এ নীতির ফলে রাশিয়া ও চীনের নীতির সাথেও জার্মানি একাত্মতা প্রকাশ করে। কারণ রাশিয়া ও চীন ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল।

একমেরু বিশ্বব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে নতুন মেরুকরণে রাশিয়া যে পেছন দিক থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। এর সাথে যুক্ত হয়েছে উদীয়মান অর্থ ও সামরিক পরাশক্তি চীন। চীন ২০১০ সাল থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় ক্ষমতাধর অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে সামরিক শক্তির। যা যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ না হলেও খুব কাছাকাছি চলে আসছে। চীনের এই অতি দ্রুত সম্প্রসারমান অর্থ ও সামরিক শক্তি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমেরু ব্যবস্থায় নতুন করে হুমকি সৃষ্টি করেছে। চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি যদি এ গতিতে চলতে থাকে তাহলে আগামী কয়েক বছরে চীন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সমকক্ষ হয়ে যাবে। ফলে সামরিক সক্ষমতাও সমানভাবে এগিয়ে যাবে। চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি করতে সব রকমের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। ২০১৩ সালে ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হুমকি এবং সিরিয়ার আসাদ সরকার পতনে সামরিক অভিযানের তীব্র বিরোধিতা করছে চীন-রাশিয়া, চীন, রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়। সিরিয়া ও ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন না চালানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিয়েছে চীন ও রাশিয়া। রাশিয়া চীনের পরমাণু প্রকল্পগুলোতেও গোপনে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে বলে মার্কিনিদের অভিযোগ। অপরদিকে মার্কিনবিরোধী সিরিয়ার আসাদ সরকারকে প্রকাশ্যে অস্ত্র, অর্থ, গোলাবারুদ দিয়ে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে চীন, ইরান, রাশিয়া যাতে করে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের অতিসহজেই দমন করতে পারে প্রেসিডেন্ট আসাদ।

ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে চীন। ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিস্তৃতি প্রতিহত করার জন্য চীন, ভারত মহাসাগরে নৌযান মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন প্রভাবমুক্ত রাখতে পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ মিয়ানমারের সাথে নব উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে। ভারতের সাথে সীমান্তসহ সকল দ্বিপাক্ষিক সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, রাশিয়ার সাথে সীমান্তসহ অন্যান্য সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চীনা অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান প্রসার মার্কিন আগ্রাযাত্রার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী সকল দিক দিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী করার শক্তি এখনও জাপানের আয়ত্তে আসে নি। তাই আমরা বলতে পারি আগামী দশকেই হয়তো একমেরু বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দ্বিমেরু বিশ্বব্যবস্থার নতুন সংস্করণ ঘটবে যার নেতৃত্বে থাকবে চীন এবং পর্দার অন্তরালে থেকে রাশিয়া সকল রসদ সরবরাহ করবে। সমরাস্ত্রের সফল রূপকার রাশিয়া যদি ২০১৩ সালের উদীয়মান পরাশক্তি চীনের সাথে একতাবদ্ধ থাকে তাহলে একমেরু বিশ্বব্যবস্থার অবসান যে আগামী দশকেই ঘটতে যাচ্ছে তা এখনই অনুমান করা যায়। তবে বাস্তবতার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত হয়তোবা তারও আগে।

১৫.৯ যে সকল কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হতে পারে

প্রথমত : ১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর বিশ্ব রাজনীতি ও সামরিক নীতিতে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা নতুন মেরুকরণকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত : মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ইসরাইলের নিরাপত্তা প্রদান এবং ফিলিস্তিন স্বাধীনতা অনিশ্চিত করে তোলা নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করে ফিলিস্তিনি নির্যাতনের বৈধতা প্রদান যা বিশ্ববাসীকে মর্মাহত করেছে, এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার বিশ্বের অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করেছে।

তৃতীয়ত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি জার্মানি এখন অর্থনীতি এবং সামরিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। জার্মানির সাথে রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের অপর দুই স্থায়ী সদস্য ফ্রান্স এবং চীন। ফ্রান্স এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠ মিত্র খুঁজে না পাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি।

চতুর্থত : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণ মার্কিন বিরোধী মেরুকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ২০১৩ সালের ইইউ এর সদস্য সংখ্যা ২৮ দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ সকল সদস্যের মধ্যে প্রচণ্ড মার্কিন বিরোধী ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়ামে রয়েছে অপরদিকে সদ্য যোগদানকারী পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও চেকশ্লোভাকিয়া রয়েছে। পূর্ব ইউরোপের এই সকল দেশ দীর্ঘদিন মার্কিন নীতির বিরোধীতা করছে ফলে তারা এখন সুযোগ পেলে মার্কিন বিরোধি জোট গঠনে সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে পারে।

পঞ্চমত : জাতিসংঘের অস্তিত্ব রক্ষায় মার্কিনবিরোধী মেরুকরণ এখন সময়ের দাবি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে উপেক্ষা করে ইরাকে যে নগ্ন হামলা চালিয়েছে তা বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তিকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তিন স্থায়ী সদস্য রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ষষ্ঠত : রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুসংবাদ নয়। কারণ রাশিয়া গত ৫ বছর যাবৎ রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে এবং দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হয়ে উঠে তাহলে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিবে।

সপ্তমত : বর্তমানে চীনের অর্থনীতিতে যে গতির সঞ্চার এবং চীন সামরিক দিক দিয়েও অনেক দূর এগিয়ে গেছে বিশেষজ্ঞদের ধারণা চীনের প্রবৃদ্ধি যদি এই গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে তাহলে আগামী দশকে চীনই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও চীন বর্তমানে অর্থ ও সামরিক দিক দিয়ে দ্বিতীয় পরাশক্তি চীন এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বদলে যাওয়া বিশ্ব রাজনীতিতে কেমন যুদ্ধ শুরু হয়?**
উত্তর: ঠান্ডা লড়াইয়ের যুদ্ধ।

২. **কখন ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল এর প্রেক্ষিতে উপসাগরীয় যুদ্ধ?**
উত্তর: ১৯৯০ সালে।

৩. **কত সালে রাশিয়া (NATO) এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৯৯৪ সালে।

৪. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট নিজেকে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে?**
উত্তর: পৃথিবীর একক পরাশক্তি।

৫. কত সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে অস্ত্র ও বিক্রি ও উৎপাদনে শীর্ষে ছিল?
উত্তর: ১৯৯৪।
৬. ১৯৯২ সালে সারা পৃথিবীতে কত ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি হয়েছিল?
উত্তর: ১৮ হাজার মিলিয়ন ডলার।
৭. ১৯৮৯ থেকে ৯২ এই চার বছরের ঘটনার দিক তাকালে লক্ষ্য করা যায়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কতটি কৃষ্ণ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে?
উত্তর: ৮২টি।
৮. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের রাখতে যুক্তরাষ্ট্র কিসের সদস্য হতে আগ্রহী?
উত্তর: ASEAN।
৯. কি কারণে যুক্তরাষ্ট্র NATO-কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে?
উত্তর: ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে।
১০. জাতিসংঘের অস্তিত্ব রক্ষায় মার্কিন বিরোধী একমেরুকরণ এখন-
উত্তর: সময়ের দাবী।
১১. কোন নীতির উপর সামরিক জোট গকে উর্বল?
উত্তর: শক্তিসাম্যের নীতি (Balance of Power)।
১২. ন্যাটোই এখন গোটা বিশ্বে কিরূপ হয়ে উঠেছে।
উত্তর: সর্বেসর্বা।
১৩ বর্তমানে বিশ্বে কোনটি বহুল আলোচিত বিষয়?
উত্তর: সন্ত্রাসবাদ।
১৪. বর্তমানে কোনটি সন্ত্রাসবাদের ধারনার আওতাভুক্ত হয় না?
উত্তর: রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক.একমেরু বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন?
খ. বিশ্ব রাজনীতির নতুন মেরুকরন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ব্যাখ্যা করুন?
২. ক. বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরন হওয়ার কারণগুলো কী কী?
খ. দক্ষিন এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আলোচনা করুন?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

খ-বিভাগ (Part-B)

১. একমেরু বিশ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হতে পারে আলোচনা করুন?
২. স্নায়ুযুদ্ধ কী? স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন ?
৩. বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রকার মেরুকরণের কারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল আলোচনা করুন?
৪. যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদান কী ভূমিকা পালন করেন?
৫. চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করুন ?
৬. দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আগ্রহ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন।
৭. সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক আলোচনা করুন।
৯. একমেরু বিশ্বের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন? নতুন মেরু সৃষ্টিতে বিশ্বের কোন শক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আপনি মনে করেন?

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যায় ১৬

প্রয়োজনীয় পাঠ: মানচিত্র অনুশীলন

১৬.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়টির প্রথমেই বলা যাক, এই অধ্যায়টি তাত্ত্বিক বা পঠিত বিষয় নয় এটি ব্যাবহারিক বা অনুশীলনের বিষয়। যেমন ভূগোলে মানচিত্র, রসায়নে বিক্রিয়া এবং পদার্থ বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক চিত্র দেওয়া অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি আর্ন্তজাতিক বিষয়বলিতে মানচিত্র, চার্ট, পাইচার্ট আলোচনা বা উপস্থাপন করা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কারণ অন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে সমগ্র রাষ্ট্রের বা জাতির রাজনীতি থেকে শুরু করে ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি, বানিজ্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির মধ্যে যে ভাবের আদান প্রদান হয় তার বিজ্ঞানসম্মত ও পদ্ধতিগতভাবেই বিশ্লেষণ করাই হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। আর এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি অনুধাবন করেই এই অধ্যায়টিতে মানচিত্র অনুশীলণ বা ব্যাবহারিক হিসেবে দেওয়া হল।

মানচিত্রের গুরুত্ব বহুমুখী। ভূগোল বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় বিভিন্নভাবে মানচিত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত প্রাকৃতিক এবং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থার সংগে বিভিন্ন তথ্যকেও প্রচলিত বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে মানচিত্রের উপস্থাপন করা যায়। বিশেষ পরিমাপ ও চিহ্নের মাধ্যমে মানচিত্র অংকনের নিয়ম অনুসারে বিষয়গুলোকে মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। তাই উদ্দেশ্যমাফিক কোন বিষয় মানচিত্রে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত (Data)। বিষয়গুলোর গণনা ও বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতিরও প্রয়োগ রয়েছে। ফলে মানচিত্রে উপাত্তগুলো উপস্থাপন করা খুবই সহজ।

১৬.২ মানচিত্র তৈরীর ইতিহাস

মানচিত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমে এর আকার-আকৃতি (Size and Shape) এবং গঠন বিষয়ক কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। মানচিত্রের পটভূমির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল:

ধরা হয় প্রাক্-গ্রিককালে প্রাচীনতম মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় এলাকাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করেই এই প্রাচীন মানচিত্রগুলো অংকন করা হয়েছিল। এসব মানচিত্রে বনভূমির মধ্য দিয়ে পার্শ্ববর্তী বসতি এলাকা, শিকার, মিষ্টিপানি ও লবণ প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলোর দিকে যাতায়াতের পথ দেখানো হয়েছে। এ সময়ে মানচিত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

একটি, স্থানীয় এলাকার প্রতিরূপ উপস্থাপন মানচিত্র
অন্যটি, সমগ্র পৃথিবীর প্রতিরূপ উপস্থাপন মানচিত্র

মানচিত্র তৈরির প্রচীনতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যাবিলনে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন মানচিত্র আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ (মতান্তরে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) শতাব্দীতে মেসোপটেমিয়ায় এটি

তৈরি করা হয়েছিল। ছোট কাদার ফলকে খোদিত এ মানচিত্রটিতে ধনী কোন ব্যক্তির জমি-জমার অবস্থান ও সীমানা দেখানো হয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিটিক মিউজিয়ামে এই মানচিত্রটি সংরক্ষিত আছে। সম্রাট সারগনের সময়ে ভূ-সম্পত্তির পরিসীমা জানার জন্য ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকে এরূপ জরিপের নজির পাওয়া যায়।

১৮৬৯ সনে মার্কেটরের আঁকা মানচিত্রটি সর্বমোট ২৪ খণ্ড কাগজের উপর অংকন করা হয়েছিল। মানচিত্রের মোট আকৃতি ছিল ২০৮x১৩১ বর্গ সেন্টিমিটার। এ মানচিত্রটিই ছিল তদানীন্তন ইউরোপীয়দের জানা পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিলিপ বুয়াচে (Philip Buache) সমোন্নতি রেখা দ্বারা অংকিত বন্ধুরতার মানচিত্রের উপর এক ধরণের রেখা চিত্রাকার তুলে ধরেন। এ পদ্ধতিটি ভূগোলবিদসহ সবার কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

১৬.৩ মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজনীয় উপাদান

মানচিত্রে কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে। এসকল উপাদানগুলো মানচিত্র অংকনে অপরিহার্য। একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রে নিচের উপাদানগুলো থাকা আবশ্যক। উপাদানগুলো:

- মূল মানচিত্র (Base Map);
- স্কেল বা মাপনী (Scale);
- অভিক্ষেপ (Projection);
- উত্তর নির্দেশন (North direction)। উল্লেখ্য যে, মানচিত্রের উপরের দিক উত্তর (North) এবং নিচের দিক দক্ষিণ (South);
- মানচিত্রে যে সকল বিষয় উপস্থাপন করা হয় সেগুলোর সূচক (Index keynote);
- মানচিত্রে শিরোনাম বা হেডিং (Heading) অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন, রাজনৈতিক মানচিত্র, জলবায়ু মানচিত্র, বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, পৃথিবীর ধান উৎপাদন প্রভৃতি;
- অক্ষ-দ্রাঘিমা রেখা (Latitude-Longitude line) চিহ্নিতকরণ। বিশেষ কোন রেখা দেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করলে সেটির মান বসাতে হয় এবং
- মূল মানচিত্রের চতুর্দিকে অবস্থিত দেশগুলোর নাম (Neighbouring Countries)। অথবা বিশাল কোন জলাধার থাকলে তার নাম। যেমন, বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে বলে এর নাম লিখতে হয়;
- বর্ডার রেখা (Boundary line)। এ রেখাটি অংকিত মানচিত্রের চারদিকে জাগজে ০.৫ (শূন্য পাঁচ) ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি ভেতরে বর্ডার রেখা থাকতে হবে।

১৬.৪ মানচিত্র অংকন কৌশল

আমরা জেনেছি, মানচিত্র হল পুরো পৃথিবী বা পৃথিবীর কোন অংশের অথবা ঐ দেশের কোন অংশের প্রতিরূপ। সুতরাং এই মানচিত্র অংকনের জন্য কতিপয় সহায়ক কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রদত্ত মানচিত্রের কিছু দিকের প্রতি যত্নশীল হলে বা খেয়াল রাখলে মানচিত্র অংকন কিছুটা সহজ হতে পারে। এখানে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক তুলো ধরা হল। দিকগুলোর মধ্যে-

ক. মানচিত্র অংকনে মানসিক প্রস্তুতি ও আগ্রহ বিশেষভাবে দরকার। পারব না এমন ধারণা মানচিত্র অংকন শেখার ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে।

খ. মানচিত্র অংকনে প্রদত্ত মানচিত্রটি পূর্ব পরিচিত বা জানা কোন স্থানের হলে অংকন সহজ হয়। এক্ষেত্রে যে কোন শিক্ষার্থীর জন্য নিজ দেশের মানচিত্র দিয়ে শুরু হলে ভালো। মানচিত্রের

হাতেখড়ি কিংবা দ্রুত শিখতে চাইলে অতি পরিচিত নিজের গ্রাম বা মহল্লা, শিক্ষার্থীর হলে মানচিত্র অংকন সহজ হয়।

গ. মানচিত্র অংকনে প্রদত্ত মানচিত্রের আকার-আকৃতি কেমন সেটিও লক্ষ রাখতে হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বার বার যে মানচিত্রটি অংকন করতে চাই সে মানচিত্রের চতুর্দিকের সীমানা দেখে নেয়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের মানচিত্র অংকনে লক্ষণীয় দিকগুলোর কথা বলা যায়। যথা-বাংলাদেশের টেকনাফ ও তেতুলিয়া অংশ দেশের পুরো অংশের মধ্যে যে মোটামুটি সমতা রয়েছে তার চেয়ে সরু, লম্বা এবং বাইরে বিন্যস্ত। মানচিত্রের এ দু'টি অংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে (দক্ষিণ অংশের টেকনাফ ও উত্তর অংশ তেতুলিয়া) অসমান। এছাড়া দেশের দক্ষিণাংশের দ্বীপাঞ্চলগুলোর প্রতি যেমন, ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, সেন্টমার্টিনকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়। মানচিত্রের এসকল দিকগুলো বার বার স্মৃতিতে আনলে বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন সহায়ক হয়।

ঘ. মানচিত্র অংকনে উদ্দেশ্যিত মানচিত্রের বিভিন্ন অংশের নাম ও পরিচিত জানা থাকলে মানচিত্র অংকন সহজ ও দ্রুত হয়। যেমন বাংলাদেশের অংকনের বেলায় টেকনাফ, তেতুলিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, সিলেট, বঙ্গোপসাগর অংশসহ দ্বীপগুলোর নাম মনে রাখলে ভালো।

অনুরূপভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় আলাস্কা, ক্যালিফোর্নিয়া, মিয়ামী, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের নাম জানা থাকলে ভালো। পৃথিবী অংকনের বেলায় মহাদেশগুলোর নাম, মহাসাগরগুলোর পরিচয় জানা থাকলে মানচিত্র অংকন খুবই সহজ হয়।

ঙ. মানচিত্র অংকনের বেলায় উল্লেশিত দেশের চতুর্দিকের সীমানা, মানচিত্রের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নাম জানা থাকলে ভালো। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত, দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান ধারণার উদাহরণ নেয়া যায়।

১৬.৫ মানচিত্র অংকন পদ্ধতি

সাম্প্রতিক সময়ে মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যায় (Cartography) অনেক ধরণের কৌশল ও ধারণার সন্নিবেশ দেখা যায়। মানচিত্র অংকনের জন্য স্বতঃসিদ্ধ কোন পদ্ধতি (Method) নেই। প্রকৃতপক্ষে মানচিত্র অংকনের জন্য নিজেই নিজের উপযোগী উপায় বের করে বা পদ্ধতি অনুসরণ করে মানচিত্র অংকন করতে হবে। তবে কতগুলো সাধারণ গাইড লাইন (General Guid Wlines) বা উপায় মেনে মানচিত্র অংকন চর্চা বা অনুশীলন করা যেতে পারে। যথা

মানচিত্র অংকনের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়। পাঠ্য বিষয় কিংবা শ্রেণীর অন্যান্য বিষয় (Subject) পড়ার সময়ের সংগে ভূগোল তথা অর্থনৈতিক ভূগোল বা বাণিজ্যিক ভূগোল অধ্যয়নের জন্য এবং মানচিত্র অনুশীলনের সময় বেছে নিতে হবে। অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার রাতকে মানচিত্র বা অন্যান্য চিত্র আঁকার জন্য নির্ধারণ করে রাখে। এমন কি পরীক্ষার দিন ও পরীক্ষা পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত মানচিত্র বা চিত্র অংকন অনুশীলন করে। আমরা জানি, যেকোন চিত্র অংকনেই যথেস্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং পরীক্ষার পূর্বেই মানচিত্র বা চিত্রাংকন অনুশীলন শেষ করে রাখতে হবে। তবে পরীক্ষাপূর্ব সময়ে মানচিত্র অংকন চর্চার জন্য সময়গুলো নিম্নরূপ হলে ভালো যথা-

- মানচিত্র অংকনের সময় একবার মানচিত্র অংকন অনুশীলন হয়ে গেলে খানিকটা বিশ্রাম নে'য়া যেতে পারে। এসময় ভাবতে হবে মানচিত্র অংকনে অন্য কোন উপায় বের করা যায় কি না যা সহজেই পরীক্ষাকালীন সময়ে ব্যবহার করা যায়।
- তবে অবশ্যই বাড়ীর কাজ দেয়া মানচিত্রটি বই নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়ম মেনে করা উচিত।
- যে কোন ধরণের চিত্র (Figure), নকশা (Diagram), মানচিত্র (Map) অংকন শুরু করার আগে চিন্তা করতে হবে চিত্রে আকার-আকৃতি কেমন। অংকিত মানচিত্র কোন দেশের, মানচিত্রে কি কি প্রদর্শন করতে হবে প্রভৃতি। তবে মানচিত্র পরিস্কারভাবে এবং সহজভাবে (Clearly and

Simply) আঁকার চেষ্টা করতে হবে। মানচিত্র অংকন ছকে মানচিত্রের সীমারেখাগুলো কোন দিক দিয়ে গেছে বা যাবে তা চিন্তা করতে হবে।

- ঠিকমতো Labelling করতে হবে। Labelling করার সময় লক্ষ রাখতে হবে, যে অংশটি দেখাতে চাই সে অংশকে চিহ্নিত রেখাটি ঠিকমতো ছেদ বা চিহ্নিত করেছে কি না।

বিসিএস সহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ বিষয়ের ক্ষেত্রে চিত্র, মানচিত্র, নকশার ব্যবহার পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো অংকন বিষয়ের বিভিন্নতা বোঝাতে রংঙের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে লাল রঙ (Red Colour) দৃষ্টির পরিপন্থী। তাই লাল বাদে মানচিত্রে উদ্দেশ্য মাফিক অন্যান্য রঙ ব্যবহার করা উচিত। সেক্ষেত্রে রঙিন কলম, পেন্সিল ব্যবহার করা যায়। তবে একটু ভালো মানের কলম ও কালি ব্যবহার বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অংকিত মানচিত্রের উপাদানের উপস্থাপন বিষয়ে কিছু কথা মনে রাখলে ভালো। যেমন, মানচিত্র বা চিত্র অংকনের সময় যেগুলো প্রদর্শন করতে হবে সেগুলো মুখস্ত না করে বিষয়গুলো মনে মনে Concentrate করা উচিত। মানচিত্র অংকনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ও মুক্তহস্তে বা হ্যাণ্ডমেড (Handmade) অংকন এদুটি পদ্ধতিই সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে, জ্যামিতিক কাঠামোর সাহায্যে, বৃত্তের সাহায্যে, ছক বা গ্রুডের সাহায্যে মানচিত্র অংকনের পদ্ধতিগুলো বেশ পরিচিত নিচে দু-একটি পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হল।

- **ট্রেসিং পদ্ধতি:** ট্রেসিং করেও মানচিত্র অংকন করা যায়। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে বা পরীক্ষার হলে এ পদ্ধতিতে মানচিত্র অংকন সম্ভব নয়। কারণ পরীক্ষার হলে মানচিত্র আঁকতে হয় স্বহস্তে এবং মুক্ত হস্তে।
- **ছক পদ্ধতি:** ছক পদ্ধতিতে মানচিত্র অংকনের সময় মানচিত্রের আকার-আকৃতির দিকটি যত্ন সহকারে খেয়াল রাখতে হয়। শ্রেণীকক্ষে বা পরীক্ষার হলে কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে মানচিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রিড করে বা বর্গাকার ছদের পদ্ধতিটির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও সহজ বলে সবার কাছে পরিচিত।

১৬.৬ বর্গাকার ছক পদ্ধতিতে মানচিত্র অংকন কৌশল

বর্গাকার ছক পদ্ধতির সাহায্যে মানচিত্র অংকনের জন্য নিচে দু-একটি মানচিত্রের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করা হল। মানচিত্র অংকনের বেলায়, পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মানচিত্রের সীমারেখা, পার্শ্ববর্তী দেশ, দেশ সংলগ্ন সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় জানা থাকলে মানচিত্র অংকনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। বাংলাদেশের মানচিত্রের বেলায় সীমারেখার কোন অংশ অঙ্কিত বর্গাকৃত ছকের কোন ঘরে পড়েছে অর্থাৎ কীভাবে সীমারেখা এঁকে বেঁকে গেছে সেটি ভালভাবে লক্ষ্য রেখে ঠিক একইভাবে অংকন শিখতে হবে। এক্ষেত্রে দু'টি উপায়ে চেষ্টা করা যায়। যথা-একটি ট্রেসিং উপায়; আদর্শ মানচিত্র অনুসরণ করে

প্রথম উপায় :

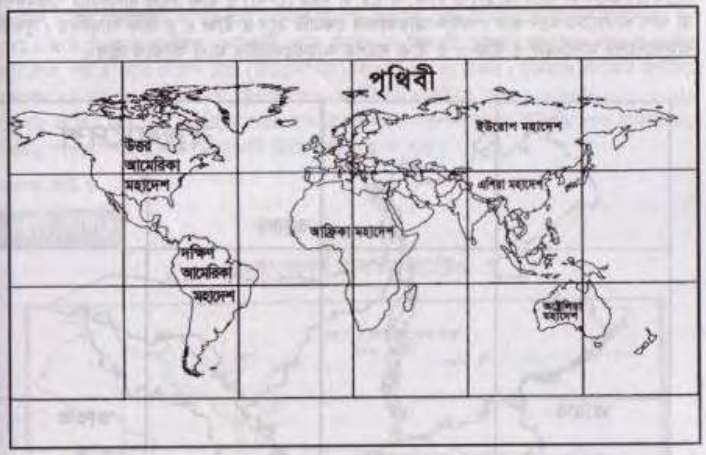
একটি ৪ ইঞ্চি x ৫ ইঞ্চি মাপের মানচিত্র ট্রেসিং করে ঐ মানচিত্রের ওপর ১ ইঞ্চি মাপের বর্গাকার ছক করে মানচিত্র অংকন করা হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে :

একটি ৪ ইঞ্চি x ৫ ইঞ্চি মাপের আদর্শ মানচিত্র কাছে রেখে দেখে দেখে মানচিত্রের কোন অংশ কোন ঘরে পড়েছে লক্ষ রেখে কয়েকবার অনুশীলন করলেও মানচিত্র অংকন শেখা যায়।

১৬.৭ পৃথিবীর মানচিত্র অংকন কৌশল

পৃথিবীর মানচিত্র অংকনেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। পৃথিবীর মানচিত্র অংকনের ক্ষেত্রে প্রধানত ৬ ইঞ্চি x ৩ ইঞ্চি মাপের আয়তক্ষেত্রেই পরীক্ষার খাতায় অংকনে মানচিত্রের জন্য সহায়ক হয়। উল্লেখ্য যে, বিসিএস, বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে বাংলাদেশ ও পৃথিবীর মানচিত্র অংকনই বেশি করে প্রয়োজন হয়।



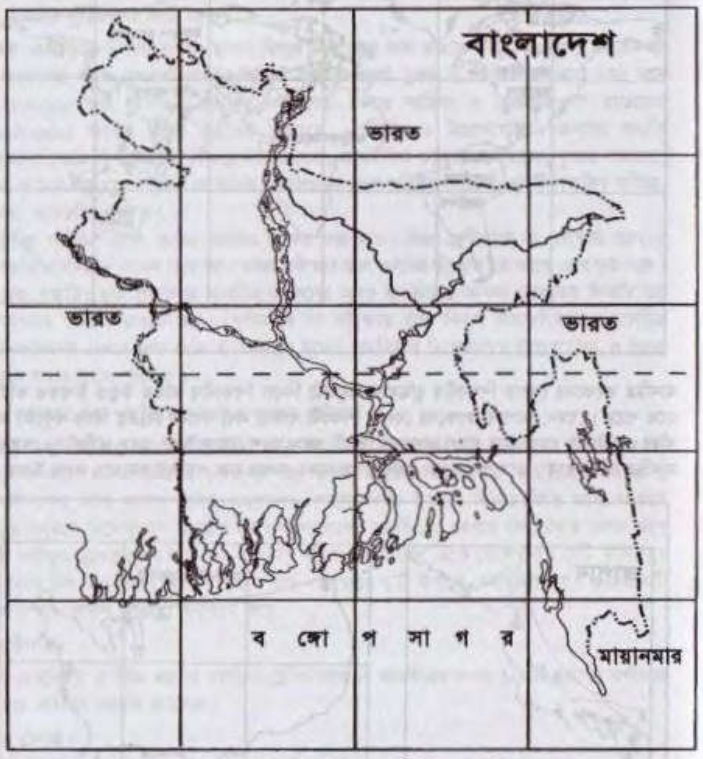
মানচিত্র অংকনের বেলায় শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী কিংবা শিক্ষার্থীর মস্তিস্ক উদ্ভূত উপায়ও কার্যকর হতে পারে। যেমন, জাপান অংকনের বেলায় শিক্ষার্থী খাতার লম্বা বরাবর নিজের দিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকা একটি দাগ কেটে আর পাশে জাপানের তিনটি প্রধান অংশ (হোক্কাইডো, হনসু ও কিউসু) দেখালেই মানচিত্র আঁকা হবে। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অংকনের বেলায় ছক পদ্ধতিই সবচেয়ে সহজ উপায়।



চিত্র: জাপান চিত্র: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

১৬.৮ বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন কৌশল

আমরা জানি, বাংলাদেশের মোটামুটিভাবে ২০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। সাধারণ মাপে বাংলাদেশের মানচিত্র ডানে বা বামে (প্রস্থ) কম, উপর নিচে (দৈর্ঘ্য) বেশি। এক্ষেত্রে ইঞ্চিতে পরিমাপ নিলে (মোটামুটি পিএসসি/ বিশ্ববিদ্যালয়/ বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত পরীক্ষার খাতার মাপ অনুযায়ী) ডানে বা বামে (প্রস্থ) ৪ ইঞ্চি, উপরে বা নিচে (দৈর্ঘ্য) ৫ ইঞ্চি নিলে মানচিত্রটি পরিমাপিত বা খাপ খাওয়ানো মনে হবে। অর্থাৎ আয়তাকার ক্ষেত্রটি হবে ৪ ইঞ্চি x ৫ ইঞ্চি আকৃতির। সুতরাং বাংলাদেশের মানচিত্রটি ৪ ইঞ্চি x ৫ ইঞ্চি মাপের আয়তক্ষেত্রটির মধ্যে আঁকতে হবে।



বাংলাদেশের মানচিত্র ও ছক

এই উপায়ে মানচিত্রের পরিমাপে ছক করার পর **প্রথমে** দু'বার মানচিত্রটির উপর দিয়ে হাত ঘোরালে, তৃতীয়বার পুনরায় একটি পূর্বানুরূপ ছক এঁকে মানচিত্রটি দেখে দেখে ছকের উপর আঁকলে অংকন সহজ হবে।

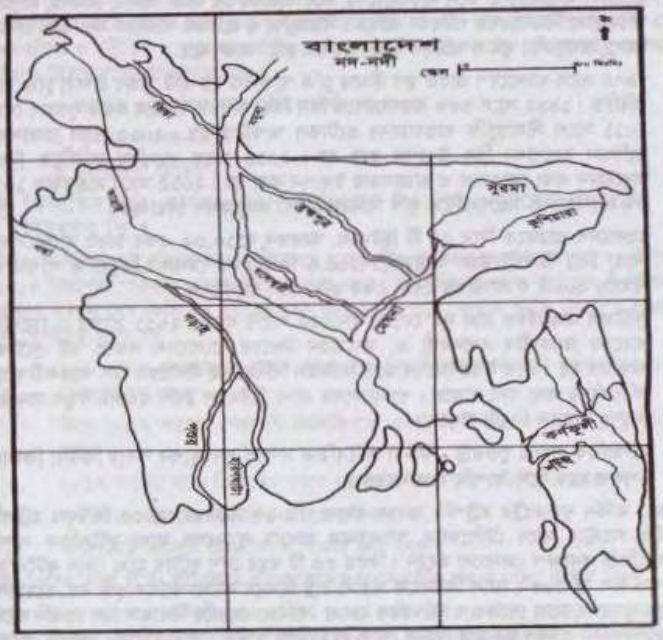
চতুর্থবার আরও একটি ছক করে না দেখে স্মৃতি থেকে ছকের উপর আঁকার চেষ্টা করলে মানচিত্র অংকন শেখার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবেনা।

সর্বশেষ পঞ্চমবারের বেলা ছক বাদে শুধু বর্ডার একে মানচিত্র পুনরায় আঁকার চেষ্টা করলে অংকনে পূর্ণ সামর্থতা আসবে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী উপরিউক্ত কৌশলে যেকোন স্থান বা দেশের মানচিত্র বারবার অনুশীলন করে মানচিত্র অংকন আয়ত্ব করতে পারবে এতে সন্দেহ নেই। এতো গেল মানচিত্র অংকন। কিন্তু মানচিত্রের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো কোন মানচিত্রকে আদর্শ মানচিত্রের রূপ দেয়। তবে মুক্তহস্তে অংকিত মানচিত্রটি কোন দেশের সে বিষয়টি দেখাতে হবে তার নাম বা হেডিং, সূচিহ্নিত, বর্ডার, দিক নির্দেশ চিহ্ন (উত্তর/দক্ষিণ) বিশেষভাবে প্রয়োজন। মুক্তহস্তে অংকিত মানচিত্রে স্কেলের দরকার হয় না। বিদেশী বইগুলোতেও স্কেলবিহীন মানচিত্রে 'Not according to scale' লেখার প্রচলন রয়েছে। মানচিত্রে রঙের ব্যবহারেও খুবই যত্নশীল হওয়া উচিত। লক্ষ রাখতে হবে বিভিন্ন রঙের সমাহারে যেন মানচিত্রটি হিজিবিজি হয়ে না যায়।

ওয়ার্ক শীট-১

ওয়ার্ক শীট-১

বাংলাদেশের মানচিত্র প্র্যাক্টিজ



অধ্যায় ১৭

সাজেশন্স : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোর

● **ভারত বাংলাদেশ স্থল সীমানা চুক্তি**

১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি ও ২০১১ সালে ওই চুক্তির প্রটোকলেই স্পষ্টভাবে বলা আছে, দুই দেশের কোন সীমানা কিভাবে নির্ধারিত হবে। ওই চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের চার রাজ্য- আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানারেখায় পরিবর্তন আসবে। সীমান্তচুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়ন করা হলে ছিটমহল সমস্যা, অপদখলীয় ভূমি ও অচিহ্নিত সীমানা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে ।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এটি মুজিব ইন্দিরা চুক্তি নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালে ভরত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডর ব্যবহার করার সুজোগ দেয়। ২০১১ সালে সীমান্তচুক্তি বাস্তবায়নের প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৩ সালে রাজ্যসভায় সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন করা হয়। ২০১৪ সালে সংসদিয় কমিটিতে বিলটি অনুমোদন এবং লোকসভা ও রাজ্যসভায় উত্থাপন করা হয়। ২০১৫ সালে মন্ত্রিসভায় ১০১৯ তম সাংবিধানিক সংশোধনিতে ভূমি বিনিময় চুক্তিটি অনুমোদন দেয়া হয়।

বাংলাদেশ ভারতকে দিবে ৫১ টি ছিটমহল, আয়তন,৭১১০.০২ একর ভারত বাংলাদেশকে দিবে, ১০১ টি ছিট মহল আয়তন,১৭১৬০.৬ তিন একর মেঘালয়,ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গ সীমান্তে ২০০০ ও আসামের ২৬৮ একর জমি পাবে বাংলাদেশ।

প্রটোকল বাস্তবায়িত হলে দুই দেশের মানচিত্রই পাল্টে যাবে। ২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরে ওই প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এতে উভয় দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়সহ সীমান্তের বেশ কয়েকটি অংশে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাপ্য ছিটমহল বেশি হওয়ায় নতুন মানচিত্রে দেশের আয়তন কিছুটা বাড়বে।

● **সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র -কিউবা কূটনৈতিক সম্পর্ক পুণ:স্থাপন করায় কিউবা কিভাবে উপকৃত হবে বলে আপনি মনে করেন ?**

উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ কিউবার রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ট্রোর সাথে টেলিফোনে আলোচনার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুণঃপ্রতিষ্ঠা পদক্ষেপ জোরালো করেন। বিগত ৫৩ টি বছর দেশ দুটোর মধ্যে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না।১৯৮২ সালে কিউবাকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল। তবুও দুদেশের মধ্যে ঘোষিত ও অঘোষিত ব্যবসা -বানিজ্য যেভাবে বিদ্যমান ছিল তেমনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিউবা থেকে হরহামেশা আসত। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও

http://thejobstudy.com Go to Contents

ভ্রমলকারীরা কিউবায় যেত। ২০১৩ সালে মার্কীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিউবায় ৩৪৮,৭৪৭,২৯৩ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র - কিউবার সম্পর্ক পুণঃস্থাপিত হওয়ায় কিউবা নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে উপকৃত হবে।

১. যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবার ফলে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ব"দ্ধি পাবে।
২. কিউবার পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে।
৩. কিউবায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটবে।
৪. সরাসরি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হবার ফলে বাণিজ্য খরচ হ্রাস পাবে।
৫. কিউবায় মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ পাবে ও
৬. কিউবায় মুক্ত বাণিজ্যের পথ সুগম হবে।

● **শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মাহিন্দা রাজাপাকসের পরাজয়ের কারন গুলো কি কি ?**

উত্তর: ৮ জানুয়ারী ২০১৫ অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা পূর্ণ নির্বাচনে সাবেক সহযোগী মাইথ্রিপালা সিরিসেনার কাছে পরাজিত হন রাজাপাকসে। নির্বাচনে মাইথ্রিপালা সিরিসেনা মোট প্রদত্ত ভোটের ৫১.২৮% ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।সিরিসেনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী 'শ্রীলঙ্কার রাজা ' খ্যাত সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্র রাজাপাকসে পান ৪৭.৫৮% ভোট।

রাজাপাকসে এই অভাবনীয় পরাজয়ের বিষয়ে সমালোচকদের ভাষ্য হল-দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা রাজাপাকসে অনেক বেশি কর্তৃত্ব পরায়ন হয়ে উঠেছিলেন। তার সময়ে বিস্তার দেখা গেছে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ।দ্রব্যমূল্য ব"দ্ধিও ক্ষেপিয়ে তুলেছিল জনগণকে। রাজাপাকসে পরাজয়ের পিছনে উলেখযোগ্য কারণগুলো হল :

১. তামিল ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন না পাওয়া
২. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ও
৩. সিরিসেনা ফ্যাক্টর।

● **ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের জন্য জাতিসংঘে উত্থাপিত জর্ডানের প্রস্তাবটির মূল বিষয়বস্থ কি ?**

উত্তর: ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের জন্য জাতিসংঘে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করে জর্ডান।ফিলিস্তিনের পক্ষে জর্ডানের উত্থাপিত এ প্রস্তাবে সমর্থন দেয় ফিলিস্তিন সহ আরবের অন্য ২২ টি রাষ্ট্র। জর্ডান কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্থ গুলো হল :

১. ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সময় হতে ইসরাইলের দখল করা পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম ছেড়ে
   দিয়ে ২০১৭ সালের শেষাবধি ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিনত করা।
২. ২০১৭ সালের মধ্যে ফিলিস্তিন থেকে দখলদার ইসরাইলী বাহিনীর প্রত্যাহার।
৩. পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী করা।
৪. স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলকে স্বীকার করে নেয়া।

● **১৮তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব গুলো উল্লেখ করুন।**

উত্তর: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র বিমোচন মানব সম্পদ উন্নয়ন , প্রযুক্তি ও আইসিটি , জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা , জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন ,

সমুদ্র-ভিত্তিক "ব্লু ইকোনমি" এবং আঞ্চলিক সংযোগ এই সাতটি বিষয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি দক্ষিন এশিয়ার শান্তি , স্থিতিশীলতার ও সমৃদ্ধির লক্ষে বাণিজ্য , বিনিয়োগ , জ্বালানী , নিরাপত্তা ,অবকাঠামো ,সংযোগ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গভীরতর আঞ্চলিক সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষে বিভিন্ন যৌথ প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

● আফগানিস্তানে গঠিত ঐক্যমতের সরকারের রূপরেখা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

উত্তরঃ ১৪ জুন ২০১৪ আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী ছিলেন আশরাফ ঘানি ও আবদুল্লা। প্রাথমিক ফলাফলে আশরাফ ঘানিকে বিজয়ী ঘোষনা করার পর ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে আবদুল্লাহর সমর্থকরা রাস্তায় নেমে আসে। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর উভয় প্রার্থী একটি জাতীয় মতৈক্যের সাথে সরকার গঠনে সম্মত হয়। সে মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ঐ দুই প্রার্থী। এর মধ্য দিয়ে কয়েক মাস ধরে চলা রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আশরাফ ঘানি প্রেসিডেন্ট এবং আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদায় ঈউঙ পদে দায়িত্ব গ্রহন করেন।

জাতীয় .মতৈক্যের সরকারের রূপরেখা

১. নতুন আফগান সরকারের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে যার প্রধান হবেন প্রেসিডেন্ট।

২. মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য মর্যাদার একজন CEO থাকবেন, যার দুজন সহকারী থাকবেন।

৩. CEO প্রেসিডেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৪. প্রেসিডেন্ট কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো নেবেন।

৫. CEO -এর নেতৃত্বে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ করবে মন্ত্রিসভা।

● জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদান করায় ফিলিস্তিনিদের কি কি প্রাপ্তি হয়েছে?

উত্তরঃ কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়ার কাছে দক্ষিণাঞ্চলীয় কুড়িল এবং জাপানের কাছে উত্তরাঞ্চলীয় কুরিল হিসেবে পরিচিত। ৫৬টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত কুড়িল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ৪টি মূলদ্বীপ। মূল চারটি দ্বীপ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ৬০ বছর ধরে বিরোধ চলছে। চারটি দ্বীপ হলো কুনাশির, এতোরোফু, শিকোতান এবং হাবোমাই। আঠার থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে জাপান এই দ্বীপগুলোতে বসতি স্থাপন করে। ১৮৫৫ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে জাপানকে চারটি দ্বীপের মালিকানা এবং রাশিয়াকে উত্তরাঞ্চলের সবকিছুর অধিকার দেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সেখানে জাপানের সতের হাজার বাসিন্দা বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া জাপানের কাছ থেকে দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে জাপানিদের বিতাড়িত করে। এরপর দেশ দু'টি কূটনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন সময় চুক্তি সম্পাদন করলেও দ্বীপ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, রিনিআম নামের ধাতব পদার্থ রয়েছে বলে মনে কর হয়। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় তখন ইউনিয়নের নেতা মিখাইল গর্বাচেভ জাপানকে অর্থের বিনিময়ে দুইটি দ্বীপ কিনে নেয়ার আহ্বান জানালেও তারা তা অগ্রাহ্য করে। জাপানের দাবি, ঐতিহ্যগতভাবে দ্বীপপুঞ্জের মালিক তারা। যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের দাবিকে সমর্থন করে। রাশিয়ার দাবি, ওখোতস্ক সমুদ্রে প্রবেশের পথ এই দ্বীপগুলো। তাই এর নিয়ন্ত্রন তাদের হাতে রাখতে হয়।

● কি কি কারনের মিয়ানমারের অর্থনৈতিক উত্থানের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনি

মনে করেন?

উত্তরঃ ২০১০ সনে নির্বাচনের মাধ্যমে মিয়ানমারে দীর্ঘ ৫০ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদপে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ মিয়ানেরর ওপর দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিল। গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর ২০১২ সন থেকে পর্যায়ক্রমে মিয়ানমারের ওপর থেকে বিভিন্ন দেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ২০১২ সন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক দেশটির অবকাঠামো উন্নয়ন মিয়ানমারে পুণরায় কার্যক্রম শুরু করে। দেশটির সরকার প্রায় দুই দশক পর বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্যে নিয়মনীতি শিথিল করে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে। সবকিছু মিলিয়ে দেশটির অর্থনৈতিক গতি নতুন মাত্রা পাচ্ছে।

মিয়ানমারে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল টিন, রৌপ্য। এছাড়াও দেশটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদও আছে। কাঠ উৎপাদনের বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় দেশ মিয়ানমার। বিশ্বের অন্যতম প্রধান মূল্যবান পাথর যেমন- রুবি, নীলা, মুক্তা ও পান্না উৎপাদনকারী দেশ মিয়ানমার। পর্যটন শিল্প প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে দেশটিতে। দীর্ঘদিনের অপশাসনে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া আসিয়ানের সদস্য দেশ মিয়ানমারের দ্র"ত অর্থনৈতিক উত্থান ঘটবে এটা প্রায় নিশ্চিত।

● ২০১৪ সনের জুলাই মাসে ইসরাইল কর্তৃক গাজা আক্রমণের প্রধান কারণগুলো লিখুন।

উত্তরঃ ইসরাইলী সেনাবাহিনী গাজার স্থল সীমান্ত, আকাশ সীমা বেং সমুদ্রে বিচরণ বিগত ৪১ বছর ধরে নিয়ন্ত্রন করে আসছে। ৬ জুলাই ২০১৪ ইসরাইলের রকেট আক্রমণে ৭ জন হামাস কর্মী নিহত হয়। প্রতিবাদে হামাস ইসরাইলের উপর উপর্যুপরি রকেট হামলা চালায়। ৭ জুলাই ২০১৪ হামাস ইসরাইলের ওপর শতাধিক রকেট নিক্ষেপ করে এবং ইসরাইল গাজার কয়েকটি স্থানে বিমান থেকে বোমার নিপে করে। ৮ জুলাই ২০১৪ ইসরাইলের প্রতিরা প্রতিরা বাহিনী "অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ" নামে সামরিক অভিযান শুরু করে। ইসরাইলের বর্বোরচিত হামলায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করে শিশু ও নারী। তাদের আক্রমণ থেকে স্থল, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টিভি ইষ্টেশন, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আশ্রয় কেন্দ্র, আবাসিক ভবন কোনো কিছু বাদ যায় নি। ২০১৪ সনের জুলাই মাসে গাজা আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলঃ

১. হামাস- ফাত্তাহ বিভেদ সৃষ্টি

২. ফিলিস্তিনকে খন্ডিত করা ও

৩. হামাসের টানেলগুলো ধ্বংশ করা।

● সাম্প্রতিক সময়ে জাপান বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হবার কারণগুলো কি কি ?

উত্তরঃ চায়নার ' সিল্ক রুট এবং বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া রিনিউড রিলেশন ' আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় জাপানকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে । এর কারণ গুলো হল :

১. বাংলাদেশের উপর চীনের প্রভাব হ্রাস করা ;

২. বিনিয়োগে চীনের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে বিবেচনা করা ;

৩. আসিয়ানভুক্ত দেশে শ্রমমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের স্বল্প মূল্যের শ্রম শক্তিকে কাজে লাগানো ;

৪. বাংলাদেশের বিনিয়োগে আগ্রহ ও

৫. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের সমর্থন প্রাপ্তি।

● বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম স্থান ধরে রাখার জন্য চীনের করণীয় গুলো কি কি ?

উত্তরঃ 'পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটি' তত্ত্ব অনুসারে আইএমএফ চীনকে ২০১৪ সনে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ১৮৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৪২ বছর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছিল।

এখন বিতর্ক হতে পারে চীনের অর্থনীতির যে অগ্রযাত্রা তা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল হবে কি না ?

আশির দশকে জাপান পৃথিবীর এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিগনিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক অবস্থান সুসংহত করতে পেরেছিল। চীনকে এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে ধরে রাখতে হলে অবশ্যই বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি পেতে হবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম চীনের সামনে প্রধান করনীয় হল :

১. মুদ্রার মানের সঠিক সমন্বয় করা
২. গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা
৩. জনসাধারণকে অধিকমাত্রায় সঞ্চয় প্রবনতা থেকে বের করে এনে ভোগ প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ করা
৪. কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রাপ্তির জন্য জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন করা
৫. পণ্যের গুনগতমান উন্নত করা
৬. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চীনা ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীক সততা নিশ্চিত করা
৭ .পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করা
৮. জমির মূল্য নিয়ন্ত্রন করা ও
৯. কারিগরী ও প্রকৌশলগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা।

● ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তিকরণের কারণগুলো কিকি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ ক্রিমিয়া রাশিয়ার জন্য ভূ- রাজনৈতিকভাবে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ক্রিমিয়াতে সাত শতাংশের বেশি রুশ জাতীয়তাবাদী পরিচয়ধারী জনগণ বাস করে। দেখা যাচ্ছে, জাতিগত এবং সামরিক কৌশলগত দিক থেকে ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অংশ হলেও রাশিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন কারণ। ক্রিমিয়ার এর নিম্নলিখিত ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করে :

১. কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত বন্দরগুলো বলকান এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
২. দিনিয়েপার নদী পথ ইউরোপ মহাদেশকে কৃষ্ণ সাগর এবং বাল্টিক সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। যা এই অঞ্চলের সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহন এবং সামরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
৩. কৃষ্ণ সাগর ককেশাস অঞ্চল এবং কাসপিয়ান সাগরের সাথে মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপকে সংযুক্ত করেছে। যা এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।
৪. ক্রিমিয়ার সমুদ্র বন্দরগুলো সারা বছর ব্যবহারযোগ্য। ক্রিমিয়াতে অন্তত ১২টি সমুদ্র বন্দর চালু রয়েছে।
৫. ক্রিমিয়ার সমুদ্র সীমায় ৪৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাসের মজুদ রয়েছে।

৬. এছাড়াও প্রতি বছর ১.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার উত্তোলনযোগ্য হাইড্রো কার্বন রয়েছে কৃষ্ণ সাগরে।

ক্রিমিয়াকে অন্তর্ভূক্তকরণের মাধ্যমে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সমুদ্র বাণিজ্য এবং জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের দখলে নেওয়া নিশ্চিত করল। কৌশলগত এবং সামরিক দিক থেকে ক্রিমিয়ার গুরুত্ব বিবোচনা করে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজেদের অংশ করে নিল বলে মনে করা হয়।

● ২০১৪ সনের থাইল্যান্ডে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ কি?

উত্তরঃ ২০১৩ সনের নভেম্বরে পার্লামেন্টে নিম্নশর্ত মতা সংক্রান্ত একটি আইন পাস করাকে কেন্দ্র করে থাইল্যান্ডে বিভেদ দেখা যায়। বিরোধীদের অভিযোগ এই আইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ইংলাক তার ভাই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত বিদেশে অবস্থান করা থাকসিন সিনাওয়াত্রাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চান। এরপর থেকে সাবেক উপ- প্রধানমন্ত্রী সুদেপ থাগসুবানের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় বিরোধীরা। ৭ মে ২০১৪ এক রায়ে দেশটির সাংবিধানিক আদালত মতা অপব্যবহারের অভিযোগে ইংলাককে মতাচ্যুত করে। তার স্থলে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয় নিউওয়াত্তমরং বুনংপাইসানকে। কিন্তু এনপর বিরোধীরা মানতে নারাজ। এমন পরিস্থিতিতে ২০ মে ২০১৪ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সামরিক আইন জারি করে ২২ মে ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়। থাইল্যান্ডে এ পর্যন্ত ১২ বার পুরোপুরি সেনা অভ্যুত্থান এবং সাত বার অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়।

● আরব বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কোন কোন বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ আরববিশ্বের শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরযোগ্য বন্ধু। এতে বিঘ্নিত হয়েছে এসব দেশের স্বার্থ ও গণস্বার্থ। সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক মতাকে ব্যবহার করেই শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক মতা কব্জা করেছে। আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করলেও, এই গণতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে নানা মত রয়েছে। সেখানে কী সেনা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে, নাকি একটি মডারেট ইসলামপন্থী দল সেখানে মতা গ্রহণ করবে তা নিয়ে শংকা রয়েছে। আরবে বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল হলঃ

১. যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তির সদিচ্ছা;
২. রাজনৈতিক সংস্কার তথা দীর্ঘদিনের অপশাসন ও রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয় এমন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে।
৩. মুখ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- সংবিধান, নির্বাহী বিভাগ, সংসদ, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী এবং রাজনৈতিক দল এগুলোর যথাযথ নির্মাণ ও বিকাশ প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ;
৪. জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চত করা;
৫. আরব বিশ্বের তেল সম্পদ নিয়ে বহিঃশক্তির আগ্রাসন বন্ধ হওয়া
৬. যোগ্য, সৎ ও দ নেতৃত্ব গড়ে তোলা
৭. মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সংযত হওয়া ও
৮. জনসেচতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

● ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানের সম্ভাবনার প্রধান কারণগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ৭ম

বৃহত্তম দেশ হল ভারত। অর্থনীতিতে ভারতের উত্থানের সম্ভাবনার অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলঃ

১. বিপুল খনিজ সম্পদ
২. কৃষি সম্পদের বিশাল উৎপাদন
৩. লোহা, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, মোটর গাড়ি, পাট, কার্পাস, বস্ত্র, চিনি ও সার শিল্পের প্রসার
৪. প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ বিশ্ব বাজার দখল
৫. বিশাল জনসম্পদ
৬. পর্যটন শিল্পের প্রসার
৭. বিনোদন শিল্প
৮. বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ
৯. দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন মানব সম্পদ ও
১০. ব্রিকস প্রতিষ্ঠিত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; যেখান থেকে অবকাঠামো উন্নয়নে এবং আপদকালীন সময়ে বিশেষ আর্থিক সুবিধা পাবে ইত্যাদি।

● **ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ গুলো উলে-খ করুন।**

উত্তরঃ ১৯৬৭ সালের পর থেকে উলে-খযোগ্য শান্তি উদ্যোগগুলো হচ্ছেঃ

১. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং প্রস্তাব
২. ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড প্রস্তাব
৩. ১৯৯১ সালের মাদ্রিদ সম্মেলন
৪. ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি
৫. ২০০০ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি
৬. ২০০১ সালের টাবা
৭. ২০০২ সালের সউদি পরিকল্পনা
৮. ২০০৩ সালের রোডম্যাপ ও
৯. ২০০৩ সালের জেনেভা চুক্তি
১০. ২০১০ ও ২০১৩ সনের ওয়াশিংটন আলোচনা।

এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ও ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি সর্বাপো আলোড়ন ও আশা জাগিয়েছিল তৎকালীন প্রোপটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ সমাধান করতে পারেনি।

● **ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশমালা লিখুন।**

উত্তরঃ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মধ্যপ্রাচ্যের এই অগ্নিগর্ভ সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ নীচে উলে-খ করা হলঃ

১. সর্বপ্রথম আল আকসা মসজিদের ও জেরুজালেমের কর্তৃত্ব বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভিত্তিকে গুরুত্ব প্রদান করে একটি সমাধানের পথ তৈরি করা যেতে পারে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

২. ইসরাইলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পাপাতমূলক নীতির পরিবর্তন করে সমস্যা সমাধানে নিরপে ভূমিকা পালন করতে হবে;
৩. জাতিসংঘের শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণসহ উভয়পকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরী বাহিনী প্রেরণ করতে হবে;
৪. ওআইসি ও আরবলীগকে ইসরাইলী আগ্রাসন বন্ধে ও যুক্তরাষ্ট্রের পপাতমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে;
৫. পশ্চিমা বিশ্বসহ অন্যান্য পরাশক্তিগুলোর অংশগ্রহণে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তি স্বার করতে ও উভয় পকে তা মানতে বাধ্য করতে হবে;
৬. ফিলিস্তিন উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে;
৭. ফিলিস্তিনিদের হামাস-ফাতাহ্ দ্বন্দ্ব দূরীভূত করতে হবে;
৮. ফিলিস্তিনে একটি গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে;
৯. ফিলিস্তিনিদের গেরিলা তৎপরতা ও ইসরাইলীদের সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে ও
১০. উদ্ভূত সমস্যা দ্বি- পাকি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

● **পারমানবিক ইস্যু নিয়ে ইরান ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে স"ষ্ট দ্বন্দ্বের সমাধান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?**

উত্তরঃ পারমানবিক ইস্যু নিয়ে ইরান ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে স"ষ্ট দ্বন্দ্বের সমাধান মূলত কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হল :

১. মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ইমেজ প্রতিষ্ঠা ;
২. ইসরাইলের আগ্রাসী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন করা;
৩. সৌদি আরব, কুয়েত, জর্ডান ও অন্যান্য আরব দেশ গুলোর সাথে ইরানের আস্থা ও বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;
৪. চীন ও রাশিয়ার শক্তিশালী ও কার্যকরী উদ্যোগ করা;
৫. ইসরাইলকে পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত করা ও
৬. মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ইত্যাদি।

মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষপাতদুষ্ট নীতিমালা ও স্বার্থের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না করা গেলে ইরানের পরমাণু কর্মসূচী নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের স্থায়ী সমাধান খুবই কঠিন হবে।

● **অর্থনীতি আধুনিকীরণে চীনের চ্যালেঞ্জসমূহ কি কি ?**

উত্তর চীনা ধাচের মুক্ত অর্থনীতি গ্রহন চীনকে বিশ্বের ব"হত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। আজ চীনের নেতারা আরো আধুনিক অর্থনীতি চান। সরকারের কোথা থেকে শুরু করা উচিত এ নিয়ে অর্থনীতিবীদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশ্লেষকরা এসব লক্ষ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছেন সতর্কতার সঙ্গে এবং কতিপয় চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা সফল করার জন্য সেগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। এগুলো হল :

১. চীনের অর্থনীতিকে আরো আধুনীকিকরনের জন্য বেসরকারী খাতে ব্যাংকের ঋন প্রদান ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হবে।
২. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. চীনের অর্থনীতিকে আধুনীকিকরন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হবে ভূমি সংস্কার সম্পন্ন করা ।

৪. শিক্ষা, গৃহায়ন ও কল্যাণের অধিকার লাভ ব্যবস্থাকে আধূনীকি করন করা অর্থাৎ "হুকৌ" বিলুপ্তি করা ও

৫. পরিবেশ দূষন নিয়ন্ত্রন করা।

● **আপনি কি মনে করেন ভারতে বিজেপি জোট ক্ষমতায় আসায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে কোন বড় পরিবর্তন আসবে ?**

উত্তরঃ বাংলাদেশ-ভারত দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষন করে এটুকু বলা যায় যে সরকার বদলের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল কোন পরিবর্তন আসবে না। তাই ক্ষমতায় বিজেপি জোট আসলেও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে বড় কোন পরিবর্তন না আসলেও সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতি কিরুপ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে :

১. অনুপ্রবেশ বিতর্ক : ক্ষমতা গ"হণের পর বিজেপির সভাপতি বলেন বাংলাদেশের হিন্দুরা নিগ"হিত হলে বিজেপি বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে। তাই মনে করা হচ্ছে বিজেপির ক্ষমতা গ্রহনের পর পুশইন বিতর্ক নতুন মাত্রা পাবে না।

২. সীমানা নির্ধারণ ও ছিটমহলের সমস্যা : সুষমা স্বরাজ ২৫-২৭ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ সফরের সময়েও বলেন ভারত দ্রুত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি লোকসভায় পাশ করানোর উদ্যোগ নিবে। এতে করে আশা করা যায় মোদির সরকার এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

৩. পানি বন্টন সমস্যা : বিজেপির সাথে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃনমূল কংগ্রেসের সম্পর্ক খুব ভাল নয়। তাই এ ক্ষেত্রে মোদী সরকারের পক্ষে সহজে কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না বলে ধরে নেওয়া যায়।

৪. আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : মোদী সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর ভারতের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে এই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার জন্যে ১০০কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের জন্য হুমকি স্বরুপ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় ভারতীয় সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে না বলে ধরে নেয়া যায়।

৫. সীমান্তে বিএসএফের হত্যাকান্ড : বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশী ভূ-খন্ডে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়টি যেভাবে বিবেচনা করে তাতে করে এই হত্যাকান্ডের বিষয়টিতে সমাধান পাওয়া যাবে বলে খুব আশাবাদী হওয়া যায় না।

৬. টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ : কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারলে বিজেপি সরকারকে এই প্রকল্প থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে।

● **ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের উদ্বিগ্ন হবার কারণগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তরঃ পাঁচ কাব সদস্যের বাইরে ভারত ও পাকিস্তান তাদের নিজ নিজ পারমাণবিক কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এই পাঁচ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ম"দুস্বরে কিছু প্রতিবাদ করলেও প্রতিরোধে আগ্রহী হয়নি। অথচ যখনই মধ্যেপ্রাচ্যের কোন ইসলামিক রাষ্ট্র পারমানবিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে তখনই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের এ ধরনের আচরণ স্পষ্টতই মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাদের বিদ্বেষকে নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের পরমাণু কর্মসূচী নিয়ে যেভাবে মাথা ঘামাচ্ছে,

ইসরাইলের পরমাণু শক্তি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীতে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের উদ্বেগের অন্যতম প্রধান কারণগুলো হল: ১. মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের উপর পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রন হ্রাস পাবে;

২. বিশ্ব রাজনীতিতে পশ্চিমাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে

৩. ইসরাইলের স্বার্থ সংরণ বাধাগ্রস্থ হবে

৪. পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে ও

৫. পশ্চিমাদের বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মুসলিম বিশ্বের উত্থান ভীতি ইত্যাদি

● **আপনি কি মনে করে অদূর ভবিষ্যতে চীন বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবকে খর্ব করবে?**

উত্তরঃ গত এক দশক ধরে চীনের যে উদীয়মান অর্থনীতির ক্রমবিকাশ তা বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে খর্ব করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বিদেশনীতি ও সামরিক নীতিতেও এর প্রভাব পড়ছে। চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে হয়তো সময়ই নির্ধারণ করে দেবে সবকিছু। যে সকল কারণে চীন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করবে বলে মনে করা হয় তা হলঃ

১. বিশ্বভূমিকা পালনের লক্ষ্যে চীন ইতোমধ্যে তার সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। একই সাথে সে এক শক্তিশালী পেণাস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছে।

২. বাস্তবে দেখা যায় যে চীন অতি দ্র"ত বেগে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বিশ্বের শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

৩. চীন আসিয়ান মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বারের ফলে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত হবে এবং নিরাপত্তা সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এর ফলে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব আরও বিস্তৃত হবে যা USA এর Aisa Pacific এলাকায় প্রভাববলয় প্রতিহত করবে।

৪. প্রবৃদ্ধিমুখী নীতি গ্রহণ ও ট্রেড ইউনিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কমিউনিষ্ট সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

৫. নব্বই এর দশকের শুরুতেই চীন বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে শুরু করেছে।

৬. এক সময় চীনের জনশক্তির মান নিয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু বর্তমানে চীনের শ্রমশক্তি কেবল সংখ্যায় বেশি বা সস্তাই নয় শিতি এবং সুশৃংখলও বটে। দণি কোরিয়া বা মালয়েশিয়ার দক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে পাল-া দেয়ার মত শ্রমিকের অভাব চীনে আর নেই। দেশে এখন বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রকৌশলী তৈরি হয়েছে যাদের বিনিয়োগ দিচ্ছে বিদেশী কোম্পানীগুলো।

৭. চীনের অর্থনীতিতে নবজাগরণের সূচনা ঘটে ১৯৯৭ সনের ১ জুলাই তারিখে। বৃটেনের কাছ থেকে ১৫৪ বছর পর চীন হংকং ফিরে পায়।

৮. WTO তে চীনের অন্তর্ভুক্তি চীনকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

● **মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্ব আলোচনা করুন।**

উত্তরঃ মায়ানমারে বাংলাদেশী পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে। স্বল্প পরিমাণের রপ্তানি বৃদ্ধি করা গেলেও মায়ানমারের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উলে-খযোগ্য কোন উন্নতি ঘটনি। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের রাজনৈতিক সম্পর্কের অন্যতম বাধা হল রোহিঙ্গা সমস্যা।

মায়ানমারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি দেশের দ্বিপাকি সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে চীনের সঙ্গে ২১৮৫ কি:মি: এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গে ১৮০০ কি:মি:, ভারতের সঙ্গে ১৪৬৩ কি:মি:, লাওস এর সঙ্গে ২৩৫ কি:মি: এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ২৭২ কি:মি: সীমান্ত বিদ্যমান। চীন সরকার সেদেশে কুনমিং সিটি (ইউননান প্রদেশ) থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত মিয়ানমারের উপর দিয়ে রেল সংযোগ স্থাপনের আগ্রহ। প্রতিবেশী ভারত ইতোমধ্যে ১৬০ কি:মি: দৈর্ঘ্য সড়ক নির্মাণ করে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে মায়ানমারের মূল ভূ-খন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করে বসে আছে ২০০১ সনে। তাই বাংলাদেশের উচিত প্রতিবেশী মায়ানমারের সাথে সর্ম্পক উন্নয়নে আশু পদপে গ্রহণ করা। মায়ানমারের সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন ঘটলে বাংলাদেশে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পেতে পারে:

১. রফতানি বাজার সম্প্রসারণ
২. শিল্পের কাঁচামাল আমদানী
৩. জ্বালানী আমদানী
৪. পর্যটন শিল্পের প্রসার
৫. দ্বি-পাকি সমস্যার সমাধান ও
৬. মিয়ানমারে শিল্প কারখানা স্থাপন

● আফগানিস্তান সমস্যার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলো লিখুন।

উত্তর: আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তার নিজেরই। তাই আফগান সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেশটির জনগণ ও নেতৃবৃন্দের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। তবে আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে আফগান সমস্যা সমাধানের নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হয়:

১. জাতিগত দ্বন্দ্ব দূর করা
২. ধর্মান্ধতা পরিত্যাগ করা
৩. সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
৪. যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা
৫. শিার প্রসার ঘটানো
৬. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা
৭. বহি:শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা না করা
৮. গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা
৯. জাতিসংঘ শান্তিরা বাহিনী নিয়োগ
১০. নিরপে নির্বাচন
১১. সব জাতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে সরকার গঠন করা

● পাকিস্তানে মৌলবাদ উত্থানের কারণগুলো চিহ্নিত করুন।

উত্তর: পাকিস্তানের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশে-ষণ করে দেশটিতে মৌলবাদ উত্থানের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করা যায়:

১. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা;
২. অশিা ও কুসংস্কার
৩. ধর্মীয় গোড়ামী
৪. প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের অভাব
৫. রাষ্ট্র কর্তৃক মৌলবাদকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন প্রদান
৬. ইসলামী মৌলবাদে বিশ্বাসী দেশী- বিদেশী সংগঠনগুলোর তৎপরতা ও
৭. অর্থের বিনিময়ে তরুণদের মৌলবাদী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

● ২০১৩ সনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নওয়াজ শরীফের জয়লাভের কারণগুলো উলে-খ করুন।

উত্তর: কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে গত ১১ মে ২০১৩ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশটির ৬৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অপর একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ৩৭২ আসনের জাতীয় পরষদে ২৭২টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়। এর মধ্যে পিএমএল এন পায় ১২৬টি আসন। পাকিস্তান পিপলস পর্টি (পিপিপি) প্রায় ৩১টি আসন এবং সাবেক ক্রিকেটার ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পায় ২৯টি আসন। মুত্তাহিদা কাওমি মুভমেন্ট (এমকিউএম) প্রায় ১৮টি আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৯টি আসনে জয়লাভ করেছে। জিআইউআইএফ পেয়েছে ১১টি আসন। ২০১৩ সনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নওয়াজ শরীফের জয়লাভের কারণগুলো হলো:

১. জারদারী সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের ব্যাপক দুর্নীতি
২. ব্যক্তি জারদারীর নেতিবাচক ইমেজ
৩. পিপিপি সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থতা
৪. সরকার ও বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব
৫. পিপিপি-র ওপর তালেবানদের কঠোর মনোভাব
৬. তরুণ ও নারী ভোটারদের সমর্থন পাওয়া
৭. পিপিপি সরকারের দারিদ্র্যতা দূরীকরণ ও শিার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা
৮. মার্কিন ড্রোন বিমান হামলা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তপে প্রশ্নে পিপিপি-র শক্তিশালী ভূমিকা নিতে না পারা
৯. পিপিপি-র সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যর্থতা
১০. মৌলবাদের উত্থান প্রতিরোধে পিপিপি-র ব্যর্থতা ইত্যাদি

● চীনের সাথে বাংলাদেশের সর্ম্পক উন্নয়নের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর: ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীনের বিরোধী ভূমিকা ছিল দুঃখজনক। স্বাধীনতার দীর্ঘ পাঁচ পর চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। যা হোক ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে দ"ঢ় হতে থাকে। এখন চীন বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চীন বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সড়ক সেতুসহ ঢাকার চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র বাংলাদেশে চীনের মৈত্রীর নির্দশন। চীন সম্প্রতি বাংলাদেশে তাদের রপ্তানি বাজার ব্যাপক বৃদ্ধি করেছে। চীন বাংলাদেশের সর্বো"চ রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের বেশকিছু পণ্যকে চীন শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রদান করছে। আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক উভয় ক্ষেত্রেই চীনের প্রভাব ও পদচারণা ক্রমবর্ধমান। অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি সর্বজনবিদিত। আমাদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে চীনের সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। চীনের সাথে সর্ম্পক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা যেভাবে উপকৃত হতে পারি সেগুলো হল:

১. বাণিজ্যিক ভারসাম্য হ"াসে সহযোগিতা প্রাপ্তি;
২. বিনিয়োগ প্রাপ্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা লাভ;
৩. গভীর সমুদ্র বন্দর ও চট্টগ্রাম কুনমিং সড়ক নির্মাণে সহযোগিতা প্রাপ্তি,
৪. কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা লাভ;
৫. পরিবেশ রায় সহযোগিতা প্রাপ্তি

৬. মিয়ানমারের সাথে বিবাদমান সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা লাভ।

● **রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন উন্নয়ন হলে বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হতে পারে?**

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই রাশিয়া বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দেয় স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় পাবনার রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে সমঝোতা চুক্তি করেছে। রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটাতে পারলে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারে সেগুলো হল:

১. বাংলাদেশের রফতানি বাজার বৃদ্ধি পাবে;

২. তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেলে রফতানি দ্রুত বাড়াতে পারবে;

৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে রাশিয়ান বিনিয়োগ পেতে পারে

৪. রাশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উত্তোলন, একাধিক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগী হতে পারে

৫. রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় রাশিয়ার শ্রমবাজারে জনশক্তি রফতানির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে।

● **এশিয়ান হাইওয়ে কি?**

উত্তর: এশিয়ার ৩২টি দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের উঝঈঅচ প্রায় ১ ল ৪০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ যে আন্ত:এশীয় মহাসড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেটিই প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে নামে পরিচিত। এশিয়ান হাইওয়ে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার এক যুগান্তকারী কর্মপরিকল্পনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ান হাইওয়ে ধারণা জোরদার হয়। এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি ছিল গোটা ধারণার মূলে। এই নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিটি দেশ পরস্পরের সাথে সড়ক পথে যুক্ত হবে। এশিয়া হাইওয়ের উলে-খযোগ্য দিক হচ্ছে পূর্ব দিকে চীন, মঙ্গোলিয়া ও ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিম দিকে কাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্কান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ; দণি দিকে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার, দণি- পূর্বদিকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউএন-এসকাপ) এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ব্যাপারে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়, কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর থেকে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক বিরোধ ও বৈরিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এশিয়ান হাইওয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। ২০০৪ সালের এপ্রিলে চীনের সাংহাইয়ে ইউএন- এসকাপের ৬০ তম অর্থনৈতিক সম্মেলনে জাপানের টোকিও থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ৩২টি দেশের মধ্যে দিয়ে সড়ক প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বারের প্রস্তব গৃহীত হয়।

● **সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি মামলায় সীমানা নির্ধারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মূল দাবী কি ছিল? PCA কি সিদ্ধান্ত নেয়?**

উত্তর: বাংলাদেশের দাবী: ন্যায্যতাসূত্র বা ইক্যুইটির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর ও ভূমির মূলবিন্দু থেকে সমুদ্রের দিকে ১৮০ ডিগ্রি সোজা রেখা থেকে সীমা নির্ধারণের দাবি জানায়।

ভারতের দাবী: ভারতের দাবী ছিল দণি তালপট্টি বা নিউমুর দ্বীপকে ভারতের মূল ভূখন্ডের অংশ ধরে সমদূরত্বসূত্র বা ইক্যুইডিসটেন্সের ভিত্তিতে সমুদ্রতট বিবেচনায় ১৬২ ডিগ্রি রেখা থেকে সীমা নির্ধারণ।

ট্রাইব্যুনালের রায়: ট্রাইব্যুনাল ১৭৭ দশমিক ৩ ডিগ্রী রেখায় সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে রায় প্রদান করে। একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা ও ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভেতরে মহীসোপানের সীমানা মনে করেছেন। আদালত উলে-খ করেছেন বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান অবতলতা বিবেচনায় নিয়ে ন্যায়সঙ্গত ফলাফল দেবে। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আদালত একই রকম যুক্তি দিয়েছেন।

● **বাংলাদেশ- ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণে PCA প্রদত্ত রায়ের উলে-খযোগ্য দিকগুলো উলে-খ করুন।**

উত্তর: বাংলাদেশ ভারত সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘ ৪ বছর ৯ মাস ধরে আইনি বিতর্ক চলে স্থায়ী সালিশি আদালতে। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই রায় ঘোষিত হয়। রায়ের উলে-খযোগ্য দিকগুলো হল:

১. ট্রাইব্যুনাল ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশকে প্রদান করেছে।

২. হাড়িয়াভাঙ্গা নদী থেকে শুরু করে রায়মঙ্গল নদীতে বাংলাদেশী জাহাজ চলাচল করতে পারবে।

৩. ভারতের সঙ্গে সমুদসীমা নির্ধারণের ফলে এখন থেকে ২০০ নাটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে বাংলাদেশের অবাধ প্রবেশাধিকার সুরতি হবে।

৪. ভারতের দাবীকৃত ১০টি গ্যাস ব-কই বাংলাদেশ পেয়েছে। তবে অগভীর সমুদ্রের ১, ৫ এবং গভীর সমুদ্রের ৯, ১৪, ১৯ ও ২৪ নং ব-কের ৬,১৩৫ বর্গ কিমি অংশ ভারতের বলে রায়ে উলে-খ করা হয়।

৫. অস্তিত্ব না থাকলেও বহুল আলোচিত তালপট্টি দ্বীপ এলাকাটি এই রায়ের ফলে ভারতের মধ্যে পড়েছে।

৬. ৫০ বর্গ কিলোমিটারের মত একটি এলাকাকে উপ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রায়ে বলা হয় উপ-এলাকার সমুদ্রপৃষ্ঠের তলদেশের সকল সম্পদের মালিকানা এককভাবে বাংলাদেশের; তবে মৎস আহরণে ভারতের অধিকার থাকবে।

● **মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেমের সম্পর্ক উন্নয়ন কি কি পদপে গ্রহণ করা যেতে পারে?**

উত্তর: মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদপেগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. ইয়াঙ্গুনে বাংলাদেশের দূতাবাসকে ঢেলে সাজিয়ে দ কূটনীতিবিদ নিয়োগ প্রদান করা;

২. দ্বি-পাকি কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা

৩. বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য মায়ানমারে পণ্য প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা;

৪. বাংলাদেশী ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের মায়ানমারে শিল্প কারখানা স্থাপনে আগ্রহী করে তোলা;

৫. মায়ানমারের অর্থণৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশে-ষণ করে তা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরবরাহ করা

৬. বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও পর্যটন শিল্প সর্ম্পকে মায়ানমারের জনগণকে অবগিত করার উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যদি।

● **ট্রানজিট, ট্রান্সশীপমেন্ট ও করিডোর বলতে কি বঝায়?**

উত্তর: ট্রানজিট: একটি দেশ এক বা একাধিক দেশকে তার ভূ খন্ডের মধ্য দিয়ে সড়ক রেল, নৌ এবং বিমান পথে বাণিজ্য সামগ্রী বা যাতায়াতে সুবিধা প্রদানই হচ্ছে ট্রানজিট। সাধারণত জলপথ

http://thejobstudy.com Go to Contents

ও স্থলপথে দীর্ঘপথ পরিক্রমা হ্রাসে ট্রানজিটের প্রয়োজন হয়। সে কারণে ট্রানজিট এক ধরনের অর্থনৈতিক বিষয়। ট্রানজিট প্রাচীন ধারণা হলেও এর বাণিজ্যিক বাস্তবতা সাম্প্রতিক। এখানে রাজনৈতিক শত্রু মিত্র বিবেচনায় আসে না। উদাহরণ: ভারতের কোন পণ্য বাংলাদেশে ভূ খন্ডের উপর দিয়ে মায়ানমারে পাঠানো।

ট্রান্সশিপমেন্ট: মধ্যবর্তী কোন স্থানে পণ্য খালাস করে পরিবহন করে চূড়ান্ত স্থানে পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থাকে ট্রান্সশিপমেন্ট বলা হয়। এক দেশের পণ্য অন্য দেশের ভিতর দিয়ে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পরিব্যহিত হতে হলে সেই দেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য খালাস করে পরিবহন পরিবর্তন করতে হয়। সংশি-ষ্ট কর্তৃপ এই কার্যক্রম পর্যবেণ করে। সাধারণত পণ্য সরবরাহকারী দেশের সাথে পণ্য পাঠানোর স্থান বা দেশের সাথে সরাসরি আকাশ, সড়ক, রেল বা নৌপথের সরাসরি সংযোগ না থাকলে ট্রান্সশিপমেন্টের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় পরিবহন আবকাঠামোর প্রয়োজনেও বড় কনসাইনমেন্টকে ছোট ছোট কনসাইনমেন্টে বিভক্ত করে পাঠানোর প্রয়োজনেও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার প্রয়োজন পড়ে। উদাহরণ: ভারতের পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী পরিবহনে সেভেন সিস্টারস ভুক্ত রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত পরিবহন।

করিডোর: করিডোর হল একটি সংকীর্ণ প্রসারিত ভূ- খন্ড যেটি একটি দেশের এক অংশের সাথে অন্য অংশকে সংযুক্ত করে। যেমন- ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর। এটি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে দেশটির অন্যান্য অংশের সাথে সংযোগ করেছে। নেপাল এবং বাংলাদেশ শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে পৃথকীকৃত হয়ে দুই দিকে অবস্থান করছে। এই করিডোরের উত্তরে রয়েছে ভুটান।

● এশিয়ান হাইওয়ের প্রস্তাবিত তিনটি রুটের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য কোন রুটটি সহায়ক বলে মনে করেন?

উত্তর: বাংলাদেশের মধ্যে এশিয়ান হাইওয়ের তিনটি গতিপথ বা রুট ঠিক করছে এসকাপ। প্রথমটি বেনাপোল-যশোর-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল (এএইচ-১)। দ্বিতীয়টি বাংলাবান্ধা-হাটিকুমরুল-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল (এএইচ-২)। তৃতীয়টি হচ্ছে মংলা-যশোর-হাটিকুমরুল- (কুষ্টিয়া লালন শাহ ও যমুনা সেতু হয়ে)- ঢাকা- কাঁচপুর-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ (এএইচ-৩)। এর মধ্যে প্রথম দুটি গতিপথ ভারতের মধ্যে থেকে এসে ভারতে শেষ হবে। তিন নম্বর পথটি শুধু মিয়ানমার সীমান্তে শেষ হয়েছে। এএইচ-১, এএইচ-২ রুট দুটি অনুমোদন করা হলে লাভ হওয়া তো দূরের কথা অর্থনৈতিকভাবে ও জাতীয় নিরাপত্তার দিক দিয়ে ব্যাপক তির মুখে পড়বে বাংলাদেশ। আর্ন্তজাতিকভাবে ও জাতীয় নিরাপত্তার দিক দিয়ে ব্যাপক তির মুখে পড়বে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ভারত থেকে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বুলগেরিয়াসহ অন্যান্য দেশ সড়ক পথে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হলে এএইচ-৩ রুটটি বাংলাদেশে জন্য সহায়ক হবে বলে মনে হয়।

● এশিয়ান হাইওয়ে থেকে বাংলাদেশ কি কি সুবিধা পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: ১ লাখ ৪০ হাজার কিলোমিটারের যে আন্তঃএশীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্ক হতে যাচ্ছে তা বলা যায় পুরো এশিয়াকেই সড়কপথে সংযুক্ত করবে। এশিয়ান হাইওয়ে চালু হলে ৩২টি দেশ সড়কপথে সংযুক্ত হবে। এর ফলে বাংলাদেশ ৩১টি দেশের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। এশিয়ান হাইওয়ে চালু হলে বাংলাদেশ যে সুবিধাগুলো পেতে পারে সেগুলো হল:

১. বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে;
২. যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে;

৩. আমদানী-রফতানী বাণিজ্যে পণ্য পরিবহন ব্যয় হ্রাস পাবে;
৪. পণ্য পরিবহণে সময় কমে আসবে;
৫. ভারত ও মায়ানমারর সাথে অবৈধপথে বাণিজ্য হ্রাস পাবে;
৬. আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে;
৭. আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার হলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক সম্পর্কও সুদৃঢ় হবে;
৮. মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার সাথে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়বে;
৯. আমদানী পণ্যের মূল্য হ্রাস পাবে এবং
১০. বিভিন্ন দেশের জন্য পরিবহন থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

● মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো হল:

১. বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির আদালত ছিল ITLOS যেটি জার্মানীর হামবুর্গে অবস্থিত। অন্যদিকে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির আদালত ছিল চঈঅ যেটি নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত।

২. মায়ানমারের সাথে বিরোধ নিস্পত্তি হয় ট্রাইবুন্যাল পদ্ধতিতে আর ভারতের সাথে নিস্পত্তি হয় আরবিট্রেশন পদ্ধতিতে।

৩. সমুদ্রসীমা নির্ধারনের মিয়ানমারের দাবী ছিল ১৯৭৬ সনের প্রস্তাবিত ফে"ভশীপ রেখার কাছাকাছি বাংলাদেশের ন্যায্য এবং মিয়ানমারের প্রস্তাবিত সমদূরত্ব পদ্ধতির সমন্বয়ে নিস্পত্তি। অন্যদিকে ভারত দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউমুর দ্বীপকে তাদের মূল ভূ-খন্ডের অংশ ধরে সমদূরত্ব ভিত্তিতে নিস্পত্তি করতে চেয়েছিল।

● সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সাথে সর্ম্পক উন্নয়নে পাকিস্তানের আগ্রহের কারণ উলে-খ করুন।

উত্তর: চীনকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে হচ্ছে পাকিস্তান। ১৯৫১ সালের ২১ মে চীন-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক অফিসিয়ালি গড়ে তোলা হয়। তখন থেকেই দেশ দুটো একে অপরের সাথে সর্ম্পক রক্ষা করে আসছে। তবে পাকিস্তান। পশ্চিমা ব-কের দিকে ছিল বিধায় চীন-পাকিস্তানের মধ্যে খুব একটি ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক ছিল বলা যাবে না, কারণ চীন হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশ।

চলমান যুক্তরাষ্ট্র- পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়নের আরও তীব্রতার দিকে চলে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। তাই পাকিস্তান কৌশলগত কারণেই চীনকে বৃহৎ ও শক্তিশালী বন্ধু হিসেবে মনে করবে, এটাই স্বাভাবিক। চীনও হচ্ছে পাকিস্তানসহ আশপাশের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করা। বেইজিং আসে মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, ভুটান এবং মালদ্বীপের সাথেও সর্ম্পক গভীর করতে চাইছে; তবে পাকিস্তানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে।

● তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিসসা না পাওয়ায় বাংলাদেশের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর: ভারতের সিকিম রাজ্যের পাহুনির পা তিস্তা কংসে গ্লেসিয়ার থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি। নদীটি সিকিমের অধিকাংশ এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপেক্ষা নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সীমান্ত নদী হিসেবে বিবেচিত হয়ে বাংলাদেশে নীলফামারী জেলা

দিয়ে প্রবেশ করে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হয়েছে। তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০৯ কিলোমিটার।

তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিসসা না পাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজের জন্য ভূ ভাগের উপরের পানি ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছে, নদীর নাব্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, নদীর বিশাল এলাকা জুড়ে জেগে উঠেছে বালুচর এবং দ্রুততর হচ্ছে মরুকরন প্রক্রিয়া । পক্ষান্তরে, ভারত বর্ষাকালে সমস্ত পানি বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়ে বন্যায় ভাসিয়ে দেয় সমগ্র উত্তরবঙ্গ। তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে না পারলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য যে নেতিবাচক প্রভাব গুলো পড়বে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সেগুলো হল :

১. রংপুর বিভাগের ৫টি জেলায় মরুকরণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।
২. পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এই অঞ্চলে সেচের অভাবে কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৩. পানির অভাবে এই অঞ্চলে মৎস সম্পদ শূন্য হয়ে পড়বে ফলশ্রুতিতে মৎস সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগন কর্মহীন হয়ে পড়বে।
৪. এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র বিনষ্ট হবে।
৫. বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং
৬. উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

● ভারত তিস্তা নদীর উপর কী কী প্রকল্প গ্রহণ করেছে ?

উত্তর: তিস্তার উজান বা পার্বত্য প্রবাহের সব অংশই ভারতের অন্তর্ভূক্ত । এর ফলে ভারত এ নদীকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পর্বত সংকুল এলাকা দিয়ে প্রবাহিত নদীতে ভারত বাঁধ নির্মাণ করছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারত যে দুটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সে দুটি হল :

১। তিস্তা-ভিম ড্যাম : প্রকল্পটি ২০০৭ সনে বাস্তবায়ন করা হয়; এটি ৫১০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত হয়েছে।

● তিস্তা নদীর ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর: বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের ৫ টি জেলার প্রায় ১ কোটি লোকের ভাগ্য এবং অত্র অঞ্চলের কৃষি, সেচ, মৎস্য সম্পদ এবং পরিবেশ তিস্তা নদীর পানির প্রাপ্যতার সাথে জড়িত। তাই কোন ভাবেই তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় থেকে পিছপা হওয়া যাবে না । এ জন্যে বাংলাদেশকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২০১০ সনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে যান। ঐ সফরের সময় তিস্তা নদীর ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের অনুরোধ জানান । ২০১১ সনের নভেম্বরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতার কারনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তার পানি বন্টণ সংক্রান্ত কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। তিস্তা নদীর ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করণে বাংলাদেশের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহন করা উচিৎ :

১. আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন করা ;
২. সরকারের সদিচ্ছা এবং দৃঢ়তা নিশ্চিত করা;
৩. দ্বপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা;
৪. ভারতের জনগনের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা ও
৫. জাতিসংঘের দ্বারস্ত হওয়া।

● আরব বসন্ত বলতে কি বুঝ?

২০১০ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া আরব রাষ্ট্রসমূহের জনগণের বিভিন্ন দাবিতে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংঘটিত হয় তাই আরব বসন্ত বা আর-রবিউল আরাবী নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এর আরেক নাম আরব 'গণজাগরণ'। পুলিশের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আত্মাহুতি প্রদানকারী তিউনিশিয়ার নাগরিক মোহাম্মদ বুয়াজিজির মৃত্যুর মাধ্যমে ১৮ ডিসেম্বর ২০১০ সালে এটি শুরু হলেও ক্রমেই তা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিষয় এই আরব বসন্তের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আরব দেশসমূহে বিদ্যমান রাজতন্ত্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন আরব দেশসমূহে শ্রমিক শোষণ চলছিল।। যার ফলে ভেতরে ভেতরে আরো অনেক আগেই মৃদু প্রতিবাদ দানা বাঁধছিল। বিগত দশকে এ অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং এ গণজাগরণ ত্বরান্বিত হয়। এ গণজাগরণের ফলে তিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবিদিন বেন আলী বরখাস্ত হন এবং পালিয়ে সৌদি আরবে নির্বাসনে যান। ১৪ মার্চ ২০১১ তার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর ক্রমে আলজেরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মৌরিতারিয়া, সুদান, ওমান, সৌদি আরব, মিশর ইয়েমেন, ইরাক, বাহারাইন, লিবিয়া, কুয়েত, মরক্কো, পশ্চিম সাহারা অঞ্চল, সিরিয়া ও ইসরাইলে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এ বিক্ষোভ সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ফেসবুক ও টুইটারের ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। এ বিক্ষোভের ফলে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনির মোবারক পদচ্যুত হন এবং তার সরকার ক্ষমতা হারায় ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১১। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এখনও সেখানে প্রতিরোধ চলছে। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি ২০ অক্টোবর ২০১১ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ বিক্ষোভের মুখে কিছুদিনের মধ্যে ক্ষামতা ছাড়তে সম্মত হন। সিরিয়া এবং বাহরাইনে সরকার পরিবর্তন ঘটলেও বিক্ষোভ চলছে। মূলত গনতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন এবং স্বৈরচারী সরকার বদলই এই আরব বসন্তের লক্ষ্য। আর্ন্তজাতিক সমীক্ষা মতে ৩০ হাজার থেকে ৩৭ হাজার লোক এই আরব গণজাগরনে শহীদ হয়েছেন। অভ্যুত্থানে সহযোগিতার মাধ্যমে ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান ২০১১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

● ইয়াসির আরাফাত কি পলোনিয়াম বিতর্ক মৃত্যুবরন করেছিলেন?

'পলোনিয়াম ২১০' বিশ্বের বিরলতম পদার্থগুলোর একটি বিষাক্ত উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় উপাদান। ১৮৯৮ সালে বিজ্ঞানী দম্পতি মেরিও পিয়েরে কুরি এ পদার্থটি আবিষ্কার করেন। এ বিজ্ঞানীদ্বয়ের দেশ পোল্যান্ডের নাম অনুসারে সেই পদার্থের নাম রাখা হয় পলোনিয়াম (চড়ষড়হরঁস)। লন্ডনে এক সাবেক কেজিবি গোয়েন্দাকে মারতে ব্যবহৃত হওয়ায় ২০০৬ সালে পলোনিয়াম নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার ঝড় ওঠে। পরবর্তীতে পলোনিয়ামের আলোচনা তুঙ্গে ওঠে সম্প্রতি ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের কাপড়ে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ায়। এরপর আরাফাতের বিধবা স্ত্রী তার স্বামীর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে তা পরীক্ষার দাবি জানান। কারণ ২০০৪ সালে ১১ নভেম্বর মারা যাওয়ার আগে তিনি যে কাপড় পরিছিলেন, সেই কাপড়ে পাওয়া গেছে পরোনিয়াম ২১০ নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব। সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা আরাফাতের কাপড়ে এ বিষাক্ত পদার্থের খোজ পান। ২৭ নভেম্বর ২০১২ রামাল্লায় মকিতাতা থেকে ইয়াসির আরাফাতের দেহাবশেষ উত্তোলন করে ৬০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তার মৃত্যু 'পলোনিয়াম-২১০' নামের তেজস্ক্রিয় উপাদানের বিষক্রিয়ায় হয়েছে কি না, তা এসব নমুনা থেকে পরীক্ষা করে দেখা হবে। হাইড্রোজেন সায়ানাইডের চেয়েও পলোনিয়াম প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার গুণ বিষাক্ত।

● মিয়ানমারে কাচিন বিদ্রোহ আলোচনা করুন?

১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই মিয়ানমারের নানা অংশে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী

তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। তার মধ্যে অন্যতম উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য কাচিনে জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহী কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্গানাইজেশন (KIO)। ১৯৬১ ফেব্রুয়ারি ৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত KIO স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করে। তবে পরে সেখান থেকে সরে এসে তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে 'তাতমাদাউ' নামে পরিচিত মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও কওঙ্ক-এর মিলিটারি উইং কাচিন ইন্ডিপেনডেন্স আর্মির (KIO) মধ্যকার ১৭ বছরের শান্তিচুক্তি ২০২১ সালের জুনে ভেঙ্গে যায়। এরপর থেকেই দু'পক্ষের লড়াই চলছে নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত কাচিন রাজ্যে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ বিদ্রোহী সংগঠন কাচিন স্বাধীনতা সংস্থার (KIO) সামরিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বিমান হামলা চালিয়ে দখল করেছে সামরিক বাহিনী। ফলে কাচিন বিদ্রোহ নতুন করে মাত্রা পায়। বর্তমান মিয়ানমার সরকার দেশটির নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদের বিদ্রোহী সংগঠন কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্গানাইজেশন (KIO) সাথে সাত দফা ভিত্তিক অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে পৌঁছেছে। কোচিন প্রদেশের মিতকিনায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

● ট্রানজিট কি ?

কোনো দেশ তার নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পরিবহণের সুবিধার জন্য চুক্তির মাধ্যমে অন্য দেশের ভূখন্ড, জলপথ বা আকাশপথ ব্যবহারের সুযোগ পেলে তাকে ট্রানজিট বলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ট্রানজিট সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে পানিপথে ভারতের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট চালু আছে। নদীপথে 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড' প্রথম স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮০ সালে এবং কয়েক দফা পুনঃনবায়নের প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ চুক্তিটি পুনঃনবায়ন হয় ২০০৮ সালের মে মাসে। তবে ভারতের আগ্রহ ট্রানজিট হোক স্থলপথে। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যে-ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যেমন করা যাচ্ছেনা তেমনি এ সকল অঞ্চলের যথাযথ উন্নয়নও সাধিত হচ্ছেনা। তাছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব উৎপাটন, অভ্যন্তরীণ সহজতর এবং দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রায় ৫০০ মাইল পাড়ি দিয়ে এ সাতটি অনগ্রসর রাজ্যে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট দাবি করে আসছে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে। অন্যদিকে বাংলাদেশও তার ভৌগোলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াসহ নানাবিধ আশঙ্কায় এ জাতীয় ভারতীয় দাবি বাস্তবায়নে এগোতে পারছে না। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালের ট্রানজিট চুক্তির আওতায় ১৯৯৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে মাত্র ৬ মাসের অস্থায়ী ট্রানজিট চুক্তি হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ১ মার্চে। কিন্তু ভারত আরোপিত বিভিন্ন শর্তে চুক্তিটি সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি।

KEY TO B C S

&

WAY TO INTERNATIONAL RELATION

http://thejobstudy.com Go to Contents

◆ বিভাগ ঃ খ

ধারণাগত বিষয়সমূহ

Conceptual Issues

অধ্যায় : ১	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
অধ্যায় : ২	বিশ্বে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী চলকসমূহ
অধ্যায় : ৩	শক্তি, জাতীয় শক্তি, শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব এবং যৌথ
অধ্যায় : ৪	অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ
অধ্যায় : ৫	ভূ-রাজনীতি
অধ্যায় : ৬	সন্ত্রাসবাদ : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
অধ্যায় : ৭	জাতীয়তাবাদ
অধ্যায় : ৮	সাম্রাজ্যবাদ
অধ্যায় : ৯	উপনিবেশবাদ ও নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ
অধ্যায় : ১০	বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা
অধ্যায় : ১১	উত্তর আধুনিকতাবাদ
অধ্যায় : ১২	স্নায়ুযুদ্ধ
অধ্যায় : ১৩	পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি
অধ্যায় : ১৪	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক
অধ্যায় : ১৫	বৈশ্বিক পরিবেশ : বিশ্ব রাজনীতি
অধ্যায় : ১৬	সাজেশন্স : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

মূল পাঠ (Basic Lesson)

অধ্যায় ১

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি
International Relation & Politics

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১.১ ভূমিকা
১.২ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা
১.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় শাস্ত্র-ক্রমবিকাশের ধারা
১:৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি বা বিষয়বস্তু
১.৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করার দাবি
১.৬ আন্তর্জাতিক রাজনীতি
১.৭ আন্তর্জাতক রাজনীতি কী
১.৮ আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি
১.৯ আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু
১.১০ আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্প্রসারিত রূপ
১.১১ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য
১.১২ জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

১.১ ভূমিকা (Introduction)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি পৃথক বিষয় হিসেবে গড়ে ওঠে নি। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ সম্পর্কে গবেষণামূলক বহু বই এবং পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে অন্যান্য বিষয়ের মতোই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রই স্বাধীন ও সার্বভৌম। তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যে সম্পূর্ণরূপে নিজের ওপর নির্ভর করে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে সক্ষম। এভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। রাষ্ট্রসমূহের এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ইত্যাদি এড়িয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

১.২ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা (Definition of International Relation)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমন একটি বৃহত্তর ধারণা ও পরিসরের প্রতি ইঙ্গিত করে যার মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্পর্কের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষ ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক শুধু যে কেবল রাষ্ট্রীয় স্তরে নির্মিত হয় তা নয়। রাষ্ট্র ছাড়া নানাবিধ আন্তর্জাতিক তথা আন্তঃরাষ্ট্রীয় অসংখ্য সংস্থা এবং সংগঠনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সহজ কথায় বলা যায় যে, রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনীতি থেকে শুরু করে সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদান হয় তার বিজ্ঞানসম্মত এবং পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করাই হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। অর্থাৎ বিশ্ব মানবসমাজের মধ্যে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সকল ক্রিয়াকলাপ ঘাত-প্রতিঘাত এবং ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই সমস্ত বিষয় পরিপূর্ণভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ একে "রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক" বিষয়ক আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার অনেকে এ বিষয়কে ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। অনেক সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমর্থক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণত যে বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো :

রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি পরিচালনা:

১. রাষ্ট্রের ক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
২. বৃহৎ শক্তিসমূহের অবস্থান এবং তাদের বৈদেশিক নীতি
৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং প্রধান শক্তিসমূহ
৪. জাতীয় স্বার্থ প্রসারের মাধ্যমসমূহ
৫. জাতীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণ
৬. আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রশাসন
৭. আন্তর্জাতিক আইন এবং
৮. পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

দৃশ্যত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র বা স্বতন্ত্র জাতিসমূহের পারস্পরিক আচরণগত পদ্ধতিকে (behavioral method) বোঝানো হয়। মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে স্বাধীন সরকারসমূহের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে যোগাযোগকে (Official contacts) নির্দেশ করে। আর এক্ষেত্রে International World Book Encyclopedia-এর পদ্ধতি প্রণিধানযোগ্য। এ পুস্তকের পরিভাষায় "International relations are an official contact among the governments of independent states" অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে মূলত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের মাঝে সরকারি পর্যায়ের যোগাযোগকে বোঝায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্লেষকের দেওয়া সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো :

শ্লেচার তাঁর International Relation-এ বলেছেন যে, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হলো একটি সমাজ বিজ্ঞান, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের কেনো কোনো দিক নিয়ে আলোচনা করে।" টমসনের ভাষায় "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ এবং যেসব শর্ত ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতি ঘটে তাদের পর্যালোচনাকে বোঝায়।"

অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স (Norman D. Palmer and Inword C. Parking)-এর মতে, "বিশ্ব

সম্প্রদায়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন ও পরিবর্তনশীল।

অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy Wright)-এর মতে, বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।

পরিশেষে, স্টানলি হকম্যান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সবচেয়ে স্বচ্ছ ধারণা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, যে সকল উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর (স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ) পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সে বিষয়ের অধ্যয়ন নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। (The discipline of international relations is concerned with the factors and activities which affect internal policies and the power of the basic units into which the world is divided) আর আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক মূলত রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধকালীন এবং শান্তি কালীন (Peace Time) উভয় আচার আচরণকে (behavior) অন্তর্ভুক্ত করে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উল্লেখ করা যায় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত ব্যাপক অর্থে বিশ্ব রাজনৈতিক সমাজের এককগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে বোঝায়। অর্থাৎ একটি দেশের সাথে অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংযোগ এবং আদান-প্রদান। এক কথায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি শাস্ত্রকে বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে।

স্মিথ (Smith), আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগত আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- গঠনমূলক তত্ত্ব (Constitutive Theory) ও ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব (Explanatory Theory)।

গঠনমূলক তত্ত্ব : সমালোচনামূলক তত্ত্বের লেখকগণ ও উত্তর-আধুনিকতাবাদী লেখকগণ এ তত্ত্ববাদী আলোচনার অনুসারী।

ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব : বাস্তবাদী, বহুত্ববাদী ও নয়া-মার্ক্সবাদী লেখকগণ এ তত্ত্বের সমর্থক।

১৯৮৮ সালে রবার্ট কোহেন (Robber Keohane) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন- যুক্তিবাদী (Rationalist) ও চিন্তাবাদী (Reflectivist)।

যুক্তিবাদী (Rationalist) : নয়া বাস্তববাদী তত্ত্ব ও নয়া উদারবাদী তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা (Neo-neo Syntucsis) এই চিন্তাধারার অন্তর্গত।

চিন্তাবাদী (Reflectivist) : উত্তর-আধুনিক আলোচনা (Post-modern study) ও সামাজিক গঠনমূলক তত্ত্ব (Social Constructivism) এই চিন্তাধারার অংশীদার।

১.৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি বা বিষয়বস্তু
Scope or subject matter and nature of International Relations

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়বস্তু অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। বর্তমান শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন, বহু নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রসারণ, আণবিক অস্ত্রের উদ্ভব, দুটি মহাশক্তিধর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে আশার বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। এজন্যই কুইনসি রাইট মন্তব্য করেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের সংঘ, জাতি, রাষ্ট্র, সরকার, জনগণ, আঞ্চলিক জোট, আন্তর্জাতিক সংগঠন এমনকি শিল্প সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংঘ, ধর্মীয় সংগঠন- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়কে প্রসারিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান (Origin) ও অগ্রগতি (Development) সূচিত হয়েছিল। এ সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি মূলত কূটনৈতিক ইতিহাসের (Diplomatic history) দিকে নজর দেয়া হত। একই সময় এমন ধারণা নিবিষ্ট ছিল যা আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নের মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব

দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চালিত একই সাথে রাষ্ট্রীয় আচরণ বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করার অনেকগুলো তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত ছিল। এ সময় ঐতিহাসিক বর্ণনা ও পদ্ধতিগুলোর ওপর জোর দেওয়া হতো বেশী। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নের কূটনৈতিক ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর অধিক জোর দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের সহযোগী কোনো তত্ত্ব এ সময় গড়ে ওঠে নি।

সাধারণত যুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের (Inter war period) প্রথম দিকে ধ্যান-ধারণা ছিল আশাবাদী। তখন আশা করা হতো যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের খুঁটিনাটি ও প্রক্রিয়াগত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে একদিন বিশ্ব সরকার (World Government) গঠন করা সম্ভব হবে এবং তার মাধ্যমেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা মানুষের হাতের নাগালে আসবে। তাই আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াগত ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলোর প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রণীত কতগুলো তত্ত্বের দ্বারা বিকশিত হয়েছে। তথাপি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে একত্রীকরণের (Accumulation) ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যা রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতায় এ পর্যন্ত কোনো বড় রকমের তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে গঠনমূলক ও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা (Predict) তাত্ত্বিকগণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবুও বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক চেষ্টা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্ব ও গবেষণাকে জ্ঞানের সমষ্টিগত রূপ হিসেবে উপস্থাপিত করা।

বস্তুত চিরদিনের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুর সীমানা নির্ধারণ করা কঠিন। অধ্যাপক বার্টনের মতে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার একদিকে সংকীর্ণ ও আর একদিকে ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ অর্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের অনেক বিষয়কে আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দিয়েছে। অন্যদিক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বহু নতুন নতুন বিষয় ও সমস্যা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছে। হার্টম্যান মন্তব্য করেছেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি পাঠ্যবিষয় হিসেবে এক রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের পরিধিও পরিবর্তিত হচ্ছে।

সম্প্রতি বেইমী ও স্মিথ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার মধ্যে কতকগুলো নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমন-

- বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থতত্ত্ব।
- পরিবেশগত সমস্যাসমূহ।
- আণবিক অস্ত্রের প্রসারণ।
- জাতীয়তাবাদ।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব।
- বিশ্ব রাজনীতি ও মানকল্যাণমূলক হস্তক্ষেপ।
- আঞ্চলিকতাবাদ ও সংবদ্ধতা।
- বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থ (Global Trade and Finance)।
- দারিদ্র্য, উন্নয়ন ও ক্ষুধা।
- মানবঅধিকারসমূহ।
- নারী-পুরুষগত বিষয়সমূহ (Gender Issues)।

অধ্যাপক কুইন্সি রাইটের মতে, বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত। তবে এ সংজ্ঞায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। কারণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দলের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত। স্পষ্টত এ ধরনের সবকিছু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত হলে এগুলো পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন-জাতিপুঞ্জ, আরব লীগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ওপেক ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করি।

http://thejobstudy.com Go to Contents

কিন্তু রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা, তাই আমরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সেই রাষ্ট্রের সরকারকে স্বীকার করে নিতে পারি। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি অত্যন্ত জটিল পরিসর। এ জটিলতাকে সংঘবদ্ধ করার মধ্যে নিহিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রকৃতি ও পরিধি। বর্তমান বিশেষজ্ঞগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন জটিলতাকে সংগঠিত এবং শ্রেণিবদ্ধ করে তত্ত্ব উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আর এভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি পরিবর্তত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

১. রাষ্ট্রব্যবস্থা।
২. জাতীয় শক্তি।
৩. জাতীয় স্বার্থ পরিপূরণের মাধ্যম রূপে কূটনীতি।
৪. প্রচার ব্যবস্থা।
৫. জাতীয়নীতি প্রয়োগের অর্থনৈতিক মাধ্যমসমূহ।
৬. যুদ্ধ, যৌথনিরাপত্তা ও শক্তিসাম্য।
৭. আন্তর্জাতিক আইন ও সংঘাত।
৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের বিশ্ব পরিস্থিতি।
৯. সামরিক অস্ত্র ও মহাকাশ বিষয়ে বিশ্ব মানব সমাজের ভবিষ্যৎ।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক শাস্ত্রের ব্যাপ্তি ও বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। অনেক নতুন নতুন বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত করেছে।
- চিরদিনের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ করা শক্ত। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিশীল চরিত্র ও দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সেই কাজটিকে কঠিন করে তুলেছে।
- আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লায়নের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নতুন বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নতুন বিষয়গুলো হলো -

আন্তর্জাতিক Regimes, পরিবেশগত সমস্যা, বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা, মানবঅধিকার, নারী-পুরুষগত বিষয়, দারিদ্র্য, উন্নয়ন ও ক্ষুধা, মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ, সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

১.৬ আন্তর্জাতিক রাজনীতি (International Politics)

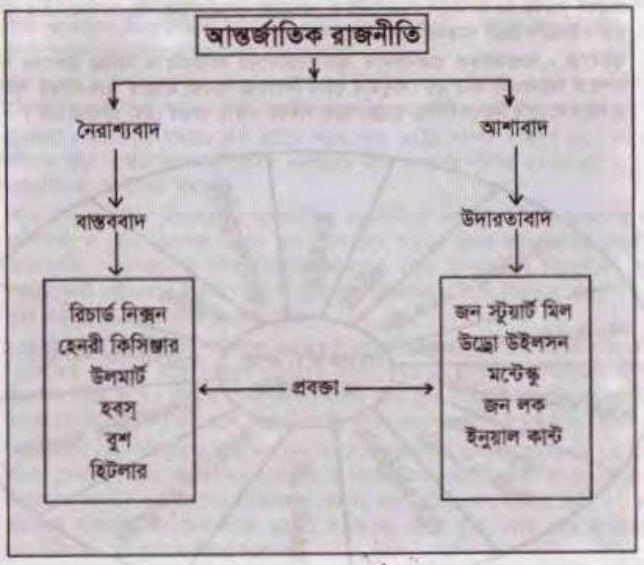
বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি মৌল বিষয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে আর তা হলো একশোর বেশি সার্বভৌম রাজনৈতিক এককের মধ্যে মানবজাতির বিভক্তি। এ এককগুলোই প্রকারন্তরে রাষ্ট্র নামে অভিহিত এবং এগুলোর সাদৃশ্য দুই-ই পরিলক্ষিত হয়। আর এ সকল রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমষ্টিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি

১.৭ আন্তর্জাতিক রাজনীতি কী?

আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষমতা অর্জন করে অপরাপর রাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। রাজনীতি মানেই হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক তথা যাবতীয় পরিকল্পনা বা নীতিগুলোকে রাজনীতি বলা যায়। আর যখন এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালতি হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলা হয়।

অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স তাঁদের বিখ্যাত International Relations গ্রন্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বলেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত কূটনীতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

করে। রাজনীতির মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধেরভাব পরিলক্ষিত হয়, তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যদি সহযোগিতার অভাব দেখা যায় অথবা সংঘর্ষই সম্পর্কের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে, তখনই আমরা তাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে পারি।



Hans J. Morgenthayu তাঁর Politics Among Nations গ্রন্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "International Politics, like all politics is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics power is always the immediate aim.

পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে মূলত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির একটি আনুষ্ঠানিক গতিশীল রূপ যা রাষ্ট্র সমূহের পারস্পারিক সম্পর্কোন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী ভূমিকা (Favorable role) পালন করে আর আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত বিশ্লেষণই হচ্ছে ক্ষমতার লড়াই ও পারস্পরিক স্বার্থগত ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস।

১. ৮ আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি
Nature and scope or subject-matter of International politics

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিবর্তনের গতিধারার সাথে তাল মেলানোর জন্য আন্তর্জাতিকতার যুগে মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সকল জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে একটি প্লাটফর্মে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আবদ্ধ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত বিশ্ব রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

নিম্নে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অন্য দেশের রাজনীতি :** একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সাথে আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কিত। তাই বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির আলোচনা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু। বিভিন্ন দেশের সরকারের কার্যাবলি, রাজনৈতিক কার্যাবলি, রাজনৈতিক দল শাসকগোষ্ঠীর কার্যাবলি প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা করে।

২. **কূটনীতি :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি ও বিভিন্ন প্রকারের কূটনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শুধুমাত্র যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা চালানো হয়।



৩. **বৈদেশিক নীতি :** বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হলো বৈদেশিক নীতি। পররাষ্ট্রনীতির উপাদান, নীতিপ্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

৪. **আন্তর্জাতিক সংগঠন :** যুদ্ধের ভয়াবহতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য করে তোলে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই আজ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ ছাড়াও বর্তমান বিশ্বে যেসব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলোও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু পরিণত হয়েছে।

৫. **আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ :** আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর নির্ভর করে মানবিক সম্পর্ক তথা ভ্রাতৃত্ববোধ। এখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. **জোটনিরপেক্ষতা :** জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এর মূল বিষয় হলো, বিশ্ব শান্তি রক্ষা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জোরালো করা যা আন্তর্জাতিক রাজনীতি অন্তর্ভুক্ত।

৭. **আন্তর্জাতিক আইন :** আন্তঃরাষ্ট্রীয় অধিকার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত এড়ানোর জন্য দরকার আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কিরূপ ভূমিকা পালন করবে তা আন্তর্জাতিক আইনে আলোচনা করা হয়।

৮. **রাজনৈতিক সচেতনতা :** বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। সে কারণে জনগণকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন করতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. **জাতীয়তাবাদ :** আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের উত্থান, রূপ ও পরিধি নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং উপনিবেশবাদকে ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০. **সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ :** সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও রূপ বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য। তাই এ বিষয়টিও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

১১. **প্রচারণা :** প্রচারণার মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয়। প্রচারণার সহায়তা ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সরকারের নীতি আদর্শের পরিচয় ঘটানো যায় না। এটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়।

১২. **শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোচিত বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। মূলত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর লড়াইয়ের ফলে জন্ম হয় শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার। এটা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

১৩. **স্নায়ুযুদ্ধ :** বিশ্ব রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী পরাশক্তিগুলোর মধ্যে যে পরোক্ষ প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় তাই হলো স্নায়ুযুদ্ধ। স্নায়ুযুদ্ধ পরিপূর্ণ যুদ্ধ না হলেও এটা শান্তিপ্রিয় মানুষকে সবসময় উদ্বিগ্ন রাখে। স্নায়ুযুদ্ধ মানে যদিও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া, তথাপি এর প্রতিক্রিয়া সবসময়ই নেতিবাচক। এটা রোধ করে বিশ্বশান্তি স্থাপন করা আন্তর্জাতিক রাজনীতির লক্ষ্য।

১৪. **নিরস্ত্রীকরণ :** মানবসভ্যতার অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো অস্ত্রের প্রসার। এ অস্ত্রের প্রসার ঠেকানোর জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরস্ত্রীকরণ একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিভিন্ন দেশ মরণাস্ত্র তৈরি করছে, যা মানুষকে সবসময় আতঙ্কের মাঝে রাখে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যোগ হয়েছে নিরস্ত্রীকরণ।

১৫. **জাতীয় শক্তি :** আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু হলো প্রত্যেক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা। এ অস্তিত্ব জাতীয় শক্তির ওপর নির্ভর করে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান লক্ষ হলো, জাতীয় শক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা আলোচ্য ক্ষেত্র যথেষ্ট ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর ক্রমেই তা ব্যাপক হচ্ছে। কাজেই একথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক যে, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনশীল বিশ্ব সম্প্রদায়েরই রাজনীতি।

১.১০ আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্প্রসারিত রূপ (Extended scope of International Politics)

একবিংশ শতকের সুবহে সাদেকের লালিমা এখনো আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘনঘটাপূর্ণ আকাশ থেকে মিলিয়ে যায় নি। দুনিয়ায় বসবাসরত বনি আদম সন্ত্রাস সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ দ্বারা নেতিয়ে পড়লেও এখনও তারা প্রত্যাশায় বুক বাঁধে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে তারা তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরবারে এক নির্ভেজাল প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে। বিশ্বের গুটিকয়েক হায়েনা সদৃশ রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধান বাদে অধিকাংশ শান্তিকামী নেতা মানুষের এ প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতিতে নিত্যনতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্যবহার করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সি, উপকরণ বা পদ্ধতিকে। বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিস্তৃত কার্যক্রমের। যে কারণে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু।

১. **বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বায়ন পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে বাড়তি উপকরণ সরবরাহ করে এ শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বিশ্বায়নের ধারণা রাষ্ট্রীয় সীমান্তের ধারণাকে লঘু গুরুত্বের বিষয় মনে করে। আন্তঃরাষ্ট্রিয় পর্যায়ে সীমান্তের প্রাচীর ভেদ করে মেধা, পুঁজি, প্রযুক্তি পণ্য অনুপ্রবেশ করবে মানুষের ভোগ ও সমৃদ্ধির জন্য। এ কারনে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গতানুগতিক বিশ্লেষণ ও বক্তব্যের ছক থেকে বের হয়ে এসে নতুন পরিভাষা ব্যবস্থাপনা, পররাষ্ট্রনীতির নবতর ফর্মুলা ও উপকরণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আর এমনি করে স্ফীত হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির শারীরিক সীমানা। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে অভিযোগও রয়েছে প্রচুর। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে ধনাঢ্যের পুঁজি অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে দিয়ে গরিব রাষ্ট্রগুলোতে শোষণবৃত্তি পরিচালনার কৌশল খাটিয়ে ওদেরকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির যাঁতাকলে পিষ্ট করাই বিশ্বায়নের কৌশলী মতলব বলে অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন।

২. **সাম্রাজ্যবাদ ও তার নতুন চ্যালেঞ্জ :** ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একচ্ছত্র বিশ্ব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গেছে ব্রিটেনসহ তার অন্যান্য মিত্র। খোদ রাশিয়াসহ অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্র আমেরিকার এ প্রতাপকে বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি পরিস্থিতি আর আগের বিন্দুতে অবস্থান করছে না। চলক চলমান থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুদ্র ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর তরঙ্গ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। কিউবা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, নিকারাগুয়া, উত্তর কোরিয়া, ইরাক, সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্তান এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরই উদাহরণ। এদের অনেকেই আমেরিকাকে ছেড়ে কথা বলছে না। ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় সাম্প্রতিক পারমাণবিক প্রস্তুতি এমনতর সাহসিকতারই প্রমাণ। সম্প্রতি ইসরাইল কর্তৃক লেবানন আক্রমণের প্রেক্ষিতে রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরোধিতা অবশ্যই তাৎপর্য বহন করে। তাই এটা পরিষ্কার সাম্রাজ্যবাদের সামনে এসব নতুন চ্যালেঞ্জ আন্তর্জাতিক শক্তি প্রসঙ্গকে নতুন ব্যাখ্যার সম্মুখীন করছে। সাথে সাথে বিস্তৃত হচ্ছে এ শাস্ত্রের কলেবর।

৩. **আন্তর্জাতিক রাজনীতির অর্থনীতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে :** শক্তি রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রাণ ভোমরা। শক্তির ভাণ্ডারি একা চলে না। আরো অনেক সহযোগী ভাণ্ডারি তাকে প্রকাশ্যে মদদ দান করে শক্তির ফায়ারেজ নিতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনি সাহায্য পেয়ে যাচ্ছে তার মিত্রদের নিকট থেকে, এতে করে ইহুদি চিন্তাবিদ এস.পি. হান্টিংটনের সভ্যতার সংকটকে সত্য প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে বাড়তি যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছে। এ যুক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুশ (Push) ও পুল (Pull) কৌশলটি কাজ করে। চাপ প্রদান কৌশল অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রেশারজাত, যা সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রেরণা দান করে, বাইরের বাজার বা সম্পদ দখল করে হলেও। টান প্রক্রিয়া সম্রাট দুষ্ট বা অগণতন্ত্র অধ্যুষিত রাষ্ট্রের সম্পদ প্রাপ্তির কৌশল সংশ্লিষ্ট। এসব রাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থানও এখানে উল্লেখযোগ্য। এর পরে সভ্যতা ও মূল্যবোধ প্রবিষ্টকরণের প্রোগ্রাম এখানে এজেন্ডাভুক্ত থাকছে, আর আদর্শ হিসেবে ইসলামকে উচ্ছেদ করার জন্য এ জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপবাদ, অপপ্রচার ও আগ্রাসন জোরদার করাও থাকছে কৌশল হিসেবে অন্তর্নিহিত। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু সভ্যতা গর্বিত সাম্রাজ্যবাদী 'ছবক' আন্তর্জাতিক রাজনীতির চিন্তার ক্ষেত্রে বাড়তি মানসিক চেতনা সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিচ্ছে।

৪. **যুদ্ধ প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতি রাজনীতি :** যুদ্ধ ইতোপূর্বে সামরিক বিজ্ঞান বা যুদ্ধবিদ্যার অংশ ছিল। কিন্তু বিস্তার লিপ্সা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবিশেষের পররাষ্ট্রনীতিতে যুদ্ধ আজ একটি শক্তিশালী উপকরণ। লেলিনের যুগ থেকে নয়, তারও পূর্ব্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিহিংসা অনুপ্রণিত জাতীয়তাবাদ ও পুঁজিবাদের মিলিত সঙ্গমে সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে থাকতে চায় পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের কৌশলময় যুদ্ধ তথা ধ্বংসের উচ্ছিষ্ট খেয়ে। ধ্বংসে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের হায়াতবর্ধন কৌশল। ধ্বংস ও যুদ্ধ হাত ধরাধরি করে চলে। যুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিরোধ প্রযুক্তিকে ঠেলে দেয় নতুন নতুন উদ্ভাবনের দিকে। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চলে আসে এমনি করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সুকুমার শরীরে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি তাই হয়ে পড়ে আগ্রাসী ধ্বংসকামী-ধর্ষকামী। এ রাজনীতি হয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক আত্মরক্ষার বাণী চিরন্তন নির্মল কিতাব। যুদ্ধ জন্ম দেয় যুদ্ধ প্রযুক্তির, যার অভিষ্ট হচ্ছে খুনখারাবি নিধনকর্ম ও পরিবেশ দূষণ। সিটিবিটির মতো বহু অস্ত্রনিরোধ

http://thejobstudy.com Go to Contents

চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে তা কোনো আমলই পাচ্ছে না। জেনেভা কনভেনশন থেকে শুরু করে জাতিসংঘের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বেসামরিক নাগরিককে যুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করার কথা বলছে, এরই সাথে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ENMOD - এর মতে যুদ্ধ থেকে পরিবেশ রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত। ফলে এ সকল বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য গিয়ে জমা হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মহাফেজখানায়। সত্যি বলতে কী, সন্ত্রাস আর মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। যে কোনো সাধারণ ঘটনায় প্রচণ্ড ধ্বংসেকামিতা যেন কতিপয় জাতির বাহাদুরি প্রদর্শনের খেলায় পরিণত হয়েছে। তা না হলে কয়জন ইসরাইলি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় মার্কিন মিত্র তামাম লেবানন ধ্বংস করে খাবে কেন।

৫. **তথ্য প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি :** তথ্য প্রযুক্তি আজ যুক্ত হয়ে পড়েছে সামরিক বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে। ফাইয়ালকা (Fialka: 1991), হারনন (Hernon: 1992), কেনেডি (Kennedy: 1993), ব্যারুডি (Baroody : 1992), এক্ষেত্রে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। সমরনীতি যেমন প্রযুক্তিনির্ভর, কূটনীতির ওপর নির্ভর করে চলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখানে নতুন নতুন উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়েছে। স্ফীত করে তুলেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

৬. **রাজনীতির নতুন ছবক :** বর্তমান যুগে শক্তিমানের শিক্ষাই শিক্ষা। তার বুদ্ধিই বুদ্ধি। বাদবাকি সব বোকামি। মানবাধিকার, সন্ত্রাস, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা যেন বৃহৎশক্তির কেতাবি বাণী। প্রকৃত বিষয় বিপরীত হতে পারে। বাদবাকি সব বোকামি। মানবাধিকার, সন্ত্রাস, গনতন্ত্র, স্বাধীনতা যেন, বৃহৎ শক্তির কেতাবি বাণী। প্রকৃত বিষয় বিপরীত হতে পারে। ক্ষুদ্র শক্তির অনৈক্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা বৃহৎ শক্তিকে অনেক ভিত্তিহীন যুক্তি দাঁড় করানো, সুযোগ দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে দুর্বল রাষ্ট্র আগ্রাসন চালাবার। এতে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে উন্মাতাল হয়ে পড়েছে তথাকথিত ক্ষুদ্র শক্তি। নতুনভাবে সৃষ্ট পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে হচ্ছে তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

১.১১ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য

Difference Between International Relation and Politics.

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট একটি জটিল সমস্যা তৈরি করেছে। কারন হিসেবে আমরা বলতে চাই যে, সত্যিকার অর্থে কোনটি ব্যবহার করা প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ও মতভেদ রয়েছে। অনেকেই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পা না। সুতরাং তারা দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। তাছাড়া উভয়ের পরিধি ও বিষয়বস্তুতে এতবেশি মিল রয়েছে যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সত্যিই দুরূপ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও আমরা উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করব:

১. পামার ও পারকিনস এর মত সংকীর্ণ অর্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো আন্তর্জাতিক সমাজের রাজনীতি। কূটনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে বিশে-ষণ নিয়েই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু গঠিত হয়। আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সম্পর্ক। সে বিচারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি অনেক ব্যাপক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কেই আলোচনা করে না, অরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিষয়েও আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক সম্পর্কও বিশে-ষন করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমিত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি মতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আর মতার সাথে বিরোধের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই বলা হয় সম্পর্ক শব্দটি সহযোগিতার আর রাজনীতি শব্দটি বিরোধিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. আন্তর্জাতিক রাজনীতি (International Politics) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত। সুতরাং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় আর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবহৃত হয় একটু ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে।

৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতি সাধারণত কূটনীতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘাতের ভাবটা থেকেই যায়। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহিঃবিশ্বের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। এ আলোচনা দ্বন্দ্বমূলকও হতে পারে আবার সহযোগিতামূলক হতে পারে। পামার ও পারকিনস তাই বলেছেন, "Internationanl relations' is a broader term than 'International Politics' and that its study is being enriched by the wider and more versatile apprach currently being pursued."

৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা সাধারণত সরকারি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। সরকারের প্রচেষ্টায় এবং সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি। কিন্তু হার্টম্যান বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জাতীয় সীমানার বাইরে বিস্তৃত। আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণ বেসরকারি বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত।

৫. আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূল প্রতিপাদ্য হলো রাষ্ট্রীয় ও সাংগঠনিক বিষয়বস্তু আর রাজনীতি মতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু সম্পর্ক সাধারন সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক যেমন- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক, শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করে।

৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাষ্ট্র শব্দটি ব্যাপক অর্থ ব্যবহৃত হয়। এখানে রাষ্ট্র বলতে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বুঝায় না, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক জোটকেও বুঝায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

৭. সি.এফ. অলজার (C.F. Alger) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে দুটি ধারণা পোষন করেছেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পণ্য করা। যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন তাদের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের সাথে সংশি-ষ্ট। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, আইন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংগঠন, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এলাকা বিস্তৃত।

৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় বহু ব্যাপক। আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতির সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। সে কারণেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে এসব সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম লেখক Hns. J. Morgenthau আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক রাজনীতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

১.১২ জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
National Political and International Politics

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূল উপাদান হলো স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিতভাবে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আর সে কারণেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা আলাদা। জাতীয় রাজনীতিও আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র। জাতীয় রাজনীতি সাধারণত একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত। জাতীয় রাজনীতির প্রধান উপাদান হলো জাতীয় শক্তি। জাতীয় শক্তির স্থায়ী ও অস্থায়ী উপদানগুলো একত্রে জাতীয় রাজনীতির চরিত্র নির্ধারণ করে। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতি। তবে যে সব রাষ্ট্র

জাতীয় রাজনীতিতে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেছে তারাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

১. **উৎপত্তিগত দিক :** উৎপত্তিগত দিকে দিয়ে বিচার করলে জাতীয় রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বয়সে প্রবীণ। যখন থেকে পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব তখন থেকেই জাতীয় রাজনীতির সূচনা, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিকাশ জাতীয় রাজনীতির অনেক পর। কেননা একটি রাষ্ট্র প্রথমে জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

২. **পরিধিগত দিক :** জাতীয় রাজনীতির তুলনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ব্যাপক। একটি রাষ্ট্রের আয়তন যতদূর বিস্তৃত তার জাতীয় রাজনীতিও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিস্তৃতি সারাবিশ্ব জুড়ে।

৩. **ব্যাপকতা :** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জাতীয় রাজনীতি হলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার একটি উপাদান বা input আর আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল একটি ব্যবস্থা। জাতীয় রাজনীতির প্রভাব আয়তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে গোটা বিশ্বের মানুষ প্রভাবিত হয়।

৪. **স্বাধীনতা ও সহযোগীতা :** জাতীয় রাজনীতির মূল লক্ষ্য হলো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ স্থানে আগ্রহী হয়ে উঠে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সংকুচিত করতে চায় না। একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রই সমান। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তঃনির্ভরশীলতা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু একটি দেশের জাতীয় রাজনীতে কূটনীতিতে তেমন কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে।

৫. **স্থিতিশীলতা ও অস্থিতিশীলতা :** জাতীয় রাজনীতি সাধারণত স্থিতিশীল হয়। তবে বিশ্বের সকল দেশেরই জাতীয় রাজনীতি স্থিতিশীল ভাবা ঠিক নয়। যেসব দেশের জাতীয় রাজনীতি স্থিতিশীল তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর পরিবর্তনশীলতা ও সংঘাতময়তা। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

৬. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক :** জাতীয় রাজনীতি কেবল জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন: রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন, জনমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ও ঘটনাবলী যেমন : জাতিসংঘ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, বিশ্বশান্তি, যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

৭. **নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ :** জাতীয় রাজনীতি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারের ধরন যেরূপই হোক না কেন সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না। অপরদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনার জন্য কোন বিশ্ব সরকার নেই যদিও অনেকেই জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিভাবক বলে মনে করেছেন। কিন্তু সরকার আইন ভঙ্গকারীকে যেভাবে শাস্তি প্রদান করতে পারে জাতিসংঘ তা পার না। জাতীয় রাজনীতি পরিচালিত হয় সংশি-ষ্ট দেশের আইন দ্বারা। জাতীয় আইনে সকলকে সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। অপরদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালত হয় আন্তর্জাতিক আইন তথা মানবাধিকার দ্বারা। মানবাধিকারের ধারণা স্পষ্ট নয় এবং সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

মূল্যায়ণ: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়ই পরিবর্তশীল। পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি থেকে অপরটি ভিন্ন। তবে এ ভিন্নতার মূল যে

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Brief Questions & Answer)

০১. আন্তর্জাতিক রাজনীতি কী?
উত্তর: যে শাস্ত্র বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি এবং এসব নীতির কার্যকারিতা ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে তাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলে।

০১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কী?
উত্তর : দুই বা ততোধিক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ধরনের সম্পর্ক।

০৩. 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অংশবিশেষ।'-কে বলেছেন?
উত্তর: পামার ও পারকিন্স।

০৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল পার্থক্য কী?
উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধু রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, আর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক, অ-রাজনৈতিক উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

০৫. 'Politics Among Nations'এর লেখক কে?
উত্তর: হ্যান্স জে. মরগ্যানথু।

০৬. 'International Relations' এর লেখক কে?
উত্তর: পামার ও পারকিন্স।

০৭. আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য কী ?
উত্তর: বহিঃরাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

০৮. আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী ?
উত্তর: ক. নির্দিষ্ট সীমানা; খ. বহুমুখী শক্তিসাম্য; গ. যুদ্ধ ও শান্তি এবং ঘ. নির্দিষ্ট কাঠামো।

০৯. হ্যান্স জে. মরগ্যানথু কোন গ্রন্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও আলোচ্যবিষয়ের উপর বিস্তৃত বিবরণ দেন?
উত্তর: 'Politics Among Nations'.।

১০. বিশ্বের সব রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্রনীতি ও তাদের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কোন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়?
উত্তর: আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

১১. অধ্যাপক গ্রেসন কার্ক কয়টি বিষয়কে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ?
উত্তর: ৫টি।

১২. ভিনসেন্ট ব্যাকার তার রিপোর্টে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত কয়টি বিষয়ের উলে-খ করেছেন ?
উত্তর: ৭টি।

১৩. অধ্যাপক কুইনসি রাইট কোন গ্রন্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ব্যাখ্যা করেছেন ?

http://thejobstudy.com Go to Contents

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংজ্ঞা দাও।
(খ) আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?

২. (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু লিখ।
(খ) আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি বর্ণনা কর।

৩. (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সম্পর্কের পার্থক্য কী ?
(খ) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ইতিহাসের সাদৃশ্য কী?

৩. (ক) মরগ্যানথু কোন বিষয়গুলোকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধিভুক্ত করেছেন ?
(খ) অধ্যাপক কুইনসি রাইট আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি হিসেবে কোন বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ?

৪. (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী ?
(খ) আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যার প্রকৃতি কোন ধরণের ?

৫. (ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান কী কী ?
(খ) জাতীয় রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য কী?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝেন ? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি কী প্রসারিত হচ্ছে? যুক্তি দিন।

২. আন্তর্জাতিক রাজনীতির ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যকার সম্পর্ক পার্থক্য লিখুন।

৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে কী বোঝেন? বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সম্প্রসারিত রূপ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন? বর্তমান বিশ্বে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব কিরূপ?

৫. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিরোধ বা সংঘাতের প্রকৃতি কিরূপ?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ২

বিশ্বে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী চলকসমূহ
Actors in the World

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

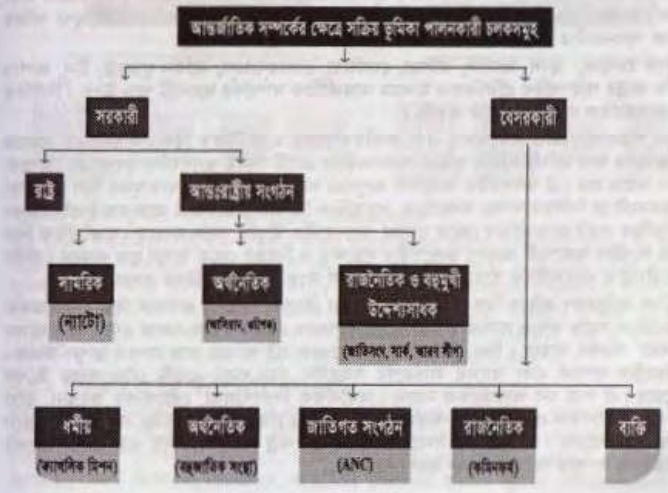
২.১ ভূমিকা
২.২ সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী
২.২.১ সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের শ্রেণীবিভাজন
২.২.২ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা
২.৩ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী
২.৩.১ অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীগণ
২.৩.২ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী (Non State actors) হিসেবে স্বীকৃতি শর্ত
২.৩.৩ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারীদের শ্রেণীবিভাগ
২.৪ আধুনিক রাষ্ট্র
২.৪.১ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী
২.৪.২ অপরিহার্য কার্যাবলি
২.৪.৩ ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি
২.৫ রাষ্ট্র কাকে বলে
২.৫.১ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা
২.৬ রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ
২.৭ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহ
২.৮ সামাজিক চুক্তি মতবাদ
২.৯ হবস্, লক্ ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ
২.৯.১ টমাস হবসের মতবাদ
২.৯.২ জন লকের মতবাদ
২.৯.৩ রুশোর মতবাদ
২.১০ রাষ্ট্রের প্রকারভেদ
২.১১ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
২.১২ নিরাপত্তা কী
২.১২.১ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত হুমকি
২.১৩ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার কৌশল
২.১৪ রাষ্ট্রের কার্যাবলি/আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি
২.১৪.২ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি
২.১৫ আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্র ও এর উপাদান
২.১৫.১ রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ
২.১৬ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড
২.১৬.১ রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের গঠন
২.১৬.২ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জনের পন্থাসমূহ
২.১৭ কল্যাণ রাষ্ট্র এবং বৈশিষ্ট্য/কার্যাবলি

২.১ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বাস্তব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, এখানে অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী (Actors) আছে। তাদের ক্রিয়া-কলাপ, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া এবং সম্পর্কের দ্বারাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি আবর্তিত হয়। বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থার কার্যকলাপের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সচলতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু সকল সংস্থাই সমভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাদের মধ্যে কোন কোন সংস্থা ও সংগঠনের ভূমিকা অন্যের তুলনায় বেশি সক্রিয় ও প্রভাবশালী। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি যে সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয়, জাতিগত সঙ্ঘ এবং সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তারাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী নামে পরিচিত।

২.২ সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী (Actors)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীর ধারণা সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠেছে। তবে এই ধারণা বর্তমানে ব্যাপকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী বলতে আপেক্ষিকভাবে স্বাধিকার সম্পন্ন সংস্থা বা এককে বোঝায়। ঐ সব স্বাধিকার সংস্থা অন্যান্য স্বাধিকার সম্পন্ন সংস্থার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীর স্বাধিকার বলতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও তার গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্যকে বোঝায়। কোন ভূমিকা পালনকারীর সক্রিয়তা এবং প্রভাব কতটা কার্যকর হবে তা নির্ভরশীল সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পালনকারীর সামর্থ্যের উপর। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং ধারনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কোন ভূমিকা পালনকারীর পক্ষেই সর্বতোভাবে নিজের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যের আচরণ এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূৎ-কৌশলগত দিক থেকে প্রত্যেক ভূমিকা পালনকারীকেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই স্বাধিকার অন্যের সহযোগিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।



২.২.১ সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের শ্রেণীবিভাজন

সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের ২ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। রাষ্ট্র (State as actors) এবং অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী (Non-State actors) অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের পুনরায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারী সংস্থা (Inter-State Governmental Organisations) অথবা অতি-জাতীয় সংস্থাসমূহ (Supra-national Organisations): আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারী সংস্থাসমূহ (Inter-State Non-Governmental Organisations) ভাগ করা যায়। একাধিক রাষ্ট্রে কার্যকলাপের সূত্রে জড়িত সংস্থাসমূহ (Trans-national Organizations) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বে-সরকারি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ফ্রাঙ্কেল যে সব সংস্থাকে একাধিক রাষ্ট্রে কার্যরত সংস্থা (Trans-national organisation) নামে অভিহিত করেছেন তাকে কোন কোন লেখক উপ-জাতীয় (Sub-national) সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীরূপে (The individual as a actor) স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

২.২.২ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেজগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা রাজনীতির রূপান্তর রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ইতিহাস এবং তার রূপান্তর বিশ্লেষন করলে এই ধারণাই স"ষ্টি হবে যে, রাষ্ট্রই হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ, সংগঠিত এবং প্রভাবশালী। দীর্ঘকাল ব্যাপী রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গতিশীল এবং ফলপ্রসূ করে তুলেছে। রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রীয় বা মুখ্য বিবেচ্য বিষয় রূপে বিবেচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক জীবন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে একেই প্রাধান্যকারী ভূমিকা-পালনকারী রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

আধুনিকালে রাষ্ট্র বলতে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে কেন্দ্রিক সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রকে বোঝায়। ভূ-খন্ড কেন্দ্রি সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র মানব সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসের শুরু থেকেই একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে যে রাষ্ট্র- ব্যবস্থার বীজ রোপিত হয়েছিল তা বিংশ শতাব্দীতে এক বিশাল মহীরূপে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই যে মুখ্যতর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিধারা প্রবাহিত হয়, সেই বিষয়ে এখন অনেকেই একমত। বর্তমানে ভূ-খন্ড কেন্দ্রিক সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রই অন্য সকল সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীর তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় এবং সফল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরম্পরাগত বা সাবেকী বিশ্লেষণে এই কারণে রাষ্ট্রই মুখ্য সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীর শিরোপা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

অতীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, বেলজিয়া, নেদারল্যান্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারনাটি গড়ে উঠত। নির্ধারিত হত আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রকৃতি।

রাষ্ট্রের সক্রিয়তার ভিত্তি সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত ছিল। আন্তর্জাতিক সমাজে অংশগ্রহনের জন্য প্রতিটি সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীকে একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মুখপাত্রের যোগ্যতা অর্জন করতে হত। ঐ জনসমষ্টির স্বাভাবিক আনুগত্য লাভও তার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। তাছাড়া ঐ জনসমষ্টিকে বিশিষ্টতাসম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক- সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হত। এই ধরনের রাজনৈতিক সত্তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারীর স্বীকৃতি অর্জন করেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত জনগোষ্ঠী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত থাকবে। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব ও জনগোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রাজনৈতিক সংস্থা বা রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

আধুনিক তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে বিশ্ব-সমাজের সদস্যরূপে বিশ্লেষণ করেন। বর্তমানে বিশ্ব-সমাজ অথবা আন্তর্জাতিক সমাজ বলতে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়কে বোঝায়। বিশ্ব-সমাজ একটি 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' পরিণত হয়েছে। নিজ নিজ প্রয়োজনে প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং তাদের আচরণের সর্বজনীন ধরন-ধারণ একটি যৌথ সত্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে। ঐ সত্তা হল আন্তর্জাতিক সমাজ। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক সমাজের ভিত্তিই হল রাষ্ট্র। এই কারণেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু হওয়া প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় ভূ-খন্ড কেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্রই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। বিগত তিন শতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রই ছিল আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ, আচরণ, সিদ্ধান্ত ও নীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া, সংঘাত ও সম্পর্কে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি আবর্তিত হয়। রাষ্ট্রই ছিল একচ্ছত্র প্রধান্যকারী ভূমিকা পালনকারী। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রসমূহের সংহতির ফলে এমন একটি ধারণার স"ষ্টি হয়েছিল যে, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থায়ী ও চিরন্তন সংস্থার রূপ ধারণা করেছে। কিন্তু বিগত সাত দশক ধরে জাতীয় দায়বদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপ ও পরিবর্তনের ফলে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীরূপে রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র প্রাধান্যের অবসান ঘটেছে।

মূল্যায়ন

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীর আবির্ভাব ঘটেছে। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিযোগী সংগঠন ও সংস্থায় পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক মোর্চা ও জোটগঠন, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন, ঠাণ্ডাযুদ্ধ, দ্বি-মেরুপ্রবণতা, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, মারণাস্ত্র উৎপাদন, মতাদর্শগত ঐক্য, আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন রাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়েছে। কোথাও নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য, কোথাও বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে রাষ্ট্রকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়েছে। রাষ্ট্রের এই অবস্থাকে- ভূ-খন্ড কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সংকট হিসাবে অভিহিত করা হয়।



২.৩ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী (Non State actors)

রাষ্ট্র ছাড়াও বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আরও অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী আছে। যাদের অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী রূপে অভিহিত করা হয়। এই সকল সংস্থা বা সংগঠন রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালনকারীকে পরিণত হয়েছে। এদের বাদ দিয়ে সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যে সকল অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী সংস্থা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত বিষয়ে ও উক্ত রাষ্ট্রের জনসাধারনের স্বার্থ ও আনুগত্যের প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র তারাই রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থায় পরিণত হতে পারে।

২.৩.১ অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীগণ

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র এককভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক সংগঠন ও গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চার্চ, স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সংস্থা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন। যেমন- আসিয়ান, জাতিসংঘ, বহুজাতিক কোম্পানী ইত্যাদি ভূমিকা বর্তমানে আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এগুলোকেই বলা হয় অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী (Non State Actors)।

২.৩.২ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারী (Non State actors) হিসেবে স্বীকৃতি শর্ত

ক. অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা সংস্থাটিকে এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে যেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব বজায় থাকে;

খ. অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণকালীগণ কর্তৃক গুরুত্ব দিতে হবে এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা স্বীকার করতে হবে;

গ. অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীর নিজস্ব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের স্বাধীনতা থাকবে। কো-অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকাপালনকারী তখনই গুরুত্ব অর্জন করে যখন রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের কৌশলের বা রণনীতি ও রণকৌশলের বিন্যাসে এদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ কর।

২.৩.৩ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারীদের শ্রেণীবিভাগ

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজগণ অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যোসেফ ফ্রাঙ্কেল অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পারনকারীদের ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন:

ক. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারী সংস্থা;

খ. আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারী সংস্থা;

গ. কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই,

এমন জাতীয় সীমানার বাইরে কার্যরত সংস্থাগুলি। হলস্টি অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের তিনটি শ্রেণীভূক্ত করেছেন। এদের মধ্যে আছেঃ নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের মধ্যে অবস্থিত অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী; নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডের মধ্যে আবদ্ধ এমন অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং আন্তঃসরকারী সংস্থা। প্রথম দুটি শ্রেণীর সংস্থাকে বে-সরকারী সংস্থা এবং তৃতীয়টিকে আন্তঃসরকারী সংস্থা নামে বিবেচনা করা হয়। কোন বিশেষজ্ঞ পুনরায় অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের অতি-জাতীয়, রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে কর্মরত সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী, উপজাতীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী রূপে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি রূপে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

উপরি-উক্ত মতামতের ভিত্তিতে অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের দুটি ব্যাপক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এদের পুনরায় প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েকটি উপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম একট কার্যগত বৈশিষ্ট্য হল অতি-জাতীয় রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের উদ্ভব। মতাদর্শগত আন্দোলন হল তার একটি উপাদান। রাজনৈতিক মতাদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক সীমানা ভেঙ্গে দেয়। ধর্মীয়, মতাদর্শগত এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ এই ধরনের অ-রাষ্ট্রীয় ও অতি-জাতীয় ভূমিকা পালনকারী। আরব লীগ, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (OIC), প্যালেস্টাইন কোন একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নিজেদের ক্রিয়াকলাপকে আবদ্ধ রাখে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্যা, স্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন একটি জাতীয় আন্দোলন রূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জণ করেছে।

১. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক: আন্তঃ রাষ্ট্রীয় বে-সরকারী সংস্থার মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সংস্থা মুখ্যত ধর্মীয়। কিন্তু ইতালি, জার্মানি, সাইপ্রাসসহ অনেক দেশের রাজনীতিতেই এই সংস্থার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অ-রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে এবং বিশেষ কোন রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই এমন সংস্থার মধ্যে ক্যাথলিক চার্চ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐ চার্চের প্রশাসনিক দপ্তর রোমে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার প্রভাব সকল দেশেই পরিব্যাপ্ত। রোমের এই চার্চকে ভ্যাটিকান নাম উল্লেখ করা হয়। প্রায় ১৮০টি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্যাটিক্যানের কুটনৈতিক সম্পর্ক আছে। ভ্যাটিকান বা রোমান ক্যাথলিন চার্চের প্রশাসনিক কাঠামো ক্রয়-স্তর-বিন্যস্ত। বিভিন্ন দেশের রোমান ক্যাথলিন চার্চ তার নির্দেশ পালনে বাধ্য। রোমান ক্যাথলিন চার্চ আপাতদৃষ্টিতে অ-রাজনৈতিক। কিন্তু ক্যাথলিন-অধ্যুষিত কার্যকলাপ অত্যান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে পোল্যান্ডে সলিডারিটির সঙ্গে সরকারের বিরোধ পোপ মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৫৯৪ সালে ক্যাথলিন-বিরোধী খ্রীষ্টানগণ চার্চসমূহের বিশ্ব পরিষদ প্রতিষ্ঠা করলেও তার প্রভাব মেয়াদ রোমান ক্যাথলিন চার্চের মতো এত ব্যাপকতা লাভ করে নি। ক্যাথলিন চার্চের কার্যাবলীকে জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী কার্যাবলী রূপে গণ্য করা হয়। কারণ, এর কোন শাখা বিপদগ্রস্থ হলে

সেই শাখা সমস্ত সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য সাহায্য লাভ করে। ক্যাথলিন চার্চের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিরবচ্ছিন্ন সংশ্রব নেই। তবে কখনও কখনও রাজনৈতিক যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বশান্তি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রকৃতি সম্পর্কে পোপ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই মতামত বিশ্বব্যাপী রোমান ক্যাথলিন সাধারন মানুষ এবং নীতি-নির্ধারণকারীদের মতামত প্রভাবিত করতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মালম্বী বা হিন্দুদের এই ধরনের প্রভাবশালী কোন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন নেই।

২. শ্রমিক সংঘ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক: শ্রমিক সংস্থাও জাতীয় গ- অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংস্থা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের জন্য উৎসাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকদের দুটি বিশাল অ

আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। একটি হল সমাজতন্ত্র মতালম্বীদের দ্বারা প্রভাবিত World Fedaratation of Trade Unions (W.F.T.U) এবং অপরটি হল পুঁজিবাদী দেশ প্রভাবিত International Confederation Trade of Free Trade Unions (I.C.F.T.U.)। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাসমূহের প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এরা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না। কিন্তু এদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন অনেক ক্ষেত্রে এই সকল সংস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অব ফ্রী ট্রেড ইউনিয়ন যথাক্রমে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতি-প্রভাবিত সংস্থা। বর্তমানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বে-সরকারী সংস্থাগুলির সংস্থা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বে-সরকারী সংস্থার মধ্যে ধর্মীয়, পেশাদারী, শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল, বৃত্তি-ভিত্তিক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। বিভিন্ন দেশে জাতি এবং উপজাতীয় গোষ্ঠী, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও সক্রিয় ভূমিকাকারীর ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইহুদিনের সংগঠিত গোষ্ঠী ঐ সকল দেশের নীতি- নির্ধারণকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আরবদের অনুকূলে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধা সৃষ্টি করে। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন (P.L.O) একটি বিশেষ ধরনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বে-সরকারী সংস্থারূপে অভিহিত করা যায়। কোন মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য ছাড়াই এই সংগঠনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। এমন কী বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘেও তাকে পরিদর্শকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্যালেস্টাইনের ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন অর্জনে এই সংস্থাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৩. অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবে বহুজাতিক কোম্পানী ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক: বহুজাতিক সংস্থার নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র বিভিন্ন দেশে প্রসারিত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে তারা কার্য-পরিচালনাকারী দেশের অর্থনৈতিক নীতিকেই কেবল প্রস্তাবিত ও নিয়ন্ত্রন করে না; ঐ সব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে থাকে। কারণ বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিদেশে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি অনুকূল মনোভাবপন্ন একটি সরকারই দাবি করবে। এইজন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের স্বার্থের প্রতি অনুকূল মনোভাবপন্ন একটি সরকারই দাবি করবে। এজন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। কখনো কখনো ঔসব সরকারের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগ গ্রহন করে। লাতিন আমেরিকায় রাজনীতির ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার এই ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই সব সংস্থা একদিকে চাপ দিয়ে সরকারের মাধ্যমে নিজেদের অনুকূল অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে সরকারকে চাপ দেয়। দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলি এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে অস্বীকৃত হলে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ফলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি জাতীয় সার্বভৌমকতা ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়।

৪. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক: আন্তঃরাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী সংস্থাও সার্বভৌম ভূ-খন্ড কেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে ক্ষুন্ন করেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন এবং তার সদস্যপদ গ্রহন করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই সব সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৯ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২২০টি। ১৯৮৩ সালে তা দাঁড়ায় ৩৩০টিতে। এই সব সংস্থাকে সামরিক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং বহু উদ্দেশ্যসাধক সংস্থায় বিভক্ত করা যায়। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে আছে আসিয়ান (ASEAN), পূর্বতন কোমেকন (COMECON), সেন্ট্রাল

আমেরিকান কমন মার্কেট, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব শ্রমসংস্থা (ILO), নাফতা (NAFTA), আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ইত্যাদি। বহু উদ্দেশ্যসাধন সংস্থার মধ্যে আছে আফ্রিকার ঐক্যসংস্থা (O.A.U), সার্ব ও এ. এস. (O.A.S Organisation of American States)।

এই সকল সংস্থার সদস্যপদ গ্রহনের সঙ্গে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রকে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিতে হয়। এর ফলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজের একক ইচ্ছানুযায়ী চলার কোন অধিকার থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ন্যাটোর বাহিনীতে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে সেনা পাঠাতে হয়। ন্যাটো ভুক্ত কোন দেশ আক্রান্ত হলে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে। ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল মারাকাশে গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরের ফলে স্বাক্ষরদানকারী সকল রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী আর বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণ করতে পারবে না। বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এমনকি দেশের অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৫. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রে নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডগত ব-খন্ডতাকে ধ্বংস করছে। আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তান সামরিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স এর (ও.ঋ.ও) যোগ আছে বলে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়। ১৯৯৩ সালে মোম্বাইতে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে এবং ২০০৮ সনে মুম্বাইয়ে সশস্ত্র হামলায় এই সংস্থায় হাত আছে বলে মনে করা হয়। অনেক সময়ে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে মদত দেবার অভিযোগ উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্য আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (ও.জ.অ) সাইপ্রাসে গ্রীক ও তুর্কি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, শ্রীলঙ্কার এল.টি.টি.ই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি আল কায়েদা ও আই এস আলোচিত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। এদের শাখা অনেক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে এখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিরোধী আন্দোলন রূপেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৬. আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন রাষ্ট্রের সার্বকৌ কর্তৃত্ব ও ভূমিকাকে পরিবর্তিত করেছে। আন্তর্জাতিক আইন বলতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার নির্দিষ্ট নিয়মাবলীকেই বোঝায়। আন্তর্জাতিক চুক্তি-সন্ধি, সম্মেলন, পারস্পরিক বোঝাপড়া, কনভেনশন, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় প্রভৃতির সমন্বয়েই আন্তর্জাতিক আইন গড়ে ওঠে। প্রতিটি সভ্য-রাষ্ট্র এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ এই বিধি প্রতিটি সভ্য-রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ ও লঙ্ঘন করলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। এই কারণে বাধ্য হয়েই প্রতিটি রাষ্ট্রকেই নিজের স্বার্থেই আন্তর্জাতিক আইন মান্য করতে হয়।

জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যরূপে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই সনদে নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। স্বেচ্ছাকৃতভাবেই কোন রাষ্ট্র সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। আবেদন মঞ্জুরের অর্থ হল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সনদে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে।

মূল্যায়ন: অনেক সময় সরকার এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সরকারী সংস্থাগুলি এই সব বে-সরকারী সংস্থার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাগুলি এইসব আন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বে-সরকারী সংস্থা কোন রাষ্ট্রের সাহায্য ও অনুমোদন ছাড়া কার্য সম্পাদন করতে পারে না। আন্তঃরাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির ফলে এই সংস্থার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে।

২.৪ আধুনিক রাষ্ট্র (Modern State)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাষ্ট্র। সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করেছে তার মধ্যে সর্বো"চ এবং শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বাস্তব রাজনৈতিক সংগঠন। সমাজ জীবনের এক পর্যায়ে মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা ও সমাজে শান্তি শ"ঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে কালের বিবর্তনে মানুষের এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

আধুনিক রাষ্ট্র 'রাষ্ট্র' নামক শব্দটি অসাবধানবশত প্রচলিত অনেক শব্দের মত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্র শব্দটি 'সরকার', 'দেশ' 'সমাজ', 'জাতি', শব্দগুলোর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'রাষ্ট্র' শব্দের বিশেষ বৈজ্ঞানিক অর্থ রয়েছে।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় আধুনিক রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টি যারা কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নিজস্ব সরকারের অধীনে বসবাস করে। আধুনিক রাষ্ট্র জাতি রাষ্ট্র এবং একটি সার্বভৌম সংঘ। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম দিকপাল ম্যাকিয়াভেলী সর্বপ্রথম তার রাজনৈতিক দর্শনে রাষ্ট্র কথাটির উল্লেখ করেন।

২.৪.১ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কার্যবালী শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে অধ্যাপক্ষ গার্নার রাষ্ট্রের এ কার্যাবলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

প্রথমত, মৌলিক বা একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলী, যা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সম্পাদন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক কার্যাবলি, সেগুলো অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, রাষ্ট্র এসব কার্য সম্পাদন নাও করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রকে তাদের প্রতি উদাসীন হলে চলবে না।

তৃতীয়তঃ ঐচ্ছিক কার্যাবলি যা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নয় এবং স্বাভাবিক নয়। আধুনিককালে কিন্তু গার্নানের ঐ শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে উদারপন্থী ও মধ্যপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জনকল্যাণের সর্বাধিক লক্ষ্য অর্জনের দৃষ্টিকোণ হতে রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মধ্যে গেটল ও উইলোবি এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

ক. মৌলিক বা মুখ্য বা অপরিহার্য কার্যাবলি এবং

খ. ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাধীন বা গৌন কার্যাবলি।

২.৪.২ অপরিহার্য কার্যাবলি

রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব ও সংহতি এবং জনগনের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে যে সকল কাজ করতে হয়, তাকে অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি বলে। এ সকল কাজ সম্পন্ন না করলে রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে। অপরিহার্য কার্যাবলির প্রকৃতি নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং নাগরিকগণের পারস্পরি সম্পর্কের ভিত্তিতে। নিচে আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক বা অপরিহার্য কার্যাবলি আলোচনা করা হলঃ

১. দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। দেশরক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য রাষ্ট্র স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং তাদের বেতন ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

২. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রতিবেশী ও দূরের রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সামরিক চুক্তি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৈত্রী ইত্যাদি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

৩. অভ্যন্তরীন আইন শ"ঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সংহতি রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ আইন শ"ঙ্খলা রক্ষা করা অপরিহার্য। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র আইন শ"ঙ্খলা বিধান করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করে।

৪. প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলির মধ্যে প্রধান কাজ হল প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন। দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে প্রশাসন কাঠামো নির্মাণ এবং একদল স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ ও

পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্র তার প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে খাজনা ও কর আদায় করে, বাজেট প্রণয়ন করে এবং মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

৫. আইন প্রণয়ন ও বিচার সংক্রান্ত কাজঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় বিচারের মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার আদালতে গঠন ও পরিচালনা করে।

৬. অর্থনৈতিক কার্যাবলিঃ রাষ্ট্রে সকল কার্যাবলি যথার্থভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ জন্য বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ ও তার সুষ্ঠুভাবে আদায় করা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

৭. উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ রাষ্ট্রের একটি অন্যতম কাজ। তাই বর্তমান কালের রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা নাগরিকদের যথার্থ উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। আর এ জন্য সরকারকে কোটি কোটি দেশী ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

৮. জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানঃ রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণ যাতে অত্যন্ত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে বাস করতে পরে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার জনগণের জানমালের বিধান করে থাকে।

২.৪.৩ ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি

যে সকল কাজ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়, অর্থাৎ যে সকল কার্যাবলি রাষ্টের পক্ষে অবশ্যই করণীয় নয়, তবে সমাজরে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য করতে হয়, সেগুলোকে ঐচ্ছিক বা গৌন কার্যাবলি বলে। জনগরে সুবিধার্থে এবং সমাজজীবনের পূর্ণতার জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন কল্যানমূলক কার্য সম্পাদন করতে হয়। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এগুলোর গুরুত্ব অত্যাধিক। মোটকথা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিজীবনের বহুমুখী উন্নয়ন সাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্র যে কার্যাবলি পালন করে থাকে, সেগুলোকে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক বা গৌণ কার্যাবলি বলা হয়। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যের পরিমাণ ও পরিধি দিনদিনই বেড়ে চলেছে।

সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ (১) সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক কার্যাবলি।

১. **সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীঃ** যে সব কার্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হলে সমাজে নানাপ্রকার অন্যায় অবিচারের প্রবল সম্ভাবনা থাকে, কিংবা যেগুলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন অনেক বেশি সুদক্ষভাবে পরিচালত হবে বলে মনে করা হয় সে সব কাজকে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাজ বলে বর্ণনা করা হয়। রেলপথ নির্মাণ, বিমানপথ পরিচালনা, রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত, খাল খনন, সেতু নির্মাণ, হাটবাজার বাণিজ্য পরিচালনা প্রভৃতি কার্যাবলিকে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক কাজগুলো সাধারণত সমাজকল্যাণমূলক। এগুলো জনগণ বা সরকার কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

২. **অসমাজতান্ত্রিক কার্যাবলিঃ** রাষ্ট্রের যে সকল কাজ কনস্বার্থের অনুকূলে অর্থাৎ যেগুলো জনসাধারণের কার্যের কোন সীমা নির্ধারণ করে না, বরং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর দ্বারাই এগুলো নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে, সেগুলোকে রাষ্ট্রের অসমাজতান্ত্রিক কাজ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি, জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কার্যাবলি, দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের সেবা ও সাহায্য করা প্রভৃতি।

তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় অনেক জনকল্যাণকর কার্য সম্প্রতি প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সম্পন্ন হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তার, শিল্প ও কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যাবলি এভাবে উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সন্তোষজনক ফর লাভ করেছে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক কার্যাবলির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা আজ অস্পষ্ট। এক দেশে যা সমাজতান্ত্রিক কাজ, অন্য দেশে তা অসমাজতান্ত্রিক কাজ বলে গণ্য হতে পারে। যাহোক, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলি উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

নিচে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

১. **শিক্ষামূলক কার্যাবলিঃ** রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ হল শিক্ষামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করা।

আধুনিক রাষ্ট্রকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করতে হয়। তাছাড়া নারী শিক্ষার প্রসার, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি ও নিরক্ষতা দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হয়।

২. **জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ** জনস্বাথ্য সংক্রান্ত কাজ করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম কাজ। জনগণই রাষ্ট্রের সম্পদ। সুস্থ ও সবল জনস্বাথ্য রাষ্ট্রের গৌরব। ফলে রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে হাসপাতাল, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃসদন কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও তার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঔষধপত্র সরবরাহ, ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ, জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রচারপত্র বন্টন প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলির আওতাধীন।

৩. **ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ** আধুনিক বিশ্ব দিন দিনই শিল্প বিকাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রসমূহ শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে শিল্পতিদের উৎসাহ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্প্রসারণ রাষ্ট্রীয় কার্যের আওতাধীন।

৪. দরিদ্রদের সাহায্য সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ দরিদ্র জনসাধারণের সন্তানসন্ততির লেখাপড়ার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে কার্য করে। বিনামূল্যে দুস্তদের বই পুস্তক প্রদান, অর্থ প্রদান, বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ প্রভৃতি কার্য করে। তাছাড়া তত্ত্বাবধান রাষ্টীয় কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

৫. শ্রমিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ প্রকার কার্য করছে। তাদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতা, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির মত জরুরী বিষয়ের নিরাপত্তা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সময়, মেয়াদ, মজুরী, নির্ধারণ ও শ্রমিক বিরোধের মীমাংসার জন্য 'মজুরী বোর্ড' ও 'শ্রম আদালত' স্থাপন করেছে। তাছা রাষ্ট্র শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য শ্রমনীতি ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য 'শ্রমিক সংঘ' স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে।

৬. যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত ও যোগাযোগ যাতে দ্রুত ও আরমদায়ক হয় রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করে থাকে। এ জন্য রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে যাতায়াত ও যোগাযোগরে জন্য রাস্তাঘাট, সড়ক, রেলপথ, বিমান, নৌ-চলাচল, ডাক,তার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে থাকে।

৭. কৃষির উন্নয়নঃ কৃষি তা কৃষকদের উন্নয়নে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের পুনর্বাসনে রাষ্ট্র তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করে থাকে।

৮. সামাজিক নিরাপত্তা বিধানঃ রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে তৎপর। জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রগুলো আ অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন, কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমা, দুস্তদের সাহায্য, বৃদ্ধদের বার্ধক্য ভাতা, বেকার ভাতা, বিকলাঙ্গদের সাহায্য ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বহুবিধ কল্যাণকের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এর ফলে সমাজের কোন কর্মহীন ব্যক্তি অন্যের মুখোমুখী হয় না বা নির্ভরশীল থাকে না।

৯. কল্যানমূলক বা জনহিতকর কার্যাবলিঃ চিত্তবিনোদরেন জন্য খেলার মাঠ, সিনেমা হল, রেডিও, টেলিভিশনে আন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচার করাও রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

মূল্যায়ন

উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্র আরো অনেক কার্য সম্পাদন করে থাকে। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারতার সাথে সাথে মানুষের চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার ব্যাপক প্রসারতা জনকল্যাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্র এখন আর পুলিশী রাষ্ট্র নয়, জনকল্যাণকর্মী রাষ্ট্র। সে জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে শিক্ষাবিস্তার, শিল্প কৃষির উন্নতি সাধন প্রভৃতি ধরনের কাজ করতে হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব ব্যবস্থাগুলো রাষ্ট্র নিয়ে থাকে। তাই বলা হয় যে, বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই "বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক।" রাষ্ট্রের সকল কাজই গুরুত্বপূর্ণ। তাই

বর্তমানে অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক কার্যাবলির মধ্যকার সীমারেখা দিন দিনই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

২.৫ রাষ্ট্র কাকে বলে (What is the State?)

সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করেছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বাস্তব রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্র সমাজের একটি শক্তিশালী বাহন যার মাধ্যমে সমাজ সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে। স্থায়ীভাবে বাস করে, একটি সংগঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সর্বপ্রকার বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে ।

২.৫.১ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of State)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এরিস্টটল বলেন, রাষ্ট্র হলো কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন। এরিস্টটলের মতে, পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গ্রাম এবং একইভাবে গ্রাম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আবার শুধু পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। এর মাধ্যমে স্বনির্ভর জীবনযাপনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিনি বলেছেন, "মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব"। সুতরাং ব্যক্তি মাত্রই রাষ্ট্রের সদস্য, কেউ রাষ্ট্র ছাড়া বাস করতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সংগঠিত একটি জনসমাজ।

তার সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনগণ আবশ্যক এবং তারা আইনের মাধ্যমে সংগঠিত ও পরিচালিত। অন্য সংগঠন ও গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের এখানেই পার্থক্য যে, সেগুলো প্রচলিত আইনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে শাসিত হতে নাও পারে। কিন্তু রাষ্ট্র অবশ্যই আইনের দ্বারা পরিচালিত হবে।

আর. এম. ম্যাকাইভার-এর মতে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাষ্ট্র জনগনের শৃঙ্খলা রক্ষার অছি ও অভিভাবক। তার মতে, রাষ্ট্র এমন একটি সংঘ যা সরকারের আইন অনুসারে কাজ করে, সরকার আইন ঘোষণা এবং তা পালন করার জন্য শক্তির অধিকারী, যে শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্যিক এবং সর্বজনীন অবস্থা বজায় রাখে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্নার বলেন, রাষ্ট্র হলো এক জনসমষ্টি যা সংখ্যায় বিপুল অথবা স্বল্পাধিক, যারা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন এবং যার একটি সংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসী স্বাভাবিকভাবে অনুগত।

রাষ্ট্র মানুষের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এর সংজ্ঞা নির্ধারনে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

Aristotle তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ The Politics- এ বলেন, পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো (Woodrow Wilson) বলেন, কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে সংগঠিত জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে। অধ্যাপক ব্লুন্টসলী (Bluntschil) বলেন, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমষ্টিই হলো রাষ্ট্র।

অধ্যাপক লাস্কি (Prof. H. J. Laski) রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বলেন, রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক সমাজ যা শাসন ও শাসিতদের মধ্যে বিভক্ত এবং যা এর এলাকাধীন সকল সংগঠনের ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব করে।

ম্যাকাইভার (MacIver) মনে করেন, রাষ্ট্র একটি সংঘ যা সরকারের ঘোষিত আইনানুযায়ী কাজ করে। সরকার আইন ঘোষণা ও আইন পালন করার শক্তির অধিকারী। এ শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা বাহ্য ও সর্বজনীন অবস্থায় রাখে।

অধ্যাপক ড. গার্নার বলেন, রাষ্ট্র হলো বিপুল বা স্বল্পাধিক জনসমষ্টি, যারা একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন অথবা স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং যাদের একটি সুগঠিত সরকার রয়েছে যার প্রতি সংখ্যাধিক্য জনসাধারণ স্বভাবজাত আনুগত্য স্বীকার করে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এবং একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বোঝায় যাদের একটি সুগঠিত সরকার আছে, জনগন সেই সরকারের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শন করে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যাপক লাস্কি রাষ্ট্রকে "আধুনিক সমাজ সৌধের চূড়া" বলে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্র একটি অত্যাবশ্যক সংগঠন।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো অনুসরণে একথা বলা যায় যে, রাষ্ট্র হলো এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুসংগঠিত সরকার গঠন করে স্বাধীনভাবে বসবাস করে।

২.৬ রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ (Aims of State)

রাষ্ট্রের লক্ষ্য কী এ প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গনে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকাল হতে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বির্তকের সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য রাষ্ট্রের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের দার্শনিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

প্রাচীন যুগ : প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো এবং এরিস্টটল রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে দেখেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা সাধন সম্ভব। প্লেটো রাষ্ট্রকে আদর্শ সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যদিও প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র মর্তলোকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার প্লেটোর সুযোগ্য শিষ্য এরিস্টটল বলেছেন, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং মানুষের উন্নততর জীবন বিধানের জন্য রাষ্ট্র সক্রিয় থাকবে। তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতানুযায়ী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের গুণগত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন।

মধ্যযুগ : মধ্যযুগের দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। Aquinas রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মধারা সম্পর্কে যে অভিমত পোষণ করেছেন তা হলো, মেষপালক মেষপালের তদারকি করবে এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা যাদের দায়িত্বভার নিয়েছে, তাদের কল্যাণ সাধন করবে। মধ্যযুগে রাষ্ট্রকে চার্চের স্বার্থরক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। খ্রিস্টধর্ম যাজকদের মতানুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। অর্থাৎ মধ্যযুগে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে।

আধুনিক যুগ : জার্মান দার্শনিক হেগেল গ্রিক দার্শনিকদের মতের প্রতিধ্বনি তুলে বলেন, রাষ্ট্র হলো ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানব প্রকৃতি পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে দেবত্বে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

আবার ফ্যাসিস্টদের মতে, Nothing above the state, beyond the state or against the state. অর্থাৎ তারা রাষ্ট্রের বাইরে, উর্ধ্বে ও এর আওতার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু কল্পনা করেন না।

২.৭ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত, চুক্তিবাদী দার্শনিক হবস, লক ও রুশো ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হবসের মতে, রাষ্ট্রের কাজ হলো শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখা এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা। আবার জন লক বলেন, রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজের মঙ্গল সাধন, কিন্তু চরমতম লক্ষ্য হলো সংঘবদ্ধ জীবনে সম্পত্তির সংরক্ষণ। তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষন করা এবং রুশোর মতে, মানুষের মঙ্গলময় জীবন সম্ভব করে তোলাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী Adam Smith রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

ক. অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিঃআক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা।

খ. সমাজের প্রতিটি লোককে অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

গ. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেসব কাজ সম্ভব নয় সেগুলো সম্পাদন করা এবং জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন ও সংরক্ষণ করা।

আবার উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক Bentham রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, আদর্শবাদী দার্শনিকদের মধ্যে Hegel, Kant প্রমুখের মতে, রাষ্ট্রের সার্থকতা তার নিজের মধ্যে নিহিত। তারা আরো বলেন, রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়।

চতুর্থত, আধুনিককালে রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করা হয়। এ দৃষ্টিকোণে জার্মান

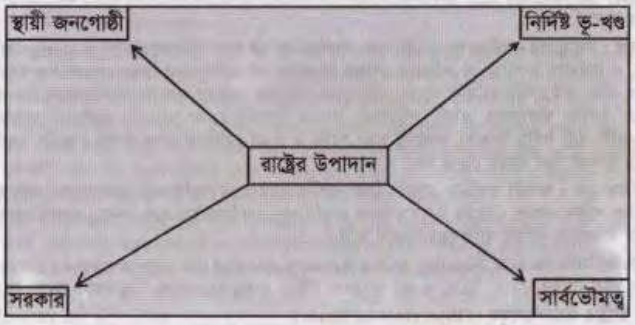
দার্শনিক Bluntschil রাষ্ট্রের বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

১. প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য-জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও জাতীয় সম্প্রসারণ হলো প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য।
২. পরোক্ষ উদ্দেশ্য-ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষা হলো পরোক্ষ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার মতে জনকল্যাণ সাধনই আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বিষয়ক কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলোর মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশের ধর্মগ্রন্থ এবং দার্শনিকদের রচনার মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে তিনজন দার্শনিকের প্রচেষ্টায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাঁরা হলেন ইংরেজ চিন্তাবিদ টমাস হবস্ ও জন লক্ এবং ফরাসি দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশো। এঁরা 'চুক্তি-মতবাদী' দার্শনিক বলে পরিচিত।

২.৮

রাষ্ট্রের উপাদান



সামাজিক চুক্তি মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হলো- মানব-ইতিহাসে এমন একটি সময় ছিল, যখন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। তাই রাষ্ট্র ও সরকারের কোনো অস্তিত্বই তখন প্রত্যক্ষ করা যেত না। মানুষ বাস করতো প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এ প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মানুষের 'প্রাক্ সামাজিক অবস্থা' অর্থাৎ তখনও সমাজের উৎপত্তি ঘটেনি। আবার, কয়েকজনের মতে, এ অবস্থা ছিল 'প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক' অর্থাৎ এ অবস্থায় সমাজের উদ্ভব ঘটলেও রাষ্ট্রের জন্ম তখনও হয় নি। ওই 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' মানুষের জীবন প্রাকৃতিক আইন'-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু কালক্রমে মানুষের জীবন হয়ে উঠল বিস্ময় এবং দুর্বিষহ। এ দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণে মানুষ ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা একদিন আদিম মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পেল। তাদের মুক্তি এর পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ফলে প্রাকৃতিক আইনের স্থান অধিকার করল রাষ্ট্র-সৃষ্ট আইনকানুন। এর ফলে মানুষের অবাধ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হলো ঠিকই; কিন্তু তার পরিবর্তে তারা রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করল। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এল; পরিসমাপ্তি ঘটল অতীতের অনিশ্চিত ও অস্থিরতাপূর্ণ জীবনের।

২.১০ রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

১৬৫১ সালে ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস্ তাঁর Leviathan গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে

প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, দারিদ্র্য, ঘৃণ্য পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী। এ অরাজক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সমস্ত ক্ষমতা নিঃশর্তভাবে কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে। হবসের মতে, পূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ হলেন সার্বভৌম শক্তির আধার। শাসক বা রাজা হলেন সর্বশক্তিমান ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হলো জনগণের স্বাধীনতার সৃষ্টিকর্তা ও সংরক্ষক। এ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনো অধিকার জনগণের নেই। হবস্-এর এ বক্তব্যে চরম রাজতন্ত্রের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

২.৯.২ জন লকের মতবাদ

১৯৬০ সালে প্রকাশিত Treatises on Civil Government গ্রন্থে ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জন লক এ মতামত ব্যক্ত করেন যে, প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানবজীবনে জনগণ কিছু অধিকার ভোগ করত। জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার এসব অধিকার লক প্রাকৃতিক অধিকার বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, জনগণ এ সমস্ত অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করতে পারত না বলে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। লকের মতে দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। প্রথমটি, জনগণের নিজেদের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি, রাজার সঙ্গে জনগণের। শাসক যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির শর্ত পালন করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শাসন ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার পাবেন। চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। এভাবে লক সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের পক্ষেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

২.৯.৩ রুশোর মতবাদ

১৭৬২ সালে ফরাসি দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশো Contract Sociale of Cocial Contract নামক গ্রন্থে তাঁর মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁর মতে মানুষের প্রাক্-রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল সুখী, সরল ও আনন্দময়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হলো তাতে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করে সুসংঘবদ্ধ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলল। রুশোর মতে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের সঙ্গে মানুষ সামাজিক চুক্তি করে নি, জনগণ নিজেদের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদন করে সার্বভৌম ক্ষমতা 'সাধারণ ইচ্ছা'র হাতে তুলে দেয়। রুশো এভাবে জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

২.১০ রাষ্ট্রের প্রকারভেদ (Kinds of State)

কিন্তু রাষ্ট্র যে চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয় সেই উপাদানগুলো কোনো বিভাজন হয় না। সেই অর্থে বলা যায়, রাষ্ট্রের কোনো শ্রেণীবিভাগ হতে পারে না। তবে 'ভূমিকা' ও অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রের শ্রেনিবিভাগ সম্ভব। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের শ্রেনিবিভাগ, অবস্থান ও ভূমিকায় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে। যথা-

ক. সার্বভৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং খ. ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে।

ক. সার্বভৌমত্ব পরিপ্রেক্ষিতে : সার্বভৌমত্ব হলো একটি অবিভাজ্য ও চরম অভিব্যক্তি, যার ওপর নির্ভর করে মূলত রাষ্ট্র নামক সংগঠনটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সার্বভৌমত্ব পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেনিবিভাগ করা যায়-

১. **সামন্ত রাষ্ট্র :** যে রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অধীনে থাকে তাকে সামন্ত রাষ্ট্র বলে। মূলত এর কম রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণভাবে সব কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে কিন্তু শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অভিভাবক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. **আশ্রিত রাষ্ট্র :** যদি কোনো দুর্বল রাষ্ট্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আশ্রয়গ্রহণ করে তাকে আশ্রিত রাষ্ট্র বলে। আশ্রিত এসব রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র।

৩. **আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র :** যে রাষ্ট্র কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র বা পরাশক্তির অধীনে থাকে তাহলে তাকে আজ্ঞাহীন রাষ্ট্র বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান ও অটোমান সাম্রাজ্য তথ্য তুরস্কের অধীনে এমন কতগুলো রাষ্ট্র ছিল, যা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদেরকে ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়। প্রধানত যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলো এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রই এসব রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

গ্রহণ করে।

৪. **অছি রাষ্ট্র :** ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাধীন রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদ পালন করে থাকে।

৫. **কনডমিনিয়াম রাষ্ট্র :** যদি কোনো রাষ্ট্রের ওপর একের অধিক বহিঃশক্তি যৌথভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাকে যৌথ সার্বভৌম শাসিত রাষ্ট্র বা কনডমিনিয়াম রাষ্ট্র বলে। যেমন ব্রিটেন বা ফ্রান্স যৌথভাবে নিউ হেবসাইডস দ্বীপের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৬. **ঔপনিবেশিক অঞ্চল :** যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিদেশি শক্তির দখলে থাকে তাকে ঔপনিবেশিক অঞ্চল বলে। যেমন, ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ কলোনিযুক্ত ছিল।

৭. **সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র :** কতগুলো অঙ্গরাজ্যের একত্রে সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র বলে। সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা-

i. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** একাধিক প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, ভারত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

ii. **ফেডারেশন :** আঞ্চলিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা ভাগাভাগি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তখন তাকে ফেডারেশন রাষ্ট্র বলে। যেমন, USA

iii. **কনফেডারেশন :** যখন একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র স্ব স্ব স্বার্থে তাদের ক্ষমতা শিথিল করে কেন্দ্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে কনফেডারেশন স্টেট বলে। যেমন- জার্মানি ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত কনফেডারেশন স্টেট ছিল।

খ. ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিত : ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতেও রাষ্ট্রকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **পরাশক্তি :** যেকোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো শক্তিকে বা রাষ্ট্রকে পরোয়া করে না তখন তাকে পরাশক্তি বলে। যেমন- বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাশক্তি বলা হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে দুটি বৃহৎ পরাশক্তির পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা পরিস্ফুটিত হয়।

২. **বৃহৎ রাষ্ট্র :** বৃহৎ রাষ্ট্র বলতে বর্তমানে বিশ্বের গুটিকয়েক রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়, যাকে অন্যভাবে পঞ্চশক্তিও বলা হয়। এ পঞ্চশক্তি হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন।

৩. **মাঝারি রাষ্ট্র :** মাঝারি রাষ্ট্র বলতে প্রধানত আঞ্চলিক শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহকে বোঝায়। বৃহৎ রাষ্ট্রের পরই এর স্থান। ভারত, জাপান, জার্মানি, ব্রাজিল প্রভৃতি মাঝারি রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।

৪. **ক্ষুদ্র রাষ্ট্র :** ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে বুঝানো হয় যেসব রাষ্ট্র কেবল নিজস্ব সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না, বরং অন্য কোনো রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান অথবা ভারসাম্য রক্ষা কিংবা বলপ্রয়োগকারী অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর করে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

উপাদানগত অবিভাজ্যতা সত্ত্বেও ভূমিকা ও অবস্থানের কারণে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব। যে চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় তা সব রাষ্ট্রে সমভাবে বিদ্যমান। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের কোনো বিভাজন বা শ্রেণিবিভাগ হতে পারে না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে বিভিন্ন ভূমিকার ভিন্নতার কারণে এবং অবস্থানগত পার্থক্যের হেতুতে রাষ্ট্রকে উপরিউক্তভাবে ভাগ করা হয়।

বিখ্যাত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান তার 'The security of small states in Third World গ্রন্থে বলেছেন, " A small state is a state with a very low conventional war capability, not only in absolute comparative terms but also vision the large powers its region.

Professor Ataur Rahman- এর মতে, The Small states are the most disadvantaged entities in the global system and they are the ones who suffer from extreme vulnerabilities.

আধুনিক সময় বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে, "A small state is a state which recognized that it can not obtain security primarily be use of the its own capabilities and its must

rely fundamentally on the aid of states, institution, processes, or developments and so. "[BIIS Journa, vol 8, no.-2, 1987-p^{-4}]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, যে সকল রাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় এবং যুদ্ধ করার ক্ষমতা সীমিত তারাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। অবশ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিষয়টি আপেক্ষিক, কেননা দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান একটি বৃহৎ রাষ্ট্র কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। কারণ তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা মধ্যপ্রাচ্যের কিংবা উত্তর আফ্রিকার অনেক বড় বড় রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ-

১. রাষ্ট্রের আয়তন,
২. গড় দেশজ উৎপাদন
৩. সামরিক ব্যয় এবং
৪. জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ইত্যাদি যার কম তারাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।

২.১১ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Small State)

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত যে বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায় এবং সেগুলো হচ্ছে-

১. পরনির্ভরশীলতা।
২. অনুন্নত অর্থনীতি।
৩. দুর্বল সামরিক কৌশল।
৪. সম্পদ ও ক্ষমতার অসামঞ্জস্য।
৫. জাতিগত বিরোধ সমস্যা।
৬. শক্তিশালী বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান।
৭. সীমিত যুদ্ধ ক্ষমতা।
৮. সামরিক সম্পদ ও সরঞ্জামের স্বল্পতা।
৯. বিপর্যস্ত পরিবেশ।
১০. অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ।
১১. বিদ্যমান দরিদ্রতা।

২.১২নিরাপত্তা কী

জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি অনেকটা অস্পষ্ট। এর সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আজও সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞ এটিকে বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। যেমন-

Encyclopedia of Social Sciences- এ জাতীয় নিরাপত্তা বলতে বোঝানো হয়েছে- "The ability of a nation to protect its internal values from external threats.

Robers. R. Macnamara বলেন, "Security is the development of economic social and political life of a nation, which may not relate to yesterday but to tomorrow.

A Nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values, it is whished to avoid war and is able if challenged to maintain them by such victory in such a war.

সুতরাং বলা যায়, জাতীয় একটি বহুমাত্রিক ধারণা। অনেকে এটিকে কেবলই একটি সামরিক বিষয়ভাবে ভুল করে থাকে। প্রকৃত অর্থে জাতীয় নিরাপত্তা কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, সর্বোপরি নিজের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে অন্য রাষ্ট্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার সামর্থ্যকেই বোঝায়।

২.১২.১ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত হুমকি

উন্নয়নশীল তথা তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্য হয়তো একরূপ নাও হতে পারে তবে এসকল রাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতি ও সামরিক ব্যবস্থায় যে অবস্থানে রয়েছে তাতে এদের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ফলে এদের জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও কতিপয় সাধারণ সমস্যা গোচরীভূত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ সকল নিরাপত্তাজনিত হুমকি, বিভিন্ন দিক থেকে আসতে পারে। যেমন :

ক. অভ্যন্তরীণ হুমকি। খ. বহিঃ হুমকি। গ. বৈশ্বিক হুমকি।

ক. অভ্যন্তরীণ হুমকি

অভ্যন্তরীণ এমন কিছু অনুঘটক আছে যেগুলো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **সামাজিক সংস্কৃতি :** সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয় যেমন- ভাষা, জাতীয়তা, ধর্ম, গোষ্ঠী ইত্যাদি উপাদানগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হিসেবে কাজ করে।

২. **অস্থিতিশীল অর্থনীতি :** দুর্বল অর্থনীতি জন্ম দেয় দারিদ্র্য, অর্থনীতি অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর করে পড়ে যা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

৩. **অস্থিতিশীল রাজনীতি :** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হুমকি, কেননা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এসকল দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি, দুর্নীতি প্রভৃতি সহ রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়।

৪. **সামরিক :** তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থান নিত্য নৈমেত্তিক ব্যাপার, এসকল দেশে দুর্বল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ দিয়ে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে বা রাষ্ট্রীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করে থাকে। যা দেশগুলোর নিরাপত্তাকে হুমকিগ্রস্ত করে।

৫. **পরিবেশগত :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব সমাজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

খ. বহিঃ হুমকি

১. **সার্বভৌমত্ব :** পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সীমান্ত বিরোধ, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপসহ বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতায় ঝুঁকি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রয়েছে।

২. **ক্ষমতার দ্বন্দ্ব :** দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রধান্য বিস্তারের জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো এ ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পরীক্ষাগারে পরিণত হয়।

৩. **পরিবেশগত নিরাপত্তা :** বিশ্বায়নের এ যুগে পরিবেশেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। পার্শ্ববর্তী শিল্পের দেশগুলো কর্তৃক পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোও আক্রান্ত হচ্ছে।

৪. **পরনির্ভরশীলতা :** বিশ্বের ক্ষমতাশীল বা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে তাদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। এক্ষেত্রে তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নীতিনির্ধারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

৫. **আদর্শগত হুমকি :** স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী এ উভয় ব্লক থেকে নিরাপত্তাজনিত হুমকির সম্মুখীন হয়। বর্তমান সময়ে এসে আদর্শগত ও হুমকি অনেকাংশ হ্রাস পেয়েছে।

গ. বৈশ্বিক হুমকি :

১. **মানব নিরাপত্তা :** দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ব্যতিরেকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সামগ্রিক যে হুমকি তাই হচ্ছে মানব নিরাপত্তা। যেমন- নতুন নতুন বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি, মৌলিক চাহিদা প্রাপ্তির অপর্যাপ্ত ইত্যাদি।

২. **পরিবেশগত নিরাপত্তা :** ক্রমবর্ধমান হারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো দায়ী। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার মূলভুক্তভোগী তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. **ধর্মীয় নিরাপত্তা :** ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা বিশ্ব নিরাপত্তা বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর নিরাপত্তার প্রতি অন্যতম একটি হুমকি। মৌলবাদ ও ধর্মীয় সংঘাত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

৪. **সন্ত্রাসবাদ :** অশিক্ষা, অনুন্নত অর্থনীতি, কর্মহীনতা, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীগত বিভাজন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটছে।

২.১৩ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার কৌশল

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো সামরিক শক্তির দিক থেকে খুবই দুর্বল। কিন্তু তাই বলে তাদের নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এমন কোনো কারণ নেই। যুদ্ধ ছাড়াও বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে।

পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

ক. বৈদেশিক নীতি ও দক্ষ কূটনীতি
খ. নিরপেক্ষতা;
গ. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন; এবং
ঘ. ক্ষমতার ভারসাম্য।

ক. বৈদেশিক নীতি ও দক্ষ কূটনীতি : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক অস্ত্র হলো বৈদেশিক নীতি এবং কূটনীতি। সামরিক শক্তি অপর্যাপ্ত থাকায় এক্ষেত্রে বৈদেশিক সম্পর্কই এসকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যকর কৌশল হতে পারে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি তাই আত্মরক্ষার নীতি হিসেবে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সহযোগিতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের লক্ষ্য শক্তির অন্বেষণ নয় এবং যতটুকু শক্তি সে ধারণ করে তা সংরক্ষণ করা। এসকল ক্ষেত্রে ছোট রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতি রক্ষণাত্মক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। ছোট রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক নীতির মূল প্রতিপাদ্য হলো আক্রমণ নয় বরং আত্মরক্ষা। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ছোট রাষ্ট্রগুলোর প্রধান দুটো সমস্যা হচ্ছে-

ক. কীভাবে সংঘর্ষ পরিহার, মীমাংসা বা স্থগিত করা যায়।

খ. কোনো সংঘাতের সৃষ্টি হলে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে কীভাবে বাধা দেওয়া যায় বা দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

এ দুটি সমস্যা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কূটনৈতিক ও সামরিক কৌশলের সাথে সম্পর্কিত যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কূটনীতির একটি বড় অংশ পরিচালিত হয় দেশগুলোর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কর্তৃক, আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সরকারি সফর, সাটল কূটনীতি, রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষীক আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে। এ ধরনের বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সফল হয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, বৈদেশিক নীতির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার দরকার হয়, উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গাপুরের কথা বলা যায়, সিঙ্গাপুরের দূরদর্শী নেতা লি কুয়ান ইউ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ১৯৭১ সালের নভেম্বরে পঞ্চশক্তি প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে মালয়েশিয়ার নিরাপত্তার সাথে সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা সংযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কমরেডশিপ গড়ে তোলা, যাতে করে দেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

তাই নিরাপত্তা রক্ষার্থে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে কূটনীতিতে আরো দক্ষতা হতে হবে। তালুকদার মনিরুজ্জামান মনে করেন, "A prudent and well thoughout foreign policy is a small states first line of defence." এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে নিজের শক্তি না থাকলেও অন্যান্য রাষ্ট্রের শক্তিকে বিপদের সময় নিজের পক্ষে ব্যবহারের মতো কূটনৈতিক দক্ষতা দেখাতে হবে।

খ. নিরপেক্ষতা : নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। যদিও নিরপেক্ষ মর্যাদা অর্জন করা দুরূহ কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কৌশল হিসেবে এটা বেশ কার্যকর। নিরপেক্ষ মর্যাদা লাভ করার জন্য কোনো রাষ্ট্রকে বেশ কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়।

ক. দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ এড়িয়ে চলার ঐতিহ্য থাকতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এ সংক্রান্ত যথোপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে নিরপেক্ষতার প্রচার কার্য চালাতে হবে, যেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা পায়।

খ. ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকতে হবে।

গ. ভৌগোলিক অবস্থান যেন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়।

ঘ. স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা থাকবে যারা নিরপেক্ষতার জন্য অবদান রাখতে সক্ষম।

সুইজারল্যান্ড ১৯৮৫ সালে ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে নিরপেক্ষ মর্যদা লাভ করেছিল। কোনো একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেকটা নিশ্চিত থাকতে পারে কেননা তাকে কোনো সামরিক জোটের সদস্য হতে হয় না ফলে সে অন্যান্য সুবিধাদিও ভোগ করে থাকে।

কোন সামরিক জোটের সদস্য হওয়ার ক্ষতির দিক সম্পর্কে মিসরের সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি জামাল আবদেল নাসের বলেছিলেন "বৃহৎ শক্তি ও ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে জোট হলো নেকড়ে ও ভেড়ার মধ্যে জোট এবং নেকড়ে কর্তৃক ভেড়াকে গ্রাসে গিলে ফেলার মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুতরাং মোটামুটি স্পষ্ট যে, সামরিক জোটবদ্ধ হওয়ার তুলনায় নিরপেক্ষ মর্যাদা লাভ একটি দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কৌশল হিসেবে অধিক কার্যকর।

গ. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন : জোটনিরপেক্ষতা বলতে কোনো শক্তি কেন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ইতিবাচক অবস্থান নেওয়াকে বোঝায়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং ঐ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংহতি বৃদ্ধিতে জোট নিরপেক্ষ নীতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বাধীনতা, সার্বভৌম ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল।

ঘ. ক্ষমতার ভারসাম্য : শক্তি সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করার কৌশলসমূহ হচ্ছে-

ক. মৈত্রী জোট গঠন; খ. অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ;

গ. ক্ষতিপূরণ; ঘ. হস্তক্ষেপ; ও ঙ. বিভক্তিকরণ ও শাসন।

ইতিহাস দাবি করে যে, ক্ষমতার ভারসাম্য ব্যবস্থা ইউরোপ শান্তিরক্ষায় ভালোভাবেই কাজ করেছে।

২.১৪ রাষ্ট্রের কার্যাবলি/আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি (Functions of State)

একটি রাষ্ট্র কী কী কার্য সম্পাদন করবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে একটি ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের মতে State is a necessary evil. মার্কসবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে শ্রেনিশোষণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন এবং সর্বহারাদের বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করেছেন। আবার নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন।

তবে সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রের নেতিবাচক ভূমিকার পক্ষে মত দিয়েছেন। আবার মধ্যম ও উদারপন্থি দার্শনিকগণ জনকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন W.W. Willoughby R.C. Gettell. আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুই শ্রেনিতে বিভক্ত করেছেন-যেমন-

ক. অপরিহার্য কার্যাবলি ও খ. ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

২.১৪.১ অপরিহার্য কার্যাবলি

রাষ্ট্রের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং সেইসাথে সংহতি ও জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের আবশ্যক তথা অপরিহার্য কাজ বলে গণ্য করা হয়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

১. **দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্য :** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

২. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য :** আন্তর্জাতিকতার যুগে অন্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র অন্য দেশে রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক প্রেরণ করে এবং অন্য রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের নিজ দেশে গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা, কূটনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করাও রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যই মূলত রাষ্ট্রকে প্রতিবেশি ও দূর রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

৩. **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত কার্য :** দেশের জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

৪. **প্রশাসন সংক্রান্ত কার্য :** অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের মধ্যে কর্মবন্টন ও তদারকি করে। মুদ্রা, টাকশাল পরিচালনা, কর বা খাজনা ধার্য ও আদায়, বাজেট প্রণয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

৫. **বিচারসংক্রান্ত কার্য :** শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র দুষ্টের দমন ও

http://thejobstudy.com Go to Contents

শিষ্টের পালন নীতি অনুসরণ করে এবং এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র বিচার বিভাগ গঠন করে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পর্কে Prof. W.W. Willoughby- এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, এটা সর্বজন-স্বীকৃত যে, রাষ্ট্রের হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকা উচিত যা দ্বারা এটি বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিহত করে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে; জাতীয় জীবনকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করার সুযোগ দিতে পারে এবং জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষাসহ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান করতে পারে।

২.১৪.২ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি

বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই আর পুলিশি রাষ্ট্র (Police State) নয়। সব রাষ্ট্রই কম-বেশি জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। সমাজের কল্যাণ সাধন ও জনগণের মঙ্গল বিধানের লক্ষ্যে রাষ্ট্র যে সকল কাজ করে, তাকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ বলে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রের এরূপ কাজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য জরুরি না হলেও জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে Prof. R.C. Gettle বলেন, রাষ্ট্র এর অস্তিত্বের জন্য ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য কিংবা জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐচ্ছিক কার্যাবলি সম্পাদন করে না, বরং নাগরিকদের নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ কল্যাণের জন্য এ কার্যাবলি সম্পাদন করে। রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য যে সকল ঐচ্ছিক কার্যাবলি সম্পাদন করে তা হলো :

১. **শিক্ষা সংক্রান্ত :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই শক্তি (Education is Power)। একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাষ্ট্র শিক্ষা সংক্রান্ত বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করা রাষ্ট্রের কাজ।

২. **জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত :** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান কল্পে রাষ্ট্র হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা করে।

৩. **যোগাযোগ রক্ষা :** অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত সে দেশের সার্বিক অবস্থা তত উন্নত। রাষ্ট্র যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক, রেল, বিমান, নৌ চলাচল, ডাক ও তার, টেলিফোন ও ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে।

৪. **কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলো কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ব্যবস্থা, শিল্প কারখানা স্থাপন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

৫. **শ্রমিক কল্যাণ :** শ্রমশক্তি একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রমশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শ্রমিকদের কাজের সময় ও মজুরি নির্ধারণ এবং শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্র শ্রম আদালত গঠন করে। তাছাড়া শ্রমিক কল্যাণের জন্য শ্রমিক সংঘ তথা Trade Union গঠন করা হয়।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা :** জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে রাষ্ট্র পেনশন প্রদান, বেকার ভাতা প্রদান, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও যৌথ বীমা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে।

৭. **জনহিতকর কার্য :** জনহিতকর কাজের অংশ হিসেবে রাষ্ট্র দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

২.১৫ আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্র ও এর উপাদান

আন্তর্জাতিক আইনের ধ্যান-ধারণা, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও পরিধি মূলত রাষ্ট্রসমূহকে নিয়েই আবর্তিত। আন্তর্জাতিক আইনের বিধি প্রথমত এবং মূলত রাষ্ট্রীয় আচরণের নিয়ন্ত্রক। রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক আচরণের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক আইন তাই নিয়ন্ত্রণ করে। সে অর্থে রাষ্ট্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান সাবজেক্ট।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র (Colonial State), অধঃ রাষ্ট্র (Vassal State) রক্ষিতা রাষ্ট্র (Protictorate) ইত্যাদি সার্বভৌমত্ব বিবর্জিত বা আধা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের ধারণা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্র বলতে আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রই বুঝি, যা সমকালীন আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি।

২.১৫.১ রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ (Elements of a state)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান পাওয়া যায়। এগুলো হলো :

১. স্থায়ী জনগোষ্ঠী ২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ৩. সরকার এবং ৪. সার্বভৌমত্ব।

এ চারটি উপাদান একত্রে সমাবেশ ঘটলেই একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। অর্থাৎ যে কোনো একটির অভাবে কোনো সংগঠন রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই রাষ্ট্র গঠনে তাদের প্রতিনিধি একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় সত্তা অর্জনের জন্য এ চারটি উপাদানের প্রয়োজন হলেও বাস্তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী তার ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়েছে এমন অবস্থাকে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি না বলে তাকে রাষ্ট্রীয় সত্তার সাময়িক অনুপস্থিতি বলা যেতে পারে। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে এমন একটি রাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে মনে করা যায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড সুনির্দিষ্ট নাও হতে পারে। যখন ১৯৪৮ সালে আরব ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে রোপণ করা হয় তখন তার সীমানা নির্দিষ্ট করা হয় নি, কিন্তু জাতিসংঘ কর্তৃক তা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

রাষ্ট্রের উপাদান

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চারটি উপাদান অপরিহার্য। এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **স্থায়ী জনগোষ্ঠী :** রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো স্থায়ী জনসমষ্টি বা জনগোষ্ঠী। মূলত স্থায়ী জনগোষ্ঠীর সমষ্টিক চেতনাবোধ থেকেই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না। বড় রাষ্ট্র ভেঙে ছোট একাধিক রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল চালিকা হচ্ছে এর সমবোধ সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশের ফলেই আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেকগুলো নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রিক জনসংখ্যার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। অবশ্য এরিস্টটল তার আদর্শ রাষ্ট্রে ৮ হাজার জনসমষ্টির উল্লেখ করেছিলেন। তবে এরিস্টটলের এ চিন্তাধারা উদ্ভূত হয়েছিল নগররাষ্ট্রের ধারণা থেকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতি রাষ্ট্র। তাই এর আকার, আয়তন বা জনসমষ্টি অনেক বেশি। চীন বা ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটির উর্ধ্বে। আবার নাইরু, মালদ্বীপ বা ত্রিণিদাদের জনসংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকটিই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

২. **সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড :** রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ভিন্ন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না ততদিন পর্যন্ত ইহুদিরা যাযাবর জীবনযাপন করত। তবে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আকার কতটুকু হবে তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। রাশিয়া দুটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। সমগ্র ভূ-ভাগের প্রায় ১৫ শতাংশ এর আয়তন। অন্যদিকে গুয়েতেমালা, সানমেরিনো, লুক্সেমবার্গ, মোনাকো ইত্যাদির আয়তন মাত্র ১০-১২ হাজার বর্গমাইল। অনেকের ধারণা ছিল আয়তনে ছোট হলে রাষ্ট্র পরিচালনা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা বিধান করা অধিকতর সুবিধাজনক। আধুনিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে অতিরিক্ত আয়তন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। কেন্দ্র হতে দূরবর্তী স্থানে গোলযোগের সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই সরকার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহন করতে সক্ষম হয়। পূর্বে এটা সম্ভব ছিল না। আবার বিশ্বে অনেক ছোট রাষ্ট্র আছে, যেখানে নান প্রকার অশান্তি বিরাজ করছে। এটা নির্ভর করে সরকারের দক্ষতা, যোগ্যতার ওপর। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলতে শুধুমাত্র স্থলভাগকেই বোঝায় না। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থল, জল এবং আকাশ সীমাও এর অন্তর্ভুক্ত। ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ সম্পদও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। উপকূলীয় রাষ্ট্র সমুদ্রসীমার কিছু অংশের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি। এ সবকিছু ভূখণ্ডের আওতাভুক্ত। একটি জনসমষ্টি স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে রাষ্ট্র গঠন করে। মোট কথা রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ হলে ভূখণ্ড তার দেহতুল্য।

৩. **সরকার বা শাসনতন্ত্র :** রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি শাসনযন্ত্র বা সরকারের প্রয়োজন। সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নীতি ও আইন-কানুনকে কার্যে পরিণত করে। আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সরকারের এ তিনটি প্রধান বিভাগ বর্তমান। সরকার ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে, তাহলে রাষ্ট্রে

দেখা দেয় অরাজকতা এবং জনসাধারণের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা থাকে না।

অনেক সময় রাষ্ট্র এবং সরকারকে অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সরকারের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের অংশবিশেষ। তাছাড়া দেশের জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়েই সরকার গঠিত হয়। দেশের শাসনযন্ত্র বা সরকারের নানারকম পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র হলো মোটামুটি স্থায়ী। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটলেও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে না। রাষ্ট্র হলো বস্তু নিরপেক্ষ, সরকার হলো বাস্তব ঘটনা। সরকারের কার্যাবলি জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করে এবং সরকারের সংস্পর্শে আসতে পারে।

৪. **সার্বভৌমত্ব :** রাষ্ট্রীয় সত্তার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই বিশেষ গুনটিই আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রের অবস্থান নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। এ চূড়ান্ত ক্ষমতার দুটি দিক রয়েছে-অভ্যান্তরীণ ও বাহ্যিক।

অভ্যন্তরীণ অর্থে, রাষ্ট্র স্বীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত সমস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন কায়েমের অধিকারী। সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য।

বাহ্যিক অর্থে, কোন রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারী।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাটি সর্বপ্রথম ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলদিনের কাছে পূর্ণতা লাভ করে। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা বলে বুঝিয়েছেন। এ ক্ষমতা রাজতন্ত্রের রাজার ওপর এবং গণতন্ত্র জনগণের ওপর ন্যাস্ত। রাষ্ট্রের এ চরম ও পরম ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করে। সার্বভৌমত্ব প্রকৃতিগতভাবে অবিভাজ্য। তবে ঐতিহাসিকভাবে এর বিভাজনও লক্ষ করা গেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রভাব বলয় সৃষ্টি, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদি ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ইতিহাসে অসংখ্য আধা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে এ সমস্ত রাষ্ট্র কর্তৃক সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র বা বৃহৎ শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত। এক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বা অধিকারের অংশবিশেষ অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ভোগ করার উদাহরণ রয়েছে। এজন্যই সার্বভৌমত্বকে বিভাজ্য মনে করা হয়েছে। আসলে এগুলো ছিল ইতিহাসের বতিক্রমী ঘটনা। বস্তুত সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য নয়। আধা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কখনই আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে প্রকৃত সাবজেক্ট ছিল না।

জনমানবতাহীন মরুভূমিতে বা অরণ্যে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও জনসাধারণের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী জনসমষ্টি অপরিহায। সংগঠিত জনসমষ্টি যারা সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত হতে পারে তারাই রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ সবাই সমান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের যা বৈশিষ্ট, ভুটানের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বেরও একই বৈশিষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি, ভূখণ্ডের আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ সার্বভৌমত্বের গুনে তারা আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হিসেবে সমান মর্যাদা ও সমান্যধিকারসম্পন্ন।

সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝালেও আন্তর্জাতিক আইনের এ ক্ষমতা অসীম নয় এবং এর প্রয়োগ আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতিসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনে মেনে চলেই তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মেনে চলা যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য, নিজ ভূখণ্ডে মানবাধিকারসহ আন্তর্জাতিক আইনের সব বিধান মেনে চলতেও রাষ্ট্র বাধ্য।

২.১৬ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড (State Territory)

ভূ-খণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সত্তার অপরিহার্য উপাদানসমূহের একটি। ভূখণ্ড জনগণের বসবাসের বস্তুগত ভিত্তি যা ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সাথে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি আঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। সংজ্ঞাকারে বলতে গেলে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠের সেই অংশ যা আইনগত কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধীন। সার্বভৌমত্বের বলে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত শ্রেষ্ঠত্বকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব থেকে পৃথক বলা যায় না। তাই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব একই সাথে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব যা কোনো রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে।

ভূ-খন্ডের ওপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দুটি দিক রয়েছে :
Imperium: এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সীমানায় অবস্থিত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা।
Dominium: এর অর্থ হচ্ছে ভূখন্ডের ওপর রাষ্ট্রের সার্বিক মালিকানা।

২.১৬.১ রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের গঠন (Structure of State Territory)

ভূখন্ডের পৃষ্ঠের যে সমস্ত অংশ নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড গঠিত সেগুলো হলো:

স্থলভাগ : রাষ্ট্রীয় সীমানায় অবস্থিত স্থলভাগ। এ স্থলভাগ মহাদেশীয় বা দ্বীপাঞ্চল হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের স্থলভাগ মহাদেশীয়, অন্যদিকে শ্রীলংকার স্থলভাগ দ্বীপাঞ্চলীয়।

জলভাগ : জলভাগের সম্ভাব্য অংশসমূহ হচ্ছে নদী, হ্রদ, জলাশয়, খাল, সমুদ্রের আভ্যন্তরীণ জলরাশি এবং রাষ্ট্রীয় সমুদ্র অঞ্চল।

ভূ-গর্ভ : স্থলভাগ ও জলভাগের গর্ভস্থ অঞ্চল ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অন্তর্ভুক্ত। গর্ভস্থ অঞ্চল যতই কেন্দ্রের দিকে যাবে ততই তা সরু হয়ে আসবে।

বায়ুমণ্ডল : স্থলভাগ ও জলভাগের ওপর নির্দিষ্ট আকাশসীমা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রসারিত।

প্রথাগতভাবে আন্তর্জাতিক সীমানায় কোনো রাষ্ট্রের পতাকাবাহী নৌ, আকাশ বা মহাশূন্যযান সে রাষ্ট্রের এলাকা বলে বিবেচিত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অঞ্চলে অবস্থিত কোনো রাষ্ট্রের পাইপ লাইন বা স্থাপনা বা স্থাপিত যন্ত্রাদিও পুরোপুরি সে রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত।

২.১৬.২ রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড অর্জনের পন্থাসমূহ

সাধারণত ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ভূ-খণ্ড অর্জনের পন্থাসমূহ হচ্ছে:

- দখল বা Occupation. দখলি স্বত্ব বা Prescription
- অর্পণ বা Cession. রোয়েদাদ বা Judical award
- পরিবৃদ্ধি বা Accretion. রাজ্যজয় বা Conquest or annexation.

এখানে উল্লেখ্য যে, রাজ্যজয়ের মাধ্যমে ভূখণ্ড অর্জন এখন কার্যত নিষিদ্ধ। কারণ আন্তর্জাতিক আইনে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দখল বা Occupation

দখল ভূখণ্ড অর্জনের একটি প্রাথমিক পন্থা। তবে দখলকৃত ভূখণ্ডটি অবশ্যই মালিকবিহীন ভূখণ্ড হতে হবে। অর্থাৎ উক্ত ভূখণ্ডে কখনো অন্য কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয় নি, এমন হতে হবে। দখলকৃত ভূখণ্ডের ওপর দখলটি অবশ্যই কার্যকর দখল হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তা দখলে রাখা বা সেখানে সার্বভৌমত্ব কায়েম করার ইচ্ছা থাকতে হবে। Terra Nullius এর ধারণাটি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, মহাসাগরসমূহের অনেক দ্বীপাঞ্চলে এবং অনেক মহাদেশীয় অঞ্চলেও বসতিহীন, মালিকহীন বা সার্বভৌমত্বহীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল, যেখানে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ দখলের মাধ্যমে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে। তবে অনেক বসতিপূর্ণ অঞ্চলকেও তারা Terra Nullius এর পর্যায়ভুক্ত করেছে, যা ছিল ঐতিহাসিক অন্যায়। হালকা বসতিপূর্ণ এ ধরনের অঞ্চলে ইউরোপীয়রা বসতি স্থাপন করেছে এবং নিজেদের প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে এবং নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিতভাবে আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করেছে। উপনিবেশবাদের পতন এবং বহুসংখ্যক আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির পরও Terra Nullius মতবাদ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হয় নি। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও এখন এ ধরনের প্রশ্ন ওঠেছে যে, এ সমস্ত স্থানে আদিবাসীদের দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়রা এ সমস্ত অঞ্চলকে Terra Nullius হিসেবে গণ্য করে সেখানে বসতি স্থাপন আরম্ভ করেছিল, যদিও সেখানে হালকাভাবেও হলেও আদি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। দখলের মাধ্যমে ভূখণ্ড অর্জনের সাথে ভূখণ্ড আবিষ্কারের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনেক ক্ষেত্রে আবিষ্কার দখলের পূর্ববর্তী পর্যায়। কিন্তু নিছক আবিষ্কার কোনো স্বত্ব মালিকানা প্রদান করে না। কোনো ভূ-খণ্ড আবিষ্কারের পর তা দখলে রাখার ইচ্ছা থাকতে হবে এবং সে দখল হতে হবে কার্যকর ও অব্যাহত। এক রাষ্ট্রের নিছক আবিষ্কার ভূ-খন্ডর ওপর অন্য রাষ্ট্র পরবর্তীতে কার্যকর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রের মালিকানার দাবিই অগ্রগণ্য।

দখলিস্বত্ব বা Prescription

ভূখণ্ড অর্জনের পন্থা হিসেবে দখল ও দখলিস্বত্বের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, দখল সবসময় মালিকবিহীন ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে, দখলিস্বত্বের প্রসঙ্গ আসে তখনই যখন কোনো ভূখণ্ডের ওপর কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার ওপর পরবর্তীতে সে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব

নিয়ন্ত্রন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এসেছে। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এরকম, যদি কোনো রাষ্ট্র ভূখণ্ডের ওপর তার সার্বভৌমত্ব কায়েম করে এবং পরে তা অব্যাহত না রাখে এবং যদি সে সুযোগে অন্য কোনো রাষ্ট্র যেখানে কার্যকর দখল প্রতিষ্ঠা করে বা জোর করে দখল করে সার্বভৌমত্ব কায়েমে সক্ষম হয়; পরে নিরবিচ্ছিন্ন বাধাহীন, প্রতিবাদহীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সে তার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র দখলিস্বত্বের মাধ্যমে সেখানে তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে প্রথম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রের কোনো প্রতিবাদ, বিরোধিতা, প্রতিরোধ বা ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দখলিস্বত্বের মাধ্যমে ভূখণ্ডে অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ দ্বিতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক ভূখণ্ড অর্জনের প্রশ্নে প্রথম রাষ্ট্রের মৌন সম্মতি থাকতে হবে। যেহেতু এটা মালিকহীন নয়, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই দখলিস্বত্বের মাধ্যমে ভূখণ্ড অর্জনের প্রক্রিয়া হবে দীর্ঘতর, কারণ এখানে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্তির প্রশ্ন জড়িত। যদিও দখল ও দখলিস্বত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি এ পার্থক্য সব সময় বজায় থাকে না। কারণ প্রায়শ বিরোধের একটি মূল প্রশ্নই হয়ে দাঁড়ায় বিরোধপূর্ণ মূল ভূখণ্ডটি কি মালিকহীন, না কি দ্বিতীয় রাষ্ট্র তার দখল নেওয়ার আগে তা প্রথম রাষ্ট্রের কার্যকর সার্বভৌমত্বের অধীনে ছিল। উদাহরণ স্বরুপ, পালমাস দ্বীপকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক মামলার রায় থেকে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ওলন্দাজরা দ্বীপটির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করার আগে তা স্পেনের সার্বভৌমত্বের অধীন ছিল কিনা।

অর্পণ বা Cession

চুক্তির মাধ্যমে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের নিকট ভূখণ্ড হস্তান্তরকে অর্পণ বলে। এ প্রক্রিয়ায় এক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বাধীন কোনো অঞ্চলে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অর্পণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তবে যুদ্ধাবসানে শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে বিজিত রাষ্ট্র কর্তৃক বিজয়ী রাষ্ট্রের নিকট কোনো ভূখণ্ড হস্তান্তরের অনেকটা উদাহরণ রয়েছে। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির দ্বারা ১৯১৯ সালে জার্মানি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে সানফ্রান্সিসকো চুক্তির দ্বারা জাপান মিত্রশক্তির নিকট অনেক ভূখণ্ড অর্পণ করে। বিক্রয়, দান ও বিনিময়ের মাধ্যমেও অর্পণ সাধিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের নিকট থেকে লুইজিয়ানা ও রাশিয়া হতে আলাস্কা ক্রয় করে। ১৯৭৫ সালে রাশিয়া দক্ষিণ শাখালিনের বিনিময়ে করিল দ্বীপপুঞ্জ জাপানের নিকট অর্পন করে। অর্পনের ইতিহাস পুরোটাই শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছামূলক নয়। ইতিহাসে অসংখ্য অসম চুক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে শক্তিশালী রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দূর্বল রাষ্ট্রের ওপর দর্পণ বা হস্তান্তর চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গ ঔপনিবেশিক যুগে এমন অনেক চুক্তিই এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং সুযোগমতো এ সমস্ত রাষ্ট্রসমূহকে আশ্রিত রাষ্ট্র বা অধস্তন বা উপনিবেশে পরিণত করেছে।

রোয়েদাদ বা Judical award

অনেক সময় বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তিকে ভূখণ্ড অর্জনের পন্থা হিসেবে মনে করা হয়। কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কাজ হচ্ছে পক্ষসমূহের যে সমস্ত বৈধ অধিকার রয়েছে তা ঘোষণা করা। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তি কোনো রাষ্ট্রকে এমন কোনো ভূখণ্ড প্রদান করতে পারে না, যা তার ছিল না। তবে অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, রাষ্ট্রসমূহ সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কমিশন বা কোনো ভূখণ্ডের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আপস বা সালিশী কমিশন গঠন করে এবং কমিশনকে সীমানা বা ভূখণ্ড বিন্যস্ত করার লক্ষ্যে সামান্য পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তবে অবশ্যই স্বীকার্য, কমিশনের এ ধরনের ক্ষমতা পক্ষসমূহের চুক্তি থেকে উদ্ভূত। তাই কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো ভূখণ্ডের হস্তান্তরকে এক ধরনের সমর্পণই (Cession) বলা যায়।

পরিবৃদ্ধি বা Accretion

প্রাকৃতিক বা ভূ-ত্ত্বাত্ত্বিক উপায়েও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড অর্জিত হতে পারে, যেমন নদীর মোহনায় সমুদ্রাঞ্চলে নদীবাহিত পলি দ্বারা নতুন ভূখণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ভূমিকম্পে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন ভূখণ্ড বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে। নদী যদি আন্তর্জাতিক সীমানায় হয় তবে তার গতিপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা বাড়তে পারে। সীমানা নদীর গভীরতম নাব্য অংশে থ্যালওয়েগ হচ্ছে দুই রাষ্ট্রের বিভক্তিকরণ রেখা। থ্যালওয়েগের পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় সীমানা বাড়াতে পারে। সত্তর দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সমুদ্রাঞ্চলে হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় একটি ভূখণ্ড দৃশ্যমান হয়। বাংলাদেশ এর নাম দেয় দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ। ভারতও নিউমুর আইল্যান্ড নাম দিয়ে দ্বীপটির মালিকানা দাবি করে। ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়পরায়ণতার বিচারে দ্বীপটি বাংলাদেশের বলেই প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতিগতভাবে দ্বীপটির অস্তিত্ব এখন নেই।

রাজ্য জয় বা Conquest or annexation

রাজ্য জয়ের মাধ্যমে ভূ-খণ্ড অর্জন সাময়িক আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর মূল কথা হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের ভূ-খণ্ড দখল করা এবং সেখানে সার্বভৌমত্ব কায়েম বা তা নিজ ভূ-খণ্ডভুক্ত করা। অতীতে এ পন্থাটি নিষিদ্ধ ছিল না। ১৯২৮ সালে প্যারিসে স্বাক্ষরিত যুদ্ধ পরিহার সংক্রান্ত "কেলগো- ব্রায়ান্ড চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল না। তাই যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে ভূ-খণ্ডের পরিবর্তন ছিল সাধারণ প্রক্রিয়া। সাধারণত যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রের অনুকূলে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ভূ-খণ্ড অর্জিত হতো। শান্তিচুক্তি ছাড়াও যুদ্ধের পরে কোনো এক লক্ষ্য কর্তৃক দখলকৃত অন্যের ভূ-খণ্ডে সার্বভৌমত্ব কায়েমের রীতি ও প্রচলিত ছিল। তার জন্য শুধু শর্ত ছিল যুদ্ধাবস্থায় পুরোপুরি পরিসমাপ্তি ও অর্জনকারী রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট ভূ-খণ্ডে সার্বভৌমত্ব কায়েম করার ইচ্ছা প্রকাশ এবং সে লক্ষ্যে সেখানে তার সাধারণ প্রশাসন ও আইন চালু করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জার্মানিকে পরাজিত করে এবং তার পুরো ভূ-খণ্ড দখল করে নেয়, কিন্তু পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঐ ভূখণ্ড অধিকার বা নিজ ভূ-খণ্ডে অন্তর্ভুক্তকরণ থেকে বিরত থাকে।

উল্লিখিত প্যারিস চুক্তি এবং বিশেষ করে জাতিসংঘ সনদে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ হওয়ার পরে যুদ্ধের মাধ্যমে অন্যের ভূ-খণ্ড অধিকার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কখনই ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত আরব ভূ-খণ্ডের ওপর ইসরাইলি অধিকার স্বীকার করে নি এবং তা ইসরাইলের ভূ-খণ্ডে অন্তর্ভুক্তিকরণের যে কোনো প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকার পক্ষে মত দিয়েছে, কারণ বর্তমান স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, শক্তি কোনো স্বত্ব প্রদান করে না।

রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড বিলুপ্তির পদ্ধতিসমূহ

রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডসমূহ নিম্নোক্ত উপায়ে বিলুপ্ত হতে পারে :

১. রাজ্য জয়ের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের জন্য যেমন ভূখণ্ড অর্জিত হয় তেমনি অপর রাষ্ট্রের জন্য তা ভূখণ্ড বিলুপ্তি হয়।
২. দখলিস্বত্বের মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড বিলুপ্ত হতে পারে। কারণ, এক রাষ্ট্রের দখলিস্বত্ব প্রাপ্তির ফলে অন্য রাষ্ট্রকে ভূখণ্ড হারাতে হয়।
৩. হস্তান্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড বিলুপ্ত হতে পারে।
৪. আপস-মীমাংসার মাধ্যমেও এক রাষ্ট্র যেমন ভূখণ্ড লাভ করতে পারে, তেমনি অন্য রাষ্ট্র ভূখণ্ড হারাতে পারে।

মূলত যেসব পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড অর্জিত হয়, সেগুলো রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড বিলুপ্তির কারণ। অর্থাৎ এক রাষ্ট্রের জন্য যা অর্জন অপর রাষ্ট্রের জন্য তা বিলুপ্তি। এটি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র।

২.১৭ কল্যাণ রাষ্ট্র এবং বৈশিষ্ট্য/কার্যাবলি (Function of Welfare State)

আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রগুলো জনসেবামূলক কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে বোঝায়, যে রাষ্ট্র জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মাঝামাঝি অবস্থা। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

Herbert Lehman বলেন, "যেখানে জনগণের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তাদের প্রতিভা পূর্ণাঙ্গরূপে পুরস্কৃত হয়, তাকে জনকল্যাণ রাষ্ট্র বলে।

G.D.H. Cole-এর মতে, "জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হলো এমন একটি সমাজ যেখানে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।"

Arther Slesinger- মনে করেন, "জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সরকার সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান, অর্থ উপার্জন, শিক্ষালাভ, চিকিৎসার সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে।"

Eidnstein জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের একটি সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "যে রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধান করে এবং পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করে তাকে কল্যাণকর রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়"।

বস্তুত যে রাষ্ট্র ব্যক্তি বা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারকে সমুন্নত রেখে জনসেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন করে, তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

৭.১৭ কল্যাণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন

স্বৈরাচারী শাসন- শোষণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তিলাভের কামনা মানুষের দীর্ঘদিনের। একদিকে চরম পুঁজিবাদ আরেকদিকে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব দুই-ই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সংকুচিত করেছে; যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অপেক্ষাকৃত সংকুচিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। ধনতন্ত্রের সর্বব্যাপী সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধনতন্ত্রবাদের সমর্থন ও প্রচারকরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, মুমূর্ষু ধনতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের পথ পরিত্যাগ করতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে তারা জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসমর্থন লাভে সচেষ্ট হন। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আবার ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন জনগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার সংস্কারমূলক কার্য সম্পাদনে ব্রতী হন। তৃতীয় নেপোলিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জার্মানির বিসমার্ক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক বিমা প্রকল্প চালু করেন। ইংল্যান্ডের ডিকেন্স ওকিংসেলে, ডিসরেলী প্রমুখ খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রী জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার জন্য চালান। কালক্রমে জর্জ লয়েড ও তাঁর পরবর্তী সরকারগুলো রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণের প্রয়াস পান। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্র কল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদনে ব্রতী হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করে। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশকেও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায় যদিও তা আর্থিক কারণে সমাজকল্যাণমূলক যাবতীয় কার্য সম্পাদনে সক্ষম হচ্ছে না।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী? আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি পর্যালোচনা করুন।
২. রাষ্ট্র কাকে বলে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদানগুলো কী কী? রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে হবস, লক ও রুশোর চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা করুন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদটিকে আপনি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন?
৪. কল্যাণ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। বাংলাদেশ কী একটি কল্যাণ রাষ্ট্র- মতামত দিন।
৫. ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারে?
৬. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য কী হুমকি স্বরূপ?-ব্যাখ্যা করুন। এর ফলে বাংলাদেশে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?
৭. আন্তর্জাতিক নদী কাকে বলে? আন্তর্জাতিক নদীতে নৌ চলাচল কালীন ব্যবহার জাতিসংঘের ব্যবহার আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ৩

জাতীয় শক্তি, শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব ও যৌথ নিরাপত্তা

National Power, Balance of Power theory & Collective Socurity

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৩.১ ভূমিকা
৩.২ জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ
৩.৩ অবস্থান
৩.৪ আয়তন
৩.৫ জলবায়ু
৩.৬ ভূপ্রকৃতি
৩.৭ প্রাকৃতিক সম্পদ
৩.৮ জনসংখ্যা
৩.৯ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
৩.১০ সামরিক ক্ষমতা
৩.১১ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক উপাদান
৩.১২ সামাজিক উপাদান
৩.১৩ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান
৩.১৪ জাতীয় মর্যাদা
৩.১৫ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা
৩.১৬ মতাদর্শ
৩.১৭ জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক
৩.১৮ শক্তিসাম্য
৩.১৯ শক্তি সাম্যের বিকাশ
৩.২০ শক্তিসাম্যের বিভিন্ন রূপ
৩.২১ শক্তিসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতিসমূহ
৩.২৩ বিভেদ ও শাসন নীতি
৩.২৩ ক্ষতিপূরণ
৩.২৪ বাফার রাষ্ট্র
৩.২৫ অস্ত্রসজ্জা ও নিরস্ত্রীকরণ
৩.২৬ হস্তক্ষেপ থেকে বিরতি
৩.২৭ জোট ও বিরুদ্ধ জোট গঠন
৩.২৮ শক্তিসাম্যের কার্য
৩.২৯ সমালোচনা
৩.৩০ শক্তিসাম্যের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা
৩.৩১ যৌথ নিরাপত্তা
৩.৩২ শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তার সম্পর্ক

http://thejobstudy.com Go to Contents

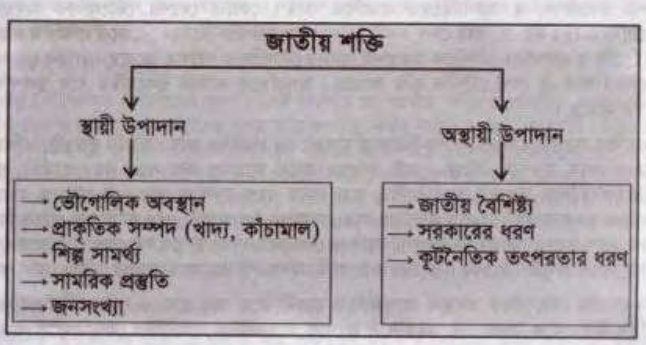
৩.১ ভূমিকা (Introduction)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় জাতীয় শক্তি ও তার উপাদান সম্পর্কে বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত: আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি এত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে যে, অনেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে শক্তিগত রাজনীতি (Power Politics) বলে উল্লেখ করেছেন। সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য জাতীয় শক্তি অপরিহার্য। জাতীয় শক্তি একটি মাধ্যম যার সাহায্যে কোনো রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করে। অর্গানস্কির (Organski) মতে, কোনো জাতীয় রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করবে তা অনেকাংশে তার জাতীয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত সব রাজনীতিই শক্তি অর্জন ও প্রয়োগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একটি জাতীয় শক্তির নিরাপত্তা, শান্তি, সম্মান, মর্যাদা প্রভৃতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো শক্তির। এ শক্তির দ্বারাই একটি জাতীয় শক্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় তার প্রভাব প্রদর্শনে সক্ষম হয়। এ প্রভাব প্রদর্শনের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে কোন জাতীয় শক্তি হয় ক্ষুদ্র না হলে বৃহৎ জাতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনায় এ শক্তির প্রদর্শন হয় সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। তবে সর্বক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রদর্শন প্রয়োজন হয় না। আমেরিকা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে এমন শক্তিশালী যা তাকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী জাতীয় শক্তিতে পরিণত করেছে। আবার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি একটি জাতীয় শক্তিকে শক্তিশালী জাতীয় শক্তি হিসেবে পরিগণিত করতে পারে। যেমন : জাপান, যার সামরিক শক্তি উল্লেখযোগ্য না হলেও তার অর্থনৈতিক শক্তি এমন পর্যায়ে যা তাকে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা দিয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীতে জাতীয় শক্তি হিসেবে শক্তিশালী রয়েছে চীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি জাতীয় শক্তি। এ জাতীয় শক্তির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় শক্তিগুলোকে সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিগুলো শক্তিশালী জাতীয় শক্তির কাছে সহায়তা প্রত্যাশা করে। এভাবে পৃথিবীতে কোনো জাতীয় শক্তি হয় বৃহৎ না হলে ক্ষুদ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। জাতীয় শক্তি গঠনে যে সকল উপাদান রয়েছে তা সব জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য। যেমন-একটি জাতীয় শক্তি বা National Power গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে ভৌগোলিক অবস্থান, সীমা বা আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প সামর্থ ও উৎপাদনক্ষম জনসংখ্যা।

৩.২ জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ (Elements of National Power)

জাতীয় শক্তি বহু উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। ই.এইচ.কার জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোকে তিন ভাগে



ভাগ করেছেন-সামরিক উপাদান, অর্থনৈতিক উপাদান ও জনমতের ওপর প্রভাব। অর্গানস্কি শক্তি দুধরনের উপাদানের উল্লেখ করেছেন-১. প্রাকৃতিক উপাদান, ২. সামাজিক উপাদান।

হ্যানস মরগেনথউ শক্তির উপাদানগুলো দু'ভাগে ভাগ করেছেন-১. অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উপাদানসমূহ ও ২. পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহ। শক্তির উপাদান হিসেবে তিনি ভৌগোলিক উপাদান, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পগত সামর্থ্য, সামরিক প্রস্তুতি, নেতৃত্ব, সামরিক শক্তি, জনসংখ্যা, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় আত্মবিশ্বাস, সরকারের গুণগত চরিত্র, কূটনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

উলফ্ জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোকে Tangible ও Intangible - দু'ভাগে ভাগ করেছেন। Tangible উপাদানের মধ্যে জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামরিক শক্তি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। Intangible উপাদানের মধ্যে তিনি নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব, সরকারের প্রকৃতি, সুনাম, বিদেশি সমর্থন ও নির্ভরশীলতার উল্লেখ করেছেন।

জোসেফ ফ্রাঙ্কেল জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোকে মোটামুটি এভাবে ভাগ করেছেন-ভৌগোলিক, জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, সাংঘটিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক এবং সামরিক কৌশগত উপাদান।

অধ্যাপক পামার ও পারকিনস জাতীয় শক্তির সাত রকমের উল্লেখ করেছেন-১. ভৌগোলিক উপাদান, ২. কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ, ৩. জনগণ, ৪. প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ৫. মতাদর্শ, ৬. জাতীয় আত্মবিশ্বাস, ৭. জাতীয় নেতৃত্ব।

ভৌগোলিক উপাদান (Geographical Elements) — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় ভূগোলের গুরুত্ব বহুদিন ধরে স্বীকৃত। ইতিহাসকে অনেকে চলমান ভূগোল বলে বর্ণনা করেছেন। নেপোলিয়ন মন্তব্য করেছিলেন যে, কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি তার ভূগোলের দ্বারা নির্ধারিত হয়, "the foreign policy of a country is determined by its geography." এ মন্তব্য অতিশয়োক্তি মনে হলেও মানব সভ্যতার বিকাশে ভৌগোলিক উপাদানের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। মরগেনথউ মন্তব্য করেছেন যে, সর্বাপেক্ষা যে স্থায়ী উপাদানের ওপর জাতীয় শক্তি নির্ভর করে তা হচ্ছে ভূগোল। ("The most stable factor upon which the power of a nation depends is obviously geography.") ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে কোনো দেশের অবস্থান, আয়তন, জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতিগত বিন্যাস অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

৩.৩ অবস্থান (Location)

ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে কোনো দেশের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তার জাতীয় শক্তি ও অন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ভূমিকা নির্ধারণ করে। অবস্থান কোনো দেশের রণকৌশল ও কূটনীতিকেও প্রভাবিত করে। কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হয় যে, সেই দেশ একটি নৌশক্তি বা স্থলশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের ভৌগলিক অবস্থানই তাদের নৌশক্তিতে পরিণত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের জন্য ঐ দেশ নৌশক্তি বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে জার্মানি স্থলবেষ্টিত বলে স্থলশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান কোনো দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া ও ইউরোপ থেকে স্থলপথে বিচ্ছিন্ন। তাই স্থলপথে তাকে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত বলে এসব দেশ স্থলপথে বার বার আক্রান্ত হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থান অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে আফগানিস্তান ও নেপালের মতো স্থলবেষ্টিত দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। সমুদ্রের কাছাকাছি দেশগুলো সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবিধা ভোগ করে।

কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার স্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে। সামরিক দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান ঐ অংশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছে।

আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য রাশিয়া আফগানিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে উৎসুক। কাশ্মিরের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কাশ্মিরের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আগ্রহী।

ভৌগোলিক অবস্থান বহুদিক থেকে পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে স্যার হালফোর্ড ম্যাকাইভার তাঁর Heartland Theory ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি ঐ তত্ত্বের মাধ্যমে কোনো জাতির শক্তিকে বৃহৎ নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন।

অপরদিকে আলফ্রেড মাহানের মতে, যে রাষ্ট্র সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই অধিকতর শক্তির অধিকার। ম্যাকাইভারের ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব (Geographical Theory) জার্মানি পণ্ডিতদের হতে বিকৃত রূপ ধারণ করে। অনেকের মতে জার্মানির আগ্রাসী নীতির পেছনে এ ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব ইন্ধন দিয়েছিল। ভূরাজনৈতিক তত্ত্বকে নানাদিক থেকে সমালোচনা করা হয়। তবে জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বকে কোনোমতে অস্বীকার করা যায়না।

৩.৪ আয়তন (Size)

ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে কোনো দেশের ভূখণ্ডের আয়তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের আয়তন নানাভাবে জাতীয় শক্তি নির্ধারণে সাহায্য করে। বর্তমান পৃথিবীতে দুই অতি শক্তিধর রাষ্ট্র-রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উভয়েই বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী। তবে ভূখণ্ডের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারযোগ্য জমি, সম্পদ প্রভৃতি বিবেচনা করতে হবে। অব্যবহারযোগ্য, সম্পদহীন ভূভাগের গুরুত্ব খুবই কম। বিশাল ভূখণ্ডে থাকলে কতকগুলো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়-

- বিশাল ভূভাগে বহু ধরনের সম্পদ থাকতে পারে ও তা জনগণের আবাসস্থল হতে পারে।
- রাষ্ট্রের বিরাট ভূখণ্ড থাকলে শত্রুরাষ্ট্রের পক্ষে সহজে সে রাষ্ট্র জয় করা সম্ভব হয় না।
- দেশের আয়তন বিশাল হলে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রকে সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে বহু দূরে প্রতিষ্ঠা করা যায়।
- দেশের আয়তন বিরাট হলে শত্রুদেশের পক্ষে সেই দেশ আক্রমণ করে অধিকার করে রাখা খুব কষ্টসাধ্য।

তবে আয়তন বড় হলেই যে জাতীয় শক্তি বেশি হবে সে কথা সব সময় নিশ্চিত করে বলা যায় না। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স তার স্বল্প আয়তন নিয়েই সারা পৃথিবীতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। জাপান তার স্বল্প আয়তন নিয়ে অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বহু অনুন্নত দেশ বিরাট আয়তনবিশিষ্ট হলেও জাতীয় শক্তির দিক থেকে দুর্বল। আবার দেশের বিশাল আয়তন থাকলেই হয় না, তাকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তান রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখতে পারে নি। আয়তন ও শক্তির সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে অর্গানস্কি বলেছেন, যখন আয়তন ও শক্তি পরস্পর সঙ্গে জড়িত থাকে তখন আয়তন বা শক্তি কোনটি প্রভাবশালী তা নির্ধারণ করা কঠিন।

৩.৫ জলবায়ু (Climate)

জলবায়ু ভৌগোলিক উপাদানের অংশ। সেই হিসেবে তা জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো দেশের আবাসস্থানের ওপর তার জলবায়ু নির্ভর করে। অবস্থান অনুযায়ী কোনো দেশ উষ্ণ বা শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অন্তর্গত হতে পারে। জলবায়ু কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ও জনগণের কর্মদক্ষতা নির্ধারণ করে। অতিরিক্ত উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক। মৌসুমী বায়ুর অন্তর্গত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ওপর কৃষি উৎপাদন বহুলাংশ নির্ভর করে। বস্তুত পৃথিবীর বহু কৃষিপ্রধান দেশই আজও বৃষ্টিনির্ভর। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জনগণের কর্মক্ষমতা বেশি থাকে। একথা সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলে মানুষ অনেক স্থানে প্রতিকূল জলবায়ুর দমন করেছে। তবে তা সত্ত্বেও জলবায়ু জাতীয় শক্তি নির্ধারণে আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৬ ভূ-প্রকৃতি (Topography)

ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভূ-প্রকৃতির ওপর বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, মৃত্তিকার অবস্থা, জনবসতির ঘনত্ব নির্ভর করে। কোনো দেশের অভ্যন্তরে যদি অতিরিক্ত পাহাড়,

পর্বত, নদী-নালা থাকে তবে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যয়সাধ্য। যোগাযোগ ও যাতায়াতের অসুবিধা অর্থনৈতিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। যোগাযোগের অসুবিধা থাকলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে কোনো দেশের সীমানায় উঁচু পাহাড়, নদী বা সমুদ্র থাকলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায়। দেশের মধ্যে পর্যাপ্ত নদী, নালা থাকলে জলসম্পদের সুবিধা পাওয়া যায়। অনেক সময় ভূ-প্রকৃতির অনুসারে বন্দর স্থাপিত হয়। ভূ-প্রকৃতির ইউরোপে অনেক উন্নত বন্দর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। কিন্তু আফ্রিকাতে একটিও উন্নত বন্দর নেই। আয়তন, অবস্থান ও জলবায়ুর মতো ভূ-প্রকৃতিও কোনো দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি নির্ধারণে সাহায্য করে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- জাতীয় শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জাতীয় রাষ্ট্রের আয়তন।
- জাতীয় রাষ্ট্রের অবস্থানও জাতীয় শক্তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- জাতীয় রাষ্ট্রের আবহাওয়া নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নাতিশীতোষ্ণ আবহওয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করে।
- Topography জাতীয় শক্তির ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।
- সামরিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি ভূ-রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

একটি জাতীয় শক্তির উপাদানের মধ্যে আরো যে বিষয়গুলো ক্রিয়াশীল থাকে তার মধ্যে রয়েছে যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দর্শন, সরকারের দক্ষতা, কূটনৈতিক নৈপুণ্য, সামরিক সক্ষমতা এবং জাতীয় ঐক্য। একটি জাতীয় শক্তি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হওয়া নির্ভর করে তার জাতীয় ঐক্যের ওপর। বাস্তবে বৃহৎ জাতীয় শক্তিগুলো যতটা জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ় করতে পারে একটি ক্ষুদ্র জাতীয় শক্তি ততটুকু নয়। পাশাপাশি একটি বৃহৎ শক্তির আচরণ সবসময় এক রকম থাকে না। অর্থাৎ একটি বৃহৎ জাতীয় শক্তি ও তার প্রয়োজনে অনৈতিক ভাবে জাতীয় শক্তির প্রদর্শন করতে পারে। যেমন : ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর একরূপ আচরণ করে। এ সময় বাংলাদেশ কিউবার সাথে পাটের বাণিজ্য চুক্তি করে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র Public Law– 480 বা PL– 480 এর আওতায় বাংলাদেশকে গম সহায়তা পথিমধ্যে বন্ধ করে দেয়। ফলে বন্যা উত্তর দ্রুত পুনর্গঠনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করা যায়নি। তাই ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অমর্ত্য সেন বলেছেন খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়না বরং ক্রয়ক্ষমতার হীনতার কারণে দুর্ভিক্ষ হয়। ১৯৭৪ সালে তাই হয়েছিল।

৩.৭ প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources)

কোনোদেশের জাতীয় শক্তি সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত উপযোগিতা সম্পন্ন দ্রব্যকে বোঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ, জল সম্পদ ও মাটির উর্বরতা অন্তর্ভুক্ত।

কৃষিজ সম্পদের মধ্যে খাদ্যশস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে যেসব দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাদের জাতীয় শক্তি বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে পশ্চিম ইউরোপকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত দেশকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। তা সত্ত্বেও ঐ সব দেশের জনগণ অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির জন্য তাদের উৎপাদনশীলতা কম। আজও আফ্রিকার বহু দেশ তীব্র খাদ্যাভাবে জর্জরিত। যে দেশ খাদ্য সমস্যায় আক্রান্ত সেই দেশ জাতীয় শক্তির দিক থেকে দুর্বল হতে বাধ্য। যে দেশ খাদ্যে যত স্বয়ংসম্পূর্ণ সেই দেশ তত স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে। খাদ্যশস্যের পরই অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য, যেমন-তুলা, পশম, রাবার, পাট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। এসব কৃষিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে ঐ সব কৃষিজ দ্রব্য গুরুত্বপূর্ণ। পশুজাত খাদ্য দ্রব্য ও জাতীয় শক্তির দিক থেকে মূল্যবান। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। পৃথিবীতে বহু দেশ আছে যারা একটি বা দুটি বা মাত্র কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি

করে। কিন্তু বিশ্বের বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বিগত কয়েক দশকে বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি। কয়েকটি দ্রব্যের দাম হ্রাস পেয়েছে। সে তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বিগত কয়েক দশকে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের উন্নয়শীল দেশগুলো কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানিজাত আয় হ্রাস পেয়েছে ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ঐ সব দেশের লেনদেন ব্যালেন্সে ঘাটতি রয়েছে। লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি পূরণের জন্য তারা বিশ্বের বাজার থেকে ঋণগ্রহণ করেছে। বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশ আজ গুরুতরভাবে ঋণের দায়ে জর্জরিত, তার ফলে তারা অর্থনৈতিক দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে।

বর্তমান শিল্পোন্নয়নের যুগে শিল্পের দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের গুরুত্ব অপরিসীম। কাঁচামালের মধ্যে খনিজ সম্পদ খুব প্রয়োজনীয়। খনিজ সম্পদ বহু শিল্পের অপরিহার্য উপাদান বলে সামরিক দিক থেকে খুব মূল্যবান। সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অধিকারী ও বহু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে বেশির ভাগ দেশই সব খনিজ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ও তাদের অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদি কোনো দেশ কোনো খনিজ সম্পদের জন্য অপরের ওপর নির্ভরশীল থাকে, তবে বিদেশের বাজারে ঐ খনিজ সম্পদের দাম বাড়ালে অর্থনীতি ক্ষতিগস্ত হয়। কোনো কারণে ঐ খনিজ সম্পদের সরবরাহ বন্ধ হলে সেই দেশ অত্যন্ত দুর্দশার সম্মুখীন হয়। তৈল সম্পদের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। অন্যান্য দেশ থেকে তেল আমাদানির ওপর ভারত এত বেশি নির্ভরশীল যে বিশ্বের বাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছিল।

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে শক্তি সম্পদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে তার সঙ্গে আণবিক শক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু দেশে আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ ও সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আণবিক শক্তির উৎস হিসেবে ইউরেনিয়ামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে অনেকে সৌরশক্তির সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। সৌরশক্তির যথাযথ প্রয়োগ শক্তির সমস্যা মেটাতে সাহায্য করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করে। শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের পক্ষে আধুনিক শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। শিল্পোন্নয়ন সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

তবে কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই যে শিল্পোন্নয়ন হবে এমন কথা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য চাই প্রযুক্তিগত বিদ্যার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ। এগুলো না থাকলে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব নয়। এ কারণে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পোন্নয়ন হয় নি। শিল্পে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত ধরনের সমরাস্ত্র তৈরিতে সাফল্য অর্জন করে নি। তার ফলে উন্নত সমরাস্ত্রের জন্য তারা পরনির্ভরশীল। অন্য দেশ থেকে সমরাস্ত্র ক্রয় করার জন্য তাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশগুলো সমরাস্ত্রের বলে অমিত শক্তি অর্জন করেছে। আবার ঐ সব সমরাস্ত্র বিক্রি করে বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জন করেছে। সুতরাং বর্তমানে বিশ্বে জাতীয় শক্তির নির্ধারক হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান।

মূল্য বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার সামরিক, শিল্পগত ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সহায়ক।
- খাদ্যশস্য জাতীয় শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- জলসম্পদ ও প্রাকৃতিক গ্যাস জাতীয় শক্তির উল্লেখযোগ্য উপাদান।
- প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিপূর্ণ ও Sustainable ব্যবহার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল।

৩.৮ জনসংখ্যা (Population)

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

কোনো দেশের জাতীয় শক্তির উপাদানরূপে মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যার গুরুত্ব বিচার করতে হলে তার গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কোনো দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জনগণের প্রয়োজন। দেশের প্রতিরক্ষার জন্যও জনসংখ্যার প্রয়োজন। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে জনসংখ্যা প্রয়োজন। যে দেশের জনসংখ্যা খুব বেশি সেই দেশে বিদেশি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রাধান্য বিস্তার করা খুব কষ্টসাধ্য। জনসংখ্যা খুব কম থাকলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় না। আবার জনসংখ্যা খুব বেশি হলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, প্রয়োজনীয় বাসস্থানের অভাব, বেকার সমস্যা ও অন্যান্য নানা ধরনের অভিশাপ দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত। বস্তুত বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই জনসংখ্যার তীব্র চাপ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা প্রকার অসুবিধা লক্ষ করা যায়। তবে কোনো দেশের মানবসম্পদকে যদি যথাযথভাবে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় তবে তা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

এ প্রসঙ্গে জনসংখ্যার গুণগত দিকটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেদিক থেকে জনগণের বয়সগত বণ্টন, জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত মান, উৎপাদনশীলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, ধর্মগত ও গোষ্ঠীগত বণ্টন, সামাজিক সংহতি প্রভৃতিও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে পামার ও পারকিনস বলেছেন যে, কোনো রাষ্ট্রে কত মানুষ বাস করে সে কথা জানাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, কী ধরনের মানুষ বাস করে ও তারা কী হবার চেষ্টা করছে সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। "It is important to know not only how many people live in a state but what kind of people they are, what they are doing, and what they are striving to become."

বয়সের দিক থেকে জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়ঃসীমা পর্যন্ত জনগণ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক দিক থেকে ঐ বয়সের জনগণের উৎপাদনশীলতা বেশি। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বয়স্ক ও বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি। অপরদিকে কম শিল্পোন্নত দেশে তরুণদের সংখ্যা বেশি। এ প্রসঙ্গে জনগণের আয়ুসীমার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের ধনী শিল্পোন্নত দেশে জনগণের গড় আয়ু প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত। সেই তুলনায় দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে জনগণের গড় আয়ু স্বল্প।

জনগণের উৎপাদনশীলতা তাদের জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মকুশলতার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড় মথাপিছু আয় এবং জাপানের গড় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ভারতের গড় মাথাপিছু আয় খুবই কম। সুতরাং তুলনামূলকভাবে ভারতের মত নিম্ন আয়সম্পন্ন দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। জীবনযাত্রার মান নিচু হলে জনগণের উৎপানশীলতা কম হয়। জনগণের উৎপাদনশীলতা যদি কম হয় তবে জাতীয় শক্তি হ্রাস পায়। বস্তুত দারিদ্র্য উন্নয়নশীল দেশে অনেক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ঐ সব দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। তার ফলে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে, বিশেষ করে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ঐ সব দেশে একই সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ জনগণ অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষার অভিশাপে জর্জরিত। যে দেশের জনগণের শিক্ষার মান যত উন্নত সেই দেশের জনগণের উৎপানশীলতা বেশি ও তার ফলে জাতীয় শক্তিও বেশি।

জনগণের উৎপাদনশীলতা তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নৈতিক গুণাবলি, সামাজিক ও

ধর্মগত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। জনগণের সামাজিক, জাতিগত, বর্ণগত কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ যদি এই ধর্ম ও ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পায়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বন্ধন দৃঢ় হলে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে জনগণের মধ্যে যদি অত্যধিক জাতিগত, ধর্মগত, গোষ্ঠীগত ও ভাষাগত বিভেদ থাকে তবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে বিভেদ দমনের জন্য জাতীয় শক্তির অপচয় হয়। জনগণের মধ্যে যত বেশি ঐক্য থাকবে ততই জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- জাতীয় শক্তি পরিমাপের সময় জনসংখ্যা গুণগত ও পরিমাণগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করা উচিত।
- জনগণের সংখ্যাগত দিক প্রকৃত চিত্র প্রতিফলন করে না। জনগণের গুণগত দিক- বয়সগত বণ্টন, নারী-পুরুষ বণ্টন, জন্মহার, শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যের মান, জীবনযাত্রার মান, উৎপাদনশীলতা, সাহস ও জনগণের নৈতিক শক্তি জাতীয় শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে সযত্নে বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩.৯ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

কোনো দেশের জাতীয় শক্তির অন্যতম উপাদান হলো অর্থনৈতিক শক্তি। অর্থনৈতিক শক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের স্তরের ওপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারই জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের মোট উৎপাদন, শিল্পোন্নয়ন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়ন, যথোপযুক্ত পরিকাঠামো ও অর্থনৈতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক নীতি প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বিশেষভাবে নির্ভর করে। শিল্পোন্নয়নের ওপর সমরশিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ নির্ভরশীল।

কোনো দেশের শিল্পের ভিতকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য ভারী ও মূল শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন। কোন দেশের শিল্পায়ন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, যেমন প্রযুক্তিগত দক্ষতা, পরিচালক দক্ষতা, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা, শ্রমিক-পরিচালক সম্পর্ক। শিল্পসামর্থ্য পরিমাপের সময় শিল্পে উৎপাদন সামর্থ্য ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। শিল্পজাত দ্রব্যের গুণগত মানও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তার প্রযুক্তিগত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। পামার ও পারকিনস জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে প্রযুক্তির উল্লেখ করেছেন। প্রযুক্তির অসাধারণ প্রাধান্য বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে Robert Heibroner মন্তব্য করেছেন যে, শান্তি ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক পদ্ধতির রুটিনমাফিক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, এমনকি, সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিটি ব্যাপারে সমসাময়িক জীবনকে প্রযুক্তির বিশাল ও গতিশীল উপস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। "The conduct of peace as well as war, the most routine flow of the economic process, even the intimate details of social existence must cope, at every instant, with the magnifying presence of a gigantic and dynamic technological foundation for contemporary life."

যুদ্ধের সময় সমরাস্ত্রমূলক প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে আণবিক প্রযুক্তি ও মহাকাশ প্রযুক্তিও ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব লাভ করেছে। সুতরাং প্রযুক্তির উন্নত স্তর জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করে। কেনো জাতির অর্থনৈতিক শক্তির মাপকাঠি হিসাবে কোন বিষয়কে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কোন সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব নেই। অনেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে দেশের নিট জাতীয় উৎপাদন, শিল্পায়নের হার, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের উল্লেখ করেন। World Development Report-এ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে বিশ্বের সমস্ত দেশকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

- নিম্ন আয়সম্পন্ন অর্থনীতি- ভারত, চীন এ শ্রেণিভুক্ত।
- মধ্য আয়সম্পন্ন ও নিম্ন-মধ্য আয়সম্পন্ন অর্থনীতি-মরক্কো, ফিলিপাইন, কঙ্গো এ শ্রেণিভুক্ত।

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

- উচ্চ-মধ্য আয়সম্পন্ন অর্থনীতি-ব্রাজিল, যুগোশ্লোভিয়া, ইরান, ইরাক এ শ্রেণিভুক্ত।
- উচ্চ আয়সম্পন্ন অর্থনীতি-জাপান, ইটালি, আমেরিকা প্রভৃতি এ শ্রেণিভুক্ত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলো বেশি প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী। অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশগুলোর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করছে।

৩.১০ সামরিক ক্ষমতা (Military Capacity)

জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে সামরিক ক্ষমতার গুরুত্ব অসীম। কোনো দেশের সামরিক ক্ষমতা সেই দেশের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা, যোগ্যতা, সেনাপতির নেতৃত্ব ও সমরাস্ত্রের উৎকর্ষের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক যুগে কোনো রাষ্ট্র সামরিক ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে শক্তিশালী না হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনা। বর্তমান যুগে সামরিক শক্তি কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে না, সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত সমরাস্ত্রের কলাকৌশলের উপরও সামরিক শক্তি নির্ভরশীল। সেনাপতির দক্ষতা, সেনাবাহিনীর যোগ্যতা ও সামরিক রণকৌশলও (military strategy) গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক শক্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশকে স্থির করতে হবে যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কোনো তত্ত্বের ওপর গড়ে তোলা হবে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মোট জাতীয় আয়ের কত অংশ ব্যয় করা হবে এবং কী ধরনের অস্ত্র উৎপাদন ও ক্রয় করা হবে। বিভিন্ন দেশের সামরিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। এ কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট সামরিক শক্তি ও সামর্থ্যের পরিসংখ্যান ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সঠিক সরকারি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

বর্তমানে প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম, সামরিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে বহু দেশ ব্যাপক গবেষণা চলছে। তার ফলে সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। আণবিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আণবিক প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা চলছে। বর্তমানে যে দেশ আণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারছে সেই দেশের সামরিক দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি। বর্তমানে অনেক রাষ্ট্র নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে সেই শক্তির ভিত্তিতে অন্য রাষ্ট্রকে তার আক্রমণাত্মক নীতি ও কার্যাবলি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তাকে নিবর্তন বলে। আণবিক অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অন্যকে আণবিক আক্রমণ থেকে বিরত রাখাকে Nuclear Deterrence বলে। বহুদিন ধরে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Nuclear deterrence-এর মাধ্যমে আণবিক যুদ্ধ বন্ধের নীতি অনুসরণ করছে। তবে বিশ্বে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাণ্ডারে এত আণবিক সঞ্চিত হয়েছে যে, অনেকেই তাতেও উদ্বিগ্ন হয়ে আণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব তুলেছিলেন। সম্প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে প্রচুর আধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয় করছে। তার ফলে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে ও তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বাপেক্ষ উদ্বেগের কথা হচ্ছে যে, দায়িত্ব তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোর অর্থ উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত না হয়ে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হচ্ছে। তার ফলে ঐ সব দেশের উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- সামরিক শক্তি জাতীয় শক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অর্জনেও সাহায্য করে।
- সামরিক নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সৈন্যদের গুণগত মান ও দক্ষতা জাতীয় শক্তি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

৩.১১ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক উপাদান (Political-Adminstrative Elements)

জাতীয় শক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের মধ্যে

জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদান থাকলেই হবে না, ঐ উপাদানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে ব্যবহার করে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। প্রত্যেক দেশে সরকারের ওপরই এ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। সরকারের প্রকৃতির ওপর সরকারের শক্তি ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার জনমতের উপর বেশি নির্ভরশীল। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এ সরকার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। গণতান্ত্রিক সরকারের পেছনে ব্যাপক জনসমর্থন থাকে বলেই সরকার বেশি শক্তিশালী।

প্রত্যেক দেশের সরকারের দক্ষতার ওপরই জাতীয় শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। সরকারই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করে ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। সরকার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করে। সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়ন করে। বহু দেশে সরকার দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে, অগ্রাধিকার স্থির করে, সম্পদ সংগ্রহ করে; উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগের নীতি নির্ধারণ করে ও দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। অনেক সময় সরকার অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করে। সরকার প্রয়োজনবোধে অন্য দেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করে বা জোট গঠন করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

হ্যানস মরগেনথউ মন্তব্য করেছেন যে, কোনো বিচক্ষণ সরকার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে।

প্রথমত : সরকার জাতীয় শক্তি গঠনকারী প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় : সরকার জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করবে।

তৃতীয়ত : সরকার পররাষ্ট্রনীতির স্বপক্ষে জনসমর্থন অর্জনের চেষ্টা করবে।

কোনো সুদক্ষ সরকার শুধু তার পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে নিজ দেশের জনগণের সমর্থন লাভ করেই ক্ষান্ত হবে না। তার পররাষ্ট্রনীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতির সপক্ষে অন্যান্য দেশের জনসমর্থন লাভেরও চেষ্টা করবে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কার্যাবলির পার্থক্য ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি অন্য দেশের সমর্থন জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

এ প্রসঙ্গে সরকারের নেতৃত্বের প্রসঙ্গটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি দক্ষ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হন তবে তাঁরা সুদক্ষ নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে দেশের শক্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করতে পারেন। পুনরায় সরকারের নেতৃবৃন্দ যদি অদক্ষ ও অবিবেচক হন তবে তাঁদের কার্যকলাপ জাতীয় শক্তিকে দুর্বল করে তোলে। যুদ্ধের সময় সরকারি নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় বিচক্ষণ সরকারি নেতৃত্ব জনগণের ও সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারে। শান্তির সময়েও সরকারি ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সরকারি নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে।

রাজনৈতিক উপাদানের মধ্যে আমলাতন্ত্রের দক্ষতা ও উৎকর্ষতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে নীতি প্রণয়ন করে তা রূপায়ণের দায়িত্ব থাকে আমলাদেরই ওপর। আমলাদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার ওপর সরকারি নীতির সার্থক প্রয়োগ অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যত প্রসারিত হচ্ছে ততই আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমলারা যদি দক্ষ ও সৎ হয় তবে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, আমলারা যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তবে জাতীয় শক্তি হ্রাস পায়।

এই প্রসঙ্গে জাতীয় শক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদদের ভূমিকাও মনে রাখতে হবে। সরকার যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের দায়িত্ব কূটনীতিবিদদের। কূটনীতিবিদরা বিদেশের সঙ্গে দেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে, বিদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত লেনদেনের ব্যাখ্যা করে। বিদেশে স্বদেশের নীতি ব্যাখ্যা করে তার স্বপক্ষে বিদেশের জনমতকে প্রভাবিত করা কূটনীতিবিদের দায়িত্ব। যদি কোনো দেশের কূটনীতিবিদরা অদক্ষ ও অযোগ্য হন তবে জাতীয় শক্তির সমস্ত অনুকূল উপাদান থাকলেও সেই রাষ্ট্র

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব, প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারে না। অপরদিকে, কূটনীতিবিদরা যদি অত্যন্ত সুদক্ষ হয় তবে তারা নিজেদের যোগ্যতায় জাতীয় শক্তির দুর্বলতা অনেকটা পূরণ করে দেয়। সুদক্ষ কূটনীতিবিদরা জাতীয় শক্তির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। অনেক সময় অনেক রাষ্ট্র তার কূটনৈতিক যোগ্যতার বলে তার জাতীয় শক্তির তুলনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। কূটনীতির এ গুরুত্বকে দিয়ে হ্যানস মরগেনথ কূটনীতিকে জাতীয় শক্তির মস্তিষ্ক বলে বর্ণনা করেছেন। "Diplomacy, one might say, is the brain of national power."

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিহত জাতীয় শক্তির অধিকারী হলেও বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নি। কারণ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মরগেনথউ উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৯০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ফ্রান্স তার শক্তি কম থাকা সত্ত্বেও সুদক্ষ কূটনীতির বলে বিশ্বরাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিসমার্কের সুদক্ষ কূটনীতি জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। কাভুর ইটালির শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন। সেই কারণে মরগেনথউ মন্তব্য করেছেন যে, "Nations must rely upon the quality of their diplomacy to act as catalyst for the different factors that constitute their power."

রাজনৈতিক উপাদানের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি প্রভৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশের রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য বিশ্বজনগণের শ্রদ্ধা ও সমর্থন অর্জন করে সে দেশের জাতীয় মর্যাদা ও শক্তি বেশি।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলি বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণমান জাতীয় শক্তির ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।
- আমলাতন্ত্রের গুণমান বিশেষত আমলাদের দক্ষতা ও সততা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করে।
- কূটনীতি জাতীয় শক্তির মস্তিষ্করূপে গণ্য হয়।

৩.১২ সামাজিক উপাদান (Social Elements)

জাতীয় শক্তির দিক থেকে সামাজিক উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক উপাদানের মধ্যে সমাজের জাতি, ধর্ম ও বর্ণগত কাঠামো উল্লেখযোগ্য। কোনো দেশের জনগণ যদি একই জাতি ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা সহজ হয়। জনগণের মধ্যে সামাজিক ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত শক্ত করে। ঐক্যবদ্ধ জনগণের সাহায্যে জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ সহজ হয়। কিন্তু সমাজে যদি বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগত অনৈক্য থাকে তবে ঐক্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার ওপর বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যদি বিবাদ ও সংঘর্ষ শুরু হয় তবে তা জাতিকে দুর্বল করে তোলে। ঐ ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষের মোকাবেলার জন্য জাতীয় শক্তির অপচয় হয়। কোন দেশের জনগণের মধ্যে তীব্র সামাজিক অনৈক্য থাকলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের মর্যাদা হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ জনগণের মধ্যে বিরোধের উল্লেখ করা যায়। কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক আচারণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সমগ্র বিশ্ববাসীর নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে। রাশিয়াতেও জাতিগত বিরোধ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিরোধ সে দেশের উদ্বেগের কারণ। ভারতে শিখ উগ্রপন্থিদের আচরণে ভারত সরকার বিব্রত। সুতরাং দেশের জনগণের মধ্যে সামাজিক ঐক্য সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে জনগণের মধ্যে তীব্র সামাজিক বিরোধ জাতীয় দুর্বলতার পরিচায়ক।

৩.১৩ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (Psychological Elements)

জাতীয় শক্তির মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে জাতির আত্মবিশ্বাস, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মর্যাদা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন দেশের জনগণের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তি সেই দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করে। আত্মবিশ্বাস (Morale) বলতে কী বোঝায় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। এটি প্রধানত

একটি মানসিক অনুভূতি। জনগণের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক দৃঢ়তা জনগণকে দেশের জন্য সংগ্রাম করতে, দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রণোদিত করে। কোনো জাতির আত্মবিশ্বাস কম থাকলে যুদ্ধ ও সংকটের সময়ে সে জাতি বিশেষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অপরদিকে, যে জাতির বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস আছে সে জাতি দৃঢ় সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ বা অন্য যে কোনো রকম সঙ্কটের মোকাবেলা করতে পারে।

অধ্যাপক পামার ও পারকিনসের মতে, জনগণের আত্মবিশ্বাস (Morale) আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। মানবেতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ (কমিউনিজম) বা ধর্ম বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষকে আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছে।

জাতির আত্মবিশ্বাস অনেক সময় প্রচারের মাধ্যমে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। তবে শুধুমাত্র প্রচারের দ্বারা সব সময় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা যায় না। সুদক্ষ জাতীয় নেতৃত্ব জাতির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের সুদক্ষ নেতৃত্ব ইংরেজ জাতির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিল।

কেনো জাতির আত্মবিশ্বাস সে জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়। জাতির মধ্যে যদি তীব্র সামাজিক অনৈক্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে তবে তা জাতীয় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে না। ঐ ধরনের অনৈক্য ও বিরোধ জাতির আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ন করে জাতীয় শক্তি হ্রাস করে।

হ্যানস মরগেনথউ উল্লেখ করেছেন যে, জাতির আত্মবিশ্বাস সরকারের ওপর নির্ভরশীল। সরকার যদি ব্যাপক জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সরকারের জনপ্রিয়তা জাতির আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। অপরদিকে, সরকার যদি স্বৈরাচারী হয়ে জনসমর্থন হারায় তবে জাতির মনোবল ভেঙে পড়ে ও আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয়। বস্তুত, জাতির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস না থাকলে জাতীয় শক্তির সম্ভাব্য উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় চরিত্রের ধারণাও উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। অনেক লেখক জাতীয় চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রাশিয়ানদের অধ্যাবসায়, মার্কিন জনগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগপ্রিয়তা, ব্রিটিশ জনগণের বাস্তবজ্ঞান, জাপানিজদের কর্মনিষ্ঠা ও জার্মানদের শৃঙ্খলাপরায়ণতার উল্লেখ করে। তবে জাতীয় চরিত্র বলতে সঠিক কী বোঝায় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐকমত নেই। উপরন্তু জাতীয় চরিত্রও পরিবর্তনশীল। সে কারণে জাতীয় চরিত্রের ধারণা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

তবে বিভিন্ন জাতির চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। হ্যানস মরগেনথউ মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংকট ও জরুরি অবস্থার যারা মোকাবেলা করেন তাঁদের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কেল বলেছেন যে, জাতীয় চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্য যে জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক তা নির্ধারণ করা কঠিন।

৩.১৪ জাতীয় মর্যাদা (National Prestige)

অনেক লেখক জাতীয় মর্যাদাকে জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোনো জাতির কার্যাবলি ও মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন জাতির মর্যাদা তার নিজের ধারণার ওপর গড়ে ওঠে না। অন্যান্য রাষ্ট্র ও বিশ্বজনগণ তার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার ওপর সংশ্লিষ্ট দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চায়। সেই রাষ্ট্রের লক্ষ্য, আদর্শ, নীতি, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা, তার পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক আচরণ সম্মিলিতভাবে বিশ্বের সামনে তার ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। সে ভাবমূর্তির ওপরেই জাতীয় মর্যাদা নির্ভর করে।

জাতীয় মর্যাদা ধারণাও পরিবর্তশীল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদার পরিচায়ক বলে গণ্য করা হয়। সামরিক দিক থেকে বর্তমানে আণবিক শক্তি অর্জন ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত ও

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

ব্যবহারের ক্ষমতাকে মর্যাদার পরিচায়ক বলে ধরা হয়। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। গণতান্ত্রিক সরকার সমন্বিত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার সমন্বিত রাষ্ট্রের অপেক্ষা বেশি। সম্প্রতি মানবাধিকার রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয় জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে জড়িত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারকে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ঘৃণা করে। যুদ্ধবাজ, আক্রমাণাত্মক সরকারের মর্যাদা কম। যে সরকার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার দমনের জন্য দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে সরকারের আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস পায়।

৩.১৫ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা (International position)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থান কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি নির্ধারণ করে। কোনো রাষ্ট্র কোন সামরিক জোটের অংশীদার হতে পারে, কোনো আঞ্চলিক জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে, আবার জোট নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতে পারে। কোন জোটের সদস্য হলে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। একদিকে জোটভুক্ত সদস্য রাষ্ট্র বিশেষ সুবিধা পায়। যৌথ সহযোগিতায় সকলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, জোট আবার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ন করতে পারে । এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি নির্ধারণের সময় সেই রাষ্ট্রের নিজস্ব শক্তির সঙ্গে সে যে জোটের অন্তর্ভুক্ত সে জোটের সামগ্রিক শক্তিকে হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে।

হ্যানস মরগেনথউ- এর মতে, জাতীয় শক্তি পরিমাপ করার সময় কতকগুলো বিষয় মনে রাখতে হবে।

প্রথমত: কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে এত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যে, একটি উপাদানের কোনো পরিবর্তনের অন্য উপাদানগুলোকে প্রভাবিত করে। একটি পরিবর্তিত উপাদান অন্য উপাদানগুলোকে কীভাবে কতটা প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণের বিষয়।

দ্বিতীয় : কোনো দেশের জাতীয় শক্তির এক উপাদানের সঙ্গে অন্য দেশের জাতীয় শক্তির সেই উপাদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

জাতীয় শক্তি পরিমাপের সময় কতকগুলো সাধারণ ত্রুটি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় কোন একটি রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না। কিন্তু জাতীয় শক্তি সবসময় তুলানামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে। জাতীয় শক্তিকে স্থায়ী মনে করা ভুল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিগত সম্পর্ক নিয়ত পরিবর্তনশীল।

জাতীয় শক্তির একটি উপাদানকে সর্বতোমুখী প্রাধান্য দিয়ে অন্য উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করাও ভুল। ভু -রাজনৈতিক তত্ত্ব অত্যধিক পরিমাণে উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। Militarism বা সমরবাদ জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে সামরিক শক্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে।

সুতরাং জাতীয় শক্তি পরিমাপের সময় এসব ত্রুটি পরিহার করতে হবে। জাতীয় শক্তি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের ফল। এ সব উপাদানের বেশিরভাগ পরিবর্তনশীল। উপাদানগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বও সব সময়ে স্থির থাকে না। এ কারণে জাতীয় শক্তি নির্ধারণ ও পরিমাপ করা কঠিন। বিভিন্ন জাতির জাতীয় শক্তি পরিমাপের সময় যথাযথ তুলানামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জাতীয় শক্তি পরিমাপের জন্য যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা অপরিহার্য।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- জাতির জনগণের দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস জাতীয় শক্তির সম্ভাব্য উপাদানগুলো সুদক্ষ ব্যবহারের পথ সুগম করে।
- জাতীয় চরিত্র বহুক্ষেত্রে জাতীয় শক্তির উপাদান রূপে পরিগণিত হয়।
- জাতীয় মর্যাদা জাতীয় শক্তির অন্যতম উপাদান বলে গণ্য হয়।

৩.১৬ মতাদর্শ (Ideology)

মতাদর্শ (Idelogy) অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় শক্তির উপাদান বলে পরিগণিত হয়েছে।

- ডেভিড ইস্টনের মতে, মতাদর্শ বলতে সেসব আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বোঝায় যাদের সাহায্যে কেনো ব্যবস্থার (system) অতীতকে ব্যাখ্যা, বর্তমানকে বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন রচনা করা যায়। (Ideologies are articulated set of ideals, ends and purposes with help members of the system to interpret the past, explain the present and offer a vision for the future).
- রেম এ্যারন মতাদর্শের সংজ্ঞা দান করে বলেছেন- "An indeology presupposes in apparently systematic formalisation of facts, interpretations, desires and predictions." অর্থাৎ মতাদর্শ বলতে বিভিন্ন তথ্য, ব্যাখ্যা, ইচ্ছা ও ধারণাসমূহের সুসংবদ্ধ বিবৃতি বোঝায়।
- রিচার্ড স্টারলিং মতাদর্শকে একগুচ্ছ ভাব (A set of ideas) বলে বর্ণনা করেছেন যাদের সাহায্যে অতীতকে অর্থবহ করে তোলা হয়, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করা যায়।
- জেরিমি বেনথাম (Jeremy Bentham) বলেছেন, মতাদর্শগুলো হচ্ছে মনের সেসব পাতা যাদের সাহায্যে আচার-আচরণের মূল উদ্দেশ্যগুলো গোপন রেখে আচার-আচরণকে সমর্থন করা হয়। (Ideologies are the fig leaves of the mind used to justify the behaviour while concealing the real motives fot it).

মতাদর্শ একদিকে যেমন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তেমনই বিভক্ত করে। এটি জনগণের মধ্যে বাস্তব বিষয়ে সমান ধারণা সঞ্চার করে ঐক্যবদ্ধ করে। পুনরায় মতাদর্শ তার ছলনাময়ী প্রকৃতি ও আবেগ প্রবণতার জন্য জনগণের মধ্যে বিভেদেরও সৃষ্টি করে।

মতাদর্শকে ছলনাময়ী বলা হয়, এটি জনগণকে যে প্রতীক (symbol) দান করে তা শাসকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থে জনগণের সমর্থন লাভের জন্য সৃষ্টি করেছে।

মতাদর্শ ভাবাবেগের সঞ্চার করে এবং তা প্রেম, ঘৃণা, ক্রোধ ও ভীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

হ্যানস মরগেনথউ-এর মতে, কোনো নীতির সত্য প্রকৃতি মতাদর্শগত সমর্থন ও যুক্তির মাধ্যমে গোপন করা হয় (the true nature of the policy is concealed by ideological justifications and rationalization).

তিনি পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলো প্রচলিত মতাদর্শের উল্লেখ করেছেন, যেমন-

- স্থিতাবস্থায় মতাদর্শসমূহ (Ideologies of the status quo)।
- সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ (Ideologies of imperialism) ।
- অনিশ্চিত মতাদর্শ (Ambiguous ideologies)।

মরগেনথউ-এর মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রাষ্ট্র স্থিতাবস্থার নীতিকে সমর্থন করার জন্য মতাদর্শকে ব্যবহার করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শকে অনেক রাষ্ট্রই তাদের সম্প্রসারণবাদী নীতির সমর্থনে ব্যবহার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ অনুসারে দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের ওপর আধিপত্য স্থাপনের অধিকার সব রাষ্ট্রের আছে। প্রাকৃতিক অনুযায়ী দুর্বল সবলের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য।

মরগেনথউ-এর মতে, তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দাবিগুলো ভাবাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় বিশ্ব তাদের আর্থিক দুর্দশার দায়িত্ব ধনী দেশগুলোর ওপর চাপাতে চেষ্টা করে। কিন্তু দারিদ্র্যের পিছনে বহু কারণ বর্তমান। তার মধ্যে পরাধীনতা অন্যতম কারণ।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারভিত্তিক মতাদর্শও একটি প্রভাবশালী মতাদর্শ। এ মতাদর্শকে কেন্দ্র করে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের বিরোধ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক দেশ শান্তির মতাদর্শকে প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। জাতিসংঘের মতাদর্শকে অনেক দেশ তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করেছে।

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

অধ্যাপক পামার ও পারকিনস লক্ষ করেছেন যে, বলশেভিক বিদ্রোহের পর বিশ্ব রাজনীতিতে মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বলশেভিক নেতারা সাম্যবাদের মতাদর্শ সমর্থন করেছিলেন। পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলো দৃঢ়ভাবে ঐ মতবাদের বিরোধিতা করে উদার গণতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করেছিল। ক্রমে ক্রমে সাম্যবাদ ও পশ্চিমি উদার গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধিতার জন্য ঠাণ্ডাযুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছে। অনেক লেখক ঠাণ্ডাযুদ্ধকে মতাদর্শগত বিরোধ ও শক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছেন।

এ প্রসঙ্গে পামার ও পারকিনস মন্তব্য করেছেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মতাদর্শের প্রাধান্য তখনই বৃদ্ধি পেয়েছে যখন মতাদর্শের পেছনে যথেষ্ট জাতীয় শক্তির সমর্থন ছিল। তাঁদের মতে মতাদর্শ যত উচ্চস্তরের হোক না কেন শক্তির সমর্থন ছাড়া প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় শক্তি মার্ক্সবাদকে একটি দুর্দমনীয় মতাদর্শে পরিণত করেছে।

বিশ্ব রাজনীতির ওপর মতাদর্শের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

- অনেক ক্ষেত্রে মতাদর্শ জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য সঞ্চার করেছে।
- কতকগুলো ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতাদর্শগুলো জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছে।
- অনেক সময় কোনো রাষ্ট্রের মতাদর্শের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের বিরোধ দেখা গেছে। সাধারণত সেসব ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে মতাদর্শের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।
- কতকগুলো ক্ষেত্রে মতাদর্শ মানবসভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের মতাদর্শ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কল্যাণমূলক সহযোগিতা প্রসারিত করেছে।
- কিন্তু যুক্তিহীন মতাদর্শ আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করে মানবসমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

অনেক লেখকের মতে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালে মতাদর্শ তার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে মতাদর্শের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্বের ধনী দেশগুলো বিশ্বায়নের মতাদর্শ প্রচার করছে। তারা বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনীতির নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী।

তবে অনেক সমালোচনার মতে, বিশ্বায়নের মতাদর্শ আসলে বিশ্ব ধনতন্ত্রের মতাদর্শ। একথা অনস্বীকার্য যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর মতাদর্শের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এখনও লক্ষ করা যায়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- মতাদর্শ মানবের আচার-আচারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
- বর্তমানে শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মতাদর্শের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সম্প্রতি বিশ্বায়নের মতাদর্শ গুরুত্ব লাভ করেছে ও অনেকে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শক্তি ও বিশ্ব রাজনীতির নতুন ব্যাখ্যা দানের পক্ষপাতী।

৩.১৭ জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক

- জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভৌগোলিক উপাদানগুলো মধ্যে আয়তন, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক উপাদানগুলোর সঙ্গে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ সম্পর্কযুক্ত। দেশের আয়তন বেশি হলে প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি থাকার সম্ভাবনা। ভূপ্রকৃতি অনুসারে খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদের প্রাপ্তি নির্ভর করে।
- জাতীয় শক্তির অপর উপাদান প্রাকৃতিক সম্পদ। তার সঙ্গে জনসংখ্যাগত উপাদান সম্পর্কযুক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য জনগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি দক্ষতা, সততা ও প্রশাসনিক যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।
- জাতীয় শক্তি উন্নয়নের হারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার ও সে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য জনগণের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, সরকারি নীতি ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে।
- জাতীয় শক্তির প্রশাসনিক উপাদানের মধ্যে সরকারি নীতি এবং মন্ত্রী ও আমলাদের কর্মদক্ষতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক উপাদানের ওপর প্রাকৃতিক উপাদানের সুযোগ্য ব্যবহার নির্ভরশীল। প্রশাসনিক দক্ষতা জনগণের গুণগত মান, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- সামরিক উপাদান, বিশেষত সমরাস্ত্রের গুণগত মান দেশের শিল্পোন্নয়ন ও উচ্চ প্রযুক্তিগত মানের ওপর নির্ভরশীল।
- সামাজিক উপাদান জনগণের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। সামাজিক ঐক্য জাতির মনোবল বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।
- জাতীয় শক্তির মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে জনগণের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা ও জনগণের গুণগত মানের ওপর নির্ভরশীল। প্রশাসনিক নীতি অনেকাংশে জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, মনোবল ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সুতরাং জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। জাতীয় শক্তির ভৌগোলিক উপাদান, অর্থনৈতিক উপাদান, জনসংখ্যাগত উপাদান, সামাজিক উপাদান, সামরিক উপাদান, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান ও প্রশাসনিক পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

হ্যানস মরগেনথউ-এর মতে, জাতীয় শক্তি পরিমাপ করার সময় কতকগুলো বিষয় মনে রাখতে হবে।
প্রথমত, কোন রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে এত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যে, একটি উপাদানের কোন পরিবর্তন অন্য উপাদানগুলোকে প্রভাবিত করে। একটি পরিবর্তিত উপাদান অন্য উপাদানগুলোকে কীভাবে কতটা প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ বিষয়।
দ্বিতীয়, কোন দেশের জাতীয় শক্তির এক উৎপাদানের সঙ্গে অন্য দেশের জাতীয় শক্তির সেই উপাদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জাতীয় শক্তির পরিমাপের সময় কতকগুলো সাধারণ ত্রুটি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় কোনো একটি রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না। সুতরাং জাতীয় শক্তি সবসময় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে। জাতীয় শক্তির একটি উপাদানকে সর্বতোমুখী প্রাধান্য দিয়ে অন্য উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করাও ভুল। ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব অত্যধিক পরিমাণে ভৌগোলিক উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সমরবাদ জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে সামরিক শক্তির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে।

সুতরাং জাতীয় শক্তি পরিমাপের সময় এ সব ত্রুটি পরিহার করতে হবে। জাতীয় শক্তি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের ফল। এ সব উপাদানের বেশির ভাগ পরিবর্তনশীল। উপাদানগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বও সব সময়ে স্থির থাকে না। এ কারণে জাতীয় শক্তি নির্ধারণ ও পরিমাপ করা কঠিন। বিভিন্ন জাতির জাতীয় শক্তি পরিমাপের সময় যথাযথ তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জাতীয় শক্তি পরিমাপের জন্য যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা চাই।

আর্গানস্কির মতে, যৌথ নিরাপত্তা ধারণা পাঁচটি অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
১. কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষে সমস্ত রাষ্ট্রই আক্রমণকারী কে সে বিষয়ে ঐক্য মত্য পোষণ করবে।
২. আক্রমণ যে উৎস থেকেই উদ্ভব হোক না কেন, সব রাষ্ট্রই তা প্রতিরোধ করতে আগ্রহী থাকবে।
৩. সকল রাষ্ট্রই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করার ব্যাপারে সমানভাবে স্বাধীন ও সক্ষম থাকবে।
৪. সমস্ত রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির আক্রমণকারীকে পরাহত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।
৫. আক্রমণকারী তার বিরুদ্ধে যৌথ শক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ত্র ত্যাগ করবে বা পরাজিত হবে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

হ্যান্স মরগেনথউ-এর মতে, যৌথ নিরাপত্তার ধারণা কার্যকর করার জন্য তিনটি শর্তপূরণ প্রয়োজন।

১. যৌথ নিরাপত্তার মাধ্যমে সম্ভাব্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এত বেশি শক্তি সংহত করা হবে যে, আক্রমণকারী যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করবে না।

২. যেসব রাষ্ট্রের শক্তি যৌথভাবে ঐক্যবদ্ধ করা হবে তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে এরকম ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৩. যেসব রাষ্ট্রের শক্তি ঐক্যবদ্ধ করা হবে তারা বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য নিজেদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবে।

অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে সামরিক সৈন্যের ওপর ও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

কোনো বিশেষ শক্তি বা জোটের বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ঠিক নয়। পামার ও পারকিনসের মতে, যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা, এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রগুলো বিপদের সময় সম্পূর্ণভাবে তাদের দায়িত্ব মেনে চলবে কিনা ও বিশ্বের সব বা অন্ততপক্ষে বৃহৎ শক্তিগুলো এই যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কিনা। ("The decisive tests would seem to be whether the system is strong enough, whether the states associated in it abide by their obligations to the fullest extent necessary in time of crisis, and whether all, or at least most of the great powers adhere to it.")

লীগ চুক্তিপত্রের প্রণেতাগণ যৌথ নিরাপত্তার ধারণাকে চুক্তিপত্রের মূল বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। তবে লীগ চুক্তিপত্র একটি ত্রুটিসহ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। লীগের আমলে শান্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে মূল ত্রুটি নিহিত রয়েছে। লীগ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঠিকমতো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

লীগের অভিজ্ঞতার আলোকে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ উন্নত ধরনের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরই পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ বিশ্বকে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছিল। নিরাপত্তা পরিষদ যৌথ শান্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে শান্তি রক্ষা করতে পারে নি।

লীগ ও জাতিসংঘের অভিজ্ঞতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, একটি কার্যকরী যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একগুচ্ছ নির্দিষ্ট নিয়মাবলি সমস্ত বিশ্বে প্রয়োগ করা হবে ও ঐসব নিয়মাবলি প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। স্বাভাবতই তার জন্য জাতিসংঘের সদস্যদের পক্ষে উচ্চ নৈতিক আচরণ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত ও মূল্যবোধের যে পরিবর্তন দাবি করে, বিশ্বের জনগণের বা সরকারসমূহের মধ্যে সে ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় না। ("Neither people, nor governments have undergone the transformation of view-points, attiudes and values which collective security demands.") জাতিসংঘ এসব শর্ত পূরণের অভাবে একটি কার্যকরী যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি।

অর্গানস্কির মতে, যৌথ নিরাপত্তা প্রকল্প যে তিনটি অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই তিনটি অনুমানই ভুল।

- প্রথম অনুমান হচ্ছে যে, সব রাষ্ট্র আক্রমণকারী কে সে বিষয়ে একমত হবে। কিন্তু বাস্তবে সব রাষ্ট্র সে বিষয়ে একমত পোষণ করে না।
- দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে যে, সব রাষ্ট্রই আক্রমণ প্রতিহত করতে সমানভাবে আগ্রহী থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কিছু কিছু রাষ্ট্র আক্রমণকারীকে সমর্থন করে।
- তৃতীয় অনুমান হচ্ছে যে, সব রাষ্ট্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যৌথ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা সব সময়ে সম্ভব হয় না।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হলে সব রাষ্ট্রকেই কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেকের মতে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যৌথ নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। কুইনসি রাইটের মতে, এ ব্যবস্থা তখনই কার্যকরী হবে যখন বিশ্বে নিরাপত্তার ভিত্তি হিসেবে শক্তিসাম্যের ধারণাকে বাতিল করে এমন একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবে। হ্যান্স মরগেনথউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমসাময়িক বিশ্বে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা যাবে না, কারণ, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেসব আদর্শভিত্তিক অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো কাজে রূপায়িত করা সম্ভব নয়।

মরগেনথউ-এর মতে, যৌথ নিরাপত্তার ধারণা একটি বিপদজ্জনক ধারণা। তাঁর মতে, যৌথ নিরাপত্তার অধীনে সব যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। ওয়াল্টার লিপম্যানও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাম্যতা ও প্রয়োগযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলছেন। একটি অপর্যাপ্ত,যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার চেয়ে কোনো যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকাই ভালো।

সুতরাং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনই কার্যকরী বাস্তব হয়ে ওঠে নি। জাতিসংঘ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োগের চেষ্টাও করে নি, পরিত্যাগও করে নি। জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করেছেন।

১৯৯০ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রথম যৌথ শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভীতি প্রদর্শন করে। ইরাক জাতিসংঘের নির্দেশ আগ্রাহ্য করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক সৈন্য দল ইরাক আক্রমণ করে ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে ঐ যুদ্ধকে অনেকেই জাতিসংঘের অধীনে যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে সম্মত হয় নি। অনেকে ঐ যুদ্ধকে নয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- বিংশ শতাব্দীতে যৌথ নিরাপত্তার ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
- কুইনসি রাইট মনে করেন যে, যৌথ নিরাপত্তার সঙ্গে শক্তিগত ভারসাম্যের সম্পর্ক একই সঙ্গে পরিপূরক ও বিরোধিতামূলক।
- যৌথ নিরাপত্তার ধারণা কতকগুলো অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- হ্যান্স মরগেনথউ-এর মতে যৌথ নিরাপত্তার ধারণা কার্যকর করার জন্য কতকগুলো শর্তপূরণ প্রয়োজন।
- লীগ চুক্তিপত্র যে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল।
- জাতিসংঘ যৌথ নিরাপত্তার মাধ্যমে শান্তিরক্ষা করতে পারে নি।

৩.১৮ শক্তিসাম্য (Balance of Power)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের ধারণা একটি পুরনো বিষয়। মানব ইতিহাসে শক্তিসাম্যের ধারণাকে অনেকে এক উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন (Important innovation) বলে বর্ণনা করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্য বহুল আলোচিত একটি বিষয়। প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক রাজনীতি গড়ে ওঠার ও বিকাশের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে দুটি ধারণা বিদ্যমান। প্রথমত: শক্তিতত্ত্ব এবং দ্বিতীয়ত: সাম্যতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব এমন একটি ধারণা যার দ্বারা অধিক শক্তিশালী জাতি অন্য জাতির ওপর আধিপত্য কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। আধিপত্য কায়েম করার মাধ্যমে জাতিগুলো আরো শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী-শক্তিই হলো ক্ষমতার মূল নিয়ামক। অপরদিকে সাম্যতত্ত্ব হলো, আপেক্ষাকৃত হুমকিমুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি জাতি দ্বারা অপর একটি জাতির নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে তার নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাকে শক্তিসাম্য বলে। আধুনিক ইতিহাসে শক্তিসাম্যের ধারণা গড়ে উঠেছে ইউরোপে শক্তিজোটের রাজনীতি গড়ে উঠার মাধ্যমে।

উল্লেখ্য যে, প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অটোভান বিসমার্ক ১৮৭০ সালে ফ্রান্সকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে

জার্মানির ঐক্য গড়ে তোলেন। তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণ করলেও শক্তিশালী জার্মানি গড়ে তোলার জন্য যুদ্ধ না করার নীতি গ্রহণ করেন। তবে ফ্রান্সকে নিয়ে জার্মানির আশঙ্কা ছিল। তাই বিসমার্ক ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শক্তিজোট গঠন করেন। এক পর্যায়ে ১৯৮৩ সালে রাশিয়া জার্মানির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে যায়। অতঃপর রাশিয়ার সাথে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যোগ দিয়ে আরেকটি শক্তিজোট গঠন করে। এভাবে শক্তিজোটের মাধ্যমে শক্তিসাম্য গড়ে ওঠে। এ শক্তি জোটের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ১৯১৪ সালে একটি যুদ্ধকে সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপ দিতে ভূমিকা রাখে। এ যুদ্ধের সময় জানুয়ারি ১৯১৮ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সিনেটে ভাষণ দিয়ে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যকে অকার্যকর একটি ধারণা উল্লেখ করে যৌথ নিরাপত্তা গড়ে তোলার আহবান জানান। ১৯১৯ জানুয়ারি প্যারিস শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় লীগ অব নেশনস। এভাবে গড়ে উঠে যৌথ নিরাপত্তা। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের ধারণার অবসান হয় নি। সে সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে শক্তিসাম্যের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করা হয়। কয়েকজন লেখক শক্তিসাম্যের তত্ত্বকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মৌলিক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শক্তিসাম্যের ধারণাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শক্তিসাম্যের ধারণার মধ্যে ভারসাম্যের ধারণা নিহিত আছে। জর্জ সোয়ার্জেন-বার্জার শক্তিসাম্যকে একটি ভারসাম্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থিতাবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। (Balance of power is "an equilibrium or a certain amount of stability in international relations.") তাঁর মতে, যেখানেই বহু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সেখানেই শক্তিসাম্যের তত্ত্বের প্রয়োগ দেখা যায়।

হ্যান্স মরগেনথউ শক্তিসাম্যকে এক সাধারণ সামাজিক নীতির একটি বিশেষ প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। (Balance of power is only "a particular manifestation of a general social principle.")

জর্জ লোয়ার্স ডিকিকসনের মতে, শক্তিসাম্য বলতে সাম্য ও অসাম্য উভয়কে বোঝায়। তাঁর মতে, শক্তিসাম্যের তত্ত্ব প্রথমটি প্রচার করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি অনুসরণ করে।

অধ্যাপক ফে (Fay)-এর মতে, শক্তিসাম্য বলতে রাষ্ট্রসমূহের শক্তির এমন ভারসাম্য বোঝায় যে, কেউ অধিক শক্তিশালী হয়ে তার ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপাতে পারে না। (Balance of power means such a "just equilibriuim in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently storng to enforce its will upon the others.") অধ্যাপক মরগেনথউ-এর মতে, শক্তিসাম্য বলতে এমন এক অবস্থা বোঝায় যেখানে কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় সাম্যের ভিত্তিতে শক্তি বন্টিত হয়েছে। (Balance of power "refers to an actual state of affairs in which power is disributed among several nations with approximate equility.")

ভ্যান ডাইবোর মতে, শক্তিসাম্যের ধারণা ক্ষমতার সম্পর্ক বর্ণনা করে।

কুইনসি রাইটের মতে, শক্তিসাম্য হলো এমন এক ব্যবস্থা যা প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, কোনো রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলে তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপরাজেয় জোটের সম্মুখীন হতে হবে। (It is "a system designed to maintain a continuous conviction in any state that if it attempts aggression, it would encounter an invincible combination of other.")

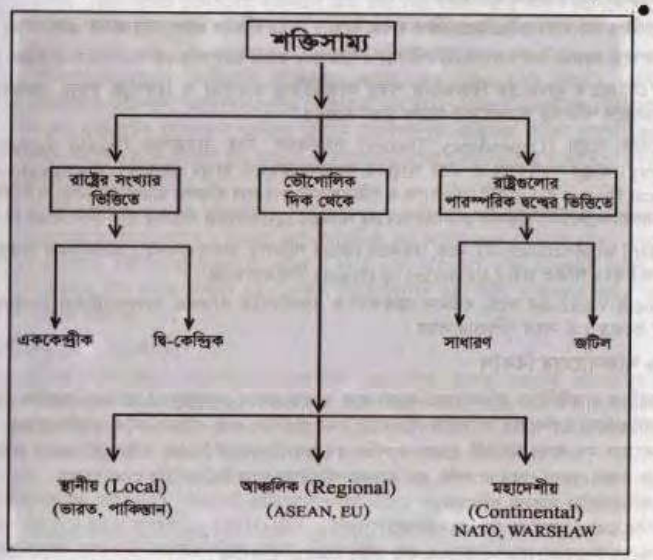
অধ্যাপক হার্টম্যানের মতে, শক্তিসাম্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে এই অর্থে যে, একটি শক্তিগত শিবির অন্য শিবির গড়ে তুলতে প্ররোচিত করে ও এভাবে জোটের জাল তৈরি হয়।

কয়েকজন লেখক পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শক্তিসাম্যের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন-

১. বহুসংখ্যক সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্মকর্তা (A maultiplicity of sovereign political actors)।
২. এসব সার্বভৌম কর্মকর্তাদের ওপর একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত ও বৈধ্য কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি (The absence of a single, centralized legitimate and strong authority over these sovereign actors)।
৩. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত অসম বন্টন (Relatively unequal distribution of status, wealth, size, and power)।
৪. বিশ্বের সীমাবদ্ধ সম্পদের জন্য বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে নিরন্তর অথচ নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ও বিরোধের অবস্থা (Continuous but controlled competition and conflict among sovereign political actors for what are perceived as scarce world resources and values)।
৫. বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর শাসকদের মধ্যে এ প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়া থাকে যে, বিদ্যমান শক্তির বন্টন তাদের পক্ষে সুবিধাজনক (An implicit understanding among the rulers of the great powers that the perpetuation of the existing power distribution benefits them mutually)।

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যাপক পামার ও অধ্যাপক পারকিনস শক্তিসাম্যের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।



শক্তিসাম্য শব্দটি একটি ভারসাম্যের অবস্থাকে বোঝায়। কিন্তু মানব ইতিহাসে নিরন্তর পরিবর্তন, রাজনৈতিক জোটব্যবস্থার পরিবর্তন ও ভারসাম্যহীনতার গতি লক্ষ করা যায়।

- মানুষের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে শক্তিভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একে ঐতিহাসিক কারণ না বলে কূটনৈতিক কৌশল বলে বর্ণনা করাই শ্রেয়।
- শক্তিসাম্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। কিন্তু মানব ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার জন্য শক্তিসাম্যেকে কার্যকরী হতে হলে পরিবর্তনশীল ও গতিশীল হতে হবে।
- বাস্তবে শক্তিগত ভারসাম্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা শক্ত। যুদ্ধের সময় শক্তিসাম্যে আছে কিনা তার পরীক্ষা হয়। কিন্তু যুদ্ধ শক্তিসাম্য নষ্ট করেও এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যা শক্তিসাম্য প্রতিরোধ করতে চায়।

- শক্তিসাম্যের ধারণাকে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ উভয় দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।
- শক্তিসাম্যের তত্ত্ব এমন একটি ধারণা যা গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র কোনো ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক নয়।
- বৃহৎ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো শক্তিসাম্যের খেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বড় রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় শক্তিসাম্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করে না, বরং শক্তিসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের ধারণা পুরনো।
- শক্তিসাম্যকে অনেকে ভারসাম্য বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থিতাবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।
- বাস্তবে শক্তিসাম্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা শক্ত।
- বৃহৎ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো শক্তিসাম্যের খেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৩০ শক্তিসাম্যের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা

শক্তিসাম্যের ধারণার এসব ত্রুটি ও জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের পর শক্তিসাম্যের ধারণা কতটা প্রাসঙ্গিক?

বাস্তববাদী ও নয়া-বাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শক্তিগত ভারসাম্যের মডেল গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য শক্তিগত ভারসাম্যের প্রয়োজন। তাঁরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভাজনের পরও আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ও বিশ্বশান্তি রক্ষার সমস্যার সমাধানরূপে শক্তিগত ভারসাম্যের মডেল গ্রহণ করেন।

নির্ভরতার তত্ত্বের (Dependency Theory) সমর্থকগণ, বিশ্ব ব্যবস্থাপক (World System Theory) তত্ত্বের সমর্থকগণ বা উত্তর আধুনিক সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ (Post-modern Critical Theory) বা নারীবাদী লেখিকাগণ ও পরিবেশবাদী লেখকগণ শক্তিগত ভারসাম্যের বিশদ ও নির্দিষ্ট সমালোচনা করেন নি। শক্তিগত ভারসাম্য ব্যবস্থার পরিবর্তে কোনো বিকল্প মডেলও তাঁরা পেশ করেন নি।

Richard Rosencrance-এর মতে, বর্তমানে কোনো শক্তিগত ভারসাম্য নেই। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কয়েকটি বৃহৎ শক্তির দ্বারা (A Concert of Power) নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

Kenneth Waltz-এর মতে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিগত ভারসাম্যহীনতা বিপদের সূচনা করেছে। এ সময় দুশ্চিন্তার সময়।

৩.১৯ শক্তিসাম্যের বিকাশ

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের ধারণা নানা মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে শক্তিসাম্য সদা গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল একটি প্রক্রিয়া। শক্তিসাম্যের মূল লক্ষ্য বিরোধী প্রভাব ও শক্তি খর্ব করার মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা। শক্তি সাম্যের ধারণা বজায় রেখে এ পর্যন্ত যত ধরনের শক্তিসাম্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে রয়েছে-

- শক্তিজোটের মাধ্যমে শক্তিসাম্য
- বিভাজন ও শাসনের মাধ্যমে শক্তিসাম্য
- সংঘর্ষ নিবারক (Butter State) রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তিসাম্য
- অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে শক্তিসাম্য
- প্রকৃত অর্থে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শক্তিসাম্যের রাজনীতি ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে -

১. **সামরিক জোটের মাধ্যমে শক্তিসাম্য :** ২য় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ইউরোপ বা বলকান অঞ্চলে সমাজতন্ত্রের বিকাশ লাভ করে। পূর্ব ইউরোপব্যাপী সমাজতন্ত্রের এ বিকাশ পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার ক্লিমেন্ট এটলি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুম্যানকে ব্যবস্থা গ্রহণের আবহান জানান। (মার্চ, ১৯৪৭) হ্যারি এস ট্রুমান সিনেটে ভাষণ দিয়ে "সোভিয়েত বিরোধী প্রতিরোধ নীতি" ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার আলোকে ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ NATO সামরিক জোট গঠন করা হয়। এ বাস্তবতায় বা শক্তিসাম্যের খাতিরে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৮টি সমাজতান্ত্রিক দেশ "WARSAW PACT" নামে আরেকটি সামরিক জোট গঠন করে।

২. **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শক্তিসাম্য :** পূর্ব ইউরোপে গড়ে উঠা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল বিষয় হলো-উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সাম্য গড়ে তোলা। পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যাতে আঘাত হানতে না পারে তার জন্য গ্রহণ করা হয় মার্শাল প্ল্যান। জর্জ মার্শাল ছিলেন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ট্রুম্যান ডকট্রিন- এর আলোকে পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনায় তিনি ১৭ বিলিয়ন বরাদ্দের আহবান জানান। সিনেট ১৩ বিলিয়ন বরাদ্দ দেয়। এভাবে অর্থনৈতিক শক্তিসাম্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৩. **অস্ত্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিসাম্য :** ১৯৪৫ সালে আমেরিকা এটম বোমা বানাতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের সময় হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এটি তার নিরাপত্তাহীনতার কারণ হিসেবে বিবেচনা করে। তারাও শুরু করে এইম বোমা তৈরি। ১৯৫০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এটম বোমা বানাতে সক্ষম হয়। ৫০-এর দশকের শুরুতে আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা বানাতে সক্ষম হয়। শক্তিসাম্যের লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নও হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে। একপর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন "আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র" (ICBM) বানাতে সক্ষম হয়। শক্তিসাম্যের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান "কৌশলগত প্রতিরক্ষা নীতি" (SDI)-কর্মসূচি গ্রহণ করেন। একে তারকা যুদ্ধ কর্মসূচি ও বলা হয়। এভাবে অস্ত্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিসাম্যের ধারণা অব্যাহত থাকে।

৪. **নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিসাম্য :** অস্ত্রীকরণের ভয়াবহ বাস্তবতা একপর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণে বা অস্ত্র সংকোচনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্বাক্ষরিত হয় NPT এবং CTBT চুক্তি। এছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে SALT এবং START চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাস করার সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে শক্তিসাম্য বজায় রাখার সুযোগ লক্ষ করা যায়।

মূল্যায়ন (Evaluation)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের রাজনীতি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর শক্তিসাম্যের রাজনীতি ক্রিয়াশীল নয়। এতে করে ভারসাম্যহীন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। বর্তমানে চলছে এককেন্দ্রিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে রাজনীতির পরিবর্তে অর্থনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের নামে চলছে মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকর করার একটি প্রক্রিয়া। মুক্তবাজার অর্থনীতি বা বিশ্বায়ন কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে WTO-কে। আর এ বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে WTO-এর যাত্রা শুরু হয়। WTO প্রতিযোগিতাপূর্ণ বজায় গড়ে তোলার জন্য বিশ্বকে ১০ বছর সময় বেধে দেয়। এ সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলে সকল প্রকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কারণ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে বাজার প্রতিযোগিতামূলক হয় না। এ কারণে ২০০৫ সাল থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক যেমন- GSP, MFA উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে শিল্পে অনগ্রসর জাতিগুলো বাস্তবে একটি সমস্যায় পড়েছে।

৩.২০ শক্তিসাম্যের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Balance of Power)

শক্তিসাম্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এলাকার ভিত্তিতে শক্তিসাম্য স্থানীয়, আঞ্চলিক, মহাদেশীয় ও বিশ্বব্যাপী হতে পারে।

শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে তাকে দ্বিকেন্দ্রিক, ত্রিকেন্দ্রিক বা বহুকেন্দ্রিক

শক্তিসাম্য হিসেবে বর্ণনা করা যায়।

হার্টম্যানের মতে, শক্তিসাম্য সাধারণ (General) বা আঞ্চলিক (Regional) হতে পারে। তাঁর মতে ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক শক্তিসাম্য বজায় ছিল। ১৭১৩ সাল অবধি স্পেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড পশ্চিম ইউরোপে এবং প্রুশিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া পূর্ব ইউরোপে আঞ্চলিক ভারসাম্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালনা করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুই অতি বৃহৎ শক্তির আবির্ভাবের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাতে দুই অতি বৃহৎ শক্তির দ্বারা সাধারণ ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

সাধারণ শক্তিসাম্যের মধ্যে আঞ্চলিক শক্তিসাম্য থাকতে পারে। কখনোও কখনোও আঞ্চলিক ভারসাম্য সাধারণ ভারসাম্য থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। কখনোও তা সাধারণ ভারসাম্যের মূলকেন্দ্রে থাকতে পারে। কখনোও বা সাধারণ ভারসাম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

শক্তিসাম্য নমনীয় বা অনমনীয় হতে পারে। হার্টম্যানের মতে, শক্তিসাম্যের বিরুদ্ধে স্বার্থ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শক্তিগত ভারসাম্য নমনীয় থাকে। যখনই তা অদৃশ্য হয় তখনই শক্তিগত ভারসাম্য অনমনীয় হয়ে পড়ে।

শক্তিসাম্য সরল বা জটিল হতে পারে। ১৯৫০-এর দশকে সরল শক্তিসাম্য বজায় ছিল। ১৯৭০-এর দশকে শক্তিসাম্য জটিল রূপ ধারণ করেছে। এ জটিল শক্তিসাম্যের অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এক ধরনের সংস্কৃতির অধিকারী নয়।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে যদি দুটি রাষ্ট্রের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তবে তা দ্বিকেন্দ্রিক। যদি তিনটি রাষ্ট্র মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তবে তা ত্রিকেন্দ্রিক। আবার তিনের অধিক রাষ্ট্র শক্তিসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলে তাকে বহুকেন্দ্রিক শক্তিসাম্য বলা যায়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Point)

- শক্তিসাম্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে- স্থানীয়, আঞ্চলিক বা বিশ্বব্যাপী শক্তিসাম্য লক্ষ করা যায়।
- শক্তিসাম্য নমনীয় বা অনমনীয় হতে পারে।
- শক্তিসাম্য সরল বা জটিল হতে পারে।

৩.২১ শক্তিসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতিসমূহ (Devices for maintaining Balance of Power)

শক্তিগত ভারসাম্য সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। শক্তিগত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রধান কৌশল হলো সবল পক্ষের শক্তি হ্রাস বা দুর্বল পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে ভারসাম্য রক্ষা।

অধ্যাপক হার্টম্যান শক্তি ভারসাম্যের কয়েক ধরনের কৌশলের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো-

- জোট গঠন
- এলাকা দখল
- বাফার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
- সম্ভাব্য শত্রুকে তার মিত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার শক্তি হ্রাস
- শত্রুরাষ্ট্রের নতুন জোট গঠনের সম্ভাবনা নষ্ট করে তার শক্তি হ্রাস।

শক্তিসাম্যের অন্যান্য পদ্ধতি হচ্ছে-

- বিভেদ ও শাসন নীতি
- ক্ষতিপূরণ
- বাফার রাষ্ট্র স্থাপন
- সামরিক অস্ত্রবৃদ্ধি ও নিরস্ত্রীকরণ
- হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপ না করা
- জোট ও বিরুদ্ধ জোট গঠন।

৩.২২ বিভেদ ও শাসন নীতি (Dvide and Rule Policy)

শক্তিসাম্য রক্ষার একটি পুরাতন পদ্ধতি হচ্ছে বিভেদ ও শাসন নীতি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো, বিশেষত ইংল্যান্ড তার উপনিবেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এ নীতি অনুসরণ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্স জার্মানির প্রতি এ নীতি অনুসরণ করেছিল।

৩.২৩ ক্ষতিপূরণ (Compensation)

শক্তিসাম্য রক্ষার আর একটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো ক্ষতিপূরণ। নতুন ভূখণ্ড দখল বা পুরনো ভূখণ্ড ভাগ করার সঙ্গে এ পদ্ধতি জড়িত। ১৭১৩ সালে ইউট্রেকট চুক্তি অনুসারে ভূখণ্ড বণ্টন করে শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীতে পরাধীন উপনিবেশগুলোতে বণ্টনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। মরগেনথউ-এর মতে, কূটনৈতিক আলোচনায় দর কষাকষির ফলে যে রাজনৈতিক আপস হয় তাই হলো ক্ষতিপূরণের সাধারণ নীতি। ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা প্রথম থেকেই শক্তিসাম্যের ধারণার সঙ্গে জড়িত।

৩.২৪ বাফার রাষ্ট্র (Buffer State)

পামার ও পারকিনসের মতে, দ্বিমেরুভিত্তিক বিশ্বে বাফার অঞ্চল বা নিরপেক্ষ এলাকা ব্যতীত শক্তিসাম্য বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ছোট ক্ষুদ্ররাষ্ট্রকে বাফার রাষ্ট্র বলা হয়। ঐরূপ রাষ্ট্র দুই অতি বৃহৎ শক্তির মধ্যে সরাসরি প্রতিযোগিতা রদ করতে পারে। বাফার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে পারে বা তাঁবেদার রাষ্ট্র বা অধীনস্থ এলাকা হতে পারে। রাশিয়া ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আফগানিস্তান বহুদিন ধরে বাফার রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেছে।

৩.২৫ অস্ত্রসজ্জা ও নিরস্ত্রীকরণ (Armament and Disarmament)

শক্তিসাম্য রক্ষার একটা পুরনো পদ্ধতি হচ্ছে সামরিক প্রস্তুতি। সামরিক প্রস্তুতি অস্ত্রসজ্জা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা টেনে আনে। তার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি পায়। সামরিক প্রযুক্তির নিত্য নতুন প্রগতির ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্র আধুনিকতম অস্ত্র তৈরি ও শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। এভাবে অস্ত্রসজ্জা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনেক রাষ্ট্র শক্তিসাম্য রক্ষা করতে ব্যস্ত।

তবে স্থায়ী শক্তিসাম্য রক্ষার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে সামরিক নিরস্ত্রীকরণ। আগে বিভিন্ন ধরনের নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ গুণগত ও পরিমাণগত দুরকমের হতে পারে। জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণের জন্য বার বার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। পামার ও পারকিনসের মতে, নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা শক্তিসাম্য রক্ষার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত।

৩.২৬ হস্তক্ষেপ থেকে বিরতি (Intervention and Non-intervention)

শক্তিসাম্য রক্ষার অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে হস্তক্ষেপ। ইতিহাসে দেখা যায় যে, শক্তিসাম্য রক্ষাকারী রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটেন এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে হস্তক্ষেপ ঘটেছে। হস্তক্ষেপের ফলে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও রয়েছে।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য হস্তক্ষেপ থেকে বিরত (Non-intervention) থাকার দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়। অনেক সময় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার নীতি অনুসরণ করেছে। যেসব ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী সেসব ক্ষেত্রে তারাও এই নীতি অনুসরণ করেছে। হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

৩.২৭ জোট ও বিরুদ্ধ জোট গঠন (Alliance and Counter-alliance)

জোট ও বিরুদ্ধ জোট গঠন শক্তিসাম্য বজায় রাখার একটি অতি প্রচলিত পদ্ধতি। কোনো রাষ্ট্র তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য জোট গঠনে আগ্রহী হতে পারে। জোট (Alliance) আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক হতে পারে। আক্রমণাত্মক জোট তার সদস্য রাষ্ট্রদের অনুকূলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

আত্মরক্ষামূলক জোট (Defensive Alliance) অনেক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। আক্রমণাত্মক জোটের (Aggressive Alliance) ফলে যুদ্ধ হতে পারে। তবে বিতর্ক আত্মরক্ষামূলক জোট সাধারণত যুদ্ধ ডেকে আনে না। জোটের প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বদাই বিতর্ক থাকতে পারে। প্রত্যেক জোটকেই তার সদস্যরা আত্মরক্ষামূলক ও প্রতিপক্ষরা আক্রমণাত্মক বলে চিহ্নিত করতে পারে।

জোট পুনরায় কার্যকর (Effective) বা অকার্যকর (Ineffective) হতে পারে। পামার ও পারকিনসর মতে, কার্যকর জোটের বৈশিষ্ট্য হলো-

- যে উদ্দেশ্যে জোট গঠিত হয়েছে সেই লক্ষ্য অর্জনের শক্তি জোটের আছে।
- জোটে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো সমস্বার্থের অংশীদার।

জোট স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। যদি জোটে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রদের মধ্যে ভৌগোলিক, মতাদর্শগত, সংস্কৃতিগত বা পরিপূরক অর্থনীতির ভিত্তিতে সাদৃশ্য থাকে, তবে জোট দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ঐগুলোর অভাবে জোট ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে।

জোট সমজাতীয় বা অনুপূরক হতে পারে। জোট পুনরায় নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতিত্বমূলক হতে পারে। জোট সাধারণ উদ্দেশ্যে গঠিত বা সীমিত উদ্দেশ্যে গঠিত হতে পারে। ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে জোট সমস্বার্থসাধন করে। কিন্তু পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে জোট অনুপূরক স্বার্থসাধন করে।

সামগ্রিক যুদ্ধের সময় জোট সাধারণ হতে পারে। কারণ সেই সময় জোটভুক্ত সদস্যদের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে জোট জড়িয়ে থাকে। কিন্তু শান্তির সময়ে কয়েকজনকে নিয়ে সীমিত উদ্দেশ্যে জোট গঠিত হতে পারে।

অনেক সময় জোটের বিপক্ষে বিরুদ্ধে জোট গঠন করেও শক্তিসাম্য বজায় রাখা হয়। কোনো জোট প্রবল হয়ে উঠলে তাকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গড়ে ওঠে। তবে তার ফলে বিশ্বে উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

শক্তিগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যেমন বিভেদ ও শাসন নীতি, ক্ষতিপূরণ, বাফার রাষ্ট্রসমূহ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও নিরস্ত্রীকরণ, হস্তক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, জোট ও বিরুদ্ধ জোট গঠন।

৩.২৮ শক্তিসাম্যের কার্য (Functions of the Balance of Power)

বিশ্বরাজনীতিতে শক্তিসাম্য কতকগুলো ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যসাধন করেছে :

- আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণ শক্তিসাম্যের ফলে কোনো একটি শক্তিধর রাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।
- বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তিসাম্য সে অঞ্চলের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর অধীনতার হাত থেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা করেছে।
- অনেকের মতে শক্তিসাম্য শান্তি রক্ষায় সাহায্য করেছে। কারণ শক্তিসাম্যের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শক্তির ভারসাম্য থাকার ফলে কেউই অপরকে আক্রমণ করতে সাহস করে নি। শক্তিসাম্য সেসব ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে।
- শক্তিসাম্য সেই পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করেছে যার ফলে কূটনীতি, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি কার্যকর হয়েছে।

৩.২৯ সমালোচনা (Criticisms)

শক্তিসাম্যের তত্ত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত : অনেকের মতে শক্তি ভারসাম্য প্রধানত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে অধিকার করে বা তাদের বিভক্ত করে শক্তিসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : শক্তিসাম্যের ধারণার প্রহেলিকা হচ্ছে যে, শক্তিসাম্য থাকলে তবেই আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর হয়। কিন্তু শক্তিসাম্য বজায় রাখার পদক্ষেপগুলো অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন

ভঙ্গ করে।

তৃতীয়ত : শক্তিসাম্য সর্বদা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করে না। অনেক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা শান্তি বিনষ্ট করে যুদ্ধ ডেকে এনেছে।

চতুর্থত : শক্তিসাম্যের কতকগুলো অনুমান ভ্রান্ত। শক্তিসাম্য অনুসারে ধরে নেওয়া হয় যে, রাষ্ট্রগুলো তাদের ক্ষমতার স্বার্থে ইচ্ছামতো জোট গঠন ও জোট ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সেই অনুমান সবক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চমত : শক্তিসাম্যের তত্ত্ব ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু সব রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় স্বার্থরক্ষা। শক্তি অর্জন তাদের বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য।

ষষ্ঠত : শক্তিসাম্যের তত্ত্ব অনুসারে কোন একটি রাষ্ট্র কেবল সামরিক জোট বা সামরিক আক্রমণের দ্বারা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। কোনো রাষ্ট্র শিল্পোন্নয়ন, দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অত্যন্ত রীণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

সপ্তমত : শক্তিসাম্যের তত্ত্ব অনুমান করে যে, কয়েকটি রাষ্ট্রের হাতে অত্যধিক ক্ষমতার সন্নিবেশ হলে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে বা বিশ্বশান্তি ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু সবসময়ে বাস্তবে তা হয় না। ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত শতককে শান্তির শতক বলা হয়। কিন্তু এ শতকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সর্বতোমুখী প্রাধান্য বজায় ছিল।

হ্যান্স মরগেনথউ, শক্তিসাম্যের কতকগুলো ত্রুটির উল্লেখ করেছেন :

১. **অনিশ্চয়তা :** শক্তিসাম্যের ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্র তার ক্ষমতা পরিমাপ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় শক্তি পরিমাপ করা কঠিন। জাতীয় শক্তি বহু উপাদানে গঠিত, যেমন ভৌগোলিক উপাদান, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ঐক্য, জাতীয় আত্মবিশ্বাস ও সরকারি দক্ষতা। এসব উপাদান সর্বদা পরিবর্তনীয়। সেজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা সহজ নয়। যখন বিভিন্ন জোটবদ্ধ রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে তখন জোটের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় শক্তি পরিমাপ করা কঠিন।

২. **অবাস্তবতা :** জাতীয় শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্য শক্তিসাম্যের তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ কঠিন। যেহেতু বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি পরিমাপ করা খুবই কঠিন, সেজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সমান ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে না। বাস্তবে তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে। এ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলো অবিচ্ছিন্ন অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এইরূপ অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিণতি হচ্ছে যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলো অনেক সময় শক্তিসাম্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। শক্তিসাম্যের ধারণা সেদিক থেকে বিপজ্জনক।

৩. **অপর্যাপ্ততা :** শক্তিসাম্যের সমর্থকগণের মতে এ ধারণা সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র শক্তিসাম্য দ্বারা তা সম্ভব হয় নি। শক্তিসাম্যের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষার সাহায্য করেছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Point)

- শক্তিগত ভারসাম্য ব্যবস্থা অনিশ্চিত, অবাস্তব ও অপর্যাপ্ত ধারণা।
- শক্তিগত ভারসাম্য সবক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে নি।
- শক্তিগত ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

৩.৩১ যৌথ নিরাপত্তা (Collective Security)

যৌথ নিরাপত্তা নীতির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এ নীতির উদ্ভাবক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। তার মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল শক্তির ভারসাম্য নীতি। যৌথ

নিরাপত্তা বলতে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ওই আইন মান্যকারী একাধিক রাষ্ট্রের যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি ভঙ্গ করে যদি কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অন্য কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটকে আক্রমণ করে, তবে আক্রান্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যে পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাই হলো সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যৌথ নিরাপত্তা সম্পর্কে অধ্যাপক জর্জ সোয়ার্জেনবার্গার (Georg Sehwarzenberger) তাঁর 'Power Politics' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মনীতি ভঙ্গ করে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ পরিচালনা করা হলে সেই আক্রমণকারীকে নিবারণ বা প্রতিহত করতে একত্রিতভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বোঝায়। যৌথ নিরাপত্তা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনার প্রেক্ষাপটে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. শান্তিরক্ষাকারী রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত শক্তি শান্তিবিঘ্নকারী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের শক্তি অপেক্ষা বেশি থাকতে হবে।

২. যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র তথা বৃহৎ শক্তিবর্গের আন্তরিক হতে হবে।

৩. যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপসহ প্রয়োজনে একত্রে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হতে পারে।

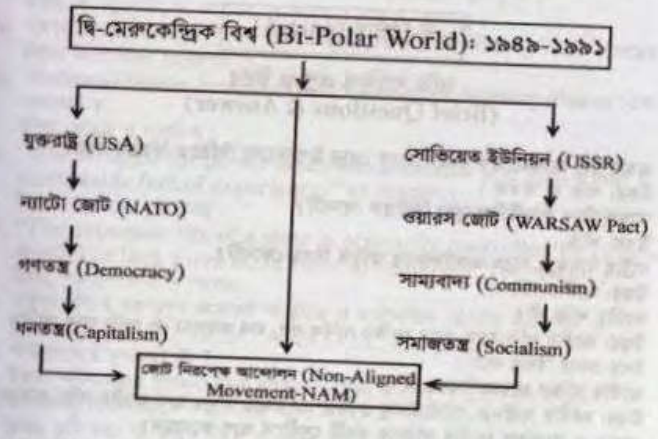
৫. যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আদর্শিক বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তি (Versaille Treaty) সম্পাদন এবং তৎপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (League of Nations) প্রতিষ্ঠার অন্যতম দিক ছিল ভবিষ্যৎ আক্রমণকারী কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ। কিন্তু এ ব্যবস্থা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সফল হতে পারে নি। বরং ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলির মধ্যেই নিহিত ছিলো ভবিষ্যৎ কোনো যুদ্ধ এবং এরপর আবার ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় যা মানব সভ্যতার জন্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যৌথ নিরাপত্তার ধারণাকে অকার্যকর বিবেচনায় সৃষ্টি করা হয় জাতিসংঘ (United Nations)। এ সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (International Community)-কে একটি বৃহৎ পরিসরে একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ সৃষ্টির পর এর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী আর্তমানবেতার সেবা নিশ্চিতকরণসহ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো যুদ্ধকেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় বরং এরূপ ব্যবস্থা যুদ্ধের পরিসরকে আরও বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সৃষ্ট ন্যাটো (NATO) জোট এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সৃষ্ট ওয়ারশ (WARASAW) জোট বিশ্বকে দুটি রাজনৈতিক আদর্শের বেড়াজালে আবদ্ধ করে এবং এর ফলে দুটি জোটের ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold War) প্রকট হয়। অপরপক্ষে যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বিশ্বকে বিভক্ত করেছিল এবং এর ফলে অনেক সময়েই কোনো কোনো যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যেমন-কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং কিউবার মিসাইল সংকট, ১৯৬২ ইত্যাদি।

৩.৩২ শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তার সম্পর্ক (The relation between Balance of Power and Collective Security)

উদ্দেশ্যগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূলত পরিপূরক (Complementory)। কারণ উভয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার

জন্য। এক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতি বা ব্যবস্থা পুরনো। এটি মূলত কার্যকর ছিল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে। এর ব্যর্থতার বৈপরীত্যেই মূলত আবির্ভূত হয় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ব্যবস্থাও অচল হয়ে পড়ে। আবার প্রায়োগিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা নীতি একে অপরের পরিপন্থী (Antagonistic)। কারণ প্রথমটির লক্ষ্য হলো শক্তির সাম্যতা আনয়নের মাধ্যমে অপর রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত (Prevention) করা যেখানে নিরাবরণমূলক ভীতি (Deterrence) অধিকতর কার্যকর। কিন্তু দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হলো আক্রমণকারী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে যৌথভাবে ব্যবস্থা নেওয়া এবং এরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রকে যুদ্ধের মাধ্যমে বা অনুরূপ পরোক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরাজিত করে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সুতরাং যৌথ নিরাপত্তা নীতি সরাসরি (Direct) ব্যবস্থা গ্রহণকে প্রাধান্য দেয় এবং এটি কোনো পরিস্থিতিমূলক অবস্থান টিকিয়ে না রেখে বরং তা অপসারণকরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোড় দেয়। শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির মধ্যে এরূপভাবে সামঞ্জস্যমূলক ও অসামঞ্জস্যমূলক সম্পর্ক নির্ধারণের একজন সমর্থক অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy Wright)। তিনি তাঁর (The Study of International Relations) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "The relations of the balance of power to collective security have been at the same time complementary and antagonistic."শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংজ্ঞার মধ্যেই এর পার্থক্যের স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শক্তিসাম্য হলো দু'টি সমান অথবা প্রায় সমান এবং বিরুদ্ধবাদী শক্তিফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং যৌথ নিরাপত্তা হলো আন্তর্জাতিক আইন ও অনিয়মিত উপেক্ষা করে কোনো রাষ্ট্রকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক জোট গঠন করে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুতরাং দেখা যায় যৌথ নিরাপত্তা হলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুতরাং দেখা যায় যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা শক্তিসাম্য নীতির চেয়ে ব্যাপকভিত্তিক ও দ্রুত কার্যকর।



প্রকৃতপক্ষে শক্তিসাম্য (Balance of Power) এবং যৌথ নিরাপত্তা (Collective Security) ব্যবস্থা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একটি কার্যকর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দুটি পরাশক্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক (Bi-Polar) বিশ্বের অবতারণা করে। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়

যুদ্ধংদেহী মনোভাব যা ঠাণ্ডাযুদ্ধ (Cold war) নামে পরিচিত ছিল। এ দুটি রাষ্ট্র বৃহৎ সামরিক জোট গঠন করার মাধ্যমে যৌথভাবে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। ফলে সৃষ্টি হয় ন্যাটো এবং ওয়ারস। এ দুটি জোট গঠনের মাধ্যমে দুই রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শক্তিসাম্য (Balance of Power) অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তাদেরকে সরাসরি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করে। নিম্নের কাঠামো দ্বারা তাদের এরূপ সম্পর্কজনিত অবস্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শগতভাবে দুটি জোটে বিভক্ত হয় তখন তাদের মধ্যে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এক ধরনের শক্তিসাম্যব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ দুটি পরাশক্তির সামরিক জোট ও আদর্শগত বিরোধের থেকে দূরে থাকার জন্য ন্যাম (NAM)- এর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে তারাও দুই পরাশক্তির বিরোধের বাইরে থাকার জন্য স্বতন্ত্র যৌথ অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক সাম্যবস্থা গড়ে তোলে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য ও যৌথনিরাপত্তা ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে তেমন কার্যকর নেই। এ দুটি ধারণাই এখন মূলত সেকেলে (Obsolete) এবং অকার্যকর। বর্তমান বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মানবিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য জাতিসংঘ (United Nations Organisation) কার্যকর রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ বিশ্ব সংস্থার পতাকাতলে আবদ্ধ হয়ে শান্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে, যদিও এ সংস্থার কার্যক্রম সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Brief Questions & Answer)

১. **একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে কোন উপাদানের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করে?**
উত্তরঃ শক্তি বা ক্ষমতা।

২. **আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ্য নির্ধারক কোনটি?**
উত্তরঃ শক্তি।

৩. **রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিষয় কোনটি?**
উত্তরঃ জাতীয় শক্তি।

৪. **জাতীয় শক্তি কী?**
উত্তরঃ জাতীয় শক্তি হচ্ছে কোন জাতির সার্বিক বল, যার সাহায্যে সে জাতি অন্য জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৫. **জাতীয় শক্তির প্রয়োজনীয়তা কী ?**
উত্তরঃ জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতীয় শক্তি প্রয়োজন।

৬. **পামার ও পারকিন্স জাতীয় শক্তিকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন?**
উত্তরঃ ৪টি। যথা: ক. সামরিক, খ. অর্থনৈতিক, গ. মতামতের উপর ক্ষমতা ও ঘ. কূটনীতি।

৭. **প্রাকৃতিক সম্পদকে কয়ভাবে কাজে লাগানো যায় ?**
উত্তরঃ ৪ ভাগে। যথা: ক. সম্পদের মালিকানা, খ. সম্পদের উন্নয়ন, গ. সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং ঘ. সম্পদ ব্যবহার।

৮. **জাতীয় শক্তি প্রকাশ করার চূড়ান্ত উপায় কী ?**
উত্তরঃ যুদ্ধ।

৯. **জাতীয় শক্তির স্থায়ী উপাদান কোনগুলো?**
উত্তরঃ ক. ভৌগোলিক অবস্থান, খ. প্রাকৃতিক সম্পদ, গ. জনসংখ্যা ও ঘ. শিল্প সামর্থ্য।

১০. **জাতীয় শক্তির অস্থায়ী উপাদান কোনগুলো?**
উত্তরঃ ক. জাতীয় চরিত্র ও মনোবল, খ. নেতৃত্ব, গ. কূটনীতি এবং ঘ. সরকারের দক্ষতা।

১১. **জাতীয় শক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি কয়টি?**
উত্তরঃ ৪টি। ক. প্ররোচনা, খ. পুরস্কার, গ. শাস্তি এবং ঘ. বলপ্রয়োগ।

১২. **জাতীয় শক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান কোনটি?**
উত্তরঃ ভৌগোলিক উপাদান।

১৩. **কম জনসংখ্যার ৩টি উন্নত ও শক্তিশালী দেশের নাম লিখ।**
উত্তরঃ ক. ব্রিটেন, খ. ইসরাইল ও গ. জাপান।

১৪. **জনসংখ্যার ৩টি গুণগত বৈশিষ্ট্য লিখ।**
উত্তরঃ ক. জাতীয় চরিত্র, খ. জাতীয় মনোবল ও গ. কূটনৈতিক দক্ষতা।

১৫. **প্রাকৃতিক সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?**
উত্তরঃ ২ ভাগে। যথা: ক. খাদ্য ও খ. কাঁচামাল।

১৬. **শক্তি উৎপাদনকারী সামগ্রী কোনগুলো?**
উত্তরঃ ক. খনিজ তেল, খ. প্রাকৃতিক গ্যাস, গ. কয়লা ও ঘ ইউরেনিয়াম।

১৭. **বিশ্বের সফল কয়েকজন জাতীয় নেতার নাম লিখ।**
উত্তরঃ ক. রুজভেল্ট, খ. চৌ. এন. লাই, গ. নেহেরু, ঘ. লেনিন, ঙ. মাহাথির মুহাম্মদ।

১৮. **জাতীয় শক্তিতে ভৌগোলিক উপাদানের কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ?**
উত্তরঃ ক. ভূপ্রকৃতি, খ. আয়তন, গ. অবস্থান এবং ঘ. জলবায়ু।

১৯. **"কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি সে দেশের ভূগোলের দ্বারা নির্ধারিত হয়।"-কে বলেছেন?**
উত্তরঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

২০. **'National Power is in the final analysis of Military Power'-কে বলেছেন ?**
উত্তরঃ পামার ও পারকিন্স।

২১. **"The struggle for power is universal in time and space and is an undeniable fact of experience."-কে বলেছেন ?**
উত্তরঃ হ্যান্স জে. মরগ্যানথু।

২২. **"The economic life of a state is primarily controlled by its possession or lack there of, of natural resources."-কে বলেছেন ?**
উত্তরঃ প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন।

২৩. **বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সামরিক ও অর্থনৈতিক জোটের নাম লিখ।**
উত্তর : NATO, EU, OPEC, APEC, OIC, G – 8, SAARC.

২৪. **শক্তিসাম্যের মূলকথা কী ?**
উত্তরঃ শক্তিসাম্যের মূলকথা হচ্ছে ক্ষমতা ও শক্তির পরিমাপের সমতা বজায় রাখা।

২৫. **মরগ্যানথু শক্তিসাম্যকে কয়টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন?**
উত্তরঃ ৪টি যথা: ক. গৃহীত নীতি, খ. কোন বাস্তব অবস্থা, গ. শক্তির সমবণ্টন এবং ঘ. শক্তির বণ্টন।

২৬. **কে শক্তিসাম্যকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি মৌলিক নীতি বলেছেন ?**
উত্তরঃ পামার ও পারকিন্স।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১ (ক) জাতীয় শক্তি কী ?
(খ) জাতীয় শক্তির প্রকারভেদ লিখ।
২. (ক) জাতীয় শক্তির স্থায়ী উপাদান কী কী ?
(খ) জাতীয় শক্তির অস্থায়ী উপাদানগুলো লিখ।
৩. (ক) অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?
(খ) কৌশলগত অবস্থান কী ?
৪. (ক) ভূরাজনীতি বলতে কী বুঝ ?
(খ) ভূরাজনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী ?
৫. (ক) জাতীয় শক্তির ভৌগোলিক উপাদানের গুরুত্ব কী ? (খ) জাতীয় শক্তির সামরিক উপাদানের গুরুত্ব কী?
৬. (ক) শক্তিসাম্য বলতে কী বুঝ ?
(খ) শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্য কী কী ?
২। (ক) শক্তিসাম্যের প্রকারভেদ উলে-খ কর।
(খ) শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ কী কী ?
৩। (ক) অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ কী ?
(খ) মৈত্রী জোট গঠন বলতে কী বুঝ?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. জাতীয় শক্তি বলতে কী বোঝেন ? জাতীয় শক্তি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আলোচনা করুন।
২. জাতীয় শক্তি কী ? একটি দেশের রাজনৈতিক গুরুত্ব এর জাতীয় শক্তির কতটুকু নির্ভরশীল?
৩. জাতীয় শক্তি কী? এর উপাদানগুলো কী কী? আন্তর্জাতক রাজনীতিতে ক্ষমতা হিসেবে অর্থনীতির ভূমিকা লিখুন?
৪. Balence of Power বা শক্তি সাম্য বলতে কী বুঝায় ? শক্তিসাম্যের বিকাশ সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।
৫. শক্তি সাম্য কী ? আন্তর্জাতক রাজনীতিতে শক্তিসাম্য নীতি কী তার পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে? যুক্তি দিন।
৬. শক্তি সাম্য কী ? শক্তিসাম্যের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্টসমূহ আলোচনা করুন।
৭. বিশ্বের যৌথ নিরাপত্তার কথা বলা হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি সাম্যই প্রধান আপনি কী একমত?
৮ শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। আপনি কী মনে করেন যে, এ দুটি ব্যবস্থা বর্তমানে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অকার্যকর? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যায় 8

অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ : অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চুক্তিসমূহ

Armament & Disarmament : Treaties Relating to Arms Control

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৪.১ ভূমিকা
৪.২ নিরস্ত্রীকরণ
৪.৩ নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে যুক্তি/আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব
৪.৪ নিরস্ত্রীকরণের সফলতার পথে অন্তরায় বা নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাসমূহ
৪.৫ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগীতা শুরু
৪.৬ বিশ্বের পারমাণবিক পরীক্ষাসমূহ
৪.৬ বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রের দেশসমূহ
৪.৭ বিভিন্ন দেশের কাছে মজুত পরমাণু অস্ত্রের মোট পরিমাণ
৪.৮ পরমাণুর অস্ত্রবিস্তার রোধ কেন প্রয়োজন
৪.৯ NPTএর বিরোধীতার কারণ
৪.১০ Nuclear Non Proliferation (NPT)
৪.১১ NPT এর চুক্তি স্বাক্ষর
৪.১২ পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি
৪.১৩ NPT এর মূল্যায়ন
৪.১৪ NPT বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ
৪.১৫ সিটিবিটি কি? এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য
৪.১৬ জেনেভার সিটিবিটি বৈঠক ও তার ফলাফল
৪.১৭ সিটিবিটি সম্পর্কে অভিযোগসমূহ
৪.১৮ সিটিবিটি-র অনুমোদন
৪.১৯ 'বিগ ফাইভ' এর অঙ্গীকার

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়াবহ পরিণতি মানবজাতিকে আতঙ্কিত করে তোলে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির হৃদয় বিদারক ঘটনার পর বিশ্বের জনগণ ভেবেছিল এবার বুঝি বিশ্ববিবেক আন্দোলিত হবে। মানবজাতি শান্তির অন্বেষায় পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়। বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার স্মৃতি মুছে না যেতেই শুরু হল মানববিধ্বংসী শক্তিশালী আণবিক বোমা তৈরির প্রতিযোগিতা। ঠাণ্ডাযুদ্ধের তথা স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাপের মাঝে আবিষ্কৃত হল হাইড্রোজেন বোমা, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বোমারু বিমান, আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধ

জাহাজ, বোমাবাহী সাবমেরিন, নক্ষত্র যুদ্ধের নকশা তৈরি ইত্যাদি ভয়াবহ মারণাস্ত্রসমূহ। এরই পথ ধরে বর্তমান বিশ্বে মারণাস্ত্র ধ্বংসাত্মক শক্তি এতবেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মানবসভ্যতাকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর নেই। পৃথিবী যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয় তবে সভ্যতার বিনাশ অনিবার্য এ সত্যটুকু এখন বিশ্ববিবেক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব শান্তিরক্ষার জন্য বর্তমান যুগে যেসব উপায় ও পন্থার কথা বহুলভাবে আলোচিত হচ্ছে এর মধ্যে নিরস্ত্রীকরণের ধারণা অন্যতম।

৪.২ নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)

সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ধরনের কিংবা সকল প্রকার অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস অথবা উৎপাদিত অস্ত্র ধ্বংসে বা উৎপাদন বন্ধ করা। আভিধানিক অর্থে, নিরস্ত্রীকরণের অর্থ শক্তি প্রয়োগ কিংবা সশস্ত্র সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে হ্রাস করা অথবা বিসর্জন দেওয়া। আন্তর্জাতিকভাবে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা।

মরগ্যানথ্যুর মতে, "অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম অস্ত্র হ্রাস করা অথবা বর্জন করাকে নিরস্ত্রীকরণ বলে।"

শে-চার বলেন, "আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরস্ত্রীকরণের মূল অর্থ একটু ব্যাপক। যেমন- কোনো রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করে তাকেও নিরস্ত্রীকরণ বলা যাবে।"

নিরস্ত্রীকরণ চার প্রকার হতে পারে। যথা : ১. সাধারণ (General), ২. আঞ্চলিক (Regional), ৩. সংখ্যাগত (Quantitative) এবং ৪. গুণগত (Qualitative)

যখন সকল রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তাকে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ বলে। যখন মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণে অংশ নেয় তখন তাকে আঞ্চলিক বা স্থানীয় নিরস্ত্রীকরণ বলা যেতে পারে। সংখ্যাগত নিরস্ত্রীকরণ বলতে অধিকাংশ বা সকল প্রকার অস্ত্রের সংখ্যা হ্রাস বা বিলুপ্তি বোঝায়।

মনে রাখার Technique & Tips

- ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।
- ১৯৬৮ সালে NPT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ২৫ বছর মেয়াদি এ চুক্তিতে ৪০টি দেশ স্বাক্ষর করে। ১৯৭০ সালের মার্চ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়।
- ১৯৯৫ সালে ইউইর্ক এ সম্মেলনের মাধ্যমে চুক্তিটি নবায়ন করা হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য।
- উপস্থিত ১৭৮টি দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল, কিউবা চুক্তিটির বিরোধীতা করে।
- পাঁচ বছর অন্তর অন্তর চুক্তিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
- এই চুক্তির বৈশিষ্ট্য : ক্ষমতাধর ৫টি রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারবে না।
- ১৯৯৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জেনেভাতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে সিটিবিটি পাশ করা হয়।
- এই চুক্তির বৈশিষ্ট্য : যাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র আছে (স্বীকৃত রাষ্ট্র) তা বজায় থাকুক নতুন করে যাতে কেউ এই মারণাস্ত্রের অংশীদার না হতে পারে।
- যে ৪৪টি দেশের হাতে পরমাণু চুল্লি আছে তাদের প্রত্যেকেরই এই চুক্তিতে সই করা বাধ্যতামূলক। ৪৪টি দেশের অনুমোদন পেলেই চুক্তিটি বাস্তবায়িত হবে। এ পর্যন্ত ৩১টি রাষ্ট্র অনুমোদন করেছে।
- CTBT চুক্তির রূপকার ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকের।
- ১৮৫ সদস্যর সাধারণ সভায় ১৮৫টি ভোটে সিটিবিটি পাশ হয়। লিবিয়া, ভূটান ও ভারত চুক্তিটির বিরোধীতা করেছে।
- এ পর্যন্ত ১৪৮টি দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে।
- তানজিয়া, সিরিয়া, লেবানন, মরিশাস ও কিউবা এ ৫টি দেশ ভোটে দানে বিরত থাকে।

চুক্তির বিষয়বস্তু

১. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন সদস্য রাষ্ট্রই কোন ধরণের পারমাণবিক পরীক্ষা বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

২. চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্য এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সংস্থা বাস্তবায়ন করার বিধান রাখা হয়েছে।

৩. চুক্তিটির বাস্তবায়নের ১০ বছর পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একত্রিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

ব্যাপক অর্থে, নিরস্ত্রীকরণ বলতে কেবলমাত্র অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস বা বিলোপ সাধন বোঝায় না। অনেক সময় নিরস্ত্রীকরণ বলতে সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করাও বোঝায়। অনেক সময় নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণকে সমার্থক বলে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় অস্ত্র হ্রাস করা, বিলোপ সাধন করা। অন্যদিকে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হলো সামরিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অস্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা। নিরস্ত্রীকরণের অন্যতম শর্ত হচ্ছে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন তখনই আসতে পারে যখন অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে। অস্ত্রের উৎপাদন ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত না হলে নিয়ন্ত্রীকরণ প্রহসন মাত্র।

পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা মানবজাতির মহাবিপর্যয়ের কারণ। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। মানবজাতির শান্তির ও নিরাপত্তার জন্য শুধু নয়, বরং অস্তিত্বের জন্য আজ অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। লাগামহীন অস্ত্র উৎপাদন যে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবার অন্যতম কারণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে রেহাই পেতে হলে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। তাই নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি বা ব্যবস্থাকে সফল করে তোলার জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় বা আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণের প্রসার ঘটাতে পারলে তা একসময় সকল রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণে পরিণত হতে পারে। এ ব্যাপারে বিশ্বজনমত সবসময় সচেতন ও সক্রিয় থাকা আবশ্যক।

৪.৩ নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে যুক্তি/আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব

Arguments in favour of disarmanment or importance of disarmament in modern world

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আধুনিক বিশ্বের ভয়াবহ মারণাস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের আবিষ্কার বিশ্বসভ্যতা ও মানবজাতিকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শান্তিকামী মানুষ চরম আতঙ্ক ও হতাশার প্রহর গুণছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানবজাতিকে বারবার যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে। লাগামহীন অস্ত্র উৎপাদন যুদ্ধকে উস্কানি দেয়। সুতরাং সকল প্রকার ভয়ভীতি ও যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা। নিরস্ত্রীকরণ সফল হলে সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ অনুকূল হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অস্ত্রমুক্ত যুদ্ধমুক্ত বিশ্বে পরিণত হতে পারে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিরস্ত্রীকরণকে সাফল্যমণ্ডিত করা একান্ত প্রয়োজন একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

নিম্নে নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে যুক্তিসমূহ তথা আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা :** আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরস্ত্রীকরণ এক অনন্য কর্মসূচি। অস্ত্র প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অস্ত্রের মাধ্যমেই এক রাষ্ট্র, অন্য রাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন করে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। অস্ত্রের কারণে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়, উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অস্ত্র প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ। রাজনৈতিক উত্তেজনা অস্ত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণে আন্তর্জাতিক সংকট রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। অস্ত্রের ভাষায় কথা বললে রাজনৈতিক সংলাপ কখনও সফল হতে পারে না। নিরস্ত্রীকরণ রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাসে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারে। রাজনৈতিক সমাধান ব্যতীত নিরস্ত্রীকরণ অর্থহীন। নিরস্ত্রীকরণ যেমন রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাসে সহায়তা করে, তেমনি রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টা নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। নিরস্ত্রীকরণের সাথে সাথে রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধংদেহী মনোভাবেরও পরিবর্তন করা চাই। যুদ্ধের প্রবণতা থেকেই অস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। মরগ্যানথ্যু বলেন, "অস্ত্র আছে বলেই

মানুষ যুদ্ধ করে না। মানুষ যুদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করলেই অস্ত্র সংগ্রহ ও উৎপাদন চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কেবল অস্ত্রের জন্য যুদ্ধ হয় না, যুদ্ধের মনোবৃত্তি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

২. **নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার :** অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভয়ভীতি বৃদ্ধি পায়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নোয়েলের মতে, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয়েছে। বিভিন্ন নিরস্ত্রীকরণমূলক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

৩. **নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির সামরিকীকরণ প্রতিরোধ :** অর্থনীতির সামরিকীকরণ প্রতিরোধের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ একান্ত আবশ্যক। অস্ত্র প্রতিযোগিতা অনেক দেশের অর্থনীতিকে সামরিক বাহিনী ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। জাতীয় আয়ের বিপুল অংশ সামরিক খাতে ব্যয় হয়, অথচ অর্থনীতির মৌলিক সমস্যার সমাধান করার জন্য অর্থের যোগান হয় না। দরিদ্রতা, ক্ষুধা ও অশিক্ষা দূর করার ব্যবস্থা করা যায় না। অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণে কোনো কোনো দেশ বছরে কোটি কোটি টাকার অস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করে অথচ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগান সম্ভব হয় না। নিরস্ত্রীকরণের ফলে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে মন্দাভাব সৃষ্টি হবে এরূপ ধারণা অমূলক। সামরিকভাবে অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমে বেকারত্ব দেখা দিলেও নিরস্ত্রীকরণের ফলে উদ্বৃত্ত অর্থের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

মনে রাখার Technique & Tips

২০১৩ সালের অস্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ এর তথ্যকণিকা

- জানুয়ারি-০২ : ইরানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কম্প্যাক্ট হেলিকপ্টার 'তুকান-টু' উদ্বোধন।
- জানুয়ারি-০২ : হরমুজ প্রণালীতে 'বেলায়েত ৯১' নামের ছয়দিনব্যাপী ইরানের নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হয়।
- জানুয়ারি-২৭ : সমুদ্রের নিচ থেকে 'বিওই' নামের ক্ষেপনাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করে ভারত।
- ফেব্রুয়ারি-০২ : ইরানের 'কাহের-২০১৩' নামের যুদ্ধবিমান উদ্বোধন।
- মার্চ-১৪ : 'ফরজ-৫' 'নাজেয়াত-১০' নামে দুটি ক্ষেপনাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায় ইরান।
- এপ্রিল-১০ : মাঝারি পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র 'হাতফ-৪' এর সফল পরীক্ষা চালায় পাকিস্তান।
- মে-২২ : ভারতের সুপারসনিক 'ব্রহ্মা' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ।
- আগস্ট-২২ : বিশ্বের পঞ্চম দেশ হিসেবে ভারত তার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী 'আইএসএস' উদ্বোধন করে।
- অক্টোবর-০৬ : রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা (OPCW) সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসে কার্যক্রম শুরু করে।
- অক্টোবর-২৩ : ভারত-চীন সীমান্ত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি (BDCA) স্বাক্ষরিত।
- ডিসেম্বর-১৪ : রাশিয়ার নতুন আন্তমহাদেশীয় ব্যালাস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র উদ্ভাবনের ঘোষণা।

৪. **পরিবেশগত উন্নয়নে নিরস্ত্রীকরণের ভূমিকা :** নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা বিশ্বের পরিবেশগত উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিউট্রন বোমার তেজস্ক্রিয়তা হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর নিক্ষিপ্ত এটম বোমার চেয়েও ভয়াবহ। রসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের প্রয়োগ চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে রাখে। যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত গোলাবারুদ ও বিষাক্ত গ্যাস পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। আণবিক বর্জ্য সমুদ্র পানি দূষণ করে পানি জগতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এককথায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবহার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিশ্বের পরিবেশ ক্রমশই মানবজাতির জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায়, নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি পূর্ণ না হোক আংশিক বাস্তবায়ন হলেও মানবজাতি পরিবেশ দূষণ থেকে কিছুটা মুক্তি লাভ করে নিরাপদ জীবনযাপনের প্রত্যাশা করতে পারে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৫. **সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার পরিহার :** মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল অপচয় ও অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য নিরস্ত্রীকরণ এক কল্যাণকর ব্যবস্থা বলা যায়। সামরিক সাজসরঞ্জাম ও মরণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। মানব কল্যাণে অর্থ ব্যয় না করে মানব ধ্বংসে অর্থ ব্যয় করা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। মহামূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদও অস্ত্র উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যয় হচ্ছে। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিয়ারে ট্রুডো মন্তব্য করেন, "মাত্র দু'সপ্তাহ বিশ্বে অস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা দ্বারা এক বছরের জন্য সমগ্র বিশ্বের জনগণের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব।" নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে এভাবে সম্পদের অপচয় ও অব্যবহার প্রতিরোধ করে মানবজাতির বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. **উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের পথ প্রশস্ত করার জন্য নিরস্ত্রীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজেদের আর্থিক স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তাদের অস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। এসব দেশসমূহের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং তা জিইয়ে রাখার মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। অস্ত্র আমদানিতে বিপুল অর্থ ব্যয় উন্নয়নশীল দেশসমূহে শুধু আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে না, তাদেরকে বৈদেশিক ঋণের বোঝায় জর্জরিত করে তোলে। প্রতি বছরে বিপুল অর্থ সামরিক খাতে ব্যয় না করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেশি ত্বরান্বিত হতে পারত। ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এর জলন্ত উদাহরণ।

নিরস্ত্রীকরণ একটি জটিল বিষয়। এ বিষয়টি উচ্চারণ কিংবা শ্রবন করা যেমন সহজসাধ্য, তেমনি এটি কার্যকর করা ততোধিক জটিল। সমস্যাসংকুল প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন। সামরিক শক্তির বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে না তোলা পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ কার্যকর হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন করতে না পারলে নিরস্ত্রীকরণ নিরর্থক। নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা হলো রাষ্ট্রসমূহের আন্তরিকতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে শুধুমাত্র চুক্তি বা সিদ্ধান্তই শেষ কথা নয়, রাষ্ট্রসমূহের আন্তরিকতা ও নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে কি না তা তদারক ও পরিদর্শন করার জন্য আন্তর্জাতিক পরিদর্শক টিম গঠন করা একান্ত আবশ্যক।

৪.৪ নিরস্ত্রীকরণের সফলতার পথে অন্তরায় বা নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাসমূহ
Obstacle to the success of disarmament or problems of disarmament

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও আলোচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ এড়াতে নিরস্ত্রীকরণ অনন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস ও বিলুপ্ত হলে যুদ্ধের অবসান হবে এ ধারণা একেবারে অমূলক নয়। অস্ত্র যুদ্ধকে আহ্বান করে, অস্ত্র ধ্বংস ও অকল্যাণ ডেকে আনে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, সীমিতকরণের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদনের পরও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের মহান উদ্দেশ্য এখন সফল হতে পারছে না। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান হবে বলে সঙ্গত কারণে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের একমাত্র শক্তিধর পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমেরুকরণের কারণে অত্যাধিক প্রতাপ ও ক্ষমতাধর হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিজের আণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ বহাল রেখে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রকে তাদের আণবিক শক্তির প্রসাররোধে চুক্তি স্বাক্ষরে চাপপ্রয়োগ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রচেষ্টা এখন ব্যাহত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আণবিক কর্মসূচি অব্যাহত রেখে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলছে। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনে চলছে নিরলস প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান, ভারত সম্প্রতি এতে যোগ দিয়েছে। একদিকে চলছে নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান, অন্যদিকে চলছে অস্ত্র উৎপাদন ও উদ্ভাবনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। নিম্নে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা :** বর্তমান বিশ্বে এখনো সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ যেহেতু কার্যকর হয় নি, সেহেতু প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ রাখতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে কোনো রাষ্ট্রই সনাতন অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে বসে থাকতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিরলসভাবে আধুনিক অস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ করে যাচ্ছে। সাথে সাথে আণবিক অস্ত্রের উৎপাদনে নিমগ্ন রয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষার ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে। শক্তি সঞ্চয়ে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা কেবল বাড়ছেই।

২. **আঞ্চলিক প্রাধান্য :** প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় নিজ নিজ অঞ্চলে অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে। সে লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভীতি সঞ্চয়ের জন্য তাকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও মারণাস্ত্রে সজ্জিত হতে হয়। ভারত ও পাকিস্তান পরস্পর অবিশ্বাস ও আস্থার অভাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য সৌদি আরব সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে চলছে। ইরান ও ইরাক আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ও প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে সমরাস্ত্রের আয়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলছে। চীন এ অঞ্চলে পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. **আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিবেচনা :** নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচির সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিচার বিবেচনার প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ শুধুমাত্র প্রতিরক্ষাগত কারণে অস্ত্র উৎপাদন করে না। প্রতিরক্ষা শিল্প বর্তমান বিশ্বে অন্যতম লাভজনক ব্যবসায়। অস্ত্র উপাদনকারী দেশসমূহ প্রতিবছর অস্ত্র রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে থাকে। নিরস্ত্রীকরণ সফল হলে এ সমস্ত দেশে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে এর প্রতিক্রিয়া বিশ্ব বাজারে দেখা দিবে।

৪. **বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক মন্দা :** নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে কার্যকর হলে বর্তমানে পুঁজিবাদী অস্ত্র উৎপাদনকারী উন্নত দেশসমূহে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। অস্ত্রকারখানা বন্ধ হয়ে গেলে তীব্র বেকার সমস্যা দেখা দিবে, যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির উপর পড়তে বাধ্য। বেকারত্ব শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ডেকে আনবে না অর্থনীতির মন্দাভাব জাতীয় উন্নয়নকে গ্রাস করবে।

৫. **পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাব :** নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচিকে সফল করতে হলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস বজায় থাকা অন্যতম শর্ত। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতি এখনো সৃষ্টি হয় নি। এমতাবস্থায়, প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলছে। নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপক আলোচনা ও আহ্বান সত্ত্বেও অনেক রাষ্ট্র আণবিক শক্তির পরীক্ষা ও অর্জনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। দূরপাল্লার মারণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের প্রসার বেড়েই চলছে। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৬. **প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি :** নিরস্ত্রীকরণের সফলতার জন্য চাই অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি। রাষ্ট্রসমূহের আন্তরিক সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা ব্যতীত নিরস্ত্রীকরণ সফল হতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি কোনো অবস্থায়ই সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের অনুকূলে নয়। আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা বিফলে যেতে বাধ্য, বরং অস্ত্রের উৎপাদন ও মজুদই সকলের কাম্য।

৭. **বৃহৎ শক্তিবর্গের আন্তরিকতার অভাব :** বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী নীতি পরিত্যাগ না করলে ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে আন্তরিক না হলে সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি কখনো সফল হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পরাশক্তিসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে আণবিক অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষরে ক্রমাগত চাপপ্রয়োগ করে যাচ্ছে, অথচ নিজেরা অবাধে পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি বর্জন করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান অরণ্যে রোদনে পরিণত হবে।

৮. **আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি :** সাম্রাজ্যবাদ মানবতার শত্রু। আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে রাষ্ট্রসমূহ সর্বদা ভীত থাকে। সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র থাবা যে কোনো সময় যে কোনো রাষ্ট্রের ওপর পড়তে পারে। সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ অস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ এমনকি আণবিক মারণাস্ত্র উৎপাদনে মনোযোগী হতে বাধ্য হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ আণবিক অস্ত্রের পথ প্রদর্শক। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান থাকবে ততদিন নিরস্ত্রীকরণের পথে প্রতিবন্ধকতা কখনো দূর হবে না।

বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে, স্নায়ু বা ঠাণ্ডাযুদ্ধেরও অবসান হয়েছে। আণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা অব্যাহত থাকলেও লাগামহীন মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা মানবজাতিকে কেবল ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে এ উপলব্ধি আজ বিশ্ব নেতৃত্বের অন্তরে জাগ্রত হয়েছে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় আশার আলো দেখা দিয়েছে। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ যদি নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে আন্তরিক সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ভয়ভীতিমুক্ত বিশ্বে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে এরূপ প্রত্যাশা কোনো দুরাশা নয়।

Nuclear Non-Proliferation (NPT) & Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)

পারমাণবিক অস্ত্র মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে যে কোনো সময় ধুলোয় মিশিয়ে দিতে সক্ষম। বিশ্বব্যাপী পরমাণু অস্ত্রের বিকাশ ও উৎপাদন বর্তমান বিশ্বের শান্তি প্রতি ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মারনাস্ত্রের প্রসার কেবল যুদ্ধের সম্ভাবনাই সৃষ্টি করে না, যুদ্ধের ধ্বংসে সাধনের ব্যাপকতাকেও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি করে। সে কারণেই পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার বিভীষিকা সকলের কাছে এক ভয়ানক ত্রাস। এ ধরনের বিভীষিকাপূর্ণ মারণাস্ত্রের কবল থেকে পৃথিবী তথা অনাগত ভবিষ্যতদেরকে রক্ষা করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করা একান্ত অপরিহার্য। আর এক্ষেত্রে প্রথম শর্তই হলো বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্র পরিহার করে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় এগিয়ে আসা। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ NPT ও CTBT । NPT ও CTBT চুক্তিকে কার্যকর চুক্তিতে পরিণত করতে হলে যেসব দেশে প্রচুর পরিমাণে পারমাণু অস্ত্র আছে সেসব দেশকে এটা উৎপাদনে অনুৎসাহিত করতে হবে। এক কথায় বলা যায়, বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত রাখা এবং শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার NPT ও CTBT ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

৪.৫ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা শহরে ১২ কিলোটনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সামরিক দক্ষতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। ইউরেনিয়াম ও প্লাটোনিয়াম ভারী মৌলের বিভাজন ঘটিয়ে, প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৪৬ সালে দুটি এবং ১৯৪৮ সালে আরো তিনটি বোমার পরীক্ষমূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মার্কিন পরমাণু বোমার প্রযুক্তিবিদ্যাগত দক্ষতা পুনরায় প্রমাণিত করে।

মার্কিন পরমাণু শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা মুখ বুঝে দেখে নি বিশ্বের অপর বৃহৎ শক্তি দেশ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। এক বছরের মধ্যেই তারাও প্রমাণ দিল, তাদের পারমাণবিক শক্তির ক্ষমতা। ১৯৪৯ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পারমাণবিক আধিপত্যের অবসান ঘটে। বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার শুরু এ বছরটি থেকে। শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে উভয় পক্ষই আরো সূক্ষ্ম, শক্তিশালী বহণযোগ্য পরমাণু অস্ত্রের প্রযুক্তি নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। আরো সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠল পরমাণু অস্ত্র। তিন বছরের মধ্যেই হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া মার্কিনীদের বেকায়দায় ফেলে দিল। বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী শাখারভের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ইউরোনিয়াম এবং প্লাটেনিয়ামের বিভাজন থেকে যে ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, হাইড্রোজেন বোমার ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৫২ সালের ১ নভেম্বর যে হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হয়েছিল, তার ক্ষমতা কয়েক হাজার কিলোটন।

এ সাফল্যের সাথে সাথে মার্কিন সোভিয়েত রাশিয়া পারমাণবিক দ্বন্দ্ব আরো জটিল হয়ে উঠল। মার্কিনীরাও এর জবাব দিল ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ বিকিনির এক কোরাল দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। এ বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল ১৫ মেগাটন। এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে, ৫০০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে (বিস্ফোরণ কেন্দ্রের) কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ৫৪ মেগাটন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পাশাপাশি, আরো দুটি দেশের হাতে চলে এল পারমাণবিক ক্ষমতা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স 'পরমাণু ক্লাবে' নাম লেখালো। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেন পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা ঘটায়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সও পরমাণু শক্তিধর দেশে পরিণত হলো। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে টক্কর দিতে মার্কিনীরা এই দুটি দেশকে পারমাণবিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছে বলে সন্দেহ করা হয়। এশিয়ার মাটিতে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় চীন ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে। চীনের ক্ষেত্রেও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া পারমাণবিক সরঞ্জাম দিয়ে চীনকে সাহায্য করে বলে অভিযোগ ওঠে। ভারত পরমাণু ক্লাবের সদস্য হয় ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে। রাজস্থানের থর মরুভূমিতে পোখরান অঞ্চলে তারা মাটির নিচে ১৫ কিলোটন শক্তির পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে ভারত পুনরায় ১১ ও ১৩ মে ১৯৯৮ একই স্থানে ৫টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এর পরপরই ২৮ মে ও ৩০ মে পাকিস্তান বেলুচিস্তানের চাগাই মরুভূমিতে ৬টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে পরমাণ বোমার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার শীর্ষে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা মোট ১ হাজার ৩২ বার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা ঘটিয়েছে ৭১৫ বার। অন্যান্য দেশগুলোর তালিকায় ব্রিটেন ৪৫ বার, ফ্রান্স ২১০ বার, চীন ৪ বার, ভারত ও পাকিস্তান ৬ বার করে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। হিরোশিমা নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণের পর বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোনো শহরের ভাগ্যে এ অভিশাপ নেমে আসে নি। এটা আশার কথা। কিন্তু দিন বদলের সাথে সাথে পরমাণুবোমার চেহারা বদলেছে। অনেক সহজ হয়ে উঠেছে এর ব্যবহার, টন পিছু খরচ কমেছে একশ ভাগ। আগে পারমাণবিক বোমা বানাতে প্লাটোনিয়াম লাগত দশ থেকে বারো কিলোগ্রাম। এখন লাগে তার অর্ধেক। ১৯৮৬ সালে পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৪৮০টি। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ফলে ১৯৯৩ সালে এ সংখ্যা নেমে ৫০ হাজারের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.৫ বিশ্বের পারমাণবিক পরীক্ষাসমূহ

বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই। এরপর ১৯৪৯ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৫২ সালে ব্রিটেন, ১৯৬০ সালে ফ্রান্স, ১৯৬৪ সালে চীন এবং ১৯৭৪ সালে ভারত এবং ১৯৯৮ সালে পাকিস্তান পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এক হিসাব মতে এ পর্যন্ত বিশ্বের ৫টি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় ২ হাজার ৫টি। লন্ডনের 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ'-এর সাম্প্রতিক হিসাব মতে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ১০৩২টি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭১৫টি, ফ্রান্স ২১০টি, ব্রিটেন ৪৫টি, চীন ৪৪টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

দেশের নাম	ভূপৃষ্ঠ	ভূগর্ভ	পরীক্ষার সংখ্যা
যুক্তরাষ্ট্র	১৪১	৩৮	১,০৩২
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪৭	৩৮	৭১৫
ব্রিটেন	৮	০.৯	৪৫
ফ্রান্স	১০	৪	২১০
চীন	২১.৯	১.৫	৪৪
মোট	৪২৭.৯	৮২.৪	২,০৪৬

তাছাড়া, ভারত ১৯৭৪ সালে ১টি ও ১৯৯৮ সালে ৫টি মোট ৬টি এবং পাকিস্তান ১৯৯৮ সালে ৬টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

৪.৬ বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশসমূহ

১. **যুক্তরাষ্ট্র :** ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। ইতোমধ্যে দেশটি ১০৫৪টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডারে ১২,০৭০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড (Warheads) আছে। দেশটির ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ পাল্লা ৮,১০০ মাইল (১৩০০০ কিঃ মি) অর্থাৎ বিশ্বের যে কোনো স্থানে তা পৌঁছাতে সক্ষম।

২. **ব্রিটেন :** ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এ পর্যন্ত মোট ৪৫টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ৩৮০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৭৫০০ (১২,০০০ কি. মি.)।

৩. **ফ্রান্স :** ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর এ পর্যন্ত ২১০টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সর্বশেষ ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে। পারমাণবিক ওয়ারহেড ৫০০টি। ক্ষেপণাস্ত্রের পল্লা ৩,৩০০ মাইল (৫,৩০০ কি. মি.)।

৪. **রাশিয়া :** যুক্তরাষ্ট্রের পর রাশিয়াই প্রথমবারের মতো বিশ্বে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় মোট ৭১৫টি। পারমাণবিক ওয়ারহেড ২২,৫০০টি। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৬৮০০ মাইল (১১,০০০ কি. মি.)।

৫. **চীন :** ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। মোট ৪৫টি বিস্ফোরণ। ৪৫০টি ওয়ারহেড। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৬,৮০০ মাইল (১১,০০০ কি. মি.)।

৬. **ভারত:** ১৯৭৪ সালের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। আর ১৯৯৮-র মে আরো ৫টি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে আনুমানিক ৬৫টি। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৫,০০০ মাইল কি. মি.।

৭. **ইসরাইল :** যতদূর জানা যায়, ইসরাইলের ১৯৭৯ সালে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় গোপনে। ৬৫-১১২টি ওয়ারহেড আছে ইসরাইলের। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় নি। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৯৩০ (১,৫০০ কি. মি.)। হাতে নতুন বোমার আনুমানিক সংখ্যা ১০০টি।

১৯৭৪ ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার পর পাশ্চাত্যের সরবরাহকারীগণ পাকিস্তানকে পারমাণবিক যন্ত্রপাতি সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৮. **পাকিস্তান :** ১৯৭২ সালে পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মে মাসে ৬টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে ১৫ থেকে ২৫টি। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৯৩০ মাইল (১,৫০০ কি. মি.)।

৯. **ইরান :** যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৩০০ মাইল (৫০০ কি. মি.)। একাধিক বোমা তৈরীর সরঞ্জাম তাদের হাতে মজুদ রয়েছে।

১০. **ইরাক :** উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে ইরাকের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের কর্মসূচি ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। যুদ্ধের পর জাতিসংঘের পরিদর্শনের ফলে কর্মসূচির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৯০ মাইল (১৫০ কি. মি.)।

১১. **উত্তর কোরিয়া :** ২০০৩ সালে গোপনে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। হাতে আনুমানিক ১০ পরমাণু বোমা মজুদ আছে। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৬০০-৯০০ মাইল (১০০০-১,৫০০ কি. মি.)।

১২. **লিবিয়া :** যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে গাদ্দাফি পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে আগ্রহী। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ১৯০ মাইল (৩০০ কি. মি.)।

১৩. **আলজেরিয়া :** একসময় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চলছিল এখন বন্ধ। দেশটি পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে চুক্তিতে (NPT) স্বাক্ষর করেছে।

১৪. **আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল :** আশির দশকে উভয় দেশ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চালায়। কিন্তু ১৯৯০ সালে উভয় দেশের গণতান্ত্রিক সরকার উক্ত কর্মসূচি রহিত করে দেয়। ল্যাটিন আমেরিকাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত একটি চুক্তিতে উভয় দেশ স্বাক্ষর করেছে।

১৫. **বেলারুশ, কাজাকিস্তান, ইউক্রেন :** সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে গেল তখন তিনটি দেশের হাতেই বিপুল পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ ছিল। কিন্তু তিনটি দেশই তাদের সকল অস্ত্র রাশিয়াকে দিয়ে NPT স্বাক্ষর করেছে।

১৬. **দক্ষিণ আফ্রিকা :** একমাত্র দেশ যেটি পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করার পর তা স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে ফেলেছে। ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক (De – Klerk) মজুদ পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করেন এবং NPT- তে স্বাক্ষর দেন।

৪.৭ বিভিন্ন দেশের কাছে মজুদ পরমাণু অস্ত্রের মোট পরিমাণ

পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণ, নিষিদ্ধকরণ এবং অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের হাতে যে পরিমাণ পারমাণবিক মরণাস্ত্র মজুদ আছে, তাতে পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার ধ্বংস করা যেতে পারে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে পরমাণু বিস্ফোরণের ভয়ংকর চেহারা দেখে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আশা করেছিলেন, পরমাণু অস্ত্রমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেরিতে হলেও বাস্তবায়িত হবে। অথচ ৬৮ বছর পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হাতে যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র আছে, হিরোশিমার বোমার মতন ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রতি মিনিটে একটা করে বোমা ফাটালে, পৃথিবীর মজুত পরমাণু বোমা শেষ হতে তিন বছর সময় লাগবে। পৃথিবীর ৯০ ভাগ পরমাণু অস্ত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলোর (সিংহ ভাগই রাশিয়ার কাছে) হাতে। পারমাণবিক শক্তিধর পৃথিবীর পাঁচটি দেশ ছাড়াও পরমাণু অস্ত্রধর দেশের তালিকায় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া, ইসরাইল, পাকিস্তান ও ভারতের নাম। ভারত ও পাকিস্তান ইতোমধ্যে তাদের নামের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। বাকী দেশগুলোর হাতে এ মারণাস্ত্র আছে কিনা, তা সরকারিভাবে জানা না গেলেও পরমাণু শক্তির ব্যবহারের ক্ষমতা এসব দেশের আছে।

৪.৮ পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ কেন প্রয়োজন

১. **বিশ্ব শান্তি রক্ষায় :** নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের অবসান এবং বিশ্বব্যাপী 'যুদ্ধ নয় শান্তির' পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠিত হওয়ায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ এর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবগত। তাই ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপে যে ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়েছে মূলত এরই প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ১৯৪৫ সালের পর বিশ্বের অন্তত পক্ষে ৭টি দেশ পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করলেও হিরোসিমা ও নাগাসাকির পর কেউ তা আর ব্যবহার করে নি। তাই বিশ্বশান্তি রক্ষা এখন পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

২. **অর্থনৈতিক মুক্তি :** পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধ করে অনেক দেশই অর্থনৈতিকভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে। পরাশক্তিসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের বার্ষিক বাজেটের বিরাট অংশ অস্ত্র উৎপাদনে ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করে আসছে। ফলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস হয়ে আসছে। যে সকল উন্নয়নশীল দেশ ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেয়ে সামরিক খাত উন্নতিকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে সে সকল দেশ অস্ত্রবিস্তার রোধ করে উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করতে পারে। পরাশক্তিসমূহ সামরিক খাতে যে বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ কমিয়ে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে দিলে তাদের দারিদ্র্য অনেকটা লাঘব হতো। তাই সামরিক বাজেট হ্রাস করে দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য প্রদান ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অস্ত্র বিস্তার রোধ প্রয়োজন।

৩. **যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করা :** অস্ত্রবিস্তার রোধ মানে অস্ত্রের বহুবিধ উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ। ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা এবং যুদ্ধের ভীতি বহুলাংশে হ্রাস করে। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা হ্রাস করে সকল ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে আনে। এতে করে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়।

৪. **যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতিকে হ্রাস করবে :** যদি পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ করা যায় তাহলে কোনো পরাশক্তির কাছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্র না থাকে তাহলে তাদের মধ্যে কোনো কারণবশত যুদ্ধ সংঘটিত হলে তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কম হবে। কারণ পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা এতই বেশি যে তা সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে।

৫. **জনস্বাস্থ্য রক্ষা :** পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয়তা নিঃসৃত হয় তার ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়াসহ জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। জলে, স্থলে, মহাকাশে যেখানেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটুক না কেন তার ফলে পরিবেশ দূষিত হতে বাধ্য। ১৯৮৫ সালে হিরোসিমা, নাগাসাকি এবং ১৯৮৬ সালের চেরনোবিলে দুর্ঘটনা সে সব এলাকায় মানুষ ও পরিবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অভিশাপ বয়ে এনেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার কিংবা ভুলক্রমে এর অপব্যবহার দুটোই মানবজাতির জনস্বাস্থ্যের জন্য অভিশাপ। তাই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ করা তা জনস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

৬. **বিশ্ব জনমত গঠন :** পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ করতে হলে বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর এবং শান্তিকামী উভয় দেশসমূহের মধ্যেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিস্তার রোধ করার উপায় খুজে বের করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন মতের, বিশ্বাসের, আদর্শের দেশসমূহের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে যা চির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যকার তিক্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। এতে করে পরাশক্তি, দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। এতে করে বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠে যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত বিশ্ব জনমতের প্রবল বিরোধিতার কারণে বিশ্বব্যাপী পরমাণু অস্ত্রের প্রকাশ্য উৎপাদন ও ব্যবহার প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে।

৪.৯ NPT এর বিরোধিতার কারণ

ভারত, পাকিস্তান ও ইসরাইল এনপিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার কারণ ভারত বরাবরই এনপিটি চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে। ভারত তার প্রতিনিধিও পাঠায় নি ১৯৯৫ সালের সম্মেলনে। তাদের মতে এ চুক্তি বৈষম্যমূলক। পৃথিবীকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করার চক্রান্ত । একদিকে পরমাণু শক্তিধর দেশ অন্যদিকে অ-পরমাণু শক্তিধর দেশ এবং চিরকালই নিরাপত্তার জন্য পরের মুখমুখি হয়ে থাকতে হবে। ভারতের স্বাক্ষর করার ওপরই পাকিস্তান তার সম্মতি জানানো কিংবা না জানানোর কথা বলে। পাকিস্তানের তরফ থেকে বলা হয়, নতুন দিল্লী এনপিটি চুক্তি সই করলে তারাও স্বাক্ষর করতে রাজি।

ইসরাইলের স্বাক্ষর না করার কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের মত হলো, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরে এলে তবেই তারা এনপিটি চুক্তি স্বাক্ষর করবে।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, এনপিটি নিয়ে মতবিরোধ মাঝে মাঝে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই মস্কো, ওয়াশিংটন ও লন্ডনে পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং ১৯৭০ এর ৫ মার্চ এ চুক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠার পর থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়ে যায়। এ চুক্তি সাধারণ সভার রাজনৈতিক কমিটির ১২৪ জন সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়েছিল। এই চুক্তি গৃহীত হবার পরপরই ৭০টি দেশ স্বাক্ষর করেছিল। ভারত ভোট দানে বিরত ছিল। কমিউনিস্ট চীন এবং ফ্রান্স এ চুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিউবা, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, আলবেনিয়া চুক্তির বিপক্ষে ভোট দেয়। এ চুক্তি প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যেসব দেশ পরমাণু শক্তির অধিকারী নয়, ভবিষ্যতে তারা যাতে ধ্বংসের কাজে পরমাণুকে ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর কাছে নিজেদের পারমাণবিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া । শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের জন্য

প্রয়োজন হলে বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই চুক্তির ফলে বর্তমানের পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর একচেটিয়া অধিকারের কথা কেউই অস্বীকার করে না। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে বিশ্বের বহুদেশ। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি যখন বলছিলেন, 'আর পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, আর উৎপাদন, বিক্রি কিংবা লেন-দেনও নয়, সমস্ত পরমাণু অস্ত্রের ধ্বংসেই হওয়া উচিত আমাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্য'। তখন তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশ অভিযোগ করেছিল, এনপিটি'র সর্ষের মধ্যে ভূত। ১৯৭০ সাল থেকে এনপিটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো এক লক্ষ পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন করেছে এবং দুই হাজারের কাছাকাছি পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে।

২০০০ সালের ১১-১৩ নভেম্বর নতুন দিল্লীতে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে তিন দিনের আলোচনায় বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পাস হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (ক) পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ঘোষণাপত্র এবং (খ) আন্দোলনের কর্মসূচি। ঘোষণাপত্রে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, মানুষকে সৃজনশীল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য এ বিষ অস্ত্রের প্রয়োগের প্রবণতা বাড়ছে। পরিবেশ দূষণ এবং বিপন্ন ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ বলে আর কিছু থাকবে না। আন্দোলনে শরিক হতে ২০০১ সাল থেকে প্রতিবছর ৪ থেকে ১১ আগস্ট 'পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হবে বলে কার্যসূচি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪.১০ Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT)

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় অনেকটা তরিঘড়ি করেই। উদ্দেশ্য জাপানের আগে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি জাপান, জার্মান, ইটালিকে পর্যুদস্ত করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফাটালে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। ঠান্ডা লড়াই চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আণবিক ক্ষেত্রে মার্কিন একচেটিয়া আধিপত্য ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। অন্যথায় বিশ্বব্যাপী শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকবে না। তারা এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করে ১৯৪৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ব্যাপারে বলা যায় যে পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েতভীতির মুখে মার্কিন পারমাণবিক ছত্রছায়ায় থাকলেও নিজেদের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন ও চিরকাল মার্কিনীদের মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকার বাসনা তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বেলিত করে এবং তারা যথাক্রমে ১৯৫২ সালের ৩ অক্টোবর ও ১৯৬০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে আণবিক শক্তির অধিকারী হয়। চীনের পারমাণবিক কার্যক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ উভয় পরাশক্তির অস্ত্রসমূহের ভীতির প্রতিক্রিয়াজাত এবং সে দেশটি ১৯৬৪ সনের ১৬ অক্টোবর তারিখে পারমাণবিক ক্লাবে যোগদান করে। মূলত উপরিউক্ত ৫টি দেশই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। পরমাণু অস্ত্রের ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিস্তার রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয়তা বৃহৎ শক্তিগুলো অনুভব করে। ফলে তারা পরমাণু অস্ত্র প্রক্রিয়াকে একটি সীমাবদ্ধ আইন-কানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে NPT চুক্তি উত্থাপন করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার পর অর্থাৎ ৫০ এর দশক থেকে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। বিশ্বপরমাণুশক্তি তখন মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটোজোট এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের জোট অধুনা বিলুপ্ত ওয়ারশ- এর অধীনে জোটবদ্ধ হয়। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে তুমুল স্নায়ুযুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে শক্তিধর দেশগুলো এক বেঠকে মিলিত হয় ও ১৯৬২ সালে মার্কিন সিনেটে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রসমূহ এর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬৮ সালে NPT চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

৪.১১ NPT চুক্তি স্বাক্ষর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের চেষ্টার ফলে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে প্রথমবারের মতো পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধে NPT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাথমিকভাবে ২৫ বছর মেয়াদি এ চুক্তিতে ৪০টি দেশ স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। ২৫ বছর মেয়াদ শেষে ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের পরিচালনায় চুক্তি পুনর্বিবেচনাসহ চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে চুক্তিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা হয়। ৭০টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল, কিউবা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। এ সম্মেলনে ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করে। পাঁচ বছর অন্তর এনপিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ১০৮টি NTP চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। উত্তর কোরিয়া ২০০৩ সালে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেয়।

চুক্তির বৈশিষ্ট্য

১. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নয় এমন দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলো অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে না এবং এ ব্যাপারে কোনো সাহায্যও করবে না।

২. যে সব দেশের পারমাণবিক অস্ত্র নেই তারা পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে না বা এ লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা ও প্রযুক্তি গ্রহণ করবে না।

৩. এ চুক্তির উপধারাগুলোতে বলা হয়েছে যে, ক্রমান্বয়ে অস্ত্র হ্রাসকরণ, ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, নতুন অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির ওপর কড়াকড়ি আরোপ, শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

৪.১২ পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি ও পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের সম্ভাবনা

পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি (Nucler Non Proliferation Treaty) সংক্ষেপে এন,পি,টি'র পর্যালোচনা শীর্ষক একমাস ব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইউইয়র্কে, জাতিসংঘের পরিচালনায়। ১৯৯৫ এর ১৭ই এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশ্বের ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। ২৫ বছরের পুরনো 'পরমাণু অস্ত্র প্রাসারোধ চুক্তি' অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ৪টি পরমাণু শক্তিধর দেশ এনপিটি অনির্দিষ্টকাল বাড়ানোর জন্যই সুপারিশ করে। এ নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর তীব্র মতভেদ, বাদানুবাদে এনপিটি সম্মেলনে যথেষ্ট জমে ওঠেছিল। অনেক বাদানুবাদ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা এনপিটি চুক্তির মেয়াদ সীমিত রাখার পক্ষেই মত দেয়। অধিকাংশ জোটনিরপেক্ষ দেশ এনপিটির মেয়াদ বাড়ানোর বিরুদ্ধে ছিল। মিসরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে। রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করেও ইসরাইল, ভারত ও পাকিস্থান এনপিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। ভারত ও পাকিস্তান সম্মেলনে কোনো প্রতিনিধি পাঠায় নি। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এনপিটি বৈঠক হয়ে থাকে।

৪.১৩ NPT এর মূল্যায়ন

এই চুক্তিটি ছিল বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে প্রথম সফল পদক্ষেপ। চুক্তিটি প্রাথমিকভাবে সকলের কাছে প্রশংসিত হলেও এর কিছু কিছু শর্তের কারণে অনেক দেশ এটির সমালোচনাও করেছে। অনেকেই চুক্তিটিকে বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতা স্থায়ীকরণের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন। নিচে চুক্তিটির মূল্যায়ন উল্লেখ করা হলো :

১. **বৈষম্যমূলক দিক :** এ চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশসমূহের অস্ত্র হ্রাস ও নির্মূলের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নি। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশসমূহের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করে

অপারমাণবিক দেশসমূহের অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করতে হয়েছে। ফলে চুক্তিটি বৈষম্যমূলক চুক্তিতে পরিণত হয়েছে।

২. **ক্ষমতার বিভক্তিকরণ :** এ চুক্তিটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী ও পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশগুলোকে দুটি ব্লকের সৃষ্টি করেছে এবং পারমাণবিক অস্ত্রধারী ৫টি দেশের কর্তৃত্বকে পাকাপোক্ত করেছে।

৩. **নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি :** এ চুক্তি অপারমাণবিক দেশগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করে নি। ক্ষমতাধর দেশগুলো চায় অপর দেশের নিরাপত্তা তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর থাকুক।

৪. **পক্ষপাতদুষ্ট :** চুক্তিতে অপারমাণবিক দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন করছে কিনা তা যাচাই ও মনিটরিং এর কথা বলা হলেও পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষেত্রে এরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নি। ফলে এ চুক্তি বিশ্বের সকল দেশকে একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫. **চুক্তির প্রতি অনীহা :** পারমাণবিক শক্তিধর ৫টি বৃহৎ রাষ্ট্র এ চুক্তিটি সকলের জন্য সমান আইন প্রণয়ন করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। অপরদিকে ভারত, পাকিস্তান ও ইসরাইলের মতো রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ হয়েও চুক্তিতে সই করছে না। উত্তর কোরিয়া প্রথমে এ চুক্তিতে সই করলেও সম্প্রতি চুক্তি থেকে সরে এসেছে। ইরান চুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে যাচ্ছে গোপনে।

৬. **কার্যকারিতা হারানো :** এ চুক্তিটি বিশ্বের সকল দেশকে একটি একক সিদ্ধান্তের ওপর দীর্ঘ দিনেও আনতে পারে নি। ফলে চুক্তিটির বাস্তবায়ন অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। চুক্তিটির প্রতি অনেক দেশ শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে এখনো পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন ও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষর না করে যেমন ভারত ও পাকিস্তান পরীক্ষা চালিয়েছে তেমনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষা চালিয়েছে।

৪.১৪ NPT বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. ১৯৬৮ সালে NPT চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ভারত ১৯৭৪ সালে প্রথম পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৯৮ সালে পাকিস্তান প্রথমবারের মত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ চুক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে NPT সম্মেলন শেষ হবার পরই চীন পরমাণু শক্তির পরীক্ষা চালিয়ে এ চুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে।

২. পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলো কর্তৃক গৃহীত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা না মানা।

৩. এ চুক্তি স্বাক্ষরের পরও দেখা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পারমাণবিক অস্ত্রসহ নতুন নতুন অস্ত্র তৈরি ও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাধর দেশগুলো এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রধান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম ও মহাকাশ প্রতিরক্ষা কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা।

৪. বিশ্বে একক কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করার জন্য ২/১টি দেশ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব।

৫. এ চুক্তির সার্থকতা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলেও ঝড় উঠেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এ চুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি পারমাণবিক সামন্ততন্ত্রকেই প্রশ্রয় দেবে।

চুক্তির ভালো দিকগুলো

১. এটি প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের কার্যকর চুক্তি যা বিশ্বের সকল দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

২. ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্ধারণ বিষয়ক সম্মেলনে

উপস্থিত ১৭৮টি দেশের কেউই এ চুক্তির বিরোধিতা করে নি।

৩. এ চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল আফ্রিকার ৫৩টি দেশের মধ্যে ৪৩টি দেশ পেলিনদাবা চুক্তির মাধ্যমে আফ্রিকাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। এ অঙ্গীকার রক্ষার্থে তারা মহাদেশের অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলকেও উৎসাহিত করবে।

৪. NPT চুক্তির ভুল-ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যেই পরবর্তী CTBT চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

৫. এ চুক্তির ফলেই পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ করা এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন তীব্রতর হয়।

৬. বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলে সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে।

NPT চুক্তিই প্রথম চুক্তি যা বিশ্বের অপারমাণবিক ও পারমাণবিক দেশগুলোকে এর কুফল সম্পর্কে ধারণা দিতে পেরেছিল। পারমাণবিক অস্ত্র যে প্রচ মানবতা বিরোধি অস্ত্র তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। শুধুমাত্র নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরেই যে পারমাণবিক অস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন বর্তমান যুগে একথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাই NPT চুক্তির বাস্তবায়নে এখনো আশা রয়ে গেছে। সেই সাথে রয়ে গেছে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার আকাঙ্ক্ষা।

NPT চুক্তির নবায়ন : NPT চুক্তির যে গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করলেই বোঝা যায়। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে পুনরায় এনপিটি চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। নবায়নের সময় মোট ১৭০টি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তি নবায়নকালে যে সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো একত্রে কাজ করবে এবং জাতিসংঘ এক্ষেত্রে মডারেটরের ভূমিকা পালন করবে।

২. অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়নকৃত চুক্তিতে পারমাণবিক অস্ত্রের কোনো পরীক্ষা চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে সেদেশের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে।

৩. চুক্তিতে বিশ্বব্যাপী অস্ত্র নির্মাণ ও হস্তান্তর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন থেকে কোনো দেশই অস্ত্র নির্মাণ করতে পারবে না।

৪. চুক্তির দ্বারা অস্ত্র রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

৫. ইতমধ্যে যেসব দেশ পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করছে সেসব দেশ তাদের পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করবে।

৪.১৫ সিটিবিটি কী ? এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

সিটিবিটি অর্থাৎ Comprehensive Test Ban Treaty বা সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি হল পশ্চিমা দুনিয়া বিশেষ করে কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং চীনের মস্তিষ্কসূত ফল। এশিয়ার দেশ চীন কোনো কোনো ক্ষেত্রে চুক্তিটির পরিকাঠামোগত অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও আদতে পশ্চিমি দুনিয়ার কাজকর্মে পুরামাত্রায় মদদ দিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক ভাষ্যকারদের মতে NPT অর্থাৎ Nuclear Non-Proliferation Treaty বা পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তির ব্যর্থতাই পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশকে CTBT'র দিকে পা ফেলতে সাহায্য করেছে। ১৯৯৫ এর ১৭ এপ্রিল এনটিপি বৈঠকে জট ছাড়াতে দেশগুলো ব্যর্থ হয়। এ সম্মেলনে ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তিটিকে নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছিলেন। ২৯ জুলাই ১৯৯৬ এর জেনেভার বিশ্ব পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন এবং সিটিবিটি পাস করিয়ে নেবার উদ্যোগ সবই ছিল দীর্ঘ কয়েক বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। সিটিবিটির কঠোর বিরোধিতা করে ভারত যখন ২১ আগস্ট ১৯৯৬ চুক্তিটির বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রয়োগ করে, তখনও থেমে থাকে নি, পরমাণুশক্তিধর দেশগুলো। অস্ট্রেলিয়াকে দিয়ে জাতিসংঘের ৫১তম সাধারণ সভায় নতুন করে প্রস্তাব আনিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সাধারণ পরিষদে আলোচনার পর ১৫৮ ভোটে এ চুক্তির

খসড়াটি অনুমোদন লাভ করে। ভারত, লিবিয়া, ও ভুটান চুক্তিটি অনুমোদনের বিরোধিতা করে এবং অপর ৫টি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে। চুক্তিটি ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এ পর্যন্ত ১৭৭টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। তার মধ্যে ৩২টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে চুক্তিটিকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়। চীনকে কাছে টানতে সিটিবিটির খসড়া প্রস্তাবটির হেরফের ঘটানোর দৃষ্টিকটু দৃষ্টান্ত গোটা বিশ্বের নজর এড়ায় নি। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল এভাবে সিটিবিটির ব্যাখ্যা করেছেন যে, যাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র আছে, তা বজায় থাকুক। নতুন করে কেউ যাতে এ মরণাস্ত্রের অংশীদার হতে না পারে। সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষারোধ চুক্তিটির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ তাদের পারমাণবিক ক্ষমতা অটুট রাখতেই সম্মেলনে আদা-জল খেয়ে নেমেছিল ।

চুক্তিটির খসড়া

ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকের ৯৫ পাতার খসড়াটিতে বলা হয় :

১. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো যাদের পরমাণু চুল্লি আছে, প্রত্যেকের সই বাধ্যতামূলক। এখানে উল্লেখ্য ৪৪টি দেশের পরমাণু চুল্লি আছে। চুক্তির বর্ণনা ১৯৯৪ সালেই তৈরি হয়েছিল। এ খসড়াপত্রটিতে পরে অদল-বদল ঘটানো হয়।

২. দেশের সংসদেও চুক্তিটিকে পাস করানোর কথা বলা হয় খসড়া প্রস্তাবে।

৩. এ প্রস্তাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আন্তর্জাতিক মনিটরিং স্টেশনের আমূল সংস্কার। অর্থাৎ কোনো দেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে কিনা তা দেখাশোনার জন্য আগামী দুই বছরে ৩১টি দেশে মনিটরিং স্টেশন চালু করা। নিজেদের পারমাণবিক চুল্লি তথা অন্যান্য বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য চীনের সঙ্গে মতবিরোধ হয়। চীন এ নীতি কার্যকর করার মধ্যে সন্দেহের গন্ধ পেয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক 'প্রভুত্ব'কে বরদাস্ত করতে পারে নি।

৪. সিটিবিটি কার্যকর হবার পর কোনো দেশ গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলো অনুসরণ না করলে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে খসড়া পত্রে বলা হয়। এ সম্পর্কেও চীন, ভারত, লিবিয়া, তানজানিয়া, মরিশাস, কিউবা প্রশ্ন তোলে। এ দেশগুলোর মতে চুক্তিটিকে ঠিকমতো অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তার বাস্তব প্রমাণের দায় দায়িত্ব বা কে নেবে?

৫. চুক্তিটিতে আরো বলা হয়েছে যে, চুক্তি স্বাক্ষরের দশ বছর পর শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

কয়েকটা বছর পিছিয়ে গেলে দেখা যায়, সিটিবিটি খসড়াপত্রটি কাজ শুরু হয় কয়েক বছর আগে। ১৯৯৪ সালের ২৫ জানুয়ারি সিটিবিটির বিষয়বস্তু তৈরির কাজ প্রাথমিকভাবে শেষ হয়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কনফারেন্স অন ডিস্ আরমামেন্টের নির্দেশেই খসড়াপত্র তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালেই খসড়াপত্র তৈরী । ১৯৯৬ সালে ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকেরকে সভাপতি করে সিটিবির বাস্তবায়নের পথ আরো একধাপ এগোয় উদ্যোক্তারা। আগেই বলা হয়েছে এনপিটি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হবার পরই পরমাণুশক্তিধর দেশগুলো অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন নভেম্বর ৯৬ এর নির্বাচনে জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে সিটিবিটি জাতিসংঘের সাধারণ সভায় পাস করিয়ে নিতে তৎপর হয়েছিলেন। ক্লিনটনের পরিকল্পনা ছিল ৯৬, ২৬ জুনের মধ্যে চুক্তিটি সই করিয়ে নিয়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাতিসংঘে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া । NPT অর্থাৎ পরমাণু প্রসার রোধ চুক্তির ব্যর্থতাই সিটিবিটির দিকে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোকে ঠেলে দিয়েছে। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিয়ে জাতিসংঘে সিটিবিটি সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে। ভারতের অভিযোগ সেই সময় তাদের অনেকগুলো প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলেও পরবর্তীকালে, সেগুলো গৃহীত হয় নি।

৪.১৬ জেনেভার সিটিবিটি বৈঠক ও তার ফলাফল

সিটিবিটি (CTBT) অর্থাৎ Comprehensive Test Ban Treaty, বাংলায় যার অর্থ হলো সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি । গোটা বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যেই দীর্ঘদিন ধরে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো চেষ্টা চরিত্র চালিয়ে আসছিল। জেনেভায় অনুষ্ঠিত ২৯ জুলাই ৯৬ এর সর্বাত্মক পরমাণু

অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি সিটিবিটি বৈঠকে সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে বিশ্বের ৬১টি দেশ সমবেত হয়েছিল। জাতিসংঘ পরিচালিত এ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম থেকে চুক্তিটির খসড়াপত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। একদিকে বিশ্বের কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর দেশ নতুন করে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করতে আদা-জল খেয়ে লেগেছিল, অন্যদিকে ভারতের মতো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম দেশগুলো চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল।

পরমাণু শক্তিধর পাঁচটি দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স একজোট হলেও চীন প্রথম থেকেই চুক্তিটির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। আরো বিস্ময়ের কথা হলো জেনেভার সিটিবিটি বৈঠকের প্রথম দিনই পরমাণু পরীক্ষা করে চীন। চীনের এ ৪ তম পরমাণু বিস্ফোরণে কম্পনের মাত্রা ছিল রিকটার স্কেলে ৪.৩। চীন সরকার অবশ্য ঘোষণা করে এটাই তাদের শেষ পরীক্ষমূলক পরমাণু বিস্ফোরণ। সিটিবিটি খসড়াটির প্রধান কারিগর ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকের। জুন ১৯৯৬ এর বিশ্ব সম্মেলনেও সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি নিয়ে পশ্চিমাশক্তি জাপ রামকেরকে খসড়া তৈরিতে সাহায্য করে। ভারত আগাগোড়াই সিটিবিটির বিরোধিতা করে এসেছে। জেনেভায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অরুন্ধতী ঘোষ সিটিবিটিকে একপেশে বিচার বিবেচনাহীন, পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর মুখ চেয়ে তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। চুক্তিতে পরমাণু অস্ত্রের প্রসার রোধের কথা বলা হলেও সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের পথে কোনো উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয় নি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন গোটা বিশ্বকে অস্ত্রমুক্ত করতে পাঁচটি পরমাণুশক্তিধর দেশকে সুনির্দিষ্ট করে সময় সীমা জানাতে হবে। ভারতের বক্তব্য হল, শুধু পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করলেই বিশ্বের মজুত অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংসে হয়ে যাবে না। বরং বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি গোষ্ঠীর হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকবে, অন্যদের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকবে না।

ভারতের বক্তব্যকে খণ্ডন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলার দাবি মেনে নেওয়া এ মুহূর্তে সম্ভব পর নয়। ধাপে-ধাপেই বিশ্ব পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগোবে। এখানে উল্লেখযোগ্য ডিসেম্বর '৯৮ পর্যন্ত বিশ্বে যে ২০৫৮টি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তার মধ্যে ১০৩২টিই ঘটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকের সিটিবিটির বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, চুক্তিটির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে অনেক সদস্য দেশের অভিযোগ থাকলেও সামগ্রিকভাবে, প্রায় সকলের কাছেই স্বীকৃতি পেয়েছে এ চুক্তি। প্রতিটি দেশকে সুনির্দিষ্টভাবে সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর নয়।

জেনেভায় সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষারোধ চুক্তি নিয়ে চীনও আপত্তি তোলে। কোনো দেশ-পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সদস্য দেশগুলোর দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন চালু ছিল। এখন চীন বলছে ৫১টি দেশের মধ্যে ৩০টি দেশের সম্মতিই যথেষ্ট। মেক্সিকোর নেতৃত্বাধীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জোট বলে, শুধু বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করলে চলবেনা, বিস্ফোরক নয়, এমন অস্ত্র পরীক্ষাও নিষিদ্ধের তালিকায় আনতে হবে। ইরানও সিটিবিটি নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অভিযোগ তোলে। পাকিস্তান সম্মেলনে নীতিগত ভাবে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করণে সম্মতি জানালেও ভারত চুক্তিতে সই না করলে, তারাও সই করবে না বলে জানিয়ে দেয়।

৪.১৭ সিটিবিটি সম্পর্কে অভিযোগসমূহ

জেনেভার আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সিটিবিটি অর্থাৎ সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি নিয়ে ভারতসহ লিবিয়া, ভুটান, কিউবা, লেবানন, মরিশাস, তাঞ্জানিয়া বিস্তর অভিযোগ তোলে। প্রস্তাবটি একপেশে, দায়সারা গোছের এবং পক্ষপাতপূর্ণ বলে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগকারী দেশগুলোর নেতৃত্বে ছিল ভারত। অভিযোগগুলোকে পরপর সাজালে এবং তার কারণ পর্যালোচনা করলে, পরিষ্কার হয়ে যায় এর তাৎপর্য।

১. সিটিবিটির মাধ্যমে কেবল মাত্র পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ এবং পরমাণু শক্তি অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান দেশগুলোর পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মজুত পরমাণু অস্ত্রের কি হবে, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। (এ প্রসঙ্গে পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর

দেশের দিকে সর্বশেষ পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভারের দিকে চোখ দেওয়া যাক। সাম্প্রতিক এক হিসেব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করে ১,০৫৪ বার। তাদের হাতে সঞ্চিত বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ ৮,৭১১ । রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষার সংখ্যা ৭১৫। তাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র আছে ৬,৮৩৩। ফ্রান্স পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ২১০ বার, হাতে পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ ৫২৪টি। ব্রিটেনের পরমাণু পরীক্ষার সংখ্যা ৪৫ বার, হাতে আছে ২০০টি পরমাণু অস্ত্র। চীন পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ৪৪ বার এবং সঞ্চিত পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ ৪৫০টি। এ সঞ্চিত পরমাণু অস্ত্রের কি হবে সিটিবিটিতে বিস্তারিত করে কিছু বলা হয় নি। এখানে উল্লেখযোগ্য পৃথিবীতে এ মুহূর্তে যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র আছে, তার পরিমাণ ১২,০০০ মেগাটনেরও বেশি।)

২. ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে, তাদের অভিযোগ। কারণ ভারতের দুই প্রতিবেশী দেশ চীন ও পাকিস্তানকে নিয়েই তাদের বিস্তর অভিযোগ। চীন ইতোমধ্যে পরমাণু অস্ত্র শক্তিধর দেশ এবং পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রশক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ দুই শক্তি যখন ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, তখন সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি তাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করবে বলেই ভারতের বক্তব্য। ১৯৭৪ সাল থেকেই ভারতের পরমাণু অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা আছে।

৩. এ চুক্তিটি কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে নি। ফলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমেই তাদের অস্ত্রের গুনগত মান পরীক্ষা করতে পারবে।

৪. এ চুক্তির বাস্তবায়নও অনেকটা বাধ্যতামূলক। কারণ চুক্তির শর্তানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করলেই এসব রাষ্ট্র চুক্তিতে অনুমোদন দিবে।

৫. সিটিবিটি চুক্তির মাধ্যমে পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশের পারমাণবিক অস্ত্র পাকাপাকি ভাবে রেখে দেবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করার ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো।

৬. সিটিবিটিতে কেবল মাত্র পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশ্বের পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো পরমাণু প্রযুক্তিগত ব্যাপারে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, বিস্ফোরণ ব্যতীতও তারা পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম। ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রযুক্তি বিদ্যাগত হস্তান্তর নিয়ে সহযোগিতামূলক আচরণ কারুরই নজর এড়ায় নি।

৭. ভারত ডাচ কূটনীতিক জাপ রামকের'এর খসড়াপত্র তিনটি অনুল্লিখিত বিষয়কে সংযোগ করার দাবি জানায়। ভারতের বক্তব্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে এবং পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে।

৮. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনরত দেশগুলোও সিটিবিটি প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা করে। ন্যাম গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো বলে পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশছাড়া অন্যান্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগদানকারী দেশের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই সঙ্গেই পাঁচটি দেশ কবে তাদের পরমানু অস্ত্র ধ্বংস করবে, তার দিনক্ষণ স্থির করার জন্য চাপ দিতে হবে।

চুক্তি বাস্তবায়নে কয়েকটি দেশের শর্ত-

১. পাকিস্তানের শর্ত ভারত চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে তারা করবে না। কারণ পাকিস্তান এককভাবে নিরস্ত্রীকণের বিরুদ্ধে থাকতে চায় না। পাকিস্তান ইতোমধ্যে এককভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে এবং ভারতকে একটি আঞ্চলিক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আহবান জানিয়েছে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

২. উত্তর কোরিয়ার শর্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন চুক্তিটি অনুমোদন করলে উত্তর কোরিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

৩. যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি অনুমোদন করে নি বলে রাশিয়া ও চীনসহ অন্যান্য দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করে নি। যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি অনুমোদন করলেই এসব রাষ্ট্র চুক্তিতে অনুমোদন করবে।

৪. বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য যথা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন কে চুক্তিটি অনুমোদন করার আহবান জানিয়ে । এ পাঁচটি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করলে বিশ্বের সকল দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করবে।

৪.১৮ সিটিবিটি'র অনুমোদন ও অন্যান্য

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় অষ্ট্রেলিয়ার আনা সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি বা সিটিবিটি অনুমোদনের প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হলে ভারতের এক টানা বিরোধীতা বাস্তবিক পক্ষে ধোপে টিকল না। ১৮৫ সদস্যের সাধারণ সভায় ১৫৮টি ভোটে সিটিবিটি পাস হয়ে যায়। ডিসেম্বর '৯৭ পর্যন্ত ১৪৯টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করে। মাত্র তিনটি দেশ প্রস্তাবটির বিরোধীতা করে। দেশ তিনটি হলো লিবিয়া, ভুটান এবং ভারত। পাঁচটি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। দেশ পাঁচটি হল তাঞ্জানিয়া, সিরিয়া, লেবানন, মরিশাস এবং কিউবা। অন্যদিকে ইরাক, জিম্বাবুয়ে, মিশর শেষ মুহূর্তে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও কড়া সমালোচনা করে বর্তমান সিটিবিটি খসড়ার। তাদের মতে বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর পাঁচটি দেশ নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে তৃতীয় বিশ্বের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় সিটিবিটি প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান তাল না মেলালেও তাদেরও চুক্তিপত্রটির খসড়াপত্র নিয়ে অভিযোগ ছিল প্রচুর। ভারতের বক্তব্যেরও যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন জাতিসংঘের পাক প্রতিনিধি মুনির আকরাম। চুক্তিটির গোড়ায় গলদের কথা তুলে ধরে পাকিস্তান বলে, সিটিবিটি আদৌ সর্বাত্মক নয়। পরীক্ষামূলকভাবে পরমাণু বিস্ফোরণ না ঘটিয়েও অন্যভাবে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো এটিকে ব্যবহার করতে পারবে।

নিউইয়র্কে অনুমোদিত সিটিবিটি ভবিষ্যতে আদৌ কি কার্যকর হবে কারণ অস্ট্রেলিয়ার আনা প্রস্তাবে এমন একটি নতুন ধারা সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তিতে সংযোজন করা হয়েছে যে, চুক্তিটির বাস্তবায়ন প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। চুক্তিটির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মোট ৪৬টি দেশ সিটিবিটিতে সই না করলে, চুক্তিটি কার্যকর হবে না। এ বাধ্যতামূলক প্রবেশ সংক্রান্ত ধারাটির মধ্যে ৪৬টি দেশের মধ্যে ভারতও পড়েছে। এদের মধ্যে কোনো একটি দেশ স্বাক্ষর না করলে চুক্তিটি কার্যকর হবেনা। কারণ সাধারণ সভার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেওয়া এক কথা আর কার্যকর আর এক কথা। কারণ ভারত খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে তারা বর্তমান শর্তে চুক্তিটির বিরোধিতা করেই যাবে।

এ চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিম্নরূপ

১. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো সদস্যরাষ্ট্রই কোনো ধরণের পামাণবিক পরীক্ষ বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোনো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না এবং তার অধীনস্ত কোনো এলাকাতেও এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

২. সকল রাষ্ট্র যে কোনো ধরণের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোনো ক্ষেত্রে জড়িত, উৎসাহিত বা কারণ হওয়ার থেকে বিরত থাকবে।

৩. চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্য এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৪. এ চুক্তির আওতায় চুক্তির শর্তাবলী সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মেনে নেয়া হয়েছে।

৫. চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোর একটি ফোরাম গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬. কোনো রাষ্ট্র চুক্তির কোনো শর্তাবলী ভঙ্গ করলে ঐ রাষ্ট্রের অনুরূপ ঘটনাস্থল পরিদর্শণের অনুমতি

চাওয়ার আইনগত বিধান সংরক্ষিত হয়েছে।

৭. চুক্তিটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম ও ফলাফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য চুক্তিটি বাস্তবায়নের ১০ বছর পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একত্রিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

সিটিবিটি এর বৈষম্যমূলক পূর্ণ দিকগুলো

১. ভারত, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর করে নি।

২. ১৭৭টি দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও মাত্র ৩২টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে।

৩. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে কেবল ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন চুক্তিটি অনুমোদন করে নি; যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস চুক্তিটি অনুমোদন বিরোধি।

৪. বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক চুল্লির অধিকারী ৪৬টি দেশের কর্তৃক এ চুক্তিটি অনুমোদতি না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকর হবে না।

৫. সিটিবিটিতে ৫টি পরমাণু শক্তিধর দেশের পরমাণু অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসের ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। কেবল পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬. এ চুক্তি কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে নি। ফলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমেই তাদের অস্ত্রের গুণগত মান পরীক্ষা করতে পারে।

তবে মজার ব্যাপার হলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এ চুক্তিটি প্রণীত হলেও সে দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিজেই CTBT- কে সিনেটে অনুমোদন করাতে ব্যর্থ হন। অধিক পরিতাপের বিষয় হলো এ যে বুশ প্রশাসনও এটিকে সমর্থন করে নি এবং তিনি আরও বলেন যে অনুসমর্থনের জন্য CTBT- কে সে দেশের সিনেটে পাঠানোর কোনো ইচ্ছা তার নেই।

কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো যে, একদিকে যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রসমূহকে চুক্তিতে আবদ্ধ করতে চাপ প্রয়োগ করছে। অন্যদিকে পরাশক্তিটি নিজেই এগুলো অগ্রাহ্য করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে যখন জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defence, সংক্ষেপে NMD) ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করে তখন তার উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্পর্কে সকলের মনে সন্দেহ উদিত হয়। তাই CTBT বাস্তবায়নের চাবি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের হাতেই রয়ে গেল।

৪.১৯ 'বিগ ফাইভ' এর অঙ্গীকার

পৃথিবীর পাঁচ পরমাণু শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন নীতিগতভাবে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। এর আগে অনেক বার এধরণের কথা বলেও কথার খেলাপ করেছে তারা। উল্টো NPT এবং CTBT নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঘাড়ে অযথা বাড়তি চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। এবারের বক্তব্যে তাদের ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, ২০০০ জাতিসংঘে একমাস ব্যাপী আলোচনার শেষে তিরিশ বছরের পুরানো NPT চুক্তির পর্যালোচনায় পরমাণু অস্ত্র হ্রাস করার অঙ্গীকার করেছে। তবে নির্দিষ্ট সময়সীমা Big-5 দেয় নি। এ সিদ্ধান্তে অতি উৎসাহী জাতিসংঘ তৎকালীন মহাসচিব কোফি আনান মনে করেন, 'শান্তির পৃথিবীর লক্ষ্যে এ এক নতুন পদক্ষেপ। মে ১৯৯৮ এ ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘের সভায় বলা হয়েছে, দুটি রাষ্ট্রকেই মানবিকতার খাতিরে 'পরমাণু অস্ত্র মুক্ত' দেশের সদস্য হতে হবে । ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল এবং কিউবা সম্পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন তুলে এখনও স্বাক্ষর করে নি। চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্টার্ট-টু (START-II) চুক্তি রূপায়নের ব্যাপারে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেকেই দীর্ঘ দূরত্বে পরমাণু অস্ত্র কমিয়ে ছয় হাজার থেকে তিন হাজার ৫০০ করার কথা বলেছে। উভয় রাষ্ট্রের হাতে ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের তিরিশ হাজারেরও বেশি পরমাণু অস্ত্র মজুত আছে। নিজেদের উদ্যোগকে আরো বাস্তবায়িত করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন পরমাণু অস্ত্রমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখালেন ৪ জুন, ২০০০। রাশিয়ার ক্রেমলিন প্রাসাদে

চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিল ক্লিনটন পরমাণু অস্ত্রে ব্যবহৃত প্লাটোনিয়াম ধ্বংস করার ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে একমত হয়েছেন। দুটি দেশই ৩৪ হাজার টন পরমাণু অস্ত্রে ব্যবহৃত প্লাটোনিয়াম নষ্ট করে দেবে বলে জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে NPT চুক্তি ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। CTBT চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের আরো একটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের ক্ষেত্রে চুক্তি দুটির অগ্রযাত্রা একটি শুভ সূচনা। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারে এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হচ্ছে তার সামরিক ক্ষমতা। ইরাক দখলের পশ্চাতের কারণসমূহ এটা ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। তাই যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মদদপুষ্ট রাষ্ট্রসমূহ সিটিবিটিতে আগ্রহী নয়। ফলে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে ধারণা নিয়ে এনপিটি ও সিটিবিটির উদ্ভব হয়েছিল তা এখন অনেক দূরের লক্ষ্য। আর যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ব্যতীত এ ধরণের কার্যক্রম আদৌ সম্ভবপর নয়। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের জন্য আরো কার্যকর ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন যাতে পৃথিবীর কোনো দেশের হাতেই পারমাণবিক অস্ত্র না থাকে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ শক্তিকে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মানব জাতির স্বার্থে গোটা বিশ্ব পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত হবে এটাই বিশ্ববাসী আশা করে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. নিরস্ত্রীকরণ কী?

উত্তর: নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা।

২. নিরস্ত্রীকরণ কত প্রকার?

উত্তর: ৪ প্রকার। যথা: সাধারণ; খ. আঞ্চলিক; গ. সংখ্যাগত ও ঘ. গুণগত।

৩. সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ কী?

উত্তর: যখন সকল রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে তাকে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ বলে।

৪. আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণ কী?

উত্তর: যখন মাত্র কয়েকটি দেশ নিরস্ত্রীকরণে অংশ নেয় তখন তাকে আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণ বলে।

৫. গুণগত নিরস্ত্রীকরণ কী?

উত্তর: কোনো বিশেষ ধরনের অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস বা বিলোপ সাধনকে গুণগত

নিরস্ত্রীকরণ বলে।

৬. সংখ্যাগত নিরস্ত্রীকরণ কী?

উত্তর: অধিকাংশ বা সব ধরণের অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস বা বিলুপ্তিকে সংখ্যাগত নিরস্ত্রীকরণ বলে।

৭. অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কী?

উত্তর: সামরিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে শুধু অস্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করাকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলে।

৮. "মাত্র দু'সপ্তাহে বিশ্বে অস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা দ্বারা এক বছরের জন্য সমগ্র বিশ্বের জনগণের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিসার ব্যবস্থা করা সম্ভব।"-কে বলেছেন?

উত্তর: কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিয়ারে ট্রুডো।

৯. উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের জাতীয় উৎপাদনের কত ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করে?

উত্তর: ৬% এর বেশি।

১০. নিরস্ত্রীকরণের সফলতার পথে অন্তরায় কী?

উত্তর: ক. আঞ্চলিক প্রাধান্য; খ. বাণিজ্যিক বিবেচনা; গ. অর্থনৈতিক মন্দা; ঘ. পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাব এবং ঙ. সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক) নিরস্ত্রীকরণ বলতে কী বুঝ?

খ) নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব কী?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. নিরস্ত্রীকরণ বলতে কী বোঝ? আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. নিরস্ত্রীকরণ কী? নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।
৩. নিরস্ত্রীকরণের সংজ্ঞা দাও। নিরস্ত্রীকরণের সফলতার পথে অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। অথবা, নিরস্ত্রীকরণ কী? নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাসমূহ কী কী।
৪. NPT ও CTBT সম্পর্কে চুক্তি দুটির বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫. নিরস্ত্রীকরণ বলতে কী বোঝ? নিরস্ত্রিকরনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৬. নিরস্ত্রীকরন ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য কী কী? নিরস্ত্রীকরন ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য চুক্তি ও পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন? নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগগুলোর ব্যর্থতার কারণগুলো কী কী ?
৭. পারমানবিক অস্ত্রবিস্তার রোধের প্রথম শর্তই হলো বৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্র পরিহার করা- মতামত দিন।

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যায় ৫

ভূ-রাজনীতি
Geo-politics

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৫.১ ভূমিকা
৫.২ ভূ-রাজনীতির সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশ
৫.৩ ভূ-রাজনীতির উপাদানসমূহ
৫.৩(১) অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা
৫.৩(২) সামরিক নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা
৫.৪ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব
৫.৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভূ-রাজনীতি
৫.৫ ভূ-রাজনৈতিক সমুদ্রসীমার গুরুত্ব
৫৬ বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব
৫.৭ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিলোপ ও বৃহৎশক্তির অভ্যুত্থান
৫.৮ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ভূ-রাজনীতি
৫.৮.১ বঙ্গোপসাগর : বাংলাদেশের সম্ভাবনার সোনালি সম্ভার
৫.৮.২ মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব
৫.৮.৩ চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব
৫.৮.৪ ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

৫.১ভূমিকা (Introduction)

ভূ-রাজনীতি সম্পর্ক চিন্তার সূত্রপাত অনেককাল আগে থেকে হলেও রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই কারণে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বেরও উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এবং এশীয় জনগণের বিশেষত জাপানিদের পুণর্জাগরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার বিকাশ পায়। শক্তিসাম্য তত্ত্ব অনুযায়ী শান্তি স্থাপন হচ্ছে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক এবং এটা সম্ভব হতে পারে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির সাম্যাবস্থা বজায় রেখে। তখনকার ইউরোপ সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ক্রয়োশিয়া এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সম্মিলিত ভাবে আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর মতো ভূমিকা পালন করত। সাধারণভাবে বলতে গেলে শক্তিসাম্য হলো মূলত শান্তি এবং স্থিতিবস্থা (status quo) রক্ষণশীল (conservative)। অন্যদিকে ভূরাজনীতিক তত্ত্ব হচ্ছে গতিশীল (dynamic)। জনগণের জীবন ধারন, সম্পদ আহরণ এবং শক্তি অর্জনের জন্য ভূমির নিশ্চয়তা এবং যে জন্য সম্প্রসারণ হচ্ছে তা মূল বৈশিষ্ট্য। এ জন্য ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বে অস্থিতিশীলতার সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এতে জাতিকে একত্র সত্তা (Collective being) এ সকল জৈবিক সত্তা (biological entity) হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যাকে অবশ্যই ক্রমবৃদ্ধি ঘটাতে হবে, না হলে পতন হবে।

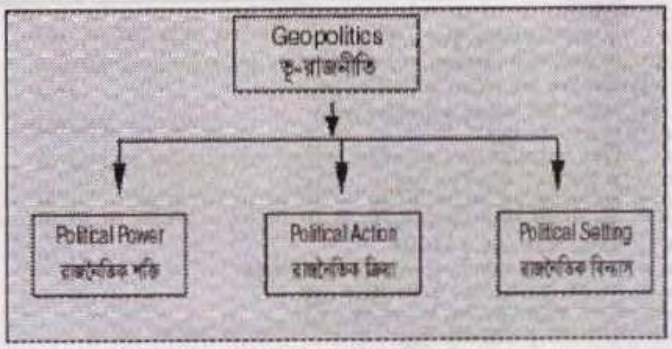
ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির সম্পর্কের পরিবর্তন, যে পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ নাও হতে পারে, শুধু স্বাভাবিকই নয় আকাঙ্ক্ষিত। ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা ইউরোপীয় সনাতনী চিন্তাধারায় বৈদেশিক

পরিবর্তনের সূচনা করে। আয়তনে ছোট, কিন্তু বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশসমূহের কাছে ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অনেক।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান ও জাপানিদের নিকট ভূ- রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক সিস্টেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণে ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে।

৫.২ ভূ- রাজনীতির সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশ (Defination, Origin and Evaluation of Geopolitics)

Geo-politics শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ Geopolitik হতে যার ইংরেজি হচ্ছে গ্রীক দুটি শব্দের রূপ : "Geo" যার অর্থ ভূ (earth) এবং "Politikos" মানে রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত (Pertaining to the state)। সুতরাং ভূ- রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের এ দুটো বিষয়ের সম্পর্ক যুক্ত রূপ।



রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টায় রাজনীতির ভূগোলের দৃষ্টি ভঙ্গির সফল প্রয়োগকেই সচরাচর ভূ-রাজনীতি নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ Geo-politics is the part of Geography studies that make relation between foreign policy and political phenomenon"
সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়া, রাজনৈতিক শক্তি এবং ভৌগোলিক বিন্যাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ হচ্ছে ভূ-রাজনীতি।

ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে একটি জাতি রাজনৈতিক সুবিধার্থে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যবহারের প্রয়াস পায়। এদিক থেকে ভূ-রাজনীতি হচ্ছে জ্ঞানের কোনো এক রাজনীতির সম্পর্কের সেই শাখা, যা একটি জাতির শক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে এবং জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ভূ-রাজনীতি তত্ত্ব অনুযায়ী এটি একটি ঐতিহাসিক সূত্র যে, জাতিকে অবশ্যই ভূমি দখল করে সম্প্রসারণ করতে হবে। নচেৎ ধ্বংসে অনিবার্য।

ফ্রেডরিক রোজেল রাষ্ট্রকে একটি জৈবিক সত্তার (Living Organism) সাথে তুলনা করেছেন যাকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, না হয় তার ধ্বংস হবে।

রাজনেতিক ভূগোলকে প্রায়ই ভূরাজনীতির সাথে সমান বা এক বলে গন্য করা হয়, যা সঠিক নয়। এজন্য এখানে ভূরাজনীতির সংজ্ঞা ও পরিধি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। ভূরাজনীতির জনক নামে পরিচিত Karl Hausofer স্পষ্টভাবে The dynamic : art of geopolitics এবং the state science of political geography এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক ভূগোলে রাষ্ট্রকে স্থান Space এর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, ভূরাজনীতিতে স্থানকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় (Fifield and Pearcy)। প্রখ্যাত জার্মান ভূগোলবিধ Ottommull এর সংজ্ঞায় রাজনৈতিক ভূগোল ও ভূরাজনীতির

মধ্যবর্তী পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ভূ-রাজনীতি রাষ্ট্রের পারস্পরিক চাহিদা ও বিবেচনা করে, পক্ষান্তরে রাজনৈতিক ভূগোল কেবলমাত্র এর স্থানিক অবস্থাগুলো পরীক্ষা করে।

Karl Hausofer এবং Ottommull এর সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে ভূ-রাজনীতির উদ্দেশ্য ও পরিধির সংজ্ঞা দান করেছে এবং একই সাথে ভূ-রাজনীতি ও রাজনৈতিক ভূগোলের মধ্যবর্তী পার্থক্য তুলে ধরেছে। আমরা দেখতে পাই যে, রাজনৈতিক ভূগোল যেখানে অভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক অবস্থাগুলো এবং রাষ্ট্রের ওপর সেগুলোর প্রভাব বিবেচনা করে, সেখানে ভূ-রাজনীতি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের বিষয়টি বিবেচনা করে সুতরাং ভূ-রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের পরিবর্তনগুলো বা রাষ্ট্রের গতিশীলতা সমীক্ষা করে। স্থান নিয়ে বিবেচনাকারী জনগনকে শিক্ষা প্রদানের একটি পন্থা। ভূ-রাজনীতি রাজনৈতিক ভূগোল না, কারণ রাজনৈতিক ভূগোলের মতো এটি রাজনৈতিক সমাজগুলোর ভৌগোলিক বিজ্ঞান নয়। সংক্ষেপে বলা যায় ভূরাজনীতি হচ্ছে স্থান (Space) ও রাজনীতির (Politics) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সেরা ভৌগোলিক ধারণা প্রদানের প্রচেষ্টা। এটি রাজনৈতিক ভূগোল থেকে অনেক বেশী। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে এটি বেরিয়ে আসে, তথ্য ও নীতি অনুসন্ধান করে যা জাতীয় চাহিদা পূরন করতে কার্যকরী হয় (Mckeen)।

এছাড়াও ভূরাজনীতি প্রায়োগিক রাজনৈতিক ভূগোল নয়। প্রখ্যাত জার্মান ভূগোলবিদ Ottommull "যথেষ্ট জনপ্রিয় ও উপযোগী আকর্ষণীয় শিরোনাম দ্বারা আর্শিবাদপুষ্ট ভূরাজনীতি কেবলমাত্র ফলিত রাজনৈতিক ভূগোল" বলে বর্ণনা করলেও রাজনৈতিক ভূগোলবিদ তার বিষয়ের প্রায়োগিক বিষয়গুলো সম্পর্কে এই ধারনা মেনে নিতে পারেন নি। হার্টশোর্ণের (১৯৬৪) মতে "দলের সংরক্ষনবাদীদের ধারণা অনুসারে ভূ-রাজনীতি সরলভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্যাগুলোতে রাজনৈতিক ভূগোলের জ্ঞান ও কলা কৌশলগুলোর উপস্থাপন। কিন্তু জাতীয় অতিরঞ্জনের জন্য রাজনৈতিক ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োগে ভূ-রাজনীতি বলা যেতে পারে তবুও এটি নিশ্চিতভাবে প্রায়োগিক রাজনৈতিক ভূগোল নয়,কারণ ব্যবহারিক ভূ-রাজনীতিতে অতীত অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বোঝা যায় সেগুলো সমাধান অপেক্ষা অধিকতর রাজনৈতিক সমস্যাবলী সৃষ্টি করেছে।

৫.৩ ভূ-রাজনীতির উপাদানসমূহ (Elements of Geo-Politics)

ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে সকল রাষ্ট্রই সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়। সকল রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে তার মর্যাদা ও সম্মানের ভিন্নতা হয়ে থাকে। একটি রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিম্নে তা আলোচনা কর হলো:

১. **ভৌগলিক আয়তন :** যে কোন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার ভৌগলিক আয়তন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়তনের দিক থেকে বড় রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সম্পদও বেশি হয়, যা রাষ্ট্রে এক ধরণের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ভারতের কথা বলতে পারি।

২. **প্রতিবেশী রাষ্ট্র :** যে কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার সম্পর্ক কি সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবেশী যদি বড় ও ব্যাপক মতাধর হয় তবে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোকে তাকে সমীহ করে চলতে হয়, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশে-ষণে দেখা যায় যে অনেক ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রও বিদেশের কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে নিজেকে প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র হতে অধিকতর মতাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. **আঞ্চলিক অবস্থান :** আঞ্চলিক অবস্থানও আধুনিককালে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান বিশ্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন Hegemonial : endency নেই, সে কারণে তাদের জন্যে ভূ-রাজনীতি নির্ধারণ যতটা সহজ হয় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিষয়টা ঠিক সে রকম সহজ নয়।

৪. **রাষ্ট্রের পরিধি :** যে রাষ্ট্রের পরিধি যত বড় সে রাষ্ট্রের ভূ-রাজনীতি নির্ধারণও জটিল। কারণ অনেকগুলো রাষ্ট্রের সাথে তার সীমান্ত থাকে যা তাকে সবসময়ই মাথায় রাখতে হয়। তবে, অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরিধি বড় হলে সেটা তার কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র যেমন বড়, তেমন বিস্তৃতও, কিন্তু তার থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর দূরত্ব এতই বেশি

যে, কোন রাষ্ট্র ইচ্ছে করলেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি যেতে পারে না।

৫. **অভ্যন্তরীণ কাঠামো :** রাষ্ট্রের ভূ-রাজনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কাঠামো খুবই গুরুত্ববহ। যে দেশে পাহাড় আর অরণ্য বেশি, সে দেশ অন্য দেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আবার যে দেশের অভ্যন্তরে নদ-নদী বেশি সেটাও সে দেশের ভূ-রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

৬. **রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ :** রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ যে কোন রাষ্ট্রের জন্য একটা বিশাল সম্পদ। যেমন কোন রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠি যদি সমজাতীয়ভুক্ত হয়, তাহলে সে রাষ্ট্রের ভূ-রাজনীতির কৌশল নির্ধারণ যতটা সহজ হয়, অন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। বরং অনেক সময় তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটাতেই তাদের অনেক শক্তি য় হয়।

সুতরাং উপরোক্ত বহুবিধ বিষয় দ্বারা একটা রাষ্ট্রের ভূ-রাজনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্ববহ হয়ে যায় কোন রাষ্ট্রের স্ট্যাটেজি নির্ধারণের ত্রে।

৫.৩(১) অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা সেটা মূলত তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করেই। আর এই অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা অনন্য। যেমন-

১. **বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে :** একটা রাষ্ট্রের যে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ থাকে, সেটা উক্ত রাষ্ট্রের বিশাল দিক। কোন রাষ্ট্রই যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সেহেতু অন্য রাষ্ট্রের সাথে তাকে যোগাযোগ করেই চলতে হয় এবং যে সম্পদের উপর নির্ভর করে তার বাজার স"ষ্টি করতে হয়। সে কারণে উক্ত রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে একটা ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব তৈরি হয়।

২. **যোগাযোগের ক্ষেত্রে :** যে রাষ্ট্রের সাথে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক পথে সে রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয় সড়ক পথে যা অনেক সময় আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে তার খরচ কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন ও দূরের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটা সমস্যা হয়। আবার সমুদ্র তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর জন্য জাহাজের দ্বারা যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে তা উক্ত রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যনীতিকে শক্তিশালী করে।

৩. **উৎপাদনের ক্ষেত্রে :** ভৌগলিক অবস্থানই কোন দেশ কি উৎপাদন করবে তা নির্ধারণ করে দেয়। তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি, কাঁচামাল সরবরাহ ইত্যাদি তার ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

৪. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূ-রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ভৌগোলিকভাবে সকল রাষ্ট্রই কম ব্যয় সাপেক্ষ এরিয়ার মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি করতে চায়। সে কারণে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভূ-রাজনীতি একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

৫.৩(২) সামরিক নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা

সামরিক নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ দেয়া যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র ভৌগোলিক কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের কোন ক্ষতির শিকার হতে হয় নি। অথচ, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর ধ্বংসস্থূপে পরিণত হয়েছে। সামরিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা নিম্নরূপ :

ক. **জাতীয় নিরাপত্তা নির্ধারণ :** কোন দেশের নিরাপত্তা কাঠামো কি হবে সেটা তার ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল থাকে। যেসব দেশ সমুদ্র বেষ্টিত তাদের সামরিক কাঠামো এক রকম, যেসব দেশ স্থলভাগে সীমা নির্ধারিত তাদের সামরিক কাঠামো এক রকম আবার যেসব দেশের জলসীমা ও স্থলসীমা উভয়ই রয়েছে তাদের সামরিক নীতি ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

খ. **সামরিক সরঞ্জাম যোগাড় :** সামরিক সরঞ্জাম যোগাড় করার ক্ষেত্রেও ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোন দেশ কোন ধরনের আক্রমণের শিকার হতে পারে সেসব বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখেই তারা তাদের সামরিক সরঞ্জাম বা উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ. **অস্ত্র প্রতিযোগিতা :** ভূ-রাজনৈতিক কারণে অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। যেমন: ভারত-পাকিস্তান প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ ৫০ বছর থেকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে। কাশ্মিরকে নিয়ে তাদের যে দ্বন্দ্ব তার আশু কোন সুরাহা তো সম্ভব হ"ছে না, বরং অস্ত্র ত্রয়ে উভয় রাষ্ট্রই বিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

ঘ. **প্রতিবেশী নিয়ন্ত্রণ :** প্রতিটি রাষ্ট্রই তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ডোমিনেট করে, তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। ভূ-রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের পে এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ খুবই সহজ। যেমন- ভারত ভূ-রাজনৈতিক কারণেই ভূটানের উপর তার নিয়ন্ত্রণ রাখাতে সম হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যেটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থান তার ভূ-রাজনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক নীতিমালা তার ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল থাকে। সে কারণে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক নীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির ভূমিকা অনন্য।

৫.৪ ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব (Importance of Geopolitics)

বর্তমান যুগে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভূ-রাজনীতিকে সামরিক শক্তি এবং আগ্রাসনের সাথে সমরূপে দেখার প্রবণতা পরিলতি হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন হৃতভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এ আগ্রাসী আক্রমণের প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো একটি সামরিক চুক্তি করে, যার নাম ন্যাটো। ন্যাটোর সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্টরা মতায় আসার পর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে চীনের সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা দেখা যায়। চীনের এ সম্প্রসারণ ঠেকানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা সিয়াটো প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে বহু নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই বিশ্ব দ্বীপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যকার এ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও ভূ-রাজনৈতিক বিশে-ষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ভূ-রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
খ. রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সম্পর্কে ভূ-রাজনীতি ব্যাখ্যা প্রদান করে।
গ. রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশ করে।
ঘ. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নীতির ব্যাখ্যা প্রদান করে।
ঙ. রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক ভৌগলিক রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং
চ. রাষ্ট্রের সম্পদরাজী সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি ঘটে।

এছাড়া কার্ল হাউসোফার (1869-1946) তাঁর সহযোগীদের নিয়ে যে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অবতারণা করেন, তাকে প্রধান পাঁচটি ধারণার প্রকাশ করা যায় -

১. সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার- যেখানে ভূমি প্রধান নিয়ামক।
২. জার্মানরা একটি প্রভুত্বশালী (Master) জাতি, বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তাই অধিক ভূমির জন্য তাকে কৌশলী হতে হবে।
৩. যে সমস্ত এলাকা, ভাষা ও জাতি অর্থনৈতিকভাবে জার্মান স্বার্থের জন্য উপযোগী সে সমস্ত এলাকা জার্মানির শাসনাধীন আসবে।
৪. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ আফ্রিকা এশিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জার্মানি অজেয় অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবস্থানে পৌছে যাবে এবং পৃথিবী ব্যাপী কর্তৃত্ব করবে।
৫. পূর্ব ইউরোপের ফিনল্যান্ড , সুইডেন ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো জার্মানি দখলে আনবে।

মূল্যায়ন

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বা ভাঙ্গণ ও দ্বিমেরু বিশ্ব পদ্ধতির অবলুপ্তির পর আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পেক্ষাপটের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে রুশ মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্যারাডাইস আর কার্যকর নয়। তবে একথা সত্যি, ভূ-রাজনৈতিক গণনা এখনও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, ভূ-রাজনীতির সম্পর্কে সটিক জ্ঞান থাকলে নিজ রাষ্ট্রের সম্পদ যথাযথ ব্যবহার করে বৃহৎ পররাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হওয়া যায়।

৫.৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ভূ- রাজনীতি

মূলত জার্মান নাৎসিয়াই ভূ-রাজনীতির দুর্নাম বয়ে আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভূ- রাজনীতিকে সামাজিক শক্তি এবং অগ্রাসনের সাথে সমরূপে দেখনে প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। দুর্নাম সত্ত্বেও ভূ-রাজনৈতিক ধারণাগুলোর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালেও সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের প্রভাবিত করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন হৃদ ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং পশ্চিম সীমান্তের রাষ্ট্রগুলোতে কম্যুনিস্ট শাসন চাপিয়ে দিয়ে এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে ত্বরাসন পর্যন্ত ধারক চন্দ্রলের (erescent of containment) কার্যকর করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই বিশ্ব দ্বীপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে। তাদের মধ্যকার এই প্রতিযোগিতাকে ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষণ দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবস্থান, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও দ্বিমেরু শক্তি অবলুপ্তির পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপট ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বর্তমান রুশ-মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্যারাডাইস আর কার্যকর নয়। তার একথাও সত্য যে ভূ-রাজনৈতিক গণনা এখনো রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ের ইউরোপ এ সংকট ও ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার সাথে যোগ দানের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দির ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একবিংশ শতাব্দিতে এসে নতুন মাত্রা যোগ করলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস।

মনে রাখার Technique & Tips

ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তঃসম্পর্কে ভূগোলের প্রভাব (মানুষ ও অবকাঠামোতে) সম্পর্কিত বিষয়ই ভূ-রাজনীতি।
- বৈদেশিক নীতিমালা পর্যালোচনা করার অন্যতম পদ্ধতি হলো ভূ-রাজনীতি।
- যে সকল ভৌগোলিক উপাদানসমূহ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে তা হলো:
  ক. রাষ্ট্রের অবস্থান, খ. রাষ্ট্রের আকৃতি, গ. জলবায়ু, ঘ. জনসংখ্যা, ঙ. প্রাকৃতিক সম্পদ, চ. প্রযুক্তিগত অগ্রসরতা/অগ্রগতি।
- বিভাগ নির্ধারিত হবে বিজিত ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। Friedlrch Ratzel তাই রাষ্ট্রকে জৈবিক সত্তার সাথে তুলনা করেছেন যাকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।
- ভূ-রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল ও রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
- ভূগোল ও রাজনীতির সম্পর্ক নির্ধারনের উপাদানগুলো হলো Political Power, Political action ও Geogrphical setting, Economic Power.
- মন্টেস্কু- (Montesquieu) দার্শনিক ভূ-গোল ও আবহাওয়াকে রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান নির্নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেন।
- Friedrich List হচ্ছেন একজন ভূ-রাজনীতি বিশারদ। List এর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম The Natural System of Political Economy (১৮৪০).
- ভূ-রাজনীতি বিষয়ে Friedrich List এর বিখ্যাত তত্ত্বের নাম Living Space বা Lebensraum.
- Living Space তত্ত্ব ভূ-রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখায়।
- Roudolf Kjellen হচ্ছেন একন সুইডিস ভূ-পোলনবিদ। তিনি ভূ-রাজনীতি ও রাজনৈতিক ভূগোলের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
- ভূ-রাজনীতির অবসানের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের সম্পদরাজি/শক্তি কীভাবে রষ্ট্রকে পরাক্রমশালী করতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করা।
- মধ্যপ্রাচ্যকে বলা হয় বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।
- মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এত বেশি কারণ হল, সৌ, ও বিমান এ তিন পথেই বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র পথ মধ্য প্রাচ্য।
- মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব একটি কারণ হচ্ছে বিপুল তৈল সম্পদ; অন্য একটি কারণ সুয়েজ খাল নৌপথে যোগাযোগ মূল পথ। অন্য

৫.৫ ভূ-রাজনীতিতে সমুদ্রসীমার গুরুত্ব

আলফ্রেড মাহান সমুদ্রশক্তি মতবাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা। তিনি এশিয়া সমস্যা গ্রন্থে উত্তর-মূল গোলার্ধের সমুদ্র শক্তির গুরুত্বের কথা উপস্থাপন করেন। পানামা ও সুয়েজ খালকে তিনি বিশ্ব বাণিজ্য ও রাজনীতি দক্ষিণ-প্রান্তসীমা বলে চিহ্নিত করে। ইউরেসিয়াকে তিনি উত্তর-মূল গোলার্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করেন। ইউরেশিয়ার মধ্যে রাশিয়াকে অজেয় শক্তিশালী স্থলশক্তি বলে মন্তব্য করেন। তিনি এশিয়ার ৩০-৪০ উত্তর অংশ বলয়কে সমুদ্র শক্তি ব্রিটেন ও স্থলশক্তি রাশিয়ার মধ্যে সংঘাত বলয় বলে অভিহিত করেন।

মাহানের মতে, বিশ্বের একচ্ছত্র নৌশক্তি হিসাবে ব্রিটেনের আবির্ভাবের পেছনে রয়েছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ জলপথের উপর তার কর্তৃত্ব কারন ঐগুলো মাধ্যমে বিশ্বের বৃহৎ সমুদ্র বন্দরগুলোতে বাণিজ্যিক বিনিময় সম্পাদিত হয়। ডোভার জিব্রাল্টার সুয়েজ, বাব-এল-মান্দের, হরমুজ প্রণালী ও মাল্লাক্কা প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ জলপথের উপর ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে থাকায় আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরসহ বিশ্বের অধিকাংশে ভূমি কৌশলগত অবস্থান তথা মাটির ছিল ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে।

৫.৬ বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্থানিক বিষয়। যদি এর গুরুত্ব ভূ-রাজনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত হতো, এটি কিছু অসামান্য উন্নয়ণের ধাপ উন্মোচন করতে সক্ষম হতো। একটি আকর্ষনীয় বিষয় হলো, বঙ্গোপসাগর শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্যই প্রধান চিন্তার বিষয় নয়, বরং এটি ভারত ও মায়ানমারের জন্যও সমপরিমাণ গুরুত্ব বহণ করে। তারা বাংলাদেশের তুলনায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনেক বেশী সতর্ক। এই অনুসন্ধানটি আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব, বাংলাদেশের জন্য এর রাজনৈতিক তাৎপর্য, বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এর মতো কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করেছে এবং এ বিষয়ে কিছু সচেতনতা, সমালোচনা এবং পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভারত এই বেল্টে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের জন্য বাংলাদেশ তথা বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে পরাশক্তি হিসেবে চীনের অগ্রগতি ঠেকানো এবং এ অঞ্চলের গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বিপুল জ্বালানী সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম



বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

লক্ষ্য। একারণেই বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি যেমন জরুরি তেমনি বাংলাদেশের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রতিরক্ষানীতিতে পরিবর্তনের ফলে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব নিয়ে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব নতুন রূপ নিয়েছে।

৫.৬.১ এক নজরে বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশের বর্ধিত অংশ যার পশ্চিমে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা উত্তরে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার (বার্মা) এবং পূর্বে আন্দামান-নিকোবর এর উত্তরাংশ অবস্থিত। এটি আনুমানিক ১,০০০ মাইল (১,৬০০ কি.মি.) প্রশস্ত এবং এর গড় গভীরতা প্রায় ৮,৫০০ ফুট (২,৬০০ মিটার)। সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫,৪০০ ফুট (৪,৬৯৮ মিটার) নিবন্ধন করা হয়েছে। উপসাগরটি ২.২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে অবস্থিত। এটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র উপকূল। অনেক বড় নদী প্রবাহিত হয়ে এই উপসাগরে পতিত হয়েছে। আমরা চিত্রটি থেকে দেখতে পাই একটি 'ট' আকারের। ভৌগলিকভাবে এটি পানি, লবন, শক্তি, মাছ, খনিজ, যোগাযোগ, ব্যবসা এবং আরো অন্যান্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু যদি আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দেখার চেষ্টা করি, তবে এটি রাজনৈতিক মতা চর্চার জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। যেহেতু এটি কৌশলগতভাবে প্রতিযোগি দেশসমূহের সীমানায় অবস্থিত, বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এর অন্তর্নিহিত গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

৫.৬.২ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বসমূহ

মনে রাখার Technique & Tips

ভূ-রাজনীতির কিছু গুরুত্বপুন্ন বিষয়

- পারস্য উপসাগর কৌশলগত গুরুত্ব বেশি কারণ এটি তৈলবাহী জাহাজ চলাচলের একমাত্র পথ।
- পারস্য উপ-সাগর ইরানের দখলে।
- মধ্যপ্রাচ্য ১৯৭৩ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে তৈল অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল।
- বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল রাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে টিকিয়ে রাখতে চায় কারণ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে সেখানে মার্কিন ঘাটি প্রয়োজন।
- বিশ্বের মোট মজুদ তেল সম্পদের ২৫% অবস্থিত সৌদি আরবে। সৌদি আরবের বৃহত্তম তৈল কোম্পানি পাওয়ার।
- হরমুজ প্রণালী অবস্থিত ওমান সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে গোলান মালভূমি মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘাতের কারণ।
- দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এখানে চীন ও ভারতের মতো শক্তিশালী ও পারমানবিক শক্তিধর দেশের সীমান্ত রয়েছে।
- ভারত মহাসগর কৌশলগত দিক থেকে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারত মহাসাগরের উপর ভারতের কর্তৃত্ব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সহ চীন ও অন্যান্য পরাশক্তিগুলো ভারত মহাসাগরের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল কাশ্মির নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে। চীন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। ভারতের মোকাবেলায় চীন বাংলাদেশকে তাদের বলয়ে নিতে আগ্রহী। ভারত এ ব্যাপারে সতর্ক। বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপে এ কারণেই চীন গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করতে চায়।

এই সমুদ্রপোকূলের গুরুত্বের পরিসর অনেক বৃহৎ। নিম্নে বিভিন্ন আঙ্গিকে এগুলো বর্ণিত হয়েছে :

ভারতের অবস্থান থেকে : ভারতের জন্য বঙ্গোপসাগরে এর অংশ ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র দেশের গৃহস্থালি গ্যাসের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করে, যা এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) এর বিক্রয় এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে। আরো সংক্ষিপ্তভাবে ও নির্দিষ্টভাবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রীজ অত্যন্ত গভীর সমুদ্রের ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করেছে এবং এটি দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান দ্বিগুণ করেছে। এখানে সত্যটি হলো, বঙ্গোপসাগরের এই অবদান ভারতের দ্রুত উন্নয়ণে সহযোগিতা করছে। এটি ভারতকে এর মুদ্রা সংরক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। একারণেই আমরা ভারতকে একটি ক্ষমতাশীল অবস্থানের দাবি রাখতে দেখি।

অপরদিকে বঙ্গোপসাগরের স্থানিক ধরণ ভারতের আন্তঃরাজনীতির ক্ষেত্রে একটি প্রভাবনীয় বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২০০৭ সালে যখন বঙ্গোপসাগরের "মালাবার অনুশীলন" নামক নেত্তঅনুশীলন

http://thejobstudy.com Go to Contents

শুরু হয়েছিল, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সিঙ্গাপুর এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেটি নতুন দিল্লিতে সরকার ও তার বিরোধীদলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। বিশ্লেষকগণ বিশ্বাস করেন যে, এ ধরণের কৌশলগত বন্ধন চীন এবং ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষতিসাধন করবে। এভাবে ভারতের জন্য এধরনের "হস্তক্ষেপ" থেকে বঙ্গোপসাগরকে রক্ষা করা একটি ব্যাপার। অপর একটি বিষয় এই যে, রাজনৈতিক মতাধর কেউই সমুদ্র মতা বৃদ্ধির এধরণের ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বিরত থাকতে পারে না। কারণ, ভারত অনুধাবন করেছে যে, মায়ানমারের সামরিক বাহিনী ও পরিকাঠামোতে চীনের বিনিয়োগ বেইজিংকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান জাতির মধ্যে সুকৌশলী/সেনাধিপত্য সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান করছে। এভাবে, ভারতের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্পর্শে থাকা এবং এর আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। পুনরায়, ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভারত অতি সম্প্রতি রাশিয়ার নিকট থেকে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন ভাড়া/পত্তন নিয়েছে। এটি বঙ্গোপসাগরের "বিশাখাপট্টম" নামক সমুদ্রতলদেশ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সুতরাং সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা দেখব যে, ভারত তার নিজের পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন নির্মাণ করেছে। এ উদ্দ্যেশ্যের জন্য বঙ্গোপসাগর প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসাবে গণ্য।

৫.৬.৩ বাংলাদেশ বনাম ভারত

বাংলাদেশ এবং ভারত মতার রাজনীতিতে প্রতিবেশী হিসেবে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে। পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণের অভাব তাদের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এমতাবস্থায়, বঙ্গোপসাগর তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একটি বিষয় আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখি যে, ভারতের তটরেখা বাংলাদেশের তটরেখার তুলনায় অনেক দীর্ঘ। কিন্তু ভারত এখনও তাদের স্বার্থের জন্য বাংলাদেশকে পদদলিত করে রাখার চেষ্টা করে। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, এটি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থ নয়। বঙ্গোপসাগর সংক্রান্ত বেশিরভাগ সমস্যা ভারতের আংশিক স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এটি বাংলাদেশকে ঘিরে অবস্থিত ভারতের রাজ্যসমূহের স্বার্থকে ইঙ্গিত করে। তবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে।

পুনরায় আলোচনার বিষয়ে ফিরে বলা যায় যে, প্রায় ৫৪ (চুয়ান্ন)টি নদী ভারত থেকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

যেহেতু বাংলাদেশ কম নদীতীরস্থ দেশ, সেহেতু ভারত তার ভূ-রাজনৈতিক সুবিধার কারণে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও আমরা এখনও অনেক বেশী কৃষি নির্ভর, তবুও তারা আমাদের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করে না।

অপরদিকে তারা যথেষ্ট নির্দয়ভাবে বিবৃত করে যে, বাংলাদেশ তাদের চাহিদা অতিরঞ্জিত করে এবং বঙ্গোপসাগরের অধিকাংশ পানির সদ্ব্যবহার হয় না এবং 'অব্যবহৃত' থাকে। এরূপ অবস্থায় এই দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভূ-রাজনীতি সংঘর্ষমন্ডিত হওয়ার ইঙ্গিত বহণ করে।

এ কারনে, বিশেষজ্ঞরা ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য সামুদ্রিক আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতের (আই টি এল ও এস) ভারত-বাংলাদেশ সামুদ্রিক বিরোধের বিচারের ফলাফল দেখার অপেক্ষায় ছিল।

২০১৩ সালের ৯-১৮ ডিসেম্বর সমুদ্রসীমা নির্ধারনের পরে বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে। শুনানিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

২০১৪ সালে এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০ কি. মি) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে। এর ফলে বিরোধ পূর্ণ সমুদ্র এলাকার বিপুল অংশে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের আর কোন বাধা থাকল না। এরায়ে গভীর সমুদ্রে প্রস্তাবিত ১০টি তেল গ্যাসই পড়েছে বাংলাদেশের সীমানায় এবং বিরোধপূর্ণ এলাকা ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের প্রাপ্তি ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার। ভারতের প্রাপ্তি ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার।

মামলাটি ৪-১ ভোটে পাস। ট্রাইবুনালের (৫) বিচারক রুপিডগার উলফ্রাম (জার্মানি) জঁ পিয়েরে কত (ফ্রান্স), টমাস এ মেনশাহ (পান) ইভান শিয়ারার (অস্ট্রেলিয়া) প্রেসারাজ শ্রীনিবাসা রাত (ভারত)

মায়ানমারের অবস্থান থেকে : সম্ভাব্য রপ্তানি বাজারে গ্যাসের চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি মায়ানমারের জন্য গ্যাস রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যেন তারা বৈদেশিক মজুদ উপস্থিত করতে পারে এবং চীন ও ভারতের মতো দেশসমূহের আনুকূল্য লাভ করতে পারে। তাই এ ধরণের সম্পদ সংরক্ষণ করার সবচেয়ে ভালো উৎস হলো অবশ্যই বঙ্গোপসাগর। আবার পাঁচ দশক সেনাশাসনের পর এটিই মায়ানমারের বেসামরিক সরকার হিসেবে পদাধিকার গ্রহণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কিন্তু এর শক্তি মন্ত্রী থানহর্তে বলেছেন যে, ২০১৩ সালের পর ছাড়া তাদের গ্যাস রপ্তানির কোন ধরণের পরিকল্পনা নেই। এবং মায়ানমার বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই তিনটি বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে তুলতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে তারা অন্য কোন দেশকে বঙ্গোপসাগরের সম্পদ আহরণ করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে সদয় হবে না। যদি তারা এটি করে, তবে এটি তাদের সরকারের কৌশলগত পরাজয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

বাংলাদেশ বনাম মায়ানমার

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য মায়ানমারের সাথে বিরোধের এক বছরেরও পুরানো বিষয়। কিন্তু এটি বাংলাদেশকে দশ কূটনৈতিক ভূ-রাজনীতি পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মায়ানমার-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে ২০০৮ সালে সেন্টমার্টিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫০ নটিক্যাল মাইল নৌ-অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এটি সংঘটিত হয়েছিল যখন মায়ানমার সমুদ্রের বিতর্কিত সম্প্রসারিত অঞ্চলে গ্যাস ও হাইড্রোকার্বন অন্বেষণনের চেষ্টা চালিয়েছিল। এ সমস্যাটি পরবর্তীতে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। আবার এ বিষয়টি ২০০৯ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনির মায়ানমার সফরে আলোচিত হয়। কিন্তু এটিই প্রথমবার নয় যে, উভয় পক্ষ আলোচনায় বসেছিল। এটি ১৯৭৪ সালে শুরু হয়েছিল এবং ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। কয়েক দশক বিরতির পর ২০০৭ সালে আবার আলোচনা শুরু হয়ে চলতে থাকে। এর কারণ হলো, উভয় দেশই দারিদ্র্য নীপিড়ীত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরের বিশাল সম্পদ রক্ষনাক্ষেবণ সবসময়ই তাদের বিশেষ উদ্বেগের বিষয়।

মনে রাখার Technique & Tips

বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (Geographical Characteristics of Bay of Bengal):

- বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে স্বাদু পানি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। কারণ এই অংশে বৃহৎ কিছু নদী যেমন: গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ইরাবতী, গোদাবারী, কৃষ্ণ ইত্যাদির পানি প্রবাহিত হয় বঙ্গোপসাগরে। প্রায় ১,২২২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি ডিলিজ করে।
- বঙ্গোপসাগরের উপরিভাগের পানির গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৮°c। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০° c (মে মাসে) এবং সর্বনিম্ন ২৫° c (জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারিতে)।
- বঙ্গোপসাগরের খোলা অংশের লবনাক্ততা ৩২%-৩৪.৫% (PPT ev Parts per Thousand) গড় লবনাক্ততা ৩৫ PPT।
- বঙ্গোপসাগরের গভীর অঞ্চলে খুবই বেশি (৪০-৫০‰)।
- বঙ্গোপসাগরের স্রোত ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে এবং ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘোরে আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- বঙ্গোপসাগরের তলদেশে একটি ফিচারের আছে যার নাম জাভা ট্রেঞ্চ (Java Trench) এবং এটি ভূমিকম্প ঘটাতে বেশি ভূমিকা রাখে।

বঙ্গোপসাগরের সম্পদ (Resources of Bay of Bengal):

- বঙ্গোপসাগরের আলাদা কিছু Marine ecosystem আছে উত্তরাংশে যেখানে রয়েছে জলাশয়, বিল ও ম্যানগ্রোভ যেগুলো মাছ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী স্থান।
- বাৎসরিকভাবে যে চিংড়ি ধরা হয় তা থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। আরও নানান রকমের মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের সুষম খাদ্যের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়ায়।
- বঙ্গোপসাগর থেকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার করা যায়।
- এখানের হাইড্রোকার্বন সম্পদ খুবই উপকারী।
- বঙ্গোপসাগরের অন্যতম একটা সম্পদ হচ্ছে পে-স্থার ডিপসিট (Placer Deposit)। যেমন টাইটানিয়ামের পে-স্থার ডিপসিট।
- ভারী খনিজ বালু (Heavy Mineral Sand) পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগরে যার প্রধান উপাদান হচ্ছে ইলমেনাইট, গারনেট, জিরকন, এবং ম্যাগনেটাইট (Ilmenite, Garnet, Zircon, Rutile and Magnetite)।

বিশেষভাবে মায়ানমারে গ্যাস রপ্তানি সরকারের জন্য বৈদেশিক মজুদের প্রধান উৎস। এটি সরকারের অস্ত্র ও অন্যান্য পোষ্য প্রকল্প উভয়েরই খরচ পরিশোধের উৎস। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি সংকটজনক ঘাটতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগর তাদের প্রথম পছন্দ বিকল্প ব্যবস্থা।

শুধুমাত্র বঙ্গোপসাগরের ধরণের জন্য, এধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি আমাদের ঘরোয়া রাজনীতি এবং আঞ্চলিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। একারণে, এধরণের সমস্যাসমূহ, বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় সামুদ্রিক বিরোধ নিস্পন্নের জন্য আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন আদালতে গিয়েছে এবং সেই সাথে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উভয় দেশই একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (ই ই জেড) এবং বঙ্গোপসাগরের ১,৫০,০০০ বর্গ কি:মি: এলাকা মহীসোপান হিসেবে দাবী করে। এই মামলা ২০০৯ সালের বিচারের পূর্বে করা হয়েছিল এবং এর শুনানী ২০১১ সালে ধার্য্য হয়। অবশেষে ২০১২ সালের ১৪ মার্চ, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে সৃষ্ট বিতর্কের বিচারকার্য আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন আদালতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি বিশ্বজুড়ে একটি উত্তম রায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫.৬.৪ বাংলাদেশের অবস্থান (উদ্যোগ, ভূ-রাজনীতি, এবং সম্ভাবনা)

মায়ানমার ও ভারতের কেন্দ্রভিমুখী মহীসোপানের দাবী বাংলাদেশকে একটি "অনুপ্রবেশহীন জোন লক রাষ্ট্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আরো বিস্তৃতভাবে বলা যায়, অনেক বছর আগে ভারত এবং মায়ানমার ইকুইডিস্টেন্স পদ্ধতি অনুসারে ডাইভিং সমুদ্রসীমা নির্ধারনের জন্য উত্থাপন করেছে। এতে উভয় পরে জন্য কোন লাভজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। বিষয়ের সাথে অব্যাহত থাকার প্রসঙ্গে বলা যায়, যদিও আমাদের প্রতিবেশী বঙ্গোপসাগরের সম্পদ ও পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে শ্রমবিমুখ মনে করে। প্রতিবেশী ভারত ও বার্মার কিছু এলাকার উপর মালিকানা দাবী করা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০০৯ সালে বঙ্গোপসাগরে গ্যাস উত্তলোনের জন্য কনোকো ফিলিস এবং টুইলো অয়েল এর সমুদ্রতীর থেকে দূরে সমুদ্রে অবস্থিত তিনটি ব্লকের অনুমোদন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উভয়ই নিলাম ডাক গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টি এখন পর্যন্ত বিদেশী ব্যবসায়ীদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিপুণভাবে ব্যবহার বিষয়ক একটি খুবই বিতর্কমূলক ঘটনা। আবার ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের মহেশখালী দ্বীপে এর নিজস্ব এলএনজি (LNG) টার্মিনাল নির্মাণ করবে। এই বার্তাটি চূড়ান্তভাবে এটি উপলব্ধি করায় যে, হাইড্রোকার্বনসমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগর প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।

অন্য আরেকটি বিষয় হলো সমুদ্র আইনের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে ঘটে যাওয়া সমসাময়িক ঘটনাসমূহ বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। একদিকে আমরা দেখি যে, এটি সকরারের জনপ্রিয়তা কীভাবে বৃদ্ধি করেছে। আবার অপরদিকে আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দেওয়া 'ধন্যবাদ' অপসারিত হতেও দেখেছি। আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের প্রতিচ্ছবি কূটনীতির পরিচয় বহণ করে। এই ভূ-রাজনীতি চূড়ান্তভাবে বঙ্গোপসাগরের সম্পদশালী বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে। আমাদের যদি বঙ্গোপসাগর না থাকতো, তবে আমরা কখনোই আমাদের দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হতাম না। আমরা ১,১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার পেয়েছি, যেখানে আমরা দাবি করেছিলাম ১,০৭,০০০ বর্গ কি.মি.। তাই আমরা এখন আমাদের প্রতিবেশী দ্বারা পূর্বে উত্থাপিত ১৩০ নটিক্যাল মাইল আমাদের এর পরিবর্তে সুবিচারের ভিত্তিতে ২০০ নটিক্যাল মাইল এর বৃহৎ এলাকা অর্জন করেছি। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূ-রাজনীতির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাৎপর্য পরিমাপের প্রধান মানদন্ড প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্র পরিবহণ প্রযুক্তিগত প্রয়োগ এবং অবশ্যই নিরাপত্তার মতো কিছু বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করে। বেশ কিছু ফলাফল নিম্নে বর্নিত হলো :

বাংলাদেশ এটি অস্ত্র পরীক্ষার সবচেয়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেসামরিক কসরত চর্চার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আমরা ভারতকে তাদের উপকূলবর্তী এলাকায় সাবমেরিন পদার্পনের মতো এ ধরনের কাজ করতে দেখি। যেহেতু বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, তাই অত্যাধুনিক গবেষণামূলক কাজকর্ম বঙ্গোপসাগরে হওয়া শ্রেয়। কারন সেখানে আমাদের স্বার্বভৌমত্ব চর্চার জন্য এলাকা ব্যবহারে ভূ-রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরকে নতুন সাম্রাজ্যবাদের গতিপথ হিসেবে ব্যবহার করা বাংলাদেশের উচিত নয়। কারণ এর উপর ভারত ও মায়ানমারের দৃষ্টিও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০০৮ সালে যখন একটি কোরিয়ান কোম্পানি মায়ানমারের সমর্থনে বঙ্গোপসাগরে খনন করছিল তখন বেইজিং চেষ্টা করেছিল সৃষ্ট বিতর্কের সমাধান করতে। এটি বঙ্গোপসাগরের উপর তাদের কৌতূহলের প্রকাশ ঘটায়। অপরদিকে চীন ও মায়ানমারের মধ্যকার সুসম্পর্ক এই ব্যাপারে অন্য একটি প্রকৃত বিষয়। কারণ মায়ানমারকে চীনের সামরিক সহযোগিতার সাথে বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত ব্যবহার অন্তর্নিহিতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অপর একটি বিষয় হলো, বঙ্গোপসাগরের গ্যাস ব-ক পত্তনের বিষয় বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডে কিছু নিশ্চিত অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। জাতির চেতনা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য আলোচ্যসূচী সৃষ্টির এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট আমাদের সম্পদ হস্তান্তর করে আমাদের ভূ-রাজনৈতিক অধিকারের অপব্যবহার করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে এধরণের বাহ্যিক হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য বাপেক্স এর মত আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ণ এবং চুক্তিবদ্ধ করা উচিত। এখানে একটি সুখবর হলো, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি সান্তোস বঙ্গোপসাগরে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন মতাসম্পন্ন গ্যাস খনি খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং, এখন নতুন ভূ-রাজনৈতিক আয়োজনের পর বাংলাদেশের পরবর্তী পদক্ষেপ সবার কাছে প্রতীতি।

গ্যাস পাইপলাইন ট্রান্সমিশন/বঙ্গোপসাগরে নতুন ভূ-রাজনৈতিক আয়োজনের সাথে সম্পর্কিত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে আমরা গভীর সমুদ্রের উৎস থেকে মূল্যবান গ্যাস সংগ্রহ করতে পারি। সেটা আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই কর্তব্য পালন করতে পারবে। কারণ, বর্তমান সময়ে শিল্প সংশ্লিষ্ট সবকিছুই আমদানি করতে হয়। এ ধরণের অপব্যয় রোধ করতে অবিলম্বে গ্যাস ট্রান্সমিশন/উত্তোলন খুবই গুরুত্বপূর্ন।

বর্তমানে ভূ-রাজনৈতিক মতা তথ্য প্রবাহের ওপর খুবই নির্ভরশীল। একটি দেশের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নির্ধারণ ও সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে আমরা তথ্যপ্রযুক্তির নতুন ধাপে পদার্পণ করেছি। এবং এটি সহজ সাধারণ জানের বিষয় যে, ফাইবারগুলো বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হওয়া কেন্দ্রীয় সার্ভার এর সাথে সংযুক্ত। কয়েক বছর আগে কিছু ঘটনার কারণে আমাদেরকে প্রধান সার্ভার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং এটি বাংলাদেশের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। আমাদের যদি বঙ্গোপসাগর না থাকতো তবে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের সুবিধাসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হতাম না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাথে বাণিজ্যের বর্ধন বঙ্গোপসাগরের একটি অন্যতম অবদান। এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে আমরা অর্থনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে কোন বিভেদ করতে পারি না। এবং বর্ধিত এলাকা অন্যতম অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে অর্জিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো বিস্তৃত ভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের সাথে বিমান পথে পণ্য বিনিময় ব্যয় সাপে। আবার স্থলপথে পর্বতময় ঝুকিপূর্ণ রাস্তা এবং দুই বা ততোধিক দেশের করিডোর এর ভিতর দিয়ে যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি করে। এতে আমাদের আয়ের অংশীদার সৃষ্টি হয়, আমদানীকৃত পণ্যে মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বঙ্গোপসাগর বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। এতে আমাদের সমুদ্র বন্দর স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর আমাদের আধিপত্য বিস্তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, আমাদের অন্য কোন দেশের সাথে বৈষম্যপূর্ণ চুক্তি করার প্রয়োজন নেই।

বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান আঞ্চলিক স্থায়িত্ব বজায় রাখতে গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলা করতে সহায়ক। কারণ এটি এমন একটি লাভজনক বিষয়, যার জন্য প্রত্যেকটি দেশ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেহেতু এর নাম বঙ্গোপসাগর সেহেতু যেকোনো বাংলাদেশী এটি ধারণা করতে পারে বেশী। সুতরাং এই ধরণের সমষ্টিগত ভাবনা উপকূলবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহনে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। আবার যেহেতু ভারতে 'পশ্চিম-বঙ্গ' রয়েছে সুতরাং তারাও একই দাবি উপস্থাপন করতে পারে। এদিকে এটি উপকূলবর্তী বিষয়সমূহে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু

http://thejobstudy.com Go to Contents

ইতিবাচকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এটি উপকূলবর্তী শান্তি ও নিরাপত্তা বয়ে আনতে পারে। যেখানে স্থল সীমান্তে উভয় দেশ যুদ্ধ ও মানুষ হত্যায় মগ্ন, সেখানে জলজ সীমান্তে আমরা নৈতিক ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারি। পারস্পরিক উন্নয়ণে হাত বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমষ্টিগত শক্তির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, যদি আমরা দক্ষিণ এশিয়ার কথা চিন্তা করি, তখন প্রথম যে বিষয়টি আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয়, তা হলো বঙ্গোপসাগরের মহাসাগরীয় নীল জলারাশি এবং এর উপকূলে অবস্থিত দেশসমূহ। এটি আমাদের নিজেদেরকে একই উপমহাদেশের অংশ হিসাবে ভাবতে সহায়তা করে এবং একটি "একাত্মবোধ" সৃষ্টি করে। জোটবদ্ধতার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিকভাবে এর সীমান্তবর্তী দেশসমূহের একাধিক স্বার্থকে সম্মিলিত করেছে। সীমান্তবর্তী দেশসমূহের মধ্যে সাধারণ বিষয়সমূহ খুব কমই পরিলতি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংঘর্ষের যথেষ্ট বিষয় রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ সরবরাহ করে। এবং এ ধরনের ক্ষেত্রের মূল ভিত্তি বঙ্গোপসাগর ভিন্ন অন্যকিছু নয়। ভূ-রাজনৈতিকভাবে উপসাগরটি কিছু অ-রাষ্ট্র নেতাদের সক্রিয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন : বে-অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেকটোরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক), সাউথ এশিয়া এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (সার্ক), ইউন্যটেড নেশনস ইকোনোমিক এন্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক (এসকেপ), ইউনেপ(UNEP) রিজিওনাল কো-অর্ডিন্যাটিং ইউনিট ফর কমিশন (এপফিক), নেটওয়ার্ক ফর একুয়াকালচার সেন্টারস ফর এশিয়া (নাকা) এবং আরও অনেকে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে বিমসটেক বঙ্গোপসাগর এর বিষয়ে অনেক গুরত্ব প্রদান করেছে। এটি এশিয়ান (ASEAN) এবং সার্ক (SAARC) এর মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। আমাদেও বিমসটেক (BIMSTEC) কে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। ইইউ (EU) ও এইউ (AU) এর মতো এর সদস্য জাতিসমূহের মধ্যে এটি কোন জাতিভেদ করে না। তারা একমাত্র ভিত্তি হিসেবে বঙ্গোপসাগর এর উপর নির্ভর করে। এখানে প্রকৃত ঘটনা হলো, এটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা, বিবাদ এবং উপকূলীয় সংঘর্ষের মতো উপকূলবর্তী রাজনৈতিক সমস্যার জন্য আমাদের উপযুক্ত ও টেকসই প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

যদি উপরোক্ত গবেষণার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত সমুদ্র শক্তি স্থাপনের উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে বঙ্গোপসাগরের জলীয় বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে অনুধাবিত হতে পারে। বাংলাদেশের অবস্থান থেকে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ যদি বিশ্ব উপকূলীয় রাজনীতিতে এর অবস্থান দীর্ঘদিন বজায় রাখতে চায় তবে সমুদ্র-শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। কারণ, শক্তিশালী জাতির জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রয়োজন। সম্পদশীল সমুদ্র উপকূলের সীমানা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের শক্তিশালী নৌ-পরিকল্পনা প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরের অবস্থান বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য সহায়ক। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যেহেতু কাঁচামাল হিসেবে প্রচুর লোহার প্রয়োজন হয়, সেহেতু দেশের দক্ষিনাঞ্চলে অবস্থিত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প এটি প্রচুর পরিমানে যোগান দিতে পারে। আবার বাংলাদেশ সমুদ্র ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলে সমুদ্র ভ্রমণকারী জাতি হিসেবে নিজদেরকে পরিচিত করতে পারে। খনিজ সংগ্রহের মাধ্যমে এবং কৃষি খাতের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে একটি সৎ ও সুনির্দিষ্ট জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা আমাদের সম্পদ। এই ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের প্রতিবেশী কখনো আমাদের প্রতি চরম শত্রু ভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করেনি। আমরা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ সম্পন্ন করলেই সম্পূর্ণভাবে আমাদের অবস্থান মতা চর্চা করতে পারব। সব দেশই এটি ব্যবহার করতে চায়। এটি চূড়ান্তভাবে আমাদের আয় বৃদ্ধি করবে। এবং এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মোট পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করবে। এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে আমাদেরকে পারস্পরিক নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। কিন্তু এ ধরণের উচ্চাভিলাষী লক্ষ অর্জন করতে আমাদেরকে যুক্তিপূর্ণ পদপেক্ষ নিতে হবে। অন্যদেরকে অনুসরণের পাশাপাশি আমাদের নিজেদের বিচক্ষণতা গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এটি সত্য যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমাদের তুলনায় বঙ্গোপসাগরের তাৎপর্য বেশী অনুধাবন করছে। সুতরাং, খুব

প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদেরকে জনগণের প্রশিক্ষণ, সমুদ্র সম্পদের ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তি ইত্যাদির উদ্দ্যেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ণ সাধন করতে হবে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগর কমিশন প্রতিষ্ঠা ভিন্ন কোন বিকল্প নেই।

মূল্যায়ণ

ভূ-রাজনীতি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে একটি বিবরণমূলক শিক্ষা। সুতরাং বঙ্গোপসাগরের প্রকৃত ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য নির্ধারণের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ধার করতে হবে এবং আমাদের চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে। একটি বিষয় আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বঙ্গোপসাগরের উপর নির্ভরশীল। একারণে সমুদ্র উপকূল থেকে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্য আমাদের কার্য-কলাপ সীমিত করা উচিত নয়। পরিবর্তে, আমাদের এর পরিবেশ রক্ষায়, বাস্তসংস্থান রক্ষায় এবং সুন্দরবনের মত জঙ্গল ও অন্যান্য বিষয়ে একসাথে কাজ করা উচিত।

৫.৭ ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বিলোপ ও বৃহদশক্তির অভ্যুত্থান

জার্মান বংশোদ্ভুত সুইডশ রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রুডলফ জেলেণ (Rudolf Kjellen) ১৯১৬ সালে তাঁর প্রকাশিত 'জৈবিসত্তা সদৃশ রাষ্ট্র (Staen som lifs form) শীর্ষ গ্রন্থে রাষ্ট্রকে ঐতিহাসিক ও সর্বাত্মক বাস্তবতায় জৈবিকসত্তা সদৃশ সত্তার হিসাবে উপস্থাপিত করেন। তিনি রাষ্ট্র সত্তাকে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির প্রেতিে অবলো স্বপক্ষে ওকালতি করেন।

ক. ভূরাজনীতি (Geopolitic) : ভূগোল ও রাষ্ট্র
খ. গণ-রাজনীতি (Demopolitik) : জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র
গ. আর্থ-রাজনীতি (Oekopolitik) : অর্থনৈতিক সম্পদ ও রাষ্ট্র
ঘ. সমাজ রাজনীতি (Sociopolitik) : সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্র এবং
ঙ. সরকার ও রাজনীতি (Kratopolitik) : সরকার ও রাষ্ট্র

জেলেনের মতে, কালের আবর্তনে সামুদ্রিক শক্তির আধিপত্য সংকুচিত হবে এবং পরিনতিতে, স্থলশক্তি সমুদ্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হবে। তিনি আরো ভবিষ্যদবাণী করেন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে, আর অনাগত দিনে বিশ্বে কতিপয় বৃহদশক্তির অভ্যুত্থান ঘটবে।

স্যার হ্যালফোর্ড জন ম্যাকিন্ডার (Sir Halford John Mackinder) হৃদভূমির ধারণা ম্যাকিন্ডার ছিলেন ভূ-রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার অন্যতম শ্রেষ্ট প্রবক্তা। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ও একনিষ্ট সেবক। সাগর পারে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাজার সংরক্ষনের পথ নির্দেশনা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে তার প্রথম গ্রন্থ Bridain and Brithish Seas রচনা করেন।

১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনায়কের ছবি আকর্ষন কল্পে ম্যাকিন্ডার গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বাস্তবতা শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে ম্যাকিন্ডার ইউরেশিয়া ও আফ্রিকাকে একক ভূ-খন্ড World Island বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন তিন চতুর্থাংশ জমাভাদ ও এক চতুর্তাংশ মূলভাগ নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ গঠিত। স্থলভাগের দুই তৃতীয়াংশ বিশ্বদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত বাকী এক চতার্থাংশ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া নিয়ে গঠিত। বিশ্বের সাত অষ্টমাংশের আবাসভূমি হচ্ছে বিশ্বদ্বীপ বাকি এক অষ্টমাংশ জনসংখ্যা বসবাস করে অবশিষ্ট স্থলভাগে। ম্যাকিন্ডারের মতে, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হৃদভূমির যা ভলগা নদী থেকে সাইবেরিয়া এবং হিমালয় থেকে আর্কটিক সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। হৃদভূমি হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দুর্গ যার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জল নিষ্কামনের ব্যবস্থার অভ্যন্তর মুখিতা। ভৌগোলিকভাবে চীন, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তান ও ইরানের মালভূমি অঞ্চল হৃদভূমির অন্তর্ভূক্ত হলেও রাজনৈতিকভাবে মূলত, হৃদভূমি মূলত রাশিয়ার পূর্ব ইউরোপীয় ভূখন্ডের সম্পূর্টা এবং এশীয় ভূখন্ড নিয়ে গঠিত।

৫.৭.১প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য/ প্রতীক (The Fast : The West)

ম্যাকিন্ডার পূর্ব ইউরোপকে হৃদভূমির দ্বার (Gateway) রূপে বর্ণনা করেন। ১৯৩১ সালে 'The British Association for the Advancement of Science' মানব আবাসভূমি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, এর সারমর্ম নিম্নরূপ দক্ষিন এশিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত এশীয় মৌসুমী অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২ কোটি বর্গ

কিলোমিটার। এই অঞ্চলে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক (১৩৯১, ৯০ কোটি) টাকা এই অঞ্চলটিতে বাস করে, জনসংখ্যা ঘনত্ব ৭০ জন / বর্গ কিলোমিটার। এর আয়তন ভূ-পৃষ্ঠের ৪%। স্বরণাতীত কাল থেকে এখানকার জনগোষ্ঠী কৃষিজীবী, প্রকৃতি- নির্ভর, অদৃষ্টবাদী ও রক্ষণশীল এবং সর্বোপরি বর্হিবিশ্বের প্রতি উদাসীন। এই ভূখন্ডের ম্যাকিন্ডার প্রাচ্য ((The East) বলে আখ্যায়িত করেন। পক্ষান্তরে শ্বেততম শ্বৈত মানব অধ্যুষিত পাশ্চাত্য (The West) হচ্ছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলাভূমি তথা ইউরোপ, প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্যের আয়তন হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৪ শতাংশ। এখানে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার অতি নগণ্য।

৫.৮ বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ভূ-রাজনীতি

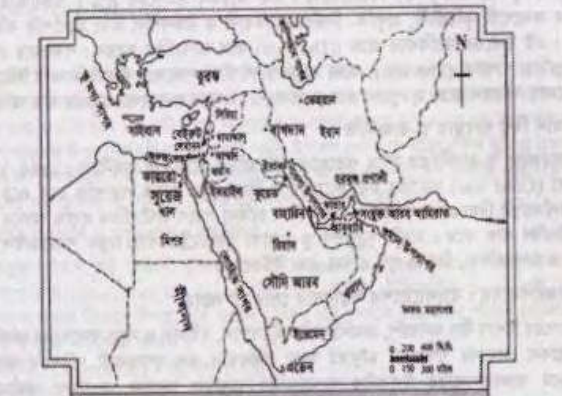
স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে ভূ-রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ভূ-অর্থনীতি। ১৯৪৫-১৯৯০ সালের স্নায়ুযুদ্ধ বা (Cold war) সমাপ্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বে বিষয়গুলির একক পরাশক্তি হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উৎকর্ষ ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূ-রাজনীতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নতুন প্যারাডাইস সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া, চীন ও পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপ।

৫.৮.১ বঙ্গোপসাগর : বাংলাদেশের সম্ভাবনার সোনালী সম্ভার

বঙ্গোপসাগরের বিশাল নীল জলরাশি, ক্রমনিম্নগামী মহীসোপান, মহীঢাল ও সমুদ্র তলদেশের অনাবিষ্কৃত সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা এদেশের পশ্চাৎপদ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বাংলাদেশের সামুদ্রিক অবস্থান, সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone) এবং গভীর সমুদ্রে অবাধ গমনাগমন সুবিধা দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। অতি প্রাচীন কাল হতেই এদেশের প্রধান নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাসহ ভারতের প্রধান নদী ব্যবস্থা, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নদীসমূহ, বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ, শৈলশিরা ও ভূমি গঠনে ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রক্রিয়াই বাংলাদেশের নিম্নাংশের অধিকাংশ ভূমিগঠন সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণমুখী এদেশের অগণিত নদী-নালার ভূমিগঠন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট নতুন পরিসর প্রাকৃতিক ভাবেই বঙ্গোপসাগরের মৎস, খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক শক্তি (জোয়ার-ভাটা), ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমে ভারত ভূ-খন্ডের পূর্বে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং মায়ানমারের মধ্যবর্তী স্থানে ভারত মহাসগরের উত্তর-পূর্ব স্থান জুড়ে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের ব-দ্বীপিয় সমভূমি ও উপসাগরের উত্তর সীমানার সীমারেখা নির্ধান করেছে। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বে গভীর সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান ও নিকোবর অবস্থিত।

ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে ৮° থেকে ২২° উত্তর অংশের মধ্যবর্তী স্থানে ২.২ ও ১০৬ বর্গ কি.মি আয়তন জুড়ে বঙ্গোপসগর অবস্থিত। এ উপসাগর ভারত-মহাসগরীয় উত্তর পূর্বাংশে ফানেল আকৃতিতে উত্তর দিকে ক্রমশ: প্রশস্ততা লাভ করেছে। বাংলাদেশে প্রায় ৫৬০ কি.মি. পর্যন্ত উপকূলীয় সীমানা অঞ্চল অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের এ্যাক্ট নং XIV অনুযায়ী বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৪৩,২৩২ বর্গ কি:মি: সংরক্ষিত আর্থনীতিক অঞ্চল, প্রায় ৭,০০০ বর্গ কি: মি: মহীসোপান এলাকার দাবীদার। এছাড়া প্রায় ১০,০০০ বর্গ কি: মি: মহাদেশীয় সমুদ্র সীমানা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এ উপসাগরের অন্যতম মালিকানার দাবীদার ভারত বাংলাদেশের মহীসোপান, মহীঢাল, সংরক্ষিত অর্থনীতিক অঞ্চল, গভীর সমুদ্র সমতলে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকানার দাবী মেনে নেয়নি বরং বাংলাদেশের সীমারেখার দাবীর বিরোধিতা এবং দাবীকে অবহেলা করে প্রতিবাদ করে। শুধু তাই নয়, হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় গড়ে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ সুস্পষ্ঠ ভাবে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত জোরপূর্বক তা দখল করে নেয়। একই সাথে ভারত বাংলাদেশের সংরক্ষিত অর্থনীতিক এলাকা, মহীসোপান ও মহীঢাল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও সামুদ্রিক মৎস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ অনুসন্ধান ও আহরণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদেরকে অনুমতি প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। সমস্ত বিতর্ক, সমস্যা প্রতিকূলতার উর্ধ্বে বঙ্গোপসাগরের লুকায়িত সম্ভাব্য সম্পদ বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করতে পারে একথা বলার অবকাশ রাখে না।

৫.৮.২ মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার ভূ-রাজনীতি



মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি ও ইরান তেলসম্পদে সমৃদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য অর্থনীতির প্রাণ এই মাসিল পুয়েলের মূল যোগানদাতা মধ্যপ্রাচ্য।

সোভিয়েত ভেঙ্গে মধ্য এশিয়ায় যে নতুন রাষ্ট্রগুলি সৃষ্টি হয় সেগুলোও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং নতুন সৃষ্ট



রাষ্ট্রগুলোতে পরাশক্তি প্রভাব না থাকায় একধরনের শক্তির শূন্যতা সৃষ্টি হয়। মার্কিন দৃষ্টিকোণ হতে, এ এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক আগ্রাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা-

১. দেশগুলির সাথে চীনের সীমান্ত রয়েছে এবং ডমিনো তত্ত্বানুসারে শক্তির শূন্যতায় এই এলাকায় সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসন সহজতর হয়ে উঠতে পারে।
২. দক্ষিণ সীমান্তের দেশ ইরানের ইসলামী বিপ্লব রপ্তানি ও সহজতর হবে। কেননা দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম।
৩. দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের দেশ তুর্কির "Common Turkik Origin" ধারণানুযায়ী তুরস্কও এই এলাকায় প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে পারে।

উপরন্তু দক্ষিণের ভারতীয় মহাসাগর এলাকায় পৌঁছতে এ দেশগুলোর প্রধান রুট হতে পারে আফগানিস্তান, যেখানে সে সময়ে তালেবানী শাসন কায়েম ছিল।

এই রাজনৈতিক সমীকরণের সাথে দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রাপ্তি যুক্তরাষ্ট্রকে ভূ-রাজনৈতিকভাবে স্বার্থবাদী করে তোলে। ফলে দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রভাব সৃষ্টি করতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পুতুল সরকার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এই পথটি আরো সহজ করে দেয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা। ফলশ্রুতিতে আফগান যুদ্ধের ইস্যু সৃষ্টি সহজতর হয় এবং আফগানিস্তানে মার্কিন অনুবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত করে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য এশিয়াকেন্দ্রিক ভূ-রাজনৈতিক সাফল্য ফলপ্রসূ হয়।

একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিপজ্জনক দেশ ইরানকে নিবারণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল ভূ-অর্থনৈতিক সম্পদকে নিয়ন্ত্রনের জন্য এ এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয় সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পরে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক ভূ-রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন হয় ইরাক দখলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সাফল্যের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব জনমতের বিরোধিতা এবং ইরাকীদের প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে। তাই এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক অর্জন জাতীয় স্বার্থের জন্য কতটুকু সুফল বয়ে আনবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৫.৮.৩ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূরাজনীতি

চীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সমাজতান্ত্রিক খোলস থেকে বেড়িয়ে উদারনৈতিক ও বাজার অর্থনীতির দিকে



অগ্রসর হওয়ায় একক দেশ হিসেবে জায়ান্ট জাপান এবং শত্রুরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া।

চীনের তিব্বত দখল হংকং এবং ম্যাকাও এর অধিগ্রহণ চীনের ভূ-রাজনীতি সুসংহত করেছে এবং একই সাথে ভূ-রাজনৈতিক শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু চীনের প্রধান ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতা তাইওয়ান। কৌশলগত কারনে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক অগ্রাধিকারে দেখা যায় দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এবং এই রাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে অথবা সরাসরি গোপনীয় পথে তাইওয়ানকে সমর্থন ও সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া। চীনের এই ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতা এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রকে চীনকে নিবারিত রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আবার উত্তর কোরিয়াকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ঘোষণা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে নিবৃত্ত রাখার মাধ্যমে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র তার ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন SEATO এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একইরূপ কূটনীতি বজায় রাখা সম্ভব ছিল।

চীন সীমান্তবর্তী দেশ ভারত ইতোমধ্যে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু এতদ অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক সক্রিয়তা সৃষ্ট হয় বাংলাদেশে HANA, SOFA প্রভৃতি সামরিক চুক্তি প্রচেষ্টার মাধ্যমে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চীন সাগর পর্যন্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চীন যে প্রভাব বজায় রাখতে চায় এর কারন হচ্ছে এই মহাসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক রুট। বিভুক্ত আরব ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য চীনকে এ অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক অগ্রগামির ছেদ রেখা টেনে দেয়। উপরন্তু সোভিয়েত ভাঙ্গনের পর এই রুটে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে কেউ সমর্থ হয়নি। তদুপরি আফগান, ইরাক দখল এবং ভারতের সাথে ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এ অঞ্চলে আরো সুসংহত করেছে। মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক বিশে-ষণ অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড CNN.Com –এর জন্য ধারাভাষ্যে লিখেছেন বিমান প্রতিরক্ষা অঞ্চল ঘোষণার পেছনে বেইজিং এর সে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এই ঘটনা চীন তার ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রদর্শন করতে চাইছেন বলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এতদ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো চীন সঙ্গত কারনেই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে চীন যেন সীমা অতিক্রম করতে না পারে এ লক্ষ্যে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি বাড়াতে হবে। ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে দক্ষিণ চীন সাগর তেল ও গ্যাসসমৃদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। পাশাপাশি এটি এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। একারণেও এ অঞ্চলে সামরিক উপস্থিত বাড়ানো প্রয়োজন মনে করে।



ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ

http://thejobstudy.com
Go to Contents

৫.৮.৪ ইউরোপের ভূ-রাজনীতি

সোভিয়েত ভাঙ্গনের পরও যে ন্যাটো ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব হারায় নি অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায় '৯৯ এর কসোভো যুদ্ধে ন্যাটোর ছত্রছায়ার যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপের বুকে একক আধিপত্য।

কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুসংহত রূপরেখা, সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ এবং ইইউ এর অন্যতম শক্তিশালী দেশ জার্মানি, ফ্রান্স বা স্পেনের যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন ইস্যুতে মতদ্বৈততা ইইউকে ভূ-রাজনৈতিকভাবে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ করে তুলতে পারে। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ ইইউভুক্ত হওয়ায় ম্যাকাইন্ডের Heartland theory অনুযায়ী বিশ্ব নিয়ন্তা হবার কথা ইউরোপীয় কাঠামো তথা ইইউ এর। ইউরোপীয় সংহতি আদতে সেরূপই ইঙ্গিত প্রদান করেছে। ইইউ ইতোমধ্যে সামরিক শাখায় আগ্রহী হয়ে ওঠায় আগামীতে ইইউ ভূক্ত ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য হ্রাস পেতে পারে। আবার ন্যাটোর প্রশ্নেও ইউরোপের আধিপত্য বাড়ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্স-আটলান্টিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইউরোপে ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য নতুন কৌশলের প্রয়োজন হবে। কিন্তু ভূ-রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা ও বিশ্বব্যাপী বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী জনমত যুক্তরাষ্ট্রকে সে ক্ষেত্রে কতটুকু সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে তা ভবিষ্যতই কেবল বলতে পারে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **Geo-politics শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর : ভূ-রাজনীতি।

২. **ভূ-রাজনীতি বলতে কী বুঝায়?**
উত্তর : একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবই হলো ভূ-রাজনীতি।

৩. **Geopolities শব্দের অর্থ কি?**
উত্তর: ভৌগোলিক রাজনীতি

৪. **Geopolities বা ভূ-রাজনীতি কোন ভাষার শব্দ?**
উত্তর: জার্মান শব্দ

৫. **ভূ-রাজনীতির জনক কে?**
উত্তর: কার্ল হসোফার (Karl Housofer)

৬. **ভূ-রাজনীতিক কোন দুটি বিষয়ের সম্পর্ক যুক্ত রূপ?**
উত্তর: ভূগোল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের।

৭. **ভূ-রাজনীতিক বিশ্লেষনে রাষ্ট্রের শক্তি অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন কোন রাজনীতিবিদ?**
উত্তর: জার্মান বংশোদ্ভুত ক্রিয়েলেক রোজলেব

৮. **আলফ্রেড টি মাহানের মতে ভূ-রাজনীতির উপাদান কয়টি?**
উত্তর : ৬টি।

৯. **ভারত এর চাহিদার কত অংশ গ্যাস বঙ্গোপসাগর থেকে সংগ্রহ করে?**
উত্তর: ১/৩ অংশ।

১০. **মায়ানমার কী কারনে বঙ্গোপসাগর এর ওপর ভৌগোলিক রাজনীতির প্রচেষ্টা চালায়?**
উত্তর: বঙ্গোপোসাগর থেকে গ্যাস উত্তোলন এবং রপ্তানী করার জন্য।

১১. **মায়ানমার বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছিল কোন দুটি অঞ্চল নিয়ে?**

উত্তর: Continental Shelf ও Exclusive Economic Zone

১২. 'The Natural System of Political Economy' গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তর : Friedrich List.

১৩. ভূ-রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা/শক্তি কীভাবে রাষ্ট্রকে পরক্রমশালী করা যায়।

১৪. বিশ্বের মোট মজুদ তেল সম্পদের ২৫% কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : সৌদি আরবে।

১৫. হরমুজ প্রণালী কোন সাগরে অবস্থিত?
উত্তর : ওমান সাগরে।

১৬. গোলান মালভূমি নিয়ে কোন কোন দেশে সংঘর্ষ হয়?
উত্তর : মিসর ও ইসরাইল।

১৭. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল কোনটি?
উত্তর : কাশ্মীর।

১৮. বঙ্গোপসাগরের তলদেশ ভূমিকম্প ঘটাতে সক্ষম ফিয়েচারের নাম কী?
উত্তর : জাভা ট্রেঞ্চ (Java Tranch)

১৯. বাংলাদেশের সাথে কোন কোন দেশের সীমানা সংযুক্ত?
উত্তর : ভারত ও মায়ানমার।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. ভূ-রাজনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর?
খ. ভূ-রাজনীতির উপাদানগুলো বর্ননা কর?

২ ক. ভূ-রাজনীতিতে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বর্ণনা কর?
খ. ভূ-রাজনীতিতে ভারত ও বাংলাদেশের অবস্থান বর্ণনা কর?

৩ ক. মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যএশিয়ার ভূ-রাজনীতি বর্ণনা কর?
খ. ভূ-রাজনীতিতে ইউরোপের অবস্থান বর্ণনা কর?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. ভূ-রাজনীতি বলতে কী বোঝেন? ভূ-রাজনীতির উপাদান এবং তার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. Geopolitics কী? বর্তমান বিশ্বের পেক্ষাপটে ভূ-রাজনীতির একটি দেশের জন্য কীরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন?

৩ ভূ-রাজনীতিতে সমুদ্র সীমার গুরুত্ব এবং বাংলাদেশ মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিজয় ভূ-রাজনীতিতে কতটুকু প্রভাব ফেলবে আলোচনা কর?

৪ বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনীতিক গুরুত্ব আলোচনা কর?

৫. বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সম্ভবনার সোনালী সম্ভার ব্যাখ্যা কর?

অধ্যায় ৬

সন্ত্রাসবাদ : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

Terrorism : International Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৬.১ ভূমিকা
৬.২ সন্ত্রাসবাদ কী
৬.৩ সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস
৬.৪ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ
৬.৫ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ
২০.৬ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের বিবরণ
৬.৭ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ
৬.৮ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা
৬.৯ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাফল্য
৬.১০ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন করে দাবী আদায় একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। এ সকল ক্ষেত্রে নির্যাতনেরও শিকার হতে হয়। তাছাড়া আন্দোলনের সুফল সব সময় সুবিধাভোগী শ্রেনির ঘরে চলে যায়। ফলে দাবি আদায়ে শান্তি আর গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, গোষ্ঠী, সংগঠন সন্ত্রাসবাদের হিংসাত্মক পথকেই বেছে নিয়েছে। তবে সন্ত্রাসবাদ যেসব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের নতুনরূপে পরিগ্রহ করেছে। টুইন টাওয়ারে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তান ও ইরাকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের ভবিষ্যৎকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

৬.২ সন্ত্রাসবাদ কী ? (What is Terrorism)

সন্ত্রাসবাদের সত্যিকারের নিরপেক্ষ সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। সন্ত্রাসবাদের ধারণা ও সংজ্ঞা নিয়েও বেশ বিতর্ক রয়েছে, বলা হয় হিংসায় ব্যবহার বা হিংসা প্রয়োগের হুমকির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি সঞ্চারে প্রয়াস ও সংস্কার করাই হলো সন্ত্রাসবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে সন্ত্রাসবাদ কথার অর্থ হলো পূর্বপরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিংসা, নিরস্ত্র লক্ষ্যে উপজাতীয় বা গুপ্ত দালালদের দ্বারা সাধারণ একদল মানুষকে সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য হতে পারে। কোনো জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়, সরকার, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এমনকি সাধারণ মানুষও। সাধারণত এ ধরনের সন্ত্রাসবাদী

কাজকর্মে জড়িত দল বা সংগঠন বিরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর তুলনায় আকারে ও আর্থিক সঙ্গতিতে ছোট হয়।

বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের ধারণার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাস আওতাভুক্ত হয়না। আবার স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সবই এ সংজ্ঞার আলোকে সন্ত্রাস বলে প্রতিপন্ন হয়।

দৃষ্টিভঙ্গীয় পার্থক্যের কারণে সন্ত্রাসবাদের প্রতি একেক দেশের প্রতিক্রিয়া একেক রকম, Bnran Michael Jenseins, "Terrorism in the 1980" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, One Man's terrorist is another man's freedom fighter তাই দেখা যায়, পিএলও স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সংগঠন হলেও তাকে ইসরাইল ও তার মিত্ররা সন্ত্রাসী হিসেবে দেখে থাকে। মোট কথা, বলা যায় ধারণাগত দিক দিয়ে সন্ত্রাসবাদের গঠন প্রায় নিরস্ত্র লোককে হত্যা, ছিনতাই গুপ্ত হামলা বন্দী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ইত্যাদি।

৬.৩ সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস (History of Terrorism)

সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সন্ধান মেলে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের একটি গোষ্ঠী জিলট (Zealost) এ সময় বর্তমান ইসরাইলের ওপর রোমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইরানে অ্যাসাসিনস (Assasins) নামে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি সংগঠন সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ত্রাসবাদের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ধর্ম। রাশিয়ার ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তা হলে দেখতে পাব সেখানে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড একটি বড় ধরণের আতংকের সৃষ্টি করেছিল ১৮৮০ সালে নিহিলিস্ট মতবাদ ও নিহিলিস্টদের কার্যকলাপের ফলে সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল ও নিহিলিস্ট বিপ্লবীদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল (১৮৮১ সালে)। নিহিলিস্টরা ছিলেন উগ্র। তবে এরা শিক্ষিত ছিলেন। একটি আদর্শকে সামনে রেখে এরা বিপ্লবী তৎপরতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এ আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের রূপ নেয়। মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইসরাইলের দ্বন্দ্বে সন্ত্রাসবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে। সত্তর এর দশকে আল ফাতাহ্ গেরিলা সংগঠন ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এরা বিমান ছিনতাই করে বিমানগুলো ধ্বংস করে দিত। কালের পরিক্রমায় আল ফাতাহ্ তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শ্রীলংকায়

মনে রাখার Technique & Tips

- ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পরই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ডাক দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে হিংসা প্রয়োগের হুমকির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি সঞ্চারের প্রয়াস তথাই হল সন্ত্রাসবাদ।
- আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ : যে সন্ত্রাসী হামলার ফলে শুধু আক্রান্ত দেশ নয় অন্যান্য দেশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জড়িত থাকে তাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।
- সন্ত্রাসবাদের স্বীকার-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেচনিয়া, কাশ্মির, শ্রীলংকা, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কয়েকটি সাফল্য

১. বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন।
২. সন্ত্রাসবাদের উৎসে চিহ্নিতকরণ।
৩. সন্ত্রাসবাদের পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন বন্ধ।
৪. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কারণে অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন তাদের দাবি আদায়ের জন্য সহিংস ত্যাগ করে আলাপ আলোচনার আগ্রহ দেখিয়েছে।
৫. প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করেছে।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

১. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ পরাশক্তির স্বার্থ হাসিলের জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বিশ্বব্যাপী প্রকৃত সন্ত্রাস নির্মূল অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
২. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ জাতিগত যুদ্ধে রূপ নেবার আশংকা থাকায় এর সফলতা ব্যর্থতার পর্যবসিত হতে পারে।
৩. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এখনও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ফলে অদূর ভবিষ্যতে এর কার্যক্রমে ভাটা পড়তে পারে।
৪. সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে গিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ কোথাও কোথাও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে ফলে এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

তামিল টাইগাররা একটি তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা থাকলেও তাদের আন্দোলন একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কাশ্মিরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতীয়তাবাদ ও মতাদর্শ বিভিন্ন সন্ত্রাস কার্যকলাপের ভিত্তি হয়ে ওঠে। এ সময় সন্ত্রাসবাদ অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায়, ইলেকট্রনিক্স ও বিস্ফোরকের নানান উদ্ভাবন সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডকে অনেক সহজ করে দেয়। সর্বশেষ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে বিশ্ব মতামতকে উপেক্ষা করে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর ইরাকে হামলা সন্ত্রাসবাদের নতুন ধারণা জন্ম দিয়েছে।



নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস

৬.৪ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ (International Terrorism)

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। হামলাকারীদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন এটা নিন্দনীয়। হাজার হাজার মানুষ এ হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে-যারা আদৌ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। এসব সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হামলাকারীরা তাদের স্বার্থ কতটুকু হাসিল করতে পেরেছে বোধগম্য নয়। কিন্তু এই ঘটনায় বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হলো সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। কারণ কোনো কিছু অর্জনের জন্য সন্ত্রাসবাদকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা যায় না। আন্তর্জাতিক সংস্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, যে সন্ত্রাসী হামলার ফলে শুধু আক্রান্ত দেশ নয় অন্যান্য দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জড়িত থাকে তাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা দেয়া হয়।

৬.৫ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ (Terrorism & Anti Terrorism War)

সন্ত্রাসবাদ দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সন্ত্রাস নির্মূলে ভূক্তভোগী রাষ্ট্রসমূহ এতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বা কখনও কখনও আঞ্চলিক পরাশক্তির সহায়তাকে ব্যবহার করেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর ফলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। মূলত ঃ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়।

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ চালু হলেও সন্ত্রাস তার চেহারা পরিবর্তন করেছে। বিশ্বের একেক দেশে একেক অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের কার্যক্রম একেক রকম। সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন রকম। তবে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের ধরন দেখে এটা খুব সহজে বোঝা যায় যে, সন্ত্রাসবাদের কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী একই। তারা তাদের স্বার্থ হাসিলের ব্যাপারে যে কোনো হিংস্র পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস- লক্ষ্য ইসলামী দুনিয়া (?)

৬.৬ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের বিবরণ

১. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :** বিশ্বের সবচেয় আলোচিত, সমালোচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একমেরুর নেতৃত্বে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অপর মেরুর নেতৃত্বে থাকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক হুমকি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেমন কোনো সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করতে হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটলে বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ একচ্ছত্র আধিপত্য বিশ্বব্যাপী নতুন সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। যার বড় প্রমাণ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে আত্মঘাতী বিমান হামলা। এ হামলায় হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথম এত বড় হামলার শিকার। কে বা কারা এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এ হামলা করেছে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ধরে নিয়েছে সৌদি বংশোদ্ভূত ভিন্ন মতালম্বী ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংগঠন আল কায়েদা এই সন্ত্রাসবাদের জন্য দায়ী। তারপর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন নাগরিক এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট এলাকা সন্ত্রাসীদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে। যার বিরুদ্ধে লড়তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিমশিম খাচ্ছে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। একে অন্যের পিছু লেগে আছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে এ সমস্যাটি মানব সমাজের অনেক দিনের সঙ্গী। তবে ১১ সেপ্টেম্বরের পর এ সম্পর্কে আলোচনা বেড়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদ এখন শুধু মার্কিনিদেরই মাথা ব্যথার বিষয় নয়, বরং

রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতায় জাতিগত বা ধর্মীয় কারণে যে কোনো স্থানে বাহুবলের ব্যবহারকে সন্ত্রাসবাদ বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

২. **ফিলিস্তিন :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিন ও ইসরাইল পরস্পরবিরোধী কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ রূপ বিশ্বে রাজনৈতিক আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিচিত লাভ করে মধ্যপ্রাচ্য সন্ত্রাসবাদের মূল হোতা ইহুদিরা। তাদের ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদে শত শত মুসলিম আরবের জীবনাবসান হয়। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর সন্ত্রাস ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়। তখন ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হলে তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেছে নেওয়া। শুরু হয় ইসরাইলী সন্ত্রাসের জবাব সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেবার। তবে ফিলিস্তিনির এই স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ইসরাইলিদের হাতে অসংখ্য নিরীহ ফিলিস্তিনি জীবন হারিয়েছে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে। গুড়িয়ে দিয়েছে আগুন লাগিয়েছে লাখ লাখ আরব বস্তি এবং উদ্বাস্তু শিবিরে। বিনা প্ররোচনায় হত্যা করেছে লাখ লাখ আরব নারী ও শিশুকে। জেনিন, নাবলুস, গাজা উপত্যকাসহ অধিকৃত ফিলিস্তিনি এলাকায় পশ্চিম তীরে একের পর এক তাণ্ডব চালাতে থাকে। এ তাণ্ডব এখনো থামে নি বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র সমর্থন এবং জাতিসংঘের ব্যর্থতা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের সন্ত্রাসবাদ শুধু ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অনিশ্চিত করে তুলে নি বরং মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল এলাকায় শান্তিকে অশান্তিতে পরিণত করেছে। এর প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল আরব পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে।

৩. **চেচনিয়া :** ককেশীয় অঞ্চলে চেচনিয়ায় সোভিয়েত ভাঙ্গনোত্তর বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যাকে রাশিয়া তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে। শুরুতে চেচেন যোদ্ধারা সফল হলেও একসময় রুশ বাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হয়েছে। স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেচেনিয়ার জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচনিয়ানদের এ যুদ্ধকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই সমর্থন করে এসেছে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাশিয়া যখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মাথানত করে তখন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান পরিবর্তন করলে চেচেনদের ভাগ্যে বিপর্যয়ের ঘনঘটা আরো করুণভাবে দেখা দেয়। চেচেনরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য হিংসাত্মক পথ বেছে নিলে রাশিয়াও চেচেনদের আন্দোলন দমনের নামে হত্যাকাণ্ডকেই বেছে নিয়েছে। ফলে রাশিয়ার ককেশীয় অঞ্চলের চেচেন ভূখণ্ডটিতে চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদকে মোকাবেলা করার রুশনীতি সমালোচিত হয়েছে। বিশেষভাবে ২০০২ সালের শেষদিকে চেচেন গেরিলাদের হাতে প্রেক্ষাগৃহে আটক পানিবন্দিদের মুক্ত করতে রুশবাহিনী মরণ গ্যাস ব্যবহার করে দেশ-বিদেশে নিন্দা কুড়িয়েছে। ফিলিস্তিনির সন্ত্রাসবাদ বা আত্মঘাতি যোদ্ধাদের সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানোর মার্কিননীতির প্রতি রুশদের সমর্থন লক্ষ করা না গেলেও চেচেনদের তৎপরতাকে তারা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চায়। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য ব্যাপক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকলে রাশিয়াও সে সুযোগ নেয়। এরপর থেকেই চেচেনদের ওপর চলতে থাকে অত্যাচারের স্টিমরোলার। রাশিয়া চেচেনদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে চালিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য প্রভাবশালী দেশের সহানুভূতি লাভ করে।

৪. **কাশ্মির :** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকেই কাশ্মির বিরোধের জন্ম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টস্ট এ অঞ্চলের জনগণ শুরু থেকেই ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরোধী ছিল । সেই থেকে আজ পর্যন্ত তারা তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মিরী জনগণ তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে অহিংস পথ বাদ দিয়ে সহিংস পথ অবলম্বন করেছে। এর পেছনে মূল কারণ হিসেবে ধরা যায় কাশ্মিরীরা মনে করে ভারত তাদেরকে সহজে স্বাধীনতা দেবে না এবং যদি আন্দোলন করেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনীর সাথে পাল্লা দিয়ে অহিংস পথে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এর প্রেক্ষিতেই কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী জনগণ সশস্ত্র পথ বেছে নিয়েছে। তাদের এ কর্মকাণ্ডকে ভারত সরকার সন্ত্রাসী

কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছে। কাশ্মিরী স্বাধীনতাকামীদের সশস্ত্র আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণতির স্বীকার শুধু কাশ্মিরের জনগণ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যও নয়, সারা ভারতের জনগণও। মূলত কাশ্মিরীদের স্বাধীনতার অধিকার আদায় করতে গিয়ে সহিংস আন্দোলন গড়ে উঠেছে, ভারতীয় সরকার তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের ভয়াবহ কর্মকাণ্ড। কাশ্মির সমস্যা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি কাড়লেও এখনও এর ব্যাপারে তেমন কোনো সুরাহা হয় নি। কারণ ভারতের অভিযোগ পাকিস্তান কাশ্মির মুজাহিদদের অস্ত্র ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ভারত কাশ্মির ইস্যুকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ইস্যু বলে মনে করে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ তারা একেবারেই বরদাস্ত করবে না। এমতাবস্থায় এখনও কাশ্মিরে চলছে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের শসস্ত্র সংগ্রাম অন্যদিকে প্রতিরোধের জন্য, দমনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে অত্যাধুনিক বন্দুক হাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কাশ্মিরী মুজাহিদদের সন্ত্রাসী এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দেওয়ায় ভারত সরকার এবং কাশ্মির মুজাহিদদের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কাশ্মিরী আন্দোলনকে একটি সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট রয়েছে।

৫. **আফগানিস্তান :** আফগানিস্তানে সোভিয়েত প্রভাব বলয় মুক্ত করার জন্য মার্কিন সরকার সেখানে দীর্ঘদিন মুসলিম মৌলবাদীদের সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছে। সোভিয়েত মদদপুস্ট নজিবুল্লাহ সরকারকে অপসারণের জন্য আফগানিস্তানের মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলো তালেবান নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলে। দীর্ঘ দুই দশক ধরে সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট নজিবুল্লাহ সরকারের সাথে মার্কিন সমর্থনপুস্ট তালেবানদের সশস্ত্র সংগ্রাম চলে। এতে আফগানিস্তানের বহু সাধারণ লোক প্রাণ হারায়। তালেবানরা অবশেষে আফগানিস্তানে নজিবুল্লাহ সরকারের পতন এবং সোভিয়েত প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করলেও সেখানে তালেবানি শাসনের নামে চলে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। যার প্রভাব পড়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রেও। ২০০১ সালে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের দায়ে অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে আত্মগোপন করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো বাহিনীর সাহয্যে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা চালায় যা এখনও (২০১৩) চলছে। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস নির্মূল করতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে।

৬. **শ্রীলংকা :** শ্রীলংকার মোট জনগোষ্ঠীর ৭৪% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সিংহলি এবং ১৮ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী তামিল, ১৯৭২ সালে শ্রীলংকাকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়। সিংহলি ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে সংখ্যালঘু তামিলরা তাদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন শুরু করে। এ পর্যায়ে তাদের আন্দোলন স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রূপ নেয় এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা সশস্ত্র পথ বেছে নেয়। শুরু হয় দাবি আদায়ের জন্য সন্ত্রাসী উপায়ে আন্দোলন, যা শুধু শ্রীলংকাকেই নয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। শ্রীলংকা সরকার তামিলদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে সামরিক বাহিনী দিয়ে তামিল দমন অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৮৭ সালে শ্রীলংকা সরকার ভারতীয় সৈন্য দিয়ে তামিলদের দমনের চেষ্টা করলে তা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও তামিলদের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হন। শ্রীলংকার তামিল সিংহলি জাতিগত দ্বন্দ্বে গত ২০ বছরে শ্রীলংকায় কমপক্ষে ষাট হাজার লোক নিহত হয়। তামিলদের সংগঠন এলটিটিই তাদের দাবি আদায়ের যে পন্থা অবলম্বন করেছিল কালক্রমে তা বিশ্ববাসীর নিকট অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে এলটিটিই বিশ্বব্যাপী একটি সন্ত্রাসী সংগঠনরূপে পরিচিতি লাভ করে।

৭. **পাকিস্তান :** পাকিস্তানকে বলা হয় বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগার। ২০০৭ সালে সে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আততায়ীদের হাতে নিহত হন। মূলত তিনি দেশের ক্রমবর্ধমান ইসলামিক জঙ্গিদের হাতে নিহত হন। এরপর থেকেই সেখানে মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ

অনেক মানুষ নিহত হয়েছে। বর্তমানেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ধারণা করা হয় বিশ্বে সন্ত্রাসীদের শিকার হয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় পাকিস্তানে।

উপরিউক্ত অঞ্চল ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে এখনও এমন কিছু সংগঠন রয়েছে যারা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিল করার জন্য সন্ত্রাসবাদের পন্থা অবলম্বন করছে। সন্ত্রাসবাদ শুধু কোনো একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের জন্যই চ্যালেঞ্জ নয়। কখনো কখনো অঞ্চল আবার কখনো কখনো বিশ্বের জন্য হুমকী হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

৬.৭ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ (Anti-terrorism)

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ডাক দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূলে সকল দেশের সহযোগিতা কামনা করে। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ভয়াবহতা বিশ্ববাসীকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের বিশ্বের সকল রাষ্ট্র (আফগানিস্তান বাদে) এবং জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে এসে দাঁড়ায়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একসময়কার প্রচণ্ড শত্রু রাশিয়াও সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন জানায়। সন্ত্রাস নির্মূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো বাহিনীর সহায়তায় ২০০১ সালে আফগানিস্তনে এবং ২০০৪ সালে ইরাকে সামরিক অভিযান চালায়। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে শুধু আমেরিকা কথা বলছে না, ইসরাইল, ভারত, রাশিয়া সরকারবলছে। এছাড়া অনেক দেশ এর দ্বারা আক্রান্ত না হয়েও যুক্তরাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

http://thejobstudy.com Go to Contents



৬.৮ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা (Anti-terrorism and Role of USA)

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান করলেও প্রকৃতঅর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ বলতে কী বোঝায় তাই দেখার বিষয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র দপ্তর বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বা Foreign Terrorist Organisation (FTO)-এর সংজ্ঞাও স্থির করে থাকে। তাদের মতে, তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সংগঠনটি বিদেশি হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বা নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী সংগঠনটি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যুক্ত থাকতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মতো কাজে সংগঠনটিকে যুক্ত থাকতে হবে। ২০০১ সালের ৫ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে FTO তালিকা প্রকাশ করে তা হলো :

১. আবু নিদাল অর্গানাইজেশন	২. আবু সায়াক গ্রুপ
৩. আর্মড ইসলামিক গ্রুপ	৪. আউস সিনরিকিয়া
৫. বাস্ক ফাদারল্যান্ড এ্যান্ড লিবার্টি	৬. গামা'স আল ইসলামিয়া(ইসলামগ্রুপ)
৭. হামাস	৮. হরকাতুল মুজাহেদিন
৯. হিজবুল্লাহ	১০. ইসলামিক মুভমেন্ট অব উজবেকিস্তান
১১. আল জিহাদ	
১৩. কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টি	১৪. এলটিটিই
১৫. মুজাহিদিনে খালক অর্গানাইজেশন (MEK)	১৬. ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি
১৭. প্যালেস্টাইনিয়ান ইসলামিক জিহাদ	১৮. প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট
১৯. PFLP	২০. PFLP – GC
২১. আল-কায়েদা	২২. রেড আই আর এ
২৩. রেভ্যুলেশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলাম্বিয়া (FARC)	২৪. রেভ্যুলেশনারি নিউক্লি
২৫. রেভ্যুলেশনারী পিপলস্ লিবারেশন আর্মি ফ্রন্ট	২৬. শাইনিং পাথ
২৭. ইউনাইটেড সেলফ ডিফেন্স ফোর্সেস অব কলম্বিয়া।	

২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ২৪টি রাষ্ট্রকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। কারণ উল্লেখ করা হয়েছে সন্ত্রাসী তৎপরতার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র যেতে পারে এমন ২৪টি দেশকেই এই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। পাকিস্তানের জঙ্গী সংগঠন হাক্কানি নেটওয়ার্ককে জাতিসংঘের কালে তালিকাভুক্তির ঘোষণা করা হয় ৫ নভেম্বর, ২০১২ ।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রথম শিকার আফগানিস্তান। ৯০ দশকের শেষের দিকে তালেবানরা যখন একটি ইসলামি আফগান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদেরকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে টুইনটাওয়ারে হামলার পর কথিত সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে লুকিয়ে আছে দাবি করে তাকে মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়ার দাবী করলে মোল্লা ওমরের তালেবান সরকার এতে অসম্মতি জানায়। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমর্থনপুস্ট দেশসমূহ আল কায়েদা ধ্বংস এবং বিন লাদেনকে ধরতে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা চালায় যা ২ মে ২০১১ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কমান্ডোদল পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে লাদেনকে হত্যার মধ্য দিয়ে আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ হামলায় হাজার হাজার নিরীহ আফগান নিহত হয়। তবে মার্কিনিরা তাদের সৈন্য ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের অপর শিকার ইরাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ইরাক আল-কায়েদাকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিচ্ছে এবং মারণাস্ত্র উৎপাদন করছে তাই ইরাককে নিরস্ত্র করতে হবে। ইরাকে হামলার ইস্যু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস করাতে ব্যর্থ হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী জাতিসংঘ এবং বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাক আক্রমণ করে বসে এবং সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত করে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যে অভিযোগে ইরাক আক্রমণ করেছিল খোদ মার্কিন তদন্ত কমিশন সেই অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছে। বর্তমানে ইরাকে সাদ্দাম সরকারের অপসারণ হয়েছে এবং একটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে সেখান হতে বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়েছে।

৬.৯ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাফল্য (Success of Anti-terrorism Activities)

১. সন্ত্রাসবিরোধীদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালে

আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনা করে। এ অভিযানে হাজার হাজার নিরীহ আফগান নিহত হলেও আল কায়েদার প্রধান বিন লাদেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালে মে মাসে পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে হত্যা করে। কথিত সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়দাতা মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন তালেবান সরকারকে কাবুল থেকে উৎখাত করতে সমর্থ হয়েছে এবং সেখানে মার্কিন সমর্থন পুস্ট একটি সরকার গঠন করতে সফলতা দেখিয়েছে। লাদেনকে হত্যা করার পর আল কায়েদা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ধরে নেওয়া যায় যে, বর্তমান আফগান সরকার সন্ত্রাসবাদ বা মার্কিন স্বার্থবিরোধী কোনো অপশক্তিকে প্রশ্রয় দেবে না। ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে বহুজাতিক বাহিনী সকল সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

২. সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে মার্কিন প্রশাসনের কাছে চিহ্নিত ইরাকের শাসক সাদ্দাম হোসেনকে বাগদাদ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর সাদ্দাম হোসেন বহুজাতিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং পড়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র সেখানে একটি অন্তর্বর্তী সরকারও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত কামনা ছিল। মার্কিন প্রশাসনের ধারণা ইরাক এখন থেকে আর মার্কিন প্রশাসনের স্বার্থবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না। ২০১১ সালের ৩১ আগস্ট ইরাক থেকে বহুজাতিক সকল সৈন্য প্রত্যাহার করা।

৩. পাকিস্তানে সন্ত্রাস নির্মূলে ন্যাটো বাহিনী ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এখনও (২০১৩)। এ হামলায় বহু সন্ত্রাসী নির্মূল হয়েছে এ পর্যন্ত। সেখান থেকে আল কায়েদা এবং ইসলামি জঙ্গিদের সম্পূর্ণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এ হামলা চালিয়ে যাবে ন্যাটো বাহিনী। আমেরিকার এ সামরিক অভিযানে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের অনেক আস্তানা গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানে আল-কায়েদা, হাক্কানি টেওয়ার্ক, হরকাতুল মুজাহেদিনসহ বিভিন্ন ইসলামিক সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে।

৪. বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করত তা এখন প্রকাশ্যে করছে না ফলে চেচনিয়াসহ কিছু কিছু এলাকায় সন্ত্রাসবাদ কিছুটা হলেও কমে গেছে।

৫. সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে যা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ভূমিকা রাখবে বলে মনে হচ্ছে।

৬. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ফলে বিশ্বের কোনো দেশ বা সংগঠন এখন আর প্রকাশ্যে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক বা সাহায্য সহযোগিতা করছে না, যা সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করেছে।

৭. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রভাব শ্রীলংকাতেও পড়েছিল ব্যাপকভাবে । গত ত্রিশ বছর স্বাধীনতাকামী এলটিটিই এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রভাবে শ্রীলংকাতে জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল। ২০০৯ সালে শ্রীলংকার সরকার এলটিটিই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে এতে এলটিটিই প্রধান প্রভাকরনসহ অনেক সদস্য নিহত হয়। এলটিটিই এর প্রধান ঘাটি জাফনা সরকারের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে ফলে শ্রীলংকাতে এলটিটিইর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যায়।

৮. ভারতীয় সরকার কাশ্মিরে একদিকে সামরিক অভিযান অপরদিকে আলোচনার পথ খোলা রেখে কাশ্মিরের মুজাহেদিন গোষ্ঠীগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছিল। উপুর্যপরি তাদের উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত থাকার কারনে তারা সহিংসে পথ ছেড়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয়েছে।

৯. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রভাবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভারত-পাকিস্তান দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে পেরেছে। রুশ-মার্কিন সমঝোতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের উৎস চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ফলে সন্ত্রাসবাদীর অবস্থান যেখানেই হোক

তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে।

৬.১০ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ (Future of Anti-terrorism Activities)

১. আফগানিস্তানে হামলার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে বিশ্বের প্রায় সব প্রভাবশালী দেশ ছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছিল অর্থাৎ আল-কায়েদা নিধন ও বিন-লাদেনকে গ্রেফতার অথবা হত্যা। লাদেন হত্যায় সফল হলেও লাদেনকে হত্যার মাধ্যমে আল-কায়েদাসহ আরও জঙ্গিসংগঠনগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী এখন আল-কায়েদার সন্ত্রাসবাদ বীরদর্পে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২. বুশ প্রশাসনের ইরাকে নগ্ন হামলা যে একান্তই তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যই সংগঠিত হয়েছিল তা জাতিসংঘ অস্ত্রপরিদর্শক দলের এবং সদ্য প্রকাশিত মার্কিন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

৩. বুশ প্রশাসনের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নানা কারণে বিতর্কিত হয়েছে। বুশ নিজে এই যুদ্ধকে মুসলমানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ক্রুসেডের যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সাথে খ্রীস্টানদের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ একুশ শতকের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। যা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করবে।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান পরিষ্কার নয় কেননা ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালেই দেখা যাবে আজকে যারা সন্ত্রাসী বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম শত্রু তারাই একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রহেই এরা বেড়ে উঠেছে। এমনকি আজকের যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু যে লাদেন তিনি আফগান যুদ্ধের সময় সিআইকে সহযোগিতা করেছিল। আমেরিকা যে তালেবানের বিরুদ্ধে এত বড় যুদ্ধের মহড়া দিল এ তালেবানরা মূলত আমেরিকার অনুগ্রহ নিয়েই ক্ষমতায় এসেছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু সাদ্দামও ইরাক-ইরান যুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ছিল। তাই এখন বলা যায় যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ মূলত মার্কিন স্বার্থ বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ।

৫. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আফগানিস্তান ও ইরাকে ব্যাপক কর্মতৎপরতা দেখালেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বিঘ্নকারী, ফিলিস্তিনিদের অধিকার হরনকারী ইসরাইলের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৬. আফগানিস্থানে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার চিরশত্রু রাশিয়া, ভারত, জার্মানি, চীন সহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সমর্থন পেলেও ইরাকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থনতো দেয় নি বরং যুদ্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেছে।

৭. বিগত দিনের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের রূপরেখা থেকে দেখা যায় যে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের একপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপর পক্ষে মার্কিন স্বার্থবিরোধী পক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ পরিস্থিতি যে কোনো দেশের বিরুদ্ধে বা সংগঠনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযান পরিচালনা করতে পারে। এতে করে সে বিশ্ব জনমত বা জাতিসংঘের অনুমোদন নেবার প্রয়োজন মনে করবে না।

৮. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ধারণা বিশ্বব্যাপী একেক দেশের কাছে এখন একেক রকম। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের একটি সর্বজনগ্রহণীয় সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে এবং তাতে অবশ্যই বিশ্বজনমত ও জাতিসংঘের অনুমোদন থাকতে হবেনা হলে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হবার আশংকা রয়েছে।

৯. তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেছেন, (জুন ২০০৪) বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূল করতে গিয়ে সন্ত্রাস আরও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর এই উক্তি থেকেই অনুমান করা যায় যে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এখনও সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারে নি। ভবিষ্যতে সফলতা অর্জন করতে হলে অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. বর্তমানে বিশ্বে কোনটি বহুল আলোচিত বিষয়?
উত্তর: সন্ত্রাসবাদ।

২. বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের ধারনার আওতাভূক্ত হয় না?
উত্তর: রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত।

৩. সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সন্ধান মেলে কত শতাব্দীতে ?
উত্তর: খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে।

৪. ২০০১ সালে ১১-ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ডাক দেয় কোন দেশ?
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৫. বিশ্বের সবচাইতে আলোচিত, সমালোচিত-
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে তবে-
উত্তর: ফিলিস্তিনী।

৭. কে তামিলদের সন্ত্রাসের স্বীকার হয়ে নিহত হন?
উত্তর: ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

৮. ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ কতটি রাষ্ট্রকে কালো তালিকাভূক্ত করেছে?
উত্তর: ২৪টি।

৯. পাকিস্তানের জঙ্গী সংগঠনের হাক্কানি নেটওয়ার্কে জাতিসংঘের কালো তালিকাভূক্ত ঘোষনা করা হয় কবে?
উত্তর: ৫ নভেম্বর, ২০১২।

১০. সন্ত্রাসবিরোধীদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযানের অংশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত সালে আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনা করে?
উত্তর: ২০০১ সালে।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. সন্ত্রাসবাদ কি?
খ সন্ত্রাসী সংগঠন গুলো বর্ণনা কর?

২. ক. আমেরিকা হল বড় সন্ত্রাস ব্যাখ্যা কর?
খ. ওসামা বিন লাদেন এর পরিচয় দাও?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

খ-বিভাগ (Part-B)

১. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন ?

২. বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের বিবরণ আলোচনা করুন ?

৩. সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাফল্য/ব্যর্থতা আলোচনা করুন ?

অধ্যায় ৭

জাতীয়তাবাদ

Nationalism

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৭.১ ভূমিকা
৭.২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা
৭.৩ জাতীয়তাবাদের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য
৭.৪ জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ/সভ্যতা

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

আন্তর্জাতিক রাজনীতি পাঠে জাতীয়তাবাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিও সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কোনো প্রাসাদে প্রবেশ করতে হলে যেমন প্রধান ফটক অতিক্রম করতে হয়, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা আবশ্যক। জাতীয়তাবাদ এক ধরণের ঐক্যবদ্ধতা। এ ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে নিহিত থাকে এক ধরনের চেতনা বা মূল্যবোধ। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ এমন একটি চেতনা, যার মূলে রয়েছে মানুষের ভিতরকার প্রবৃত্তিসমূহ। মানুষের ভিতরকার এ প্রবৃত্তিসমূহ নানা সময় নানা মাত্রায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ কারণে একেক সময় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ হয় একেক রকমের। জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিব্রু ও গ্রিক সভ্যতায় ১ম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। কারণ তারা সভ্যতা গড়ে তুলতে পারায় নিজেদের পৃথক এবং শ্রেষ্ঠ ভাবত। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। আধুনিক ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ধরে নেওয়া হয় উপনিবেশবাদের মাধ্যমে। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা এবং ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসার নৌপথ আবিষ্কার করেন। অতঃপর আবিষ্কৃত এই ভূ-খণ্ডে ইউরোপ থেকে এসে বসবাস শুরু করে। এই বসবাস করার প্রক্রিয়াকে উপনিবেশবাদ বলে। এই উপনিবেশবাদই হলো আধুনিক ইতিহাসের জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর উপনিবেশগুলোকে নতুন মাত্রায় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপনিবেশের পরবর্তী স্তর সাম্রাজ্যবাদ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের পর তাদের শিল্পের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাজার সৃষ্টি করার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে, শুরু হয় নব্য উপনিবেশবাদ। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ হলো-নব্য উপনিবেশিকতাবাদ। উল্লেখ্য যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া হলেও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (IBRD এবং IMF) শৃঙ্খলিত করে রাখার সুযোগ গ্রহণ করে। এভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখার প্রক্রিয়াকে নব্য উপনিবেশবাদ বলে। জাতীয়তাবাদের প্রকাশ নানা রকম হলেও জাতীয়তাবাদ গঠনের উপাদানগুলো প্রায় সকল ক্ষেত্রে একই রকম। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ধ্বংসাত্মক বাস্তবতারও জন্ম দিয়েছে যা আবার নতুন করে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কার্লটন

জে.এইচ.হেজ এর মতে, সাম্প্রতিককালে বিশ্বের সভ্য মানুষের চিন্তায় ও কাজে জাতীয়তাবাদ এমন এক সর্বজনীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ জাতীয়তবাদকে বর্তমানে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। জাতীয়বাদ কখনো ধর্ম ও নীতিবোধের সীমানাকে অতিক্রম করতেও সাহস পায়। জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময় ও কালে আবির্ভাব হয়। জাতীয়তাবাদ কোনো সময় স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রতীক। জাতীয়তাবাদের আশীর্বাদে এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত মানুষ তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয়তাবাদ কখনো উগ্ররূপ পরিগ্রহ করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি করতে ইন্ধন যোগায়, সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হয়। জাতীয়তাবাদ সর্বপ্রথম ঐক্য ও শান্তির অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়। কালক্রমে তা বিকশিত হতে হতে স্বার্থবাদীদের সংকীর্ণ স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হয়। তাই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি থাকা খুবই স্বাভাবিক।

৭.২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা (Definition of Nationalism)

জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক ধারণা। এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো লেখক জাতীয়তাবাদকে একটি আবেগময় অনুভূতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐ অনুভূতিই কোনো মানবগোষ্ঠীকে তার অবস্থান, আচার-আচরণের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পার্থক্যকরণের পথ প্রশস্ত করে।

হ্যান্স কোঁ (Hans Kohn)- এর মতে, "জাতীয়তাবাদ প্রথম ও সর্বাগ্রে এক মানসিক অবস্থা, এক বিশেষ চেতনামূলক সৃষ্টিস্বরূপ।"

কার্লটন জে. এইচ. হেজ- এর মতে, "জাতীয়তাবাদ হলো জাতীয় জনসমাজ ও দেশপ্রেম নামে দুটি প্রাচীনতম উপাদানের আবেগ জড়িত সমন্বয় ও অতিরঞ্জন।" জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে এক আবেগ, অনুভূতি, মনোবৃত্তি, প্রত্যাশা, সহানুভূতি, ঘৃণা ও একাত্মতার মানসিকতা পরিস্ফুটিত হয়।

লাস্কির মতে, "জাতীয়তাবাদ প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিজ বাসভূমি, নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য, অন্যের সঙ্গে পার্থক্য ও বংশগত বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।" জাতীয়বাদ এমন এক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করে যার কারণে একটি জাতীয় জনসমাজ অন্য এক জনসমাজ থেকে নিজেদেরকে পৃথক হিসেবে ভাবতে শিখে।

আরনল্ড জে, টয়েনবি এর মতে, "জাতীয়তাবাদ কোনোরূপ বস্তুগত বা যান্ত্রিক কিছু নয়, বরং তা জীবন্ত মানুষের এক আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি।"

অরগানসরিক মতে, "জাতীয়তাবাদ হলো এক ধরনের অতি শক্তিমান অনুভূতি, যার মাধ্যমে কোনো জাতি এবং তার জীবনযাত্রায় ভিত্তিরূপে পরিগণিত যৌথ মানবগোষ্ঠী তার অবস্থান এবং আচার আচরণের সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তির শনাক্তকরণের পথ প্রশস্ত করে।"

ফরাসি চিন্তাবিদ রেনান বলেন, "জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক সত্তা এবং এটি এক প্রকার সজীব মানসিকতা।"

অধ্যাপক লাস্কির মতে, "জাতীয়তাবাদ সাধারণভাবে মানসিকতার ব্যাপার।

প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন বলেন, "জাতীয়তাবাদ দুটি উপাদানের সংমিশ্রণবিশেষ। একটি জাতীয়তার ধারণা সম্পর্কিত আদর্শবাদ, আর অন্যটি জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ আদর্শবাদকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপদান।"

সুতরাং বলা যায়, জাতীয়তাবাদ মূলত এক বিশেষ ধরনের চেতনা। এর মূল উৎস মানুষের প্রগাঢ়তম মানসিক প্রবৃত্তি। জাতীয় জনসমাজ রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। নিজেদের মধ্যে একাত্মবোধ ও অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদের জয়গানে মুখরিত। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ একই সূত্রে গাঁথা।

৭.৩ জাতীয়তাবাদের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য (Elements or characteristics of Nationalism)

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক একাত্মবোধ। জাতীয়তা গঠনের জন্য কোনো জনসমষ্টিকে নিজেদেরকে এক মনে করাই যথেষ্ট। যে সমস্ত উপাদান বা বৈশিষ্ট্য কোনো জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে বা অনুপ্রেরণা জোগায় সেগুলোকে জাতীয়তাবাদের উপাদান বলা হয়। তবে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির জন্য এ সমস্ত উপাদানের সামগ্রিক উপস্থিতি অপরিহার্য নয়।

ক্ষেত্রবিশেষে কোনো উপাদান উপস্থিত থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। নিম্নে উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **বংশগত ঐক্য :** উদ্ভবগত বা বংশগত ঐক্য জাতীয়তাবাদের একটি প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তবে বর্তমানে এ ধারনাকে অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কারণ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সকল দেশের মানুষের উদ্ভব একই গোষ্ঠী থেকে হয় নি বা সভ্যতার কোনো এক পর্যায়ে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এর বিশুদ্ধতা হারিয়ে গেছে। ফলে জার্মান, ইংরেজ একই ধারায় উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও একই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি। তবে বংশগত চেতনা সুদীর্ঘকালের জাতীয়তার বোধকে যে সুদৃঢ় করে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

২. **ভাষাগত ঐক্য :** ভাষা হচ্ছে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। একই ভাষাভাষী ও ভাষার মাধ্যমে সৃষ্ট সাহিত্য পাঠকারী একটি জনসমষ্টির মধ্যে খুব সহজেই একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। ভাষার ব্যবধান মানসিক ব্যবধান তৈরি করে। ভাষার অভিন্নতা মানসিক সান্নিধ্যতার সহায়ক। ভাষাগত ঐক্যও জাতীয়তার জন্য অপরিহার্য শর্ত নয়। একই ভাষায় পৃথক জাতি হতে পারে আবার বিভিন্ন ভাষাভাষীরাও এক জাতি হতে পারে। ইংরেজ, আমেরিকান দুটি জাতি কিন্তু ভাষা এক। অন্যদিকে, সুইজারল্যান্ডের লোকেরা তিন ভাষায়, বেলজিয়ামবাসীরা দুই ভাষায়, চীনারা বহু ভাষায়, আর ভারতীয়রা নানান ভাষার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা একই জাতীয়তার অধীন। আরবরা একই ভাষার হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত রয়েছে। আবার ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। যেমন, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তার সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

৩. **ধর্মীয় ঐক্যবোধ :** জাতীয়তাবাদ প্রকাশের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধর্ম মানুষকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। একই ধর্মানুযায়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতি সহজেই ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। ইহুদি ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। ধর্মীয় কারণেই ইহুদি ও মুসলিমরা পরস্পর বিভক্ত। ইসরাইল ও ফিলিস্তিন সংকটের এটাই মূল কারণ। ধর্মীয় যুক্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আধুনিক যুগে ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হচ্ছে বলা যায়। বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠী একই জাতীয়তার ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জাতীয়তা ভারতীয় ও বাংলাদেশি। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠী একই ধর্মানুসারী হয়েও বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। এক কথায় সারা বিশ্বের মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ অথবা হিন্দু পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্য এক ধরনের জাতীয়তাবাদ।

৪. **ভৌগোলিক সান্নিধ্য :** জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে ভৌগোলিক ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ভৌগোলিক ঐক্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখার মাধ্যমে সুস্পষ্ট জাতি গঠনে যে কোনো জনসমষ্টিকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করার ফলে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহজেই ঐক্যভাব গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক সান্নিকট্যবর্তিতা সাধন ও সংস্কৃতিগত অভিন্নতা সৃষ্টির মাধ্যমে এক জাতীয় অনুভূতি গঠনে প্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মানসিক বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানে একই জাতীয়তা সংরক্ষণের পথে অন্যতম বাধা ছিল। জাতি গঠনে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক ঐক্যের অভাবে জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।

৫. **কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত ঐক্য :** জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হচ্ছে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত একাত্মবোধ। একই ইতিহাস, সভ্যতা, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, জয় পরাজয়, আনন্দ ও দুঃখের স্মৃতি একটি জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে পৃথক ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশি জাতীয়তার পেছনে এ উপাদানটি খুবই সক্রিয় ছিল। ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমেরিকানদের অন্তরে চির জাগ্রত থাকবে। যার কারণে অনেকগুলো রাজ্য সমন্বয়ে আমেরিকানরা একটি জাতি।

৬. **একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য :** দীর্ঘকাল যাবৎ একই শাসনতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস

করার ফলে অথবা একই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করার মানসে একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে জাতীয়তার ভাব উদিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীন সুদীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করার কারণে বিভিন্ন ভাষা ও বংশের লোক একত্রিত হয়ে আমেরিকান জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তা গঠনের অন্যতম কারণ ছিল একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করা। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থার সমতা জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত করে। আবার একই ভূখণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অংশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সমানতালে না হলে অনৈক্য দেখা দেয় এবং এতে করে জাতীয়তাবাদের চেতনায় ফাটল ধরে।

মনে রাখার Technique & Tips

জাতীয়তাবাদের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য
- বংশগত ঐক্য
- ভাষাগত ঐক্য
- ধর্মীয় ঐক্যবোধ
- ভৌগোলিক সান্নিধ্য
- কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত ঐক্য
- একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য
- ঐক্যবোধ
- বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদ
- আদর্শিক ঐক্য

জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ/সভ্যতা
- সাম্রাজ্যবাদের জন্মদান
- সভ্যতার প্রতি হুমকি
- আন্তর্জাতিক পরিপন্থী
- গণতন্ত্র বিরোধী
- বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি বিরোধী
- বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থি
- অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অকল্যাণকর
- সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ করে
- সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের উদ্রেক।

৭. **ঐক্যবোধ :** উপরিউক্ত উপাদান বা বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করে সহজেই বোঝা যায় যে, জাতীয়তা গঠনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট উপাদানই অপরিহার্য নয়। একাত্মবোধ বা ঐক্যবোধই হচ্ছে জাতীয়তার মূল উপাদান। জাতি গঠনের জন্য জনগোষ্ঠীর ঐক্যবোধ অপরিহার্য। ঐক্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের আবেগ বা ভাবানুভূতি মাত্র। জাতীয়তা হচ্ছে সেরূপ মানসিক ঐক্যবোধ, যে ঐক্যবোধ একটি জনসমষ্টিকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। লাস্কির ভাষায়, "জাতীয়তা বলতে একটি জাতির লোকদের মধ্যে এরূপ বিশেষ ঐক্য বোঝায় যা তাদেরকে মানবজাতির অন্য সকল দল থেকে আলাদা করে দেয়।"

৮. **বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদ :** গোত্র সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঐক্য বা জাতীয়তাবোধ জন্ম নিয়েছে তা পর্যায়ক্রমে এবং বিবর্তনের ধারায় বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। একটি দেশের জাতীয়তাবাদ এখন আর পৃথক কোনো জাতীয়তাবাদ নয় বরং বিশ্ব জাতীয়তাবাদের একটি অংশ। একারণে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়তা করে ১৯১৪-১৮ পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যবস্থা বা লীগ অব নেশন্স। এ ব্যবস্থা খুব একটা কার্যকর না হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধের ফল হিসেবে গড়ে ওঠা UNO বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদকে অনেকাংশেই কার্যকর করতে সহজ হয়েছে। বিশ্বের মানুষের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে UNO নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছে।

৯. **আদর্শিক ঐক্য :** জাতীয়তাবাদের আরো একটি কার্যকর উপাদান হলো আদর্শ। এ আদর্শিক জাতীয়তাবোধের জন্ম হয় রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ফলে। একসময় এ আদর্শিক দ্বন্দ্ব পরস্পরবিরোধী শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে NATO সামরিক জোট গঠন করে নিজেদের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে Warshaw নামের সামরিক জোট তাদের নিরাপত্তার জন্য গড়ে ওঠে। এভাবে আদর্শিকভাবে পৃথক পৃথক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। অবশ্য স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের মাধ্যমে আদর্শিক জাতীয়তাবাদের আপাত অবসান হয়েছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

জাতীয়তাবাদের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা গেলেও জাতীয়তাবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের অহংকারবোধ ক্রিয়াশীল থাকে। এ অহংকারবোধের প্রকাশ সর্বদাই নমনীয় থাকে এমনটি নয়। কখনো কখনো এর ধ্বংসাত্মক রূপও দেখা যায়। যেমন-১৯১৪ সালে বসনিয়া হার্জেগোভিনাকে নিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয় তার পেছনে মূল কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল বসনিয়া হার্জেগোভিনাকে দখল করা নিয়ে হাঙ্গেরি ও সার্বিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব। যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি, তুরস্ক এবং বুলগেরিয়া চলে যায় অস্ট্রো হাঙ্গেরির পক্ষে এবং রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন চলে যায় সার্বিয়ার পক্ষে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুদ্ধ হলেও এই যুদ্ধটাই প্রথম বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা ধারণার জন্ম দেয়। এ যুদ্ধের সময় ৮ জানুয়ারি ১৯১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তির নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার ১৪ দফা ঘোষণা করেন। ১১ নভেম্বর ১৯১৮, জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে মিত্র ও সহযোগী শক্তির জাতিগুলো প্যারিসে একটি শান্তির সম্মেলনে মিলিত হয়। এখানেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের নামকরণ করেন "লীগ অব নেশনস"। এপ্রিল ১৯১৯ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এটি গঠিত হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

৭.৪ জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ/সভ্যতা

Nationalism VS Internationalism or Civilization.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তাবাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে এর সম্পর্কে খুবই ঘনিষ্ঠ। জাতীয়তাবাদের ধারণা ও বাস্তবতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে বলা যায়। জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে কখনো কল্যাণকর কখনো ভীতিপূর্ণ অকল্যাণকর হিসেবে আবির্ভূত হয়। জাতীয়তাবাদ কোথাও মানবসভ্যতাকে করেছে কলঙ্কিত, আবার কোথাও জাতীয়তাবাদের আশীর্বাদে মানবজাতি হয়েছে গৌরবান্বিত। তাই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সর্বদাই রয়েছেন দ্বিধাবিভক্ত। জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী? জাতীয়তাবাদ কি মানবসভ্যতার প্রতি হুমকিস্বরূপ? নাকি জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের সহায়ক, বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত? এরূপ দ্বন্দ্বের কারণ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের ভিন্নরূপের ফল। জাতীয়তাবাদের পরস্পরবিরোধী দুটি রূপ রয়েছে। একটি হচ্ছে তার ভয়ঙ্কর বা উগ্ররূপ, আর আরেকটি হচ্ছে তার কল্যাণকর বা গঠনমূলক রূপ। বিংশ শতাব্দীতে হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো, তেজো, ল্যাটিন আমেরিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশের স্বৈরাচারী ও আগ্রাসী শাসককুল বিকৃত জাতীয়তাবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগ্রাসন, সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ কল্যাণকামী গঠনমূলক শক্তির ভূমিকা পালন করে চলছে। যার কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

যারা জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতা ও সভ্যতার হুমকি হিসেবে মনে করেন তাদের জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তব্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **সাম্রাজ্যবাদের জন্মদান** : জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্মদান করে। জাতীয়তাবাদের উগ্র চেতনা বিকাশের কারণে পৃথিবীর অনেক জাতি নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে নানা কারণে মনে করে থাকে। এমনকি তারা নিজেদেরকে কর্তা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রেরিতও মনে করে থাকে। এর ফলে তাদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, তাদের অধিকার রয়েছে পৃথিবীর অন্য জাতিসমূহের ওপর কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব কায়েম করার। এরূপ সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাচেতনা উগ্র জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। জার্মান জাতি এর নগ্ন উদাহরণ। জার্মানদের এরকম মানসিকতা থেকে জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ।

২. **সভ্যতার প্রতি হুমকি** : জাতীয়তাবাদ সভ্যতার প্রতি এক হুমকিস্বরূপ। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা হচ্ছে সভ্যতার সোপান। জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিজেকে বড় করে দেখে ও অন্যকে ছোট মনে করে। এরূপ মানসিকতা এক প্রকার গর্ববোধ ও অহমিকার জন্ম দেয়। জাতীয়তার বিকৃতি ঘটে। বিভিন্ন জাতির মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতা বিকাশে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয়তাবাদকে সভ্যতার হুমকি হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন।

৩. **আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী** : জাতীয়তা অবশ্যই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী। সংকীর্ণ জাতীয় মনোভাব আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে বাধা দেয়। জাতীয় স্বার্থকে সবসময় বড় করে দেখলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কখনো উন্নতি ঘটবে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে সময় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। জাতীয়তাবাদ অন্যের স্বার্থকে বিবেচনা করে না। সবসময় নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখে।

৪. **গণতন্ত্রবিরোধী** : জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক ভাবধারা, চিন্তাচেতনা ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গণতন্ত্র সহনশীলতায় বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদ পরমসহিষ্ণু নয়। জাতীয়তাবাদ হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদের জন্ম দেয়। গণতান্ত্রিক সহমর্মিতা জাতীয়তাবাদে অনুপস্থিত।

৫. **বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি বিরোধী** : বর্তমান বিশ্বে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ঢেউ লেগেছে। জাতীয়তাবাদ এ জাগরণের পথে বিরাট বাধা। জাতীয়তাবাদের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এশিয়া ও ইউরোপের জাতিসমূহের স্বাধীনতা হরণের ও অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস।

৬. **বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী** : জাতীয়তাবাদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অন্যতম অন্তরায়স্বরূপ। উগ্র জাতীয়তাবাদ জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার বিরোধী। সম্মিলিত জাতিসংঘ জাতীয়তাবাদীদের চক্ষুশূল। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উগ্র জাতীয়তাবাদ যুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। সংঘর্ষের মাধ্যমে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ও অরাজকতা বৃদ্ধি পায়। তাই বিশ্ব শান্তিরক্ষায় জাতীয়তাবাদ কখনও আশীর্বাদ হতে পারেনা।

৭. **অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অকল্যাণকর** : জাতীয়তাবাদ শুধু বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব সভ্যতার আলোকে অকল্যাণকর নয়, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ক্ষতিকর। জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি তীব্র হয়ে উঠলে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ বন্ধ হয়ে যায়। জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার একেবারে বিনষ্ট হয়।

৮. **সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ করে** : জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের সুযোগ না থাকলে সাংস্কৃতিক উন্নতি হতে পারে না।

৯. **সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের উদ্রেক** : জাতীয়তাবাদের উপস্থিতির কারণে জাতিতে জাতিতে সন্দেহ, বিভেদ ও দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেক জাতি অন্য জাতিকে সবসময় সন্দেহের নজরে দেখে। এ ধরনের পারস্পরিক সন্দেহ থেকেই কলহ-বিবাদের উৎপত্তি হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে গড়ায়। জাতিগত নিরাপত্তা রক্ষায় রাষ্ট্রসমূহ অস্ত্র উৎপাদন, ক্রয় ও সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে চলে। এর কারণে জাতীয়তাবাদকে অনেকে দুষ্টশক্তি বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন।

মূল্যায়ন (Evaluation)

জাতীয়তাবাদ বিংশ শতাব্দীতে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী রাজনীতির বাহকগণ জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থ, অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ মনোভাব সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করেছে। এরূপ বিকৃত উগ্র জাতীয়তাবাদের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতা ও নব্য ঔপনিবেশিকতার জন্ম হয়েছে। এরূপ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কল্যাণকর জাতীয়তাবাদের বা কাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কল্যাণকামী জাতীয়তাবাদ সকল প্রকার গোঁড়ামি, অন্ধ জাতিবিদ্বেষ, অহমিকা, পররাষ্ট্র গ্রাস ও লুণ্ঠন, সর্বপ্রকার আগ্রাসী তৎপরতা, যুদ্ধ, অন্য জাতির ওপর আধিপত্য করার প্রয়াস ইত্যাদির ঘোরবিরোধী। কল্যাণকর জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী, নয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্য ও চক্রান্তের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আত্মনির্ভরশীল জাতীয় রাষ্ট্র, জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, বহুত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সকল জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস। এরূপ জাতীয়তাবাদ বিশ্বসভ্যতা ও আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হওয়া তো দূরের কথা, বরং বিশ্ব শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার দিশারী বা পথ প্রদর্শকস্বরূপ। জাতীয়তার কল্যাণকর পথে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হোক এটা সকলেরই কাম্য।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

০১. স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রতীক কোনটি ?
উত্তরঃ জাতীয়তাবাদ।

০২. কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত মানুষ স্বাধীনতা লাভ করেছে ?
উত্তরঃ জাতীয়তাবাদ।

০৩. জাতীয়তাবাদ সর্বপ্রথম কী হিসেবে আবির্ভূত হয় ?
উত্তরঃ ঐক্য এবং শান্তির অগ্রদূত হিসেবে।

০৪. জাতীয়তাবাদ কখন সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হয় ?
উত্তরঃ জাতীয়তাবাদ যখন স্বার্থবাদীদের সংকীর্ণ স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়।

০৫. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মানুষের কেমন অনুভূতি রয়েছে?
উত্তরঃ মিশ্র অনুভূতি।

০৬. জাতয়িতাবাদ কেমন ধারণা ?
উত্তরঃ মানসিক ধারণা।

০৭. জাতীয়তাবাদ কী ?
উত্তরঃ জাতীয়তাবাদ একটি আবেগময় অনুভূতি যে অনুভূতি কোন মানবগোষ্ঠীকে তার অবস্থান, আচার-আচরণের সাথে অন্য মানবগোষ্ঠীর পার্থক্যকরণের পথ প্রশস্ত করে।

০৮. "জাতীয়তাবাদ সাধারণভাবে মানসিক ব্যাপার"-উক্তিটি কার?
উত্তরঃ উক্তিটি অধ্যাপক লাস্কির।

০৯. জাতীয়তাবাদ কখন গঠিত হয় ?
উত্তরঃ যখন কোন জনসমষ্টি নিজেদেরকে এক মনে করে।

১০. বংশগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছে এমন দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তরঃ ক. ইংরেজ ও খ. জার্মান।

১১. বংশগত ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এমন রাষ্ট্রের উদাহরণ দাও।
উত্তরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত।

১২. জাতীয়তাবাদের জনক কে ?
উত্তরঃ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।

১৩. জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ কোথায় ঘটে ?
উত্তরঃ ইউরোপে।

১৪. কোন শতকে জাতীয়তাবাদী বাবধারার উন্মেষ ঘটে?
উত্তরঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে।

১৫. জাতিকে 'Spiritual organism' বলে বর্ণনা করেছেন কে?
উত্তরঃ জার্মান দার্শনিক হেগেল।

১৬. 'The idea of nationality is essentially spiritual is character.'-উক্তিটি কে করেছেন ?

উত্তরঃ অধ্যাপক গেটেল।

১৭. জাতীয়তাবাদকে জাতির "Mystique quality"-বলে কে আখ্যায়িত করেছেন ?
উত্তরঃ প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন।

১৮. জাতীয়তাবাদের প্রতীকসমূহ কী কী ?
উত্তরঃ বীর ও বিখ্যাত ব্যক্তি, জাতীয় পতাকা, শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত।

১৯. ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর পতনে কোনটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে ?
উত্তরঃ জাতীয়তাবাদ।

২০. বিশ্ব রাজনীতির উপর জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া কয়ভাবে প্রকাশিত হয় ?
উত্তরঃ ২ভাবে। ক. ইতিবাচক ও খ. নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

২১. জাতীয়তাবাদের কয়েকটি ইতিবাচক দিক লিখ।
উত্তরঃ ক. দেশপ্রেম জাগ্রত করে, খ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, গ. বিশ্ব সভ্যতার সমৃদ্ধি সাধন ও ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

২২. জাতীয়তাবাদের কয়েকটি নেতিবাচক দিক লেখ।
উত্তরঃ ক. সার্বভৌমত্ব ও শান্তির পথে বাধা, খ. সাম্রাজ্যবাদের জন্মদান, গ. অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঘ. বিশ্বয়নের পরিপন্থী।

২৩. বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন উগ্রজাতীয়তাবাদী নেতার নাম লিখ।
উত্তরঃ হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো, তেজো।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১। (ক) জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দাও।
(খ) জাতীয়তার উপাদান কী কী?

২। (ক) আন্তর্জাতিকতাবাদ কী ?
(খ) জাতীয়তাবাদ কী আন্তর্জাতিকতার প্রতি হুমকি ?

৩। (ক) জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য কী ?
(খ) বিশ্ব রাজনীতির উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব কী ধরণের ?

http://thejobstudy.com Go to Contents

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বুঝেন? জাতীয়তাবাদ গঠনে যে সকল উপাদান ক্রিয়াশীল তা আলোচনা করুন?

২. জাতীয়তাবাদের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন। জাতীয়তাবাদ কি সভ্যতার পতে হুমকি? আপনার যুক্তি দিন।

৩. দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ ধারণা এবং এদের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী? আপনার যুক্তি দিন।

৪. জাতীয়তাবাদ কী? জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমধারা আলোচনা করুন।

৫. আপনি কি মনে করেন জাতিয়তাবাদ আধুনিক সভ্যতার প্রতি হুমকিস্বরূপ? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন?

অধ্যায় ৮

সাম্রাজ্যবাদ
Imperialism

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৮.১ ভূমিকা
৮.২ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা
৮.৩ সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ
৮.৮ সাম্রাজ্যবাদের স্তর
৮.৫ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ
৮.৬ ডলার সাম্রাজ্যবাদ
৮.৭ সাম্রাজ্যবাদের কি অবসান হয়েছে

৮.১ ভূমিকা (Introduction)

'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি কোনো নতুন ধারণা নয়। Imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পরিচয় হলো "Imperialism" যার অর্থ হলো সামরিক কর্তৃত্ব বা শক্তির কর্তৃত্ব। পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হওয়ায় এর অর্থ শুধু সামরিক কর্তৃত্বে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার পরিবর্তন। আক্ষরিক অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বেড়ে উঠেছে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োগিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়াই সাম্রাজ্যবাদের নতুন শঙ্কা তৈরি হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ হলো অন্যের ভূখন্ড বা অঞ্চল দখল করে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করা। আধুনিক ইতিহাসে তাকে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয় এ ধারণা বাস্তবে অনেক পুরনো। যেমন : খ্রিস্টপূর্ব (অব্দ) ৬৩-তে রোম সম্রাট অগাস্টাস সিজার পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইন অঞ্চল দখল করে নেয়। ৪র্থ শতাব্দীতে রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইন বাইজান্টাইন সভ্যতাকে দখল করে নিয়ে এর নামকরণ করেন কনস্ট্যান্টিনেপল। ১৫ শতকে অটোম্যান তুর্কি সুলতান মোহাম্মদ এ জায়গা দখল করেন এবং নাম দেন ইস্তাম্বুল। কনস্ট্যান্টিনেপল দখল হওয়ায় ইউরোপীয়রা নিজ নিজ দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। অতঃপর ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতে আসার নৌপথ আবিষ্কারের মানসিকতা জেগে ওঠে। ১৪৯২ সালে ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের রানি ইসাবেলার অনুরোধে "সান্টা মারিয়া"জাহাজ নিয়ে ভারতে আসার নৌপথ আবিষ্কারের জন্য রওনা দেন। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে ভারত আবিষ্কার হলে প্রমাণ হলো কলম্বাস ওয়েস্টইন্ডিজ আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের স্তর ধরে নেওয়া হয় ১৪৯২ সালে

আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে । সাম্রাজ্যবাদের ধারণা বিরামহীনভাবে চলছে। এরপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে সাম্রাজ্যবাদে (Imperiaism) কথাটি নতুন রূপ লাভ করতে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতিকে বোঝানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদ কথাটি অত্যন্ত নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কালের পরিক্রমায় সাম্রাজ্যবাদ কথাটি ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

৮.২ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা (Definition of Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদ একটি বহু নিন্দিত ও বিকৃত ধারণা হলেও এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা মোটেই সহজ নয়। কারণ এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো মতৈক্য নেই। প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও বিরোধীগণ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারও কারও মতে, "সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সেই নীতি যার লক্ষ্য সাম্রাজ্য স্থাপন, এর উপযোগী সংস্থা গড়ে তোলা ও তা সংরক্ষণের নীতি অবলম্বন করা।" কারও মতে, "সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ওপর ইউরোপীয় জাতিদের প্রভুত্ব কায়েম করার কৌশল।"

মরগ্যানথু বলেন, "কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ সীমানার বাইরে অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।"

জুলিয়াস বন- এর মতে, "সাম্রাজ্যবাদ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার প্রধান লক্ষ্য হলো সাম্রাজ্য গঠন, সংরক্ষণ ও তাকে সংগঠিত করা।"

চার্লস হজেজ এর মতে, "সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি দেশ কর্তৃক অন্য কোনো দেশের ওপর প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, প্রত্যেক্ষ কিংবা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।"

অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যের নীতি বা চেতনা বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল শক্তি যোগায়।"

সি. ডি. বার্নস- এর মতে, "সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ওপর আরোপিত একই ধরনের আইন ও শাসনব্যবস্থা।"

এইচ. জি. ওয়েলস বলেন,"সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি সচেতন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা।"

স্যুম্যান- এর মতে, "একটি দেশের জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ ও হিংসার মাধ্যমে বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাই হলো সাম্রাজ্যবাদ।"

চার্লস বেয়ার্ড বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ হলো কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করা এবং দাখিলকৃত ভূখণ্ডের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা।"

ভি. আই. লেনিন- এর মতে, "পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্যই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। পুঁজিবাদের পতনোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান।"

হ্যানস ডালদার বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির মাধ্যমে কয়েকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য কয়টি রাষ্ট্রের আগ্রাসী আচরণকে বোঝায়। সাধারণভাবে অধীনস্থ রাজনৈতিক সমাজের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে।' সাম্রাজ্যবাদ বলতে বুঝায় এক বিশাল আয়তনবিশিষ্ট রাষ্ট্র, যা কমবেশি নির্দিষ্ট জাতীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত এবং একটি কেন্দ্রীভূত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত।

কাল কাউৎস্কির- এর মতে, সাম্রাজ্যবাদ হলো অতি উচ্চ পর্যায়ের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের ফসল। সাম্রাজ্যবাদ দেশসমূহের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্বের অর্ধেক ভূখণ্ড এদের অধীন ছিল। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তর। আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রাণকেন্দ্র।

৮.৩ সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ভি.আই.লেনিন তাঁর পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। নিম্নে সাম্রাজ্যবাদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. **উদ্দেশ্যের প্রধান্য :** সাম্রাজ্যবাদ কখনো লক্ষ্যহীন নয়। সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত চতুর অভিসন্ধি। এর বিশেষ উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত স্থির ও সুস্পষ্ট। এর পেছনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে। অনেক সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশাই মুখ্য হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধিই মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. **সাম্রাজ্য বিস্তার :** সাম্রাজ্য বিস্তার বা প্রসার ঘটানো সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদ জোর করে অন্য রাজ্য করায়ত্ত করে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারেই সাম্রাজ্যবাদের আনন্দ ও তৃপ্তি। সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার ছোটও হতে পারে, বড়ও হতে পারে। সাম্রাজ্য বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য।

৩. **পুঁজিবাদের পূজারী :** সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের পূজারী ও দোসর সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের একচেটিয়া পর্যায়। মূলত ধনতন্ত্রের শেষ পর্যায় হলো সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ হলো একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে সমগ্র অর্থনীতি একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সাম্রাজ্যবাদ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

৪. **প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা :** সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। সাম্রাজ্যবাদে অন্য জাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের ওপর শাসন ও শোষণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদ অধিকৃত এলাকায় যে কোনো ধরনের স্টিমরোলার চালাতে দ্বিধাবোধ করে না।

৫. **সাংস্কৃতিক নির্যাতন :** সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি অধিকৃত এলাকার জনগণের ওপর সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চালায়। তারা বিভিন্ন কৌশলে সাংস্কৃতিক জীবনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ তাদের হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে প্রচেষ্টা চালায়। শাসনকৃত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে পারলে তাদের পক্ষে আনুগত্য আদায় সহজ হবে।

৬. **মৌলিক অধিকার বিনষ্ট করা :** সাম্রাজ্যবাদ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অধিকৃত এলাকার জনগণের রাজনৈতিক মৌলিক অধিকার হরণ করতে উদ্যত হয়। এর জন্য তারা বিভিন্ন নির্যাতন নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

৭. **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য :** সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। এর অন্যতম লক্ষ্য অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করা। সাম্রাজ্যবাদ আর্থিক মুনাফার পথ প্রশস্ত করে। সাম্রাজ্যবাদ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার।

৮. **সামরিক শক্তি প্রদর্শন :** সাম্রাজ্যবাদ সামরিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ। সামরিক শক্তিবলেই সাম্রাজ্য দখল করা হয় ও তা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। জনসমর্থনের অভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সামরিক শক্তির ওপরই নির্ভর করে চলতে হয়।

৯. **বৈষম্য সৃষ্টি :** সাম্রাজ্যবাদ অধিকৃত জনগণের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য তৈরি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে তারা একশ্রেণির সুবিধাভোগী তল্পিবাহককে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ সেগুলো হচ্ছে :

১. **উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ :** সাম্রাজ্যবাদে সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। রাষ্ট্রের পুঁজি কতিপয় শিল্প মালিকদের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে। পুঁজির কেন্দ্রীকরণ বিশ্ব বাজার নিয়ন্ত্রণের পথ খুঁজে।

২. **পুঁজি সমন্বয় :** সাম্রাজ্যবাদে পুঁজির আধিপত্য ও সমন্বয় সাধন হয়। ব্যাংক ও শিল্পপতিদের মিলন ঘটে। ফলে মহাজনী কারবার বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে মালিকানা দেশের বাইরে থাকে।

৩. **পুঁজি রপ্তানিকরণ :** সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুঁজি রপ্তানিকরণ। অধিকৃত এলাকায় তাদের পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি হয়, মূলধন গঠিত হয়। মূলধন বৃদ্ধি পেলে তা আবার পাচার করা হয় নিজ দেশে। ঔপনিবেশিক শাসনের এটাই চরিত্র ছিল।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৪. **পুঁজি বিনিয়োগে সমঝোতা :** সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার পথ অবলম্বন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে এক প্রকার ভাগ বাটোয়ারা চলে।

৫. **ভূখণ্ডের ভাগাভাগী :** সাম্রাজ্যবাদের আরেক বৈশিষ্ট্য সমগ্র বিশ্বের ভূখণ্ডকে তাদের মধ্যে ভাগাভাগী করে বণ্টন করে নেওয়া। প্রত্যেকে তার অধীনস্থ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেষ্ট হয়। লেলিন তাঁর মতবাদে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশে সাম্রাজ্যবাদের পতনের কথা উল্লেখ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বই সাম্রাজ্যবাদের পতন ডেকে আনবে। পুঁজি ও শ্রমের বিরোধে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মতে, সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের অবসানে সর্বহারাদেরই জয় হবে।

৮.৪ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়

Different strata or phases of Imperialism

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণে সাম্রাজ্যবাদের স্তরকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়-

প্রথম পর্যায় (১৪৯২-১৭৩৬)

১৪৯২ সালে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার এবং ১৭৩৬ বা ইউরোপের সপ্তদশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদকে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে প্রথম স্তর বলা হয়। এ সময়ের মধ্যে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব অর্থনীতিতে বণিক শ্রেণির প্রভাব সৃষ্টি খ্রিস্টান ধর্মে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট-এর উদ্ভব এবং খ্রিস্টান মিশনারির কর্মকাণ্ড ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ সময়ে যুদ্ধ- বিগ্রহসহ বিভিন্ন ব্যাপারে ইউরোপের কতিপয় রাষ্ট্র পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের বহু অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

দ্বিতীয় স্তর (১৭৩৬-১৮৭০)

এ সময়ের মধ্যে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়ে প্রসার লাভ করে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। এ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদকে প্রসারিত করতে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটিয়ে ছিল।

তৃতীয় স্তর (১৮৭০-১৯১৯)

এ সময়ে উৎপাদিত পণ্যের জন্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শক্তি সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে অবতীর্ণ হয়। প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন দখলের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

চতুর্থ পর্যায় (১৯১৯-১৯৪৪)

এ সময় একদিকে বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। যেমন জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া দখল করে নেয়। ইতালি আবিসিনিয়া, জার্মানি এবং চেকোশ্লাভাকিয়া, অস্ট্রিয়া দখল করে এ উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটায়। অবশ্য এর পেছনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সোভিয়েত বিরোধী নীতি একপর্যায়ে ভ্রান্তনীতি হিসেবে প্রামাণিত হয়। ফলে ১৯৩৯ সালে শুরু হয় আরো একটি যুদ্ধ।

পঞ্চম পর্ব (১৯৪৪-বর্তমান)

এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশের অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েত বিরোধী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ সাধনে ব্রত হয়। ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটেনউড শহরে বৈঠকের মাধ্যমে উপনিবেশ বিলোপ করে অর্থনৈতিক ভাবে প্রাক্তন উপনিবেশকে শৃঙ্খলিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থাকে বলা হয় নব্য উপনিবেশবাদ। এ ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে প্রথমে আইবিআরডি, আইএমএফ, গড়ে তোলা হয় এবং ১৯৪৭ সালে 'গ্যাট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ গ্যাট ১৯৯৫ সালে থেকে ডব্লিওটিও হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

সাম্রাজ্যবাদ বাস্তবে শোষণেরই একটি প্রক্রিয়া। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এর রূপ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো

তাদের সরাসরি শাসনের অবসান ঘটিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলোকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। এর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ৪র্থ স্তরের অবসান ঘটে এবং শুরু হয় ৫ম স্তর। ৫ম স্তরের সাম্রাজ্যবাদের ধারণা জন্ম নেয় ব্রেটেনউড্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। জুন ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটেন উড্স শহরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই সিদ্ধান্ত হয় যে, দরিদ্র জাতিগুলোর অর্থনীতির কাঠামোগত পুনর্গঠন করার জন্য একটি ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য ১টি মুদ্রা তহবিল গঠন করা। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯৪৫-এ IBRD এবং IMF গঠন করা হয়। শুরু হয় দরিদ্র জাতিগুলোকে ঋণ দেওয়া। ঋণ দিয়ে দরিদ্র জাতিগুলোকে বাস্তবে ঋণগ্রস্ত জাতিতে পরিণত করা হয়েছে। এভাবেই চলছে বর্তমান শিল্প সাম্রাজ্যবাদের শোষণের প্রক্রিয়া।

৮.৫ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ (Causes of origin and of imperialism)

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শক্তির আধিপত্য বিস্তারে সময় ও সুযোগের ফলই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। অনেকে এর উদ্ভবের পেছনে সভ্যতার প্রসারের যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুক্তিতে কোন দেশ কোনো দেশকে করায়ত্ত করবে তা কখনও মারা যায়না। বস্তুতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশে কতকগুলো বাস্তবসম্মত কারণ বিদ্যমান রয়েছে, যা সাম্রাজ্যবাদ বিকাশে সহায়তা করেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক স্বার্থ :** সাম্রাজ্যবাদ বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা, কাঁচামাল আমদানি, উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হয়। রোম, ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল অর্থনৈতিক স্বার্থেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে। মার্কসীয় পুঁজিবাদী যুক্তিকে অনেকেই সাম্রাজ্যবাদের মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে অন্যান্য উপাদান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের মুখ্য কারণ ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ।

২. **জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা :** সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পেছনে জাতিগত প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে অন্যদেরকে ছোট বা হীন মনে করে। তাদের ধারণা, অন্যদের শাসন বা পরিচালিত করার তাদের স্বাশ্বত অধিকার রয়েছে। আধিপত্যকে তারা কোনো রূপ অন্যায় মনে করে না, বরং তাদের অধীনে শান্তি হওয়ার মধ্যেই অন্যের গৌরব বলে তারা প্রচার করে। ইতালি ও জার্মানিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসোলিনি ও হিটলার এরূপ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পোষণ ও প্রচার করে। এটা উগ্র জাতীয়বাদেরই নামান্তর।

৩. **সভ্যতা বিকাশের ধারণা :** সাম্রাজ্যবাদকে অনেকে সভ্যতা বিকাশ বা বিস্তারের অনন্য উপায় বলে মনে করেন। সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে অনুন্নত অসভ্য দেশগুলোতে সভ্যতার উজ্জ্বল আলো পৌঁছে দেওয়া হয়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে অনুন্নত দেশে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। অসভ্য দেশে সভ্যতার আলো প্রবেশ করে। জনগণের মন মানসিকতা, জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত হয়। এ কারণেই কোনো কোনো কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদের জয়গানে মুখরিত হন। এতে সাম্রাজ্যবাদের অনুসারে সহায়তা হয়।

৪. **জাতীয়তাবাদের বিকৃত বা অকল্যাণমূলক রূপ :** সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের নেপথ্যে এক ধরনের বিকৃত বা অকল্যাণকর জাতীয়তাবোধ সক্রিয় ছিল। জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়েই পুঁজিবাদের ফসল। পুঁজিবাদী দেশ নিজেদের আর্থিক স্বার্থে বিকৃত জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটায়। নিজেকে শ্রেষ্ঠ, অন্যকে হেয়, অন্যের প্রতি ঘৃণা, অন্য জাতির ওপর আধিপত্যের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ, আত্মগরিমা, অহমিকা, অন্যকে শোষণ ও দমন করা ইত্যাদি অন্যায় অনুচিত মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপ নগ্ন জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। বিকৃত জাতীয়বাদই সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর হয়েছিল।

৫. **প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিধান :** সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনেক ক্ষেত্রে অধিকৃত দেশ থেকে অন্য দেশে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশ সুদূর ভূখণ্ডে আধিপত্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। নিরাপত্তা জোরদারের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়াগো গার্সিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, ইরাকসহ অনেক অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

৬. **উৎপাদিত পণ্যের বাজার সন্ধান :** সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাদের শিল্পজাত উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজারের সন্ধানে অনেক সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য হন্নে হয়ে ওঠে। পণ্যের নতুন বাজার পাওয়া না গেলে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রক্রিয়া ওঠে। পণ্যের নতুন বাজার পাওয়া না গেলে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। তাই নতুন বাজার সৃষ্টির জন্য চাই নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সাম্রাজ্য রক্ষায় অর্থনৈতিক স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড এভাবে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করায়ত্তগত ছিল।

৭. **অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তাকেও কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহে জনসংখ্যাধিক্য দেখা দিলে তা অন্য দেশে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্য ভূখণ্ডে দখল করে সেখানে জনসংখ্যার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে। এর ফলস্বরূপ অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। হিটলারও এরূপ তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করে। তবে এটি কখনও সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের একমাত্র কারণ নয়। ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি শক্তি জনসংখ্যাধিক্য না থাকাতে সাম্রাজ্য বিস্তারে আকুল হয়ে ওঠে।

৮. **ধর্ম প্রচার :** সাম্রাজ্য বিকাশে ধর্ম প্রচার অন্যতম কারণ ছিল বলে অনেকের অভিমত। পাশ্চাত্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, খ্রিস্টের বাণী দেশ দেশান্তরে পৌঁছে দেওয়া খ্রিস্টীয় ধর্মালম্বীদের অন্যতম কর্তব্য। এ লক্ষ্যে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধর্মীয় যাজকেরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন ভূখণ্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ধর্মের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী নীতিরও বিকাশ ঘটে। ধর্ম প্রচারের আড়ালে তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও লক্ষ্যকে সংরক্ষণ করার প্রয়াস চালান। আমেরিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের অনন্য অবদান রয়েছে। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভে মিশনারি দলসমূহ প্রথমে অবতীর্ণ করেছিল। বাণিজ্য ও বিদেশী শাসন তাদের অনুসরণ করে আগমন করে। পর্তুগাল ও স্পেনের শাসকেরা রাজ্য দখলেরর সাথে সাথে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন। এতে জনগণের মন জয় করা সহজ হয়। ধর্মান্তকরণ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মোক্ষম হাতিয়ার।

৯. **রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি :** সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের অন্যতম কারণ রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা। সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য দেশ দখলের সাথে সাথে সেখানে তাদের নিজ রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্য তারা প্রয়োজনে অধিকৃত দেশের জনগণের ওপর নানা প্রকার রাজনৈতিক নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হয়না। সাম্রাজ্য বিস্তারে সাম্রাজ্যবাদী দেশের আন্তর্জাতিক প্রভাব প্রতিপত্তি যে বৃদ্ধি পায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১০. **ক্ষমতা লিপ্সা ও আধিপত্য বিস্তারের অদম্য স্পৃহা :** সাম্রাজ্যবাদ বিকাশে অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা হরণের লিপ্সা ও আধিপত্য বিস্তারের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সাম্রাজ্যবাদ সবময় ক্ষমতা লিপ্সু হয়ে থাকে। পর দেশ ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই অতীতে যুদ্ধবিগ্রহ ও উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতালোভী ও আধিপত্যবাদী একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১১. **সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিতর্ক :** সাম্রাজ্যবাদ সমর্থকরা এর পক্ষে সুচতুর যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। তাঁদের মতে, পশ্চাৎপদ জনপদে সভ্যতার আলো পৌঁছানো শ্বেতকায় শ্রেষ্ঠ জাতির অন্যতম দায়িত্ব। বর্বরদের ওপর শাসন করার অধিকার বিধাতা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব। সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের সনাতন ধারা অব্যাহত না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের পদচারণা এখনও ত

রূপ হয়ে যায় নি। সাম্রাজ্যবাদ এখন নবরূপে আবির্ভূত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে চলছে। অপরদিকে, বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য তাদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জনশক্তির জয় ও সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য।

৮.৬ ডলার সাম্রাজ্যবাদ:আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের মোড়কে নয়া সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ

Dollar Imperialism: Financial aid as a tool of neo-imperialist expansion

ইতো:পূর্বে আলোচিত হয়েছে কীভাবে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের মূলত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর আর্থিক সংকট নিরসনের নামে ট্রুম্যান ডক্ট্রিন ও মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছিল। আর্থিক সহায়তাদানের আড়ালে আমেরিকা ঐ অঞ্চলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির যে নীতি অনুসরণ করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মর্মার্থ যথার্থই উপলব্ধি করেছিল। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ ঐ মার্কিন সাহায্যদানের পরিকল্পনাকে 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' বলে আক্রমণ করেছিলেন। কার্যত, ডলার সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির একটি সুনির্দিষ্ট কৌশলমাত্র ছিল। গ্যাব্রিয়েল কলকো (Gabriel Kalko)-র মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে আমেরিকা যথেচ্ছভাবে ডলার ছড়িয়ে ইউরোপের মাটিতে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণবৃদ্ধির পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিকল্পিত সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধ করতে সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই পর্বে বহুলাংশে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত দুটি আর্থিক সংস্থাও এই লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছিল অর্থাৎ আরো প্রাঞ্জলভাবে বললে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক হয়ে ওঠেছিল। এগুলির মধ্যে একটি ছিল বিশ্বব্যাংক (World Bank) যার অন্যতম প্রধান কাজ ছিল আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ দেওয়া এবং অন্যটি ছিল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (International monetary Fund বা IMF), যেটি বিদেশি মুদ্রার জমা ঠিক রাখার জন্য অর্থ ধার দিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই দুটি সংস্থা নিঃস্বার্থভাবে পশ্চিম ইউরোপের বিপর্যস্ত দেশগুলিকে আর্থিক ঋণদানের পক্ষপাতী ছিলনা। মার্কিন নির্দেশে নানারূপ শর্ত চাপিয়ে দিয়ে তারা পরোক্ষ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রগুলোর ওপর পুঁজিবাদী আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছিল। ১৯৫০ সালের মধ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে দেয় মার্কিন অর্থ সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৬০০ মিলিয়ন ডলার। বলাবাহুল্য, ডলার সাম্রাজ্যবাদের এমন সম্প্রসারণ দ্বি-মেরু বিশ্বে উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করেছিল এবং ঠান্ডা লড়াই-এর প্রসার ঘটিয়ে চলেছিল।

আর্থিক সহায়তা প্রকল্পগুলো জারি রাখার মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিব্যবস্থা এমনকি সাধারণ জীবন চর্চার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে উদ্যোগী হয়েছিল। মার্কিন সাহায্য লাভের প্রথম শর্তই ছিল সংশ্লিষ্ট দেশ বা দেশগুলোকে পুঁজিবাদের অনুসারী ও রাজনৈতিক আদর্শে সোভিয়েত ও সাম্যবাদ বিরোধী হতে হবে। ট্রুম্যান নীতির কড়া সমালোচক লিপম্যান বলেছেন যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তীব্র ভীতি থেকে উদ্ভূত এই মার্কিন নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠেছিল আন্তর্জাতিক বিশ্বে সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করতে একটি বিশ্বস্ত, তাঁবেদার ও মার্কিন অনুগ্রহপুষ্ট রাষ্ট্র মন্ডলী গঠন করা। মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) বা ইউরোপীয় পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী (ERP) ঘোষণা করার সময় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে এই সমস্ত প্রকল্প বা অর্থনৈতিক উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হবে ইউরোপে একটি অখণ্ড ও পুনরুজ্জীবিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যবস্থার পাশাপাশি মুক্তবাজার অর্থনীতি (Free Market Economy)-ও স্থান করে নেবে। সোভিয়েত ইউনিয়নও এই ডলার সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যুত্তর দিতে চেয়েছিল প্রায় অনুরূপ আর্থিক সহায়তাদান কর্মসূচী ও সংস্থা গঠনের মাধ্যমে। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলোর পাশে দাঁড়াবার তাগিদ থেকে সে ঘোষণা করেছিল 'মলোটভ পরিকল্পনা', গঠন করেছিল 'কমিনফর্ম' ও 'কমেকন'-এর মতো সংস্থাসমূহ। দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লড়াই শুরু হলো।

http://thejobstudy.com Go to Contents

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত, বিভাজিত পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে আলোচ্য সময়ে মার্কিন সাহায্য যে-কোন শর্তে গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য পথ ছিলনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিতে কার্যত, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংহতি একরকম মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পুঁজিবাদের বিকাশ ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির নগ্ন প্রতিযোগিতা বহু আগে থেকেই পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোকে বিভাজিত ও উত্তেজনাপূর্ণ করে রেখেছিল। বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রকেও মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। যুদ্ধ পরবর্তী দিনগুলোতে তাদের দীর্ঘকালের এশীয় ও আফ্রিকা উপনিবেশগুলোও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রমান্বয়ে হাতছাড়া হয়ে চলেছিল। কিন্তু সংকট নতুন করে ঘনীভূত হয়েছিল সোভিয়েত সাম্যবাদের ক্রমপ্রসারের কারণে। যুদ্ধশেষে পূর্ব ইউরোপের একের পর এক দেশে সোভিয়েত রাশিয়া তার অনুগত কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রবল আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিল। বস্তুত, সোভিয়েত প্রসূত সাম্যবাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সংশ্লিষ্ট পুঁজিবাদী শক্তিশালীর পক্ষে মার্কিন-নির্ভরতাই প্রধান কাম্য হয়ে ওঠেছিল।

মার্কিনরা ভয় পেয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ ভুলে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো অতঃপর নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ একদিকে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং অপরদিকে সমাজতন্ত্র ও বৈপ্লবিক ভাবাদর্শের গতিরোধ করতে ঐ ভৌগোলিক অঞ্চলভুক্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল বললে অতিশয়োক্তি হয়না। এই পদ্ধতিতে ডলার সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রসারের সমান্তরাল পথে পশ্চিম-ইউরোপের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থারও ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটেছিল। বিশেষকরে মার্কিন আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির মতো দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যে অসম্ভবের নামান্তর, সেই চরম সত্যটি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বুঝতে সময় লাগেনি এবং পরিবর্তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমেরিকার খবরদারি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যভাবে বললে পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপকে তারা অনধিকার চর্চা বা অনভিপ্রেত পদক্ষেপ বলে মনে করেনি। এর দরুন ঐ অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে সংহতিবোধও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। বিশেষজ্ঞদের কথায়; 'By its political, economic and military interventions and assistance the United States did exert integrationist pressures and did help to make a number of developments possible'। পশ্চিম ইউরোপের পাশাপাশি এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ডলার কূটনীতির প্রসার অপ্রতিরোধ্য গতিতে ঘটে চলে। সোভিয়েত-উত্তর বিশ্বেও তা অপরিবর্তিত আছে।

৮.৭ সাম্রাজ্যবাদের কি অবসান হয়েছে (Has Imperialism been finished)?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কমিউনিস্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের দিনকাল শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে নকল সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে। বাহ্যিক সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি নতুন ধরনের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্র ঘোষিত সাম্রাজ্যবাদের স্থলে বেসরকারি পুঁজিপতি শক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদ এখনও সচল রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের রূপ ও ধরন কেবল বদলেছে। পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নতুন কৌশলে শোষণ করে যাচ্ছে। নব্য উপনিবেশবাদ পুরাতন উপনিবেশবাদের স্থান দখল করেছে। পুঁজিবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হয়। তাই পুঁজিবাদ যতদিন জীবিত থাকবে সাম্রাজ্যবাদও ততদিন অব্যাহত থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বহুজাতিক কর্পোরেশন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার। বহুজাতিক কর্পোরেশন কেবল আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করে তা নয়, তারা এসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও হস্তক্ষেপ করে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক রাষ্ট্র তার জলন্ত উদাহরণ। এসব বিষয় বিবেচনা করে আমরা একথা বলতে পারি যে, সাম্রাজ্যবাদের চির বিদায় হয়েছে-এরূপ মন্তব্য অসাড়। নব্য উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদের নব্য রূপ ধারণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ পরিবর্তন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার শোষণ ও প্রভাব পূর্বের মতই অব্যাহত রেখেছে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **সাম্রাজ্যবাদ কী ?**
উত্তরঃ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ সীমানার বাইরে অন্য যে কোন রাষ্ট্রের উপর মতা বিস্তারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

২. **পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর বলে কে আখ্যায়িত করেছেন ?**
উত্তরঃ ভি. আই. লেনিন।

৩. **'Imperialism: The Highest Stage of Capitalism' গ্রন্থের লেখক কে?**
উত্তরঃ ভি. আই. লেনিন।

৪. **ধনতন্ত্রের কোন পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান ?**
উত্তরঃ শেষ পর্যায়ে।

৫. **পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় কে?**
উত্তরঃ সাম্রাজ্যবাদ।

৬. **জনসমর্থনের অভাবে সাম্রাজ্যবাদকে কোন শক্তির উপর নির্ভর করে চলতে হয় ?**
উত্তরঃ সামরিক শক্তি।

৭. **কোন চুক্তির মধ্যেমে সমগ্র আফ্রিকাকে ইউরোপের উন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় ?**
উত্তরঃ ১৮৮৬ সালের বার্লিন চুক্তি।

৮. **কোন দেশের শাসকরা রাজ্যবিস্ত-ারের সাথে ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন ?**
উত্তরঃ পর্তুগাল ও স্পেন।

৯. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কোন কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব তীব্রতর হয় ?**
উত্তরঃ জার্মানী ও ইতালী।

১০. **সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের মনস্থাত্ত্বিক কারণ কী ?**
উত্তরঃ আধিপত্য বিস্তারের অদম্য আকাঙ্খা।

১১. **সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য কী ?**
উত্তরঃ ক. পুঁজির কেন্দ্রিকরণ, খ. সাম্রাজ্য বিস্তার, গ. প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও ঘ. বৈষম্য সৃষ্টি।

১২. **সাম্রাজ্যবাদের প্রথম স্তর কোনটি ?**
উত্তরঃ ১৪৯২-১৭৩৬ সাল পর্যন্ত।

১৩. **সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় স্তর কোনটি ?**
উত্তরঃ ১৭৩৬-১৮৭০ সাল পর্যন্ত।

১৪. **সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় স্তর কোনটি ?**
উত্তরঃ ১৮৭০-১৯১৯ সাল পর্যন্ত।

১৫. **সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য কী ?**
উত্তর : অন্য রাষ্ট্রের বাজার দখল, শোষণের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ এবং স্থানান্তর।

১৬. **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য করে কোন দেশ ?**
উত্তর : ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

১৭. **সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কৌশল কী ?**
উত্তরঃ ক. স্বনির্ভরতা অর্জনে বাধা, খ. কৌশলগত সহায়তা প্রদান, গ. শর্তসাপেক্ষে ঋণ প্রদান, ঘ. অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও ঙ. সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দাও।
(খ) সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য কী কী ?

২. (ক) সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের কারণ কী ?
(খ) সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা কর।

৩. (ক) নব্য উপনিবেশবাদ কী ?
(খ) নব্য উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক কী ?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝেন ? সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর বর্ননা করুন । স্তর বর্ণনা করুন। বা' "সাম্রাজ্যবাদ শোষনেরই একটি প্রক্রিয়া" মন্তব্য করুন।

২. সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দাও । সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন ?

৩. সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ সমূহ আলোচনা করুন ?

৪. "সাম্রাজ্যবাদ কী ? সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ"আলোচনা করুন?

৫. বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরণ ও কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

৬. 'পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ'- লেনিনের এ উক্তির আলোকে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরণ ও কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করুণ।

অধ্যায় ৯

উপনিবেশবাদ ও নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ
Colonialism & Neo-colonialism

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৯.১ ভূমিকা
৯.২ উপনিবেশবাদ
৯.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়
৯.৪ নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ
৯.৫ নব্য উপনিবেশবাদের প্রভাব/বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

উপনিবেশবাদ শব্দটি সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হলেও উপনিবেশবাদের পৃথক অর্থ রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উপনিবেশবাদকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়। যদিও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে উপনিবেশবাদের প্রত্যয় প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। উপনিবেশবাদ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটনা হয় না। উপনিবেশ বলতে নতুনভাবে বসতি স্থাপন বোঝায়। সাধারণভাবে কোনো এলাকা থেকে সমবেত কোনোজনগোষ্ঠী অন্য এলাকায় বসতি স্থাপন করলে তাকে উপনিবেশ বলে। উপনিবেশ স্থাপন করার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। নিজ দেশে অভাব-অনটন, খাদ্যাভাব, ধর্মীয় সংঘর্ষ, শাসকের সাথে বিরোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থানাভাব কিংবা ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বার্থে মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। আর্যরা প্রথমে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে ভারতীয় বনে যায়। প্রাচীন ভারতীয়রাও সিংহল, সুবর্ণ দ্বীপ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। রোমান, গ্রিক ও মিশরীয়রাও উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। আরব মক্কালীয় ও চৈনিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলকায় বসতি স্থাপন করেছিল।

৯.২ উপনিবেশবাদ (Colonialism)

জে.এ. হবসন- এর মতে, "সঠিক অর্থে উপনিবেশবাদ হলো জাতীয়তাবাদের একরূপ স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ বা সম্প্রসারণ। যে নতুন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে উপনিবেশবাদীরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতাকে অনুপ্রবেশ করার যে ক্ষমতা তারা ভোগ করেন, তাই উপনিবেশবাদের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে।" কারও কারও মতে, "ঔপনিবেশিকতা হলো কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপর সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণকারী অন্য কোনোসার্বভৌম রাষ্ট্রের শাসন।"

রুপার্ট এমার্সন এর ভাষায়, "ঔপনিবেশিকতা হলো কোনো বিদেশি জনগণের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা।"

টাউনসেন্ড ও পীক বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ আসলে এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনকেই বোঝায় যা সাধারণত শোষণমূলক, যা সচরাচর এ আধুনিক আন্দোলনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে কিন্তু সর্বদা নয়।"

এ. এম. উইনসলের এর মতে, "উপনিবেশ বলতে এমন এক ভূখণ্ডগত অধিকারকে নির্দেশ করে যেখানে ইউরোপিয়ানদের ইচ্ছা ছিল বসবাসের নতুন স্থান লাভ করা। যেখানে এ দ্বন্দ্ব ছিল সেই ইচ্ছার অনুসঙ্গী এমনকি অপ্রয়োজনীয় ঘটনা এবং যেখানে সেই দ্বন্দ্ব ছিল এ ইচ্ছার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই দুষ্কর। এ সম্পর্কে নানারূপ মতপার্থক্যও রয়েছে। এ সমস্ত সংজ্ঞার পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি যে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপনিবেশ বলতে এমন এক ভূখণ্ডকে বোঝায় যে ভূখণ্ডের অধিকাংশ মানুষের জীবন ব্যবস্থা ভিন্ন সংখ্যালঘুগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের সাথে তাদের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

৯.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়

Characteristics or nature/cause/aims of colonialism

উপনিবেশবাদ কোনো কারণ ব্যতীত আপনা আপনি গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে নানাবিধ বাস্তব কারণ বিদ্যমান থাকে। যার কারনে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ স্থাপনে প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণগুলোর মধ্যে উপনিবেশবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি অন্তর্নিহিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি :** উপনিবেশ স্থাপনের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পায়, আর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেলে জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয়। ঊনবিংশ বিংশ শতকে ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী প্রতাপ ও মর্যাদার কারণ ছিল তার বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া। কালক্রমে উপনিবেশ হারানোর ফলে ব্রিটেনের মর্যাদা

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে উপনিবেশ

- দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্র যার উপনিবেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন, সিরিয়া (ফ্রান্স) বাদে অন্যান্য সব দেশ যার উপনিবেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- মধ্য এশিয়ার সবগুলো দেশ যার উপনিবেশ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- সি.আই.এসভুক্ত সবগুলো দেশ যার উপনিবেশ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- ইন্দোচীনের দেশগুলো যার উপনিবেশ ছিল-ফ্রান্স।
- ইউরোপের বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ যার উপনিবেশ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- দক্ষিণ আমেরিকার বড় রাষ্ট্র ব্রাজিল (পর্তুগাল), ছোট রাষ্ট্র সুরিনাম (নেদারল্যান্ড) ও গায়ানা (ইংল্যান্ড) বাদে অন্যান্য সকল দেশ যার উপনিবেশ ছিল- স্পেন।
- মধ্য আমেরিকার পানামা (কলাম্বিয়া) বাদে অন্যান্য সবগুলো দেশ যার উপনিবেশ ছিল-স্পেন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আফ্রিকার ৩টি স্বাধীন দেশ যার উপনিবেশ ছিল-১. লাইবেরিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), ২. মিসর (ইংল্যান্ড), ৩. ইথিওপিয়া (ইংল্যান্ড)।
- ভূ-মধ্যসাগরীয় কার্সিকা দ্বীপটি বর্তমানে-ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত সর্বপ্রথম স্বাধীন দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৭৬ সালে)
- জিব্রাল্টার বর্তমানে -ইংল্যান্ডের উপনিবেশ (পূর্বে ছিল নেদারল্যান্ডের)।
- চন্দ্রনগর (পশ্চিমবঙ্গ) একসময়-ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার-ফিলিপাইন একসময় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- হংকং যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্ব থেকে চীনের অধীনে আসে-১৯৯৭ সালে।

ব্যতিক্রম

- ইউরোপের একমাত্র যে দেশটি ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল- মাল্টা।
- ইউরোপের বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবার্গ রাষ্ট্রদ্বয় নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল।
- অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল মিসর, রোমানিয়া, তুরস্ক (কেন্দ্রস্থল-ইস্তাম্বুল)।
- রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সুইজারল্যান্ড, ইটালি (কেন্দ্রস্থল-রোম)।

অধ্যায় ৯

উপনিবেশবাদ ও নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ
Colonialism & Neo-colonialism

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৯.১ ভূমিকা
৯.২ উপনিবেশবাদ
৯.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়
৯.৪ নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ
৯.৫ নব্য উপনিবেশবাদের প্রভাব/বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

উপনিবেশবাদ শব্দটি সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হলেও উপনিবেশবাদের পৃথক অর্থ রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উপনিবেশবাদকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়। যদিও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে উপনিবেশবাদের প্রত্যয় প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। উপনিবেশবাদ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটনা হয় না। উপনিবেশ বলতে নতুনভাবে বসতি স্থাপন বোঝায়। সাধারণভাবে কোনো এলাকা থেকে সমবেত কোনোজনগোষ্ঠী অন্য এলাকায় বসতি স্থাপন করলে তাকে উপনিবেশ বলে। উপনিবেশ স্থাপন করার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। নিজ দেশে অভাব-অনটন, খাদ্যাভাব, ধর্মীয় সংঘর্ষ, শাসকের সাথে বিরোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থানাভাব কিংবা ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বার্থে মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। আর্যরা প্রথমে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে ভারতীয় বনে যায়। প্রাচীন ভারতীয়রাও সিংহল, সুবর্ণ দ্বীপ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। রোমান, গ্রিক ও মিশরীয়রাও উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। আরব মঙ্গোলীয় ও চৈনিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলকায় বসতি স্থাপন করেছিল।

৯.২ উপনিবেশবাদ (Colonialism)

জে.এ. হবসন- এর মতে, "সঠিক অর্থে উপনিবেশবাদ হলো জাতীয়তাবাদের একরূপ স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ বা সম্প্রসারণ। যে নতুন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে উপনিবেশবাদীরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতাকে অনুপ্রবেশ করার যে ক্ষমতা তারা ভোগ করেন, তাই উপনিবেশবাদের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে।" কারও কারও মতে, "ঔপনিবেশিকতা হলো কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপর সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণকারী অন্য কোনোসার্বভৌম রাষ্ট্রের শাসন।"

রূপার্ট এমার্সন এর ভাষায়, "ঔপনিবেশিকতা হলো কোনো বিদেশি জনগণের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা।"

টাউনসেন্ড ও পীক বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ আসলে এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনকেই বোঝায় যা সাধারণত শোষণমূলক, যা সচরাচর এ আধুনিক আন্দোলনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে কিন্তু সর্বদা নয়।"

এ. এম. উইনসলের এর মতে, "উপনিবেশ বলতে এমন এক ভূখণ্ডগত অধিকারকে নির্দেশ করে যেখানে ইউরোপিয়ানদের ইচ্ছা ছিল বসবাসের নতুন স্থান লাভ করা। যেখানে এ দ্বন্দ্ব ছিল সেই ইচ্ছার অনুসঙ্গী এমনকি অপ্রয়োজনীয় ঘটনা এবং যেখানে সেই দ্বন্দ্ব ছিল এ ইচ্ছার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই দুষ্কর। এ সম্পর্কে নানারূপ মতপার্থক্যও রয়েছে। এ সমস্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি যে, ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপনিবেশ বলতে এমন এক ভূখণ্ডকে বোঝায় যে ভূখণ্ডের অধিকাংশে মানুষের জীবন ব্যবস্থা ভিন্ন সংখ্যালঘুগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের সাথে তাদের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

৯.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়
Characteristics or nature/cause/aims of colonialism

উপনিবেশবাদ কোনো কারণ ব্যতীত আপনা আপনি গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে নানাবিধ বাস্তব কারণ বিদ্যমান থাকে। যার কারনে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ স্থাপনে প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণগুলোর মধ্যে উপনিবেশবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি অন্তর্নিহিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি :** উপনিবেশ স্থাপনের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পায়, আর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেলে জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয়। উনবিংশ বিংশ শতকে ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী প্রতাপ ও মর্যাদার কারণ ছিল তার বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া। কালক্রমে উপনিবেশ হারানোর ফলে ব্রিটেনের মর্যাদা

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে উপনিবেশ

- দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্র যার উপনিবেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন, সিরিয়া (ফ্রান্স) বাদে অন্যান্য সব দেশ যার উপনিবেশ ছিল- ইংল্যান্ড।
- মধ্য এশিয়ার সবগুলো দেশ যার উপনিবেশ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- সি.আই.এসভুক্ত সবগুলো দেশ যার উপনিবেশ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- ইন্দোচীনের দেশগুলো যার উপনিবেশ ছিল-ফ্রান্স।
- ইউরোপের বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ যার উপনিবেশ ছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- দক্ষিণ আমেরিকার বড় রাষ্ট্র ব্রাজিল (পর্তুগাল), ছোট রাষ্ট্র সুরিনাম (নেদারল্যান্ড) ও গায়ানা (ইংল্যান্ড) বাদে অন্যান্য সকল দেশ যার উপনিবেশ ছিল- স্পেন।
- মধ্য আমেরিকার পানামা (কলম্বিয়া) বাদে অন্যান্য সবগুলো দেশ যার উপনিবেশ ছিল-স্পেন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আফ্রিকার ৩টি স্বাধীন দেশ যার উপনিবেশ ছিল-১. লাইবেরিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), ২. মিসর (ইংল্যান্ড), ৩. ইথিওপিয়া (ইংল্যান্ড)।
- ভূ-মধ্যসাগরীয় কার্সিকা দ্বীপটি বর্তমানে-ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত সর্বপ্রথম স্বাধীন দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৭৬ সালে)
- জিব্রাল্টার বর্তমানে -ইংল্যান্ডের উপনিবেশ (পূর্বে ছিল নেদারল্যান্ডের)।
- চন্দ্রনগর (পশ্চিমবঙ্গ) একসময়-ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার-ফিলিপাইন একসময় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- হংকং যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্ব থেকে চীনের অধীনে আসে-১৯৯৭ সালে।

ব্যতিক্রম

- ইউরোপের একমাত্র যে দেশটি ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল- মাল্টা।
- ইউরোপের বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবার্গ রাষ্ট্রদ্বয় নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল।
- অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল গ্রিস, রোমানিয়া, তুরস্ক (কেন্দ্রস্থল-ইস্তাম্বুল)।
- রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সুইজারল্যান্ড, ইটালি (কেন্দ্রস্থল-রোম)।

http://thejobstudy.com Go to Contents

প্রতিপত্তিও হ্রাস পেতে থাকে।

২. **অর্থনৈতিক সুবিধা :** উপনিবেশবাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ফায়দা বা সুবিধা অর্জন করা। মূলত অর্থনৈতিক কারণেই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উদ্ভব। উপনিবেশ স্থাপনের নেপথ্যে রয়েছে ঔপনিবেশিক ভূখণ্ড থেকে আর্থিক দিক থেকে সুবিধা অর্জন করা। উপনিবেশবাদীরা অধিকৃত এলাকা থেকে তাদের দেশের শিল্প-কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে উপনিবেশিক ভূখণ্ড এটি ব্যতীত জনগণের ওপর বিভিন্ন প্রকার কর, খাজনা ইত্যাদি আরোপ করে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখে।

৩. **শাসন ক্ষমতার বিস্তার :** শাসনক্ষমতার বিস্তার উপনিবেশবাদের অন্যতম লক্ষ্য বটে। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে অধিগ্রহণকারী রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার বিস্তার বা প্রসার ঘটে। দখলীকৃত ভূখণ্ডে দখলদার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এমনকি শাসনব্যবস্থা দখলদার রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের নামেও পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে রাজা/রাণীর নামে শাসন অব্যাহত ছিল। আনুগত্য ছিল অটুট।

৪. **রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ :** উপনিবেশবাদে অধিকৃত এলাকায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনে থাকে। অধিকৃত ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে কোনো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তেমন লক্ষ করা যায় না। তবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এর মধ্যেই ধীরে ধীরে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কোনো কোনো সময় ঔপনিবেশিক শাসক নিজেই জনগণের রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়।

৫. **জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক সুবিধা :** উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক দিক থেকে নানাবিধ সুবিধা অর্জন করে থাকে। অধিকৃত ভূখণ্ডে জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অধিকৃত অঞ্চল জনবলের উৎস, সেখান থেকে শ্রমিক ও সৈন্য সংগ্রহ করা যায়। অধিকৃত এলাকার সামরিক বাহিনী দখলদারদের অংশবিশেষ। যুদ্ধের সময় দখলদার রাষ্ট্র দখলকৃত এলাকা থেকে অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এভাবে তাদের উপনিবেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে।

৬. **অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন :** অনেক ক্ষেত্রে নিজ দেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসনের স্বার্থে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিজ দেশে যখন ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয় তখন উপনিবেশ এলাকায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে স্থানান্তরিত করে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা হয়।

৭. **সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস :** উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঔপনিবেশিক এলাকার সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস। উপনিবেশ শক্তি শুধুমাত্র ভূখণ্ড দখল ও শাসন বিস্তার করে শান্ত থাকে না। তারা দখলকৃত এলাকার জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করে। পর দেশের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার কারণে ধীরে ধীরে অধিকৃত এলাকার জনগণের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে থাকে।

৮. **ধর্ম প্রচার :** উপনিবেশ বিস্তারের সাথে সাথে ধর্ম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ধর্ম যাজকরা উপনিবেশ অঞ্চলে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করে থাকে। উপনিবেশ এলাকায় সৃষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন মিশনারি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সাহায্য সহযোগিতার নামে নানাভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণকে প্রভাবিত করে ধর্মান্তরে প্রেরণা যোগায়।

৯. **জাতীয়তাবাদী প্রেরণা :** উপনিবেশবাদ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা যোগায়। উপনিবেশ শাসন ও শোষণের নিষ্পেষণে থাকতে থাকতে উপনিবেশ এলাকায় জনগণের মধ্যে

ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হতে থাকে। কালক্রমে একসময় এরূপ জাতীয়তাবোধ জনগণকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন করতে শক্তি যোগায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ এক সময় উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১০. **শ্রেণিবিভেদ :** শ্রেণিবিভেদ সৃষ্টি উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজ স্বার্থে অধিকৃত ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে নানারূপ শ্রেণিবৈষম্য ও বিভাজন সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়। ভাগ কর এবং শাসন কর হচ্ছে উপনিবেশবাদের অন্যতম নীতি। উপনিবেশবাদ সৃষ্ট সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য উপনিবেশ অঞ্চলে এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও কারণসমূহ আলোচনা করে উপনিবেশ স্থাপনে অভিপ্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়। উপনিবেশবাদের ফলে অধিকৃত ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। উপনিবেশবাদ কখনও আশীর্বাদ হতে পারে না। কারণ এটা সাম্রাজ্যবাদেরই প্রতীক। আর সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার। তবে উপনিবেশবাদ যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকাও পালন করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। উপনিবেশবাদ অধিকৃত এলাকার যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশকিছু অবদান রেখেছে। অধিকৃত জনগণের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছে।

৯.৪ নব্য/নয়া উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism)

নব্য উপনিবেশবাদ কথাটি আসলে উপনিবেশবাদেরই নতুন সংস্করণ মাত্র। নয়া উপনিবেশবাদ কোনো ভিন্ন ধরনের উপনিবেশবাদ নয়, এটি অনেকটা পুরনো বোতলে নতুন পানীয়ের মতো। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায় হলো-নব্য উপনিবেশবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যখন সাম্রাজ্যবাদের দুর্দিন শুরু হয়। উপনিবেশবাদ সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্নমহল ভেঙে পড়তে শুরু করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই ব্যবস্থা শুরু হয়ে এখনো অব্যাহত রয়েছে। প্রকৃত অর্থে নব্য উপনিবেশবাদ গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীতে ১ম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এ ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী শক্তি কখনো মেনে নিতে পারে নি। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের অঘোষিত নীতি হলো-বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে জাতীয়তাবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা। প্রয়োজনে সামরিক সহায়তার মাধ্যমে হলেও আন্দোলনকে সফল করা হয়। বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। যুদ্ধের পর এ জাতিগুলোর স্বাধীনতার আন্দোলনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন দিলে বিশাল অংশ জুড়ে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে, পুঁজিবাদ তা হতে দিতে রাজি নয়। এ কারণেই যুদ্ধের পর জাতিগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন হলেও এ জাতিগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বলতে কিছু নেই। এক্ষেত্রেও যাতে সোভিয়েতের সহযোগিতা না থাকে তার জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রিটেন উডস্ শহরে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দরিদ্র জাতিগুলোকে অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের জন্য একটি ব্যাংক এবং অর্থনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য একটি মুদ্রা তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে গঠন করা হয় IBRD এবং IMF। সদ্য স্বাধীন এবং দরিদ্র জাতিগুলোকে অর্থনৈতিক এ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ দেওয়া শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যতঃ দরিদ্র জাতিগুলোকে ঋণগ্রস্ত জাতিতে পরিণত করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে স্বাধীনতা দেওয়া হলেও অর্থনৈতিকভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখার প্রয়াসকে নব্য উপনিবেশবাদ বলে। এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নানা ধরনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো তাবেদার সরকার গঠন, অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আনা, ঋণ সাহায্য করা, বিনিয়োগ বা পুঁজি লগ্নি করা, সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ করা।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এমনি দুঃসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

উপনিবেশ হারিয়ে যায়। কিন্তু শোষণ হারালে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বই যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই নতুন কৌশলের মাধ্যমে পূর্বতন উপনিবেশগুলো শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার চক্রান্ত শুরু হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, পর্তুগাল এরূপ চক্রান্তকারী গোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলায়। ফলে সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার যৌথ উদ্যোগের সূচনা হয়। নয়া উপনিবেশবাদ এরূই প্রচেষ্টারই ফলস্বরূপ।

প্রকৃতপক্ষে নয়া উপনিবেশবাদ বলতে নতুন এক ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতি বোঝায়, যে পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ নিজেদের শোষণ ও আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। নয়া উপনিবেশবাদ হলো নতুন পন্থায় সনাতন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব নয় বিধায় পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। এতে কৌশলই কেবল পরিবর্তন হয়েছে। শোষণ ঠিকই বহাল রয়েছে। তাই বলা যায়, নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা ও কৌশল তা আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় নয়া উপনিবেশবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি লক্ষণীয় না হলেও উপনিবেশবাদের ধারণা ও মানসিকতা আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে মুছে যায় নি। যে সমস্ত দেশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছে তারা এখনও সাম্রাজবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায় নি। বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উপনিবেশবাদ হলো পশ্চাৎগামী উপনিবেশবাদের পদচারণা অনুসরণ করা। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে এসেও নয়া উপনিবেশবাদের সমস্যা কেবল বেড়েই চলছে। ঔপনিবেশিক শাসকচক্র



নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের ওপর তাদের আগের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে চলছে। তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পরোক্ষ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টাই হচ্ছে নব্য উপনিবেশবাদ।

বর্তমানকালে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ শক্তি প্রয়োগ বা সামরিক কায়দায় তাদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে না, বরং তারা অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগত প্রাধান্য বিস্তার, সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, অর্থনীতির সামরিকীকরণ, আঞ্চলিক, উপজাতীয় কোন্দল সৃষ্টি, অসম বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন, করিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে দরিদ্র দেশসমূহকে পরনির্ভরশীল করে তোলা, কঠোর শর্তযুক্ত ঋণ প্রদান, মুদ্রার মূল্য হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাজারকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো হারানো কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। উপনিবেশবাদের ধ্বনিকাপাত হলেও নয়া উপনিবেশবাদ নতুন কৌশলে অনুন্নত দেশগুলোকে ক্রমাগত শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে চলছে।

এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর তাকে অব্যাহত রাখতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মুৎসুদ্দি সরকার, অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আনা, ঋণ সাহায্য দেওয়া, বিনিয়োগ/পুঁজি লগ্নি করা, সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

১. **মুৎসুদ্দি সরকার প্রতিষ্ঠা :** নব্য উপনিবেশবাদের ধারণা বাস্তবায়নের জন্য মুৎসুদ্দি সরকার প্রতিষ্ঠা করা। মুৎসুদ্দি সরকার হলো এক ধরনের তাঁবেদার সরকার যা ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আদেশ-নির্দেশ, মোতাবেক সরকার পরিচালনা করে থাকে। এ লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোনো রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য সামরিক পন্থায় রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিলির আলেন্দে সরকারের পতন ঘটিয়ে পিনোচেটকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণকে ক্ষমাতাচ্যুত করে সুহার্তোকে বসিয়েছে। এঙ্গোলার সরকার-বিরোধী দলের হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তুলে দিয়ে সেখানে ক্রমশ : হতাশার জন্ম দিয়েছে। আফগানিস্তানেও তারা একই আচরণ করেছে। অতঃপর সন্ত্রাসের অজুহাতে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা একটি মুৎসুদ্দি সরকার গঠন করেছে। ইরাকেও এরূপ একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. **অর্থনৈতিক আধিপত্য :** নব্য উপনিবেশবাদের প্রধান লক্ষ হলো সাবেক উপনিবেশগুলোর ওপর নতুন করে যে কোনো উপায়ে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা। এটি অনস্বীকার্য যে, দীর্ঘদিন উপনিবেশের অধীন শোষণ বঞ্চনার শিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর অর্থনীতি পরিবেষ্টনে বলতে গেলে ছিলই না। অর্থাৎ এ সকল দেশে অনগ্রসরতা, পুঁজির অভাব, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার অভাব, আধুনিক শিল্পের অভাব, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সংকট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভর হতে বাধ্য করেছে। ফলে বিদেশি ঋণ ও বিদেশি বিনিয়োগের নির্ভরশীলতা ছাড়া উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর বিকল্প কোনো পথ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুযোগ সৃষ্টি তার সদ্ব্যবহার করার প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ বা পুঁজি লগ্নি করে নব্য উপনিবেশবাদের ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়েছে।

৩. **অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আনা :** নব্য উপনিবেশবাদ সৃষ্টি এবং তাকে অব্যাহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গড়ে তোলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেমন World Bank এবং IMF নামের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দুটো। অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির কাঠামো পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করার জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। একটি জাতি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় তখন তার নিজের ইচ্ছামতো উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে না। এ কারনে তাদের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকে। কার্যত এ নির্ভরশীলতাই নব্য উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য।

৪. **ঋণ সাহায্য :** অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তনশীল করে শোষণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা নব্য উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা কৌশল। ঋণ প্রদানের

শর্ত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা নিজেদের প্রয়োজনমত ঋণ সাহায্য ব্যবহার করতে পারবে না। এতে করে ঋণ গ্রহীতা দেশ উৎপাদনশীল শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার, আমদানি হ্রাস, বেকারত্ব দূর করে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। তারা একদিকে যেমন চড়া সুদ আরোপ করে তেমনি ঋণ শোধের ব্যবস্থাকেও জটিল করে তোলে।

৫. **বিনিয়োগ বা পুঁজি লগ্নি :** নব্য উপনিবেশবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ করা। এদের বিনিয়োগের বিশেষত্ব এমন যাতে করে অনুন্নত দেশের প্রকৃত উপকার হয় না। দরিদ্র্য দেশের জনসংখ্যার আধিক্য, বেকারত্বের কারণের সস্তা শ্রম এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য কম বলে বিনিয়োগ বা পুঁজি লগ্নিতে উৎসাহিত হয়।

৬. **সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্তিকরণ :** সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বকে কব্জায় রাখার জন্য নব্য উপনিবেশবাদ সৃষ্টি করা হয়। এর মূলে ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা। তাই সমাজতন্ত্রের বিকাশ রোধ করার জন্য সামরিক জোটের সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় NATO সামরিক চুক্তি। এ সামরিক চুক্তির মূল লক্ষ ছিল "সোভিয়েত বিরোধী প্রতিরোধ নীতি"। এরপর পঞ্চাশের দশকেই সামরিক ব্যবস্থার বিস্তার সাধন করা হয়। এ সময় গঠিত হয় 'SEATO (South East Asia Treaty Organization). এবং SEATO এর সদস্য একদিকে ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যদিকে ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড পাকিস্তান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় গড়ে তোলা হয় SENTO বা বাগদাদ চুক্তি। এভাবে নয়া উপনিবেশবাদ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়।

৭. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ :** নব্য উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ নতুন রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। নয়া উপনিবেশিক শক্তি কোনো দেশের সুস্থ, সুচিন্তিত গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করে অসুস্থ প্রতিক্রিয়াশীল অশালীন সাংস্কৃতিক মানসিকতা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে। অথবা দুর্বল করে রাখে।

মূল্যায়ন (Evualation)

নব্য উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো পরোক্ষ তৎপরতার মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিপ্লবের ধারাকে প্রতিহত করতে পেরেছে। আমরা জানি যে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিপরীতে গড়ে তোলা হয়েছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। মুক্তবাজার ব্যবস্থাকে বিশ্বব্যাপী কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয় স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। অতঃপর ১৯৯২ সনে GATT চুক্তিতে WTO করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে GATT– এর উরুগুয়ে রাউন্ড সমাপ্ত করা হয়। এ WTO-এর মধ্যেমে বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশসহ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জাতিগুলোকে সকল প্রকার শুল্ক বাধা তুলে দিয়ে বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করা হয়েছে। অথচ আমাদের মতো জাতিগুলো শিল্পের বিকাশ সাধন না করে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করার সমস্যায় পড়েছে।

৯.৫ নব্য উপনিবেশবাদের প্রভাব/বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি
Impact characteristics/nature of Neo-colonialism

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে নব্য উপনিবেশবাদের প্রভাব অপরিসীম। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির প্রস্থান হলেও সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের ঐতিহ্যগত ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে বলা যায়। উপনিবেশবাদ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হলে ও উপনিবেশবাদের শোষণ ও কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে নি। ঔপনিবেশিক শক্তি এখনও বিভিন্ন কৌশলে তাদের স্বার্থ আদায় করে চলছে। স্বাধীনতা লাভ করলেও অনুন্নত দেশগুলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের ওপর এখনো বিভিন্ন কারণে নির্ভরশীল রয়েছে। উপনিবেশিক দায়বদ্ধতা থেকে তারা কখনো মুক্ত হতে পারে নি। উপনিবেশবাদের প্রভাব তাদেরকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রেখেছে। নিম্নে উপনিবেশবাদের আধিপত্য বিস্তারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে

http://thejobstudy.com Go to Contents

আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখা :** উপনিবেশবাদ শক্তি প্রয়োগ ও সামরিক দিক পরিত্যাগ করে অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে। নব্য উপনিবেশবাদ প্রধানত অর্থনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তাদের হারানো কর্তৃত্ব ও শোষণ অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। স্বাধীনতা লাভ করলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ কখনো স্বাধীনভাবে তাদের সম্পদের ব্যবহার ও জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ এসব দেশের অর্থনীতিকে নানা পন্থায় পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম রেখেছে। সাধারণত বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো হচ্ছে-

ক. **আর্থিক সহায়তা ও ঋণ প্রদান :** ঔপনিবেশিক দেশসমূহ অনুন্নত দেশসমূহে নানাবিধ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এসব আর্থিক সহায়তা অনুন্নত দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। আর্থিক সহায়তা লাভে অনুন্নত দেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানকারী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে তাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অনুন্নত দেশে বিরাট অঙ্কের ঋণ প্রদান করে থাকে। এসব ঋণ গ্রহীতা দেশকে নানাভাবে দায়বদ্ধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের সাথে নানাবিধ কঠিন শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলি ঋণ প্রদানকারীর স্বার্থেই আরোপ করা হয়। ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নাগপাশে চিরতরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

খ. **খাদ্য সাহায্য প্রদান :** খাদ্য সাহায্য প্রদান ঔপনিবেশিক শক্তির অনুন্নত দেশে কর্তৃত্ব বজায়ের পুরাতন কৌশল। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশে খাদ্য ঘাটতি থাকায় ধনী সাম্রাজ্যবাদী দেশ খাদ্য সাহায্যের অজুহাতে যে সব দেশের সরকার ও জনগণের সহানুভূতি আদায়ের সুযোগ পায়। খাদ্য সহায়তা লাভের ফলে কৃষি উন্নতিতে তারা কখনো মনোযোগী হতে পারে না। খাদ্যের জন্য তাদেরকে সবসময় পরনির্ভরশীল থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য সাহায্যের সাথে নানারূপ শর্তও আরোপ করা হয়। এভাবে খাদ্য সাহায্যের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের প্রভাববলয় অক্ষত রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

গ. **মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু :** সাম্প্রতিকালে নব্য উপনিবেশবাদীরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নতুন কৌশল চালু করেছে। এ ব্যবস্থায় উন্নত বিশ্বের পণ্যসামগ্রী অবাধে অনুন্নত দেশে প্রবেশের সুযোগ পাবে। ফলে দেশীয় নিম্নানের দ্রব্য সামগ্রী উপেক্ষিত ও পরিত্যাজ্য হবে। প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী উন্নত রাষ্ট্রেগুলোর পণ্য বাজারে সয়লাব হয়ে যাবে। এতে ঔপনিবেশিক স্বার্থই সংরক্ষিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘ. **পণ্য সাহায্য :** ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দরিদ্র অনুন্নত দেশে অনেক সময় পণ্যসামগ্রী সাহায্য হিসেবেও প্রদান করতে পারে। সাহায্যপ্রাপ্ত পণ্য ব্যবহার করে দেশের জনগণ বিদেশী পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে অনায়াসে পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়। সাহায্য সামগ্রীতে করারোপ করা হয় না বলে সরকার আমদানি শুল্ক থেকেও বঞ্চিত হয়। রাজস্বের ঘাটতি হয় অথচ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধি হয়।

ঙ. **প্রকল্প সাহায্য :** প্রকল্প সাহায্য প্রদান উপনিবেশবাদের অন্যতম হাতিয়ার। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে প্রকল্প সহায়তার নামে নানাবিধ উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রকল্প সাহায্যের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়। সাহায্য গ্রহণ করতে হলে শর্তসমূহ অবশ্যই পূরণ করতে সম্মত হতে হবে। এসব শর্ত অবশ্যই সাহায্য প্রদানকারী রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প সাহায্যের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষণ ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে এর দ্বারা যথাযথ উন্নয়ন সাধিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় কিংবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় করা হয়। প্রকল্প সাহায্যের নামে যে অর্থ প্রদান করা হয় তা দেশের কল্যাণে ব্যয় না হয়ে পুনরায় দাতা দেশের হাতেই চলে যায়।

২. **বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা** : নয়া উপনিবেশবাদের প্রভাব বিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার হলো বহুজাতিক সংস্থার প্রাধান্যকারী ভূমিকা পালন করা। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এসব সংস্থা বর্তমানে তাদের প্রভূত নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেছে। অনুন্নত দেশগুলো তাদের প্রাধান্য ও প্রভুত্বের কাছে বর্তমানে জিম্মি হয়ে রয়েছে। দরিদ্র দেশের উন্নয়ন সহায়তা ও পুঁজি ঘাটতি দূর করার জন্য বহুজাতিক সংস্থার গঠনমূলক আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা আবশ্যক বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থা কেবল নিজেদের উদ্বৃত্ত পুঁজি খাটানো, পরিত্যাজ্য যন্ত্রপতি ও কারিগরি কৌশল রপ্তানি করে থাকে। শিল্পোন্নয়ন ও নতুন কর্মকৌশল উদ্ভাবনে কোনো সহায়তা প্রদান করেনা। ঔপনিবেশিক দেশ ও তাদের বহুজাতিক সংস্থাসমূহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিকল্পিতভাবে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে দরিদ্র দেশগুলো দিন দিন আরও দরিদ্রতায় নিমজ্জিত হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থা কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই দরিদ্র দেশগুলোতে শোষণ চালাচ্ছে না, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ঘটনাপ্রবাহে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

৩. **তাঁবেদার সরকার গঠন** : নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের প্রাধান্য ও আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে তাদের পছন্দমতো তাঁবেদার সরকার গঠন করে। এ সমস্ত তাঁবেদার বা পুতুল সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে দ্বিধাবোধ করে না। তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইশারায় তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। কোনো কারণে এ সব সরকারের কার্যকলাপ তাদের স্বার্থের বিরোধী মনে হলে তারা যে কোনো উপায়ে সরকারের পতন ঘটাতে কুণ্ঠিত হয় না। নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ বিরোধী কোনো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটানো, সামরিক অভ্যুত্থান, প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান চালানো, বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ইন্ধন ও সহযোগিতা প্রদান করে তাদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, নামিবিয়া, এল সালভাদোর, হন্ডুরাস, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি রাষ্ট্র এর অনন্য উদাহরণ।

৪. **সামরিক ঘাঁটি স্থাপন** : সামরিক কৌশল ও অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন নয়া উপনিবেশবাদের অন্যতম কৌশল। এসব ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব সামরিক ঘাঁটি উন্নত উন্নয়নশীল উভয় রাষ্ট্রেই বিদ্যমান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রে ঘাঁটি স্থাপন করে ইউরোপে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করে। ওয়ারশভুক্ত দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনা মোতায়েন ছিল। বর্তমান আফগানিস্তান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। এরূপ অবস্থান রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৫. **সামরিক জোট ও চুক্তি সম্পাদন** : সামরিক জোট গঠন ও চুক্তি সম্পাদন নয়া উপনিবেশবাদের একটি অন্যতম কৌশল। তৃতীয় বিশ্বের নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর দুর্বলতার সুযোগে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদেরকে সাহায্য সহায়তার নামে বিভিন্ন জোট ও চুক্তিতে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়। জোটে অন্তর্ভুক্তি ও চুক্তির সুযোগে তারা এসব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। এতে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব বলয়ের বিস্তার ঘটে।

৬. **প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে** : স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে উপনিবেশিক নাগপাশ থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র্য ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে উন্নতি লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু তাদের স্বনির্ভরতা অর্জনের এরূপ প্রচেষ্টার পথে উপনিবেশ শক্তি এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শক্তি সাহায্যের অজুহাতে এসব দেশে তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত কারিগরি প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তর করে থাকে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশের পরিনির্ভরশীলতা কখনো হ্রাস পায় না, বরং ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ ও আধিপত্যই পুনঃবহাল হয়।

৭. **সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ** : সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে শোষণ করে না, তারা সেসব দেশের মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত জীবনকেও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে। উপনিবেশবাদ সকল প্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও উদ্যোগের বিরুদ্ধে অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। শিল্প ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তাই তারা সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুপ্রবেশে মনোনিবেশ করে থাকে। এ লক্ষ্যে অর্থ সহায়তা, সংস্থা ও তহবিল গঠনে উদ্যোগী হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি অসুস্থ, প্রতিক্রিয়াশীল, অনুশীলন সাংস্কৃতির চর্চাকে উৎসাহিত করে অনুন্নত দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে বিনষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না।

৮. **মেধা পাচারের ব্যবস্থা** : উপনিবেশিক শক্তি অনুন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা দেশের শিক্ষা জগতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে তারা নানাবিধ অর্থ সাহায্য ও ফাউন্ডেশন গঠনে উদ্যোগ নেয়। দেশের মেধাবী ছাত্রদের বিদেশ পাঠিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তনের সুযোগ করে দেয়। পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে ও পাশ্চাত্য জীবনে আকৃষ্ট হয়ে এসব মেধাবীরা জীবনের তরে বিদেশে পাড়ি জমায়। ফলে দেশ হয় মেধা শূন্য। ঔপনিবেশিক নির্ভরশীলতা কখনো অবসান হয় না।

৯. **উপজাতীয় কোন্দল ও সংঘর্ষ সৃষ্টি** : উপনিবেশিক শক্তি অনুন্নত দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের ইন্ধন যোগায়। এতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিনাশ হয়, ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল যথা: কঙ্গো, কেনিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, কোরিয়া, সাইপ্রাস, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ডোমিনিকান রিপাবলিক এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

১০. **যৌথ ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা** : নয়া উপনিবেশবাদ অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারের জন্য যৌথ প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেয়। এটিকে যৌথ ঔপনিবেশিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির একার পক্ষে অন্যান্য শক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠে না। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ব্রিটেন, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি ঔপনিবেশিক শক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য সহায়তা করেছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন ও জোরদার এরূপ যৌথ উপনিবেশবাদের অনন্য দৃষ্টান্ত।

মূল্যায়ন (Evaluation)

পুরনো সেকালের উপনিবেশিকতার উপস্থিতি এখন বিলীন হয়েছে সত্য কিন্তু তার স্থলে আবির্ভূত হয়েছে নতুন ঔপনিবেশিকতা। নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি নানা কৌশল ও পদ্ধতিতে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশ বিস্তার লাভের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নতুন কৌশলে বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে নানারূপ সমস্যা বিরোধ সৃষ্টি করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি সংরক্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এতে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন অগ্রগতিই ব্যাহত হচ্ছে না বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। নয়া উপনিবেশবাদ যতদিন পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত না থাকবে ততদিন অনুন্নত দেশসমূহে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। নয়া উপনিবেশবাদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে হলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পরনির্ভরশীলতার পথ পরিত্যাগ করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হতে হবে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **উপনিবেশবাদ কী ?**
উত্তর : কোন বিদেশি জনগণের উপর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা।

২. **ঔপনিবেশিক শক্তি কারা ?**
উত্তর : ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ মূলত ইউরোপের দেশ। এদের অন্যতম হচ্ছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল।

৩. **ভারতীয় উপমহাদেশ কাদের উপনিবেশ ছিল ?**
উত্তর : ব্রিটেনের।

৪. **উপনিবেশবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি কী?**
উত্তর : সাম্রাজ্যবাদ।

৫. **উপনিবেশ মুক্ত স্বাধীন দেশ কারা ?**
উত্তর : ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র।

৬. **উপনিবেশ স্থাপনের কারণ কী ?**
উত্তর : ক. অর্থনৈতিক সুবিধা, খ. শাসন ক্ষমতার বিস্তার, গ. জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি, ঘ. ধর্মপ্রচার এবং ঙ. জাতীয়তাবাদী প্রেরণা।

৭. **উপনিবেশবাদের অবসান কবে শুরু হয় ?**
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে।

৮. **উপনিবেশবাদের অবসানের কারণ কী ছিল ?**
উত্তর : ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন।

৯. **উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী কয়েকজন নেতার নাম লিখ।**
উত্তর : মহাত্মা গান্ধী, নাসের, সুকর্ণ, নেহেরু প্রমুখ।

১০. **নব্য উপনিবেশবাদ কী ?**
উত্তর : ঔপনিবেশিক শাসকচক্র নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের উপর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পরোক্ষ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টাই হচ্ছে নব্য উপনিবেশবাদ।

১১. **ঔবনিবেশিক শাসকচক্র নব্য স্বাধীন দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় ?**
উত্তর : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।

১২. **নব্য উপনিবেশিক শাসকচক্রের কৌশলগুলো কী কী ?**
উত্তর : ক. অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, খ. সামরিক জোট গঠন, গ. সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ঘ. আসম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, ঙ. প্রযুক্তিগত দিক থেকে পরনির্ভরশীল করে তোলা ও চ. আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ।

১৩. **সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?**
উত্তর : ক. ঋণ প্রদান ও আর্থিক সহায়তা, খ. খাদ্য সাহায্য, গ. পণ্য সাহায্য, ঘ. প্রকল্প সাহায্য ও ঙ. মুক্ত বাজার অর্থনীতি।

১৪. **নব্য উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক হাতিয়ার কী ?**
উত্তর : ক. ঋণ প্রদান ও আর্থিক সহায়তা, খ. খাদ্য সাহায্য, গ. পণ্য সাহায্য, ঘ. প্রকল্প সাহায্য ও ঙ. মুক্ত বাজার অর্থনীতি।

http://thejobstudy.com Go to Contents

১৫. **নব্য উপনিবেশবাদের সাম্প্রতিক নজীর কোনটি ?**
উত্তর : ইরাক ও আফগানিস্তান।

১৬. **উপনিবেশবাদের সূচনা কখন?**
উত্তর: পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

১৭. **ভারতে প্রথম কোন বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটে?**
উত্তর: ওলন্দাজ।

১৮. **উপনিবেশবাদের প্রধান কারণ কী?**
উত্তর: অতিরিক্ত পণ্য বিক্রির জন্য বাজার দখল।

১৯. **উপনিবেশবাদ মূলত কত প্রকার ও কী কী?**
উত্তর: দুই প্রকার: স্বল্প এলাকা জুড়ে উপনিবেশ ও খ. বৃহৎ এলাকা জুড়ে উপনিবেশ।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) উপনিবেশবাদ কী ?
(খ) ঔপনিবেশিক শক্তি কারা ?

২. (ক) ভারতীয় উপমহাদেশ কাদের উপনিবেশ ছিল ?
(খ) উপনিবেশবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি কী?

৩. (ক)দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতার নাম লিখ।
(খ) শোষণমূলক কয়েকটি উপনিবেশের নাম লিখ।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. নব্য উপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝেন? এ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা আলোচনা করুন।
অথবা
নব্য উপনিবেশবাদী ব্যবস্থাপনা ছিল অনিবার্য।"–আপনার স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২. 'সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ'- বিশ্লেষণ করুন।

৩. উপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝায়? বর্তমান বিশ্বে উপনিবেশবাদের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা আলোচনা করুন।

৪. নব্য উপনিবেশবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কীভাবে শোষণ করছে বলে আপনি মনে করেন-আলোচনা করুন।

৫. নয়া বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক এর বর্তমান গতি-প্রকৃতি আলোচনা করুন?

অধ্যায় ১০

বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা
Globalisation & New World Order

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১০.১ ভূমিকা
১০.২ বিশ্বায়নের সংজ্ঞা
১০.৩ বিশ্বায়ন ও প্রত্যাশা
১০.৪ বৈশিষ্ট্যসমূহ
১০.৫ বিশ্বায়নের প্রভাব
১০.৬ ইতিবাচক প্রভাবসমূহ
১০.৭ নেতিবাচক প্রভাবসমূহ
১০.৮ নয়া বিশ্বব্যবস্থা
১০.৯ আমেরিকার নয়া বিশ্ব পরিকল্পনা
১০.১০নব্য বিশ্ব ব্যবস্থা ও সভ্যতার সংঘাত
১০.১১ইসলামী মৌলবাদ : বিশ্বের বিপদসংকেত
১০.১২মার্কিন অধিপত্যবাদের সংকোচনের প্রয়াস

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

বিশ্বায়নের ধারণা উপলব্ধি করা খুব সহজ নয়। একে অভিহিত করা হয়েছে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। বিশ্বায়ন নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। বর্তমান বিশ্বায়ন বিকশিত হয় সোভিয়েত নেতা ও সংস্কারবাদী মিখাইল গর্ভাচেভের 'পেরেস্ত্রৈকা' ও গ্লাসনস্ত' নীতি থেকে। সেখানে গর্ভাচেভ চেয়েছিলেন বিশ্বব্যবস্থার পুনঃসংস্করণ, উদারনীতি, নতুনভাবে বিশ্বচিন্তা, সকলের জন্য শান্তি, বৃহৎ শক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তি। গর্ভাচেভের এ নীতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকিয়ে রাখা। যদিও সফল হয়নি বরং হিতে বিপরীত হয়েছিল। পরবর্তীতে সিনিয়র জর্জ ডব্লিও বুশ 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির বহু প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করেন। তবে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর অতি দ্রুত নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯৯২ সালে জেনেভায় GATT-এর উরুগুয়ে রাউন্ড সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, GATT কে WTO তে পরিণত করা হবে। এপ্রিল ১৯৯৪ সালে মরোক্কোর মারাকাস এ WTO-র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে WTO আত্মপ্রকাশ করে। WTO-র মূল লক্ষ্য হলো "অবাধ বাণিজ্য" বা "প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য" বা "মুক্তবাজার অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠা করা। এটি করার জন্য বিদ্যমান সকল প্রকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উঠিয়ে দিয়ে বহুপাক্ষিক বা প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্য গড়ে তোলার জন্য WTO ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময় নির্ধারণ করে দেয়। উল্লেখ্য যে, এ ১০ বছর সময়কে বিশ্বায়নের দশক বলা হয়। এ সময়ের মধ্যে WTO-র বাণিজ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব

ি-ভাবনার চলাচল, দেশের, অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে-এসেছে সচলতার বিপ্লব।

- বহুধরনের কর্তৃত্বের উদ্ভব : বিশ্বে বিভিন্ন সংগঠনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্বব্যাপী বহু আন্দোলনের প্রসারের হাত ধরে বহু ধরনের কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়েছে।
- বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব : বিশ্বায়নের ফলে বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংগঠন,সকলেই নিজ নিজ কার্যপরিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যস্ত।
- সমস্ত বিশ্বে কর্তৃত্বের সংকট : রসনুর মতে, সমস্ত বিশ্বে কর্তৃত্বের সংকট দেখা গেছে। ব্যক্তি এখন অনেক বেশি দক্ষ, অনুভূতিসম্পন্ন, স্বাতন্ত্রপ্রিয়। তার ফলে, ঐতিহাসিক কারণে আনুগত্য প্রদর্শন না করে কর্তৃপক্ষের কাজ বিচার করে আনুগত্য প্রদর্শনের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। এখন ব্যক্তি অনেক বেশি সচেতনভাবে স্থির করে, কখন কতটা কার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। তার ফলে, বহু প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাজন লক্ষ করা যায়।
- বিশ্বব্যবস্থার দ্বিবিভাজন : ঐসব পরিবর্তনের ও বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বব্যবস্থা আজ দুভাগে বিভক্ত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বের পাশে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। Global Civil Society গড়ে উঠছে। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কর্তৃত্বের সঙ্গে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও নিরন্তর আদান-প্রদান চলছে। তার ফলে, জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা, তার কূটনৈতিক কার্যাবলি ও সামরিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন এসেছে। বেসরকারি সংগঠনের সামনেও বহু সুযোগ ও সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ উপস্থিত।

বিশ্বব্যবস্থার এ বিভাজনকে কেন্দ্র করে বহু নতুন নতুন ধারার উৎপত্তি হয়েছে :

- ⇨ জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকতাকরণ হয়েছে।
- ⇨ তার ফলে সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে।
- ⇨ সেই সঙ্কোচনের সুযোগে দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের ধারাসমূহ পুষ্ট হয়েছে।
- ⇨ বহুমুখী সংস্কৃতির (Multi-culturalism)-এর প্রসারণ ঘটেছে।

Fred Halliday-এর মতে, বিশ্বায়নের প্রবাহ যে সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে, তা নয়।

- বিশ্বায়ন বিশ্বজনীন (Universal) ও বিশেষ স্থানীয় (Particular) ভাবধারার মধ্যে আপাত বিরোধিতাকে প্রতিফলিত করেছে।
- বিশ্বায়নের প্রবাহে আমূল পরিবর্তন ও অবিচ্ছিন্নতা, উভয় ধারার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।
- বিশ্বায়ন নিখিল ধরণীব্যাপী আধুনিকতার অগ্রদূত হলেও আধুনিকতা বিরোধী মৌলবাদী চিন্তাধারার প্রকাশের জন্য বিবৃত।
- বিশ্বায়ন কেবল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর ধারণার সঙ্গে সমার্থক-এ অনুমান ও ধারণা ভুল।
- ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও মুক্ত বাজারের ধারণাকে সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে-সে বিশ্বাসও ভুল।
- বিশ্বায়ন ধরণীর বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে সুমহান ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্রোত। বিশ্বায়নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়, যেমন–

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Economic Features)

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধারার পরিবর্তন।
২. মূলধনের মুক্ত চলাচল।
৩. বেসরকারিকরণের প্রবণতা।
৪. বহুজাতিক সংস্থার প্রসার।

৫. জ্ঞানভিত্তিক সেবামূলক কাজের প্রসারণ ও বিশ্বব্যাপী আদান-প্রদান।
৬. নমনীয় মুদ্রা-বিনিময় হার।
৭. নিয়ন্ত্রণবিহীন শ্রমবাজার।
৮. রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস।

রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Political Features)

১. জাতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্কোচন।
২. ন্যূনতম রাষ্ট্রের ধারণার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি।
৩. আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আয়তন সঙ্কোচন।
৪. বামপন্থী আন্দোলনের ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রভাব হ্রাস।
৫. বিভিন্ন ধরনের মানবকল্যাণকামী আন্দোলনের প্রসার।
৬. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা।
৭. জনগণের রাজনৈতিক অনীহা বৃদ্ধি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Social Features)

১. বহুমুখী সংস্কৃতির (Multi-culturalism) প্রসার।
২. সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ।
৩. নতুন Tele electronic সংস্কৃতির প্রসার।
৪. তথ্য-চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানের মুক্তবাজার।
৫. শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন।
৬. যুক্তিবাদী জ্ঞান ও গবেষণার বিকাশ ও প্রসার।

১০.৫ বিশ্বায়নের প্রভাব (The Impacts of Globalisation)

বিশ্বায়নের প্রভাব, সুফল ও কুফল নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ চলছে। বিশ্বায়ন বিষয়ে উদার অর্থনীতিবিদ্‌দের (Liberal Economists) মত হলো–

ক. বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে গুণগত রূপান্তর এসেছে। বিশ্বায়ন ব্যক্তি, পরিবার ও কোম্পানির জন্য অধিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।
খ. বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস পাবে।

বাস্তববাদী ও Mercantalist-দের মত হলো :

ক. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করবে।
খ. বিশ্বায়নের ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশন তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারাবে না।
গ. সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। বরং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আরও প্রসারিত হবে।

নয়া-মার্ক্সবাদীদের মতে :

ক. বিশ্বায়ন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে একটি বিশ্ব-অর্থনীতি গড়ে তুলবে।
খ. জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বায়নের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হ্রাস পাবে।
গ. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্বে বৈষম্য বৃদ্ধি করে বড় বড় শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

১০.৬ ইতিবাচক প্রভাবসমূহ (Positive Effects Impacts)

১. **তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি :** বিশ্বায়ন দক্ষতার বিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব ও মানবিক সম্পর্কগত বিপ্লব জেনে মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। যুক্তিবাদী জ্ঞান সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে ঐ সকল দেশে NINC ও TNC সহ অনেক উন্নত

http://thejobstudy.com Go to Contents

দেশসমূহের মূলধনের বিনিয়োগে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রচুর অর্থনৈতিক বিনিয়োগের সাথে সাথে ঐ সকল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিও নিয়ে আসে। ফলে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগে। তার ফলে, বিবিধ মানবিক সমস্যার (সামাজিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসাগত, শিক্ষাগত) সমাধানের নতুন নতুন কৌশল ও পথ অর্জিত হয়েছে। নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের সম্ভবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **মানব সভ্যতা :** বিশ্বায়ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও প্রসারে সহায়তা করেছে। তার ফলে বহু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। Multi-culturalism মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩. **ঐক্যবদ্ধতা :** বিশ্বায়ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। বিশ্বায়ন আধুনিক সত্তার (Modern indentity) বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪. **কর্তৃত্বের আনুগত্য :** বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়েছে। বিশ্বে বহু নতুন নতুন অতিজাতীয় (Trans-national) সংগঠনের উৎপত্তি ও প্রসার হয়েছে। বিশ্বের বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য বহু নতুন বিধি ও নিয়ম কার্যকরী করা হয়েছে। তার ফলে, বহুসংখ্যক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিশ্বব্যবস্থার বিভাজন ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের উদ্ভব-ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দের পরিধিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। ব্যক্তি এখন উপযোগিতা ও কার্যদক্ষতা বিচার করে কোনো কর্তৃত্বের প্রতি তার আনুগত্য কতটা প্রকাশ করবে তা স্থির করছে। সেদিক থেকে বিশ্বায়ন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

৫. **কর্পোরেশনের প্রসার :** বিশ্বায়ন বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রসারের সাহায্য করেছে। এসব কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রযুক্তি, তথ্য, মূলধন ও জ্ঞানভিত্তিক সেবার আদান-প্রদান বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে।

৬. **সজাগ ও সতর্ক :** বিশ্বায়ন মানবসমাজের বিবিধ সমস্যা, তার গুরুত্ব ও বিপদ সম্পর্কে বিশ্বের সব সচেতন মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে তুলেছে। বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য, বহু দেশের দুঃসহ দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার নিষ্ঠুর অস্বীকৃতি, বিশ্বময় নারী জাতির লাঞ্ছনা-বঞ্চনা নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী আলোচনা-বিতর্ক চলছে। সমস্ত পৃথিবীতে নারীবাদী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

৭. **শান্তি-আন্দোলন :** বিশ্বায়ন যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে যুদ্ধের প্রতি জনগণের অনীহা বৃদ্ধি করেছে। তার ফলে, আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে।

৮. **গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা :** বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অতি-জাতীয় আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. **সচেতনতা ও বিশ্ব জনমত :** বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দরিদ্র জনগণের দুঃসহ বঞ্চনার প্রতি সমস্ত বিশ্ব জনগণকে সচেতন ও সজাগ করে ধীরে ধীরে এ অন্যায় বৈষম্য, এ নীতিহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী সচেতনতা ও বিশ্ব জনমত গড়ে তুলেছে।

১০. **মূলধনের অভাব পূরণ :** তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবে কোনো উৎপাদনশীল প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে না। ফলে দেশটি শিল্পায়ন থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে ঐ সকল দেশে MNC ও TNC সহ অনেক উন্নত দেশের মূলধনের বিনিয়োগের ফলে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

১১. **ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষিত :** বিশ্বায়ন বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে, কোনো একটি কোম্পানি বাজারে একচেটিয়া কোনো কার্টেল সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে ভোক্তাদের পছন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যা পরোক্ষভাবে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা করে।

১২. **বাণিজ্য বৃদ্ধি :** বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি বিশ্বায়ন দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সেবাখাতে কোনো বাধা সমর্থন করে না। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অভাবিত ভাবে Trade volume বৃদ্ধি পায়।

১৩. **পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি :** এ ব্যবস্থায় বাজারে কোনো সিন্ডিকেট সৃষ্টি হবার আশংকা থাকেনা। বাজারে অনেক কোম্পানির পণ্য বিরাজমান থাকে। ফলে কোম্পানিসমূহ নিজ পণ্যের গ্রাহক সৃষ্টির জন্য পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে।

১৪. **কম খরচ :** ভোক্তাদের সহজাত প্রবৃত্তি হলো কম খরচে ভালো জিনিস ক্রয় করা। এতে কোম্পানি সমূহ বাধ্য হয়ে কম খরচে বাজারে ভাল পণ্য সরবরাহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে তা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান।

১৫. **ব্যবস্থাগত উন্নতি :** উন্নত ব্যাবস্থাপনার ফলে যে কোনো কোম্পানী কম খরচে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও খাবার যোগান দিতে পারে। ফলে কোম্পানিসমূহ তাদের প্রশাসনে সৃজনশীল ও উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যাবস্থাপনা জগতে নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে।

১৬. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** একটি দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সূচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে।

১৭. **সরকার ও অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন :** বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক দেশের অর্থনীতি ও সরকার কাঠামো অন্য দেশের অর্থনীতি ও সরকার কাঠামোর ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে সরকার ও অর্থনীতি কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে যা নাগরিক সংবেদনশীল।

১০.৭ নেতিবাচক প্রভাবসমূহ (Negetive Effects Impacts)

১. **বিশ্বায়ন ও মাথাপিছু আয় হ্রাস :** এটা প্রমাণিত যে, বিশ্বায়নের সুযোগ-সুবিধা বা সুফল অসমভাবে বন্টিত হচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, চিলি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ভারত প্রভৃতি দেশ বিশ্বায়নের সুযোগকে কাজে লাগতে পেরেছে। এ সকল দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭-৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার অনেক দেশ বিশ্বায়নের ফলে সমস্যায় পড়েছে। যেমন : মাদাগাস্কার, রাশিয়া, কাজাখস্তান, ভেনিজুয়েলা, সাব-সাহারার আফ্রিকান দেশসমূহ ইত্যাদি। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বিদেশি বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এ কারণে বিশ্বের ৮০ টিরও বেশি দেশের মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছে। ৪০টি দেশে বিগত এক দশক ধরে মাথাপিছু আয় ৩% হারে স্থবির হয়ে আছে। সাব-সাহারান আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং Commonwealth স্বাধীন রাষ্ট্রের ৫৫টি দেশের মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে কমছে।

২. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত :** বিশ্বায়নের ফলে শ্রমবাজার তথা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন এসেছে। কারণ অতিদক্ষ বা উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়ে চলছে। কিন্তু এটাই সত্য যে, অতি দক্ষ মানুষের সংখ্যা অনেক কম। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, বহুজাতিক খাতের নির্বাহী, বিনোদন ব্যবস্থাপক - এ ধরনের উচ্চ বেতনের অভিজাত পেশাজীবীদের চাহিদা বাড়ছে, অথচ অদক্ষ শ্রমের বাজার নিজ নিজ দেশের সীমানায় আরও সংকুচিত হয়েছে।

৩. **বিশ্বায়ন বৈষম্য বাড়িয়েছে :** বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসমতা বা বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে বিশ্বায়ন। ধনী দেশগুলোতে বসবাসরত বিশ্বের মাত্র ৫% মানুষের সঙ্গে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর ৫৩% মানুষের আয় ব্যবধান ১৯৬০ সালে ছিল ৩০:১, ১৯৯০ সালে ৬০:১। বর্তমানে ৭৪:১। এ চিত্র ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যকার দ্রুত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিশ্বায়নের অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

৪. **বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংকট :** বিশ্বায়ন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সুফল ধনী দেশগুলোই হস্তগত করছে।

বহু ক্ষেত্রের দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বায়নের আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারছেনা। তার জন্য বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করেছে যে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধানে (Economic gaps) ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। বিশ্বায়ন একই দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে।

বিশ্বায়নের ফলে দেশে দেশে ও পুঁজির অবাধ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কালো বাজারের অর্থ বেশি বেশি করে শেয়ার বাজারে লগ্নি হচ্ছে। এ প্রবণতা বিশ্ব অর্থবাজারের ঝুঁকিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করছে। কেননা হঠাৎ করে একটি দেশের অর্থবাজারের বিপুল পরিমাণ পুঁজি অনুপ্রবেশ করছে। আবার ঐ দেশগুলোর পুঁজিবাজারে সমস্যা দেখা দিলে সমস্ত বিদেশি পুঁজি নিমেষেই সরিয়ে নেওয়া হয়। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ এবং পূর্ব এশিয়ার বাজারদর এর উদাহরণ। ১৯৯৬ সালে Indonesia, Malaysia, South Korea, Philippines, Thailand - এ পুঁজিপ্রবাহ বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৭ সালে এ সকল দেশের পুঁজিবাজারে সমস্যা দেখা দিলে রাতারাতি ১২ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যায়। এতে করে ঐ সকল দেশে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়।

৫. **বিশ্বব্যাংক ও IM- এর পরামর্শ :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিশ্বব্যাংক ও IMF কৃষিখাতে ভর্তুকি না দেওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে। আত্মাহুতি দিয়েছে জাপানের কৃষক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়নের এ কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে সমাবেশ করছে।

৬. **বিশ্বায়ন ও কর্মসংস্থানহীনতা :** বিশ্বায়নের যুগে মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে নি। বরং বেকারত্ব বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রসারণ শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে নি। বিশ্বায়নের ফলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় তা কর্মসংস্থানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। টিকে থাকার জন্য তাই বিভিন্ন দেশে নানা রকম শ্রমনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রম আইন সংশোধন করায় কর্মসংস্থান হয়েছে নিরাপত্তাহীন। কারণ বিশ্বায়ন বেসরকারি নিয়মিত ও নিশ্চিত দীর্ঘকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত কমে যাচ্ছে। যেমন - চিলিতে মোট কর্মসংস্থানের ৩০% ও কলাম্বিয়ায় ৩৯% অনিশ্চিত চুক্তিভিত্তিক কাজ করছে। বিশ্বায়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও তা ঘটেছে অসংঘটিত ও অনানুষ্ঠানিক খাতে। যেমন - ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন কর্মসংস্থানের ৮৫% হলো অনানুষ্ঠানিক। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাত সংকুচিত হওয়ায় বেকারত্ব ব্যাপক হারে বাড়ছে।

৭. **শ্রমবাজার :** বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের সচলতা বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে শ্রমবাজারের সচলতা বৃদ্ধি পায় নি।

৮. **সম্পদের ব্যবহার :** অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্বের সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহারেও সাহায্য করে নি। বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সম্পদের কাম্য ব্যবহার হবে - সে ধারণাই ভুল।

৯. **বিশ্বায়ন এবং পরিবেশ :** বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য বিশ্বায়ন দায়ী। দরিদ্র মানুষেরা পরিবেশ বিপন্ন করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম দায়ী হলেও বিশ্বায়ন সৃচিত ধনীদের ভোগের খেসারত দিতে হচ্ছে দরিদ্রদের। যেমন - উন্নত ধনী দেশগুলোতে বসবাসরত বিশ্বের মাত্র ৫ ভাগ মানুষ ব্যবহার করে বিশ্বের উৎপাদিত মোট কাগজের ৮৪%। অথচ এ কাগজ উৎপাদনের ফলে অনুন্নত দেশগুলোর বন উজাড় হচ্ছে।

১০. **অস্ত্র প্রতিযোগিতা :** বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে মারণাস্ত্রের বাজার প্রসারিত হয়েছে। তার ফলে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সামরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক উত্তেগ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে।

১১. **আন্তর্জাতিক সংগঠন :** বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ধনী দেশগুলোর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী সদস্যরা ঐ সব সংগঠনকে নিজেদের স্বার্থসাধনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে।

১২. **বৈদেশিক ঋণ :** বিশ্বায়নের যুগে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের বৈদেশিক ঋণভার বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে।

১৩. **বিশ্বায়ন এবং সাংস্কৃতিক বিপন্নতাবোধ :** বিশ্বায়ন মানুষের সামনে নানা ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সংস্কৃতির প্রবাহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। বাস্তবে এ সংস্কৃতির বিস্তার একমুখী বা ধনী দেশ থেকে গরিব দেশের দিকে ধাবমান। হলিউড সংস্কৃতি বিপন্ন করেছে বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে। উন্নত দেশগুলোর এ বিনোদন ব্যবসা বর্তমানে সবচেয়ে লাভজনক খাত। বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে। একমুখী এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিশ্বময় হওয়ায় মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ অনেক দেশের পূর্বের সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে বিনষ্ট করেছে।

১৪. **বিশ্বায়ন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা :** ব্যক্তি মানুষের নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি করছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের প্রভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির ভালো দিক যেমন রয়েছে, তেমনি মাদক দ্রব্য, অস্ত্র ও কালো টাকার বিস্তার হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। কালো টাকানির্ভর মাদক দ্রব্য, নারী ও অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসা বর্তমানে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ। এতে করে রাস্তাঘাটের অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই সাথে ব্যক্তি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে।

১৫. **রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে:** বিশ্বায়ন বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক সংঘাত বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। অশুভ রাজনৈতিক ও বাণিজ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য অস্ত্রের বিস্তার ঘটানোর ফলে রাজনৈতিক সংঘাত বেড়ে চলেছে। যেমন - ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে বিশ্বের ৬১টি বড় ধরনের সশস্ত্র সংঘাত ঘটেছে। এর মধ্যে মাত্র ৩টি সংঘাত আন্তঃরাষ্ট্রীয়। বাকি সবগুলো হলো দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক সংঘাত।

১৬. **মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ :** নতুন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অনেক দেশে নয়া-মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে।

১৭. **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা :** বিশ্বায়ন অতি-জাতীয়তার (Trans-nationalism) কুফল বৃদ্ধি করেছে। সাম্প্রতিক কালে জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী অপরাধমূলক কার্যকলাপ, সন্ত্রাসবাদ ও ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি-রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম (Global Trade Regime) দরিদ্রতম দেশগুলোর স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার জন্য মূলত WTO সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিশ্বায়নের যুগে WTO তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

- প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী Joseph Stiglitz স্বীকার করেছেন যে,
  - ⇨ বিশ্বায়ন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে না।
  - ⇨ বিশ্বের পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখতে সাহায্য করছে না।
  - ⇨ বিশ্ব অর্থনীতির স্থিরতা (Stability) বজায় রাখতে পারছে না।

তবে তাঁর মতে, বিশ্বায়নে গতি রোধ সম্ভব নয়। মূল সমস্যা বিশ্বায়নকে নিয়ে নয়।

মূল সমস্যা, যে উপায়ে বিশ্বায়ন পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যেই নিহিত আছে। অর্থভাণ্ডার এমন সব বিধিনিয়ম রচনা করেছে যে তার ফলে কেবল ধনী, শিল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা হচ্ছে।

তাঁর মতে, ঐ সব সংস্থা বিশ্বায়নকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অর্থনীতি ও সমাজকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছে।

Stiglitz দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, ঐ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। দরিদ্র জনগণের দাবি, পরিবেশের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করলে হবে না। বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নতুন যুগের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বায়ন বিশ্বের সমষ্টিগত কার্যধারা ও বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণের ওপর আলোকপাত করে।

Joseph Stiglitz মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ বিশ্বায়নের ধারণা সমর্থন করেন (Globalization with a human face)।

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বিশ্বায়নের অনেক সুফল ও কুফল আছে। সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক দিক থেকে অনিয়ন্ত্রিত কয়েকটি দেশের পক্ষে সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। কিন্তু অন্য অনেক দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত বিকৃতি (Structural distortions) ও বৈষম্য আনবে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট বঞ্চনা ও অসাম্য নিরাপত্তাহীনতাকে বাড়িয়ে চলছে। এটি মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় ও বৈশ্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। পণ্যের বিশ্বায়নের সাথে সাথে মানবিক বিশ্বায়নেও মনোযোগী হতে হবে। UNDP তার "Human Globalization" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে UNDP উল্লেখ করেছে যে, বিশ্বে ১৩০ কোটিরও বেশি মানুষ দিনে ১ ডলারের নিচে অর্থ উপার্জন করে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, প্রায় ৮৪ কোটি মানুষ পুষ্টিহীন অবস্থায় টিকে আছে এবং প্রায় ১৬ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। ২৫ কোটিরও বেশি শিশু শিশুশ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। ৮৮ কোটিরও বেশি মানুষ ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। নভেম্বর ২০০৯ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন জানিয়েছেন যে, বিশ্বে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভোগে। তিনি আরো বলেছেন, যদি ক্ষুধার যন্ত্রণা নিরসনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে তিনি অনশন করবেন। পণ্যের বিশ্বায়নের সাথে সাথে মানবিক বিশ্বায়নও জরুরি।

পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়নের কুফলের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদ, উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করে ঐ সব আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। অতি-জাতীয় প্রতিবাদী আন্দোলনও (Trans-national Resistance Movement) গড়ে উঠেছে।

বিশ্বায়ন আজকের যুগে এক অনিবার্য বাস্তবতা। তৃতীয় বিশ্বের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব বেশি হলেও এর কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। সুতরাং বিশ্বায়নকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের কবল থেকে মুক্ত করে একে অধিকতরও মানবিক করে তুলতে হবে। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি বিশ্বায়নের সুযোগকে পুরোপরি কাজে লাগাতে হবে।
বিশ্বায়নের সুফল ও সুবিধা কীভাবে বন্টন করা যায়, তাকে ঘিরেই আন্দোলন। কুফল ও কুপ্রভাব কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে- সেই নিয়েই বিতর্ক।

আজ বিশ্ব সমাজের সামনে কতকগুলো প্রশ্ন উঠেছে-

- বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব কী আরও অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে?
- বিশ্বায়নের সুফল কীভাবে ধনী ও দরিদ্র্য দেশগুলোর মধ্যে বণ্টিত হবে?
- বিশ্বায়নের কুফল দূর করার জন্য রাষ্ট্রগুলোর কী ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

ঐ সব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের গর্ভে লুকিয়ে আছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Point)

- বিশ শতকে ১৯৬০-এর দশক থেকে বিশ্বায়নের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।
- জেমস রসনুর মতে, বিশ্বায়ন একই সঙ্গে ঐক্যসাধনকারী শক্তি ও অনৈক্যসাধনকারী প্রবণতাকে পুষ্ট করেছে।
- বিশ্বায়ন এনেছে -দক্ষতার বিপ্লব, তথ্য ও প্রযুক্তির বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব, সম্পর্কগত বিপ্লব, সংগঠনগত বিস্ফোরণ, সচলতার বিপ্লব, বহু ধরনের কর্তৃত্বের ও বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বায়ন নিয়ে এসেছে কর্তৃত্বের সংকট ও বিশ্বব্যবস্থার দ্বিবিভাজন (রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্ব ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব)।
- বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে Multi-culturalism-এর প্রসার ঘটেছে।
- বিশ্বায়নের অনেক সুফল আছে। বিশ্বায়ন মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। বহু মানবিক সমস্যার নতুন নতুন সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদানের ধারা প্রসারিত করেছে। জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধের কুফল, দারিদ্র্যের বঞ্চনা, পরিবেশ-দূষণ বিষয়ে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠেছে ও ঐ সব অভিশাপ দূর করার জন্য গণ-আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে।
- বিশ্বায়নের অনেক কুফলও দেখা গেছে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এবং একই দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস করেছে। অর্থ বাজারের (Financial market) অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মারণাস্ত্রের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। বহু দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপদের সম্মুখীন। বিশ্বায়নের প্রতিবাদে বহু অঞ্চলে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো ধনী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থে তাদের দ্বারাই পরিচালিত। দরিদ্র দেশগুলোর স্বার্থ ও মতামত উপেক্ষিত।
- Joseph Stiglitz-এর মতে, বিশ্বায়ন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর স্বার্থে, পরিবেশের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে কাজ করছে না। তাঁর মতে বিশ্বায়নের গতিরোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের ধারণার ত্রুটি নয়, ত্রুটি রয়েছে বিশ্বায়ন পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে। তাই পরিচালনা ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ বিশ্বায়নের ধারণা সমর্থন করেন।

১০.৮ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা (New world order)

বিশ্ব এখন একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। একুশ শতকের বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে আগ্রহ অনেকের। বিশ শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা নানা কারণে আলোচিত/সমালোচিত হয়েছিল। দুদুটো বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন, বৃহৎ শক্তির মাঝে প্রভাব বিস্তার করার প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যবস্থার বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু কেমন হবে একুশ শতকের বিশ্বব্যবস্থা? কী হবে তার রাজনীতি? কোনো কোনো বিষয় প্রাধান্য পাবে বিশ্বরাজনীতিতে?

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকরা এ নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের দিকে তাঁরা দৃষ্টি দিয়েছেন। লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্নধারার দার্শনিক, ভাষাপণ্ডিত ও এম আই টি-র অধ্যাপক নোয়াম চমস্কিও। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর গণতন্ত্রের যে উচ্ছ্বাস বিশ্বের সর্বত্র লক্ষ করা যায় চমস্কি তার সমালোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র নয়, রয়েছে পলিয়ার্কি।

১০.৯ আমেরিকার নয়া বিশ্ব পরিকল্পনা

পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের আকস্মিক ভাঙন এবং বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিহীনতা ও নাজুক অবস্থার এক ক্রান্তিলগ্নে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ার সিনিয়র বুশ পরিকল্পনা বিরানব্বইয়ের একটি চমকপ্রদ এবং আলোচিত ঘটনা। স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্বরিত বিজয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণা। মি. বুশ ইরাকের কুয়েত দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন নেতৃত্বে বহুজাতিক

বাহিনীর সফলতা এবং এরই মধ্যে নিহিত মূল চেতনাকে সামনে রেখে তার নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেন। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের গৃহীত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার-এর ধারণা এরূপ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা হচ্ছে অন্যান্য জাতিগুলোর সাথে একত্রে কাজ করার নয়া পদ্ধতি। সকল প্রকার বিরোধের সহজ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান করা, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের যথাযথ প্রয়োগ, জাতিসংঘকে সুদৃঢ় করা এবং সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রুশের এ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থাকে নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ এটাকে একটা ধোঁকা বা আই ওয়াশ বলে মন্তব্য করেছেন। এ নিউ ওয়ার্ল্ড পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে মার্কিন স্বার্থেই প্রণীত বলে মনে করেন। সমাজতন্ত্রের পতনের পর একক পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে স্থান দেখছে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তরালে শক্তিহীন এবং নিরাপত্তাহীন জাতিগুলোকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ করার ষড়যন্ত্র এতে নিহিত রয়েছে। মি. বুশ উপসাগরীয় যুদ্ধে যখন কুয়েত মুক্ত করার জন্য ইরাকি আগ্রাসনের প্রতিহত করছিলেন তখনি তিনি তার পশ্চিমা মিত্রদের নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়ে এতে শরিক হতে অনুপ্রানিত করেছিলেন। নতুন বিশ্ব গড়ার নামে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবার সময় বুশ মন্তব্য করেন, এটা তেলের যুদ্ধ নয়, এটা হবে এমন এক নতুন বিশ্বের সূচনা যেখানে দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের আগ্রাসনকে আর কখনই সহ্য করা হবেনা। কুয়েত দুর্বল, তাই তার বিরুদ্ধে আগ্রাসী ইরাকের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার দায়িত্ব পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকা ও তার মিত্রদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যদি কোনো বিরোধ হয় সেটাই শুধু নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আওতায় গ্রহণযোগ্য এবং তা প্রতিহত করা মার্কিনীদের পবিত্র দায়িত্ব। আর এর সাথে তাদের কোনো স্বার্থ জড়িত না হলে তাতে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই এবং সেটা কোনো আগ্রাসন বা অন্যায় নয়।

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণা বাস্তবিকই একটি ফাকা বুলি বা আদৌ বাস্তবভিত্তিক নয়। কেননা শঙ্কাগ্রস্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত বহু রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলো আপন ক্ষেত্রে অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ। আবার উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বীয় স্বার্থে দুর্বলের ওপর অহরহ চালাচ্ছে অন্যায় এবং অবৈধ আগ্রাসন। ফলে গোটা বিশ্ব দুটি প্রান্তিক মেরুতে অবস্থান করছে যার ঘটনাই এমন প্রমাণিত হয় নি। তাছাড়া নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা রূপরেখায় আদর্শের কোনো ভিত্তি নেই। এখানে দুর্বল ও সবলের ব্যাখ্যা এবং ধারণাও নিতান্তই ফাঁকা বুলি। আগ্রাসন, মানবতা, ন্যায়নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো মার্কিন এবং ইহুদিদের মনগড়া প্রতারণামূলক। তাই এ শ্লোগান নিতান্তই একটি হাস্যকর বিষয় বলে কয়েক বছর পরেও এর অনুকূলে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর তেমন কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

১০.১০ নব্য বিশ্ব ব্যবস্থা ও সভ্যতার সংঘাত (New world order and Clash of Civilizations)

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্বি-মেরুকরনের বুনিয়াদ ধসে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্ব ভাগ্যবিধাতা বলে জাহির করতে লাগল। ঘোষিত হলো নব্য বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব মার্কিন কংগ্রেসের প্রদত্ত ভাষণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বললেন বিশ্বশান্তি ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা নির্মান করতে হবে। নব্য বিশ্ব ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় তা জর্জ বুশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। এরপর ১৯৯৩ খ্রিঃ সেপ্টেম্বরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা এন্টনি লেক ক্লিনটন ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় বাজারকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয় এবং এখন সেই বিপদ কেটে গেছে। এখন মুক্ত অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিধি প্রসারিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বিশ্ব ব্যবস্থা হলো বাজারকেন্দ্রিক মুক্ত অর্থনীতির আধিপত্য স্থাপন আর তার একমাত্র নিয়ন্ত্রক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন মুলুকে অন্যরকম ভাবনাচিন্তার আভাস মিলল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামুয়েল পি হান্টিংটন ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সুবিখ্যাত Foreign Affairs পত্রিকায় The Cash of Civilizations নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারপর ১৯৯৬ সালে ঐ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরবর্তী

বিশ্বরাজনীতির চালচিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য হান্টিংটন সভ্যতাকেন্দ্রিক রাজনীতির একটি বিকল্প মডেল নির্বাচন করছেন। এ মডেলের ভিত্তিতে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির পালাবদল ব্যাখ্যা করেছেন এককেন্দ্রিক বাস্তিক বিশ্ব নয়, জব্জুর এ বিশ্বের সংঘাতের মূলসূত্র কী তার পুঙ্খানপুঙ্খভাবে বিবরণ বিশ্লেষণ প্রস্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যাপক হান্টিংটন তার গ্রন্থে বিশ্বের মোট নয়টি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বলয়ের কথা বিবৃত করেছেন। এগুলো হলো পাশ্চাত্য জগৎ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইসলামীয়, কনফুসিয়ানস হিন্দু, পূর্ব ইউরোপের রক্ষণশীল খ্রিস্টান অঞ্চল, বৌদ্ধ ও জাপানি। তার মতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্ব রাজনীতি এ সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতি আগের মতো দ্বিকেন্দ্রিক নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এককেন্দ্রিক নয়, আসলে বিশ্ব রাজনীতির চরিত্র বহুমাত্রিক। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির নির্ণায়ক শক্তি Global politics has become multi polar and multi civilization

হান্টিংটন দেখিয়েছেন যে এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতির কথা বলে অনেকেই সাংস্কৃতিক বিভাজনের মূল বিষয়টি থেকে দৃষ্টি সরাতে চেয়েছেন। প্রচলিত ধারণা হলো পাশ্চাত্য জগতের ও অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদী বিশ্বে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সূত্রে প্রোথিত করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। যদি ভারতের কথা বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনে এক ভাষা, এক প্রশাসন ও সর্বভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার কাঠামো রচিত হলেও ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত ছিল।

হান্টিংটন সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে ক্ষমতার রাজনীতি সংস্কৃতির ওপর একাত্মভাবে জড়িত। তার ভাষায় The distribution of cultures in the world reflects the distribution of power. Trade may or may not follow the flag, but culture alsmot always follows power একথা সত্য, আঠারো উনিশ শতকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ও বিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজনীন প্রভাব প্রতিপত্তি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জাতিগত, ধর্মীয় আন্তঃপরিচয়ের শক্তি খর্ব হয় নি। পক্ষান্তরে অ-পাশ্চাত্য জাতি ও সংস্কৃতির ক্রম অগ্রগতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। জোসেফ নী নামক একজন বিশিষ্ট মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সাংস্কৃতিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তার মতে, আপাতদৃষ্টিতে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হলো প্রবল শক্তি সে তুলনায় সাংস্কৃতিক শক্তি অনেক নমনীয় অধ্যাপক নী মনে করেন, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটলেই সাংস্কৃতিক শক্তির প্রাবল্য বৃদ্ধি পাবে। তিনি লিখেছেন, If a state's culture and ideology are attractive, others will be more willing tof follow একটি দেশের বহিরঙ্গ শক্তি বৃদ্ধি পেলে অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যাপক হান্টিংটন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে বিশ্বের অন্যত্র আধুনিকীকরণের দুটি বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে যেমন, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বাধন সুদৃঢ় হয়েছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বহির্ভূত জাতিগোষ্ঠী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে। ব্যক্তিগত স্তরে আধুনিকীকরণের অভিঘাতে নিসঙ্গতা বোধ জাগ্রত হয়েছে। পূর্বের সামাজিক রীতিনীতি ও বন্ধন শিথিল হওয়ায় মানুষের মনে আত্মপরিচয়ের সংকট উদ্ভূত হয়। এ পরিস্থিতিতে মানুষ নিজস্ব ধর্মের মধ্যে নিজের হারানো সত্তাকে ফিরে পেতে চায়। তার মতে পুরাতন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীগুলো অন্যান্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজের সভ্যতার বাধনকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়। বাংলার নবজাগরণে শিক্ষিত সম্প্রদায় এভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে নিজেদের জাতীয় সত্তার ঐকান্তিক অনুসন্ধানে প্রকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গিয়ে হান্টিংটন রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

১০.১১ ইসলামি মৌলবাদ : বিশ্বের বিপদ সংকেত

অধ্যাপক হান্টিংটন ইসলামীয় মৌলবাদ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। ইসলামীয় মৌলবাদের প্রসার প্রথমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে প্রতিফলিত হয়। পরে তা

রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ইসলামীয় মৌলবাদে দীক্ষিত হয়। তার ভাষায় While students and intellectuals formed the militant cadres and shock troops of Islamist elements, urban middle class people made up the bulk of the active membership. ভারতে ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গি সংগঠনগুলো যথা সিমি, হুজি আর পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈয়বা সাংগঠনিক কাঠামো লক্ষ করলে দেখা যায় হান্টিংটনের ব্যাখ্যা কতটা সঠিক।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইসলামীয় মৌলবাদ রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। ইরান ও সুদানে ইসলামীয় শাসন বলবৎ হয়। এদিকে আশির দশক ধরে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আফগানিস্তানে তালিবানগোষ্ঠী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কাশ্মিরে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো তথাকথিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথে অগ্রসর হয়। জম্মু ও কাশ্মীর মুক্তিফ্রন্ট নামে গঠিত মঞ্চ ব্যাপক হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত।

কাশ্মিরে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সরাসরি কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন জানিয়েছে এবং পাশাপাশি অর্থ ও সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য জুগিয়েছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রায় ১২০০ মুজাহিদিন যোদ্ধা আফগানিস্তান, সুদান, তাজিকিস্তান থেকে কাশ্মিরে নিয়োজিত হয়। ইসলামীয় জঙ্গি কার্যকলাপ থেকে রাশিয়াও রেহাই পায় নি। আফগানিস্তানে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন তালিবান জঙ্গিদের সঙ্গে এক দশক ব্যাপী রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এরপর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তাজিকিস্তানে ও ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে চেচনিয়াতে ইসলামীয় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে সংশ্লিষ্ট হতে হয়।

অবশ্য ইসলামীয় জগতে একাধারে সংহতি ও বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান, মরক্কো, ইরান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক ইসলামীয় সংঘ স্থাপন করে। এছাড়া বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ নামে দুটি বেসরকারি সংস্থা বেসরকারি স্তরে ইসলামীয় সমাজের মধ্যে সংহতিসাধনের চেষ্টা চালায় কিন্তু ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। হান্টিংটন লিখেছেন যে ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো মূল শক্তি গড়ে ওঠে নি। ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, সৌদি আরব, তুরস্ক সকলেই কোনো একটি দেশের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি নয়।

হান্টিংটন যে সভ্যতার সংঘাতের কথা বলেছেন তা একুশ শতকের শুরু থেকে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বাণিজ্যের ওপর ধ্বংসলীলা হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হয়। আর ভারতের শুধু কাশ্মির নয়, অন্যত্র বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা চলতে থাকে। গত ২৬শে নভেম্বর ২০০৮ মুম্বাইয়ে তাজ হোটেলে ও অন্যত্র যে বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ড চলে, তাতে সমগ্র বিশ্বে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদ যে কতটা ভয়ঙ্কর তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

১০.১২ মার্কিন আধিপত্যবাদের সংকোচনের প্রয়াস

যদিও বিশ্ব রাজনীতির অভিমুখ এক কেন্দ্রিকতার দিকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে একক অধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত, কিন্তু মার্কিন আধিপত্যবাদকে একতরফা সুযোগ না দেওয়ার জন্য সাম্প্রদিককালে বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিকল্প গোষ্ঠী গড়ে তুলে চলেছে। এগুলোর মধ্যে সাংহাই কোঅপারেশন ওরগানাইজেশন ও ব্রাজিল রাশিয়া ভারত ও চীন-এর সমন্বয় গোষ্ঠী নাম উল্লেখ করা যায়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সাংহাই গোষ্ঠী নামে পরিচিত একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা বলয় গঠিত হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বি.আর.আই .সি একটি সুস্পষ্ট বিশ্বজনীন সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিগত ১৬ই জুন ২০০৯ খ্রি. রাশিয়ার ইকাটেরিন বার্গ-এ ব্রাজিল, ভারত, রাশিয়া ও চীনের রাষ্ট্রপ্রধানগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। এ শীর্ষ বৈঠকে বিশ্বে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী বিধিব্যবস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ চারটি দেশ বিশ্বের শতকরা ৪০ ভাগ জনগোষ্ঠীর অধিকারী, অথচ বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা অপ্রতুল।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **বিশ্বায়ন কী?**
উত্তর: বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ, সীমাহীন, বিশ্বব্যবস্থা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদারীকরণ।

২. **"Global village" ধারণার পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে বিশ্বায়ন বা Globalization"-ধারণাটির প্রবক্তা কে?**
উত্তর: মার্শাল ম্যাকলুহান।

৩. **"Globalization and Ethnicity" গ্রন্থটির লেখক কে?**
উত্তর: স্টুয়ার্ট হল।

৪. **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বর্তমান সদস্য কত?**
উত্তর: ১৮৯টি

৫. **'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৯৪৫ সালের ২৬ অক্টোবর।

৬. **খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বর্তমান সদস্য কত?**
উত্তর: ১৯০টি।

৭. **UNESCO এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: United Nations Education Scientific And Cultural Organization.

৮. **UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর

৯. **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?**
উত্তর: ১৯৩টি

১০. **বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?**
উত্তর: ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর

১১. **IMF এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: International Monitary Fund.

১২. **IMF এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?**
উত্তর: ১৮৪টি

১৩. **WTO এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: World Trade Organization

১৪. **WTO এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?**
উত্তর: ১৫০টি।

১৫. **NAFTA কী**
উত্তর: North American Free Trade Agreement

১৭. **মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?**
উত্তর: i. ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি, ii. অবাধ প্রতিযোগিতা, iii. শুল্কমুক্ত বাণিজ্য, iv. সীমিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।

১৮. **"Globalization dramatically increased inequality between and within nations"- উক্তিটি কার?**
উত্তর: প্রখ্যাত ইউনিয়ন নেতা জে. মায়ুর।

১৯. **বিশ্বব্যবস্থা কী?**
উত্তর: বিশ্বব্যবস্থা বলতে বুঝায় বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রিক বিন্যাস, তাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রক্রিয়া।

২০. **প্রথমবারের মতো নতুন বিশ্বব্যবস্থার ধারণা প্রদান করেন কে?**
উত্তর: মার্কিন রাষ্ট্রপ্রতি সিনিয়র বুশ ১৯৯১ সালে।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক) বিশ্বায়ন কী?
খ) বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য কী কী?

২. ক) বিশ্বায়নের কারণ কী?
খ) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বলতে কী বুঝ?

৩. ক) বিশ্বায়নের সুবিধা কী কী?
খ) বিশ্বায়নের অসুবিধা কী কী?

৪. ক) নতুন বিশ্বব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?
খ) নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কী?

৫. ক) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?
খ) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী?

৬. ক) বিশ্বসন্ত্রাস বলতে কী বুঝ?
খ) মুক্তবাজার অর্থনীতি বলতে কী বুঝ?

http://thejobstudy.com Go to Contents

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝেন? বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. বিশ্বায়ন বলিতে কী বুঝেন? বিশ্বায়নের পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার যুক্তি দিন অথবা বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ আলোচনা করুন?

৩. বর্তমান বিশ্ব ব্যাবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৫. আন্তর্জাতিক পরিসরে জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী- আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১১

উত্তর আধুনিকতাবাদ
Post Modernism

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১১.১ ভূমিকা
১১.২ পোস্ট মর্ডানিজম ধারনাটির বিকাশ
১১৩ পোস্ট মর্ডানিজম কী?
১১.৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পোস্ট মর্ডানিজম
১১.৪ (১)পোস্টমর্ডানিজম এর অবদানসমূহ
১১.৫ উত্তর আধুনিকতাবাদের গণমাধ্যমের প্রভাব
১১.৬ বাংলাদেশ ও উত্তর আধুনিকতাবাদ
১১.৭ পোস্টমর্ডানিজম দুর্বল দিকসমূহ
১১.৮ মূল্যায়ণ

১১.১ ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞান বা মানবতার সংগে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সকল মতবাত কিংবা তত্ত্ব সমূহের মধ্যে "পোস্ট মর্ডানিজম" এখনও সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হিসেবে বিবেচিত। নৈতিকতা বা রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায় কুলষিত হওয়ায় একে প্রতিনিয়ত দোষারোপ করা হচ্ছে যার মাত্রা ৯/১১ এর পরবর্তীতে বেড়ে গেছে বহুগুনে। উত্তর আধুনিকতাবাদের জন্মকালে ধরে নেওয়া হয় ১৯৪০-১৯৫০ সময়কালকে এর জন্ম হয় ফ্রান্সে। আশির দশকের পরবর্তীতে একটি যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে।

১১.২ পোস্ট মর্ডানিজম ধারনাটির বিকাশ

সর্ব প্রথম এর ব্যবহার দেখা যায় মার্চ ১৯১৭ সালে Rodolf Pannuit এর মাধ্যমে তিনি দর্শণ ভিত্তিক সংস্কৃতিকে বুঝানোর জন্য উত্তর আধুনিকতাটি সর্বপ্রথম চয়ন করেন। পর পর ১৯২৬ সালে বি.আই.কে এর " Post modernnism and other Essays" এর মাধ্যমে পরবর্তীতে আমরা এ শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাই নতুন ধার্চের কল ও সঙ্গীতকে ইঙ্গিত করতে। তবে, ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনের

সাধারণ তথ্য হিসেবে এর প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই ১৯৩৯ সালে যখন Arnold J. Toynbee ঘোষণা দেন আমাদের উত্তর আধুনিক যুগের উদ্ভাবন হয় ১৯১৪-১৯১৮ এর ব্যাপক যুক্ত থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর এর বিস্তার আরও বেশি দেখতে পাই। যথা: বাজারজাতকরণ, ব্যবসায় বাণিজ্যি এবং সংস্কৃতি আইন ও ইতিহাস এর ব্যাখ্যা, তার তীব্রতা আরও বেশি স্পস্ট হয়ে ওঠে ৯/১১ এরপরে।

১১.৩ পোস্ট মর্ডানিজম কী?

পোস্ট মর্ডানিজমের কেন্দ্র বিন্দু হলো Power Knowledge বা মতা জ্ঞান। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সর্ম্পক বিশে-ষক Der Derian বলেছেন- পোস্ট মর্ডানিজম মতার রাজনীতির পারস্পরিক ক্রিয়ার পুঁথিগত ধারণা উদঘাটন করে। তাই এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো :

ক. পুথিগত পারস্পরিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

খ. কি ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে "পোস্ট মর্ডানিজম" এ বিষয়টিকে আরও বেশি বোধগম্য করে তোলা যায়।

প্রথমত, পুঁথিগত বিদ্যা বলতে Der Derian অবশ্যই শুধামাত্র এ বিষয়ক বিভিন্ন লেখা, তত্ত্ব, রচনাকে ইঙ্গিত করেন নি বরঞ্চ প্রতিনিয়ত বাস্তব পৃথিবীতে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। মূলত মতার রাজনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া বলতে এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধানের ব্যাখ্যামূলক আলোচনার সাথে সর্ম্পযুক্ত প্রতিনিধিদের বিবরণমূলক অবস্থানের তুলনামূলক ব্যাখ্যাকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পোস্ট মর্ডানিজম (i) Deconstion এবং (ii) Double Reading এ দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে।

Deconstruction এর মূল লক্ষ হলো ঐ উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা যা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে স্থিতিশীলতার অন্তরায় রুপে কাজ করে। অর্থাৎ এটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক যথা- কোন একটি লেখা, তত্ত্ব, গঠনতন্ত্র, পাঠ্য বিষয়, প্রতিষ্ঠান জনগোষ্ঠী প্রভৃতি সকল কিছু নিয়ে আলোচনা করে।

অন্যদিকে Double Reading প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে যে কিভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিনিয়ত নিজেদের অভ্যন্তরীন গঠনতান্ত্রিক দূর্বলতার কারণে ধ্বংস প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হতে থাকা সত্ত্বেও টিকে আছে।

১১.৪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পোস্ট মর্ডানিজম

রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব, সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় যার গুরুত্ব ৯/১১ এর পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়গুলো পোস্ট মর্ডানিজমের ও মূল আলোচ্য বিষয় তবে তা গতানুগতিক কোন ধারা নয় বরঞ্চ নিজেস্ব এক ধারায় এর আলোক পাত করে।

Post Modernism মূলত Quasi Phenomenology নামক বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক। Quasi Phenomenology এর ৪টি উপাদান। যথা:

ক. সংঘাতের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভবের এক সার্বিক পর্যালোচনা।

খ. সীমানা সংক্রান্ত অভিলিখনের ব্যাখ্যা।

গ. রাষ্ট্র নামক কৃত্রিম অভিন্ন এক সত্তার অপ্রচলিত ব্যাখ্যা।

ঘ. রাষ্ট্রনীতির সংশোধনবাদী পর্যালোচনা।

রাজনীতি ও সংঘর্ষ পরস্পর স্ববিরোধী তবে সত্যবর্জিত নয়, এমন একটি সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে এই সংঘর্ষ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে একই সাথে এও স্বীকার করে যে- সংঘর্ষ থেকে রার উপায় সকল রাষ্ট্র সমূহের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব। তবে, Post Modernism -এর সংঘর্ষের ধারণাটি সনাতনী ধারণা থেকে অনেকটাই ভিন্ন সাধারণভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি অতি প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হলেও এটি কোন সাংবিধানিক বিষয় নয়। এটি ভূ--খন্ডের বাহ্যিক কাঠামোগত ধারণা, শক্তি রাজনীতি, মতা স্তর ইত্যাদি ধারণার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন মাত্রা যোগ করে। Post Modemism ধারণা অনুযায়ী সংঘর্ষ বা সংঘা কিংবা সংকট একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। এটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে Power Politics বা শক্তি রাজনীতির বিকাশ ঘটায় না বরঞ্চ প্রারম্ভিক এবং বিবর্ধকের দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করে।

Post Modernism এর মতে, জাতি, রাষ্ট্র, জাতি রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব প্রাকৃতিক কোন ফল নয় বরঞ্চ শাসনের মতা বা প্রশাসনিক বা আর্থিক মতার লোভ যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে স"ষ্ট ইতিহাসের ফল। বৈশ্বিক রাজনীতির বর্তমান রূপের কোন নির্দিষ্ট কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা হয় এগুলোর বর্তমান রূপের Self Interest (নিজ স্বার্থ) Just for power (মতার লোভ) Power politics (মতার রাজনীতি) ইত্যাদি।

Post modernism আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা সম্পর্ককে কখনোই শুধুমাত্র রাষ্ট্র নামক একক সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে রাজী নয়।

১১.৪.১ পোস্টমর্ডানিজম অবদানসমূহ

পোস্টমর্ডানিজম তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। যথাঃ

১. উদ্ভবমূলক বিজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞান ও মতার মধ্য অভ্যন্তরীন সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। Post Modernism এর মতে ক্ষমতাশালী তার নিজের মতো করে জ্ঞানকে প্রভাব করে আবার একই সাথে বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে যার জ্ঞান যতবেশি সে ততো জ্ঞানী। তবে এটি অবশ্য স্বীকার্য যে ক্ষমতাশীল ব্যক্তি নিজের মতো করে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করে প্রভাবিত করে এবং দুর্বলের উপর তা চাপিয়ে দেয়।

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসরে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তবে দেখতে পাব যে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো পরিবেশ বিপর্যয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে কিভাবে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করছে। জ্ঞানকে ব্যবহার করছে নিজেদের প্রয়োজন মত।

২. পোস্ট মর্ডানিজম সার্বভৌম দেশের পরিবর্তে নতুন কোন পদ্ধতির প্রয়াস চালায়। যেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসীমা আরও বৃদ্ধি পায়।

৩. পোস্ট মর্ডানিজম তত্ত্বটি রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্বের চেয়ে ঐ সকল বহুমুখী ক্ষেত্রসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যেগুলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নয় আন্তর্জাতিক পরিসরে, সীমানার বহির্ভূত পর্যায়গুলোতে কার্যক্রম চালায়।

৪. সংঘাতের প্রকৃতি ফলম কারণ ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমূহ ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

৫. রাষ্ট্রসমূহ কেন তার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যর্থ, কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতার কারণসমূহ আলোচনা করে নতুন কিছু সুযোগ সৃষ্টি করেছে পোস্ট মর্ডানিজম তত্ত্বটি

১১.৫ উত্তর আধুনিকতাবাদের গণমাধ্যমের প্রভাব

উত্তর আধুনিকতাবাদে গণমাধ্যমের ওপর জোর দেখা হয়েছে বেশি, কারন জনপ্রিয় গান বিজ্ঞাপন কিংবা অন্য যে কোন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জগতের বাস্তবতা বা পরিচিতি নির্ধারিত হয় এবং এসব গণমাধ্যমের কারনেই হয়ে ওঠেছে সার্বজনীন তাই বলা চলে, উত্তর আধুনিকতার বিশ্বে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো গণমাধ্যম, আমরা গণমাধ্যমের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় বিচার ও বিশ্লেষনকারী, গণমাধ্যম আমাদের প্রভাবিত করে, ভালো, মন্দ, সুন্দর, অসুন্দর যাবতীয় ধারণা আমরা গণমাধ্যমে চোখে গণমাধ্যমের ভাষায় গণমাধ্যমের আয়নায় দেখি, পোশাকের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ঠিক তেমনিভাবে এগুলো মানুষের নৈতিক অবস্থান ও ব্যাখ্যা করে। একটি পোশাকের ক্ষেত্রে আমরা এর বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, স্থায়ীত্ব, সৎ, গুনগত মান অন্যগুলোর সঙ্গে তুলনা করে প্রমাণের ভিত্তিতে নির্বাচন করি। নৈতিবাতাসম্পনিক বিষয়গুলো ও ঠিক তেমনি। একটি বিষয় আমাদের কাছে কখনো সত্য বা সুন্দর/সঠিক কালে ধরা দেয় আবার কখনো মিথ্যা বা ভুল ভাবে ধরা দেয়। এ দুই শক্তির মধ্যে সেটি শ্রেষ্টরূপে ধরা পরে সেটিই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

১১.৬ বাংলাদেশ ও উত্তর আধুনিকতাবাদ

এ বিষয়টি আমরা পোস্ট মর্ডানিজম বিশ্লেষন ডেভিড আপ্টারের সঙ্গে এর সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে পারি। পোষ্ট মর্ডানিজমের দৃষ্টিতে নেশন-স্টেট এর সামগ্রিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিকাশ নিম্নরূপ:-

		বাংলাদেশ	ভিত্তি
সমন্বয়ী	নির্ভরশীল	১৯৪৭ সাল পর্যন্ত	USA
ধর্মীয়	অনির্ভরশীল	১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত (২৫ মার্চ)	ইরান
মবিলাইজিং	নির্ভরশীল	১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত	উত্তর কোরিয়া
ব্যুরোকেটিক	অনির্ভরশীল	১৯৭৫ -বর্তমান সময় পর্যন্ত	বাংলাদেশ

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, Post Modernism এর সাধারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যামন যথা:

সার্বভৌম	**অক্ষত সার্বভৌম**	**রাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সার্বভৌমত্ব**	**শরিকানা**
ভৌগোলিক	ক্ষেত্রে বিশেষ	কর মূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনা	অংশীদারীত্ব
		স্বাধীনতা	পারস্পারিক ঘড়ে
			বাধ্যবাধকতা
সামরিকাত্ব মুখ্যতা	গৌনতা	কল্যানমুখী অর্থনীতি	বহুজাতিক কল্যাণমুখী
সংরক্ষিত নাগরিকত্ব	শরিকী নাগরিকত্ব	আমলাতান্দ্রিক	অ-আমলাতান্দ্রিক
জাতীয়তাকেন্দ্রিক	বহুজাতিকেন্দ্রিক	অর্থনীতি বাস্তবায়নে সরকারের নিরঙ্কুশ স্বায়িত্ব	Govt + NGO

১১.৭ পোস্টমর্ডানিজম দুর্বল দিকসমূহ

১. পোস্টমর্ডানিজমএক তরফাভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করে গেছে। অথচ এর পিছনে শুধু অস্পষ্ট যুক্তি দেখিয়ে নিরব রয়ে গেছে। এর বিকল্প হিসেবে আমাদের সামনে কোন নতুন অস্তিত্বের আভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

২. পোস্টমর্ডানিজম "জ্ঞান ও ক্ষমতার" তথ্যকে বৈধতা দিতে গিয়ে জোর যার মুলুক তার বিষয়টিকে বৈধতা দিয়েছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জন্য হুমকী স্বরূপ।

৩. রাষ্ট্রের সার্বভৌম অখণ্ডতার বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রাষ্ট্রের জন্য হুমকীর মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে।

৪. সংঘাতের প্রকৃতি, ফল, কারণ, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিড়া আলোচনা করলেও সমাধান নিয়ে কোন আলোচনা করে নি।

১১.৮ মূল্যায়ন

রাষ্ট্র বা সার্বভৌমত্ব এর সমগ্রতা এর সমালোচনা হলো পোস্ট মর্ডানিজম এর মূল আলোচ্য বিষয়। এটি সতন্ত্র্যতা, নৈতিকতা, গণতন্ত্র সমাজ ইত্যাদির মতো কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক বিষয় সমূহকে নাকচ করে দেয় বা এর বিরোধিতা করে। পোস্ট মর্ডানিজমএর মূল প্রেষনাই হলো বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতির সমালোচনার মাধ্যমে একে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন কোন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যার মূল রাষ্ট্র নয়, যেখানে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ভূমিকা থাকবে না।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (Part-A)

১. পোস্টমর্ডানিজম কী ?
২. পোস্টমর্ডানিজম এর বিকাশ লিখুন?
৩. পোস্টমর্ডানিজম কী এর বিকাশ লিখুন?
৪. পোস্টমর্ডানিজম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করুন ।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

খ-বিভাগ (Part-B)

১. পোস্টমর্ডানিজম এর আলোকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আলোচনা করুন?
২. পোস্টমর্ডানিজম এর অবদানসমূহ আলোচনা করুন?
৩. পোস্টমর্ডানিজম এর প্রকৃতি বিকাশ, অবদান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি এর প্রভাব লিখুন?

Go to Contents
http://thejobstudy.com

অধ্যায় ১২

স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডা লড়াই : বর্তমান পেক্ষাপট
Cold War : Persent Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১২.১ স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞা
১২.২ স্নায়ুযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য
১২.৩ স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তি
১২.৪ স্নায়ুযুদ্ধের কারণ
১২.৫ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান
১২.৬ স্নায়ুযুদ্ধের প্রকৃতি
১২.৭ স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডাযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়
১২.৭.১ প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-১৯৫০)
১২.৭.২ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫০-১৯৫৩)
১২.৭.৩ তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৩-১৯৫৯)
১২.৭.৪ চতুর্থ পর্যায় (১৯৫৯-১৯৬২)
১২.৮ জাতিসংঘের উপর স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া
১২.৯ ইউক্রেন সংকট ও ঠাণ্ডাযুদ্ধের সূচনা

১২.১ স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞা (Definition of Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অবসানের পর বিশ্বব্যাপী নতুন যে যুদ্ধে শুরু হয় তাকে স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) বলা হয়। স্নায়ুযুদ্ধ আসলে সরাসরি কোন যুদ্ধ নয়। এটি হিল মতাদর্শের যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী সমাজ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সারাবিশ্বে এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তাই স্নায়ুযুদ্ধ। স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যদিয়েই আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে Super চড়বি হিসেবে অবির্ভূত হয়। অধ্যাপক আব্দুল হালিমের মতে,"অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে সরাসবি যুদ্ধে না গিয়েও নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচার প্রপাগান্ডার মাধ্যমে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই হল স্নায়ুযুদ্ধ।"

স্নায়ুযুদ্ধেও সময় উভয় শিবিরই চেয়েছে নিজের বলয় বৃদ্ধি করতে। এক্ষেত্রে তারা কখনও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে, আবার কখনও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছে।

ফ্রাংকেল বলেছেন, " স্নায়ুযুদ্ধ আসলে যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয় এমন অবস্থা।"

ওয়াল্টার রেমন্ড (Walter Raymond) তাঁর Political Dictionary, P-১০১-তে বলেছেন, "স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিকে বোঝান হয়। স্নায়ুযুদ্ধ সময় এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে প্রকৃত যুদ্ধেও আশ্রয় গ্রহণ না করেও অত্যন্ত বিরোধিতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন স্নায়ুযুদ্ধকে (Cold War) সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) ও সাম্রাজ্যবাদী (Imperialist) শক্তির মধ্যকার বিবাদ মনে করত এবং তাই যুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েত নীতিতে ছিল সব সময় সম্মুখে এগিয়ে চল, দুর্বল জায়গায় আঘাত দোয়া এবং কোনরূপ শক্তি শূন্যতা থাকলে তা যথা– শীঘ্র পূরণ করা (.... was always pushing, seeking weak points and thus attempting to fill power vacuums.)

Friedman তাঁর An Introduction to World Politics, P-২৬৫ গ্রন্থে বলেছেন, In short there is some reasons to believe that the cold war is not a necessary phase for 'hot war' but a new technique of warfare."

স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞায় ফ্রাঙ্কেল (Frankel) বলেছেন, " স্নায়ুযুদ্ধ যুদ্ধও নয় এবং শান্তিও নয়। কোন প্রকার বিবাদ মিটিয়ে ফেলার সুযোগও নেই। কারণ উভয় পই নিজ নিজ যুক্তিতে অটল থাকে। এখানে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সকল কৌশলই অকার্যকর। উভয় পক্ষই সম্মুখ যুদ্ধেও জন্য প্রস্তুত কিন্তু যুদ্ধেও ঝুঁকি নিতে নারাজ। সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য উভয় উভয়কে দায়ী করে। মূলত এরূপ অস্বস্তিকর উদ্বেগজনক ও উত্তেজনা স্নায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করে বলেই একে স্নায়ুযুদ্ধ বলে।"

সুম্যান (Schuman) বলেন, " সমাজতন্ত্রেও অগ্রগতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল মুক্ত দুনিয়ার নেতৃত্ব নিতে এবং এখান থেকেই শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য হল To contain the red menace."

উক্ত চারটি ক্ষেত্রেই পুজিবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের যে দ্বন্দ্ব তাকে স্নায়ুযুদ্ধ বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, স্নায়ুযুদ্ধ আসলে কোন যুদ্ধ নয়। তবে স্নায়ুযুদ্ধ শান্তির অবস্থাকেও বুঝায় না। স্নায়ুযুদ্ধ এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে যুদ্ধ না হয়েও যুদ্ধেও সব প্রস্তুতি চলতে থাকে। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চরম অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টার নামই হল স্নায়ুযুদ্ধ। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে মতাদর্শগত বিরোধ, অস্ত্রেও অপ্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ বিস্তার ও ক্ষমতা অর্জনের যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল তাকেই স্নায়ুযুদ্ধ বলা হয়েছে।

১২.২ স্নায়ুযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cold War)

১. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পারিক দ্বন্দ্বই ছিল স্নায়ুযুদ্ধ।
২. স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে বিশ্ব মূলত দুটি ব্লকে (block) বিভক্ত ছিল। একটি পুঁজিবাদী যার নেতৃত্ব প্রদান করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরটি সমাজতান্ত্রিক যার নেতৃত্ব দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।
৩. স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডা লড়াইকালীন সময়ে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশক্তি (Super) নামে পরিচিত ছিল।
৪. আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে হয় ভয় দেখিয়ে না হয় সাহায্য

সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেও পক্ষে আনার চেষ্টা করেছে।
৫. স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল স্লোগান ছিল সম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর আমেরিকার মূল স্লোগান ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
৬. এ সময় উভয় পক্ষই নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করলেও সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি।
৭. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্যদিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

১২.৩ স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তি (Origin of Cold War)

স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তির সঠিক সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ১৯৪৫ সালে ফাল্টন (Fulton) এর ওয়েস্টমিনিস্টার কলেজ বক্তৃতায় চার্চিল বলেছিলেন যে," যুদ্ধকালীন মৈত্রী ও জোটের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। কেউ জানে না সোভিয়েত ইউনিয়ন অদূর ভবিষ্যত কী করতে যাচ্ছে। তার চালচলন ও আচার-আচরণ সবই সন্দেহের উদ্রেক করে। এককথায় গোটা মহাদেশের উপর লৌহ যবনিকা (Iron curtain)নেমে এসেছে।" অনেকেই মনে করেন চার্চিলের এ বক্তব্যের মধ্যেই স্নায়ুযুদ্ধের ইঙ্গিত নিহিত ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জর্জ এফ.কেন্নান (George F. Kennan) ১৯৪৭ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স এর জুলাই সংখ্যা 'ছদ্মনামে' সোভিয়েতের কার্যকলাপের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিলেন।

অনেকেই মনে করেন যে, ১৮৭০ সালে জার্মানি ও ইতালি একত্রীকরণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্যেও যে পরিবর্তন ঘটে এবং এ দুটো নতুন বৃহৎ শক্তির আগ্রাসী মনোভাব বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্বের সূচনা করে যা পরবর্তীতে ঠান্ডা লড়াইয়ে পরিণত হয়।

অধিকাংশ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকগণ মনে করেন যে , ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর বলশেভিক পার্টি (Bolshevik) মতা দখলের পর থেকেই স্নায়ুযুদ্ধেও সূচনা। Communist দের মতা দখল পুঁজিবাদ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধকে প্রসারিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল প্রধান নিশানা। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পর কমিউনিস্ট Communist দুনিয়ার বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ছিল শক্তির প্রধান উৎস।

স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তি সম্পর্কিত তৃতীয় মতবাদটি হল এর বীজ নিহিত আছে ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্টেও 'আটলান্টিক সনদ' (The Atlantic Charter) এর মধ্যে। ঐ সময় রুশ নেতা যোসেফ স্টালিন (Joseph Stalin) কে বাদ দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (F.D.Roosvelt) ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchil) ভবিষ্যত বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে ঘোষনা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তাতে রুশ নেতা যোসেফ স্টালিন (Joseph Stalin) কিছুটা রুষ্ট হন। কারণ তিনি পশ্চিমা বিশ্বেও নেতাদের আগে থেকেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা বিশ্বেও পারস্পরিক সন্দেহই স্নায়ুযুদ্ধের পথকে প্রসারিত করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বহুল পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে তাদের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অন্যদিক ইতালি ও জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপের একমাত্র পরাশক্তিতে পরিণত হয়। ফলে ইউরোপে শক্তির ভারাসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই ইউরোপের ব্যাপারে থাকতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পরও আমেরিকা ইউরোপ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচলিত করে তোলে। কারণ সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র পারমাণবিক শক্তির অধিকারী ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্রভৈরীর প্রস্তুতি বাড়াতে থাকে। ফলে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়।

১২.৪ স্নায়ুযুদ্ধের কারণ (Causes of Cold War)

স্নায়ুযুদ্ধের প্রধান কারণ পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব। অন্যভাবে বলা যায় যে, স্নায়ুযুদ্ধেও প্রধান কারণ মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব। এ মতাদর্শ হল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী মতাদর্শ। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী সমাজ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সামাজতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্বই স্নায়ুযুদ্ধের প্রধান কারণ।

অবশিষ্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক রেমন্ড এ্যারন (Raymond Aron) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য সাধনকেই রাষ্ট্রসমূহ উদ্বুদ্ধ করে। যথাঃ Power, Ideas and Glory.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুযুদ্ধেও জন্যও এ তিনটি কারণ বিদ্যমান ছিল।

স্নায়ুযুদ্ধেও কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে W.W. Rostow বলেছেন, " সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠান্ডাযুদ্ধকে সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) ও সাম্রাজ্যবাদী (Imperialist) শক্তির মধ্যকার বিবাদ বলে। মনে করত এবং যুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েত নীতি ছিল সবসময় সম্মুখে এগিয়ে চলা, দুর্বল জায়গায় আঘাত হানা এবং কোন রকম শক্তি শূন্যতা থাকলে তা যথাশীঘ্র পূরণ করা (... was always Pushing , seeking weak points and thus attempting to fill power vacuums) সোভিয়েত ইউনিয়নের এরূপ পরিস্থিতিতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই মোকাবিলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যে একমাত্র ধারক ছিল তার প্রমাণ ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কোতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান (George F. Cennan) প্রদত্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন, "..... the United States Confomted a long term Challenge, not a short rang Hitlrian Military Plan."

নিম্নে স্নায়ুযুদ্ধেও কারণ

১. **সমাজতন্ত্রের প্রসার :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরে পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ যেমন–পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া , চেকোশ্লাভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুধাবন করেছিল যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত এসব দেশ ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি বা কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে যা শেষ পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে।

২. **কমিউনিস্ট পার্টির মতা বৃদ্ধি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে Communist Party ক্ষমতা দখল করে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। Communist Party অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে ইউরোপকে বের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেই উপযুক্ত বলে মনে করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরূপ পরিস্থিতিকে সাম্যবাদ প্রসারের অনুকূল বলে আখ্যা দেয়। জর্জ কেনান বলেন , ইতালিই হল ইউরোপের মূল কেন্দ্র, সেখানে যদি Communist রা জয়ী হয় তাহলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আমাদের পরাজয় ঘটবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Communist ভীতি স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

৩. **ইরান নিয়ে মতপার্থক্য :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরান মিত্র বাহিনীর দখলে থাকলেও উত্তর ইরান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে। ১৯৪২ সালের এক চুক্তি অনুসারে জার্মানির আত্মসমর্পণের পর ছয় মাসের মধ্যে ইরান থেকে মিত্র বাহিনীর সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ছিল। কিন্তু মিত্র বাহিনী অভিযোগ করে যে , উত্তর ইরানে অবস্থিত সোভিয়েত বাহিনী ইরানে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং উত্তর ইরানের পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

৪. **গ্রিস নিয়ে বিরোধ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি গ্রিস দখল করলে ১৯৪৪ সালে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপে গ্রিস মুক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের চুক্তি অনুসারে গ্রিসকে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলরূপে স্বীকার করা হয়। কিন্তু গ্রিসের জনগণের ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাবের কারণে ব্রিটেন তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত গ্রিসের সাধারণ নির্বাচনে (ব্রিটেন মার্কিন প্রভাবে) স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয় লাভ করে এবং বামপন্থিরা পরাজিত হয়। পরাজিত বামপন্থিরা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। গ্রিসের সরকার যুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধ দমনে মার্কিন সরকারের সাহায্য কামনা করে। মার্কিন সরকার সামরিক সাহায্যের পাশাপাশি ৪০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদান করে।

৫. **তুরস্ক নিয়ে বিরোধ :** ১৯৪৫-১৯৪৭ পর্যন্ত তুরস্কের ঘটনাবলীও স্নায়ুযুদ্ধের কারণ হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ও তার পরে তুরস্কের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। উভয় দেশ অনাক্রমণ চুক্তি করলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে সম্পর্কেও অবনতি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, দীর্ঘকালে মার্কিন সাহায্য ব্যতীত তুরস্কের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। মার্শাল প্ল্যানের অধীনে তুরস্ককে ১৫০,০০০,০০০ ডলার সাহায্যে প্রদান করা হয়।

৬. **পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে বিরোধ :** পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের খনিজ সম্পদ

রক্ষার জন্য ১৯৪১ সালে ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। আজারবাইজানসহ উত্তর প্রদেশসমূহে সোভিয়েত বাহিনী এবং দক্ষিণাঞ্চলে ইংরেজ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত দক্ষিনাঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করে । ১৯৪২ সালে পারস্য , ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত ত্রি- পাক্ষিক চুক্তিতে দক্ষিনাঞ্চলে ইংরেজ বাহিনীর এবং উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত বাহিনীর দখল স্বীকার করা হয়। চুক্তি অনুসারে যুদ্ধ শেষে পারস্য থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে সোভিয়েত মার্কিন দ্বন্দ্ব শুরু হয়। জাতিসংঘের মধ্যস্ততায় সোভিয়েত- পারস্য যৌথ মালিকানায় একটি তেল কোম্পানী গঠিত হয় যার ৫১% শেয়ার পরবর্তী ২৫ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে থাকবে। ১৯৪৬ সালের ১ মে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে পারস্যেও পার্লামেন্ট চুক্তির শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এত পূর্ব-পশ্চিম বিরোধ ঘনীভূত হয়।

১২.৫ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান (Decline of Cold War)

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাতনের মধ্য দিয়েই স্নায়ুযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটেছে বলে ধরে নেয়া হয়। কেননা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবস্থান, সামরিক জোট WARSAW এর অবস্থান এবং চূড়ান্তভাবে সোভিয়েতের অবসানকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান বলে। ১৯৮৯ সালের ২ এপ্রিল The New york Times এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে ঠান্ডাযুদ্ধেও অবসানের ঘোষণা প্রদান করে। একই বছরের ৩ ডিসেম্বর দুই Super Power এর দু নেতা মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ও সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভ আনুষ্ঠানিক ও সরকারিভাবে দু' দেশের মধ্য চলতে থাকা প্রায় ৫০ বছরের দ্বন্দ্বের অবসান ঘোষণা করেন। তবে ঘোষণা করলেও স্নায়ুযুদ্ধেও সমাপ্তি ঘটেনি। এরপরও বেশ কিছুদিন স্নায়ুযুদ্ধের রেশ থেকে যায়। " The debate over the end of the cold war, like debate its origins, is likely to be long and inconclusive." বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যিনি সভ্যতার সংকট (Clash of Civilization) এর প্রবক্তা S. P. Huntington স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের কারণ হিসেবে গণতন্ত্রেও বিকাশকে দায়ী করেছেন। Huntington এর মতে, যা Third Wave of Democracy নামে পরিচিত।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) সমাজতান্ত্রিক শক্তির পতনকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের কারণ হিসেবে দেখেছেন এবং স্নায়ুযুদ্ধের অবসানকে তিনি ইতিহাসের পরিসমাপ্তি (End of History) বলে অভিহিত করেছেন।

নিম্নে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন :** স্নায়ুযুদ্ধ যেহেতু ছিল সোভিয়েতে ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব, সেহেতু ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানি ও একত্রিভাবে মধ্যদিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আনুষ্ঠানিকভাবে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম প্রবল পরাক্রমশালী পুঁজিবাদী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করে।

১৯৮৫ সালে সর্বাচেত যখন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতা দখল করে তখন অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শাসক দলের দুর্নীতি, সমাজতন্ত্রের বিকৃত, পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে গর্বাচেভ গ্লাসনস্ত (Glasnost) খোলামেলা ও প্যারেস্তেইকা (Perestroykal) উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সমাজতন্ত্রের পতনই স্নায়ুযুদ্ধের অবসানকে ত্বরান্বিত করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারনে যে রাজনৈতিক সংকটের জন্ম হয়েছিল তা কাটিয়ে উঠা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর্থিক দুরাবস্থা পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের পক্ষেও বাধা হয় দাঁড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজের আকর্ষনীয়তা হারিয়ে ফেলে।

২. **সোভিয়েত অর্থনীতি বিপর্যয় :** স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দুই পরাশক্তি পারমাণবিক অস্ত্রসহ বিশাল অস্ত্র ভান্ডার গড়ে তোলে। অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় আশির দশকের শেষ দিকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। অনেকেই মনে করেছিলেন যে, এ সংকট কাটিয়ে উঠতে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়তো

অভ্যন্তরীন দমন নীতি ও শত্রুর আক্রমণে নতুন কৌশল গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের ও ভাবনা ভুল প্রমাণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন দমনীতি ও অস্ত্রবিস্তার ছাড়াই উদারীকরণ ও খাপ খাইয়ে নেবার নীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তন আনায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

অর্থনৈতিক দূরাবস্থার গর্বাচেত অনাক্রমণ, উদারীকরণ ও ব্যয় সংকোচন নীতির মাধ্যমে পশ্চিমা দুনিয়াকে এটাই বুঝাতে সক্ষম হন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে আগ্রহী। লন্ডনে অনুষ্ঠিত শিল্পোন্নত দেশের সাবেক এ.৭, বর্তমান এ সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমন্ত্রন জানানো হয়। এভাবে পশ্চিমা দুনিয়ার আর্থিক সহায়তা লাভের প্রত্যাশায় সর্বাচেত স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটাতে সহায়তা করেন। অবশ্য তাঁর পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে নোবেল পুরস্কার ভূষিত করা হয়।

৩. **সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতন :** সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। প্রজাতন্ত্র গঠনকারী উপনিবেশের মত। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে সর্বাচেত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইউনিয়ন চুক্তি (Union Treaty) স্বাক্ষরের জন্য প্রজাতন্ত্রগুলোকে আহবান জানায়। কিন্তু অতি রাষ্ট্রে বিশ্বাস (Nation-state) প্রজাতন্ত্রগুলো চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। পূর্ব ইউরোপের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবার পর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই ভেঙ্গে যায় এবং স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

৪. **সমাজতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা :** সোভিয়েত ও ইউনিয়নে যে সাম্যবাদ (ঈড়সসঁহরংস) বিদ্যমান ছিল তার মূল স্লোগান ছিল শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও উৎপাদন। সোভিয়েত সাম্যবাদে আদর্শের চেয়ে অর্থের গুরুত্ব ছিল কম (Here you work for an ideal, not for money)। কিন্তু মানব চরিত্র কখনই শুধু আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় নি। ম্যাকিয়াভেলী যেমনটি বলেছেন, মানুষ তার পিতৃহত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারলেও সম্পত্তি হরণকারীকে ক্ষমা করতে পারে না। সম্পদের প্রতি বাসনা মানুষের চিরন্তর। তাছাড়া মানুষ শুধু আদর্শের খাতিরে ভবিষ্যতের সুখ বিসর্জন দেবে সেটি মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে পশ্চিমা দুনিয়ায় ভোগ বিলাসের ত্যাগ করলেও শাসক শ্রেণী ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও উচ্চবিলাসী জীবনের অধিকারী। শাসকশ্রেণির বিচ্যুতিবাদিতা জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং সাম্যবাদের পতেনের মধ্যদিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

৫. **জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন :** স্নায়ুযুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করে। NAM এর সূত্রপাত হয় ১৯৫৬ সালে বান্দু সম্মেলনের মধ্যদিয়ে এবং ১৯৬১ সালের বেলগ্রেড সম্মেলনের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। NAM এর মূলমন্ত্র পঞ্চশীল নীতি হলেও স্নায়ুযুদ্ধকালীন সৃষ্ট সোভিয়েত ও মার্কিন জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখাই ছিল এক প্রধান লক্ষ্য। NAM- এর সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি স্নায়ুযুদ্ধের প্রসারতা প্রতিরোধ করে। তাছাড়া জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রবর্তিত মিশ্র অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র গতি মন্থর করে এবং ধীরে ধীরে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

৬. **দ্বি-মেরুকরণ প্রবণতা হ্রাস :** স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব রাজনীতি দ্বি-মেরুকরণ চরিত্র লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ দ্বি-মেরুকরণ প্রবণতা হ্রাস পেতে থাকলেও দুটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বাহ্যিক ও অপরটি অভ্যন্তরীণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে মেরুকরণ প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো জোট নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করে। দীর্ঘ উপনিবেশিত ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে এসব সৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে।

দ্বি-মেরুদন্ড রাজনীতিতে ওয়াশিংটন ও মস্কো যথাক্রমে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বদানকারী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে উভয় শিবিরের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে ওয়াশিংটন ও মস্কোর গুরুত্ব হ্রাস করে। উভয় শিবিরে এককেন্দ্রিকতায় বহুকেন্দ্রিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হলে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

৭. **পুঁজিবাদের যথাযথ মুল্যায়ন না করা :** সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ পুঁজিবাদের শক্তিকে যথাযথ ভাবে মুল্যায়ন করতে না পারায় সমাজতন্ত্রের ধ্বংসে ডেকে আনে, আর সমাজতন্ত্রের ধ্বংসে থেকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত না করেই বিলাসিত ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা পুঁজিবাদের সাহায্যের হাতছানি অস্বীকার করতে পারে নি। এতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

৮. **অর্থনৈতিক কারণ :** সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক মন্দা স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ষাটের দশক থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস থেকে থাকে। সত্তরের দশকে এসে তা প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বিশেষত জাপান, জার্মান ও আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। দুই পরাশক্তি অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবধান প্রমাণ করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ নয়।

১২.৬ স্নায়ুযুদ্ধের প্রকৃতি (Nature of Cold War)

স্নায়ুযুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে আমরা কতগুলো অনুমান টানতে পারি :

প্রথমত : দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে বিরোধ বা মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল তা মীমাংসা করা সম্ভব নয়। প্রথমত, দুই বৃহৎ শক্তি বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ইচ্ছা যদি প্রকাশ করত তাহলে বিরোধ স্থায়ীরূপ লাভ করে কখনো স্নায়ুযুদ্ধের আকার ধারণ করতো না।

দ্বিতীয়ত: সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত দুনিয়ার কাছে ভয়ের কারণ ছিল। অর্থৎ সোভিয়েতের সামরিক শক্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে গণতান্ত্রিক দুনিয়া আশঙ্কা করেছিল যে, যে কোন সময়ে সে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে পারে এবং তা যদি হয় তাহলে মুক্ত দুনিয়াকে সেই আগ্রাসন মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেসঙ্গে সোভিয়েতের মতো যাতে বেপরোয়াভাবে বেড়ে না যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এজন্য আমেরিকা ও তার অনুগামীরা সংযমন নীতির লক্ষ্য একটাই,সোভিয়েতকে ক্ষমতা বিস্তারের আদৌ কোন সুযোগ না দেওয়া। যা কিছু করবে আমেরিকা। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সংযমন নীতি নিন্দিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: সাম্যবাদেও লক্ষ্য গণতন্ত্রকে যে কোন প্রকারে ধংস করা। সুতরাং গণতন্ত্রের ধংস রোধ করতে হলে সাম্যবাদেও গতিকে বাধা দিতে হবে। সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমেরিকার এই ভীতি তাকে সমরায়োজনে উৎসাহিত করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকায় বুদ্ধিবাদী (Intellectual) মহলে নুতন এক মতবাদের জন্ম হয়- তার নাম আচরণবাদ (Behaviouralism)। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এর অন্তর্নিহিত দুটি দূর করতে সক্ষম সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই আচরণবাদের কাজ। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, স্নায়ুযুদ্ধ মনে করে সাম্যবাদ মানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও অধিকার ধংসকারী। সাম্যবাদ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও চেতনাকে ধংস করে একটা কঠোর নিয়ন্ত্রণ (Regimentation) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। বলকান অঞ্চলে ও পোল্যান্ডে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তার লাভ করায় আমেরিকা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, জন্ম নিল ট্রুম্যান তত্ত্ব (Truman Doctrine)। ট্রুম্যানতত্ত্ব গনতন্ত্র ও স্বাধিকার নীতিকে সামনে রেখে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে জোর লড়াই শুরু করে।

১২.৭ স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডাযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় (Stages of the Cold War)

ঠান্ডাযুদ্ধকে চারটি পর্যায় ভাগ করা হয় : ১৯৪৫-১৯৫০,১৯৫০-১৯৫৩,১৯৫৩-১৯৫৯ এবং১৯৫৯-১৯৬২। বহু বিশেষজ্ঞের মতে, স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডাযুদ্ধ ১৯৪৫-১৯৬২ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। এর পরে এই যুদ্ধেও অবসান ঘটে। অনেকে মনে করেন, ১৯৬২ সালে কিউবা সংকটের পরে এ যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। তবে তার গভীরতা ও ব্যাপকতা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল। সত্তর ও আশির দশকে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা সত্ত্বেও পারস্পারিক অবিশ্বাস, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয় নি। স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডাযুদ্ধ নতুন রুপ লাভ করেছে।

১২.৭.১ প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-১৯৫০)

১৯৪৫-১৯৫০ পর্যন্ত ছিল স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্যায়। এ সময়ে যে সকল ঘটনা স্নায়ুযুদ্ধেও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল তার মধ্যে অন্যতম পূর্ব-ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব, ট্রুম্যানের নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা,বার্লিন সংকট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো সামরিক জোট গঠন। ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লবও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে ভীতির কারণ হয়েছিল। ঠান্ডাযুদ্ধের

প্রথম পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি যে নীতি অনুসরণ করেছিল তাকে 'প্রতিরোধের নীতি '(Policy of Containment) নামে অভিহিত করা যায় ('প্রতিরোধের নীতি' বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতিকে বোঝাত। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বতোভাবে এই ধারণা প্রচার করতে চেয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। তার লক্ষ পুঁজিবাদকে, মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করে সমগ্র বিশ্বের উপর সাম্যবাদ আরোপ করা। জর্জ কেন্নান ১৯৪৭ সালে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Containment) এর ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সতর্ক করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধক নীতের মূল পদ্ধতি ছিল - সোভিয়েত ইউনিয়নকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে সাহায্যের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করা এবং সামরিক জোট গঠন করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের পরিবেশ গড়ে তোলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

ট্রুম্যানের নীতি (Truman's Doctrine)

১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ভাষণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধের নীতি ঘোষিত হয়। তিনি গ্রিস এবং তুরস্কে কমিউনিস্ট প্রভাব ধ্বংস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নির্মূল করার জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দান এবং সামরিক মিশন প্রেরণের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন দাবি করেন।

স্বাধীন দেশসমূহ তাদেও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মার্কিন সাহায্য প্রত্যাশী। ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, যে সব স্বাধীন মানুষ দেশের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংখ্যালঘু এবং বাইরের চাপ প্রতিরোধ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেও সাহায্যে এগিয়ে যাবে। ট্রুম্যান নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পারস্য অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিরোধের নামে ইরানের তৈল-সম্পদকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি মূলত ধনির তেলকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়। ট্রুম্যান- এর মতে, যুদ্ধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাশিয়া বা ইরানের তেল-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায় তাহলে বিশ্বে কাঁচামালের ভারসাম্য বিশেষভাবে পরিবর্তিত হবে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা একটি বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ট্রুম্যান বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বলেন।

প্রথমত, যেখানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আগ্রাসনের ফলে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসবে। ট্রুম্যানের এই ঘোষণা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী ছিল। মতাদর্শগত বিরোধের মাধ্যমে বিশ্ব যে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয় তার ধারণা ঐ ঘোষণার নিহিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, ট্রুম্যান নতুন নীতির মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে, মার্কিন হস্তক্ষেপ ও সক্রিয়তা কেবল গ্রিস এবং তুরস্কেই সীমিত থাকবে না। ফ্রান্স,গ্রেট ব্রিটেন , ইতালি এবং জার্মানির দুর্বলতা ও সংকটের ফলে যে পরিস্থিতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই শূন্যতা পূরণের মাধ্যমে ইউরোপে তার প্রভাবের এলাকাকে বৃদ্ধিতে আগ্রহী।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'শক্তির অবস্থান' (Position of Strength) থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরোধে বদ্ধ পরিকর।

চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিসংঘের ওপর আস্থা স্থাপন না করে এককভাবে নিজের শক্তির উপর নির্ভরশীলতা ঘোষণা করেছে। সে নিজেকে বিশ্বের স্ব-নির্বাচিত অভিভাবকে পরিণত করেছে।

ট্রুম্যানের ঘোষিত নীতি হলো মূলত চার্চিলের ফুলটন ভাষণের ব্যবহারিক দিক। গ্রিস ও তুরস্ককে সাহায্য দানের দাবি জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৪১০০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করেছে। এ বিনিয়োগ হলো বিশ্বের স্বাধীনতা এবং শান্তির জন্য। গ্রিস এবং তুরস্কেও জন্য আমি যে সাহায্যেও সুপারিশ করছি তা ঐ বিনিয়োগের এক-দশমাংশের একটু বেশি। এটা সাধারণ ধারণা যে, আমরা বিনিয়োগ রা করবো এবং তা যেন ব্যর্থ না হয় তার চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে প্রত্যেক জাতিকে দুটি জীবনধারার মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে।"-Congressional Record, Vol 93, 47, March ১২, ১৯৪৭, চ-২০০০.

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

সাম্যবাদকে প্রতিরোধর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে। মার্কিন

http://thejobstudy.com Go to Contents

যুক্তরাষ্ট্র সাম্যকরুপে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, ইউরোপ এবং অন্যএ সাম্যবাদের প্রভাব এবং প্রসার রোধের ফলপ্রসূ মাধ্যম হলো অর্থনৈতিক সাহায্য। ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ব্যাতীত সাম্যবাদের প্রসার রোধ করা সম্ভাব নয়, একথা মার্কিন সরকারের কর্ণধারগণ অনুভব করেছিলেন। এ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ, ট্রুম্যান-নীতির প্রয়োগগত দিক।

১৯৪৭ এর ৫ জুন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি মার্শাল হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে মার্কিন নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কোনো দেশ বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে নয়। এই নীতি ক্ষুদা, দারিদ্রা, হতাশা এবং বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। এর লক্ষ হবে, বিশ্বে একটি সক্রিয় অর্থনীতির পুনরুত্থান। এর লক্ষ হবে এমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গড়ে তোলা, যেখানে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব। তাছাড়া তিনি ইউরোপের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার মার্কিন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মার্শালের এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কিন- সোভিয়েত বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৪৭- এর শেষদিকে এবং ১৯৪৮-এর প্রথমদিকে ১৬টি দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা হয়। চার বছরের জন্য তাদের ১৭ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দানের চুক্তি হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মার্শাল পরিকল্পনা চালু হয়। ইউরোপের ঐক্য সাধন ঐ পরিকল্পনার মাধ্যমেই শুরু হয়। হ্যারিম্যান- এর মতে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইউরোপের কমিউনিস্টদের প্রচন্ড চাপ ছিল। মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা হয়।

জার্মান সমস্যা (German Problem)

বার্লিনের অবরোধকে কেন্দ্র করে ১৯৪৯ সালে স্নায়ু বা ঠান্ডাযুদ্ধের পরিবেশ ঘনীভূত হয়েছিল। জার্মানকে আক্রমনের সময় গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী পশ্চিম বার্লিন এবং সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব বার্লিনে প্রবেশ করেছিল। মিত্র রাষ্ট্রসমূহের মতানৈক্যের ফলে জার্মানি প্রকৃতপক্ষে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদিকে সোভিয়েত প্রভাবিত পূর্ব জার্মানি অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন প্রভাবিত পশ্চিম জার্মানি। জার্মানিকে কেন্দ্র করে স্নায়ুযুদ্ধ ঘনীভূত হয়েছিল।

সামরিক দিক থেকেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহন করেছিল। এই উদ্যোগের ফলে জাপান এবং জার্মানি পুনরায় সশস্ত্রীকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের প্রত্যাশী হয়েছিল। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি এবং জোট গঠনের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে স্বতন্ত্র শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মান সেনাবাহিনীকে ন্যাটোর নেতৃত্বাধীন করেছিল। সামরিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবরুদ্ধ রাখার নীতি কার্যকর করার জন্য ন্যাটো সামরিক জোট গঠন করেছিল।

১২.৭.২ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫০-১৯৫৩)

স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের শুরু ১৯৫০ এবং তা অব্যাহত থাকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। এ পর্যায়ে স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হয় কোরিয়া অর্থাৎ প্রথম বাররের মত স্নায়ুযুদ্ধ ইউরোপ থেকে এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের, সোভিয়েতক ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধে। ১৯৪৮ সালে কোরিয়াকে প্রকৃতপক্ষে উত্তর এবং দক্ষিণ- দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণাংশে মার্কিন প্রভাবিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার প্ররাচনায় ১৯৫০ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সোভিয়েত ইউনেয়নের অনুপস্থিতির সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারীরূপে ঘোষণ করার চেষ্টায় সফল হয়।

শান্তি রক্ষার অজুহাতে সম্মিলিত জাতিসংঘের বাহিনী উত্তর কেরারিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। অন্যদিকে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর কোরিয়াকে সাহায্যের জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের অন্তরালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাই উত্তর কোরিয়া বিররুদ্ধে নিজের আক্রমণাত্মক নীতি কার্যকর করেছে। সমগ্র বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখতে পায়। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পায়।

১২.৭.৩ তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৩-১৯৫৯)

স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় ছিল ১৯৫৩-১৯৫৯ পর্যন্ত। এ সময় স্নায়ুযুদ্ধ ইন্দোচীন, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র প্রসারিত হয়। ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর সোভিয়েতের নতুন নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবিরের, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পুরণো বিরোধিতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক সমস্যাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার করতে শুরু করে। পশ্চিমা জোটের বিরোধিতা, সদ্যস্বাধীন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, কূটনৈতিক আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। কিন্তু পশ্চিমা শিবিরের প্রতিরোধের নীতি, আগ্রাসন এবং সম্প্রসারণের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা থেকে তারা নতুন নতুন ঝটিকাকেন্দ্র গড়ে তোলে।

ইন্দোচীন : ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনে ফরাসি উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। দিয়েন বিয়েন ফু-ও পতন ফরাসিদের প্রতিরোধের সকল প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ ছিল ইন্দোচীনে তার প্রভাবের এলাকা গড়ে তোলা। এই কারণেই ঐক্যবদ্ধ ইন্দোচীনের ধারণাকে বিপর্যস্ত করাই ছিল মার্কিন উদ্দেশ্য। ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীনের সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৭ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখা ধরে ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি অংশে ভাগ করা হয়। দক্ষিণাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভিয়েতনামের জাতীয় শক্তি ফ্রন্ট এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি। উক্ত সংস্থা জাতীয় ঐক্য সাধন এবং দক্ষিন ভিয়েতনামের মার্কিন পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে। জেনেভা চুক্তি অনুসারে লাওস ও কম্বোডিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কমিউনিস্ট বিরোধিতার দীর্ঘকালীন নীতি সম্প্রসারণের জন্য যৌথ প্রতিরা চুক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক তৎপরতা, শুরু করে। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রভাব রোধ, এতদঞ্চলের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রবহকে ধ্বংস এবং এই এলাকাকে সংঘর্ষের এলাকায় পরিণত করার জন্য ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চুক্তি সংগঠন (SEATO) গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিটিনস, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তান ঐ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা- সদস্য ছিল। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান এই জোট ত্যাগ করে। ১৯৭০ এর জুন মাসে এই জোট ভেঙে দেওয়া হয়।

জোট গঠন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে 'ধানজাস' (ANZUS) গঠন করে। স্নায়ুযুদ্ধেও তৃতীয় পর্যায়ে পশ্চিম এশিয়ায় সংকট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯৫৫ সালে বাগদাদ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে গড়ে ওঠে বাগদাদ জোট। গ্রেট ব্রিটেন, ইরাক, ইরান, তুরস্ক এবং পাকিস্তান এই জোটের সদস্য ছিল। ১৯৫৮ সালে ইরাক এই সংস্থার সদস্যপদ ত্যাগ করে। এর পর এই সংস্থার নামকরণ করা হয় সেন্টো (CENTO)। ১৯৭৯ সালে পাকিস্তান সেন্টো থেকে বেরিয়ে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আত্মরক্ষামূলক প্রতিরাকে শক্তিশালী করার জন্য ১৯৫৫ সালে পোল্যান্ড, রুমানিয়, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ,আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব জার্মাকিকে নিয়ে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা (WARSAW PACT) গঠন কওে। ১৯৬৩ সালে আলবেনিয়া এই সংস্থা ত্যাগ করে।

সুয়েজ সংকট : ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণের পর মিশরের উপর গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইসরাইলের আক্রমনের ফলে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে আক্রমণকারীদের সমর্থন করেনি মিশর এবং অন্যান্যদেও মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যেন সকলের স্বার্থই বজায় থাকে, এটাই ছিল মার্কিন নীতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশরের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন কওে। আক্রমণকারীদের প্রতি সোভিয়েতের সতর্কবাণী পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছিল। দুটি মহাশক্তির রাষ্ট্র সরাসরি সংঘর্ষে জড়িত না হওয়ার ফলে বিপর্যয়রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

হাঙ্গেরি ও বর্লিন সংকট : ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে প্রতি- বিপ-বী অভ্যুত্থানের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়। ঐ প্রতি- বিপ-বী চক্রান্তাত দমনের জন্য হাঙ্গেরীয় সরকারের আহবানে ওয়ারশ চুক্তি জোটের বাহিনী পাঠানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঐ পদক্ষেকে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হিসেবে প্রাচার করা হয়।

১২.৭.৪ চতুর্থ পর্যায় (১৯৫৯-১৯৬২)

স্নায়ুযুদ্ধের চতুর্থ পর্যায় ১৯৫৯-১৯৬২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই পর্যায়ে একদিকে বিরোধ ও অন্যদিকে গতানুগতিক পদ্ধতিতে উত্তেজনা প্রশমন এবং বিরোধ হ্রাসের পদ্ধতি গ্রহন করা হয়। ১৯৬০-এর ১মে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউ-২ মার্কিন গোয়েন্দা বিমানকে নিজের এলাকার মধ্যে ভূপাতিত করে। এই কারণে মে মাসে প্যারিসে ক্রুশ্চেভ এবং আইসেনহাওয়ার-এর মধ্যে প্রস্তাবিত শীর্ষ বৈঠক স্থগিত থাকে। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্ররাষ্ট্রদের পশ্চিম বার্লিনে প্রবেশের পথ বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর ফলে মার্কিন সোভিয়েত বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ১৯৬১-র জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভিয়েনায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির মধ্যে বার্লিন সমস্যা, নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐ বৈঠক সমাধানের কোন সূত্র নির্ধারণ করতে পারেনি।

কিউবা সংকট : ষাটের দশকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কিউবা-সংকট। সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই কিউবা সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। ফলে কিউবায় পেনাল্ড ঘাঁটি স্থাপিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার সাহায্যের জন্য এক জাহায অস্ত্র প্রেরণ করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি ঐ জাহাজ অবরোধের নির্দেশ দেন। প্রথমদিকে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। সমগ্র বিশ্ব একটি ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। বিশ্বশান্তি এবং আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে বিশ্বকে রার জন্য সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী জাহাজ ফিরিয়ে নেন। শুধু তাই নয়, তিনি কিউবা থেকে পেণাস্ত্রও প্রত্যাহার করে নেন। এটাই ছিল স্নায়ুযুদ্ধের এক পরিণত রূপ। রাষ্ট্রপতি কেনেডি এবং প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মস্কো এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে হট-লাইন স্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞগণের মতে, ১৯৬২ সালে কিউবা- সংকটের পর রুশ মার্কিন বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায়। উভয় দেশেই সহাবস্থানের নীতির দিকে অগ্রসর হয়। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায় কূটনীতির ইতিহাসে যা 'উত্তেজনা প্রশমন'ক বা 'বন্ধুত্বেও পুনরুদ্ধার' (Detente) নামে পরিচিত।

অনেকে ১৯৯০ সালের স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধের আরেকটি পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভবে অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাই যে, ১৯৬২ সালের কিউবা সংকটের পর স্নায়ুযুদ্ধেও উত্তেজনা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৯০ সালে এর চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

কিউবা-সংকটের পর থেকে স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার 'লৌহ যবনিকা'র অনাতরাল থেকে বেরিয়ে আসে। পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের, বিশেষ ভাবে চীন সোভিয়েত বিরোধ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবব সীমিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙ্গন এবং সর্বোপরি চীনের সঙ্গে বিরোধ সোভিয়েত ইউনেয়নের দৃষ্টিকে স্নায়ুযুদ্ধ থেকে পারস্পকি বোঝাপড়া এবং উত্তেজনা প্রশমেনের (Detente) দিকে সরিয়ে নেয়। একই সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা দূর কারা সম্ভব ছিল না। প্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্যোগ সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুব-পশ্চিমা জোটভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের, বিশেষেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তেজনা প্রশমনের নীতি নুসরণে বাধ্য করেছিল। দ্রুত সমাজতন্ত্রিক অগ্রগতির প্রয়োজনে অস্ত্র উৎপাদন সীমিতকরণ এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ উত্তেজনা প্রশমনের নীতির উদ্ভবে সাহায্য করেছে। পশ্চিমা জোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব গ্রাস, ন্যাটোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, এশিয়ার সমস্যা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহায় অবস্থা তাকে স্নায়ুযুদ্ধের কৌশল সীমিতকরণে বাধ্য করেছিল। পুঁজিবাদী দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষে উত্তেজনা প্রশমনের নীতি গ্রহণ করেছে। এর পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবয় এমনকি পশ্চিম জার্মানিও সমাজতন্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। স্নায়ুযুদ্ধেও পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে উত্তেজনা প্রশমনের নীতি গ্রহণ করেছে তার মূলে আছে জাতীয় এবং দলীয় স্বর্থের চাপ। ভিয়েতনাম যুদ্ধজনিত তের ইপর প্রলেপ দান, মিত্রশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং রিপাবলিকরন দলের নির্বচনী সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য জনমানসে একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলাই ছিল উত্তেজনা প্রশমনের নীতির মূল লক্ষ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রাহী রাষ্ট্রপতি নিক্সন এবং হেনরী

কিসিঞ্জার মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

স্নায়ুযুদ্ধেও অবসান বিশ্বরাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ জন্ম দেয়। স্নায়ুযুদ্ধেও অবসান দ্বি-মেরুকৃত বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এক-মেরুকৃত বিশ্বেও সূচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংগঠিত দ্বিমেরুকরণের প্রভাব ছিল। কিন্তু ১৯৯০ দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, দুই জার্মানির একত্রীকরণের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নায়ু-যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং এক মেরুকরণ বিশ্বের ধারণা বিস্তার লাভ করে। আর এ এক-মেরুকৃত বিশ্বের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পুঁজিবাদের প্রধান ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর। সাম্প্রতিক বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমেরুর কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে তার সামরিক জোট WARSAW Pact- ও বিলুপ্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে NATO বিশ্বের সকল জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান এক-মেরু প্রসঙ্গে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির গতি প্রকৃতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক অধিপত্য পর্যালোচনা করলেই একমেরু বিশ্বের ধারণা পাওয়া যায়। চার্লস ক্রাউথামার তাই বলেছেন, By far the most important aspect of the post cold war is its unipolarism."

স্নায়ুযুদ্ধেও অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য বা একমেরুকৃত বিশ্ব ব্যবস্থায় শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। এতে করে শান্তি প্রক্রিয়া বিঘ্ন হবার পাশাপাশি যুদ্ধেও সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশলের পাশাপাশি পররাষ্ট্র নীতরও পরিবর্তন সাধন করেছে। স্নায়ু-যুদ্ধকালে যেসব দেশ মার্কিন নীতি বা পুঁজিবাদেও বিরোধীতা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। স্নায়ুযুদ্ধের পওে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে রবার্ট আর্ট (Robert.J.Art) এর অভিমত হচ্ছে-

১. বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা।
২. মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন।
৩. পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৪. ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গণতন্ত্রেও বিকাশ। এবং পরিবেশ দূষণরোধ।

এক-মেরুকৃত বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ মূলত ৫ টি :

১. পশ্চিম ইউরোপের একত্রীকরণ যা বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
২. প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপারেন নেতৃত্বে Yen block এর আত্মপ্রকাশ।
৩. পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধ।
৪. বর্তমান মজুদ অস্ত্রভান্ডার ভেঙ্গে ফেলা। এবং
৪. অস্ত্রবিক্রয় সীমিতকরণ।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তিনটি বিষয়ে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা দেখা যায়। যথা: শক্তি,মতাদর্শ ও শক্তি বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সমতুল্য বর্তমান বিশ্বে আর কেউ নেই। মতাদর্শগত দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র কায়েম আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্রের যে পতন ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে S.P. Huntington এর লেখায়, তিনি স্নায়ুযুদ্ধের অবসানকে Othird wave of Democracy" অভিহিত করেছেন। সমাজতন্ত্রেও চেয়ে পুঁজিবাদ আদর্শগতভাবে কিছুটা হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারাবিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়াওে হামলাকে অনেকেই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নতুন হুমকি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাস দমনের নামে যা করলেন তা আরও ভয়াবহো। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন বাহিনী অবৈধভাবে ইরাক আক্রমণ করে। জাতিসংঘের ১৯১ টি সদস্যরাষ্ট্রের ১৫১ টির মতামত উপেক্ষা করে মাত্র ৪০ টি রাষ্ট্রের সমর্থনে এবং নিজেদের সামরিক ও অর্থনৈতিক মতার বলে ইরাক আক্রমণ করে। যদিও পরবর্তীকলে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ জানানোর মত শক্তি ও সাহস কারও ছিল না। ২০১১ সালের ২ মে মার্কিন বাহিনী ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার মধ্যদিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। মার্কিন বিশেষ বাহিনী পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বেও তোয়াক্কা না কওে অ্যাবোটাবাদের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে হত্যার খবর নিশ্চিত করে। এভাবে গোটা বিশ্বের সর্বত্র মার্কিনীদের একক আধিপত্র একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থারই ইঙ্গিত বহন করে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

১২.৮ জাতিসংঘের উপর স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া (Impacts of Cold War on United Nations)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতিহাসে স্নায়ুযুদ্ধ হল এক ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই পারমাণবিক শক্তিধর নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল। আবার এই দুই রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে জাতিসংঘ তখন সবেমাত্র শিশু। এই শিশু প্রতিষ্ঠানের ইপর স্নায়ুযুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া কিন্তু আদৌ ভাল হয়নি। আমরা প্রথম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি নিরাপত্তা পরিষদের উপর। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ভেটো (veto) মতা ভোগ করার অধিকর পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় উভয়কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে যে কেউ যে কোন প্রস্তাব আনলে অন্য একজন তার বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করত। আর ভেটো দেওয়া মানে প্রস্তাবটিকে বাতিল করে দেওয়া। দুই পরাশক্তি ইচ্ছামত ভেটো দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে আদৌ কাজ করতে দেয়নি। ফলে নিরাপত্তা পরিয়দের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ পরিণত হয় দুই পরাশক্তির লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে। বৃহৎ শক্তিবর্গের কোন একজন যদি ভিন্ন মত পোষণ করে তা হলে সেটা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ এই ঐক্যের পথে সর্ববৃহৎ বাধা হয়ে দেখা দেয়। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা। যে সমস্ত কারণ জাতিসংঘের ব্যর্থতর জন্য দায়ী স্নায়ুযুদ্ধ তাদের অন্যতম। কোরিয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গ যখন নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে উত্থাপিত হয় তখন স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐক্যমতে উপনীত হতে পারেনি। আবার স্নায়ুযুদ্ধেও প্রভাবে পড়ে আমেরিকা কোরিয়া প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদ থেকে সাধরাণ সভার অধিবেশনে নিয়ে গিয়েছিল এবং যার ফলশ্রুতি হল শান্তির জন্য সম্মিলিত প্রস্তাব (Uniting for peace Reasolution)। যে কাজের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল সেই কাজের দায়িত্ব গিয়ে পড়ল সাধারণ সভার উপর। সাধারণ সভার উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব পড়ার ফলে বিশ্বে সাময়িকভাবে হয়তো কল্যাণ সাধিত হয়েছিল, কিন্তু এ কথা বলতে বাধা নেই যে, নিরাপত্তা পরিষদেও অর্মণ্যতা অধিকমাত্রার প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, যা কারো জন্য কাম্য ছিল না।

মতাদর্শগত বিরোধ ও স্নায়ুযুদ্ধেও জন্য জাতিসংঘের দরজা সুদীর্ঘকালব্যাপী চীনের কাছে বন্ধ ছিল। অথচ ন্যায়-নীতির বিচার চীনের অনেক আগে জাতিসংঘে প্রবেশ করা উচিত ছিল এবং সেসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়া। কিন্তু যেহেতু চীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোটে প্রয়োগ করে চীনের প্রবশ রোধ করে রেখেছিল। স্নায়ুযুদ্ধেও বরফ যখন গলতে শুরু করল আমেরিকা তখন নিজেই উদ্যোগী হয়ে চীনের জন্য জাতিসংঘের দরজা খোলার ব্যবস্থা করে দেয়।

সাধারণ সভায় এক জোট হয়ে ভোট দানকে (bloc voting) অনেকে স্নায়ুযুদ্ধের ফল বলে মনে করেন। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার বহু সদস্যরাষ্ট্র এক জোট হয়ে কোন প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেয়। পক্ষে বা বিপক্ষে বলতে প্রধানত সোভিয়েত বা আমেরিকাকে বোঝায়। যদিও সাধারণ সভার সদস্যরা সরাসরি দুটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত নয় তবুও প্রায়ই তারা দুই পরাশক্তিকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ভোট দিয়ে থাকে। গুডস্পীড বলেন, It can be claimed theat the United States has been able to obtain a strong fairly consistent following when it seeks to achieve votes on certain issues. This pro-United states coalition is revealed by the fact that htose nations that vote most closely with the United States on Cold War issues have been elected to the crucial United Nations offices at least until the last few years."

অনেকে মনে করেন কাশ্মীর, কাঙ্গো , সুয়েজ, সাইপ্রাস ইত্যাদি বহু সমস্যার সমাধানের বিলম্ব ঘটছে স্নায়ুযুদ্ধেও জন্য। এর পেছনে মতার লড়াই নেই এমন কথা বলা যায় না। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ দুই অতি বৃহৎ শক্তিকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অতিমাত্রায় সক্রিয় হবার প্রেরণা দিচ্ছে জাতিসংঘের বহু জনহিতকর কাজও স্নায়ুযুদ্ধের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

স্নায়ুযুদ্ধের বর্তমান অবস্থা

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্বভাবত স্নায়ুযুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক জাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে সারা বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা না করে একক সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে উদ্যত হয়েছে।

ফলে বিশে ।বর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও মার্কিন বিরোধিতায় সোচ্চার হচ্ছে। তাই অনেকেই মনে করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এসব দেশগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ অর্থে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয় নি, ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। মার্কিন বিরোধী সমাজ প্রতিপক্ষগুলো হচ্ছে-

১. **চীন:** বিশ্বব্যাপী চীন নিজ বাজার উন্মুক্ত করেছে। সাথে সাথে সামরিক দিক দিয়েও সে অন্যতম শক্তি। বাণিজ্য থেকে মার্কিনের সাথে চীনের প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বহুদিনের। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধি চীনকে শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। চীনের এই সমৃদ্ধি মার্কিন পক্ষ হতে ভালো চোখে দেখা হচ্ছে না।

২. **ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন:** ইউরোপীয় ইউনিয়নেও মার্কিন বিরোধীতা দেখা যায়। মার্কিনের বিরুদ্ধে ইউরোপের রাস্তাগুলো লড়তে পারবে না বলেউ মূলত জোট গঠন করেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মার্কিনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতে সামরিক দিক হতেও এই সংগঠনটি শক্তি অর্জন করবে বলে বিশ্লেষজ্ঞরা মনে করেন।

৩. **মুসলিম বিশ্ব:** মুসলমানের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণই (মার্কিনের) মুসলিম বিশ্বাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের কাছে রয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ তেল। সেই তেলের ওপর মার্কিনের রয়েছে বড়া দৃষ্টি। এ কারণেই ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া-প্রমুখ দেশগুলোর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তেল সম্পদকে পুঁজি করেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হতে পারে।

৪. **জাপান:** অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নয়ন জাপানকে সামরিক দিক হতেও শক্তিশালী করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা জাপান নিশ্চয়ই ভোলেনি। এমতাবস্থায় জাপান ভবিষ্যতে মার্কিনের প্রতিপক্ষ হবে বলে অনেকেরই ধারণা।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যা যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটলেও স্নায়ু যুদ্ধের বিলুপ্তি ঘটেনি এবং তা ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ রুপ ধারণ করতে পারে বলেই সকলের ধারণা।

স্নায়ুযুদ্ধের পর পরিবর্তনসমূহ

স্নায়ুযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কতিপর ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে-

১. **সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিবর্তন:** সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যে জোয়ার বিশ্বব্যাপী ছিল তাতে একটা প্রচন্ড ধাক্কা লাগে। এর প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে। বর্তমানে যেসব দেশে সমাজতন্ত্র রয়েছে সেগুলোও তাদের আদর্শিক দিক হতে অনেকটা ছাড় দিয়ে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। যেমন- চীন ও কিউবা।

২. **মার্কিন একক আধিপত্য:** সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো প্রতিপক্ষ রইল না। ফলে বিশ্বব্যাপী মার্কিন একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. **গণতন্ত্রের/পুঁজিবাদের বিকাশ:** স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী এটাই প্রমান করার চেষ্টা করা হয় যে, গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। যুক্তরাষ্ট্র এ লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী প্রচার প্রচারণা চালাতে থাকে। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রের চেতনা দুর্নিবার গতিতে যাত্রা শুরু করেছে।

৪. **একক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা:** বিশ্বব্যাপী মূলত বর্তমান একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিনের যে ভয় ছিল আজ সে ভয় নেই, যে কারণে ইরাকসহ রুমানিয়া, রুয়ান্ডা, হাইতি প্রভৃতি দেশে তার একক আধিপত্য বজায় রাখতে দেখা যায়।

৫. **আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার:** স্নায়ুযুদ্ধের পর অনেক শক্তি আছে যারা মার্কিন আধিপত্য

পছন্দ করে না, আবার তার বিরুদ্ধে এককভাবে লড়ার শক্তিও নেই-সেই সমস্ত দেশ, জাতিগুলো সম্মিলিতভাবে আঞ্চলিক সংগঠনের ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে।

খ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

১. **পুঁজিবাদের একচোটিয়া বিকাশ:** স্নায়ুযুদ্ধের পর অধিকাংশ দেশ আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বিশ্বের দেশগুলোতে এই ধারা উল্লেখযোগ্যহারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২. **মুক্তবাজার অর্থনীতির জনপ্রিয়তা:** স্নায়ুযুদ্ধের পর মুক্তবাজার অর্থনীতি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সারা বিশ্বের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে অনেকাংশেই।

৩. **আঞ্চলিক জোট গঠন:** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জোট গঠন লক্ষ্য করার মতো। স্নায়ুযুদ্ধের পর এসব অর্থনৈতিক জোটের গতিশীলতা ব"দ্ধি পেয়েছে। যেমন-জি-৮ এর কথা বলা যেতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স, বৃটেন ও ইটালি এর অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি চীন-জাপান পূর্ব এশিয়ার এবং হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক দিক হতে শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক দিক হতে ৩টি ব্লক গড়ে ওঠেছে।

   ক. NAFTA
   খ. EU
   গ. AFTA ও

৪. **অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব :** স্নায়ুযুদ্ধের পর রাজনৈতিক দিক হতে এত শক্তিশালী কোনো একক শক্তি (মার্কিন বিপরীতে) নেই বলে অর্থনৈতিক দিক হতে শক্তি অর্জন ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই দ্বন্দ্ব, চীন, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের।

৫. **বিতর্কিত বিশ্ব সংখ্যা:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের কারণে বিশ্ব সংস্থাগুলোও কোন কাজ করতে পারছে না। কেননা এসব সংখ্যা পরিচালনার মূল অংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে।

গ) সামাজিক ক্ষেত্রে

১. **সংঘাত বেড়েছে:** স্নায়ুযুদ্ধের পর সংঘাতের পথ আরও উন্মুক্ত হয়েছে। কেননা এখন আর মার্কিনের বিপরীতে দাঁড়ানোর মতো কোন শক্তি। নেই। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের/মনোভাবের কারণে বেড়েছে।

২. **শান্তি আন্দোলন:** বিশ্বব্যাপী যেহেতু শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নেই কাজেই বিশ্বজনমতই ভরসা। তবে এই বিশ্বজনমতও থেমে নেই। দেশে শান্তি আন্দোলন জোরদার হচ্ছে।

৩. **জাতিসংঘের ভূমিকা হ্রাস:** জাতিসংঘ মূলত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ-তে পরিণত হয়েছে। মার্কিনের বিপরীতে গিয়ে কোন ভূমিকাই পালন করতে পারছে না। ইরাক যুদ্ধেও সময় আমরা তাই লক্ষ্য করেছি।

৪. **নিরস্ত্রীকরণ:** যুদ্ধেও ভয়াবহতা উপলব্ধি কওে বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের কথাও ভাবা হচ্ছে।

৫. **মৌলবাদী শক্তির উত্থান:** স্নায়ুযুদ্ধেও পরই মলত বিশ্বব্যাপী মার্কিন একাধিপত্যেও বিপরীতে মৌলবাদের প্রসার দেখা যায়। পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ সারা বিশ্বে এর প্রভাব লক্ষ্য করার মতো।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. স্নায়ুযুদ্ধ কী?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শগত যুদ্ধ।

২. স্নায়ুযুদ্ধ কোন দুটি মতাদর্শের মধ্যে বিদ্যমান ছিল ?
উত্তর: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র।

৩. স্নায়ুযুদ্ধে পুঁজিবাদী মতাদর্শেও নেতৃত্ব কোন দেশের হাতে ছিল ?
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৪. স্নায়ুযুদ্ধে সমাজতন্ত্রিক শিবিরে নেতৃত্তর কোন দেশের হাতে ছিল ?
উত্তর : সোভিয়েত ইউনিয়ন

৫. স্নায়ুযুদ্ধ আসলে যুদ্ধও নয়,শান্তি নয় , এমন একটি অবস্থা - মন্তব্যটি কে করেছিলেন ?
উত্তর : ফ্রাঙ্কল।

৬. স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা কখন ?
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে।

৭. কখন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে ?
উত্তর : ১৯৯০ সালে দুই জার্মানী একত্রীকরণের মধ্যদিয়ে।

৮. স্নায়ুযুদ্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট লিখ।
উত্তর : দ্বি-মেরুকৃত ব্যবস্থা, পরাশক্তি উত্থান, যুদ্ধ না করে ভয় দেখিয়ে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি।

৯. Iron curtain অর্থ কী ?
উত্তর : লৌহ যবনিকা।

১০. স্নায়ুযুদ্ধের প্রবর্তক কারা ?
উত্তর: চার্চিল,কেন্নান, বারচ্চ প্রমুখ।

১১. অক্টোবর বিপ-ব কত সালে সংগঠিত হয় ?
উত্তর: ১৯১৭ সালে।

১২. আটলান্টিক সনদ কখন স্বারিত হয় ?
উত্তর: ১৯৪১ সালে।

১৩. Nato কত সালে গঠিত হয় ?
উত্তর: ১৯৪৯ সালে।

১৪. Raymond Aron-এর মতে স্নায়ুযুদ্ধের প্রধান কারন কয়টি ?
উত্তর: ৩টি।

১৫. Raymond Aron-এর মতে স্নায়ুযুদ্ধের কারন তিনটি কী কী ?
উত্তর: power, Ideas and Glory.

১৬. স্নায়ুযুদ্ধেও কয়েকটি কারণ লিখ ?
উত্তর: সমাজতন্ত্রের প্রসার,কমিউনিস্ট পার্টির মতা বৃদ্ধি, গ্রিস, ইরান ও তুরস্ক নিয়ে মত পার্থক্য।

১৭. The clash If civlization তত্ত্বেও প্রবর্তক কে ?
উত্তর: হান্টিংটন (S.P Huntington)।

১৮. কে গণতন্ত্রের বিকাশকে "Third wave of Democracy"বলে অভিহিত করেছেন ?
উত্তর: Huntington.

১৯. স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।
উত্তর: ক.সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, খ.সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন এবং গ. সমাজতন্ত্রের অন্ত সারশূন্যতা।

২০. গ্লাসনস্ত অর্থ কী ?
উত্তর: খোলামেলা আলোচনা।

http://thejobstudy.com Go to Contents

২১. পেরেস্ত্রেইকা (Perestroyka) অর্থ কী ?
উত্তর: উন্নয়নমূলক আলোচনা।

২২. কত সালে ট্রুম্যাননীতি ঘোষণা করা হয় ?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ।

২৩. মার্শাল পরিকল্পনা কত সালে ঘোষিত হয় ?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ৫ জুন।

২৪. কোরিয়া যুদ্ধ কত সালের শুরু হয় ?
উত্তর: ১৯৫০ সালে।

২৫. সিয়াটো (SEATO) কত সালে সম্পাদিত হয় ?
উত্তর: ১৯৫৪ সালে।

২৬. Warsaw Pack কত সালে সম্পাদিত হয় ?
উত্তর: ১৯৫৫ সালে।

২৭. সুয়েজখাল কত সালে জাতীয়করণ করা হয় ?
উত্তর: ১৯৫৬ সালে।

২৮. স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম স্তরের সময়কাল কত ?
উত্তর: ১৯৪৫-১৯৫০

২৯. স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরের সময়কাল কত ?
উত্তর: ১৯৫০-১৯৫৩

৩০. স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় স্তরের সময়কাল কত ?
উত্তর: ১৯৫৩-১৯৫৯।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞা দাও।
খ. স্নায়ুযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

২. ক. স্নায়ুযুদ্ধের কারণ লিখ।
খ. স্নায়ুযুদ্ধের প্রকৃতি আলোচনা কর।

৩. ক. স্নায়ুযুদ্ধের কী অবসান ঘটেছে?
খ. জাতিসংঘের ওপর স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. স্নায়ুযুদ্ধ কী? স্নায়ুযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর?
২. স্নায়ুযুদ্ধেও কারণ ও স্তর আলোচনা কর?
৩. স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের কারণগুলো বর্ণনা কর?
৪. স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির প্রকৃতি আলোচনা কর?
৫. তুমি কী মনে করে যে, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির গতি একমেরুকরণ প্রকৃতির?

অধ্যায় ১৩

পররাষ্ট্রনীতি এবং কূটনীতি
Foreign Policy & Diplomacy

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৩.১ ভূমিকা
১৩.২ কূটনৈতিক সম্পর্কে ধারণা
১৩.৩ কূটনৈতিক প্রতিনিধি
১৩.৪ কূটনীতিবিদের কার্যাবলি
১৩.৬ পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির সম্পর্ক ও পার্থক্য
১৩.৭ কূটনৈতিক অব্যাহতি বা বিমুক্তি বা কূটনীতিকদের সুযোগ সুবিধা
১৩.৮ সফল কূটনীতিবিদের গুণাবলি
১৩.৮ অর্থনৈতিক কূটনীতি

১৩.১ ভূমিকা (Introduction)

পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীল। তাদের নির্ভরশীলতার জন্য একে অপরের সাথে বিভিন্ন ধরণের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং তাদের স্বার্থের (National Interest) প্রেক্ষাপটে তারা পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ (Inter-action) সম্পাদন করে থাকে। এরূপ আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (Peaceful Co-existence) বজায় রেখে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে অফিস স্থাপন করে সরাসরি রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে। একটি রাষ্ট্রের অপর রাষ্ট্রে স্থাপিত অফিসকে কূটনৈতিক মিশন (Diplimatic Mission) বলা হয়ে থাকে এবং এ কূটনৈতিক মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে কূটনীতিক (Diplomat) বলা হয়। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রসমূহ তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সাহায্যেই এ কাজটি সম্পন্ন করে। রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় প্রথা অতি প্রাচীন। একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই কূটনৈতিক প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা তারা অনুভব করে যে, কূটনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। চৈনিক সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কূটনৈতিক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম স্থায়ী ভাবে রাষ্ট্রদূত বিনিময় প্রথা প্রবর্তন হয় ইউরোপের বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গণতন্ত্র প্রসারের ফলে কূটনীতি পরিচালনা পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, যাতায়াতের সুবিধা, সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক অধিকতর নিবিড় হতে থাকে এবং যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বাস্তবতায় কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অধিকার, কর্তব্য অথবা বিশেষ সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপক রীতিনীতি গড়ে ওঠে কূটনীতি

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে কূটনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ এখন কূটনীতির মাধ্যমে পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখে।

১৩.২ কূটনীতি সম্পর্কে ধারণা (Conception About Diplomacy)

কূটনীতি হলো একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাজনীতির বহিঃপ্রতিফলন, যার দ্বারা ঐ রাষ্ট্রটি তার নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করতে প্রয়াস পায়। কূটনীতিক হলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে বহিঃসম্পর্ক জোরদার করাসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উপর্যুক্ত অংশগ্রহণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা। কূটনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Diplomacy' গ্রিক শব্দ 'Diploma' থেকে এসেছে। 'Diploma' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত উপাধিপত্র বা সনদ। কূটনীতির আভিধানিক অর্থ হলো চতুর কৌশল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের Diplomacy বলতে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক সরকারি কার্যাদি বুঝায়। কূটনীতি হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বা সুষ্ঠু পরিচালনার এক কৌশল।

The Oxford English Dictionary তে কূটনীতি (Diplomacy) এর অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা হয়, "কূটনীতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পরিচালনার ব্যবস্থা অথবা বলা যায় কূটনীতি হচ্ছে সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।" স্যার আরনেস্ট স্যাটাউ (Satow) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, "কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের প্রয়োগ।"

জর্জ কেন্নান (Kennan) কূটনীতিকে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন।

হ্যারল্ড উইলসন এর মতে, "কূটনীতি শব্দটি নানাবিধ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কূটনীতিকে কখনও আলাপ-আলোচনার সমার্থক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়, আবার কখনও আলোচনা পরিচালনার দক্ষতা ও কৌশলরূপে গ্রহণ করা হয়।"

প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincoln) এর মতে, "কূটনীতি বলতে প্রতিনিধিত্বের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ প্রথাগতভাবে একে অপরের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।"

মরগ্যানথ্যু (H.G. Morgenthau) এর মতে, "কূটনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মস্তিষ্কস্বরূপ।" তার মতে, কূটনীতি বলতে বোঝায় সকল স্তরের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।

উড ও সেরেস (J.R. Wood and Jean Serres) এর মতে, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের কৌশল হচ্ছে কূটনীতি।"

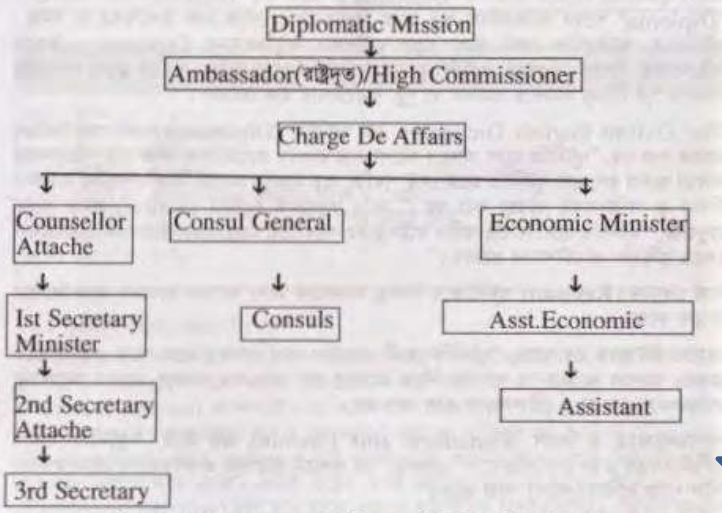
নরম্যান হিল (Norman Hill) বলেন, "কূটনীতিকে প্রায়ই পররাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয় অথচ এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পররাষ্ট্রনীতি সরকারি নীতিমালার অন্তঃসার, আর কূটনীতি হলো এমন এক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নীতিসমূহ বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং তা সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।"

কূটনীতি হলো একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের একটি শান্তিপূর্ণ হাতিয়ার। এটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা অন্য কোনো রাষ্ট্রের পরিচালিত কর্মকাণ্ড। আর কূটনৈতিক আইন হচ্ছে প্রথাগত ও চুক্তিগত যে সব নিয়ম কানুন যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং কূটনৈতিক প্রেরণ, তাদের দায় মুক্তি, কার্যাবলি, অপসারণ প্রভৃতি সংক্রান্ত সার্বিক

বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে।

১৩.৩ কূটনৈতিক প্রতিনিধি (Diplomatic Envoys)

একটি রাষ্ট্র যখন অপর রাষ্ট্রে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করত সেখানে সরকারিভাবে ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ করে নিজ দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন এরূপ মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ পেশাদার কূটনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হন। এদেরকে নিম্নরূপ পর্যায়ভুক্ত করা যায় :



১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেসের মাধ্যমে কূটনীতিকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালের কূটনৈতিক ও কনস্যুলার সম্পর্কিত কনভেনশনই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আইনের মূল উৎস। ১৯৬১ সালের কনভেনশনের ১৪নং অনুচ্ছেদে কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের কে সমন্বয় করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : (ক) রাষ্ট্রদূতগণ এবং পোপের দূত (Ambassador and High commissioner) এবং Nuncio. (খ) বিশেষ কূটনৈতিক মন্ত্রী, কূটনৈতিক প্রতিনিধি (envoys) এবং পোপের উপদূত (internuncio) যারা রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট প্রেরিত হন। (গ) চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে প্রেরিত হন। এছাড়া রয়েছে বিশেষ ধরণের কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা স্থায়ী মিশনে কর্মরত থেকে কূটনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করেন না। তারা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরণের কার্যক্রমের জন্য নিয়োজিত হন। এদের মধ্যে রয়েছে- ক) Special Envoys, খ) Envoys, গ) Nuncios, ঘ) Inter Nuncios

কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কর্মরত কূটনৈতিক মিশন প্রধানকে হাইকমিশনার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মিশন প্রধানদেরকে এ্যামব্যাসেডর বলা হয়ে থাকে। কূটনৈতিক মিশন

http://thejobstudy.com Go to Contents

প্রধানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কূটনৈতিককে চার্জ দ্য এফেয়ার্স বলা হয়ে থাকে। এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক মিশনে কর্মরত থাকেন যথাক্রমে কাউন্সেলর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সচিব। বাণিজ্যিক কার্যক্রম দেখাশুনা করার জন্য পদস্থ কূটনৈতিক কর্মকর্তা হলে কনসুল জেনারেল এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন সহকারী কনসুলগণ। সামরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বলা হয় অ্যাটাসি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কজনিত কার্যক্রম মূলত পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কূটনৈতিক কর্মকর্তা হলেন ইকোনোমিক মিনিস্টার। কূটনৈতিক মিশনে স্থায়ী পদায়নে না তাকে বরং সরাসরি একটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষ দূত (special Envoy)। মহা-সচিবসহ জাতিসংঘের কর্মরত বিশেষ কর্মকর্তাগণ যখন কূটনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত হন, তখন তাদেরকে হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১৩.৪ কূটনীতিবিদের কার্যাবলি (Functions of diplomats)

রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতির সফল বাস্তবায়নে কূটনীতিবিদদের ভূমিকা ও কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। বিশ্বায়নের বর্তমান পৃথিবীতে তাদের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কূটনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক যেন অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা। মরগ্যানথ্যু কূটনীতিকে আপসের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তরূপে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, কূটনীতি হচ্ছে জাতীয় শক্তির অপরিহার্য উপাদান। আর. জে. চাইল্ড (R. J. Child) এর মতে, "কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি হচ্ছে প্রতিনিধিত্বকরণ আপস আলোচনা, রিপোর্টিং এবং বিদেশের মাটিতে জাতীয় নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।" মরগ্যানথ্যু তিনটি কাজের উল্লেখ করেন। কূটনীতিবিদগণ তিনটি কাজ করেন। যথা :

১. প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব,
২. আইনগত ও
৩. রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করা।

কে. জে. হোলস্টি (K. G. Holsti) বলেন, কূটনীতির প্রধান কার্যাবলি হলো বিদেশে নিজের

মনে রাখার Technique & Tips

কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলী

১৯৬১ সালের ভিয়েন কনভেনশনের ৩ নং অনুচ্ছেদে কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

১. কূটনীতিক গ্রাহক রাষ্ট্রে প্রেরক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন
২. আইনের সীমার মধ্যে গ্রাহক রাষ্ট্রে রক্ষা করা
৩. গ্রাহক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করা।
৪. গ্রাহক রাষ্ট্রের অবস্থা যা প্রেরক রাষ্ট্রের প্রয়োজন সে সম্পর্কে নিজ রাষ্ট্রে রিপোর্ট করা
৫. উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা।

কূটনৈতিক মর্যাদার অবসান হয় কিভাবে?

১. প্রেরক রাষ্ট্র মেয়াদ মেস হয়েছে মর্মে যদি গ্রাহক রাষ্ট্র প্রত্যাহার করলে:নোটিশ প্রদান করা।
২. "গ্রাহক রাষ্ট্র স্বীকৃতি না দিলে" গ্রাহক রাষ্ট্র যদি স্বীকৃতি দিতে রাজি না হয়
৩. "গুপ্তচর ব্যক্তি" গ্রাহক রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে যেমন-গুপ্তচর বৃত্তিকে লিপ্ত হলে গ্রাহক রাষ্ট্র তাকে 'অবাঞ্ছিত' (Persona non grata) ঘোষনা আদেশ দিতে পারে।
৪. যুদ্ধের কারন : যদি যুদ্ধের কারনে গ্রাহক রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের অবসান ঘটলে কূটনৈতিক প্রতীনগন নীজ দেশে ফিরে যান। যেমন ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় আর্জেন্টিনা ও বৃটেনের মধ্যে।
৫. আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের অবসান : আন্তর্জাতিক ব্যক্তি কোন ব্যক্তি না বরং দেশ অথবা/সংখ্যা। এক্ষেত্রে দেশটি হতে হয় সার্বভৌম। অথ্যৎ সার্বভৌম কোন দেশ যদি কোন কারনে সার্বভৌমত্ব হারায় তবে বিদ্যমান কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটে।
৬. স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে বিরত।
৭. প্রেরক রাষ্ট্র প্রত্যাহার করলে।

দেশের নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষা, প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব, সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ, পরামর্শদান করা, নীতি প্রণয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আধুনিক যুগে কূটনীতিকদের কাজ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১. **প্রতীকী কার্যাবলি :** কূটনীতিবিদরা স্ব-স্ব দেশের প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব করেন। তারা নিজ দেশের সরকারের চক্ষু ও কর্ণের ভূমিকা পালন করেন। তারা নিজ দেশের গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও অনুরূপ অনুষ্ঠানে অন্যত্র যোগদান করেন।

২. **প্রতিনিধিত্ব করা :** বিদেশে একজন কূটনীতি নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেন। কর্মরত রাষ্ট্রের সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সাথে আলাপ আলোচনা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে একজন কূটনীতিক নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য সাধন করেন।

৩. **প্রতিবেদন প্রেরণ :** কূটনীতিকের অন্যতম কাজ হলো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সামরিক বিষয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ করা। তিনি শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করেন না। এর সাথে তার সুচিন্তিত মতামত সম্বলিত প্রতিবেদনও তৈরি করেন। তার পাঠানো প্রতিবেদন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **আলাপ আলোচনা :** কূটনীতিবিদদের অন্যতম কাজ হলো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া। এক্ষেত্রে কূটনীতিবিদ আপসকারীর ভূমিকাও পালন করেন। তাকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে জাতীয় স্বার্থ কোনো প্রকারে ক্ষুন্ন না হয়।

৫. **স্বার্থ সংরক্ষণ :** কূটনীতিবিদদের মুখ্য কাজ হলো নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। বিদেশে অবস্থানকালে তারা সবসময় লক্ষ্য রাখেন কিভাবে নিজ দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা যায়। এ ব্যাপারে তাদেরকে নিজ দেশের ভ্রমণকারী নাগরিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষানবিশ ও বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের নানাভাবে সাহায্য সহায়তা করতে হয়। তাদের এরূপ কার্যাবলি মোটেই সংঘাতময় বা স্বার্থপরতা নয়। তারা কেবল প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা মোটেই তাদের লক্ষ্য নয়।

৬. **সংযোগ স্থাপনের কাজ :** কূটনীতিকরা নিজ দেশের ও দায়িত্ব পালনকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংযোগ রক্ষাকারীর দায়িত্ব পালন করেন। প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তির খসড়া তৈরি করেন ও তাতে স্বাক্ষর পর্যন্ত করে থাকেন। এক্ষেত্রে এসব চুক্তি সরকার প্রধানের স্বাক্ষরিত বলে বিবেচিত হয়। কূটনীতিকরা বিদেশে নিজেদের নাগরিকদের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন এবং তাদের ওপর সর্তক দৃষ্টি রাখেন।

৭. **বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ :** কূটনীতিকগণ শুধুমাত্র প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব করেন না, তারা নিজ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজও করে থাকেন। এ ব্যাপারে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্য দূত নিয়োজিত বা অনুপস্থিত থাকলে কূটনীতিক নিজেই এসব কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। বহির্বিশ্বে দেশের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এরূপ কার্যাবলি সম্পাদন দক্ষতার ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

৮. **বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা :** কূটনীতিবিদদের অন্যতম কর্তব্য হলো অবস্থানকারী রাষ্ট্রের সাথে নিজ দেশের বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা। বন্ধুত্বের মাধ্যমেই পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার দ্বারা উন্মোচিত হবে। আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে পারস্পরিক বহুবিধ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে নিজ দেশের স্বার্থও সমুন্নত রাখা যায়। রাষ্ট্রদূতদের ভূমিকার ওপর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভর করে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

৯. **কর্মসূচি পরিচালনা :** বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা বর্তমানে কূটনীতিবিদদের অন্যতম

দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ও সংগঠন বিদেশে নানা আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। কূটনীতিবিদদের এ সমস্ত সংস্থাসমূহের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়।

কলোম্বিস ও উলফে (Couloimbus & Wolfe) এর মতামত অনুযায়ী, উপরিউক্ত কার্যাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১.নিয়মমাফিক কার্যাবলি (Routine functions) ও
২.বিষয়গত কার্যাবলি (Substantive functoins)

বিদেশে নাগরিকদের আগমন, জন্ম মৃত্যু, বিয়ে, পাসপোর্ট বৈধকরণ, পরিবর্তন, সম্পত্তি স্বার্থ রক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কূটনৈতিক অনুষ্ঠান ভোজ সভায় যোগদান ইত্যাদি রুটিন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে, আলাপ আলোচনা, প্রতিবেদন প্রেরণ, সংযোগ স্থাপন, কর্মসূচি পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে বিশ্বের জটিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি কেবল বেড়েই চলছে।

মরগ্যানথ্যু বলেন, "কূটনীতিকগণ কেবল নিজ দেশের চক্ষু কর্ণই নন। তারা পররাষ্ট্রনীতির মুখ গহ্বর ও হাতরূপেও গণ্য হন। তাদের কার্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কূটনীতির যেমন বিকল্প নেই, কূটনীতিকদের তেমন স্বস্তি নেই।

১৩.৫ কূটনীতিক দায়মুক্তি (Immunities of Envoys)

১৯৬১ সালের ১৮ এপ্রিল ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত কনভেনশন মোতাবেক একজন কূটনীতিক স্বাগতিক দেশে তাঁর বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি প্রাপ্ত হন। এগুলো হলো:

ক. একজন কূটনৈতিক স্বাগতিক দেশে সেদেশের একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিকের মতো প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন।
খ. স্বাগতিক দেশের রাজস্ব ও মিউনিসিপাল কর থেকে অব্যাহতি পাবেন।
গ. স্বাগতিক দেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে স্বাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে আব্যাহতি পাবেন।
ঘ. কূটনৈতিক মিশনের নথিপত্র তল্লাশি বা আটক করা যাবে না।
ঙ. কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বাগতিক দেশ নিজের ও পরিবারবর্গের জানমালের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবেন।
চ. কূটনীতিককে স্বাগতিক দেশ গ্রেফতার বা আটক করতে পারবে না। স্বাগতিক দেশ যথাযথ সম্মান সহকারে কূটনীতিকের সাথে আচরণ করবে এবং তাঁর দেহ, স্বাধীনতা বা মর্যাদার ওপর যে কোনো আক্রমণ রোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ছ. কূটনীতিকের বাসস্থান কূটনৈতিক মিশনের মতোই যথাযথভাবে স্বাগতিক দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত হবে। কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বাগতিক দেশে শিষ্টাচার বহির্ভূত কোনো কাজ করলে তাঁকে স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব (Recall) করা যাবে এবং তার কার্যক্রমের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে ঐ কূটনীতিকের বিরুদ্ধে বহিষ্কারাদেশ প্রদানসহ তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (Persona Non grata) ঘোষণা করা যাবে। এরূপ বহিষ্কৃত কোনো কূটনৈতিক স্বাগতিক দেশের সকল অধিকার ও দায়মুক্তি হারাবে এবং স্বাগতিক দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

১৩.৬ পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির সম্পর্ক ও পার্থক্য
Relations and difference between foreign policy and diplomacy

বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই নিঃস্বার্থভাবে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে না। জাতীয় লক্ষ্য ও স্বার্থের

অনুকূলে প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। পররাষ্ট্রনীতি হলো জাতীয় স্বার্থরক্ষার অন্যতম মাধ্যম। বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি কোনো রাষ্ট্রের মনোভাবের সুবিন্যস্ত বহিঃপ্রকাশই হলো সেই রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি। বৈদেশিকনীতির মাধ্যমে যে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তকে যথার্থ যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। পররাষ্ট্রনীতি হলো বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া। বৈদেশিক নীতি বলতে সাধারণত বোঝায় কতকগুলো নির্দিষ্ট আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুসরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক বিশেষ প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের রূপরেখাই হলো পররাষ্ট্রনীতি। অন্য কথায় বলা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে তাদের সমষ্টিকে সংক্ষেপে পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়।

অপরপক্ষে, কূটনীতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগই হচ্ছে কূটনীতি। কূটনীতি হচ্ছে সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।

আরনেস্ট স্যাটাউ (Satow) এর মতে, "কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ।"

অরগানসকির ধারণা মতে, "কূটনীতিকে পররাষ্ট্রনীতির সাথে সামঞ্জস্য করে দেখা ভুল। কূটনীতি হলো পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্রিয়ার এক অংশ বিশেষ।" তাঁর মতে, "কূটনীতি হলো এক প্রক্রিয়া বিশেষ এর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে অন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলাপ আলোচনা পরিচালিত হয়।"

মরগ্যানথ্যু এর মতে, "কূটনীতি বলতে বোঝায় সকল স্তরের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও এবং প্রয়োগ।"

কারো কারো মতে, কূটনীতি হলো পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের হাতিয়ার। কূটনীতিকে পররাষ্ট্রনীতির সমার্থকরূপে ধারণা করা সঠিক নয়। কারণ কূটনীতিকরা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা কখনও পালন করেন না। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে তাদের মতামত, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হলেও তারা কোনো অবস্থায়ই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্যে সবসময়ই তফাৎ রয়েছে। কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিকে সমার্থক মনে করার অর্থ হলো কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির মূল বক্তব্য থেকে সরে আসা। কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি কখনই সমার্থক হতে পারে না। আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে এক্তিয়ারগত পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে কতিপয় পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

পররাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত। অপরপক্ষে কূটনীতি বলতে পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

পামার ও পারকিনসের মতে, "কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও লোকজন সরবরাহ করে। একটি বিষয়বস্তু আর অন্যটি হলো পদ্ধতি। অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি বিষয়বস্তু হলে কূটনীতি তার প্রয়োগের একটি হাতিয়ার মাত্র।

হ্যারল্ড নিকলসের মতে, "কূটনীতির যেখানে শেষ, পররাষ্ট্রনীতি সেখানে শুরু। কূটনীতি কোনো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সাধনের মাধ্যম। কূটনীতি উদ্দেশ্য নয় একটি পদ্ধতি।"

কূটনীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর হয়, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে কূটনীতি ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বিবেচনা করা হয়। কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের মুখ্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়নে কূটনীতি কখনও একক ভূমিকা পালন করে না।

কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে না। পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা ও প্রচারে সহায়তা করে। কূটনীতি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। কূটনীতি হলো সেই হাতিয়ার, যার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করেন না।

কূটনীতির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। কূটনীতি পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনস্থ থেকেই কাজ সমাধান করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই কূটনীতিবিদদের কাজ করতে হয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোনো কোনো সময় কূটনৈতিক কার্যাবলি সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কখনও স্থগিত হয়ে যায় না।

কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি উভয়ে পরস্পর নির্ভরশীল। কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক তথ্য ও সংবাদ সরবরাহের অন্যতম উৎস। বিশ্বস্ত ও মৌলিক সূত্র থেকে তথ্যপ্রাপ্তি ব্যতীত পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনও সম্ভব নয়। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কূটনীতিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কূটনীতিকগণই বিদেশে নিজ নিজ দেশের মুখ্য প্রতিনিধি। তারা হলেন সরকারের চক্ষু ও কর্ণ বিশেষ। তারা নিজ দেশের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করেন ও বৈদেশিক ঘটনাবলি সম্পর্কে দেশের সরকারকে সর্বদা অবহিত রাখেন। কূটনীতির হাতিয়ার ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি ও সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে প্রয়োগে করতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য একটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু, কাজের পদ্ধতি ও হাতিয়ার কিরূপ হবে তা নির্ভরশীল থাকে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর। বৈদেশিকনীতিকে সুন্দর ও ফলপ্রসূ করার ব্যাপারে কূটনীতিকদের ভূমিকা অনন্য। বৈদেশিক দপ্তর দক্ষ ও অভিজ্ঞ হলে কূটনীতি দক্ষ ও কার্যকর হবে। কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এমন যে, একটা থেকে অন্যটা পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। মরগ্যানথ্যু কূটনীতিকে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উভয়ের ভূমিকায় ন্যস্ত করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি কূটনীতির চারটি কর্তব্যের উল্লেখ করেন। এগুলো হলো- ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্ধারণ, অন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্যের মূল্যায়ন, উভয়ের লক্ষ্যের সামঞ্জস্য বিধান এবং লক্ষ্য সাধনের মাধ্যমে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এগুলোর একটি কর্তব্য পালনে কূটনীতি ব্যর্থ হলে পররাষ্ট্রনীতিও বিপন্ন হবে, যার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব শান্তি পরাহত হবে। কূটনীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি উৎসাহ লাভ করে। কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি উভয়ের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন-জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠা ও সংবৃদ্ধি বিধান। জাতীয় লক্ষ্য সাধনের জন্যই পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মধ্যে নির্ভরশীলতা ও সামঞ্জস্য বিধান একান্ত আবশ্যক। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠকের ব্যবস্থা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের পরস্পরের সাক্ষাতের সুযোগ, হটলাইন ডিপ্লোমেসির উদ্ভব তৃতীয় রাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন ইত্যাদি কারণে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও তৎপরতা ক্ষানিকটা গৌণ হয়ে আসলেও স্থায়ী ও নিয়মিত মাধ্যম হিসেবে কূটনীতির গুরুত্ব কখনও হ্রাস পাবে না। কূটনৈতিক তৎপরতার সাফল্যের ওপর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ও বিশ্ব শান্তির সোপান নিহিত রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্ক যত জটিল আকার ধারণ করছে কূটনীতির গুরুত্ব ততবেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে বলা যায়। কূটনীতি শান্তিরক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ প্রতিরোধ করা ও এড়ানো কিংবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় শান্তি পুনঃস্থাপনে কূটনীতির কোনো বিকল্প নেই।

১৩.৭ কূটনৈতিক অব্যাহতি বা বিমুক্তি বা কূটনীতিকদের সুযোগ সুবিধা

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনীতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কূটনীতি এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে কূটনীতি। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়। বৈদেশিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হলো কূটনীতি। কূটনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এক সূত্রে গাঁথা। বর্তমান বিশ্বের জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিশ্ব শান্তি সংরক্ষণের ও প্রতিষ্ঠায় কূটনীতির বিকল্প নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই নিজ স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে দেশে দেশে কূটনীতিক পাঠাতে হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে কূটনীতিকদের গ্রহণও করতে হয়। ফলে দেশে বিদেশে কর্মরত কূটনীতিকদের কতকগুলো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব সুযোগ সুবিধা না থাকলে কূটনীতিকরা স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেনা। কূটনীতিকদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা

প্রদান করা হয় এবং প্রচলিত বিধি সম্মত যে সকল বিষয়ে তাদের ক্ষেত্রে অব্যাহতি বা ছাড় দেওয়া হয় তাকেই কূটনৈতিক অব্যাহতি বা কূটনৈতিক বিমুক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সকল সুযোগ-সুবিধা দেশের সাধারণ নাগরিকরা ভোগ করতে পারেন না। এটা শুধুমাত্র কূটনীতিকদের বিশেষ অধিকার বলে গণ্য করা হয়। এর উৎস হিসেবে- ক. সৌজন্য খ. আন্তর্জাতিক আইন গ. আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও ঘ. চুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। নিম্নে কূটনীতিকদের কতকগুলো সুযোগ-সুবিদার কথা উল্লেখ করা হলো :

১. **আইনের অব্যাহতি :** কূটনীতিকরা কর্মরত দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এসব আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। তারা নিজ রাষ্ট্রের আইনের আওতাভুক্ত থাকেন। তবে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের স্বদেশের সরকারের অনুমতিক্রমে দেশীয় আইনে তাদের বিচার করা যেতে পারে।

২. **নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান :** কূটনীতিকরা নিজ রাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রদূত হিসেবে তারা সম্মানের পাত্র। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কূটনীতিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে তারা সরকারের পক্ষ থেকে যে কোনো রকম সাহায্য কামনা করতে পারেন।

৩. **কর শুল্ক থেকে অব্যাহতি :** কূটনীতিকগন যে সকল দেশে কর্মরত থাকেন সে সকল দেশের প্রত্যক্ষ কর ও শুল্ক থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরোক্ষ কর থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ নেই।

৪. **দূতাবাস, বাসস্থান ইত্যাদির ওপর এখতিয়ার :** দূতাবাস, কূটনীতিকদের বাসস্থান, নথিপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি কূটনীতিকদের নিজ দেশের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। স্থানীয় সরকার বা কর্মচারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৫. **যোগাযোগের সুবিধা :** কূটনীতিকরা যে কোনো সময় যে কোনো সংবাদ বা তথ্যাদি নিজ দেশে কিংবা অন্য দেশে প্রেরণ করতে পারেন। তারা কূটনীতিক লাগেজ সুবিধাও ভোগ করেন। তাদের নিকট পাঠানো বা তাদের প্রেরিত চিঠিপত্র, লাগেজ ইত্যাদি দেশীয় কর্তৃপক্ষ খুলে দেখতে পারে না। তারা গোপন সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য নিজস্ব বেতার সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

৬. **জবাবদিহিতার অব্যাহতি :** কূটনীতিকগণ কর্মরত রাষ্ট্রের নিকট জবাবদিহি নন। কোনো প্রকার অভিযোগ থাকলে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদেরকে তলব করতে পারে মাত্র। গুরুতর অভিযোগ সরকারের নিকট করতে হয়। তাঁর দেশের সরকারই কেবলমাত্র তাকে জবাবদিহি করতে পারে।

৭. **সহযোগিতার আশ্বাস :** কর্মরত দেশের সরকার কূটনীতিকদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে থাকেন। কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত তাদের কর্মকাণ্ডে কোনোরূপ আপত্তি বা বাধা দেওয়া হয় না। তারা স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করতে পারেন। তারা যে কোনো সময় সরকারের কাছ থেকে যে কোনো প্রকার সাহায্য সহায়তা চাইতে পারেন।

৮. **স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার :** কূটনীতিবিদগণ যে সকল সুযোগ সুবিধা পায় তার মধ্যে যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হলো অবস্থানকারী রাষ্ট্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ দেশের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ নিষেধ। কূটনীতিকরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার ঐ রাষ্ট্র কর্তৃক পেয়ে থাকে।

৯. **ডিপ্লোমেটিক ব্যাগের সুবিধা :** কূটনীতিবিদরা যখন নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে বা অন্য দেশ থেকে নিজ দেশে এক কথায় দেশান্তরের সময় তাদের কাগজপত্র ও ব্যাগেজ কিছুই চেক করা হয়না। অর্থাৎ তারা ডিপ্লোমেটিক ব্যাগের সুবিধা পেয়ে থাকে।

১৩.৮ সফল কূটনীতিবিদের গুণাবলি (Qualities of a sucessful diplomat)

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিশ্বে কূটনীতি এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিণত

হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যতই বাড়ছে কূটনীতির গুরুত্ব ততই কেবল বাড়ছে। কূটনীতিবিদদের মাধ্যমেই বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও পারস্পরিক মতবিনিময় কার্য সম্পাদন করা হয়। কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সামর্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে কূটনীতিবিদদের গুণাগুণ ও দক্ষতার ওপর। পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতি পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ওপরই নির্ভর করে। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক রক্ষা করা, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, আপন রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি কূটনীতিবিদরা সম্পন্ন করেন। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা রক্ষা, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বহুলাংশে কূটনীতিবিদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব যাদেরকে পালন করতে হয়, তাদেরকে কতকগুলো বিশেষ গুণাবলির অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিম্নে গুণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সুশিক্ষা :** একজন কূটনীতিবিদকে অবশ্যই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আধুনিক বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাকে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষা ব্যতীত কোনো বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনই সম্ভব নয়। সুশিক্ষায় শিক্ষিত কূটনীতিবিদই কেবল দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন।

২. **ব্যক্তিত্ব :** একজন সফল কূটনীতিকে অবশ্যই চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। তার চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, পোশাক পরিচ্ছদ ও গুণাগুণ এমন হওয়া চাই যা সহজে সকলকে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করতে পারে। কূটনীতিককে রাষ্ট্রের প্রতীকী হিসেবে দেখা হয় তার ব্যক্তিত্বের ওপর নিজেদের ভাবমূর্তি নির্ভর করছে। একজন সচেতন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কূটনীতিকে যেমন রাষ্ট্রের সুনাম বয়ে আনে, তেমনি একজন দুর্বল ব্যক্তিত্বহীন কূটনীতিক রাষ্ট্রের বদ নামের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

৩. **স্থির লক্ষ্য :** একজন সফল কূটনীতিককে তার দায়িত্ব ও লক্ষ্য সঠিকভাবে স্থির করার যোগ্যতা থাকতে হবে। তাকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নানাবিধ জটিলতা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৪. **সঠিক বিচারবোধ :** সঠিক বিচারবোধ একজন কূটনীতিকের অন্যতম গুণ। তাকে নিজ দেশের ও অন্যরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। সঠিক বিচারবোধ না থাকলে এ কাজটি অত্যন্ত দুরুহ হয়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৫. **আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান :** কূটনীতিবিদকে অবশ্যই মেধাসম্পন্ন হতে হবে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে একজন সফল কূটনীতিককে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া চাই। অন্যথায় বিশ্ব পরিস্থিতিতে তার পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা মোটেই সম্ভব হবে না।

৬. **আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান :** আধুনিক যুগে একজন কূটনীতিককে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া চাই। সঠিক জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা, আলাপ আলোচনা, যুক্তিতর্ক, চুক্তি সম্পাদন, খসড়া তৈরি, প্রতিবেদন রচনা করা ইত্যাদি কাজ দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

৭. **তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহে দক্ষতা :** একজন সফল কূটনীতিক একজন সফল প্রতিবেদকও বটে। কূটনীতিককে কর্মরত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে নিজ দেশে পাঠাতে হয়। সঠিক ও সুস্পষ্ট প্রতিবেদন রচনা কূটনীতিকের তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। কূটনীতিকের প্রেরিত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে।

৮. **সততা ও বিশ্বস্ততা :** একজন সফল কূটনীতিককে অবশ্যই সৎ, বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক হতে হবে। চারিত্রিক সততা ব্যতীত বিদেশে নিজ দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখা সম্ভব নয়। তাকে বিভিন্ন প্রকার লোভ লালসার উর্ধ্বে থাকতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরিত্যাগ করতে না

পারলে জাতীয় স্বার্থ কখনও সমুন্নত রাখা যাবে না। অনেক সময় কূটনীতিবিদরা বিভিন্ন লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে দেশের ব্যাপক দুর্নাম বয়ে আনেন। বিশ্বস্ততা না থাকলে প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব পালন করা আদৌ সম্ভব নয়।

৯. **জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সতর্ক থাকা :** একজন কূটনীতিককে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশে তিনি কোনো অবস্থায়ই এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার কার্যকলাপের ওপর জাতীয় স্বার্থ, মান সম্মান অনেকখানি নির্ভর করছে। সুতরাং তাকে সবসময় সচেষ্ট থাকতে হবে কীভাবে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখা যায়।

১০. **পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞান :** পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া কূটনীতিকের আবশ্যকীয় গুণ। কূটনীতিক হচ্ছেন পররাষ্ট্রনীতির বাহক ও ধারক। তাকে সবসময় নিজ দেশের ও বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতে হয়। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাকে পররাষ্ট্র দপ্তর ও বহির্বিশ্বের সংযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে হয়।

১১. **দূরদৃষ্টি সম্পন্ন :** একজন কূটনীতিকের দূরদৃষ্টি থাকা চাই। দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থ বিবেচনায় রেখে তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভূমিকা পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন না হলে তার কার্যকলাপ দ্বারা ভবিষ্যতে দেশের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে একজন কূটনীতিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেহেতু বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেহেতু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দক্ষ, দায়িত্বশীল, জ্ঞানী, ব্যক্তিসম্পন্ন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিবিদ তার নিজ দেশের স্বার্থকে সার্থকভাবে সমুন্নত রাখতে পারেন। সাথে সাথে তার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত হতে পারে।

১৩.৯ অর্থনৈতিক কূটনীতি

অর্থনৈতিক কূটনীতি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনী বিষয়াবলির সাথে জড়িত। অর্থনৈতিক কূটনীতিবিদগন বিদেশের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ পর্যবেক্ষন করেন এবং নিজ দেশের সরকারকে সেই নীতিসমূহ থেকে কীভাবে সর্বোত্তম উপকার লাভ করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অর্থনৈতিক কূটনীতি পররাষ্ট্রের কোনো নির্দিষ্ট পলিসির বিপরীতে নিজ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ কীভাবে ব্যবহার কিংবা প্রয়োগ করা যায় সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়।

অর্থনৈতিক কূটনীতি

অর্থনৈতিক কূটনীতি হচ্ছে এমন কার্যক্রমের সমষ্টি (আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উভয় মিলে) যা সীমানা বর্হিভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলি (রপ্তানি, আমদানি, বিনিয়োগ, ধার-দেনা, সাহায্য অভিবাসন) রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বহির্ভূত সংস্থা দ্বারা আধুনিক বিশ্বে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনীতি, ব্যাবসা বানিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে কূটনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাই অর্থনৈতিক কূটনীতি।

কূটনৈতিক ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে বেশি নিবদ্ধ ছিল। সময়ের পরিবর্তে এখন জোর দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়াদির ওপর। ঔপনিবেশিকতার অবসান, জোটনিরপেক্ষনীতি, তৃতীয় বিশ্বের সংহতি ইত্যাদি আর উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়না। এ সমস্ত প্রত্যয়ের স্থান দখল করেছে বিশ্বায়ন, অবাধ প্রতিযোগিতা,অর্থনৈতিক ব্লক,আন্তর্জাতিক ব্লক ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনীতির স্বার্থবোধ থেকে মধ্যপ্রাচ্য (ইরাক) সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক কূটনৈতিকের নামান্তর।

অর্থনৈতিক কূটনীতিকে বানিজ্য কূটনীতি (Trade/Commercial Diplomacy) বলা হয়। তবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এক নয়। অর্থনৈতিক কূটনীতির পরিধি বানিজ্য কূটনীতির চেয়ে

http://thejobstudy.com Go to Contents

ব্যাপকতর।

১৩.৯ (১) বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী ও অর্থবহ করণে করনীয়:

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালি ও অর্থবহকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **বহির্বিশ্বের সাথে কার্যকরি সম্পর্ক গঠন :** সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ এখন মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। এ সংকট আসলে বিশ্বমন্দা, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির সাথে জড়িত। ফলে এ সংকট থেকে উত্তরণ পেতে চাইলে বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই এ মুহূর্তে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে দেশে ও বিদেশে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সরকারসহ বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা ইপিবি, এনবিআর, পিডিবি, ইত্যাদির কর্মদক্ষতা বহুগুনে বাড়াতে হবে।

২. **জরুরি অবস্থা মোকাবেলা :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী ও অর্থবহকরণের জন্য জরুরি অবস্থা মোকাবেলার উপযোগী করে পরিচালনা করা উচিত। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে সফল করতে হলে সরকারের সকল শাখাকে এক্ষেত্রে সহায়তা ও সহযোগিতা করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহির্বিশ্বে আমাদের মিশনসমূহকে তাদের দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সমন্বয় থাকতে হবে যেখানে বেসরকারি খাতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. **প্রতিকূল বাণিজ্যিক পরিস্থিতির মোকাবিলা :** বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাথেই বাংলাদেশের প্রতিকূল বাণিজ্য বিরাজ করছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সব থেকে বেশি এবং এটি দিন দিন বেড়েই চলছে। এটি সমাধানের জন্য আমাদের অবশ্যই ভারতের সাথে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরালোভাবে শুরু করতে হবে। তাছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলো আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় এবং তাদের পণ্যের দাম আমাদের পণ্যের থেকে কম হওয়ার কারণে আমরা বহির্বিশ্বে যেমন বাজার হারাচ্ছি তেমনি সস্তা পণ্যে আমাদের বাজারও সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অবশ্য পূর্বমুখী নীতি (Look East Lolic) গ্রহণ করেছে। যার অন্যতম মূল লক্ষ্যই হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করা।

৪. **শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা :** উন্নত বিশ্বের পণ্য ও বাজারের সাথে আমরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবো না। তাই উন্নত দেশগুলোর বাজারে আমাদের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা আদায় করে নিতে হবে। এজন্য দরকার যথাযথ কূটনৈতিক পদক্ষেপ। উন্নত রাষ্ট্রগুলোকে বোঝাতে হবে এবং দরকষাকষি চালাতে হবে। এজন্য অর্থনৈতিক বিষয়ে পারদর্শী দক্ষ কূটনীতিবিদ নিয়োগ করতে হবে।

৫. **শ্রমিক রপ্তানি :** মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিমা বিশ্ব, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই যথেষ্ট শ্রমিক ঘাটতি রয়েছে। আমরা সেসব দেশে শ্রমিক রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। তাছাড়া বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারণে শ্রমিকদের বাজার যাতে সংকুচিত না হয় কিংবা শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য না হয়, সে জন্যও আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতেও (WTO) দরকষাকষি করতে পারি। কারণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মুড-৪ (Mode-4)-এ জনসংখ্যা রাপ্তানীর ব্যাপারে (Movement of Natural Persons) বলা হয়েছে। সেখানে শুধু দক্ষ শ্রমিকদের কথা বলা হয়েছে। আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে যে, সেখানে যাতে অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. **সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও সাহায্য বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাত পুঁজি স্বল্পতার জন্য বিকশিত হতে পারছে না। তাই অভ্যন্তরীণ পুঁজির পাশাপাশি বিদেশি পুঁজি আকৃষ্টকরণ জরুরী

হয়ে পড়েছে। এজন্য বহির্বিশ্বে আমাদের দেশের ইমেজ বৃদ্ধি করতে হবে। বিনিয়োগকারীদের বোঝাতে হবে যে, এখানে বিনিয়োগ অধিক নিরাপদ ও লাভজনক। এ প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্যও শক্তিশালী অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রয়োজন। একইভাবে বৈদেশিক সাহায্যও যাতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তারও পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. **বহির্বিশ্বে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা :** বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বকে আমাদের বোঝাতে হবে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকেও বোঝাতে হবে যে, আমরা দারুন সব বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছি এবং আমাদের বাণিজ্যিক পরিবেশ খুবই ভালো।

৮. **বহির্বিশ্বে প্রচারিত বাংলাদেশের নেতিবাচক দিক খতিয়ে দেখা :** বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ব্যাপারে কী কী নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, কেন রয়েছে তাও খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন সমস্যা, যানজট, লোডশেডিং, ঢাকা শহরের উচ্চমাত্রায় পরিবেশ দূষণ, অশান্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত, টোল আদায়ে অনিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতর ও বাইরের ঘটনাবলি এদেশে বিদেশি বিনিয়োগকে ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। এসব সমস্যার সমাধানে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. **বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা :** বাংলাদেশকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ ঢাকায় পৌঁছার পর থেকেই সরকার কর্তৃক সকল সহযোগিতা পেতে পারেন এবং বিনিয়োগ বোর্ড এসকল বিনিয়োগকারীর সব সমস্যা কার্যকরীভাবে ও দ্রুততার সাথে গ্রহণ করে। সময় মানেই টাকা। সিঙ্গাপুরে একজন যাত্রী বিমান থেকে নামার পরে ১৫ মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দর ছাড়তে পারেন, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও এক্ষেত্রে গড়ে একঘন্টারও বেশি সময় লাগে। বাংলাদেশে এসে বিমানবন্দরেই একজন বিনিয়োগকারী এদেশের ভাবমূর্তি হিসাব করে ফেলতে পারেন। মালয়েশিয়ার ক্লাং বন্দরে জাহাজ ভেড়ার পর গড়ে ৭ ঘন্টার মধ্যেই কনটেইনার নামানো শুরু হয়, সেখানে চিটাগাং বন্দরে লাগে কয়েকদিন।

১০. **মিশন ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় :** অর্থনৈতিক কূটনীতির বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। এটি বহুলাংশে ব্যবহৃত হয় একটি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বোঝাতে। এভাবে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংস্থান বৃদ্ধির কারণেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল ক্ষেত্রেই বিদেশে আমাদের মিশনসমূহ এবং আমাদের বেসরকারি খাতের দক্ষ সমন্বয় দরকার।

১১. **বিনিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটি গঠন :** যদি কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায় কিংবা যদি বাইরে আমাদের কোনো দূতাবাস সেদেশে আমাদের কোনো রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করতে চায় তাহলে কীভাবে তাদেরকে এগোতে হবে? তাদেরকে কী বিনিয়োগ বোর্ড বা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নাকি কোনো কোম্পানী বরাবর আবেদন করতে হবে? এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থাপনা পাওয়া যায় না। এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে, যারা সপ্তাহে দুই বা ততোধিক মিটিং করবে। এ কমিটিতে থাকবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন চেম্বার্স, বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। এ কমিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক শাখার অধীনে থেকে বিভিন্ন ব্যাপারে কাজ করবে। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও একটি কমিটি থাকতে পারে।

১২. **আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি :** 'সাহায্য নয় বিনিয়োগ চাই' যদিও বর্তমান সময়ের স্লোগান তথাপি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদেশি আর্থিক সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতির দায়িত্ব হচ্ছে এসব সাহায্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হলে সাহায্য আরো বৃদ্ধি করা।

১৩. **বাংলাদেশের সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ কার্যসম্পাদন :** বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক সংস্থা ও সম্মেলনে কার্যকরী এমনকি

নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করাকেও নির্দেশ করে। এলডিসি, জি-৭৭, ইকোসক, এসকাপ প্রভৃতি সংস্থার সম্মেলনে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই অনুন্নত ও স্বাল্পোন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা তুলে ধরছে। তবে আমাদেরকে ভারত, আমেরিকায় আমাদের রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দূতাবাসসহ কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাস, ঐ দেশে বাংলাদেশি সংগঠনগুলোকে একযোগে করতে হবে। ওয়াশিংটনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোকে যেমন-দি স্টেট ডিপার্টমেন্ট, USTR জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল, কংগ্রেসসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা যেমন জেসি পেন, গ্যাপ, ওয়ালমার্ট ইত্যাদিকে বাংলাদেশের পণ্যের গুণাগুণ বোঝাতে হবে।

১৪. **বাংলাদেশের পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি :** জাপান, অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব-ইউরোপ এবং আফ্রিকায় বাংলাদেশের পণ্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে। যে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যহার আমরা এখনও করতে পারি নি। এছাড়া ইউরোপের অস্ত্রবাদের সবকিছু (ইবিএ) সুযোগটি আমরা আমাদের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে কাজে লাগাতে পারি।

১৫. **সাফটা কার্যকর :** আমরা সার্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও সার্কের পূর্ণ অর্থনৈতিক সুবিধা পাই নি মূলত ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের কারণে। সাফটাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভারতকে তার বাজার সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে এ অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। এ অঞ্চলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। এ অঞ্চলে আন্তঃসহযোগিতার মাধ্যমে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও হাইওয়ে, দক্ষিণ এশীয় এনার্জি গ্রীড, চট্টগ্রামে গভীর সমুদ্রবন্দর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রেও শরণার্থী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

১৬. **লবিং :** ১৮৮৫ সালে মালয়েশিয়ার সরকার কেবল বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার আধা দক্ষ শ্রমিকদেরকে সে দেশে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল অসাধারণ লবিংয়ের মাধ্যমে। এখনও সেরকম লবিং করে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চলে আমাদের শ্রমশক্তি রপ্তানি করতে হবে।

১৭. **বিদেশে মিশনসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ :** বিদেশে আমাদের মিশনগুলোকে কার্যকরী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরো দ্রুত কাজ করার উপযোগী করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রদূতকে অসাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে। তাদের দক্ষতাও আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থনৈতিক কূটনীতি আমাদের অস্তিত্বের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

মূল্যায়ন(Evaluation)

অতএব অর্থনৈতিক কূটনীতি বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবার দাবীদার। আমাদের কূটনীতিদেরকে এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে। বিশেষ প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। ভালো দরকষাকষির জ্ঞান আবশ্যক। বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা ইত্যাদিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সর্বোপরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সমন্বয়ের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি খাতকেও একযোগে কাজ করতে হবে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **কূটনীতি কী ?**
উত্তরঃ কূটনীতি হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সুষ্ঠু পরিচালনার এক কৌশল।

২. **কূটনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী ?**
উত্তরঃ Diplomacy.

৩. **'Diplomacy' শব্দটি কী ভাষার শব্দ ?**
উত্তর : গ্রিক শব্দ।

৪. **কূটনীতির আভিধানিক অর্থ কী ?**
উত্তরঃ চতুর ও কৌশল।

৫. **হ্যারল্ড নিকলসন কূটনীতিকে কতটি অর্থে ব্যবহার করেছেন ?**
উত্তর : ৫টি। যথা: ১. বৈদেশিক নীতি, ২. আলোচনা, ৩. আলোচনার রীতি ও উপায়, ৪. বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ৫. আলোচনা কর্মকান্ডে দক্ষতা।

৬. **কূটনীতিকে কতভাগে বিভক্ত করা যায় ?**
উত্তর : ৬ ভাগে।

৭. **কত শতকে গোপন কূটনীতি ব্যাপকভাবে প্রচলন শুরু হয় ?**
উত্তরঃ উনবিংশর শতকে।

৮. **"কূটনীতিবদ জাতীয় শক্তির অপরিহার্য উপাদান।" এ উক্তিটি কে করেছেন ?**
উত্তরঃ উক্তিটি Prof. Morgenthau এর।

৯. **"কূটনীতিবদ মাঝে মাঝে নিজ দেশের চক্ষু ও কর্ণের ভূমিকা পালন করে।" উক্তিটি কে করেছেন ?**
উত্তরঃ উক্তিটি Palmer and Perkins. এর।

১০. **R.J. child কূটনীতিবদের কার্যাবলীকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ?**
উত্তর : ৪টি। যথা: ১. প্রতিনিধিত্ব, ২. আলাপ-আলোচনা, ৩. প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ৪. স্বার্থ রক্ষা করা।

১১. **Prof. Morgenthau কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ?**
উত্তর : ৩টি। যথা-১. প্রতিকী প্রতিনিধিত্ব, ২. আইনগত প্রতিনিধিত্ব এবং ৩. রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব।

http://thejobstudy.com Go to Contents

১২. **কূটনীতিকের কার্যাবলী কী কী?**
উত্তরঃ ১. প্রতিনিধিত্ব করা, ২. প্রতিবেদন প্রেরণ, ৩. স্বার্থ সংরক্ষণ, ৪. সংযোগ স্থাপন এবং ৫. সাংস্কৃতিক কাজ।

১৩. **পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর করার অর্থনৈতিক উপায়গুলো কী কী ?**
উত্তর : ক. এম্বার্গো, খ. শুল্ক নিয়ন্ত্রণ এবং গ. বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) কূটনীতি কী?
(খ) **Diplomacy** শব্দটি কী শব্দ ?

২. (ক) বর্তমানে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম হাতিয়ার কী ?
(খ) বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মৌলিক উপাদান কোনটি?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. কূটনীতি বলতে কী বুঝ? কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
২. কূটনীতি কী? পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির মধ্যে সম্পর্ক/পার্থক্য আলোচনা করুন।
৩. কূটনীতিক অব্যাহতি বা বিমুক্তি বলতে কী বোঝ? কূটনীতিবিদদের বিমুক্তি বা সুযোগ সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
অথবা, কূটনীতি কী? একজন কূটনীতিবিদ সাধারণত কী কী সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।
৪. কূটনীতির সংজ্ঞা দাও। একজন সফল কূটনীতিবিদের গুণাবলিসমূহ আলোচনা করুন।
৫. কূটনৈতিক প্রতিনিধি কী? কূটনীতিকের দায়মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. আধুনিক যুগের একজন কূটনৈতিকের কাজ কী কী? সাম্প্রতিককালে কূটনৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৭. বর্তমান আন্তজাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তা আলোচনা করুন।
৮. কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতি বা বৈদেশিকনীতি পরিচালনার একটি মূল হাতিয়ার-উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ১৪

বৈশ্বিক পরিবেশ ও বিশ্ব রাজনীতি
Global Environment & World Politics

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৪.১ ভূমিকা
১৪.২ জলবায়ুর পরিবর্তন
১৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ
১৪.৩.১ মানব সৃষ্ট কারণ
১৪.৩.২ প্রাকৃতিক কারণসমূহ
১৪.৪ অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর জলবায়ুর পরিবর্তন তথা পরিবেশ বিপর্যয়ের হুমকিসমূহ
১৪.৫ জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়
১৪.৬ জলবায়ুর পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ
১৪.৭ দূষণমুক্ত বিশ্ব গড়তে পরাশক্তির ভূমিকা
১৪.৮ দূষণ সৃষ্টিতে বিশ্ব পরাশক্তির ভূমিকা
১৪.৯ জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ
১৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ
১৪.১১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে বাংলাদেশের ভূমিকা
১৪.১২ জলবায়ু পরিবর্তনের বিপক্ষে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ
১৪.১৩ বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)
১৪.১৪ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন
১৪.১৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অভিযোজন
১৪.১৬ জলবায়ু কূটনীতি
১৪.১৭ পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সম্মেলন
১৪.১৮ পরিবেশ কী ও বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনসমূহ
১৪.১৯ কাপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলন
১৪.২০ কানকুন জলবায়ু সম্মেলন
১৪.২১ ডারবানে জলবায়ু সম্মেলন- ২০১১
১৪.২২ কোপেনহেগেন সম্মেলন ও বিশ্ব জলবায়ু
১৪.২২.৪ Cop-20 বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন
১৪.২৩ সাম্প্রতিক জলবায়ু সম্মেলনের প্রাপ্তি নিয়ে সংশয়
১৪.২৪ পরিবেশ সংরক্ষণে রিও +২০ সম্মেলন ও বিশ্ব ভাবনা
১৪.২৫ রিও পরিবেশ সম্মেলন এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা
১৪.২৬ সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো
১৪.২৭ কিয়োটো প্রটোকল

১৪.১ ভূমিকা

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, আমাদের অস্তিত্বসমূহ সবকিছু পরিবেশ। অর্থাৎ মানব সমাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট পার্থিব বিষয়াবলি যার মধ্যে জল, স্থল ও বায়ুর মধ্যে অবস্থিত সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু অন্তর্ভুক্ত। এসসি কেন্ডেইগ পরিবেশ বলতে জৈবিক ও অজৈবিক বস্তুর যোগফল যা কোনো সৃষ্টির পরিবর্তণে সাহায্য করে তাকে বুঝিয়েছেন। পরিবেশ দূষণ আধুনিক সভ্যতার একটি অভিশাপ। প্রাকৃতিক শুদ্ধতা আর সজীবতাকে ছাপিয়ে আধুনিক কলকারখানা, তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্প বাণিজ্যের চরম উৎকর্ষ আজ মানব সভ্যতাকে এক উৎকট ও বিরক্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কারণ মানব বাসের জন্য চাই দূষণমুক্ত পরিবেশ। শুধু মানব জীবনই নয় বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর রক্ষাকবচ এ পরিবেশ। কাজেই জীবন এবং পরিবেশ এক ও অভিন্ন বিষয়। একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক মরা-বাঁচার। তাই পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করে দ্রুত মানব বসতির উপযোগী পৃথিবী গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে পরিবেশ দূষণের কারণে । প্রকৃতি বা পরিবেশের অনেক উপাদানই সীমিত। মানুষের নিরবত ব্যবহার প্রকৃতির সীমিত উপাদানকে প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। উপরন্তু নগরায়ন ও শিল্পায়ন বিশ্ব পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পরিবেশের ব্যাপক ধ্বংস সাধনের জন্যই বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে ও বৈশ্বিক উতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মনে রাখার Technique & Tips

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস, বর্ষ ও দশক

২ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব জলাধুমি দিবস
১৪ মার্চ	আন্তর্জাতিক নদী রক্ষা দিবস
২১ মার্চ	বিশ্ব বন দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
৮ জুন	বিশ্ব মহাসাগর দিবস
১৭ জুন	বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস
২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস
১৬ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সংরক্ষন দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস
১৩ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস
১৯ নভেম্বর	বিশ্ব টয়লেট দিবস
৩ ডিসেম্বর	কীটনাশক ব্যবহার বন্ধবিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস
১১ ডিসেম্বর	বিশ্ব পর্বত দিবস
	আন্তর্জাতিক বর্ষ
১৯৯৮	আন্তর্জাতিক মহাসাগর বর্ষ
২০০২	আন্তর্জাতিক পর্বত পর্ব
	আন্তর্জাতিক বাস্তুতান্ত্রিক পর্যটন (Ecotourism)বর্ষ
২০০৩	আন্তর্জাতিক জীবাণুমুক্ত পানি বর্ষ
২০০৬	আন্তর্জাতিক খরা ও মরুকরণ বর্ষ
২০০৭-০৮	আন্তর্জাতিক মেরুবর্ষ
২০০৮	আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষ
২০০৯	আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক আঁশ বর্ষ, গরিলা বর্ষ
২০১০	আন্তর্জাতিক বাঘ বর্ষ
	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র বর্ষ
২০১১	আন্তর্জাতিক বন বর্ষ
২০১২	সবার জন্য টেকসই জ্বালানি বর্ষ
২০১৩	আন্তর্জাতিক পানি সহযোগিতা বর্ষ
২০১৫	আন্তর্জাতিক মাটি বর্ষ।
২০০৫-২০১৫	'জীবনের জন্য পানি' কর্মপরিকল্পনা দশক
২০১০-২০২০	খরা ও মরুকরণের সিদ্ধান্ত আন্দোলন দশক
২০১১-২০২০	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র দশক
২০১৪-২০২৪	সবার জন্য টেকসই জ্বালানি দশক

১৪.২ জলবায়ুর পরিবর্তন

বিশ্বব্যাপী উতা বৃদ্ধি, বিভিন্নস্থানে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরার আঘাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আভাস দিচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের। জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণায় আন্তর্জাতিক সংস্থা Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর মতে, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উতার কারনে আমাদের জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। উতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্রের রূপকে করছে ক্ষুন্ন। যার কারনে বিভিন্ন দুর্যোগ তথা অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

পরিবেশ একটি ব্যাপক বিষয়। পরিবেশ যেহেতু ব্যাপক বিষয় সেহেতু পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রেও অনেক কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের ফলে বিশ্ব পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। ওজোন স্তরের ক্ষয়, পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দ দূষণসহ নানা দূষণের কারণে পৃথিবী নামক এ গ্রহটি মানব বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ দূষণে দুটি কারণ চিহ্নিত করেছেন প্রথমত প্রাকৃতিক কারণ, দ্বিতীয়ত মানব সৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে-বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি। মানব সৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বৃক্ষ নিধন, রসায়নিক পদার্থের অপব্যবহার, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, গ্রীন হাউজ ইফেক্ট, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ। পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার, প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার, জ্বালানির অপরিকল্পিত ব্যবহার ইত্যাদি।

১৪.৩.১ মানব সৃষ্ট কারণ

মানুষ তার প্রয়োজনে পরিবেশকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে গিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানব সভ্যতারও বিবর্তন ঘটেছে। আর এ সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে মানুষ তার পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। যে সকল মানবসৃষ্ট কারণে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি বা বেড়ে গিয়েছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** মানব সৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণ। বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে বড় সমস্যা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বিজ্ঞান মানুষের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার দ্বার খুলে দিলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানুষকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি। আর ২০১২ সালে জনসংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি। জনসংখ্যার এ দ্রুত বৃদ্ধি, বাসস্থান, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশ মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করেছে।

২. **বাসস্থান :** মানুষের বসবাসের জন্য বাসস্থান অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী বাসস্থান তৈরি করতে আবাদযোগ্য জমিতে বসতবাড়ি নির্মাণের, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত, নগরায়ন ও শিল্পায়ন করতে গিয়ে সীমিত জমি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে সর্বত্র ঘন জনবসতি গড়ে উঠার ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে করে পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং দূষণের স্বীকার হচ্ছে।

৩. **কৃষি সম্প্রসারণ :** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে সীমিত পরিমাণ জমির ওপর উৎপাদন বাড়াতে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে অতিমাত্রায় কীটনাশক, সার, সেচ ব্যবহার করা হচ্ছে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া জলাশয়ে প্রাণীজ সম্পদের বিলুপ্ত ঘটছে। উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবের কারণে তা মানব দেহে বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

৪. **শিল্পায়ন :** অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পায়ন অত্যাবশক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শিল্পায়নের উৎপাদন কাজে বনজ ও সামুদ্রিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। শিল্প কারখানার নির্গত বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ও গ্যাস, বর্জ্যপদার্থ প্রভৃতি জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে চলছে। বর্জ্য পদার্থের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া অনেক সামুদ্রিক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। শিল্প এলাকাগুলোতে মানুষের নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর কলকারখানার জ্বালানির CO_2 গ্যাস বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে শতকরা ৫০ ভাগ। নিচে বিগত ২০০ বছরে CO_2 বৃদ্ধির ডাটা দেওয়া হলো :

১৮০০ শতকের শেষ দিকে ২০০ PPM
১৯০০ শতকের শেষ দিকে ৩০০ PPM
বর্তমান ৩৮০ PPM
২১০০ CO_2 হবে ৫৫০ PPM

৫. **নগরায়ন :** মানুষের কর্মসংস্থান ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক বন এবং আবাসযোগ্য ভূমির ওপর অপরিকল্পিত নগর গড়ে উঠছে। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে করে পরিবেশ দূষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. **বৃক্ষ নিধন :** বৃক্ষ নিধন বর্তমানে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকী সৃষ্টি করেছে। সুস্থ পরিবেশের জন্য মোট ভূগর্ভের ২৫% বনভূমির প্রয়োজন থাকলেও বিশ্বের অনেক দেশে প্রয়োজনীয় বনভূমি নেই। তাছাড়া জ্বালানি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, শিল্প প্রসার প্রভৃতি কারণে মানুষ ব্যাপক হারে বনজসম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বের অনেক অঞ্চলই মরুভূমিতে পরিণত হবে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের এবং সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলো এর প্রধান শিকারে পরিণত হবে। বর্তমানে বিশ্বে বার্ষিক বন ধ্বংসের পরিমাণ ২ কোটি হেক্টর। এ পরিসংখ্যান পরিবেশের মারাত্মক দূষণের ভয়াবহতার প্রতিই ইঙ্গিত করছে। এভাবে বন ধ্বংসে হতে থাকলে অতি শীঘ্রই নিকারাগুয়া, হণ্ডুরাসের অর্ধেক বনভূমি শেষ হয়ে যাবে। কলম্বিয়া, দক্ষিণ চিলি, গিনি, কঙ্গো, শ্রীলংকা, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে বনজ সম্পদ ২০১০ সাল নাগাদ অর্ধেকের বেশি ধ্বংসে হয়ে গেছে। আর বনভূমি ধ্বংসে হওয়ার কারণে বহুপ্রজাতির বনজ ও জলজ প্রাণীর বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশংকা করা হচ্ছে।

৭. **মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার :** বর্তমানে পৃথিবীর ধনী ও দরিদ্র উভয় দেশের কাজেই নিরাপত্তা বিষয়টা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর এ নিরাপত্তা রক্ষার অযুহাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরমাণু অস্ত্রসহ নানাবিধ মারণাস্ত্র উৎপাদন করে চলেছে। এতে করে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ১৯৪৫ সালে জাপানে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ, পরবর্তীতে রাশিয়ার চেরোনবিল দুর্ঘটনা, ভারতের ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনা এ সকল এলাকার পরিবেশের ওপর দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব ফেলেছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে এবং ২০০৩-০৪ সালে ইরাকে ব্যাপক মরণাস্ত্রের ব্যবহার এসকল এলাকার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে তুলেছে। পরিবেশের এ সকল বিপর্যয় সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী মরণাস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা প্রতিদিন বেড়েই চলছে।

৮. **যোগাযোগ ব্যবস্থা :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। এতে করে কৃষিজ জমি ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। ফলে জমির ওপর চাপ পড়ছে। অন্যদিক ব্যাপক জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত যানবাহন ব্যবহারের ফলে এসকল যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ বায়ুমন্ডলকে দূষিত করছে প্রতিনিয়ত। বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড ও সীসার পরিমাণ মাত্রার চাইতেই বহুগুন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ প্রচন্ড রকম ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল বায়ু গ্রহণের ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীব ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৯. **রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার :** শিল্প কলকারখানায় এবং কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের কারণে এসকল পদার্থ একদিকে যেমন সে সকল শিল্পের পরিবেশ দূষিত করেছে। অন্যদিকে এ সকল শিল্প কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া ও বায়ু ও পানিতে মিশে পরিবেশ মারাত্মক দূষণের কবলে পড়ছে। বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থের দ্বারা বায়ু দূষণের ফলে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এসিড বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাড়িঘর, মানুষ, বনজ সম্পদ, জলজ ও প্রাণীজ সম্পদ। পরিবেশ দূষনের জন্য দায়ী পদার্থগুলো হলো সীসা, জৈবযৌগ, জীবাশ্ম জ্বালানি, অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি। কার্বনকণা থেকে শুরু করে ভারি ধাতু, জটিল জৈব যৌগ, জীবাশ্ম জ্বালানি, নিউক্লিয়ারের আবর্জনা, CFC, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি পরিবেশ দূষণ করছে।

১০. **বিলাসবহুল দ্রব্যের উৎপাদন :** বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তির ব্যাপক আধুনিকায়নের ফলে মানুষের জীবন যাত্রার বিলাস বহুল ধরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি; এয়ার কন্ডিশন, ফ্রিজ, এরোসল জাতীয় স্প্রে উৎপাদন ও ব্যবহারে উন্নত দেশসমূহে ক্লোরফ্লোর কার্বন বা গ্রীন

হাউজ গ্যাস বাতাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বিশ্বের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ গ্যাসসমূহ স্টাটোস্ফিয়ারের ওজনস্তরকে হালকা করে তোলে। এর ফলে সূর্য থেকে অতি বেগুনি রশ্মি খুব সহজেই পৃথিবীতে এসে পড়ে। আর এ অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের চর্ম, ক্যান্সারসহ নানাবিধ জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। কখনও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মও হচ্ছে। এ CFC গ্যাস পরিবেশ দূষণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১১. **গ্রীন হাউজ ইফেক্ট :** গ্রীন হাউজ পরিবেশ দূষণের জন্য একটি অন্যতম প্রভাবক। সূর্য থেকে যে তাপ পৃথিবীতে আসে তা বিকিরণের মাধ্যমে আবার মহাশূণ্যে ফিরে যায়। কিন্তু বায়ুমন্ডলে ক্লোরফ্লোর কার্বন বিশেষত কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বায়ুন্ডমলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়াটিকেই বিজ্ঞানীগণ গ্রীন হাউজ ইফেক্ট নামে অভিহিত করেছেন। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

১২. **শিল্পজাত অপচনশীল দ্রব্য :** এমন কিছু শিল্পজাত দ্রব্য আছে যেগুলো একদম অপচনশীল যেমন প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ, এ জাতীয় পদার্থ অপচনশীল হওয়ায় তা মাটি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। আবার পোড়ানোর কারণে তা বাতাসকে দূষিত করছে। এটি মাটির ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং সূর্যালোককে মাটিতে পৌছাতে বাঁধা দেয়। আবার পোড়ার সময় এর পলিভিনাইল ক্লোরাইড পুড়ে হাইড্রোজেন সায়াননাইড উৎপন্ন হয় যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

১৪.৩.২ প্রাকৃতিক কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ বলতে সে সকল কারণকেই বুঝায় যে সকল কারণ সংঘটিত হবার পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই। যে সকল প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম বন্যা, ঝড় জলোচ্ছাস, অগ্নুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্প প্রভৃতি।

১. **বন্যা :** বন্যা পরিবেশ দূষণের একটি অন্যতম কারণ বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রতিবছর উজান থেকে নেমে আসা পানিতে প্লাবিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও তাপে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পানির বৃদ্ধি ঘটায়। অতি বৃষ্টি, বাঁধভাঙ্গার কারণের বন্যা হয়ে থাকে। এ সকল বন্যায় ব্যাপক প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে থাকে। বন্যার ফলে ব্যাপক পশুপাখি, মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ফসল পানির নিচে ডুবে পচন সৃষ্টি করে মলমূত্র আবর্জনা ভাসিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। জলোচ্ছাসের কারণে ব্যাপক বন্যা হয়ে থাকে। এছাড়া জলোচ্ছাসের কারণে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে দূষণ সৃষ্টি করে।

২. **ঘুর্ণিঝড় :** ঘুর্ণিঝড় বা ঝড়ের কারণে পশুপাখি ও মানুষের প্রাণহানি ঘটে, গাছপালা, ফসলের ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়। মানুষ, পশুপাখির মৃতদেহ এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাছপালা পচে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ চীন, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুর্ণিঝড়ে ব্যাপক পরিবেশ দূষণের খবর পাওয়া গেছে।

৩. **অগ্নুৎপাত :** অগ্নুৎপাতের কারণে পরিবেশ দূষণের সবচাইতে বড় উদাহরণ জাপান এবং ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ। এসব দেশে এক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে ব্যাপক লাভা উদগীরণের ফলে পরিবেশের ওপর তা মারাত্মক দূষণের সৃষ্টি করেছিল।

৪. **ভূমিকম্প :** প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে ভূমিকম্প যেমন ভয়াবহ তেমনি অনিশ্চিত। জাপান, ভারত, ইরানসহ পৃথিবীর নানা দেশে ভূমিকম্পের কারণে ব্যাপক জানমালের ক্ষতির ইতিহাস পাওয়া যায়। মানুষ, পশুপাখি, ঘরবাড়ির ব্যাপক ধ্বংসলীলা পরিবেশকে মারাত্মক দূষণের সম্মুখীন করে। এছাড়া দাবানল নদীর গতিপথ পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তণের কারণেও পরিবেশ দূষণের স্বীকার হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণগুলো পরিবেশের অন্যতম উপাদন মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। আর এ দূষনের ফলে পরিবেশ হয়ে উঠছে মানুষ বসবাসের অনুপোযোগী। নিম্নে এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

http://thejobstudy.com Go to Contents

১. **বায়ুদূষণ :** বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হলো বাতাসে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের মিশ্রণের আধিক্য। এ গ্যাসগুলো হলো- কার্বনডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন কার্বনসমূহ, নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, সালফারের অক্সাইডসমূহ। এছাড়াও রয়েছে CFC, বায়ুবাহিত বস্তুকণাসমূহ, ফটো কেমিক্যাল অক্সিডেন্ট, অ্যাসবেস্টাস, বেরিলিয়াম, পারদ, ভিনালি ক্লোরাইড, বেনজিন, আর্সেনিক, কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ি ও মোটর যানের কাল ধোঁয়া, জ্বালানির ধোঁয়া প্রভৃতি ব্যাপকহারে বায়ু দূষণ করছে। ফলে পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

২. **পানি দূষণ :** উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের জন্য নিরাপদ নয় পানির এমন অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পানি দূষণ বলে। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য পানিকে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে ফলে প্রতিনিয়ত পানি দূষণের স্বীকার হচ্ছে। পৃথিবীর পানির ৯৭ শতাংশ সামুদ্রিক লবণাক্ত পানি যা পানের অযোগ্য বাকি ৩ শতাংশের ২ শতাংশ রয়েছে মেরু অঞ্চলে বরফ জমাটবদ্ধ অবস্থায় ও মাত্র ১ শতাংশ সুপেয় পানি রয়েছে মানুষের আওতার মধ্যে এ ১ শতাংশের ২ ভাগ রয়েছে মাটির উপরে এবং ৯৮ ভাগ রয়েছে মাটির নিচে। জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এ পানি। জৈব আবর্জনা, জীবানু, উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থসমূহ, রাসায়নিক পদার্থ, পানিবাহিত পলি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, খনিজ তেল, প্রতিনিয়ত পানি দূষিত করে চলছে। এ দূষণের স্বীকার হয়ে মানুষ, বনজ ও জলজ প্রাণীর জীবনযাত্রা বাধগ্রাস্থ হচ্ছে। কখনও কখনও কোনো প্রজাতি বিলুপ্তির সম্মুখীন হচ্ছে।

৩. **মাটি দূষণ :** প্রাণী এবং বৃক্ষের বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে মাটি। এ মাটি নানা কারণে তার গুণাগুণ হারিয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর আবর্জনা, কঠিন-তরল জৈব অজৈব নানা ধরণের শিল্প আবর্জনা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ইত্যাদি মাটি দূষণের জন্য দায়ী। যা মাটির গঠন বিন্যাসকে নষ্ট করে পরিবেশ দূষণে সহায়তা করছে।

৪. **শব্দ দূষণ :** আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ জীবন যাত্রায় শব্দ দূষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শব্দ দূষণ বলতে আমরা বুঝি যে শব্দসীমা মানুষের শ্রাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করে শ্রবেনেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটায় সেই শব্দকে শব্দ দূষণ বলা হয়। যানবাহনের জোরালো হর্ণ, কলকারখানার নির্গত শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ, যানবাহন চলাচলের শব্দ, লাউড স্পিকারের উচ্চ শব্দ, উড়োজাহাজের শব্দ, প্রচণ্ড কোলাহল, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ফুড ব্লেন্ডার, যান্ত্রিক পাখা ইত্যাদি শব্দ দূষণ করছে। এতে করে মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা লোপ পায়। টেনশনে উচ্চ রক্তচাপ, বৃদ্ধিসহ নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

১৪.৪ অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর জলবায়ুর পরিবর্তন তথা পরিবেশ বিপর্যয়ের হুমকিসমূহ

১. **পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় সংকট :** বিশ্বের পানির ৯৭ শতাংশ সামুদ্রিক পানি ২ শতাংশ রয়েছে মেরু অঞ্চলে এবং ১ শতাংশ সুপেয় পানি যা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। এ সুপেয় ১ শতাংশের ২ ভাগ রয়েছে মাটির উপরে এবং ৯৮ ভাগ রয়েছে মাটির নিচে। বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মাটির ওপর এবং নিচের উভয় স্থানের পানি দূষণের স্বীকার হবে। অনুন্নত দেশগুলোর বেশির ভাগ জনগণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মাটির উপরিভাগের পানির ওপর নির্ভরশীল থাকায় তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম হুমকির সম্মুখীন হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ লোক নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত এবং ২৪০ কোটির বেশি লোক পর্যাপ্ত পয়ঃনিস্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এদের বেশির ভাগই বসবাস করে উন্নয়নশীল দেশে।

২. **কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে :** পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি দুটোই বৃদ্ধি পাবে ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় এর প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করবে। খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পাবে। ফলে অনুন্নত রাষ্ট্রে মহামারি, দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

৩. **জ্বালানি :** অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো জ্বালানির জন্য প্রধানত বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে জ্বালনির ব্যাপক সংকট দেখা দিবে। দরিদ্র দেশগুলোতে জ্বালানি হিসেবে কাঠ বা

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে কম বয়সী শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া জ্বালানির ধোঁয়ায় পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে। বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ওজন স্তরের ক্ষতি করছে।

৪. **স্বাস্থ্য :** পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে অনুন্নত দেশে সবচাইতে বড় প্রভাব পড়বে স্বাস্থ্য সেবার ওপর। অনুন্নত বিশ্বের জনগণ এমনিতেই দরিদ্র। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মানুষের রোগ বেড়ে যাবে। বিশেষ করে হেপাটাইটিস, ক্যান্সার, প্লেগসহ নানাবিধ জটিল রোগের বিস্তারের কারণে মহামারি আকার ধারণ করে মানুষ মারা যেতে পারে। এইডস রোগ জনিত সমস্যাগুলোর শতকরা ৯২ ভাগই ঘটছে উন্নয়নশীল দেশে। এছাড়া পানি ও বায়ু দূষণের ফলে উন্নয়নশীল দেশে অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে। রয়েছে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মার মতো জীবন ঘাতক ব্যাধি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখের মতো। এ মৃত্যুগুলোর শতকরা ৭০ ভাগের কারণ ডায়রিয়া জনিত রোগ। শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সংক্রামণে বছরে ২২ লাখের মতো অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু ঘটছে উন্নয়নশীল দেশে।

৫. **অনুন্নত দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে :** পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে অনুন্নত দেশে মানুষের আয় রোজগার হ্রাস পাবে ফলে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান বৃদ্ধি পাবে। দরিদ্র জনগণ ও জাতিসমূহ জীবন রক্ষার তাগিদে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সংরক্ষণের চেয়ে স্বল্পমেয়াদী জীবন রক্ষাকারী চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়। এ কারণে দরিদ্র দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আরো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ৮০% জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের স্বীকার । জাতিসংঘ ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্য ৫০% কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৬. **ক্ষতিকর বর্জ্য ও রসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব :** পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে উন্নত দেশগুলো নিজেদের পরিবেশকে সমুন্নত রাখতে সেখানকার শিল্পকলকারখানা ও গবেষণাগারের বর্জ্য পদার্থ উন্নয়নশীল বিশ্বে রপ্তানি বা ডাম্পিং এর জন্য ব্যবহার করতে পারে এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। যার প্রভাব ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পৃথিবীতে প্রতিবছর ৩০ লাখ টন বিষাক্ত বর্জ্য উৎপাদন হয় এর সিংহভাগই উন্নত শিল্প প্রধান দেশের। উন্নয়নশীল দেশে বিষাক্ত বর্জ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করার জন্য ১৯৯৫ সালে একটি চুক্তি হলেও তা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

৭. **মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদের অভাব :** FAO-এর রিপোর্টে দেখা গেছে যে বাণিজ্যিক মৎস্য ক্ষেত্রগুলোতে ৭০ ভাগ মাছ শূন্য হয়ে গেছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের একটি বিরাট অংশ মৎস্য ধরা পেশায় নিয়োজিত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এ সকল এলাকায় মৎস্য সম্পদের অভাব দেখা দিবে এবং মৎস্যজীবীরা বেকার হয়ে পড়বে। মৎস্য সম্পদের পাশাপাশি অন্যান্য জলজ প্রাণী ও সম্পদও হুমকির সম্মুখীন হবে।

৮. **অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়বে :** অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। আর এ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এসকল দেশে পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটলে এসকল দেশের কৃষি শিল্পে চরম বিপর্যয় ঘটবে এবং যে সকল শিল্পের কাঁচামাল কৃষি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল সে সকল শিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থায় ধ্বংস নামবে। এতে করে অনুন্নত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং রপ্তানি হ্রাস পাবে। ফলে অর্থনীতি আমদানি নির্ভর হয়ে পড়বে। এতে করে অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

৯. **পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট :** বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের ব্যাপক প্রভাবে উন্নয়নশীল দেশের নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিচ্ছে। এসকল বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছাস, এসিড বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির সহায়তায় পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ রিপোর্টের মতে পরিবেশ দূষণের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে তিন কিলোমিটার পুরু ধোঁয়াশার মেঘ জমেছে। এ ধোঁয়াশার মেঘ থেকে ঝরতে পারে এসডি বৃষ্টি যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের জন্য নিয়ে আসতে পারে এক ভয়াবহ বিপর্যয়।

১৪.৫ জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়

মানুষ তার অগ্রযাত্রায় পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ গ্রহণ করছে প্রতিনিয়ত। পরিবেশের অনেক উপাদানই আজ প্রায় নিঃশেষ হওয়ার পথে যার প্রভাব পরিমাণ সীমিত। মানুষের অনবরত ব্যবহারের ফলে প্রকৃতির অনেক উপাদনই আজ প্রায় নিঃশেষ হওয়ার পাথে যার প্রভাব পড়েছে পরিবেশের ওপর। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে বিশ্বব্যাপী। আর এতে করে পরিবেশ হয়ে উঠছে মানুষের জন্য বসবাসের অনুপযোগী। পরিবেশের নানা উপাদানকে মানুষ তার প্রয়োজনে যথেচ্ছা ব্যবহার করার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী সার্বিক পরিবেশের বিপর্যয়কেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব পরিবেশ যে সকল হুমকির সম্মুখীন হলো :

১. **বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি :** গ্রিন হাউজ ইফেক্টের মূল কথা হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। গ্রিন হাউজ গ্যাসের মধ্যে রয়েছে কার্বনডাই-অক্সাইড, ক্লোরফ্লোর কার্বন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। জ্বালানি বন উজাড়, মানুষের কার্যক্রমের কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। বায়ুমন্ডলে এ গ্যাস দীর্ঘকাল অবস্থান করে। প্রায় ৫০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত। UNEP এর এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ১৮০০-১৯০০ সময়সীমার উন্নত দেশসমূহে কার্বন ডাই অক্সাইড এর নির্গমনের হার শতকরা ৮৩.৭ ভাগ। উন্নত দেশসমূহের নির্গমনকৃত ৮৪ শতাংশ ক্লোরফ্লোর কার্বন ও ৫০ শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড থেকেই ওজন স্তর ক্ষয় ও ভূমণ্ডলীয় উত্তাপের মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত একশ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রী থেকে ০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। গত ১০ হাজার বছরের ইতিহাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাত্রা এটাই সর্বোচ্চ। এটা আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ১ ডিগ্রী থেকে ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাড়বে সমুদ্রতলের উচ্চতা। গত শতাব্দীতে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিলো ১-২ সেন্টিমিটার। ভূ-মণ্ডলীয় উত্তাপের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়বে ৩০-৫০ সেন্টিমিটার। এর ফলে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো নিমজ্জিত হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মিশর, আমেরিকা ও কানাডার প্রেইরী অঞ্চল অনেক অংশ পানিতে নিমজ্জিত হবে। ইতোমধ্যে মালদ্বীপের নিম্নভূমির অংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে। এছাড়াও নদ-নদীতে লোনা পানির পরিমাণ বাড়বে, বাড়বে শরণার্থী সংখ্যা। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার ফলে গ্রীষ্মকালীন রোগ বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে হেপাটাইটিস-বি, সংক্রামণ সেরিব্রাল, মেনিন জাইটি, পলিও, কলেরা রোগ বৃদ্ধি পাবে এবং একই সঙ্গে সূর্যের বিকিরণকৃত আলট্রাভায়োলেট রশ্মির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির কারণে চামড়ার ক্যান্সার ও চোখের ছানি পড়া রোগ বৃদ্ধি পাবে। এমনকি খাদ্যশস্যে তেজস্ক্রিয়তাও বেড়ে যেতে পারে। IPCC (1998) মতে, ২১০০ সালের ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হবে ১.৪ ডিগ্রী-৫.৮ ডিগ্রী C.

২. **ওজনস্তর ক্ষয় :** জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীকে সুরক্ষাকারী ওজনস্তরকে ধ্বংস করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অধিকহারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও অপচয় এবং এরোসল জাতীয় স্প্রে উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহে শিল্প কারখানায় এবং বিলাসবহুল পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহারে ক্লোরফ্লোর কার্বন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এর মতো মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী স্তর ওজন স্তরকে হালকা বা কখনো কখনো ফুটো করে দিচ্ছে। এতে করে সূর্যের মারাত্মক ক্ষতিকর আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে তা মানুষ, প্রাণী, গাছপালা এবং পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। এ গ্যাসসমূহ স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজন স্তরকে হালকা করে তোলে। এর ফলে অতি বেগুনি রশ্মির ক্রিয়ায় মানুষের চর্মের ক্যান্সার, চোখের ছানি পড়াসহ বিভিন্ন রোগ ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম গ্রহণ সহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। খাদ্যশস্যেও এর বিকিরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিশ্বে বর্তমানে বায়ুতে ক্ষতিকর গ্যাস উদগিরণের একটি সারণি দেখানো হলো :

দেশের নাম	উদগীরণের শতকরা হার (%) (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে)	উদগীরণের শতকরা হার (%) (বিজ্ঞান ও পরিবেশ কেন্দ্র নয়াদিল্লী)
যুক্তরাষ্ট্র	১৭	১৮.৪৪
পঃ ইউরোপ	১৪.৩২	১১.৮৯
রাশিয়া	১৯	১৩.০৮
ব্রাজিল	১০.৩৪	১৮.২৯
এশিয়া (জাপান বাদে)	২১.৬০	৭.৯৭
জাপান	১৬.০০	২২.০৩

নিম্নে বিশ্বে এর ক্রমাগত বৃদ্ধির খতিয়ান

সময়	নির্গমনের পরিমাণ	
১৮০০ শতকের শেষ দিকে	২০০ PPM বিশ্বে বৃদ্ধির হার	০.৯%
১৯০০ শতকের শেষ দিকে	৩০০ PPM বিশ্বে বৃদ্ধির হার	০.৯%
বর্তমানে	৩৮০ PPM	

৩. **মরুকরণ :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব পরিবেশের ওপর যে হুমকি সৃষ্টি হবে তাতে করে বিশ্বের অনেক এলাকা মরুকরণের সম্মুখীন হবে। ১৯৮৭ ও ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের মরুপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত কনভেনশনে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা মরুভূমি হয়ে যাবার ভয়াবহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে দেখা গেছে যে আফ্রিকার ৫৩% এবং এশিয়ার ৩৫% এলাকা কোনো না কোনো মাত্রায় মরুময়তা বিরাজ করছে। বর্তমানে প্রতিবছর পৃথিবীর প্রায় ২ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা মরুতে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী চীন, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ১৫ কোটি কৃষক শস্য উৎপাদন থেকে বঞ্চিত। ফলে এ সকল এলাকায় খাদ্য শস্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করছে দিন দিন।

৪. **প্রাকৃতি দুর্যোগ বৃদ্ধি হবে :** বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের অনেক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটবে। শীত প্রধান এলাকাগুলো বেশি উষ্ণ হয়ে উঠার ফলে বায়ু প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। ফলে বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় ক্রমাগত বৃষ্টি হতেই থাকবে এবং খরাপ্রবণ এলাকায় খরার তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো প্রভৃতি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, আফ্রিকা মহাদেশে খরা, অতিবৃষ্টি ও বন্যা মহামারী আকার ধারণ করবে। এশিয়াতে একই প্রভাব পড়বে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতাও বৃদ্ধি পাবে। সার্বিক তাপমাত্রা পরিবর্তন ঘটে ঋতুচক্রের ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়বে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসিড বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে।

৫. **জীব বৈচিত্র ধ্বংস :** ১৯৯৫ সালে UNEP বিশ্বব্যাপী জীব বৈচিত্র নিরূপণ শুরু করে যা এ যাবৎ গৃহীত উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক। বিশ্বের ১ হাজার ৫শ বিজ্ঞানীর কাজের ফলাফলের রিপোর্টে দেখা গেছে যে, বহুলাংশেই মানবিক কর্মকাণ্ডের দরুন প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তি ও বসতি বিনষ্টের হার নজিরবিহীন। পৃথিবীর অনেক বৃক্ষ এবং প্রাণীই আজ চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে এবং অনেক প্রজাতিই বিলুপ্তির পথে। এ সকল কারণে পরিবেশেরও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৬. **নদ-নদীর প্রবাহ :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর অনেক নদী শুকিয়ে যাবে, অনেক নদী গতিপথ পরিবর্তন করে পরিবেশের ওপর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭. **পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি :** ভূ-গর্ভস্থ পানি কমে যাওয়ায় পানিতে আর্সেনিকের মতো বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানিকে হুমকির সম্মুখীন করবে। এছাড়া শস্যে আর্সেনিকের প্রভাব পড়ার কারণে খাদ্যশস্যও ব্যবহার হুমকির মুখোমুখি হবে।

মূল্যায়ন

বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় দুই-এক দিন বা দুই-এক বছরে হয় নি। বছরের পর বছর মানুষ পরিবেশকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গিয়েই পরিবেশকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের পেছনে সবচাইতে দায়ী বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো। এসকল রাষ্ট্র তাদের শিল্প এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে গিয়ে পরিবেশকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। যার বেশির ভাগ প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। তাই আগামী পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ ধনী-দরিদ্র, উত্তর-দক্ষিণ ভেদাভেদ ভুলে জননীতুল্য পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসি। সেই সাথে রিওডি জেনেরিওর ধরিত্রী সম্মেলন ১৯৯২, রিও+১০ কিয়োটো প্রটোকল ৯৭, বিশ্ব টেকসই সম্মেলন ২০০২, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ২০১২ সহ বিশ্বব্যাপী সকল পরিবেশ সম্মেলন গৃহীত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে সবাই জাতিসংঘের পতাকাতলে সমবেত হই। নতুন দিনে বেঁচে থাকার স্লোগান হোক "অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য চাই উন্নত পৃথিবী"।

১৪.৬ জলবায়ুর পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

১. **শস্য উৎপাদন :**

ক. ১৯৮৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন কমে ৪৫%।

খ. তীব্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফরে আউশ উৎপাদন ২৭% এবং ভূট্টা উৎপাদন ৬১% কমে।

গ. তীব্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বোরো উৎপান কমে ৫৫-৬২%।

ঘ. ৪০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফরে তীব্র প্রভাব পড়ে খাদ্য উৎপাদনে।

ঙ. প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর গড়ে ৩.৯% ধান উৎপাদন কমে।

২. **মাছ এবং চিংড়ি চাষে :**

ক. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে চিংড়ির ঘেরের ভিতরে বাইরে থেকে পানি প্রবেশ করে এবং বিরুপ প্রভাব ফেলে।

খ. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মাইগ্রেশ ইত্যাদির ধরন প্রভারিত হয় তাপমাত্রা, বৃদ্ধিপাত এবং হাইড্রোলজি দ্বারা।

গ. অর্ধিক তাপমাত্রার ফলে পানির কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে ফলে পানির চগ কমে যায় এবং পানি অম্লীয় হয় যার প্রভাব পড়ে মাছের উৎপাদনে প্রজমনে, আচরনে, সাতার কাটতে এবং অন্যান্য জৈবিক ক্ষেত্রে।

৩. **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে :**

ক. হৃৎপিন্ডের রোগ (স্লোক) হয়।

খ. জীবাণু ও পানি বাহিত রোগ হয়।

গ. তাপ ও আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ঘ. এ্যাজমা, শ্বসনিক এলার্জি ও বায়ুবাহিত রোগ হয়।

ঙ. মানসিক, স্নায়ের, স্নায়ুর রোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৪. **গবাদি পশু :**

ক. অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তনের ফলে জীবানু বাহিত রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

খ. তাপমাত্র এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কমে যায়।

৫. **সামাজিক প্রভাব:**
   ক. অর্থনৈতিক ক্ষতির ফলে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়।
   খ. অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে।
   গ. আয় কমে যায়।
   ঘ. মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেয়।
   ঙ. মানুষের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখে পড়ে বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে।

১৪.৭ দূষণমুক্ত বিশ্ব গড়তে পরাশক্তির ভূমিকা

১. পরাশক্তিগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য অধিক দায়ী হওয়া সত্ত্বেও একই সাথে তারা অত্যাধিক সম্পদের অধিকারী, যেমন- প্রচুর পুঁজি, বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী, উন্নত প্রযুক্তি মাথাপিছু আয় ৪০০০০ ডলারেরও অধিক জাতীয় আয় ইত্যাদি হবার কারণে এ সমস্যাটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অধিক সামর্থ্যের অধিকারী।

২. বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই মোট উৎপাদিত CO_2 এর ২৫% নিঃসরণ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও গ্যাস খনিগুলি এর জন্য দায়ী। ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটার আশংকায় কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করতে স্বীকৃতি জানিয়েছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের অন্যান্য প্রধান CO_2নিঃসরণকারী দেশ যেমন- জাপান, কানাডা ও অন্যান্য দেশ কিয়োটো প্রটোকলে অনিচ্ছুক হলে এ প্রটোকল বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই শুধু মাত্র ৫-৬টি অর্থনৈতিক পরাশক্তির আগ্রহ সৃষ্টি হলেই বিশ্বের পরিবেশ রক্ষাকারী কিয়োটো চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে জোহান্সবার্গ ধরিত্রী সম্মেলন ২০০২ অনেকটাই আশার আলো জ্বালিয়েছে বিশ্ববাসীর মনে এ সম্মেলনে।

৩. যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টনী ব্লেয়ার জানান তার দেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিবেশ ও দারিদ্র্য উন্নয়নে দেয়া সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুন করবে। সেই সঙ্গে তার সার্বিক সহায়তার পরিমাণ আরো ৫০% বাড়াবে। ব্লেয়ার কিয়োটো চুক্তি অনুমোদনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন এ চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করলে বিশ্ব এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

৪. ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক সহায়তার পরিমাণ আগামী ১০ বছরে তার দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.৭ শতাংশে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

৫. তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার নবায়নযোগ্য জ্বালানি তার দেশের সহযোগিতার পরিমাণ পাঁচ কোটি ইউরো পর্যন্ত উঠতে পারে বলে জানান।

৬. তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল প্রেসিডেন্ট বুশের পাঁচশ কোটি ডলার পরিবেশ সহায়তার কথা পুনরাবৃত্তি করেন। বরাক ওবামা বলেছে, ৮০% CO_2 নিঃসরণ কমবে ২০৫০ সালের মধ্যে।

৭. পশ্চিমা দেশগুলো আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রস্তাব দিয়েছে।

৮. কানাডার প্রধানমন্ত্রী জী শ্রেভিয়ে জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষায় তার দেশের তহবিল দ্বিগুণ করার ঘোষণা দেন।

৯. জাপান সরকার বলেছে, আগামি ২০২০ সালের ভিতরে ২৫% CO_2 নিঃসরণ কমাবে ২০৫০ সালের মধ্যে।

১০. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৪০% CO_2 নিঃসরণ কমাবে ২০৩০ সালে মধ্যে এবং ১২ নভেম্বর ২০১৪ সালে বারাক ওবামা ও শি জিনপিং বেইজিং এ কার্বন নির্গমন হ্রাসে স্বাক্ষর করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫% CO_2 নিঃসরণ কমাবে ২০২৫ সালের মধ্যে আর চীন ২০% CO_2 নিঃসরণ কমাবে ২০২৫ সালের মধ্যে।

১৪.৮ দূষণ সৃষ্টিতে বিশ্ব পরাশক্তির ভূমিকা

বিশ্ব পরিবেশ স্থাপনে পরাশক্তিসমূহের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। পরাশক্তিসমূহের কার্যাবলির প্রভাবে যেভাবে বিশ্ব পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :-

১. এটা সর্বজনবিদিত যে অধিকহারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে ধনী দেশসমূহই বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথা পরিবেশ দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী

২. উন্নত দেশসমূহের পারমাণবিক চুল্লিগুলো থেকে যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং শিল্প কারখানাগুলো থেকে যে অন্যান্য মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- পারদ, সীসা ও আর্সেনিক ইত্যাদি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় তার ফলে জলাধার দূষণসহ জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হবার সম্মুখীন।

৩. বিশ্বে যত কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ হয় তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একাই নিঃসরণ করে শতকরা ২৫ ভাগ, চীন শতকরা ২৯ ভাগ বিশ্বের ৫৮ ভাগ কার্বনডাই-অক্সাইড নির্গত হয় মাত্র ৮টি দেশে। UNEP-এর এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ১৮০০-১৯০০ সময়সীমায় উন্নত দেশসমূহ কার্বনডাই-অক্সাইড-এর নির্গমণের হার শতকরা ৮৩.৭ ভাগ আর স্বল্পোন্নত দেশে এর হার মাত্র ১৬.৩ ভাগ।

৪. বিশ্বের ৫টি পরাশক্তির কাছে ৯৯ শতাংশে পারমাণবিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম। এসকল দেশ পারমাণবিক মরণাস্ত্র নির্মূলে অগ্রণী ভূমিকা রেখে বিশ্ব পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

৫. বিশ্বের ৯৩.৭ শতাংশ CO_2 নির্গমণ হয় মাত্র ২৪টি শিল্প প্রধান দেশে। এ সকল দেশ শিল্পে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. গবেষকরা দেখিয়েছেন যে উন্নত দেশসমূহের নির্গমণকৃত ৮৫ শতাংশ CFC ও ৫০ শতাংশ CO_2 থেকেই ওজনস্তরে ক্ষয় ও ভূমণ্ডলীয় উত্তাপের মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি।

১৪.৯ জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ

২০১২ সালের ৩১ মে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয় বাণিজ্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য নিরাপত্তা : দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের উপায় শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এক সেমিনার। সেমিনারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। এসব দেশের সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। এসব দেশের সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে জমি উৎপাদন ক্ষমতা হারাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জন্য একটি সমন্বিত নীতি গ্রহণ করা এবং প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীন নীতিতে তা অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানে শ্রীলংকার পরিবেশমন্ত্রী আনুরা প্রিয় দর্শনা ইয়াপা বলেন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা এ অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যগত ও খাদ্য নিরাপত্তায় বড় আঘাত এনেছে। এমনকি দ্রুত বর্ধনশীল এ সংকট নতুন প্রজন্মের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের সব দেশই জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন। এমনকি খাদ্য বিনিময় ও সব ধরণের বাণিজ্যকেও বাধাগ্রস্ত করছে বাড়তে থাকা বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

উষ্ণায়নরোধে নতুন জোট : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে ক্লাইমেট অ্যাণ্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন (Climate and clear Air Coalision) নামে নতুন একটি জোট গঠন করা হচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ এ জোট গঠনের ঘোষণা দেন। এর সদস্য দেশ ছয়টি। দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, কানাডা, ঘানা, মেক্সিকো, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র। ২০১২ সালের এপ্রিলে সুইডেনের স্টকহোমে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ, নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, রাজনৈতিক সমর্থন আদায় জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট দেশ, কোম্পানি, বেসরকারি সংস্থা ও ফাউন্ডেশন- এর মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠায় নতুন জোট কাজ করবে। জোটের কার্যক্রম পরিচালনায় মার্কিন সরকার প্রাথমিকভাবে এক কোটি ২০ লাখ ডলার দিবে।

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সম্মেলন : ২০১০ সালের ১৮-৩০ অক্টোবর জাপানের নাগোয়াতে অনুষ্ঠিত হয় দশম জীববৈচিত্র্য বিষয়ক (Conference of the Panties to the United Nations Convention on Biological Diversity) সম্মেলন। সম্মেলনে জাতিসংঘের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটির (সিবিডি) ১৯৩টি সদস্য দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক ধ্বংস রোধে কার্যকর কৌশল নির্ণয়।

প্রবিবেশ ও বন রক্ষায় জাতিসংঘ চুক্তি : আগামি ১০ বছরের মধ্যে বিশ্বের বন, প্রবালদ্বীপ এবং অন্যান্য বিপন্ন প্রতিবেশ রক্ষায় এক ঐতিহাসিক বিশ্বচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩০ অক্টোবর ২০১০ এর মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল, বিশ্বের সেই জী বৈচিত্র্যের বিনাশ বন্ধের এক প্রচেষ্টায় ধনী ও গরীব দেশগুলো প্রকৃতির ধ্বংসে রোধে কার্যকর ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত হয়। এ চুক্তিতে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ ২০১০ সাল নাগাদ প্রধান কয়েকটি লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করে। এর মধ্যে রয়েছে দূষণ রোধ, বন ও প্রবালদ্বীপ রক্ষা, ভূমি ও পানি এবং মৎস্য অভয়ারন্য সংরক্ষণ। নাগোয়াতে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হলো জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ১৭ শতাংশ ভূমি ও ১০ শতাংশ সমুদ্র এলাকা সংরক্ষণে মতৈক্য পৌঁছানো। বর্তমানে মাত্র ১৩ শতাংশ ভূমি ও এক শতাংশ সমুদ্রাঞ্চল রক্ষা করা হচ্ছে। নাগোয়া চুক্তির দুর্বলতা হলো যে, এ চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করে নি।

মূল বক্তব্য (Key Points)

- নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে উন্নত বিশ্বে ঘটছে দ্রুত শিল্পায়ন। পৃথিবীব্যাপী যতই শিল্পায়ন ঘটছে ততই পরিবেশ ও জলবায়ু দূষিত হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং "গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার" স্বীকার হচ্ছে পৃথিবী। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এর অব্যাহত বিকাশের ধারা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।
- শিল্প বিপ্লবের শুরুতে বাতাসে প্রতি মিলিনয় ভাগের ২৫০ ভাগ কার্বনডাই-অক্সাইড ছিল যা ১৯৬০ সালে ৩১৫ ভাগ এবং ১৯৯০ সালে ৪১৫ ভাগে দাঁড়ায়। বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য অনুযায়ী আগামিতে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রতি দশ বছরে গড়ে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে এবং পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৬ সেঃ মিঃ বৃদ্ধি পাবে।
- পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৬০ কিলোমিটার উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার ওজন নামক গ্যাসের একটি স্তর আছে যা সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের গাছপালা ও প্রাণীকুলকে রক্ষা করে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম ফসল ও ফলনের আমূল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। তার সাথে কৃষির সাথে যারা জড়িত নয় তাদেরও সমস্যা হবে। খাদ্য শস্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে দেশের বৃক্ষরাজি ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ অত্যাধিক গরমের ফলে যে গাছ জন্মে তা আর বেড়ে উঠতে পারে না। এর বিরূপ প্রভাব পড়বে মানুষ এবং পরিবেশের ওপর।
- ১৯৯২ সালে ১০৮টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ ১৭২টি দেশের প্রতিনিধিরা প্রথম পরিবেশ রক্ষায় ধরিত্রী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য ২টি কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। ১. তাপমাত্রা প্রতিরোধ চুক্তি, ২. জীববৈচিত্র্য চুক্তি।
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কিয়োটো প্রটোকলের ভূমিকা রয়েছে : United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর অধীনে ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কার্বডাই-অক্সাইড ও গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগিরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সালে কার্যকর হয়েছে। নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৭টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থন Ratified করেন। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়েছে।

এ প্রটোকলের আওতায় বিশ্বের ৩৬ দেশকে গ্রিন হাউজ গ্যাসের মাত্রা ১৯৯০ সালের চেয়ে নিচে নামাতে হবে। কাজাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এ কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয় নি। কিয়োটো প্রটোকল বনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- পৃথিবীতে প্রতিবছর ৩০ লাখ টন বিষাক্ত বর্জ্য উৎপাদন হয় এর সিংহভাগই উন্নত শিল্প প্রধান দেশের। উন্নয়নশীল দেশে বিষাক্ত বর্জ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করার জন্য ১৯৯৫ সালে একটি চুক্তি হলেও তা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।
- UNEP- এর এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ১৮০০-১৯০০ সময়সীমার উন্নত দেশসমূহে কার্বনডাই-অক্সাইড এর নির্গমনের হার শতকরা ৮৩.৭ ভাগ। উন্নত দেশসমূহের নির্গমনকৃত ৮৪ শতাংশ ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ও ৫০ শতাংশ কার্বনডাই-অক্সাইড থেকেই ওজনস্তর ক্ষয় ও ভূমন্ডলীয় উত্তাপের মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত একশ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রী থেকে ০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। গত ১০ হাজার বছরের ইতিহাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাত্রা এটাই সর্বোচ্চ। এটা আগামি ২০৩০ সাল নাগাদ ১ ডিগ্রী থেকে ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাড়বে সমুদ্রতলের উচ্চতা। গত শতাব্দীতে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১-২ সেন্টিমিটার। ভূ-মন্ডলীয় উত্তাপের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়বে ৩০-৫০ সেন্টিমিটার। এর ফলে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো নিমজ্জিত হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মিশর, আমেরিকা ও কানাডার প্রেইরী অঞ্চল অনেক অংশ পানিতে নিমজ্জিত হবে। ইতোমধ্যে মালদ্বীপের নিম্নভূমির অংশ সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেছে।
- বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের পেছনে সবচাইতে দায়ী বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো। এসকল রাষ্ট্র তাদের শিল্প এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে গিয়ে পরিবেশকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। যার বেশিরভাগ প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর।

১৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো "জলবায়ু পরিবর্তন" বর্তমানে এটি মানব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে তার পরিবেশ। আবার এ পরিবেশকেই মানুষ তার সার্বিক আচরণের মাধ্যমে অভিশাপ হিসেবে রূপায়িত করেছে। আর ফল ভোগ করা আমরা প্রায় শুরু করেছি। World Bank- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে " বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবন অঞ্চল অর্থাৎ "HOTSOT" হলো বাংলাদেশ। ২০-৪০ তামাত্রা বাড়লে বিশ্বের জলবায়ু সবচেয়ে নেতিবাচক রূপ দেখা যাবে বাংলাদেশে।" তাই বর্তমানে এ অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী চলছে নানা-জল্পনা-কল্পনা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

১. **সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি :** জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ক্ষতিকর একটি প্রভাব হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বত চূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদের উচ্চতা বেড়ে যাবে।

বিশ্বের ৯০ জন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ-জার্মান ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা" -Potsdam Institute for Climate Impact Research" প্রতিবেদন মূল্যায়ন করেন এবং মতদেন, "বিশ্বের কার্বন নিঃসরণের পরিমান বর্তমান যে হারে বাড়ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৯০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রার ৪০ তাপমাত্রা বাড়বে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে এর ভয়ানক প্রভাব পড়বে আর এর ফল ভোগ করবে বাংলাদেশ। UNDP বলেছে যদি সমুদ্রের পানির উচ্চতা ১.৫ m. বাড়ে তাহলে বাংলাদেশে ১৬% ভূমি ও ১৫% জঙ্গল ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

বিশ্বে বৃহৎ-ব-দ্বীপ বাংলাদেশ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ২০ বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

Intergovernmental panel on climate change (IPCC)- এর এক সমীক্ষায় বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫-১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল নাগাদ তা থেকে ১০০ তে পৌঁছাতে পারে। তাই সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : জলবায়ু পরিবর্তনের আরো একটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি। সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। জলবায়ু পরিবর্তনের সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়বে। স্বাভাবিক ভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। সাম্প্রতিক সময়ে "সিডর ও আইলা" বাংলাদেশের যে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ণনাতীত এবং এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতো এটা জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফল। এ প্রতিবেদন বলা হয়েছে, জলবায়ুর পরিবর্তন এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে ৩ মিটার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে উপকূলে আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড়।

৩. **জীববৈচিত্র ধ্বংস :** বাংলাদেশের সুন্দরবন অসংখ্য জীববৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তা আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এর কারণ ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর প্রভাব বনাঞ্চল ও প্রাণীকূল ধ্বংসে হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৯০ ভাগ তলিয়ে যাবে এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৪. **কৃষিতে বিপর্যয় :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে। উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ উপকূলের জমিতে লবনাক্ততার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এক সমিক্ষায় দেখা গেছে যে, মাত্রাতিরিক্ত লবণের কারণে বিগত পাঁচ বছরে দক্ষিণের চার জেলায় প্রায় সাড়ে ৬৭ হাজার হেক্টের জমি অনাবাদি হয়ে পড়েছে। এতে ৩৩৭০০০ মেট্রিক টন ফসল কম উৎপাদন হচ্ছে। প্রতিবছর ধান উৎপাদন কমে যাচ্ছে ৩.৯%।

কৃষি জরিপের তথ্যানুযায়ী "উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১৭ লাখ ৪০ হাজার পরিবারের জীবিকার উৎস কৃষি। লবণাক্ততা, বৈরী আবহাওয়াসহ নানা ঘাত প্রতিঘাতে কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হচ্ছে। যেমন- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বিষেজ্ঞরা লবণাক্ততার মাত্রা নির্ধারণে পাঁচটি স্তরে (S-1 থেকে S-5) এসব এলাকা বিন্যাস করেছেন। এর মধ্যে লবণের সহনীয় জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। উল্লেখ্য দক্ষিণাঞ্চলের জমিগুলোতে লবণাক্ততার মাত্রা S-3 থেকে S- 5 মাত্রায় অবস্থিত।

৫. **বিপর্যয়ের শিকার নারী :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীরা বেশিক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)- এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৭ জনে ১ জন নারী জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। সরকারি হিসাবে ঘূর্ণিঝড়ে সিডের সারাদেশে ৩৪৪৭ জনা মারা যায়। যার মধ্যে নিহতের ৭০% হলো নারী ও শিশু।

৬. **খাওয়ার পানির সংকট :** জলবায়ু পরিবর্তনের আর একটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর প্রভাব পড়েছে। ফলে মিঠাপানি দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। ফলে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করে।

৭. **বাড়ছে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু :** জলবায়ুর প্রভাবের ফলে বাড়ছে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার। এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলেই এর প্রভাব বেশি। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARP)-এর দেওয়া উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার প্রতিবেদন অনুযায়ী বলা হয় বরিশাল বিভাগের নারী-রা প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় পিছিয়ে। সারা দেশে ৯২% নারী ঘরে বসে প্রসব করেন। উপকূলে সেই হার ৯৬% আর এর মধ্যে বরিশাল বিভাগের ৬৮% নারী কোনো রকম প্রজনন সেবা পান

http://thejobstudy.com Go to Contents

না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০০৩ সালের তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে পাঁচ জন। এ হার প্রতি লাখে ১৯৪ জনে নামিয়ে আনার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি।

৮. **বাড়ছে জলবায়ু উদ্বাস্তু এবং কমছে উপকূলের জনসংখ্যা :** জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়ায় দক্ষিণ উপকূলে অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। এলাকা ছাড়ছে আশ্রয় নিচ্ছে বিভাগীয় শহরগুলোতে। উল্লেখ্য বরিশাল বিভাগের জনসংখ্যা না কমে বরং বাড়ছে।

সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বরিশালের ছয় জেলার মানুষ নাবেড়ে উল্টো ২৭ হাজার কমেছে। অর্থাৎ দেশের গড় বার্ষিক জনসংখ্যার হার ১.৩৪% হলেও বরিশাল বিভাগের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশ। অনাবৃষ্টির কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশের ২৫% এলাকা পানি সংকটে ভোগে শুষ্ক মৌসুমে।

১৪.১১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে বাংলাদেশের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ প্রভাব আমাদের দেশে পড়তে শুরু করেছে, যদিও এর জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়। উন্নত বিশ্বের অযাচিত কাজের ফসল জলবায়ু পরিবর্তন, যার কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে আজ। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একটি সময়ের দাবি। কেননা সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। আমাদের উচিত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় প্রাধিকারগুলো চিহ্নিত করা।

যদি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করা না যায়। তবে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০-২৫ ভাগ প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, এমনটাই ধারণা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের। ২০০৭ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে জাতিসংঘে শতাধিক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সামনে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয় সেখানে উল্লেখ রয়েছে, বিশ্বব্যাপী ও পরিবেশ দূষণের ফলে বর্তমান যে প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তাতে আগামী ২০৮০ সালের মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার ৩০০ কোটি মানুষ ভয়াবহ পানি ও খাদ্য সঙ্কটে পড়বে। এছাড়া ২০ থেকে ৩০ শতাংশ গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে সর্বোচ্চ হুমকির মুখে, যারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, বিশ্বের তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ থেকে ২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে, তাতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ গাছপালা ও পশুপাখির জীবনের ওপর ভয়াবহ ঝুঁকির সম্ভাবনা বিদ্যমান।

১. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আইন :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দায়বদ্ধ। বেশকিছু আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, জাতীয় পর্যায়ে আইন ও নীতিমালা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জীববৈচিত্র্য কনভেনশন-১৯৯২, রামসার কনভেনশন-১৯৭১, যার উদ্দেশ্য জলাভূমি সংরক্ষণ, Convention on Internation Trade of Endangered Specs (CITES) যার উদ্দেশ্য শঙ্কিত জীব ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা ও International Quarantine Law যার উদ্দেশ্য জীববৈচিত্র্যের সীমান্ত অতিক্রম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

২. **জীববৈচিত্র্য কনভেনশন-১৯৯২ :** বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশের মতো প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই কনভেনশনের নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সমর্থন করতে সম্মত হয়েছে। যথা- ১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ২. জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন উপাদানের টেকসই ব্যবহার এবং ৩. জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার থেকে প্রাপ্য লাভের সুষ্ঠু এবং সমবিভাজন নিশ্চিত করা। দেশের সক্ষমতা এবং সততা অনুযায়ী প্রায় সব স্বাক্ষরকারী (জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনের) পক্ষ নিম্নে উল্লিখিত কাজ করবে যথা-১. জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যথোপযোগী জাতীয় কর্মকৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করবে অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে বিদ্যমান যেসব কর্মকৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে বর্তমান কনভেনশনে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলো

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

আরো কার্যকর করে নেবে এবং ২. জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে যথাসাধ্য যথোপযুক্ত সংশ্লিষ্ট ও আন্তঃবিভাগীয় কর্মপরিকল্পনা, কর্মসূচি ও নীতিমালায় অধিভুক্ত করে নেবে।

৩. **জৈব-নিরাপত্তা বিষয়ক কার্টাজেনা প্রটোকল-২০০০ :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য কার্টাজেনা জীব-নিরাপত্তা নীতিমালা বেশ তাৎপর্যমণ্ডিত। জিন পরিবর্তিত জীবের (GMO : Genetically Modified Organism) ট্রান্স বাউন্ডারী মুভমেন্ট একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলনের ১৫ নং নীতির বিতর্কিত বিধানের অনুকূলে এ নীতিমালার উদ্দেশ্য জীবন্ত পদ্ধতিতে জীবের (LMO : Living Modified Organism) স্থানান্তর, নড়াচড়া ও ব্যবহারে নিরাপত্তা বিধানে অবদান রাখা যাতে জীববৈচিত্র্য অটুট ও স্থায়ী থাকে। নীতিমালার মাধ্যমে আমদানিতে সতর্কতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরকারী। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর করা হয়েছে।

৪. **বন নির্দেশনা-২০০২ :** বন নির্দেশনা (Bonn Guidelines) গৃহীত হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তৃতীয় লক্ষ্য অর্জনে এপ্রিল, ২০০২ হেগে ষষ্ঠ অধিবেশনের জীবসম্পদ ব্যবহারে অধিকার এবং এর ব্যবহারের সুফলের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করতে। উল্লিখিত নির্দেশনা ১৮০টি অংশগ্রহণকারী দেশের সবক'টিই গ্রহণ করেছে। নির্দেশণাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

৫. **জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (CBD):** Convention of Biological Diversity) যদিও বন নির্দেশনা-২০০২ আইনগতভাবে পালনে বাধ্য নয়, আমরা জানি এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে আইন তৈরি করা সম্ভব, পাশাপাশি সদস্য রাষ্ট্রগুলো জীববৈচিত্র্য কনভেনশন-১৯৯২ ও জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক কার্টাজেনা নীতিমালা আইনগতভাবে পালনে দায়বদ্ধ। জীববৈচিত্র্য সম্মেলনের ঘোষণাপত্র ও জীব নিরাপত্তা নীতিমালা বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে ফলে বাংলাদেশের বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৬. **বাংলাদেশের বাস্তবতায় জাতীয় আইন :** ১৯৯২ সালে জীববৈচিত্র্য কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করার পর জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (NCS : National Conservation Strategy) এবং জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (NEMAP : National Enviornment Management Action Programme) তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং উইএনডিপি'র সহায়তায় টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (SEMP: Sustainable Enviornment Management Plan)-এর অধীনে বেশকিছু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা পর্যায়ে জাতীয় বননীতি ১৯৯৪ এবং ২০ বছর মেয়াদি বন মহাপরিকল্পনা ১৯৯৩-২০১৩ কার্যকর হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমি বনায়ন করা হবে। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ এর অধীনে ৭টি জলাভূমিকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ, বেলাভূমি, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাংগুয়া হাওর, মারজাট হাওর এবং গুলশান ও বারিধারা লেক। এছাড়াও বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NBSAP : Nat Biodiversity Strategy and Action Plan) তৈরি করেছে, পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য আইন Biodiversity Act এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান সংরক্ষণ আইন (Traditional Knowledge Pro-tect Act) বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন-১৯৭৪ এর ২৩-এবং ২৪ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য জাতীয় উদ্যান, গেইম রিজার্ভ গঠন করতে হবে। সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার যেকোনো এলাকাকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করতে পারবে, এমনকি যেকোনো এলাকাকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করতে পারবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কোনো একক বিষয় নয়। তাই বিশ্ব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দরকার সমন্বিত উদ্যোগ ও যৌথ প্রচেষ্টা। একমাত্র নিয়ামক হলো সব রাষ্ট্রের সমভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে হুমকির মুখে থাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। যেকোনো

পদক্ষেপই কেবল কঠোরভাবে আইন প্রয়োগেই যথেষ্ট কি-না, বিষয়টি তর্কের উর্ধ্বে নয়। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রথম শর্ত।

১৪.১২ জলবায়ু পরিবর্তনের বিপক্ষে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিজান কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকার ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট ২,৫০০ কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ প্রদান করেছে। এ তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশল এ্যাকশন ২০০৯ (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan,2009)- এর বরাদ্ধ। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প নিম্নরূপ :

১. পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধানভিত্তিক উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
২. Project on Farm Productivity and Food Security Enhancement of the Vulnerable Farmers in the Char Areas of jamalpur and Sherpur Districts.
৩. জলবায়ু পরিবর্তনে চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সুপেয় পানি সরবরাহ সামাজিক সুরক্ষাকরণ প্রকল্প।
৪. পোল্ডার ৫ এর বেড়ি বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প।
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলাভূমির বন পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প।
৬. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প।
৭. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় অভিজোজন সংক্রান্ত প্রকল্পে সহায়তা ২০১১ সালে Bangladesh Climate Change Resilience Fund(BCCRF) গঠন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা হয়েছে। BCCRF হতে ইতোমধ্যে উপকূলীয় এলাকার জনগণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাল্টি পারপাস সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
৮. জলবায়ু পরিবর্তন অধিদপ্তরের নামে একটি স্বতন্ত্র অধিদপ্তর সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৯. জলবায়ু পরিবর্তন স্ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় পরিচারিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হচ্ছে " Strengthening Institutional Capacity of Climate Change Unit"
১০. বাংলাদেশে ৩৪টি আবহাওয়া স্টেশন আছে এবং প্রায় ১০০০ সংস্থা আছে জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর। এছাড়াও ৩০০০টি সাইক্লোন কেন্দ্র ও ৪০,০০০ স্বেচ্ছাসেবি নিয়োজিত রয়েছে।

১৪.১৩ বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)

সূর্য থেকে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর রশ্মি যখন পৃথিবীতে আসে তখন কোন বস্তুর উপর পড়লে ঐ রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় ফলে কিছু রশ্মি আদতিত হয়ে মহাশূন্য ফিরে যায় এবং কিছু রশ্মি পৃথিবীতে থেকে যায়। এই থেকে পাওয়া রশ্মিগুলোকে কিছু গ্যাস শোষন করে এবং তাপমাত্রা বাড়ায়। এ গ্যাসগুলোকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলে। যেমন- কার্বন ডাই- অক্সাইড,নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, কোরো ফোরা কার্বন ইত্যাদি। গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলো প্রতিনিয়তই সূর্যরশ্মি শোষন করছে এবং পৃথিবীতে তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে গ্রীন হাউস ইফেক্ট বলে। এই এফেক্টের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বলে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

১. হারিকেন এবং অন্যান্য ঝড় শক্তিশালী হচ্ছে।
২. বন্যা এবং খড়া একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে যাচ্ছে।
৩. বিশুদ্ধ পানির দুষ্পাপ্যতা দেখা দিচ্ছে।
৪. কিছু মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন- নশরে মাধ্যমে ম্যালারিয়া।

৫. সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উপকূলীত বন্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৬. সে মাঝে মাঝে খুব বেশি বৃষ্টিপাতে এবং বন্যা ঘটছে।
৭. খাদ্য সরবরাহের ব্যাঘাত ঘটছে।
৮. ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে।
৯. বরফ গলে যাচ্ছে।
১০. উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের উপর ব্যাপক খারাপ প্রভাব পড়ছে।
১১. প্রবাল প্রাচীর ধ্বংসে হচ্ছে।
১২. সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

১৪.১৪ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক আর এর ফলাফল আঞ্চলিক ও এলাকা ভিত্তিক। এর প্রভাব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। Adaptation আভিধানিক অর্থ অভিযোজন বা উপযোগীতা। অভিযোজনের একটা সম্ভাবনা আছে যেটা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এটা কিরূপ হবে সেটা নির্ভর করে জলবায়ু সংকটের ধরনের উপর। ভৌগোলিক আয়তনের জন্য একটা দেশের অভিযোজন আর একটা দেশ থেকে ভিন্ন হয়। তবে অভিযোজন অবশ্যই সম্ভাব্য, প্রায়ভিক, প্রযুক্তিগতভাবে সুবিধাজনক এবং অর্থনৈতিকভাবে সহনশীল হতে হবে। অভিযোজনের কৌশল এক এক দেশে এক এক রকম যেমন-স্বল্প উন্নত দেশে অভিযোজন কৌশল উন্নত দেশের কৌশল অপেক্ষা ভিন্ন হয়। অভিযোজন স্বতঃস্ফূর্ত বা পরিকল্পিত হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন বলতে বুঝায় মানুষের ব্যবহারিক, অর্থনীতিক কাঠামো, সামাজিক কাঠামো সব ধরনের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা। যার ফলে ঝুঁকিপূর্ণ সমাজে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো অনেকটা কমে আসে। অভিযোজনকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়:

Adaptation is the adjustment in natural or human system inrespons to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderate born of exploits beneficial opportunities (IPCC, 3rd Assessment)

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতা থাকতে হবে, যেমন সম্পদ, প্রযুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক মূলধন, তথ্য ও অবকাঠামো ইত্যাদি। এসব সক্ষমতা থাকলে একটা দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে খুব সহজে অভিযোজন ঘটাতে পারে।

অভিযোজনের ক্ষেত্র:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল আমাদের জীবনের সকল স্তরেরই প্রভাব ফেলে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, অবকাঠামোগত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই আমাদের আর্থসামাজিক সকল ক্ষেত্রে অভিযোজন প্রয়োজন।

অভিযোজনের বিশেষ সেক্টরসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. সমুদ্রের স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে
২. বন্যার বিরুদ্ধে
৩. খরার বিরুদ্ধে
৪. কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজন
৫. মৎস ক্ষেত্রে অভিযোজন
৬. গবাদি পশুর ক্ষেত্রে অভিযোজন
৭. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভিযোজন
৮. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, টর্নোডো, সুনামি, ভূমিকম্প, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিযোজন করতে হবে।

১৪.১৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অভিযোজন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ভৌগোলিক অবস্থা, জমির বৈশিষ্ট্য, নদীর বিধিত্ব ইত্যাদি। এজন্য বাংলাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলা প্রতিনিয়ত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভোগ করছে। বাংলাদেশের সরকার এ বিষয় নিয়ে খুব তীক্ষ্ণভাবে সচেতন এবং এর ক্ষতিকর দিক

http://thejobstudy.com Go to Contents

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েক বছর যাবৎ প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা উন্নত দেশের পেশাগত দল ও সুশীল সমাজের সাথে এই বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছিল এবং তাদের কাঝ থেকে বিভিনন ধরনের পরামর্শ নিয়েছিল। বাংলাদেশর সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন-

1. ACZM (Intergrated Coastal Zone Management)-2005
2. BCCSAP (Bangladesh Climate Change Strtegy Action Plan)-2009
3. NAPA (National Adaptation Programme of Action)-2005
4. PRSP (Poerty Reduction Stratey Paper)

যেগুলো গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুটামুটি আগামী ১০ বছরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

BCCSAP এর কাজ হচ্ছে চলতি পরিবেশগত অবস্থাকে যোগ করে আশানুরূপ উদ্যোগ নেওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির অভ্যন্তরে জলবায়ুর পূর্ণবাসন করা।

NAPA এর কাজ হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় কৃষি শস্যে অর্থাৎ জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করলে যাতের ফসলের ক্ষতি না হয় সেজন্য অভিযোজন হিসেবে Wet Bed No-tillage পদ্ধতি এবং উপকূলীয় বন্যা থেকে পাকা শস্য রক্ষা করার জন্য Sorjan পদ্ধতি অনুসরণ করা। উপকূলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের অভিযোজন বাড়ানোর পদ্ধতি এবং যেসব মাছ লবণ সহিষ্ণু সেসব মাছের তালিকা দেওয়া বন্যার আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণকরা এবং বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার পূর্বেই বিভিন্ন পূর্বাভাস দেওয়া যাতে বন্যার ক্ষতি অনেকটা কমানো যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা যেসব এলাকায় বেশী সেসব ক্ষেত্রে বাড়ির সামনে সারিবদ্ধ গাছ লাগানোর পরামর্শ দেয় যাতে করে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানতে না পারে। NAPA এর মতে বাড়িঘরগুলো তরম তধম পদ্ধতিতে বানানো উচিত যাতে করে ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সরাসরি আঘাতন করতে না পারে। বেশি বনায়নের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বহুলাংশে ক্রমে যায়। এজন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন। তাছাড়া শহরের অবকাঠামো এবং ফ্যাক্টরিগুলোর পুর্নগঠন এবং পরামর্শ দেয় যেটা অভিযোজনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ-

অভিযোজনের বিভিন্ন উপায়

১. শারীরিকভাবে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানো।
২. জীবিকা নির্বাহের ক্ষমতা বাড়ানো।
৩. উপার্জনের নানারকম উপায় অবলম্বন করা।
৫. লোক সমাজ এবং রীতিসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা।
৬. সরকারী -বেসরকারী অংশদারিত্ব গঠন করা;
৭. সচেতনাতা বাড়ানো এবং বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া;
৮. নতুন প্রযুক্তির গবেষণা করা;
৯. গ্রামে ছোট পুকুর নির্মাণ করা যেখানে খরার সময় পানি সরবরাহ করা যায়।
১০. বাস্তভূমি বা আবাসভূমিতে বাগান করা;
১১. অল্প স্থায়ীত্বের শস্য উৎপাদন করা।
১২. নতুন কৃষির পদ্ধতি উদ্ভাবন চেষ্টা করা।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে বন্যার ব্যবস্পনা, উপকূলীয় polders ঘূর্ণিঝড়, বন্যার আশ্রয় কেন্দ্র হাইওয়ে রাস্তা নির্মানের জন্য ১০ বিলিয়নের মার্কিন ডলার খরচ করেছিল বাংলাদেম অভিযোজন হচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি ধরনের। (MOEF 2009)

তবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অভিযোজন কৌশলের গবেষণা, নকশা ও কাজে পরিণত করার জন্য ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

১৪.১৬ জলবায়ু কূটনীতি (Climate Diplomacy)

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মতৈক্যে পৌঁছানোর ধীরগতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বৈদেশিক নীতি কঠোর করা হয়। এ নীতিকে/প্রক্রিয়াকে জলবায়ু কূটনীতি বলে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন সুনামি, টর্নোডো, জলোচ্ছাস, বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি, খরার আঘাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান ফলাফল। জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা "Inter-governmental Panel on Climate Change" (IPCC)-এর মতে, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী না হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এক নির্দোষ শিকার। এই বাস্তবতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলোর নিকট হতে ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার লক্ষ্যে গঠিত কাইমেট চেঞ্জ নেগোশিয়েশন টিম ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নেগোশিয়েশনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যা বাংলাদেশের সফল জলবায়ু কূটনীতির উদাহরণ।

আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সক্রিয় ও ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF), CDM Executive Board, Adaption Found Board, Adaptation Committee, Consultative Group of Experts Ges Kyoto Protocol-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক Climate Change Negotiation-এ ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ LDC এর অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালু করেছে তাই জলবায়ু কূটনীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জলবায়ু কূটনীতির মূল বিষয়বস্তু হলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলোকে প্রতিরোধ করা এবং ক্ষতির সম্মুখীন রাষ্ট্রগুলোর অধিকার নিশ্চিত করা।

১৪.১৭ পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সম্মেলন

১. **মন্ট্রিল সম্মেলন ১৯৮৭ :** ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ওজনস্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কাগজে কলমেই থেকে গেছে।

২. **ধরিত্রী সম্মেলন ১৯৯২ :** জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জেনোরিওতে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়। সম্মেলনে ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করা হয়। রিওডি জেনিরিও সম্মেলনে ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে মুখ্য নীতিমালাগুলো হচ্ছে-

ক. টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ।

খ. রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারিত্বের চেতনায় বিশ্বের পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে।

গ. পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরুৎসাহিত ও প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকরী সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ. রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. **ধরিত্রী সম্মেলন +৫, ১৯৯৭ :** ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'ধরিত্রী সম্মেলন +৫' এর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্বের ৬১টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ যোগ দেন। এতে 'দ্য প্রোগ্রাম ফর ফারদার ইমপ্লিমেন্টেশন অব এজেন্ডা-২১' গৃহীত হয়। এছাড়া রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়।

৪. **হেগ সম্মেলন ২০০০:** নভেম্বর ২০০০ নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে জাতিসংঘের বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ১৮০টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীসমূহ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধকল্পে ঐকমত্য অর্জনে সমর্থ হবে বলে বিশ্ববাসী প্রত্যাশা করেছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার কারণে সম্মেলনের সাফল্য অর্জিত হয় নি।

৫. **ধরিত্রী সম্মেলন/বিশ্ব টেকসই সম্মেলন ২০০২ :** ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন বা বিশ্ব টেকসই সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশকে ক্ষতি না করে বিশ্বকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এ সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পাঁচটি সেবামূলক ক্ষেত্র- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও জীব বৈচিত্রের মতো ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এ শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার জন্য চিহ্নিত করেন। এ সম্মেলনে আরো যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো :

ক. জীব বৈচিত্র ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা।

খ. জীবন রক্ষাকারী চাহিদা মেটাতে দরিদ্র দেশগুলো যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার একটা বিকল্প উপায় পেতে পারে তা নির্ধারণ করা।

গ. ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনা। ধনী দরিদ্র দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস। বিনিয়োগ প্রবাহকে টেকসই উন্নয়নের সাথে সমন্বয় করার অঙ্গীকার।

ঘ. সকল মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রেখে একটি মানবিক নিরপেক্ষ এবং নিরাপদ বিশ্ব সমাজ গঠন করা হবে। মানবিকতার চরম অবস্থা অনুধাবন করে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে এমন একটি বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হবে।

ঙ. পূর্ববর্তী পরিবেশ বিপর্যয় সংক্রান্ত ঘোষণাগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং বাস্তবায়িত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হবে। পরিবেশের জৈব বৈচিত্র তথা স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

চ. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের খাদ্য চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করন।

ছ. বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় ঐক্যমত্য হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রজাতির বিলুপ্তির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হবে।

৬. **বর্লিন সম্মেলন-১৯৯৪ :** ১৯৯৪ সালে বর্লিন সম্মেলনে "জাতিসংঘ আবহাওয়া সম্মেলন" আশংকা করা হয় যে, ধরিত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিএফসি হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধরিত্রী সম্মেলন+৫ ১৯৯৭ সালে পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একটি বিশেষ সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ৫ জুন পরিবেশ দিবসে বিশ্বব্যাংক পরিবেশের সুরক্ষার জন্য ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচিকে 'গ্রিন টপ-১০' বলা হয়।

১৪.১৮ পরিবেশ কী ও বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনসমূহ (কিয়েটো, কোপেনহেগেন ও কানকুন সম্মেলন) বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় , যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা এবং কানকুন সম্মেলনের সফলতা ও ব্যর্থতা :

১৪.১৮.১ পরিবেশ কী

পরিবেশ বাংলা শব্দ, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ Environment এ শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি Environment থেকে। 'Environment' অর্থ বেষ্টন করা বা ঘেরা। মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ককেই পরিবেশ বলে।

১৪.১৮.২ প্রথম সম্মেলন তথা স্টকহোম বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন

প্রথম পরিবেশ সম্মেলন : ১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ৪৫তম অধিবেশনে এবং ১৯৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের নাম ছিল জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)। পরিবেশের বিপর্যয়ই পরিবেশ রক্ষার তাগিদ দেয়। বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলন স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইল ফলক। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এমনকি অনেক দেশে জাতীয় পরিবেশ কর্ম-পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করা হয়। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের বিরূপ প্রভাব হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাসেল কনভেনশন, রটারডাম কনভেনশন ও স্টকহোম কনভেনশন গৃহীত হয়েছে এবং এর আওতায় নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা ও পরিচালনা ও বিশ্ববাসীকে জলবায়ু পরিবর্তণের ভয়াবহতা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ইন্টারগভার্ণমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ" (আইপিসিসি)। আইপিসিসি'র প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয় জলবায়ু পরিবর্তন কী হারে ঘটছে এবং এর করণীয় সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সজাগ করে তোলে। ফলে বিশ্ব সম্প্রদায় সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য একসাথে কাজ করছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে "মানব পরিবেশ সংক্রান্ত" সম্মেলন এর মাধ্যমে পরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রক্রিয়া শুরু হয়। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ নিয়ে বহুকর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, অদ্যাবদি কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। এটি একটি অমিমাংসিত সমস্যা। পরিবেশ নিয়ে প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ষ্টকহোমে ১৯৭২ সালে। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালে UNEP Environment Program গঠন করা হয়। একই বছর UNEP Environment Program '৫ জুন' কে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে এ দিবসটি যথারীতি পালন হয়ে আসছে।

১৪.১৮.৩ বাংলাদেশের পরিবেশ সংকট

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে যে হারে চলছে তাতে প্রতি এক থেকে দুই ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠেরতলও এক ইঞ্চির মতো বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে পাঁচ অথবা ছয় ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এক ফুটের মতো উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সব সময় বন্যা পরিস্থিতির মুখামুখি হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবনধারণের জন্য অনেকগুলো বিষয় সরাসরি জড়িত। যা বাংলাদেশের সার্বিক জীবন যাত্রায় প্রভাব ফেলেছে।

১৪.১৯ কাপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলন (GOPENHAGEN CLIMATE SUMMIT)

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের জন্য ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগের এ দুই সপ্তাহব্যাপী একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা Cop-15 নামে পরিচিত। এ সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সম্মেলনে ১২০টি দেশের সরকার প্রধান সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। Cop-15 সম্মেলনে গৃহীত চুক্তির প্রধান প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

১. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের হার কমিয়ে আনতে হবে।
২. ২০১০ সালের শেষ নাগাদ একটি বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি প্রণয়ন করার জন্য সমঝোতার সঙ্গে একটি সুপারিশ সংযুক্ত করা হয়েছে।
৩. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলো তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন রাষ্ট্রে হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশ ও

http://thejobstudy.com Go to Contents

মালদ্বীপের দ্বীপ রাষ্ট্র সমূহ, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং আফ্রিকার দেশসমূহকে। এ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ যৌথভাবে প্রতি বছর ১ হাজার কোটি ডলার করে সাহায্য দিয়ে যাবে ২০২০ সাল পর্যন্ত।

১৪.২০ কানকুন জলবায়ু সম্মেলন Cop-16 (CANCUN CLIMATE SUMMIT)

মেক্সিকোর পর্যটন নগরী কানকুন সিটিতে ২০১০ সালের ডিসেম্বর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা Conference of the parties 16 (Cop-16) নামে পরিচিত। Cop-16 এ গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-

১. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে Adaptation Committee প্রতিষ্ঠা।
২. যে সকল দেশে ১০টির কম Clean Development Mechanism (CDM) Project আছে সেসব দেশকে আর্থিক সহায়তা ও পর্যাপ্ত শুল্ক সরবরাহ। দেশ
৩. Green climate fund গঠন।
৪. Cop-16 এর Arenx I ভুক্ত দেশসমূহ ২০১০-১১ মেয়াদে প্রতিশ্রুত ৩০ বিলিয়ন অর্থ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অভিযোজন এবং প্রমশন খাতে প্রদান।
৫. উন্নত দেশ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে ২০২০ সাল হতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করা।
৬. ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি Transitional Copmmittee দ্বারা Green Climate fund এর গঠন ত্বড়ান্ত করা।
৭. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি নিয়ে ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮. একটি প্রযুক্তি নির্বাহী কমিটি ও একটি জলবায়ু প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে Technology Mechanism অর্থাৎ উন্নয়ন ও বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কানকুনে সাফল্য

১. পাশ্চাত্য থেকে উন্নয়নশীল ও দারিদ্র দেশগুলোকে তহবিল সরবরাহের ব্যবস্থা।
২. নিঃসরন হ্রাসের বর্তমান অঙ্গীকার সম্প্রসারণ করা উচিত-এ মর্মে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।
৩. দেশগুলোকে তাদের বনসম্পদ না কেটে রক্ষা করতে আর্থিক প্রনোদনা দেয়ার ব্যবস্থা।

কানুকুনে ব্যার্থতা

১. নিঃসরণ হ্রাসের মাত্রা বাড়ানোর অঙ্গীকার।
২. নিঃসরন হ্রাসের মাত্রা আরো কমানোর কর্মকৌশল।
৩. নতুন বৈশ্বিক চুক্তির আইনগত মর্যাদার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত।

১৪.২১ ডারবানে জলবায়ু সম্মেলন- ২০১১

২৮ নভেম্বর, ২০১১ ডারবানে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু সম্পর্কে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এজেন্ডা হলো 'এ্যাডাপটেশন প্লান'। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো কোপেনহেগেনে এ দাবি উত্থাপন করা হয়। কানকুন সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলো এ দাবি উন্নত দেশগুলো মেনে নেয়। ডারবান সম্মেলনে এ দাবীর রূপরেখা তৈরি করা হয়। এটিই ছিল কানকুন সম্মেলনের এগ্রিমেন্টের ম্যান্ডেট। ডারবান সম্মেলনের সভাপতি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইথি নকোওয়া মাসাবান, তিনি বলেন জলবায়ু সম্পর্কে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ এক সুতোয় গাঁথা। ধনী দেশগুলোর কারণেই এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে এ দেশগুলোকে।

ডারবান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত : ডারবান সম্মেলনে কার্বন নিঃসরন সংক্রান্ত কিয়োটো চুক্তি আইনগত ভাবেই বাধ্যবাধক হিসেবে এ চুক্তি বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৯৫টি দেশের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। এ কিয়োটা প্রটোকলের প্রথম অঙ্গীকার শেষ হবে ২০১২ সালে। ১ জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় অঙ্গীকার কাল শুরু হবে। তর্ক বিতর্কের পর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্মত হয়। এ সম্মেলনে ডারবান প্লাটফর্ম নামে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির কাজ হলো আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সকল দেশের

জন্য আইনগত বাধ্যবাধক এক চুক্তি বা প্রটোকল অথবা এমন এক সমঝোতা যা আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্যতা তৈরি করা হবে। ডারবান সম্মেলনে উপস্থিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় অঙ্গীকারের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্যই সুখকর। দ্বিতীয় অঙ্গীকারকালে উন্নত বিশ্ব ১৯৯০ সালের তুলনায় ২৫-৪০% কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য বাধ্য থাকবে। ডারবান সম্মেলনে ২০০৭ সালে বালি সম্মেলনে গৃহীত বালি এ্যাকশন প্লানের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি কমিটির মাধ্যমে আরো এক বছর বৃদ্ধি করা হয়। বালি এ্যাকশন প্লানে উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মতিভাবে একটি আউটকাম তৈরি করে বাস্তবায়নের জন্য আগামী দোহা সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে। বালি এ্যাকশন প্লানে এলডিসি ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। ডারবান সম্মেলনের গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড অপারেশনালাইজ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। COP- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হবে।

১৪.২২ কোপেনহেগেন সম্মেলন ও বিশ্ব জলবায়ু

কপ (COP) সম্মেলন : জলবায়ু পরিবর্তণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা-কনভেনশন (UNFCCC) ১৯৯৪ সালের মার্চ কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কনফারেন্সেস অব দ্য পার্টিস-কপ (Conferences of the Parties COP) নামে পরিচিত এ সম্মেলনে UNFCCC ভুক্ত দেশসমূহ অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালের ২৮ মার্চ-৭ এপ্রিল জার্মানির বার্লিনে প্রথম এবং ২০১১ সালের ২৮ নভেম্বর-৯ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে সর্বশেষ ১৭ তম (COP) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালে ১৮ তম COP অনুষ্ঠিত হয় ২৬ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর, কাতারে।

১৪.২২.১ ডারবান জলবায়ু সম্মেলন (COP-17) (DURBAN CLIMATE SUMMIT)

২৮ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে Cop-17 অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু সম্মেলনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. Green Climate Fund এর কার্যক্রম শুরু : Finance বিষয়ক নেগোসিয়েশনে উন্নত বিশ্ব অভিযোজন এবং প্রশমন ট্রাস কার্যক্রমে স্বল্প মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রতিবছর ১০ বিলিয়ন করে ২০১০-১২ সময়ে ৩ বছরে ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং উন্নত এবং উন্নয়নশীল ২০২০ সাল হতে যৌথভাবে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২. Technology Developemnt and Transfer -এর আওতায় Technology Mechanism, Technology Executive কমিটি এবং Climate Technology Centre and Network প্রতিষ্ঠা।

৩. Adaptation Frame Work, Adaptation Committee এর গঠন চূড়ান্তকরণ এবং LDC দেশসমূহের জন্য National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

১৪.২২.২ দোহা জলবায়ু সম্মেলন (Cop-18) (DOHA CLIMATE SUMMIT)

২৬ নভেম্বর ২০১২ হতে ৮ ডিসেম্বর ২০১২ সালে কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত হয় বলে এ সম্মেলনেক দোহা জলবায়ু সম্মেলন বলা হয়। দোহা সম্মেলনের আশার দিক হচ্ছে, ছোটখাটো পরিসরে হলেও কিছু চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি প্যাকেজ প্রস্তাব যার আওতায় দরিদ্র দেশগুলোকে ২০২০ সালের আগ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থ দেওয়া হবে এবং পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানির উৎস খোঁজা হবে। তবে কিয়োটো প্রটোকলে সই করেনি এমন দেশগুলো জরুরি ভিত্তিতে কার্বন নিঃসরন কমানোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি এ সম্মেলনে। কার্বন নিঃসরনের দিক দিয়ে এ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে বিশ্বের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত।

১৪.২২.৩ Cop-19 বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

১১-২৩ নভেম্বর ২০১৩ সালে ২০১৩ সালে পোল্যান্ডের ওয়ারশর্তে অনুষ্ঠিত UNFCCC এর Conference of the Parties 19 (COP19/CMP9) এ delegate- দের মধ্যে একটি gohal agreement এর বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ-

ওয়ারশ আন্তর্জাতিক ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক ব্যবস্থা (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে বিশেষ করে extreme events Ges slow onset events এর কারণে উন্নয়নশীল নরাজুক দেশসমূহে যে ক্ষয়ক্ষতি (Loss and Damage): প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া পরবর্তী নেয়ার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (International Mechanism) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। এছাড়া পরবর্তী ২২ তম জলবায়ু সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনা পূর্বক নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অর্থায়ন (Finance): Long term finance বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। উন্নত দেশসমূহকে ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রদেয় climate finance আনুপাতিক হারে বৃদ্ধির (scaling up) জন্য হালনাগাদ কৌশল ও পদক্ষেপ (Update strategies and approaches) সমূহ সমন্বয়ে দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০১৫ এর চুক্তি পালনে বাধ্যবাধকতা Legally Binding Agreemenঃ ২০১৫) : কনভেশন আওতায় সকল সদস্য দেশের জন্য নতুন একটি প্রটোকল বা একটি লিগ্যাল ইনস্টুমেন্ট বা একটি Legal force সহ agreed outcome ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য COP-21 তে adoption এর জন্য যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার কার্যক্রম অগ্রগতি অর্জনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২০ সাল হইতে Legally Binding Agreement ২০১৫ কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর (Technology Deveopment and Transfer): CTCN Gi modalities এবং procedures এবং CTCN- এর উপদেষ্টা বোর্ড এর rules of procedures গ্রহণ করা হয়। CTCN কে কার্যকর করার জন্য প্রতিটি দেশে জাতীয় স্তরে National Designated Entities (NDE) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরকে NDE হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪.২২.৪ Cop-20 বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

১-১২ ডিসেম্বর, ২০১৪ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুর লিমায় ২০ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন শুরু হয়। যা জাতিসংঘের সদস্য বিশ্বের ১৯৪টি দেশ সর্বসম্মতভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধের লক্ষ্যে খসড়া চুক্তি গ্রহণ করে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর প্যারিসে পরবর্তী জলবায়ু সম্মেলনে এ খসড়া ভিত্তিতে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

লিমায় সমঝোতা চুক্তিতে প্রত্যেক দেশকে আলাদা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেসব দেশকে উন্নত দেশগুলো ২০১৫ সাল থেকে আর্থিক সহায়তা দেব। ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে উন্নত দেশগুলো তাদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ উল্লেখ করবে। জাতিসংঘের জলবায়ু শাখা ২০১৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে কোন দেশ বাকী পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দেবে-তা একটি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে জানাবে।

'লিমা কল ফর কাইমেট অ্যাকশন' নামে ঘোষিত ও খসড়া চুক্তিতে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল সব সদস্যরাষ্ট্র উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে সম্মত হয়। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকলে নিঃসরণ মাত্রা কমানোর দায়িত্ব পড়েছিল শুধু শিল্পোন্নত দেশের ওপর। 'লিমা পরিকল্পনায়" শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশই নিঃসরণ মাত্রা নির্ধারণে গ্রিন হাউস গ্যাসরে নিঃসরণ মাত্রা হ্রাসের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা জাতিসংঘ নিয়েছিল, লিমা পরিকল্পনার ফলে তা বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারসহ বিভিন্নভাবে উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ কিছু গ্যাস তাপমাত্রা আটকে রেখে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে মেরুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীপের মতো নিচু ভূখন্ডগুলো ক্রমশ তলিয়ে যাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের জলবায়ুতেও চরমভাভাপন্নতা দেখা যাচ্ছে।

চুক্তিভূক্ত দেশগুলো ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় প্যারিস সম্মেলনের আগে যার যার

এক নজরে বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা উত্তরনে বিভিন্ন কনভেশন/চুক্তি

গৃহীত হওয়ার	কনভেশনের নাম/চুক্তি	গৃহীত হওয়ার তারিখ ও সাল	কার্যকর
৫-১৬ জুন ১৯৭২	United Nations conference on the Human Environment (মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন)	স্টকহোম, সুইডেন।	১১৪টি দেশ অংশগ্রহন করে।
২২ মার্চ ১৯৮৫	Convention for the protection of the ozone layer (জাতিসংঘের ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষন বিষয়ক কনভেনশন)	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া ২২ সেপ্টেম্বর	১৯৮৮ কার্যকর
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯	Basel convention on the control of trans boundary movements of hazardous wastes and their Disposal (বায়ুমন্ডলে স্ট্রাটোরিক্ষাত্মিক স্তরে ওজোন স্তরকে রক্ষা বিয়সক প্রটোকল মন্ট্রিপল্লিল প্রটোকল প্রাটেকল নামে খ্যাত)	মন্ট্রিল, কানাডা	১ জানুয়ারী ১৯৮৯ কার্যকর হয়।
২২ মার্চ ১৯৮৯	Basel convention on the control of transboundary movements of Hazadous wastes and their disposal (বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কনভেনশন বাসেল কনভেনশন নামে পরিচিত)।	বাসেল, সুইজারল্যান্ড	৫ মে ১৯৯২ কার্যকর হয়।
৩-১৪ জুন ১৯৯২	The Earth Conference (ধরিত্রী সম্মেলন)	রিওডি জেনিরো, ব্রাজিল	২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩
২৩-২৭ জুন ১৯৯৭	ধরিত্রী সম্মেলন+৫	নিউইয়ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭০টি দেশ অংশগ্রহন করে	
১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭	Kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change (ভূমন্ডলের তাপবৃদ্ধি ও আবহমন্ডলের পরিবর্তন রোধ বিয়ষক প্রটোকল কিয়োটা প্রটোকল।)	কিয়োটা, জাপান	কার্যকর ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
২৯ জানুয়ারী	Cartagena protocol on bissafety to the convention on Biological diversity (জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল কার্টাগেনা প্রটোকল)।	মন্ট্রিল, কানাডা	কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩
নভেম্বর ২০০০	হেগ সম্মেল ২০০০	হেগ, নেদারল্যান্ড	১৮০টি দেশ
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০২	ধরিত্রী সম্মেলন ২০০২	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা	
২-২৫ ডিসেম্বর ২০০৭	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৩তম সম্মেলন বালি সম্মেলন।	বালি দ্বীপ ইন্দোনেশিয়া	১৯২টি দেশ এতে অংশ নেয়
২০০৮	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৪ তম সম্মেলন	ওয়ারশ, পোল্যান্ড	১৯২টি দেশ
৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৫তম সম্মেলন কোপেন হেগেন সম্মেলন।	কোপেন হেগেন, ডেনমার্ক	১৯৩টি দেশ অংশ গ্রহণ
২৯ নভেম্বর- ১০ ডিসেম্বর ২০১০	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৬ তম সম্মেলন	কানকুন	
২ নভেম্বর- ৯ ডিসেম্বর ২০১১	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৭তম সম্মেলন	ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।	
২০ জুন ২০১২	রিও+২০ সম্মেল	রিওজি জেনিরো ব্রাজিল	
১৬ নভেম্বর ২০১২	দোহা সম্মেলন ২০১২	দোহা, কাতার	
১-১২ ডিসেম্বর ২০১৪	লিমা সম্মেলন ২০১৪	লিমা, পেরু	

নিঃস্বরণ মাত্রা নির্ধারণে সম্মত হলেও সে মাত্রা কীভাবে অর্জিত হবে। তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা অনুমোদিত খসড়ায় রাখা হয়নি। পরিমাপযোগ্য তথ্য দেওয়া ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বর্তমান সময়ের তুলনায় কম হতে হবে জাতিসংঘ এ তথ্য নিরীক্ষার পর ২০১৫ সালের ১ নভেম্বরের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতার ওপর প্রস্তাবিত নিঃসরণ মাত্রার প্রভাব বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

রাষ্ট্রগুলোর নির্ধারিত নিঃসরণ মাত্রার তুলনামূলক সমীক্ষা প্রস্তুতের ব্যাপারে অগ্রসর অর্থনীতির দেশের আপত্তির কারণে বাতিল করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিঃসরণ মাত্রা নির্ধারণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বক্তব্য, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের দায়বার মূখ্যত শিল্পোন্নত দেশগুলোর।

পেরুর রাজধানী লিমায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত-লিমা কল ফর কাইমেট অ্যাকশন, কে অনেকে যুগান্তকারী হিসেবে অভিহিত করেন। কারণ এর আগে পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানোর দায়িত্ব পড়েছিল শুধু শিল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর আর এ দায়িত্ব নিতে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশই সম্মত হয়েছে। এটাকে নি-সন্দেহে বলা যায় এক ধাপ অগ্রগতি। কারণ এর মাধ্যমে স্বীকার করে নেওয়া হলো যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানোর দায়িত্ব আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সব দেশের। এই সমস্যা গোটা মানবজাতির সমস্যা। কিন্তু এই অগ্রগতির আগু কোন সুফল বা সম্ভাবনা লিমায় দেখা দেয় নি। কারণ কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে কোন ধরনের আইনি বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা করা হয় নি ফলে ২০২০ সালের বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে তা বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় নি।

রাষ্ট্রগুলোর নির্ধারিত নিঃসরণ মাত্রার তুলনামূলক সমীক্ষা প্রস্তুত করার পক্ষে একটি প্রস্তাব লিমা সম্মেলনে নাকচ হয়ে গেছে চীন ও ভারতসহ দ্রুত অগ্রসরমাণ কয়েকটি দেশের আপত্তির কারণে। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কারণ এ ধরনের কারণে দেশগুলোই এখন সর্বাধিক মাত্রায় কার্বন নিঃসরণ ঘটাচ্ছে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো তারা উপেক্ষা করে চলেছে। কোন দেশ কী মাত্রায় কার্বন নিঃসরণ করতে পারবে এ ব্যাপারে কোন আইনি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি না করে প্রতিটি দেশের নিজস্ব বাস্তবতার নিরিখে নিজেদেরই নির্ধারণ করার সুযোগ রেখে দেওয়ার ফলে লিমা সম্মেলন হতাশার সৃষ্টি করে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সংকট নিরসনের কোন কার্যকর সমাধান হয় নি। ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু সম্মেলনে আইনি বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা বর্তমানে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

১৪.২৩ সাম্প্রতিক জলবায়ু সম্মেলনের প্রাপ্তি নিয়ে সংশয়

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর সহায়তায় গঠিত তহবিল 'গ্রিন কাইমেট ফান্ডে' মাত্র ২৩০ কোটি ডলার জমা দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি মিলল জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে। ২০১৪ সালের মধ্যে এই তহবিল এক হাজার কোটি ডলার জমা পড়ার কথা। নিউইয়র্কে দিনব্যাপী এ সম্মেলনে নগদে প্রাপ্তি বলতে এটাই। আর উলে-খযোগ্য অর্জন হলো, কার্বণ দূষণ কমাতে প্রথমবারের মতো উঠতি অর্থনীতির দেশ চীনের প্রতিশ্রুতি। জলবায়ু পরিবর্তনে তি মোকাবিলায় উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য তাগিত দিয়েছেন বিশ্বনেতারা। তবে এর জবাবে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে সামান্যই। সম্মেলনে যে, ২০০৩ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি মিলল, এর মধ্যে জর্মানি আর ফ্যান্সই দেবে ২০০ কোটি উলার। অথচ এ বছরের শেষ নাগাদ এ তহবিলে এক হাজার কোটি ডলার জমা পড়ার কথা। ২০২০ সাল নাগাদ তা বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার হবে। এবার তহবিল অর্থ সহায়তাকারী দেশগুলোর মধ্যে আছে সুইজারল্যান্ড, চীন, কোরিয়া, ডেনমার্ক ও নরওয়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কার্বন দূষণকারী দেশ চীন প্রথমবারের মতো কার্বন নিঃসরণ রোধে কঠোর কর্মসূচী নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী ঝাং গাওলি দেশটির অর্থনীতিকে ২০২০ সালের মধ্যে তাঁর দেশ ২০০৫ সালের তুলনায় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রতি একক কার্বন নিঃসরণ ৪৫ ভাগ কমাবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের দায় বহনকারী ৪৫ ভাগ কমাবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের দায় বহনকারী বড় দেশ হিসেবে চীন এর ক্ষতি রোধে ব্যাপক কর্মসূচী নেবে। ২০১৪ সালে আয়োজিত সম্মেলন উপলক্ষে নিউইয়র্কের রাস্তায় তিন লাখের বেশি মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ

হয়। বিশ্বের ১৬০টির বেশি দেশে অনুষ্ঠিত হয় দুই হাজারের বেশি শোভাযাত্রা ও মানববন্ধন। ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনের পর এবারের শীর্ষ সম্মেলনটি ছিল সবচেয়ে বড়। ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একটি কার্যকর সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম হাতে নিতে বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি আদায় ছিল এবারে লক্ষ্য। সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আয়োজন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন আশারদই শোনা। তাঁর উচ্চারণ, 'এর আগে কখনোই বিশ্বের এতগুলো দেশের সরকার প্রধানেরা জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পরিকল্পনা গ্রহনে একজোট হয় নি।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ১৯৯০-২০১৪ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ ২৫৯টি, প্রাণহানি ৭৮৪৯ জন। ক্ষয়ক্ষতি ২০৮৬, ১৪ মিলিয়ন ডলার (জিডিপির ১.৬৭ ভাগ)। শুধু ২০০৯ সালে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকা বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ হচ্ছে ৬ষ্ঠতম বন্যা আক্রান্ত দেশ।

মূল্যায়ন

একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্ব পরিবেশ আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। আর এর পেছনে প্রধান কারণগুলো হলো উন্নত বিশ্বের কার্যকলাপ এবং এর প্রধান শিকার উন্নয়নশীল দেশের জনগণ। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের প্রতিক্রিয়ার পরিবেশের মারাত্মক দূষণ মানবজাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পরিবেশের এ ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আজ গোটা বিশ্বে সচেতনতা বেড়েছে পরিবেশবাদীদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি। বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনসমূহ পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের কাছে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে না। পরিবেশ রক্ষা ও একটি ভারসাম্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। উন্নত বিশ্বের ওপর আজ অনেক কিছু নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব পরাশক্তিসমূহ যদি এগিয়ে না আসে তাহলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা যাবে না। কারণ বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব পরাশক্তির ইচ্ছার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই পরিবেশ দূষণমুক্ত বিশ্ব পরিবেশ গড়তে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো জাতিসংঘ একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করতে পারে। এ ফোরামে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর সহযোগিতাই পারে আগামী প্রজন্মকে একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে।

১৪.২৪ পরিবেশ সংরক্ষণে রিও +২০ সম্মেলন ও বিশ্ব ভাবনা

পরিবেশের বিষয়ে মুখ্য অধিবক্তা এবং 'টেকসই উন্নয়ন'-এর নেতৃত্বস্থানীয় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছে জাতিসংঘ। বিশ্বের জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও মরুময়তারোধে অর্থাৎ টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে, ১৯-২১ জুন, ২০১২, ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে রিও + ২০ সম্মেলন ২০১২।

RIO +20

চাই পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি : রিও+২০শীর্ষ সম্মেলনে বিশেষ করে ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জেনেরিওতে রিও +২০ শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রার সঙ্গে পরিবেশের বিষয়টি যে পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে জাড়িত সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ওঠে এসেছে। পরিবেশ বিনষ্ট করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্য হতে পারে না। টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি। সম্মেলনে উপস্থিত নোবেল বিজয়ী, মন্ত্রী এবং বিজ্ঞানীদের একটি প্যানেল এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বকে নতুন এক টেকসই অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে সরকারগুলোকে রিও সম্মেলনের ঐতিহাসিক এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে, এমনকি তারা পরিশেষে এ অভিমতে পৌঁছেছেন যে, ভবিষ্যতের সমাজ এক মারাত্মক পরিবেশ ঝুঁকির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। বিশ্বধরিত্রী সম্মেলনের প্রায় ২০ বছর পর রিও প্লাস টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ করে দরিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানকে আরো কীভাবে এগিয়ে নেয়া যায় তা এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। কেননা এ গ্রহের প্রাকৃতিক সম্পদ অনিঃশেষ নয়। তেমনি অনিঃশেষ নয় উন্নতির মাত্রাও। তাহলে উন্নয়ন কি সবসময় সম্ভবপর। রিও সম্মেলনের আগে এ মৌলিক প্রশ্ন ওঠে, যাতে জড়িয়ে রয়েছে পরিবেশও।

আকোস্তার বক্তব্য : জিডিপি অর্থনীতির এ পরিভাষাটি আমাদের সকলেরই পরিচিত শব্দ। এর অর্থ হলো গড় জাতীয় উৎপাদন। এ গড় জাতীয় উৎপাদন বাড়ানোর জন্যই প্রতিটি দেশের সর্বাঙ্গীন আর সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। জিডিপি ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে না কিন্তু বিশ্বের সকল দেশের মুখে শোনা যাবে অর্থনীতিতে আমাদের জিডিপি বাড়ছে আর এ জিডিপি এবং তার পরিসংখ্যানপত্র তুলেছেন একদল

সাংবাদিক। সাংবাদিক এনজিও কর্মী এবং কিছু কিছু নামজাদা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে তৈরি একটি প্যানেল। সংক্ষেপে যে প্যানেলকে বলা হয়ে থাকে 'আকোস্তা' আকোস্তার বক্তব্য জিডিপি যে হিসাব দেখায় তাতে কেবলই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিশ্বের তথা এ প্রকৃতির যা কিছু ভাণ্ডার তার সবটাতে পর্যাপ্ত। সেটা অনিঃশেষ নয়। তাহলে কীভাবে উন্নয়ন এবং আরো উন্নয়ন সম্ভবপর। তাছাড়া জিডিপির উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হয় তার ক্ষতিপূরণের হিসাবটা কোথায়। রিও সম্মেলনে আকোস্তা যে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে সেটাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। শিল্পক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো প্রসঙ্গে এ আকোস্তা জানাচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সবচেয়ে লক্ষ করা যায় তাদের জিডিপি বেশ ভাল মাত্রাতেই বাড়তে থাকে। কিন্তু সেটা বাড়াতে গিয়ে প্রাকৃতির ভারসাম্যের ওপর প্রতিনিয়ত যে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকে অদৌ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না।

সুতরাং অপরিমিত বাড়াবাড়ি ধরণের অর্থনীতির নয়, চাই এমন অর্থনীতির বৃদ্ধি যা ঘটবে ধীরে ধীরে। অপরিমিত বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের যে যথেষ্ট ক্ষতি হবে, সেই অসুস্থ প্রবণতাটাকেই বন্ধ করতে চাইছে আকোস্তা। রিও সম্মেলনে তারা তাই সোচ্চার। জিডিপির ব্যাপক বৃদ্ধি নয়। চাই ধীরে কিন্তু সামগ্রিক প্রগতিশীল বৃদ্ধি।

১৪.২৫ রিও পরিবেশ সম্মেলন এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা

এ ধরণের বিপরীতমুখী পরিবেশগত বাস্তবতাই আমাদের টেকসই উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধক। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আর্থ-সামিটে সিঙ্গাপুরের পরিবেশ ও পানিসম্পদ মন্ত্রী ড. বিভিয়ান বালাকৃষ্ণান সিঙ্গাপুর সিটিকে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ, পরিবেশবান্ধব ও সবুজ শহর হিসেবে তুলে ধরেন। আমাদের নগরবিদ ও বিশেষজ্ঞরা গত ৫০ বছর ধরে ঢাকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড়বড় মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে চলেছেন। বিশ্ব ফোরামে ঢাকা নগরীর চলমান সমস্যাগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারলে আমাদের জন্য লাগসই, টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার বিকল্প প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের প্রস্তাব আকর্ষণ করা অসম্ভব নয়।

রিও সম্মেলনে প্যারিস, মেলবোর্ন, লাগোস, টোকিও, রিও ডি জেনিরো বিশ্বের এ ৫টি মেগাসিটিকে জলবায়ুর পরিবর্তনে হুমকির সম্মুখীন বলে আখ্যায়িত করা হলেও আরো মারাত্মক দূষণ ও পরিবেশগত হুমকির শিকার ঢাকা নগরী কোনো আলোচনায়ই আসছে না, এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। জুনের ১৮-১৯, ২০১২ তারিখে মেক্সিকোর লস কাবোসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জি-টুয়েন্টি বা বিশ্বের ২০টি ধনী দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার সম্মেলন। ঠিক একই সময়ে জাতিসংঘের আয়োজনে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত হলো জাতিসংঘের সদস্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত ৩ দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ধনীদেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় জি-এইট, জি-টুয়েন্টিসহ ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রতিবছর একাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও সকল দেশের সমন্বিত উন্নয়ন ও ধরিত্রির স্বার্থরক্ষায় ধনী দেশগুলোর কোনো আগ্রহ না থাকায় আর্থ-সামিটের আয়োজন খুব কম দেখা যায়। ব্রাজিলের রিওজি জেনিরোতে ১৯৯২ সালের জুন মাসে সাড়ম্বরে প্রথম আর্থ সামিট অনুষ্ঠিত হওয়ার ১০ বছর পর ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনের শিরোনাম ছিল 'রিও+টেন'। আর এবার রিও সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১২ সালের ধরিত্রি সম্মেলনের শিরোনাম ছিল 'রিও+টুয়েন্টি'। এ মুহূর্তে বিশ্বে যত সমস্যা সংকট ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সম্ভবত তার শতকরা ৯০ ভাগই বিশ্বের দেশগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ, জ্বালানি সংকট ও টেকসই নাগরিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ঘিরে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ভূগোল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাস করলেও বিশ্বের সকল মানুষ একই ধরিত্রীর সন্তান। নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সক্ষম দেশগুলো রাজনৈতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিলেও, সমুদ্রসীমায় ফ্রিগেট এবং আকাশ প্রতিরক্ষায় বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেও একই নদী, একই আকাশ, একই সমুদ্র, একই জলবায়ুর অংশিদারিত্বের সীমারেখা নির্ধারণ করা অসম্ভব। এ কারণেই ক্লাইমেট চেঞ্জ বা কার্বন দূষণের ফলে বিশ্বের উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোবাবেলায় বিশ্বের

দেশগুলো এখন সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ধরিত্রীর আকাশে প্রতিদিন হাজার হাজার টন কার্বনসহ নানাবিধ টক্সিন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার জন্য মূলত ধনী দেশগুলো দায়ী হলেও জলবায়ুর পরিবর্তনে বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপের মতো দরিদ্র দেশগুলো সর্বাগ্রে ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। রিও সম্মেলনের ঘোষনা ও তা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন না থাকলেও 'ক্লাইমেট চেঞ্জ' ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরো কয়েকটি হাই-প্রোফাইল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। যদিও এসব সম্মেলনের লক্ষ্য, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ধনী দেশগুলোর অনীহা এসব সম্মেলনের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ওলাঁদ বা জার্মান চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেলের মতো শিল্পোন্নত দেশের নেতারা রিও +২০ বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণের চেয়ে কাবোসের জি-২০ সম্মেলন অথবা নিজদেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে লিপ্ত থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তথাপি জুন ২০১২, এর ১৯ থেকে ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এবারের রিও সম্মেলন ছিল অতীতে যে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চেয়ে বড় বিশ্ব সম্মেলন। বিশ্বের ১৮৮টি দেশ থেকে ৪৫, ৩৮১ জন প্রতিনিধি রিও+২০ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্তত ১০০টি দেশের রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধান ছাড়াও ১২ হাজার সরকারি প্রতিনিধি, প্রায় ১০ হাজার এনজিও প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পরিবেশ, মানবাধিকারকর্মী ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি এবং চার হাজারের বেশি সংবাদকর্মী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ এবং নানা মতের সম্মিলনের কারণে সম্মেলন শেষে এর ফলাফল ও বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে মতভেদ দেখা দিলেও টেকসই উন্নয়ন ও দীর্ঘস্থায়ী জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে সম্মেলনে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা লাখ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ সম্পদের যোগান দিতে ৭০০টি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে বিশ্বের দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে। তিনদিনের সম্মেলন শেষে 'দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট' শিরোনামের ৫৩ পৃষ্ঠার দীর্ঘ রিও+২০ ঘোষণা পাস করা হয়। দীর্ঘ ঘোষণাপত্রের সর্বত্র বার বার অতীতের আর্থ-সামিটগুলোতে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলোই পুনর্ব্যক্ত হতে দেখা গেছে। বিগত বিশ বছরে বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনে গৃহীত ইনিশিয়েটিভসগুলোর বাস্তবায়নে ধীরগতি সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও ইন্টিভিউদের ক্ষুব্ধ করেছে। বেসরকারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্বদানকারী সংস্থা গ্রিনপিস'র নির্বাহী পরিচালক কুমি নাইডু বিক্ষুব্ধ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্বের সকল দেশের নিরাশ লোকদের সংক্ষোভকে সৃজনশীল ও অর্থবহ চিন্তা ও কর্মে পরিণত করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন, সকলের জন্য পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণের জন্য প্রতিশ্রুতি সর্বমোট ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ফান্ড সংগ্রহের পাশাপাশি কার্যকর ভূমিকা পালনে মার্কিন সরকারের সাথে সেখানকার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোও একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওয়াল-মার্ট, কোকাকোলা, ইউনিলিভারসহ প্রায় ৪০০ বহুজাতিক কোম্পানি ২০২০ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে ঐকমত্য গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনগুলোতে হাজার হাজার কোটি ডলারের উদ্ধার তহবিল গঠন এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো এখনো এসব তহবিলের কোনো সহায়তার নাগাল পাচ্ছে না।

রিও +২০ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি বিশাল অর্থনৈতিক তহবিলের পাওনাদার দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানসহ সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। তবে এ ধরণের সম্মেলনের বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, তাদের অবস্থান ও যথাযথভাবে দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। কোনো কোনো সরকার প্রধান দায় এড়ানোর জন্য অথবা জি-২০ সম্মেলনে ব্যস্ত থাকায় রিও সম্মেলনে সরাসরি অংশগ্রণ করতে না পারলেও তারা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্মেলনে বিতর্কে অংশ নিতে ভুল করেন নি। সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠানমালায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনসহ বিশ্ব

নেতারা তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপট নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে রিও কনভেনশন সেন্টারের বিভিন্ন ভেন্যুতে হাজার হাজার পরিবেশবাদী, মানবাধিকারকর্মী, নানা স্তরের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ১০ দিনে শত শত সাইড-ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। বিকল্প জ্বালানি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, সড়ক-মহাসড়কের নিরাপত্তা, শিশুশিক্ষা, চারকোল দিয়ে ফলমূল ও শাক-সবজি সংরক্ষণের প্রযুক্তির মতো অসংখ্য বৈচিত্রময় বিষয় নিয়ে সেশন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নানাভাবে, নানা আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাগুলো সেখানে নিজেদের উদ্ভাবন ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সুযোগ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সম্মেলনের পূর্বে এ লক্ষ্যে তাদেরকে যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছে। অথচ এ ধরণের সম্মেলনে সংগৃহীত তহবিল, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার দাবিদার দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে নি। বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গতিপূর্ণ হাই-প্রোফাইল ধরিত্রী সম্মেলনে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কারো যাওয়া দরকার ছিল। রিও+২০ সামিটে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের বক্তব্য ও ভূমিকা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তেমন গুরুত্ব পায় নি। এমনকি দেশীয় মিডিয়ায়ও এ বিষয়ে চোখে পড়ার মতো কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড, ব্রাজিলের প্রধানমন্ত্রী দিলমা রোসেফের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন প্রশ্নে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের যৌক্তিক ও জোরালো দাবি তুলে ধরলে তা দেশের জন্য ইতিবাচক হতে পারতো।

রিও সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন তার বক্তৃতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কল্যাণের জন্য দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। একটি সাইড ইভেন্ট আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক এবং গ্লোবাল ম্যাকানিজম নামের একটি সংস্থা টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জমির বিকল্প অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে গ্রিন ইকোনমির নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করে। বাংলাদেশসহ উপ-মহাদেশের বাস্তবতায় এ ধরণের প্রস্তাব অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল, কিন্তু আমাদের দেশীয় বা আঞ্চলিক ফোরামগুলো তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারছে না। ওপরন্তু আমাদের যৌথ নদীগুলো ভারতের আঞ্চলিক শক্তির একতরফা নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের পথে এগুলো আমাদের জন্য মৌলিক ভিত্তি ও স্বার্থ। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেছে, শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নানা ইস্যুতে বাংলাদেশকে অবশ্যই এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরাম ব্যবহার করে ভারতের ওপর চাপ বৃদ্ধিও অব্যাহত রাখতে হবে। মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক আদালতের দারস্থ হয়ে তার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। নদী, পানিসম্পদ ও

দেশের নাম	গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমণের পরিবর্তন লক্ষ্যমাত্রা(২০১২ সালের মধ্যে)	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন (২০০৮-২০১২)
জার্মানি	-১৭%	-১২%	-৮%
কানাডা	+২৭%	তথ্য পাওয়া যায় নি	৬%
অস্ট্রেলিয়া	+২৫%	তথ্য পাওয়া যায় নি	-৬%
স্পেন	+৪৯%	+১৫	-৮%
যুক্তরাষ্ট্র	+১৬%	তথ্য পাওয়া যায় নি	-৭%
নরওয়ে	+১০%	তথ্য পাওয়া যায় নি	+১%
জাপান	+৬.৫%	তথ্য পাওয়া যায় নি	-৬%
যুক্তরাজ্য	-১৪%	-১২.৫%	-৮%
ইইউ	-১৫	-০.৮%	-৮%
চীন	+৪৭%	-	-
ভারত	+৫৫%	-	-

http://thejobstudy.com Go to Contents

প্রাকৃতিক পরিবেশ যেকোনো দেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তি ও মৌলিক সম্পদ। দুর্বল দেশগুলো নিজেদের এসব সম্পদ, এমনকি নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ রক্ষায়ও ব্যর্থ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রিও-সম্মেলনের মতো বিশ্বফোরামগুলো কার্যকর উদ্যোগ বা প্রস্তাব রাখতে পারে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো সামরিক নিরাপত্তা নিয়ে যতটা তৎপরতা চালায় টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে তার ১০ ভাগের একভাগ গুরুত্ব দিতেও যেন তাদের অনীহা । বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ে পশ্চিমাদের প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা প্রায় ৭ দশক ধরে অব্যাহত থাকলেও রিও-সম্মেলনকে ভিত্তি ধরা হলে জলবায়ু ও পরিবেশ নিয়ে দুর্বল ও অপর্যাপ্ত আয়োজন মাত্র ২ দশকের। অবশ্য ১৯৯২ সালের রিও-সম্মেলনের ২ দশক আগে ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে জাতিসংঘ প্রথম 'কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট'র আয়োজন করা হয়। অথচ ১৯৯২ সালের রিও-সম্মেলনকেই প্রথম আর্থ-সামিট হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করার পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এবারের রিও-সম্মেলনেও বলিভীয় প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসসহ ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বামপন্থী নেতাদের মুখে এ ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

১৪.২৬ সাম্প্রতিক ২০১২ টেকসই উন্নয়নে বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

ব্রাজিলের রিও নগরীতে ২২ জুন, ২০১২ রাতে শতাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন রিও +২০ রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। বিশ বছর আগে আটলান্টিক মহাসাগরের কোলঘেঁষে সৈকত নগরী রিওতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ধরিত্রী সম্মেলনে যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার করেছিল মূলত এবার তারই পুনঃঘোষণা দিলেন ১৯৫টি দেশের প্রতিনিধিরা। সম্মেলন সভানেত্রী ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট দিলমা রউসেফ অনেক দেনদরবার আর কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ শেষে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে গ্রহণ করলেন সম্মেলন দলিল 'যে ভবিষ্যৎ আমরা চাই' । প্রেসিডেন্ট দিলমা ভাষায় এ দলিল 'সূচনা বিন্দু' 'সিলিং বা চূড়া' নয়।

১৯৯৯ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রিও ঘোষণা গ্রহণ করেছিলেন অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে। জাতিসংঘ জলবায়ু সনদ, প্রাণী বৈচিত্র্য সনদ ও মরুময়তা রোধ সনদ ত্রয়ী স্বাক্ষর করেছিলেন স্বাচ্ছন্দচিত্তে।

সম্মেলনের ব্যর্থতা

কিন্তু এবার সেই রিও নগরীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন আর জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন নি। অর্থনৈতিক মন্দার দোহাই দিয়ে তাই রিও +২০ সম্মেলনের রাজনৈতিক দলিল কিছুটা ফাঁকা। টেকসই উন্নয়নের পথে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশেষত স্বল্পোন্নত ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর জন্য অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রশ্নে বড় রকমের কোনো সাহসী সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ ও জোরালো অঙ্গীকার নেই। অর্থকড়ির ব্যাপারে বরং নেয়া হয়েছে ধীরে চলো নীতি।

করণীয়

অথচ পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিপুল বিনিয়োগ। নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানির জন্য প্রয়োজন অঢেল অর্থের। দারিদ্র্য বিমোচন, মানব উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বড় রকমের বিশ্ব বিনিয়োগের । দারিদ্র্য খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য ও জীবিকার নিরাপত্তায় প্রয়োজন আশু বিনিয়োগ । রিও +২০ সম্মেলনে এ ব্যাপারে কোনো জোরালো অঙ্গীকার আসে নি। তবে টেকসই উন্নয়ন ও সবুজ অর্থনীতির জন্য বিশ্বজুড়ে কত অর্থের প্রয়োজন, কীভাবে তা সংগ্রহ করা যায় সে ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে দেয়া হয়েছে। এজন্য একটি আন্তঃসরকার প্রক্রিয়া শিগগির চালু হবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। সে বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছেন রিও +২০ সম্মেলনে। ধনী দেশগুলোর জিএনপির শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে (ওডিএ)

দেয়ার পূর্ব অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ থেকে শূন্য দশমিক ২০ শতাংশ বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে দ্রুত দেয়ার জন্য ধনী দেশগুলোকে চটজলদি পদক্ষেপ নিতে বলেছে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা। দিন-রাত লাগাতার দেনদরবার করে রিওতে অবশেষে ১৯৫ দেশের দর কষাকষিকারীরা একমত হন উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম গঠনের ব্যাপারে। টেকসই উন্নয়নে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ বিশ্ব ফোরাম কাজ করবে। ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়ন কমিশনের দায়িত্বভারও উচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক ফোরামের ওপর বর্তাবে।

১৪.২৬ সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো

২০১২ সালে ১৭ জুনের সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব নিল ব্রাজিল। সম্মেলন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ। দিন-রাত কাজ করে নতুন একটি খসড়া ব্রাজিল উপস্থাপন করল। চারটি বিষয়ের ওপর দর কষাকষি শুরু হলো। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো, সবুজ অর্থনীতি, বাস্তাবায়ন আর নীতি-কৌশল নিয়ে।

ব্রাজিল নতুন খসড়া উপস্থাপন করল। আফ্রিকা ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া অসন্তোষ জানাল। অবশেষে ২০১২ সালে ১৭ জুনের ভোররাতে সমঝোতা হলো। ঐ দিন বিকেলে গৃহীত হলো নতুন খসড়া। নেপালের দুর্বল নেতৃত্বের কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বেশ কিছু স্বার্থহানি হলো। নিউইয়র্ক প্রস্তুতি বৈঠকগুলোতে আমাদের আরো সোচ্চার থাকা প্রয়োজন ছিল। তবে সমঝোতা হলো রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও নীতি-কৌশল নিয়ে। সবার দায় আছে তবে কারো কারো দায় অনেক বেশি-এ নীতি আর সমতা নীতি রাজনৈতিক দলিলে স্থান পেল। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নির্ধারণে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে দায়িত্ব দেয়া হলো। সবুজ অর্থনীতির বিষয়ে সমঝোতা হলো। উন্নয়নশীল বিশেষত স্বল্পোন্নত ও দ্বীপরাষ্ট্রের সবুজ উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ে তাগিদ দেয়া হলো। ২০ জুন ২০১২ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা বসলেন শীর্ষ সম্মেলনে। ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট দিলমা রউসেফ আর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ভাষণ দিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য একরাশ আশার বানী ও বড় বড় পরিকল্পনা পত্র পূর্বের ন্যায় শোনা গেল। লাভের মধ্যে শুধু একটুকু পাওয়া গেল যে, যে সকল দেশ বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী তাদের দ্বায় স্বীকার এবং জলবায়ু উন্নয়নে তার ব্যাপক সহযোগিতার অঙ্গীকার। আগামী দিনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পথ চলার পথে ক্ষতিকারী দেশগুলো থেকে কতটুকু বা কীভাবে সাহায্য পাবে তার ধারণা এখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো খুব দ্রুতই যে তাদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে তা নয়। অপর দিকে ক্ষতিকারক উন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় রাখতে শিল্পায়ন থেকে সরে আসবে না বরং শিল্পায়ন আরো বৃদ্ধি পাবে ফলে তাদের কাছ থেকে খুব দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকারী ব্যবস্থা অপসারণে আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় আলোচনায় যে বিষয়টি ওঠে এসেছে তা হলো সবুজ অর্থনীতি। অর্থাৎ পরিবেশ ও জলবায়ুকে বাঁচিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এতে করে উন্নয়নশীল দেশগুলোও যেমন তাদের উন্নয়নের চাকা গতিশীল রাখতে পারবে। তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র রাষ্ট্র আরো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। এভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার পরে দূষণমুক্ত সবুজ ও নির্মল বাতাসে পূর্ণ ধরিত্রী উপহার দিতে।

১৪.২৬.১ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো

অনেক দৌড়ঝাঁপের পরও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো চিহ্নিত ও নির্ধারণে রিও +২০ সম্মেলনে স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি। তবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে দ্রুত পদক্ষেপ ও অর্থায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। তারা ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো কী কী হবে এবং কীভাবে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে সেজন্য ৩০ সদস্যের খোলা কার্যকরি দল (ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ) গঠনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। দায়িত্ব দিয়েছেন সাধারণ পরিষদকে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো নির্ধারণের জন্য যেন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জন মার না খায় সে ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্যও রিও +২০ সম্মেলনে শীর্ষ নেতারা জোর দিয়েছেন। বলেছেন, দেশে দেশে টেকসই উন্নয়ন সব উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারায় আনতে হলে এর লক্ষ্যগুলো কাজে লাগবে। বাস্তবায়ন জোরদার করতেও এগুলো কাজে আসবে।

১৪.২৭ কিয়োটো প্রটোকল (Kyoto Protocol)

সাধারণ অর্থে কিয়োটো প্রটোকল জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) সংক্রান্ত একটি বহুপাকি চুক্তি। তিকর কার্বন ডাই- অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণ কমারো জন্য স্বারিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকরহ য়। নভেম্বেও ২০০৯ পর্যন্ত বিশ্বেও ১৮৭ টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ উক্ত প্রটোকল অনসমর্থন (জবপগ্ররভরবফ) করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩৭ টি উন্নয়নশীল দেশ। কাজাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রটোকল অনুসমর্থন করেও নি। চীন এবং ভারত গ্রিন হাউস নির্গমনে অন্যতম শীর্ষে থাকলেও তাদেরও ক্ষেত্রে নির্গমন মাত্রা প্রযোজ্য নয়।

১. **প্রটোকলের সংজ্ঞা (Definition of Kyoto) :** জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি UNEP প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

"কিয়োটো প্রটোকল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার অধীনে শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদেও সম্মিলিত গ্রিনহাউস গ্যাস নিগমন কমপক্ষে ৫ শতাংশ হ্রাস করবে। ২০১২ সালের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার হেক্সোফোরাইড, এইচএফসি এবং সিএফসি - এই ৬ টি গ্রিনহাইস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করবে। জাতীয় পর্যায়ে এই হ্রাসকরণ হার-

ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ৮ শতাংশ ;

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৭ শতাংশ ;

জাপানের জন্য ৬ শতাংশ ;

এবং রাশিয়ার জন্য ৩ শতাংশ।"

১৪.২৭.১ কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি (Main Principles of Kyoto protocol) : জাতিসংঘের Framework Comention of Climate Change UNFCCC এর অধীনস্থ কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি ৬ টি। যথাঃ

১. কিয়োটো প্রটোকল সরকার কর্তৃক লিখিত এবং জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে।

২. স্বারকৃত রাষ্ট্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ
ক. শিল্পোন্ন দেশসমূহ যাদের গ্যাস নির্গমন হ"াস বাধ্যতামূলক: এবং
খ. শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহ যাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাধ্যতামূলক নয়।

৩. যে সকল শিল্পোন্নত দেশ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকল কত"ক নির্ধারিত গ্যাস নির্গমন হ্রাসের মাত্রা অতিক্রম করেত ব্যর্থ হয় , তাহলে শাস্তি হিসেবে পরবর্তী টার্গেটে তাকে ৩০ % গ্যাস নির্গমন হ"াস করতে হবে।

৪. সকল শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সংশ্লিষ্ট দেশের ১৯৯০ সালের গ্রঅস নির্গমনের মাত্রার চেয়ে ৫ শতাংশ কমাতে হবে।

৫. কিয়োটো প্রটোকল Flexible Mechanism অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধমে শিল্পোন্নত দেশ গ্যাস নির্গমন কমাতে না পারলে তার পরিবর্তে উচ্চ মূল্যেও নির্ধারিত আর্থিক তিপূরণ অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলোকে প্রদান করবে।

৬. কিয়োটো প্রটোকলের মাধ্যমে জার্মানির বনভিত্তিক Clean Development Mechanism - CDM Project - প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্তপ আর্থিক তিপূরণের মাত্রা নির্ধারণ করেব এবং CDM Project - এর আতৈায় যথাযোগ্য অনগ্রসর রাষ্ট্রকে তিপূরণর অর্থ সহায়তা প্রদান করবে।

১৪.২৭.২ কিয়োটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যে (Objectives of Kyoto) :

কিয়োটো প্রটোকলের শূল উদ্দশ্য হলো বিরাপী গ্রিনহাউস গ্র্যাস নির্গমনের মাত্রা সহনমীল রাখা করণ, জরবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা যে হাওে বেড়ে চলেছে। তা প্রথিবীকে এক সময় ধংস করে দিতে পারে। Inter - governmental Panel on Climate change- 9 (IPCC) নামক সংস্তার প্রতিবেদন মোতাবেক ২১০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে প"থিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা ৫-৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকরের বিধান মেনে চললে ২০৫০ সাল নাগাদ প্রথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ০.০২ ডিগ্রী থেকে ০.২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

১৪.২৭.৩ কিয়োটো প্রটোকলের ভূমিক

কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৭ : ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর জাপানের প্রধান শহর কিয়োটোতে । পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রতিরোধ বিষয়ক এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৬০টি দেশের শীর্ষ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো CO_2 নিঃসরণের মাত্রা ৭ শতাংশ হ্রাস করতে এবং ২০১০ সাল নাগাদ CFC নিঃসরণ ১৯৯০ সালের পর্যায় রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ঐকমত্য হয়। তাছাড়া সার্বিকভাবে ৫.২ শতাংশ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এছাড়া অপর ২১টি শিল্পোন্নত দেশও অনুরূপ বিধিবদ্ধ মাত্রা অর্জন করবে এমন সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ৩ বছর পর ২০০১ সালের ২৯ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় দেশ এ চুক্তিটি প্রত্যাখান করায় এ চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে।

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর অধীনে ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশেন সম্পন্ন হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কাবন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগিরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে কার্যকর হয়েছে। নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বিশ্বের ১৯০টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থন Ratified করেন। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়েছে। এ প্রটোকলের আওতায় বিশ্বের ৩৬ দেশকে গ্রিন হাউজ গ্যাসের মাত্রা ১৯৯০ সালের চেয়ে নিচে নামাতে হবে। কাজাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এ কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয় নি। কিয়োটো প্রটোকল বনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘের আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল আইপিসিসি তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে। আইপিসিসি এর মতে, ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১৮ সেন্টিমিটার হতে ৫৯ সেন্টিমিটারে উন্নীত হবে। Institute for Water Modelling এর গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়লে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ৮৪ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)

১. **বিগত ১০০ বছরে সমুদ্রে পৃষ্ঠের উচ্চতা কতটুকু বেড়েছে?**
উত্তর: বিগত ১০০ বছরে সমুদ্রে পৃষ্টের উচ্চতা ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বেড়েছে।

২. **CFC এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: Chloro-Flore-Carbon

৩. **জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সপ্তম লক্ষ্য কী ছিল?**
উত্তর: জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সপ্তম লক্ষ্যে ছিল 'টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ'।

৪. **১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়েটো প্রটোকল অনসমর্থিত হলেও কোন দুটি দেশ দ্বারা প্রটোকল অনসমর্থিত হয় নি?**
উত্তর: ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়েটো প্রটোকল অনসমর্থিত কাজাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত হয় নি।

৫. **টেকসই উন্নয়ন কী?**
উত্তর: টেকসই উন্নয়ন কথাটি পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি আধুনিক ধারণা। মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষা অব্যাহত রাখাকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

৬. **IPCC কী?**
উত্তর: IPCC এর পূর্ণরূপ Intergovernment Panel on Climate Change বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল।

৭. **পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন?**
উত্তর: বায়ুমন্ডলে গ্রীণহাউজ গ্যাস পুঞ্জিভবনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তণ হচ্ছে বলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. টেকসই উন্নয়ন কিসের উপর নির্ভর করে?
উত্তর: টেকসই উন্নয়ণ নির্ভন করে সম্পদের ভিত্তি, টেকসই ভোগের স্তর এবং টেকসই উৎপাদনের উপর।

৯. বাংলাদেশে পানির উৎস কয়টি ও কী কী?
উত্তর: পানির উৎস তিনটি। যথা-
(ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি;
(খ) ভূ-নিম্নস্থ পানি;
(গ) বৃষ্টির পানি।

১০. COP এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Conference of the Parties

১১. BCCAP কী?
উত্তর: Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan

১২. CDM কী?
উত্তর: Clean Development Mechanism\

১৩. SADKN এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: South Asian Disaster Knowledge Network.

১৪. BDKN এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর:Bangladesh Disaster Knowoledge Network.

১৫. CASE এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Clean Air Sustainable Environment.

১৬. গ্রিণ হাউজ ইফেক্ট এর পরিণতি কী?
উত্তর: তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

১৭ জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমন্ডলে কোন গ্রিণ হাউজ গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে?
উত্তর: CO2

১৮ বাসেল কনভেনশনের পুরো নাম কী?
উত্তর : Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

১৯ জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত রূপরেখা কনভেশন কী?
উত্তর: বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোকাবিলায় জাতিসংঘ কনভেনশন।

২০ কিয়োটো প্রটোকল কী?
উত্তর ভূমন্ডলের তাপবৃদ্ধি ও আবহাওয়া মন্ডলের পরিবর্তন রোধ বিষয়ক প্রটোকল।

২১ কিয়োটো প্রটোকল কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
উত্তর : ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ কিয়োটো, জাপান (কার্যকর হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)।

২২. কিয়োটো প্রটোকলের পুরো নাম কী?
উত্তর: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

২৩. কার্টাগেনা প্রটোকল কী?
উত্তর : জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার করা পরিমার্জিত প্রাণের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রটোকল। অর্থাৎ জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল।

২৪. কার্টাগেনা প্রটোকল কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
উত্তর :২৯ জানুয়ারি ২০০০; মন্ট্রিল, কানাডা (কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩)।

২৫. কার্টাগেনা প্রটোকলের পুরো নাম কী?
উত্তর : Cartagena Protocol on Biosafety tothe Conventon on Biological Diverity

২৬. এজেন্ডা ২১ কী?
উত্তর : ১৯৯২ সালে ব্রাজিল রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত একটি দলিল।

২৭. গ্রিণ পিস কী?
উত্তর : পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ।

২৮. গাড়ি থেকে নির্গম কালো ধোঁয়ায় যে বিষাক্ত গ্যাস থাকে তা কী?
উত্তর : কার্বন মনোক্সাইড

২৯. জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন কী?
উত্তর : জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষন, এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার বিরুদ্ধ কনভেনশন।

৩০. জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেশন হবে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ৫ জন ১৯৯২; রিওডি জেনেরিও, ব্রাজিল (কার্যকর হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩)।

৩১. মন্ট্রিল প্রটোকল কী?
উত্তর : বায়ুমন্ডলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষা বিষয়ক প্রটোকল।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) 'গ্রিণ হাউস ইফেক্ট' বলতে কী বোঝায়?
(খ)'গ্রিণ হাউস প্রভাব' কথাটা প্রথম কে, কখন ব্যবহার করেন?

২. (ক) এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাসটির নাম কী?
(খ)হাইড্রোজেন সালফাইড

৩. (ক) ওজোন স্তরের রং কী?
(খ) ওজোনের রং কী?

৪. (ক) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা কত?
(খ)পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সমন্ধীয় বিদ্যাকে কী বলে?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করছে? জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্ব পরিবেশকে কীভাবে হুমকির সম্মুখীন করছে?

২. পরিবেশ দূষনের কারণসমূহ এবং বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর এর প্রভাব আলোচনা করুন।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে জীববৈচিত্রকে হুমকির মুখে ফেলেছে? বাংলাদেশে এর কী প্রভাব পড়তে পারে?

৪. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলন ও আইন কানুন উল্লেখ কর? বাংলাদেশে গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী কী?

৫. দূষণ সৃষ্টিতে বিশ্ব পরাশক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন। বিশ্ব পরাশক্তি ও বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন দূষণমুক্ত বিশ্ব গড়তে কতটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

৬. পরিবেশ সংরক্ষণে রিও +২০ সম্মেলনের আলোকে বিশ্ব ভাবনা আলোচনা করুন।

৭. পরিবেশ কী? বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনসমূহ (কিয়েটো, কোপেনহেগেন ও কানকুন সম্মেলন) বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায়, যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। কানকুন সম্মেলনের সফলতা ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন ?

৮. কিয়াটো প্রটোকল কোথায় গৃহীত হয়? এর মেয়াদ কখন শেষ হবে ?

৯. গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বলিতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

১০. বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলোর মোকাবেলার জন্য কী কী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

১১. বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৫

সাজেশন : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

● আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয়রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। সে কারণেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

পামার এবং পারকিনস্ এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্ব সমাজের সকল মানুষ ও গোষ্ঠীর সকল সম্পর্ক, মানুষের জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, চাপ এবং প্রক্রিয়া আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় রাজনৈতিক এবং অ-রাজনৈতিক বিষয় যুক্ত থাকে। কে.জে.হলসটি-র মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে সাধারণভাবে নিয়মিত প্রক্রিয়া অনুসারে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রসমষ্টি নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনাকেই বোঝায়।

● আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী;
২. বিশে-ষণের কাঠামো সম্পর্কে মতৈক্য;
৩. আন্তর্জাতিক আচরণের বিশে-ষণের জন্য চমকপ্রদ ধারণা প্রয়োগ;
৪. স্বকীয় ভাষা;
৫. প্রাথমিক বিশে-ষণলব্ধ ফলাফলের পুনঃপরীার জন্য উন্নত মানের বিশে-ষণাত্মক পদ্ধতি; গবেষণা এবং
৬. তার ফলাফলের তালিকা প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং তার সরবরাহের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা।

● আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়গুলো কি কি?

উত্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়গুলো হলো:

১. আন্তর্জাতিক আইন
২. কূটনীতির ইতিহাস
৩. বিজ্ঞান বা যুদ্ধের কলাকৌশল
৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতি
৫. সংগঠন
৬. বাণিজ্য
৭. উপনিবেশিক সরকার এবং
৮. পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন

● আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

উত্তর: সাধারণত আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দুটোকে প্রায় করা হয়। কোন কোন লেখক রাজনীতি শব্দটাকে পছন্দ করেন। কেউ কে বা ব্যবহারের পপাতী। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মধ্যে করতে গিয়ে অনেক লেখক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। অনেকে অবশ্য ভিন্নমত আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে বিষয় দু'টির বিষয়বস্তুগত পার্থক্য সম্পর্কে প্রথমে ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পরিপ্রেতিতে বিষয় দু'টির মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বুঝায়। আন্তর্জাতিক ভালো মন্দ উভয়েই হতে পারে। আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক সহযোগিতা ও সংঘর্ষে গঠিত। এর মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তি উভয়ই বিদ্যমান। বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সীমানা অনেক বেশি ও ব্যাপক। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বিশে-ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

http://thejobstudy.com Go to Contents

ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

● আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল্য ল্য। অপরদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করাই হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ল্য।

২. আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। এর পরিধিও তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এর পরিধি ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক।

৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি। এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধিক মাত্রায় রাজনৈতিক, কেননা এটা সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতিত হলো বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে সংশি-ষ্ট বিষয়। অণ্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, আইন, অর্থনীতি, যোগাযোগ ও বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তার এলাকা গড়ে তোলে।

৫. আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরোভাবে নীতি নির্ধারন করে থাকে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রত্যভাবে নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

৬. আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্মের উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব সমস্যার সমাধান করা। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রত্যভাবে নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

৭. আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্বরাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য নীতি প্রণয়ন করে। এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আলোচনা করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানবকল্যাণের কথা চিন্তা করে সর্বদা নীতি প্রণয়ন করে এবং এটা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

● জাতীয়তাবাদের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর: জাতীয়তাবাদের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য গুলো হল:

১. ভৌগোলিক ঐক্য;
২. রাষ্ট্রীয় ঐক্য
৩. ধর্মীয় ঐক্য;
৪. উদ্ভবগত বা বংশগত ঐক্য
৫. ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য
৬. অর্থনৈতিক ঐক্য
৭. দ্বন্দ্ব কলহের মধ্যে থেকে ঐক্য
৮. ভাবগত ঐক্য;
৯. আচার ব্যবহারগত ঐক্য
১০. জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতি
১১. যোগাযোগ সার্মথ্যতা ও
১২. জাতীয় প্রতীকসমূহ।

● বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ সমূহ কি কি?

উত্তর: বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফি"কায় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণগুলো হলো:

১. স্বাধীনতার আকাঙ্খা
২. ধর্মগত ঐক্য
৩. জাতীয়তাবাদী নেতার নেতৃত্বের প্রভাব
৪. অর্থনৈতিক ঐক্য ;
৫. ভৌগোলিক সান্নিধ্য
৬. ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য এবং
৭. ভাষাগত ঐক্য

● সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: সাম্রাজ্যবাদ হল সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা। অপর রাজ্য গ্রাস করে বা রাজ্য জয় করে, সেই অঞ্চলের মানুষকে জোর করে বিদেশী শাসনাধীনে আনা এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করাই হল সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ অর্থ বিদেশী শাসন ও শোষণ কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে আগ্রাসন বিঘান করলে তাকে সাম্রাজবাদীর বলে আখ্যা দেয়া হয় সাম্রাজ্যবাদ কোনো নতুন ধরাণা নয়। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা তারও পূর্বে ম্যাসিডনিয়ান সাম্রাজ্য প্রাচীনতম সাম্রাজ্যের উদাহরণ। রোমান সাম্রাজ্যের শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ বলতে সাম্রাজবাদের একটা

রূপকেই বোঝায়, যার উদ্ভব ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ঐ সময় ভাষায় ইম্পিরিলিজম শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়ে আসছে।

● সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর: সাম্রাজ্যাদের বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক উদ্দেশ্য থাকে।
২. সাম্রাজ্যবাদের অপর বৈশিষ্ট্য হলো অন্য রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে আনা ক্ষুদ্র এলাকা জুড়ে হতে পারে, আবার বিরাট এলাকা জুড়েও হতে পারে। তবে অন্যের রাজ্য দখল অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লক্ষ্য।
৩. সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রাধান্য বিস্তার করে। একই জাতির মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার সম্ভব।
৪. সাম্রাজ্যবাদী কর্মকান্ড সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জন্য লাভ ও অ-লাভ উভয় বয়ে আনতে পারে।
৫. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ভূ-খন্ডে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে এটি ঐ ভূ-খন্ডবাসীদের জন্য মঙ্গলকর-অঙ্গলকর উভয় হতে পারে। তবে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বেশি দেখা যায়।
৬. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যে ভূ-খন্ডে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে এটি ঐ ভূ-খন্ডবাসীদের জন্য মঙ্গলকর-অমঙ্গলকর উভয়ই হতে পারে। তবে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বেশি দেখা যায়।

● সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ সমূহ কি কি?

উত্তর: সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণগুলো হল:

১. অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা: অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে কাজ করেছে অর্থণৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ। কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারে চাহিদা সাম্রাজ্যবাদের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এ বিষয়টি অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী কে বিরাট অংশ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ প্রসারে প্রত্য প্রেরণা যুগিয়েছিল।
২. জাতীয় গৌরব ও মর্যাদাবোধের প্রতীক: জাতীয় গৌরব ও মর্যাদাবোধের প্রতীক হিসেবেও সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের প্রবক্তাগণ বিশ্বে মর্যাদা লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করে। হিটলারের জার্মানি এবং মুসোলিনীর ইতালি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
৩. সভ্যতার উজ্জ্বল আদর্শসমূহ : সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজেদেরকে সভ্যতার ধারক ও বাহক মনে করে অনুন্নত দেশগুলোতে তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম করেছে।
৪. জাতীয় প্রতিরা স্বার্থ: জাতীয় প্রতিরার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এ উদেদশ্যে সাম্রাজ্যের প্রসার সুদূর অতীতকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ ও আগ্রাসন ও প্রক্রিয়াকে গতিবেগ দিয়েছে।
৫. নিজ দেশের উদ্বৃত্ত জনগণকে অন্যদেশে পুর্নবাসিত করার প্রচেষ্টা: জনগণকে অন্য দেশে পুর্নবাসিত করার প্রচেষ্টা থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে বলেও অনেকে ধারণা করেন। কিন্তু এটি সবসময় যথার্থ কারণ নাও হে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যার সমস্যা অংশকেই উপনিবেশে বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেছিল।

● উপনিবেশ উদ্ভবের কারণ কি?

উত্তর:মহাযুদ্ধের পরে নানাবিধ কারণে পুরনো ধরনের সাম্রাজ্যবাদের প্রায় অবসান ঘটে। আফ্রিকার বহুদেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন ও সার্বভৌম হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার পরেও পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এসব নতুন রাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং সে উদ্দেশ্যে নানাভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ রকম পরোভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখার ফলেই নয়া উনপিবেশবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ নতুন রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য নিতে এবং পুঁজি আমদানি করতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার সময় এমন সব শর্ত আরোপ করে থাকে যার ফলে সেসব দেশে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা যায়।

● নব্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উপায় বা হাতিয়ারগুলো কি কি?

উত্তর: নব্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উপায় বা হাতিয়ারগুলো হলঃ

১. মুৎসুদ্ধি সরকার প্রতিষ্ঠা
২. অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা
৩. সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্তকরণ
৪. সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ও
৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ

● বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: বিশ্বায়নের ধারণা উপলব্ধি করা খুব সহজ নয়। একে অভিহিত করা হয়েছে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। বিশ্বায়ন নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে উপর সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন। মার্শাল ম্যাকলোহান এর মতে, গে-াবাল ভিলেজ ধারণার পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে বিদ্যমান বা চলমান। সাধারণত বিশ্বায়ন বলতে আমরা বুঝি অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ, সীমানাবিহীন বিশ্বব্যবস্থা, সামাজিক , সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদারীকরণ অর্থাৎ এমন একটি পক্রিয়া যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিকীকরণ। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দশকে। এখন তা দ্রুত এগুচ্ছে, দেশে দেশে আমদানি শুল্ক কমছে। পণ্য আমদানিকে বাধাগ্রস্থ করে এমন নীতিগুলো আর থাকছে না। আমরা ক্রমেই এক বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত হচ্ছি। এতে অবশ্যই চমক আছে। তবে এতে শংকিত হবারও অনেক কারণ বিদ্যমান। কারণ এ প্রক্রিয়া গরিব দেশগুলোতে দারিদ্র্য বাড়াতে সাহায়তা করছে। আর অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে ঐ দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ।

● বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

উত্তর: বিশ্বায়নের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তার মধ্যে উলে-খযোগ্য হল:

১. তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি;
২. সাংস্কৃতিক সমতা;
৩. ভূখন্ডকেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সীমানা উন্মুক্তকরণ;
৪. বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ
৫. মুক্ত বাজার অর্থনীতি
৬. প্রত্য বিদেশী বিনিয়োগ
৭. আমদানি নিয়ন্ত্রনমুক্ত অবাধ বাণিজ্য
৮. বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অবাধ যাতায়াত
৯. এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজির অবাধ আদান প্রদান ও
১০. উৎপাদনের একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি।

● বিশ্বায়নের সুফলগুলো কি কি?

উত্তর: বিশ্বায়ন একটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া। জোসেফ স্টিগলিংজ এর মতে বিশ্বাস বলতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দেশ ও জনগণের মধ্যে নিবিড় সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের সুফলগুলি হল:

১. পণ্য ও মূলধনের বাজারে প্রসার
২. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি
৩. তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি
৪. ব্যাংক, বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্যের অকল্পনীয় বিস্তার ও
৫. বিভিন্নজাতি, গোষ্ঠী, জনজাতি ও এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

● বিশ্বায়নের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে?

উত্তর: বর্তমান বিশ্বায়ন বিকশিত হয় সোভিয়েত নেতা ও সংস্কারবাদী মিখাইল গর্বাচেভে পেরেস্ত্রৈকা ও গ-াসনস্ত নীতি থেকে। সেখানে গর্বাচেভ চেয়েছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থার পুনঃসংস্করণ উদারনীতি, নতুনভাবে বিশ্বচিন্তা, সকলের জন্য শান্তি, বৃহৎ শক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং স্নায়যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। গর্বাচেভের এ নীতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকিয়ে রাখা। যদিও তা সফল হয়নি, বরং হিতে বিপরীত হয়েছিল। পরবর্তীতে সিনিয়র জর্জ ডবি-উ বুশ বিশ্বায়ন

ধারণাটি বহু প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করে। তবে অবশ্যই তা ১৯৯০ সালের হেলসিংকি অধিবেশনের পরে।

● বিশ্বায়নের প্রভাবগুলো কি কি?

উত্তর: উন্মুক্ত বিশ্ববাণিজ্য প্রত্যেকটি দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্যান্য দেশের চেয়ে আরো বেশি উন্নত প্রস্তুত করতে এবং তা অন্যান্য দেশে বিক্রয় করতে। এভাবে গড়ে উঠেছে তুলনামূলক । এর ফলে যে প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হল:

১. দ্রব্যাদির প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দামেও সস্তা হয়েছে।
২. দ্রব্যাদির সুলভতা বৃদ্ধি করেছে মানুষের চাহিদা এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে।
৩. নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে।
৪. একীভূত অর্থায়ন ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছে।
৫. বিভিন্ন ধরনের মতবাদ জন্মলাভ করেছে।

● অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর: আসলে বিশ্বায়নের অর্থই হচ্ছে উচ্চতর পুজিবাদী বিশ্বায়ন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়ন হচ্ছে গোটা বিশ্বকে একটি একক বাজার হিসেবে ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে পুজির আধিপত্য এবং পুজিবাদী দেশগুলোর স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্যই স্বাক্ষরিত হয় গ্যাট চুক্তি, প্রতিষ্ঠা করা হয় WTO এর মত সংস্থা। ইতোমধ্যে এ ধরনের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার নেতিবাচক ফল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাবগুলো হল:

১. ধনী দরিদ্র বৈষম্য বৃদ্ধি;
২. বিশ্ব জুড়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি;
৩. বিশ্ব বাণিজ্যে ধনী দেশগুলোর একক প্রাধান্য;
৪. শুল্ক হ্রাস ও ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ;
৫. বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি
৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারী পুঁজি হুমকীর সম্মুখীন
৭. গরীব রাষ্ট্রগুলোর ধনী রাষ্ট্রগুলোর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ও
৮. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক ধনী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রা ইত্যাদি।

● বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব কিরূপ?

উত্তর: বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাবগুলো নিম্নরূপ:

১. মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন
২. অভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্তকরণ
৩. শুল্ক হ্রাস ও ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ
৪. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন
৫. পোষাক শিল্প প্রতিযোগিতার সম্মুখীন
৬. কৃষি উৎপাদন ও কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্পগুলো হুমকির সম্মুখীন
৭. নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
৮. আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী হ্রাস
৯. ধনী দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি
১০. অবাধ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
১১. সাংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব
১২. বেসরকারী খাতকে উৎপাদনসহ প্রদান ইত্যাদি

● নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : ১৯৭৪ সালের ৩০ এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬ষ্ঠ বিশেষ জোটনিরপে দেশসমূহের তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক আলজিরিয়া কর্তৃক ৭৭ জাতি গ্রুপের প থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে এ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থান ১৯৭৩-৭৪ সালে আরবের তেল নিষেধাজ্ঞা ও পরবর্তীকালে ওপেক কর্তৃক তেলের চারগুন মূল্য বৃদ্ধি স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ করে দেয় এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ভিত্তিতে এক নতুন আন্তর্জাতিক অধ্যাদেশ জারির জন্য চাপ প্রদান করতে থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না নিয়ো। নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধাপরণা ব্যাপক আলোচিত ও বির্তকের দাবি রাখে। তবে এ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে আনতে পারবে বলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ধারণা।

● তৃতীয় বিশ্বে নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণগুলো কি কি?

উত্তর: তৃতীয় বিশ্বের নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণগুলো হল:

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র দেশসমূহ অর্থনৈতিক মন্দাদশা ঘুচাতে নিপতিত হয় এবং ঐ সময় রাষ্ট্র প্রধানেরা অনুধাবন করলেন এই অর্থনৈতিক মন্দাদশা ঘুচাতে বিচ্ছিন্নভাবে বৈদেশিক সাহায্য ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আক্ষেপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো একান্ত প্রয়োজন।
২. পশ্চিমা দেশসমূহ সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করে থাকে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এ কারণে বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।
৩. দারিদ্র্য পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। এই দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন ঋণ, সেবা, মুনাফা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে উন্নত এবং অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

● নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংগঠন সমূহের নাম লিখুন।

উত্তর: নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্রবস্থার সংগঠন সমূহ হল:

১. বিশ্ব ব্যাংক	২. আইএমএফ
৩. প্যাট	৪. ডব্লু-প্রটিও
৫. গ্রুপ-৭৭	৬. আসিয়ান
৭. সাফটা	৮. NAFTA I
৯. ইউরোপীয় ইউনিয়ন	

● রাষ্ট্রের উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর: রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক ও মানবিক সংগঠন। রাষ্ট্র বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূ- খন্ডের আন্তর্তাধীন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বোঝায়। মানব সমাজের রাজনৈতিক সচেতনাবোধ থেকে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ভূ-খন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব অন্যতম উপাদান বলে স্বীকৃত।

উলি-খিত উপাদানসমূহ ছাড়াও বর্তমানে স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সাম ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

● ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কি রাষ্ট্র?

উত্তর: ব্রিটিশ কমনওয়েলথ একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা। সাবেক ব্রিটিশ ঔপনিবেশভূক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে এ সংস্থা গঠিত।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ রাষ্ট্র কি না : প্রথমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন্স, বর্তমানে কমনওয়েলথ অব নেশন্স নামে পরিচিত। এ সংস্থাটি ৫৩টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত। যুক্তরাজ্য এর শীর্ষে রয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত জনপদ স্বাধীনতা লাভের পর কমনওয়েলথের সদস্য হয়েছে। কমনওয়েলথ একটি রাষ্ট্র নয়, বরং স্বাধীন রাষ্ট্রের সংঘ। এর নিজস্ব কোনো ভূখন্ড নেই। নেই কোনো জনসমষ্টি। সর্বোপরি এর কোনো সার্বভৌম মতা নেই। অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য কমনওয়েলথভূক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীগণ সময়ে সময়ে মিলিত হন। এর রয়েছে একটি সচিবালয় একটি সচিবালয়। ব্রিটেনের রাজা বা রাণী এর প্রতীকী প্রধান।

কনওয়েলথ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংঘ। এটা কোন স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

● ডোমিনিয়নগুলো কি রাষ্ট্র? আলোচনা করুন।

উত্তর: ডোমিনিয়নগুলো যেমন- অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা রাষ্ট্র কি না এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ ডোমিনিয়নের জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড ও সরকার রয়েছে। কিন্তু এদের সার্বভৌমত্ব আছে কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

ডোমিনিয়নগুলো রাষ্ট্র কি না: ডোমিনিয়নগুলো হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এসব রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে। তারা ব্রিটেনের সাথে সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কেউ কারো অধীন নয়। তারা যেকোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারা শুধু ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর প্রতি আনুগত্যের দিক থেকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন সদস্য ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। তাদের রাষ্ট্রীয় যেকোনো কর্মকান্ডে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। ডোমিনিয়ানসমূহে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন ও সার্বভৌম। তাদের নিজস্ব পতাকা তারা ইচ্ছা করলে যেকোনো মুহূর্তে কমনওয়েলথ ত্যাগ করতে পারে। তাই ডোমিনিয়াম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

● পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কী?

উত্তর: পুঁজিবাদ হলো এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের (....) মালিকানা ন্যস্ত থাকে ব্যক্তি মালিকানা ন্যস্ত থাকে ব্যক্তি মালিকানায়। পুঁজিবাদের ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানায় পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয় এবং একটি জটিল বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অবাধ অর্থনীতি ও মুক্তবাজারে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করা এবং ব্যক্তিগত খাতের বিকাশ ঘটানো। গণতান্ত্রিক আর্দশ প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাত অন্যতম প্রধান শর্ত। কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমশক্তি বিক্রয়, সরলীকৃত শ্রেণীকাঠামো, মুনাফার জন্য উৎপাদন, অবাধ প্রতিযোগিতা, এলিটদের প্রাধান্য, শ্রেণীশোষণ ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অনুরণ ইত্যাদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

● আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী কি কি?

উত্তর: রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলিঃ

১. প্রশাসন পরিচালনাঃ দেশের প্রচলিত আইন আনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে শাসানকার্য পরিচালনা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ।
২. সার্বভৌমত্ব রাঃ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রা এর পরিত্র দায়িত্ব। সার্বভৌত্বই বর্তমান রাষ্ট্রের ভিত্তি।
৩. অভ্যন্তরীণ শান্তি শ"ঙ্খলাঃ অভ্যন্তরীণ শান্তি শ"ঙ্খলা রার জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হয়।
৪. বিচার সংক্রান্তঃ আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। এজন্য রাষ্ট্রকে নিরপে বিচার গঠন ও পরিচালনা করতে হয়।
৫. নিরাপত্তা সংক্রান্তঃ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।
৬. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সংরণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য কাজ।
৭. আইন প্রণয়নঃ প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইন বাতিল, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।
৮. আর্থিক কাজঃ খাজনা ও কর নির্ধারণ, তা আদায় করা এবং সুষ্ঠ ভাবে ব্যয় করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বার্ষিক বাজেট তৈরি ও পেশ করে।

● কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে?

উত্তরঃ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে এমন এক ধরনের রাষ্ট্রকে বুঝায় যা জনগণের সামগ্রিক কল্যাণে বিধান করে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের প্রাত্যহিক নূন্যতম চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র খাদ্য, বস্ত্র, শিা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভি-

ন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া (...) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধি ও সুষমবন্টন ব্যবস্থায় জনগণের (.....) কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে থাকে। (.....) ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যে রাষ্ট্র উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক (.....) করে থাকে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে। মূলত জনকল্যাণে নিবেদিত রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক।

● পুঁজিবাদী সরকার কাকে বলে?

উত্তর: পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থা হলো এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা। এটা সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। পুঁজিবাড়ী শাসন ব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। তাই পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থা বলতে উৎপাদন শক্তির মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়।

পুঁজিবাদী সরকার হচ্ছে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং যেখানে অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জন স্বীকৃত।

ডি.এম.রাইট- এর মতে, পুঁজিবাদা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীয় হয় এবং তা অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থা আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন ও জনগণের মতামতের স্বীকৃতি প্রদান করে।

● সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

উত্তর: সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রে চরম, চূড়ান্ত ও অপ্রতিরোধ্য মতাকে বুঝানো হয়। এটি রাষ্ট্রের প্রাণ। রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্বই রাষ্ট্রকে বিশিষ্টতা দান করেছে। স্থায়ীত্ব, ব্যাপকতা সীমাহীনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোই মূলত সার্বভৌমত্বকে অনুধাবনে সাহায্য করেছে।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য:

১. স্থায়ীত্ব : সার্বভৌমত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্থায়িত্ব। যতদিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান থাকবে। সার্বভৌমত্বের অবসান হয় না।
২. সর্বব্যাপকতা: সার্বভৌমত্বের অপর বৈশিষ্ট্য হলো সর্বব্যাপকতা। রাষ্ট্রের ভেতর প্রত্যেক নরনারী এবং তাদের দ্বারা সংগঠিত প্রত্যেক সমাজ, সম্প্রদায় ও সংঘ সার্বভৌম শক্তির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব বাধাবন্ধনহীন এবং অবাধ।
৩. অবিভাজ্যতা: সার্বভৌমত্ব এক ও অবিভাজ্য। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত মতা মাত্র একটি কেন্দ্রেই ন্যস্ত থাকে। যদি দুই বা ততোধিক কেন্দ্রে তা ন্যস্ত থাকে তাহলে তাদের মধ্যে বিরোধ ঘটা অসম্ভব নয়।
৪. হস্তান্তর অযোগ্য: সার্বভৌম মতা হস্তান্তরের অযোগ্য। মানুষ যেমন তার প্রাণ অপরকে দান করতে পারে না তেমনি রাষ্ট্র তার সাবভৌম মতা পরিত্যাগ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব ছেড়ে দেওয়ার অর্থ তার বিলুপ্তি।
৫. মৌলিকতা ও চরম ক্ষমতা : সার্বভৌম মতা মৌলিক এবং চরম। রাষ্ট্রের মধ্যে এক বাইরে তার সমক বা তার উর্ধ্বে কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।
৬. সীমাহীনতা: সার্বভৌম মত অন্য কোনো শক্তির দ্বারা সীমিত নয়। আইনগত অসীম মতার প্রয়োগ সর্বত্র হতে পারে।

● সামন্ত রাজ্য বলতে কি বুঝেন?

উত্তরঃ আন্তর্জাতিক আইনে যে সব রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন অবস্থায় (.....) নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র বা সামন্ত রাষ্ট্র বলা হয়। যদিও অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ করতে পারলেও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে এ রাষ্ট্রগুলো সম্পূর্ণভাবে অভিভাবক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

● আশ্রিত রাজ্য কি?

উত্তরঃ দুর্বল ও পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার খাতিরে অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে ঐ শক্তিশালী রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত আশ্রয় গ্রহণকারী রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মতে আশ্রিত রাজ্য হিসাবে গন্য করা হয়। আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র আশ্রিত রাজ্য বা রাজ্যগুলো প্রতি অভিভাবকের ভূমিকা পালন নিশ্চিত করে থাকে।

● নিরপে রাজ্য বলতে কি বুঝেন?

উত্তরঃ যে দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা সম্পর্কে সকল বৃহৎ শক্তি স্থানীয়ভাবে নিশ্চয়তা দেয় সেটাইকেই বলা হয় নিরপে রাষ্ট্র। পৃথিবীতে এরূপ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একমাত্র উদাহরণ হচ্ছে সুইজারল্যান্ড। ১৮৭৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস সুইজারল্যান্ডকে উক্তরূপ গ্যারান্টি দিয়ে নিরপে রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

● **ভূ-খন্ড অর্জনের পন্থা সমূহ কি কি?**

উত্তঃ সাধারণত ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ভূ-খন্ড অর্জনের পন্থাসমূহ হচ্ছে-

১. দখল ২. দখলীস্বত্ব
৩. অর্পন ৪. প্রোয়েদাদ
৫. পরিবৃদ্ধি এবং ৬. রাজ্য নয়

● **সমুদ্র এলাকাকে কি কি সুনির্দিষ্ট এলাকায় চিহ্নিত করা যায়?**

উত্তরঃ সমুদ্র এলাকাকে নিম্নলিখিত এলাকায় চিহ্নিত করা যায়:

১. সমুদ্র তটরেখা ২. আঞ্চলিক বা উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল
৩. সন্নিহিত বা সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল ৪. চূড়ান্ত অর্থৌতিক অঞ্চল
৫. মহী সোপান এবং ৬. উন্মুক্ত সমুদ্র

● **১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশন সম্বন্ধে কি জানেন?**

উত্তরঃ ষাটের দশক থেকে সমুদ্র আইনের ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়। পঞ্চাশের দশকে লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমুদ্রের জলভাগ ও মহীসোপানে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের সীমা বৃদ্ধির যে প্রবণতা ছিল, ষাটের দশকে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রের সমর্থনে এ প্রবণতা আরো সংঘবদ্ধ এবং ব্যাপক রূপ লাভ করে। ১৯৬০ সনের জেনেভা সম্মেলনে উলি-খিত দুটি অমীমাংসিত প্রশ্ন ছাড়াও আরো যে দুটি প্রশ্নের তখনো আন্তর্জাতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেগুলো হচ্ছে পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে অবস্থিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হিসেবে বিবেচিত প্রণালীর মধ্য দিয়ে সব সময়ের জন্য যুদ্ধ জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণ এবং দ্বীপপুঞ্জের জলরাশির মধ্য দিয়ে সব সময়ের জন্য যুদ্ধ জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণ এবং দ্বীপপুঞ্জের জলরাশির মধ্য দিয়ে নৌচলাচল ও তার উপর দিয়ে বিমান চলাচলের অধিকার সংক্রান্ত।

● **উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলের উপর আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য সংলগ্ন অঞ্চলকে কয়ভাবে ভাগ করা যায়?**

উত্তরঃ উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলের উপর আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য সংলগ্ন অঞ্চলকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. শুল্ক অঞ্চল: শুল্ক ধার্য ও আদায় করার লক্ষ্যে এই চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. মৎস শিকার অঞ্চল: উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচ্ছত্রভাবে অধিকার নিশ্চিত করনার জন্য এই অঞ্চলটি চিহ্নিত হরা হয়।
৩. স্বাস্থ্যকর অঞ্চল : উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচ্ছত্রভাবে মৎস শিকারের জন্য এই অঞ্চলটি চিহ্নিত করা হয়।
৪. অভিবাস অঞ্চল :ধ বিদেশ গমন অথবা বিদেশ থেকে আগমণকারীদের জন্য এই অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়।

● **সমুদ্রের সংরক্ষিত অঞ্চল বলতে কি বুঝেন?**

উত্তরঃ চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরের সমস্ত সমুদ্র এলাকা উন্মুক্ত বলে বিবেচিত। সেখানে সব রাষ্ট্রের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু কোন কোন উপকূলীয় রাষ্ট্র

অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের আঞ্চলিক সমুদ্রের সীমা বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে উন্মুক্ত সমুদ্রের অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংকুচিত হতে থাকে এবং উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। এটা নিরসেনের জন্য ১৯৮২ সনের সমুদ্র সংক্রান্ত কনভেনশনের মাধ্যমে উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহকে সংরতি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদান করা হয়। সংরতি অর্থনৈতিক অঞ্চল বলতে আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে এমন এক সংলগ্ন সমুদ্রাংশকে বুঝায় যেখানে উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকার থাকবে। এটা উপকূল রেখা অর্থাৎ ভিত্তি রেখা থেকে সর্বোচ্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

১৯৮২ সালের কনভেনশনের ৫৬নং অনুচ্ছেদে সংরতি অর্থনতিক অঞ্চলের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

● **উন্মুক্ত সমুদ্রে জেনেভা কনভেনশন অনুসারে কী কী স্বাধীনতা পাওয়া যায়?**

উত্তরঃ উন্মুক্ত সমুদ্রে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্বাধীনতাগুলো পাওয়া যায়:

১. নেস্ত চলাচলের স্বাধীনতা;
২. উন্মুক্ত সমুদ্রের উপরোস্থ আকাশে বিমান চলাচলের স্বাধীনতা;
৩. আন্তঃসাগরীয় যোগাযোগ যেমন- তার ও পাইপ লাইন স্থাপনের স্বাধীনতা;
৪. মৎস্য শিকারের স্বাধীনতা ও
৬. বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা।

● **উন্মুক্ত সমুদ্রে কোন কোন কাজ জলদস্যুতার অন্তর্ভুক্ত?**

উত্তরঃ উন্মুক্ত সমুদ্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো জলদস্যুতার অন্তভুক্ত:

১. যে কোন বেসরকারী জাহাজের অথবা বিমানের নাবিক বা বৈমানিক বা আরোহী ব্যক্তিগত স্বার্থে কৃত কোন অবৈধ হিংসাত্মক কাজ, অবৈধ আটক
২. উন্মুক্ত সমুদ্রে অপর কোন জাহাজ বা বিমানের কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির পরিচালিত হয়;
৩. আন্তঃসাগরীয় যোগাযোগ যেমন- তার ও পাইপ লাইন স্থাপনের স্বাধীনতা;
৪. আন্তর্জাতিক আইন সাপে কৃত্রিম দ্বীপ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের স্বাধীনতা;
৫. মৎস্য শিকারের স্বাধীনতা ও
৬. বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা।

● **উন্মুক্ত সমুদ্রে কোন কোন কাজ জলদস্যুতার অন্তর্ভুক্ত?**

উত্তরঃ উন্মুক্ত সমুদ্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো জলদস্যুতার অন্তর্ভুক্তঃ

১. যে কোন বেসরকারী জাহাজের অথবা বিমানের নাবিক বা বৈমানিক বা আরোহী ব্যক্তিগত স্বার্থে কৃত কোন অবৈধ হিংসাত্মক কাজ, অবৈধ আটক অথবা কোন লুটপাত করাযা:
ক. উন্মুক্ত সমুদ্রে অপর কোন জাহাজ বা বিমানের কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির পরিচালিত হয়;
খ. কোন রাষ্ট্রের এখতিয়ার বহির্ভূত কোন স্থানে কোন জাহাজ, বিমান, ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত লুটতরাজমূলক কাজ।
২. কোন বিশেষ জাহাজ অথবা বিমান একটি দস্যু- জাহাজ দস্যু বিমান এ সর্ম্পকে তথ্যাদি অবগত হওয়া সত্ত্বেও সেই জাহাজ বা বিমান সেচ্ছায় অবৈধ উদ্দেশ্যে পরিচালনা করাও জলদস্যুতা বলে গণ্য হতে পারে।
৩. জলদস্যুতামূলক অবৈধ কাজে কাউকে প্ররোচিত বা উত্তেজিত করা অথবা অনুরূপ কাজকে সহজসাধ্য করাও জলদস্যুতার অন্তর্ভুক্ত।

● **উন্মুক্ত সমুদ্রে প্রাণীজ সম্পদের রক্ষণা বেক্ষণের জন্য কি বিধান রয়েছে?**

উত্তরঃ উন্মুক্ত সমুদ্রের প্রাণিজ সম্পদ বিশেষ করে মৎস্য সুষ্ঠ ব্যবহার ও রণাবেণের জন্য কনভেনশনে প্রয়োজনীয় বিধান রাখা হয়েছে। সম্পদ রার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংশি-ষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলা সাপে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জেলেদেরই উন্মুক্ত সমুদ্রে মৎস্য শিকার করার অধিকার রয়েছে। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্র মৎস্য সম্পদের রণাবেণ ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য অবশ্যই একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। শিকারযোগ্য মৎস্যের পরিমাণ নির্ধারণ ও মৎস্য সংরণের পদপে গ্রহণে সবচেয়ে

উন্নত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রমাণাদির সাহায্য নেয়া প্রয়োজন যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিগত প্রমাণাদির সাহায্য নেয়া প্রয়োজন যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। কনভেনশনে রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য, মৎস্য শিকার, পরিসংখ্যান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত বিনিময়েরও বিধান রাখা হয়েছে।

● আকাশে এয়ারলাইন্স সমূহের কি কি স্বাধীনতা রয়েছে?

উত্তরঃ আকাশে এয়ারলাইন্স সমূহের নিম্নলিখিত স্বাধীনতা রয়েছে:

১. অবতরণ ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের আকাশ পথ অতিক্রম করা;
২. পরিবহনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে অবতরণ;
৩. যে রাষ্ট্রের বিমান সে রাষ্ট্রে উঠানো মালামাল বা যাত্রী অন্য রাষ্ট্রে নামানো;
৪. যে রাষ্ট্রের বিমান সে রাষ্ট্রে বহন করার উদ্দেশ্যে অন্য রাষ্ট্রে মালমাল বা যাত্রী উঠানো;
৫. বিমানের মালিক রাষ্ট্র কর্তৃক দুই বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে মালামাল ও যাত্রী বহন।

● জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো কি কি?

উত্তরঃ জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো হল:

১. ভৌগলিক উপাদান ২. জনসংখ্যামূলক উপাদান
৩. উৎপাদন দতামূলক উপাদান ৪. যাতায়াত ও যোগাযোগ
৫. বৈজ্ঞানিক দতামূলক উপাদান ৬. সরকারী সংগঠন ও প্রশাসনমূলক উপাদান
৭. অর্থনৈতিক ব্যবস্থামূলক উপাদান ৮. সামরিক অবস্থান সম্পর্কিত উপাদান
৯. ধ্যান- ধারণা সংক্রান্ত উপাদান ১০. গোয়েন্দা ও গুপ্তচর সংক্রান্ত উপাদান
১১. সামরিক ব্যবস্থাপমূলক উপাদান ১২. নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত উপাদান

● জাতীয় শক্তির প্রকারভেদগুলো লিখুন।

উত্তরঃ জাতীয় শক্তির প্রকারভেদগুলো হল:

১. সামরিক শক্তি ২. অর্থনতিক শক্তি
৩. জনমতের শক্তি ও ৪. কূটনৈতিক শক্তি

● শক্তিসাম্যকে কি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল?

উত্তরঃ সাতটি অর্থে শক্তিসাম্যের ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছিলঃ

১. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতার সমবন্টনের দ্বারা বিন্যস্ত ভারসাম্য;
২. একটি রাষ্ট্রের প্রধান্যের দ্বারা সৃষ্ট ভারসাম্য;
৩. আপেকি স্থায়িত্ব এবং শান্তি রাকারী ব্যবস্থা;
৪. স্থায়িত্বহীনতা এবং যুদ্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অবস্থা;
৫. মতা কেন্দ্রিক রাজনীতিকে ব্যক্ত করার একটি পদ্ধতি;
৬. ইতিহাসের একটি সার্বজনীন আইন এবং
৭. নীতি প্রণেতাদের জন্য একটি নির্দেশিকা।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

● শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তরঃ শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতার সমবন্টনের দ্বারা বিন্যস্ত ভারসাম্য;
২. একটি রাষ্ট্রের প্রাধান্যের দ্বারা সৃষ্ট ভারসাম্য;
৩. আপেকি স্থায়ীত্ব এবং শান্তি রাকারী ব্যবস্থা;
৪. স্থায়ীত্বহীনতা এবং যুদ্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অবস্থা;
৫. মতা কেন্দ্রিক রাজনীতিকে ব্যক্ত করার একটি পদ্ধতি;
৬. ইতিহাসের একটি সার্বজনীন আইন এবং
৭. নীতি প্রণেতাদের জন্য একটি নির্দেশিকা

● শক্তি সাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তরঃ শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. সক্রিয় রাজনৈতিক অংশ গ্রহণকারী হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব;
২. রাষ্ট্রের উপরে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত এবং বৈধ কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি;
৩. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মর্যাদা, সম্পদ এবং মতার অপেক্ষাকৃতভাবে অসম বণ্টন;
৪. বিশ্বের সীমিত সম্পদের জন্য বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে নিরন্তর অর্থ নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা এবং বিরোধের অবস্থা বিদ্যমান;
৫. বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির মধ্যে এই বোঝাপড়ার মনোভাব বিদ্যমান যে মতার বণ্টন তাদের পক্ষে সুবিধা জনক।

● শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশল কিরূপ?

উত্তরঃ শক্তিসাম্যের ধারণা অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রের মতা যদি দৈবাৎ এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, সে অপর রাষ্ট্র সমূহের নিরাপত্তার প্রতি হুমকী হয়ে দেখা দেয়, তবে সাম্য অবস্থা বজায় রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন হয় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া রাষ্ট্রটির শক্তি হ্রাস করার প্রচেষ্টা করা।

পামার ও পারকিনস শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য ছয়টি পদ্ধতির কথা উলে-খ করেছেন। যেমনঃ

১. জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট ২. তিপূরণ
৩. সমারস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ ৪. হস্তপে ও হস্তক্ষেপ থেকে বিরতি
৫. সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র এবং ৬. বিভক্তি করণ ও শাসন

● শক্তিসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরঃ মতার ভারসাম্য রার অন্যতম কৌশল হল সামরিকীকরণ, অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া। বৃহৎ শক্তিগুলি সামরিক প্রস্তুতিসহ জাতীয় প্রতিরার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে একদিকে অস্ত্রের উৎপাদনও যেমন বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে অস্ত্রের প্রতিযোগিতাও বেড়ে যায়। অস্ত্রীকরণ শক্তিসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলেও এটি অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। অস্ত্রীকরণ কৌশল শক্তির দিক থেকে কোনো রাষ্ট্রের সমক হওয়ার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্র যখন অস্ত্রসজ্জে সজ্জিত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় থাকলেও এর ফলে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তার পরিণামে সর্বাত্মক যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধর প্রারম্ভই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ তাই দাবি তুলেছে যে, অস্ত্রীকরণ নয় বরং নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেই শক্তিসাম্য বজায় রাখতে হবে।

তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ভঙ্গের মাধ্যমে মতার ভারসাম্য রার স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ত্রশস্ত্রের শক্তিতে যে শক্তিশালী অবস্থায় আছে, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে তারা তাদের সেই সুবিধাজনক অবস্থাকে পরিত্যাগ করতে চায় না। এর ফলে শক্তিসাম্য ব্যাহত হচ্ছে।

● কূটনীতি বলতে কি বুঝেন?

উত্তরঃ সাধারণত কূটনীতি বলতে বুঝায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারর মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং কৌশলের প্রয়োগ। আভিধানিক অর্থে কূটনীতি হল অত্যন্ত নিপুণতা ও দতার সাথে আন্তর্জাতাকি সর্ম্পক পরিচালনা করা আন্তর্জাতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকেই সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা বা সম্পর্কে বিচিত্রময় গতি প্রকৃতি।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ম্পকের ভিত্তিতে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান বা সুনিপুণ পরিচালনার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাই কূটনীতি নামে পরিচিত। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ আলোচনাকেও কূটনীতি বলে।

● একজন কূটনীতিকের মূল কাজগুলো কি কি ?

উত্তরঃ সাধারণত কূটনীতি বলতে বুঝায় রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং কৌশলের প্রয়োগ। আভিধানিক অর্থে কূটনীতি হল অত্যন্ত নিপুণতা ও দতার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। আন্তর্জতাকি সমাজের বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

থেকেই সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা বা সম্পর্কের বিচিত্র গতি প্রকৃতি।
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বা সুনিপুণ পরিচালনার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাই কূটনীতি নামে পরিচিত। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোপনাকেও কূটনীতি বলে।

● একজন কূটনীতিকে মূল কাজগুলো কি কি?

উত্তর: একজন কূটনীতিকের মূল কাজগুলো হল:

১. প্রতিনিধিত্ব
২. আলাপ আলোচনা
৩. প্রতিবেদন প্রেরণ ও
৪. বিদেশে জাতি এবং স্বদেশের নাগরিকদের স্বার্থ রা করা

● কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের শ্রেণীবিন্যাস কিরূপ?

উত্তর: কূটনৈরতিক প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে একটা দেশের কূটনীতি পরিচালিত হয়। বিংশ শতকে কূটনৈতিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কোনো রাষ্ট্রের কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়। যেমন:

১. রাষ্ট্রদূতগণ এবং পোপের দূত: রাষ্ট্রদূতগণ বিদেশে তার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। রাষ্ট্রদূতগণ নিজ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বহিঃরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপধানের কাছে প্রেরিত হন। ভ্যাটিক্যান জাতীয় নগর রাষ্ট্রের বৈদেশিক প্রধান প্রতিনিধিকে পোপের দূত বা গঁহপরড় বলা হয়।
২. বিশেষ কূটনৈতিক মন্ত্রী, কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং পোপের উপদূত যারা রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট প্রেরিত হন।
৩. চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স- রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে অথবা নতুন কোন দূত নিয়োগ করা হয়নি এমন পরিস্থিতিতে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স নিয়োগ প্রাপ্ত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকট প্রেরিত হন।

এছাড়াও রয়েছেন কাউন্সিলর এং সেক্রেটারিগণ। সেক্রেটারিদের মধ্যে আবার তিন শ্রেণীর বিভাজন রয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এছাড়াও থাকেন বিভিন্ন ধরনের এ্যাটচি ও সহকারী এ্যাটাচিগণ।

● পদমর্যাদার ভিত্তিতে আপেশাদার কন্সাল কতটি শ্রেণীতে বিভক্ত?

উত্তর: পেশাদার কন্সালের চেয়ে সংখ্যা বেশি হতে পারে। নরওয়ে ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে অপেশাদর কন্সারের সংখ্যা বেশি। পদমর্যাদার ভিত্তিতে অপেশাদার কন্সালগণকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন:

১. কন্সাল জেনারেল
২. কন্সাল
৩. ভাইস কন্সাল এবং
৪. কন্সাল এজেন্ট

● কূটনৈতিক মিশনে কনসালদের কাজগুলো কি কি?

উত্তর: কূটনৈতিক মিশনে কনসালদের কাজগুলো হল:

১. বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রার জন্য আইনগত ভূমিকা রাখা।
২. অবস্থানকারী রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানীক ও সাংস্কৃতি সম্পর্ক স্থাপন করা।
৩. প্রেরণকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও আইনগত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা নিজ রাষ্ট্রে প্রেরণ করা।
৪. অবস্থানকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা নিজ রাষ্ট্রে প্রেরণ করা।

● কি কি কারণে একজন কূটনৈতিক অব্যাহতি পেতে পারেন?

উত্তর: নিম্নলিখিত কারণে কূটনৈতিক প্রতনিধিদের কাজের অবসান ঘটতে পারে:

১. যখন প্রেরক রাষ্ট্র গ্রাহক এই মর্মে নোটিশ প্রদান করে যে, তার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কাজ শেষ হয়েছে;

২. যখন গ্রাহক রাষ্ট্র এই মর্মে প্রেরক রাষ্ট্রকে নোটিশ প্রদান করে যে, তার কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে মিশনের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়;
৩. কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রাহক রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ করলে, যেমন, গুপ্তচরবৃত্তির, ঐ গ্রাহক রাষ্ট্র তাঁকে তখন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করতে পারে এবং দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারে। সেত্রে ঐ কূটনৈতিক প্রতিনিধি আর তাঁর দায়িত্বে থাকনে না;
৪. যুদ্ধের কারণে গ্রাহক রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক অভসান ঘটলেও কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ নিজ দেশে অর্থাৎ প্রেরণকারী রাষ্ট্রে ফিরে যান।
৫. আন্তর্জতাকি আইনের বিষয়বস্তু বা আন্তর্জতাকিক অস্তিত্ব হতে কোন রাষ্ট্র অবলুপ্ত হলে তখন আর ঐ অবলুপ্ত রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকে না।

● কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন কি?

উত্তর: আন্তর্জাতাকি আইন কমিশন ১৯৫৬ সালে কূটনৈতিক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতিসমূহ বিধিবদ্ধকরণের কাজ হাতে নেয় এবং ১৯৫৮সালে তার দশম অধিবেশনে খসড়া বিধানাবলী সংবলিত একটি দলিল প্রণয়ন করে। এ খসড়া বিধানাবলীর ভিত্তিতে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সুবিধাদি জাতিসংঘ সম্মেলনে ১৯৬১ সালের ১৬ এপ্রিল কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন গৃহীত হয়। কনভেনশনটি স্বারিত হয় ১৯৬১ সালর ১৮ এপ্রিল। ১৯৬৪ সালের ২৪ এপ্রিল এ কনভেনশন বলবৎ হয়।

● নিরস্ত্রীকরণ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: নিরস্ত্রীকরণ বলতে আভিধানিক অর্থে বুঝায় শক্তি প্রয়োগ অথবা সশস্ত্রস্ত সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে হ্রাস করা অথবা বর্জন করা। আন্তর্জাতিক রাজনতীতে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বুঝায় কোনো রাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা, অথবা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে স্বেচ্ছায় যদি অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করে তাকেও নিরস্ত্রীকরণ বলা হয়।
নিরস্ত্রীকরণ বলতে সাধারণভাবে বুঝায়, মরণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ধরনের বা সকল প্রকার অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস এবং উৎপাদিত অস্ত্র ধ্বংশ বা উৎপাদন বন্ধ করা। অনেকে মত পোষণ করেন, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেই যুদ্ধ এবং আন্তর্জতাকি অস্থিরতা দমন করা সম্ভব।
মরগানথোর মতে, অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম অস্ত্র হ্রাস করা অথবা বর্জন করারেক নিরস্ত্রীকরণ বলে।

● আধুনিক বিশ্বের নিরস্ত্রীকরণের যুক্তিগুলো লিখুন।

উত্তর: বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রার জন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পথ উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ অন্যতম। নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। যুক্তিগুলো হল:

১. নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সীমিতকরণ এবং প্রশমনে সাহায্য করবে।
২. নিরস্ত্রীকরণ প্রতিটি জাতির প্রয়োজনীয় সম্পদকে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে সাহায্য করবে।
৩. অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা উৎপাদনাকারী দেশের অর্থনীতিকে সামরিকীকরণের প্রয়াস ত্বরান্বিত করে, সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ আবশ্যক।
৪. পরিবেশ দূষণ প্রতিনোধ, জনস্বাস্থ্য রা এবং প্রতিরা সরঞ্জামের ধবংশাত্মক মতা হ্রাসের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

● জাতিসংঘ কর্তৃক পরমাণু অস্ত্র সংবরণ ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত উদ্যোগগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর: জাতিসংঘ কর্তৃক এ পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্র সংবরণ ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) Baruch Plan
(২) প্রথম সোভিয়েত পদক্ষেপ
(৩) জোট নিরপে ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যৌথ উদ্যোগ
(৪) মস্কো চুক্তি
(৫) মহাকাশ চুক্তি

(৬) পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি
(৭) ঝঅখঞ-১ (৮) ঝঅখঞ-২
(৯) দিল্লী আলোচনা ও (১১) সোভিয়েত পদপে

● **এন.পি.টি চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।**

উত্তরঃ এন.পি.টি চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

১. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নয় এমন দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলো পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে না এবং এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করবে না।

২. যে সব দেশের পারমাণবিক অস্ত্র নেই তারা পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে না বা এ লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা ও প্রযুক্তি গ্রহণ করবে না।

৩. এ চুক্তির উপধারাগুলোতে বলা হয়েছে ক্রমান্বয়ে অস্ত্র হ্রাসকরণ, ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, রপ্তানির উপর করাকড়ি আরোপ, শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

● **এন.পি.টি চুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো কি কি?**

উত্তরঃ এন.পি.টি চুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো হলঃ

১. এটি প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের কার্যকর চুক্তি যা বিশ্বের সকল দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

২. ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্ধারণ বিষয়ক সম্মেলনে উপস্থিত ১৭৮ টি দেশের কেউই এই চুক্তির বিরোধিতা করেনি।

৩. এই চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল আফ্রিকার ৫৩টি দেশের মধ্যে ৪৩টি দেশ পোলিনদাবা চুক্তির মাধ্যমে আফি"কাকোন পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। এ অঙ্গীকার রার্থে তারা মহাদেশের অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলকে উৎসাহিত করবে।

৪. NPT চুক্তির ভুল ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যেই পরবর্তীতে ঈঞইঞ চুক্তি স্বার হয়।

৫. এই চুক্তির ফলে পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ করা এবং পরিবেশ রার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন তীব্রতর হয়।

৬. বিশ্ববাসী পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলে সবাইকে অনুপ্রণাতি করতে পেরেছে।

● **সি.টি.বি.টি চুক্তিটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কি কি?**

উত্তরঃ সি.টি.বি.টি চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলঃ

১.চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন সদস্য রাষ্ট্রই কোন ধরনের পারমাণবিক পরীা বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোন বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না এবং তার অধীনস্থ কোন এলাকাতেও এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

২.সকল রাষ্ট্র যে কোন পারমাণবিক অস্ত্র পরীা, বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোন ক্ষেত্রে জড়িত, উৎসাহিতকরণ করা থেকে বিরত থাকবে।

৩.চক্তির শর্তাবলি বাস্তবায়নের জন্য এ সংক্রান্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৪.এই চুক্তির আওতায় চুক্তির শর্তক্ষলি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক মেনে নেয়া হয়েছে।

৫.চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একটি ফোরাম গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬.কোন রাষ্ট্র চুক্তির কোন শর্তাবলি ভঙ্গ করলে ঐ রাষ্ট্রের অনুরূপ ঘটনাস"ল পরিদর্শনের অনুমতি চাওয়ার আইনগত বিধান সংরতি হয়েছে।

৭.চুক্তিটি বাস্তবায়নে এর কার্যক্রম ও ফলাফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য চুক্তিটি বাস্তবায়নের ১০ বছর পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একত্রিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

● **সি.টি.বি.টি চুক্তির বৈষম্যর মূল দিকগুলো কি কি আলোচনা কর?**

উত্তরঃ সি.টি.বি.টি চুক্তির বৈষম্যের মূল দিকগুলো হলঃ

১. ভারত, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্থানসহ কয়েকটি দেশ এ চুক্তি স্বার করেনি।

২. ১৮৩টি দেশ চুক্তিটি স্বার করলেও মাত্র ১৬৩টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে।

৩. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে কেবল ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন চুক্তিটি অনুমোদন করেনি; যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস চুক্তিটি অনুমোদন বিরোধী।

৪. বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক চুলি-র অধিকারী ৪৪টি দেশ কর্তৃক এ চুক্তিটি অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকর হবে না।

৫. সিটিবিটিতে ৫টি পরমাণু শক্তিধর দেশের পরামণু অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। কেবল পরীা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬. এ চুক্তি কম্পিউটার নিমুলেশনের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্রের পরীা নিষিদ্ধ করেনি। ফলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমেই তাদের গুণগত মান পরীা করতে পারবে।

● **অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য সবার আগে প্রয়োজন বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করা আপনি কি একমত?**

উত্তরঃ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের প্রথম শর্তই হেতৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্র পরিহার করা- এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:

১.বিশ্বের ৯০ ভাগ পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ রয়েছে দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। বাকী ১০ ভাগ রয়েছে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, চীন, ভারত, পাকিস"ানসহ মাত্র ৬/৭টি দেশের হাতে। এ তথ্য থেকে খুব সহজে দেখা যায় বিশ্বের সমুদয় পারমাণবিক অস্ত্র মাত্র ৮/৯টি দেশের হাতে সীমাবদ্ধ। ফলে বৃহৎ শক্তিগুলো অস্ত্র পরিহার করলেই পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ সম্ভব।

২. অস্ত্র প্রযুক্তির সরবরাহকারী: ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া, ব্রাজিল, লিবিয়া, ইরানসহ যে সকল দেশ সম্ভাব্য পারমাণবিক অস্ত্রের প্রযুক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে এসব দেশের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে এসব দেশের পরমাণু অস্ত্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছ থেকেই পেয়েছে। বিশেষ করে ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্থান উত্তর কোরিয়া চীনের কাছে ইরান ও লিবিয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে থেকে পরমাণু অস্ত্রের প্রযুক্তি পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পরমাণু অস্ত্রের অন্যতম অধিকারী যুক্তরাজ্যের পরমাণু প্রযুক্তিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া। উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বিশ্বে মাত্র ৫ থেকে ৮টি রাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্রের প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রন করছে। বর্তমানে পরমাণু শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো একে অন্যের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করছে। পরমাণু অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি করছে। এতেই খুব সহজেই বলা যায় যে ব"হৎ কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর দেশকে নিরস্ত্র করতে পারলেই অস্ত্র বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

● **SDI বা তারকা যুদ্ধ কি ?**

উত্তরঃ Strategic Defence Initivative বা কৌশলগত প্রতিরা উদ্যোগ সংপে ঋউও নামে পরিচিত। এ কর্মসূচি হলো কতকগুলো অস্ত্র ও সমর সরঞ্জামের সমাহার, যা মহাকাশ আবহাওয়ামন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন ল্যবস্থর ওপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে মহাকাশ কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে স্থাপিত হবে। এ ব্যবস্থা মহাশূন্যভিত্তিক হওয়ায় একে তারকাযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতে এ ব্যবস"ার মাধ্যমে প্রতিপরে পেণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের ভূমিতে আঘাত হানার আগেই তা প্রতিহত করা সম্ভব।

● **ইস্পাহান পরমাণু কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?**

উত্তরঃ ইস্পাহান পরমাণু কেন্দ্রটি ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থিত। এটি ইরানের অন্যতম প্রধান পরমাণু প্রযুক্তি কেন্দ্র, যেখানে ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ইরানের বক্তব্য অনুযায়ী , প-াণ্টটি তারা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করে থাকে। এ প্রক্রিয়াকরণ প-াণ্ট ব্যবহার করে আণবিক বোমা বানানো সম্ভব বলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর ধারনা।

● **মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে কী কী ধারণা পাওয়া যায়?**

উত্তরঃ কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত ১ বছর) চূড়ান্তভাবে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদি উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। এর থেকে আমরা নিম্নোক্ত ধারণা করতে পারিঃ

১. একটি দেশ
২. একটি নির্দিষ্ট সময়
৩. চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদি এবং ৪। আর্থিক মূল্য

● **নীট জাতীয় উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?**

উত্তরঃ মোট জাতীয় উৎপাদন হতে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় তথা অবচয়মূলক ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে নীট জাতীয় উৎপাদন। মোট জাতীয় উৎপাদন সৃষ্টি করতে সারা বছর ধরে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, দালানকোঠা প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এগুলোর কিছুটা য়তি হয়। মোট জাতীয় উৎপাদনের কিছু অংশ এ সকল উপাদান তথা মূলধন সামগ্রী ক্ষতি পূরণের জন্য আলাদা করে রাখতে হয়। এ ধরনের ব্যয়কে য়তি পূরণমূলক ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে এনএনপি বলে। অর্থাৎ = জিএনপি- ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট।

● **মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?**

উত্তরঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোন দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলা হয়। অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন বলতে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্যকে বুঝিয়ে থাকে।
মোট দেশজ উৎপাদন হিসাব করার সময় দেশের মধ্যে অবস্থানরত দেশী ও বিদেশীদের দ্বারা উৎপাদিত সকল প্রকার দ্রব্য ও সেবাকর্মকে ধরা হয়। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশের জনসাধারণ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হয় না।
সুতরাং মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি বলতে শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের মোট অর্থমূল্যকে বোঝায়। তবে জিডিপি হিসাব করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকে বিবেচনা করা হয়, মধ্যবর্তী দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকে নয়। এ থেকে বলা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোন দেশের নিজস্ব সীমানা তথা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে চূড়ান্তভাবে যে সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যই হল মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপি।

● **মোট দেশজ উৎপাদন ও নীট দেশজ উৎপাদনের পার্থক্যগুলো কি কি?**

উত্তরঃ মোট দেশজ উৎপাদন ও নীট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্যগুলো হলঃ

১. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তথা মোট দেশজ উৎপাদনের তুলনায় নীট দেশজ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ধারণা। কারণ এউচ এর একটি অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল ঘউচ।
২. ঘউচ এর চেয়ে এউচ এর পরিমাপ করা সহজ। কারণ মূলধনসামগ্রীর য়তি পূরণমূলক ব্যয় হিসাব করা যথেষ্ট কষ্টদায়ক। সেদিক দিয়ে এউচ এর পরিমাপ সহজ।
৩. একটি দেশের প্রকৃত উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদন হতে জানা যায় না। নীট দেশজ উৎপাদন ঘউচ থেকে কোন দেশের প্রকৃত উৎপাদন জানা যায়। এদিক দিয়ে NDP, GDP এর তুলনায় অধিকতর প্রয়োজনীয় ধারণা।
৪. ব্যবহারিক দিক দিয়ে এউচ এর চেয়ে NDP বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের প্রকৃত অবস্থা NDP থেকেই জানা যায়।

● **জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সামগ্রীক অর্থনীতিতে কয়টি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়?**

উত্তরঃ প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও আয় পদ্ধতি এ দুটিই অনুসরণ করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপের উদ্দেশ্যে সমগ্র অর্থনীতিকে ১১টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। এ খাতগুলো হলঃ

১. কৃষি ২. খনিজ ও খনন

৩. শিল্প ৪. নির্মাণ
৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ৬. পরিবহন ও যোগাযোগ
৭.বাণিজ্যিক সেবা ৮. সুহায়ন সেবা
৯. লোক প্রশাসন ও প্রতিরা ১০. ব্যাংক ও বীমা এবং
১১. পেশা ও বিবিধ সেবা ।

● **বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যয়ের খাতগুলো কি কি?**

উত্তরঃ সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ব্যয়ের খাতগুলো হলঃ

১. দেশ রা ২. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা
৩. বেসামরিক প্রশাসন ৪. শিক্ষা
৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজ
৭ ।সামাজিক নিরাপত্তা ও ৮. অর্থনৈকি স্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

● **প্রত্যক্ষ কর বলতে কি বুঝেন?**

উত্তরঃ সাধারণভাবে বললে বলা যায় যে, প্রত্য সেসব কর, যা যাদের উপর ধার্য করা হয় তাদের নিকট হতেই সরাসরি আদায় করা হয়ে থাকে। এভাবেও বলা যায়, যে করের প্রাথমিক বোঝা এবং চূড়ান্ত বা আর্থিক বোঝা একই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ যে করের ভার অন্য ব্যক্তির উপর সরানো যায় বা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায় তাকে পরো কর বলে। পরো করের ত্রে যার উপর চাপিয়ে দিতে পারে। দরা যাক, কাপড়ের উপর কর ধার্য করা হয়েছে। তাহলে করের প্রাথমিক ভার বা করঘাত পড়বে কাপড় বিক্রেতার উপর কর ধার্য করা হয়েছে। তাহলে করের প্রাথমিক ভার বা করঘাত পড়বে কাপড় বিক্রেতার উপর। কিন্তু কাপড় বিক্রেতা কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করে করের অর্থ ক্রেতার নিকট হতে আদায় করতে পারে। বিক্রয় করের মত বাণিজ্য কর, প্রমোদ কর, অন্তঃশুল্ক, আবগারি কর পরো করের অন্তর্ভুক্ত।

● **কার্টেল কি?**

উত্তরঃ একই ধরনের পণ্য একই ধরনের ব্যবসায় একে অপরের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা না করার চুক্তির নাম হচ্ছে কার্টেল। এই ধরনের চুক্তি সাধারণত গোপন বা মৌখিক হয়ে থাকে। চুক্তিতে আবদ্ধকারীরা যে বিষয় গুলোতে একমত হয়ঃ

১. দাম ২. উৎপাদনসীমা
৩. মূল্য ছাড়ের পরিমান ৪. বাকি প্রদানের সীমা
৫. ক্রেতা নির্ধারণ ও ৬. বাজার এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদি।

উপরের প্রতিটি বিষয় প্রতিযোগিতামূলক আইনে নিষিদ্ধ। সাধারণত অবৈধভাবে ব্যবসায়িক গোপন চুক্তি হয়ে থাকে। যে ধরনের পরিপ্রেতিতে এ রকম চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকেঃ

১. যেখানে প্রতিযোগিতা কম।
২. যে দ্রব্যগুলো গুণগত মানে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ।
৩. যখন শিল্প স্বাভাবিক উৎপাদনের চেয়ে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

● **ডাম্পি বলতে কি বুঝেন?**

উত্তরঃ দেশীয় বাজারের চেয়ে কম দামে বিদেশি দ্রব্য বাজারে বিক্রির নাম হচ্ছে ডাম্পিং। ডাম্পিং সম্পর্কে যথেষ্ট বির্তক রয়েছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাম্পিং সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ভূমিকা না নিলেও এন্টি ডাম্পিং বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশের সরকার যদি মনে করে তার নিজের দেশের শিল্প কারখানা হুমকির সম্মুখীন তা হলে ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। তবে ঐ দেশের সরকারকে দেখাতে হবে যে, অভ্যন্তরীণ শিল্প বাণিজকে তি করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির ৬নং আর্টিকেলে এন্টিডাম্পিং সম্পর্কে বিস্-ারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডাম্পিং পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ শিল্প কারখানাকে বাঁচার জন্য আমদানী কারক দেশ প্রয়োজনে আমদানি দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ কোন নির্দিষ্ট দেশের কোন নির্দিষ্ট পণ্যের ত্রে প্রযোজ্য করা যাবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চুক্তি অনুযায়ী কোন

পণ্য ডাম্পিং হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের ৩টি পদ্ধতি স্থির করেছে:

১. রপ্তানী পণ্যটির অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য;
২. অন্য কোন দেশে রপ্তানী হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত রপ্তানী মূল্য ও
৩. পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিবিধ খরচ ও স্বাভাবিক মুনাফা ইত্যাদি বিবেচনা

কোন আমদানীকারক দেশ কোন আমদানী পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ অর্থাৎ এন্টি ডাম্পিং কার্যকর করতে পারবে না; যদি সে প্রমাণ করতে না পারে যে তার অভ্যন্তরীণ শিল্প কারখানা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এন্টি ডাম্পিং আরোপিত হলে তা ৫ বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হবে। ৫ বছর পর পুনরায় বিষয়টি বিবেচনায় আসবে।

● **অবমূল্যায়নের উদ্দেশগুলো কি কি?**

উত্তর: অবমূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলো হল:

১. যখন কোন দেশ তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে।
২. অনেক সময় সংরেণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুদ্রামান হ্রাস করা হয়।
৩. দেশের কর্মহীনতা দূরীকরণের জন্যও অনেক সময় অবমূল্যায়নের আশ্রয় নেয়া হয়।
৪. অনেক সময় আমদানি রপ্তানির সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিংবা আমদানি শুল্কের সাহায্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। এই সমস্ত নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হলে লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দেখা দেয়। এমতাবস্থায় অবমূল্যায়নের সাহায্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রেখে ঐ সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

● **অবাধ বানিজ্য কি?**

উত্তর: যেখানে দেশীয় ও বৈদেশিক দ্রবসামগ্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না, বিদেশী দ্রব্যের ওপর অধিক শুল্কজনিত বাধা আরোপ করা হয় না এবং দেশীয় পণ্যসামগ্রীকে কোনোরূপ বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় তা তাকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অবাধ বাণিজ্য বলতে এমন এক বাণিজ্যিক নীতিকে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপাদান এবং ভোগের জন্য দ্রব্যের ওপর শুল্ক, কোটা, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, কর ও ভর্তুকি সংক্রান্ত কোনো প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় না।

● **অবাধ বাণিজ্যের পে যুক্তিগুলো কি কি?**

উত্তর: অবাধ বাণিজ্যের পে যেসব যুক্তি রয়েছে সেগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

১. মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করে
২. স্বল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা লাভ
৩. উপাদানের আয় বৃদ্ধি করে
৪. উদ্বৃত্ত পণ্যের রপ্তানি সুবিধা লাভ
৫. একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিহত হয়
৬. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়
৭. উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বৃদ্ধি পায়
৮. দ্রব্যমূল্যের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়
৯. বিশ্বশান্তির সহায়ক এবং
১০. দেশীয় উদ্যোক্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

● **কি কি শর্ত সাপেক্ষ একটি রাষ্ট্র LDCs ভুক্ত হয়?**

উত্তর: ১৯৭১ সালের জাতিসংঘ LDCi যে তালিকা প্রকাশ করে তাতে ২৪ টা দেশের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৪ সালে ৪৯ টা দেশ r এর তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে এলডিসি ভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা ৪৮। ১৯৯৪ সনে বৎসোয়ানা, ২০০৭ সনে কেপেভার্দে, ২০১১ সনে মালদ্বীপ এবং ২০১৪ সনে সামোয়া এলডিসির তালিকা তালিকা থেকে বের হতে সমর্থ হয়।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক প্রতি তিন বছর পর পর খউঈং রাষ্ট্র সমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। LDCs ভুক্ত হবার জন্য শর্তগুলো হল:

ক. জিডিপি-র নিম্নহার (মাথাপিছু জিডিপি ৯০৫ ডলারের নীচে)।
খ. দুর্বল মানব সম্পদ (জন্মহার, মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শির অবস্থা ও বয়স্ক শিা ইত্যাদি)
গ. অর্থনীতিতে দিক পরিবতনের নিম্নমাত্রা (জিডিপি- তে উৎপাদন খাতের অংশ, শিল্পে শ্রমিকের

অংশগ্রহণের হার, বাৎসরিক মাথাপিছু বাণিজ্যিক শক্তি খরচ এবং আঙ্কটাড কর্তৃক প্রকাশিত পণ্য- দ্রব্য রপ্তানির কেন্দ্রীভূত নির্দেশক সমূহ)। এছাড়াও আরো কিছু বিষয়কে খউঈং ভুক্ত একটি রাষ্ট্রকে অনুন্নত রাষ্ট্রের তালিকা থেকে বের হয়ে আসতে হলে উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে অন্তত দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়।

নিম্নে জিডিপি-র হারের ক্ষেত্রে মাথাপিছু জিডিপি ৯০৫ মার্কিন ডলারের নীচে হলে একটা রাষ্ট্র LDCs ভুক্ত হবার যোগ্য হয়। কিন্তু অনুন্নত রাষ্ট্রের তালিকা থেকে বের হয়ে আসতে হলে মাথাপিছু জিডিপি হতে হয় ১০৮৬ মার্কিন ডলার।

● **বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রোপটে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কি কি পদপে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন?**

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সমস্যাটি বহুমুখী হয়ে পড়ছে। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃষ্টি, খরা, ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ে। চরম আবহাওয়ার মাত্রা বাড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন ঘন আসে। সাগর উত্তপ্ত হওয়া, মাটি ও পানির অম্ল-ত্ব বেড়ে যাওয়া সংক্রমণের গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়া সবকিছুই ঘটে। জলবায়ু পরিবর্তনের খাদ্য প্রক্রিয়া আর্থ সামাজিক প্রোপটকেও প্রভাবিত করে।

১. জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ প্রতিরোধ করে উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিহত করা;
২. উন্নত প্রযুক্তি ও নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
৩. টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি অনুসরণ করা;
৪. সেচ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য পানির সীমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৫. সেচ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য পানির সীমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা
৬. প্রযুক্তি ও কৌশল বিনিময়ে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা গড়ে তোলা
৭. বন্যা ও খরা সহনীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন করা ও
৮. বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

● **জলবায়ু শরণার্থী বলতে কি বুঝায়?**

উত্তর: বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ যেসব মানুষ নিজেদের বসতবাড়িসহ সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে তাদেরকেই জলবায়ু শরণার্থী বলা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করবে। বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা উলে-খযোগ্য সংখ্যক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে জলবায়ু ও পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আশংকা করছেন।

● **জলবায়ু পরিবর্তন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতীশীলতার জন্য কি কি হুমকীর কারণ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তর: ক্রম বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তনের তিকর প্রভাবগুলোর মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া, ঝড়/ জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি, স্থলভাগের অভ্যন্তরে লোনা পানির অনুপ্রবেশ, প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের আবাসস্থল/ পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস ও জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি অন্যতম। ফলশ্রুতিতে ফলে বিশ্বব্যাপী যেসব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তার ফলে বিশ্ব নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আতংকিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব প্রভাব সেগুলো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য যে হুমকীগুলো সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো হল :

১. দুর্বল ও ভঙ্গুর রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়বে
২. বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা হুমকীতে পরবে
৩. শিল্প ও অবকাঠামো ধবংস হয়ে যাবে
৪. বিশ্ব অর্থনীতি হুমকীতে পড়বে
৫. সমস্যা তৈরিকারী এবং আক্রান্ত দেশসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাবে

৬. মানবাধিকার লংঘন এবং শিল্পপ্রধান উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনায় হুমকি বৃদ্ধি পাবে
৭. প্রথাগত নিরাপত্তা নীতিকে হুমকিতে ফেলবে ও
৮. অভিবাসন বাড়বে।

● **বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো লিখুন।**

উত্তর: বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউজ ইফেক্টের জন্য সিএফসি বা কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমন্ডলের বহির্গামী তাপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীণ হাউজ গ্যাসের মধ্যে রয়েছে কার্বনডাই অক্সাইড, সিএফসি, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

১. পৃথিবীর বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া
২. সূর্যালোকের ঘনত্বের তারতম্য
৩. সৌর তেজস্ক্রিয়তা
৪. অপরিকল্পিত নগরায়ণ
৫. বৃক্ষ নিধন
৬. মারণাস্ত্র উৎপাদন ও এর ব্যবহার
৭. ব্যাপক শিল্পায়ণ
৮. রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার
৯. জ্বালানীর অপরিকল্পিত
১০. বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার

● **বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংপে লিখুন।**

উত্তর: ১৯৮০ থেকে ২০০৭ সন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত আইপিসির গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা দশমিক দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে শুরু করে ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এশিয়া মহাদেশে হবার কারণে আমাদের শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলো নীচে উলে-খ করা হল:

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে;
২. নিম্ন উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবে
৩. কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মরুকরণ ঘটবে
৪. কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবে
৫. জীব বৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস হবে৬. নদ- নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে যাবে
৭. মৎস ও বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে ৮. পানি সমস্যা দেখা দিবে ও
৯. রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে

● **বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিন।**

উত্তর: পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত হবার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয়গুলো নীচে উলে-খ করা হল:

১. সারা দেশে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক হারে বনায়ন করতে হবে;
২. সিএফসির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে;
৩. ইটভাটা, শিল্পকারখানা ও যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রন করতে হবে;
৪. জ্বালানী হিসেবে কাঠ বা জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে;
৫. উন্নত দেশগুলোর শিল্প ও গবেষণাগারে বর্জ্য আমদানী নিষিদ্ধ করতে হবে;
৬. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের আচরণগত পরিবর্তন পর্যবেণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;
৭. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৮. ধনী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বাংলাদেশের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য আবেদন উত্থাপন করতে হবেও;
৯. বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের

http://thejobstudy.com Go to Contents

সহায়ক ক্রিয়াকর্ম থেকে জনগণকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

● **সবুজ অর্থনীতি কি?**

উত্তর: UNEP এর সংজ্ঞানুযায়ী সবুজ অর্থনীতি হল সেই অর্থনীতি যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং সামাজিক সমতা আনবে কিন্তু পরিবেশগত ঝুঁকি কমাবে এবং পরিবেশগত অভাব দূর করবে। সবুজ অর্থনীতির উলে-খযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হল:

১. সবুজ জ্বালনী
২. সবুজ পুঁজি
৩. সবুজ পরিবহন
৪. সবুজ পানি ব্যবস্থাপনা
৫. সবুজ কর্মসংস্থান
৬. সবুজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৭. সবুজ ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ৮. সবুজ কৃষি

● **রিও+২০ সম্মেলনের সফলতাগুলো উলে-খ করুন।**

উত্তর: ২০১২ সনের ২০-২২ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক ধরিত্রী সম্মেলনটি রিও+২০ নামে পরিচিত। রিও+২০ সম্মেলনে ১৯৯২ সনে গৃহীত একুশ শতকের এজেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়। জলবায়ু সনদ, জীব বৈচিত্র্য এবং মরুময়তা সনদের হালনাগাদ অবস্থানেরও মূল্যায়ন করা হয়। সবুজ অর্থনীতি এবং টেকসই উন্নয়ন গোসল বা ঝউএং সম্মেলনটির আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এই সম্মেলনের সফলতাগুলো হল:

১. বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে একমত হন।
২. দ্রুততার সাথে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যতা হ্রাসের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে দারিদ্র্যতা হ্রাসের বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
৩. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো ২০১৫ সনের মধ্যে এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর অধিকমাত্রায় মনোযোগী হবার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
৪. কিয়োটো প্রটোকল চুক্তি অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ও ভারবান চুক্তি অনুযায়ী তহবিলের মাধ্যমে চলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টিও সম্মেলনের ঘোষণায় যুক্ত করা হয়েছে।
৫. এমডিজি অনুযায়ী, ধনী দেশগুলোর জাতীয় প্রবৃদ্ধির ১ শতাংশ দরিদ্র দেশগুলোকে দেওয়ার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

● **আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নদীর শ্রেণীবিভাগ উলে-খ করুন।**

উত্তর: আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে নদীকে সাধারণত জাতীয় নদী, আন্তঃসীমান্ত নদী বা বহুজাতিক নদী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে। বহুজাতিক নদীকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

১. জাতীয় নদী: যে নদী একটি দেশে উৎপত্তি হয়ে কেবল সে দেশের ওপরই প্রবাহিত হয়, সে নদীকে জাতীয় নদী বলা হয়। জাতীয় নদীতে রাষ্ট্র একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও অধিকার ভোগ করে থাকে। ইংল্যান্ডের টেমস নদী হচ্ছে জাতীয় নদীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
২. আন্তঃসীমান্ত নদী: একাধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী হচ্ছে বহুজাতিক নদী বা আন্তঃসীমান্ত নদী। বাংলাদেশের মোট ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোমতী, তিস্তা, সুরমা, কুশিয়ারা, নাফ ইত্যাদি আন্তঃসীমান্ত নদী।
৩. অভিন্ন নদী: যেসব নদীতে একাধিক রাষ্ট্রের মালিকানা বা অংশীদারিত্ব আছে, সেসব নদীকে অভিন্ন নদী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে সীমান্ত নদী, আঞ্চলিক নদী ও আন্তর্জাতিক নদীসমূহকে অভিন্ন নদী বলে অভিহিত করা হয়।

● **সীমান্ত নদী, আঞ্চলিক নদী ও আন্তর্জাতিক নদী কাকে বলে?**

উত্তর: সীমান্ত নদী: দুটো রাষ্ট্রের সীমানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী হচ্ছে সীমান্ত নদী। সীমান্ত

নদী দুটো রাষ্ট্রের সীমানা হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত নাফ নদী। একইভাবে ডেট্রয়েট নদী যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে, রাইন জার্মান ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে এবং আমুর নদী চীন ও রাশিয়ার সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আঞ্চলিক নদীঃ যেসব নদীর সমুদ্রের সাথে সম্পর্ক নেই অথচ একাধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সে নদী সমূহকে আঞ্চলিক নদী বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, দণি আমেরিকার লাপ-টা নদী।

আর্ন্তজাতিক নদীঃ যে নদীগুলো একাধিক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়ে, সেগুলোই হচ্ছে আন্তর্জাতিক নদী। যেমন গঙ্গা, আমাজন, দানিয়ুব নদী ইত্যাদি। বিশ্বের প্রায় ২৬১টি নদী আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক নদীগুলো আন্তঃসীমান্ত নদীও বটে। বাংলাদেশের এ ধরনের নদীর মধ্যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর নাম উলে-খযোগ্য।

● **বাংলাদেশের উপর নিয়ে প্রবাহিত আন্তঃসীমান্ত বা আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে অংশীদারিত্ব রার বিষয়ে করণীয় সর্ম্পকে পরামর্শ দিন।**

উত্তরঃ বাংলাদেশের নদ- নদীর মধ্যে ৫৭টি নদীর উৎপত্তিস্থল প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারে অবস্থিত। এসব আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা বা পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুল, ফেনী, খোয়াই, গোমতী, মনু, তিস্তা নদীসমূহের নাম উলে-খযোগ্য। ভারত থেকে আসা ৫৪টি নদীর উজানে একাধিক ড্যাম ও বাঁধ নির্মাণ করে ভারত শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহের হার কমতে কমতে এখন ১০ ভাগে পৌছেছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত আন্তঃসীমান্ত বা আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে অংশীদারিত্ব রার বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১. যৌথ- নদী কমিশনকে শক্তিশালী করা ও দক্ষযোগ্য বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা;
২. সঠিক রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা;
৩. তিকর প্রভাব নির্ণয়ে সমীা পরিচালনা করা;
৪. দ্বিপাকি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা;
৫. যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প গ্রহণ করা
৬. দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে ব্যর্থ হলে আর্ন্তজাতিক সংস্থার দ্বারস্থ হওয়া
৭. আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী গক্ষুপগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

◆ বিভাগ ঃ গ

অর্জিত বিষয়সমূহ
Empirical Issues

অধ্যায় : ১	জাতিসংঘ ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
অধ্যায় : ২	বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জি-৮ এবং জি-৭৭
অধ্যায় : ৩	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
অধ্যায় : ৪	দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ঃ সার্ক
অধ্যায় : ৫	বিমসটেক
অধ্যায় : ৬	ইউরোপীয় ইউনিয়ন
অধ্যায় : ৭	দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা ঃ আসিয়ান
অধ্যায় : ৮	উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা ঃ ন্যাটো
অধ্যায় : ৯	এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন ঃ অ্যাপেক
অধ্যায় : ১০	ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা
অধ্যায় : ১১	দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি
অধ্যায় : ১২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি
অধ্যায় : ১৩	ভারতের পররাষ্ট্রনীতি
অধ্যায় : ১৪	দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক : বর্তমান প্রেক্ষাপট
অধ্যায় : ১৫	বহুপাক্ষিক সম্পর্ক : বর্তমান প্রেক্ষাপট
অধ্যায় : ১৬	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
অধ্যায় : ১৭	সাজেশন : সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর



জাতিসংঘ

অধ্যায় ১

জাতিসংঘ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

The United Nations : Past, Present & Future

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১.১ ভূমিকা
১.২ গঠন
১.৩ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ
১.৪ জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ
১.৫ লীগ অব নেশন'স এবং জাতিসংঘের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা
১.৬ সাদৃশ্য
১.৭ পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য
১১ জাতিসংঘের গঠন ও কার্যাবলি
১.৯ সাধারণ পরিষদ
১.৯(১) সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি
১.৯(২) সাধারণ পরিষদের মূল্যায়ন
১.১০ নিরাপত্তা পরিষদ
১.১০(১) নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালী
১.১০(২) নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি
১.১০(৩) নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি
১.১০(৪) নিরাপত্তা পরিষদকে আরো কার্যকর করার জন্য সুপারিশমালা
১.১০ (৫) জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান এর নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করতে মডেল
১.১০(৬) নিরাপত্তা পরিষদের মূল্যায়ন
১.১০(৭) নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভেটো ক্ষমতা মূল্যায়ন
১.১১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
১.১১(১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন প্রণালী
১.১১(২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি
১.১২ অছি পরিষদ
১.১২(১) অছি পরিষদের গঠন
১.১২(২) অছি পরিষদের কার্যাবলি

১.১২(৩) বর্তমান অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত
১.১৩ আন্তর্জাতিক আদালত
১.১৩(১) আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনপ্রণালী
১.১৩(২) আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যাবলি
১.১৪ সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর
১.১৪(১) সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর এর গঠন
১.১৪(২) সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ
১.১৫ জাতিসংঘের ভূমিকা বা সাফল্য ও ব্যর্থতা
১.১৫(১) জাতিসংঘের সাফল্য
১.১৫(২) জাতিসংঘের বিগত দিনের সফলতা
১.১৬ সম্মিলিত জাতিসংঘের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক
১.১৬ (১) মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ জাতিসংঘ
১.১৭ জাতিসংঘের দুর্বলতার কারণ
১.১৮ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
১.১৮(১) নতুন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন
১.১৮(২) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক
১.১৮(৩) শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যাবলি
১.১৮(৪) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা
১.১৮(৫) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সুফল
১.১৮(৬) শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের কুফল
১.১৯ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা
১.১৯(১) সিডও ১৯৭৯
১.২০ জাতিসংঘ সংস্কার
১.২০(১) জাতিসংঘের সংস্কার কেন দরকার
১.২০(২) জাতিসংঘের সংস্কারের পথে বাধাগুলো
১.২০(৩) জাতিসংঘের সংস্কারের রূপরেখা
১.২০(৪) জাতিসংঘের সংস্কারের রূপরেখা সম্পর্কে মতামতগুলো
১.২০(৫) জাতিসংঘের সংস্কারের মূল্যায়ণ
১.২১ জাতিসংঘের সামগ্রিক মূল্যায়ণ : জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ
১.২২ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত
১.২২ (১) নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কাঠামোগত সুপারিশ
১.২৩ এক নজরে জাতিসংঘ
১.২৪ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
১.২৫ জাতিসংঘে মানবাধিকার কমিশন
১.২৬ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ
১.২৭ সাধারণ পরিষদের সভাপতি
১.২৮ জাতিসংঘে উচ্চপদে বাংলাদেশী
১.২৯ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ
১.৩০ জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ
১.৩১ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১.১ ভূমিকা (Introduction)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা মানবজাতিকে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে দারুণভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য করে। এরই পটভূমিতে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সংগঠন 'লীগ অব নেশনস্' বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু লীগ নানাবিধ কারণে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা অনেক মারাত্মক কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময় ছিল। বিশ্বযুদ্ধের এ লোমহর্ষক ও মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা সমগ্র মানবজাতিকে আতঙ্কিত করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবতা, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ সংস্থার মধ্যে সাধারণ পরিষদ অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ। একে বিশ্বের মহাসভা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। গত (১৯৪৫-২০১৫) ৭০ বছরে সাধারণ সভার কার্যাবলি ও ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ সভার গুরুত্ব ও প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। Evan Luard সাধারণ সভার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর The United Nation. How it works and what it Does" গ্রন্থে বলেছেন, "সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক সমাজকে যদি একটি জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে সাধারণ সভাকে পার্লামেন্টের সাথে তুলনা করা সঙ্গত। পৃথিবীর শান্তিকামী মনীষী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা শুরু করেন। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের বৈঠকের পর ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে আটলান্টিক সনদ ঘোষিত হয়। এ সনদে মানবজাতিকে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কতকগুলো সাধারণ নীতি

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে জাতিসংঘ

২৮ জুন ১৯১৯ → জাতিপুঞ্জ গঠনের চুক্তিপত্র গৃহীত হয়। (২য় ভার্সাই চুক্তিতে)
↓
১০ জানুয়ারি ১৯২০ → জাতিপুঞ্জের গঠন।
↓
১৯৩৯ সালে → জাতিপুঞ্জের বিলুপ্তি।
↓
১২ জুন ১৯৪১ → লন্ডন ঘোষণা।
↓
১৪ আগস্ট ১৯৪১ → আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর।
↓
১ জানুয়ারি ১৯৪২→জাতিসংঘের ঘোষণা স্বাক্ষরিত (৪টি রাষ্ট্র)
↓
২ জানুয়ারি ১৯৪২→ জাতিসংঘের ঘোষণায় স্বাক্ষর ↓ করে ২২টি রাষ্ট্র পরবর্তীতে স্বাক্ষর করে ২১টি।
১৯-৩০ অক্টোবর ১৯৪৩ → মস্কো সম্মেলন। (৭ দফা ঘোষণা)।
↓
নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৩ → তেহরান সম্মেলন। (আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান)।
↓
১৯৪৪ → ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন (জাতিসংঘ নামকরণ)।
↓
১৯৪৫ → ইয়াল্টা সম্মেলন (ভেটো ক্ষমতা প্রদান)।
↓
২৬ জুন ১৯৪৫ → সানফ্রান্সিসকোতে সম্মেলন ↓ (৫০টি দেশ স্বাক্ষর করে)
২৬ জুলাই ১৯৪৫→ ২৬ জুলাই সনদ অনুমোদিত (৫১টি দেশ)
↓
১৫ অক্টোবর ১৯৪৫ → একান্নতম সদস্য হিসেবে ↓ পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করে।
২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ → জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়।
↓
২৩ অক্টো:-১৬ ডিসে: ১৯৪৬ → জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন।
↓
২০ অক্টোবর ১৯৪৭ → জাতিসংঘের পতাকা ↓ নির্ধারিত।
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ → জাতিসংঘে বাংলাদেশের ↓ সদস্য পদ লাভ (১৩৬ তম, ২৯তম অধিবেশনে)।
১৪ জুলাই ২০১১ → জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য (১৯৩তম) দক্ষিণ সুদান।

নির্ধারিত হয়। এতে বলা হয়, প্রত্যেক জাতি ইচ্ছা মতো সরকার গঠন করে সার্বভৌম ভূখণ্ডের মালিক হতে পারবে। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে কোনো রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগ নীতি অবলম্বন করতে পারবে না। সকল জাতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শ্রমের উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের জন্য সমানভাবে সহযোগিতা করবে। এখানে প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মোতাবেক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১.২ গঠন (Formation)

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ১৯৪৩ সালের মস্কো ঘোষণার একটি বিশ্ব সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত ও স্বীকৃত হন। প্রথমে গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) এ ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করে। পরে বিশ্বের আরও অনেক রাষ্ট্র এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাম্বারটন ওকস শহরে বিশ্ব সংস্থা গঠনের জন্য ১৯৪৫ সালে এক অধিবেশন ডাকা হয়। এ অধিবেশন বিশ্ব সংস্থা গঠনের নিমিত্তে কতকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতিমালা গৃহীত হয়। ডাম্বারটন ওকসের প্রস্তাবলির ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৪৫ সালে ২৬ জুন এক বিশেষ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্স বা সম্মেলনে মোট ৫০টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গ প্রস্তাবিত বিশ্ব সংস্থার সনদ রচনা করার জন্য স্বাক্ষর দান করেন এবং পরে ৫১টি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত সনদ অনুমোদিত হয়। অতঃপর ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবিত বিশ্ব সংস্থার সনদটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বুকে বিশ্ব সংস্থা হিসেবে জন্ম নেয় সম্মিলিত জাতিসংঘ বা UN। জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দু'টি প্রধান শাখা রয়েছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস বহন করে বিশ্ব শান্তির সুমহান লক্ষ্যে গঠিত সম্মিলিত জাতিসংঘ শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।



১.৩ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ
Aims and objectives of UN

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার সুমহান লক্ষ্যে গঠিত সম্মিলিত জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘের প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হলো :

১. জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. শান্তির প্রতি সর্বপ্রকার হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা প্রতিরোধ করা।
৩. সাম্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে সকল জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুসুলভ মনোভাব গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবিক ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা।
৫. বিশ্বের সকল মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৬. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান বা নিষ্পত্তি করা।
৭. উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের কার্যকলাপে সমন্বয় সাধন করা।

১.৪ জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ (Principles of the UN)

১. সকল সদস্য রাষ্ট্র সমান মর্যাদার অধিকারী এবং যে কোনো শান্তিকামী রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য লাভ করতে পারে।
২. জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আপন দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে হবে।
৩. কোনো সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভীতি বা বলপ্রয়োগ নীতি অবলম্বন করতে পারে না।
৪. সকল সদস্য রাষ্ট্র বিশ্বশান্তি নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার রক্ষাকল্পে আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের শান্তি পূর্ণ নিষ্পত্তি করবে।
৫. জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থার প্রতি সকল সদস্য রাষ্ট্র পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করবে।
৬. জাতিসংঘের সদস্য ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রেরও জাতিসংঘের মূলনীতির পরিপন্থী কার্যকলাপ সংঘটিত করে শান্তিভঙ্গ করতে পারে না।
৭. জাতিসংঘ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

১.৫ লীগ অব নেশন'স এবং জাতিসংঘের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (Comparision between Covent of The League of Nations and The United Uations)

United Nations এবং League of Nations উভয় আন্তর্জাতিক সংগঠনই বর্তমান জগতের অভিনব সৃষ্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা মানবজাতিকে বিশ্ব শান্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার জন্য গড়ে ওঠেছিল League of Nations বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু League of Nations নানাবিধ কারণে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ধ্বংস-লীলা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ডাম্বরটন ওকস ও সানফ্রান্সিসকো অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনার পর United Nations এর সনদ রচয়িতাগণ এ প্রতিষ্ঠান এ স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই পূর্ববর্তী League of Nations এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সেই সঙ্গে সনদ রচয়িতাগণ সচেতনভাবেই League of Nations এর ত্রুটিগুলো পরিহারের চেষ্টা করেছিলেন। League of Nations এর সার্থক কার্যক্রম একদিকে যেমন তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি

League of Nations এর ত্রুটি ও ব্যর্থতাগুলো তাদের সাবধান ও সচেতন করে তুলেছিল। সুতরাং League of Nations ও United Nations এর মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

১.৬ সাদৃশ্য (Similarities)

১. **উদ্দেশ্যের দিক থেকে :** League of Nations এবং United Nations এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের শান্তি নিরাপত্তা রক্ষা করা। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানই যুদ্ধ প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করেছে। উভয় প্রতিষ্ঠানই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ও যৌথ নিরাপত্তার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিধ পদ্ধতির উল্লেখ করেছিল। League of Nations এর আমলে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক কাজের সঙ্গে কিছু কিছু মানব কল্যাণমূলক কার্যাবলিও সম্পাদন করা হয়েছিল। United Nations এর উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানব কল্যাণমূলক সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার সাধন করা। বস্তুত এ দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ওপরই United Nations এর আমলে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেদিন থেকে League of Nations এর চুক্তিপত্র অপেক্ষা United Nations এর সনদে গৃহীত উদ্দেশ্যগুলো অনেক বেশি ব্যাপক।

২. **সংগঠনের দিক থেকে :** League of Nations এবং United Nations এর মধ্যে সংগঠনগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। League of Nations এর আমলে একটি লীগ সভা , একটি লীগ পরিষদ, একটি সচিবালয় ও একজন মহাসচিব, ম্যানডেট ব্যবস্থা ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। United Nations একটা নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদও স্থাপন করেছে। League of Nations পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। United Nations এর নিরাপত্তা পরিষদে ৫ জন স্থায়ী সদস্য রয়েছে, উভয় প্রতিষ্ঠানই অনুভব করেছিল যে, স্থায়ী সদস্যদের সহযোগিতা ছাড়া বিশ্বশান্তি রক্ষা সম্ভব নয়।

৩. **অন্যান্য সাদৃশ্য :** League of Nations এর সঙ্গে United Nations এর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়–

- League of Nations এর আমলে বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার নীতি ঘোষিত হয়েছিল। United Nations এর সনদে আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বিশদভাবে বহু পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে।
- League of Nations এবং United Nations বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যৌথ নিরাপত্তার ধারণা গ্রহণ করেছে।
- League of Nations এর আমলে ম্যানডেট ব্যবস্থার মাধ্যমে পরাধীন জনগণের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছিল। United Nations, League of Nations এর অনুকরণে কয়েকটি পরাধীন অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের জন্য অছি পরিষদ স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে United Nations বিশ্বের পরাধীন জনগণের স্বাধীনতা অর্জনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
- League of Nations এর আমলে আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছিল। United Nations এর সনদেও আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- League of Nations এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করা। United Nations এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষঅর্জন।
- League of Nations তার দুই দশকের কার্যকালে বহু কল্যাণমূলক কার্যাবলি গ্রহণ করেছিল। United Nations এর আমলেও কল্যাণমূলক কার্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- League of Nations প্রথম স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন করে তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের প্রসার সাধনে ব্রতী হয়েছিল। ঐ আদালতের কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে United Nations এর আমলে আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

- League of Nations এর চুক্তিপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কোনো সদস্য অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। United Nations এর আমলেও অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- League of Nations এর যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনো সামরিক বাহিনী ছিলনা। United Nations এর আমলেও ঐরূপ শান্তিরক্ষাবাহিনী গঠন সম্ভব হয় নি।
- League of Nations সদস্যরা ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল ও তার ফলে League of Nations ব্যর্থ হয়। United Nations এর আমলেও বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের প্রতি সচেতন। সেই কারণে United Nations আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারে নি।

১.৭ পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য (Defferences and Dissimilarities)

প্রথমত : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত League of Nations ছিল প্রধানত ইউরোপীয়ান সংগঠন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত United Nations একটা বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : League of Nations চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। United Nations জনগণের সংকল্প ও ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেছে। সেই দিক থেকে United Nations এর সনদ অধিকতর গণতান্ত্রিক।

তৃতীয়ত : League of Nations এর আমলে শান্তিপূর্ণ পন্থতিতে এবং যৌথ নিরাপত্তার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছিল। United Nations এর আমলে ঐ দুই পন্থতি ছাড়াও শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

চতুর্থত : League of Nations এর যৌথ নিরাপত্তার ধারণা ছিল বিকেন্দ্রীভূত ও ত্রুটিপূর্ণ। United Nations এর আমলে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে।

পঞ্চমত : League of Nations এর সভা ও লীগ পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট ছিল না। United Nations এর আমলে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠত : League of Nations এর সভা ও লীগ পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট ছিল। United Nations এর আমলে মহাসচিবকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করা হয়েছে।

সপ্তমত : League of Nations এর কিছু কল্যাণমূলক কার্যাবলি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু United Nations এর আমলে কল্যাণমূলক কার্যাবলির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দান করা হয় এবং একটা পৃথক পরিষদ স্থাপন করা হয়।

অষ্টমত : League of Nations এর ব্যবস্থা অপেক্ষা অছি পরিষদ অনেক বেশি সুসংবদ্ধ ও অধিক ক্ষমতা অধিকারী।

নবমতম : League of Nations এর চুক্তিপত্রের অংশ ছিল না। United Nations এর আদালত সনদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। League of Nations আমলে প্রতি ৯ বছর অন্তর আদালতের সব বিচারপতিদের নির্বাচন করা হতো। United Nations এর আমলে প্রতি তিন বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ বিচারককে পুনর্নির্বাচিত করা হয়।

দশমত : League of Nations এর সদস্যপদ প্রত্যাহারের নীতির উল্লেখ ছিল। তারই সুযোগ নিয়ে অনেক প্রভাবশালী দেশ সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। জাতিসংঘ সনদে সদস্যপদ প্রত্যাহারের কোনো নিয়ম সংযোজিত হয় নি।

একাদশতম : League of Nations এর কোনো সদস্য যদি চুক্তিপত্রের সংশোধন অনুমোদন না করে তবে সেই রাষ্ট্র ঐ সংশোধন মানতে বাধ্য থাকবে না। United Nations এর সনদে ঐ ধরনের কোনো ধারা সংযোজিত হয় নি।

দ্বাদশতম : United Nations এর আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাবশালী সদস্য। কিন্তু League of Nations আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদস্য পদ গ্রহণ করে নি।

ত্রয়োদশতম : League of Nations এর আলোচনায় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রাধান্য ছিল।

http://thejobstudy.com Go to Contents

কিন্তু United Nations এর সাধারণ সভায় আলোচনা ইউরোপের বাইরে প্রসারিত তৃতীয় বিশ্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

মনে রাখার Technique & Tips

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি

১. আলাপ আলোচনামূলক কার্যাবলি
২. নির্বাহী সংক্রান্ত কাজ
৩. নির্বাচনমূলক কাজ
৪. অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি
৫. আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক কার্যাবলি
৬. তত্ত্বাবধানমূলক কাজ
৭. কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি
৮. উদ্যোগ গ্রহণ
৯.বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষামূলক কার্যাবলি

চতুর্দশতম : League of Nations চুক্তিপত্রে সার্বভৌমত্বের সাম্যের নীতি স্পষ্টভাবে স্বীকৃত ছিল না। United Nations এর সনদে এ নীতি স্বীকৃত হয়েছিল। League of Nations চুক্তিপত্রে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এলাকায় League of Nations এর হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকবে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। কিন্তু United Nations এর সনদে ২(৭) ধারায় ঐ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পঞ্চদশতম : League of Nations এর চুক্তিপত্র মিউনিখ চুক্তির অংশ ছিল। তার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ত্রুটি দূর করার জন্য United Nations এর সনদকে কোনো শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

ষষ্ঠদশতম : League of Nations এর আমলে চুক্তিপত্রে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হলেও বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় নি। League of Nations এর আমলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা প্রবর্তিত হয় নি, United Nations এর সনদে ভেটো ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

সপ্তদশতম : League of Nations প্রতিষ্ঠার দুই দশকের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত United Nations প্রতিষ্ঠার ৬ দশকের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ হয় নি।

সুতরাং উপরিউল্লিখিত ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জাতিসংঘ লীগের চেয়ে উন্নততর সংস্করণ। League of Nations মূলত ছিল ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সেক্ষেত্রে United Nations সমগ্র বিশ্বের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হয়েছে। বস্তুত United Nations আপন মহিমা ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এ প্রসঙ্গে Hartmann মন্তব্য করেছেন যে, " The United Nations is, in so far as its vital functions are concerned an improved version of the League of Nations." এবং অধ্যাপক শুম্যান বলেন, "The United Nations Organisation is the League of Nations in a new guise" অর্থাৎ United Nations এর গঠন League of Nations এরই নব ছদ্মবেশ স্বরূপ।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- United Nations ও League of Nations এর মধ্যে কতকগুলো সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়–আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই United Nations ও League of Nations এর মূল উদ্দেশ্য।
- উভয় সংগঠনই বিশ্বের বিবিধ সমস্যার মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।
- উভয় সংগঠনই শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।
- উভয় সংগঠনই শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
- উভয় সংগঠনই মানব জীবনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বহুবিধ কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
- United Nations ও League of Nations এর মধ্যে কতকগুলো বৈসাদৃশ্য আছে– League of Nations ছিল মূলত ইউরোপীয়ান সংগঠন, United Nations একটি বিশ্বজনীন

প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে।

- জাতিসংঘ লীগের আমলে ঘোষিত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নততর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।
- United Nations কল্যাণমূলক কার্যাবলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল।
- জাতিসংঘ লীগের উন্নততর সংস্করণ।

১.৮ জাতিসংঘের গঠন ও কার্যাবলি (Formation and functions of the United Nations)

জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক এর উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ৬টি শাখা বা বিভাগ রয়েছে। জাতিসংঘ ও বিভাগসমূহ মাধ্যমে তার কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যথা :

- সাধারণ পরিষদ (The general assembly)
- নিরাপত্তা পরিষদ (Security council)
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and social council)
- অছি পরিষদ (The trusteeship council)
- আন্তর্জাতিক আদালত (International court of justice)
- সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর (Secretariat or editorial office)

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর নিজস্ব কোনো ভূখণ্ড নেই। সকল সদস্য রাষ্ট্রের আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করে। বিশ্বব্যাপী এর কার্যাবলি বিস্তৃত।

নিম্নে জাতিসংঘের বিভাগসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো :

১.৯ সাধারণ পরিষদ (The general assembly)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের ৬টি শাখার মধ্যে সাধারণ পরিষদই সর্ববৃহৎ এবং অনন্য। সকল সদস্য রাষ্ট্র সমবায়ে এ পরিষদ গঠিত। এটিকে একটি আইন পরিষদ বা আলোচনা পরিষদ (Discussion body) বলা যেতে পারে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ৫জন করে প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে পাঠাতে পারে। জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ সংস্থার মধ্যে সাধারণ পরিষদ অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ। একে বিশ্বের মহাসভা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোটাধিকার থাকবে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩ তে উন্নীত হয়েছে। বছরে অন্তত একবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হয়। প্রয়োজনবোধে জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুরোধে সেক্রেটারি জেনারেল ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহবান করতে পারেন। সাধারণ পরিষদের প্রতিটি অধিবেশনের জন্য একজন সভাপতি ও ১৭ জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন । সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে যে কোনো সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সদস্যপদ দান, বাজেট, নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের (সমর্থন) প্রয়োজন হয়। গত (১৯৪৫-২০১৪) ৬৯ বছরে সাধারণ সভার কার্যাবলি ও ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ সভার গুরুত্ব ও প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। Evan Luard সাধারণ সভার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর "The United Nation. How it works and what it Does" গ্রন্থে বলেছেন, "সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক সমাজকে যদি একটি জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে সাধারণ সভাকে পার্লামেন্টের সাথে তুলনা করা সঙ্গত। এখানে প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়" আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মোতাবেক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১.৯ (১) সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি (Functions of the general assembly)

সাধারণ পরিষদ সম্মিলিত জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। জাতিসংঘের সাধারণ সভা ও আইনসভা হিসেবে পরিষদ বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। জাতিসংঘ সনদের ১০ থেকে ১৭, ২১ থেকে ২৩, ৬১, ৮৬, ৯৩, ১০১, ১০৮ এবং ১০৯ নম্বর ধারাসমূহে সাধারণ সভার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে সাধারণ সভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **আলাপ আলোচনামূলক কার্যাবলি :** জাতিসংঘ সনদের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পরিষদে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে এবং তা নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার জন্য সুপারিশও করতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ আলোচনায় বসতে পারে না।

জাতিসংঘের ১১, ১২ এবং ১৩ নং ধারায় সাধারণ পরিষদকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. **নির্বাহী সংক্রান্ত কাজ :** নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ, কোনো সদস্যকে সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে নতুন কোনো সংস্থা গঠন করতে পারে। কোনো গুরুতর সমস্যা সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদ সম্মিলিতভাবে সামরিক ব্যবস্থাসহ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এতো সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নতির লক্ষ্যে গবেষণার ব্যবস্থা করতে পারে। অবশ্য সাধারণ পরিষদ নিজস্ব ক্ষমতাবলে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরি করতে পারে না।

৩. **নির্বাচনমূলক কাজ :** সাধারণ পরিষদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্বাচনমূলক। সাধারণ পরিষদ সনদ অনুযায়ী নিম্ন পর্যায়ে আলোচনা করা হলো।

ক. এ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্যকে নির্বাচিত করে।

খ. এ পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৪ জন সদস্যকে নির্বাচন করে।

গ. এ পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালতের ১৫ জন বিচারকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে ভোট প্রদান করে থাকে।

ঘ. সাধারণ পরিষদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনমূলক কাজ হচ্ছে জাতিসংঘের মহাসচিবের নির্বাচন। জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিমক্রমে ৫ বৎসরের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব (Secretary-General) কে নির্বাচন করে থাকে।

ঙ. এ পরিষদ অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

৪. **অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি :** সাধারণ পরিষদের নিকট কতিপয় অর্থ ও বাজেট সংক্রান্ত কার্যাবলি ন্যস্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের ১৭ নম্বর ধারায় সাধারণ সভাকে জাতিসংঘের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘকে দেয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ পরিষদই ধার্য করবে। সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত জাতিসংঘের কোনো আর্থিক বাজেট পাস হতে পারে না। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের বাজেট পাসের সাথে সাথে অন্যান্য সংস্থার বাজেটও পর্যালোচনা ও অনুমোদন করে থাকে।

৫. **আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক কার্যাবলি :** সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের তদারকি ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা ও সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালাও ঘোষণা করে থাকে।

৬. **তত্ত্বাবধানমূলক কাজ :** সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলি তদারক করে থাকে। বিভিন্ন পরিষদ তাদের কার্যাবলির বার্ষিক রিপোর্ট সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করে এবং সাধারণ পরিষদ তা পর্যালোচনা করে থাকে।

৭. **কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি** : সাধারণ পরিষদ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। সাধারণ পরিষদের কার্য নির্বাহের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটিসমূহ হচ্ছে :

ক. নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক কমিটি;
খ. অর্থনৈতিক ও অর্থ সংক্রান্ত কমিটি;
গ. বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি;
ঘ. প্রশাসন ও বাজেট বিষয়ক কমিটি;
ঙ. অছিগিরি কমিটি;
চ. মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি;
ছ. আইন বিষয়ক কমিটি।

৮. **উদ্যোগ গ্রহণ** : সাধারণ পরিষদ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যগত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার নিমিত্তে পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাধারণ সভা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং নারী, পুরুষভেদে সর্বস্তরের মানুষের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণ সভার উদ্যোগেই Sea Law Convention-1982, Genocide convention-1948 এবং Human rights Convention-1948 গৃহীত হয়।

৯. **বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষামূলক কার্যাবলি** : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অন্যতম মহান দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রও শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আলাপ আলোচনা করার জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট পাঠাতে পারে। সাধারণ পরিষদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ যৌথভাবে যে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ পরিষদে ১৯৫০ সালে গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোনো আগ্রাসী কার্যকলাপ রোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারণ পরিষদ ২৪ ঘন্টার মধ্যে জরুরি সভা আহবান করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কোরিয়া সংকটে ১৯৫০ সালে সাধারণ পরিষদ এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১.৯ (২) সাধারণ পরিষদের মূল্যায়ন (Evaluation of the general assembly)

সাধারণভাবে সংখ্যাধিক্যের ভোটেই সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় গৃহীত হয়ে থাকে। ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, চীনা, স্পেনীয় ও আরবি-এ ৬টি ভাষায় সাধারণ সভায় সমস্ত আলোচনা এবং কাজকর্ম চলে। গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে সাধারণ সভার ক্ষমতা ও প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেলেও ৬০-এর দশক থেকে তার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। সোভিয়েত-উত্তর স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর মার্কিন প্রভাবাধীন এক-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় সাধারণ সভাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়ার অপপ্রয়াস অব্যাহত আছে। সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাধ্যতামূলক নয়; তবুও বৃহত্তর বিশ্বের জোরালো সমর্থন থাকায় সেগুলোর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতাও কোনো অংশে কম নয়। সাধারণ সভার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (Epitome of the world) পরিলক্ষিত হয়। শুরুতে ৫০টির মতো রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ (General Assembly) আত্মপ্রকাশ করলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা ১৯৩ তে উপনীত হয়েছে। বিশ্ব জনমতের জাতিসংঘ নামক একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রশ্নে সাধারণ পরিষদ ভূমিকা অনন্য। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক পরিষদ শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতিসংঘ সনদের ৩৫নং অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এমন বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের যে কোনো পক্ষ বিষয়টির ওপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে থাকে। তবে, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ বিশেষ সংস্থা গঠন করে বিশেষভাবে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রভূত ক্ষমতার আধার সন্দেহ নেই, তবুও বিশ্ব জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে থাকে সাধারণ পরিষদে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- এ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ।
- সাধারণ সভা জাতিসংঘের সকল সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোটাধিকার থাকবে।
- সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়।
- সদস্যপদ দান, বাজেট, নিরপাত্তা ও শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের (সমর্থন) প্রয়োজন হয়।
- গত (১৯৪৫-২০১৪) ৬৯ বছরে সাধারণ সভার কার্যাবলি ও ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।
- তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ সভার গুরুত্ব ও প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক পরিষদ শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।
- সাধারণ সভা জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারে ।
- সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশের জন্য গবেষণা কাজে উৎসাহ দিতে পারেও সুপারিশ করতে পারে ।
- জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিমক্রমে ৫ বৎসরের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব (Secretary-General) কে নির্বাচন করে থাকে।
- সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদেরকে নির্বাচিত করে থাকে।

১.১০ নিরাপত্তা পরিষদ (Security council)

জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মুখ্য দায়িত্ব এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে বলে একে নিরাপত্তা পরিষদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র পরিষদ। সাধারণ পরিষদের ন্যায় এত বৃহৎ সংস্থার পক্ষে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মতো গুরুদায়িত্ব একা পালন করা কোনো অবস্থাই সম্ভব নয়। সাধারণ পরিষদকে সম্মিলিত জাতিসংঘের আইনসভা বলা হলে নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যত জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা যায়। জাতিসংঘের ৬টি শাখার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন।

১.১০ (১) নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালি (Structure of security council)

গঠন প্রণালির দিক থেকে নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদের মতো বৃহৎ নয়। ৫ জন স্থায়ী ও ১০ জন অস্থায়ী সদস্যসহ মোট ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়। অস্থায়ী সদস্যগণ ২ বছরের জন্য প্রতি বছর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোনো বিদায়ী সদস্য তাৎক্ষণিকভাবে পুনঃনির্বাচিত হতে পারবেন না। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে- ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া ও গণচীন। ১৯৭১ সালে ২৫ অক্টোবরের পূর্বে গণচীনের স্থলে জাতীয়তাবাদী চীন (তাইওয়ান) ছিল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি ও ভোটাধিকার থাকবে। নিরাপত্তা পরিষদ একটি সার্বক্ষণিক পরিষদ। এর সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গকে সদর দপ্তরে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকতে হয়। ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে পালাক্রমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে প্রতি মাসে নিরাপত্তা পরিষদের একজন সভাপতি নিযুক্ত হন। জাতিসংঘ সনদের ২৩(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা জাতিসংঘের সনদ সংশোধন ব্যতীত কোনো

অবস্থায়ই খর্ব করা যাবে না। নিরাপত্তা পরিষদ যে কোনো সাধারণ কার্যাবলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ ৯ জন সদস্যের সমর্থনই যথেষ্ট। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ৫জন স্থায়ী সদস্যের একমত হওয়া আবশ্যক। একজন দ্বিমত পোষণ করলে কোনোরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। স্থায়ী সদস্যদের এরূপ অভিনব ক্ষমতাকে ভেটো ক্ষমতা (Veto power) বলা যায়। নিরাপত্তা পরিষদের এরূপ ভেটো ক্ষমতা যথেষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা বলা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একজন স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ সমস্ত পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ভেটো ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা করা হলেও কার্যত এখনও একটি যথার্থই বলবৎ রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বছরের যে কোনো সময় যতবার ইচ্ছা বসতে পারে।

মনে রাখার Technique & Tips

নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি
১. সাংবাধানিক বা নির্বাহি সংক্রান্ত কার্যাবলি
২. শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক কাজ
৩. বিশ্ব শান্তি সংরক্ষণে প্রতিরোধ ও শক্তিপ্রয়োগমূলক কাজ
৪. অছি-বিষয়ক ক্ষমতা
৫. অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণবিষয়ক কাজ
৬. নতুন সদস্য গ্রহণ বিষয়ক ক্ষমতা
৭. সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করা
৮. নির্বাচনমূলক ক্ষমতা
৯. মিলিটারী স্টাফ কমিটি গঠন
১০. বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত
১১. নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

১.১০ (২) নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি (Functions of security council)

নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশীল পরিষদ। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মতো গুরুদায়িত্ব মূলত নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত। নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্ব শান্তি নিরাপত্তার ধারক ও বাহক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা ও কার্যাবলির ওপর জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অনেকখানি নির্ভর করে। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এটি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বও এ পরিষদের ওপর বর্তায়। কেউ কেউ একে জাতিসংঘের হৃৎপিণ্ড বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। নিম্নে নিরাপত্তা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সাংবিধানিক বা নির্বাহী সংক্রান্ত কার্যাবলি :** নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন কোনো সদস্য গ্রহণ কিংবা কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণ পরিষদকে সুপারিশ করে এবং সাধারণ পরিষদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে থাকে। জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোনো রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাহলে কেবল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমেই সাধারণ পরিষদ তা বিবেচনা করতে পারে।

২. **শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক কাজ :** নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ যে কোনো ঘটনার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে। আলাপ আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপস ও সালিশির মাধ্যমে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা করে ও শান্তি বিনষ্টকারী বিরোধের কারণ দূরীভূত করতেও সচেষ্ট হয়। নিরাপত্তা পরিষদকে সুপারিশ করতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ২৪ নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. **বিশ্বশান্তি সংরক্ষণে প্রতিরোধ ও শক্তিপ্রয়োগমূলক কাজ :** নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী ও পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্যকারী যে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও

http://thejobstudy.com Go to Contents

যোগাযোগ বিচ্ছিন্নমূলক যে কোনো ধরনের অবরোধ ও চাপ সৃষ্টি জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আবেদন জানাতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজবোধে শান্তি বিনষ্টকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক স্টাফ কমিটির পরামর্শক্রমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পদাতিক বিমান ও নৌবাহিনীর সাহায্যে তলব করতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ৩৯-৫১ ধারাসমূহে নিরাপত্তা পরিষদকে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তা পরিষদকে লক্ষ রাখতে হবে, এ ব্যাপারে যেন কোনো রাষ্ট্রের অধিকার, দাবি দাওয়া ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়।

৪. **অছি-বিষয়ক ক্ষমতা :** সনদের ৮৩-৮৪ নং অনুচ্ছেদে অছি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। যেসব অছি এলাকাকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের সব দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। ঐ সব অছি এলাকার চুক্তি অনুমোদন, পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অছি পরিষদের কাছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে [৮৩-৮৪]।

৫. **অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রীকরণবিষয়ক কাজ :** এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কাজে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সামরিক প্রধানগণ পরিষদকে সহায়তা দান করবেন। মূলত নিয়ন্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণমূলক কাজটি স্থায়ী সদস্যদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। এ লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ একটি কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের নাম হচ্ছে সনাতনধর্মী যুদ্ধাস্ত্র কমিশন।

৬. **নতুন সদস্য গ্রহণ বিষয়ক ক্ষমতা :** সম্মিলিত জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তবে সাধারণ সভার সাথে যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা নতুন সদস্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবেদনকারী কোনো রাষ্ট্র শান্তিপ্রিয় কিনা ও সনদে বর্ণিত বাধ্যবাধকতা পালন করতে পারবে কিনা, তা বিচার করেই নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করে। কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখন প্রতিশোধমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বাতিলের জন্যও নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করে। নিরাপত্তা পরিষদই আবার ঐ রাষ্ট্রের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রত্যর্পণ করতে পারে। সদস্যের বহিষ্কারের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা রয়েছে। কোনো সদস্য ক্রমাগত সনদ লংঘন করলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভায় তাকে বহিষ্কারের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ব্যতীত সাধারণ সভার পক্ষে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বহিষ্কার সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব গ্রহণ ও কার্যকর করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয়, এমন কোনো রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্ট্যাটিউটের অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিরোধের সাথে জড়িত কোনো পক্ষ যখন আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত পালনে ব্যর্থ হয়, তখন আবেদন অনুযায়ী বিচারালয়ের রায় কার্যকর করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে।

৭. **সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করা :** নিরাপত্তা পরিষদ প্রতি বছর তার কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অবস্থার ওপর সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

৮. **নির্বাচনমূলক ক্ষমতা :** নিরাপত্তা পরিষদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নির্বাচিত করে। সম্মিলিত জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন কোনো রাষ্ট্র বিচারপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে নিরাপত্তা পরিসদ সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ পেশ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা মহাসচিবকে নির্বাচিত

করে। সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদকে অংশগ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ মহাসচিবের কাছে সাধারণ সভার বিশেষ বা জরুরি অধিবেশন আহবানের দাবি করতে পারে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তার অধীনস্থ সংস্থা গঠন করতে পারে।

৯. **মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠন :** জাতিসংঘ সনদের ৪৭ নং ধারা মোতাবেক নিরাপত্তা পরিষদ মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠন করতে পারে। এ কমিটির দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের প্রয়োজন পূরণ, তার নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনী নিয়োগ, পরিচালনা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য ও পরামর্শ দান। নিরাপত্তা পরিষদের Chief of Staff-দের নিয়ে মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠিত হয়।

১০. **বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত :** জাতিসংঘ সনদের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হলে জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রকেও সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা সাহায্যের আহ্বান জানাতে পারে। সশস্ত্রবাহিনী নিয়োগের বিষয়ে পরিষদের আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য ঐ আহ্বান জানাতে পারে। দ্রুত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বল প্রয়োগের কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য অবিলম্বে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র জাতীয় বিমানবাহিনী নিয়ে জাতিসংঘকে নিয়োগের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১১. **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা :** নিরাপত্তা পরিষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলো নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নির্বাচিত করে। জাতিসংঘের সদস্য নয়-এমন কোনো রাষ্ট্র বিচারপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিয়োগ করে থাকে।

১২. **অন্যান্য কার্যাবলি :** নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের সংশোধনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সাধারণ পরিষদের বিশেষ বা জরুরি অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ মহাসচিবকে করতে পারে। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য পরিষদ অধীনস্থ সংস্থা গঠন করতে পারে।

সুতরাং জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ ব্যাপক ক্ষমতা ও কার্যাবলির অধিকারী। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের আন্তরিক সদিচ্ছা ও সক্রিয় কার্যকারিতার ওপর সুমহান আদর্শ বাস্তবায়ন করা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

১.১০(৩) নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি (Decision making process of security council)

নিরাপত্তা পরিষদ নিঃসন্দেহে জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ। এর কার্যক্রমের ওপর সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। এটি একটি স্থায়ী পরিষদ। সদস্যদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হয়। বছরে যে কোনো সময় যতবার ইচ্ছা এর অধিবেশন বসতে পারে। স্থায়ী ও অস্থায়ীসহ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫। কোনো সাধারণ বা পদ্ধতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৫ জনের মধ্যে যে কোনো ৯ জন সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি (ভোট) যথেষ্ট বলে বিবেচিত। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের একমত হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের যে কোনো একজন দ্বিমত পোষণ করলে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের এরূপ ভোট প্রদানের ক্ষমতাকে 'ভেটো ক্ষমতা' বলা হয়। কিন্তু কোনো স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র বিরোধের প্রশ্নে রাশিয়া ভোট প্রদান করতে পারে নাই। আবার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে রাশিয়া যুদ্ধ বিরতির বিপক্ষে ভোট দান করেছিলেন। যার ফলে যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে গণচীন প্রথমে ভেটো প্রয়োগ করেছিল। ইসরাইল ও ভিয়েতনাম সমস্যার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েকবারই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল।

১.১০(৪) নিরাপত্তা পরিষদকে আরো কার্যকর করার জন্য সুপারিশ
Recommendations for more Effective Security Council

প্রথমত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিশ্বে যারা বৃহৎ শক্তি ছিল আধুনিককালে আরও অনেক রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠেছে এবং তাদেরও নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের আসন দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তা পরিষদকে আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন হতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদের বেশির ভাগ সদস্যের প্রথম শ্রেণির রাষ্ট্র হতে হবে।

তৃতীয়ত : নিরাপত্তা পরিষদের সাফল্যের জন্য স্থায়ী সদস্যদের আচরণ পরিবর্তন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রতিটি বিষয় নিয়ে স্থায়ী সদস্যরা যদি বিবাদে লিপ্ত হয় তাহলে পরিষদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং বাস্তব পরিস্থিতি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থত : কেবল প্রস্তাব পাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলিকে সীমিত রাখার ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। প্রস্তাব লক্ষ্য সাধনের একটি মাধ্যম। মূল লক্ষ্য হলো বিরোধ মীমাংসা।

পঞ্চমত : নিরাপত্তা পরিষদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণে তৎপর হতে হবে। গোষ্ঠী স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে কেবল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রভাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর চাপে পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত নিলে কখনও সাফল্য আশা করা যায় না।

ষষ্ঠত : নিরাপত্তা পরিষদকে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ ও সংঘর্ষের বিষয় আলোচনা করতে হবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের কার্য পরিচালনায় গোপনীয়তার পরিবর্তে আরও বেশি প্রচার প্রয়োজন।

সপ্তমত : প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক প্রকাশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন এবং নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট নীতি গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ। সনদে বর্ণিত নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রত্যাশা নিয়ে সনদের রচয়িতাগণ পরিষদের হাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন, সেই প্রত্যাশা অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদকে অধিকতর কার্যকরী ও শক্তিশালী করা সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে আশা করা যায়। তবে নিরাপত্তা পরিষদের গঠনতন্ত্রে কিছুটা দুর্বলতা থাকার কারণে তা অনেক সময় যথার্থ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কাজেই নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতাগুলো সংশোধন করে একে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে।

১.১০(৫) জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান নিরাপত্তা পরিষদকে আরো কার্যকর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২টি বিকল্প উপায়ে এটি ঢেলে সাজাতে দুটি মডেলের অবতারণা করেছিলেন।

যথা : ১) মডেল - এ, ২) মডেল - বি

মডেল - এ

ভৌগোলিক এলাকা	দেশের সংখ্যা	বর্তমান স্থায়ী সদস্য(থাকবে)	প্রস্তাবিত স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা	প্রস্তাবিত অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা	মোট সংখ্যা
আফ্রিকা	৫৩	০	২	৪	৬
এশিয়া ও প্যাসিফিক	৫৬	১	২	৪	৬
ইউরোপ	৪৭	৩	১	২	৬
আমেরিকা	৩৫	১	১	৪	৬
মোট	১৯৯	৫	৬	১৩	২৪

এ প্রস্তাবিত মডেলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ৬ ভেটো ক্ষমতা (নতুন সদস্যের থাকবে না) এবং নতুন সদস্যগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

মডেল - বি

এ মডেল অনুসারে কোনো স্থায়ী সদস্য থাকবে না কিন্তু ৮ সদস্য বিশিষ্ট চার বছর মেয়াদি (নবায়নযোগ্য) একটি নতুন ক্যাটাগরি থাকবে এবং অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা হবে ১১টি (২ বছর মেয়াদি)।

ভৌগোলিক এলাকা	সদস্য রাষ্ট্র	বর্তমান স্থায়ী সদস্য সংখ্যা	প্রস্তাবিত নতুন সদস্যের সংখ্যা	প্রস্তাবিত অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা	মোট সংখ্যা
আফ্রিকা	৫৩	০	২	৪	৬
এশিয়া ও প্যাসিফিক	৫৬	১	২	৩	৬
ইউরোপ	৪৭	৩	২	১	৬
আমেরিকা	৩৫	১	২	৩	৬
মোট	১৯১	৫	৮	১১	২৪

Source: UN Department of Public Information, Exclusive Summary, A More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004, P - 80.

১.১০(৬) নিরাপত্তা পরিষদের মূল্যায়ন (Evaluation of the Security Council)

নিরাপত্তা পরিষদের কাজকর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শুরুতেই বলা যায় যে, জাতিসংঘের এ অঙ্গটির প্রতিশ্রুতি ও প্রকৃত কাজের মধ্যে ফারাক বিস্তর। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষ্যকার নিকোলাস (H.G Nicholas)-এর ভাষায়, 'Of all the organs of UN none has shown a greater discrepancy between promise and performance than the Security Council'. ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিনগুলোতে নিরাপত্তা পরিষদ তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। দুই পরাশক্তি মধ্যেকার বৈরিতা বিশ্ব রাজনীতিতে যে উত্তেজনার আবহ তৈরি করেছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রশমন করতে পারে নি নিরাপত্তা পরিষদ এবং এর ফলে অতীতে বার বার সমগ্র জাতিসংঘে সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। তুলনায় আলোচ্য পর্বে পরিস্থিতি অনেকটা সামাল দিতে সক্ষম হয়েছিল সাধারণ সভা। নিরাপত্তা পরিষদের এ নিষ্ক্রিয়তায় কোরিয়ার সংকট থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সাধারণ সভা অনেক বেশি উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যদিকে, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানেও পরিষদ বিশেষ কোনো সাফল্য পায় নি। পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা অনেকেই সনদের নীতি ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের দ্বারা তাড়িত হয়ে কাজ করেছিল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনও করে চলেছে। নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা ও অকার্যকরিতার এটিও অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিক অতীতে আফগান ও ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসনমুখী ভূমিকার সমালোচনা নিরাপত্তা পরিষদের তরফ থেকে কোনো যায় নি। নিরাপত্তা পরিষদের সীমাবদ্ধতা এখানেই। অল্প কথায় সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নিরাপত্তা পরিষদের ওপর বিশ্বশান্তি, সুস্থিতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল পরিষদ সেই দায়িত্ব পালনে অনেকটাই সক্ষম হয় নি। পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে সংহতির অভাব, তাদের সংকীর্ণ বেপরোয়া আচরণ, ভেটো ক্ষমতার অপপ্রয়োগ পরিষদের জনপ্রিয়তা বেশ কিছুটা হ্রাস করেছিল। সাধারণ সভার কাছে পরিষদের দায়বদ্ধতার ঘাটতিও সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘের ভাবমূর্তি মলিন করেছে। ৫টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিকে তাদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে অথচ কলেবর বৃদ্ধি সত্ত্বেও সাধারণ সভা সেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না, এ অগণতান্ত্রিকতা জাতিসংঘের সীমাবদ্ধ চরিত্রকেই বার বার তুলে ধরেছে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

১.১০.(৭) নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভেটো ক্ষমতা মূল্যায়ন

Evaluation of veto power in taking decision of the security council

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার এক মহান দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। নিরাপত্তা পরিষদের অভিপ্রায় ও ভূমিকা জাতিসংঘের অস্তিত্বকে গৌরবান্বিত অথবা ম্লান করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার এতটুকু গুরুত্ব থাকার কারণে এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিও এমন হওয়া উচিত, যাতে সকল রাষ্ট্রের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়। কোনো রাষ্ট্রের ওপর যেন কোনো প্রকারের অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া না হয় বা কোনো রাষ্ট্র যেন ন্যায়সঙ্গত সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়াস যেন কোনো অবস্থায়ই এতটুকু বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিসংঘের বর্তমান রীতি অনুযায়ী দেখা যায় যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের

ব্যাপারে ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের যে কোনো একজন কোনো কারণে দ্বিমত পোষণ করলে বা বিপক্ষে ভোট দান করলে সে বিষয়ে আর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ৪টি সদস্য রাষ্ট্রসহ বাকি ১০ জন সদস্য ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও একজনের কারণে সমস্ত বিষয় পণ্ড হয়ে পড়ে। এরূপ একক বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারকে অনেকেই অনুচিত, মাত্রাতিরিক্ত ও অসঙ্গত বলে আখ্যায়িত করেছেন। জাতিসংঘ সকল সদস্য রাষ্ট্র সমবায়ে গঠিত। সকলের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এরূপ একক প্রভুত্বমূলক বিশেষ ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে ৫টি বৃহৎ শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের নিকট অসহায় ও অধীনস্থ করে রেখেছে বলা যায়। এতে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়েছে বটে। তাছাড়া উক্ত বিশেষ ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ তাদের মদদ ও সমর্থনপুষ্ট অনুগত রাষ্ট্রসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। যার ফলে তাদের প্রতি আনুগত্যশীল কোনো রাষ্ট্রের স্বার্থের কোনো সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা পরিষদে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কোনো সমস্যার সময়োচিত সঠিক মীমাংসা করা যায় না। ভেটো ক্ষমতার উপস্থিতিতে জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার কারণে জার্মানি ও ইয়েমেন বহুদিন পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়েছিল। কোরিয়া আজও উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত রয়েছে। ইসরাইল বিশ্ব জনমতের সকল আবেদন উপেক্ষা করে বেপরোয়াভাবে প্যালেস্টাইনের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে, কাশ্মিরে সহিংস লড়াই চলছে।

অপরপক্ষে, ভেটো ক্ষমতায় গুরুত্বকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বৃহৎ ভূমিকাকে কখনও গৌণ করে দেখা যায় না। কোনো বৃহৎ শক্তি বিপক্ষে অবস্থান করলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই ভেটো ক্ষমতা বিষয়ে সকল স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে সমস্যারও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে। ভেটো ক্ষমতা বৃহৎ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মূল শক্তির উৎস বলা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যমে সুফলও পাওয়া যায়। যেমন- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রয়োগের ফলেই পরবর্তী সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য ভেটো ক্ষমতাই কেবল দায় নয়, বরং এর অপপ্রয়োগ ও পক্ষপাতমূলক ব্যবহারই দায়ী। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় বিশ্ব জনমতের দাবি অনুযায়ী এর সংশোধন ও সংস্কার একান্ত আবশ্যক। একক ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারকে বিলুপ্ত করা উচিত। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মীমাংসায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য স্থায়ী ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের ৩টির সমর্থন যথেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বলবৎ থাকতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের প্রশাসনিক পরিষদ ও তার হাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত।
- নিরাপত্তা পরিষদ ৫ জন স্থায়ী ও ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে গঠিত।
- জাতিসংঘের সনদে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো দানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- নিরাপত্তা পরিষদের সভা যে কোনো সময়ে আহবান করা যায়।
- নিরাপত্তা পরিষদের ওপর বহুমুখী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।
- জাতিসংঘের সনদে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।
- নিরাপত্তা পরিষদের প্রয়োজনীয় শর্তপূরণের অভাবে কার্যকর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।
- নিরাপত্তা পরিষদ বিবিধ শান্তিরক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শান্তি রক্ষার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ স্বস্তি পরিষদ (Safety Net) এ নামে পরিচিত।

১.১১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and social council)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক শাখা। বিশ্বমানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে সুখী, সুন্দর ও উন্নত জীবনযাত্রার

মান নিশ্চিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হবে।

১.১১(১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন প্রণালি
Structure of economic and social council

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন। এর কার্যকাল ৩ বছর। এ পরিষদের সদস্যরা ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি ৩ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন। বছরে অন্তত ৩ বার এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে। প্রয়োজনবোধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এ পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে।

১.১১(২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি
Functions of economic and social council

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপক কার্য সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

প্রথমত : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে অনুন্নত জাতিগুলোর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মানব কল্যাণ সাধনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

তৃতীয়ত : এ পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে কর্মরত অন্যান্য বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা করে। অন্যান্য সংস্থাসমূহকে এর অধিবেশনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়।

চতুর্থত : এ পরিষদ আপন দায়িত্ব পালনের জন্য চুক্তিপত্র তৈরি করে, সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাঠায়, সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে কাছ থেকে এর সুপারিশমালা কার্যকর করার ব্যাপারে রিপোর্ট চায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আগামী ৩ বছরের জন্য (২০১৪-২০১৬) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কমিটি, কমিশন ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিষদ বিভিন্ন এজেন্সি ও সংস্থার কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের কাজও করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থাসমূহের নিকট থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে এবং মন্তব্য ও সুপারিশ সহকারে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করে। ১৫টি বিশেষ সংস্থা, ১২টি কমিশন ও ৫টি সাবকমিশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

এক নজরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫টি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন

কমিশন	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	সদস্য সংখ্যা
আফ্রিকা অর্থনৈতিক কমিশন	১৯৫৮	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া	৫৪
ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন	২৮ মার্চ, ১৯৪৭	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	৫৬
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারেবীয় অর্থনৈতিক কমিশন	১৯৪৮	সানটিয়াগো,চিলি	৪৪ (সহযোগী-৭)
এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন সামাজিক কমিশন	২৮ মার্চ, ১৯৪৭	ব্যাংকক,থাইল্যান্ড	৫৩(সহযোগী-৯)
পশ্চিম এশীয় অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন	৯ আগষ্ট, ১৯৭৩	বৈরত, লেবানন	১৩

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন নিয়ে গঠিত। তারা তিন বছরের জন্য সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হন।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫টি আঞ্চলিক কমিশন, অনেক বিশেষজ্ঞ সংস্থা (Specialized agencies) ও (Special bodies) বিশেষ সংগঠন স্থাপন করেছে।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বহু ধরনের কল্যাণমূলক কার্যাবলি পরিচালনা করেছে।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে পারেনি।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা যায়।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে আন্তর্জাতিক আদালত

- International Court & Justice
- ২৯ জুন ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সদস্য রাষ্ট্র: ১২২ টি (সর্বশেষ আইভরিকোস্ট ১ মে ২০১৩)।
- বিচারক সংখ্যা: ১৫ জন।
- বিচারকের মেয়াদ: ৯ বছর।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট: পিটার টমকা স্লোভাকিয়া(৬ ফেব্রুয়ারী,২০১২)।
- বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট: বার্নাদো সেপুলভেদো আমর (নিয়োগ: ৬ ফেব্রুয়ারী,২০১২)
- বিচারকের মধ্য থেকে ৩ বছরের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ পান।

১.১২ অছি পরিষদ (The trusteeship council)

সম্মিলিত জাতিসংঘের অছি পরিষদ এক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংস্থা বা পরিষদ। অছি এলাকা (অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সার্বভৌমত্বহীন পৃথক জনপদ) সমূহের শাসন, তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই অছি পরিষদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। অছি রাষ্ট্র বা এলাকাসমূহের বিভিন্ন স্বার্থসংরক্ষণের জন্যই অছি পরিষদ গঠিত হয়েছে।

অছি এলাকা বলতে কী বুঝায় (What is meant by trusteeship council)

জাতিসংঘ সনদে অছি এলাকা বলতে এক বিশেষ ধরনের এলাকা বা রাষ্ট্র বোঝায়। যে জনপদ বা এলাকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই, কিন্তু পৃথক অস্তিত্ব বা সত্তা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, এরূপ এলাকাকে অছি এলাকা বলা হয়। তিন প্রকার এলাকা নিয়ে অছি এলাকা আওতাভুক্ত রয়েছে। যথা :

- যে সমস্ত এলাকা লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন সময়ে পরাজিত রাষ্ট্রসমূহের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এলাকা এবং
- চুক্তির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন অছি এলাকা।

১.১২(১) অছি পরিষদের গঠন (Formation of trusteeship council)

অছি পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। অছি রাষ্ট্র বা এলাকা সংখ্যা পরিবর্তনের সঙ্গে অছি পরিষদের সদস্য সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান এর সদস্য সংখ্যা ৬ জন। সাধারণ ৩ প্রকার সদস্য নিয়ে অছিগিরি পরিষদ গঠিত। যথা:

- অছি এলাকা শাসনকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র।
- অছি এলাকা শাসনকারী নয় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এমন স্থায়ী সদস্যের প্রতিনিধি এবং
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র।

অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোট রয়েছে। এর সভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বছরে দুইবার এর অধিবেশন বসে। এ পরিষদ সদস্যদের থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করে এবং নিজেই এর আইনকানুন প্রণয়ন করে থাকে। অছি পরিষদ জাতিসংঘের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের অধীনস্থ ও এদের তত্ত্বাবধানে থেকে কার্য পরিচালনা

করে।

১.১২(২) অছি পরিষদের কার্যাবলি (Functions of trusteeship council)

অছি এলাকার তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন সাধনে অছি পরিষদ সাধারণত নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যথা :

- অছি এলাকায় শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা অছি পরিষদের প্রধান কাজ।
- অছি পরিষদের অন্যতম কাজ হচ্ছে অছি এলাকাভুক্ত জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা।
- অছি এলাকার অধিবাসীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা।
- পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে শাসনকারী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্টের পর্যালোচনা করা।
- অছি পরিষদ অছি এলাকার অধিবাসীদের নিকট থেকে তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং শাসনকারী রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।
- অছি পরিষদ মাঝে মধ্যে শাসনকারী রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে অছি এলাকা পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ওপর রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ করে।

১.১২ (৩) বর্তমান অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহ নিয়ে জাতিসংঘের অধীনে অছি পরিষদ গঠন করা হয়। বর্তমানে একটি মাত্র অঞ্চল রয়েছে। এটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে প্যাসিফিক আইসল্যান্ডস। বর্তমানে অছি পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। ১৯৯৪ সালে পালাউ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দানের মধ্য দিয়ে এর কার্যক্রম স্থগিত হয়।

১.১৩ আন্তর্জাতিক আদালত (International court) :

আন্তর্জাতিক আদালত হচ্ছে সম্মিলিত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ বিচারালয়। আন্তর্জাতিক আদালত লীগ অব নেশনস এর স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আদালতের অধিবেশন প্রয়োজনবোধে যে কোনো স্থানে বসতে পারে।

১.১৩(১) আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনপ্রণালি (Strucuture of International court)

আন্তর্জাতিক আদালত ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে ৯ বছরের জন্য গঠিত হয়। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচিত করে। বিচারকরা একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতেই নির্বাচিত হন। কোনো প্রকার জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়। তবে একই রাষ্ট্রের একসঙ্গে দু'জন বিচারক নির্বাচিত হতে পারবেন না। মেয়াদান্তে বিচারকগণ পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। বিচারকগণ তাদের মধ্য থেকে ৩ বছরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। আদালতের কার্যক্রমে নয়জন বিচারপতির উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হয়। যে কোনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়।

১.১৩(২) আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যাবলি (Functions of International Court)

আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা। আদালত কোনো ব্যক্তিগত মামলা পরিচালনা করে না। শুধুমাত্র বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের সম্মতিক্রমেই আন্তর্জাতিক আদালত কোনো মামলা পরিচালনা ও রায় প্রদান করে থাকে। আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর করে। নিম্নে আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **আবেদনমূলক বিষয়ে এখতিয়ার বা কার্যাবলি** : জাতিসংঘের কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি অপর কোনো

সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং সে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য আবেদন করে, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসামূলক রায় প্রদান করে থাকে।

২. **জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে এখতিয়ার** : জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেয়, তাহলে আন্তর্জাতিক আদালত উক্ত বিরোধের আইনানুগ মীমাংসা প্রদান করে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

৩. **সন্ধি বা চুক্তিবিষয়ক কার্যাবলি** : জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্পাদিত সন্ধি বা চুক্তি বিষয়ে যদি কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সম্মতিক্রমে আদালত এর যথাযথ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।

৪. **উপদেশমূলক এখতিয়ার** : আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক যে কোনো বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ যদি আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট উপদেশ কামনা করে তাহলে আদালত উক্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদানে এগিয়ে আসে।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ অথবা জাতিসংঘের শর্তাধীন যে কোনো মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত রায় প্রদান করতে পারে। কিন্তু রায় কার্যকর করার কোনো চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালতের রায় কার্যকর করে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে এবং এ রায় সঠিকভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের মুখ্য বিচার বিভাগ।
- এ আদালত ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত। বিচারপতিগণ সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।
- ইউরোপের হেগ নগরীতে আদালতের মুখ্য কেন্দ্র অবস্থিত।
- আদালতের Statute-এ সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোকে কেবল বিচারপ্রার্থী হবার অধিকার প্রদান করা হয়েছে (Locus standi in judicio)
- আন্তর্জাতিক আদালতের ঐচ্ছিক এলাকা, বাধ্যতামূলক এলাকা ও পরামর্শ দান এলাকা আছে।
- জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যই আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী হবার অনীহা দেখিয়েছে।
- জাতিসংঘের সনদের ৯৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বিরোধের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি রাষ্ট্র মেনে চলবে।

১.১৪ সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর (Secretariat or editorial offic)

সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর হলো সম্মিলিত জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক শাখা বা বিভাগ। এটি একটি সার্বক্ষণিক বিভাগ। জাতিসংঘের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম ও বিভিন্ন বিভাগ, এজেন্সি ও সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব সেক্রেটারিয়েটের ওপর ন্যস্ত। সেক্রেটারিয়েটের দক্ষতা ও কর্ম প্রচেষ্টার ওপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা তথা সম্মিলিত জাতিসংঘের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে বলা যায়।

১.১৪(১) সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর এর গঠন
Structure of secretariat or editiorial office

একজন সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব এবং তার দ্বারা নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীদের সমন্বয়ে সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর গঠিত। সেক্রেটারিয়েটের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক জাতিসংঘের মুখপাত্র সেক্রেটারি জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সেক্রেটারি জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন ডেপুটি

সেক্রেটারি জেনারেল ও আন্ডার সেক্রেটারি থাকেন। সেক্রেটারি জেনারেল স্বপদে পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। সাধারণত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুদক্ষ ও উচ্চ কূটনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি উচ্চ বেতন-ভাতাদি পেয়ে থাকেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিসহকারে দায়িত্ব পালন করেন।

মনে রাখার Technique & Tips

জাতিসংঘের বিগত দিনের সফলতা

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা
২. শান্তি প্রতিষ্ঠা
৩. সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবদান
৪. উপনিবেশ বিলোপ, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা
৫. মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনও উন্নয়ন কর্মসূচী
৭. উদ্বাস্তু, অসহায় মানবতার সেবায়
৮. পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ
৯. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে
১০. পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ
১১. অসহায় ও দুর্গতদের সহায়তায় জাতিসংঘ
১২. নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণে
১৩. বিশ্ব ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে
১৪. আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন
১৫. শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায়
১৬. মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধে
১৭. বিশ্ব বাণিজ্য সমস্যার সমাধান
১৮. ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য

১.১৪(২) সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর এর বিভিন্ন বিভাগ
Various divisions of secretariat or editorial office

সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকীয় দপ্তর জাতিসংঘের কার্য নির্বাহী বিভাগ। এটা কতকগুলো বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক বিভাগে আবার একজন করে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল থাকেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সেক্রেটারি জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ও আন্ডার সেক্রেটারি থাকেন। সেক্রেটারি জেনারেল স্বপদে পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। সাধারণত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুদক্ষ ও উচ্চ কূটনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি উচ্চ বেতনভাতাদি পেয়ে থাকেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে দায়িত্ব পালন করেন।

১.১৫ জাতিসংঘের ভূমিকা বা সাফল্য ও ব্যর্থতা (Role or Success and Failure of UN)

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘই হলো ইতিহাসে প্রথম ও প্রকৃত আন্তর্জাতিক সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে রদ ও রহিত করে ভবিষ্যতে বিশ্ব শান্তিকে নিশ্চিত করার তীব্র বাসনায় তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা করে এবং এ লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ হিসেবে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই সম্মেলনে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র গৃহীত হয়। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) আত্মপ্রকাশ করে নতুন দিগন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়।

আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হলেও এ সংস্থার সাফল্য এবং স্থায়িত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বরং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় League of Nations গঠিত হলেও এ সংস্থার সাফল্য এবং স্থায়িত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। বরং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় League of Nations গঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই এ সংস্থাটির তাবৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবেই লীগ অব নেশনস্ তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে বিশ্বের মাটিতে সর্বপ্রথম জন্মলাভ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনটির

অকাল মৃত্যু ঘটে। অতপর লীগ অব নেশনস্- এর ধ্বংস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নব উদ্যম এবং উৎসাহে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল সংগঠন যা ২৬ জুন, ১৯৪৫ সানফ্রান্সিসকোতে ৫০টি দেশ বা জাতি জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করলে জাতিসংঘের (UN) জন্ম হয়। সনদ স্বাক্ষরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুম্যান উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেন, "আমরা যুদ্ধবিরোধীর যুদ্ধে জয়ী হলাম"। তার এ আবেদন প্রমাণ করে সে, ভবিষ্যত পৃথিবীতে যুদ্ধ নামের ধ্বংসাত্মক বাস্তবতা কল্পনায় পরিণত হবে। কিন্তু এটি সত্য যে, জাতিসংঘ জন্মের পর আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ না হলেও যুদ্ধ থেমে থাকে নি। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয় যে, "এ সংগঠনটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিশ্বের ছোট বড় জাতি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সম অধিকার প্রতিষ্ঠায়"। কিন্তু (১৯৪৫-২০১৪) ৬৯ বছর বয়সী জাতিসংঘ এখনও বিশ্বের সকল মানুষের অধিকারকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নি অথবা বিশ্বের মানুষের অধিকার রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করে নি।

জাতিসংঘ জন্মের পর থেকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তারক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। জাতিসংঘ উপনিবেশ বিলোপ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা অর্জন করেছে। অসহায় ও দুর্গতদের সহায়তায় জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষায় জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কারণ অব্যাহত একটি প্রক্রিয়ায় সফলতা ও ব্যর্থতা থাকে না। থাকে, প্রত্যাশামাফিক প্রাপ্তিতা ও অপ্রাপ্তিতা। একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব জাতিসংঘের লক্ষ্য হলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায় নি। এত বছরে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় অনেক ছোটবড় যুদ্ধ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আর তাতে ধ্বংস হচ্ছে জীবন সভ্যতা, আর্তনাদ করছে মানবতা। এখনও বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করছে। এখনও জাতিসংঘের সনদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে এক দেশ অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব লংঘন করছে, আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১.১৫(১) জাতিসংঘের সাফল্য (Success of UN)

বহু হতাশা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ সংস্থাটি এখনও যুদ্ধ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নির্যাতন ও দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে বিরাজ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি ও বিরামহীন আঞ্চলিক সংঘাতের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা সংস্থার একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রম সবচেয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। জাতিসংঘ শুধু শান্তিরক্ষা ও সংঘাত নিরসনেই কাজ করছে না, জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো বিশ্বের মানুষের সেবার জন্য বিশেষ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিশু ও নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবাধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য ও শিক্ষাখাতের উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, আণবিক জ্বালানির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও সংস্থা আরো অনেক কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে।

১.১৫(২) জাতিসংঘের বিগত দিনের সফলতা (Success of UN in the Past)

১. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা :** জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। জাতিসংঘ এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বিশ্বের বৈরী পরিবেশ মোকাবেলার চেষ্টা করেছে। জাতিসংঘ জন্মের পর এ পর্যন্ত বিশ্বে ছোট-বড় শতাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এ সকল যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে। এ সকল যুদ্ধে জাতিসংঘ তার নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যেমন: ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হলে জাতিসংঘ তার প্রথম শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। কখনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেছে আবার কখনো শান্তি বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে সংঘাতের কবল থেকে লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করেছে।

জাতিসংঘ এ পর্যন্ত ৬৭টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, ১৫টি শান্তিরক্ষা বাহিনী বর্তমানে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। অপরদিকে, যুদ্ধ লাগতে পারত এমন ১৭২টি সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করেছে। ৮০টিরও বেশি আসন্ন যুদ্ধ পরিহারে জাতিসংঘের পরিচালিত কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। তাই একটু গভীরে ভাবলে অনুমান করা যাবে যে, জাতিসংঘ জন্মের পর যত যুদ্ধ হয়েছে তার চেয়ে অনেক যুদ্ধ সে হতে দেয় নি।

২. **শান্তি প্রতিষ্ঠা :** ১৯৪৫ সাল থেকে অদ্যাবধি জাতিসংঘ বহুসংখ্যক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সফল হয়েছে। এতে অবসান ঘটেছে আঞ্চলিক সংঘাতের। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

ক) ১৯৫০ সালে কোরিয়া সংকট নিরসন।
খ) ১৯৫৬ সালে কোরিয়া সংকট নিরসন।
গ) আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার।
ঘ) এলসালভাদরে গৃহযুদ্ধের অবসান।
ঙ) ভিয়েতনামের যুদ্ধ অবসানে।
চ) ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানে।

৩. **সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবদান :** সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সফলতা অনেক বেশি। জাতিসংঘ সনদের বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্য পূরণের জন্য জাতিসংঘ ECOSOC নামের একটি অঙ্গ সংস্থার সৃষ্টি করেছে। ECOSOC তার উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে Specialized Agencies বা বিশেষ সংস্থা এবং কার্যকরী কমিশন মিশন গঠন করেছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য UNDP, UNESCO, UNICEF বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৪. **উপনিবেশ বিলোপ, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা :** উপনিবেশ বিলোপ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কার্যত অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৫ সালে ৬টি অঙ্গসংগঠন নিয়ে জাতিসংঘের জন্ম হয়। এর মধ্যে একটি অঙ্গসংগঠন হলো অছি পরিষদ। অছি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপনিবেশ বিলোপের জন্য। অছি পরিষদের অধীনে যেসব অঞ্চলের উপনিবেশ বিলোপের দায়িত্ব দেওয়া হয় তার মধ্যে সর্বশেষ পালাউ ১৯৯৪ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। অছি পরিষদের বাইরেও জাতিসংঘ উপনিবেশ বিলোপের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এর সর্বশেষ উদাহরণ দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভ (২০১১ সালে)। এর পূর্বে জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনায় পূর্ব তিমুর ও ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সংকুল বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। যেমন: কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এলসালভেদর, মোজাম্বিক ইত্যাদি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উত্তরণ ঘটেছে জাতিসংঘের মাধ্যমে। নির্ভরশীল অঞ্চলগুলোতে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তার জন্য অছি পরিষদ গঠন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১১টি অঞ্চল অছি ব্যবস্থার অধীনে ছিল। এ পর্যন্ত ১১টি অঞ্চলের ওপর থেকে অছি ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে ওই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে। বর্তমানে অছি পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে।

৫. **মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন :** মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বিশেষ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার পর থেকে মানবাধিকার সংক্রান্ত ৮০টিরও বেশি ব্যাপকভিত্তিক চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ দূরীকরণ, প্যালেস্টাইনিদের সহযোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাছাড়াও অস্ত্র বিস্তার রোধ, সমুদ্রের তলদেশ থেকে মহাশূন্য ব্যবহার পর্যন্ত তিন শতাধিক চুক্তিকে বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করেছে।

৬. **উন্নয়ন কর্মসূচি :** জাতিসংঘ প্রায় ৭০টি দেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে হাজার হাজার কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা UNDP এ বিষয়টি তদারক করে

থাকে। UNDP বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতেও ব্যাপক বিনিয়োগ করে সফলতা অর্জন করেছে।

৭. **উদ্বাস্তু, অসহায় মানবতার সেবায় :** জাতিসংঘ উদ্বাস্তু, দুর্গত ও অসহায়দের সহায়তা করার ক্ষেত্রে অনন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন UNHCR ১৯৫১ সাল থেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও হত্যার ভয়ে পলাতক কয়েক কোটি উদ্বাস্তুর খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করেছে। ইউরোপ ও এশিয়ার উদ্বাস্তুদের সহায়তা দানের জন্য যথাক্রমে ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে UNHCR-কে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৮. **পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ :** ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে মানব পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মানব পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম বিশ্ব সম্মেলন তথা মন্ট্রিল ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন নামে ব্রাজিলের Reo-De-Jenerio তে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিরোধ এবং জীববৈচিত্র্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটোতে পরিবেশ সংক্রান্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে CFC গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ "ধরিত্রী সম্মেলন-২০০২" অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে COP-15 অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পরিবেশ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জাতিগুলোর আর্থিক সহায়তার দাবি জানানো হয়। ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুনে COP-16 অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালে রিওতে রিও+২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব পরিষদ ও জলবায়ু সমুন্নত রাখার আহবান জানিয়ে।

মনে রাখার Technique & Tips

জাতিসংঘের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক

১. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষা
২. ভিয়েতনাম ট্র্যাজেডি
৩. সোমালিয়ার শান্তি মিশন
৪. বসনিয়ায় জাতিসংঘ মিশন
৫. ইরাক যুদ্ধ
৬. আফগান সমস্যা
৭. লেবানন সংকট নিরসনে ব্যর্থতা
৮. কিউবার মিসাইল সংকট
৯. গ্রেনাডা ও ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা
১০. কসভোতে জাতিগত সমস্যা নিরসনে ব্যর্থতা
১১. বার্লিন সমস্যা
১২. নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগের ব্যর্থতা
১৩. মানবাধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ
১৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থতা
১৫. সাংগঠনিক ক্ষেত্রে
১৬. বর্ণবাদ ও জাতিগত দাঙ্গা নিরসনে
১৭. সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ নিরসনে ব্যর্থতা

৯. **স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ :** WHO- এর তৎপরতায় ১৯৮০ সালে বিশ্ব থেকে গুটি বসন্ত এবং ২০০৫ সালের মধ্যে পোলিও নির্মূলের ঘোষণা এবং সে আলোকে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। UNICEF এবং WHO টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে সচেষ্ট। এছাড়াও শিশু মৃত্যুহার, অন্ধত্ব, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ UNFPA নিঃসন্দেহে সাফল্যের একটি মাইলফলক। উক্ত সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে জন্মহার ১৯৬০ সালের ৬.০% থেকে বর্তমানে ১.১% এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বিশ্বের দরিদ্র দেশের পল্লি এলাকায় ১৩০ কোটি লোকের নিকট বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১০. **পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ :** জাতিসংঘ ১৯৬৮ সালে NPT ও ১৯৯৬ সালে CTBT চুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থা (IAEA) গঠন করেছে। জলে, স্থলে, বায়ুতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমানে CTBT-তে ১৭৭টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। তন্মধ্যে ৩২টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

১১. **অসহায় ও দুর্গতদের সহায়তায় জাতিসংঘ :** অসহায় ও দুর্গতদের সহায়তা দিয়ে জাতিসংঘ বিশেষ প্রশংসা নিয়েছে। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠার পর UNHCR প্রায় ১৯ মিলিয়ন উদ্বাস্তুকে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। অসহায়দের জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি প্রতিবছর ২ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্য বিতরণ করে।

১২. **নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণে :** নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার জন্য জাতিসংঘ CEDAW Convention গ্রহণ করেছে। ১৯৭৫-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ দশক পালিত হয়। ১৯৭৫-২০০৫ পর্যন্ত জাতিসংঘ ৪টি বিশ্ব নারী সম্মেলন আয়োজন করে। এভাবে জাতিসংঘ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভিত্তিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে বিশ্ব শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে শিশু সংক্রান্ত ২০টি মৌলিক বিষয় নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর এ বিষয়গুলোর যৌক্তিক সমাধানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

১৩. **বিশ্ব ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে :** জাতিসংঘের সংস্থা UNESCO পৃথিবীর প্রাচীন স্থাপনা ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে তা যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, মহাস্থানগড়সহ গ্রিস, ইটালি, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৫৫২টি স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা হিসেবে ইউনেস্কো সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৪. **আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন :** জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন (ICOJ) করে আন্তর্জাতিক অপরাধ, মানবতাবিরোধ অপরাধ, গণহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধের শাস্তি প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৫. **শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় :** শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে ও শিশুশ্রম বন্ধ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ ১৯৪৬ সালে ILO- কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ILO- এর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

১৬. **মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধে :** জাতিসংঘ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধ, আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, উৎপাদনকারীকে মাদকদ্রব্য উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্যে জাতিসংঘ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (UNDCP)- এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১৭. **বিশ্ব বাণিজ্য সমস্যার সমাধান :** 'গ্যাট' পরবর্তীতে WTO (১৯৯৫) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘ কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। বাণিজ্য ব্যবস্থার সার্বিক খবরদারিসহ বৈশ্বিক উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগের তদারকি এ বিশ্ব সংস্থার অন্তর্গত হবে।

১৮. **ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য :** জাতিসংঘ 'অছি পরিষদ' ও আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ঔপনিবেশের স্বাধীনতা প্রদানের সহায়তা করেছে। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদ রোধে উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতায় সহায়তা দিয়েছে।

১৯. **অন্যান্য :** উপরিউক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও জাতিসংঘ (United Nations Organization) আরও ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। যেমন:

ক. দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যর অবসানে।
খ. বিভিন্ন দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায়।
গ. বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট মোকাবেলায়।
ঘ. উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

জাতিসংঘ বিশ্বমানবতার অগ্রগতি অর্জনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সহায়তায় বিশ্ব আজ গুটি-বসন্ত মুক্ত এবং প্রায় পোলিও-মুক্ত। জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনায় অনেক জাতি স্বাধীনতা অর্জন করলেও এখনও ফিলিস্তিন আত্ম

নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করতে পারেনি। জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা সেবার অগ্রগতি হলেও তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখনও স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। বিশ্বের প্রায় ১৩ বিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন ১ ডলার আয় করে জীবিকা নির্বাহ করছে। UNICEF দরিদ্র জাতিগুলোকে শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা করলেও এখনও অনেক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এ বাস্তবতায় বিশ্ববাসী প্রত্যাশা করে যে, জাতিসংঘের মাধ্যমে এ সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। ১৯৬২ সালের কিউবার মিসাইল সংকট নিরসন দুই পরাশক্তির আপসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছিল। জাতিসংঘ সেখানে ছিল নীরব দর্শক; এতে জাতিসংঘের কোন কৃতিত্ব ছিল না।

১.১৬ সম্মিলিত জাতিসংঘের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক (Different points of failure of the UNO)

১৯৪৫ সালে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও, গত (১৯৪৫-২০১২) ৬৭ বছরে সাফল্যের সাথে সাথে এ বিশ্ব সংস্থাটি পূর্ণ বিশ্বশান্তি আনয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বিশ্বে আজও বন্ধ হয় নি যুদ্ধের সম্ভাবনা। ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে। আজও বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি লোক বাস করছে দারিদ্র্য সীমার নিচে, যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ প্রতিদিন যুদ্ধ করছে একবেলা খাদ্যের আশায়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে আফ্রিকায় বেড়ে চলেছে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা। পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা আজও দূর হয়নি মানুষের মন থেকে। চীন বা ফ্রান্সের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এ বিভীষিকাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়। দূর হয় নি বর্ণবৈষম্য। তাই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও জাতিসংঘ ভবনের শহরে সংঘটিত হয় দাঙ্গা। বিশ্ব পরিবেশ ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণও আজ পৃথিবীর জন্য হুমকি স্বরূপ। নিম্নে বিশ্বশান্তি আনয়নে চরমভাবে ব্যর্থ জাতিসংঘের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. **মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষা :** জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছিল ১৯৪৮ সালে ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে সংঘর্ষের পর। কিন্তু শান্তিরক্ষকের ভূমিকা বিস্তার লাভ করেছে ১৯৯০-এর দশকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ অবসানের পর।

২. **ভিয়েতনাম ট্র্যাজেডি :** দশ বছরের যুদ্ধে (১৯৬৫-৭৫) ২০ লক্ষেরও বেশি ভিয়েতনামী এবং ৫৮ হাজার মার্কিন সৈন্য মারা গেছে। কিন্তু জাতিসংঘে কখনোই ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে কোনো আলোচনা বা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় নি। ওয়াশিংটন এবং হ্যানয়ের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। জাতিসংঘের কোনো ভূমিকা ছিল না।

৩. **সোমালিয়ায় শান্তি মিশন :** জাতিসংঘ সোমালিয়ার শান্তি মিশন পাঠালেও, পারে নি সোমালিয়ার বিভিন্ন গোত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করতে বরং তার তীব্রতা বেড়েছে।

৪. **বসনিয়ায় জাতিসংঘ মিশন :** জাতিসংঘের গত ৬ দশকের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বসনিয়ার শান্তি আনয়ন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর নাকের ডগার ওপর দিয়ে সার্বরা চালায় বসনীয় মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ। ৩টি কয়েক বৃহৎ শক্তির হাতে জিম্মী, এ সংস্থা মধ্যপ্রাচ্য, ভিয়েতনামের মতো বসনিয়াতেও শান্তি মিশন ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে জাতিসংঘ পারেনি রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও জায়ারের জাতিগত দাঙ্গা বন্ধ করতে।

৫. **ইরাক যুদ্ধ :** বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের বিরোধিতা ও নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যকে সাথে নিয়ে ৩টিকয়েক রাষ্ট্রের সমর্থনে বিপজ্জনক পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করছে ইরাক এ অভিযোগে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে নগ্ন হামলা চালায়। জাতিসংঘ এ হামলা ঠেকাতে রাজি হওয়ায় জাতিসংঘের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হয়ে ওঠেছিল।

৬. **আফগান সমস্যা :** জাতিসংঘ আফগানিস্তানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বন্ধ করতে পারে নি সে দেশের বিভিন্ন জাতিগত ও দলগত সংঘাত, যা আফগানিস্তানে গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার জন্য বড় বাধা।

৭. **কিউবার মিসাইল সংকট :** ১৯৬২ সালের কিউবার মিসাইল সংকট নিরসন দুই পরাশক্তির আপসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছিল। জাতিসংঘ সেখানে ছিল নীরব দর্শক; এতে জাতিসংঘের

কোনো কৃতিত্ব ছিল না।

৮. **গ্রেনাডা ও ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা :** গ্রেনাডায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন আগ্রাসী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ টু শব্দটি পর্যন্ত করে নি। ১৯৬৫-৭৫ সাল পর্যন্ত দশ বছরের যুদ্ধে প্রায় ২০ লক্ষের বেশি ভিয়েতনামী এবং ৫৮ হাজারের মতো মার্কিন সৈন্য মারা গিয়েছিল। এর কোনটির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। এমনকি আগ্রাসন বন্ধে ইতিবাচক পদক্ষেপও গ্রহণ করে নি।

৯. **কসোভোতে জাতিগত সমস্যা নিরসনে ব্যর্থতা :** কসোভোতে জাতিগত আলবেনীয় সমস্যা এবং সার্ব সৈন্য কর্তৃক মুসলমানদের নিধনরোধে জাতিসংঘ কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

১০. **বার্লিন সমস্যা :** ১৯৪৮ সালের বার্লিন সমস্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে ঠাণ্ডাযুদ্ধের একটি অন্যতম কারণ ছিল। এ সমস্যা সমাধানেও জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১১. **নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগের ব্যর্থতা :** অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব যুদ্ধমুক্ত বিশ্বের একটি অনিবার্য শর্ত। নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত উদ্যোগে জাতিসংঘ অগ্রণী হিসেবে প্রশংসার দাবিদার হলেও দেশে দেশে এখনও অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও প্রসার থামাতে পারে নি। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত পাকিস্তানের পারমাণবিক পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা, চীন ও ফ্রান্সের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার এবং উত্তর কোরিয়া ও ইসরাইলের গোপন পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার মিশন রোধ করতে জাতিসংঘ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

১২. **মানবাধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ :** ১৯৪৮ সালে প্রণীত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনেক রাষ্ট্র অমান্য করে চলেছে ও মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। ইরাক, কাশ্মির, মায়ানমার, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশে অব্যাহত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা দেখেও জাতিসংঘ তার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারছ না। ইরাকের ওপর অবরোধ থাকার সময় সে দেশ শিশুখাদ্য ও পর্যাপ্ত ঔষধ আমদানি করতে পারে নি।

১৩. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থতা :** জাতিসংঘের ব্যবস্থাধীনে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে তাদের কার্যকলাপ নব্য উপনিবেশবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বে এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দু'চারটি দেশ। এছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে যে ঋণ দেওয়া হয় তাতে যেসব শর্ত আরোপ করা হয় যা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলে। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো-বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ। জাতিসংঘ ECOSOC- এর মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের চাপ ও প্রাধান্য বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

১৪. **সাংগঠনিক ক্ষেত্রে :** জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণগুলো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং তার সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার তুলনায় নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য শীতল যুদ্ধের ময়দান হিসেবে জাতিসংঘকে ব্যবহার করেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের তাদের মতৈক্য ছাড়া এক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। অনেক সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে তারা জাতিসংঘের অনেক উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের কোনো নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই। এ কারণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সামরিক সাহায্যের ওপর এ সংগঠনকে নির্ভরশীল থাকতে হয়। অনেক সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের সেনাবাহিনীতে সেনা পাঠাতে অস্বীকার করেছে। এর ফলে শান্তিরক্ষার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

১৫. **বর্ণবাদ ও জাতিগত দাঙ্গা নিরসনে :** বিশ্ব শান্তির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো বর্ণ ও জাতি বিদ্বেষ এবং ধর্মবিদ্বেষতা। জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়েতে বর্ণবাদ বিদ্বেষ নির্মূল করতে সম্পূর্ণ রূপে সফলতা লাভ করতে পারেনি।

১৬. **সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ নিরসনে ব্যর্থতা :** জাতিসংঘের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া ঔপনিবেশবাদ। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজেদের শোষণ ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি অঞ্চলে এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু জাতিসংঘ এ সকল নব্য ঔপনিবেশবাদ শক্তির বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বড় বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- জাতিসংঘের কতকগুলো ত্রুটি লক্ষণীয়। এটি বহু আন্তরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসায় ব্যর্থ হয়েছে।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামূলক কার্যবলি পরিচালনার জন্য স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন বা স্থায়ী নিয়মাবলি প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছে।
- জাতিসংঘের উদ্যোগে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা বিশেষ সফলতা অর্জন করে নি।
- জাতিসংঘের কল্যাণমূলক সংস্থাগুলোর কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে।
- সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘ গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে।
- জাতিসংঘের ব্যর্থতা মানব সমাজেরই ব্যার্থতা।

১.১৭ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম (Peace-keeping Activities of the United Nations)

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে বিশেষ শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করে থাকে। সনদের ৪৩, ৪৪ ও ৪৭ ধারামতে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে শান্তিরক্ষা মিশনগুলো কাজ করে থাকে। সাধারণত বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমনে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর করা, স্থিতাবস্তা বজায় রাখা, গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন পরিচালনা বিদ্যমান, চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি উদ্দেশ্যে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়ে থাকে। তবে কোনো বিরোধপূর্ণ স্থানে বা অঞ্চলে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয় :

১. যে দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব করা হচ্ছে সে দেশের সম্মতি থাকতে হবে।
২. নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব অনুমোদিত হতে হবে।
৩. শান্তি বাহিনীকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বেচ্ছামূলকভাবে সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে।

১.১৭ (১) নতুন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন

১ জুলাই ২০১৩ সালে মালিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে নতুন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন The United Nations Multidimensional Intergrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)। ১২,৬০০ সদস্যের এ শান্তিরক্ষা মিশন আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন International Support Mission to Mali (AFISMA)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন ২১০০ অনুযায়ী গঠিত এ শান্তিরক্ষা মিশন তুয়ারেগ বিদ্রোহের পর মালির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে গঠিত হয়। ২৮ জুলাই ২০১৩ মালিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে MINUSMA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.১৭.(৩) শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যাবলি(Responsibilities of Peace-Keeping Forces)

নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য দেশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্ব নির্ধারণ করে। জাতিসংঘ সনদে বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের মূল দায়িত্ব হলো :

আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা রক্ষা করা। পরিষদের ৫সদস্য চীন, ফ্রান্স, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্তে ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। শান্তিরক্ষা মিশনের সৈনিকরা জাতিসংঘের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে না। যেসব সরকার স্বেচ্ছায় সৈনিক

প্রদান করেন তারাই কমাণ্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ তাদের অংশগ্রহণের শর্ত নিয়ে সতর্কতার সাথে আলোচনা করেন। শৃঙ্খলা ও সেনা সদস্য সংক্রান্ত বিষয়সহ জাতিসংঘের পতাকাতলে কর্মরত সামরিক বাহিনীর ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারের হাতেই থাকে এবং ইচ্ছে করলে তারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারেন। শান্তিসেনারা তাদের জাতীয় ইউনিফর্ম পরিধান করেন। শান্তিসেনা হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করার নীলবেরেট বা হেলমেট ও জাতিসংঘের প্রতীক পরিধান করেন।

এক নজরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

- **জাতিসংঘ সনদের ৪৩, ৪৪ ও ৪৭ নং ধারামতে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়ে থাকে।**
- **প্রথম ও দীর্ঘতম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম :** UN True Supervision Organisation (UNTSO); জেরুজালেম; মে ১৯৪৮-বর্তমান।
- **প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সশস্ত্র মিশন :** First UN Emergency Force (UNEF I); মধ্যপ্রাচ্য, নভেম্বর ১৯৫৬; জুন ১৯৬৭।
- **প্রথম সমাপ্ত মিশন :** United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL); লেবানন; জুন-ডিসেম্বর ১৯৫৮।
- **সংক্ষিপ্ত মিশন :** United Nations Aouzou Strip Observer Group (UNASOG); চাঁদ, লিবিয়া; মে-জুন ১৯৯৪।
- **মোট শান্তিরক্ষা মিশন (১৯৪৮-বর্তমান) :** ৬৯টি।
- **বর্তমানে চালু শান্তিরক্ষা মিশন :** ১৬টি-১৫টি শান্তিরক্ষা মিশন ও ১টি রাজনৈতিক মিশন।
- **চালু সহায়ক (Assistance) মিশন :** ১টি (UNAMA-United Nations Assistance Mission in Afganistan). এটি রাজনৈতিক মিশন। DPKO এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।
- **মোট নিয়োজিত শান্তিরক্ষী (মার্চ-২০১৫) :** ৯৭,৮১১ জন
- **শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত দেশ (মার্চ ২০১৫):** ১২২টি।
- **শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ (মার্চ ২০১৫) :** প্রথম সর্বোচ্চ : বাংলাদেশ (৯৪৩৬) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ :, পাকিস্তান ৮৪৪০।
- **বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রণের জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে :** ১৯৮৮ সালে।
- **মোট শান্তিরক্ষী নিহত হয় (মার্চ ২০১৫) :** ১২২টি দেশের ৩৩৯১ জন (১৪ জনের কোনো জাতি পরিচয় নেই)।
- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিহত প্রথম শান্তিরক্ষীর নাম :** রেনে দ্য ল্যাব্রিয়ের (ফ্রান্স)। তিনি ১৯৪৮ সালে UNTSO মিশনে নিহত হন।
- **সর্বাধিক শান্তিরক্ষী নিহত হয় যে মিশনে :** UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL); মার্চ ১৯৭৮-বর্তমান; ২৬৭ জন।
- জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে প্রস্তাব ৫৭/১২৯-এর মাধ্যমে ২৯ মে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়।
- বিশ্ব শান্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ১৯৮৮ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।
- **প্রথম নারী পুলিশ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করছে :** লাইবেরিয়ায়।

১.১৭(৪) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা
Role of Bangladesh in UN Peacekeeping Mission

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশীদার। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, হানাহানি, সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষণ (UNIIMOG) মিশনে বাংলাদেশ সমন্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে তার পদযাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে যৌথ বাহিনীতে অংশগ্রহণকৃত বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে উপসাগরীয় যুদ্ধে যৌথ বাহিনীতে অংশগ্রহণকৃত বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে। এরপর থেকেই পৃথিবীব্যাপী বহুজাতিক বাহিনী

http://thejobstudy.com Go to Contents

এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক হারে বাংলাদেশ সমন্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা ও সৈন্য প্রেরণ শুরু হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ চলমান ১০টি মিশনসহ ৩৯টি রাষ্ট্রের মোট ৫৪টি শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সৈন্য যোগানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ২০১৫ সালে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। মার্চ ২০১৫ সালের হিসেবে অনুযায়ী বাংলাদেশের ৯ হাজার ৪৩৬ শান্তিরক্ষী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ১০টি শান্তিরক্ষা মিশনে কার্যরত আছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ কে এম আবদুল মোমেন এ তথ্য জানিয়েছেন। বিশ্ব শান্তিরক্ষা ও স্থিতিশীলতা জোরদারে বাংলাদেশের দৃঢ়প্রত্যয় এবং এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের আহবানের প্রতি বাংলাদেশের দ্রুত ও ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্জন অসাধারণ। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে স্বীয় অংশ গ্রহণ জোরদার করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে অন্যতম শীর্ষ পুলিশ ও নারী শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র। বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন আনটাগ (United Nations Transition Assistance Group-UNTAG) অংশগ্রহণ করে। ২০১০ সালের মে মাসে হাইতি মিশনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পুলিশের মহিলা কন্টিনজেন্ট জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যোগ দেয়।

২০১০ সালের মে মাসে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্লু হেলমেট হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের রয়েছে বিশ্ব মানের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট। এর নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (BIPSOT) - এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল পিস কিপিং অপারেটিং ট্রেনিং সেন্টার (PKOTC)। যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪ জুন ১৯৯৯ (২০০২ সালে বর্তমান নামকরণ করা হয়); রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুরে এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অবস্থিত। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও নিষ্ঠা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। তারা মডেল শান্তিরক্ষী হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করছে।

১.১৭(৫) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কারণ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট সুফল বয়ে এনছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের এ কার্যক্রম উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ এর কারণ সমূহ নিম্নরূপ:

১. **বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণ:** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বিশ্বের যে প্রান্তেই প্রয়োজন হয়েছে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে এনছে।

২. **বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের গ্রহণযোগ্যতা:** বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের আত্মবিশ্বাস এবং সংঘাতে জড়িত পক্ষগুলোর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। এটি সংঘাত নিরসনে তাদের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও কমিটমেন্টের কারণেই।

৩. **বাংলাদেশের নিরপক্ষেতা:** বাংলাদেশের নিরপেক্ষতাও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৪. **পেশাগত দক্ষতা:** বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পেশাগত দক্ষতাও তাদের মর্যাদপূর্ণ অবস্থানের কারণ। বাংলাদেশের রয়েছে সুশৃঙ্খলা ও সুপ্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী। ফলে তারা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৫. **বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের দৃষ্টিভঙ্গি:** বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অন্যদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। ফলে সংঘাত-বিরোধের সাথে জড়িত দলসহ স্থানীয় জনঘন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাথে তাদের সম্পর্ক হয় অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্কে ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও স্থিতিশীলতা জোরদারে দায়িত্বপালনরত থাকাকালীন বাংলাদেশের ১০৮ জন শান্তি সেনা শাহাদৎ বরণ করেছেন।

বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এক নজরে বাংলাদেশের ভূমিকা

দেশের নাম	মিশনের নাম	অংশগ্রহণকারী
আফগানিস্তান	UNAMA	১১
এ্যাংগোলা	UNAVEM& UNAVEM	৬৩৫
বুরুন্ডি	BINUB	৬
বসনিয়া	UNAMIC	১৫২
কম্বোডিয়া	UNAMIC,UNTAC	১৩০১
কঙ্গো	MONUC	১৭৬৩৮
ক্রোয়েশিয়া/পূর্ব স্লোভেনিয়া	UNTAES	৭৬
পূর্ব তিমুর	UNAMET, UNTAET & MINUSTAH	৩০৪৯
ইথিওপিয়া/ইরিত্রিয়া	UNMEE	১১০৮
জর্জিয়া	UNOMIG	১৩১
হাইতি	UNOMIG	৩৩৩১
ইরাক	UNGCE	১২৪
ইরান	UNIIMOG	৩১
আইভরিকোস্ট	MINUCI	২৫৬০৭
কসভো	UNMIK	৫৩৯
কুয়েত	UNIKOM	৮২৩৮
লাইবেরিয়া	UNOMIL	২২০২৬
মেসিডোনিয়া	UNPREDEP	৭
মোজাম্বিক	ONUMOZ	২৬২২
নামিবিয়া	UNTAG	৮৫
রুয়ান্ডা	UNAMIR	১০২২
সিয়েরালিয়ন	UNAMSIL & UNIOSIL	১১৯৮১
সোমালিয়া	UNOSOM-1,2	১৯৭৫
দক্ষিণ সুদান	UNMISS	১০০০৩
তাজিকিস্তান	UNMOT	৪০
উগান্ডা/রুয়ান্ডা	UNOMUR	২০
পশ্চিম সাহারা	MINURSO	১৭৪
যুগোশ্লাভিয়া	UNPROFOR	১৬০৮
চাদ	MINURCAT	৫৩
দারফুর	UNAMID	৪৭১৯
লেবানন	UNIFIL	৬৫২
পশ্চিম আফ্রিকা	UNOWA	২
নাইরোবি	UNSOA	১
সিরিয়া	UNSMIS	১৮
মোট দেশ : ৩৯	মিশন : ৫৪	১১৮৯৮৫

১.১৭(৫) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সুফল (Success of Bangladesh in peace keeping Missions)

১. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশ ও সেনাবাহিনীর জন্য সম্মান ও প্রশংসা বয়ে এনেছে।
২. বিশ্বে নতুন নতুন বন্ধু রাষ্ট্র এবং পুরনোদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে।
৩. ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলোতে সৈন্য প্রেরণ করে আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।
৪. বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে।
৫. বিশ্বের বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে।
৬. আর্থিকভাবে সেনা সদস্য এবং দেশ লাভবান হয়েছে।
৭. সরাসরি জাতিসংঘের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জাতিসংঘের আস্থা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।
৮. বাংলাদেশি সৈন্যরা এতদিন কেবল দেশীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তারা বহুজাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। এছাড়া উন্নত ও প্রযুক্তিগত সমরাস্ত্রের ব্যবহার শিখছে এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ সেনাবাহিনীর কার্যক্রমে সেগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে।
৯. বাংলাদেশ ২০১৩ সালের জাতিসংঘ পিস বিল্ডিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হয়।

১.১৭(৬) শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের কুফল (Drawbacks)

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি সৈন্যদের অংশগ্রহণের কুফল উল্লেখযোগ্য না হলেও কিছু কিছু কুফল আছে যা আমাদের জাতীয় পর্যায়ে দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে। উল্লেখযোগ্য কুফলগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **কর্মরত সেনাসদস্যদের মৃত্যু :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের পর এ পর্যন্ত (মার্চ ২০১৪) ১১০ জন কর্মরত সদস্য বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ১৩ জন সদস্য এবং লাইবেরিয়ায় কর্মরত ২ জন সদস্যসহ মোট ১৫ জন সদস্য ছুটিতে দেশে ফেরার সময় বেনিনে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহণ করে অনেক সদস্য আহতও হয়েছেন।

২. **লেনদেনের বৈষম্য :** শান্তিরক্ষা মিশনে তৃতীয় বিশ্ব তথা বাংলাদেশি সেনা সদস্যদের বেতন ও ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে ফলে বহির্বিশ্বে দেশের সম্মান কিছুটা হলেও হেয় করা হয়েছে।

৩. **রাজনৈতিক প্রভাব :** শান্তিরক্ষা মিশনে যাবার সুযোগের জন্য সেনাবাহিনীর লক্ষে লবিং, গ্রুপিং এবং রাজনৈতিক দলীয় প্রভাব ঢুকে পড়েছে। যা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points) :

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামূলক কার্যাবলির জন্য জাতিসংঘের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শান্তিরক্ষামূলক কার্যবলী বল প্রয়োগমূলক নয় এবং নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়।
- জাতিসংঘ মূলত দু'ধরনের শান্তিরক্ষামূলক কার্য পরিচালনা করে– শান্তি পর্যবেক্ষণ মিশন, শান্তিরক্ষাকারী সেনাবাহিনী।
- জাতিসংঘের শান্তি রক্ষামূলক কার্যাবলির কতগুলো দুর্বলতা।
- সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামূলক কার্যাবলী প্রসারিত হয়েছে।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামূলক কার্যাবলীর বৈশিষ্টগুলো হলো এটি শান্তিপূর্ণ হস্তক্ষেপের পক্ষপাতি– এটি বল প্রয়োগমলক নয়– কার্যাবলি নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামূলক কার্যাবলি বহুক্ষেত্রে বির্তকের সম্মুখীন হয়েছে। এসব কার্যাবলী

অস্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা দিবস, ২০০২ সালে সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ২৯ মে "আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস " হিসেবে পালিত হবে। এ মোতাবেক ২০০৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

১.১৮ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা (Roll of UN Eliminate Discremination Against Women)

নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করে। যেমন, ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র। এছাড়া জাতিসংঘ নারী উন্নয়নে আরও অনেক কাজ করে তা হলো :

- ১৯৪৯- মানব পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তি অবসানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন।
- ১৯৫১- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক এক ধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের একই বেতন দান।
- ১৯৫২- নারীর রাজনৈতিক অধিকার, যার বলে নির্বাচনে নারী ভোট প্রদান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।
- ১৯৫৭- বিবাহিত নারীরা জাতীয়তা সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করতে পারবে।
- ১৯৬০- নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ।
- ১৯৬২- বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও রেজিস্ট্রেশন ফরম সনদ।
- ১৯৬২- বালিকা ও নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার।
- ১৯৭৫- নারী বছর ঘোষণা।
- ১৯৭৫- প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন, যেটি মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত।
- ১৯৭৬-১৯৮৫-নারী দশক ঘোষণা।
- ১৯৭৯- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, যা CEDAW নামে অভিহিত। ১৯৮১ সালে এ সনদ কার্যকর হয়।
- ১৯৮০- দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন, কোপেনহেগেন।
- ১৯৮৫- তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন, নাইরোবি।
- ১৯৯২- রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি।
- ১৯৯৩- অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান।
- ১৯৯৫- চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং। বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা ছিল নারীর চেখে বিশ্ব দেখুন। এ সম্মেলনে প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বা বেইজিং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- ২০০০- বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন।
- ২০০৫- বেইজিং প্লাস টেন সম্মেলন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

কাজেই আমরা দেখি, নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকল, সেমিনার ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

১.১৮(১) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও ১৯৭৯ (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women Or CEDAW 1979)

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সিডও সনদ নামে পরিচিত, যা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় । ১৯৮৯ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয় । বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে এ সনদটি সমর্থন করেছেন । এ সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো , এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্নাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন ইস্যুতে সমন্বিত করে ।

নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে সিডও সনদের ভূমিকা : নারী ও পুরুষের সমতার নীতিকে ভিত্তি করে সনদটি তৈরি । নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে ওঠে এসেছে । আইনগত পদ্ধতিতে এ অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করার সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদ মেনে চলতে বাধ্য । এ সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে । এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে । সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে । এর প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য তা বিশ্লেষণ করে। পরের ১৪টি ধারা ব্যাখা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। জাতিসংঘ ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, নারীর উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কাজ করেছে এবং নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

১.১৯ জাতিসংঘের সংস্কার (Reforms of the United Nations)

১৯২০ সালে যে উদ্দেশ্য নিয়ে League of Nations গঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ফলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক বাস্তবতায় মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নতুন বিশ্বব্যবস্থা "জাতিসংঘ" গড়ে তোলেন। জুন,১৯৪১ লন্ডন ঘোষণা ছিল জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ। আগস্ট, ১৯৪১ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চার "আটলান্টিক চার্টার" ঘোষণা করেন। এটি ছিল জাতিসংঘ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ জানয়ারি, ১৯৪২ এ সনদকে "জাতিসংঘ ঘোষণা" হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অতঃপর কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয় মস্কো সম্মেলন, তেহরান শীর্ষ সম্মেলন, ডাম্বারটন ওকস্ সম্মেলন এবং ইয়াল্টা শীর্ষ সম্মেলন। পরিশেষে ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের মাধ্যমে ২৬ জুন, ১৯৪৫ জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৫ সালে যে আঙ্গিকে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল তা ছিল বাস্তবতা। পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের সংস্কার অর্থই হলো নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার। ১৯৪৫ সালে ১১ সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৬৫ সালে অস্থায়ী সদস্য ৪টি বাড়ানো হয়। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার সময় এর সদস্য সংখ্যা ৫১টি ছিল। ২০১২ সালে জাতিসংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০ কোটির উপরে। বিগত (১৯৪৫-২০১২) ৬৭ বছরে বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বর্তমান জাতিসংঘের যে কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য তা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে।

১.১৯(১) জাতিসংঘের সংস্কার কেন দরকার (Why is Reforms of UN is Neccssary?)

জাতিসংঘের নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য। জাতিসংঘ সনদের ২৩ অনুচ্ছেদে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালি অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের ১৫টি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এ ১৫ সদস্যর মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য, ১০টি অস্থায়ী সদস্য। ১৯৬৫ সালে পূর্বে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য ছিল ১১টি। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা ছিল ৫টি এবং অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ছিল ৬টি। ১৯৬৫ সালের জাতিসংঘের সংশোধিত সনদ কার্যকরী হলে অস্থায়ী সদস্য ৬+৪=১০ এ উন্নীত হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি করা হয় নি। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের গঠন ছিল বাস্তবসম্মত। তখন শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের সংস্কার করতে

হবে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির লক্ষ্য ছিল অক্ষশক্তির পতন এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। দুটি লক্ষ্যই সফল হয় কিন্তু পরবর্তী বিশ্বে অক্ষশক্তিসমূহ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্ব অক্ষশক্তিই বাস্তবতা। ইতোমধ্যে জাপান জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ দাবি করেছে। তাই বাস্তবতার আলোকে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার জরুরি। বর্তমান জাতিসংঘে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। ছোট মহাদেশ ইউরোপের ৩টি, এশিয়া থেকে ১টি এবং উত্তর আমেরিকার ১টি স্থায়ী সদস্য। তাই আফ্রিকা ও দ. আমেরিকা থেকে নতুন সদস্য নেওয়ার জন্য সংস্কার প্রয়োজন। অর্থাৎ জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ভোটের পরিবর্তে ভোট প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ভেটো ক্ষমতার সংস্কার করতে হবে। জাতিসংঘের সনদের সূত্রে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে এবং কোনো প্রস্তাব পাস করতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি সদস্যর আবার ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সনদে। প্রতিটি স্থায়ী সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো প্রস্তাবে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কোনো স্থায়ী সদস্য যদি কোনো সনদের বিপরীতে ভেটো প্রয়োগ করে তাহলে উক্ত প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদে পাস হতে পারবে না। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য দেশের ১৪টি যদি একদিকে এবং অন্য যে কোনো ভেটো ক্ষমতার অধিকারী ১টি দেশ যদি অন্যদিকে/বিপরীতে অবস্থান করে তাহলে কোনো প্রস্তাব পাস করতে পারবে না। মূলত জাতিসংঘের এ ভেটো ক্ষমতার অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে বর্তমানে জাতিসংঘ অনেক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ভেটোসহ অন্যান্য বিষয়েও সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়াও

১. সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
২. নিরাপত্তা পরিষদের অত্যধিক ক্ষমতা
৩. মহাসচিবের সীমিত ক্ষমতা
৪. শান্তিরক্ষায় ব্যর্থতা ইত্যাদি।

১.১৯(২) জাতিসংঘের সংস্কারের পথে বাধাগুলো (Obstacles to Reform of UN)

১৯৪৫ সালের বিশ্ব ব্যবস্থা এবং ২০১৩ সালের বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে বিশাল ব্যবধানের কারণেই জাতিসংঘ পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল রেখে নিজেকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে ব্যর্থ হয়েছে; যদিও এর পেছনে যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এ বাধাগুলো হলো

১. **নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত ত্রুটি :** নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মাত্র ৫টি সদস্য স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী আবার শুধুমাত্র ৫টি স্থায়ী সদস্যর ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে। বিগত ৬৭ বছরে জাতিসংঘের মোট জনসংখ্যা এবং সদস্য উভয় বেড়েছে ব্যাপক হারে তথাপি স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় নি একটিও। আবার নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের ১৪টি যদি একপক্ষ অবলম্বন করে এবং স্থায়ী সদস্য ৫টির কোনো একটি যদি বিপক্ষে ভেটো প্রদান করে তাহলে কোনো প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পাস হতে পারবে না। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রস্তাব পাস করার এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। অপরদিকে নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ বা মহাসচিব কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে বিশ্বশান্তি পরাভূত।

২. **নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ :** ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘ বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র যুক্তরাজ্যের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে ফলে জাতিসংঘের সর্বজনীনতা হুমকির সম্মুখীন।

৩. **সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার অভাব :** জাতিসংঘ তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলো থেকে যথাযথভাবে সহযোগিতা পায়না। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন ইস্যুতে মতৈক্য লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়।

৪. **অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় :** জাতিসংঘের নিজস্ব আর্থিক তহবিল না থাকায় জাতিসংঘের যাবতীয় বাজেটের ব্যয় সম্পাদিত হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রদেয় চাঁদা থেকে আবার অনেক সদস্য রাষ্ট্র নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে না এবং অনেক সদস্য রাষ্ট্র আছে যারা পর্যাপ্ত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করে। জাতিসংঘ এসকল অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত থাকে। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে জাতিসংঘকে মোট চাঁদার ২৫% প্রদান করে।

৫. **সদর দপ্তরের অবস্থান :** জাতিসংঘের সদর দপ্তর শুরু থেকেই নিউইয়র্কে থাকায় জাতিসংঘের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রভাব স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

৬. **নিরাপত্তা বাহিনী :** জাতিসংঘের কোনো নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী নেই। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘকে তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিকট সৈন্য চাইতে হয়। অনেক সময় সদস্য রাষ্ট্র সৈন্য প্রেরণে অপরগতা প্রকাশ করে।

৭. **নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈষম্য :** জাতিসংঘ বিশেষ কার্যক্রমে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৃহৎ অর্থনৈতিক ও পরাশক্তিগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনুন্নত এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোকে এ সকল ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ দেওয়া হয়না। এছাড়া ভৌগোলিক ও জনসংখ্যা অনুপাতে ক্ষমতা বণ্টনে জাতিসংঘ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

৮. **ভেটো নামক ক্ষমতা :** স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা জাতিসংঘের কোনো সর্বজনীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। ভেটো ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে না। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করছে দিনের পর দিন।

৯. **পরাশক্তিসমূহের যুদ্ধংদেহী মনোভাব :** জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পরাশক্তিসমূহের পারমাণবিক এবং যুদ্ধাংদেহী মনোভাব এবং দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর সবল রাষ্ট্রের অবৈধ খবরদারি জাতিসংঘের কর্তৃত্বের পরিচালনার জন্য প্রধান বাধা।

১০. **আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা ও দারিদ্র্য :** বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে জাতিসংঘকে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে মূল সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

১.১৯(৩) জাতিসংঘের সংস্কারের রূপরেখা (Structure of Reform of United Nations)

জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরই জাতিসংঘের সংস্কারের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ১৭ জানুয়ারি, ১৯৯২ জাতিসংঘের ইতিহাসে নিরাপত্তা পরিষদের ১ম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গতিশীল করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্রতী হয়। এ সভায় An Agenda for peace কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে এ কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়। এ সুপারিশমালার উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, উন্নয়নকে সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং উন্নয়নকে শান্তি, অর্থনীতি, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের মতো বিষয়সমূহের নিরিখে দেখতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে নতুন কাঠামো গড়ে উঠবে এর প্রধান ভূমিকায় থাকবে জাতিসংঘ। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সালে ভারত ৩৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে সাধারণ পরিষদে একটি দরখাস্ত জমা দেয়। সাধারণ পরিষদ দরখাস্তের প্রেক্ষিতে রিপোর্ট তৈরির জন্য ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্যানেল কমিটি গঠন করে। ১৯৯৫ সালে এ কমিটি একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের পর রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের সংস্কারের লক্ষ্যে নিরাপত্তা

পরিষদের পুনর্গঠন প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে স্থায়ী সদস্য ৫ থেকে ১০, অস্থায়ী সদস্য ১০ থেকে ১৩-তে উন্নীত করে মোট ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করতে হবে।

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাজালী ইসমাইল নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৪- এ উন্নীত করার কথা উল্লেখ করেন।

এক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্য ১০ এবং অস্থায়ী সদস্য ১৪ করার প্রস্তাব করেন। তিনি স্থায়ী সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য দুই ধরনের মতামত দেন: প্রথমত, নতুন স্থায়ী সদস্য হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপ থেকে একটি করে এবং দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে ৩টি এবং শিল্প উন্নত বিশ্ব থেকে ২টি স্থায়ী সদস্য নেওয়া যেতে পারে।
বর্তমান মহাসচিব কফি আনান সম্প্রতি প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাজেট ব্যয় হ্রাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রয়াসকে জোরদার করা এবং উপ-মহাসচিব পদ সৃষ্টি করা। জাতিসংঘ সংস্কারের উদ্দেশ্যে উপরিউল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ প্রমাণ করে যে, জাতিসংঘের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

১.১৯(৪) জাতিসংঘ সংস্কারের রূপরেখা সম্পর্কে মতামত
Opinion About Structure of Reform of United Nations

১. **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ :** বর্তমান সনদে সাধারণ পরিষদের হাতে তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। সাধারণ পরিষদের সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু একথা বলা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ পরিষদেই জাতিসংঘের সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত তাই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সাধারণ পরিষদকে করা একান্ত আবশ্যক এবং জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি।

২. **স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি :** ১৯৪৪ সালে ডাম্বারটন ওকস ভবনে মিত্রশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়। একই সাথে ৫টি স্থায়ী সদস্য মনোনীত করা হয়। অতঃপর ৬টি অস্থায়ী সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ সনদের ২৩ ধারা সংশোধনী করে অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ১০-এ উন্নীত করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধির কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। ৯০ এর দশকের শুরু থেকে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধির জন্য সংস্কার প্রয়োজন।

৩. **শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংস্কার :** ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনকে জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী সদস্য করা হয়। এ সময় এ ৫টি সদস্যকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে ঘোষণা করে কার্যত জাতিসংঘের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে। ১৯৪৫ সালে এটিকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিলেও বর্তমান বিশ্বে তা বাস্তবতা বর্জিত। কারণ গঠনের সময় সম্পূর্ণ আফ্রিকা এবং এশিয়ার সিংহভাগ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলে ছিল। পরিবর্তিত বিশ্বে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। এ অঞ্চলসহ দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জাতি গণতন্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাই এ অংশ থেকে জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ দিলে শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আমি বলতে চাই, শক্তির ভারসাম্যের জন্য জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন।

৪. **বাস্তবতার আলোকে সংস্কার :** ২য় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির লক্ষ্য ছিল দুটো। প্রথমত, অক্ষশক্তির পতন এবং দ্বিতীয়ত, নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। ১৯৪৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পতন হয় ইতালির। মে ১৯৪৫ এবং সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ যথাক্রমে পতন হয় জার্মানি এবং জাপানের। ওদিকে লন্ডন ঘোষণা থেকে শুরু করে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘ গঠন করা হয়। অর্থাৎ দুটি উদ্দেশ্যই সফল হয়। তাই বলা যায় জাতিসংঘের আত্মপ্রকাশ ছিল অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে। ১৯৫৫ সালে ইটালি, ১৯৬৬ সালে জাপান এবং ১৯৭৩ সালে জার্মানি জাতিসংঘের

http://thejobstudy.com
Go to Contents

সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে এরা জাতিসংঘের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ চাঁদা প্রদানকারী দেশ। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় ও তাদের ভূমিকা একই রকম। এমনকি অক্ষশক্তির ৩ জাতির মিত্রশক্তির অন্যতম সদস্য USA, UK, কানাডা ও ফ্রান্সের সাথে মিলে G-7 (পরবর্তীতে G-8) গঠন করেছে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর জাপান জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ দাবি করেছে। বাস্তবতার আলোকে জাপানকে জাতিসংঘের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় আনা উচিত। এজন্য সংস্কার করতে হবে।

৫. **জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য সংস্কার :** নিরাপত্তা পরিষদে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। এখানে আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত ছোট মহাদেশ ইউরোপ থেকে রয়েছে রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স। সবচেয়ে বড় মহাদেশ এশিয়া থেকে রয়েছে চীন এবং উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার একটিও স্থায়ী সদস্য নেই। এ বাস্তবতায় এশিয়া থেকে আরো স্থায়ী সদস্য নেওয়াসহ আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে স্থায়ী সদস্য নিতে হবে। এভাবে নিরাপত্তা পরিষদ পুনর্গঠন করলে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। এটি করার জন্য সনদের সংশোধন করতে হবে।

৬. **Veto ক্ষমতা সংস্কার :** ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনে ৫টি জাতিকে স্থায়ী সদস্য মনোনীত করা হয়। ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ ইয়াল্টা সম্মেলনে এ ৫টি জাতিকে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ সুযোগে যে কোনো স্থায়ী সদস্য নিরাপত্তার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভেটো দেওয়ার সুযোগ লাভ করে। যেমন: ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ চাইলে চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়। তাই আমি মনে করি, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভেটো রেখে অন্যান্য ক্ষেত্রে ভোট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এজন্য সংস্কার করতে হবে।

৭. **নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ :** বর্তমান ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা এবং অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে।

৮. **ভেটো ক্ষমতা রহিতকরণ :** নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা রহিত করতে হবে কারণ এটি একটি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এর পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করতে হবে। বিশেষ করে কোনো প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা দুই -তৃতীয়াংশ ভোটের গ্রহণযোগ্যতা রাখতে হবে।

৯. **মহাসচিবের ক্ষমতা :** বর্তমান পদ্ধতিতে জাতিসংঘের সর্বময় অধিকারী হিসেবে মহাসচিব কাগজে কলমে ক্ষমতাধর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সনদের দেওয়া ক্ষমতানুসারে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ। বর্তমানে সংগঠনকে দায়বদ্ধ রাখার বিধান করতে হবে।

১০. **স্থায়ী শান্তিরক্ষা বাহিনী :** জাতিসংঘের নিজস্ব শান্তিরক্ষা বাহিনী থাকা একান্ত আবশ্যক। জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলো থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী সদস্য সংগ্রহ করে একটি শক্তিশালী শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে যা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

১১. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন :** জাতিসংঘ তার বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চাঁদা থেকে। কিন্তু জাতিসংঘের এমন অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকা উচিত যা নিজেকে একটি শক্ত অর্থনৈতিক ভিতের ওপর দাঁড় করায় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে। এ তহবিল থেকে জাতিসংঘ তার বার্ষিক বাজেট, যাবতীয় খরচ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ধারণ করতে পরবে।

১২. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যক্রম বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নয়নের জন্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩. **জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব :** জাতিসংঘের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বসবাস এশিয়াতে। এশিয়া থেকে নিরাপত্তা পরিষদে শুধুমাত্র ১টি স্থায়ী সদস্য অর্থাৎ চীনকে নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জনগণের বাস ইউরোপে। সেখান থেকে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়াসহ তিনটি স্থায়ী সদস্য নেওয়া হয়েছে। উত্তর আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। ল্যাটিন আমেরিক ও আফ্রিকা মহাদেশ থেকে কোনো স্থায়ী সদস্য নিয়োগ করা হয় নি। এ কারণে জনসংখ্যার আনুপাতিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বৈষম্য বিদ্যমান। তাই সকল এলাকা থেকে জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

১৪. **কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে :** জাতিসংঘ কর্মচারী নিয়োগে অর্থ ও পরাশক্তির প্রভাব থাকায় জাতিসংঘের নিরপেক্ষ কার্যক্রমে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাসাম্য নিশ্চিতকরণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আর এজন্য জাতিসংঘের সনদের সংস্কার আবশ্যক।

১৫. **পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কর্তৃক জাতিসংঘ সনদ প্রণীত হয়। পরাজিত অক্ষশক্তির সদস্য ইটালি, জাপান, জার্মানি বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং শিল্পোন্নত 'জি-৮' পরিবারের সদস্য। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জাতীয় শক্তির মুখ্য নির্ধারক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় বিশ্বব্যবস্থায় এ দেশগুলোর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দেশগুলো জাতিসংঘের উচ্চ চাঁদা প্রদাকারী দেশ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যকমের সক্রিয় অংশীদার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি বর্তমানে বিশ্বব্যবস্থায় বাস্তবতা। তাই এ সকল দেশ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে জাতিসংঘের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

১৬. **নিরস্ত্রীকরণ :** নিরস্ত্রীকরণ অর্থাৎ শক্তিশালী এবং সমরাস্ত্র নির্মূল করে শক্তিসাম্য রক্ষা এবং বিশ্বকে নিরাপদ বসতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরস্ত্রীকরণের পূর্ণ ক্ষমতা জাতিসংঘকে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে সমরাস্ত্রে সজ্জিত দেশগুলোকে মারণাস্ত্র নির্মূলে আইনের মাধ্যমে বাধ্য করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কঠোর আইন প্রণয়ন করার অধিকার জাতিসংঘের থাকতে হবে। আঞ্চলিক ও সামরিক চুক্তিগুলোও বাতিল করতে হবে।

১.১৯(৫) জাতিসংঘের সংস্কারের মূল্যায়ন (Evaluation of Reform of UNO)

এভাবে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘকে সকল অংশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবসানের মধ্য দিয়ে স্নায়ু-যুদ্ধের অবসান ঘটে। অতঃপর ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘ সংস্কারের বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৯২ সালে ভারত প্রথম ৩৭টি দেশের সমর্থন দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ প্রস্তাবের আলোকে জাতিসংঘ একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি তার রিপোর্টে উল্লেখ করে যে স্থায়ী সদস্য ৫-১০ এবং অস্থায়ী সদস্য ১০-১৩ উন্নীত করতে হবে। অর্থাৎ ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করার কথা বলা হয়। তবে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। এদিকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। NAM-এর পক্ষ থেকে ভারতকে স্থায়ী সদস্য করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এ বাস্তবতায় এমনভাবে সংস্কার করা হোক যাতে করে সকল অংশ নিরাপত্তা পরিষদে কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারে।

১.২০ জাতিসংঘের সামগ্রিক মূল্যায়ন : জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ Overall assessment of UN : Its Future

একথা অনস্বীকার্য যে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল বাস্তবে সেই লক্ষ্য পূরণে এ সংগঠন আংশিক সাফল্য অর্জন করেছে। বেন্টউইচ ও মার্টিন (Bentwitch & Martin) একদা মন্তব্য করেছিলেন, 'The UN which was meant for an instrument of world peace has proved to be a forum of world conflict.' আর্থার মুর (Arthur Moore) আর এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, জাতিসংঘ লিগের পথেই হাঁটবে। কিন্তু তবুও জাতিসংঘ তার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে আজও স্বমর্যাদায় টিকে আছে, বিলুপ্ত হয় নি। সর্বদা বিবেচনায় রাখা উচিত যে জাতিসংঘ একটি বিশ্ব সরকার (Wrold Government) নয়; এটি সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি স্বেচ্ছামূলক সংগঠন মাত্র, তাই এর সীমাবদ্ধতাগুলোও সমান বাস্তব। ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lipman) যথার্থই বলেছেন যে, এ সংগঠন সময়ের সাথে সাথে নিজেকে 'একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান' ('an indispensable institution') হিসেবে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নে জাতিসংঘের আন্তরিকতা ও উদ্যোগে কোনোদিনই ঘাটতি দেখা যায় নি। এখানেই সংগঠনটির যথার্থতা। একটি সমন্বয়কারী এজেন্সি হিসেবে জাতিসংঘ শুরু থেকে আজ অবধি বিশ্বজুড়ে দেশ ও জাতিগুলোর সেবায় নিবেদিত প্রাণ। নানা বাধাবিঘ্ন, প্রতিকূলতা, অপারগতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও মান্য হিসেবে তার স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সম্মিলিত জাতিসংঘের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের ঘটনা আজ অবধি ঘটে নি। এ সংঘ ছেড়ে বেরিয়েও যায় নি কেউ। সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের অবসান ঘটিয়ে এবং বিশ্বে অসংখ্য স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যুদয় নিশ্চিত করে এ সংগঠন যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে তার তুলনা মেলা ভার। বিশ্বজুড়ে শরণার্থী সমস্যা, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ, পারমাণবিক অস্ত্রভীতি, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো সংকটগুলোর মোবাবিলায় জাতিসংঘের সক্রিয় ভূমিকা বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জন করেছে। এখানেই তার প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠটি দীর্ঘ ৬৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও অনেকটাই অনুজ্জ্বল ও মলিন থেকে গেছে। এই একবিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বৈষম্য দূর করতে এবং দুর্বল দেশগুলোর ওপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের অন্যায্য হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে জাতিসংঘ বার বার ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ-উত্তর এক-মেরু বিশ্বে জাতিসংঘের ওপর একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ও প্রভাব ক্রমবর্ধমান যা জাতিসংঘের নিরপেক্ষ অবস্থানকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে তুলে ধরেছে। সাম্প্রতিক অতীতে এবং বর্তমান সময়ে জাতিসংঘ অনেকটাই মার্কিন আধিপত্যবাদী নীতি ও কর্মসূচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে জাতিসংঘকে শিক্ষণীয়রূপে রেখে আমেরিকা প্রায় একক উদ্যোগে ইরাকের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই প্রবণতা সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বিমান হামলার সূত্র ধরে আমেরিকা কয়েক হাজার কিমি দূরে অবস্থিত আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সাহস পায় নি জাতিসংঘ। ২০০৩-এ আমেরিকার নির্লজ্জ ইরাক আক্রমণ ও 'সাদ্দাম হঠাও অভিযান'ও জাতিসংঘ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আমেরিকা গত শতকের ৯০-এর দশক থেকে 'নতুন বিশ্ব বিন্যাস' ('New World Order')-এর স্লোগান তুলে যেভাবে তার নিজের স্বার্থের অনুসারী বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করতে জাতিসংঘকে প্রতি পদে পদে ব্যবহার করে চলেছে তা যেমন নজিরবিহীন তেমনি উদ্বেগজনক। এক-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বায়িত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান মার্কিন একাধিপত্যবাদ যে জাতিসংঘের নিরপেক্ষ চরিত্রকে প্রবলভাবে ক্ষুণ্ন করেছে, তা বলাই বাহুল্য। আমেরিকার মতো মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের হাতে জাতিসংঘকে একপ্রকার তুলে দেওয়ার ঘটনাকে 'বিমান ছিনতাই'-এর মতো হার্মাদি কাজ বলে সচরাচর নিন্দা করা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে জাতিসংঘের সনদ নির্মাতারা জাতিসংঘের এরূপ পরিণাম কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি।

১.২১ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামত

Opinion About Increasement of Permanent member in Security Council

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘের কর্তৃত্ব, জাতিসংঘ সনদের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখনকার নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্যর প্রায় সকলে।

অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া সবলে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে জাতিসংঘের কর্তৃত্বের রূপরেখা নিরূপণ করছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫১টি। ২০১২ সালে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ গুণেরও বেশি। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। এর অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলো-

১। বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের একক কর্তৃত্ব বজায় রাখা।
২। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা তাদের স্বার্থের অনুকূলে তৈরি করা।
৩। নব্য ঔপনিবেশিকতা সৃষ্টি করা।
৪। পরাশক্তি হিসেবে নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, ইত্যাদি।

এক নজরে নিরাপত্তা পরিষদে

১৯৩টি দেশের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ৫টি

মহাদেশ	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা অনুপাত (%)	মোট আয়তনে	অনুপাত (%)	অন্তর্ভুক্ত
এশিয়া	৩৮৫ কোটি	৬২.৫%	২৯.৫%	৫৫	১টি (চীন)
ইউরোপ	৭৬ কোটি	১২.৫%	৬.৫%	৪১৩ টি	UK, রাশিয়া
আফ্রিকা	৮৫ কোটি	৯%	২০%	৫২	নেই
উঃ আমেরিকা	৫০ কোটি	৬%	১৬.৩%	১৮১ টি	USA
দঃ আমেরিকা	২৫ কোটি	৪.৫%	১১.৮%	১২	নেই
ওশেনিয়া	৩ কোটি	৫%	৫.২%	৩	নেই

স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধিতে করণীয়

নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান ৫টি স্থায়ী সদস্য UNSC এর সার্বিক পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত নয় এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতারও পরিচয় দিয়েছে। তাই UNSC এর স্থায়ী বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে করণীয় :

১. **জনসংখ্যার অনুপাতে স্থায়ী সদস্য নির্বাচন :** জাতিসংঘের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের বাস এশিয়াতে। অথচ এশিয়া থেকে মাত্র একটি রাষ্ট্রকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। যা অগণতান্ত্রিক এবং অবাস্তব। আফ্রিকা মহাদেশে মোট জনসংখ্যার ৯%। ল্যাটিন আমেরিকায় মোট জনসংখ্যার ৪.৫% হওয়া সত্ত্বেও এ দুটি মহাদেশ থেকে একটি দেশও স্থায়ী সদস্যর আসন পায়নি। অথচ ইউরোপে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২.৫% থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ৩টি স্থায়ী সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এশিয়া থেকে বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতও অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি জাপানকে এবং আফ্রিকা থেকে দঃ আফ্রিকা অথবা নাইজেরিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের মতো দেশকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে ভারসাম্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২. **অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল দেশগুলো থেকে :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক পরাশক্তিরাই নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। বিগত ৬৯ (১৯৪৫-২০১৪) বছরে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তির সাথে মিত্রশক্তির সহাবস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'জি-৮' এর কথা বলা যায়। অন্যদিকে বিগত ৬৯ (১৯৪৫-২০১৪) বছরে বিশ্বে অনেক শক্তিশালী অর্থনৈতিক পরাশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। যারা বিশ্ব অর্থনৈতিতে প্রভাব বিস্তার করছে এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বর্তমানে জাতিসংঘ প্রচণ্ড রকম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। নিরাপত্তা পরিষদে কোনো অর্থনৈতিক পরাশক্তির স্থায়ী সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করলে তারা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় অবদান রাখতে পারবে। এছাড়া বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের মোট বাজেটের ২৫% প্রদান করে জাতিসংঘের ওপর যে একক প্রভাব বিস্তার করছে, তারও সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে জার্মানি, ইটালি, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, উঃ কোরিয়া, কানাডা ইত্যাদি দেশগুলো থেকে এক বা একাধিক দেশকে স্থায়ী সদস্য দেশ হিসেবে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

৩. **রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী দেশগুলো থেকে :** আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল দেশের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি সে সকল দেশ থেকে স্থায়ী সদস্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন-আফ্রিকা থেকে মিসর, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইরান, পূর্ব এশিয়া থেকে মালয়েশিয়া, উত্তর-পশ্চিম এশিয়া থেকে উজবেকিস্তান, পূর্ব ইউরোপ থেকে পোল্যান্ড, মধ্য ইউরোপ থেকে ইউক্রেন উল্লেখযোগ্য দাবিদার।

৪. **গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে :** সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের ভোটাভুটির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাওয়া সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য করা যেতে পারে এবং কোনো সদস্যর সদস্যপদ বাতিল করাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থনের বিধান রাখা যেতে পারে।

৫. **সনদ সংশোধনের মাধ্যমে :** সনদ সংশোধনের মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী সদস্যের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর উক্ত ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়ে অন্য সদস্যের ওপর বর্তাবে।

৬. **মহাসচিবের ক্ষমতায়ন :** জাতিসংঘের মাহাসচিবকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা উচিত যাতে স্বীয় ক্ষমতাবলে বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি কোনো একটি সদস্য রাষ্ট্রকে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা প্রদান করতে পারে। মূলত এটি অন্যান্য স্থায়ী সদস্যদের সাথে শক্তির ভারসাম্য এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া মহাসচিব নিজেও স্থায়ী সদস্যের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। প্রয়োজনে তার ব্যবহার করতে পারেন।

৭. **উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সদস্য :** বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য হিসেবে কোনো দেশ অন্তর্ভুক্ত নেই। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বা LDC- ভুক্ত দেশগুলোর মোট সংখ্যা ৫০টি। এদের পক্ষে এবং এদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে LDC- ভুক্ত দেশগুলো থেকে একটি সদস্য অবশ্যই নেওয়া যেতে পারে।

১.২১(১) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধির কাঠামোগত সুপারিশ (Structural Recommendation to increase Permanent Members)

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যর বৃদ্ধির কাঠামোগত রূপ ও প্রস্তাবনা দেওয়া বেশ জটিল। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একটি গঠনমূলক মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অঞ্চল (মহাদেশ)	বর্তমান স্থায়ী সদস্য সংখ্যা	প্রস্তাবিত স্থায়ী সদস্য সংখ্যা	মোট
এশিয়া	১টি- চীন	২টি- ভারত, জাপান	৩টি
ইউরোপ	৩টি- UK, France, Russia	১টি- জার্মানি	৪টি
আফ্রিকা	নেই	১টি- দঃ আফ্রিকা/নাইজেরিয়া	১টি
উঃ আমেরিকা	১টি- USA	প্রয়োজন নেই	১টি
দঃ আমেরিকা	নেই	১টি- ব্রাজিল	১টি
ওশেনিয়া	নেই	১টি- অস্ট্রেলিয়া	১টি

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, আঞ্চলিক প্রভাবের গুরুত্ব উলে-খযোগ্য। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে সদস্যের সংখ্যা ৫ থেকে ১২- তে উন্নীত করলে বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা এবং জাতিসংঘের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব।

মূল্যায়ন (Evaluation)

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। পরিবর্তি নিরাপত্তা পরিষদের মূল কাজই হবে যুদ্ধ নয় শান্তির বাণী প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্ব নিরাপত্তা ও মানবতা রক্ষা করা। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমান ভেটো ক্ষমতা রহিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক পন্থায় সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব অনুমোদন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকারিতা তাকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটি জাতিসংঘের একমাত্র সংস্থা যা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট। তাই আমাদের উচিত স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘকে যুগোপযোগী এবং পরিবর্তিত বিশ্বের চাহিদার আলোকে গড়ে তোলা; যার একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে যুদ্ধ নয় শান্তি।

১.২২ UN Women

বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ও লিঙ্গবৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা হিসেবে ২০১০ সালে জন্ম নেয় UN Women ২০১০ সালের ২ জুলাই সাধারণ পরিষদের ছোটাভুটির মাধ্যমে গঠিত এ সংস্থাটির অফিসিয়াল নাম United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Woman. ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে UN Women তার কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থাটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। প্রথম প্রধান চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল বাশেলেট। ৯ জুলাই ২০১৩ UN Women-এর দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুমজাইল মিশেল বাশেলেটের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

১.২৩ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ সম্পর্ক (Bangladesh and UNO Relations)

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভের পর স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বমানবতার কল্যাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। জাতিসংঘ হচ্ছে পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাচালিত একটি বিশ্ব সংস্থা। জাতিসংঘ সনদের মাধ্যমে এক নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক শান্তি প্রিয় স্বাধীন রাষ্ট্র যারা জাতিসংঘের বিধি-বিধান মেনে চলতে আগ্রহী তারা ইচ্ছা করলে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। তবে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) সুপারিশ এবং সাধারণ পরিষদের (General Assembly) দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়।

১.২৩(১) বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ (Bangladesh Joins United Nations Organizations)

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর থেকেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য তৎপর হয়। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ প্রাপ্তির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য পদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদনটি উত্থাপন করা হলে চীন এর বিরোধিতা করে এবং ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট বাংলাদেশের সদস্য পদ প্রাপ্তির বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে। কিন্তু জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ প্রাপ্তির বিষয়ে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্দী বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে।

১৯৭৪ সালের ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দান করেন। এ সম্মেলনে যোগ দান বাংলাদেশকে মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদা দান করে। ওআইসি ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভ্রাতৃত্ববোধ ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-বাংলাদেশ পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করে। পাকিস্তান, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি জোরালো ভিত্তি লাভ করে। এ সময় নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা পরিষদের

http://thejobstudy.com Go to Contents

সর্বসম্মত প্রস্তাব মতে ১৩৬ তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্থান লাভ করে। বাংলাদেশের জনগণের কষ্টার্জিত, রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠে জাতিসংঘের মত বিশ্ব সংস্থায় সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের এক অবিচ্ছেদ্য সু-সম্পর্ক গঠে উঠেছে।

১.২৩(২) জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব

ক. জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের বিষয়ে সুপারিশ করে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব।

Having examined the application of the People's Republic of Bangladesh for admission to membership in the United Nations, recommends to the General Assembly that the peoples Republic of Bangladesh be admitted the membership in the United Nations. Resolution 351 of 10 June 1974 of The Security Council adopted without a vote at its 1776 in meeting.

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ মঞ্জুর করে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবনা

Having received the recommendation of the security council of 10 june 1974 taht the People's Republic of Bangladesh should be admitted to membership in the United Nations.

Having Considered the application for membership of the Peoples Republic of Bangladesh.

Decides to admit the Peoples Republic of Bangladesh to the membership in the United Nations.

2233rd plenary Meeting
17 September 1974

১.২৩(৩) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষন দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, আজ এ মহান অধিবেশনে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে আমি এ জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা নিশ্চিত করে বাঙ্গালী জাতির জন্য এটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙ্গালী জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করেছেন, তাঁরা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত আছে। আমাদের লাখ লাখ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

বঙ্গবন্ধু ২৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ড হেইমের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১.২৩(৪) যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের পুর্নগঠনে জাতিসংঘের সহায়তা

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পূর্ণগঠনে জাতিসংঘ ও এর সহযোগী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভ্যুদয় লগ্ন থেকেই বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম শুরু হয়। যুদ্ধকালীন বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর সহযোগিতা ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় এগিয়ে আসে জাতিসংঘ। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গঠিত হয় টঘজঙউ যা পরে টঘজঙউ

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

বা বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিশেষ ত্রাণ দফতর নামে পরিচিত লাভ করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুর্ণগঠনের জন্য জাতিসংঘ ১.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থার সহযোগিতায় এ অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশ প্রায় ১.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋন ও প্রকল্প সাহায্য লাভ করে। যা কেবল জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ন ও সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ :

১. ৮ আগস্ট, ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য বাংলাদেশ দরখাস্ত করলে ১০ আগস্ট, ১৯৭২ সালে স্থায়ী সদস্য চীন ভেটো দেওয়ায় বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভে ব্যর্থ হয়।
২. ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের "স্থায়ী পর্যবেক্ষক" এর মর্যাদা দেওয়া হয়।
৩. অক্টোবর, ১৯৭৩ বাংলাদেশ পুনরায় সদস্য পদের জন্য আবেদন করলে এবারও চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভে ব্যর্থ হয়।
৪. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সদস্য পদের জন্য সচেষ্ট হলে কোনোরূপ ভেটো না থাকায় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য পদ লাভ করে।

প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি : জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব সৈয়দ আনোয়ারুল করিম (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।

বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি : বর্তমানে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন (জুলাই, ২০০৯- বর্তমান)

নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ : ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দুই বার সদস্য পদ লাভ করে। প্রতিবারে দুই বছরে মেয়াদে সদস্য পদ লাভের তারিখ ও সময়কাল হচ্ছে নিম্নরূপ:

	তারিখ	মেয়াদকাল
তম		
প্রথম	১০ নভেম্বর, ১৯৭৮	১৯৭৯-১৯৮০
দ্বিতীয়	১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯	২০০০-২০০১

নবীন রাষ্ট্র হলেও বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করেছে। মার্চ ২০০০ এবং জুন ২০০১ বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। ২০০১ সালের জন্য মাসে সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যপদ লাভ : বাংলাদেশ ১৯৭৬-৭৮ ; ১৯৮১-৮৩ ; ১৯৮৫-৮৭ ; ১৯৯২-৯৪ এবং ১৯৯৬-৯৮ মেয়াদে সদস্য পদ লাভ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যপদ লাভ : বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৭ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)- এর সদস্যপদ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সদস্যপদ লাভ : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭২ সালের ২২ জুন।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সদস্যপদ লাভ : বাংলাদেশ (FAO) এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭২ সালের ১৩ নভেম্বর।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি

বাংলাদেশ দুইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

প্রথম : ১৯৮১ সালে বাংলাদেশসহ ইরাক ও সিঙ্গাপুর সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটে সিঙ্গাপুর হেরে যায়। বাংলাদেশ ও ইরাক সমান ভোট লাভ করে। লটারীতে বাংলাদেশ হেরে যায়।

দ্বিতীয় : ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়। এ সুবাদে সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন প্রথম কোনো বাংলাদেশি : আমিরা হক।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ : জাতিসংঘ বাজেটে বাংলাদেশের চাঁদার হার .০১ শতাংশ।

UNPKO এবং বাংলাদেশ : United Nation Peace Keeping Operation/ Mission ১৪ মে, ১৯৪৮ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের প্রেক্ষপটে জাতিসংঘ প্রথম শান্তিরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে-

UNTSO- United Nations Truce Super Vission Organization আরব-ইসরাইল। সময়কাল জানুয়ারি, ১৯৪৯।

UNMOGIP - United Nations Military Observer Group in India and Pakistan -১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। এক্ষেত্রে কাশ্মির পাকিস্তান অথবা ভারত কারও সাথেই ভুক্ত হয় নি। সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ পাকিস্তানি মোজাহিদ এবং আফগান গেরিলারা কাশ্মিরকে পাকিস্তানভুক্ত করার জন্যে আক্রমণ করে। এ প্রেক্ষাপটে প্রথম পাক- ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারণে জাতিসংঘ কাশ্মিরের শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী মিশন প্রেরণ করে।

UNMOGIP নামে শান্তি মিশন গঠন করা হয়। শান্তির লক্ষ্যে ঐক্যের প্রস্তাব Uniting for peace Resulation- ১৯৫০ থেকে ৫৩ সময়ে কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। এতে করে নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ১৯৫০ সালে Uniting for peace Resulation এর মাধ্যমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার সাধারণ পরিষদকে দেওয়া হয়। অবশ্য সাধারণ পরিষদ এ অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি।

UNEF - UN Emergency Force : (১৯৫৬) ১৯৫৬ সালে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে দ্বিতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মিশরের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, বৃটেন, ইসরাইল অংশ নেন। এ কারণে সাধারণ পরিষদ সুয়েজ অঞ্চলের জন্য সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ জাতিসংঘ জরুরি বাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত নেন।

নীল টুপির ব্যবহার : UNEF ১৯৫৬ সালে মিসরের সুয়েজ অঞ্চলে নিয়োগকৃত বাহিনীর নীল টুপি ব্যবহার শুরু হয়।

UNPKO এবং বাংলাদেশ : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশ ২০ আগস্ট ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।
UNIIMOG- Iran & Iraq Melitary Observer Group
১. সামরিক বাহিনীর ১৫ জন সদস্য অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে।
২. বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৫৪টি শান্তি মিশনে অংশ গ্রহণ করে।
৩. বর্তমানে ১৩টি মিশনে নিয়োজিত আছে।

নৌবাহিনী

১. ১৯৯৩ সালে লাইবেরিয়ায় শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।
২. এ পর্যন্ত ২১ টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে ৮টি মিশনে নিয়োজিত আছে।

বিমান বাহিনী

১. ১৯৯৩ সালে UNPROFOR UN Protection Force বসনিয়া হার্জেগোভিনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়।
২. বিমানবাহিনী এ পর্যন্ত ১৮টি মিশনে অংশ নিয়েছে এবং বর্তমানে ৭টি মিশনে নিয়োজিত আছে।

বাংলাদেশ পুলিশ :

১. ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় শান্তিরক্ষা কর্মসূচিতে প্রথম অংশগ্রহণ করে।
২. এ পর্যন্ত ২০টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৬টি মিশনে নিয়োজিত আছে।
৩. মে ২০১০ সালে বাংলাদেশের মহিলা পুলিশের একটি দল হাইতিতে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে শান্তিরক্ষা মিশনে যাত্রা শুরু করে।

জাতিসংঘে উচ্চপদে বাংলাদেশি

- **বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী :** Human Rights Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ সালে দায়িত্ব পালন করেন।
- **জনাব এস.এ.এম.এস. কিবরিয়া :** ESCAP-এর নির্বাহী সচিব (Under-Secretary-General-এর পদমর্যাদায়) হিসেবে ১৯৮১-৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- **বিচারপতি টি. এইচ. খান :** International Criminal Tribunal-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ সালে দায়িত্ব পালন করেন।
- **মেজর-জেনারেল মোঃ আবদুস সালাম :** মোজাম্বিকে UN Peace-Keeping Mission-এর Commander হিসেবে ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- **মিসেস সালমা খান :** CEDAW-এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- **ফেরদৌস আরা :** CEDAW-এর ২৩তম বিশিষ্ট বাংলাদেশি সদস্য হিসেবে ১৫ জানুয়ারি, ২০০৭ হতে দায়িত্ব পালন করেন।
- **বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী :** মহিলাদের উন্নয়নে সাধারণ পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপে এশিয়ান প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।
- বাংলাদেশ ২০০৩ সাল থেকে ৪ বছরের জন্য জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ২০০২-২০০৫ সালের জন্য আইএলও'র গভর্নিং বর্ডির ডেপুটি সদস্য নির্বাচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ WHO-এর ৫৬তম সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত।
- ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন জাতিসংঘের জাতিসংঘের বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। (জুলাই ২০০৯- বর্তমান)
- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১.২৪ এক নজরে জাতিসংঘ (United Nation- At a Glance)

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লীগ অব নেশনস গঠন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আতঙ্কিত মানবতাকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৬ সালে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব করেন। উড্রো উইলসনের বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১৯১৮ সালে প্যারিস সম্মেলনে লীগ অব নেসনস- এর গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। প্যারিসে উড্রো উইলসনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯ জন। ১৯১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এ কমিশন গঠনতন্ত্র তৈরি করে। ১৯১৯ সালের জুন মাসে ভার্সাই সন্ধির প্রথম খণ্ড হিসেবে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে ২৬ দফা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় " লীগ অব নেশনস"।

তিনটি সংস্থা নিয়ে লীগ অব নেশনস গঠিত হয়।

- পঞ্চশক্তি (ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি) নিয়ে একটি কাউন্সিল।
- লীগ অব নেশনস- এর সকল সদস্য নিয়ে একটি সাধারণ পরিষদ।
- একটি সচিবালয়। তাছাড়া আরো দুটি অঙ্গ সংস্থা ছিল-
  - ক. আন্তর্জাতিক আদালত ও
  - খ. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

লীগ অব নেশনস কনভেনান্ট অনুযায়ী কাউন্সিল ৫টি স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। আমেরিকা সংস্থায় যোগ না দেওয়ার কারণে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৮। পরে জার্মানি যোগ দেওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯।

লীগ অব নেশনস প্রত্যাশা অনুযায়ী পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। অথচ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২০ সালে লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এ

http://thejobstudy.com Go to Contents

সংস্থার উদ্দেশ্য ও নীতিমালার মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

জাতিসংঘের জন্ম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি হয়েছিল 'লীগ অব নেশনস্'। কিন্তু লীগ অব নেশনস্-এর ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ :

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ও ক্ষমতা, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষয় ও অগণিত সামরিক ও বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ, আতঙ্কিত মানবতা, ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে না পারলে পৃথিবী ধ্বংসে হয়ে যাবে। তাই সমবায় ও শান্তি এ দুই পন্থার একটি মানব জাতিকে বেছে নিতে হবে। এ কঠোর বাস্তবতা উপলব্ধি করেই ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'জাতিসংঘ' গঠিত হয়।

১. **লন্ডন ঘোষণা (জুন ১২, ১৯৪১) :** ১৯৪১ সালের জুনে জার্মানি ব্রিটেনকে আক্রমণ করার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের ৯টি প্রবাসী সরকারসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লন্ডনের জেমস্ প্রাসাদে যে ঘোষণা দেয় তাকে 'লন্ডন ঘোষণা' বলা হয়। এটি জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

২. **আটলান্টিক সনদ (আগস্ট ১৪, ১৯৪১) :** ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উইনস্টোন আটলান্টিক মহাসাগরে 'ব্রিটিশ নৌ-তরী (প্রিন্সেস অব ওয়েলস)'-এ মিলিত হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে ঘোষণা দেন তাকে 'আটলান্টিক চার্টার (সনদ) বলা হয়। জাতিসংঘ গঠনে এ সনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেননা ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ২৬টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে মিলিত হয়ে এ সনদকে 'জাতিসংঘ সনদ' নামে অভিহিত করেন।

৩. **মস্কো সম্মেলন (অক্টোবর ১৯-৩০, ১৯৪৩) :** ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের ১৯-৩০ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণের সম্মেলনে বিশ্ব শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ৭ দফা চুক্তি সম্বলিত ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণাপত্রেই বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়।

৪. **তেহরান সম্মেলন (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৪৩) :** ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন ইরানের রাজধানী তেহেরানে মিলিত হয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ঘোষণা প্রদান করেন। ঘোষণাটি প্রদান করা হয় ১ ডিসেম্বর, ১৯৪৩। সম্মেলনে বিশ্বের ছোট বড় সকল দেশকে সদস্য হওয়ার জন্য আহবান করা হয়।

৫. **ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন (আগস্ট ২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৪৪) :** ১৯৪৪ সালের আগস্ট ২১ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস ভবনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রতিনিধিগণ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জাতিসংঘ গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এতে জাতিসংঘ গঠনের- ক. রূপরেখা, খ. নিরাপত্তা পরিষদ গঠন ও এর পাঁচটি স্থায়ী সদস্য নির্বাচন, গ. সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'জাতিসংঘ'।

৬. **ইয়াল্টা সম্মেলন (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫) :** ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের ইয়াল্টায় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যে সম্মেলনে মিলিত হন এটিই 'ইয়াল্টা সম্মেলন' নামে অভিহিত। এখানে ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ সম্মেলনে ৫টি স্থায়ী সদস্যকে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৭. **সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন (এপ্রিল ২৫ থেকে জুন ২৬, ১৯৪৫) :** ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে

২৬ জুন মিত্র শক্তির দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ১১১টি ধারা সম্বলিত 'জাতিসংঘ সনদ' প্রণয়ন করেন। ২৬ জুন ১৯৪৫ সম্মেলনে উপস্থিত ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা সনদে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখে ৫১তম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে পোল্যান্ড জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে এ সনদ কার্যকর হয়। তখন থেকেই প্রতি বছর ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তবে জাতিসংঘের প্রথম নিয়মিত অধিবেশন বসে লন্ডনে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে।

জাতিসংঘ সনদের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে আগ্রহী; বিশ্বের যে কোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হবার যোগ্য। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩। সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই, ২০১১ সালে)। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্যকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

জাতিসংঘের সদস্য নয় : তাইওয়ান

জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক : ভ্যাটিকান এবং ফিলিস্তিন

সদর দফতর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতর (ফ্লাসিং মিডোস) অবস্থিত। নিউইয়র্কে সদর দফতরের ১৭ একর জমি দান করেন জন ডি রকফেলার। ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে মহাসচিব ট্রিগভি লাই সদর দপ্তর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯ মাস পর ১৯৫১ সালে ২১ আগস্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ তাদের নতুন কার্যালয়ে কাজ শুরু করেন। জেনেভায় জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দফতর অবস্থিত।

জাতিসংঘের পতাকা : হালকা নীলের মাঝখানে একটি সাদা বৃত্ত এবং এ বৃত্তের মাঝে থাকে জাতি সংঘের প্রতীক। প্রতীকটি জলপাই শাখায় জড়ানো পৃথিবীর একটি মানচিত্র যা হলো বিশ্ব শান্তির নিদর্শন। ২০ অক্টোবর ১৯৪৭ সাধারণ পরিষদ পতাকাটির নকশা অনুমোদন করেন।

জাতিসংঘের সরকারি ভাষা : ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রুশ এবং স্প্যানীস। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভাষা হিসেবে আরবীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হয় ইংরেজি এবং ফরাসি।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য :

ক. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।
খ. সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।
গ. আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা।
ঘ. মানুষের সমঅধিকার, স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।
ঙ. আন্তর্জাতিক বিবাদ- বিষয়াদিগুলোকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী মীমাংসা করা।

জাতিসংঘের মূল সংস্থাগুলো :

মূল সংস্থা ৬টি। যথা-

ক. সাধারণ পরিষদ (General Assembly);
খ. নিরাপত্তা পরিষদ বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council);
গ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council);
ঘ. সম্পাদকীয় দফতর (Secretariat);
ঙ. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice);
চ. অছি পরিষদ (Trusteeship Council);

সাধারণ পরিষদ(General Assembly)

এটা হচ্ছে জাতিসংঘের আলোচনা পরিষদ (Discussion Body) যা সকল সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। প্রতিটি সদস্য দেশ সাধারণ পরিষদে সর্বাধিক ৫ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের একটি মাত্র ভোট দানের ক্ষমতা আছে। ভোটাধিকার ক্ষমতা প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সমান। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়। এ পরিষদ সনদভুক্ত যে কোনো ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে। সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন বসে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার। কিন্তু উদ্ভূত কোনো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য সাধারণ পরিষদ বছরের যে কোনো সময় বিশেষ (Special) অথবা জরুরি (Emergency) অধিবেশনে বসতে পারে। এ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ এবং জাতিসংঘের বাজেট পাস করাও এ পরিষদের কাজ।

নিরাপত্তা পরিষদ বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council)

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এ পরিষদের প্রধান কাজ। এ পরিষদকে জাতিসংঘের কার্যনির্বাহী কমিটি বলা হয়। ২৪ ঘন্টার নোটিশে এ পরিষদ অধিবেশন ডাকতে পারে। ৫ জন স্থায়ী ও ১০ জন অস্থায়ী মোট ১৫ জন সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত (১৯৬৫ সালের পূর্বে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ জন)। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো - যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। এশীয় দেশসমূহ হতে ২ জন, আফ্রিকান দেশসমূহ হতে ৩ জন, ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ হতে ২ জন, পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশসমূহ যেমন অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি হতে ২ জন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ হতে ১ জন মোট ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এ পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটদানের অধিকার আছে। কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯টি সম্মতিসূচক ভোটের প্রয়োজন। কোনো স্থায়ী সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের এ বিশেষ ক্ষমতাই 'ভেটো' (Veto) নামে পরিচিত। এ ভেটো ক্ষমতার জন্যই জাতিসংঘের সকল সদস্যের ক্ষমতা সমান নয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ছাড়াও এ পরিষদ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি, যে কোনো পুরনো সদস্যের বহিষ্কার, জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক নিয়োগ অনুমোদন করে।

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির পদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নামের ইংরেজির আদ্যক্ষর অনুসারে একমাস পর পর পরিবর্তন হতে থাকে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)

এ পরিষদের উদ্দেশ্য বিশ্বে উন্নততর ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন, মানবাধিকার অর্জন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও চোরাচালান রোধ ইত্যাদি। ৫৪ জন সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়। সদস্যদের মেয়াদ ৩ বছর। প্রতিবছর ১৮ জন সদস্য অবসর গ্রহণ করেন ও ১৮ জন নতুন সদস্য পরবর্তী ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এ সদস্যরা সাধারণ পরিষদের দুই- তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। বছরে অন্তত দুবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। একটি নিউইয়র্কে জাতি

সংঘের সদর দফতরে এবং অন্যটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এ পরিষদের অধীনস্থ আঞ্চলিক অফিসগুলো-

ক. এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ব্যাংকক (থাইল্যান্ড)
খ. আফ্রিকা অঞ্চল আদ্দিস আবাবা (ইথিওপিয়া)
গ. ইউরোপ অঞ্চল জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)
ঘ. ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চল সান্টিয়াগো (চিলি)
ঙ. পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল বৈরুত (লেবানন)

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্য নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এ পরিষদের মূল কাজ হচ্ছে অছি-অঞ্চলভুক্ত এলাকাগুলোর জনসাধারণের উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের পথ সুগম করা।

এ অছি ব্যবস্থা এতই সফলতা লাভ করেছে যে, ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে পালাউ-এর স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে অছি অন্তর্ভুক্ত ১১টি ট্রাস্ট অঞ্চলের সবগুলো স্বাধীনতা লাভ বা প্রতিবেশী স্বাধীন দেশের সঙ্গে একত্রীভূত হবার মধ্য দিয়ে এ পরিষদের কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন হতে অছি পরিষদ শুধুমাত্র প্রয়োজনে অধিবেশনে মিলিত হবে।

আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গ সংস্থা। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের কার্যকাল নয় বছর। আদালতে পেশ করা মামলায় কেবল কোনো দেশই পক্ষ হতে পারে, ব্যক্তি নয়। কোনো দেশ মামলার কার্য প্রণালিতে অংশ নিতে অনিচ্ছুক হলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেশটি যদি মামলা মেনে নেয় তবে সে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। আদালত নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে অবস্থিত।

সচিবালয় (Secretariat)

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও বাইরে কর্মরত আন্তর্জাতিক কর্মচারীদলকে নিয়ে সচিবালয় গঠিত। সম্পাদকীয় দফতরের প্রধান জাতিসংঘের মহাসচিব। তিনি হলেন জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য জাতি সংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন। মহাসচিবকে তার কার্যে সহায়তা করে ১২ জন অধস্তন সচিব (Under Secretary) এবং ১২ জনেরও অধিক সহকারী সচিব (Assistant Secretary)। সম্প্রতি একটি উপ-মহাসচিব পদও তৈরী করা হয়েছে। মেয়াদ শেষে একজন মহাসচিব পুনরায় ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন।

জাতিসংঘের মহাসচিবগণ (UN Secretary General)

১. লর্ড গাডউইন (শুরু থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) :
- তিনি ব্রিটেনের নাগরিক।
- সময়কাল শুরু হতে ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।
- তিনি অন্যতম জাতিসংঘের সনদ প্রণেতা।
- তিনি ন্যাটো সনদের প্রণেতা।
- ১৯৯৬ সালে ২৪ আগস্ট জাতিসংঘ দিবসে মারা যান।

২. ট্রিগভেলী (২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ - ১০ নভেম্বর, ১৯৫৩):
- তিনি নরওয়ের নাগরিক।
- তার দায়িত্বের সময়কাল ১৯৪৬-১৯৫৩ সাল।

- তিনি জাতিসংঘের প্রথম নির্বাচিত মহাসচিব।
- তার সময়ে চীনের বিপ্লব, কোরিয় যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধের বিকাশ হয়।

৩. দ্যাগ হ্যামার শোল্ড (১০ নভেম্বর, ১৯৫৩ - ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১) :
- তিনি সুইডেনের অধিবাসী।
- তার দায়িত্বের মেয়াদ ১৯৫৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত।
- তিনি দুইবার মহাসচিব পদে নির্বাচিত হন।
- ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ কঙ্গো ও কাতাঙ্গার মধ্যে গৃহযুদ্ধ নিরসনের লক্ষ্যে কাতাঙ্গা যাওয়ার পথে উত্তর রোডেশিয়ার (বর্তমান জাম্বিয়া) এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।
- তিনি মহাসচিব হিসেবে ১৯৬১ সালে প্রথম শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
- তার নামে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে একটি লাইব্রেরি করা হয়েছে।

৪. উথান্ড : (৩০ নভেম্বর, ১৯৬১ - ১ জানুয়ারি, ১৯৭১)
- তিনি মায়ানমারের নাগরিক।
- প্রথমে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে কাজ শুরু করেন, পরে নির্বাচিত হন।
- তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন।
- তিনি দুইবার মহাসচিব নির্বাচিত হন।
- তিনি এশিয়ার প্রথম জাতিসংঘ মহাসচিব।

৫. কুট ওয়ার্ল্ড হেইম : (১ জানুয়ারি, ১৯৭২-১ জানুয়ারি, ১৯৮১)
- তিনি অস্ট্রিয়ার নাগরিক।
- তিনি এ পর্যন্ত একমাত্র মহাসচিব যিনি নিজ দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।
- তার বিরুদ্ধে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগ রয়েছে।
- তিনি দুইবার নির্বাচিত হন।

৬. হ্যাভিয়ার প্যারেজ দ্য কুইয়ার : (১ জানুয়ারি, ১৯৮২-১ জানুয়ারি, ১৯৯১)
- তিনি পেরুর নাগরিক।
- তার সময়ে উপসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
- তিনি তার দেশে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন।
- তিনি পেরুর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।
- তিনি দুইবার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৭. ড. বুট্রোস ঘালী : (১ জানুয়ারি, ১৯৯২-১ জানুয়ারি, ১৯৯৬)
- তিনি মিসরের নাগরিক।
- স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর তিনি প্রথম মহাসচিব।
- তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারেন নি।
- তিনি ১৯৯৫ সালে ওনাসিস পুরস্কার লাভ করেন।

৮. কফি আনান : (১ জানুয়াররি, ১৯৯৭-১ জানুয়ারি, ২০০৬)
- তিনি ঘানার নাগরিক।
- কফি আনান ও জাতিসংঘ একত্রে শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।
- তিনি দুইবার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৯. বান কি মুন : (১ জানুয়ারি, ২০০৭- বর্তমান)
- তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী।
- জাতিসংঘ মহাসচিব একজন একাধিকবার নির্বাচিত হতে পারেন। তবে এ পর্যন্ত দুইবারের বেশি কেউ নির্বাচিত হননি। জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচনে ৯ জনের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

১.২৬ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

কে দায়িত্বে থাকেন

নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য দেশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম গঠন ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে। জাতিসংঘ সনদে বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের মূল দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা

করা। পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য চীন, ফ্রান্স, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্তে ভেটো প্রয়োগ করতে পারে।

শান্তিরক্ষা মিশনের সৈনিকরা জাতিসংঘের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে না। যেসব সরকার স্বেচ্ছায় সৈনিক প্রদান করেন তারাই কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ তাদের অংশগ্রহণের শর্ত নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করেন। শৃঙ্খলা ও সেনা সদস্য সংক্রান্ত বিষয়সহ জাতিসংঘের পতাকাতলে কর্মরত সামরিক বাহিনীর ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারের হাতেই থাকে এবং ইচ্ছে করলে তারা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারেন। শান্তিসেনারা তাদের জাতীয় ইউনিফরম পরিধান করেন। শান্তিসেনা হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করার জন্যে তারা নীলবেরেট বা হেলমেট ও জাতিসংঘের প্রতীক পরিধান করেন।

UNPKO

১. ১৯৪৮ সাল থেকে মোট ৬৯টি শান্তিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
২. আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা দিবস ২০০২ সালে সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে ২৯ মে "আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস" হিসেবে পালিত হবে। এ মোতাবেক ২০০৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

শান্তিরক্ষা কর্মসূচিতে সর্বাধিক ব্যয় বহনকারী দেশ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- ২৭%, জাপান- ১৯%, জার্মানি - ৯%, ব্রিটেন- ৭%, ফ্রান্স- ৭%, ইতালি- ৫%, কানাডা- ৩%, স্পেন- ৩%, চীন- ২%, নেদারল্যান্ড- ২% মোট ৮৪ %।

শান্তিসেনাদের কীভাবে ক্ষতিপূরণ করা হয় : শান্তিরক্ষা সৈনিকদের তাদের নিজ নিজ সরকার তাদের জাতীয় র‍্যাংক ও বেতনক্রম অনুসারে বেতন-ভাতা পরিশোধ করেন। যেসব দেশ শান্তিরক্ষায় স্বেচ্ছায় সৈনিক প্রেরণ করে তাদের সৈনিক পিছু মাসে একটা সাধারণ হার প্রায় ১ হাজার ডলার করে পরিশোধ করা হয়। জাতিসংঘ সরঞ্জামের জন্যও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে পাওনা অর্থ না পাওয়ার কারণে নগদ অর্থ ঘাটতির ফলে এসব দেশকে প্রায়ই অর্থ প্রদান ব্যাহত হয়।

১৯৪৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১২২টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে বর্তমানে জাতিসংঘের ১৬টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।

জাতিসংঘের শান্তি প্রক্রিয়ার সহায়ক মিশন বর্তমানে কার্যরত : ১৬টি।

জাতিসংঘের বিভিন্ন বৈঠকে যে সমস্ত সংস্থাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় :

১. ফিলিস্তিন, ২. এশিয়ান-আফ্রিকান আইন পরামর্শ কমিটি, ৩. ক্যারাবিয়ান কমিউনিটি, ৪. কমনওয়েলথ, ৫. ইউরোপীয়ান কমিশন, ৬. আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন সংস্থা, ৭. আন্তর্জাতিক সমুদ্র উপকূল কর্তৃপক্ষ, ৮. আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ট্রাইব্যুনাল, ৯. প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থা, ১০. আরব লীগ, ১১. আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, ১২. ওআইসি, ১৩. রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট।

জাতিসংঘ আহূত শীর্ষ সম্মেলন

শিশু বিষয়ক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন	নিউইয়র্ক, ১৯৯০
জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন	রিও ডি জেনিরো, ১৯৯২
বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন	ভিয়েনা, ১৯৯৩
আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন	কায়রো, ১৯৯৪
বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন	কোপেন হেগেন, ১৯৯৫
চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন	বেইজিং, ১৯৯৫
দ্বিতীয় বিশ্ব আবাসন সম্মেলন	ইস্তাম্বুল, ১৯৯৬
পরিবেশ সম্মেলন + ৫	নিউইয়র্ক, ১৯৯৭
বেইজিং+৫ সম্মেলন	নিউইয়র্ক, ২০০০
তৃতীয় বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলন	ডারবান, ২০০১
বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন	রোম, ২০০২
জাতিসংঘ শিশু সম্মেলন	নিউইয়র্ক, ২০০২
পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন	জোহানসবার্গ, ২০০২

১.২৭ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন

সদস্য সংখ্যা : ৫৩

সদস্য দেশসমূহ : আর্মেনিয়া, অস্ট্রিয়া, বাহরাইন, চিলি, দক্ষিণ কোরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ফ্রান্স, মেক্সিকো, উগান্ডা, পাকিস্তান, সিয়েরালিওন, সুদান, সুইডেন, টোগো, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, জার্মানি, সৌদি আরব, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, বরুন্ডি, ক্যামেরুন, কানাডা, চীন, কোস্টারিকা, কিউবা, ইকুয়েডর, স্পেন, গুয়াতেমালা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, লিবিয়া, মাদাগাস্কার, নাইজেরিয়া, পেরু, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, চেক প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, সেনেগাল, সোয়াজিল্যান্ড, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, ভিয়েতনাম ও জাম্বিয়া।

১.২৮ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ

জাতিসংঘের ১৬টি সংস্থাকে বিশেষ সংস্থা'র মর্যাদা দেওয়া হয়। সংস্থাগুলো হচ্ছে-

- ILO -International Labour Organization. (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
- FAO-Food and Agirucultural Organization. (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
- WHO-World Health Organization. (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
- UNESCO-United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. (জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা)
- WORLD BANK : এটি ৫টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত যথা-
  - ◆ IBRD : International Bank for Reconstruction and Development.
  - ◆ IDA : International Development Association.
  - ◆ IFC : International Finance Corporation.
  - ◆ MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency.
  - ◆ ICSID : International Centre for Setterment Investment Disputes.
- আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF-International Monetary Fund.
- আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO-International Civil Aviation Organization.
- বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU-Universal Postal Union.
- আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU-International Telecommunication Union
- বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO-World Meterological Organization.
- জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO-United Nations Industrial Development Organization).
- বিশ্ব বুদ্ধিসম্পদ সংস্থা (WIPO) সদস্য : ১৮৭ (সর্বশেষ-টুভ্যালু ৪ জুন, ২০১৪)
- আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা (IMO)
- বিশ্ব বাণিজ সংস্থা (WTO-World Meterological Organization).

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

- ILO-র পূর্ণরূপ: International Labour Organization.
- ILO-প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে।
- কোনো চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠিত : ভার্সাই চুক্তি।
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সালে।
- ILO-এর সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- ILO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৯০টি।
- ILO শান্তিতে ১ম নোবেল পুরস্কার পায় : ১৯৬৯ সালে।
- বাংলাদেশ ILO-এর সদস্য পদ লাভ করে : ২২ জুন, ১৯৭২ সালে।
- ILO-এর বর্তমান প্রধান : গাই রাইগার (ব্রিটেন, দশম)।

[Source:www.ilo.org]

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

- FAO-এর পূর্ণরূপ : Food and Agirucultural Organization.
- প্রতিষ্ঠা : ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে।
- সদর দপ্তর : রোম, ইতালি।
- আঞ্চলিক সদর দপ্তর :

অঞ্চল	দপ্তর
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ল্যাটিন আমেরিকা	সান্টিয়াগো, চিলি
পূর্ব আফ্রিকা	দারুসসালাম, তানজানিয়া
পশ্চিম আফ্রিকা	আক্রা, ঘানা

- প্রধানের পদবি : ডিরেক্টর জেনারেল।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৯৫টি।
- গভর্নিং বডি গঠিত : ৪৯ জন।
- ডিরেক্টর জেনারেলের মেয়াদকাল : ৬ বছর।
- বর্তমান প্রধান : জোসে গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভা(ব্রাজিল,নবম)।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস : ১৬ অক্টোবর।
- বাংলাদেশ এর সদস্য লাভ করে : ১৩ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।

[Source:www.fao.org]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

- WHO-এর পূর্ণরূপ : World Health Organization.
- প্রতিষ্ঠা : ৭ এপ্রিল, ১৯৪৮ সালে।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৯৪ টি ।
- সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- প্রধানের পদবি : ডিরেক্টর জেনারেল।
- বর্তমান মহাপরিচালক : মার্গারেট চ্যান (হংকং, সপ্তম)।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস : ৭ এপ্রিল
- বাংলাদেশ WHO এর সদস্য পদ লাভ করে ১৭ মে, ১৯৭২ সালে ।

[Source:www.who.org]

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

- UNESCO-এর পূর্ণরূপ : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
- প্রতিষ্ঠা : ১৬ মে, ১৯৪৫ সালে।
- সর্বশেষ সদস্য : ফিলিস্তিন (২৩ নভেম্বর, ২০১১)
- সদর দপ্তর : প্যারিস, ফ্রান্স।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৯৬টি।
- বর্তমান মহাসচিব : Miz Irina Bokova (বুলগেরিয়া, দশম)।
- যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করে : ১৯৮৪ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ ১৮ বছর পর পুনরায় UNESCO-তে ফিরে আসে : ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশ UNESCO-এর সদস্য পদ লাভ করে : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

[Source:www.unesco.org]

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)

- ICAO-এর পূর্ণরূপ : International Civil Aviation Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ৪ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে।
- সদর দপ্তর : মান্ট্রিল, কানাডা।
- সদস্য সংখ্যা : ১৯০টি।
- বর্তমান মহাসচিব :রেমন্ড বেঞ্জামিন।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করেঃ ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ সালে।

[Source:www.icao.org]

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)

- UPU-এর পূর্ণরূপ : Universal Postal Union.
- প্রতিষ্ঠা : ৯ অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে। বার্ন চুক্তির মাধ্যমে।
- কার্যক্রম শুরু : ৯ জুলাই, ১৮৭৫ সালে।
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদালাভ : ১ জুলাই, ১৯৪৮ সালে।
- সদর দপ্তর : বার্ন, সুইজারল্যান্ড।
- সদস্য সংখ্যা : ১৯২ টি (দক্ষিণ সুদান, ১৮ এপ্রিল, ২০১১)।
- বাংলাদেশ UPU-এর সদস্য পদ লাভ করে ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ সালে।
- বর্তমান মহাসচিব : এডওয়ার্ড ডায়ন।
- বিশ্ব ডাক দিবস : ৯ অক্টোবর

[Source:www.upu.org]

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন

- ITU-'র পূর্ণরূপ : International Telecommunication Union
- প্রতিষ্ঠিত হয় : প্যারিসে।
- জাতিসংঘের মর্যাদা লাভ : ১৬ মে, ১৯৪৭ সালে।
- সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৯২টি (দক্ষিণ সুদান, ১৮ এপ্রিল, ২০১১)।
- বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস : ১৭ মে।
- বর্তমান মহাসচিব : হাসদোনতোরি (মালি) ।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সালে।

[Source:www.itu.org]

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)

- WMO-এর পূর্ণরূপ : World Meterological Organization.
- প্রতিষ্ঠা : ১৮৭৩ সালে।
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ : ২৩ মার্চ, ১৯৫০ সালে।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৮৮ টি (ট্রুভালু ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২)।
- বর্তমান প্রধান : Alexzander Bedriffky (১৫ তম)।
- সদর দপ্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করেঃ ২৪ আগষ্ট, ১৯৭৩ সালে।

[Source:www.wmo.org]

জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)

- UNIDO-এর পূর্ণরূপ: United Nations Industrial Development Organization.
- প্রতিষ্ঠা : ১৯৬৬ সালে।
- জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদালাভ : ১ জানুয়ারি, ১৯৮৫ সালে।
- সদর দপ্তর : ভিয়েনা অস্ট্রিয়া।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৭১টি।
- বর্তমান মহাসচিব : Kandeh yumkella-(সিয়েরা লিওন)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।

[Source:www.unido.org]

১.২৯ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

১. জাতিসংঘের পূর্বসূরি লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।
২. লীগ অব নেশনস গঠনের প্রস্তাবক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
৩. লীগ অব নেশনস বিলুপ্ত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে।
৪. লীগ অব নেশনস-এর সদর দপ্তর ছিল জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
৫. জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবক ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
৬. জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত প্রথম ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয় ১ জানুয়ারি, ১৯৪২।
৭. জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত লন্ডন ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয় ১২ জুন, ১৯৪১।
৮. জাতিসংঘের নামকরণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (১ জানুয়ারি, ১৯৪২)।
৯. জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত লন্ডন ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয় ১৪ আগস্ট, ১৯৪১।
১০. জাতিসংঘের খসড়া সনদ প্রণয়ন করা হয় ১৯৪৪ সালে।
১১. জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইরানের রাজধানী তেহরানে।
১২. জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকস্ সম্মেলনে।
১৩. জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণকারী দেশসমূহ চীন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
১৪. জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় ২৬ জুন, ১৯৪৫।
১৫. জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয় ২৫ এপ্রিল-২৬ জুন, ১৯৪৫ সানফ্রান্সিসকোতে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিদের সম্মতিতে।
১৬. জাতিসংঘ সনদ কার্যকরী হয় ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে।
১৭. প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় ২৪ অক্টোবর।
১৮. ২৬ জুন, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সনদে স্বাক্ষর না করেও প্রতিষ্ঠার সময় জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয় পোল্যান্ড।
১৯. জাতিসংঘের সনদ পাস এবং স্বাক্ষর করে ৫০টি দেশ ২৬ জুন, ১৯৪৫ সালে।
২০. সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ অক্টোবর থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৬।
২১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে।
২২. সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার (মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলে)।
২৩. সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন এক বছর মেয়াদে।
২৪. সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে।
২৫. নিয়মিত অধিবেশন ছাড়া সাধারণ পরিষদ মিলিত হতে পারে বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে।
২৬. সাধারণ পরিষদের সভাপতি পালাক্রমে নির্বাচিত হন এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে।
২৭. নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন এক মাসের জন্য।
২৮. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় ২ বছরের জন্য।

২৯. নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে সম্মতি প্রয়োজন ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রসহ অতিরিক্ত ৪টি রাষ্ট্রের (মোট ৯টি রাষ্ট্রের)।
৩০. নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন জাতিসংঘের সদর দপ্তর ছাড়া অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুইবার (১৯৭২ সালে আদ্দিস আবাবায় এবং ১৯৭৩ সালে পানামা সিটিতে)।
৩১. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫৪।
৩২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন ৩ বছরের জন্য।
৩৩. প্রতিবছর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ১৮ জন সদস্য অবসর গ্রহণ করেন।
৩৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশন বছরে ২ বার অনুষ্ঠিত হয়।
৩৫. জাতিসংঘের অছি পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে।
৩৬. প্রতিবছর অছি পরিষদের ২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।
৩৭. আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর অবস্থিত হেগ (নেদারল্যান্ড)-এ।
৩৮. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারকের সংখ্যা ১৫ জন।
৩৯. আন্তর্জাতিক আদালতে একজন বিচারক নির্বাচিত হন ৯ বছর মেয়াদে।
৪০. আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন ৩ বছর মেয়াদে।
৪১. জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ৩ (ভ্যাটিকান ও প্যালেস্টাইন)।
৪২. বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য (বাংলাদেশের সঙ্গে সদস্যপদ দেওয়া হয় গ্রানাডা ও গিনিবিসাউকে)।
৪৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের (৭৯-৮০) অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় ১০ নভেম্বর, ১৯৭৮।
৪৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় ১৯৮৬ সালে (৪১তম অধিবেশনে)।
৪৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
৪৭. জাতিসংঘের ফারাক্কা বিষয় প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে।
৪৮. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩১তম অধিবেশনে ফারাক্কা বিষয় উত্থাপিত হয়।
৪৯. সাধারণ পরিষদের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে ফারাক্কা বিষয়ে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন এডমিরাল এম এইচ খান।
৫০. সাধারণ পরিষদের ফারাক্কা বিষয় সর্বসম্মত ঘোষণা হিসেবে গৃহীত হয় ২৬ নভেম্বর, ১৯৭৬।
৫১. জাতিসংঘের ইউরোপীয় কার্যালয় অবস্থিত জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
৫২. জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৭৩ সালে টোকিওতে।
৫৩. জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধানকে বলা হয় মহাসচিব (সেক্রেটারি জেনারেল)।
৫৪. জাতিসংঘের মহাসচিব নিযুক্ত হন নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে।
৫৫. জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদকাল ৫ বছর।
৫৬. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রিগভেলি (নরওয়ে)।
৫৭. জাতিসংঘের মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।
৫৮. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়ান)।
৫৯. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারত), ১৯৫৩।
৬০. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম মুসলিম নারী সভাপতি সায়খা বিনতে রশীদ আল খলিফা (বাহরাইন), ২০০৬।
৬১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম সভাপতি পল হেনরি স্পাক (বেলজিয়াম), ১৯৪৬।
৬২. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম এশীয় সভাপতি কার্লোস পি. রোমুলো (ফিলিপাইন), ১৯৪৯।
৬৩. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম মুসলিম সভাপতি নাসরুল্লাহ এনাতেজাম (ইরান), ১৯৫৫।
৬৪. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Brief Questions & Answer)

১. লীগ অব নেশনস বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কত সালে গঠিত হয়?
উত্তরঃ ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি।

২. লীগ অব নেশনস গঠন সংক্রান্ত 'ভার্সাই চুক্তি' কবে গৃহীত হয়?
উত্তরঃ ১৯১৯ সালের ২৮ জুন।

৩. লীগ অব নেশনস-এর সদর দপ্তর কোথায় স্থাপন করা হয়?
উত্তরঃ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

৪. কয়টি প্রধান সংস্থা নিয়ে লীগ অব নেশনস গঠিত হয় ?
উত্তরঃ তিনটি। যথা: ক. সাধারণ সভা, খ. কাউন্সিল এবং গ. সচিবালয়।

৬. লীগ অব নেশনস এর লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তরঃi. বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করা; ii. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও iii. রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।

৭. লীগ অব নেশনস-এর অন্যতম সংস্থা 'পরিষদ' কতটি সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল?
উত্তরঃ পাঁচটি স্থায়ী সদস্য- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান এবং ৪টি অস্থায়ী সদস্য নিয়ে।

৮. লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কে করেছিলেন?
উত্তরঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

৯. লুয়ার্ডের মতানুযায়ী লীগ অব নেশনস এর ব্যর্থতার কারণগুলো কী কী?
উত্তরঃ i. কোনো দৃঢ়তা ছিল না; ii. তার কোনো বর্তৃত্ব ছিল না ও iii. সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব ও সংকটের সময় লীগ অব নেশনস সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়ে।

১০. জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত 'লন্ডন ঘোষণা' কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৪১ সালের ১২ জুন।

১১. জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবক কে ছিলেন?
উত্তরঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট।

১২. জাতিসংঘ নামকরণ করেন কে?
উত্তরঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট।

১৩. জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তরঃ ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন।

১৪. জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত 'আটলান্টিক ঘোষণা' কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তরঃ ১৯৪১ সালের যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস এ।

১৫. জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাব কবে ও কোথায় গৃহীত হয়?
উত্তরঃ ১৯৪৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস এ।

১৬. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

উত্তরঃ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।

১৭. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

১৮. জাতিসংঘের সদস্য দপ্তরের স্থপতি কে?
উত্তরঃ ভ্রিউ হ্যারিসন।

১৯. কতটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করেছিল?
উত্তরঃ ৫১টি।

২০. কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর না করেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মর্যাদা পেয়েছিল?
উত্তরঃ পোল্যান্ড।

২১. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা দেশ কতটি?
উত্তরঃ ১৯৩ টি।

২২. জাতিসংঘ কতটি সংস্থা নিয়ে গঠিত হয়েছিল?
উত্তরঃ ৬টি। যথা: সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আদালত ও অছি পরিষদ।

২৩. জাতিসংঘের প্রত্যেক দেশ কোন পরিষদের সদস্য ?
উত্তরঃ সাধারণ পরিষদের সদস্য ।

২৪. "The United Nations: How it works and what it does"-গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তরঃ Evan Luard।

২৫. সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত বছরের জন্য?
উত্তরঃ ১ বছরের জন্য।

২৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম সভাপতি কে?
উত্তরঃ পল হেনরি স্মাক (বেলজিয়াম)।

২৭. সাধারণ পরিষদের কার্য পরিচালনার জন্য কয় ধরণের কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে?
উত্তরঃ ৩ ধরনের। কমিটিগুলো হলো i. প্রধান কমিটি; ii. পদ্ধতি বিষয়ক কমিটি ও iii. স্থায়ী কমিটি.

২৮. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ছিল?
উত্তরঃ ৪১ তম অধিবেশনে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

২৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?
উত্তরঃ ১৩৬ তম।

৩০. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি কে?
উত্তরঃ বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারত)।

৩১. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তরঃ ১৯৭৪ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর।

৩২. সাধারণ পরিষদের মুখ্য বা প্রধান কমিটি কয়টি ও কী কী ?
উত্তরঃ ৭টি। যথা: i. রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি; ii. অর্থনৈতিক এবং অর্থ বিষয়ক কমিটি; iii. সামাজিক, মানবিকও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিটি; iv. অছি বিষয়ক কমিটি; v. প্রশাসন ও বাজেট সম্পর্কিত কমিটি; vi. আইন বিষয়ক কমিটি ও vii. বিশেষ কমিটি।

৩৩. সাধারণ পরিষদ সর্বপ্রথম কার্যক্রম শুরু করে কত সালে?
উত্তরঃ ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি।

৩৪. সাধারণ পরিষদের নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয় কবে?

উত্তর: সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার।

৩৫. জাতিসংঘের মূল সনদে কতটি অধ্যায় ও ধারা রয়েছে?
উত্তর: ১৯টি অধ্যায় এবং ১১১টি ধারা।

৩৬. নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর: ১৫টি। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী।

৩৭. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী দেশগুলোর নাম কী?
উত্তর: i. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ii. ব্রিটেন; iii. ফ্রান্স; iv. রাশিয়া ও v. চীন।

৩৮. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কত সময়ের জন্য নির্বাচিত হয় ?
উত্তর: ২ বছরের জন্য।

৩৯. নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কত সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর: ১ মাসের জন্য।

৪০. নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে কতটি দেশের সম্মতি প্রয়োজন?
উত্তর: ৯টি। ৫টি স্থায়ীসহ আরো ৪টি সদস্য রাষ্ট্রের।

৪১. 'ভেটো' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: আমি এটি মানি না।

৪২. জাতিসংঘের কোন দেশগুলো ভেটো ক্ষমতার অধিকারী?
উত্তর: নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র।

৪৩. নিরাপত্তা পরিষদের গঠন জাতিসংঘের কত নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
উত্তর: ২৩ নং অনুচ্ছেদে।

৪৪. VETO কী শব্দ?
উত্তর: ল্যাটিন শব্দ।

৪৫. নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি কী কী?
উত্তর: শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক কাজ, আঞ্চলিক ব্যবস্থা গঠন, অছিগিরি কাজ এবং নির্বাচনমূলক ক্ষমতা।

৪৬. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের সংখ্যা কত জন?
উত্তর: ১৫ জন।

৪৭. জাতিসংঘ সনদের কত ধারায় আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন, কার্যাবলি ও এখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: চতুর্দশ অধ্যায়ে এবং ৯২-৯৬ নং ধারায়।

৪৮. আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: নেদারল্যান্ডের দ্যা হেগ শহরে।

৪৯. আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর: তিন ভাগে। যথা: i. স্বেচ্ছামূলক এখতিয়ার, ii. আবশ্যিক এখতিয়ার ও iii. পরামর্শদানমূলক এখতিয়ার।

৫০. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয় ?
উত্তর: ৯ বছরের জন্য।

৫১. আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর: ৩ বছরের জন্য।

৫২. কত নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি বর্ণিত রয়েছে?
উত্তর: ৬১-৭২ নং অনুচ্ছেদে।

৫৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি?

http://thejobstudy.com Go to Contents

উত্তর: ৫৪টি।

৫৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন কতটি?
উত্তর: দু'বার/তিনবার।

৫৫. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন কতটি?
উত্তর: ৫টি।

৫৬. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্থায়ী কমিটি কয়টি ?
উত্তর: ৭টি।

৫৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যকরী কমিশন কতটি?
উত্তর: ৬টি।

৫৮. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি কী কী?
উত্তর: অধিকার ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, তথ্যসংগ্রহ ও বিন্যাস চুক্তিপত্র তৈরি, রিপোর্ট প্রণয়ন ইত্যাদি।

৫৯. জাতিসংঘ সনদের কত ধারায় অছি পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: ৮৬-৯১ নং ধারায়।

৬০. অছি পরিষদের সদস্যগণ কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর: ৩ বছরের জন্য।

৬১. অছি পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার ঘটানো, সকল মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অধিকার স্বীকার করা।

৬২. জাতিসংঘের মহাসচিব কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর: ৫ বছরের জন্য।

৬৩. জাতিসংঘ সনদের কত নং ধারায় মহাসচিবের কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর: ৯৭ নং ধারায়।

৬৪. জাতিসংঘ সনদের কত নং ধারায় জাতিসংঘ সচিবালয় গঠনের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: ৯৭ নং ধারায়।

৬৫. জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধান কে?
উত্তর: মহাসচিব।

৬৬. জাতিসংঘ সচিবালয় কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত?
উত্তর: ১২ জন উপ মহাসচিব ও ১২জন সহকারী মহাসচিবসহ ৪০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়েগ গঠিত এবং সম্প্রতি একটি উপমহাসচিব পদও তৈরি হয়েছে।

৬৭. জাতিসংঘ সচিবালয় কতটি বিভাগ নিয়ে গঠিত?
উত্তর: ৯টি।

৬৮. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিবের নাম কী?
উত্তর: নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলী।

৬৯. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?
উত্তর: দক্ষিণ কোরিয়ার বান কী মুন।

৭০. জাতিসংঘকে অধিকতর কার্যকর করার উপায়গুলো কী কী?
উত্তর: স্থায়ী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, জাতিসংঘ সনদ পরিবর্তন।

৭১. Morgenthu-এর মতানুযায়ী জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ কী কী?
উত্তর: সাংগঠনিক দুর্বলতা, কাঠামোগত দুর্বলতা, রাজনৈতিক দুর্বলতা।

৭২. লুয়ার্ডের মতানুযায়ী জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ কী কী?

উত্তর:দৃঢ় মনোবলের অভাব, শক্তিশালী কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি, অপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্জীব আচরণ।

৭৩. **ICJ-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: Internation Court of Justice।

৭৪. ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য কত ছিল?
উত্তর: ১১

৭৫. জাতিসংঘের কতটি দেশের Veto Power রয়েছে?
উত্তর: ১১

৭৬. Veto কোন শব্দ?
উত্তর: ল্যাটিন

৭৭. নিরাপত্তা পরিষদে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কমপক্ষে কতটি সদস্য দেশের সম্মতি প্রয়োজন?
উত্তর: ৫টি স্থায়ী সদস্য সহকারে ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের।

৭৮. আন্তর্জাতিক আদালতের একজন বিচারক কত বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন?
উত্তর : ৯ বৎসর।

৭৯. আন্তর্জাতিক আদালতের প্রথম মহিলা বিচারপতি কে?
উত্তর: রোজালিন হিগিন্স (ব্রিটেন)

৮০. জাতিসংঘের মহাসচিব নিযুক্ত হয় কিভাবে?
উত্তর: নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারন পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে।

৮২. ২০১৪-২০১৫ সালের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় কোন দেশগুলো।
উত্তর : শাদ, নাইজেরিয়া, চিলি, লিথুনিয়া, জর্ডান (সৌদি আরবের পরিবর্তে)।

৮৩. ২০১৫-২০১৬ সালের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় কোন দেশগুলো।
উত্তর : ভেনিজুয়েলা, অ্যাঙ্গোলা, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্পেন।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক) জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য কী ছিল?
খ) জাতিপুঞ্জের কয়টি স্থায়ী কমিটি ছিল?

২. ক) জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের দায়িত্ব কী ছিল?
খ) জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

৩. ক) জাতিসংঘের লক্ষ্য কী?
খ) জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কী?

৪. ক) জাতিসংঘের নীতিসমূহ কী কী?
খ) জাতিসংঘের কাঠামো বর্ণনা কর।

৫. ক) সাধারণ পরিষদের কমিটিসমূহ কী কী?
খ) সাধারণ পরিষদের কাজ কী?

৬. ক) নিরাপত্তা পরিষদের গঠন বর্ণনা কর।
খ) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন কাঠামো বর্ণনা কর।

৭. ক) নিরাপত্তা পরিষদের কাজ কী?
খ) ভেটো কী?

৮. ক) আন্তর্জাতিক আদালত কী?
খ) আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার কী?

৯. ক) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কী?
খ) অছি পরিষদ কী?

১০. ক) জাতিসংঘ মহাসচিবের কাজ কী?
খ) জাতিসংঘ সচিবালয়ের কাঠামো বর্ণনা কর।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন, কার্যাবলি ও ক্ষমতা আলোচনা করুন।
২. নিরাপত্তার পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।
৩. জাতিসংঘের মহাসচিবের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।
৪. জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা প্রকৃতি ও প্রক্রিয়াগুলো লিখুন। জাতিসংঘের মূল সংস্থাগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা পালন করে আলোচনা করুন।
৫. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ উল্লেখপূর্বক এ সংস্থাটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।
৬. জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন। জাতিসংঘের সংস্কার হওয়া কি প্রয়োজন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
৭. পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের ভূমিকা কী হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? জাতিসংঘকে অধিক কার্যকরী করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ বিলুপ্ত বা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন-মতামত দিন।
৮. জাতিসংঘের সংস্কারের পথে বাধাগুলো কী কী? সংস্কারের রূপরেখা কী রকম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো সম্পর্কে মতামত দিন।
৯. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর মূল কাজগুলো কী কী? জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বিবরণ দিন।
১০. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণে বাংলাদেশের সুফল ও কুফলগুলো উল্লেখ করুন।

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ২

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ,এডিবি, জি-৮,এবং জি-৭৭
World Bank, IMF, ADB, G-8, G-77

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

২.১ ভূমিকা
২.২ গঠন
২.৩ এক নজরে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন
২.৪ বিশ্বব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য
২.৫ তহবিলের উৎস
২.৬ পরিচালনা পর্ষদ
২.৭ বিশ্বব্যাংকের কার্যাবলি
২.৮ বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা
২.২ ভোটিং পাওয়ার
২.১০ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট
২.১০ (১) বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট
২.১১ বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ
২.১২ বিশ্বব্যাংকের ঋণনীতি
২.১৩ ঋণদান পদ্ধতি
২.১৪ বিশ্বব্যাংকের ঋণ
২.২৩ IMF (International Monetary Fund)
২.২৪ IMF এর লক্ষ্য সমূহ
২.২৫ IMF এর তহবিলের উৎস
২.২৬ যারা ঋণ/সাহায্য পেতে পারে
২.২৭ IMF এর কার্যাবলি
২.২৮ IMF এর ঋণদান পদ্ধতি
২.২২ এক নজরে বিশ্বব্যাংক ও IMF এর মধ্যে পার্থক্য
২.৩০ একনজরে বিশ্বব্যাংক

২.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ঋণ বা আর্থিক সহায়তা একান্ত অপরিহার্য। দেশের নাগরিক সুবিধা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ দূর করতে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো বা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। এ প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই বিশ্বের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিকভাবে অর্থ প্রবাহের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঐকমত্য স্থাপন করেন। মূলত এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হবে অধিক পুঁজির এলাকা থেকে কম পুঁজির এলাকায় পুঁজির প্রবাহ বা স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেঙেপড়া অর্থনীতি ও অবকাঠামোর পুনর্গঠনই ছিল এর প্রাথমিক লক্ষ্য। বিশ্বের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংক ও IMF- এর প্রতিষ্ঠাতা জন মেইনার্ড কেইনসের নেতৃত্বে World Bank এবং IMF গড়ে তোলার জন্য আলোচনা শুরু হয়। ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটন উডস-এ ৪৪টি দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এবং আর্থিক কাঠামো ধরে রাখার জন্য ২টি প্রতিষ্ঠান। সামষ্টিকভাবে ব্রিটন উডস ইনস্টিটিউশন নামে এ দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচিত-এ দুটি প্রতিষ্ঠান হলো :

১. International Monetary Fund বা IMF
২. International Bank for Reconstruction and Development বা IBRD বা সংক্ষেপে World Bank/বিশ্বব্যাংক বলা হয়।

মাত্র ৪৪টি দেশ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮। বিশ্ব ব্যাংক হচ্ছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের একটি গ্রুপ। এগুলো হচ্ছে পূর্ণগঠন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর, যখন ২৮টি রাষ্ট্র এতদবিষয়ক এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৪৪ সালে নিউ হেমসফিয়ারের ব্রেটন উডস এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অর্থ ও পুঁজি সম্মেলনে এই চুক্তিটি গৃহীত হয়। আইবিআরডি বিশ্বব্যাংক নামেও পরিচিত। এছাড়া রয়েছে ১৯৫৬ সালের ১০ জুলাই প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা (International Finance Corporation-IFC), ১৯৬০ প্রতিষ্ঠিত আর্ন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (The

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে বিশ্বব্যাংক (World Bank)

- প্রতিষ্ঠা : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে।
- জন্মলাভ : ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে।
- আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু : ২৫ জুন, ১৯৪৬ সালে।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৮৮টি।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম : জিম ইয়ং কিম (দক্ষিণ কোরিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, ঘানা)।
- বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম : প্রফুল্ল সি প্যাটেল।
- প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল : ৫ বছর।
- কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী : ২৫ সদস্যবিশিষ্ট। ৫ জন নিযুক্ত হন সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী পাঁচটি দেশ থেকে এবং বাকি ১৯ জন ১৯টি ভৌগোলিক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত।
- সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী ৭টি দেশ : যুক্তরাষ্ট্র (১৫.৮৫%), জাপান (৬.৮৪%), চীন (৪.৪২%), জার্মানি (৪%), ফ্রান্স (৩.৭৫%), যুক্তরাজ্য (৩.৭৫%), ও ভারত (২.৯১%)।
- বাংলাদেশ IBRD এর সদস্য পদ লাভ করে ১৭ আগস্ট, ১৯৭২।
- বিশ্বব্যাংকে সবচেয়ে বেশি ভোটধারী : প্রথম-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় -জাপান।
- বিশ্বব্যাংক ও IMF এর স্থপতিরা : জন মেনার্ড কেনেস (যুক্তরাজ্য) ও হ্যারি ডেক্টার হোয়াইট (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংক থেকে পদত্যাগ করে : কিউবা।
- বিশ্বব্যাংক বলতে মূলত কোন সংগঠনকে বুঝায় :IBRD
- সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ : পরিচালক পর্ষদ। পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয় প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন করে পরিচালক এবং একজন বিকল্প পরিচালক নিয়ে।
- বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গসংস্থা ৫টি IBRD, IFIC, ICSI, D3, MIGA.



International Development Association-IDA), ১৯৬৬ সালের ১৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত পুঁজি বিনিয়োগ জনিত বিরোধ নিস্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (International Center for Settlement of Investment Disputes-ICSID) এবং ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (The Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিকাশ সাধন করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশ্ব ব্যাংক একটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়, যেখানে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রয়েছে। দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে ক্ষুদ্রতর আকারের নির্বাহী পরিচালক পরিষদ। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বব্যাংক গ্রুপে ১১০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, এর বার্ষিক প্রশাসনিক বাজেট প্রায় ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার। বার্ষিক ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট এর মুখ্য প্রকাশনা। বিশ্বব্যাংক গ্রুপের পাঁচ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট একজন। সদর দফতর ওয়াশিংটন ডিসি। বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরস পরিষদ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে একবার সম্মেলনে মিলিত হন।

বিশ্ব ব্যাংক হলো বিশ্ব পুঁজি ব্যবহার মোড়লদের ফোরাম। এ সংস্থার প্রধান কাজ পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থাকে দক্ষ ও কার্যকর রাখার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাওয়া।

২.২ গঠন

১৯৪৪ সালের জুলাই মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে অর্থসাহায্য জরুরি প্রয়োজন। তাছাড়া পরবর্তী ইউরোপের অর্থনৈতিক চেহারা কেমন হবে, কীভাবে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে গড়ে উঠবে নতুন বিশ্ব, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি কোনো পথে চলবে, এর চালিকাশক্তিইবা কেমন হবে-এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তৎকালীন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হেনরি মর্গেন থাউয়ের আহবানে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে বসে এক অর্থনৈতিক সম্মেলন। সারা বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৭শ প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর উদ্ভূত সঙ্কট মোকাবেলার লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সিদ্ধান্তের আলোকেই বিশ্ব অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে ২৭ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বব্যাংক। আর এ ব্যাংক কাজ শুরু করে ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন।

মোট পাঁচটি সংস্থা নিয়ে বর্তমান বিশ্বব্যাংক গঠিত। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪। বর্তমানে এটি সারা পৃথিবীর ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে গঠিত একগুচ্ছ সংগঠনের মধ্যে অন্যতম। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাহায্য ও উপদেশ দান করা দারিদ্র্য দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান ও নিরাপত্তা দেখভাল করা প্রভৃতি বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

WORLD BANK : এটি ৫টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত; যথা-

- IBRD : International Bank for Reconstruction and Development.
- IDA : International Development Association.
- IFC : International Finance Corporation.
- MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency.
- ICSID : International Centre for Settlement Investment Disputes.

২.৩ এক নজরে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য	সুদের হার	ঋণের মেয়াদ	কার্যক্রম
IBRD	১৯৪৫	১৮৮	৭%	১৫-২০ বছর	৮০০ মার্কিন ডলারের উপর GDP যেসব দেশের সেসব দেশে ঋণ প্রদান।
IDA	১৯৬০	১৭৩	বিনা সুদে.৭৫% সার্ভিস চার্জ	৩৫-৪০ বছর	৮০০ মার্কিন ডলারের নিচে GDP যেসব দেশের সেসব দেশে ঋণ প্রদান।
IFC	১৯৫৬	১৮৪	প্রচলিত বাজার দর	৩৫-৮০ বছর	বেসরকারি খাতে ঋণদান।
MIGA	১৯৮৮	১৭৯	-	-	ঋণ গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর মধ্যে নিশ্চয়তা প্রদান।
ICSID	১৯৬৬	১৪৯	-	-	ঋণ গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসা।

লক্ষ্যসমূহ

ব্রিটন উডস- এ সমবেত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশ্বব্যাংকের যে ভূমিকা নির্ধারণ করেন তা তার আনুষ্ঠানিক নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তারা এর নামকরণ করেন (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) বলে। এর প্রাথমিক কাজ হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থ সাহায্য করা। চল্লিশের দশকের শেষার্ধে ব্যাংক পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অর্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাজকর্ম শুরু হবে। এসব ইউরোপীয়ান দেশগুলো নিজেদের অর্থনীতিকে অনেকটা গুছিয়ে আনতে সক্ষম হলে ব্যাংক দরিদ্র বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে সেসব দেশের জনগণের জীবন মানকে উন্নত করা।

২.৪ বিশ্বব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

১. যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা প্রদান করা।
২. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থ সরবরাহ করা।
৩. দারিদ্র্য ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করা।

২.৫ তহবিলের উৎস (Source of Fund)

বিশ্বব্যাংক হচ্ছে বিনিয়োগ ব্যাংক, যার কাজ হলো এক পক্ষের নিকট থেকে ধার করে অন্য পক্ষকে ঋণ দেওয়া অর্থাৎ বিনিয়োগকারী ও গ্রহীতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা।

বিশ্বব্যাংকের সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি ও ফ্রান্স। ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রই এ ব্যাংকের মালিক যাদের এখানে ১৭৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ইকুইটি শেয়ার। উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য আইবিআরডি (IBRD) তার তহবিল সংগ্রহ করে থাকে খোলা বাজার থেকে বিশ্বের ১০০টি দেশের ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট ফান্ড বিক্রির মাধ্যমে। এ বন্ডগুলো AAA রেটিং মানের; কেননা এর পিছনে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের গ্যারান্টি রয়েছে। সুবিধাজনক শর্তে ঋণ প্রদানকারী আইডিএ (IDA) তার তহবিল সংগ্রহ করে দাতা দেশগুলো থেকে গ্যারান্টি প্রাপ্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক হলো পুঁজি বাজারের অন্যতম এবং এর কাজ ক্রয়কারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনাবাসিক ঋণ গ্রহীতা। বিশ্বব্যাংকে সরাসরি বিভিন্ন সরকার তাদের এজেন্সি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর নিকট থেকে বন্ড ও নোট বিক্রির মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এ বন্ড বিক্রিলব্ধ অর্থ তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন সম্ভাবনাময় প্রকল্প এবং আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর কাজে সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স ও ভারত বিশ্বব্যাংকের শীর্ষ অংশীদারি দেশ।

মনে রাখার Technique & Tips

বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা

আইবিআরডি (IBRD)

- IBRD-এর পূর্ণরূপ : International Bank for Reconstruction and Development. (১ জুলাই ১৯৮৬)
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৪৪ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৮৮টি (সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বব্যাংকের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে : IBRD
- যে সম্মেলনে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় : ব্রিটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪ সালে)।
- বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট : ইউজিন মেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংকের ৬১ বছরের ইতিহাসে কোনো প্রেসিডেন্টের দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে চাকরি হারায় : পল উলফাউইৎস (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম : জিম ইয়ং কিম (দক্ষিণ কোরিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, দ্বাদশ)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ সালে।
- বিশ্বব্যাংকের সদস্য হলে প্রথমে IMF-এ সদস্য হতে হবে।

আইডিএ (IDA)

- IDA-এ পূর্ণরূপ : International Development Association এটি 'Softloan-window. নামেও ব্যাপক পরিচিত।
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৭৩টি (সর্বশেষ সদস্য রোমানিয়া)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- IDA-এর প্রধান : বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম (পদাধিকার বলে)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ সালে।
- IDA-এর ঋণ সুদমুক্ত।

২.৬ পরিচালনা পর্ষদ

বিশ্বব্যাংক ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী সমন্বয়ে গঠিত। বিশ্বব্যাংকের বড় অংকের শেয়ারহোল্ডার ৫টি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স একজন করে পরিচালক নিয়োগ দিয়ে থাকে। বাকী ১৯জন ১৯টি ভৌগোলিক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে সদস্যদের দ্বারা নিযুক্ত হন। পরিচালনা পরিষদই বিশ্বব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয় প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র থেকে একজন করে পরিচালক এবং একজন বিকল্প পরিচালক নিয়ে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

যারা ঋণ বা সাহায্য পেতে পারে

কোনো ধনী রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ পেতে পারে না। শুধুমাত্র উন্নয়নশীল জাতিসমূহের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সরকারকেই বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্র যত গরিব হবে তত সহজ শর্তে সে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সুবিধা ভোগের দাবিদার। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যাদের মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ১৩০৫ মার্কিন ডলারের উর্ধ্বে তারাই IBRD থেকে ঋণ পেয়ে থাকে। প্রদত্ত ঋণের সুদের হার বাজার হার অর্থাৎ যে হারে ব্যাংক নিজে অর্থ সংগ্রহ করে তার চেয়ে সামান্য বেশি। এ ঋণ সাধারণত ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। আবার (IDA) শুধুমাত্র গরিব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো যাদের মাথাপিছু (GNP) ১৩০৫ মার্কিন ডলারের কম তাদেরকেই ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে (IDA) ঋণসমূহ সেসব দেশেই বিতরণ করা হয় যাদের এ্যানুয়াল পার ক্যাপিটা ইনকাম ৮৬৫৪ ডলারের কম। (IDA) এর ঋণগুলো সুদবিহীন এবং পরিশোধকাল ৩৫ কিংবা ৪০ বছর।

২.৭ বিশ্বব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of World Bank)

বিশ্বব্যাংকের কাজ হলো অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি সহায়তা দান এবং বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিকে উন্নত করতে উৎসাহ প্রদান করা। বিশ্বব্যাংক উন্নয়নকে দেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে দুই দশকব্যাপী প্রদত্ত ব্যাংকের মোট সহায়তার দুই-তৃতীয়াংশই দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ শক্তি এবং পরিবহন খাতে। যদিও এসব অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহায়তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তবুও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাংক নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে তার কার্যক্রম আরো বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে সম্প্রসারিত করেছে।

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য প্রদান এবং সদস্য দেশসমূহের লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রেখে তাদেরও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান ও শ্রমের পরিবেশ উন্নত করা।

২. সদস্য দেশসমূহের বিদেশি বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করা এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের পুঁজি অংশীদারিত্ব বা তাদেরও বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৩. সদস্য দেশসমূহের পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করা।

মনে রাখার Technique & Tips

আইএফসি (IFC)

- IFC-'র পূর্ণরূপ: International Finance Corporation.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ২০ জুলাই, ১৯৫৬ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৮৪ টি (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান,১৮ এপ্রিল ২০১২)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- IFC-এর প্রধান : বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম (পদাধিকার বলে)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করেঃ ১৮ জুন,১৯৭৬ সালে।

ইসিএসআইডি (ICSID)

- ICSID-এর পূর্ণরূপ : International Centre for Settlement of Investment Disputes.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৬৬ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৪৯ টি (সর্বশেষ- সাওটোম অ্যান্ড প্রিন্সিপে)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ICSID-এর প্রধান : বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিফ (পদাধিকার বলে)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করেঃ ২৬ এপ্রিল,১৯৮০ সালে।

মিগা (MIGA)

- MIGA-এর পূর্ণরূপ : Multilateral Investment Gurantee Agency.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৮৮ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৭৯ টি (সর্বশেষ- কমোরোস, ২৫এপ্রিল ২০১৩)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- কার্যাবলী : উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করেঃ ১২ এপ্রিল,১৯৮৮ সালে।

৪. ছোটবড় নির্বিশেষে অধিক জরুরি এবং উপযোগী প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার দিয়ে সেগুলোর জন্যে অর্থসংস্থানে সহায়তা করা।

৫. বিশ্বব্যাংক বিশেষ করে মনোযোগ দিচ্ছে সেই সব প্রকল্পগুলোতে যেগুলো উন্নয়নশীল দেশের সবচেয়ে দরিদ্র জনসাধারণের সরাসরি উপকারে আসে। কৃষি এবং পল্লি উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং নগর উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে ব্যাংক দরিদ্র জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করছে।

৬. ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করছে তাদের উৎপাদন বাড়াতে এবং শিক্ষা, গৃহায়ন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ জীবনের প্রয়োজন মিটানোর সকল ধরনের কাজে।

৭. চলমান খাতগুলোতে পরিবর্তন আনয়ন করা হচ্ছে। পরিবহন খাতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বাজার মুখী রাস্তাগুলোর উন্নয়নে বিদ্যুৎখাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৮. ছোট ছোট খামার এবং গ্রামাঞ্চলকে শিল্পখাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

৯. বিদ্যুৎ শক্তি ছাড়াও ব্যাংক তেল, গ্যাস, কয়লা, জ্বালানি কাঠ এবং বায়োগ্যাস-এর মতো শক্তির উৎসগুলোর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করছে।

১০. ঋণ গ্রহীতা সদস্য রাষ্ট্রটি বিশ্বব্যাংককে দেখতে পায় কারিগরি সহযোগিতার একটি উৎস হিসেবে। কেননা, অধুনা এরা প্রচুর পরিমাণে কারিগরি ঋণ সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক ইউএনডিপি কর্তৃক কারিগরি, সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। এসব প্রকল্পের মধ্যে কৃষি, পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত খাতগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা নিরীক্ষান্তে বিশ্বব্যাংক ইদানীং বেশি জোর দিচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নমূলক কারিগরি সহায়তা এবং ম্যাক্রো ইকনোমিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে।

২.৮ বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা

বিশ্বব্যাংক একটি সমবায়ের মতো। সদস্যরা এর অংশীদার। এ প্রতিষ্ঠানটি নির্বাহী পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। সদস্য দেশগুলোই এ নির্বাহী পরিচালকদের নির্বাচন করে থাকে। সদস্যদের মধ্য থেকে ২৫টি দেশ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। এরাই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও



বরখাস্ত করতে পারেন। ২৫টি নির্বাহী পরিচালকের মধ্যে ২০টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকি পাঁচটি মনোনয়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ২ বছর পর পর নির্বাহী পরিচালক নির্বাচন করার বিধান রয়েছে।

২.৯ ভোটিং পাওয়ার

বিশ্বব্যাংকের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের জন্য ২শ ৫০টি ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। এটি সদস্য দেশগুলোর সার্বিক ক্ষমতা। এছাড়া ব্যাংক মূলধনের প্রতিটি শেয়ারের জন্য একটি করে ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সদস্য রাষ্ট্রগুলো।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ভোট প্রয়োগের ক্ষমতার ৮০ শতাংশ রয়েছে পশ্চিমা ধনী দেশগুলোর দখলে। এরাই বিশ্বব্যাংকের মূলধনের জোগান দিয়ে ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা কিনে নিয়েছে। তাই বিত্তশালী দেশগুলো ব্যাংকের মূলধনের জোগান দিয়ে অঘোষিত স্পন্সর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্র এখানে একেবারেই উপেক্ষিত।

সদস্য দেশগুলোর সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক বলয় প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিমা দেশগুলো অর্থের বিনিময়ে বেশিরভাগ শেয়ার কিনে এ সংস্থাটি নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক গঠিত হলেও মাত্র ৫টি নির্বাহী পরিচালক নির্বাচন করতে পারে ওই সদস্য দেশগুলো। চীন, রাশিয়া ও সৌদি আরব নিজেদের নির্বাহী পরিচালক নির্বাচনের ক্ষমতা রাখে। আর বাকি সব নির্বাহী পরিচালক নির্বাচন করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপান।

ভোটদানের ক্ষমতার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র দখলে রয়েছে ২ লাখ ৮৫ হাজার ২১৮ ভোট, যা সর্বমোট ভোটের ১৮ শতাংশেরও বেশি। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র একাই চারটি নির্বাহী পরিচালক নির্বাচন করার ক্ষমতা পেয়েছে।

এরপরই রয়েছে এশিয়ার দেশ জাপান। এদেশটিতে মোট ভোটের প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ দখলে রেখেছে। অন্যদিকে চার শতাংশ করে ভোট প্রয়োগ করে যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্স। ইউরোপেরএই তিনটি দেশ একসঙ্গে প্রায় ১২ শতাংশ ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। এভাবেই বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক এ সংস্থা পশ্চিমা বিশ্বের ক্রীড়নে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ মাত্র দশমিক ৩১ শতাংশ ভোট প্রয়োগের অধিকার রাখে। পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলো এ সংস্থার মোট ভোটের মাত্র ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এ দেশগুলোর পরেই রয়েছে উদীয়মান বিশ্ব। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো বিশ্বব্যাংকের ২২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

২.১০ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক এ সংস্থা পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রেসিডেন্ট। সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকেই এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। তবে বিশ্ব অর্থনীতির নীতিনির্ধারণী এ সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট অবশ্যই কোনো না কোনো মার্কিন নাগরিকের কপালে জুটবে। মার্কিন নাগরিক ছাড়া বাকি বিশ্ব এ জায়গায় বসাটা একেবারেই অসম্ভব। আপাতত পরিসংখ্যান তাই বলছে। এ পর্যন্ত ১২ জন ব্যক্তি এ পদে বসেছেন। এ ১২ জনই মার্কিন নাগরিক।

বিশ্বব্যাংকের বর্তমান ও দ্বাদশতম প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ কোরিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক জিম ইয়ং কিম, যুক্তরাষ্ট্র, (১ জুলাই২০১২-বর্তমান)। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২.১০ (১) বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্টের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ভাইস প্রেসিডেন্টরা। এরা ব্যাংকের প্রিন্সিপাল ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন অঞ্চল ও সেক্টরের ভিত্তিতে এদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৪ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে তিনজন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া আরো দুজনকে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়।

২.১১ বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ

এ পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণ এ আসন অলংকৃত করেছেন। এ জায়গাটিও দখলে রেখেছে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো। নীতিনির্ধারণের কোথাও ঠাঁই নেই দরিদ্র দেশগুলোর। ধনী দেশের এ প্রতিনিধিরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রেসক্রিপশন লিখে থাকেন। আর তাদের প্রশাসক মহল একগুচ্ছ শর্তের জালে ঘিরে ফেলে ওই উন্নয়নশীল দুনিয়াকে। স্বার্থান্বেষী মহলের শর্তের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম খুব একটা সফল হয় না।

বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক সক্ষমতা যাচাই করেন। অবকাঠামোগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্টের কাছে সুপারিশ করেন। প্রেসিডেন্ট ওই সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্বব্যাংকের করণীয় নির্ধারণ করেন।

২.১৩ ঋণদান পদ্ধতি

১৯৭০ সালের আগে বিশ্বব্যাংক 'ল্যান্ডিং পলিসির' ওপর ভিত্তি করে ঋণ দিত। এ নীতি অনুযায়ী কোনো দেশ বিশ্বব্যাংকের কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দেওয়া হতো। তখন ঋণদান বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা হতো না।

১৯৭০ সালের পর নতুন নীতির ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদান শুরু করে। এ নীতি অনুযায়ী কোনো দেশ ঋণ চাইলে বিশ্বব্যাংক কী পরিমাণ ঋণ দেবে, সেটা কত সময়ের জন্য এবং কোনো খাতে এ ঋণ খরচ করা হবে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি ঋণ বিশ্বব্যাংকের কার্যসম্পাদন নীতি বা অপারেশনাল পলিসি অনুসারে পরিচালিত হয়, যা এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, ব্যাংক অর্থায়িত কর্মকাণ্ডগুলো অর্থনৈতিক সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠু।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশ্বব্যাংকের দু'ধরনের ঋণদান পদ্ধতি রয়েছে :

ক. যেসব উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় ৮০০ ডলারের ওপর তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ৭% হার সুদে ১৫ থেকে ২০ বছরের জন্য ঋণ দেওয়া এবং

খ. যাদেরও মাথাপিছু আয় ৮০০ ডলারের নিচে তাদেরকে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা। তবে এক্ষেত্রে IDA .৭৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করে থাকে।

উক্ত খাতে বিশ্বব্যাংকের IFC প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী সুদ নির্ধারণ প্রদান করে থাকে।

২.১৪ বিশ্বব্যাংকের ঋণ

বিশ্বব্যাংকের ঋণের প্রায় ২৫ ভাগ শক্তি উৎপাদন, ৩০ ভাগ যোগাযোগ, ১২ ভাগ মৎস্য, বন ও কৃষি উন্নয়ন এবং বাকি প্রায় ৩০ ভাগ শিল্প উন্নয়ন, কারিগরি সাহায্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে দেওয়া হয়।

যেসব খাতে ঋণ দেয় বিশ্বব্যাংক :

১. **প্রকল্প ঋণ :** বড় বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সেতু, রাস্তাঘাট, শিল্প ও নগরায়ণের জন্য এ ঋণ দেওয়া হয়।

২. **খাতওয়ারি সমন্বয় ঋণ :** সরকারের অবকাঠামো বিন্যাস, নীতিনির্ধারণী কাজ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ ঋণ দেওয়া হয়।

৩. **অবকাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সহায়ক ঋণ :** উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হবে।

৪. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যুদ্ধের ক্ষতি কাটানোর ঋণ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যুদ্ধের কারণে কোনো দেশের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ত্বরিৎগতিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক জনসংখ্যা রোধ, উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও ঋণ দেয়।

৫. **বাণিজ্য উদারীকরণ ঋণ :** কোন দেশ তার বাণিজ্য উদারীকরণ করতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করতে যে যে ক্ষেত্রে ঋণ প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে।

৬. **মূল্যস্ফীতি রোধে ঋণ :** কোনো দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দিলে, আমদানি বেড়ে গেলে কিংবা

http://thejobstudy.com Go to Contents

রফতানি কমে গেলে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বিশ্বব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে।

৭. **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ঋণ:** কোনো দেশের সরকার যদি সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে বিশ্বব্যাংক।

৮. **বেসরকারিকরণ ঋণ :** দেশের জন্য অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং বেসরকারিকরণ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে বিশ্বব্যাংক।

৯. **শিল্পায়ন ঋণ :** কোনো দেশ নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করতে চইলে এবং পুরনো ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য বিশ্বব্যাংক ঋণ দেয়।

২.১৪ (১) উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে বিশ্বব্যাংকের ঋণদাননীতি

বিশ্ব ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে ঋণদাননীতি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্ব ব্যাংক যে পন্থায় ঋণ প্রদান করে তা নিম্নরূপ:

১. নিজস্ব সম্পদ থেকে ঋণ প্রদান।

২. প্রাইভেট চ্যানেলের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী কর্তৃক প্রদত্ত দেয় ঋণের অংশ বিশেষ প্রদান;

৩. সদস্য রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত বা ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য খাত থেকে ধার করা সংগৃহীত অর্থ থেকে ঋণ প্রদান;

৪. ঋণ গ্রহীতা রাষ্ট্রের প্রকল্প নির্ধারণের পর ব্যাংক ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করে।

৫. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রহীতা রাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই ও বিভিন্ন বিষয়ে তদন্ত করা সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে ঋণ প্রদান করে থাকে;

৬. বিশ্ব ব্যাংক শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উৎপাদনশীল খাতেই ঋণ প্রদান করে এবং শুধুমাত্র প্রকল্পের বৈদেশিক মুদ্রার অংশটুকুই যোগান দেয়।

২.১৪(২) বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ প্রদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

বিশ্ব ব্যাংক ঋণ প্রদানের পূর্বে কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় নিয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে:

১. যে প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করা হয়েছে তার প্রকল্প প্রস্তাবনার যথার্থতা ও সুবিধাগুলো একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়ে থাকে।

২. যে রাষ্ট্র ঋণ নেবে তার সে ঋণ ফেরত দেয়ার যুক্তিসংগত সম্ভাবনা থাকতে হবে।

৩. ঋণ কেবল উৎপাদনমূখী উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়।

৪. বিশ্বব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে কোন প্রকল্পের পূর্ণগঠন ও উন্নয়নের জন্য কেবল বৈদেশিক মুদ্রার আবশ্যকতাই পূরণ করা হয়।

২.১৪(৩) বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলী

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ প্রদানের শর্তাবলির কাঠামোগত বিন্যাস নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক শর্তাবলী (Economic Conditions)

বেসরকারীকরণ: বেসরকারিকরণের পাঁচটি আলাদা ধরণ রয়েছে। যেমন:

পানি খাত বেসরকারিকরণ, খনিজ সম্পদ বেসরকারিকরণ (প্রাকৃতিক গ্যাস), বিদ্যুৎ খাত বেসরকারিকরণ, কৃষিখাত বেসরকারিকরণ এবং বিবিধ।

বেসরকারিকরণ সংস্কার: এ শর্তের অধীনে ঋণ গ্রহীতা রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষেত্রে বিশেষে তাদের বেসরকারিকরণ নীতিতে পরিবর্তন আনতে হয়।

বাণিজ্য উদারীকরণ: এ শর্তের আওতাধীন বিষয়গুলো হলো: শুল্ক, হ্রাস, শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন,

পন্য ও সেবা খাতে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস।

বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত: অবাণিজ্য বাধা দূর করা, বাজার ভিত্তিক বিনিময় মূল্য এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক শর্তাবলী

স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

শিক্ষা: শিক্ষানীতি, পাঠ্যক্রমে সংস্কার ও শিক্ষাখাতে সুশাসন

পানি ও পয়:নিষ্কাশন: পানি ও পয়:নিষ্কাশন সংক্রান্ত শর্তসমূহ

পরিবেশ: পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিরহ সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ

গ্রাম ও শহর উন্নয়ন: গ্রামীণ ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত শর্তাবলী

সামাজিক সুরক্ষা: সামাজিক সুরক্ষার নামেও শর্ত চাপিয়ে দেয়া হয়

জনপ্রশাসন খাত সংস্কার সংক্রান্ত শর্তাবলী

জবাবদিহিতা, দুর্নীতি দমন, জনপ্রশাসন সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ, আইন ও বিচার বিভাগ সংস্কার, জন অর্থনৈতিক খাত ব্যবস্থাপনা, করা প্রশাসন, সামাজিক সংগঠনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

২.১৪(৪) বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ প্রদান নীতির সমালোচনা

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণদান নীতির সমালোচনাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক পরাশক্তি, বৃহৎ শক্তি, আঞ্চলিক পরাশক্তির প্রভাব বেশি থাকায় ঋণ প্রদান কার্যক্রমে তাদের স্বার্থই প্রায়শ প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংক কেবল প্রকল্পের বৈদেশিক মুদ্রার অংশের জন্য ঋণ প্রদান করে এ ঋণের অর্থ কেবল পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানীকৃত কাঁচামাল ও সেবা ক্রয়ের পিছনে খরচ করতে হয়। বিশ্ব ব্যাংককে অনেক সময় হস্তক্ষেপকারী (Interventionist) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের পলিসি সংস্কার বা কাঠামোগত এডজাস্টমেন্টের নামে প্রায়শই বিশ্ব ব্যাংক পরামর্শ দিয়ে থাকে। এর ফলে ঋণ গ্রহণকারী রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থ অনেক সময়ই রক্ষিত হয় না। পৃথিবীর ধনী রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব ব্যাংককে টাকার যোগান দেয় সুদে খাটানোর জন্য। সেখানে টাকার অংকে ভোটের হিসাব। যে রাষ্ট্র সুদের ব্যবসার জন্য বিশ্ব ব্যাংকে এক কোটি ডলার দিল, তার এক ভোট যে দশ কোটি ডলার দিল তার দশ ভোট। এ রকম হিসাব। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি অর্থ কেউ বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে সুদে খাটাতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র কাউকে সে সুযোগও দেয় না। ফলে বিশ্ব ব্যাংকের কর্তৃত্ব সব সময় থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। এর প্রেসিডেন্টকেও নিয়োগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

২.১৫ বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংক সম্পর্ক

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই ১৯৭২ সালে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা মিশন প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইয়ুজভ ফাল্যান্ড। বহু বিতর্ক ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য হয়। বাংলাদেশ ICSID-এর সদস্যপদ লাভ করে ২৬ এপ্রিল ১৯৮০ এবং মিগার সদস্যপদ লাভ করে ১২ এপ্রিল ১৯৮৮। বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক প্রসঙ্গটা বিশাল।

বিশ্ব ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সফর করেন। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জেমস উলফেনসন ১৯৯৭ সালের ১৩ অক্টোবর এবং পল উলকোভিৎজ ২১ আগস্ট, ২০০৫ বাংলাদেশ সফরে আসেন। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের তাগিদ দেন। বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জেমস উলফেনসন যমুনা সেতু, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এবং বরিশালের একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি বেসরকারি খাতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

একনজরে বাংলাদেশের বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের সদস্যপদ লাভের সময়কাল

ক্রমিক নং	বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ
১	পুর্ণগঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক International Bank for Reconstruction and Development-IBRD	১৭ আগস্ট, ১৯৭২
২	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা/সমিতি International Development Association-IDA	১৭ আগস্ট, ১৯৭২
৩	আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা International FInance Corporation_IFC	১৮ জুন, ১৯৭৬
৪	পুঁজি বিনিয়োগ জনিত বিরোধ নিস্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র Internatinal Centre for Settliment Investment Disputes_ICSID	২৬ এপ্রিল, ১৯৮০
৫	বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA	১২ এপ্রিল, ১৯৮৮

বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্পসমূহ তারাই তদারক করে। বিশ্ব ব্যাংক কর্মসংস্থানমূলক কোন প্রকল্পে ঋণ দেয় নি। শিল্প কারখানার জন্য ঋণ দেয় নাই। বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পে ঋণ দেয় নাই। ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে তাদের ঋণ বোঝা হয়েই পড়েছে। বিমান কর্মীদের ছাঁটাই করতে গ্র্যাচুইটি পেনশনের অর্থের যোগান দিতে বিশ্ব ব্যাংক ঋণ দিয়েছে। অতীতে বিশ্ব ব্যাংকের ভুল পরামর্শ বাংলাদেশের পাট শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সেই বিশ্ব ব্যাংকেই ২০০৭ সালে এসে পাট শিল্পকে জাগিয়ে তোলার প্রচারনায় নেমেছে। বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ প্রধান শিয়েম জু পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে বলেছেন, পাট শিল্পকে জাগিয়ে তোলার একনই সময়। বিশ্ব ব্যাংক পাট খাতকে পুরোপুরি বেসরকারি করণের জন্য আবারও নতুনভাবে নেমেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ বলেন, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা না বাড়াতে পারলে এবং এখাতের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা না হলে কারো পক্ষে এ খাতের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। পাটকলগুলোর দায়ভার পরিশোধ না করলে শুধু মালিকানা পরিবর্তন করা হলে এখাতের উন্নয়ন হবে না। বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের কমিউনিটি কিনিক প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দেয়। বিপরীতে বিশ্ব ব্যাংক সরকারের ওপর কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপ্রয়োজনীয়। এতে সরকারের, অর্থের অপচয় হয়। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডিসটেন্স লার্নিং নেটওয়ার্কের (GDLN) আওতায় নলেজ ম্যানেজমেন্ট, কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষি বাজারজাত করণের ওপর ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ১৫০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সাম্প্রতিককালে ঋণদানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও কূটনীতিতেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে এক এগারোর গজব নামানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে বিশ্ব ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তারপর অসাংবিধানিক ফখরুদ্দীন আহমদ-মঈন উ আহমদের জবাবদিহিতাহীন সরকারকে দিয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী অনেক অপকর্ম করিয়ে নিয়েছে। যেমন সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসহ বেশ কিছু পাটকল বন্ধ করিয়েছে। জ্বালানী তেলে মূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়েছে, কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাস করেছে, কিংবা একেবারে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক, কর বাড়িয়েছে, কিন্তু একই ধরণের ফিনিশড পণ্য আমদানিতে শুল্ককর কমিয়ে দেশীয় বেসরকারি শিল্প কারখানাগুলোকে বিপন্ন করে তুলেছে। দেশে দরিদ্রের সংখ্যা দশ শতাংশে

বাড়িয়ে দিয়েছে মাত্র দুই বছরে।

২.১৫(১) বিশ্ব ব্যাংকের পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিল

২০১২ সালের ২৯ জুন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক বিদায়ের একদিন আগে বাংলাদেশের সঙ্গে পদ্মা সেতু ঋণ চুক্তি বাতিল করে দেন। তারপর থেকে ভেতরের অনেক খবর আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। জোয়েলিকের দাবি ছিল, তাদের তরফে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। তার কিছু করার অবকাশ নেই। তাই ঋণ চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হলো।

সরকার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের এ আচরণকে রহস্যময় হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কারণ, বিশ্বব্যাংকের প্রায় সব শর্তই মানা হয়েছিল। পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর অ্যালেন গোল্ডস্টেন ডেইলি স্টারের প্রতিনিধির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাকালে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন, যার বাংলা অনুবাদ ১৬ জুলাই দৈনিক সংবাদ প্রকাশ করেছে। গোল্ডস্টেন বলার চেষ্টা করেছেন, বিশ্বব্যাংক সরকারকে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছিল। সরকার তার মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করে। ২০১২ সালের ২৮ জুন অর্থাৎ প্রকল্প বাতিলের একদিন আগে বিশ্বব্যাংক দক্ষিণ এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসাবেল গুয়েরোকে বিশ্বব্যাংকে বাংলাদেশ সরকারের বিকল্প গভর্নর এবং সিনিয়র সচিব ইকবাল মাহমুদ সরকারের সর্বশেষ অবস্থান তুলে ধরেছেন। এ চিঠির শুরুর বাক্যটি হচ্ছে- I would like to take this opportunity to make a last ditch attempt to resolve the Padma Bridge issue on which lays the prosperit and wellbeing of 60 million people of Bangladesh. এ চিঠিতে সচিব সাহেব খোলাখুলি অনেক কথা বলেছেন।

পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগের শুরু অনেক আগে থেকে। অক্টোবর , ২০১১-এর প্রথম দিকে বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট দু'জন পদস্থ অফিসার এবং যোগাযোগমন্ত্রীকে অপসারণের দাবি জানিয়েছিল। তাদের অভিযোগে ছিল, কনসালটেন্সি প্রিকোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে এরা লাভালীন কোম্পানীর কাছ থেকে ঘুষ দাবি করেছেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী জানান, সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাদের প্রমাণ ছাড়া সরানো সম্ভব নয়। তবে শিগগিরই মন্ত্রিসভার রদবদল করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অন্যত্র দায়িত্ব দেওয়া হবে। ওই সভায় আরও জানানো হয়, যে লাভালিন কোম্পানী তাদের কাছে ঘুষ চাওয়ার দাবি করেছে, তাদের কালো তালিকাভুক্ত করে বাতিল করে দিলে সরকারের আপত্তি নেই। ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংক নতুন অভিযোগ আনে যে, তারা রয়্যাল কানাডা পুলিশের কাছে জানতে পেরেছে যে, লাভালিন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত দলিলপত্র চেয়ে পাঠায়। কিন্তু কানাডা পুলিশ জানায় যে, তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তা বিশ্বব্যাংক কিংবা বাংলাদেশ ও সংক্রান্ত দেওয়া যাবে না। ২০১২ সালের জুন মাসে বিশ্বব্যাংক একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বাংলাদেশে পাঠায়। তারা বলে যে, পাঁচ শর্ত মানা হলে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করা হবে না। এসব শর্ত ছিল-

এক দুদকের তদন্ত সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত অবগত হওয়ার সুযোগ;
দুই. দুদককে প্রদত্ত সরকারের নীতিগত সব নির্দেশের দলিল বিশ্বব্যাংককে জানানো;
তিন. দুদকের পক্ষে যারা তদন্ত করবেন, তাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বিশ্বব্যাংককে জানানো;
চার. মাঝে মধ্যে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে দুদুকের ব্রিফিং গ্রহণ এবং
পাঁচ. তদন্ত চলাকালে যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে, সেখানে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধির উপস্থিত থাকা।

সরকারের চিঠিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব ব্যাংকের পাঁচ দফার প্রতিটিই মানা হয়েছিল। শুধু এসব শর্তের ভিত্তিতে একটি আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে সরকার রাজি হয় নি। সরকারের বক্তব্য ছিল-দুদক জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান। তাদের পক্ষে একটি বিদেশি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করা সম্ভব নয়। যাই হোক, বিশ্বব্যাংক সরকারের মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি এবং পরে পদ্মা সেতু চুক্তি বাতিল করে দেয়। গোল্ডস্টেন সর্বশেষ যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, চার শর্তের দুটি বাংলাদেশ সরকার মানতে রাজি ছিল। যে দুটি তারা মানেনি সেটা হচ্ছে ২ ও ৩ নং শর্ত। ২নং শর্ত ছিল ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ

http://thejobstudy.com
Go to Contents

সংক্রান্ত। এটা মানা না হলে ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আর তৃতীয়টি ছিল বহিঃস্থ প্যানেলকে দুদকের নিয়মিত তথ্য সরবরাহ। গোল্ডস্টেন আরও বলেছেন, যদি বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত দুর্নীতির প্রমাণ দুর্বল বলে বাংলাদেশ সরকার মনে করে, তাহলে তারা সেগুলো প্রকাশ করে না কেন?

বিশ্বব্যাংকের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, কোনো দেশের প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি ঘটলে তদন্ত প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চালু থাকে। পরে দুর্নীতি প্রমাণিত হয় কিংবা হয় না। মোট কথা প্রকল্পটিকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেওয়া হয় না। বাংলাদেশে যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা কাবিখা কর্মসূচী চালু; তাতে ২০ শতাংশ দুর্নীতি-অনিয়ম হয়-এমন তথ্য বিশ্বব্যাংকের জরিপ-অনুসন্ধানে মিলেছে। কিন্তু যেহেতু ৮০ শতাংশ সুবিধা গরিবদের কাছে পৌছায়, সে জন্য দুর্নীতি সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংক কাবিখা প্রকল্পে সহায়তা বন্ধ করে নি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ড. ইফতেখারুজ্জমান এ জন্য বলেছিলেন, বিশ্বব্যাংক মাথাব্যথা হওয়াতে মাথাটাই কেটে ফেলল।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ৫৫৬ টি নতুন সাইকোন শেল্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ জন্য ব্যয় হবে দুই হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা। বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী উপকূলীয় জেলার ৭৪টি উপজেলায় জনগণের জনামাল ও গবাদিপশু রক্ষায় এ সাইকোন শেল্টার নির্মাণ করবে সরকার। প্রকল্পটি ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সভাশেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে মোট ৯২৫০টি সাইকোন শেল্টার দরকার। বর্তমানে আছে ৩২৬৮টি। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৫৬টি নতুন সাইকোন শেল্টার নির্মাণ ছাড়াও ৪৫০টি সাইকোন শেল্টার মেরামত করা হবে। ফলে ১০০৬টি সাইকোন শেল্টার বর্তমানের ৩২৬৮টির সাথে যোগ হবে। প্রকল্পটির ব্যয় ধার হয়েছে ২৯৩৫ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পে ২৯২৫ কোটি টাকা সাহায্য দেবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

এ ছাড়া ৫৫০ কিলোমিটার সাইকোন শেল্টার সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হবে বলেও জানা মন্ত্রী। এছাড়াও আরোট দুটি প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নামে চলমান একটি প্রকল্পে অতিরিক্ত ঋণ হিসেবে ৪০ কোটি ডলার দিবে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (পিইডিপি) ৩ লক্ষ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৮ শতাংশ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশুর হার ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণ। এর আওতায় শিক্ষা বছরের প্রথম মাসে ৯০ শতাংশ শিশুর হাতে নতুন বই পৌছানো এবং শুন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিও রয়েছে। অতি দরিদ্রদের জন্য আয় সহায়তা প্রকল্পের (আইএসপিপি) আওতায় দেশের ৪২টি উপজেলার ২৭ লাখ অতি দরিদ্র জনগণ সুফল পাবেন। এসব উপজেলার অতি দরিদ্র ৬ লাখ মাকে শিশুদের পুষ্টি ও মেধাবিকাশমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিপরীতে নগদ সহায়তা দেয়া হবে। জালিয়াতি রোধে এ সহায়তা পোষ্ট অফিসেসর মাধ্যমে প্রতি মাসে তাদের একাউন্টে চলে যাবে। স্মার্টক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে তারা এ সহায়তা তুলবেন। জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছরে পুষ্টি ও মেধাবিকাশের জন্য এ সহায়তা পরবর্তী সময়ে তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ভ্যাট প্রশাসনের উন্নয়নে তথা অনলাইনে ভ্যাট আদায় চালু করতে বিশ্ব ব্যাংক ৬ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশে চলমান ৩১টি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন রয়েছে ৬৭০ কোটি ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর, বিশ্বব্যাংকের অর্থ ছাড়া হয় ৯৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংস্থাটির ছাড় ১শ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন ইআরডির কর্মকর্তা শফিকুল আযম। তাদের তথ্য মতে, চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৪ মাসে (জুলাই-অক্টোবর) বিশ্বব্যাংক ছাড় করেছে ৬৭ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের অঙ্গ সংস্থা আইডিএর ঋণের সার্ভিস চার্জ মাত্র শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ ঋণের বিপরীতে প্রথম ১০ বছর কোনো কিস্তি দিতে হবে না। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে ৪০ বছর। তবে আইডিএ কমিটমেন্ট চার্জের নাকি বাংলাদেশ থেকে

প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা নিয়ে যায়। ঋণ সহায়তা দেওয়ার আগেই কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়েই কমিটমেন্ট চার্জ নেওয়া শুরু হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের নেতিবাচক বক্তব্যে অর্থনীতিতে কিছু প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহ কমে নি। রফতানি আয়ও বাড়ছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। বিশ্বব্যাংক অতীতেও এমনসব পূর্বাভাস দিয়েছে যা কখনো ফলেনি বরং জনমনে বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর হচ্ছেন সালমান জাইদী। প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন।

২.১৬ IMF (International Monetary Fund)

১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে ৪৫টি রাষ্ট্রের অনুষ্ঠিত সম্মেলনের লক্ষকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে আইএমএফ এর কার্যক্রম শুরু হয়। আইএমএফ জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর।

আইএমএফ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থ সহযোগিতার উন্নতি বর্ধন করা, ব্যবসা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এইভাবে সকল সদস্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো ও চাকরীর ক্ষেত্র বাড়ানো

এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য আইএমএফ সদস্য দেশসমূহের দায় পরিশোধের সমস্যার ক্ষেত্রে আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এসব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য কারিগরি সাহায্য যোগায়।

বিনিময় বিন্যাস এবং বিনিময় হারের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আইএমএফ-এর সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে সদস্য দেশগুলো সহযোগিতা করে। এ ছাড়া রয়েছে শর্তহীন ঋণ পরিশোধের বহুবৈচিক ব্যবস্থা এবং এইভাবে দেশসমূহের মধ্যে দায় পরিশোধের উন্নতি বর্ধন করা হয়।

আইএমএফ পুঁজি সম্পদের একটি তহবিল রক্ষা করে যাতে সদস্য দেশসমূহে সাময়িকভাবে অথবা শর্তাধীনে পুঁজি সহজপ্রাপ্য হয়-যাতে দেশগুলো তাদের পরিশোধের ঘাটতি দূর করার কর্মসূচী নিতে সক্ষম হয়। সদস্য দেশগুলো পুঁজি আইএমএফ এর কাছে পুনঃ পরিশোধ করে। ফলে এই সম্পদ আবর্তন-ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয় এবং দায় পরিশোধের বিপন্ন দেশসমূহের ঋণপ্রাপ্তি সহজপ্রাপ্য হয়।

আইএমএফ এর "স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস" (এস ডি আর) হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা। ১৯৬৯ সালে দলিলের প্রথম সংশোধনী এনে আইএমএফ এটা প্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জাতিক পরিশোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সদস্য দেশগুলো দ্বারা এই 'এসডিআর' ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্পট ট্রানসেকশনের জন্য মুদ্রা লাভ করতে এবং দায় পরিশোধ করতে, ঋণ হিসেবে অথবা ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে এই এস ডি আর ব্যবহৃত হয়। পরিচালক পর্ষদ, কার্যনির্বাহী পরিচালক মন্ডলী, সচিবালয় নিয়ে আইএমএফ- এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। আইএমএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে। এর প্রধান কার্যালয় ৭০০ ১৯তম ষ্ট্রিট, এন, উইউ, ওয়াশিংটন, ডি, সি, ২০৪৩১, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আইএমএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। আইএমএফ ১৯৯৯ সালে দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তা (PRGF) কর্মসূচী ২০০৬ সালে Extended Credit Facility-ECF নামক ফ্যাসিলিটি কর্মসূচী চালু করে। আইএমএফ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮। ১৮৮তম সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান (১৮ এপ্রিল ২০১২ থেকে)। আইএমএফ একক পরাশক্তি এবং পশ্চিম ইউরোপের সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার অর্থনৈতিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে।

২.১৬(১) IMF এর লক্ষ্যসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য তৎপরতা চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয় IMF- কে। একটি স্বেচ্ছাসেবী এবং সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের আদলে গঠিত IMF বিভিন্ন জাতিসমূহ বিশেষত যারা বন্ধু সদস্য রাষ্ট্রে উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থেকে এক মহৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চায় তাদেরকে এর সদস্যপদ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলে। সকল সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত Articles of Agrement এর মধ্যেই রয়েছে সদস্যবর্গের আচরণবিধিসমূহ। বিধি-বিধানগুলো হলো :-

১. সদস্যগণ বাধ্য থাকবেন তাদের নিজস্ব মুদ্রাকে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা ব্যতিরেকে মুক্তভাবে বৈদেশিক মুদ্রার সাথে বিনিময়ে সম্মত থাকতে।
২. অন্য সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নিজ দেশের অর্থ এবং মুদ্রানীতিতে এমন কোনো পরিবর্তন আনয়নের বিষয়ে IMF- কে আগাম অবহিত করা।
৩. IMF এর পরামর্শক্রমে নিজ অর্থ এবং মুদ্রানীতিতে এমন সংস্কার সাধন করা যা অন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য সহায়ক। সংস্কার আচরণবিধি মেনে চলতে সহায়তা করার লক্ষ্যে IMF একটি মুদ্রাপুল পরিচালনা করে যেখান থেকে সদস্যবর্গ আপদকালে ঋণ পেতে পারে। অবশ্য এটাও ঠিক যে মূলত IMF বিশ্বব্যাংকের মতো কোনো ঋণদাতা সংস্থা নয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো:-

ক. সদস্যদের মুদ্রা এবং বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যবেক্ষণ করা এবং এতদসম্পর্কিত আচরণবিধি যাতে সবাই মেনে চলে সে বিষয়ে মুরুব্বির ভূমিকা পালন করা।
খ. নীতিগতভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ; IMF- এ বিষয়ে যে কোনো রকমের আকস্মিকতা বা অপ্রত্যাশার বিরুদ্ধে।
গ. সদস্য রাষ্ট্রবর্গের অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করে সে সবের ওপর বিতর্কের আয়োজন করে মন্তব্যসহ তা সফল সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিলি করাও IMF এর লক্ষ্য। এতে এসব বিষয়ে একটি দেশের গৃহীত নীতিমালা যাতে অন্য দেশের ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে সবাই সজাগ হতে পারে।
ঘ. IMF মনে করে বিশ্বজনীন সমৃদ্ধি অর্জনের প্রধান শর্ত হলো একটি সুশৃঙ্খল মুদ্রা ব্যবস্থা যা কিনা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। শক্তিশালী এ মুদ্রাব্যবস্থা বজায় রাখা এবং তা তদারকি করাই IMF এর নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব। এর কমও নয় বেশিও নয়।

২.১৬(২) IMF এর তহবিল উৎস

IMF কোনো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান নয় এবং সে বিনিয়োগকারী ও গ্রহীতার মধ্যে কোনো রকম মধ্যস্ত তাও করে না। তৎসত্ত্বেও তার ভাণ্ডারে যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে যার মূল্য ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে। এ অর্থ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রদত্ত চাঁদা থেকে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র তার সামর্থানুযায়ী চাঁদা প্রদান করে অর্থাৎ সম্পদশালী রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ বেশি এবং দরিদ্র রাষ্ট্রের চাঁদা কম। বিশ্বব্যাংক যেখানে নিজে ঋণ করে এবং ধার দেয় IMF সেখানে মোটামুটি একটি ক্রেডিট ইউনিয়নের মতো। আর সদস্যবর্গ এখানে নিজেদের অর্থ সংগ্রহ করে প্রয়োজনের সময় সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে। যদিও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে IMF ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয় তবু সে তার অর্থায়ন কম পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সদস্য চাঁদার ওপরই নির্ভরশীল।

২.১৬(৩) যারা ঋণ/সাহায্য পেতে পারে

ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল সদস্য রষ্ট্রই IMF থেকে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির দাবিদার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে এ সিস্টেমের আওতাভুক্ত সকল অংশীদারকেই পারস্পরের প্রতি আর্থিক দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত রাষ্ট্রসমূহ যারা ঐসব দায়-দায়িত্ব পালনে অপারগ IMF তার নিজস্ব

তহবিল থেকে সেসব দেশকে সাময়িকভাবে অর্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে বিশেষ করে ব্যালেন্স অব পেমেন্টজনিত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। IMF থেকে গৃহীত অর্থ সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ্য। কোনো ক্রমেই তা দশ বছরের বেশি (গ্রেস পিরিয়ডসহ) আনাদায়ী রাখা যাবে না। IMF এর সুদের হার বাজার হারের চেয়ে সামান্য কম হলেও বিশ্বব্যাংক ও IDA লোনের মতো এত কম নয়। IMF এর ফান্ড ব্যবহার করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা এমনভাবে সংশোধন করে নিতে পারে যাতে তা অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ না হয়েও সমৃদ্ধিকে সুসংহত করতে সহায়ক হয়।

২.২.১৬(৩) IMF এর কার্যাবলি

IMF এর বিগত দিনের ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তাকে বড় বড় মুদ্রাগুলোর সাধারণ বিনিময়যোগ্যতা নীতি অবলম্বনের আন্দোলন দেখাশুনা করতে হয়েছে। তদারকি করতে হয়েছে সোনার মূল্যের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নির্ধারিত স্থায়ী বিনিময় হার পদ্ধতি এবং সল্পমেয়াদের অর্থ সাহায্য করতে হয়েছে সেসব দেশকে যারা তাদের মুদ্রামূল্য রাখতে গিয়ে দ্রুত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বোধ করেছে অথবা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে অসুবিধার সম্মখীন হয়েছে। ২য় পর্যায় শুরু হয় ১৯৭৮ সালে Par Value System এর বিপর্যয়ের পর থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করার জন্য তার কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করে। গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে এজন্য IMF তিনটি কর্মসূচি গ্রহণ করে :

প্রথমত : তারা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিজ নিজ মুদ্রা বিনিময়ে কড়াকড়ি পরিহার করতে আহবান জানাতে থাকে।

দ্বিতীয়ত : IMF তার সদস্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত বিনিময় ব্যবস্থার করণীয় দায়-দায়িত্ব তদারকি করার পরিবর্তে তাদের মুদ্রা ব্যবস্থার অধুনা Payment মোটামুটি ভারসাম্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ অন্তত আদর্শগতভাবে একটি দেশ যে পরিমাণে Payment করবে সেই পরিমাণে Receive করবে। আর্থিক সমস্যার কারণে যখন কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যায়ন এবং দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তখন সেখানে Balance of Payment সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। এমতাবস্থায় IMF এর সাথে চুক্তির শর্ত বলেই রাষ্ট্রটি সেখান থেকে সহায়তা কামনা করতে পারে। IMF এর ভূমিকা হলো আসলে পরামর্শমূলক। IMF নিয়মিতভাবে (সাধারণত বছরে একবার) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলোচনায় বসে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে, চলমান অবস্থায় বিরাজমান বা সম্ভাব্য সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সদস্য পরিমণ্ডলে তা প্রচারের মাধ্যমে সবার গোচরে আনয়ন করে।

তৃতীয়ত : যেসব সদস্য রাষ্ট্র সাময়িকভাবে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সংকটে নিপতিত হয়, IMF তাদের স্বল্প এবং মধ্য মেয়াদি আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। সংকটাপন্ন সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষীয়মান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিকরণের এ জাতীয় সহায়তার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য সরকারকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে হয় যে, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সংকটের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী যে কারণ তা দূর করার মতো অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি তারা গ্রহণ করবে। এসব ক্ষেত্রে IMF তার ভূমিকা রাখে একটি দেশের ঘাটতি পূরণে অধিকতর ভর্তুকী প্রদানের চেয়ে নিজস্ব সম্পদ অবলম্বনে বেঁচে থাকার পথে যুগ পরিবর্তনের যন্ত্রণাকে সহজ করার কাজে। IMF এর সহায়তা লাভের চাবিকাঠি হলো সদস্য রাষ্ট্রের Balance of Payment এবং এর Payment and Recipts এর সাথে অন্য দেশের Payment and Reclipts এর সামঞ্জস্যতা।

২.১৭ IMF এর ঋণদান পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিয়ম অনুযায়ী এর প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জন্যই বিদেশি মুদ্রা গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য দেশগুলো প্রতি বছর তাদের এজন্য নির্ধারিত শতকরা ২৫ ভাগ হতে শুরু করে ২০০ ভাগ পর্যন্ত অন্য দেশের মুদ্রা তহবিল হতে গ্রহণ করতে পারে। কোটা সম্পর্কিত এ সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে কোনো দেশের পক্ষেই

তহবিল হতে যথেচ্ছভাবে ঋণ গ্রহণ সম্ভব হয় না। কোনো দেশ আন্তর্জাতিক দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হলে সংশ্লিষ্ট দেশকে নিজ হতে ঋণের জন্য চেষ্টা করতে হয়।

কোন দেশের জন্য ঋণ অনুমোদন করা হলে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল উক্ত দেশের নিকট হতে গৃহীত ঋণের জন্য সুদ আদায় করে থাকে এবং ঋণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশকেও জামানত দিতে হয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যেসব দেশের মুদ্রার বণ্টন তহবিল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যদি কোনো দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ উক্ত দেশের বিদেশি মুদ্রা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত কোটায় শতকরা ৭৫ শতাংশ বেশি হয়, তাহলে উক্ত দেশের মুদ্রাকে IMF দুর্বল মুদ্রা বলে ঘোষণা করে। এভাবেও যদি উক্ত মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর না হয়, তাহলে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে উক্ত দেশ হতে পণ্য আমদানি করার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২.১৮ এক নজরে বিশ্বব্যাংক ও IMF এর মধ্যে পার্থক্য

বিশ্বব্যাংক

১. বিশ্বের দরিদ্রতর রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।
২. উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সাহায্য করে সে দেশের উন্নয়নের সহায়তা করে।
৩. উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যাদের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (G.N.P) ১৩০৫ মার্কিন ডলারের নিচে তাদেরকে IDA এর মাধ্যমে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
৪. শাখা প্রতিষ্ঠান IFC এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের বেসরকারি উদ্যোগসমূহকে উৎসাহ প্রদান করে।
৫. বেশিরভাগ অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক ফান্ড মার্কেট থেকে ধারে।
৬. অথরাইজ ক্যাপিটালের পরিমাণ ১৯০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার : যার ১০% এর যোগানদার এর সদস্যবর্গ।

IMF

১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করে।
২. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা এবং সুবিন্যস্ত বিনিময় সম্পর্কে উন্নতি সাধন করাই এর লক্ষ্য।
৩. শিল্প সমৃদ্ধ এবং উন্নয়নশীল সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই তাদের সাময়িক Balance of Payment সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করে।
৪. SDR বরাদ্দের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা রিজার্ভের ঘাটতি পূরণ করে।
৫. সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকে কোটা অনুযায়ী চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে।
৬. পরিশোধিত চাঁদার পরিমাণ ৩৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২.১৯ বাংলাদেশ ও আইএমএফ সম্পর্ক

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১০ মে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল-আইএমএফ এর সদস্যপদ লাভ করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে তখন থেকেই বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

আইএমএফ তাদের ঋণ সাহায্যের ক্ষেত্রে দুই ধরনের শর্ত আরোপ করে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো সংখ্যাবাচক, আরেকটি হলো কাঠামোগত শর্ত। অনুন্নত, স্বল্পোন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রের সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শর্তগুলো চাপানো হয়। আর কাঠামোগত শর্ত আরোপ করা হয় প্রতিষ্ঠানিক এবং নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে। যেমন বেসরকারিকরণ বা বিরাষ্ট্রীয়করণ, বাণিজ্য সংস্কার, সরকারের বাজেটে ঘাটতি হ্রাস, সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালা সুদৃঢ় করা মূল্য উদারীকরণ প্রভৃতি। বর্তমানে দারিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে এসব শর্ত চাপিয়ে দেয়া হলেও শর্তগুলো নানা কারণে ব্যর্থতার মুখ দেখায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে আইএমএফের শর্তসমূহ গ্রহীতা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক গ্রহণ যোগ্যতাকে অসম্মান করছে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৬-৮৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) প্রণীত তিন বছর মেয়াদি স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (SAF) চুক্তিতে সাক্ষর করে। বাংলাদেশ ও আইএমএফ-এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯৮৯-১৯৯০ সালে বিস্তৃত আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ আইএমএফ প্রবর্তিত তিন বছর মেয়াদি এনহেনসড স্ট্রাকচারাল এডজাসমেন্ট ফ্যাসিলিটি

(ESAF) নামক আর একটি কর্মসূচীতে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিবদ্ধ ২৯টি রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৭ সালে আইএমএফ প্রবর্তিত ঊঝঅঋ এর অধিভুক্ত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সাল থেকে গৃহীত আইএমএফ-এর The Poverty Reduction and Growth Facility (PRDG) ঋন সুবিধার আওতায় অন্যকথায় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পরামর্শমত বাংলাদেশ সরকার 'দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র' (Poverty Reduction Strategy Paper-PRSP) প্রস্তুত করে।

২০০৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আরএমএফ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। এ মিশন বাংলাদেশে এসেছে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংক বেসরকারিকরণ এবং পলিসি সাপোর্ট ইনস্ট্রুমেন্ট (পিএসআই) চুক্তি স্বাক্ষরসহ প্রায় ২৫টি এজেন্ডা হাতে নিয়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক এজেন্ডা হচ্ছে পিএসআই। পিএসআই চুক্তি হলে বাংলাদেশের আর্থিক খাত, বাজেট প্রণয়ন, ব্যাংক ঋণের সুদের হার নির্ধারণ, জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ, কৃষিখাতে ভর্তুকী, শিল্পনীতিসহ যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করার অফিসিয়াল অধিকার পাবে আইএমএফ।

আইএমএফের হাতে আর্থিক সার্বভৌমত্ব তুলে দেয়ার কাজটি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সরকার বিশেষ করে জরুরি সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছে। এ সরকার আইএমএফ-এর পরামর্শগুলো সুকৌশলে বাস্তবায়ন করছে। কারণ জনগনের কাছে তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। নেই জবাবদিহিতাও।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ না উচ্চারণ করেছেন। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করতে বাংলাদেশের জন্য আইএমএফ-এর ঋণ সহায়তার প্রস্তাবে এ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির কর্মকর্তাদের মুখের ওপর না করে দিয়েছেন তিনি। তার এ সাহসী উচ্চারণের পেছনে রয়েছে জাতীয় মনোভাব ও সরকারের নৈতিক সমর্থন। ড. আতিউর রহমান স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আইএমএফ যে ঋণ প্রকল্প চালু করেছে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত রয়েছে। বাংলাদেশের মন্দা মোকাবিলায় শিল্প ও কৃষি খাতসহ সকল পর্যায়ে নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে যে কোন স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের তুলনায় এগিয়ে থাকা, উচ্চ রেমিটেন্স প্রবাহ, বিশাল অভ্যন্তরীন চাহিদা, মানব সৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যাপক সক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, আইএমএফ চাইলে অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশকে কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অন্যদের কাছে বাংলাদেশ অনুকরণীয় হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।"

জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আইএমএফ যখনই যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, তার পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল। অন্যকথায় বাংলাদেশের ব্যাপারে আইএমএফ এর ভুল, বিভ্রান্তিকর ভবিষ্যৎবানীর নজিরও যথেষ্ট রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে আইএমএফ-এর গবেষনায় বলা হয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৫ শতাংশ বা তার কাছাকাছি। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬ শতাংশ।

ঋন দিতে গিয়ে আইএমএফ যে সব শর্ত বিভিন্ন সময়ে আরোপ করেছে, তার পশ্চাতে ছিল উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে বাংলাদেশকে একটি স্থায়ী ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রে পরিনত করে রাখা। বাংলাদেশ মূলত কৃষি অর্থনীতির দেশ এবং এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমেই সহজে দ্রুততার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব অথচ আইএমএফ বারবার কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাসসহ এ খাতকে পিছিয়ে রাখার লক্ষ্যে নানা শর্ত আরোপ করেছে। আইএমএফ বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভোগ বাড়ানোর কাজটি বেশ-সুচারুভাবে করে চলেছে। বিদ্যুৎ গ্যাস, পানিসহ সকল সেবা খাতে মূল্য বৃদ্ধির শর্ত আরোপে তাদের উৎসাহে কখনও ঘাটতি দেখা যায়নি।

আইএমএফ খাদ্য শষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ না বাড়িয়ে বরং পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে সস্তায় খাদ্য আমদানি লাভজনক মর্মে পরামর্শ দিয়ে সরকারকে যে নীতি নির্ধারণে বাধ্য করেছিল, তা আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে আমদানির উপর নির্ভর করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে আইএমএফের অফিস অবস্থিত। ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে আইমএমফের অফিস থাকার সমালোচনা করে বলেন, বিশ্বের আর কোন দেশে এ রকম নজির নেই।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

২.২০ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank)

এশীয় অঞ্চলের মূলধন স্বল্পতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, অনুন্নত প্রযুক্তি, সীমিত বাজার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ উন্নয়ন প্রচেষ্টার পথে একটা বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এ পটভূমিতে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (Economic and Social Commsision for Asia and Pacific-ESCAP) এর তত্ত্বাবধানে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় এশিয়ায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে মন্ত্রী পর্যায়ের এক সম্মেলনে একটি আঞ্চলিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার রূপরেখা অনুমোদিত হয়। ১৫টি রাষ্ট্র ব্যাংকের চার্টার সম্পর্কে সম্মতি জানানোর পর ১৯৬৬ সালের ২২ আগস্ট তা কার্যকর ঘোষণা করা হয়। ঐ বছরই ২৪ নভেম্বর টোকিওতে ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৬ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৩১টি রাষ্ট্র। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭। অ-এশীয় সদস্য ৬৫টি রাষ্ট্র। এর মধ্যে ইউরোপ ১৮, উত্তর আমেরিকা ২ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা), ওশেনিয়া ১৫। সদর দফরত ম্যানিলা ফিলিপাইন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে (এডিবি) জাপানের শেয়ার বেশি থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনেক বেশি। এ ব্যাংকটির অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য অর্থের পরিমানও কম।

মনে রাখার Technique & Tips

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)

- IMF-এর পূর্ণরূপ: International Monetary Fund.
- প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়: ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনে।
- কাজ শুরু: ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে।
- সদর দপ্তর: ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা: ১৮৮ টি।
- প্রধানের পদবি: ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
- যে সম্মেলনের ফলে IMF প্রতিষ্ঠিত হয়: ব্রিটেন উডস সম্মেলন, ১৯৪৪ সালে।
- বর্তমান প্রধান: ফ্রান্সের সাবেক অর্থমন্ত্রী ক্রিষ্টিন লগার্ড(৫ জুলাই ২০১১)।
- বাংলাদেশ IMF-এর সদস্যপদ লাভ করে: ১০ মে, ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ থেকে IMF-এর কার্যালয় গুটিয়ে নেওয়া হবে: ২০১২ সালের মধ্যে।

২.২০(১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের লক্ষ্য হলো:

ক. এশীয় অঞ্চলে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেসরকারী ও সরকারী মূলধনকে কার্যকরভাবে বিনিয়োগে সহায়তা;
খ. স্বল্পোন্নত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রকল্প ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগের ব্যবস্থা;
গ. বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রবৃদ্ধিগত বৈষম্য দূর করা;
ঘ. বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কর;
ঙ. নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
চ. জাতিসংঘের সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও সম্পর্ক বজায় রাখা।

২.২১(২) বাংলাদেশ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সম্পর্ক

বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য পদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে এডিবি ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এডিবি বাংলাদেশের যে সব প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নিম্নরূপ:

১. কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট খাত যেমন: বনজ সম্পদ, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শস্য উৎপাদন, সেচ সুবিধা;
২. পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন, যেমন: রেলওয়ে, সড়ক, সেতু, কদর উন্নয়ন এবং টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সড়ক সেতু যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণে এডিবি অর্থায়ন স্মরণীয় হয়ে আছে।

৩. স্বাস্থ্য ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্পর্কিত খাতে অর্থায়ন।
৪. দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।
৫. নগর উন্নয়ন, বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।
৬. শিক্ষা খাতের উন্নয়ন: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এডিবি কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও গ্রামীন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।
৭. নারীর উন্নয়ন: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন।
৮. বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান।
৯. শক্তি সম্পদ খাতের উন্নয়ন-জ্বালানি খাতে ঋণদান-বাংলাদেশে এডিবি প্রদত্ত মোট ঋণের এক চতুর্থাংশেই জ্বালানী খাত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। আর এ ঋণের বিনিময়ে বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি এডিবি দেশের জ্বালানি খাতের মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের তেল-গ্যাস উত্তোলন ও বিপনন ব্যবস্থা বেসরকারি খাতে হস্তান্তর। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জ্বালানী তেল ও গ্যাসের দাম বাড়াতে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করছে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক। বিভিন্ন সময়ে এডিবির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেশের গ্যাস খাতের নীতিমালায় যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

১. গ্যাস খাতে বেসরকারি উদ্দোক্তাদের সমপৃক্ত করা;
২. আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোর উত্তোলিত গ্যাসের বাজার নিশ্চিত করা এবং
৩. এ খাতের উন্নয়নে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রফতানির সুযোগ সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া।

মূলত বহুজাতিক কোম্পানীর মুনাফার পথ সৃষ্টি করতেই এডিবি বাংলাদেশকে এ ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে। অবশ্য দেশের কয়েকটি খনিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লার মজুদ নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে এডিবি গ্যাস রফতানির বিষয়টি সামনে আনছে না। এখন তাদের কাছে মূল ইস্যু কয়লা রফতানি। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী কয়লা খনি নিয়ে এশিয়া এনার্জির জনস্বার্থ বিরোধী তৎপরতায় মদদ দিচ্ছেএডিবি। অথচ এশিয়া এনার্জির পরিকল্পনা অনুযায় ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে শুধু পুলবাড়ীসহ আশপাশের ছয়টি থানা নয়, পানি বিষাক্ত ও মরুকরণের মধ্য দিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গে এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। শুধু বর্তমান প্রজন্মই নয়, অনির্দিষ্টকাল ধরে ক্ষতবিক্ষত হবে ওই অঞ্চলের মানুষ। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরাকরি উচ্ছেদ হবেন লক্ষাধিক মানুষ (এশিয়া এনার্জির নিজের হিসাবেই ৫০ হাজার)। বিদ্যুৎ খাতে এডিবি: এশিয়ার উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও বেসরকারিকরণে মূল ভূমিকা পালন করছে এডিবি। এ খাতে তাদের বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, বিপণন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাছ থেকে সরিয়ে ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর। এডিবির সংস্কার মানে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দুর্নীতি নির্মূল করে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা দূর করা নয়; উৎপাদন বৃদ্ধিকে গৌণ করে ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করাই ছিল এডিবির প্রথম কাজ। এ লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) গঠন করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) সংকুচিত করা হয়। ১৯৯৬ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী (পিজিসিবি)। বিদ্যুৎ লাইন সঞ্চালনের দায়িত্ব পিডিবির কাছ থেকে পিজিসিবির কাছে তুলে দেওয়া হয়। পরে এডিবির পরামর্শে গঠিত হয় ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো)। এ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ সংযোজন ডেসাকে কোম্পানীতে রুপান্তরিত করে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) নামকরণ করা হয়। এজন্য এডিবি ৭ কোটি ৯ লাখ এবং জার্মান সংস্থা জেএফডব্লিউএই ৪ কোটি ৪ লাখ ইউরো ঋণ দিয়েছে। ৪টি প্রকল্পের আওতায় এ অর্থ ব্যয় হবে। এগুলোর মধ্য রয়েছে ৩৩/১১ কেভি সাব-ষ্টেশন নির্মাণ, ১৩২/১৩৩ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ, ১৩২ ওভারহেড ৯ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ, ১৩২ কেভি ৩২ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ এবং ৩৩ কেভি ৭৫ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ ইত্যাদি। অর্থাৎ কোম্পানী করে বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপুল অর্থ ব্যয় করা হলেও উৎপাদন বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ থাকছে না। বিদ্যুৎ খাত নিয়ে এডিবির পরিকল্পনার মধ্যে আছে।

১. সরকারি খাতে উৎপাদন নিরুৎসাহিত এবং বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া।
২. বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তর উৎপাদন, সরবরাহ, বিপণন ও বিতরণের জন্য আলাদা আলাদা কোম্পানী গঠন ও এর সবকটিকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনা;
৩. বিদ্যুৎ খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করা;
৪. সংকট নিরসনে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি।

পানি নিয়ে বাণিজ্যের পায়তারা:

পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে দীর্ঘ দিন ধরেই কৌশলে অগ্রসর হচ্ছে এডিবি-বিশ্বব্যাংক। জীবনধারণের আবশ্যিক উপাদান পানিকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করতেই বারবার পানির দাম বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি। রাজধানীতে ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এডিবি। বিগত অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে গত ৪ বছর ধরে এডিবির একটি দল কাজ করেছে। অতীতে এডিবির পরামর্শে সরকার যেসব নীতিমালা বা আইন কানুন তৈরি করেছে তার কোনোটিই বেসরকারি খাতে স্থানীয় বিনিয়োগের জন্য সহায়ক হয় নি। বরং বিদেশি কোম্পানীকে কাজ পাইয়ে দিতে সহায়তা করেছে। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এডিবির পরামর্শে একটি নীতিমালা তৈরি হয়েছে। তাতে কোনো প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের দরপত্রে অংশ নিতে চাইলে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলাদেশে যেখানে আগে কোনো দিন বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণই হয় নি, সেখানে দেশীয় কোম্পানীর অভিজ্ঞতা থাকবে কীভাবে?

ব্যর্থ প্রকল্পগুলোর দায় কার? দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন, সরকারের আর্থিক লাভসহ বিভিন্ন ইতিবাচক স্বপ্ন দেখিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ঋণের দায় চাপালেও এডিবির অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের সাফল্যের হার খুবই কম। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত ৯৮টি প্রকল্পের ওপর এডিবির নিজস্ব মূল্যায়নে মাত্র ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ প্রকল্পকে সফল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে মূল্যায়নকৃত ৩৩টি প্রকল্পে। ৫১.৫ শতাংশ, শিক্ষা খাতে ১১টির মধ্যে ৬৩.৬ শতাংশ, জ্বালানি খাতে ১১টির মধ্যে ৭২.৭ শতাংশ, আর্থিক খাতে ৬টির মধ্যে ১৬.৭ শতাংশ, শিল্প ও বাণিজ্যে ৬টিতে ৫০ শতাংশ, অন্যান্য খাতে ১১টিতে ৭২.৭ শতাংশ, যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে ১৫টিতে ৭৩.৩ শতাংশ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে ২ টি প্রকল্পের মূল্যায়নে ৫০ শতাংশ সাফল্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে যে দুটি প্রকল্প মূল্যায়ন করা হয়েছে তাতে সাফল্যের হার শূণ্য (সূত্র: এডিবি ও বাংলাদেশ, এডিবির নিজস্ব ওয়েবসাইট)।

এডিবির মূল্যায়ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এডিবির কাছ থেকে নেওয়া ঋণের মধ্যে ৩৬৫ কোটি ৬ লাখ ১০ হাজার ডলারই ব্যর্থ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে। জনগণের কোনো উপকার করতে ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সুদসহ এ অর্থ ফেরত দিতে হচ্ছে। প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রতটি স্তরে শর্ত, পরামর্শ ও কৌশল চাপিয়ে দিলেও এডিবি কেন এ ব্যর্থতার দায় নেবে না?

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি করা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বাংলাদেশের মত যে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে সব সময় চ্যালেঞ্জের মধ্যেই থাকে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা একটি ধারাবাহিক বিষয়।

২.২৩ জি-৮ (G-8)

G-8 বা Group of 8 বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের জোট। সংস্থাটি গঠিত হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৭৫। এর পূর্ব নাম G-6 বা ৬ জাতি গোষ্ঠী। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি দেশ। সদস্যগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও রাশিয়া। অষ্টম সদস্য হিসেবে রাশিয়া যোগ দেয় ১৫ মে ১৯৯৮। সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

২.২৪ জি-৭৭

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন হলো ৭৭ জাতিগোষ্ঠী। মূলত উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে জেনেভায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি আঙ্কটাড (ANC-TAD) "United Nations Conference on Trade and Development" নামে পরিচিত। এ আঙ্কটাডের মূল বিষয়কে কেন্দ্র করেই বিকাশমান বিশ্বের সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে ৭৭ জাতিগোষ্ঠী হয়। আঙ্কটাডের সব কয়টি সম্মেলনে এ গোষ্ঠী একটি অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রেখে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে থাকে। তবে প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যই এ সংস্থা মূল ভূমিকা পালন করে। এ গোষ্ঠীর মূল সম্মেলনের পূর্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় তিনটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে এ তিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমন্বয় করে ৭৭ জাতিগোষ্ঠীর ঘোষণায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সংস্থার কোনো সাংগঠনিক কাঠামো কিংবা সদর দপ্তর নেই। বিশ্বের ১৩২টি উন্নয়নশীল দেশ এ গোষ্ঠীর সদস্য।

বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা

২.৩০ এক নজরে বিশ্বব্যাংক (World Bank)

- প্রতিষ্ঠা : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে।
- জন্মলাভ : ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে।
- আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু : ২৫ জুন, ১৯৪৬ সালে।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৮৮টি।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম : জিম ইয়ং কিম (দক্ষিণ কোরিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, দ্বাদশ)।
- বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম : প্রফুল্ল সি প্যাটেল।
- প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল : ৫ বছর।
- কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী : ২৪ সদস্যবিশিষ্ট। ৫ জন নিযুক্ত হন সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী পাঁচটি দেশ থেকে এবং বাকি ১৯ জন ১৯টি ভৌগোলিক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত।
- সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী ৭টি দেশ : যুক্তরাষ্ট্র (১৫.৮৫%), জাপান (৬.৮৪%), চীন (৪.৪২%) জার্মানি (৪%), ফ্রান্স (৩.৭৫%) যুক্তরাজ্য (৩.৭৫%), ও ভারত (২.৯১%)।
- বিশ্বব্যাংকে সবচেয়ে বেশি ভোটধারী : প্রথম-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় -জাপান।
- বিশ্বব্যাংক ও IMF এর স্বপ্নদ্রষ্টা : জন মেনার্ড কেনেস (যুক্তরাজ্য) ও হ্যারি ভেইটার হোয়াইট (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংক থেকে পদত্যাগ করে : কিউবা।
- বিশ্বব্যাংক বলতে মূলত কোনো সংগঠনকে বোঝায় : IBRD
- সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ : পরিচালক পর্ষদ। পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয় প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন করে পরিচালক এবং একজন বিকল্প পরিচালক নিয়ে।

আইবিআরডি (IBRD)

- IBRD-এর পূর্ণরূপ : International Bank for Reconstruction and Development.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৪৪ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৮৮টি।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বব্যাংকের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে : IBRD
- যে সম্মেলনে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় : ব্রিটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪ সালে)।
- বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট : ইউজিন মেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বিশ্বব্যাংকের ৬১ বছরের ইতিহাসে কোনো প্রেসিডেন্টের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে

http://thejobstudy.com Go to Contents

চাকরি হারায় : পল উলফাভিৎস (যুক্তরাষ্ট্র)।
- বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম : জিম ইয়ং কিম (দক্ষিণ কোরিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, দ্বাদশ)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ সালে।
- বিশ্বব্যাংকের সদস্য হলে প্রথমে IMF-এর সদস্য হতে হবে।

আইডিএ (IDA)

- IDA-এর পূর্ণরূপ : International Development Association এটি 'Softloan-window' নামেও ব্যাপক পরিচিত।
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৭২টি (সর্বশেষ সদস্য-দক্ষিণ সুদান)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- IDA-এর প্রধান : বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম (পদাধিকার বলে)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ সালে।
- IDA-এর ঋণ সুদমুক্ত **আইএফসি (IFC)**
- IFC-এর পূর্ণরূপ: International Finance Corporation.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ২০ জুলাই, ১৯৫৬ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৮৪টি (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- IFC-এর প্রধান : বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম (পদাধিকার বলে)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১৮ জুন, ১৯৭৬ সালে।

আইসিএসআইডি (ICSID)

- ICSID-এর পূর্ণরূপ : International Centre for Settlement of Investment Disputes.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৬৬ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৪৮টি।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ICSID-এর প্রধান : বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিফ (পদাধিকার বলে)।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে: ২৬ এপ্রিল,১৯৮০ সালে।

মিগা (MIGA)

- MIGA-এর পূর্ণরূপ : Multilateral Investment Gurantee Agency.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৮৮ সালে।
- সদস্য সংখ্যা : ১৭৭টি (সর্বশেষ-ফিলিস্তিন)।
- সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- কার্যাবলি : উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।
- বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে : ১২ এপ্রিল, ১৯৮৮ সালে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Brief Questions & Answer)

১. বিশ্বব্যাংকের পূর্ণ নাম কী?
উত্তর : International Bank for and Development (IBRD)

২. MGD অর্থ কী?
উত্তর : Millennium Development Goals.

৩. WTO- এর পূর্ণনাম কী?
উত্তর : World Trade Organization.

৪. বর্তমান বিশ্বে LDC দেশের সংখ্যা কয়টি?
উত্তর : ৪৯টি।

৫. LDC অর্থ কী?
উত্তর : Least Development Country.

৭. IFC-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর :IFC-এর পূর্ণরূপ: International Finance Corporation.

৮. ICSID-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর :ICSID-এর পূর্ণরূপ : International Centre for Settlement of Investment

৯. MIGA-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর :MIGA-এর পূর্ণরূপ : Multilateral Investment Gurantee Agency

১০. IBRD-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর :IBRD-এর পূর্ণরূপ : International Bank for Reconstruction and Development.

১১. বিশ্বব্যাংক এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কী ?
উত্তর :বিশ্বব্যাংক এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম : জিম ইয়ং কিম (দক্ষিণ কোরিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, ঘানশ)।

১২. IDA এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : IDA-এর পূর্ণরূপ : International development Association.

১৩. বিশ্বব্যাংকের প্রধান কাজ কী?
উত্তর : দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র হ্রাস করা।

১৪. বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট কে নিয়োগ দেন?
উত্তর : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

১৫. বিশ্বব্যাংক কত সালে বাংলাদেশের পদ্মাসেতু প্রকল্পের ঋণ বাতিল করে?
উত্তর : ২০১২ সালের ২৮জুন।

১৬. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : ফিলিপিনের ম্যানিলায়।

১৭. IFC-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে নিয়োগ দেন?
উত্তর : ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

১৭. IFC-এর পরিচালনা পরিষদের কে নিয়োগ দেন?
উত্তর : ২৪ জন।

১৮. প্রতিষ্ঠাকালীন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কত?
উত্তর : ৩১টি।

১৯. কত সালে বিশ্বব্যাংক ঢাকায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে?
উত্তর : বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে।

২০. বিশ্বব্যাংকে কর্তৃত্ব কোন দেশের হাতে?
উত্তর : আমেরিকার হাতে।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) বিশ্বব্যাংকের পূর্ণ নাম কী?
(খ) MGD অর্থ কী?

৩. (ক) WTO- এর পূর্ণনাম কী?
(খ) বর্তমান বিশ্বে LDC দেশের সংখ্যা কয়টি?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। বিশ্বব্যাংক সমালোচিত হচ্ছে কেন?

২. উন্নয়নশীল বিশ্বে আইএমএফ-এর ভূমিকা কিরূপ? আইএমএফ সমালোচিত হওয়ার কারণগুলো লিখুন?

৩. বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা বিতর্কিত হওয়ার কারণগুলো কী কী? উন্নত বিশ্ব কী? বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যাবহার করছে-মতামত দিন?

৪. মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবির ভূমিকা আলোচনা করুন?

৫. পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক গৃহিত ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলো উল্লেখ করুন?

৬. স্বল্পন্নত দেশ বলতে কী বুঝেন? স্বল্পন্নত দেশগুলোর সমস্যাবলি কী কী? স্বল্পন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় কী?

৭. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর কার্যাবলি আলোচনা করুন।

৮. বিশ্বব্যাংক ও পদ্মাসেতু সম্পর্কে আলোচনা করুন? বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে- অপনার মতামত তুলে ধরুন?

অধ্যায় ৩

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
World Trade Organization

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৩.১ ভূমিকা
৩.২ উৎপত্তি
৩.৩ গ্যাট থেকে WTO এর রূপান্তর
৩.৪ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)
৩.৫ WTO এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৩.৬ WTO এর মৌলিক নীতিমালা
৩.৭ WTO-এর প্রধান কার্যাবলি
৩.৮ WTO-এর সাংগঠনিক কাঠামো
৩.৯ বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ
৩.১০ WTO-চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি
৩.১১ WTO-এর মন্ত্রী সম্মেলন
৩.১২ একনজরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
৩.১৩ WTO and Least Developed Countries (LDCs)
৩.১৪ WTO ও বাংলাদেশ
৩.১৫ WTO ও তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ

Go to Contents
http://thejobstudy.com

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আলোচনার ফোরাম হিসেবে কাজ করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমস্যা (Dispute) সমাধানের লক্ষ্যে রেফারি হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি বৈধ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক, নেগোশিয়েশন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির শর্তানুযায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। উরুগুয়ে রাউন্ড মাল্টিলেটারাল নেগোশিয়েশনের ফাইনাল অ্যাক্টের টার্ম অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জন্ম হয়।

৩.২ উৎপত্তি (Origin)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-এর উত্তরসূরি হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। একে GATT-এর অধীনে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য আলোচনার অষ্টম রাউন্ডে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলার

আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ ৮ বছরের বেশি সময় ধরে আলোচনা শেষে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর কর্মকর্তা পর্যায়ে জেনেভার উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফল সমন্বয়ে "Final Act" গৃহীত হয়। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকেশে ১১৭টি দেশের মন্ত্রীগণ সামান্য পরিবর্তনসহ 'ফাইনাল এ্যাক্ট' স্বাক্ষর করেন, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। মারাকেশে স্বাক্ষরিত ফাইনাল অ্যাক্টের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৫৫০। এতে ২৯টি চুক্তি ছাড়াও বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ঘোষণাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩.৩ গ্যাট থেকে WTO-এ রূপান্তর (Transformation of WTO Form GATT)

গ্যাট (GATT)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে General Agreements on Tariffs and Trade. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অন্যান্য বাধাসমূহ দূর করা গ্যাটের অন্যতম লক্ষ্য হলেও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কোনো স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল না। তাছাড়া গ্যাটের নীতিমালাসমূহও ভট্টিউটিওর ন্যায় বিস্তৃত ছিল না। গ্যাটের নিয়মাবলি (rules) কেবল বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাও আবার সকল বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু ভট্টিউটিও পণ্য ছাড়াও অন্যান্য খাত যেমন- সেবা খাত, Intellectual property rights ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ১৯৪৭ সালে গ্যাটের জন্ম হয়। গ্যাটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে) বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করা ও সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে তার সমাধান করার মাধ্যমে অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক মুক্ত বাণিজ্য নিশ্চিত করা। মূলত ব্রিটন উডস কনফারেন্স থেকে গ্যাট সৃষ্টির ধারণা জন্মে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ২২টি দেশের মধ্যে দীর্ঘ প্রায় ৬ মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর GATT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে জেনেভাতে সচিবালয় স্থাপনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

GATT-এর জন্মলগ্নে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২২। কিন্তু পরবর্তীকালে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০তে উন্নীত হয়। এ ছাড়া ৩২টি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর না করলেও GATT-এর নিয়মাবলির অধীনে পরিচালিত হয়। ১৯৪৭

মনে রাখার Technique & Tips

WTO এর পটভূমি
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
↓
ইউরোপের অর্থনীতিতে ধস
↓
সমাজতন্ত্রের উত্থান
↓
অর্থনৈতিক উপনিবেশ গড়ার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর উদ্যোগে বৈঠক
WB, IMF & ITO গঠনের উদ্যোগ
↓
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অনুমোদন না দেওয়ায় WB, IMF হলেও ITO ব্যর্থ
↓
১৯৪৪ জুলাই,৫০টি রাষ্ট্র ব্রেটন উডস (যুক্তরাষ্ট্র প্রথম উদ্যোগে-ব্রেটন উডস কনফারেন্স-আলোচ্য বিষয় WB,IMF&ITO)
↓
১৯৪৭ সালে ২৩ টি দেশের চুক্তি স্বাক্ষর
↓
১ জানুয়ারি, ১৯৪৮ এ ৫০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২৩টি দেশে GATT চুক্তি চালু
↓
বর্তমান মোট সদস্য ১৬০ (সর্বশেষ ইরেমেন)
↓
১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩-WTO এর মহাপরিচালক -রবার্তো কার্ভালহো আজেভিদো (ব্রাজিল)।

ITO → ১৯৪৪
GATT → ১ জানুয়ারী, ১৯৪৮
WTO → ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫
বৈঠক/রাউন্ড
→ ১৯৪৮ এ গ্যাটের প্রথম বৈঠক,জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
→ ১৯৪৯- এনেসী, ফ্রান্স।
→ ১৯৫১- টরকোয়ে, যুক্তরাষ্ট্র।
→ ১৯৫৬- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
→ ১৯৬০- ৬১ ডিলন রাউন্ড।
→ ১৯৬৪- ৬৭ কেনেডী রাউন্ড।
→ ১৯৭৩- ৭৯ টোকিও রাউন্ড।
→ ১৯৮৬- ৯৪ উরুগুয়ে রাউন্ড।
→ পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র : ৫৬টি
→ পর্যবেক্ষক সংস্থা :৭টি
→ সদর দফতর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
→ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য WTO এর সদস্য নয়- রাশিয়া।

থেকে ১৯৯৪ সালে WTO-এর জন্ম নেওয়া পর্যন্ত GATT-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ৮টি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে জেনেভায় প্রথম রাউন্ড এবং ১৯৮৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত উরুগুয়েতে গ্যাটের ৮ম রাউন্ড বা সর্বশেষ আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৮ম রাউন্ড আলোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হলো ডব্লিউটিও। যদিও গ্যাটের নিয়ম-কানুনগুলোই ডব্লিউটিওর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তথাপি বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য একটি অধিকতর দৃঢ় লিগ্যাল ভিত্তি সৃষ্টি করা ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়াবলি এর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যেই ডব্লিউটিও সৃষ্টি করা হয়।



৩.৪ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)

উরুগুয়ে রাউন্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের পর ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে WTO-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ সংস্থার সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। এটি বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংগঠন। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবায়ন কাজ তদারক করা, মুক্ত বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করাও এ সংগঠনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬০ (সর্বশেষ ইয়েমেন)। বিশ্ব বাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি বাণিজ্য এখন WTO সদস্য দেশগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে।

বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৪০-এর দশকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, তা যে অত্যন্ত সফল হয়েছে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৫০-এর দশকে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ বাণিজ্য ছিল, ১৯৯০-এর দশকে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৫ WTO- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of WTO)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো বহুজাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার বৈধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। এ প্রতিষ্ঠান সদস্য দেশসমূহের সরকারকে তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা ও চুক্তিসমূহের মূল নীতিমালা নির্ধারণ করে। এটা এমন একটি প্লাটফরম যেখানে যৌথভাবে যুক্তিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করাই হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩.৬ WTO- এর মৌলিক নীতিমালা (Fundamental Principles of WTO)

WTO-যে সকল মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো হলো :

১. **পক্ষপাতহীন বাণিজ্য :** WTO-এর সকল সদস্য রাষ্ট্রের একে অপরকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

২. **সীমিত আকারের সংরক্ষণ :** দেশীয় শিল্পকে প্রদত্ত যেকোনো সুযোগ-সুবিধা কোটা বা আমদানি লাইসেন্স হিসেবে না দিয়ে ট্যারিফ হিসেবে প্রদান করতে হবে।

৩. **সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে পর্যালোচনাপূর্বক ট্যারিফের হার নির্ধারণ :** যেসকল পণ্যের ট্যারিফ ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব পণ্যের ট্যারিফ কেবল তখনই বৃদ্ধি করা যাবে যদি আমদানিকারক দেশ এ জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

৪. **National treatment :** অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্যকে অভ্যন্তরীণ কর ও বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই সে কাজে পণ্যের চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

৫. **সমতার ভিত্তিতে পর্যালোচনা :** যদি কোনো সদস্য রাষ্ট্র মনে করে যে, তার অধিকার খর্ব করা বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত বিধি-বিধানের সাহায্য চাইতে পারবে।

৩.৭ WTO-এর প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

১. উরুগুয়ে রাউন্ডের চুক্তিসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা (to administer and inplement URAS).
২. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার জন্য ফোরাম হিসেবে কাজ করা;
৩. বাণিজ্যসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা;
৪. বিভিন্ন সদস্যদেশের জাতীয় বাণিজ্য নীতিমালা পরীক্ষা করে দেখা;
৫. কারিগরি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্য নীতিমালার বিষয়ে সহায়তা করা।

৩.৮ WTO- এর সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর অনেকগুলো কমিটি রয়েছে। এসব কমিটির অধিকাংশ হলো বিশেষায়িত কমিটি, যেগুলো কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে। যেমন-আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, টেক্সটাইল শিল্প মনিটরিং, লাইসেন্সিং, মার্কেট এক্সেস, রুলস অব অরিজিন, স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি সংক্রান্ত ট্যারিফ কনসেশন প্রভৃতি বিষয়ক কমিটি। তবে WTO-এর প্রধান প্রধান শর্তাবলি সম্পাদন করে থাকে মোটামুটি ৪টি কমিটি। এগুলো হলো :

১. মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন (Ministerial Conference)-এটি একটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্যমন্ত্রীগণ প্রতি দুই বছরে একবার মিলিত হন। এটি WTO- এর সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন এবং সার্বিক কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত।
২. সাধারণ সভা (General Council)-এটি জেনেভায় নিযুক্ত সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।
৩. বাণিজ্যনীতি পর্যালোচনা কমিটি (Review Committee on Trade Policy);
৪. বাণিজ্যসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি (Committee for dispute settlement)

৩.৯ বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ (Dispute Resolution)

বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি WTO-এর একটি অন্যতম প্রধান কাজ। যদি কোনো সদস্য দেশ মনে করে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার অধিকার লংঘিত হয়েছে, তাহলে সে WTO-এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারে। অভিযোগ পাওয়ার পর WTO-এর বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি স্বাধিন "প্যানেল অব এক্সপার্টস" নিয়োগ করে। উক্ত প্যানেল আপত্তির শুনানি ও WTO-এর বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে তাদের রায় প্রদান করে। রায়ের পর আইনের কোনো বিষয় উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্র আপিল করতে পারে। WTO-এর সকল সদস্য রাষ্ট্র মিলে তখন উক্ত আপত্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বা রায় দিয়ে থাকে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এরূপ ১৬৭টি আপত্তি WTO-এর গোচরে আনা হয়েছে। অথচ গ্যাট (GATT)-এর পুরো জীবনকালে (১৯৪৭-৯৮) মাত্র ৩০০টি এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল।

৩.১০ WTO-চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি (Important Treaties Related to WTO)

১. **সেবাসম্পর্কিত বাণিজ্য চুক্তি (General Agreement on Trade and Services (GATS)** : হাসপাতাল, ব্যাংক, বিমা, হোটেল, পর্যটন, বিমান, সিনেমা, টেলিভিশন, পরিবহন, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সার্ভিসিং সক্রান্ত বিষয় এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। চুক্তি অনুযায়ী এসব সেবা খাতে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তাছাড়া অবাধ বাণিজ্যের পাশাপাশি এসব খাতে বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করার কথাও চুক্তিতে বলা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহের চাপের মুখে অনেকটা বাধ্য হয়ে ১৯৯১ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহ এ চুক্তি মেনে নেয়।

২. **Trade Related Investment Measures (TRIM)** : এটি হচ্ছে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি চুক্তি। এর মূল শর্ত বা বিষয় হচ্ছে বহিঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানিগুলোকেও দেশীয় কোম্পানির মতো বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ দেশীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, বিদেশি কোম্পানিগুলোকেও একই সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। পূর্বে সরকার দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সীমিত আকারে লভ্যাংশ বিদেশে স্থানান্তর, দেশি লোকজনের কর্মসংস্থানের অধিকার সুযোগ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারত। কিন্তু TRIM কার্যকর হওয়ার পর থেকে সরকার আর তা করতে পারবে না।

৩. **Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)** : এটি হচ্ছে বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ববিষয়ক একটি আইন। কপিরাইট, ট্রেড মার্ক ও প্যাটেন্ট-এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এ চুক্তি অনুযায়ী কপিরাইট, ট্রেড মার্ক ও প্যাটেন্ট মালিকানাতে নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে নতুন আবিষ্কারসমূহ ২০ বছর ধরে, কৃতিস্বত্ব পাবে অর্থাৎ এ দীর্ঘ সময় ধরে আবিষ্কারের নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে তার একচ্ছত্র দখলদারিত্ব বজায় রাখতে পারবে। TRIPS চুক্তি অনুযায়ী কপিরাইট চুরি করা কিংবা ফিল্ম নকল করা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৩.১১ WTO-এর মন্ত্রী সম্মেলন (Ministerial Conference)

এ পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ে চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হলো :

১. **সিঙ্গাপুর সম্মেলন** : ১৯৯৬ সালের ৯-১৩ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে WTO-এর কার্যক্রম জোরদার করা এবং বাণিজ্য উদারিকরণের জন্য ইতোপূর্বে গৃহীত নীতিমালার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সম্মেলন শেষে ২২টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ও ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সিঙ্গাপুর ঘোষণা গৃহীত হয়। উক্ত সভার প্রধান অর্জন ছিল একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ কর্মপরিকল্পনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাজারে সহজ প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা সমীকরণসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

২. **দ্বিতীয় মন্ত্রী পরিষদ সম্মেলন বা জেনেভা সম্মেলন** : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১৯৯৮ সালের ১৮-২০ মে। এ সম্মেলনেও বাণিজ্য ব্যবস্থার উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের ওপর জোর দেওয়া হলেও উন্নত দেশগুলোর সাথে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ব্যাপক সম্পর্ক দেখা দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্যের উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের জন্য WTO প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য

উন্নত বিশ্বের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। তাদের প্রতিনিধিদের বক্তব্য ছিল, মুক্তবাজার অর্থনীতির স্কুলে উন্নত বিশ্বের পণ্য তাদের দেশে অবাধে প্রবেশ করলেও উন্নত বিশ্বের বিনিয়োগ ও আমদানি বাড়ছে না। ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা WTO-পূর্ব অবস্থার চেয়ে খারাপ হচ্ছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোকে আরো বাণিজ্য উদারিকরণ ও ভর্তুকি প্রদানের ওপর জোর দেয়। এ সম্মেলনের ফলাফল ও খুব একটা ইতিবাচক ছিল না।

৩. **তৃতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন বা সিয়াটল সম্মেলন** : ১৯৯৯ সালের ৩০ শে নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটলে WTO-এর মন্ত্রী পর্যায়ের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত তথা ঘোষণাপত্র ছাড়াই বিশৃঙ্খলার মধ্যে উক্ত সম্মেলন শেষ হয়। এটি নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। একদিকে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সম্মেলনের ভেতরে প্রতিনিধিদের মধ্যে মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দেয়, অন্যদিকে সম্মেলন কক্ষের বাইরে সম্মেলন বিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাপক বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ফলে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করাসহ সিয়াটল শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।

৪. **মন্ত্রী পর্যায়ের চতুর্থ সম্মেলন বা দোহা সম্মেলন** : ২০০১ সালের ৯-১৩ নভেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের সিয়াটল ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকেই এবার দোহাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ১৪২টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা একত্র হয়েছিল এ সম্মেলনে। কোনো রকম জোড়াতালি দিয়ে আলোচনার পরবর্তী রাউন্ড শুরুর ঘোষণা করে সম্মেলন শেষ হয়। এবারের ঘোষণায় বলা হয়, আগামী মন্ত্রী সম্মেলনে চারটি বিষয়ে আলোচনা হবে। এগুলো হলো : বাণিজ্য সহায়ক পদ্ধতি (Trade Facilitation), সরকারি সংগ্রহ (Government Procurement), বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতার নীতি। বাণিজ্য সহায়ক পদ্ধতি বলতে বোঝানো হয়েছে যে, শুল্ক আদায় ব্যবস্থা যেন অনাবশ্যকভাবে বাণিজ্যের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। আর সরকারি সংগ্রহ বলতে সরকারি ক্রয়কে বোঝানো হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে যেন স্বচ্ছতা থাকে তা সে জিনিস দেশি বা বিদেশি যার কাছ থেকেই ক্রয় করা হোক না কেন।

৫. **কানকুন সম্মেলন** : ২০০৩ সালের ১০-১৪ সেপ্টেম্বর মেক্সিকোর কানকুন নগরীতে ১৪ দেশের অংশগ্রহণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত হলেও প্রথম বারের মতো গরিব দেশগুলো এক সাথে এক আওয়াজে কথা হলে বিশ্বের ধনী দেশগুলোকে সতর্ক করে দেয়।

৬. **হংকং সম্মেলন** : ২০০৫ সালের ১৩-১৮ ডিসেম্বর হংকংয়ের হংকং সিটিতে ১৪৮টি দেশের অংশগ্রহণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ৩২টি স্বল্পোন্নত দেশে ২০০৮ সালের মধ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করে।

৭. **জেনেভা সম্মেলন** : ২০০৯ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মন্ত্রী পর্যায়ের সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ১৫৩টি সদস্য রাষ্ট্র ও ৫৬টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ও সংস্থার ৩ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দ্রুত দোহা রাউন্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকর এবং মেধাস্বত্ব আইন ও ইলেকট্রনিক কমার্স আপাতত কার্যকর না করার বিষয়ে একমত হবার মধ্য দিয়ে আলোচিত এ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। WTO-র সপ্তম সম্মেলনে ২০০১ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো ২০১০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের দাবি জোরদার হয়।

৮. **অষ্টম WTO সম্মেলন ২০১১** : অষ্টম WTO সম্মেলন ১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সালে জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রী পর্যায়ের এ বৈঠকে। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে

রাশিয়া, সামোয়া, মন্টিনিগ্রোকে WTO এর সদস্য করে নেয়া হয়। ২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশগুলো WTO-এর আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভ করে। উল্লেখ্য বিশ্বকে নতুন কোনো সম্ভবনা ও পথ নির্দেশ না দেখিয়েই জেনেভায় সমাপ্তি ঘটে WTO-এর মন্ত্রী পর্যায়ের এ বৈঠক। ১৯৯৩ সালে WTO-এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি দুই বছর অন্তর মন্ত্রী পর্যায়ের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১২ এক নজরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ পর্যন্ত ৮টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও এর তৃতীয় ও পঞ্চম সম্মেলন দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যর্থ হয়। WTO-এর সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যমন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। নিচে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ৫টি শীর্ষ সম্মেলনের স্থান, সাল, অংশগ্রহণকারী দেশ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসহ উল্লেখ করা হলো :

সম্মেলন	স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারী	দেশ গৃহীত সিদ্ধান্ত
প্রথম	সিঙ্গাপুর	১৯৯৬	১২৮	বাণিজ্য উদারীকরণ, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও বিনিয়োগ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি।
দ্বিতীয়	জেনেভা	১৯৯৮	১৩৫	মুক্ত বাণিজ্য বিকাশে সমন্বিত উদ্যোগ, ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা অপসারণ ও কোটা ব্যবস্থার অপসারণ।
তৃতীয়	সিয়াটল	১৯৯৯	১৩৫-	কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই সমাপ্ত হয়।
চতুর্থ	দোহা	২০০১	১৪৪	বাণিজ্য উদারীকরণ দোহা উন্নয়ন রাউণ্ড চালু, ঔষধ শিল্পের কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত হয়।
পঞ্চম	কানকুন	২০০৩	১৪৬	ব্যর্থ সম্মেলন। কোনো সিদ্ধন্ত নেই।
ষষ্ঠ	হংকং সিটি	২০০৫	১৪৮	৩২টি স্বল্পোন্নত দেশে ২০০৮ সালে মধ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা।
সপ্তম	জেনেভা	২০০৯	১৫৩	২০১০ সালের মধ্যে দোহা রাউণ্ডের ঘোষণা কার্যকর করা, মেধাস্বত্ব আইন ও ই-বাণিজ্যে ২০১১ সাল পর্যন্ত শুল্ক আরোপ স্থগিত করা।
অষ্টম	জেনেভা	২০১১	১৫৭	বিশ্বকে নতুন কোন সম্ভাবনা ও পথনির্দেশ না দেখিয়েই জেনেভায় সমাপ্তি ঘটে।
নবম	বালি	৩-৭ ডিসেম্বর ২০১৩		-

৩.১৩ WTO and Least Developed Countries (LDCs) :

বর্তমানে বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা ৪৯ এবং তাদের জনসংখ্যা প্রায় ৬০০ মিলিয়নের বেশি। এ দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কারণে বহু সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অসাম্য, উৎপাদন খাতের অসন্তোষজনক পারফরমেন্স, বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস, অপর্যাপ্ত ফসলি উন্নয়ন সাহায্য, বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিকূল শর্তাবলি, সরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস, ঋণ পরিশোধের স্থায়ী সমস্যা, পুনঃপুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বেসামরিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদ। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশ্ব বাণিজ্যে অবদান প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। ৮০-র দশকের তুলনায় ৯০-র দশকের প্রথম দিকে বিশ্ব রপ্তানি ও আমদানিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবদান যথাক্রমে ৫০% ও ৩৩% হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া

এ সময়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জিডিপি ও রপ্তানির অনুপাত ১৭% থেকে কমে ১৪% এ দাঁড়িয়েছে। এসব কারণে উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনায় এসব দেশগুলোর উদ্বেগ ছিল সর্বাধিক। ফলে উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার LDC- গুলোর জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়। এগুলো হলো :

১. LDC বেলায় উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তিসমূহ নমনীয় ও সমার্থকভাবে প্রয়োগ করা।
২. এন্টি ডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা প্রদান।
৩. তাদের রপ্তানি খাতের বহুমুখিতা আনয়নে ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অধিকতর টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান।
৪. স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানি প্রবিধানসমূহে প্রয়োগের ক্ষেত্রে LDCs-কে ৫ বছরের অবকাশ প্রদান।
৫. LDCs কে TRIPS চুক্তি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থেকে ১০ বছরের জন্য মুক্তি দেওয়া।
৬. টেক্সটাইল সেক্টরে দশ বছরের জন্য মাল্টিফাইবার এগ্রিমেন্ট-এর বাধ্যবাধকতা থেকে অবকাশ প্রদান
৭. এসব দেশসমূহের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৮. এসব দেশসমূহের WTO সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে সাহায্য করা।
৯. কতিপয় বাধ্যবাধকতা থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি প্রদান।

উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিধান রাখা হলেও দেশগুলো এসব সুযোগ গ্রহণ করার মতো ভালো অবস্থায় নেই। উরুগুয়ে রাউন্ড এগ্রিমেন্টের থেকে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধাগুলো পরোক্ষ এবং বাস্ত বায়নের অনেক সময় প্রয়োজন। অন্যদিকে, এসব চুক্তি থেকে উদ্ভূত ব্যয়ের বিষয়টি তাৎক্ষণিক এবং উল্লেখযোগ্য। এর কারণ হিসেবে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায় :

ক. অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্যের অবলুপ্তি। অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে সকল দেশ সমান সুযোগ পাবে এবং কোনো দেশই বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর পূর্বের ন্যায় অগ্রাধিকার পাবেনা।
খ. খাদ্যদ্রব্যসহ ওষুধ ও অত্যাবশ্যকীয় মূলধন সামগ্রীর উচ্চ আমদানি মূল্য।
গ. রপ্তানি বাণিজ্য গুটিকয় পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।
ঘ. উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি।

আঙ্কটাড (UNCTAD)-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির ফলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বছরে ৩০০ মিলিয়ন থেকে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা তাদের বার্ষিক রপ্তানি-আয়ের ৩-৫% হারাবে। প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক ও ট্রপিক্যাল পণ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান-এ তিন দেশের বাজারে GSP মার্জিসে তাদের মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০-৬০ শতাংশ। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে যা LDCs-কে আরো অধিক অসুবিধায় ফেলবে।

৩.১৪ WTO ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেরও রয়েছে আন্ত র্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা। ডব্লিউটিও-এর ১২৪তম সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ সালে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ। চুক্তিতে স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ তার স্থানীয় বাজার পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য এবং WB ও IMF-এর চাপে পড়ে ইতিমধ্যেই অনেকখানি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তিতে স্বাক্ষরের ফলে বিশ্বের প্রতিটি দেশই তার নিজ দেশের বাজারকে অন্যের সকল দেশের জন্য উন্মুক্ত

করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশই এখন পর্যন্ত তাদের সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করে নি। এমনকি যেসব পণ্যের জন্য বাজার খুলে দিয়েছে সেসব পণ্যের ক্ষেত্রেও আমদানি শুল্ক সক্ষম হচ্ছে। অথচ শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম অনগ্রসরদের তালিকায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর চাপে ডব্লিউটিও-এর শর্তবিলি বাংলাদেশকে পূরণ করতে হচ্ছে উন্মুক্তকরণে ক্ষেত্রে অগ্রসরদের তালিকায় থেকে। বিষয়টি কেবল দুর্ভাগ্যজনকই নয়, ন্যায়বিচারেরও পরিপন্থী। যাহোক, ডব্লিউটিও- এর সদস্য হওয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষ ও বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ অভিমত পোষণ করেছেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। বাংলাদেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প। ২০০৫ সাল নাগাদ মাল্টিফাইবার এগ্রিমেন্ট (MFA) বাস্তবায়িত হওয়ায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে তাদের রপ্তানি কোটা হারায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে অনেক গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বেকার সমস্যা বাড়বে এবং দেশ তার বৈদেশিক মুদ্রা হারিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থায় পড়তে পারে।

২. উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ৮ বছর পর থেকে (স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে) শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভর্তুকি দিতে পারবেনা। ফলে যেসব দেশ অন্যদিকে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকি সুবিধা না থাকায় রপ্তানি আরো হ্রাস পাবে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ এবং তার রপ্তানি শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সেহেতু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৩. উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির ফলে কৃষিতে ভর্তুকি দেয়া যাবে না। ফলে বাংলাদেশের মতে, কৃষিনির্ভর দেশে সার, বীজসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং ফলশ্রুতিতে মোট উৎপাদন হ্রাস পাবে। তখন বাংলাদেশকে উচ্চমূল্যে বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হবে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. সেবা সম্পর্কিত বাণিজ্য চুক্তি (GATS) ও বাংলাদেশ উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত GATS চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দেশের সেবা খাত যথা ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, টেলিকমিউনিকেশন, যোগাযোগ, হোটেল ইত্যাদি এখন বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীর কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ফলে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীরা এসব খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করবে এবং পরিসেবায় অন্তর্ভুক্ত খাতগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

৫. বাণিজ্যসম্পর্কিত মেধাস্বত্ব (TRIPS) ও বাংলাদেশ এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে কপিরাইট, ট্রেড মার্ক ও পেটেন্ট মালিকানাতে নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো এতকাল যাবৎ নিজস্ব পেটেন্ট আইনের আওতায় উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছিল। এ সুযোগ এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেয়া হয়েছে। এখন বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোকে মোটা অংকের বিনিময়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো থেকে উন্নত প্রযুক্তি কিনতে হবে। এমতাবস্থায় আমাদের ঔষুধশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসহ বহু শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. বাণিজ্যসম্পর্কিত বিনিয়োগ ব্যবস্থা (TRIM) ও বাংলাদেশ এ চুক্তির ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলো দেশীয় কোম্পানিগুলোর মতো অবাধে আমদানি রপ্তানি করার সুযোগ পাবে। বিদেশি কোম্পানিগুলোর রয়েছে উন্নত প্রযুক্তি ও বিশাল মূলধন। এ কারণে দেশীয় কোম্পানিগুলো তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় মার খাবে ও অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ যাবে। ফলে অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মূল্যায়ন(Evaluation)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য উদারিকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য ছিল, এর ফলে বিশ্বের বছরে বিশ হাজার কোটি ডলারের নতুন বাণিজ্য সৃষ্টি হবে এবং বাণিজ্য বাড়বে ৭০ হাজার কোটি ডলারের নতুন বাণিজ্য সৃষ্টি হবে এবং বাণিজ্য বাড়বে ৭০ হাজার কোটি ডলারের। WTO-এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ব বাণিজ্য বেড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ কতটুকু লাভবান হয়েছে তা-ই দেখার বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এসব দেশ এ বিশাল বাণিজ্য বৃদ্ধি থেকে তেমন লাভবান হয় নি। এসব দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে যে কারিগরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, তার বাস্তবায়ন হয় নি। ফলে বাড়ে নি তাদের উৎপাদন বা রপ্তানি। বরং কৃষি, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা, মেধাস্বত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যেসব চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলো এসব দেশকে আরো সমস্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঠিক এ মুহূর্তে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও মাল্টিফাইবার এগ্রিমেন্ট (MFA), TRIPS, TRIM, GATS ইত্যাদি বাস্তবায়ন শুরু হলে তার প্রতিকূল প্রভাব যে এসব দেশের ওপর পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শিল্পোন্নত দেশগুলো গরিব দেশসমূহকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য না করে বরং তাদের বাজার উন্মুক্তকরণের জন্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। বিশ্বায়নের ফলে তাই ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান না কমিয়ে বরং একে বাড়িয়ে দিয়েছে। দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি ধনী দেশগুলোর বৈষম্যনীতির প্রভাবে WTO-র তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রী পর্যায়ের এ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে WTO আগামীতে আরেকটি Rich men's cluli-এ পরিণত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.১৫ WTO ও তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ

LDC হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশ। ভয়াবহ দারিদ্র্য, দুর্বল অর্থনীতি, অনুন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং মানবসম্পদের অপ্রতুলতা তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ চিত্র হিসেবে বিবেচিত ১৯৭১ সালে যখন প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের ধারণা স্বীকার করা হয় তখন এর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪; বর্তমানে এর সংখ্যা ৪৯। ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশের প্রত্যেকেই GATT এর উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফলে তারা চুক্তি অনুযায়ী উদারিকরণের প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উপকার লাভের সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। WTO পরবর্তী বিশ্ব সংস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য খুবই কষ্টকর।

WTO বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা হলো-

১. **অসম প্রতিযোগিতা :** অবধা বাণিজ্য এবং অবাধ বাজার সকলের জন্যই উপযোগী এমন কথা সাহায্যে প্রচার করে বেড়ায় WTO। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। WTO এর উদার রাজনীতির ফলে দরিদ্র দেশগুলো শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় বিদেশি বাজারে টিকে থাকা বেশ কঠিন। এ জন্য বিদেশী বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য উদারিকরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পণ্যসামগ্রীর প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। এভাবে শক্তিশালী অর্থনীতির সাথে দুর্বল অর্থনীতির মধ্যকার প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বল পক্ষ অবধারিতভাবে পরাভূত হচ্ছে। এ অসম প্রতিযোগিতার ফলে নয়- এর দশকে ধনী দেশগুলোর সাথে দরিদ্র দেশগুলোর জীবন মান ও সমৃদ্ধির ব্যবধান আরো বেড়েছে। এমনকি UNCTAD- এর Trade and development report (1999)-এ বলা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলার প্রবৃদ্ধির হার ৭০-এর দশকের চেয়েও কম হয়েছে ৯০-এর দশকে। যেখানে WTO এর কাজ হচ্ছে দেশে দেশে বাণিজ্য সংঘাত মেটানো তাদের প্রণয়নকৃত নীতির ফলে এর সংঘাত উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মতামত অগ্রাহ্য :** WTO সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত মুক্ত আলোচনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশের সুবিধা সংরক্ষণ ও মতামত বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে আসছে। WTO-তে কানাডা, USA, জাপান, EU- এর মতামত লক্ষ্য করা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এসব দেশের গ্রিনরুমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতামত উপেক্ষিত। সিয়াটল বৈঠকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ WTO-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে যে, WTO কর্তৃক প্রণয়নকৃত নীতি তৃতীয় বিশ্বের মৌলিক অধিকারই কেবল হরণ করছে না বরং সার্বভৌমত্বেও হস্তক্ষেপ করছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক- কোনো ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত বা নীতি নির্ধারণের অধিকার থাকছে না এসব দেশের।

৩. **পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ :** এর প্রথম দুটি সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির কোনো বাস্তবায়ন হয় নি। মৌলিক দৃষ্টি না দিয়ে WTO গতানুগতিকভাবে সিয়াটল বৈঠক অগ্রসর হয়। তাই উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, যা সিয়াটল সম্মেলনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪. **অবাধ গতিশীল শ্রমনতি :** WTO মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত মূলধন বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রণহীন কারেন্সি ইত্যাদি প্রলোভন দেখাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। কিন্তু অবাধে শ্রমিক যাতায়াতের কথা বলছে না। তাই WTO তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

৫. **অপরাধের সুযোগ বৃদ্ধি :** WTO-এর বিশ্বায়নের ফলে অপরাধের দ্রুত বিশ্বায়ন ঘটেছে। UNDP এর ১৯৯৯ সালের এক রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়, বিশ্বায়ন অপরাধের বহু সুযোগগুলো দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে বেআইনি মাদক ব্যবসা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি ডলারের। এ পরিমাণ অর্থ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৮ শতাংশ, যা লোহা ও ইস্পাত বা মোটর গাড়ির ব্যবসায় অর্থের চেয়েও বেশি। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সিয়াটল সম্মেলনের পর WTO চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

৬. **পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী :** WTO-এর বিরুদ্ধে অপর চ্যালেঞ্জ হলো এর বাণিজ্য নীতি পরিবেশের ওপর বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরিবেশবাদী গ্রিনপিসের অভিযোগ ছিল WTO গাছ কেটে বনাঞ্চল উজাড় করতে সাহায্য করছে, টিম্বার কোম্পানিকে বাণিজ্যের নামে সামুদ্রিক কচ্ছপ নিধনে সাহায্য করছে। তাই বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো তাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য উন্নত বিশ্বকে দায়ী করে এ বিষয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবি তোলে।

৭. **কৃষি ভর্তুকি প্রশ্ন ও বিনিয়োগসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ :** ধনী দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ধনী দেশগুলো কৃষিতে অধিক হারে ভর্তুকি প্রদান করছে। অথচ দরিদ্র দেশগুলোকে ভর্তুকি দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। কৃষি ভর্তুকি নিয়ে ধনী-দরিদ্র মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় WTO বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতেও WTO সমঝোতায় আসতে পারে নি, যা WTO-কে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে।

৮. **অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতা ও বাজার দখল :** WTO তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অনেক অঙ্গীকার করেছে কিন্তু এ অঙ্গীকারের কোনোটিও তারা পালন করতে পারে নি। অন্যদিকে WTO বিশ্বায়নের নামে যে উন্মুক্ত বাণিজ্য তৈরি করেছে, তা দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল করে নিয়েছে, ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৯. **উন্নয়নশীল দেশের দাবি শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা :** WTO গঠনের পর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো কিছু দাবি করে আসছিল। যেমন- শ্রমের অবাধ যাতায়াত এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি। কিছু উন্নয়নশীল দেশের কোনো দাবি আজও গ্রহণ করা হয়

নি। LDC দেশগুলোর পাশ থেকে কানকুন সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সব ধরনের পণ্যে শুল্ক কোটামুক্ত সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হচ্ছিল। কিন্তু এর প্রতি কোনো কর্ণপাতই করা হয় নি।

১০. **মেধা পাচার :** WTO বিশ্বায়নকে আরো গতিশীল করেছে। এর ফলে মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে উন্নত দেশগুলোতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনুন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা WTO সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

১১. **বৈষম্যমূলক চুক্তি :** WTO এর আওতায় যে TRIPS চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাও ধনী দেশসমূহের পক্ষে পক্ষপাতমূলক। এ চুক্তি দরিদ্র্যের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই রাখে নি। TRIPS এর আওতায় প্যাটেন্ট করা দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী অহেতুক অতিমাত্রায় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, তাও সম্পূর্ণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ভোক্তাদের প্রতিকূল।

১২. **কঠোর নীতি ও সিদ্ধান্তহীনতা :** WTO ধনী-দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক মতবিরোধের অবসান ঘটাতে পারে নি। উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে বাজার উন্মুক্ত করার কথা বললেও তাদের বাজার উন্মুক্ত করে না। অন্যদিকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সম্মেলনগুলোতে WTO সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে নি।

১৩. **অর্থ ও সম্পদ পাচার :** WTO এর ফলে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে নিজ দেশে পাচার করে। ফলে অনুন্নত দেশগুলো সম্পদ ও অর্থ সবই হারাচ্ছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

উপর্যুক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, WTO তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষন করার হাতিয়ার মাত্র। WTO এর নেতৃত্ব দানকারী দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর টিকে থাকা খুবই কঠিন। WTO হচ্ছে উন্নত দেশ কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে শোষন করার একটি আইনানুগ বৈধ প্রতিষ্ঠান। কাজেই বলা যায়, WTO তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **`GATT' এর পূর্ণরূপ কি?**
উত্তর: General Agreements on Tariffs and Trade.

২. **কখন ২৩টি দেশের মধ্যে `GATT' চুক্তি স্বাক্ষতির হয়?**
উত্তর: ১৯৪৭ সালে

৩. **কখন হতে WTO এর কার্যক্রম শুরু হয়?**
উত্তর: ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫

৪. **WTO এর সদর দপ্তর কোথায়?**
উত্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

৫. ১ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে GATT এর প্রথম বৈঠক কোথায় বসে?
উত্তর: জেনভা, সুইজারল্যান্ড

৬. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য WTO এর সদস্য নয়?
উত্তর: রাশিয়া

৭. কখন, কোথায় WTO এর সদস্য হিসেবে রাউন্ড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ?
উত্তর: ১৯৯৪ সালে, উরুগুয়ে

৮. GATT এর উত্তরসরী সংস্থা কোনটি?
উত্তর: WTO

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) `GATT' এর পূর্ণরূপ কি?
(খ) কখন ২৩টি দেশের মধ্যে `GATT' চুক্তি স্বাক্ষতির হয়?

২. (ক) কখন হতে WTO এর কার্যক্রম শুরু হয়?
(খ) WTO এর সদর দপ্তর কোথায়?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উৎপত্তি, বিকাশ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করুন। দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। অথবা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)-এর পটভূমি ও কার্যসম্পাদন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

২. WTO Ministerial conference কত দিন পরপর হয়? ২০১৩ সালের কোথায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে?

৩. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন।

৫. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে কী বোঝেন? বাংলাদেশ এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৬. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৭. বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন?

৮. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পটভূমি ও কার্যসম্পাদনের সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

http://thejobstudy.com Go to Contents

অধ্যায় 8

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা- সার্ক

South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৪.১ ভূমিকা
৪.২ সার্ক গঠনের পটভূমি
৪.৪ সার্কের নীতিমালা
৪.৫ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা
৪.৬ সার্কের সফলতা ও ব্যর্থতা
৪.৭ সার্কের ব্যর্থতা
৪.৮ সার্ক-এর দুর্বলতা ও মূল্যায়ন
৪.৯ সার্কের ভবিষ্যৎ
৪.১০ সাপটা ও সাফটা সম্পর্কে আলোচনা
৪.৪ দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবস্থা (SAPTA)
৪.১২ সাফটা (SAFTA)
৪.১৩ সাপটা ও সাফটার মধ্যে তফাৎ
৪.১৪ সাপটা চুক্তির বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো ১৯৮০'র দশকে সার্ক (SAARC) অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) গঠিত হয়। সরকারি নাম হলো: আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশিয়া সমিতি বা সার্ক। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ সার্কের সনদে স্বাক্ষর করেন। যে সমস্ত দেশকে নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছে তারা হলো ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ। পরবর্তীতে অবশ্য আফগানিস্তানকে সার্কের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ায় বর্তমানে সার্কের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮-এ। এ ৮টি দেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিশেষ অঞ্চলে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এদের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে এরা সবাই কম-বেশি অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই সার্ক গঠন করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক জোরদার ও উন্নয়নকে সন্নিহিত করার নিমিত্তে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্লাটফর্ম হিসেবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

SAARC

৪.২ সার্ক গঠনের পটভূমি (History of Organizing SAARC)

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি (বর্তমানে ৮টি) দেশের সমন্বয়ে গঠিত সহযোগিতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সন্দেহ ও সংশয় দূর করে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতেই সার্কের গঠনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫০-৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হয় প্রায় ৬% হারে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় একই সময়ে বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ৪% হারে। এ প্রেক্ষাপটে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সার্ক গঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন ১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লিখে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। চিঠিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগিতা কাঠামো; যেমন- ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC), ল্যাটিন আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশন (লাফটা), আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC), এসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN)- এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করা এবং এ লক্ষ্যে একটি

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে সার্ক

১৯৮০ → প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সার্কের প্রস্তাব।
↓
১৯৮১ → শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে সাত দেশের প্রতিনিধিগণের বৈঠক।
↓
১৯৮২ → ইসলামাবাদে বৈঠক।
↓
১৯৮৩ → ঢাকায় সাত দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের ১ বৈঠক।
২ আগস্ট, ১৯৮৩ → নয়াদিল্লীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের চুক্তি স্বাক্ষর এবং আনুষ্ঠানিক সার্কের জন্ম।
↓
(৭-৮) ডিসেম্বর ,১৯৮৫ → ঢাকায় সার্কের ১ম শীর্ষ সম্মেলন।
↓
৮ ডিসেম্বর ,১৯৮৫ → সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।
↓
১৬ জানুয়ারি, ১৯৮৫ → সার্ক সচিবালয় কাঠমুন্ডুতে ↓ স্থাপিত।
২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ → কলম্বোতে ৬ষ্ঠ ↓ শীর্ষসম্মেলনে সাপটা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।
১১ এপ্রিল, ১৯৯৩ → ঢাকায় ৭ম শীর্ষ সম্মেলনে ↓ সাপটা অনুমোদিত।
৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ → সাপটা চুক্তি কার্যকর হয়
↓
৬ জানুয়ারি, ২০০৪ → ইসলামাবাদে দ্বাদশ শিখ ↓ সম্মেলনে সাফটা চুক্তির স্বাক্ষর
১ জুলাই, ২০০৬ → সাফটা কার্যকর হয়।
↓
১৫ মার্চ, ২০০৭ → সার্কের কার র‍্যালি ↓ কক্সবাজার হতে উদ্বোধন।
২৩-২৫ মার্চ, ২০০৭ → সার্ক নাগরিক শীর্ষ ↓ সম্মেলন।
২০০৭ → মহাশ্বেতা দেবী সার্ক দেবক।
↓
২৮ এপ্রিল, ২০১০→ সার্ক ডেভেলপমেন্ট ↓ ফান্ড (SDF) যাত্রা শুরু করে।
১০ নভেম্বর, ২০১১→ মালদ্বীপে সপ্তদশ সার্ক শীর্ষ ↓ সম্মেলন হয়।
১ মার্চ, ২০১৪→ অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল) ↓ বর্তমান দ্বাদশ মহাসচিব হিসাবে নিয়োগ।
২০১৬ সালে → পাকিস্তানে নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এর সাথে তিনি কয়েকটি সহযোগিতার বিষয়ও তুলে ধরেন। যেমন- আবহবিদ্যা, টেলিযোগাযোগ, যাতায়াত, শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যা, কৃষি যৌথ উদ্যোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, জাহাজ চলাচল, নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার ইত্যাদি। তাঁর এ প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্য ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে একটি সংস্থা গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে যৌথ বা একীভূত কর্মসূচী নামে একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে ৯টি সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই সার্কের জন্ম হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে চলতে থাকা উপনিবেশ-উত্তর রাজনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতায়, অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও জাতিভেদ হিংসা দক্ষিণ এশিয়ায় যে সার্বিক পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী ছিল তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ও একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার জরুরি প্রয়োজন ছিল। এতদঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় ৭টি দেশের সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তৃক সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থার জন্ম হয়।



প্রতিষ্ঠাকালীন সার্ক এর সদস্যবৃন্দ

৪.৩ সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Aims and Objectives of SAARC)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শক্ষা, বিজ্ঞান,কারিগরি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদান ও যোগাযোগ সহজ করাই ছিল সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক শাসনের দায় থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। কারণ সেই সমস্ত সাহায্যের পেছনে থাকে নানা ধরনের শর্ত। এ শর্তগুলো সাহায্যের কার্যকারিতাকে বহুলাংশে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই বহুদেশ সাহায্য গ্রহণে বিশেষভাবে আগ্রহী নয়। অথচ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে যদি বাড়িয়ে তোলা যায় তাহলে সেই সহযোগিতা

অনেকটা বিদেশি সাহায্যের বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে সার্কের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।

সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হলো :

প্রথমত : দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা ও জীবনযাত্রারমান উন্নীতকরণ।

দ্বিতীয়ত : এ অঞ্চলের জনগণের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে।

তৃতীয়ত : সার্কের লক্ষ্য হলো এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যৌথ আত্মবিশ্বাস (Collective self-reliance) গড়ে তুলতে সাহায্য করা। একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এ যৌথ আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়। আত্মবিশ্বাস গড়ে না উঠলে বিদেশি আগ্রাসন ও নয়া উপনিবেশবাদের অগ্রগমন রোধ করা যাবে না।

চতুর্থত : পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন ও সমস্যা উপলব্ধি করা সার্কের অন্য একটা উদ্দেশ্য।

পঞ্চমত : অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যকে উদ্দীপিত করা।

ষষ্ঠত : বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

সপ্তমত : যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ করে না রেখে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর দেওয়া।

অষ্টমত : অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত অপরাপর আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সংগে সহযোগিতা করে চলা।

এছাড়া ঢাকা শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত সার্ক সনদে সংস্থার নিম্নোক্ত লক্ষ্য ঘোষণা করা হয় :

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান।
৩. দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য দান।
৪. একে অপরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতায় সাহায্য দান।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা দান।
৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
৭. আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার বিকাশ।
৮ এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা।

৪.৪ সার্কের নীতিমালা (Principles of SAARC)

সার্ক এর সনদের ২নং ধারায় সংকলিত নীতিসমূহে কয়েকটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়; যথা-

প্রথমত : সার্কের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হবে সার্বভৌম সাম্য (Sovereign equality) নীতির ওপর। অর্থাৎ সার্ক স্বীকার করছে যে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য টানা হবে না, প্রত্যেকেই সার্বভৌম এবং এ ব্যাপারে সমতাকে মেনে নিতে হবে। কেউ প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পাবে না।

দ্বিতীয়ত : প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

তৃতীয়ত : প্রতিটি রাষ্ট্র এমন আচরণ করবে যাতে অন্য রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং উপকৃত হয়। অর্থাৎ অন্যের ক্ষতিসাধন করা সার্কের নীতি হতে পারবে না।

চতুর্থত : সার্কের সমস্ত সদস্যের মধ্যে যেমন সহযোগিতা চলবে, তেমনি একই সঙ্গে চলবে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় সহযোগিতা। অর্থাৎ সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

সার্কের নীতি অনুসারে এই সংস্থাভুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো শিল্পায়নসহ দ্রুত আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে পশ্চিমা শক্তিগুলোর মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে :

১. সার্ক শীর্ষ সম্মেলন
২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন
৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪. প্রোগ্রামিং কমিটি
৫. টেকনিক্যাল কমিটি
৬. ওয়ার্কিং গ্রুপস ও
৭. সচিবালয়।

সার্ক সদস্যদেশগুলোর রাষ্ট্র/সরকারপ্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষ সম্মেলন সংস্থার সর্বোচ্চ ও একমাত্র নীতিনির্ধারণী সংস্থা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন নীতিমালা তৈরি, অগ্রগতির পর্যালোচনা, নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্যদেশগুলোর পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত। এ কমিটির দায়িত্ব হলো বিভিন্ন কর্মসূচি সার্বিক মনিটরিং ও সমন্বয় সাধন করা, বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, তাদের অর্থ জোগানের মোরালিটি নির্ধারণ, বিভিন্ন কর্মসূচি প্রাধিকার নির্ধারণসহ নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ। টেকনিক্যাল কমিটি তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমানে ৭টি টেকনিক্যাল কমিটি রয়েছে। আর ওয়ার্কিং গ্রুপের দায়িত্ব হলো বিশেষ ইস্যু বিবেচনা করে সুপারিশমালা তৈরি ও সংশ্লিষ্ট সার্ক বডিতে পেশ করা।

সার্ক সচিবালয়ের কাজ হলো সার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম মনিটরিং ও বাস্তবায়ন করা ও সংস্থার বিভিন্ন সভায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং সার্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। সার্ক সচিবালয় নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। এটি একজন সেক্রেটারি জেনারেল, ৭জন পরিচালক ও প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে গঠিত। সার্ক মহাসচিব ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী সদস্যদেশগুলো থেকে মনোনয়নের মাধ্যম তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র : সার্ক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হলো : ১. কৃষি; ২. স্বাস্থ্য ও জনসেবা; ৩. ডাক ও টেলিযোগাযোগ; ৪. মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধ; ৫. আবহাওয়া; ৬. পল্লি উন্নয়ন; ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া; ৯. যাতায়াত ও পরিবহন; ১০. নারী উন্নয়ন; ১১. পর্যটন; ১২. পরিবেশ ও বন; ১৩. দারিদ্র্য বিমোচন; ১৪. সার্ক অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামের বিনিময়; ১৫. মহিলা ও শিশু।

এছাড়া সার্কের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এগুলো হলো : ১. সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র; ২. সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র; ৩. সার্ক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র; ৪. সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র; ৫. সার্ক টিউবার কিউলোসিস কেন্দ্র। এছাড়া আরো তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো হলো :

১. সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্যান্ডি, শ্রীলংকা।
২. সার্ক উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, মালদ্বীপ।
৩. সার্ক তথ্যকেন্দ্র, নেপাল।

৪.৫ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা (Role of SAARC in Bring Peace and Prosperity)

দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। সার্ক তার লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি সত্যি কিন্তু তাই বলে এ সংস্থার অর্জনও একেবারে কম নয়। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ভুল বোঝাবুঝি ও বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে তবেই সার্ককে সামনে এগোতে হয়েছে, যা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থাকে মোকাবিলা করতে হয় নি। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্ক যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যা এতদঞ্চলের অরাজনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

২. সার্ক তার People-to-people contact বৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে এতদঞ্চলের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে পর্যটক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসার ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরকে জানার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠেছিল, তা দূরীভূত হতে শুরু করেছে–যা এ অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

৩. সার্কের সুবাদে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম, আবহাওয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উন্নয়নে নারী, মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধ প্রভৃতি। তাছাড়া সার্ক ফেলোশিপের আওতায় প্রতিবছর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্কের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থী বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পর লাভবান হচ্ছে।

সার্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন সার্কের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক। যদিও সার্ক চার্টারে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাকে সার্কের আলোচ্যসূচির বাইরে রাখা হয়েছে, তথাপি সার্ক সম্মেলন চলাকালীন সময়ে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে কোনো বাধা নেই। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ১২শ শীর্ষ সম্মেলনের সময় ইসলামাবাদ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে জমাট বাঁধা বরফ যেন হঠাৎই গলতে শুরু করে। উক্ত বৈঠককে ভিত্তি করে দুদেশের সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে দুদেশ প্রথমবারের মতো জম্মু ও কাশ্মির নিয়ে আলোচনা করতেও রাজি হয়। আর এর প্রভাব পড়েছে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ওপরও। ১২শ সার্ক সম্মেলনে সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াও সন্ত্রাসবিরোধী সার্ক কনভেনশন ও একটি 'সোশ্যাল চার্টার, স্বাক্ষরিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলনকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলনকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়। সার্কের ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে সফল শীর্ষ সম্মেলন।

এছাড়া ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তামিল সমস্যা এবং ইসলামাবাদে চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনের উপলক্ষ ছাড়া হয়তো দুদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বৈঠক সম্ভব হতো না। ফলে এসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যেত।

শীর্ষ সম্মেলন ছাড়াও প্রতিবছর সার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, তথ্যমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, পর্যটনবিষয়ক মন্ত্রী, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এসব সম্মেলন পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

অবৈধ মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধের লক্ষ্যে সার্ক সদস্যদেশগুলো বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। এসবের মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর জনগণের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও এসবের সরবরাহ ও পাচার রোধে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সার্ক ফুড সিকিউরিটি সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি 'খাদ্যনিরাপত্তা মজুদ' গড়ে তোলা হয়েছে। এর সুফল ইতোমধ্যেই সদস্যদেশগুলোর জনগণ পেতে শুরু করেছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে

অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে "South Asian Development Found (SADF)" গঠন করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশের বেশি লোকবাস করলেও দেশগুলোর মধ্যে আন্ত-বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই নগণ্য। তাই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা (SAPTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এর আওতায় সদস্যদেশগুলোকে বিভিন্ন পণ্যের ওপর ট্যারিফ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আন্ত-সার্ক বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়। SAPTA চুক্তির রেশ ধরে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ১২শ শীর্ষ সম্মেলনে South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়ে। সাফটা চুক্তিটি ২০১৬ সালে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এটি সার্কের এক বিরাট সাফল্য। এ চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হলে সার্কের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য হ্রাস পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সার্কের রয়েছে বেশ কয়েকটি ইস্যুভিত্তিক আঞ্চলিক কেন্দ্র। তন্মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র ও সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, নয়াদিল্লি সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, কাঠমান্ডুতে সার্ক টিউবার কিউলোসিস কেন্দ্র ও সার্ক তথ্যকেন্দ্র, ইসলামাবাদে সার্ক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, শ্রীলংকায় সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও মালদ্বীপে সার্ক উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের একটি গভর্নিং বোর্ড রয়েছে। এসব আঞ্চলিক কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ আদান-প্রদান গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যদেশগুলো উপকৃত হচ্ছে।

সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র ছাড়াও আওতায় বছরব্যাপী শতাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব কর্মসূচি সদস্যদেশগুলো ভাগাভাগি করে (অভিজ্ঞতা অনুযায়ী) আয়োজন করে থাকে। এসব কর্মসূচি সদস্যদেশগুলোর বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, শিক্ষা, গবেষক, ব্যবসায়ীদেরে মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ করে দেয়। এটিও সার্কের কম অর্জন নয়। সার্কের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এভাবে এতদঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি আনয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সার্কের অবদান উল্লেখযোগ্য না হলেও বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক কর্মসূচির সামগ্রিক প্রভাব সার্কভুক্ত দেশগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও অবস্থান সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এতদঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সার্কের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিসীম।

৪.৬ সার্কের সফলতা ও ব্যর্থতা (Success & Failure of SAARC)

সার্ক দক্ষিণ এশিয়ায় তার লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারে নি। এর সহযোগিতা কেবল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মূল ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন) এখনও সার্ক তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে নি। অবশ্য SAPTA গঠন ও SAFTA গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সার্ক তার মূল ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। যদিও এর মাধ্যমে কার্যকর তেমন কিছু অগ্রগতি দেখা যায় না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সমঝোতা সৃষ্টিতে সার্কের চেনা তেমন প্রভাব ফেলে নি। অথচ আন্তর্জাতিক গবেষকদের মতে, যেকোনো আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য চারটি রাজনৈতিক পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। যথা :

১. বাইরের বা ভিতরের যেকোনো হুমকি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ

এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জোটভুক্ত দেশসমূহকে অভিন্ন ও যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

২. জোটভুক্ত দেশসমূহের মাঝে অভিন্ন রাজনৈতিক ও যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৩. জোটভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রনীতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ঘটনাপ্রবাহে কৌশলগত দিক নিয়ে অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

৪. জোটভুক্ত দেশসমূহের মাঝে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশে চরম দারিদ্র্য, জাতিবিদ্বেষ, হিংসা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা প্রভৃতি সার্ককে অর্থহীন করে তুলেছে। বিশেষ করে বিতর্কিত ও দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহ সার্ক সনদের বাইরে রাখায় এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাক-ভারত সম্পর্ক, তামিল প্রশ্নে শ্রীলংকার সাথে ভারতের, বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন, পার্বত্য চট্টগ্রামও সীমান্তবিরোধ, নেপালের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক বিরোধ প্রভৃতি নিয়ে সার্কে আলোচনার সুযোগ না থাকায় এর সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সার্ক তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এজন্য অনেকের মতে, রাজনৈতিক বিষয়ে সমঝোতা ব্যতীত অর্থবহ আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রায় অসম্ভব। দিল্লির ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে পাকিস্তান এ প্রসঙ্গে বেশ খোলাখুলিভাবেই বলেছে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে অন্য ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়।

দারিদ্র্য বিমোচনের কথা সার্কের প্রথম দিনই বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও এই অঞ্চলের প্রায় ৪৬% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসকরে। ১৯৯৩ সালে ৭ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণায় বলা হয়, ২০০২ সালের মধ্যে এ অঞ্চল থেকে দারিদ্র্য দূর করা হবে এবং ২০০০ সালের মধ্যেই প্রতিটি মানুষকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হবে। কিন্তু গত প্রায় এক যুগেও সাফ গেমস অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয় নি। কাশ্মির সমস্যাসহ এ অঞ্চলের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সার্ক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ফলে এসব সমস্যা ও বিরোধ কমে নি; বরং তীব্রতর হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক দিয়ে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপক কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে।

১৯৮৯ সালকে সার্ক দেশগুলো 'কন্যা শিশু বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে এবং বলা হয়, সাতটি দেশেরই কন্যা শিশুর চরম অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। শ্রমিক হিসেবে এদের অনেকের জীবন শুরু হয়। বিশেষ করে বহু কন্যা শিশু বর্তমানে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত। তাই সার্ক এ বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অঙ্গীকার করে। কিন্তু এখনও সে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে নি। বরং ভারত ও শ্রীলংকায় হাজার হাজার কন্যা শিশু বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

সার্ক ইতিহাসে দীর্ঘ সময় পার হলেও আন্ত-সার্ক বাণিজ্য বৈষম্য আরো বেড়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের সাথে অন্য দেশের সব সময়ই প্রতিকূল ভারসাম্য বিরাজমান। ১৯৯৫ সালে আন্ত সার্ক বাণিজ্য সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে মোট রপ্তানি ছিল ৩.৭%। ২০০০ সালে এই হার আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩.২%। সাপটা গঠনের পরও আন্ত-সার্ক বাণিজ্য তেমন সাফল্যজনক অগ্রগতি অর্জন করতে পারে নি। আর তাই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর চোখে এখনও দক্ষিণ এশিয়া 'অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল' হিসেবে বিবেচিত।

তবে গত ২৫ বছরে সার্ক কিছুই যে অর্জন করতে পারে নি তা নয়, বরং যে অগ্রগতি হয়েছে তা কোনো অংশেই উপেক্ষা করার মতো নয়। যেমন-

প্রথমত : সার্কের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেছে, যা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এর একটি আনুষ্ঠানিক সনদ রয়েছে এবং কাঠমান্ডুতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থাটির আর্থিক বিষয়ে 'টার্ম অব রেফারেন্স' এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: SAPTA চুক্তি সম্পাদন সার্কের একটি বড় ধরনের সাফল্য। ১৯৯৩ সালের ৭ম সার্ক সম্মেলনে SAPTA গঠন ও ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে সাটপার আওতায় সার্ক দেশসমূহ ট্যারিফ সুবিধা প্রদানসংক্রান্ত পণ্য তালিকা

প্রস্তুত করেছে প্রায় ২০০০ পণ্যের ওপর ১০% শুল্ক হার হ্রাস করেছে। এর ফলে আন্ত-সার্ক বাণিজ্যে প্রতিকূল ভারসাম্য কমে আসবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

তৃতীয়ত : ইতোমধ্যে সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন, সার্ক যোগাযোগমন্ত্রীদের সম্মেলন, সার্ক স্পিকার সম্মেলন, সার্ক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারিত হয়েছে। সার্কের প্রথমে যে সহযোগিতার ক্ষেত্র ছিল ১৩টি, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১টিতে। ফলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের মাঝে আঞ্চলিক সহযোগিতার তাগিদে অনুভূত হচ্ছে।

চতুর্থত : সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শীর্ষ সম্মেলনের সময় সার্কের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ সম্মেলনের বাইরে ঘরোয়া বৈঠকে দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুযোগ পান। ইসলামাবাদে চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো সার্কের বাইরে একে অন্যের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর আক্রমণ না করা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ব্যাঙ্গালোর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে তামিল সমস্যা নিয়ে ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে আলোচনার ফলে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের সাথে বাংলাদেশ, নেপাল এমনকি কাশ্মীর ইস্যু নিয়েও পাকিস্তানের আলোচনা হয়। এর ফলে পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং নানা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সমঝোতা সৃষ্টির সুযোগ ঘটে।

পঞ্চমত : কৃষি তথ্য সম্প্রসারণ ও কৃষির উন্নতির জন্য ইতোমধ্যে 'SAIC' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশসমূহের দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্ক একটি তহবিল গঠন করেছে। এর নাম হলো 'South Asian Development Fund' সংক্ষেপে SADF।

ষষ্ঠত : দক্ষিণ এশীয় খাদ্য নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তি এ অঞ্চলের দেশগুলোর খাদ্যচাহিদা পূরণ ও খাদ্য আমদানিতে সুফল দিচ্ছে। বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সার্কের দেশগুলো নিজেদের মজুদ থেকে একে অপরকে সহযোগিতা করছে।

অন্যদিকে SAPTA গঠনের পর অবাধ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সার্ক ২০০৩ সালের মধ্যে SAFTA (South Asian Free Trade Area) স্বাক্ষরেরও সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়। নারীদের অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবেশ ও এনজিওবিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সার্ক সফলতার দাবিদার।

সপ্তমত : দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সন্ত্রাসবাদ আজ নানাভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। কোথাও মৌলবাদের মোড়কে, কোথাও জাতি বিদ্বেষ, আবার কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের অন্তরালে। সার্কের ৭টি দেশই এই সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার। তাই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ৮ম শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে সন্ত্রাস পুরোপুরি বন্ধ না হলেও এর ব্যাপকতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

৪.৭ সার্কের ব্যর্থতা (Failure of SAARC)

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হলেও বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও নানাবিধ অন্তরায়ের ফলে সার্ক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এসব দুর্বলতা ও অন্তরায়গুলো হলো :

১. সার্কের সনদে কোনো দ্বি-পক্ষীয় বিষয় আলোচনার সুযোগ নেই। আবার রাজনৈতিক বিষয়েও

কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রাখা হয় নি। সার্কের এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে কোনো শান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অথচ এ দুটি বিষয় আঞ্চলিক শান্তি ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

২. আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতিতে অভিন্নতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সহযোগিতার এই উপাদানটি এ অঞ্চলে অনুপস্থিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পুঁজিবাদী ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের দৃঢ় সম্পর্কের কারণে ভারতের সঙ্গে কৌশলগত বিরোধে লক্ষণীয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতমুখী নীতি ভারত ও পাকিস্তানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির এই ভিন্নতা দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার পথে অন্তরায়।

৩. আঞ্চলিক সহযোগিতার আরেকটি উপাদান হলো সদস্যদেশগুলোর নিরাপত্তা সম্পর্কে ঐকমত্য। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই নিজেদের হুমকি মনে করে। যেমন, পাকিস্তান তার নিরাপত্তার জন্য ভারতকে, ভারত পাকিস্তানকে এবং বাংলাদেশ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ভারতকে হুমকি বলে মনে করে। নিরাপত্তা সম্পর্কে ঐকমত্য না থাকায় সার্কের বন্ধন সুদৃঢ় হয় নি।

৪. দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আজ আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সে এ অঞ্চলের সমগ্র এলাকার ৭২ ভাগ, জিএনপির ৭৯ ভাগ, বাণিজ্যের ৫৯ ভাগ, জনসংখ্যার ৭০ ভাগ এবং বিশ্বের চতুর্থ সামরিক বাহিনীর অধিকারী। ওপরোন্ত ভারত আজ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। অবশ্য পাকিস্তানও এই শক্তি অর্জন করেছে। সম্পদ ও সামরিক দিক দিয়ে ভারতের বড় ভাইসুলভ আচরণ অন্য দেশসমূহের মাঝে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত করেছে। ফলে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সার্ক নয়, ভারতই মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে সার্ক একেবারেই নিষ্ক্রিয়।

৫. সাম্প্রতিক এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক ও চরমপন্থী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এসব শক্তি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় তৎপর রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– সাম্প্রতিক অযোধ্যায় হিন্দু-মুসলিক দাঙ্গায় প্রায় ১ হাজার প্রাণহানি, পাকিস্তানে ইসলামি জঙ্গি গ্রুপ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে হামলা, শ্রীলংকায় এলটিটিই গেরিলাদের তৎপরতা, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক প্রভৃতি ঘটনা এই অঞ্চলের শান্তি ও সহযোগিতার পথে অন্তঃরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ঘটনার কারণে অনেকবার সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায় এবং নেপালে একাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। তাই এসব প্রতিকূলে উপাদানসমূহ দূর করা না হলে সার্ক কখনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না।

৪.৮ সার্ক-এর দুর্বলতা ও মূল্যায়ন (Weaknesses of SAARC and its evaluation)

সার্ক-এর প্রথম দুর্বলতা ও ব্যর্থতা হলো সার্ক দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অনিয়ন্ত্রিত সন্দেহের বাতাবরণ।

- **প্রথমত**, ভারতের একক নেতৃত্বদান প্রসঙ্গে সার্ক-এর ছোটো দেশগুলোর সন্দেহ এবং সেই সন্দেহ থেকে পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রের চীনের শরণাপন্ন হওয়া ও চীনের সঙ্গে আঁতাত পারস্পরিক বিশ্বাসভঙ্গের নজির হয়ে ওঠেছে।
- **দ্বিতীয়ত**, সার্ক-এর সাফল্যের পথে মূল বাধা হলো ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার জটিল সম্পর্ক, স্পষ্টভাবে বৈরিতার সম্পর্ক।
- **তৃতীয়ত**, পাকিস্তানের মতো দেশ মাঝে মাঝেই কাশ্মীর সমস্যার মতো, দ্বি-পাক্ষিক ইস্যুকে সার্ক-এর মঞ্চে তুলে দক্ষিণ এশীয় আন্তঃরাষ্ট্র সংগঠনটিকেই দুর্বল করেছে।
- **চতুর্থত**, সার্ক-এর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর নানাবিধ অভ্যন্তরীণ সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, জাতি-ভাষা-ধর্মকে কেন্দ্র করে চলা অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষজনিত জাতীয় সংহতির বিপন্নতা এবং সর্বোপরি, অনুন্নত

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যত, সার্ক-কে দুর্বলতর করে তুলেছে।

কিন্তু এসব ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই SAARC আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। পর্যবেক্ষকদের মতে, 'The removal of these bottlenecks is a long-term and pains-taking affair. SAARC is a very young and tender plant. It is to be carefully nursed and protected. Any ill-conceived step may cry a halt to the progress already achieved.' বলার অপেক্ষা রাখে না যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানসহ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতিই প্রধানত সার্ক-এর চলার পথ অনেক বেশি মসৃণ করতে পারে। কারণ এ দুটি প্রতিবেশী দেশই এ সংগঠনের দুটি মূল স্তম্ভ।

৪.৯ সার্কের ভবিষ্যৎ (Future of SAARC)

সার্কের অস্তিত্ব প্রশ্নে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষ করে অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, সার্ক দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ বজায় থাকলে সার্কের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এজন্য সার্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় দেশ হিসেবে ভারতকে তার আচারণ ও কার্যক্রমে সংযত হতে হবে এবং ভারতের সাথে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের বিদ্যমান দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। নতুবা পারস্পরিক সংঘাত আরো বেড়ে যাবে। ইতোমধ্যে কাশ্মীর ইস্যু ও পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারত ১৯৯৯ ও ২০০২ সালে যুদ্ধের প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় সার্কের ভবিষ্যৎ খুব বেশি উজ্জ্বল নয় বরং বর্তমানে এটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর সৌহার্দ্য বিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পারস্পরিক সফরের মধ্যে সার্ক অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় সার্ককে কার্যকর করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকটের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, শিল্পায়ন বাড়তে হবে এবং বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর এজন্য SAPTA ও SAFTA কে কার্যকর ভূমিকায় রূপ দিতে হবে।

২. আন্তআঞ্চলিক বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা আবশ্যক।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য সম্পদ সঠিকভাবে আহরণ করা হার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

৪. নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার আর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবেনা। তাই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ার মূল ধারার সঙ্গে এ অঞ্চলে সমন্বয় ঘটিয়ে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা দরকার।

৫. এ অঞ্চলে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ব্যাপারে বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে সার্কের সাফল্য সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

৬. এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি যুগোপযোগী করতে হবে। সার্কের সদস্য দেশগুলোর বিনিয়োগ নীতিমালার ভবিষ্যৎ নির্দেশনা ও সঙ্গতি নিশ্চিত করার জন্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৭. একই সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে কর ও শুল্ক কাঠামোর। তুলে দিতে হবে অশুল্ক বাধাসমূহ।

৮. এ অঞ্চলে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে এবং জরুরিভাবে অনুভূত হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রযুক্তিগত কৌশলের অবাধ-প্রবাহের।

মূল্যায়ন (Evaluation)

সার্কের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়বে এবং আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য চাঙা হবে; যা উচ্চ

প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতামূলক বিশ্বপরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেসরকারি খাতের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া সরকারগুলো নিজেরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। সার্ককে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এমনকি গৌণ বিবেচনা করা সম্ভব নয়। বরং পারস্পরিক সহযোগিতাও পরস্পরের পরিপূরক-তাই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে নিজেদের অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে এমন বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ অঞ্চলের সম্পদ এবং তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে সার্ক চেম্বার এবং সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করতে পারে। সার্ক অঞ্চলের অসম কর, শুল্ক, ট্যারিফ, প্যারা ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ আন্ত-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে উদার বাণিজ্য-সুবিধাদি এবং আকর্ষণীয় বিনিয়োগ নীতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে একে ঘিরে নানা সংশয় গড়ে ওঠে। পারস্পরিক সহযোগিতার সার্বিক বিকাশই যদি সার্কের সফলতার চাবিকাঠি হয় তবে মানদণ্ডে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের অনাগ্রহ ও কর্তৃত্বভাব সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ফলে সার্কের সফলতার চাইতে ব্যর্থতার পাল্লা বেশি ভারি।

৪.১০ সাপটা ও সাফটা সম্পর্কে আলোচনা (SAPTA and SAFTA)

আজকের দুনিয়ায় বেশির ভাগ মানুষ বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য শক্তিশালী আঞ্চলিক ইউনিয়ন গঠনের পক্ষপাতি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আঞ্চলিকীকরণের এ নতুন প্রয়াস বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার ঝুঁকি কমাত সফল হয়েছে বলে মনে করা হয়। এরই মধ্যে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা বিরাট অংশ আঞ্চলিকীকরণ করা হয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (European Union-EU)-এর শতকরা ৭০ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরিচালিত হয়। দি নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (NAFTA)- এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর মধ্যে দ্রুত বাড়ছে।

EU এবং NAFTA- এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ২১ সদস্যের এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (APEC) এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। APEC- এর সদস্যরা নভেম্বর '৯৫-এ জাপানের বাণিজ্যিক রাজধানী বলে খ্যাত ওসাকা নগরীতে বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণে মিলিত হয়। আগামী ২০১০ সালের মধ্যে কীভাবে মুক্ত বাজার এর লক্ষ্য অর্জন করা যায় তারা সেই নকশা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। ASEAN এর সদস্যরা সাম্প্রতিক এক সভায় এ অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইকনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (ECO) এর ৭ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্য আঞ্চলিকীকরণের জন্য একযোগে কাজ করছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে উন্নয়ন দৃশ্যপটের দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বস্তুত অত্যাবশ্যক। বিশ্ব জুড়ে বেশ কটি ট্রেডিং ব্লক এবং (ইকোনোমি গ্রুপিং এর জন্ম এটাই প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক বিদ্যমান থাকা (Economic Survival) তথা ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি রাষ্ট্রকে উন্নতির জন্য একা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কোনো সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ধারার সহযোগিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বেশী প্রয়োজনীয় এবং অনেক বেশি লাভবান।

তাছাড়া বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক উদারিকরণ এর কারণে বর্তমান বিশ্ব আঞ্চলিক অর্থনীতির সংহতিকরণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানের ওপর জোর দিচ্ছে। এ সত্যকে অনুধাবন করে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি রাষ্ট্র যথা-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল শ্রীলংকা এবং আফগানিস্তান নিজেদের মধ্যকার আঞ্চলিক সহযোগিতাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে সার্ক (SAARC)। বিশ্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সার্কের সদস্যভুক্ত দেশসমূহ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে SAPTA এবং SAFTA

http://thejobstudy.com Go to Contents

গঠন সম্মত হয়। প্রত্যাশা করা হচ্ছে পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সাপটা ও সাফটা দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক সদস্যভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৪.১১ দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবস্থা South Asian Preferential Trade Arrangement (SAPTA)

সাপটা হচ্ছে সার্কভুক্ত ৮টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এক প্রকার সমঝোতা চুক্তি। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সার্কের ৭ম শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিন অর্থাৎ ১১ এপ্রিল সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে সচিব ও মন্ত্রি পর্যায়ের বৈঠকগুলোতে সাপটা চুক্তির বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে বিষয়টি শীর্ষ পর্যায়ে পেশ করা হলে সেখানে সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। "ঢাকা ঘোষণায়" সাপটাকে কাঠামোগতভাবে গ্রহন করা হয় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পরবর্তীতে বৈঠকের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। গত ১৯৯৫ সালের ২০-২১ এপ্রিলের আইজিজি বা Inter Government Group-এর সভায় শুল্ক রেয়াত বিনিময় চূড়ান্ত করা হয় এবং ৮ ডিসেম্বর (১৯৯৫) থেকে সাপটা কার্যকর হয়েছে।

সাপটা চুক্তির আওতায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃ বাণিজ্য প্রসার ও ক্রমাগত উদারিকরণের নিমিত্তে সার্ক অঞ্চলের পণ্য সমূহের ক্ষেত্রে প্রভেদহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রার্থিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি মুখবন্ধ/ভূমিকা (Preamable) ২৫টি ধারা (Article) এবং তিনটি পরিশিষ্ট (Annexes) সম্বলিত সাপটা চুক্তির নীতি সমূহ, প্রকৃতি/ধরন (Modality) এবং প্রক্রিয়াসমূহ বিবৃত হয়েছে। সাপটা চুক্তি অনুযায়ী সার্কভুক্ত দেশসমূহ :

১. ট্যারিফ
২. প্যারা-ট্যারিফ শুল্কাদি (para-tariff)
৩. অ-ট্যারিফ (non-tariff)- এর কার্যক্রম ও
৪. প্রত্যক্ষ বাণিজ্য (direct trade) কার্যক্রমের মধ্যমে (ধারা ১ ও ৪) পারস্পরিকভাবে অগ্রাধিকারসূচক বাণিজ্য সুবিধাদি দিবে। এসব সুবিধাদি-
   ক. এক একটি পণ্য ধরে
   খ. ঢালাওভাবে শুল্ক হ্রাস করে,
   গ. ক্ষেত্রবিশেষে সহযোগিতার ভিত্তিতে ও
   ঘ. প্রত্যক্ষ বাণিজ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার আলোকে স্থিরকরা (ধারা-৫) হবে।

এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও কার্যক্রমের ফলে পরস্পরের প্রতি প্রদত্ত ট্যারিফ বা ট্যারিফ সদৃশ্য রেয়াত সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় রেয়াত বিষয়ক তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে (ধারা-৭)। এক সদস্য দেশ কর্তৃক অন্য সদস্য দেশকে দেয়া এসব রেয়াতাদির নিঃশর্তে সার্কের সকল দেশের প্রতি প্রয়োগযোগ্য হবে। কেবল মাত্র সার্কের অন্তর্ভুক্ত অনুন্নত দেশ জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ীসমূহের ক্ষেত্রে তাদের তরফ থেকে প্রদেয় শুল্ক বা এ ধরনের রেয়াত দেয়া বাধ্যতামূলক হবে না (ধারা-৮)। এ চুক্তি অনুন্নত দেশ সমূহের অনুকূলে অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ যথাসম্ভব বিশেষ ও অনুকূলের রেয়াতাদি ও সুবিধাদি দেবেন। এসব রেয়াতাদি ও সুবিধাদির মধ্যে :

রপ্তানি পণ্যের জন্যে শুল্কবিহীন প্রবেশাধিকার বা ট্যারিফ ভিত্তিক অগ্রাধিকার বা গভীরতর ট্যারিফ ভিত্তিক অগ্রাধিকার।

অ-ট্যারিফ ভিত্তিক বাঁধার অবসান। যথাযথ স্থানে ট্যারিফ-সদৃশ্য বাঁধার অবলোপন। যুক্তি সংগত মাত্রায় সংরক্ষণীয় রপ্তানি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদি বাণিজ্য চুক্তি করণ।

অনুন্নত দেশসমূহের তরফ হতে আমদানির ওপর পরিমাণগত সীমা আরোপনে অধিকতর নড়তা (flexibility) এবং প্রদত্ত রেয়াত প্রত্যাহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত (ধারা-১০ ও ১৪)। এ চুক্তির আওতায় গ্রহণীয় কার্যক্রম বা প্রদেয় রেয়াতাদি সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহের সাথে সদস্যদেশ বিশেষের বাণিজ্য সম্পর্ক, চুক্তি বা ব্যবস্থাদির প্রতিকূলে (ধারা-১১) প্রয়োগ করার বাধ্যকতা

থাকবে না।

এ চুক্তি অনুযায়ী সদস্য দেশ বিশেষের দেনা পাওনা স্থিতিতে (balance of payments) বিঘ্ন ঘটলে কিংবা তার সামনে ঘোরতর অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে চুক্তির আওতায় প্রদেয় রেয়াতাদি সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাবে (ধারা-১৩)। যেসব পণ্যসামগ্রীতে পারস্পরিক রেয়াত দেয়া হবে সংশ্লিষ্ট দেশে সেসব পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের মূল্য যোজনার মাত্রা ন্যূনতম পক্ষে ৫০% হবে; অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে এসব মূল্য যোজনার মাত্রা শতকরা ১০% কম হতে পারবে ধারা (৯-১৬)। সদস্য দেশসমূহ সার্ক অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন অবকাঠামো ও আন্তঃদেশ বহন সুবিধাদি প্রসার ও বাড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে (ধারা-১২)।

এ চুক্তি বাস্তবায়ন ও চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সম্প্রসারণভিত্তিক উপযোগের সমধর্মি বিভাজন নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি (Committee of Participants) গঠিত হবে। এ কমিটি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিমূলক বিধি নির্ধারণ করবেন। কমিটি সদস্য দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা, আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন এবং পারস্পরিক আলোচনার ফলে সম্ভব না হলে শেষ পর্যায়ে এ চুক্তির বিভিন্ন ধারার অর্থ ও প্রয়োগ বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন (ধারা ৯, ১৯, ২০)।

সকল সদস্য দেশের সম্মতিক্রমে এ চুক্তি সংশোধন করা যাবে (ধারা-২৪)। সকল সদসদেশ কর্তৃক এ চুক্তি অনুমোদনের লৌকিকতা সম্পন্ন হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চুক্তিটি বলবৎ হবে (ধারা-২২)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ও ভূটান চুক্তিটির অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে এবং ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে চুক্তিটি কার্যকরি হয়েছে। চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর যে কোনো সময়ে ৬ (ছয়) মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে এ চুক্তি থেকে যে কোনো দেশ নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারবে (ধারা-২১)।

২০-২১ এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে সার্ক সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইজিজির ৬ষ্ঠ সভায় সার্কের সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বহু-পাক্ষিক ও দ্বি-পাক্ষিক আলাপ -আলোচনার পর SAFTA চুক্তির আওতায় প্রদেয় শুল্ক রেয়াত প্রাপ্ত পণ্যের তালিকা চূড়ান্ত করা হয় যা পরে দিল্লিতে শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশক্রমে কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

সাপটার আওতায় বাংলাদেশ ১২টি আমদানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত শুল্ক হারের ১০% রেয়াত প্রদান করবে। উল্লেখযোগ্য পণ্য তাজা আঙ্গুর, চুনা পাথর এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক। এ রেয়াত প্রদানের ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় বাৎসরিক ১৮.৮৭ লাখ টাকা হ্রাস পেতে পারে। বাংলাদেশের প্রদত্ত শুল্ক রেয়াতের ফলে দেশে আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ।

সাপটার চুক্তির ফলে বাংলাদেশের যেসব পণ্য সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে রেয়াত পাবে তা নিম্নরূপ :

ভূটান : প্রসাধন সামগ্রী (১০%), কাপড় কাচা ও গায়ের সাবান (১০%), বিস্কুট ও নুডুলস (১০%), চকলেট (২০%) ইত্যাদি।

ভারত : জৈব ও রাসায়নিক সার (১০০%), বিভিন্ন প্রকার চামড়াজাত পণ্য (৫০%), পার্টিক্যাল বোর্ড (৫০%), কাগজ ও বোর্ড (৫০%), চীনামাটি ও অন্যান্য সামগ্রীর তৈরী টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার এবং অন্যান্য গৃহসামগ্রী (৫০%), টুথপেস্ট (৫০%), বিস্কুট (৫০%), ইত্যাদি।

মালদ্বীপ : কাঁচাপাট (৭.৫%), চামড়া (৭.৫%), কার্পেট (৭.৫%) ইত্যাদি।

নেপাল : ঔষধপত্র (১০%), চামড়াজাত পণ্য (১০%) ইত্যাদি।

পাকিস্তান: পান (১৫%), বাঁশ (১৫%), কাগজ ও বোর্ড (১৫%), বই (১৫%), কাঁচা পাট (১৫%) ইত্যাদি।

শ্রীলংকা : জুট কার্পেট (১০%) জুট ইয়ার্ন (১০%), ইত্যাদি।

নিম্নের সারণিতে কার্যকরী রেয়াতি হারের পরিমাণ দেওয়া হলো :

দেশের নাম	কার্যকরি রেয়াতি হারের আওয়াত (%)	কার্যকরি রেয়াতি হারের গড় (%)
বাংলাদেশ	৬.৭৫-৫৪.০০	২৩.০৬
ভারত	০-৪৫.০	২০.৮৩
পাকিস্তান	১৩.৫-৬৩.০	৩৫.২৭
নেপাল	৪.৫-২৭.০	১৬.১৬
মালদ্বীপ	১৩.৮৬-২৩.১৩	২০.১৩
ভূটান	৮.৭-৪২.৫	২১.৮৩
শ্রীলংকা	৮.০-৩১.৫	২০.১৬
আফগানিস্তান	-	-

সামস্টিক হারে শুল্ক হ্রাস পদ্ধতি বাণিজ্য বৃদ্ধির আর একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। এর আওতায় প্রস্তাবিত সকল পণ্যের ক্ষেত্রে একই হারে শুল্ক রেয়াতের সুবিধা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের পক্ষে এ ধরনের শুল্ক হ্রাস বরিাট বাণিজ্য ঘাটতির বিষয় হলেও যে সমস্ত ক্ষেত্রে Non-Reciprocal treatment গ্রহণের সুযোগ রয়েছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে Last Developed Contracting State হিসেবে বাংলাদেশ এ সুবিধা নিতে পারে। সার্কভুক্ত দেশগুলো প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সুবিধার আওতায় দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কতিপয় বিশেষ পণ্যের আমদানি রপ্তানি নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া সার্ক নেতৃবৃন্দ মনে করেন, 'সাপটা' এ অঞ্চলের বাণিজ্য ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে ষষ্ঠ সার্ক সম্মেলনের চেয়ারম্যান এবং শ্রীলংকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসা 'সাপটার' এ অঞ্চলের বাণিজ্য ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে ষষ্ঠ সার্ক সম্মেলনের চেয়ারম্যান এবং শ্রীলংকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসা 'সাপটা' প্রবক্তা ছিলেন।

৪.১২ সাফটা (SAFTA)

সাপটা (SAPTA)-এর সম্প্রসারিত প্রতিফলন হচ্ছে সাফটা (SAFTA)। সাপটা কার্যকর হওয়ার পর থেকে এর সফলতার ওপর নির্ভর করে সাফটার বাস্তবায়ন। দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সাফটা গঠনের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ১৯৯৭ সালে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০২ সালের মধ্যে সাপটাকে সাফটায় রূপান্তর অর্থাৎ সার্ক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এ অঙ্গীকারের অর্থ হলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সার্কের সাতটি দেশবিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধশালী আঞ্চলিক জোট যেমন, আসিয়ান, ইউরোপীয় কমন মার্কেট বা নাফটার মতো বাণিজ্যিক লেনদেন, পুঁজি বিনিয়োগ, কাঁচামাল আদান-প্রদান, মুদ্রা ঘাটতি মোকাবিলা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা করবে একে অপরকে। বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সামাজিক শুল্কের ছাড় সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সাফটা গঠনের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারত সাফটাকে বাস্তবায়ন করতে সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সাপটার আরো সফল বাস্তবায়ন ও সুফল অনুধাবন করতে আগ্রহী। সাপটার অধিকতর সুফল ও ভারতের ভবিষ্যৎ নমনীয়তার ওপর নির্ভর করছে সাফটা গঠনের ভবিষ্যৎ। এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে বৃহৎ দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। বৃহৎ দেশগুলো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র দেশসমূহ থেকে পণ্যসামগ্রী ঋসড়াটিতে সাফটার উত্তরণে ঐক্যসমূহ হলো এ অঞ্চলের মধ্যে ট্যারিফ, প্যারা ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ও বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার মতো অন্যান্য বাধা দূর করা, সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন স্পর্শকাতর পণ্য ও লেনদেন বহির্ভূত রাখার তালিকা শনাক্ত করা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাছাড়া রাজনৈতিক সমঝোতা বজায় থাকলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক ইউনিয়ন গড়ে উঠাও অসম্ভব নয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো মূলত একে অপরকে সার্কের আওতায় Most Favoured Nations হিসেবে বিবেচনা করছে। সাপটা সফলতা পেলে তা থেকে অদূর ভবিষ্যতে

ভাগ নেবে সাফটা।

৪.১৩ সাপটা ও সাফটার মধ্যে তফাৎ (Difference Between SAPTA and SAFTA)

সাপটা (SAPTA) এ ইংরেজি কথার পুরো অর্থ হলো South Asian Preferential Trading Arrangement, বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় দক্ষিন এশীয় অধিকতর বাছাই করা বাণিজ্য বোঝাপড়া, আর সাফটার (SAPTA) অর্থ হলো South Asian Free Trade Area বা দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল। সাপটা'র সাফল্যই 'সাফটা' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে। 'সাপটায় আংশিকভাবে বাণিজ্য শুল্ককে রেহাই দেবার কথা বলা হয়েছে সাফটাতে বাণিজ্যপণ্য পুরোপুরিভাবে শুল্কছাড়ের আওতায় পড়বে। এখানে কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রেই শুল্কের বিধিনিষেধ কার্যকর হবে না। যেমন, সাপটাতে বর্তমানে ২২৪টি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে সুবিধাজক শর্তের ভিত্তিতে ১০% শুল্ক ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। সাফটাতে সামগ্রিক শুল্কের ছাড় সমস্ত বাণিজ্যক লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সার্কের সাতটি দেশেল মধ্যে অভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে সাতটি দেশর আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবে। কারণ এ দেশগুলোর কোনওটিতে না কোনোটিতে এমন কিছু অতিমূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, যা কিনতে অন্য দেশগুলোকে চড়া দাম দিতে হয়,সার্কের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে উঠলে ন্যূনতম শুল্কের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে ওঠেছে। আমাদের হাতের কাছেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি (বর্তমানে সদস্য ১০টি) দেশ নিয়ে গড়ে ওঠা আসিয়ান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে আগামী ২৫ বছরে এ দেশগুলো বিশ্বের ধনী দেশগুলোর অন্যতম হয়ে ওঠবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫টি দেশও অর্থনৈতিক লেনদেরন ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাঁরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক কালেই গড়ে ওঠেছে উত্তর আমেরিকার নাফটা বা North America Free Trade Area। মাত্র দুই বছরের মধ্যে নাফটার জোটবদ্ধ দেশ আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো অর্থনৈতিক লেনদনের মাধ্যমে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দক্ষিন এশিয়ার বাণিজ্য পরিস্থিতি শুধু দুঃখজনকই নয়, মর্মান্তিকও বটে। বিশ্ববাণিজ্যের মোট বাণিজ্যিক লেনদেনের মাত্র ৩ শতাংশ আর এরও সামান্য অংশমাত্র সাপটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যের হাল ফেরাতে 'miles to go'। সাতটি দেশকেই নিজেদের স্বার্থে 'সাপটা'র পথ ধরে 'সাফটা'য় পৌঁছাতে হবে।

৪.১৪ সাপটা চুক্তির বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা

বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ : (Implementation of SAPTA)

সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলোর বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে যে গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, তারাও অভিমত পোষণ করেছেন যে, ২০০১ সালের মধ্যে সাফটা পরিকল্পনা 'বাস্তবায়নযোগ্য' ছিল না। তারা সাফটা বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে। তবে সার্ক চেম্বারের নেতৃবৃন্দ দ্রুত স্যাফটা বাস্তবায়নের পক্ষপাতী। সমস্যা আছে ভারতকে নিয়েও। দক্ষিণ এশিয়ার মোট জিডিপির ৭৮ দশমিক ২ ভাগ ভারতের বাকি অংশ অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর। তন্মধ্যে বাংলাদেশের অংশ মাত্র ৬ দশমিক ৭ ভাগ। শুল্ক কমিয়ে দেওয়ায় ইতোমধ্যে দেশে ভারতীয় পণ্যে সয়লাব হয়ে গেছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মাঝে কম উন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা থাকা উচিত। ওপরন্তু দেখা গেছে সাপটা চুক্তিতে বেশ কয়েকটি পণ্যের শুল্ক হ্রাসের কথা বলা হলেও, ভারত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে না। ফলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি পণ্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। এখানে বলা ভালো, গত দশ বছরে বাংলাদেশে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ১০ গুণ বেড়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের আমদানি প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশ ভারতের ১১তম বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয়েছে। তাই সার্কভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোর ঘাটতি দূর করার একটা দূর আশ্বাস বহন করছে।

আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধি ও তৈরি সম্পর্কের অবসান : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরিতা সার্ক এর উন্নয়ন ও বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এ বৈরিতা আরো বেড়েছে।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনে এ দুই দেশের শীর্ষ নেতারা বৈঠক করেও সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। ফলে দিন দিন তাদের মধ্যকার দূরত্ব আরো বাড়ছে। তবে বর্তমান ভারত সরকারের সাথে পাকিস্তান সরকার দীর্ঘস্থায়ী বৈরিতা অবসান ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন যে, ২০১৩ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নওয়াজ শরীফ হওয়ায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বৈরিতা কমবে। তাছাড়াও ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংক্রান্ত, শ্রীলংকার সাথে বৈরিতা অবসান হলে সাপটা ও সাফটার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং সদস্য দেশসমূহের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। এসকল দেশসমূহ দীর্ঘদিনের আমদানি নির্ভরশীল থেকে মুক্ত হতে পারবে।

বিশ্ব বাজারে বাণিজ্য : বিশ্ব বাজারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থান খুব আশাব্যঞ্জক নয়। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মধ্যেও তেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে নি। বিশ্ব বাজারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশ রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রায় ০.৮৭% এবং আমদানি ১.০৯%। অন্যদিকে আন্তঃসার্ক বাণিজ্য সাব রিজিওনের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৩%, যা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জোটভুক্ত দেশগুলোর তুলনায় কম। উল্লেখ্য আন্তঃইউরোপীয় দেশগুলোতে এ পরিমাণ প্রায় ৬৩% এবং উত্তর আমেরিকা এর পরিমাণ প্রায় ৩৭% এবং পূর্ব-এশিয়ায় আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৩৮% (১৯৯৪ সালের পরিসংখ্যান) তাই সাফটা চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হবে।

বহুমুখী বাণিজ্য বৃদ্ধি : বহুমুখী বাণিজ্য আলোচনায় নিজেদের স্বার্থ অধিকতর সংরক্ষণ এবং শিল্পন্নত দেশসমূহ এবং তাদের ব্লক থেকে সুবিধাজনক বাণিজ্য অংশ আদায়ের লক্ষ্যে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সফল প্রচেষ্টা হিসেবে সাপটার জন্ম। কিন্তু এ যাবৎ সার্কের জন্মের প্রায় ১৮ বছর পরেও জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সহযোগিতা বা সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে বলে মনে হয় না। তাই আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধি করে বাণিজ্য বহুমুখী করে সাফটা বাস্তবায়িত হলে মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে বৃহত্তর আভ্যন্তরীণ সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অধিক মাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জনে সুযোগ ঘটবে। এতে উৎপাদন খরচ কমানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ফলে দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : দারিদ্র্য কমাতে ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে অধিকতর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা জরুরি। দক্ষিন এশিয়ার অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীদের দিল্লি বৈঠকে সেই কথাই বার বার উচ্চারিত হয়েছে। সার্কের সদস্য রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীরা এক সুরে বলেন, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত মিল থাকার কারণে এবং সাতটি দেশেরই অর্থনৈতিক পরিকাঠামোমূলত একই হওয়ায় আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো ঘনিষ্ঠ উদ্যোগ প্রয়োজন। ভারতের সাবেক অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছিলেন, সার্ক দেশগুলোর মধ্যে অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির সামঞ্জস্য আনতে হবে। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীও একই সুরে বলেন, "আমাদের যা সম্পদ আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার হলে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে সার্ক দেশেগুলো মুক্তি পাবে।

পরিকাঠামোগত বিকাশের গুরুত্ব : সার্ক দেশগুলো বর্তমানে তাদের বাণিজ্য ও লগ্নির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য পরিকাঠামোগত বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবহন, যোগাযোগ জনস্বাস্থ্য, পরিবেশগত উন্নয়নের দিকে জোর দিয়েছে। কারণ বাণিজ্যের উন্নতি তখনই সম্ভব যখন প্রতিটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে।

টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর : সাফটা সম্পূর্ণভাবে কার্যকারী হলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন বাজারে পরিণত হবে এবং এক দেশের প্রযুক্তি অন্য দেশে সহজেই হস্তান্তর হবে। ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর স্বার্থেই টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে।

"ট্রেড ব্লক" গড়ে তোলা : উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এখন তাদের নিজেদের স্বার্থে নতুন নতুন "ট্রেড ব্লক" গড়ে তুলেছে, যাতে করে উন্নয়নশীল বিশ্বের উৎপাদিত পণ্য এখন বাজার হারানোর একটা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সস্তা শ্রমের বদলে উন্নয়নশীল বিশ্ব উন্নত বিশ্বে তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটা বাজার সৃষ্টি করেছিল। এটা এখন ভাঙতে বসেছে। 'নাফটা' পুরোপুরি কার্যকর হলে উত্তর আমেরিকার উন্নয়নশীল বিশ্বের পণ্য বাজার হারাবে। এটা বাংলাদেশ কিংবা ভারতের জন্য চিন্তার

কারণ। এ কারণেই ছোট ছোট দেশগুলোকে আজ নিজেদের মধ্যে "ট্রেড ব্লক" গড়ে তুলে তাদের বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। "সাপটা" এ কারণেই একটি মডেল সার্ক এর চেতনার আলোকে 'সাপটা' অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের

একটা বাজার নিশ্চিত করতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ছোট ছোট দেশগুলো (যেমন বাংলাদেশ, ভুটান) যাতে বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়। সাপটা চুক্তির ১০নং ধারায় এ ধরনের বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও ৬নং ধারায় কৃষিভিত্তিক প্রকল্প, যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত প্রকল্পের ব্যাপারে যে অতিরিক্ত সুবিধাদি দেয়া হয়েছে তা থেকে ছোট ছোট দেশগুলো সুবিধা নিতে পারে।

রাজনৈতিক মতবিরোধ ও অবিশ্বাসই সার্কের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সাপটার ভবিষ্যতও সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এদিকে সাপটা কার্যকর হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছোট ছোট দেশগুলো সন্দেহ করছে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার চুক্তির ফলে ভারতের মতো বৃহৎশক্তি তাদের অর্থনীতিতেও ছোবল মারবে। যেমন গ্যাট এবং পরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর নিজের অবস্থা মজবুত করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ভারতকে 'আমেরিকা' ভেবে বাঁকা চোখে দেখে। এ মানসিক দূরত্বই 'সাপটার' প্রধান অন্তরায়। আজ আসিয়ান নাফটা অর্থনৈতিক জোট গঠন করে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তুলে সাফল্যের মুখ দেখছে। আজ যদি দক্ষিণ এশিয়ার অবাধ বাণিজ্য এলাকা বা ASIAN FREE TRADE AREA সংক্ষেপে সাফটা (SAFTA) গড়ে ওঠে তাহলে সাতটি দেশই অর্থনীতিতে লাভবান হবে। সাপটাকে আরো কার্যকর করতে হলে এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমন্বিত ট্রানজিট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। সার্ক এর প্রয়োজনীয়তা আজ থেকে আঠারো বছর আগে যতটুকু ছিল পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়েছে। তাছাড়া সার্ক কাঠামোতে সাপটা ও সাফটার সফল বাস্তবায়ন সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংযোজন করবে নতুন মাত্রা।

সার্কের মহাসচিববৃন্দ

মহাসচিব	দেশ	কার্যকাল
আবুল আহসান	বাংলাদেশ	৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫-১৯৮৯
শ্রীকান্ত কিশোর ভারগভা	ভারত	১ জানু: '৯০-৩১ ডিসে:, '৯১
ইব্রাহীম হোসেন জাকি	মালদ্বীপ	১ জানু: '৯২-৩১ ডিসে: '৯৩
শ্রী যাদব কান্ত সিলওয়াল	নেপাল	১ জানু: '৯৪-৩১ ডিসে: '৯৫
নাঈম-উল হাসান	পাকিস্তান	১ জানু: '৯৬-৩১ ডিসে: '৯৭
নিহাল রডারিগো	শ্রীলংকা	১ জানু: ১৯৯৯-০১ জানু: ২০০২
কিউ এ এম এ রহিম	বাংলাদেশ	১১ জানু: ২০০২ -২০০৫
লিওন্যাপো চেনকিয়াব দোর্জি	ভুটান	১ মার্চ, '০৫-২৯ ফেব্রু. '৮৮
শীলকান্ত শর্মা	ভারত	১ মার্চ, -০৮ ২৮ ফেব্রু. '১১
ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ	মালদ্বীপ	১ মার্চ, '১১- ২০ মার্চ, '১২
আহমেদ সালেম	মালদ্বীপ	১ এপ্রিল '১২- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
অর্জুন বাহাদুর থাপা	নেপাল	১ মার্চ, ২০১৪- বর্তমান

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

সম্মেলন	স্থান/দেশ	সময়কাল
প্রথম	ঢাকা, বাংলাদেশ	৭-৮ডিসেম্বর, ১৯৮৫
দ্বিতীয়	বাঙ্গালোর, ভারত	১৬-১৭ নভেম্বর, ১৯৮৭
তৃতীয়	কাঠমুন্ডু, নেপাল	২-৪ নভেম্বর, ১৯৮৭
চতুর্থ	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	২৯-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
পঞ্চম	মালে, মালদ্বীপ	২১-২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০
ষষ্ঠ	কলম্বো, শ্রীলংকা	২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১
সপ্তম	ঢাকা, বাংলাদেশ	১০-১১ এপ্রিল, ১৯৯৩
অষ্টম	নয়াদিলি-, ভারত	২-৪ মে, ১৯৯৫
নবম	মালে, মালদ্বীপ	১৩-১৪ মে, ১৯৯৭
দশম	কলম্বো, শ্রীলংকা	৩০-৩১ জুলাই, ১৯৯৮
একাদশ	কাঠমুন্ডু, নেপাল	৫-৬ জানুয়ারী, ২০০২
দ্বাদশ	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	৪-৬ জানুয়ারী, ২০০৪
ত্রয়োদশ	ঢাকা, বাংলাদেশ	১২-১৩ নভেম্বর, ২০০৫
চতুর্দশ	নয়াদিল-ী, ভারত	৩-৪ এপ্রিল, ২০০৭
১৬তম	ভুটান	২৮-২৯ এপ্রিল, ২০১০
১৭তম	মালদ্বীপ	১০-১১ নভেম্বর, ২০১১
১৮তম	নেপাল	৯-১৪ নভেম্বর, ২০১৪

সার্কের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ

এক নজরে সার্ক
At a galance of SAARC

- **SAARC-এর পূর্ণরূপ :** South Asian Association for Regional co-operation
- **গঠনের প্রেক্ষাপট :** ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হয়। পরবর্তীতে কাঠমুন্ডু, ইসলামাবাদ, ঢাকা ও সর্বশেষ নয়াদিল্লিতে সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর ১৯৮৫ সালে সাতটি দেশের সরকার প্রধানদের ঢাকায় এক শীর্ষ সম্মেলনে এটি গঠিত হয়।
- **আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় :** ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।
- **সার্কের রূপকার :** বাংলাদেশের শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
- **সদস্য সংখ্যা :** গঠনকালীন সদস্য সংখ্যা ৭টি (বর্তমানে ৮টি)।
- **সদস্য দেশ :** বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ।
  অষ্টম সদস্য হিসেবে আফগানিস্তান ৩ এপ্রিল, ২০০৭ সালে সার্কে যোগ দেয়।
  সার্ক এর পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ৯টি - চীন, জাপান, রাশিয়া, ইরান, EU, মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া, জাতিসংঘ।
- **সদর দপ্তর :** নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডু (১৬ জানুয়ারি ১৯৮৭ উদ্বোধন করা হয়)।
- **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নিজেদের মধ্যে

সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান : হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- বর্তমান মহাসচিব : অর্জুন বাহাদুর থাপা (১৩তম নেপাল), ১ মার্চ, ২০১৪- বর্তমান।
- প্রথম মহাসচিব : আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
- কমিটি : তিনটি কমিটির মাধ্যমে সার্কের কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। সেগুলো হলো স্থায়ী কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি এবং কর্ম কমিটি।
- মৌলিক উদ্দেশ্য : ৭টি।
- সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্বাচিত ক্ষেত্র : ১৩টি।
- বাণিজ্য সংক্রান্ত সাপটা চুক্তি স্বাক্ষর : ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩।
- সাপটা চুক্তি কার্যকর : ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।
- সার্কের অন্তর্ভুক্ত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র : নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তান।
- প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ঢাকায়, ৭-৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।
- সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : নেপালে, ২৬-২৭ নভেম্বর, ২০১৪।
- পরবর্তিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে : পাকিস্তানে, ২০১৬ সালে।
- সার্কভুক্ত বৃহত্তম দেশ : ভারত (৩২,৭৮,২৬৩ বর্গ কি.মি.)।
- সার্কভুক্ত ক্ষুদ্রতম দেশ : মালদ্বীপ (২৯৮ বর্গ কিমি)।
- সার্কভুক্ত সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন জনবহুল দেশ : ভারত(১২৪.১৫ কোটি), মালদ্বীপ (৩ লক্ষ)।
- সার্কভুক্ত সবচেয়ে পরে স্বাধীনতা লাভকারী দেশ : বাংলাদেশ।
- সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন শিক্ষার হার : সর্বাধিক মালদ্বীপ (৯৮.৪%), সর্বনিম্ন আফগানিস্তান (৩৬%)।
- সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয় : সর্বাধিক মালদ্বীপ (৭৪৭৮ মার্কিন ডলার) এবং সর্বনিম্ন নেপাল (১১৩৭ মার্কিন ডলার)।
- কোনো দেশের সরকার প্রধানের উপাধি রাজা : ভূটান।
- সার্কভুক্ত কৃষি তথ্য কেন্দ্র অবস্থিত : ঢাকা, বাংলাদেশ।
- সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয় করে : নেপাল।

সার্ক ঘোষিত বর্ষসমূহ

১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর সার্ক কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচন করে। সদস্য দেশগুলো সেই অনুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১. ১৯৯০ : সার্ক কন্যা বর্ষ (SAARC Year of Girl Child)
২. ১৯৯১ : সার্ক আবাস বর্ষ (SAARC Year of Shelter)
৩. ১৯৯২ : সার্ক পরিবেশ বর্ষ (SAARC Year of Environment)
৪. ১৯৯৪ : সার্ক যুব বর্ষ (SAARC Year of Youth)
৫. ১৯৯৫ : সার্ক দরিদ্র দূরীকরণ বর্ষ (SAARC Year of Environment)
৬. ১৯৯৬ : সার্ক সাক্ষরতা বর্ষ (SAARC Year of Literacy)
৭. ১৯৯৭ : সার্ক ইয়ার অব পার্টিসিপটারি গভর্নেন্স (সার্ক প্রতিনিমূলক প্রশাসন বছর)।
৮. ১৯৯৯ : সার্ক জৈববৈচিত্র্য বর্ষ
৯. ২০০২ : সার্ক পরিবেশ যুবকদের অংশগ্রহণ বর্ষ
১০. ২০০৪ : এইচআইভি/এইডস সচেতনতা বর্ষ
১১. ২০০৬ : সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইয়ার
১২. ২০০৭ : সবুজ দক্ষিণ এশিয়া বর্ষ
১৩. ২০০৮ : সার্ক সুশাসন বর্ষ

http://thejobstudy.com Go to Contents

সার্ক দশক

১. সার্ক কন্যা দশক : ১৯৯১-২০০০ খ্রিস্টাব্দ
২. শিশু অধিকার দশক : ২০০১-২০১০
৩. সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন দশক : ২০০৬-২০১৫
৪. সার্ক কানেক্টিভিটি দশক : ২০১০-২০২০

সার্ক দিবস

৮ ডিসেম্বর : সার্ক চার্টার দিবস
২৪ সেপ্টেম্বর : সার্ক ঘোষিত মীনা দিবস

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশ ঘটে কবে ?
উত্তর: বিংশ শতাব্দীতে।

২. SAARC এর পুরো নাম কী ?
উত্তর:South Asian Association for Regional Co-operation.

৩. সার্ক গঠনের উদ্যোক্তা কে?
উত্তর:রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

৪. কবে সার্কের যাত্রা শুরু হয় ?
উত্তর:১৯৮৫ সালে।

৫. সার্কের প্রথম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
উত্তর: ঢাকায়, ৭-৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে।

৬. সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর: আট। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা,ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান।

৭. আফগানিস্তান কবে সার্কে যোগ দেয় ?
উত্তর: ২০০৭ সালে।

৮. সার্কের সর্বশেষ সদস্য দেশ কোনটি ?
উত্তর: আফগানিস্তান।

৯. সার্কের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো কয় স্তর বিশিষ্ট?
উত্তর: পাঁচ স্তর বিশিষ্ট।

১০. সার্কের বর্তমান চেয়াম্যান কে?
উত্তর: মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি।

১১. সার্কের পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য কী ছিল?
উত্তর: জনগণের জন্য সার্কের অংশীদারিত্ব।

১২. কলম্বো ঘোষণার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ লিখ।
উত্তর: ১. সার্কফুড ব্যাংক স্থাপন। ২. জ্বালানি সংকট নিরসন, ৩. বহুমুখী পরিবহন

অবকাঠামো গড়ে তোলা। ৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

১৩. কলম্বো সম্মেলনে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?
উ র: ৪টি।

১৪. সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র কয়টি ?
উত্তর: ১০টি।

১৫. সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঢাকায়।

১৬. সার্ক যক্ষা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ?
উত্তর: নেপালে।

১৭. সার্ক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পাকিস্তানের ইসলামাবাদে।

১৮. সার্ক বন কেন্দ্র কোথায় ?
উত্তর: ভুটানে।

১৯. সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পাকিস্তানে।

২০. সার্ক উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র কোথায় রয়েছে ?
উত্তর: মালদ্বীপের মালেতে।

২১. সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কোথায় ?
উত্তর: শ্রীলংকায়।

২২. সার্ক আবহাওয়া গবেষণা সেন্টার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঢাকায়।

২৩. সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: নয়াদিল্লিতি।

২৪. সার্ক তথ্য কেন্দ্র কোথায়?
উত্তর: কাঠমান্ডুতে।

২৫. সার্কের বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তর: অর্জুন বাহাদুর থাপা।

২৬. ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
উত্তর: ১৮তম নেপাল, ৯-১৪ নভেম্বর, ২০১৪।

২৭. সার্কের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম লিখ।
উত্তর:১. রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. মন্ত্রিপরিষদ, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি এবং ৫. সচিবালয়।

২৮. সার্কের কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখ।
উত্তর:১. জনজীবনের মনোন্নয়ন, ২. স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ৩. সমঝোতা বিধান এবং ৪. পারস্পরিক সহযোগিতা।

২৯. সার্কের সাফল্যগুলো লিখ।
উত্তর:১. সাপটা প্রতিষ্ঠান, ২. সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর, ৩. কৃষি উন্নয়ন, ৪. সন্ত্রাস দমন এবং ৪. পারস্পরিক সহযোগিতা।

৩০. SAPTA কী ধরনের চুক্তি ?
উত্তর: দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি।

৩১. SAPTA কত সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং কার্যকর হয় ?
উত্তর: ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ সালে।

৩২. SAPTA এর পুরো নাম লিখ।

উত্তর: South Asian Preperential Trade Agrement.

৩৩. সাফটার উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলা।

৩৪. SAPTA এর পুরো নাম লিখ।
উত্তর: South Asian Preperential Trade Agrement.

৩৫. সাফটা চুক্তি কত সালে কার্যকর হয়?
উত্তর:২০০৬ সালে।

৩৬. সার্কের ব্যর্থতাগুলো লিখ।
উত্তর:১. দারিদ্র্য দূরীকরণ, ২. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ৩. ফারাক্কা সমস্যা এবং ৪. কাশ্মীর সমস্যা।

খ-বিভাগ (Part-C)

৩. ক) সার্কের সাফল্য কী?
খ) সার্কের বথ্যতা উল্লেখ কর।

৪. ক) আসিয়ান গঠনের পটভূমি কী?
খ) আসিয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

৫. ক) সার্কের ভবিষ্যৎ কী?
খ) আসিয়ানের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো কী কী?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. সাপটা ও সাফটা সম্পর্কে আলোচনা করুন। সাপটা চুক্তির বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি কীভাবে ঘটতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
২. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন SAARC- এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন।
৩. দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে। এ সংকট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো ভূমিকা আছে কী? আলোচনা করুন।
৪. সদস্যভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন।
৫. সাফটা কী? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৬. দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নের সার্কের ভূমিকা কতটুকু উজ্জ্বল?
৭. আঞ্চলিক সহযোগিতা কি? আঞ্চলিক সহযোগিতা কি বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক? আলোচনা করুন।
৮. আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্তগুলো কী? সার্ক সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত ঢাকা ঘোষণা উল্লেখ করুন।

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ৫

বিমসটেক
BIMSTEC

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৫.১ ভূমিকা
৫.২ দক্ষিণ এশিয়ার বর্ণনা (সার্ক)
৫.৩ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বর্ণনা/আসিয়ান
৫.৪ বিমসটেক এর বর্ণনা
৫.৫ বিমসটেকের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা
৫.৬ বিমসটেকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তা
৫.৭ প্রয়োজনীয়তা
৫.৮ ঢাকায় বিমসটেক–এর সচিবালয়
৫.৯ চুক্তির বিষয়বস্তু
৫.১০ দক্ষিণ এশিয়া-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি

Go to Contents
http://thejobstudy.com

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতি মূলত আমেরিকানির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে ছোটখাটো অনেক বিষয়ে যেমন আমেরিকা হস্তক্ষেপ করে তেমনি বিশ্ব রাজনীতির শক্তিগুলোর Check and Balance নষ্ট হয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আমেরিকার নির্দেশিত গাইড লাইন অনুসরণ করা প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে অনেক দেশের জন্য, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে। এ অবস্থায় নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এছাড়াও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা এবং প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য আঞ্চলিক জোটগুলোই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই বিভিন্ন সময়ে গঠিত আসিয়ান, অ্যাপেক, সার্ক প্রভৃতি আঞ্চলিক সংস্থার মতোই ৬ জুন ১৯৯৭ সালে থাইল্যান্ডের উদ্যোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিমসটেক (BIMSTEC)। বিমসটেক সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

৫.২ দক্ষিণ এশিয়ার বর্ণনা (SAARC)

নতুন বিশ্বব্যবস্থায় যে কাঠামো গড়ে উঠছে, তাতে করে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ফলে প্রতিরক্ষা সংস্থার গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং তার স্থলে অর্থনৈতিক আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে ওঠেছে। ইউরোপ এ ধরনের আঞ্চলিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেছে এবং এর সুফল তারা ভোগ করছে যেমন- EEC- এর পরবর্তীতে সৃষ্ট EU। কারণ এ সময়

এ দেশগুলো (১) শিল্পোন্নত দেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার এবং (২) নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ ; যেমন SAARC (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা) এ ধরনের একটি অর্থনৈতিক আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের জন্য ১৯৮০ সালের মে মাসে তদানীন্তন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রস্তাব পেশ করেন যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ভুটান, নেপাল এবং মালদ্বীপ এ ৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট তারিখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে দক্ষিণ এশিয়ার এ ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় সার্ক। দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিয়ে গতিশীল একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠার পথে বাধা নেহায়েত কম নয়। সবচেয়ে বড় বাধা ইতিহাস থেকে পাওয়া পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ। ভারত-পাকিস্তান, ভারত-বাংলাদেশ বা ভারত-নেপাল এবং ভারত-শ্রীলংকার মতো আন্তঃদেশীয় সমস্যার জটিলতা একটি কার্যকর জোট গঠনের পথে বড় রকমের অন্তরায়। বস্তুত এ কারণেই সার্কের ধারণার সূত্রপাত ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। যার সুফল এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নি।

৫.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্ণনা/আসিয়ান

ইন্দোচীনে কমিউনিস্টদের আগমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তির ভারসাম্য পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এখানকার কমিউনিস্ট দেশগুলো তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণ, অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ব্যাংকক ঘোষণা স্বাক্ষরের মাধ্যমে ASEAN গঠিত হয়। যদিও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫ এবং বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১০। বর্তমানে সংস্থাটি আর্ন্তজাতিক বিশ্বে অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার তুলনায় খুবই কার্যকরী

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে BIMSTEC

- BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ : Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Co-operation.
- BIMSTEC-এর পূর্ব নাম : BISTEC.
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ৪ (বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড)।
- ৬ষ্ঠ ও ৭ম সদস্য : ভুটান ও নেপাল (ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সালে)।
- কোথায় গঠিত হয় : ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
- কোন দেশ BIMSTEC গঠনে মূল উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে : থাইল্যান্ড।
- মিয়ানমার কবে BIMSTEC-এ যোগদানের পূর্বে এর নাম ছিল : BISTEC (Bangladesh, India, Srilanka, Thailand, Economic Co-operation).
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৭ টি।
- ৬ জুন, ১৯৯৭ : 'ব্যাংকক ঘোষণা' গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে BIMSTEC-এর আনুষ্ঠানিক জন্মলাভ।
- ৩১ জুলাই, ২০০৪ : প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হয় ব্যাংকক থাইল্যান্ডে।
- ১৩ নভেম্বর, ২০০৮ : দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয় দিল্লী, ভারত।
- ৪ মার্চ, ২০১৪ : তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয় নাইপিদো, মায়ানমার। এ শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকায় বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন সংক্রান্ত সংঘ স্মারক, ভারতের নয়াদিল্লিতে আবহাওয়া ও জলবায়ু কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সংঘ স্মারক এবং ভুটানে সাংস্কৃতিক শিল্প কমিশন ও সাংস্কৃতিক শিল্প অবজারভেটরি স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বিমসটেক-এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন।
- সদস্য দেশ : বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট : সুরাবুদ সুনালন্ত।
- প্রথম ও বর্তমান মহাসচিব : সুমিথ নাকালদাল (৪ মার্চ, ২০১৪- বর্তমান) (শ্রীলংকা)।

সহযোগিতার ক্ষেত্র : ৬ টি; প্রতিটি খাতে একটি করে দায়িত্ব প্রাপ্ত ৩ বছরে জন্য

- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ (বাংলাদেশ)।
- প্রযুক্তি (শ্রীলংকা)।
- পরিবহণ ও যোগাযোগ (ভারত)
- শক্তিখাত (মায়ানমার)।
- পর্যটন (ভারত)
- মৎস্য খাত (থাইল্যান্ড)

ভূমিকা পালন করছে। যদিও জাতিগত সমস্যা, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা, বিদ্রোহী সমস্যা আসিয়ানের প্রধান সমস্যা হিসেবে প্রণিধানযোগ্য। আসিয়ান সংগঠনই এ অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাকে প্রমাণ করে। তাছাড়া এদের প্রতিটি দেশই একই ধরনের পণ্য উৎপাদনের ফলে তাদের মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সার্ক এ অঞ্চলে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে না পারলেও ASEAN এক প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানে অবস্থান করছে। ফলে অনেক দেশই আজ এর সদস্য হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এটি মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য একটি অন্যতম মাইল ফলক। এর মূল লক্ষ্য প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা কম নয়।

৫.৪ বিমসটেক-এর বর্ণনা (Discription of BIMSTEC)

বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ জুন, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডকে নিয়ে এ সংস্থার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-শ্রীলংকা-থাইল্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন বা বিসটেক (BISTEC)। একই বছরের ডিসেম্বরে মায়ানমার এ সংস্থায় যোগ দিলে M (এম) যোগ করে নতুন নাম হয় বিমসটেক (BIMSTEC)। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেপাল এবং ভুটান এ সংস্থায় যোগ দেয়। ফলে বিমসটেকের নাম বার বার পরিবর্তিত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ৩১ জুলাই, ২০০৪ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের Ministry of Foreign Affairs – এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে সংস্থার নাম পরিবর্তন না করে নামের অর্থের পরিবর্তন করা হয়। পাচটি দেশের আদ্যাক্ষরের বদলে নতুন নাম হবে Bay of Bengal (B) Initiative (I) for Multi (M) Scetoral (S) Technical (T) and Economic (E) Co-operation (C) এতে সংক্ষিপ্ত নাম বিমসটেক (BIMSTEC) অপরিবর্তিতই থাকল। আগে মূলত অর্থনৈতিক বিষয়টির কথা উল্লেখ করা হলেও এখন এর প্রেক্ষিত হচ্ছে বহুমুখী।

৫.৫ বিমসটেকের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা (Qualifications to be Member of BIMSEC)

সদস্যপদের আগ্রহী রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক অবস্থান ও বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ও পরিবহনের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তারপরেই কেবল সদস্যপদ গ্রহণের জন্য বিমসটেকের চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। BIMSTEC সকল সদস্যের অনুমোদনক্রমে নতুন কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৫.৬ বিমসটেকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তা (Objectives, Aims and Necessity)

BIMSTEC এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার বৃদ্ধি করা। পারস্পরিক সহযোগিতার চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলো বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য চাষ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ঔষধ, বস্ত্র, চামড়া, কৃষি প্রভৃতি খাতে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ। তাছাড়া সম্প্রতি সম্মেলনে সাতজাতির নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস, HIV/এইডস, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ৭ আগস্ট, ১৯৯৮ এর ইকোনমিক/ট্রেড মিনিস্টারদের মিটিংয়ে বিমসটেকের সদস্য দেশগুলো কয়েকটি বিষয়কে ঠিক করে সদস্য দেশকে এ বিষয়গুলোর সমহারে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এগুলো হলো- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাংলাদেশ, টেকনোলজি-ইন্ডিয়া, যোগাযোগ-থাইল্যান্ড, এনার্জি- মিয়ানমার, পর্যটন এবং ফিশারিজ-শ্রীলংকা। পরবর্তীতে ৩১ জুলাই ২০০৪ সরকার প্রধানদের নিয়ে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে বিমসটেকের সহযোগিতা ক্ষেত্র ৬টি খাতে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি খাতে একটি করে দেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ৩ বছরের জন্য। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ- বাংলাদেশ, টেকনোলজি- শ্রীলংকা, পরিবহণ ও যোগাযোগ- ভারত, এনার্জি মিয়ানমার পর্যটন- ভারত এবং ফিশারিফ- থাইল্যান্ড। এবারের শীর্ষ সম্মেলনে বারবার

আলোচিত হয়েছে ফ্রি ট্রেড এরিয়া বা এফটিএ, ভিজিট বিমসটেক ইয়ার ২০০৪ প্রভৃতি বিষয়। বিমসটেক সামিট ডিক্লারেশনেও দেশগুলোর ঐক্যের কথা বলা হয়।

মনে রাখার Technique & Tips

FTA (Free Trade Area) : চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪; পুকেট, মালয়েশিয়া।
FTA- তে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র : ৭ (বাংলাদেশ পরে স্বাক্ষর করে)।
ট্যারিফ বিলুপ্ত হবে: ২০১৭ সনের পূর্বে (মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান) ২০১২ সনের পূর্বে অন্য সদস্যরা।

শীর্ষ সম্মেলন

জেন্যু	সন
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	২২ ডিসেম্বর, ২০০২
পুখেকট, মালয়েশিয়া	১ আগস্ট, ২০০৪
ভারত	১৩ নভেম্বর, ২০০৬
মায়ানমার	৪ মার্চ, ২০১৪

৫.৭ প্রয়োজনীয়তা

অনেকেই মনে করেছেন, আঞ্চলিক শক্তি উত্থানের এ সময়টাতে বিমসটেক- এর পক্ষে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল ও ভুটান বিমসটেকের এ সদস্য দেশগুলো সার্কের সদস্য; অপরদিকে থাইল্যান্ড আসিয়ানের সদস্য। আমাদের সীমান্ত প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারও আসিয়ানের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চাচ্ছে। প্রায় তিন দশক হবে সার্ক আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কার্যকর অর্থনৈতিক ভূমিকা গড়ে ওঠে নি। তবে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এর মাধ্যমে সার্কের গুরুত্ব কমে যায় কিনা তা নিয়ে তারা বলেছেন, হয়তো বিমসটেক সার্কের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক হবে। কারণ বাংলাদেশের সামনে অনেক ধরনের ম্যান্ডেট আছে। ২০০৫ সালে গার্মেন্টস কোটা ওঠে গেলে এ শিল্পে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ছিল কিন্তু তা হয় নি।। তাই শুধু সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কারণে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভালভাবে টিকে থাকতে হলে এ ধরনের কার্যকরী জোটগুলোতে প্রবেশ করে নিজেদের অবস্থান শক্ত করা প্রয়োজন।

৫.৮ ঢাকায় বিমসটেক-এর সচিবালয়

১৩ সেপ্টেম্বর ২০৫ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Co-operation (BIMSTEC). স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় উদ্বোধন করা হয়। এটি হলো ঢাকায় স্থাপিত প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সচিবালয়। ১-৪ মার্চ, ২০৫ মায়ানমারের নাইপিদোতে অনুষ্ঠিত বিমসটেকের তৃতীয় সম্মেলনে স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় স্থাপনের ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতদিন জোটভুক্ত বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচলিত হলেও ২০৫ সালের জুন থেকে ঢাকায় এ জোটের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়।

৫.৯ চুক্তির বিষয়বস্তু

আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক যে কোনো চুক্তিরই একটি মূল লক্ষ্য আছে। যেমন- এ চুক্তি অনুযায়ী বিমসটেক সাত জাতি এলাকায় ২০১৭ সালের মধ্যে অবাধ শুল্ক বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলার আগ্রহী। ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড এলাকায় মুক্ত বানিজ্য এলাকা গড়ে তোলার জন্য শুল্ক হ্রাস করতে সময় পাবে ৮ বছর। অপররদিকে নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও বাংলাদেশ সময় পাবে ১৩ বছর। "fast track" পণ্যের ক্ষেত্রে ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ের শুল্ক হার শূন্য হয়েছিল পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র। কিন্তু বাংলাদেশে, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারের জন্য শুল্ক হার শূন্যে আসবে। এক্ষেত্রে মায়ানমার, নেপাল ও ভুটানের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ২০০৬ সালের জুন থেকে সদস্য দেশগুলো শুল্ক হ্রাস করতে শুরু করেছে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

৫.১০ দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিতে যে ধরনের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম

অর্থনীতি

BIMSTEC গত সাত বছর ধরে চলছে ধীর গতিতে। কিন্তু আসিয়ানের চিত্র আলাদা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জোটের প্রতিটি সদস্য দেশ প্রতিনিয়ত উন্নতি লাভ করছে। ১৯৯৫ সালে ভিয়েতনামকে আসিয়ানের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসিত এ দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে জোটের অপর দেশগুলোর কোনো মিল নেই। অর্থনীতিকে তাঁরা রাজনৈতিক ইস্যুর সাথে মেলাতে চায় না বলেই সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক সম্ভব হচ্ছে। বিমসটেককে শক্তিশালী করতে আসিয়ানের এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান সময়ে বিমসটেক- এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে ড. থাকসিন বলেন, ১৯৯৭ সালে যখন সংস্থাটি গঠিত হয় তখন এশিয়ায় চলছিল বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকট যা সারা বিশ্বকেই টালমাটাল করে দিয়েছিল। এ সময়টাকে উত্তরণের জন্য তথা কথিত ওয়াশিংটনভিত্তিক বু প্রিন্ট চাপিয়ে দেওয়া হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এবং পাশাপাশি যেসব দেশ অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে চেষ্টা করবে তাদের ওপর। ছয় বছর পর এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতির গতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাউথ-ইস্ট এশিয়া এখন অর্থনৈতিক সংকট প্রায় কাটিয়ে ওঠেছে। কঠিন পথে চলে আমরা শিখেছি, একই রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সব সময় বিজ্ঞতাসূচক কিংবা সঠিক নয়। এর বদলে স্বসাহায্য (self-help) এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমঝোতাপূর্ণ সহযোগিতা এ অস্থির সময়েও গুরুত্বপূর্ণ।

উপখাত	দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ
বস্ত্র ও পোশাক	বাংলাদেশ
ঔষধ ও ঔষধ শিল্প	ভারত
রত্ন ও অলংকার	শ্রীলংকা
উদ্যান	থাইল্যান্ড
প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য	শ্রীলংকা
স্বয়ংক্রিয় শিল্পকারখানা ও যন্ত্রাংশ	থাইল্যান্ড
নারকেল ও মসলা	ভারত

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ

মানবগোষ্ঠীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বা ১শ ৩০ কোটি জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সম্পদগুলোকে একত্রিত করা এবং প্রচেষ্টাগুলোকে সমন্বিত করার মাধ্যমে আমরা ভালভাবে অর্জন করতে পারি। দক্ষিণ-এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব -এশিয়া এ দুটি অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা) এর বিমসটেক অবাধ বাণিজ্য এলাকা সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তি সম্পাদনের ফলে উক্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের গুরুত্ব বাড়বে। বিমসটেক জোটে সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশ ছাড়াও রয়েছে থাইল্যান্ড, মিয়ানমারের মতো দেশ। মিয়ানমার বাংলাদেশি পণ্যের ভালো বাজার। এ নিকট প্রতিবেশী দেশে আমাদের বাণিজ্য বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বিমসটেকভুক্ত সাতটি দেশের মিলিত আয়তন ৫০ লাখ বর্গ কি.মি. এবং এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা ১৩০ কোটি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের আদান-প্রদানের পরিমাণ মাত্র ৭৩০ কোটি মার্কিন ডলার। যা তাদের মোট বাণিজ্যের চার ভাগ। গত বছরের শেষার্ধে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০ দশমিক ৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ছিল ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৩-৫ অর্থবছরে আমাদের দেশে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষমাত্রা ৭.২ শতাংশে স্থির করা হয়েছে। যে দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি আমাদের চেয়ে মজবুত, তাদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরাও আমাদের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারি।

সাত বছরের ইতিহাসে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিতিতে শীর্ষ সম্মেলন এ প্রথম। এ সম্মেলনে বাণিজ্যের পরেই সদস্য দেশগুলোর প্রতি বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের

অর্থনীতিতে থাইল্যান্ডের বিনিয়োগ করিগরি সহযোগিতাও এখন অনেক বেড়েছে। ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রস্তাবটির কথাও এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। এ দুটি দেশের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সহ-জোটভুক্ত দেশগুলোর উন্নয়ন করা সম্ভব। একথা কারো অজানা নয় যে, আসিয়ানভুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করেছে। তারা বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বিমসটেক জোটের পথ ধরে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আমরাও গড়ে তুলতে পারব বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা, বাণিজ্য সম্পর্কসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ফলদায়ক সম্পর্ক। বিমসটেক হয়ে উঠতে পারে সার্ক ও আসিয়ানের মধ্যে সেতুবন্ধন।

বিমসটেকের সহযোগিতামূলক খাতের ভিতর এ ক্ষেত্রকে ১০টি উপখাতে বিভক্ত করা হয়েছে। নিচে উপ-খাতগুলোর দেখাশোনার জন্য একেকটি দেশকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রযুক্তি খাত

বিমসটেকের ৬টি সহযোগী খাতের মধ্যে প্রযুক্তি খাতটি অন্যতম। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রসর। তার ফলে, তাদের বৈষয়িক অগ্রগতিও আশাতীত। বাংলাদেশসহ বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা জয় করে সবে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদচারণা শুরু করেছে। আজ পুরনো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ রুগ্নশিল্প রূপে চিহ্নিত হচ্ছে। কারণ পুরনো শিল্প যদি প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তবে প্রতিটি সদস্য দেশের রুগ্নশিল্পের তালিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে সন্দেহ নেই। এ দিকটায় গুরুত্ব দিতে BIMSTEC প্রযুক্তিকে দুটি উপ-খাতে ভাগ করা হয়েছে এবং উপ-খাত দুটি দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। উপখাত দুটি হলো:

১. প্রযুক্তি হস্তান্তর
২ তথ্যপ্রযুক্তিসামগ্রী ও পরিসেবা।

শক্তি

BIMSTEC- ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যথেষ্ট আছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পাথর প্রভৃতি যথেষ্ট আছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি, গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ১৫.৩৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট। ভারতের গ্যাস, কয়লা, লোহা, তেল, পাথর প্রভৃতি সম্পদে ভরপুর এবং বৈদ্যুতিক উৎপাদন ৫৩৩.৩৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট।

শ্রীলংকায় জলবিদ্যুৎ, চুনাপাথর এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬.৩৬ বিলিয়ন কিলোওয়াট, নেপালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.৭৬ বিলিয়ন কিলোওয়াট, ভুটানে প্রাকৃতিক সম্পদ হলো কাঠ, বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, জিপসাম ইত্যাদি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.৯ বিলিয়ন কিলোওয়াট। মায়ানমারে প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.৭৬ বিলিয়ন কিলোওয়াট। তাই বলা যায়, BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এ দিকে ইঙ্গিত করে বিমসটেক শক্তিকে চারটি উপখাতে ভাগ করেছে।

১. প্রাকৃতিক গ্যাস
২. বায়ু
৩. সোলার ও
৪. পানি/ স্রোত তরঙ্গ।

শক্তি খাতে আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য Action Plan তৈরির দায়িত্ব পায় মায়ানমার। শক্তি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পায় থাইল্যান্ড এবং শক্তি খাতে প্রজেক্টগুলো নবায়নের উৎস বের করা, শক্তিখাতে তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের দায়িত্ব পায় ভারত।

মৎস্য খাত

BIMSTEC ভুক্ত সদস্য দেশগুলোতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বেশি। যথোচিত গুরুত্ব সহকারে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের প্রচেষ্টার জন্য BIMSTEC থাইল্যান্ডকে ৩ বছরের জন্য দায়িত্ব দেয়।

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

পরিবহন ও যোগাযোগ

সবল অর্থনীতির পাশাপাশি নিজ অর্থনীতিকে সমান্তরাল ও প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে আনার সার্বিক সুযোগ পেতে হবে। একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড পেতে হবে। তার জন্য যোগাযোগ ও পরিবহনের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যোগাযোগ ও পরিবহন খাতকে শক্তিশালী করতে পারলে বিদ্যমান সুযোগের সম্প্রসারণ হবে এবং তুলনামূলক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে। তাই পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতকে।

পর্যটন

বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দক্ষিণ ও দক্ষি- পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং পর্যটকদের জন্য বরাবরই আকর্ষণীয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পর্যটন বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তা জিওফ্রে রিপমেন জানচ্ছেন, "আমরা দেখেছি সারা বিশ্বে পর্যটন শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৪%-৬%। আর এশিয়ার এ বৃদ্ধির হার ৮%-১০%।" তাই পর্যটন শিল্পকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলার সময় এসেছে। পর্যটন শিল্প বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির দিকে লক্ষ রেখে BIMSTEC পর্যটন শিল্পের দায়িত্ব দিয়েছে ভারতকে।

দ্বি-পাক্ষিক

BIMSTEC- ভুক্ত সদস্য দেশগুলো তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সুযোগ করে দেবে। তাছাড়া দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতাও সম্ভব। যেমন- থাইল্যান্ডে বিমসটেক সম্মেলনে উপস্থিত ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দ্বি-পক্ষীয় বৈঠক করেছেন। বাংলা-ভারত সম্পর্কের অমীমাংসিত ইস্যুগুলোর সমাধানের বিভিন্ন পর্যায়ে সংলাপ, ভারতে নদীর আন্তঃসংযোগ, ভয়াবহ বন্যার প্রসঙ্গটি আলোচনায় এসেছে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ভিয়েতনাম চীন থেকে নদী সংক্রান্ত সব তথ্য উপাত্তের সাহায্য পাচ্ছে। জার্মানিতে বন্যা হলে ফ্রান্স খবর পাচ্ছে, চেক রিপাবলিক জানতে পারছে অথচ উজানের দেশ ভারত থেকে বন্যার পূর্বাভাসমূলক প্রয়োজনীয় তথ্য বাংলাদেশ পাচ্ছে না। ভারত-বাংলাদেশ একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করা সত্ত্বেও স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোতে একসঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সব ক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে না। তবে বিমসটেক- এর সাতটি সদস্য দেশের মধ্যে দ্বি-পক্ষীয় বিরোধ তেমন নেই। অন্তত ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মতো দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা এ সংস্থায় নেই। কাজেই আশা করা যায় দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা বা বিরোধ বিমসটেকের যাত্রাপথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। বিমসটেক যেহেতু আসিয়ান ও সার্ক অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে, কাজেই এ নতুন সংস্থা দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সহযোগিতার সেতু হিসেবে কাজ করতে পারবে। তাই দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রসারিত হলেও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নেরও একটি সহায়ক ক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান

আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সমস্যা। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যা, বাংলাদেশ-ভারত বা ভারত-নেপাল এবং ভারত-শ্রীলংকার মতো আন্তঃদেশীয় সমস্যার জটিলতা একটি কার্যকর গঠনের পথে বড় রকমের অন্তরায়। ড. থাকসিন অন্য নেতাদের কাছে প্রস্তাব করেছেন, যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে তারা জরুরি ভিত্তিতে টেলিফোনে সরাসরি কথা বলে নেবেন, এর নাম তিনি দিয়েছেন টেলিফোন ডিপ্লোম্যাসি। তাই পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে BIMSTEC আসিয়ানের মতো অর্থনৈতিকভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য ক্রমাম্বয়ে হ্রাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক জোটের দিকে রাষ্ট্রগুলো ঝুঁকে পড়ছে। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে আঞ্চলিক জোটগুলোই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাই আঞ্চলিক জোট গড়ে ওঠেছে এবং প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে আসিয়ান, ইইউ, নাফটার সফলতা তাই প্রমাণ করে।

আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তবে আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব, জরুরিও বটে। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে দেখা যায় বিমসটেকভুক্ত ৫টি দেশের মধ্যে সমুদ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। এ কারণেই বিমসটেক এর নতুন অর্থে বে অফ বেঙ্গলের নাম আনা হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। যদিও নেপাল ও ভুটান বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে অবস্থানগত দিক দিয়ে সম্পৃক্ত নয়। সমুদ্র বাণিজ্য এবং বন্দরের সুষ্ঠু ব্যবহার বিমসটেকের সামনে নতুন দিক খুলে দিতে পারে। তাহলে এর পাশাপাশি দেশের ভেতর প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের সকল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তবে সবচেয়ে বেশি বা সবার আগে দরকার BIMSTEC সদস্য দেশগুলোর ভিতর একের প্রতি অপরের আস্থা, প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দায়বদ্ধতা। সার্ক ও বিমসটেক জোটের মাধ্যমে বাংলাদেশও নিজের এবং এ অঞ্চলের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি। অধিকন্তু এশিয়ান অর্থনীতিতে যে নতুন শতাব্দীর সূচনা হতে যাচ্ছে বিমসটেক হতে পারে তার প্রথম কিরণ।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Brief Questions & Answer)

১. **বিমসটেক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ৬ জুন, ১৯৯৭।

২. **বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্র কতটি?**
উত্তর : ৭টি

৩. **বিমসটেকের সদর দপ্তর কোথায়?**
উত্তর : ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪. **বিমসটেকের পূর্ণনাম কী?**
উত্তর : Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Co-operation.

৫. **বিমসটেকের সদর দপ্তর কে উদ্বোধন করেন?**
উত্তর : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০৫ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বিমসটেক-এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন উদ্বোধন করেন।

৬. **বিমসটেকের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন কবে ও কোথায় হয়?**
উত্তর : ৪ মার্চ, ২০৫ সালে তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয় নাইপিদো, মায়ানমারে।

৭. **বিমসটেকের প্রথম ও বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?**
উত্তর : প্রথম ও বর্তমান মহাসচিব : সুমিথ নাকালদাল (৪ মার্চ, ২০১৪- বর্তমান) (শ্রীলংকা)।

৮. **BIMSTEC -এর একমাত্র দক্ষিণ পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রটির নাম কী?**
উত্তর : থাইল্যান্ড।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) BIMSTEC এর পূর্ব নাম কি?
(খ) BIMSTEC এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কয়টি?
২. (ক) BIMSTEC এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ কোনগুলো?
(খ) কখন BIMSTEC গঠিত হয়?
৩. (ক) BIMSTEC গঠিত হয় কোথায়?
(খ) BIMSTEC গঠনে মুল উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে কোন দেশ?
৪ (ক) BIMSTEC এর বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি?
(খ) BIMSTEC এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়।

গ-বিভাগ (Part-C)

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থনীতিতে বিমসটেক (BIMST-EC) কী ধরনের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে আপনি মনে করেন?
২. উপ-আঞ্চলিক জোট বিমসটেক সম্পর্কে আলোচনা করুন। বিমসটেককে কেন সার্ক ও আসিয়ানের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়-ব্যাখ্যা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ৬

ইউরোপীয় ইউনিয়ন : ইউরোর প্রচলন ও অভিন্ন ইউরোপ
European Union : Emergence of Euro & United Europe

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৬.১ ভূমিকা
৬.২ সম্প্রসারিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন
৬.৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ এর বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হালচাল
৬.৪ ইইউ গঠিত হওয়ার পর ইউরোপের অর্থনীতিতে প্রভাব
৬.৫ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইউরোর প্রভাব
৬.৬ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে
৬.৭ সম্প্রসারিত ইইউ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতি ও রাজনীতি
৬.৭(১) বাণিজ্য
৬.৭(২) বিশ্ব অর্থনীতিতে ইইউ এর গুরুত্ব
৬.৭ (৩)EU এর বিস্তার বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব
৬.৮ EURO
৬.৯ ইউরো কি?
৬.১০ ইউরো গঠনের ইতিহাস
৬.১১ ইউরো'র প্রভাব
৬.১২ ইউরো চালু করার শর্তসমূহ
৬.১৩ ইউরোর নোট ও মুদ্রা
৬.১৪ ইউরোর অর্থনীতিতে প্রভাব
৬.১৫ ইউরো ও একক বাজার
৬.১৬ ভবিষ্যৎ বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে ইউরো
৬.১৭. মূল্যায়ন

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের ব্যাপক ধ্বংসলীলা বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউরোপকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। সেই তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল কম। ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক দূর এগিয়ে যায়। ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক অবকাঠামো, শিল্পের আধুনিকায়ন, প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিতে থাকে। ফলে বিশ্বব্যাপী মার্কিন অর্থনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বিশ্বব্যাপী মার্কিন অর্থনীতির আধিপত্য বিস্তারের পথকে নিষ্কন্টক করে দেয়। ইউরোপীয় অভিবাসীদের নিয়ে গঠিত এবং দু'দুটো

বিশ্বযুদ্ধের ফায়দা লোটা যুক্তরাষ্ট্র এখন একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে ইউরোপের কোনো দেশই এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক যুগ পর ভেঙ্গে পড়া ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ রোমে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল ইউরোপীয় ইকোনমিক কাউন্সিল বা ইইসি। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিলে ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার কাজটি EC- র মাধ্যমে করত। ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি EC আত্মপ্রকাশ করে। গঠনকালীন সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি। সংস্থাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য সুলভ ও সাধারণ বাজার সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। EC কে ব্যাপক রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি EC ইউরোপীয় ইউনিয়নের রূপান্তরিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা EU এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ তে। সমগ্র ইউরোপীয় কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ হিসেবে EU কে ব্যাপক সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া হিসেবে ২০০৪ সালের মে মাসে EU তে আরও ১০টি দেশ যোগ দিলে EU এর সদস্য দাঁড়ায় ২৫ এ। ১ জানুয়ারী ২০০৭ সালে দুটি দেশ যোগ দিয়ে সদস্য হয় ২৭ এবং বর্তমান ২০১৩ সালে ১ জুলাই ক্রোয়েশিয়া ২৮ তম দেশ হিসেবে EU-তে যোগ দেয়। EU বিশ্বের প্রভাবশালী আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাটি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করার ফলে এ সংস্থাটি ইউরোপের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। EU বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক ব্লক। EU এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব যে খর্ব হবে তা এক কথায় নিশ্চিত।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে ইউরোপিয়ান

১৯৫০➡ EC (European Commission) গঠিত।
১৯৫৭➡ ২৫ মার্চ রোমে ৬ দেশের চুক্তি স্বাক্ষর (বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানি)।
১৯৫৮➡ ১ জানুয়ারি ইসি-র আত্মপ্রকাশ।
১৯৭৩➡ ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ডের যোগদান।
১৯৮১➡ গ্রিসের যোগদান।
১৯৮৬➡ স্পেন ও পর্তুগালের যোগদান।
১৯৯২➡ একক বাজার চালু।
১৯৯৫➡ সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ডের যোগদান।
১৯৯৮➡ ব্রাসেলসে ১১টি সদস্য রাষ্ট্র অভিন্ন মুদ্রা চালুর বিষয়ে একমত হয়।
১৯৯৯➡ ১ জানুয়ারি ইউরো চালু (১১টি দেশে)।
২০০১➡ গ্রিসে ইউরো গ্রহণ।
২০০২➡ জানুয়ারি ইউরো ব্যাংক নোট চালু। ১ জুলাই, ২০০২ সালে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব নোট ও মুদ্রা বাতিল।
২০০৪➡ ১০টি রাষ্ট্রের ইইউতে যোগদান।
২০১৩➡ ১ জুলাই ক্রোয়েশিয়া EU এর ২৮ তম সদস্য হয়
২০১৪➡ ১ জানুয়ারি লাটভিয়া ১৮তম দেশ হিসেবে ইউরো মুদ্রা চালু করে।

➡ ইইউ এর পূর্ব নাম : ইউরোপীয় কমিশন (EC)
➡ ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে নতুন নাম EU (European Union)
➡ বর্তমান সদস্য : ২৮
➡ সর্বশেষ সদস্য : ক্রোয়েশিয়া ২৮ তম (১ জুলাই, ২০১৩)
➡ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ৬।
➡ সদর দফতর : ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম।
➡ EU-র সংগঠন : ৮টি।
➡ ইউরোতে নোট : ৭টি (৫০০, ২০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০ ও ৫)।
➡ ইউরোর সংক্ষিপ্ত রূপ : EUR

৬.২ সম্প্রসারিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন

১৯৫৮ সালে গঠিত ইইসি এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানিসহ ৬টি রাষ্ট্র। পরবর্তীতে বৃটেন, ডেনমার্ক, এবং গ্রিস EC-তে যোগদান করলে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০। ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল ১১তম ও ১২তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ইইসিতে যোগদান করে। ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ EC, EU -তে রূপান্তরিত হলে সুইডেন, অষ্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড এতে যোগদান করে। এই ১৫ সদস্য নিয়ে শুরু হয় EU- এর

অগ্রযাত্রা। মূলত: মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তি ও পেশি শক্তি প্রদর্শনীর বিরুদ্ধেই ইউরোপ এখন এক হতে চাইছে। আর এই প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবেই ১ মে, ২০০৪ ইইউ এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে আরও ১০টি দেশ। অভিন্ন স্বার্থের দিক বিবেচনা করেই জড়ো হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো একই পতাকাতলে। সীমানার বিভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদের তুলে ধরেছে অভিন্ন ইউরোপীয় হিসেবে। পূর্ব - ইউরোপে। ৮টি দেশ পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুনিয়া এবং ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দুটি দেশ সাইপ্রাস ও মাল্টা EU- এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায়। এর মাধ্যমে সম্পদশালী পশ্চিম ইউরোপের ১৫টি দেশের সাথে পূর্ব ইউরোপ সমাজতান্ত্রিক এবং মধ্য ইউরোপের দেশগুলোর সমন্বয় ঘটল। এর ফলে EU বিশ্ব অর্থবাজারে একক বৃহত্তম বাজার হিসেবে আবির্ভূত হলো। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিক গতিশীল করার জন্য ১৯৯৯ সালে একক ইউরোপীয় মুদ্রা ইউরো চালু হয়। যদিও ২০০২ সালে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে ইউরো কার্যকরীভাবে প্রচলন শুরু করে। EU কে ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়া ২০০৭ সালে EU তে যোগদান করে। ১ জুলাই ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়া ২৮ তম সদস্যপদ হিসেবে সর্বশেষ যোগদান করে। এশিয়া ইউরোপের মাঝামাঝি থাকা তুরস্কও EU- তে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণের পরিপূর্ণতা যে খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে তা অনেকটা নিশ্চিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোন একক জাতিসংঘের রূপ নেওয়ার মানে হলো ইউরোপের সকল পুঁজি, বাণিজ্যিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক শক্তির একটি সুদূর প্রসারি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমন্বয়। এই জাতিসংঘের সকল সদস্য হচ্ছে উন্নত জীবন যাত্রা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রভূত পুঁজির মালিক। বিশ্ব অর্থনীতি যে বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর অঙ্গুলি হেলনে চলে তাদের ব্যবস্থাপনার একটি বড় অংশ আসছে এসব দেশ থেকে।

৬.৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ এর বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হালচাল

বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি। বিশ্বব্যাপী সে দ্রুত তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। যার জন্য ইউরোপের ইটালি, স্পেন, যুক্তরাজ্যের মত স্বাবলম্বী রাষ্ট্রও তার লেজুরবৃত্তি করছে। ১৯৯৯ সালে 'ইউরো' বাজারে আবির্ভূত হওয়ার পর মার্কিন অর্থনীতি তথা বিশ্ব বাজারে ডলারের একক আধিপত্য খর্ব করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এখন মুদ্রার রিজার্ভ আর পুরোপুরি ডলারে রাখার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক দেশই ডলারের সহিত ইউরো বা এককভাবে ইউরোকে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে ডলারের প্রভাব কিছুটা কমে গেছে। বাজারে ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যা এর আগে পরিলক্ষিত হয় নি। ইউরো পরিচালনার জন্য জার্মানির ফ্রাংকফুটে ইইউ- এর কেন্দ্রিয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইইউ-যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

বিষয়	ই-ইউ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বজিডিপির অংশ	১৫ শতাংশ	২৫.৫ শতাংশ
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবদান	১৯.৫ শতাংশ	১৫.০ শতাংশ
মোট জনসংখ্যা	৪৫৫ মিলিয়ন	২৬০ মিলিয়ন
সদস্য সংখ্যা	২৫টি	১টি (যুক্তরাষ্ট্র)

উপরিউক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় EU- এর অবদান বেশি। বিশ্ব জিডিপিতে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ভাল অবস্থায় থাকলেও EU- এর সম্প্রসারণের ফলে অতি দ্রুত EU- এর জিডিপি যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির প্রভাবকে খর্ব করতে পারবে। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। বিগত পাঁচ বছরে ডলারের তুলনায় ইউরোতে প্রবৃদ্ধি বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে তা থেকে এ কথাই বোঝা যাচ্ছে যে, EU যুক্তরাষ্ট্রের একক অর্থনৈতিক প্রভাব খর্ব করবে।

৬.৪ EU গঠিত হওয়ার পর ইউরোপের অর্থনীতিতে প্রভাব

১. একক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীলতা আসবে।
২. অর্থবাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। অর্থবাজারে পরিবর্তন আসবে। ফলে ভোক্তারা বেশি লাভবান হবে।
৩. শ্রম ও কাঁচামালের অবাধ যাতায়াতের ফলে উৎপাদন খরচ কমে যাবে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা সহজ হবে।
৪. মুদ্রা বিনিময় হারের ঝামেলা না থাকায় এবং মুদ্রা বিনিময় জনিত ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ইউরোপে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।
৫ একক মুদ্রা 'ইউরো' ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্যকে আরো জোরদার করবে ইত্যাদি।

৬.৫ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইউরোর প্রভাব

১. ইউরো বিশ্ব বাজারে ডলারের একক আধিপত্য খর্ব করেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ইউরোর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. একটি শক্তিশালী EU বিশাল অংকের পুঁজি ইউরোপে নিয়ে আসবে।
৩. EU -তে একক পুঁজি বাজার সৃষ্টি হলে তা বিশ্বের পুঁজি বাজারে পরিণত হবে। তাছাড়া বৃহত্তম শেয়ার ইক্যুইটি বাজার হবে EU।
৪. উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবহণসহ অন্যান্য খরচ কমে যাওয়ায় বিশ্ব বাজারে EU-এর পণ্য মার্কিন পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার শেয়ার কমিয়ে দিতে ভূমিকা রাখবে ইত্যাদি।



ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ

http://thejobstudy.com Go to Contents

ইউরো, EU- এর অর্থবাজার, পুঁজিবাজার, বন্ড, শেয়ার মার্কেট সব কিছুকেই চাঙ্গা করেছে। ইউরো এখন ডলারের সবচাইতে বড় প্রতিযোগী মুদ্রা হিসেবে বিশ্ব বাজারে স্থান করে নিয়েছে। ইউরোর বিশ্ব বাজারে প্রবেশ বর্তমানে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাগুলোর মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টা প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইইউ যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করেছে একথা নিশ্চিত।

৬.৬ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রসারিত ইউরোপ বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাবকেও খর্ব করেছে। উদাহরণ স্বরূপ

১. **ইরাক বিষয়ে :** ইরাক যুদ্ধে EU- এর বেশিরভাগ সদস্যই যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে। কারণ সেখানেও তাদের স্বার্থ রয়েছে। যুক্তরাজ্য, ইতালি, স্পেন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করলেও ফ্রান্স, জার্মানি নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। ফ্রান্স এর ভেটো প্রয়োগের কারণে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে ইরাক আক্রমণের বৈধতা গ্রহণ করতে পারে নি। স্পেন প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করেছে।

২. **ইসরাইল বিষয়ে :** জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল বিষয়ক নীতির বিরুদ্ধে EU- এর সকল সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাজ্যও আমেরিকার ইসরাইল নীতির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

৩. **বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে :** বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতির সমালোচনা করেছে বেশির ভাগ EU সদস্য।

৪. **NATO সম্পর্কে :** NATO কে যুক্তরাষ্ট্র যাতে কোনোভাবেই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে এজন্য ইইউ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলেছে। এসব ঘটনাবলী থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাবও খর্ব করছে।

৬.৭ সম্প্রসারিত ইইউ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাব

৬.৭ (১) বাণিজ্য

বর্তমান একবিংশ যুগ বাণিজ্যের যুগ। বাণিজ্যই হচ্ছে অর্থনীতির চালিকা শক্তি। যে দেশ যত বেশি বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ততবেশি লাভবান হবে। বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখা কোনো একটি দেশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলে, একই মতের এবং আদর্শের দেশগুলো বাণিজ্যিক জোটগুলো এক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতাও লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোট হলো জি-৮, এ্যাপেক, নাফনা এবং সর্বশেষ EU। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর পারস্পরিক স্বার্থ আদান-প্রদান করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে ইইসি গঠিত হলেও সমগ্র ইউরোপে বাণিজ্য সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ এবং বিশ্ব বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্যে ১৯৯৫ সালে EU গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে EU- এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫টি। ২০০৪ সালের মে মাসে ১০টি দেশ ইইউতে যোগদান করে EU- এর ব্যাপক সম্প্রসারণ করে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য কর্তৃত্ব বজায় রাখার অগ্রযাত্রা শুরু করে। ১ জানুয়ারি ২০০৭ সালে দুটি দেশ যোগ দিয়ে সদস্য হয় ২৭ এবং বর্তমান ২০১৩ সালে ১লা জুলাই ক্রোয়েশিয়া ২৮তম দেশ হিসেবে EU- তে যোগ দেয়। ইইউ সম্প্রসারণ হওয়ার পর বিশ্ববাণিজ্যে যে এর কর্তৃত্ব ও প্রভাব আগামী দিনে বাড়বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। EU- এর বাণিজ্য সম্প্রসারণ বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী বাণিজ্যিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাব অনেকাংশে খর্ব করেছে। EU সম্প্রসারণের ফলে ইউরোপের দরিদ্র এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনের ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান EU তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে বহিঃবিশ্বে বাণিজ্যিক লেনদেন বিস্তৃত করেছে যে বিশ্ব বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ববাণিজ্যে EU এর ভূমিকা সমূহ-

১. EU যে একটি সফল বাণিজ্যিক জোট হওয়ার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে একত্রিত করেছে তার প্রমাণ ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি ইইসি নামক যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল-পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক কমানোর মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য সুলভ ও সাধারণ বাজার সৃষ্টি করা এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। ১৯৯৫ সালে EU- তে পরিণত হলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম জোরদার হয়।

২. ১৯৯৫ সালে EU গঠিত হবার পর ২০০২ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮ বছরে বিশ্ব বাণিজ্যের ২০ শতাংশ দখলে নিতে সমর্থ হয়েছে। ২০০৪ সালে EU- এর সম্প্রসারণের ফলে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ এবং কর্তৃত্ব আরো নিশ্চিত বৃদ্ধি পায়।

৩. ইউরোপের দুর্বল অর্থনৈতিক দেশগুলোতে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ভোক্তাদের চাহিদার মূল্যায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. আন্তর্জাতিক বাজার গতিশীল হয়েছে।

৬. ডলারের পরিবর্তে ইউরো মুদ্রায় লেনদেন হওয়ায় বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক জোট হওয়ায় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন খরচ কমে গেছে। ফলে বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউরো রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে গুরুত্ব পাওয়া বিশ্ব বাণিজ্যে EU-এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯. EU- তে রয়েছে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন, হল্যান্ড, স্পেনের মতো বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প প্রধান দেশ এবং প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের একই ভিসা এবং একই মুদ্রার অবাধ প্রবাহ থাকায় বিশ্ব বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ রাখতে EU লাভবান হবে।

১০. ইইউ বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাজার। ইউরোপের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই অঞ্চলে। এত বড় বিশাল বাজারে বিনিময় ব্যবস্থা ইইউ এর বাণিজ্য স্বার্থ ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছে।

মনে রাখার Technique & Tips

- সম্প্রসারণের ফলে ইইউ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক ব-কে পরিণত হয়।
- শিল্প জিডিপিতে ইইউ এর অবদান ১৫ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫.৫ শতাংশে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইইউ এর অবদান ১৯.৫ শতাংশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ শতাংশ।
- ইউরো চালু হয় ১৯৯৯ সালে।
- বর্তমান বিশ্বে ১২ শতাংশ লেনদেন হয় ইউরোতে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইইউ যে সকল ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করেছে তা হল :
১. ইরাক বিষয়ে
২. ইসরাইল বিষয়ে
৩. বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নীতিতে এবং
৪. NATO এর কার্যক্রমে।

সম্প্রসারিত ইইউ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যে সকল প্রভাব রাখছে :

বাণিজ্য
- ২৫টি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ।
- বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে।
- বৈদেশিক মুদ্র রিজার্ভের ক্ষেত্রে ইউরোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ইউরো বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজ বাজার।

অর্থনীতিতে
- একমেরু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান।
- প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের ব্যবহার।
- ইইউতে একক মুদ্রা চালু।
- পর্যাপ্ত উৎপাদন।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা।

রাজনীতিতে
- একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান।
- বিশ্ব সংগঠনগুলোতে কর্তৃত্ব আরোপ।
- মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।
- জাতিসংঘে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।
- একক বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের চিন্তাভাবনা।
- বৈদেশিক সাহায্য প্রদান।
- সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা, আঞ্চলিক ঐক্য।

৬.৭ (২) বিশ্ব অর্থনীতিতে EU- এর গুরুত্ব

শুধুমাত্র রাজনৈতিক, আঞ্চলিক সংহতি কিংবা জাতিগত আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবর্গ শুরু থেকেই সদস্য দেশগুলোকে একত্রিত করার ব্যাপারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। সদস্য দেশগুলো এটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, আঞ্চলিক বা আন্ত-মহাদেশীয় যে কোন জোটের সদস্যদের

মধ্যে আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধা তথা লাভের বিষয়টি প্রাধান্য না পেলে সেই জোট বা ঐক্য জোরদার ও স্থায়ী হতে পারে না। ১৯৯৫ সালে EU গঠিত হয়েছিল মাত্র ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য EU এর ভূমিকা প্রয়োজনীয় মনে করে ২০০৪ আরো ১০টি দেশ যোগ দেয়। ১ জানুয়ারী, ২০০৭ সালে দুটি দেশ যোগ দিয়ে সদস্য হয় ২৭ এবং বর্তমান ২০১৩ সালে ১ জুলাই ক্রোয়েশিয়া ২৮ তম দেশ হিসেবে EU-তে যোগ দেয়এবং আরও ৫টি দেশ যোগদানের অপেক্ষায়। EU- এর এই দ্রুত সম্প্রসারণ যে শুধু এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলবে তা নয় বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নেও প্রভাব বিস্তার করবে। বিশ্ব অর্থনীতির যে সকল বিষয়ে ইইউ প্রভাব ফেলবে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **একমেরু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান :** বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি অনেকটা একমেরু কেন্দ্রিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এককভাবে ইউরোপসহ বিশ্বের যে কোন দেশের ধরা ছোয়ার বাইরে। তাই সমন্বিত ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের একক অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব খর্ব করতে বিশেষ ভূমিকা রাখায় সম্প্রসারিত EU এক্ষেত্রে যে সফলতা অর্জন করবে তা বর্তমান এর কর্মকাণ্ড থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সম্মিলিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৩০০ কোটি ইউরো মুদ্রা যা যে কোন অর্থনৈতিক পরাশক্তির জন্য চ্যালেঞ্জ এবং যে কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী।

২. **প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য :** EU- তে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইস্পাত, কয়লা ও লৌহ খনি। ইইউ দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত। যা শিল্প পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। EU গঠিত হওয়ার পর এর সদস্য দেশগুলোর মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প কারখানার সম্প্রসারণ ঘটেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে EU- এর উৎপাদিত পণ্য বাজার দখলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। ফলে অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে।

৩. **EU- তে একক মুদ্রা চালু :** EU- তে একক মুদ্রা চালু থাকায় বিনিয়োগ খরচ কম হবে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকবে। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এতে করে EU- এর অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুদ হবে। EU তার অর্থনীতি মজবুদ করতে পারলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে আসবে। EU ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু করলেও ২০০২ সালে তা যথাযথ রূপ নেয়। EU- এর কেন্দ্রিয় ব্যাংক জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে অবস্থিত।

৪. **পর্যাপ্ত উৎপাদন:** বর্তমানে EU- এর বার্ষিক উৎপাদন প্রায় আট ট্রিলিয়ন ডলার। যা বিশ্ব বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই পরিমাণ উৎপাদন পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৫ শতাংশ।

৫. **বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা :** গত দীর্ঘ দিন বিশ্বের অনেক দেশে ব্যাপক মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে এর মধ্যে অনেক দেশ আছে যাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের ওপর। অনেক দেশেও ব্যাপক মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করে যদি ঐ সকল রাষ্ট্র থেকে তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে ঐ সকল রাষ্ট্র এবং বিশ্ব অর্থনীতি প্রচন্ড রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। EU গঠিত হবার ফলে বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে এই সংগঠনের ব্যাপক বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে করে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্যাবস্থা তৈরি হয়েছে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৬.৭ (৩) EU- এর বিস্তার বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব

EU মূলত একটি বাণিজ্যিক জোট হলেও পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী ছিল। EC গঠিত হবার পেছনে বাণিজ্যিক সম্পর্ক কাজ করলেও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের আভাস পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্ব একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব। বিশ্ব কর্তৃত্বের একমাত্র অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে একক প্রভাব

বিস্তার করে চলেছে। মূলত বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সমান কোন সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর দেশ না থাকার কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রায় সকলেই দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। ১৯৯৫ সালে EU গঠন এবং ২০০৪ সালে এর ব্যাপক সম্প্রসারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করে একটি নতুন ক্ষমতার সৃষ্টি করবে বলে আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। ২০০৪ সালের ১ মে EU- এর সম্প্রসারণ বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যে সকল ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ইইউ বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে সেগুলো হলো :

১. **একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান :** সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া চলছে EU গঠনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সে প্রচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ইউরোপের কিছু কিছু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেজুরবৃত্তি করলেও তারা EU- এর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করছে। এতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষুন্ন হতে চলেছে নিশ্চিত। ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ বিশ্ব রাজনীতিতে যে নতুন মেরুকরণ করতে যাচ্ছে EU এর কর্মকান্ডে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. **বিশ্ব সংগঠনগুলোতে কর্তৃত্ব আরোপ :** বিগত দিনগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, জাতিসংঘসহ অন্যান্য বিশ্ব প্রতিষ্ঠানে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। এসকল প্রতিষ্ঠানকে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারিত EU মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করতে এবং ইউরোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয় রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি সিস্টেমের কর্তৃত্ব নিয়ে ইতোমধ্যে ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক এবং আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

৩. **মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে :** নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে হামলা EU এর বেশির ভাগ সদস্যই নিন্দা জানিয়েছে। ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ভেটো প্রদানের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকে হামলার অনুমোদন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ইরাকের জনগণের হাতে ইরাকের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও EU অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের ধ্বংসনীতির সমালোচনা করেছে EU। জাতিসংঘ ইসরাইল নীতির মার্কিন প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে EU- এর সদস্য দেশগুলো।

৪. **জাতিসংঘে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় :** নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যর মধ্যে ৩টিই ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত। ফ্রান্স, জার্মানি নিরাপত্তা পরিষদে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে। স্থায়ী পরিষদে নতুন সদস্য হওয়ার ব্যাপারে EU- এর সদস্য জার্মানি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় EU- এর সদস্য বিশেষ করে ফ্রান্স, জার্মানি এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যেও EU- এর স্বার্থ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার একচেটিয়া কর্তৃত্ব বেশিদিন মেনে নেবে না ইউরোপ।

৫. **একক বিদেশ ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের চিন্তাভাবনা :** বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য EU আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি একক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিচালিত করার জন্য একক বিদেশনীতি ও নিরাপত্তা নীতির ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সুদৃঢ় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও আশার ব্যাপার এই যে, EU- এর সকল সদস্য দেশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, তারা কেউই EU- এর সকল স্বার্থ ক্ষুন্ন করে এমন বিদেশ ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করবে না।

৬. **সাহায্য প্রদান :** কর্তৃত্ব আরোপের জন্য EU বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজি, প্রযুক্তি, তথ্যসহ নানাবিধ সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এক সময় যে সকল দেশ মার্কিন সাহায্য সহযোগিতার উপর তাকিয়ে থাকত তাদের অনেক রাষ্ট্রই এখন EU- এর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৭. **সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা :** EU তার সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় করণের জন্য ব্রাসেলসে EU- এর সদর দপ্তর স্থাপন করছে। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা এবং EU- এর রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য ইইউ তার সদর দপ্তরের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৮. **আঞ্চলিক ঐক্য :** EU- এর অনুকরণে আফ্রিকা, এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অনুরূপ জোট গঠনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডি-৮, এ্যাপেক, দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত), সাফটা- তে EU- এর কার্যক্রমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

EU- এর বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব যে ক্ষুন্ন হবে তা প্রায় নিশ্চিত তবে এক্ষেত্রে সংগঠিত করতে হবে। কারণ ইউরোপের সমাজ আধুনিক হলেও জাতীয় চেতনার উর্দ্ধে উঠতে তাদের অনেক সময় লাগবে। ইউরোপের অনেক দেশ এখনও সদস্য পদ গ্রহণ করে নি অনেক দেশ এখনও একক মুদ্রা গ্রহণ করে নি। EU পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট পড়েছে কম অনেকে আগ্রহই দেখায় নি। ইউরোপের বিরাট এলাকায় এখনও ৩০ শতাংশ দরিদ্র এবং অনুন্নত অর্থনৈতিক রাষ্ট্র রয়েছে। একটি সমন্বিত সুষম অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সকল রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করতে সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে খর্ব করতে হলে ইইউকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস উত্তরাধিকার নিয়ে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ নিজ নিজ উপায়ে গর্ববোধ করে। ইউরোপের রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প এলাকা ও প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তাছাড়াও ইইউ এর বিশাল পুঁজি বাজার বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষুন্ন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে সত্যি কারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে খর্ব করতে হলে ইইউ এর যে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে এসব কিছুর জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন।

এক নজরে ইউরোপিয়ান- এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

বছর	চুক্তি	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ
১৯৫২	প্যারিস চুক্তি	ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত পরিষদ গঠন
১৯৫৭	রোম চুক্তি	ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কমিউনিটির আত্মপ্রকাশ
১৯৮৫	একক ইউরোপীয়ান এ্যাক্ট	EU ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নন-ট্যারিফ বাধাগুলো দূর করা এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের অবাধ প্রবাহ
১৯৮৬	সেনজেন চুক্তি	এক সদস্য রাষ্ট্র থেকে অন্য সদস্য রাষ্ট্রে ভিসাযুক্ত চলাচল সুবিধা
১৯৯২	ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তি	অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থাসহ শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়ন সহযোগিতা, বিশ্ব নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন EEC এর নামকরণ করা হয় EU
১৯৯৭	আমস্টাডাম চুক্তি	ইউরোপীয়ান মনিটারি ইউনিয়ন গঠন। ২০০২ সাল থেকে একক মুদ্রা "ইউরো" চালু
২০০৪	সাংবিধানিক চুক্তি	নাগরিক অধিকারের সনদ তৈরি, কাউন্সিল অব মিনিস্টারস্ এর সভাপতির পদ সৃষ্টি
২০০৭	লিসবন চুক্তি	EU এর সংস্কার

এক নজরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অঙ্গসংস্থাসমূহ অবস্থান

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অঙ্গসংস্থাসমূহ	অবস্থান
১. ইউরোপিয়ান কাউন্সিল	সদস্য দেশে
২. ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট	স্ট্রাসবার্গ, জার্মানি
৩. ইউরোপিয়ান কমিশন	ব্রাসেলস্ ও লুসেমবার্গস্ক
৪. কাউন্সিল অব মিনিস্টারস্	ব্রাসেলস্ ও বেলজিয়াম
৫. ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস	লুক্সেমবার্গ
৬. ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক	ফ্র্যাংকফুট (জার্মানি)
সহযোগী সংস্থাসমূহ	
১. আঞ্চলিক কমিটি	ব্রাসেলস্ (বেলজিয়াম)
২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল	ব্রাসেলস্ (বেলজিয়াম)
৩. কোর্ট অব এডিটরস্	লুক্সেমবার্গ

৬.৮ EURO

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চিন্তাধারার ফসল ইউরো। ইউরো হচ্ছে ঐক্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। ইউরো আলোচনা করার পূর্বে আমাদের অবশ্যই ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানি এ ছয়টি রাষ্ট্রের মধ্যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি গঠনের লক্ষ্যে রোমে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি ইসি আত্মপ্রকাশ করে। বৃটেন, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড পরবর্তীতে এতে যোগদান করে। গ্রীস দশম সদস্য হিসেবে এবং ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল ১১তম ও ১২তম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সংস্থাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য সুলভ ও সাধারণ বাজার সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। ১লা জানুয়ারি '৯৫ সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড ইসিতে যোগদান করে। জানুয়ারি ১৯৯৫ ইসি ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত EU- এর সদস্য ছিল ১৫। ২৮তম সদস্য দেশ ১ জুলাই যোগদান করে ক্রোয়েশিয়া এখন সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টিতে। এর ফলে EU বিশ্ব অর্থবাজারে একক বৃহত্তম বাজার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১০টি নতুন দেশ হল সাইপ্রাস, হাঙ্গেরি, লিথুনিয়া, মাল্টা, পোল্যান্ড, স্লোভেনিয়া, স্লোভাক রিপাবলিক, চেক রিপাবলিক, লাটভিয়া ও এস্তানিয়া। EU-কে একটি একক অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক EU মুদ্রা হিসেবে ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি হইতে EU সদস্য দেশগুলোতে (১২টিতে) ইউরো চালু করা হয়। বর্তমানে ১৮টি দেশে ইউরো চালু আছে। সর্বশেষ সদস্য হয় লাটভিয়া ১ জানুয়ারি ২০১৪ সালে। মূলত ইউরো হলো EU- এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যের প্রতীক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দফতর, বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে।

৬.৯ EURO কী

ইউরো হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের একক সরকারি মুদ্রা। ১৯৯৯ সালের ১জানুয়ারি এ মুদ্রা চালু হয়। ২০০২ সালে জানুয়ারি মাসে ইউরোর নোট চালু হয়। ১৯৯৯ সালে ১১টি দেশে ইউরো চালু হয়। গ্রীস পরে এটিতে যোগ দেয়। বর্তমানে ১৮টি দেশে ইউরো চালু আছে। ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও সুইডেন এখনও ইউরোতে যোগ দেয় নি। সুইডেন এখনও ইউরোতে যোগ দেয় নি। সুইডেনে EURO-তে যোগ না দেওয়ার পক্ষে যায়। ব্রিটেন ইউরোতে যোগ দেবে ২০০৭ সালে এপ্রিল মাসে। ডেনমার্ক এর সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয় নি। মূলত ইউরোপ আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার এবং অখণ্ড ইউরোপের গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতেই ইউরো চালু হয়েছে।

ইউরোপের গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতেই ইউরো চালু হয়েছে।

৬.১০ ইউরো গঠনের ইতিহাস

১৯৯৩ সালের নভেম্বর থেকে ম্যসট্রিস্ট চুক্তি বলবৎ হয়। ইউরোপীয় মনিটরি ইউনিয়ন (EMU) ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এর ২য় পর্যায় শুরু করে। এ সময় সদস্য দেশগুলোর কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্ণরদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইউরোপীয় মনিটরি ইনস্টিটিউট (EMI) যা পরবর্তীতে ইউরোপীয় কেন্দ্রিয় ব্যাংকে পরিবর্তিত হয়। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ একটি একক ইউরোপীয় মুদ্রার নামের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান এবং এর নামকরণ করেন "ইউরো"। ১৯৯৫ সালের মাদ্রিদ কাউন্সিলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি "ইউরো" চালু করা হয় এবং ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি বাজারে নোট ও মুদ্রা ছাড়া হয়। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবস্থিত ফ্রাংকফুট, জার্মানি।

৬.১১ ইউরো'র প্রভাব

ইউরো মানে মুদ্রা বাজারে একটা স্থিরতা। অভিন্ন মুদ্রা গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো তাদের আর্থিক নিয়ম নীতি ম্যাসট্রিস্ট চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসারে তৈরি করছে। ইউরোপের একক বাজার প্রসারের ক্ষেত্রে ইউরো সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করছে। ইউরো-তে ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন শুরু হবার পর মুদ্রা বিনিময়ের খরচ এবং জটিলতা উভয়ই দূর হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরো অঞ্চলে পুঁজি বিনিয়োগ দ্রুত ত্বরান্বিত হচ্ছে। আর্থিক খাতে ইউরো নতুন কিছু সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইউরো গ্রহণকারী অঞ্চলের বন্ড, ষ্টক এবং ব্যাংক সম্পত্তির পরিমাণ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৯৯ সনে ইউরোপীয় ইস্যুকৃত বন্ডের পরিমাণ যে কোন মুদ্রায় ইস্যুকৃত বন্ডের পরিমাণের চেয়ে বেশি। ধাপে ধাপে ইউরো একটা বড় ধরনের রিজার্ভ মুদ্রায় পরিণত হচ্ছে। বিশ্বে বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ তুলনা করলে ইউরো'র রিজার্ভের পরিমাণ বিশ্বের মোট রিজার্ভের ২৫ শতাংশ। এর ফলে EU বিশ্বের বেশ কিছু বোঝা বহন করতে সক্ষম হচ্ছে। যেমন : এশিয়ার আর্থিক দুরাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি EU শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। ১৯৯৯ সনে প্রথম ভাগে ইউরো-ডলারের হার ছিল ১ ইউরো সমান ১.০৯৮ মার্কিন ডলার।

৬.১২ ইউরো চালু করার শর্তসমূহ

১৯৯৮ সনের ২-৩ মে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিল বৈঠকে পর্যালোচনার পর দেখা যায় ইইউ-র ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১১টি সদস্য নিজেদের মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা "ইউরো" চালু করার বিষয়ে একমত হয়েছে। তারা ১ জানুয়ারি ১৯৯৯ থেকে এ অভিন্ন মুদ্রা চালু করার প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে। EU -র যে ১১টি সদস্য ইউরো মুদ্রা চালু করার বিষয়ে একমত হয়েছে সেগুলো হলো : বেলজিয়াম, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, ইটালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল ও ফিনল্যান্ড। ২০০১ সনে গ্রীস এই অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থায় যোগ দেয়। অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালুর এর অগ্রগতি অর্থনৈতিক ও মুদ্রা বাজারের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইউরোপীয় মনিটরী ইন্সটিটিউট এর কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী ইউরো চালু করা ১১টি রাষ্ট্র যে সব শর্ত পূরণ করে তার সার সংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. জাতীয় আইন প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থা প্রভৃতি ইউরোপীয় সিস্টেম অফ সেন্ট্রাল ব্যাংকের নিয়ম নীতির সাথে সামঞ্জস্য করা।
২. জানুয়ারি ১৯৯৮ এর শেষে গড় মুদ্রাস্ফীতি নির্ধারিত হারের ভিতরে রাখা।
৩. সরকারি অতিরিক্ত ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।
৪. বিগত দুই বছর যাবৎ ইটালি ও ফিনল্যান্ড ছাড়া বাকী ৯টি দেশ ERM এর সদস্য হয়। কিন্তু ইটালি ও ফিনল্যান্ড পরবর্তীতে ERM এর সদস্য ভুক্ত হয়। ফিনল্যান্ড ও ইটালির পরবর্তীতে সদস্যভুক্তির বিষয়টি ইউরো চালুর ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি।
৫. ১৯৯৮-এর জানুয়ারির শেষে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার নির্ধারিত মাত্রার ভিতরে পাওয়া যায়।

৬.১৩ ইউরোর নোট ও মুদ্রা

ইউরোতে নোট আসছে ৭টি। এ ৭টি নোটের মূল্যমান হলো ৫০০, ২০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০ এবং ৫ ইউরো। এর ডিজাইনে স্থান পেয়েছে ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় স্থাপত্য। নোটগুলোর ওপরের ভাগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রবেশদ্বারের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। উপরিভাগের এ ছবিগুলো একটা বিশেষ অর্থ বহণ করবে। এর অর্থ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত। নোটগুলোর বিপরীত পিঠে বিভিন্ন যুগের নতুন ছবি ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ হল ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বিশ্বের সব দেশের সাথে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী। ইউরো নোটের পাশাপাশি ইউরো মুদ্রা চালু করা হয়েছে ৮টি। এ মুদ্রাগুলোর মূল্যমান হলো ২ ও ১ ইউরো এর ৫০, ২০, ১০, ৫, ২ ও ১ সেন্ট। প্রতিটি মুদ্রাতে ইউরোপের একটা সাধারণ চিত্র আছে। অপর পিঠে সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী চিত্র মুদ্রিত করেছে। কিন্তু সব মুদ্রাই সব দেশে কার্যকরভাবে চলবে। যেমন- একজন ফরাসি নাগরিক জার্মানির তৈরি মুদ্রা ব্যবহার করতে পারবে। ইউরোর সংক্ষিপ্ত সরকারি নাম হবে 'ইউর' (EUR)।

৬.১৪ ইউরোর অর্থনীতিতে প্রভাব

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিন্ন মুদ্রা ইউরো ইউরোপীয়ান অর্থনীতিকে সুদৃঢ়ভাবে একীভূত করেছে। উল্লেখ্য ১ জানুয়ারি ১৯৯৯ থেকে এ নতুন মুদ্রা ইউরো চালু হয়েছে। এ অভিন্ন মুদ্রা চালুর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তিনটি স্তর অতিক্রম করে আসে ।

১. ১৯৯২ সালে ইইউ সদস্যরা একক বাজার গড়ে তোলে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সনের ১ জুলাই থেকে ইইউ সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সীমান্ত পণ্য চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।
২. ১৯৯৪ সালে ইউরোপীয়ানমনিটরি ইনস্টিটিউট গঠন করে।
৩. ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক গঠন।

১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫টি সদস্যের মধ্যে যে ১১টি সদস্য অভিন্ন মুদ্রা ইউরো গ্রহণ করেছে তারা তাদের নিজস্ব মুদ্রা ২০০২ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছে। ২০০২ সালে স্থায়ীভাবে ইউরো তার স্থান দখল করেছে ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী এগারটি রাষ্ট্রের বিশ্ব বাণিজ্যে এবং জিডিপি-তে অংশগ্রহণ প্রায় ২০%। অতএব এ ইউরো আঞ্চলকে বিশ্ব বাণিজ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। ম্যাসট্রিচ চুক্তি অনুযায়ী অভিন্ন মুদ্রা চালুর ব্যাপারে আগ্রহী রাষ্ট্রগুলো তাদের শর্তাবলী পূরণ করেছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে ২ মে, ১৯৯৮ ব্রাসেলসে ইউরোপীয়া ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। ১ জানুয়ারি, ২০০২ সাল পর্যন্ত ইউরো প্রকৃত পক্ষে একটা খাতা-পত্রে মুদ্রা এবং এ সময় পর্যন্ত ইউরো মুদ্রা বাজারে যেভাবে কাজ করে তা হলো।

১. ইউরো-তে অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলো মুদ্রার সাথে ইউরো'র বিনিময় হার নির্ধারিত ছিল।
২. নতুন ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের সকল কাজ-কর্ম ইউরো-তে হয়।
৩. পাইকারী বাজার, আর্থিক এবং পুঁজি বাজার নতুন অভিন্ন মুদ্রা ইউরো ব্যবহার করে।
৪. সকল সরকারি ঋণ ইউরো-তে প্রদান করা হয়।
৫. জনগণ ইচ্ছা করলে ইউরো-তে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পেরেছে।
৬. ইউরোতে ব্যবহারযোগ্য ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায় এবং বর্তমান ক্রেডিট কার্ডেও ইউরো-তে লেনদেন করা যায়।
৭. ইউরো গ্রহণ করা রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসন কোম্পানির কাগজপত্র, কর প্রদান, ইত্যাদি কাজ ইউরো-তে করার ব্যাপারে আপত্তি করবে না।
৮. ২০০২ সাল পর্যন্ত দ্বৈত মূল্যায়ন ব্যবস্থা (জাতীয় মুদ্রা ও ইউরো) বহাল ছিল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপীয়ানরা ইউরো চালুর পক্ষে। ইউরোপীয় কমিশন ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রে একটি জরিপ চালালে দেখা যায় ৬১% লোক ইউরো চালুর পক্ষে এবং ২৮% লোক এর বিপক্ষে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৬.১৫ ইউরো ও একক বাজার

ইউরোপের একক বাজারের জন্য অভিন্ন মুদ্রা ইউরো প্রকৃতপক্ষে একটা স্বপ্নেচ্ছা। ইউরোপের এ একক বাজার প্রতিষ্ঠান বিষয়টি ১৯৯২ সালে সমাধা হয়। ইউরোপের এ একক বাজারটি প্রকৃতপক্ষে ৩০০টি অভ্যন্তরীণ বাজার একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে। ইউরোপের এ একক বাজারে ৪টি বিষয়ের অবাধ বিনিময় হবে। এগুলো হল :

১. পণ্য দ্রব্য।
২. মূলধন।
৩. লোকবল।
৪. পরিসেবা।

১৯৯২ সালের একক বাজার প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্যে এখন দরকার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একক বাজার পরিচালনা করার জন্যে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে। এ অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে তাদের বাজার পরিচালনা করছে। ইউরোপীয়ান ও বিদেশি কোম্পানি সবার জন্যই এ একক মার্কেটের সুবিধা সমান। এ মার্কেটের কার্যক্রমগুলো খুব স্বচ্ছ। বিদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে জাপান সরাসরি এবং যৌথ পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ইউরোপের এ একক বাজার ব্যবস্থায় সবচাইতে বেশি সুবিধাজনক অবস্থান নিয়েছে। ইউরো অঞ্চলের মুদ্রা নীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং তা কার্যকরী করা হয়। আর এ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে স্বাধীন ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক। ১৯৯৮ সনে ফ্রাঙ্কে এ ব্যাংক উদ্বোধন হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে ১ জানুয়ারি ১৯৯৯। ইউরোপীয় সিস্টেমস অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক (ESCB) ইউরোতে অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় পরিচালনা করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখাসহ পেমেন্ট সিস্টেম দেখাশোনা করে। এখানে উল্লেখ্য ইউরোপীয়ান ব্যাংকের প্রধান পদটির নাম প্রেসিডেন্ট। এছাড়া থাকে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও একজিকিউটিভ বোর্ডের সদস্যরা।

৬.১৬ ভবিষ্যৎ বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে ইউরো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য একক ইউরোপের প্রয়োজনীয়তা তীব্র অনুভূত হয়। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের রোম চুক্তি থেকে একক ইউরোপ গঠনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে একক ইউরোপ গঠনের প্রাথমিক ধাপ সমাপ্ত হয়। মূলত বিশ্বের ক্রম পরিবর্তনশীল অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং বিশ্বে ইউরোপকে একক অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ। সমগ্র ইউরোপীয় কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ হিসেবে EU কে ব্যাপক সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া হিসেবে ২০০৪ সালের মে মাসে EU তে আরো ১০টি দেশ যোগ দিলে EU- এর সদস্য দাঁড়ায় ২৫। ১ জানুয়ারি, ২০০৭ সালে দুটি দেশ যোগ দিয়ে সদস্য হয় ২৭ এবং বর্তমান ২০১৩ সালে ১ জুলাই ক্রোয়েশিয়া ২৮তম দেশ হিসেবে EU তে যোগ দেয়। কিন্তু বর্তমানে ১৮ট দেশে ইউরো চালু আছে এবং বেশিরভাগ সদস্য দেশে "ইউরো" মুদ্রা চালু আছে এবং যে সকল দেশে "ইউরো" মুদ্রা চালু হয় নি সে সকল দেশে চালু করার প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ১৮তম দেশ হিসেবে "ইউরো" মুদ্রা চালু করে ১ জানুয়ারি, ২০১৪ সালে লাটভিয়া। ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালের ইউরো চালু হওয়ার পর থেকে বিগত ১৪ বছরের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে ইউরো এখন মার্কিন ডলারের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বি। বিশ্বে অতি দ্রুত এর ব্যবহার এবং বিনিময় বেড়ে চলেছে এবং প্রভাব বিস্তার করছে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর। ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক যে "ইউরো" হবে সে সম্পর্কে মতামত নিচে তুলে ধরা হলো :

১. **অর্থনৈতিক প্রধান্য :** শুধুমাত্র রাজনৈতিক কিংবা জাতিগত আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবর্গ গোড়া হইতেই অর্থনৈতিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে "তারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, আঞ্চলিক বা আন্তঃমহাদেশীয় যে কোনো জোটের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা তথা লাভের বিষয়টি প্রধান্য না পেলে সেই জোট বা ঐক্য জোরদার ও স্থায়ী হতে পারে না। সেই লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ইউরোপীয় জোটভুক্ত দেশসমূহ

অভিন্ন মুদ্রা চালুর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রিদ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনিয়নভুক্ত ইউরোপের জন্য এক ও অভিন্ন মুদ্রা "ইউরো" চালু করার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে অদুনা "ইউরো" অন্যতম শক্তিশালী মুদ্রার অন্য নাম।

২. **জাতীয় উৎপাদন ঃ** ২৮টি দেশের এই জোটের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ। এবং সম্মিলিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৩০০ কোটি ইউরো মুদ্রা যা যেকোন অর্থনৈতিক শক্তির জন্য চ্যালেঞ্জ এবং যে কোন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও মোকাবেলা করার মত শক্তিশালী।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদ:** ইইউতে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম ইস্পাত, কয়লা ও লৌহখনি এবং ইইউভুক্ত দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত, মাথাপিছু আয় ভালো যা মোট জিডিপি সাফল্যজনক বৃদ্ধিতে সহায়ক। ফলে ইউরো একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর অবস্থান করছে।

৪. **শিল্প প্রধান :** ইইউ-তে রয়েছে জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যান্ড ও স্পেনের মতো বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্পপ্রধান দেশ এবং প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। যা ইউরোকে গতিশীল করতে এবং বিশ্ব বাণিজ্য ইইউরোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫. **স্থির মূল্য :** ইউরো সিস্টেমের উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে অন্যতম একটি হলো স্থিরমূল্য ধরে রাখা (চুক্তির ১০৫ নং ধারা)। কারণ এর ওপর নির্ভর করছে মূল্যস্ফিতির ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি। আর মূল্যস্ফিতির হারের উপর নির্ভর করছে অর্থনীতির ভালোমন্দ। মূল্যস্থিরতাকে ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক যেভাবে সংযোজিত করেছে সেটি হলো-E "As a year-on-year increase in the Harmonized Index of Consumer Price (HICP) for the Euro area of below 2%"। মুদ্রানীতির উপাদানসমূহ বলতে বোঝায় হয় মূল্য অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যালান্স সিটের উপাদানগুলোর সংখ্যা মুদ্রানীতির এ উপাদানগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো কোন রকম ত্রুটি ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য। মুদ্রানীতির নির্দেশক সমূহ পরিবর্তনশীল। এ নির্দেশকগুলো মুদ্রানীতিকে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যাবলীকে পূরণ করতে সহায়তা করে। মুদ্রানীতিকে কাম্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। আর এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় ইউরোকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিশ্ব বাজারে প্রভাব বিস্তারের জন্য। ইউরো শক্তিশালী ও স্থিতিশীল মুদ্রা হওয়ার কারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে করে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউরোর প্রভাব বেড়ে যায়।

৬. **ই-ইউ বাজার :** ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত এলাকা বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাজার। ইউরোপের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর অবাধ বিস্তার। বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প পণ্যের উৎপাদন রয়েছে এ অঞ্চলে। এত বড় বিশাল বাজারের বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক হিসেবে ইউরো ইতোমধ্যেই বিশ্বের অর্থনীতিতে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। ইউরোপের এ একক বাজারটি প্রকৃতপক্ষে ৩০০টি অভ্যন্তরীণ বাজার একত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছে।

৭. **ইইউ এর একক বিদেশনীতি ও নিরাপত্তানীতি :** ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একটি একক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিচালিত করার জন্য একক বিদেশনীতি ও নিরাপত্তা নীতির ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ আলোচনা চলছে। তবে আশার ব্যাপার হল ইইউ এর সকল সদস্য দেশ ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে তারা কেউ ইইউ- এর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে এমন বিদেশনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করবে না। যা ইইউ- এর অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ফলে ইউরো ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

৮. **পুঁজিবাজার :** ১৯৯৯ সালে ইইউ এর ১১টি দেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ২৭% বেশি এবং জাপানের প্রায় দ্বিগুণ। অপরদিকে এই ১১টি দেশের রপ্তানি বিশ্বের মোট রপ্তানির ২০%। বর্তমান ইইউ এর সদস্য সংখ্যা ২৮টি এবং রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। এই সকল আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে একক মুদ্রা হিসেবে ইউরো এখন ডলারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত

হচ্ছে। তাই অর্থনীতিবিদ এবং বাণিজ্য পর্যবেক্ষকদের ধারণা হচ্ছে ইউরো অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সর্বাধিক তেজি মুদ্রায় পরিণত হয়ে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে।

৯. **বিনিময় হার বৃদ্ধি :** ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হলেও ২০০৪ সালের মাঝামাঝি এর বিনিময় হার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শেয়ার বাজার ইউরো ক্রেডিট কার্ড, ইউরো কার্ড ও ইউরো চেক চালু হয়েছে। কাগজের মুদ্রা হিসেবে ইউরো বিশ্বব্যাপী বিনিময় ব্যবস্থায় আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শেয়ার বাজারে পৃথিবীর অন্যান্য কারেন্সি বিশেষ করে ডলারের পাশাপাশি ইউরোর অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউরো নিয়ন্ত্রক হবে একথা স্পষ্ট।

১০. **বিশ্ব অর্থনীতি এবং ইউরো :** বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলো হলো : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন, জাপান এবং এশিয়া। ইউরো গঠনের পূর্বে অর্থাৎ ৯০ এর দশক এর শুরুতে এবং তার পূর্বে বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জাপান। বর্তমানে জাপানের অর্থনীতি দুর্বল না হলেও তার সেই চ্যালেঞ্জিং রূপ এখন আর ততটা শক্তিশালী নয়। অপরদিকে এশিয়ার অর্থনীতিতে এতদিন তেমন শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে না পারলেও বর্তমানে চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বিশেষ করে এপেকভুক্ত দেশগুলো ভালো করলেও বিশ্ব অর্থনীতিতে তেমন একটা প্রভাব ফেলছে না। কাজেই বিশ্ব অর্থনীতি এখন অনেকটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির উপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ ইউরো এবং ডলারের ওপরই নির্ভরশীল। এতদিন ডলারের একক প্রভাব থাকলেও সম্প্রসারমান ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৫ এবং ২০০৭ সালে তা ২৮-এ দাঁড়ায়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোই যে হবে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক একথা বিশ্ব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেছেন।

১১. **ভ্রমণ বৃদ্ধি :** ২০০২ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের ১২ শতাংশ লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে ইউরোতে। ইউরোপে যারা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কিংবা বেড়াতে যাবেন তাদের একটি মুদ্রা কিংবা ট্রাভেলারস চেক কিনলেই চলবে। যেখানে এক দেশ থেকে আর এক দেশে গেলে মুদ্রা বদলের ঝামেলা থাকবে না। ফলে মুদ্রার অবাধ প্রবাহের কারণে ইউরোর গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

১২. **বিনিয়োগ :** ইউরো চালু হওয়ার ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বেড়েছে অনেক বেশি। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ অনেক কমে গেছে অন্যান্য এলাকা তুলনায়। অর্থাৎ জার্মান, সুইডেন, ইটালির উদ্যোক্তারা, মাল্টা, সাইপ্রাসে বিনিয়োগ বা কারখানা স্থাপন করতে চাইলে প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করা অনেক সহজ হবে একক মুদ্রা হওয়ায়। কাজেই যেমন ঝামেলা হবে না, তেমনি অভিন্ন শুল্ক ও করনীতির সুবিধা সবাই ভোগ করবে। এছাড়া যেসব এলাকায় জনশক্তির পারিশ্রমিক কম এবং পর্যাপ্ত কাঁচামাল রয়েছে সেসব এলাকায় অবাধে বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে উৎপাদিত পণ্যের খরচ কম হবে এবং মুনাফা বেশি হবে। বিশ্ববাজারে পণ্যের বিক্রি ও চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে ইউরো শক্তিশালী হবে।

৬.১৭ মূল্যায়ন (Evaluation)

ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে ইউরো এ ব্যাপারে বিশ্ব অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা আশা ব্যক্ত করলেও এসবকিছু নির্ভর করছে ইউরোভুক্ত সদস্য দেশগুলোর সার্বিক অংশগ্রহণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নে যেমন রয়েছে জার্মানি, ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী অর্থনৈতিক পরামক্তি অপরদিকে রয়েছে স্পেন বুলগেরিয়ার মতো দুর্বল অর্থনৈতিক দেশ। আবার পশ্চিমে রয়েছে উদার গণতান্ত্রিক দেশ অপরদিকে পূর্বে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এ সমস্ত অসম ব্যবধানগুলোর মাঝে সমতা বিধান করে পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে বিশ্বে ডলার যেমন একক প্রভাব বিস্তারকারী মুদ্রা হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে রেখেছে সেক্ষেত্রে ইউরোকে একটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। ডলারের সঙ্গে সেক্ষেত্রে সম্মিলিত ইউরোপের শক্তি হিসেবে ইউরো সফল হবে বলে বিশ্বাস।

এক নজরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

- EU-এর পূর্ণরূপ : European Union
- EU-এর পূর্বনাম : Europeo Commission (EC)
- EU নামকরণ হয় : ১ জানুয়ারি, ১৯৫৫ সালে।
- EU আত্মপ্রকাশ করে : ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ রোমে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ২৮টি দেশ।
- সদস্য দেশ : বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, পর্তুগাল, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, স্লোভেনিয়া, এস্তানিয়া, হাঙ্গেরি, সাইপ্রাস, মাল্টা, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া।
- সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র :২৮তম দেশ - ক্রোয়েশিয়া (১ জুলাই, ২০১৩ সালে)।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ৬টি (বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানি)।
- সহযোগী সদস্য : ১টি (তুরস্ক)।
- EU-তে যোগদানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কোন দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় : তুরস্কে।
- কোন দেশ গণভোটের বিরোধিতার কারণে EU-তে যোগদান করেনি : নরওয়ে।
- সদর দপ্তর : বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে।
- EU-এর অঙ্গ সংগঠন : ৮টি। যথা- ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, কাউন্সিল অব ইউরোপ, ইউরোপীয় কমিশন, দি কোর্ট অব জাস্টিস অব দ্য ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, ইউরোপিয়ান কোর্ট অব এডিটরস, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইকনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিটি এবং কমিটি অব রিজনস।
- ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বর্তমান সদস্য সংখ্যা-৭৬৬ জন।

ইউরোপীয় মুদ্রা 'ইউরো'

- EU-এর একক মুদ্রার নাম : ইউরো।
- ইউরো চালু হয় : ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে।
- ইউরো মুদ্রার জনক : রবার্ট মেন্ডেল (১৯৯৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী)।
- ১৯৯৯ সালে ইউরো মুদ্রা চালু হয় : ১১ টি দেশে।
- কোন চুক্তির ফলে ইউরোপে এক ইউরোপ ও একক মুদ্রা চালু হয় : ম্যাসট্রিচট চুক্তির ফলে (১৯৯২ সালে)।
- ইউরোপের বাইরে প্রথম কোথায় ইউরো মুদ্রা লেনদেন হয় : ভারত।
- পূর্বের ১৫ সদস্যের কোন কোন দেশে এখনো ইউরো চালু হয় নি : যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ও সুইডেন।
- ইউরো ব্যাংক নোটের প্রচলন শুরু হয় : ১ জানুয়ারি, ২০০২ সালে।
- EU-এর বাইরে কোন কোন দেশ ইউরোকে তাদের নিজস্ব মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করে : এন্ডোরা, মোনাকো, সানম্যারিনো, কসোভো, মন্টিনিগ্রো ও ভ্যাটিকান সিটি।।
- সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব ব্যাংক নোট ও মুদ্রা বাতিল হয় : ১ জুলাই, ২০০২ সালে।
- বর্তমানে কয়টি দেশে 'ইউরো' মুদ্রা চালু আছে ১৮টি
- সর্বশেষ কোন দেশ 'ইউরো' মুদ্রার প্রচলনকারী দেশ : লাটভিয়া (১ জানুয়ারি ২০১৪; ১৮তম)

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **EU- এর পূর্ণরূপ কি?**
উত্তর: European Uunion

২. **EU-এর পূর্ব নাম কি?**
উত্তর: Europeo Commission (EC)

৩. **EU-এর নামকরণ করা হয় কখন?**
উত্তর: ১ জানুয়ারী ১৯৫৫

৪. **১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ রোমে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কখন আত্মপ্রকাশ করে?**
উত্তর: ১ জানুয়ারী ১৯৫৮

৫. **EU-এর বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা কত?**
উত্তর: ২৮টি

৬. **সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র অর্থাৎ ২৮ তম দেশ কোনটি?**
উত্তর: ক্রোয়েশিয়া।

৭. **EU-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ কয়টি?**
উত্তর: ৬টি

৮. **EU-এর সদর দপ্তর কোথায়?**
উত্তর: বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস

৯. **EU-এর অঙ্গ সংগঠন কয়টি?**
উত্তর: ৮টি

১০. **EU-এর একক মুদ্রার নাম কি?**
উত্তর: ইউরো

১১. **কখন থেকে ইউরো চালু হয়?**
উত্তর: ১ জানুয়ারী ১৯৯৯

১২. **ইউরো মুদ্রার জনক কে?**
উত্তর: রবার্ট মেন্ডেল।

১৩. **ইউরোপের কাইবে প্রথম কোথায় ইউরো মুদ্রা লেনদেন হয়?**
উত্তর: ভারত

Go to Contents
http://thejobstudy.com

১৪. ইউরো ব্যাংক মোটের প্রচলন শুরু হয় কখন?
উত্তরঃ ১ জানুয়ারী ২০০২

১৫. বর্তমান কয়টি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু আছে?
উত্তরঃ ১৮টি

১৬. ইউরো সংক্ষিপ্ত রূপ কি?
উত্তরঃ EUR

১৭. সর্বশেষ ইউরো মুদ্রা প্রচলনকারী দেশ কোনটি?
উত্তরঃ লাটভিয়া

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) EU- এর পূর্ণরূপ কি?
(খ) EU-এর পূর্ব নাম কি?

২. (ক) EU-এর নামকরণ করা হয় কখন?
(খ) EU-এর অঙ্গ সংগঠন কয়টি?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. EU-এর সদস্য বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব হবে বলে আপনি মনে করেন ? সাম্প্রসারিত ইইউ বিস্তারে বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলতে পারে ?

২. গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দার কারণসমূহ আলোচনা করুন। এ সংকট নিরসনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আলোচনা করুন।

৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৪. ইউরো কী? ভবিষ্যৎ বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে ইউরো- মতামত দিন।

অধ্যায় ৭

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংঘ (আসিয়ান)
Association of South-East Asian Nations (ASEAN)

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৭.১ ভূমিকা
৭.২ আসিয়ান প্রতিষ্ঠার কারণ
৭.৩ আসিয়ানের গঠনের ইতিহাস
৭.৪ আসিয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭.৫ সহযোগিতা ও অগ্রগতি
৭.৬ আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ১০ দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি
৭.৭ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ান এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
৭.৮ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে আসিয়ান
৭.৯ যে সকল কারণে বাংলাদেশ আসিয়ান এর সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা
৭.১০ সাফল্য ও ব্যর্থতা
৭.১১ আসিয়ানের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হলো আসিয়ান। এ এলাকার দেশসমূহ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অঞ্চলের দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার, অর্থনৈতিক কাঠামো পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি বিশাল স্থান দখল করে আছে। ১৯৬৭ সালে ASEAN গঠিত হওয়ার পর থেকে বিগত ৪৮ (১৯৬৭-২০১৪) বছরে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদের আদান-প্রদান, বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ASEAN- ভুক্ত প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভীতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ব্যাংকক ঘোষণা (Bankok Declaration) স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংগঠন হলো Association of South-East Asian Nations (ASEAN). পাঁচটি দেশ নিয়ে আসিয়ান যাত্রা শুরু করেছিল; সেগুলো হলো : ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি উন্নয়নকামী দেশ নিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আসিয়ান সেই সকল অঞ্চলের একটি। তাই বিশ্বরাজনীতিতেও বর্তমানে আসিয়ানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে চিন্তা না করে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে আসিয়ানকে বলা হয় Rising Dragon, সেজন্য আঞ্চলিক জোট হিসেবে আসিয়ানের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭.২ আসিয়ান প্রতিষ্ঠার কারণ (Causes of the foundation of the ASEAN)

আসিয়ান প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য একটি মাইলফলক। নিম্নে এটি প্রতিষ্ঠা করার কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো :



১. **কোরিয়ার জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রয়োজন :** আসিয়ান গঠনের আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতির ওপর একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। কারণ এটাই আসিয়ান গঠনের প্রধান প্রেরণাদাতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আদি কোরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ এ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হয় নি। দুই কোরিয়া যেকোনো অজুহাতে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। কোরিয়া চীনের একেবারে কাছে। সুতরাং চীন চাইত না তার সদর দরজার সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করুক। তাই সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে উৎসাহ দেখাতে শুরু করে। এদিকে এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক চীনা থাকায় তাদের স্বার্থের কথা সে ভাবতে বসে। চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিক্ততা তখন চরম। জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

২. **ন্যাটো এবং সিয়াটোর প্রভাব :** ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার কয়েকটি দেশকে নিয়ে ন্যাটো গঠন করেও আমেরিকা নিশ্চুপ থাকতে পারে নি। ইউরোপে সোভিয়েত সম্প্রসারণকে ঠেকাবার জন্য ন্যাটো জবরদস্ত হাতিয়ার হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তদানীন্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তা প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে। তাই থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনকে নিয়ে সে সিয়াটো (সাউথ-ইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন) গঠন করে। সিয়াটো চীন ও ভারতের কাছে এক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমবর্ধমান মার্কিন প্রভাব



আশিয়ানভুক্ত দেশসমূহ

http://thejobstudy.com Go to Contents

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে, এ আশঙ্কা দূর হয়। যে স্নায়ুযুদ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকাকে ইতোমধ্যে গ্রাস করে ফেলেছে, তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসন তৈরি করে নিতে চাইছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সঠিক অর্থে জোটনিরপেক্ষ না হলেও ওয়াশিংটন এবং মস্কোর দাদাগিরি থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

৩. **ভিয়েতনাম যুদ্ধ :** ইন্দোচীন ফরাসি শাসনাধীনে। জাতীয় মুক্তির জন্য সেখানকার অধিবাসীরা জীবনমরণ লড়াই চালাচ্ছে। অনেক সম্মেলন, আলাপ-আলোচনার পর ফ্রান্স সরে এলে গঠিত হলো ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া। আমেরিকা ভিয়েতনামে যুদ্ধ বাধিয়ে বসল এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে সে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ও ভিয়েতনামের রাজনীতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বিশেষ ঘটনা। কেবল ভিয়েতনাম নয়, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তাকে কোণঠাসা করার জন্য একদিকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যদিকে চীন সক্রিয় হয়ে ওঠেছিল। এ পরিস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে।

৪. **জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নিষ্ক্রিয়তা :** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অগ্নিগর্ভ রাজনীতি আলোচনার জন্য ১৯৫৪ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ জেনেভায় সম্মেলন করে। ১৯৫৫ সালে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় বান্দুং সম্মেলনে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ মিসরের রাষ্ট্রপতি নাসের যোগদান করেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নয় বছর সময়কে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের যুগ বলে অক্লেশে অভিহিত করা চলে। এ সময়কে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সুবর্ণ যুগও বলা যায়। ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর পর আন্দোলনে ভাটার টান দেখা যায়। ওদিকে আবার সুকর্ণ, সুহার্ত কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত। নেহেরু ও নাসের আফ্রো-এশীয় ঐক্য কখনো বাস্তবায়িত হবে না, তার চেয়ে বরং এ এলাকার মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলাই ভালো। পল ক্যামাক, ডেভিড পুল ও উইলিয়ম টর্ডফ বলেছেন, "Meanwhile sources of tension which had hindered the emergence of regional grouping in the early 1960 the dispute between Malay and the Philippines over Sabah in 1962, the aggresive policy of confromasi pursued by Indonesia against Malaysia from 1963 to 1965 and Singapore withdrawal from the Malaysian federation in 1965 had either faded or been resolved".

৭.৩ আসিয়ান গঠনের ইতিহাস (History of Organizing ASEAN)

১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৫টি দেশ ব্যাংককে মিলিত হয়ে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রচার করে আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং সেটাই আসিয়ান নামে পরিচিত। আসিয়ান বা ASEAN-এর পুরো নাম Association of South-East Asian Nations. আফ্রিকান ঐক্য সংগঠনের মতো এটি আয়তনে এত বড় নয়। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে ৫টি দেশ নিয়ে আসিয়ান যাত্রা শুরু করেছিল সেগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড। ১৯৮৪ সালে তেলসম্পদে সমৃদ্ধ ব্রুনাই আসিয়ানের সদস্য হয়। ভিয়েতনামের সদস্য হওয়া কী করে সম্ভব হলো? ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার যখন যুদ্ধ চলছিল তখন মার্কিন কর্তারা ভিয়েতনামের ওপর ত্রিশ বছরের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিল ক্লিনটন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে ১৯৯৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলার জন্য আসিয়ানের সদস্য হয়। ১৯৯৭-এর জুলাই মাসে মিয়ানমার এবং কম্বোডিয়াকে আসিয়ান সদস্যপদ দেয়। লাওসও একই সঙ্গে সদস্য হয়। ৫টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল আসিয়ান। আর ১৯৯৭ সালে এটি হলো 'আসিয়ান-১০'।

সূচনা পর্বের ৫টি দেশ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পরে যারা এর সদস্য হয়েছিল তাদের সম্পর্কে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। আসিয়ানের সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজনে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ

ব্রুনাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ব্রুনাইরও আর্থিক লাভ কম হয় নি। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভিয়েতনামের কোনো বাধা থাকল না আঞ্চলিক সংগঠনের সদস্য হয়ে সে তার বাণিজ্য বাড়িয়ে তুলল। মিয়ানমারের সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে আসিয়ানের সদস্য করতে আপত্তি জানিয়েছিল।

৭.৪ আসিয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of ASEAN)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তির এলাকায় পরিণত ও উত্তেজনামুক্ত করার জন্যই আসিয়ান গঠিত হয়েছিল। ইন্দোচীনের অশান্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে যাতে গ্রাস করতে না পারে, সেই কারণে ৫টি দেশ তৎপর হয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ১৯৭১ সালে আসিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মিলিত হয়ে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ এলাকা গঠনের উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগের নাম দেওয়া হয় ZOPFAN-Zone of Peace, Freedom and Neutrality. ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল। আসিয়ানের সদস্যরা মনে করতেন, এগুলো এলাকার শান্তির পরিপন্থী এবং সেগুলো অপসারিত করার জন্য ওয়াশিংটনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত ঘাঁটিগুলো পরোপুরি অপসারিত না হলেও সুদৃঢ় করার পথ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিরত রেখেছে। লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে (সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এটি ঘটে) আসিয়ান নিরপেক্ষ নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে আসিয়ান

- ASEAN-এর পূর্ণরূপ : Association of South-East Asian Nation.
- ASEAN প্রতিষ্ঠিত হয় : ৮ আগস্ট, ১৯৬৭ সালে
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ৫ টি দেশ যথা- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড।
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১০টি।
- সর্বশেষ সদস্য : কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে)।
- বর্তমান সদস্য দেশ : মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার ও কম্বোডিয়া।
- সদর দপ্তর : সিঙ্গাপুর (পূর্বে ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়)।
- ASEAN সম্মেলনের নাম : ASEAN +3
- ASEAN +3 এর +3 কি : চীন, জাপান ও উত্তর কোরিয়াকে ASEAN-এর অন্তর্ভুক্ত।
- ASEAN-এর সর্বশেষ সম্মেলন : ৩-৪এপ্রিল, ২০১২ সালে, নমপ্নহ, কম্বোডিয়া।
- ASEAN কবে থেকে বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করে : ২০০৩ সাল থেকে।
- আসিয়ানের বর্তমান মহাসচিব (১৩তম) লি লং মিন (১ জানুয়ারি, ২০১৩- বর্তমান) ভিয়েতনাম।
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি।

শান্তির পথ বেছে নেওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈরিতা, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, পাক-ভারত দ্বন্দ্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রকট হয়ে ওঠে। সেই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে আমেরিকা ভারত মহাসাগরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার উদ্যোগ প্রাধান্য পায়।

শান্তি স্থাপন বা শান্তির এলাকায় পরিণত করা আসিয়ানের মুখ্য লক্ষ্য হলেও অর্থনৈতিক লক্ষ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষাটিকে কোনো প্রকারে গৌণ বলে মনে করা চলে না। ক্যামাক, পুল এবং টর্ডফ বলেছেন, ASEAN concentrated on measres of economic cooperation and integration in the areas of food and energy, large scale industrial projects, intra-regional trade liberalisation and joint initiatives on international commodity problems. দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়াই আসল লক্ষ্য। যে সমস্ত কৌশল প্রয়োগে সদস্যরা অগ্রসর হচ্ছিল সেগুলোর দিকে তাকালে দেখা

যাবে, বাজার অর্থনীতির মূলসূত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধী আসিয়ানের সদস্যরা কোনো দিন ছিল না, এখনও নয়।

কালভোকোরেসি সংক্ষেপে আসিয়ানের উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন, দারিদ্র্য, রোগ ও সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক তদারকিকে উন্নত করে তোলা এবং বিদেশি শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখা। বিদেশি শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখতে আসিয়ান কতখানি সফল হয়েছিল, তা নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তবে যৌথ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ এলাকায় অর্থনৈতিক বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ প্রতিহত করা আসিয়ানের আরেকটি উদ্দেশ্য। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট শাসন ও কম্বোডিয়ার ওপর ভিয়েতনামি আগ্রাসনের দরুন আসিয়ান তাকে সদস্য করে নি। পরে মার্কিন মধ্যস্থতায় ভিয়েতনামকে সদস্য করা হয়। থাইল্যান্ডের সরকার চীনের ওপর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল বলে আসিয়ানের প্রবেশদ্বার থাইল্যান্ডের জন্য খোলা হয় নি। পরে আসিয়ান সিদ্ধান্তের সংশোধন করে তাকে সদস্য করে নেয়। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া সম্পর্কের ইস্যুটি আসিয়ান একাধিকবার জাতিসংঘে তুলেছে।

শীর্ষ সম্মেলনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : আসিয়ানের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে। রাষ্ট্রপ্রধানদের এ বৈঠক তিন বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনির্ধারিত বৈঠক হতে পারে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছর। এছাড়া যে সমস্ত খাতে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সে খাতগুলো হলো :

১। কৃষি	৯। আইন
২। অর্থনীতি	১০। আঞ্চলিক সমস্যা
৩। শক্তি খাত	১১। গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন
৪। পরিবেশ	১২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৫। অর্থ	১৩। সামাজিক উন্নয়ন
৬। তথ্য	১৪। আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ
৭। বিনিয়োগ	১৫। পরিবহণ
৮। শ্রম	১৬। পর্যটন ইত্যাদি।

মন্ত্রী পর্যায়ের এ কার্যক্রমগুলোকে ১২২টি কারিগরি কার্যকরী গ্রুপ সহযোগিতা করে। আসিয়ানের বৈদেশিক সম্পর্ক দেখাশোনা করার জন্যে সদস্য রাষ্ট্রের নিচের দেশগুলোর কূটনৈতিক মিশনদের প্রধানদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয় :

বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র (ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক) জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, কোরিয়া, ভারত, চীন, রাশিয়া ও পাকিস্তান।

আসিয়ানের সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ পায় পাঁচ বছরের জন্য। এ নিয়োগ সবার জন্যে উন্মুক্ত ও অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেওয়া হয়। আসিয়ানের বিশেষ কিছু সংস্থা রয়েছে সেগুলো হলো:

ASEAN University Network, ASEAN-EC Management Centre, ASEAN Centre for Energy, ASEAN Agricultural Development Planning Centre, ASEAN Earthquake Information Centre, ASEAN Poultry Research and Training Centre, ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation, ASEAN Rural Youth Development Centre, ASEAN Specialized Meterological Center, ASEAN Tourism Information Centre, and ASEAN Timber Technology Centre.

২. **মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক :** ব্যাংকক ঘোষণাপত্র সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বাৎসরিক বৈঠককে উচ্চতম নীতি নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ বৈঠকেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের প্রধান কাজ হচ্ছে নীতি

নির্দেশনা প্রণয়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্বাচন ও সংঘের কাজের নিরীক্ষণ।

বালি শীর্ষ সম্মেলনের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বাৎসরিক বৈঠক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের মন্ত্রীদের সমন্বয়ে আরো আলোচনা ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এ বৈঠকসমূহের প্রধান দায়িত্ব। বৈঠকসমূহ নিম্নরূপ :

ক. আসিয়ান অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রীদের বৈঠক

খ. আসিয়ান শ্রমমন্ত্রীদের বৈঠক

গ. আসিয়ান সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রীদের বৈঠক

ঘ. আসিয়ান শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক

ঙ. আসিয়ান তথ্যমন্ত্রীদের বৈঠক।

(সম্প্রতি অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রীদের নিয়মিত বৈঠক আসিয়ানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ফোরামে পরিণত হয়েছে)।

৩. **স্থায়ী কমিটি** : পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) আসিয়ানের কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। পরবর্তী মন্ত্রীদের বৈঠক যে দেশে অনুষ্ঠিত হবে, সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সে দেশে আসিয়ানভুক্ত অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। প্রত্যেক মাসেই এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের প্রাত্যহিক কাজ দেখাশোনা করা এবং পরবর্তী মন্ত্রী বৈঠকের প্রস্তুতি গ্রহণ এর প্রধান কাজ।

৪. **সচিবালয়** : বালি শীর্ষ সম্মেলনের পর জাকার্তায় একজন সচিবের নেতৃত্বে আসিয়ান সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে। সচিবালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন কমিটির মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সংঘের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে সহায়তা দান।

মনে রাখার Technique & Tips

আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম

- ARF-এর পূর্ণরূপ: ASEAN Regional Forum.
- প্রতিষ্ঠা : ২৫ জুলাই ১৯৯৪ সালে।
- মোট সদস্য : ২৭ টি।
- সদর দপ্তর : জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
- ২৬তম সদস্য দেশ : বাংলাদেশ।
- ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ৭-৮ মে,২০১১, জাকার্তা।
- সদস্য দেশসমূহ : অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, চীন, ইরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, লাওস, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব তিমুর।
- গঠনের উদ্দেশ্য : (১) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ ও পরামর্শে উৎসাহিত করা, (২) এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আস্থারক্ষার কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করা এবং (৩) অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা।
- ASEAN দেশগুলো AFTA বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয় : ২০০৩ সালে।

এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীদের সমন্বয়ে নয়টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-শিল্প, খনিজ ও জ্বালানি কমিটি, বাণিজ্যিক ও পর্যটন কমিটি, খাদ্য, কৃষি ও বনসম্পদ কমিটি, পরিবহন ও যোগাযোগ কমিটি, বাজেট কমিটি, সমাজ উন্নয়ন কমিটি, সংস্কৃতি ও তথ্য কমিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি। এছাড়াও এ সংঘে কার্যরত আছে অনেক সহায়ক কমিটি, অস্থায়ী কমিটি, ওয়ার্কিং গ্রুপ ইত্যাদি।

৭.৫ সহযোগিতা ও অগ্রগতি (Cooperation and Progress)

১৯৬৭ সালে ASEAN গঠিত হলেও প্রাথমিক বছরগুলোতে এর অগ্রগতি ছিল মন্থর। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহপরায়ণতা এর অগ্রগতির মূলে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ৭০'এর দশকে তেলের মূল্য বৃদ্ধি, বিশ্ব অর্থনীতির নিম্নগতি, কমিউনিস্ট দেশগুলোর সাফল্য ও ইন্দোচীন হতে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে ASEAN ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নতুন ধারণার জন্ম হয়।

ASEAN অর্থনৈতিক সহযোগিতায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবয়ব নিয়ে ASEAN অর্থনৈতিক সহযোগিতা গঠিত। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা আসিয়ান দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো :

১. শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা

২. বাণিজ্য সহযোগিতা

৩. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৪. নিজেদের মধ্যে সংহতি সাধন

৫. সামাজিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও

৬. এসব লক্ষ্যকে সার্থক করার জন্য নতুন নতুন সংস্থা সৃষ্টি করা।

সদস্য প্রাপ্তি

	দেশের নাম	যোগদানের তারিখ
১.	ইন্দোনেশিয়া	৮ আগস্ট, ১৯৬৭
২.	মালয়েশিয়া	৮ আগস্ট, ১৯৬৭
৩.	ফিলিপাইন	৮ আগস্ট, ১৯৬৭
৪.	সিঙ্গাপুর	৮ আগস্ট, ১৯৬৭
৫.	থাইল্যান্ড	৮ আগস্ট, ১৯৬৭
৬.	ব্রুনাই দারুস সালাম	৮ জানুয়ারি, ১৯৮৪
৭.	ভিয়েতনাম	২৮ জুলাই, ১৯৯৫
৮.	লাউস	২৩ জুলাই, ১৯৯৭
৯.	মায়ানমার	২৩ জুলাই, ১৯৯৭
১০.	কম্বোডিয়া	৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯

অন্যান্য দেশে আসিয়ানের ১০টি কমিটি আছে। অংশীদারদের সাথে দরকষাকষি আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতাকে ত্বরান্বিত করে থাকে। ASEAN বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কাজ করার জন্য সদস্য দেশকে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়।

আসিয়ান অঞ্চলের সম্মিলিত লোকসংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন ও আয়তন ৪.৫ মিলিয়ন বর্গ কি. মি.। এ দেশগুলোর জিডিপি'র পরিমাণ ৭৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৭২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৭.৬ আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ১০টা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি (Socio-economic Positions of ASEAN Countries)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত নয়টা দেশের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা দিলে সহজেই স্পষ্ট হয় কোনো ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতির ভাগ বাঁটোয়ারাতে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মায়ানমার ও লাওস এবং কম্বোডিয়ার বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ইউরোপেরও বহু দেশের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৬ সালে পাঁচ সদস্যের (ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড) আসিয়ান বিশ্বের বাজারে নারিকেল তেল, কম দামের চাল, রাবার, কাঠ বিক্রি করে কোনোমতে দিন গুজরাতো। আজকে ১০ সদস্যের বর্ধিত আসিয়ান বিশ্ব-বাজারে ব্যবসা বাণিজ্যের সোনার খনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার IMF এবং বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও এ দেশগুলোর শক্তসামর্থ্য অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়েছে। ১১ হাজার ৩৭ বিলিয়ন ডলার বিশ্ব বাণিজ্যের মধ্যে আসিয়ানের অবদান প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার। শতাংশের হিসেবে ৭ শতাংশের বেশি। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা এর কারণ ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে বলেছেন, রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে গুলিয়ে ফেলে নি নয়টা দেশ। রাজনৈতিক ঘনঘটা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও দেশগুলোর অর্থনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলে নি।

মায়ানমার

মায়ানমার (বার্মা) তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সামরিক শাসন এ দেশটাতে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে অর্থনীতি থেমে থাকে নি মায়ানমারে। ৪ কোটি ৭৫ লাখ জনসংখ্যার দেশে ৮৩ শতাংশ মানুষই শিক্ষিত। ১ ডলার সমান ৬.০৭ কিয়াট। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি জয়লাভ করলেও সামরিক শাসক ক্ষমতা ছাড়তে চায় নি। ইউরোপ, আমেরিকার চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে দিব্যি শাসন ক্ষমতার স্টিম রোলার চালিয়ে আসছে সেনাবাহিনী। জনপ্রিয় বিরোধী নেত্রী অং সান সুচিকে গৃহবন্দী অথবা নজরবন্দী করে রেখেছে সামরিক শাসক। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মায়ানমারকে সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো। মায়ানমারের সঙ্গে চীনের মাখামাখির প্রসঙ্গ টেনেও আসিয়ান দেশগুলো বলেছে সদস্য হবার পর নয়টা দেশ আলাপ-আলোচনা করে সবকিছু সামলে নেবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, চীন হলো মায়ানমারে প্রধান অস্ত্র বিক্রেতা এবং অর্থনৈতিক সাহায্য ও বাণিজ্যের প্রধান উৎস।

সিঙ্গাপুর

কমবেশি ৫৪টা দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত মাত্র ৩২ লক্ষ লোকের দেশ সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইউরোপের বহু দেশের চোখকে কপালে তুলে দিয়েছে। ১৯৫৯ সালে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন সিঙ্গাপুর অনেক খানাখন্দ পেরিয়ে ১৯৯৭ সালে অর্থনীতিতে পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ১৯৬০ থেকে বিগত ৩৬ বছরে সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয় বেড়েছে ১৩ গুণ। জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশে এবং কখনো কখনো তার বেশিও বিনিয়োগ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের অর্থনীতির সাফল্যের হাত ধরে স্বাক্ষরতার হার পৌঁছেছে ৯১ শতাংশে এবং মানুষের গড় আয়ু ৭৯ বছর। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, উদার মুক্ত আবহাওয়ায় সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থাগুলোও সেদেশে বাণিজ্য করার ছাড়পত্র পেয়েছিল। অথচ বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শ্রমনির্ভর অর্থনীতি বেকার সমস্যার সমাধান ঘটাল। এছাড়াও সিঙ্গাপুরের শ্রমিক সংগঠনগুলো কার্যত অরাজনৈতিক (Non-Political)। বিগত আঠারো বছরে শ্রমিকদের বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মালয়েশিয়া

আসিয়ানের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র ১৩টা প্রদেশের যুক্তরাষ্ট্র মালয়েশিয়ার গণতন্ত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে পাঁচকান হলেও এর জন্য অর্থনীতি কখনো মার খায় নি। দেশীয় মুদ্রা রিঙ্গিট। ৩.৪০ রিঙ্গিট খরচ করলে ১ ডলার রোজগার করা যায়। পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ মালয়েশিয়াতে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ১১১০০ মার্কিন ডলারের মতো। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা শতকরা ৮৩ শতাংশ। গড় আয়ু ৭২ বছর। দুকোটি তের লক্ষ লোকের দেশ মালয়েশিয়াতে আজ যে অর্থনৈতিক খোলা হাওয়ার যুগের সূচনা হয়েছে তার প্রভাব প্রতিবেশি দেশগুলোর ওপরও পড়েছে।

লাওস

আসিয়ান সদস্য হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ লাওস জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (লাওস) সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। এ এলাকার অন্যান্য দেশের তুলনায় লাওস বেশ খানিকটা পিছিয়ে। ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ১১৫০ ডলার। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪০ শতাংশ। দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশই আসে কৃষি থেকে। নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪৩ শতাংশের মতো। আসিয়ানের সদস্য হওয়ায় গোষ্ঠীর অন্যান্য আটটা দেশের সঙ্গে একই সারিতে স্থান করে নিয়েছে লাওস। গোষ্ঠীর বড় শরিক দেশগুলো লাওসকে সমপর্যায়ভুক্ত করার জন্য প্রথম কয়েকটা বছর ছাড় দেবার কথা ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে লাওস এখনও নিজের পছন্দমতো চলবে বলে আসিয়ানের অন্য দেশগুলো জানিয়েছে।

থাইল্যান্ড

৫ কোটি ৯৪ লক্ষ লোকের দেশ থাইল্যান্ড রাজতন্ত্র আসিয়ানের অন্যতম দেশ। এর রাজধানী ব্যাংকক।

আয়তন প্রায় ৫,৪২,৩৭৩ বর্গ কিলোমিটার। এ দেশটাতে সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। দেশের বাৎসরিক উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আসে শিল্প থেকে। কৃষি থেকে আসে মাত্র ১০ শতাংশ। থাইল্যান্ড মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ৮৮০০ ডলার। গড় আয়ু ৬৯ বছর।

ফিলিপাইন

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৭১০০টা দ্বীপ নিয়ে গঠিত প্রজাতন্ত্রী ফিলিপাইনস আসিয়ানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সদস্যরাষ্ট্র। ফিলিপাইনস আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্র। অর্থনীতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মতোই ফিলিপাইনসও সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করেছে। মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন ৩২০০ ডলার। দেশের বাৎসরিক উৎপাদনের ৪৫ শতাংশই আসে পরিসেবা থেকে এবং শিল্প থেকে আসে ৩৩ শতাংশের মতো।

ভিয়েতনাম

আসিয়ানের সদস্য হবার তালিকায় ভিয়েতনাম নাম লিখিয়েছে ১৯৯৫ সালে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাহাড়-প্রধান সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের অর্থনীতি এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে নি। মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ১৭০০ ডলার। আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যে ব্যবধান এখনও দূর করতে পারে নি। তবে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে, আসিয়ানের সদস্য হবার পর ক্রনেই লক্ষণীয়ভাবে উন্নতি করেছে। ৯৪ শতাংশ মানুষই সাক্ষর। গড় আয়ু ৬৮ বছর।

আর্থিক প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ক্রনেই একটা সচ্ছল রাষ্ট্র। তিন লক্ষের মতো জনসংখ্যা ৫,৭৬৫ বর্গ কিলোমিটারের দেশ ক্রনেই'র মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন ১৮০০ ডলার। ১৯৮৪ সালে মে মাসে ক্রনেই আসিয়ানের সদস্য হয়। শিক্ষিতের হার ৮৮%।

আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন

সম্মেলন	তারিখ	স্থান
প্রথম	২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬	বালি, ইন্দোনেশিয়া
দ্বিতীয়	৪-৫ আগস্ট, ১৯৭৭	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
তৃতীয়	১৪-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
চতুর্থ	২৭-২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২	সিঙ্গাপুর
পঞ্চম	১৪-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ষষ্ঠ	১৫-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮	হ্যানয়, ভিয়েতনাম
সপ্তম	৫-৬ নভেম্বর, ২০০১	বন্দরসেরি বেগওয়ান, ক্রনেই
অষ্টম	৪-৫ নভেম্বর, ২০০২	নমপেন, কম্বোডিয়া
নবম	৭-৮ অক্টোবর, ২০০৩	বালি, ইন্দোনেশিয়া
দশম	২৯-৩০ নভেম্বর, ২০০৪	ভিয়েনতিয়েন, লাওস
একাদশ	১২-১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
দ্বাদশ	১১-১৪ জানুয়ারি, ২০০৭	মেট্রোসেবু, ফিলিপাইন
ত্রয়োদশ	১৮-২২নভেম্বর, ২০০৭	সিঙ্গাপুর
চতুর্দশ	২৩-২৫অক্টোবর, ২০০৮	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
পঞ্চদশ	২৩-২৫ অক্টোবর, ২০০৯	থাইল্যান্ড
ষোড়শ	৭-৮ মে, ২০১০	হ্যানয়, ভিয়েতনাম
সপ্তদশ	৮-৯ এপ্রিল, ২০১০	হ্যানয়, ভিয়েতনাম
অষ্টাদশ	৭-৮মে, ২০১১	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া
উনবিংশ	১৪-১৯ নভেম্বর, ২০১১	বালি, ইন্দোনেশিয়া
বিংশ	৩-৪ এপ্রিল, ২০১২	নমপেন, কম্বোডিয়া
২১তম	১৭-২০ নভেম্বর, ২০১২	নমপেন, কম্বোডিয়া
২৪তম	১০-১১ মে,২০১৪	নাইপোদি, মায়ানমার
২৫তম	১২-১২ নভেম্বর, ২০১৪	নাইপোদি, মায়ানমার

২.৭ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ান- এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Steps Taken to Achieve Economic Solvence)

পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অঞ্চলের দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ, সম্পদের সুষম ব্যবহার, অর্থনৈতিক কাঠামো-পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি বিশাল স্থান দখল করে আছে। ঐতিহাসিক এ অঞ্চলের দেশসমূহ অর্থনৈতিকভাবে সুগঠিত ছিল। এ বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে অর্থাৎ আসিয়ানের মাধ্যমে শক্তিশালী আঞ্চলিকতাবাদের বিবর্তন ঘটানো হয়। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ অঞ্চল এশিয়া হতে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সেতু রচনা করেছে। ফলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে এ এলাকা থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও ভিয়েতনাম এশিয়ার শস্যভাণ্ডার রূপে গণ্য। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে পৃথিবীর ৯০ ভাগ রাবার ও ৬০ ভাগ টিন উৎপন্ন হয়। এছাড়া সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডে রয়েছে শক্তিশালী বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক যা এ অঞ্চলকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক বলয়ে পরিণত করেছে। আসিয়ান দক্ষিন পূর্ব এশিয়াকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো:

১. **অর্থনৈতিক সহযোগিতা :** আসিয়ান যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তাদের মোট বাণিজ্যের ১২-১৫%। আসিয়ান অঞ্চলে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি জন্য ১৯৭৭ সালে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential trading Arrangement) করা হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে আসিয়ান সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ সুবিধা লাভ করে। এর দশ বছর পর ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ানের সম্মেলনে পুনরায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য PTA (Preferential Trading Arrangement) কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আসিয়ানের চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত হয় Frame work Agreement on Enhancing Economic Co-operation কর্মসূচি। সিঙ্গাপুরে গৃহীত এ কর্মসূচি আসিয়ান মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা ASEAN Free Trade Area-AFTA) গঠনের সূত্রপাত করে। AFTA-র কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো আসিয়ান অঞ্চলকে বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় একটি একক ইউনিটে পরিণত করা। আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ তুলে দিলে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে ট্যারিফ বাধা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আসিয়ানের পঞ্চম সম্মেলনে Agenda for Greater Economic Integration গৃহীত হয়। এ Agenda-তে AFTA কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্যে নির্ধারিত সময়সীমা ১৫ বছর থেকে ১০ বছরে আনা হয়। ১৯৯৭ সালে আসিয়ানের নেতারা গ্রহণ করে ASEAN VISION ২০২০। এটিকে গতিশীল উন্নয়নের জন্য আসিয়ানের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির কৌশল বলা যায়। পণ্য, সেবা, বিনিয়োগ, পুঁজি ইত্যাদির অভাব যাতায়াত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে ট্রান্স আসিয়ান পরিবহণ নেটওয়ার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ উদ্যোগে থাকছে আন্তরাষ্ট্রীয় মহাসড়ক, রেলওয়ে, প্রধান প্রধান সমুদ্র বন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও বেসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন। এর পাশাপাশি আসিয়ান পাওয়ার গ্রিড ও ট্রান্স আসিয়ান গ্যাস লাইন প্রকল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

আসিয়ানের সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলে সমৃদ্ধি এসেছে। AFTA চালুর মাত্র তিন বছরের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য ২৮.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৩ সালে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভিতর রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৩.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ১৯৯৬ সনে তা দাঁড়ায় ৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এ হিসাব মত দেখা যাচ্ছে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের মোট বাণিজ্যের ২০-২৫% করছে নিজেদের ভিতর। ১৯৯৬ সনে আসিয়ানে ২৮.৬ মিলিয়ন পর্যটক দেখা যায়। এর মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর

http://thejobstudy.com Go to Contents

পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১১.২ মিলিয়ন (৪০%)।

২. **আসিয়ানের সাথে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সম্পর্ক :** ASEAN Vission ২০২০ এ অঞ্চলের সম্মিলিত স্বার্থের কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা রাখে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলোর সাথেও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আসিয়ানের নেত্রীবৃন্দ চীন, জাপান ও কোরিয়ার সাথে সংলাপ করেছে। এ তিন দেশের সাথে একুশ শতকে সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য আসিয়ান ইতোমধ্যে বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এছাড়াও আসিয়ান যে সমস্ত দেশ বা সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সংলাপ করেছে। সেগুলা হলো : অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইউএনডিপি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তান। এ সমস্ত দেশ বা সংস্থাগুলোর সাথে আসিয়ান বছরে একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়াও আসিয়ান যে সমস্ত সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: ইকো, গালফ কাউন্সিল, রিও-গ্রুপ, সার্ক ও সাউথ প্যাসিফিক ফোরাম। এছাড়া আসিয়ানের অধিকাংশ রাষ্ট্র যে সংস্থাগুলোর বিভিন্ন বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেগুলো হলো:

ক. এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (APEC)
খ. এশিয়া ইউরোপ মিটিং (ASEM)
গ. ইস্ট এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকা ফোরাম (EALMF)।

এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নও আসিয়ান- এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চীন ও রাশিয়া আসিয়ান- এর পূর্ণ আলোচনাকারী অংশীদার (Full Dialogue Partner) মর্যাদা পেয়েছে। ভারত পর্যবেক্ষকের এর মর্যাদা পেয়েছে।

৩. **আসিয়ানের ট্যারিফ হ্রাস প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত :** আসিয়ানের বাণিজ্যমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ট্যারিফ হ্রাসের ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য যে তালিকা প্রস্তুত করেছিল তাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার বিষয়টি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে আসিয়ানকে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা করার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার কথা ছিল ২০০৮ সালের ভিতর। পরবর্তীতে ২০০২ সালের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়। ৬ বছর আগে সিদ্ধান্তটিকে কার্যকর করতে গিয়ে কিছু সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় ট্যারিফ হ্রাস প্রক্রিয়ায় স্থগিত করণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে বাণিজ্যমন্ত্রীরা অবশ্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে ইতোমধ্যে ৩৮,৪০০ পণ্যের ট্যারিফ কমিয়ে ৫% থেকে ০-এ নামিয়ে আনা হয়েছে। এ সংখ্যা মোট পণ্যের প্রায় ৮৫%। ২০০১ সালে এ হ্রাসের পরিমাণ ৯০% এ দাঁড়াবে বলে আশা করা হয়। উল্লেখ্য উপরের এ অগ্রগতি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে।

৪. **২০০২ সালের মধ্যে আসিয়ানকে মুক্তবাজার এলাকা ঘোষণার বিষয়ে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** আসিয়ানের মুক্তবাজার কাউন্সিল এ অঞ্চলকে ২০০২ সালে মধ্যে মুক্তবাজার এলাকা ঘোষণা করার জন্য পুনরায় মত প্রকাশ করেছে। আসিয়ানের বাণিজ্যমন্ত্রিরা একমত হন যে, ইতোমধ্যে ট্যারিফ বিষয়ে ছয়টি সদস্য দেশ ৯০% অগ্রগতি ঘটিয়েছে। ২০০১ সালের মধ্যে আরও ৫% ও ২০০২ সালের মধ্যে বাকি ৫% অগ্রগতি ঘটেছে । সেক্ষেত্রে আসিয়ান অঞ্চলের সার্বিক ট্যারিফের হার ২০০১ সালে দাড়াবে ৩.৯৬%। আসিয়ান মুক্ত বাজার অঞ্চল কাউন্সিল বা AFTA কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভিতর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানায়। আসিয়ানের ১৯৯৮ সালে মোট রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ৭.৭% (৩১৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ১৯৯ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আঞ্চলিক অর্থনীতি শক্তিশালী হবার পরে আমদানিও বৃদ্ধি পায় ৭.৭% হারে ১৯৯৮ সালে আসিয়ানের মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৩২২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯৯ সালে সাগ্রিক অর্থে আসিয়ানের ভিতরে ও বাইরে দু'ক্ষেত্রেই আসিয়ানের বাইরে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২%।

অন্যদিকে আসিয়ান অঞ্চলের ভিতরে ১৯৯৯ সালে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ৭.৬% (৭৪.৪ বিলিয়ান মার্কিন ডলার)। ১৯৯৯ সালে সব গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে আসিয়ানের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৮.৭% (৫৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার); জাপানে বৃদ্ধি পায় ৭.২% (৩৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) আর যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধি পায় ৬.৩% (৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০০৪ সালে আসিয়ানকে ২০১৫ এর মধ্যে মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. **আসিয়ান+৩ :** চীন, জাপান ও কোরিয়ার সাথে আসিয়ানের অর্থমন্ত্রীরা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে একটি চুক্তি করে। এ চুক্তির ভিত্তিতে আসিয়ান ও এ তিন দেশের অর্থমন্ত্রীরা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বৈঠকের পাশাপাশি নিজেরা আলাদাভাবে বৈঠকে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ধারণা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা পূর্ব এশিয়াকে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংহতির প্রবর্তন ঘটাবে। নব্বইয়ের দশকে আসিয়ানের সাথে এ তিনটি দেশের সংযুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে আসিয়ান +৩। আসিয়ান +৩ পূর্ব এশিয়াকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলছে।

৬. **পুঁজিবাদের বিকাশ :** ৮০ ও ৯০ এর দশকে এ দেশগুলোতে ব্যাপক পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। এগুলো বিকশিত হয় মূলত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনুকরণে। এ পূর্ব এশীয় পুঁজিবাদ 'আসিয়ান +৩' এর মতো আঞ্চলিক সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের নেটওয়ার্ক আরো বাড়াতে আগ্রহী হয়। জাপান ও চীন উভয়ই তাদের শক্তিশালী রাষ্ট্র লিংকের মাধ্যমে এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক দর্শন হয়ে দাঁড়ায় Production Rather than Consumption ভিত্তিক।

৭. **আসিয়ানের বিদেশি বিনিয়োগ :** দ্রুত উন্নয়ন, নব্য শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সরাসরি বিদেশি পুজি বিনিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসিয়ান সম্পদের যে সমস্ত উপাদান বাইরে থেকে আসে তার মধ্যে সরাসরি বিদেশি পুঁজির পরিমাণ বেশ একটি বড় অংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত আসিয়ান অঞ্চলে সরাসরি 'বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বার্ষিক গড় হার ছিল ৪০%। মোট বৈদেশিক পুঁজির ৫০%-ই আসত মালয়েশিয়া, মায়ানমার ও ভিয়েতনামে। ৯০-এর দশকে সত্যিকার অর্থে আসিয়ান অঞ্চল ছিল সবার উপরে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত বিশ্বে বিনিয়োগকৃত মোট পুঁজির ১৭.৪% পেয়েছে আসিয়ান। এর পরিমাণ ৪৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ১৯৯৩-৯৮ সন পর্যন্ত আসিয়ান গড়ে ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ লাভ করেছে। অথচ ১৯৮৬-৯১ সন পর্যন্ত আসিয়ান গড়ে ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ লাভ করেছে। অথচ ১৯৮৬-৯১ সন পর্যন্ত বাৎসরিক বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ আসিয়ানে এসেছে গড়ে ৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আসিয়ান অঞ্চলে ১৯৯৬-৯৮ সন পর্যন্ত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বাৎসরিক ১৪% হারে বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে আসিয়ানে ১৯৮০ সন পর্যন্ত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের স্থিতি যেখানে ছিল ২৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে ১৯৯৮ সালে এ স্থিতি ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ অঞ্চলে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতীয়ভাবে এমনকি আসিয়ানের সদস্যরাও সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন-ব্রুনাই, দারুস সালাম রপ্তানিমূলক ও অধিক কারিগরী সম্পন্ন উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ বিদেশি মালিকানা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসাসহ সকল উৎপাদন খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ১০০ ভাগ মালিকানা দেয়ার ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়াও আগ্রহী হয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া যে সমস্ত বিনিয়োগ ১০০ মিলিয়ন ডলারের নিচে সেগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মাত্র ১০টি কার্য দিবস সময় নিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার কিছু কিছু ব্যাংককে ১০০ ভাগ মালিকানা দেবার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার

ব্যাপারে লাওস সরকার বিনিয়োগকৃত প্রকল্পগুলোর জন্য আমদানি করা ক্যাপিটাল দ্রব্যটির ওপর থেকে শুল্ক মওকুফের ঘোষনা দিয়েছে। মালয়েশিয়া সরকারও ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধুমাত্র উৎপাদন খাতে। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে মালয়েশিয়াতে জমিও ক্রয় করতে পারবে। মায়ানমার সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তিন বছর পর্যন্ত সব ধরনের কর্পোরেট কর মওকুফের ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও মায়ানমার বিনিয়োগকৃত শিল্পের জন্য আমদানিকৃত সকল কাঁচামালের ওপর শুল্ক মওকুফ করেছে। ফিলিপাইন তার খুচরা বাজার এবং বিতরণ খাতগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ প্রদান করছে। সিঙ্গাপুর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩০% কর্পোরেট কর হ্রাস করেছে। এর ফলে সিঙ্গাপুরে প্রকৌশল ও কারিগরি সেবা এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত সেবামূলক ব্যবসার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। থাইল্যান্ডও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীদের ১০০ ভাগ মালিকানা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া থাইল্যান্ড কৃষিখাতে বিনিয়োগের ওপর বেশ কিছু ছাড় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভিয়েতনাম তার পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রথম পাঁচ বছর বিনিয়োগকৃত ব্যবসার জন্য আমদানি করা সকল কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ওপর শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। এ ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য বিদেশিদের অনুমতি পাবার সময়সীমা কমিয়ে মাত্র ১৫ দিন করা হয়েছে। যে সমস্ত বিনিয়োগ ৫ মিলিয়ন ডলারের নিচে ভিয়েতনাম সেই ব্যবসাগুলোকে বিকেন্দ্রীভূত করে প্রাদেশিক শহরগুলোতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কী কী ক্ষেত্রে কী ধরনের মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হবে তার একটি তালিকা ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড তৈরি করেছে। এ রাষ্ট্রগুলোর তালিকা তাদের উৎপাদন খাতের জন্য ১ জানুয়ারি ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল।

৮. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সহযোগিতা :** আসিয়ান সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে ২০১৫ সালের মধ্যে। পরবর্তীতে আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দেওয়ার এ বিষয়টি কার্যকর করার সময় কমিয়ে এনে ২০১০ সালকে নির্ধারণ করা হয়। শুল্ক তুলে দেওয়ার বিষয়ে প্রথমে স্বাক্ষর করেছিল ছয়টি সদস্য রাষ্ট্র। এরা হলো: ব্রুনাই দারুস সালাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড। নতুন যে চারটি সদস্য (কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার ও ভিয়েতনাম) আসিয়ানে যোগ দিয়েছে তারা ও শুল্ক মুক্তকরণ প্রক্রিয়া ২০১৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন করবে বলে ঠিক করেছে। তবে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে এর সময়সীমা ২০১৮ সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে আসিয়ানের ধস নামা অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটে। এ উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি।

৯. **শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতা :** শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা আসিয়ান- এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ পরিকল্পনার দ্বারা মৌলিক শিল্পজাত পণ্য তৈরি, যৌথভাবে শিল্প ঝুঁকি গ্রহণ এবং নিজেদের অভাব পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে Asean Industrial Project বা সংক্ষেপ ATP গঠন করা হয়। এ শিল্প প্রকল্পের অধীনে সদস্য দেশগুলো সিদ্ধান্ত নেয় যে, পণ্য উৎপাদনে তারা বেশি গুরুত্ব দেবে। এর ফলে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় যা Preterential Trading Agreement বা সংক্ষেপে P.T.A নামে পরিচিত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো যেসব পণ্য উৎপাদন করবে সেগুলো এ চুক্তির অধীনে ASEAN গ্রহণ করবে।

১০. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ :** আসিয়ান- এর অর্থ বিনিময় ব্যবস্থা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোকে স্বল্পমেয়াদি অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়।

১১. **খাদ্য মজুদ ভাণ্ডার :** ১৯৮১ সালে আসিয়ানের খাদ্য গুদাম তৈরি হয়। এটা সম্মিলিত খাদ্য নিরাপত্তার জন্য তৈরি হয়। এর মাধ্যমে ৫০ হাজার টন খাদ্য মজুদ রাখা হয়। দুর্যোগ পরিস্থিতি যাতে মোকবেলা করা যায়। আসিয়ান এর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কমিটি আঞ্চলিক সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

১২. **আঞ্চলিক শান্তি ও ঐক্য :** আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংলাপ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলে আসছে অনেকদিন থেকে। এটি আরো বেশি গুরুত্ব পায় আসিয়ানের নেতৃবৃন্দ ১৯৯৯ সালে ম্যানিলায় যখন অনির্ধারিত বৈঠক করে তখন থেকে। এ অনির্ধারিত বৈঠকে আসিয়ানের নেতৃবৃন্দ '৯০-এর দশকে সৃষ্ট নিরাপত্তা অবস্থার প্রেক্ষিতে আসিয়ানের নিরাপত্তা মোকাবেলা কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঐ বৈঠকে তারা একমত হন এ অঞ্চলের জন্য সম্মিলিত একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। আসিয়ানভুক্ত রাষ্ট্রগুলো পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গড়ে তোলার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিটিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'SEANWF'। এ বিষয়ে জুলাই ২০০০ সালে তারা ২য় বারের মতো বৈঠক করে। আসিয়ানের এ চুক্তির ফলে এটিই প্রতীয়মান হয় যে আসিয়ান পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার চায় না তারা চায় পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত শান্তিপূর্ণ একটি বিশ্ব। পূর্ব তিমুর প্রশ্নে ৫ মে, ১৯৯৯ আসিয়ান এক বৈঠক করে। সেই বৈঠকে তারা জাতিসংঘ, ইন্দোনেশিয়া এবং পর্তুগালের মধ্যে চুক্তি অনুসারে পূর্ব তিমুর সমস্যা সমাধানে মত দেয়।

৭.৮ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে আসিয়ান (ASEAN in the way to Economic Prosperity)

দশটা দেশের সহযোগিতা সংগঠন আসিয়ান অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে গোটা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। লাওস (Laos) ও মায়ানমার বা সাবেক বার্মা (Burma) ১৯৯৭ সালে নতুন সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছে। কম্বোডিয়াও নতুন সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল ১৯৯৯-এ।

কম্বোডিয়া যোগ দিলে দশটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট আসিয়ানের জনসংখ্যা হলো ৪৮০ মিলিয়ন। দেশগুলোর মোট জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৫৯০ বিলিয়ন ডলার। আসিয়ান দেশগুলোর রাষ্ট্রনেতারা এ বলে আশা প্রকাশ করেছেন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি গতানুগতিক রাস্তা ছেড়ে আরো উদারীকরণের দিকে অগ্রসর হলে দশটা দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারে পরিণত হবে। ২০০৩ নাগাদ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়েছে। অর্থনীতির ভিত আরও শক্ত করতে আসিয়ানের নয়টা দেশ ও কম্বোডিয়া ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম একটা বৈঠকে বসেন।

আসিয়ানের অর্থনৈতিক সাফল্যের দিকে নজর দিলে এশিয়ার পরিকাঠামোগত অবস্থানের দিক দিয়ে চোখ ধাঁধানো সাফল্য নজরে আসে।

গত দশকে আসিয়ানের বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নতির হার ছিল ৭.৫ শতাংশ যেখানে বিশ্বের বাকি অংশের গড় বার্ষিক উন্নতির হার ৩.২ শতাংশ। বার্ষিক গড় ব্যক্তিগত আয়ের দিক থেকেও আসিয়ান দেশগুলো ছিল অনেক এগিয়ে। বিশ্বের যেখানে ৭০০ ডলার, আসিয়ানের সেখানে ১,৭০০ ডলার। সদস্য দেশগুলোর যৌথ বাণিজ্যও বেড়েছে প্রতিবছর ১৭ শতাংশ। আসিয়ান সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য ১৯৭০ সালে দুই বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৯৬ সালে ১২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশগুলোর মতে বর্তমানের আমদানি শুল্ক ৮ শতাংশ থেকে ২০০৩ সাল নাগাদ ৩ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে।

২০২০ সাল নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ানের অর্থনীতি কোনোদিকে মোড় নেবে সে সম্পর্কে জাকার্তায় ১৫ জুন, ১৯৯৭ সদস্য দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীরা এক বৈঠকে মিলিত হন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটা ছাতার তলায় সমস্ত সদস্য দেশগুলোকে নিয়ে আসার কোনোও পরিকল্পনা না থাকলেও, রাজনৈতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে আসিয়ানের রাষ্ট্রনেতারা। কারণ অর্থনৈতিক সহমর্মিতার জন্য রাজনৈতিক সহযোগিতা জরুরি। ঘরোয়া রাজনীতিতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি অর্থনৈতিক বিনিয়োগের পক্ষে ফলদায়ী বলে রাষ্ট্রনেতারা উল্লেখ করেছেন। নতুন যে দুটি সদস্য লাওস ও মায়ানমার, তাদের সম্পর্কেও যথেষ্ট সজাগ অন্য সাতটা দেশ। কারণ দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরবর্তীকালে যাতে বোঝা হয়ে না উঠতে পারে তার জন্য সজাগ রয়েছে আসিয়ানের অন্যান্য সদস্য দেশগুলো।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্ব-এশিয়ায় একটি শক্তিশালী

আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশ ঘটেছে আসিয়ান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমঝোতা দেশগুলোকে রাজনৈতিক ঐকমত্যের পথেও পরিচালিত করবে সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা দিবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যা এ অঞ্চলকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক বলয়ে পরিণত করবে নির্দ্বিধায়।

বাংলাদেশের আসিয়ানের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিকতার ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে। আঞ্চলিকতাবাদকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে যে সকল আঞ্চলিক জোট ব্যাপক সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, APEC, ASEAN। শুরুর পর থেকেই এ সকল আঞ্চলিক জোটগুলো তাদের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত করে চলেছে। আসিয়ানও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আসিয়ানে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের ইচ্ছা এবং আসিয়ানের আগ্রহ উভয়ই অনুকূল পরিবেশে রয়েছে।

৭.৯ যে সকল কারণে বাংলাদেশ আসিয়ান- এর সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **আসিয়ান- এর ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহ :** ১৯৬৭ সালে আসিয়ান গঠিত হওয়ার সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫টি। বিগত ৪৭ (১৯৬৭-২০১৪) বছরে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আসিয়ান তার সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ১০ এর উন্নীত করেছে। এছাড়া অদূর ভবিষ্যতে আরো সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশের সম্ভাবনা পর্যাপ্ত।

২. **পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি :** বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে একটি ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। আর তা হলো বিদ্যমান পররাষ্ট্রনীতির পাশাপাশি পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির আগ্রহ। একই ধারাবাহিকতায় পূর্ব-এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির ফলে আসিয়ান- এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপক সম্প্রসারণের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। যা বাংলাদেশকে আসিয়ান- এর অনেক কাছে নিয়ে এসেছে।

৩. **প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আসিয়ানের সম্পর্ক :** বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমার ১৯৯৭ সালে আসিয়ান- এর সদস্যপদ লাভ করে এবং অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আসিয়ান এর পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করেছে এবং নিকটতম প্রতিবেশী থাইল্যান্ড আসিয়ান এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ায় বাংলাদেশের সদস্য প্রাপ্তি অনেক সহজ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৪. **থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের সমর্থন :** ২০০৩ সালে থাইল্যান্ড ও মায়ানমারে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উভয় দেশ সফর করেছেন। ২০০৩ সালে থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এলে আসিয়ানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে তাদের সহযোগিতা কামনা করলে তারা বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়েছেন যা বাংলাদেশের সদস্য প্রাপ্তিতে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে।

৫. **ভৌগোলিক অবস্থান :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আসিয়ানের সদস্য প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে অনেকে ধারণা করেন। কারণ বর্তমানে আসিয়ানের বেশির ভাগ সদস্যই পূর্ব এশিয়ার। এক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য দক্ষিণ এশিয়া আসিয়ানের জন্য সহজ এবং নিরাপদ। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ায় সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি।

৬. **আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ :** ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং APEC এর শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ নীতি আসিয়ানকেও সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেক্ষেত্রে আসিয়ান এর নতুন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোর প্রাধান্য পাবে।

৭. **বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এবং বাজার :** বর্তমান বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে। বিশেষ করে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি জনশক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ আসিয়ানভুক্ত হলে অন্যান্য দেশও কম পারিশ্রমিকে জনশক্তি পেতে পারবে। ১৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল বাজার যা আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পণ্যর বাজারজাতকরণে সহায়ক হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ আসিয়ানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এসব সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশের সদস্য প্রাপ্তির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। এতগুলো সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আসিয়ানের সদস্য প্রাপ্তি খুব সহজ হবে না। কারণ বাংলাদেশের তুলনামূলক দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা, অদক্ষ জনশক্তি সদস্য প্রাপ্তির পেছনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই অতি দ্রুত বাংলাদেশকে যে সকল বিষয়ের বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো :

ক. অভ্যন্তরীণ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি।
খ. মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন।
গ. দক্ষ জনশক্তি তৈরি।
ঘ. সম্পদের সুষম বণ্টন।
ঙ. উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও যথাযথ প্রয়োগ।
চ. শিল্পায়ন।
ছ. অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ইত্যাদি।

৭.১০ সাফল্য ও ব্যর্থতা (Success and Failure)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে ও সঙ্কটকালে আসিয়ানের জন্ম। প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলেও আসিয়ান এ উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারে নি। আংশিক সফলতা অবশ্যই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। ইন্দোনেশিয়াকে আজও গরিব দেশের পর্যায়ভুক্ত করা হয়, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের ধারে কাছে যেতে পারে নি। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান পশ্চাৎপদতার কারণ হলেও আসিয়ানের কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি আসিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও বিগত বছরগুলোতে এ সহযোগিতা লক্ষণীয়ভাবে বিকশিত হতে পারে নি। এমন হতে পারে সদস্যদের সহযোগিতা বাড়াবার আগ্রহ ছিল না। এ ক্ষেত্রে আসিয়ান যে ব্যর্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাণিজ্য ও শিল্পনীতির উদারীকরণ আসিয়ান করে উঠতে সক্ষম হয় নি। অথচ এটি না হওয়ার জন্য শিল্পায়ন পিছিয়ে পড়েছে।

আসিয়ান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে উত্তেজনামুক্ত করতে পারে নি। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। কিন্তু এ এলাকায় মার্কিন প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। আসিয়ানের নেতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে জোন অব পিস, ফ্রিডম অ্যান্ড নিউট্র্যালিটি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আজও শান্তির এলাকায় পরিণত হতে পারে নি। একে আসিয়ানের ব্যর্থতাই বলা উচিত।

কম্বোডিয়ার শান্তিচুক্তি : আসিয়ান আদৌ সফল হয় নি এমন কথাও বলা যায় না। ১৯৯১ সালে আসিয়ানের তৎপরতায় কম্বোডিয়ায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আসিয়ান দেশগুলোর এটি একটি বিরাট সাফল্য। এ অঞ্চলে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার মানসে আসিয়ান দেশগুলো ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করে। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য আসিয়ানের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি করে। জাতিসংঘে আসিয়ান প্রশংসা পেয়েছে।

আসিয়ানের কোনো কোনো সদস্য শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে পড়েছিল বলে আশির দশকের শেষের দিকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। আসিয়ানের সদস্যরা শিল্পক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছিল। অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে এরা সাহায্য করেছিল।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

৭.১১ আসিয়ানের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা (Limitations and weaknesses)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির এক অমোঘ সন্ধিক্ষণ তথা সংকটকালে ASEAN-এর জন্ম হয়েছিল। এ সংস্থা গঠিত হওয়ার প্রথম পাঁচ-সাত বছর পর্যন্ত এর কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে এর তৎপরতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আসিয়ান-এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিতে মোটামুটি সাফল্য আসলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। আসিয়ানের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হলো এর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর অসম অবস্থান। একদিকে, এ সংগঠনভুক্ত ইন্দোনেশিয়া আর্থিক বিচারে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার তুলনায় অনেকটাই পশ্চাদ্‌পদ। অন্যদিকে, ঐ দুটি রাষ্ট্রের তুলনায় আয়তনে বৃহত্তর হওয়ার দরুন ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্র দুটির সম্পর্কেও স্বাভাবিকতা আসে নি। ইন্দোনেশিয়া আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সুস্থিতি রক্ষার প্রয়োজনে বাইরের শক্তির উপস্থিতির বিরোধিতা করে আসলেও সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার মতো ছোট রাষ্ট্রগুলি ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বদা সংশয় পোষণ করে এসেছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও আসিয়ান তার ভূমিকা যথাযথ পালন করে উঠতে পারে নি। বাণিজ্য ও শিল্পনীতির উদারিকরণও ঐ অঞ্চলে বিশেষ গতিময়তা পায় নি যার ফলে শিল্পায়নও পিছিয়ে পড়েছে।

অভ্যন্তরীণ সুসম্পর্কের প্রশ্নেও যথার্থ উদ্যোগ নিতে আসিয়ান ব্যর্থ হয়েছে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে সাবা (Saba) ভূখণ্ড নিয়ে বিরোধের সূত্র ধরে ১৯৭৭ সালের পর থেকে বেশ কয়েক বছর ASEAN-এর শীর্ষবৈঠক ডাকা সম্ভব হয় নি। আসিয়ান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে উত্তেজনামুক্ত করতেও পুরোপুরি সফল হয় নি। চীন ও আমেরিকার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঐ অঞ্চলে নিরাপত্তায় একটি স্থায়ী প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। আসিয়ান নেতৃত্ব ঐ অঞ্চলকে 'Zone of Peace, Freedom and Neutrality' বলে ঘোষণা করলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। এটি সংগঠনের একটি প্রধান দুর্বলতা। ASEAN দেশগুলির মধ্যে পরনির্ভরতা ক্রমশ বাড়ছে। আমেরিকার উদ্যোগে গঠিত Pacific Community বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠী ঐ অঞ্চলে আসিয়ানকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অনেকে আসিয়ান-এর ওপর ক্রমবর্ধমান মার্কিন প্রভাবের এবং আসিয়ান গোষ্ঠীর তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধিতার সমালোচনা করে থাকেন।

মূল্যায়ন (Evaluation)

অদূর ভবিষ্যতে আসিয়ান যে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে এ ব্যাপারে আসিয়ান- এর সকল সদস্যকে সকল বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি আসিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও বিগত বছরগুলোতে এ সহযোগিতা লক্ষণীয়ভাবে বিকশিত হতে পারে নি। কারণ আসিয়ানের একদিকে রয়েছে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার মতো শক্তিমালী অর্থনৈতিক পরাশক্তি। অন্যদিকে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও লাওসের মতো দুর্বল অর্থনীতির দেশ। তাই এক্ষেত্রে শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেশগুলোকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। অন্যদিকে বাণিজ্য ও শিল্পনীতির উদারীকরণের সাথে সকল সদস্য যাতে তাল মিলিয়ে চলতে পারে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। কিছু কিছু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আসিয়ান যে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর একথা নিশ্চিত। তাই আজ একথা বলার যথেষ্ট যুক্তি ও কারণ আছে যে আসিয়ানের অগ্রসরমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে একটি শক্ত অর্থনৈতিক বলয়ে পরিণত করবে।

অবশ্য আসিয়ান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পুরোপুরি বিফলে যায় নি। ১৯৮৭ সালে আসিয়ান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করতেও আসিয়ান সক্ষম হয়েছিল। ১৯৯১ সালে এ সংগঠনের আন্তরিক প্রয়াসের ফল ছিল কম্বোডিয়ার শান্তিচুক্তি। আসিয়ান এসব কাজের জন্য জাতিসংঘেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে। আমেরিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসার প্রসারেও আসিয়ান দেশগুলি বেশ কিছুটা সাফল্য পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে এখনও অনেকটা পথ বাকি আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিন্ন বাজার স্থাপন অথবা সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন এখনও

সম্ভব হয় নি। সেদিক থেকে দেখলে EU-র তুলনায় ASEAN এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছে।

মূল বক্তব্য (Key point)

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তির এলাকায় পরিণত ও উত্তেজনামুক্ত করার জন্যই আসিয়ান গঠিত হয়েছিল।
- ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশ ব্যাংককে মিলিত হয়ে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রচার করে আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং সেটাই আসিয়ান নামে পরিচিত।
- বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আসিয়ান সে সকল অঞ্চলের একটি। তাই বিশ্বরাজনীতিতেও বর্তমানে আসিয়ানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সঠিক অর্থে জোটনিরপেক্ষ না হলেও ওয়াশিংটন এবং মস্কোর দাদাগিরি থেকে মুক্ত থাকতে চায়।
- লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে (সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এটি ঘটে) আসিয়ান নিরপেক্ষ নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

এক নজরে আসিয়ান

- **ASEAN-এর পূর্ণরূপ :** Association of South East Asian Nation.
- **ASEAN প্রতিষ্ঠিত হয় :** ৮ আগস্ট, ১৯৬৭ সালে
- **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:** ৫টি দেশ যথা- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড।
- **বর্তমান সদস্য সংখ্যা :** ১০টি।
- **সর্বশেষ সদস্য :** কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে)।
- **বর্তমান সদস্য দেশ :** মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার ও কম্বোডিয়া।
- **সদর দপ্তর :** সিঙ্গাপুর (পূর্বে ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়)।
- **ASEAN সম্মেলনের নাম :** ASEAN +3
- **ASEAN +3 এর +3 কী :** চীন, জাপান ও উত্তর কোরিয়াকে ASEAN-এর অন্তর্ভুক্ত করন।
- **ASEAN-এর সর্বশেষ সম্মেলন :** ১১-১২ নভেম্বর ২০১৪ নাইপোদি, মায়ানমার।
- **ASEAN কবে থেকে বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করে :** ২০০৩ সাল থেকে।
- **আসিয়ানের বর্তমান মহাসচিব :** লি লং মিন (১ জানুয়ারি, ২০১৩) ভিয়েতনাম।
- **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- **অসিয়ান চুক্তি অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে :** ২০২০ সাল।
- **আসিয়ানের নতুন সনদ গৃহিত হয় :** ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে।

আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম

- ARF-এর পূর্ণরূপ: ASEAN Regional Forum.
- প্রতিষ্ঠা : ২৫ জুলাই ১৯৯৪ সালে।
- মোট সদস্য : ২৭টি।
- সদর দপ্তর : জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
- ২৬তম সদস্য দেশ : বাংলাদেশ।
- ২৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ৯-১০ অক্টোবর, ২০১৩ সালে জাকার্তায়।
- সদস্য দেশসমূহ : অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, চীন, ইরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, লাওস, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব তিমুর।
- গঠনের উদ্দেশ্য : (১) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ ও পরামর্শে উৎসাহিত করা, (২) এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আস্থরক্ষার কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করা এবং (৩) অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা।
- ASEAN দেশগুলো AFTA বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয় : ২০০৩ সালে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **ASEAN-এর পুরো নাম লিখ।**
উত্তরঃ Association of South East Asian Nations.

২. **আসিয়ান কী?**
উত্তরঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।

৩. **কত সালে আসিয়ান গঠন করা হয় ?**
উত্তরঃ ১৯৬৭ সালে।

৪. **আসিয়ানের সদস্য সংখ্যা কত?**
উত্তরঃ ১০টি। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ব্রুনেই, ফিলিপাইন, মায়ানমার।

৫. **আসিয়ানের সদর দফতর কোথায়?**
উত্তরঃ ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায়।

৬. **আসিয়ানের বর্তমান মহাসচিব এর নাম লিখ?**
উত্তরঃ লি লং মিন, ভিয়েতনাম।

৭. **আসিয়ানের ৩টি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লিখ।**
উত্তরঃ১. সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা, ২. অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন এবং ৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

৮. **আসিয়ানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লিখ।**
উত্তরঃ১. শীর্ষ সম্মেলন, ২. মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক, ৩. স্থায়ী কমিটি এবং ৪.সচিবালয়।

৯. **আসিয়ানের স্থায়ী কমিটি কয়টি ?**
উত্তরঃ ৮টি।

১০. **আসিয়ানের ৪টি সহযোগিতার ক্ষেত্রে লিখ।**
উত্তরঃ১. শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা, ২. বাণিজ্যিক সহায়তা, ৩. একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৪. নতুন নতুন সংস্থা গড়ে তোলা।

১১. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ানের গৃহীত কয়েকটি ধাপ লিখ।**
উত্তরঃ১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, ২. খাদ্য মজুদ ভান্ডার স্থাপন, ৩. শিল্প উন্নয়নে সহযোগিতা এবং ৪. ধনতন্ত্রের বিকাশ ৫. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাহায্য প্রদান।

১২. **আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত চুক্তির নাম কী?**
উত্তরঃ SEANWFZ.

১৩. **ASEAN Industrial Project কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?**
উত্তরঃ ১৯৭৬ সালে।

১৪. **AFTA এর পুরো নাম কী ?**
উত্তরঃ Asean free trade Area.

১৫. **APEC-এর পুরো নাম লিখ।**

উত্তর: Asia Pacific Economic Co-operation.

১৬. **ASEM-এর পুরো নাম লিখ।**
উত্তর: Asia Europe Meeting.

১৭. **AFTA কত সালে গৃহীত হয়?**
উত্তর: ১৯৯২ সালে।

১৮. **AFTA চালু হয় কত সালে ?**
উত্তর: ২০০৩ সালে।

২০. **কম্বোডিয়ার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে ?**
উত্তর: ১৯৯১ সালে।

২১. **দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয় কত সালে?**
উত্তর:১৯৮৭ সালে।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

৪. ক) আসিয়ান গঠনের পটভূমি কী?
খ) আসিয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

৫. ক) সার্কের ভবিষ্যৎ কী?
খ) সার্ক ও আসিয়ানের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো কী কী?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. আসিয়ান প্রতিষ্ঠার কারণ, গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনাসহ এর সফলতা ও ব্যর্থতার দিকগুলো আলোচনা করুন এবং আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের গঠন বর্ণনা করুন ?

২. আসিয়ানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এ অঞ্চলকে ধীরে ধীরে একটি শক্ত অর্থনৈতিক বলয়ে পরিণত করছে"–আপনি কি একমত? বাংলাদেশের আসিয়ানের সদস্য হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন ?

৩. আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে সার্ক ও আসিয়ানের তুলনামূলক আলোচনা করুন?

৪. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আসিয়ানের গুরুত্ব আলোচনা করুন?

৫. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন?

৬. আসিয়ানের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ৮

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা : ন্যাটো
North Atlantic Treaty Organisation : NATO

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৮.১ ভূমিকা
৮.২ ন্যাটোর সৃষ্টি
৮.৩ ন্যাটো গঠনের পটভূমি
৮.৪ ন্যাটো গঠনের কারণ
৮.৫ ন্যাটো (NATO) এর উদ্দেশ্য
৮.৬ ন্যাটো-এর গঠন
৮.৭ একনজরে ন্যাটোর সম্প্রসারণ
৮.৮ ন্যাটো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা
৮.৯ পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ
৮.১০ সম্প্রসারণ নয় ন্যাটোর রূপান্তর প্রয়োজন

৮.১ ভূমিকা (Introduction)

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জোটবদ্ধ হয়ে আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করে। ফলে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনাকালে সামরিক জোট হিসেবে ন্যাটো গড়ে ওঠে এবং তার কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান বিশ্বরাজনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যাটোর কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮.২ ন্যাটোর সৃষ্টি (Formation of NATO)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছে। অবিশ্বাস এবং সন্দেহের রাজনীতি এ সময় মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী রাষ্ট্রের জোট, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা পুঁজিবাদী জোট বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা করেছিল। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের হুমকি থেকে বাঁচাতে সহযোগী পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। রাজনীতির আর্দশগত লড়াই থেকে নিরাপত্তার পরিবর্তে দুটি বৃহৎ শক্তিধর দেশ শক্তিসাম্যের ভিত্তিতে জোটবদ্ধ হয়েছিল। মূলত ইউরোপের মাটিতে রুশ বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ সামরিক জোট গঠন।

৮.৩ ন্যাটো গঠনের পটভূমি (Background of NATO)

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সহযোগী দেশগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক জোট বন্ধনের আগে ১৯৪৮ সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পর একটি স্মারক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। সেই সময় এ ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা মাথায় রেখে একত্রিত হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালেই ব্রাসেলসে ইউরোপের আরো তিনটি দেশ সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ভবিষ্যতে সোভিয়েত আক্রমণের আশংকাতেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কূটনৈতিক চালে ৫টি দেশকেই একই ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক বিবৃতিতে ইউরোপের সামরিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা বলেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ইউরোপের সহযোগী দেশগুলো একটি উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিল। এ সংস্থার ১৯টি সদস্য রাষ্ট্র হলো, কানাডা, গ্রিস, গ্রেট ব্রিটেন, তুরস্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ফেডারেল, রিপাবলিক অব জার্মানি, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল,বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি ও স্পেন, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র। চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে ২১-২২ নভেম্বর, ২০০২ অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে নিম্নোক্ত ৭টি দেশ-কে ন্যাটোর সদস্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মার্চ ২০০৪ : লাটভিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াসহ ৭টি দেশ যোগ দেয়। দেশগুলো নিয়ে ন্যাটোর সদস্য দাঁড়ায় ২৮। এছাড়াও রাশিয়াকে সহযোগী সদস্য করা হয়েছে ১৯৯৭ সালে।

৮.৫ ন্যাটো গঠনের কারণ (Causses Behind the Formation of NATO)

ন্যাটো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত একটি

মনে রাখার Technique & Tips

At a Galance of NATO

- NATO-এর পূর্ণরূপ : North Atlantic Treaty Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে।
- কোন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে NATO গঠিত হয় : উত্তর আটলান্টিক চুক্তি।
- NATO-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ১২টি দেশ।
- গ্রিস ও তুরস্ক যোগ দেয় : ১৯৫২ সালে।
- পূর্ব ইউরোপের সাতটি দেশ কবে NATO-তে যোগদান করে : ২৯ মার্চ, ২০০৪ সালে।
- সর্বশেষ যোগদান করা ২টি দেশ : আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া।
- NATO-এর ইউরোপ অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক কে : জেমস এল জনস (যুক্তরাষ্ট্র)।
- NATO-ভুক্ত একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র : তুরস্ক।
- সদস্য দেশ : ২৮টি। (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, গ্রিস, তুরস্ক, জার্মানি, স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, এস্তোনিয়া, আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া)।
- পূর্ববর্তী সদর দপ্তর : প্যারিস, ফ্রান্স।
- বর্তমান সদর দপ্তর : ব্রাসেলস, বেলজিয়াম (১৯৬৬ সালে স্থানান্তর করা হয়)।
- ন্যাটো-২০ : ২৮ মে, ২০০২ ন্যাটো-রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া 'ন্যাটোর জুনিয়র পার্টনার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে রাশিয়া ন্যাটোর সদস্য নয়, সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জন্য রাশিয়াকে 'ন্যাটো-২০' বলা হয়।
- ১১ মার্চ,২০০৯ সালে ফ্রান্স পুনরায় ন্যাটোর সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে (১৯৬৬ সালে ফ্রান্স ন্যাটোর সামরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখে)।
- NATO-এর ১৫তম ও বর্তমান মহাসচিব : জেনস স্টলেনবার্গ (১ অক্টোবর, ২০১৪-বর্তমান), নরওয়ে।
- NATO-এর সর্বশেষ সম্মেলন (২৬তম) অনুষ্ঠিত হয় : ৪-৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে ওয়েলস, যুক্তরাজ্য।

http://thejobstudy.com Go to Contents

সামরিক জোট। এ জোট গঠনের পেছনে যে সকল কারণ রয়েছে সেগুলো হলো :

ক. ১৯৪৮ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী জোট গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স একটি সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। অন্যদিকে ইউরোপের আরো তিনটি দেশ ব্রাসেলসে অন্য একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সহযোগী দেশগুলোর আগ্রাসন প্রতিরোধই ছিল এসব সামরিক মৈত্রী জোট গঠনের উদ্দেশ্য। আর এর ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাটো (NATO)।

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণ তথা সাম্যবাদের প্রসারকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে গঠন করে ন্যাটো (NATO) জোট।



ইউরোপ (১৯৯০)

গ. ন্যাটো জোট গঠনের অন্যতম কারণ হলো ঠাণ্ডা লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিক থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, আদর্শগত মতপার্থক্য, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মনস্তাত্ত্বিক সন্দেহ প্রভৃতি কারণে ঠাণ্ডা লড়াই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে রুখবার লক্ষ্যে ন্যাটো (NATO) জোট গঠনে প্রয়াসী হয়।

ঘ. সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নীতি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্য বিস্তার প্রায় নিশ্চিত হচ্ছিল। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রুখবার উদ্দেশ্যে ন্যাটো জোট গঠন করা হয়।

ঙ. পশ্চিম ইউরোপে নিজস্ব প্রভাব ও বিস্তার বজায় রাখাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো জোট গঠনের অন্যতম কারণ।

৮.৬ ন্যাটে (NATO) এর উদ্দেশ্য

ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য ও শর্তসমূহ ন্যাটো চুক্তির ৫নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ধারা মতে এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার রক্ষার স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে যাবতীয় বিবাদ-বিরোধের মীমাংসা করা।

২. পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

৩. জোটভুক্ত দেশসমূহের কোনো একটি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অপরাপর রাষ্ট্রগুলো একে নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে গণ্য করবে এবং যতদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেবে ততদিন নিজেরা যৌথভাবে তা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালাবে।

৪. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার
উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সকল বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবে এবং প্রয়োজনে
নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

৫. যে কোনো রাষ্ট্র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিতে এ সংস্থার সদস্য হতে পারবে।

৮.৭ ন্যাটো (NATO)- এর গঠন

ন্যাটোর গঠন কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ন্যাটোর প্রধান কার্যকরী পরিষদ হলো উত্তর আটলান্টিক পরিষদ (North Atlantic Council)। এ পরিষদ জোটের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং সকল সদস দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। সদস দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কার্যকরী পরিষদের সদস্য। ন্যাটোর মহাসচিব এ পরিষদের চেয়ারম্যান। সদস্য দেশের মধ্য থেকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। জোটের যে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়। কাউন্সিল সামরিক কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

ন্যাটোর বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো:

ক. প্রতিরক্ষা এবং নীতিনির্ধারক বিভাগ (Division of Defence & Policy planning)
খ. প্রতিরক্ষা সহায়তা বিভাগ (Division of Defence support)
গ. রাজনীতি বিষয়ক বিভাগ (Division of political Affairs)
ঘ. বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগ (Division of Science Affairs)

ন্যাটোর সামরিক সংস্থা ফ্রান্স ছাড়া সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। এটি সদস্য দেশের সেনাপ্রধান বা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ন্যাটোর সর্বোচ্চ সামরিক সংস্থা।

সেনাপ্রধানগণ বছরে দুবার বৈঠকে মিলিত হন। প্রয়োজনে যে কোনো সময় মিলিত হতে পারেন। তারা কার্যকরী পরিষদ এবং ডিফেন্স প্ল্যানিং কমিটিতে প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন। ন্যাটোর প্রধান শক্তি হচ্ছে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রাপ্ত পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী। তবে এ সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন একজন মার্কিন নাগরিক। এ সংস্থায় ব্যয় প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র বহন করে থাকে। মোট ব্যয়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগই জোগান দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৮.৮ এক নজরে ন্যাটোর সম্প্রসারণ: ন্যাটো সম্প্রসারণের ধাপগুলো হলো -

১. ১৯৪৯ সালে সদস্য ১২টি (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য); যথা : ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

২. ১৯৫২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি গ্রিস ও তুরস্ক।

৩. ১৯৫৫ সালের ৯ মে পশ্চিম জার্মানি (বর্তমান জার্মানি)

৪. ১৯৮২ সালের ৩০ মে স্পেন।

৫. ১৯৯৯ সালে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্র যোগ দিলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। এ তিনটি দেশ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ।

৬. ২০০৪ সালে লাটভিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভানিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াসহ ৭টি পূর্ব ইউরোপের দেশ যোগ দিলে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টি।

৭. ২০০৮ সালে আলবেনিয়া ও ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়া যোগ দিলে ন্যাটোর সর্বশেষ সদস্য সংখ্যা হয় ২৮।

বর্তমান বিশ্বে ন্যাটোর গুরুত্ব নতুন করে অন্যভাবে আবির্ভূত হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত CIS- ভুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এবং ন্যাটো জোটের সদস্য এবং এটাই সর্বশেষ বাস্তবতা। অপরদিকে ন্যাটোর সুদূরপ্রসারী সম্প্রসারণের কথা মাথায় রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান, পাকিস্তানকে ন্যাটোর বাইরে অন্যতম প্রধান মিত্র দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর বাইরে ন্যাটোর সামরিক বাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে ন্যাটো যে আরো সম্প্রসারিত হবে, তা অবশ্যম্ভাবী।

৮.৯ ন্যাটো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity to Expand NATO)

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সফল সামরিক জোট হলো North Atlantic Treaty Organization যা NATO নামে সর্বাধিক পরিচিত। ইউরোপের বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে (বসনিয়া, কসোভো, আলবেনিয়া ইত্যাদি) দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ধর্মীয় ও জাতিগত, দাঙ্গা মোকাবেলায় এ সামরিক জোট অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ন্যাটোকে আরো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এর সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু কথা হলো ন্যাটোর জন্ম হয়েছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বলয় বিস্তারকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এবং সে দেশসহ গোটা পূর্ব ইউরোপ থেকে কমিউনিজমের অবসান পরবর্তী সময়ে স্নায়ু-যুদ্ধের অবসান ঘটে ও ওয়ারশ জোট ভেঙে যায়, আর বিশ্বরাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন একাধিপত্য। ফলে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় ন্যাটো জোটকে টিকিয়ে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে যেখানে প্রশ্ন তুলেছেন, সে ক্ষেত্রে ন্যাটোকে সম্প্রসারণ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখা দরকার।

বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে ন্যাটোর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন, তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক একাডেমিতে এক বক্তৃতায় তিনি ন্যাটোর সম্প্রসারণ ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ, তার চারটি কারণ উল্লেখ করে। সেগুলো হলো :

১. ন্যাটোর সম্প্রসারণ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জোটকে শক্তিশালী করবে। এককভাবে প্রতিরক্ষার চেয়ে যৌথভাবে প্রতিরক্ষা ভালো। ন্যাটোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমমান রাষ্ট্রগুলোর একত্রে কাজ করার সুযোগ ঘটবে, যা জাতিগত সংঘাত, আঞ্চলিক আগ্রাসন ও ব্যাপক বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের প্রসারসহ নতুন বিশ্বের হুমকি থেকে একে-অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। ন্যাটোর প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র কেবল নিরাপত্তাই ভোগ করবে না, এক্ষেত্রে অবদানও রাখবে। এর অর্থ হচ্ছে তাদের বাহিনীগুলো ন্যাটোর বাহিনীগুলোর পাশাপাশি যুদ্ধ করতে এবং ন্যাটোর ভূখণ্ড রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

২. ন্যাটোর গণতন্ত্র ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সুফলগুলো রক্ষায় সক্ষম হবে। ন্যাটোর

সদস্যপদ নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে একবিংশ শতাব্দীতে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দেবে; যেমন অতীতে জার্মানি, ইটালি ও স্পেনের মতো দেশকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সুসংহতকরণে নিরাপত্তা জুগিয়েছে।

৩. ন্যাটোর সদস্যপদ সম্ভাব্য দেশগুলোকে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে নিরসনে উৎসাহিত করবে। অতীতে ন্যাটোর সদস্যপদ ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে এবং গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে সহায়তা করেছে। বর্তমানে ন্যাটোর খোলা দুয়ার নীতি মধ্য-পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে তাদের বিগত দিনের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে, স্থিতিশীল সীমান্ত চিহ্নিত করতে, সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণে তাদের অভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে প্রেরণা জোগাবে।

৪. পরিশেষে স্নায়ুযুদ্ধের সময় যে কৃত্রিম রেখা ইউরোপ মহাদেশকে বিভক্ত করেছিল, ন্যাটোর সম্প্রসারণ সেটাকে মুছে দেবে। পার্টনারশিপ ফর পিস, ইউরোপ-আটলান্টিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল এবং ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যকার ফাউন্ডিং অ্যাক্টের সাথে ন্যাটোর সম্প্রসারণ দেশগুলোর রাজধানীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা, সব দেশের সামরিক বাহিনীর একত্রে মিলিত হওয়া এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় নিরাপত্তার নামে সমগ্র ইউরোপে ন্যাটো জোটের সম্প্রসারণ ঘটাতে চাচ্ছে। রাশিয়া প্রথম দিকে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর বিস্তৃতির বিরোধিতা করলেও বর্তমানে সে নিজেও এর সদস্য হতে চাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে বরিস ইয়েলৎসিন ও বিল ক্লিনটনের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ বিষয়ে সমঝোতা হয়। অতঃপর একই বছরের মে মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এগুলো হলো :

১. ন্যাটো তার নতুন মধ্য ইউরোপীয় সদস্যদেশগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে না।
২. ন্যাটোভুক্ত সেনাদলকে নতুন সদস্যদেশগুলোতে স্থায়ীভাবে মোতায়েন করা হবে না।
৩. ন্যাটো জোট রাশিয়ার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী নতুন কোনো সামরিক অবকাঠামো নির্মাণ করবে না ইত্যাদি।

এসব সত্ত্বেও রুশ নেতৃবৃন্দ ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণের বিরোধিতা থেকে পিছপা হয়নি। অবশেষে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ ন্যাটোতে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালনসংক্রান্ত এক চুক্তির প্রেক্ষিতে নমনীয় হয় এবং ন্যাটোর সম্প্রারণ প্রশ্নে বিরোধিতা করবে না বলে জানায়।

১৯৯৭ সালে অন্তর্ভুক্ত হয় পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্রের মতো কমিনিস্ট ব্লকের দেশ, পরবর্তীকালে ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ অন্তর্ভুক্ত হয় শ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, শ্লোভেনিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া। এভাবেই সম্প্রসারিত হচ্ছে ন্যাটো। যদিও এর সম্প্রসারণে বিতর্ক রয়েছে, তথাপি একক ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে ন্যাটোর সম্প্রসারণ কতটুকু সফল হবে, তা সময়ই ভালো বলতে পারবে।

৮.১০ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ

মধ্য ইউরোপের দেশগুলোকে ন্যাটোভুক্ত করে নেওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে শ্লোভকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়া হতে পারে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, এ সম্প্রসারিত সামরিক জোটের লক্ষ্য কী হবে? এ প্রসঙ্গে তিনটি জবাবের কথা বলা হয়ে থাকে।

ক. রাশিয়া যদি আবার কখনো সম্প্রসারণবাদী রূপ ধারণ করে, তাহলে তাকে প্রতিহত করা।
খ. ইউরোপীয় অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করা ও
গ. আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে সেনা প্রেরণের জন্য শান্তিরক্ষা মিশন সংগঠিত করা। তবে যে যাই

বলুক, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ঘটনাসমূহের পরিবর্তনের ফলে ন্যাটোর গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস
পেয়েছে। যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ন্যাটোর জন্ম হয়েছিল, বর্তমানে সে ধরনের অবস্থা ও বিরাজমান নেই। অনেকে মনে করেন যে বর্তমানে ন্যাটো জোটের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে
হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হলো :

১. বর্তমানে দুই পরাশক্তির মধ্যকার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার সংঘর্ষের আশংকা নেই বললেই চলে। তাই ন্যাটোর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।
২. পশ্চিম ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে রাশিয়া তাদের মোতায়েনকৃত ক্ষেপণাস্ত্র তুলে নিয়েছে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরাপ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়েছে। এর ফলে ন্যাটো
জোটের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিস্তৃতির আশংকা
নেই। ফলে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার রোধের ক্ষেত্রে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে।
৪. দুই পরাশক্তিই বর্তমানে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা ইতোমধ্যে
মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। যেখানে তারা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ধ্বংস করছে, সেখানে সামরিক জোটের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়।
৫. 'ওয়ারশ' জোটের বিলুপ্তির ফলে বর্তমানে ন্যাটো জোটের কোনো গুরুত্ব নেই। ন্যাটো জোটে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও গুরুত্ব সর্বাধিক। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তার সামরিক কর্তৃত্ব বজায়
রাখলেই বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। ন্যাটো জোটের সৃষ্টিকালীন গুরুত্ব এখন আর না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রণ হিসেবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ন্যাটো জোট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তবে এ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ন্যাটো ইউরোপের জন্য শুভ হবে, না অশুভ হবে তা সময়ই বলে দেবে।

মূলত স্নায়ুযুদ্ধের পর ন্যাটোর যে সম্প্রসারণের গতি শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। তবে ন্যাটোর সম্প্রসারণ যে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। অদূর ভবিষ্যতে ন্যাটো যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ন্যাটোর ভবিষ্যৎ যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল সেগুলো হলো :

প্রথমত : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে টিকিয়ে রাখবে।

দ্বিতীয়ত : জার্মানি ও রাশিয়া থেকে যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ভীতি না কাটবে।

তৃতীয়ত : একক ইউরোপ গঠনে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ন্যাটোকে কাজে লাগাবে।

চতুর্থত : জাতিসংঘের দায়িত্ব অনেকটা এ সংস্থা কর্তৃক গ্রহণ করার ফলে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও শক্তি পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছে। কারণ বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে তার কার্যসিদ্ধির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বিকল্প শক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে যতদিন না পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের গঠন কাঠামোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

পঞ্চমত : ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ ও শান্তি রক্ষার জন্য ন্যাটো

সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

ষষ্ঠত : বিশ্বব্যাপী গোলযোগপূর্ণ এলাকায় দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনতে ন্যাটো বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ জন্য ২০০২ এর শীর্ষ সম্মেলনে গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে দ্রুত মোতায়েনযোগ্য ২১ হাজার সৈন্যের র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সপ্তমত : ন্যাটো গঠনের ফলে ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। ওয়ারশ জোট বিলুপ্ত এবং ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণের ফলে সে বিরোধ কেটে যাবে যা ভবিষ্যৎ সদস্য দেশগুলোকে একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করবে।

অপরিবর্তিত বিশ্বে ভবিষ্যতে ন্যাটোর টিকে থাকার উপরিউক্ত যুক্তিগুলোর বিপক্ষেও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো :

প্রথমত : সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ওয়ারশ জোট বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের প্রতিপক্ষের ভীতির কারণের অবসান হয়েছে। ফলে ন্যাটো অদূর ভবিষতে টিকে থাকার প্রয়োজন গুরুত্ব হারিয়েছে।

দ্বিতীয়ত : ন্যাটোর অন্যান্য প্রভাবশালী সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এতে সামান্য হলেও ন্যাটো জোটে প্রভাব পড়ছে বলে ২০০৩ সালে মার্কিনীদের ইরাক আক্রমণে জার্মানি, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা অগ্রাহ্য করে।

তৃতীয়ত : দুই পরাশক্তিই বর্তমানে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা ইতোমধ্যেই মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। যেখানে তারা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ধ্বংস করছে সেখানে সামরিক জোটের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

চতুর্থত : সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিজম এর বিস্তৃতির আশংকা নেই। ফলে সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধের ক্ষেত্রে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে।

পঞ্চমত : ন্যাটো পরিচালনা করতে যে বিশাল ব্যয়ভার তারপর প্রতিনিয়ত সদস্য বৃদ্ধির ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিশাল ব্যয়ভার অংশীদার হতে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম। তাই অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্স এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কতদিন বহন করবে তা অনেকটা অনিশ্চিত।

ষষ্ঠত : অদূর ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরষিদের সম্প্রসারণ এবং গঠন কাঠামোতে গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির সন্নিবেশ ঘটলে ন্যাটো তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে।

সপ্তমত : যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এ সংস্থায় যোগদান করেছে তাদের স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ন্যাটোতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইঙ্গ-মার্কিন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করায় অদূর ভবিষ্যতে এসব সদস্য রাষ্ট্র ন্যাটো- তে তাদের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। ফলে ন্যাটোর ভবিষৎ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারে।

৮.১১ সম্প্রসারণ নয়, ন্যাটোর রূপান্তর প্রয়োজন (Restructuring Not Expansion of NATO)

১৯৪৮ সালে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল ৬৪ বছর পর সে উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর হুমকি মোকাবেলা করার জন্যই পুঁজিবাদী দেশগুলো ন্যাটো নামে একটি সামরিক জোট গঠন করে। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সামরিক জোট ওয়ারশ প্যাক্ট- এর বিলুপ্তি ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। কিন্তু বিগত বিশ বছরে ন্যাটো তার কার্যক্রম বিন্দুমাত্র সংকুচিত না করে তা বিশ্বব্যপী সম্প্রসারণ করেছে। কিন্তু ন্যাটোর সম্প্রসারণ কি ন্যাটোর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ? স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ধারণা

http://thejobstudy.com Go to Contents

করেছিল ন্যাটো হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা তার কার্যক্রম সংকুচিত করে ফেলবে। কিন্তু ন্যাটোর উদ্যোক্তরা ন্যাটোকে বিলুপ্ত বা সংকুচিত না করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনে ন্যাটোকে ব্যবহার করে। প্রথম দিকে ন্যাটোর সন্ত্রাস দমন প্রক্রিয়ার ফলে ন্যাটোর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায় ন্যাটোর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে বিশ্বব্যাপী ন্যাটোর বিপক্ষে জনমত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষমতাধর শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করার হাতিয়ার হিসেবে ন্যাটোকে ব্যবহার করলে ন্যাটোর প্রতি বিশ্ব বিবেকের বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। তাই বর্তমান বিশ্বে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বিলুপ্তি বা সংকোচনের চেয়ে ন্যাটোর রূপান্তর একান্ত প্রয়োজন বলে অনুমিত হচ্ছে। ন্যাটোর রূপান্তর প্রক্রিয়ার মূল শর্তই হতে হবে বিশ্ব শান্তি, মানবতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসনে ন্যাটোর নিঃস্বার্থ ও ত্বরিৎ অংশগ্রহণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুটা পরেই ন্যাটো উত্তর আটলান্টিক মহাসমুদ্রের দু'পাশে মিত্র শক্তিসমূহের মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পশ্চিম ইউরোপের মিত্র শক্তিসমূহের আঁতাত হিসেবে সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ করতে নয়-যুদ্ধের প্রতিষেধক হিসেবে যুদ্ধের যে বিভীষিকা থেকে পশ্চিমা ইউরোপকে মিত্রবাহিনীর চার বছরের প্রতিরক্ষামূলক প্রতিযুদ্ধ বের করে আনে। সেই বিভীষিকায় যাতে পশ্চিম ইউরোপকে আর পড়তে না হয় তার ব্যবস্থা হিসেবে। জার্মানির নাৎসি সরকার কর্তৃক সূচিত সেই ভয়াবহ যুদ্ধকে ঠেকাতে পশ্চিম ইউরোপের দরকার হয়েছিল। পশ্চিমে আটলান্টিক পাড়ের যুক্তরাষ্ট্র পূর্বে জার্মানির পূর্বগ্রন্থের বিজয়াভিযান ঠেকানো সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ভারতবর্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, চীনের ঔপনিবেশিকে আর আধা ঔপনিবেধিক শাসনাধীন সেই সব জনগণের যাদের পক্ষে পশ্চিম ইউরোপীয়দের প্রতিপক্ষে জার্মানি জাপানের অক্ষশক্তির পক্ষে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কমিউনিজম পরিচালিত বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বযুদ্ধ ঠেকানোর কাজে একক স্বার্থে সকলকে একত্রিত করে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংঘ (NATO) প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করে। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ করা নয়, যুদ্ধ ঠেকানো। ন্যাটো প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতার মাধ্যমে যে কোনো অগ্রযাত্রামূলক যুদ্ধের প্রতিপক্ষে ঐরূপ পরিনতির দৃশ্যমান হুমকি দিয়ে রাখা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পশ্চিম ইউরোপকে কমিউনিস্ট বিশ্বের বিজয়াভিযান মূলক ঘোষিত যুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য ন্যাটোর আর দরকার থাকে না। সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট বাহিনীপুঞ্জের পঙ্গপালকে ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখা হস্তী বাহিনীস্বরূপ ন্যাটো এবার অর্থহীন অথচ প্রচুর ব্যয়বহুল এক শ্বেত হস্তীতে পরিণত হয়। ন্যাটো এখন একটি যুদ্ধবাজ সমিতিতে পরিণত হয়েছে যা তার মূল কার্যক্ষেত্রে উত্তর আটলান্টিক ছেড়ে বহুদূর মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানে এসে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে লিবিয়ায়। তারপর হয়তো সিরিয়া বা ইরানে । এসব জায়গাই উত্তর আটলান্টিক থেকে অনেক দূরে। কমিউনিস্টদের এখানে গন্ধ বাতাস নেই। আর যে সব সন্ত্রাসী দমনে ন্যাটোর মতো এক বিশাল সমরযন্ত্র অত বড় বড় অভিযান করছে তা একেবারেই বেমানান। ছোট ছোট সামরিক সরকার বা একনায়কতন্ত্রের শাসকদের গণতন্ত্রের স্বার্থে ধ্বংস করার জন্য ন্যাটোর মতো এখন বিশাল সমরাভিযান আজকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সহায়তায় তাদের নিমেষে ধ্বংস করা মার্কিন ন্যাটোর/সামরিক সময়ের ব্যাপার মাত্র। তার জন্য অত বড় যুদ্ধ দরকার হয় না। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের যুদ্ধগত ভোগান্তির দরকার হয় না। কিন্তু ন্যাটোর এতসব যুদ্ধগত তোড়জোড় সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় বেশি। ন্যাটোর অতীত কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে ন্যাটো যেই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখন আর নেই। সামরিক বাহিনীপুঞ্জ হিসেবে ন্যাটোর প্রয়োজন আর উপযোগও আজ ফুরিয়েছে। তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ অনুধাবনের পথ ধরে ন্যাটোকে হয় তুলে দিতে হয় যেমন তার প্রতিপক্ষ Warsaw Pact উঠে গেছে। নয় তাকে সন্ত্রাস প্রতিরোধ মূলক অন্য ধরনের এক বাহিনীপুঞ্জে পরিবর্তিত করতে হবে। এতে করে তার যুদ্ধ বাহিনীকে তুলে দিয়ে, উচ্চতর সেনা নায়কদের অধীনে পুরো ন্যাটোকে নতুন করে সন্ত্রাস প্রতিরোধমূলক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের যন্ত্রে রূপান্তরিত করা দরকার।

ন্যাটো যাতে যুদ্ধ শুরুর পরিবর্তে যুদ্ধ বন্ধ করতে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার পরিবর্তে যুদ্ধ না করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ন্যাটো যত দ্রুত মানবিক এবং আন্তঃদ্বন্দ্বমূলক সংঘাত-নিরসনে সহায়ক হবে তত দ্রুত ন্যাটোর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে ন্যাটোর বিলুপ্তি। সম্প্রসারণে চেয়ে ন্যাটোর রূপান্তর একান্ত প্রয়োজন।

মূল্যায়ন

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যাটো গঠন করা হয়েছিল অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্লক থেকে গণতান্ত্রিক ব্লককে রক্ষা করা, তা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হলেও ন্যাটো তার কার্যক্রম থেকে সরে আসে নি। ন্যাটো জোটের সৃষ্টিকালীন গুরুত্ব এখন আর না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ন্যাটো জোট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ন্যাটোর টিকে থাকতে হলে এর ওপর অর্পিত দায়িত্বকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে, যাতে সকলের মন থেকে এরূপ ভীতি দূর হয়ে যায় যে সংগঠনটি তাদের ওপর অহেতুক খবরদারি করা ও তাদের চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখার জন্যই বিরাজ করছে না। এটা প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. কার নেতৃত্বে 'ন্যাটো' গঠন করা হয়েছিল ?
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

২. কারা 'ওয়ারশ জোট' গঠন করেছিল ?
উত্তর: সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৩. ন্যাটো জোট কত সালে গঠিত হয় ?
উত্তর: ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল।

৩. কত সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে আণবিক শক্তির অধিকারী ছিল ?
উত্তর: ১৯৪৫-৫৯ সাল পর্যন্ত।

৪. মার্শাল পরিকল্পনা কত সালে ঘোষণা করা হয় ?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে।

৫. মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তর: পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রগুলোকে পুনর্গঠন।

৬. কত সালে জার্মান রুশ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?
উত্তর: ১৯৩৯ সালে।

৭. পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম খনি রক্ষায় কোন কোন দেশ সৈন্য প্রেরণ করেছিল ?
উত্তর: গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৮. আজারবাইজান অঞ্চলের জনগণ কত সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ?
উত্তর: ১৯৪৫ সালে।

৯. কোন দেশের নেতৃত্বে 'সিয়াটো' চুক্তি সম্পাদিত হয় ?
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১০. কত সালে সিয়াটো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?
উত্তর: ১৯৫৪ সালে।

১১. SEATO-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলোর নাম লিখ।
উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তান।

১২. ন্যাটো জোটের উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তর: সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা রক্ষা, সোভিয়েত আক্রমণ প্রতিহত করা, কমিউনিজমের প্রসাররোধ।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) ন্যাটো জোট কত সালে গঠিত হয় ?
(খ) ন্যাটো জোটের উদ্দেশ্য কী ছিল ?

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. ন্যাটোর গঠন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী? পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ন্যাটোর সম্প্রসারণের কারণগুলো উল্লেখ করুন।
৩. NATO- এর সদর দপ্তর কোথায়? এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম লিখুন ।
৪. বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কীভাবে সম্পৃক্ত হতে চায় ?
৫. উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা এবং ওয়ারস চুক্তি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

অধ্যায় ৯

এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনোমিক কো-অপারেশন : এ্যাপেক
Asia Pacific Economic Co-operation : APEC

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৯.১ ভূমিকা
৯.২ বৈশিষ্ট্য
৯.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৯.৪ সদস্য দেশসমূহ (২১টি)
৯.৫ বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা
৯.৬ এ্যাপেক ও বিশ্বায়ন
৯.৭ এ্যাপেকের কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকরী কর্মসূচী
৯.৮ বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনোমিক কো-অপারেশন বা APEC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠার সময় এ্যাপেকের সদস্য সংখ্যা ছিল ১২। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ এ। এ্যাপেকের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের এক বিশাল এলাকা গড়ে তোলা। এ্যাপেকের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রায় ২২০ কোটি জনসংখ্যার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতিকে গতিশীল করা এবং কমিউনিটির বন্ধন বৃদ্ধি করা এ্যাপেক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। মূলত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতি গতিশীল রাখার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিকে সহযোগিতা করার ওপর APEC গুরুত্ব প্রদান করে। তাই বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৯.২ বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

১. এটি একটি অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সংগঠন।
২. বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক জোট জি-৮ এর সকল সদস্য এর অন্তর্ভুক্ত।
৩. ASEAN এর অনেক সদস্য এর অন্তর্ভুক্ত (প্রতিষ্ঠাতা ৫টিসহ ৭টি সদস্য)
৪. এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিন আমেরিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের সম্মিলন ঘটেছে এ্যাপেকে।
৫. ২১টি সদস্য রাষ্ট্রের একত্রে জিডিপির পরিমাণ ১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
৬. বিশ্ব বাণিজ্যের ৪৭ শতাংশ সম্পন্ন হয় এ অঞ্চলে আর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলার।
৭. বিশ্বের মোট উৎপাদিত পণ্যের ৫৫% এখানে উৎপাদিত হয়।
৮. বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশের বেশি জনসংখ্যার বসবাস।
৯. বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী প্রতিটি দেশ এ জোটের অন্তর্ভুক্ত।

১০. বিশ্বের তিনটি বড় অর্থনৈতিক শক্তির একটি হচ্ছে এ্যাপেক।
১১. এ ফোরামে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে উন্নয়নশীল দেশও।

৯.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

১. এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতিকে গতিশীল করা এবং কমিউনিটির বন্ধন বৃদ্ধি করা।
২. ২০২০ সালের মধ্যে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা। তবে জোটভুক্ত উন্নত দেশগুলোর জন্য এ সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০১০। আর অনুন্নত দেশগুলোর জন্য ধরা হয়েছে ২০২০।

৯.৪ সদস্য দেশসমূহ (২১টি)

যে ২১টি দেশ নিয়ে এ্যাপেক গঠিত সেগুলো হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তাইওয়ান, হংকং, মেক্সিকো, পাপুয়া নিউগিনি, চিলি, রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও পেরু।

সদর দপ্তর : সিঙ্গাপুর

বর্তমান নির্বাহি প্রধান : অ্যালেন বোলার্ড (নিউজিল্যান্ড) দায়িত্বভার গ্রহণ-১ জানুয়ারি, ২০১৩।

শীর্ষ সম্মেলন : প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম শীর্ষ সম্মেলন : ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে।

২৪তম শীর্ষ সম্মেলন : ২-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে।

২৫তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৩ সালে ৫-৭ অক্টোবর, ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায়।

২৬তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৪ সালে হবে চীনে।

২৭তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৫ সালে হবে ফিলিপাইনের ম্যানিলায়।

২৮তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৬ সালে হবে পেরুর লিমাতে।

২৯তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৭ সালে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে APEC

- APEC-এর পূর্বরূপ : Asia Pacific Economic Co-operation.
- প্রতিষ্ঠিত হয় : নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে।
- APEC-এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য : ২০২০ সালের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।
- উদ্যোক্তা : অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।
- সদস্য সংখ্যা : ২১টি। চীন, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই,কানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও পেরু।
- সদর দপ্তর: আলেকজান্দ্রা পয়েন্ট, সিঙ্গাপুর।
- প্রথম শীর্ষ বৈঠক : অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায়।
- APEC-এর সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ২-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে, রাশিয়ার ভ্লাদিভস্ট- কে।
- APEC-এর বর্তমান নির্বাহী প্রধান : অ্যালেন বোলার্ড (নিউজিল্যান্ড) দায়িত্বভার গ্রহণ-১জানুয়ারি, ২০১৩।
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের এক বিশাল এলাকা গড়ে তোলা।
- মোট জনসংখ্যা : ২২০ কোটি।
- এ্যাপেকের জিডিপির পরিমাণ ১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- বিশ্ব বাণিজ্যের ৪৭ শতাংশ সম্পন্ন হয় এই অঞ্চলে।
- এ অঞ্চলে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলার।
- বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের ৫৫ শতাংশে এই এলাকায় উৎপাদিত হয়।

বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে
- অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায়
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ধ্যান ধারণার সম্মিলন ঘটাতে
- দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে
- বিভিন্ন পণ্যের অবাধ বিনিময়ের জন্য শুল্ক হ্রাস।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এবং
- কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে।

পরিচালনা

১৯৯১ সালে গৃহীত নীতিমালার আলোকে এ্যাপেক পরিচালিত হয়। উন্মুক্ত আলাপ আলোচনা এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা ঠিক রেখে এ্যাপেক তার কার্যক্রম পরিচালিত করে।

মন্ত্রী পর্যায়ের এবং কর্মকর্তাদের বৈঠক

প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে ১ জন করে প্রতি সদস্য রাষ্ট্র থেকে এ্যাপেকের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করে। মন্ত্রী পর্যায়ের শীর্ষ বৈঠকে অনুষ্ঠানের জন্য ঐ সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ও অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৯.৫ বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা (Importance and Necessity of APEC)

এ্যাপেক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে সচল রাখা। বিগত ২৫ (১৯৮৯-২০১৪) বছরে এ্যাপেক তার কার্যক্রম অতি সতর্কতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এ্যাপেক তার কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করেছে। মূলত পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় বিগত দিনের কার্যক্রমের আলোকে এ্যাপেক যে অনেকটাই সফলতা অর্জন করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৯.৬ এ্যাপেক ও বিশ্বায়ন (APEC and Globalization)

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর এ্যাপেক গঠন করার মূল উদ্দেশ্যই হলো একে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্মুক্ত করা, পণ্য এবং বাণিজ্যে বাধাসমূহ দূর করা এবং পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এ্যাপেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫%। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবারায় ১৯৮৯ সালে মন্ত্রী পর্যায়ের একটি বৈঠকের পর এ্যাপেকের যাত্রা শুরু হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এ্যাপেকের একটি বৈঠকের আয়োজন করে। এ বৈঠকে এ্যাপেক ভবিষ্যতে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হবে বলে ধারণা পাওয়া যায়। মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকলেও এ্যাপেকের মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে। এ্যাপেক একমাত্র যে সমস্ত বেসরকারি সংগঠনকে সমর্থন করে সেটি হলো–"প্যাসিফিক বিজনেস ফর আপ।" সিয়াটল সম্মেলনে এ্যাপেকের দুটি উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য দুটি হলো :

১. একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রসারমান বিশ্ব অর্থনীতিকে সমর্থন দান করা।

২. ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক বাধাগুলো কমিয়ে আনা ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভিতর পণ্য পরিবহনে বা পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি করা। ১৯৯৪ সনে ইন্দোনেশিয়াতে এ্যাপেক নেতৃবৃন্দ নিজেদের ভিতর মুক্তবাজার গড়ে তোলার সময়সীমা নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ ২০২০ সাল। তবে এর মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সময়সীমা ধরা হয় ২০১০ পর্যন্ত। আর ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য। এ্যাপেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভিতর মুক্ত বাজার গঠনের পাশাপাশি বাণিজ্য প্রসারের ব্যাপারেও এ্যাপেক আগ্রহী। এ ব্যাপারে এ্যাপেক পূর্ব এশিয়ার সম্ভাবনাময় বাজারে নিজেদের প্রবেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। এ্যাপেকের এ্যাজেন্ডার ভিতর কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা আছে। এগুলো হলো :

১. ট্যারিফ কমানো।
২. শুল্ক প্রক্রিয়াকে আধুনিকীকরণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৩. সেবার মানকে উন্নয়ন করা।
৪. পুঁজির বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।
৫. একটি কারিগরি মান গড়ে তোলা।
৬. মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ করা।
৭. প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৮. সরকারি বাজারে উদারীকরণ করা।
৯. রুলস অফ অরিজিনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
১০. সৃষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
১২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

৯.৭ এ্যাপেকের কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকরী কর্মসূচির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো হলো :

১. মানব উন্নয়ন। এর ভিতর থাকছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শ্রমিক সরবরাহ ও বাজারের তথ্য।
২. শিল্পভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
৩. ছোট ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ।
৪. শক্তি খাত।
৫. পরিবহন খাত।
৬. টেলিযোগাযোগ ও তথ্য।
৭. মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ।
৮. পর্যটক।
৯. বাণিজ্য এবং পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান।
১০. সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ।
১১. মৎস্য।
১২. কৃষি প্রযুক্তি।

এ্যাপেকের সদস্যরা তথ্য প্রযুক্তি, খাদ্য উৎপাদন, মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য, সামুদ্রিক পণ্য এগুলোর ওপর থেকে ট্যারিফ কমিয়ে আনার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেছে। খুব কাছ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ্যাপেক শুধুমাত্র একটা আঞ্চলিক বাণিজ্যিক ব্লক নয় যেটা উরুগুয়ে বাউন্ডের চুক্তিকে কার্যকরী করবে। বরং এটি স্পষ্ট এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য NAFTA-র মতো আরেকটি শক্তিশালী একক বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তি। এ্যাপেক অর্থনীতিতে একটি একত্রীভূত শক্তি বা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি ধাপ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি এ্যাপেকের নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবে চলে আসবে এটি এখন খুবই স্পষ্ট। পূর্ব–এশিয়ার সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য এ্যাপেককে উদ্যোমী করে মূলত অস্ট্রেলিয়া। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর বাণিজ্যিক ধরণের কারণে অস্ট্রেলিয়া পূর্ব-এশিয়ার জ্বলে ওঠা অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়। পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে উন্নয়নের বিষয়ে এ্যাপেক আগ্রহী। পূর্ব এশীয় অর্থনীতিতে জাপানের প্রাধান্য যে বেশি এতে কোন সন্দেহ নেই। জাপানের এ প্রাধান্যকে বন্ধ করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র এ্যাপেক-কে যে ব্যবহার করে তা সুস্পষ্ট। এ্যাপেক গঠন করে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব এশিয়াতে কোন অর্থনৈতিক গ্রুপ গড়ে ওঠার পথকে বাধাগ্রস্ত করে দিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগ যতটা উদারীকরণ করা উচিত এ্যাপেক এখন পর্যন্ত ততটা করে উঠতে পারে নি। তবে ইতোমধ্যে এ্যাপেক তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতিকে বিশ্বায়নের পথে যতটুকু এগিয়ে নিয়ে গেছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং একত্রিকরণ প্রক্রিয়াকে সাধারণত বিশ্বায়ন বলা হচ্ছে। তবে একে অনেকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বলে দাবী করছে। তবে বিভিন্ন বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন এমন একটি অবস্থা যা বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অর্থ বুঝায়। তবে প্রযুক্তি উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও একত্রিত করা, বাজার খুলে দেওয়া,

স্বাধীনভাবে উন্নয়ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, উন্নয়ন কার্যক্রমকে উদারীকরণ করা, অর্থনীতি সংকটকে মোকাবেলা করা, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং একত্রিকরণ করাকে বিশ্বায়ন বলতে পারি। তবে অনেকে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টাকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ্যাপেক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় যেভাবে অংশগ্রহণ করছে তা হলো :

১. জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি অর্থনীতি শক্তির মাঝে সংযোগ স্থাপন করছে।
২. এ্যাপেকের ব্যবসায়িক উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে।
৩. বিশ্বে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথেও সংযোগ স্থাপন করছে।

এ্যাপেক এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বাজারকে উদারীকরণ করতে সাহায্য করেছে। এছাড়া এ অঞ্চলে বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি সহায়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের রাষ্ট্রকে বিশ্বায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৯.৮ বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Importance and Necessity of APEC in World Economy)

বিশ্ব অর্থনীতি ও আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে এ্যাপেক গত ২৫ (১৯৮৯-২০১৪) বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এ্যাপেক এ অঞ্চলে এবং বিশ্ব সামষ্টিক অর্থনীতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে আস্থা তৈরি করেছে। এ্যাপেকের সহযোগিতা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার জন্য অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ্যাপেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিচে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে :** এ্যাপেকের ১৫ বছরের মতো সময় ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। সামনের বছরগুলোতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে এ্যাপেককে বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য এ্যাপেককে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু তার পরেও তাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে সেজন্য সুযোগ ও পথ সৃষ্টি করতে হবে। এ্যাপেকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছাতে হলে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ভিত্তির। এ সঠিক ভিত্তি স্থাপনে এ্যাপেক গত ১৫ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টা এ্যাপেকের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে এবং এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করেছে। এছাড়া এ্যাপেক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব দেওয়াসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবৃদ্ধির একটি শক্তি হিসেবে কাজ করছে। একক বা যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ্যাপেক তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গত দশকে এ্যাপেকের অগ্রগতির ওপর অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রস্তুত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় এক দশকে এ্যাপেকের শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় নি পাশাপাশি এ অঞ্চলের জীবন যাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৫৫ ভাগ উৎপাদিত হয় জোট ভুক্ত দেশে। এ অঞ্চলের জিডিপির পরিমান ১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর এদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী প্রতিটি দেশ এ জোটের অন্তর্ভূক্ত।

২. **অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় :** ১৯৯৪ সালের ১৫ ও ১৬ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বোগরে অবকাশ কেন্দ্রে এ্যাপেকের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কর্মকর্তাদের মতে প্যাসিফিক রিম হচ্ছে এক ট্রিলিয়ন (১ হাজার বিলিয়ন) ডলার মূল্যের বাণিজ্য বাজার। এ এলাকায় দ্রুত ব্যবসার প্রসার ঘটছে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে ফিলিপাইনের সুবিক বেতে যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে 'ম্যানিলা অ্যাকশন প্লান' গৃহীত হয়। এতে ২০২০ সালের মধ্যে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়। আর এরপর থেকেই মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান রেখে চলার কৌশল তৈরি করেছে এ্যাপেক।

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় সমর্থন দান ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে এ্যাপেক মন্ত্রীরা দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন ২০০০-এ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা মনে করেন এ ব্যবস্থা একুশ শতকের অর্থনীতির বিশ্বায়নের চাহিদা মেটাতে পারবে। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইনের আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির নীতিকে আরও সম্প্রসারণ ও উদারীকরণ করার সাহায্য করছে এ্যাপেক। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতির ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিগুলোকে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে এ্যাপেক কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে করে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলো আরও অধিক পরিমাণ অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আর এগুলো কার্যকর করার জন্য এ্যাপেক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি এদের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

৩. **বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার সন্নিবেশ :** বিগত দিনের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে এ সংস্থায় রয়েছে চীনের মতো One Country two System এর দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, রয়েছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের মত উঠতি তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশ। এদের রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণা। এছাড়াও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর সদস্যদের ১২টি রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। ৪টি রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার, ৪টি ওশেনিয়া ও ১টি ইউরোপ। আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ওপর গড়ে ওঠা একটি অর্থনৈতিক জোট যা বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের দেশ এ এ্যাপেক ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করার সুবাদে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে।

৪. **দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে :** এ্যাপেক অঞ্চলে ২৮০ কোটি জনসংখ্যার বসবাস। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। এ ব্যাপক জনসংখ্যাকে উন্নয়নের অংশীদার করতে জনশক্তি জনসম্পদে পরিণত করতে এ্যাপেক গুরুত্বারোপ করেছে। এ্যাপেক বিশ্বায়নের ফলে নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এজন্য এ্যাপেক এ অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের জন্য শিক্ষা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর প্রেক্ষিতে গত এপ্রিলে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যে সমস্ত কারণে জরুরি বলে এ্যাপেক মন্ত্রীরা মতো প্রকাশ করেন সেগুলো হলো:

ক. ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজন উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা।

খ. শিক্ষা এবং শিক্ষকের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন জরুরি।

৫. **কৃষি পণ্যের রপ্তানীর ওপর ভর্তুকি হ্রাস :** এ্যাপেক কৃষিপণ্য রপ্তানির ওপর ভর্তুকি হ্রাস করে বিশ্বব্যাপী কৃষি পণ্যের বাজারে একটি সমতা বিধানের পদক্ষেপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে এ্যাপেকভূক্ত দেশগুলোর উৎপাদিত কৃষি পণ্যের রপ্তানির ওপর ভর্তুকি হ্রাস করে কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থাকে প্রতিযোগিতামূলক করেছে।

৬. **বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস :** এ্যাপেক নেতৃবৃন্দ শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন শিল্পপণ্য, কাঁচামাল ও সেবার ক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক শুল্ক হ্রাস করে পণ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। 'ম্যানিলা অ্যাকশন প্লান'-এর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ওপর ট্যারিফ বিলুপ্ত করার মার্কিন পরিকল্পনটি গ্রহণ করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিশেষ করে কম্পিউটার, সেমিকন্ডাক্টর, সফটওয়ার ও টেলিযোগাযোগের সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এখন ট্যারিফ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ্যাপেক ফোরামে অংশ নিয়ে চীন ইতোমধ্যে

বেশ কিছু আইটেমের ওপর ১৫ থেকে ২৩ ভাগ হারে ট্যারিফ বা শুল্ক হ্রাস করেছে।

৭. **কর্মসংস্থান :** এ্যাপেক মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করার ফলে এ্যাপেকভুক্ত দেশগুলোতে ব্যাপক বিনিয়োগ হয়েছে এবং এর বেশির ভাগই শিল্প কলকারখানায়। ফলে এ্যাপেক অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মালয়েশিয়াতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২ সালে রপ্তানি করেছে ১৩ হাজার কোটি ডলার। এর ফলে ২৪ লাখ মার্কিনীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়া ও চীনে গত একদশকে ব্যাপক বিনিয়োগ হওয়ার কারণে সেসব এলাকার বেকারত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বেকারত্ব দূরীকরণে এবং শিল্পায়নের অগ্রগতিকে ধরে রাখতে হলে এ্যাপেক-এর বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখা একান্ত আবশ্যক না হলে শুধু আঞ্চলিক অর্থনীতিই নয়,আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে।

৯.৯ মূল্যায়ন (Evaluation)

এ্যাপেকভুক্ত এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে সত্য। কিন্তু সেখানকার বেকারত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে নি। প্রকৃত আয় আর আগের জায়গায় ফিরে আসে নি। এমনকি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছিল তা থেমে গেছে। ফলশ্রুতিতে অস্থিরতা এখনও রয়ে গেছে। সুতরাং বড় অর্থনৈতিক জোট হিসেবে এ্যাপেকের আজ বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। এটা না করে এ্যাপেক যদি প্রতিবছর শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয় তা হলে প্রতিষ্ঠানটি একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য। তাই আমরা বলতে পারি, এ্যাপেক যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল অর্থাৎ এশিয়া প্যাসিফিক অর্থনীতিকে গতিশীল এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে সার্বজনীন করার জন্য যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **APEC এর পূর্ণরূপ কি?**
উত্তর: Asia Pacific economic Co-operation

২. **APEC কখন গঠিত হয়?**
উত্তর: প্রতিষ্ঠিত হয় : নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে

৩. **APEC বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?**
উত্তর: ২১টি

৪. **APEC এর বর্তমান নির্বাহী প্রধান কে?**
উত্তর: অ্যালেন বোলার্ড

৫. **APEC এর সদর দপ্তর কোথায়?**
উত্তর: আলেকজান্দ্রা পয়েন্ট, সিঙ্গাপুর

৬. **APEC এর উদ্যোক্তা কে?**
উত্তর: অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।

৭. **বিশ্ব বাণিজ্যের কতটুকু এ্যাপেক অঞ্চলে সম্পন্ন হয়?**
উত্তর: ৪৭%

৮. **বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের কত শতাংশ এ্যাপেক এলাকায় উৎপাদিত হয়?**
উত্তর: ৫৫%

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. (ক) **APEC এর বর্তমান নির্বাহী প্রধান কে?**
(খ) **APEC এর সদর দপ্তর কোথায়?**

৬. (ক) **APEC এর উদ্যোক্তা কে?**
(খ) **APEC এর পূর্ণরূপ কি?**

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন?
২. বর্তমান এ্যাপেক ও বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ১০

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা
Organisation Of Islamic Co-operation(OIC)

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১০.১ ভূমিকা
১০.২ ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট
১০.৩ ওআইসি-এর নতুন সনদ
১০.৪ ওআইসি'র সাংগঠনিক কাঠামো
১০.৫ ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ
১০.৬ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন
১০.৭ ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ
১০.৮ নীতিমালাসমূহ
১০.৯ সহযোগী সংস্থা
১০.১০ ওআইসি'র কার্যক্রমসমূহ
১০.১১ অঙ্গ সংগঠনসমূহ
১০.১২ মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় ওআইসি'র ভূমিকা
১০.১৩ ওআইসিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
১০.১৪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ওআইসি'র ভূমিকা
১০.১৫ ওআইসি-এর সফলতা
১০.১৬ বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক
১০.১৭ ওআইসি -এর কার্যক্রম মূল্যায়ন

Go to Contents
http://thejobstudy.com

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা Organisation Of Islamic Co-operation (OIC) মুসলিম জাহানের ৫৭টি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের একটি বলিষ্ঠ সংগঠন । বিশ্বের প্রায় ১২০ কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সংহতির প্রতিক হচ্ছে OIC, যার মূল আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিম জাহানের সংহতির যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তার সাংগঠনিক অভিব্যক্তি হচ্ছে ওআইসি । বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ওআইসি গঠিত হলেও বিগত (১৯৬৯-২০১৫) ৪৬ বছরে ওআইসি'র কার্যক্রমে এর সার্বিক প্রতিফল পাওয়া যায় না। ওআইসি'র বিগত দিনের ভূমিকা এবং উদ্যেশ্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যাবে। ওআইসি'র কার্যাবলি আলোচনা করার পূর্বে ইহার গঠনের ইতিহাস ও সংগঠন কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা আবশ্যক। ওআইসি'র গঠনের প্রেক্ষাপট ও গঠন প্রণালি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ।



ওআইসি

১০.২ ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট (Background of OIC)

১৯৬৭ সালের ৫ জুন ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়। মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ইসরাইল বেশ কিছু আরব ভূমি দখল করে নেয়। নিরাপত্তা পরিষদের আহবানে ১০ জুন, ১৯৬৭ এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এরপর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কাবা মসজিদ আল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ বছরই ২৫ আগস্ট কায়রোতে ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সৌদি আরব প্রস্তাব দেয় যে, বিষয়টি শুধু আরব নয় গোটা ইসলামি বিশ্বের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য অবিলম্বে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য। উপস্থিত অন্যান্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ তাতে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং সৌদি আরব, মরক্কো, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া ও মালয়েশিয়াকে নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরের ৮-৯ তারিখে এ কমিটির সদস্যগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মিলিত হয়ে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে এ মাসেরই (১৯৬৯ সালে) ২২ থেকে ২৫ তারিখে রাবাতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের অংশ গ্রহণে। সম্মেলন শেষে এক ঘোষণায় বলা হয় , ইসরাইলকে অবিলম্বে ১৯৬৭ সালের পূর্ব সীমানায় ফিরে যেতে

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে OIC

- প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত-১৯৬৯ সালে (আল আকসা মসজিদে ইহুদিদের দ্বারা অগ্নিকান্ডের কারনে)
- OIC-এর পূর্বনাম : Organization of Islamic Conference.
- বর্তমান নাম : Organization of Islamic Co-operation.
- ২১ আগষ্ট,১৯৬৯-আনুষ্ঠানিকভাবে OIC প্রতিষ্ঠা।
- OIC গঠিত হয়-১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর, রাবা, মরক্কোতে (প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে) অংশ গ্রহণ করে ২৫টি মুসলিম দেশ।
- মোট সদস্য-৫৬ টি (OIC) ১৫আগস্ট, ২০১২ সিরিয়ার সদস্য পদ স্থগিত করে)।
- অমুসলিম রাষ্ট্র হয়েও OIC এর সদস্য-উগান্ডা, কুয়ান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, সুরিনাম, গায়না ও মোজাম্বিক।
- সম্প্রতি অমুসলিম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদনকারী দেশ : রাশিয়া।
- সদর দপ্তর- জেদ্দা, সৌদি আরব।
- বর্তমান মহাসচিব-আইয়াদ বিন আমিন মাদানী (সৌদিআরব, ৩১ জানুয়ারি, ২০১৪-বর্তমান)।
- প্রথম মহাসচিব-মালয়েশিয়ার টেংকু আবদুর রহমান (১৯৭১-৭৩)।
- OIC- এর পর্যবেক্ষক : ১৩টি (বসনিয়া-১৯৯৪, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র-১৯৯৭, থাইল্যান্ড-১৯৯৮, তুর্কি সাইপ্রাস-১৯৯৭, মরো ন্যাশনাল লিবারেল ফ্রন্ট-১৯৭৭, জাতিসংঘ-১৯৭৬, আরব লীগ-১৯৭৫, আফ্রিকান ইউনিয়ন-১৯৭৭, ইকো-১৯৭৫, ন্যাম-১৯৭৭ এবং রাশিয়া-জুন, ২০০৫)।
- সর্বশেষ সম্মেলন (১২তম) - ৬-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, কায়রো, মিসর।
- ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪- বাংলাদেশ সদস্য পায় (৩২তম সদস্য, লাহোর সম্মেলনে)।
- সর্বশেষ সদস্য- আইভরিকোষ্ট (২০০১)

ওআইসি এর লক্ষ্যসমূহ

- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামিক সংহতি সুদৃঢ়করণ।
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য মৌলিক ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।

ওআইসি কর্তৃক পরিচালিত ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়

- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি (আইইউটি)– গাজীপুর, বাংলোদেশ।
- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব অব নাইজার, সেশহর, নাইজার।
- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব উগান্ডা, মালে ভিন্সিয়ে, উগান্ডা।

হবে। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধান ও সৈন্য প্রত্যাহারে ইসরাইলকে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানানো হয় ।

প্রথম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ২২-২৭ মার্চ পর্যন্ত জেদ্দায় মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এ সম্মেলনেই ওআইসি গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত হয়। সম্মেলন একটি ইসলামি সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং জেরুজালেম মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা জেদ্দায় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন।

ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৭০ সালের ২৬-২৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জেদ্দায় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। এতে ত্রিশটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ অংশ নেন। এ সম্মেলনে ওআইসির বিধিবদ্ধ যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে প্রায় প্রতিবছর ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ।

সদস্য সংখ্যা : প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫। বর্তমানে ৫৬টি (OIC ১৫ আগস্ট,২০১২ সিরিয়ার সদস্য পদ স্থগিত করে)।

সদর দপ্তর : জেদ্দা, সৌদির আরব, এটিকে সচিবালয় বলা হয়।

১০.৩ ওআইসি এর নতুন সনদ (New Charter of OIC)

ইসলামীক সহযোগিতা সংস্থা এর মূল সনদ গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে । বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে ১৪ মার্চ ২০০৮ ওআইসি 'র ১১তম শীর্ষ সম্মেলন মূল সনদের কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতুন সনদ গৃহীত হয়।

নতুন সনদের উল্লেখযোগ্য বিষয় : ৩৯টি অনুচ্ছেদের বিশিষ্ট ওআইসি 'র নতুন সনদে উল্লেখ যোগ্য যা রয়েছে তা হলো :

১. সদস্য দেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ থাকতে হবে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে ।
২. ওআইসি'র অঙ্গ সংগঠন হবে ১১টি ।

সম্মেলন	স্থান	অনুষ্ঠানের তারিখ
প্রথম	রাবাত, মরক্কো	২২-২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
দ্বিতীয়	লাহোর, পাকিস্তান	২২-২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
তৃতীয়	মক্কা, সৌদি আরব	২৫-২৮ জানুয়ারি, ১৯৮১
চতুর্থ	কাসাব্লাংকা, মরক্কো	১৬-১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪
পঞ্চম	কুয়েতসিটি, কুয়েত	২৬-২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৭
ষষ্ঠ	ডাকার, সেনেগাল	৯-১২ ডিসেম্বর, ১৯৯১
সপ্তম	কাসাব্লাংকা, মরক্কো	১৩-১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৪
অষ্টম	তেহরান, ইরান	৯-১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
নবম	দোহা, কাতার	১২-১৩ নভেম্বর, ২০০০
দশম	পুত্রজায়া, মালয়েশিয়া	১৬-১৭ অক্টোবর, ২০০৩
একাদশ	ডাকার,সেনেগাল	১৩-১৪ মার্চ, ২০০৮
দ্বাদশ	শারম আল শেখর, মিসর	৬-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

৩. ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ত্রিবার্ষিক।
৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্সিলর অধিবেশন হবে প্রতিবছর।
৫. মহাসচিব পদের মেয়াদ ৫ বছর।

৬. সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা হবে আরবি , ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ।
৭. দখলকার ইসরাইল মুক্ত হলে সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে স্থানান্তরিত হবে আল কুদস শহর অর্থাৎ জেরুজালেমে।

১০.৪ ওআইসি'র সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure of OIC)

ওআইসির তিনটি প্রধান সংস্থা/বডি রয়েছে । এগুলো হলো :

১. **ওআইসি'র শীর্ষ সম্মেলন :** এটি ওআইসির সর্বোচ্চ সংস্থা। ওআইসির নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ ফোরাম হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন। ওআইসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১২টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮১ সালে তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে প্রতি তিন বছর পর পর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৯ সালে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১২টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে লাহোরে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন ,১৯৮১ সালে তায়েফে তৃতীয় ১৯৮৪ সালে মরক্কোর ক্যাসাব্লাংকার ৪র্থ ,১৯৮৭ সালে কুয়েত সিটিতে ৫ম, ১৯৯১সালে ডাকারে ৬ষ্ঠ, ১৯৯৪ সালে রাবাতে ৭ম, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তেহারনে ৮ম, কাতারে ৯ম শীর্ষ সম্মেলন ২০০০ সালে এবং দশম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালের অক্টোবরে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায়, একাদশ শীর্ষ সম্মেলন ১৩-১৪ মার্চ ২০০৮ সেনেগালের ডাকারে এবং দ্বাদশ সম্মেলন ১৬-১৭ মার্চ, ২০১১ সালে মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে OIC- এর শীর্ষ সম্মেলন

২. **ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন :** সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে এ সংস্থা নিয়মিতভাবে বছরে একবার মিলিত হয় এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে। মুসলিম উম্মার সাধারন উদ্বেগের যেকোন বিষয় আলোচনা করা ,শীর্ষ সম্মেলন গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং ওআইসির মূল নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি করা এ সংস্থার দায়িত্ব। এছাড়া ওআইসি সচিবলায় ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার বাজেট অনুমোদন করা সংস্থার দায়িত্ব। এ সংস্থার অধীনে চারটি কমিটি রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

মহাসচিব	দেশ	সময়কাল
টেংকু আব্দুর রহমান	মালয়েশিয়া	১৯৭১-১৯৭৩
হাসান আল তাওহামি	মিশর	১৯৭৪-১৯৭৫
ড. আব্দুল করিম যাই	সেনেগাল	১৯৭৫-১৯৭৯
হাবিব সাক্তি	তিউনিশিয়া	১৯৭৯-১৯৮৪
সৈয়দ শরফুদ্দিন পীরজাদা	পাকিস্তান	১৯৮৫-১৯৮৮
ড. হামিদ আল গাবিদ	নাইজার	১৯৮৯-১৯৯৬
ড. আজেদ্দিন লারাকি	মরক্কো	১৯৯৭-২০০০
ড. আবদেল ওয়াহেদ বেলকাজিজ	মরক্কো	২০০১-২০০৪
ড. একমেলদ্দিন এহসানুগলু	তুরস্ক	২০০৫-২০১৩
আইয়াদ বিন আমিন মাদানী	সৌদিআরব	২০১৪-বর্তমান

ক. রাজনীতি বিষয়ক কমিটি
খ. অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ক কমিটি
গ. সাংস্কৃতিক ও ইসলাম বিষয়ক কমিটি
ঘ. প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি

এ পর্যন্ত ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংস্থার পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কাতারের কনার্কিতে। নিয়মিত অধিবেশন ছাড়াও অদ্যাবধি এ সংস্থার সদস্যরা প্রতিবছর জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনের পূর্বে নিউইয়র্কে সমস্যয়

সভায় মিলিত হয়ে থাকে।

৩. **ওআইসি সচিবালয়** : সচিবালয় ওআইসির সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রতিষ্ঠান। এটি শীর্ষ সম্মেলন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল সার্বিক কর্মসম্পাদনসহ প্রধান হচ্ছে মহাসচিব। তারা সকলেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সনদ অনুযায়ী জেরুজালেম মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এর প্রধান কার্যাবলী জেদ্দায় থাকবে। ওআইসির সরকারি ভাষা হলো তিনটি এগুলো হলো আরবি, ইংরেজী, ফারসি।

মহাসচিব

প্রথম মহাসচিব মালয়েশিয়ার টেংকু আব্দুর রহমান ১৯৭১-১৯৭৩ পর্যন্ত। বর্তমান মহাসচিব মরক্কোর ড. আবদেল ওয়াহেদ (তুরস্কের ড. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু (২০০৫) বেলকাজিজ, ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত মোট ১০ জন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছে। ২০১৩ সালে ১০ম মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন সৌদিআরবের আইয়াদ বিন আমিন মাদানি। তিনি ২০১৪ সালের ৩১ শে জানুয়ারী ক্ষমতা গ্রহণ করে। ওআইসির মহাসচিব নির্বাচিত হয় সদস্য রাষ্ট্রের সর্বসম্মতিতে। ১০ম মহাসচিব নির্বাচন ভোটাভুটির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে OIC-এর মহাসচিববৃন্দ

১০.৫ সদস্যপদ লাভ (Prerequisite to be a Member)

সব মুসলিম রাষ্ট্র এ সংস্থার সদস্যপদ লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে। অবশ্য বর্তমানে অমুসলিম দেশকেও সদস্য করার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। অমুসলিম রাষ্ট্র হয়েও OIC- এর সদস্য-উগান্ডা, কুয়াডা, ক্যামেরুন, বেনিন, সুরিনাম, গায়না ও মোজাম্বিক। সম্প্রতি অমুসলিম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদনকারী দেশ - রাশিয়া।

প্রশাসন : এ সম্মেলন সংস্থার সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব কর্তৃক। তিনি একজন নির্বাচিত প্রশাসক। তাছাড়াও তাকে সহযোগিতা করার জন্য চারজন সহকারী মহাসচিবও একইভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এদের প্রত্যেকেই চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

ওআইসি'র পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহ :

১. জাতিসংঘ
২. ন্যাম
৩. আরব লীগ
৪. আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা
৫. ইকো

১০.৬ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন (Conferences of the Foreign Secretaries)

প্রতি বছর ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সাধারণ নীতি এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করাই মন্ত্রী সম্মেলনের প্রধান কাজ। ১৯৮০ সালে আফগানিস্তান সমস্যার ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামি কোর্ট অব জাস্টিস : তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে এটি গঠিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ৭জন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। সদর দপ্তর কুয়েতের রাজধানী কুয়েত সিটিতে।

(ক) বিশেষায়িত কমিটিসমূহ

১. আলকুদস কমিটি ১৯৭৫ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে (যে সম্মেলনে মরক্কোর বাদশা হাসান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন) পবিত্র জেরুজালেমে অবস্থিত পবিত্র মসজিদ আল-কুদস এর হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল।
২. ইসলামিক কমিশন ফর ইকনোমিক, কালচারাল এন্ড সোশ্যাল এফেয়ার্স। ১৯৭৬ সালে এ কমিটি

গঠিত হয়েছিল।
৩. স্থায়ী অর্থনৈতিক কমিটি।
৪. অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতার জন্য স্থায়ী কমিটি : ১৯৮১ সালে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল।
৫. সাংস্কৃতিক এবং তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি : এ কমিটি ১৯৮১ সালে গঠিত হয়েছিল।
৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য স্থায়ী কমিটি : এ কমিটি ১৯৮১ সালে গঠিত হয়েছিল। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ার জন্য একটি কমিটি, ফিলিপাইনের মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি কমিটি এবং প্যালেস্টাইনের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে।

১০.৭ ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ (Aims and Objects of OIC)

ওআইসি মুসলিম উম্মাহার সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, মুসলিম দেশসমূহের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরো দ্রুততর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র স্থানসমূহের হেফাজতের লক্ষ্যে মুসলিম দেশসমূহের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন। যাহোক, সংগঠনের চার্টারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর ৭টি উদ্দ্যেশ্য ও ৫টি নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। এগুলো হলো :

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি সংহতি বৃদ্ধি করা।
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা করা এবং নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা।
৩. বর্ণবৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য ও উপনিবেশগুলো মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো।
৪. ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি সমর্থন দান।
৫. মুসলিম জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতিগত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সহযোগিতা প্রদান

(খ) ১৯৭২ সালে গৃহীত চার্টারে ওআইসি নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামিক সংহতি সুদৃঢ়করণ।
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য মৌলিক ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যদের সাথে পরামর্শমূলক সভার আয়োজন।
৩. বর্ণগত বৈষম্য এবং বিরোধ দূরীকরণ এবং সবরকমের ঔপনিবেশিকতা তথা সাম্রাজ্যবাদের মূল উৎপাটন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।
৪. আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫. মুসলমানদের পবিত্র স্থান এবং নিদর্শনসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধন এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের সংগ্রামে সমর্থন দান ও তাদের আবাসভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান।
৬. মুসলিম জনগোষ্ঠির মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং জাতিগত অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামে সহযোগিতা প্রদান।
৭. সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্য ও উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১০.৮ নীতিমালাসমূহ (Principles)

ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত :

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সমতা।
২. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা।

৩. প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা।
৪. শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেমন আলোচনা, মধ্যস্থা ও আর্বিট্রেশনের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করা।
৫. কোনো সদস্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় ঐক্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বা শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন হতে বিরত থাকা।

১০.৯ সহযোগী সংস্থা (Subsidiary Organs)

১. ইসলামি সলিডারিটি তহবিল
২. আল-কুদস ফান্ড
৩. পরিসংখ্যানিক , অর্থনৈতিক ও সামাজিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আংকারা।
৪. ইসলামের ইতিহাস, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র- ইস্তাম্বুল।
৫. ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট- জেদ্দা।
৬. ইসলামি ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট - জেদ্দা।
৭. ইসলামি বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্র - মরক্কো।
৮. ইসলামি কমিশন ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট।

ওআইসিভুক্ত অন্যান্য সংস্থা

১. ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক - জেদ্দা।
২. আন্তর্জাতিক ইসলামি সংবাদ সংস্থার - জেদ্দা।
৩. ইসলামি স্টেটস ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশন - জেদ্দা।
৪. ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমোডিটি এক্সচেঞ্জ- করাচি।
৫. ইসলামিক এডুকেশন, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন- মরক্কো
৬. ইসলামিক রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট - জেদ্দা।
৭. ইসলামি ক্যাপিটালস অর্গানাইজেশন - রিয়াদ।

১০.১০ ওআইসি'র কার্যক্রমসমূহ (Activities of OIC)

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ওআইসি ব্যাপক কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে থাকে। কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

ক. **অর্থনৈতিক সহযোগিতা :** অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সন থেকে ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প, পারস্পরিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম গৃহীত হয়ে আসছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিনিয়োগের সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নয়নের জন্য যে চুক্তি হয়েছিল, তারই ফলে এ সহযোগিতার ক্ষেত্র সাম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যাতে করে যৌথভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে সদস্য দেশগুলো নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শিল্পমন্ত্রীগণ বৈঠক করেন; তাতে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রযুক্তির উন্নয়ন গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৮ সালে 'ডিসেম্বর ঘোষণায়' বলা হয় যে, ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী সহযোগিতা কর্মসূচি গৃহীত হবে।

খ. **সাংস্কৃতিক সহযোগিতা :** ওআইসি সমগ্র বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের মাধ্যমে বিশ্বে বিশেষ কর্মসূচি নেবে। নাইজেরিয়া, উগান্ডা, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে। ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠান, ইসলামের ওপর

বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা-কার্যে সহযোগিতা প্রদান এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা অনুষ্ঠান তথা ইসলামের প্রচারের জন্য সংগঠন বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে সালমান রুশদী কর্তৃক প্রকাশিত "সেটানিক ভার্সেস" গ্রন্থের সম্পাদকের সমালোচনা করা হয় এবং গ্রন্থটির প্রচারণা এবং বিক্রি নিষিদ্ধকরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উক্ত গ্রন্থের প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ. **রাজনৈতিক সহযোগিতা :** ওআইসি'র জন্মলগ্ন থেকে সমগ্র আরব এলাকায় ইসরাইলি দখলদারিত্ব অবসানের জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছে। সেই সাথে ফিলিস্তিনি জনগণের মুখপাত্র হিসেবে পিএলওকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সিনাই উপত্যকার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের জন্য তথা পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের দখল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় ওআইসি সমর্থন প্রদান করে আসছে। ১৯৮১ সালের শীর্ষ সম্মেলনে পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে ইসরাইলকে বয়কট করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বিশেষ বৈঠকে আফগানিস্তান থেকে সকল প্রকারের সোভিয়েত আগ্রাসন বন্ধ করে নিঃশর্তভাবে সকল সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়েছিল এবং আফগানিস্তানের সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছিল। এ সম্মেলনে সোমালিয়ায় সকল সামরিক হস্তক্ষেপ এবং আফ্রিকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বন্ধু রাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতির নিন্দা করা হয়েছিল।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনে অব্যাহত ইরাক-ইরান যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং এ দুটি দেশে সব ধরনের সমরাস্ত্র বিক্রি প্রতিরোধকরণের লক্ষ্যে ইসলামি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বন্ধের প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে মুজাহিদিনদের দ্বারা গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক পরিচালিত আফগানিস্তানকে পুনরায় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

১৯৯০ সালের আগস্টে ওআইসিভুক্ত বেশিরভাগ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে কুয়েতে ইরাকি অনুপ্রবেশের নিন্দা করা হয় এবং ইরাকি বাহিনীর প্রত্যাহার কামনা করা হয়। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে কুয়েতে ইরাকি আগ্রাসনের বিষয় নিয়ে আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কিছুটা বিরোধ বাধে, ফলে বারো দেশের রাষ্ট্র প্রধান সে সভায় যোগদান করেন নি। তবে তাঁরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইরাককে সমর্থন করেছিলেন। যখন ফিলিস্তিনে এবং অন্যান্য এলাকায় ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পিএলও ঘোষিত জেহাদ ওআইসি সমর্থনের প্রস্তাব করে তখন এ

http://thejobstudy.com Go to Contents

মনে রাখার Technique & Tips

কার্যক্রম

- অর্থনৈতিক সহযোগিতা
- সাংস্কৃতিক সহযোগিতা
- রাজনৈতিক সহযোগিতা
- মানবিক সাহায্য

মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ওআইসি'র প্রয়োজনীয় রূপরেখা

- ঐক্য ও সংহতি
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ
- শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
- অমুসলিম দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক
- অবাধ বাণিজ্য এলাকা গঠন (ওআইসিকে)
- ওআইসিকে নিরাপত্তা জোট গঠন।

ওআইসিকে আরও কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

- জাতিসংঘে বলিষ্ঠ ভূমিকা।
- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগুলোর মধ্যে ওআইসির সদস্য অন্তর্ভুক্তি।
- একতাবদ্ধ
- আন্তঃবাণিজ্য ব্যবস্থা বৃদ্ধি
- আরবলীগের সাথে সুসম্পর্ক
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহ
- ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা রক্ষায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ইত্যাদি।

বিরোধ মাথাচাড়া দেয়।

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ওআইসি প্রস্তাব করে যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়া হার্জেগোভিনায় সার্বদের আগ্রাসনের হাত থেকে অসার্বিয়দের (বসনিয়ার ৪৩ ভাগ জনগোষ্ঠী মুসলমান) রক্ষা করার জন্য যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে বসনিয়ার জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ১৯৯১ সালের এর ডিসেম্বর মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট এ মর্মে দাবি করে যেন সার্বিয়া এবং মনটিনিগ্রো এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদের ৪২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করত বসনিয়ার মুসলমানরা যেন তাদের আত্মরক্ষার অধিকার বজায় রাখতে পারে। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের ওপর থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ওআইসি দাবি জানায়, যাতে করে বসনিয়ার মুসলমানরা সার্বিয়দের উন্নতমানের অস্ত্রের মুখে নিজেদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষভাগে পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বসনিয়ার মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করার জন্য মিসর, ইরান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সেনেগাল, তুরস্কের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সমন্বয়কারী দল গঠন করা হয়।

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচারের অভিযোগের বিষয়ে ওআইসি'র পর্যবেক্ষক দল তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে। এ সম্মেলনে ভারতের জম্মু ও কাশ্মিরে মানবাধিকার লংঘনের মাত্রা কমানোর জন্য ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। ভারতীয় কাশ্মির বাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার প্রদানের জন্য সম্মেলনে দাবি জানানো হয়। কাশ্মিরে দ্বিতীয় ওআইসি পর্যবেক্ষক দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুদের দ্বারা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার জন্যও এ সম্মেলনে ধিক্কার জানানো হয়। তাছাড়া ইসরাইলের সন্ত্রাসবাদ এবং আগ্রাসনসহ নরহত্যা, হেবরন মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের ওপর গুলি করে হত্যা করা; আজারবাইজানে আর্মেনিয়দের তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ে ওআইসি নিন্দা ব্যক্ত করে। ১৯৯৩ সালের মধ্যে জুলাইয়ে বসনিয়া হার্জেগোভিনার ওপরে ওআইসি'র একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ওআইসিভুক্ত ৭টি দেশ পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ায় সম্মিলিত জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় নিযাতিত জনগণের সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সৈন্যবাহিনী পেরণ করার জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ায় জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সতের হাজারেরও বেশি সৈন্য ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করা উচিত বলে জাতিসংঘের নিকট দাবি করে। কিন্তু জাতিসংঘ শুধু মালয়েশিয়ার, পাকিস্তান এবং তিউনিশিয়া থেকে ৫ হাজার সৈন্য ঐ বছরে প্রেরণের জন্য অনুমতি দেয়। বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের একটি মিশন বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশে গিয়ে ওআইসি'র দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রভাব বিস্তার করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের চেষ্টা চালানো হয়।

(ঘ) মানবিক সাহায্য : ওআইসি যুদ্ধাহত মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা; যেমন-রেড ক্রিসেন্ট- এর সাথে একসঙ্গে কাজ করে থাকে। আফ্রিকার খরা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত সেনেগাল, নাইজার, মৌরিতানিয়া, মালি, গিনি, গিনিবিসাও, গায়না, জাম্বিয়া, চাদ, কেপভার্দ, বারকিনা ফাসো প্রভৃতি দেশগুলোর প্রতি ওআইসি বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে থাকে। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের জন্য আশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার জরুরি সাহায্য

প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড গঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামিক কমিশন ফর ইকোনমিক কালচারাল এন্ড সোশ্যাল এ্যাফেয়ার্স-এ রূপান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে, ওআইসি'র আরো কিছু সংগঠন গঠিত হয়েছে যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

১০.১১ অঙ্গ সংগঠনসমূহ (Organs of OIC)

১. **আল-কুদস ফান্ড :** জেরুজালেমের পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল।

২. **ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর দি প্রিজারভেশন অফ ইসলামিক কালচারাল হেরিটেজ :** ১৯৮২ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এ সংগঠন গঠিত হয়।

৩. **ইসলামিক সেন্টার ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ ট্রেড :** ১৯৮৩ সালে মরক্কোর রাজধানী ক্যাসাব্লাংকায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এ সংগঠনের মূল কাজ।

৪. **ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আই. এফ. এস. টি. এন্ড ডি) :** ইসলামিক দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৫. **ইসলামিক সেন্টার ফর টেকনিক্যাল এন্ড ভকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ (আইসিটিভিআর) :** ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কেমিক্যাল প্রকৌশলের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি এবং প্রশিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে তথা এ সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে।

৬. **ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স একাডেমী :** সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮১ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. **ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড :** সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৭৪ সালে এ সংগঠনটি গড়ে ওঠে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে সাহায্য প্রদানসহ মসজিদ, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামিক কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ সংগঠনটি কাজ করে থাকে।

৮. **রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিস্ট্রি, আর্ট এন্ড কালচার :** ১৯৭৯ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

৯. **ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর দি ইসলামিক কান্ট্রিজ :** তুরস্কের আংকারায় ১৯৭৮ সালে এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১০.১২ মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় ওআইসি'র ভূমিকা (Role of OIC to Protect Muslim World)

শুরুতে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এখন সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে সংস্থাটি নিজস্ব লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ওআইসির ভূমিকা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। তাই বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ওআইসির ভূমিকার প্রয়োজনীয় রূপরেখা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **ঐক্য ও সংহতি :** শুরুতে ওআইসি ২৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর মোট সদস্য ৫৭ (কিন্তু OIC ১৫ আগস্ট, ২০১২ সিরিয়ার সদস্য পদ স্থগিত করে) বর্তমানে সদস্য ৫৬। দিন দিন বাড়ছে সংগঠনের সদস্য ও জনসংখ্যা। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে

ঐক্য ও সংহতির অভাব লক্ষ করা যায়। বিগত ওআইসির দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। কারণ মুসলিম বিশ্বের এখন সবচেয়ে দুঃসময় আর এ দুঃসময়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একান্ত অবশ্যম্ভাবী। বারাত থেকে পুত্রজায়া পর্যন্ত প্যান ইসলামিক ধারণার ভিত্তিতে যে ইসলামিক আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাকে ধারণ ও লালন করতে ঐক্য ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। দেশগুলোকে সতর্ক হতে হবে যাতে কেউ যেন তাদের ঐক্যে ও সংহতিতে ভাঙন ধরাতে না পারে। কেননা যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি হলো অপরিহার্য শর্ত। ইসলামের মৌলিক ঐক্য চেতনাকে কাজে লাগাতে পারলেই ওআইসি তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। ধনী সদস্যদের পেট্রোডলার এবং গরীব সদস্য দেশগুলোর শ্রম ও মেধার সমন্বয় করে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো অনেক শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারে। এছাড়া ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে। কারণ ইসলামি ব-কে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার এক- পঞ্চমাংশ, বিশ্বের মোট তেল সম্পদের ৬০ শতাংশ রয়েছে এবং এ ব্লকে তাদের ৪০ শতাংশ কাঁচামাল রপ্তানি করে। কিন্তু ইসলামি ব্লকের সম্মিলিত আয় বিশ্বের মোট উৎপাদনের পাঁচ শতাংশেরও কম।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ :** মুসলিম বিশ্বে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম খনিজ সম্পদ তেল। বিশ্বের মোট তেলের ৬০ শতাংশ রয়েছে এ দেশগুলোতে। বিশ্বে এখনও তেলের বিকল্প আবিষ্কার না হওয়ায় মুসলিম বিশ্ব তেলকে তাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে ওআইসি তেলভুক্ত দেশসমূহ তেলের উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে লাভবান হতে পারে। বিশ্বে যেসকল দেশ মুসলিম বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ সে সকল দেশের বিরুদ্ধে তেল অবরোধের মতো সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে সে সকল দেশকে শায়েস্তা করতে পারে। এছাড়া তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহ তাদের তেল বিক্রির একটা অংশ তুলনামূলকভাবে দুর্বল অর্থনৈতিক দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করতে পারে।

৪. **শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন :** মুসলিম বিশ্বের পশ্চাৎপদতার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে অনগ্রসরতা। অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে মুসলমানেরাই সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিক্ষার আলো জ্বেলেছিল এবং হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশালকায় লাইব্রেরির ধ্বংসসাধন পর্যন্ত এ আলো প্রজ্বলিত ছিল। বিশ্বের বড় বড় আবিষ্কার যেমন, আলকেমি কর্তৃক ঘড়ি আবিষ্কার, ইবনে সিনা কর্তৃক চিকিৎসার বিজ্ঞানের আবিষ্কার (যা লন্ডন রয়্যাল স্কুল অব মেডিসিন-এ মূল পাঠ্য হলেও মুসলিম দেশগুলোর সিলেবাসে অনুপস্থিত) ইবনে খালদুন কর্তৃক সমাজ বিজ্ঞানের মূলসূত্র আবিষ্কার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ উদ্ভাবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অথচ আজ মুসলমানগণ জ্ঞানচর্চা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে অলস জীবন-যাপন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুসলমানগণ যদি মৌলিক জ্ঞানচর্চা, চরিত্র বিকাশ ও সাধনার মাধ্যমে উৎকর্ষ অর্জনের পথ বেছে নেয়, তবেই তাদের উন্নতি হতে পারে। এজন্য মুসলিম দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে ওআইস যদি মুসলমানদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে, তবেই ওআইসি একটি সফল সংগঠন হিসেবে বিকশিত হতে পারবে। ওআইসি'র ইতিবাচক বিকাশে বাংলাদেশও রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

৫. **অমুসলিম দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক :** ওআইসি মূলত ইসলামিক রাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন হলেও বর্তমানে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ভিন্ন ধর্মীয় রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে পৃথিবীর কোনো দেশই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। তাই অবাধ বাণিজ্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সুফল গ্রহণ করতে হলে অন্যান্য অমুসলিম দেশ এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক একান্ত অপরিহার্য। কারণ বিশ্বে এখন সহযোগতা ও ঐক্যের যুগ। এ যুগে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে

সকলের সাথে সুসম্পর্ক একান্ত অপরিহার্য।

৬. **অবাধ বাণিজ্য এলাকা :** ওআইসি তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ও আইসিকে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা ঘোষণা করতে পারে। এতে করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদিত পণ্যের অবাধ বাণিজ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যে সকল রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় এবং অর্থসহ নানাবিধ সাহায্য করতে পারে।

৭. **নিরাপত্তা জোট :** মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিত্বকারী এবং মুসলিম দেশগুলোর সর্ববৃহৎ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ওআইসি। এ সংস্থার জন্ম হয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে। সময়ের ক্রমধারায় বিশ্বে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ইসরাইলি আগ্রাসন আজও বন্ধ হয়নি। শুধু এক ইসরাইল কর্তৃক নয়, বিশ্বের সর্বত্র চলছে মুসলিম উম্মাহর ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ। ফিলিস্তিন ছাড়াও লেবানন, কাশ্মির, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া, সাম্প্রতিক ইরাকের মুসলিম হত্যাযজ্ঞ বন্ধে ওআইসি তেমন কোনো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে নি। এর অন্যতম কারণ ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব। এছাড়া ওআইসি'র কোনো নিরাপত্তা বাহিনী নেই যা তাদেরকে বহিঃশক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এর প্রেক্ষিতে ওআইসিকে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে নিরাপত্তা কার্যক্রমও চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ওআইসিকে অন্যান্য সামরিক জোটের ন্যায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। সদস্য দেশগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তুলতে পারে যা মুসলিম দেশসমূহের ওপর আঘাত আসলে মোকাবেলা করতে পারে। এ সামরিক বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে রাখতে হবে এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। এজন্য ওআইসি একটি নিরাপত্তা তহবিল গঠন করতে পারে নিরাপত্তা বাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য।

ওআইসি-এর বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতি স্থাপন।
২. মুসলিম দেশগুলোর দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ব্যাধি দূর করা।
৩. রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার বাণিজ্যিক শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ।

১২.১৩ ওআইসিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (Necessary arrangements to make an effective OIC)

ওআইসিকে আরো কার্যকর করার জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জাতিসংঘের ভূমিকা :** জাতিসংঘে ওআইসিকে একত্রে জোরালোভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র যেন একই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

২. **নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ :** ওআইসিকে চেষ্টা করতে হবে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্য থেকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করার।

৩. **একতাবদ্ধ :** মুসলিম দেশসমূহে যে কোনো বহিঃ আক্রমণের বিরুদ্ধে একযোগে সোচ্চার হয়ে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহকে কাজ করতে হবে।

৪. **আন্তঃবাণিজ্য ব্যবস্থা :** ইসলামিক অর্থনৈতিক বাজার ব্যবস্থা ওআইসিভুক্ত সদস্যসমূহের মাঝে চালু করতে হবে। এতে এক প্রকার আন্তঃবাণিজ্যিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

৫. **আরবলীগের সাথে সুসম্পর্ক :** মুসলিম বিশ্বের অপর একটি শক্তিশালী সংগঠন আরবলীগের সাথে ওআইসির একত্রে কাজ করে যেতে হবে। কারণ মৌলিক উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

৬. **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর :** দীর্ঘদিন কার্যকর থাকায় ওআইসির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি কার্যকর করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে

ওআইসি একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারে।

৭. **অবাধ তথ্য প্রবাহ :** মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়নের মাধ্যমে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ওআইসি ভুক্ত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতি, কর্মসূচী ও অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মুসলিম বিশ্বকে শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। এসব দিকের প্রতি মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে এখনই নজর দিতে হবে। আর তা না হলে এ সংস্থাটি কার্যকরিতা হারিয়ে বৈঠক ও বিবৃতি সর্বস্ব একটি সংস্থায় পরিণত হবে।

৮. **ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা :** সর্বোপরি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা রক্ষায় ওআইসিকে আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা যেন যথা সম্ভব শীঘ্রই হয়। এ ব্যাপারে কার্যকরী এবং সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মূল্যায়ন : ওআইসি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কতটা সফল হলো তা গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে একে আরও সুসংহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতার বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। তবেই ওআইসি তার কর্মে সফলতার ভূমিকা পালন করতে পারবে। ধনী দরিদ্র ব্যবধানকে কমিয়ে আনতে হবে। একই সঙ্গে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র যাতে মজবুতভাবে রুখে দেয়া যায় তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০.১৪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ওআইসি'র ভূমিকা (Role of OIC in Socio- economic devlopment and to save Muslims Interest)

ওআইসি'র একটি বিশেষত্ব হলো এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংগঠন, যা একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। ধর্ম বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এত বড় সংগঠন আর নেই। কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর এ সংগঠনটি মুসলমানদের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কতটুকু কী করতে পেরেছে তাই নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিম্নে ওআইসি-এর ভূমিকা উল্লেখ করা হলো :

১. **ফিলিস্তিন সংগঠন :** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ওআইসি এর মূল লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনসহ মুসলমানদের স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের সংগ্রাম, নিজেদের মধ্যে সংহতিবোধ জোরদার করা। ফিলিস্তিনি জনগনের অধিকার আদায় তথা স্বাধীনতা অর্জনে জোরালো কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ওআইসি কেবল বিভিন্ন সময়ে সম্মেলন ও আবেদন নিন্দা প্রকাশ প্রস্তাব পাস করেছে বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইসরাইয়েলি বর্বর কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ অভিযান চলছে নতুন বসতি স্থাপন করা হচ্ছে ফিলিস্তিন স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে চুক্তি করেও তা লঙ্ঘন করেছে। ২০০১ সালে ইসরাইল ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদ করার ঘোষণা দেয়। ২০১০ সালে গাজায় ত্রাণমুখী জাহাজে হামলা করে অনেক লোক হত্যা করে ইসরাইল। তবে মুসলিম বিশ্ব অনেকটা দেখেও না দেখার ভান করে থাকে।

২. **আফগান সংগঠন :** ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণ শুরু থেকে ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান অভিযান পর্যন্ত ওআইসি শুধু বক্তব্য দিয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইর্য়কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাদেনের অজুহাতে আক্রমন করলে এতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ধ্বংসে হয়ে যায়। সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসে হয়ে যায় কিন্তু ওআইসি-এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা পালন করে নি।

৩. **উপসাগরীয় সংগঠন :** ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমন ছিল ওআইসি এর নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। তথাপী ওআইসি ইরাককে এ জাতীয় আগমন থেকে নিবৃত করতে পারে নি। অন্যদিকে যৌথ বাহিনীর পাশবিক হত্যায় হাত থেকেও ইরাকি জনগণকে রক্ষা করতে পারে নি। ১৯১৮ সালে ইরাক যখন কুয়েত দখল করে তখন বহুজাতিক বাহিনীগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে মুসলিম বিশ্বের প্রতিবেশী দুই দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় এবং পরে কুয়েতকে উদ্ধারের নামে মধ্যপ্রাচ্যে বহুজাতিক বাহিনীর স্থায়ী আসন বসানোর জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, সারা দুনিয়ার মানুষের বিবেক আর মানবিক চেতনাকে আহত করে মার্কিন ব্রিটিশ হানাদাররা যখন ইরাকের সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে ছিল তখন ওআইসি মুসলিম বিশ্বের

প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে কিছু করতে পারেনি।

৪. **লেবানন সংগঠন :** ইসরাইলের মিথ্যা অজুহাতে লেবাননে হামলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং লেবাননের প্রায় এক হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। এ ব্যাপারে ওআইসি তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি।

৫. **ইসরাইল মিডিয়া সংগঠন :** ইসরায়েল জোর করে গোলেন হাইটস সিরিয়ার কাছ থেকে দখল করে নেয়। এ ব্যাপারে বিশ্বের অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী দেশের সাথে ওআইসি কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি।

৬. **বলকান সংগঠন :** মুসলিম বিশ্বের আপামর জনতা বসনিয়ার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আর্তনাদে ব্যথিত ও পীড়িত হলেও ওআইসি তাদের বেদনায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি। বিশ্ববাসীর কাছে কোনো জোরালো প্রতিবাদ নিয়ে মুসলিম বিশ্বের হয়ে ওআইসি উপস্থিত হতে পারে নি। সারিয়াট স্বৈরশাসক মিলো সেভিয়েটের বিরুদ্ধে যতটুকু করতে পেরেছে তা হলো জাতিসংঘের কাছে আবেদন রেখে নূন্যতম ফান্ড সৃষ্টি করা।

৭. **মুসলিম বিশ্বে সংহতি স্থাপনে ব্যর্থ :** মুসলিম বিশ্বে সংহতি স্থাপন করা ছিলো ওআইসি- এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব কতটুকু সংহত তা সূক্ষ্ম নিরীক্ষার বিষয়। আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় সৌদি আরব সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৯১সালে ইপসাগরীয় যুদ্ধে এবং ২০০১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে সৌদি আরব, কুয়েত, তুরুস্ক নিজেদের স্থল ও আকাশ সীমা ব্যবহার করতে দিয়েছে। এদিকে কাশ্মীর গণহত্যা, ধর্ষণ, ২০০২ সালে গুজরাটে গনহত্যা ও বিপর্যয়ে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা এগিয়ে আসে নি।

৮. **মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা :** ১৯৬০ সালে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে মূল উদ্দেশ্যটি সামনে রেখে ওআইসি প্রতিষ্ঠা করেছিল, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কেননা ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, বসনিয়া হার্জেগোভিনা,চেচনিয়া, মিন্দানাও সহ বিশ্বের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়, ওআইসি তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে নি।

৯. **অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যর্থতা :** ওআইসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বিনিময়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো সম্ভবনাময় আইডিবির প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। তবে সফলতার হার খুব কম। বিপুল জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ওআইসি সমষ্ঠিগতভাবে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে।

১০. **শিক্ষা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে ব্যর্থতা :** শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম দেশ বর্তমানে তেমন উন্নত নয়। ওআইসি দুটি সংস্থা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামি ইনস্টিটিউট প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছে অথচ কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম শীর্ষ সম্মেলন এর জন্য ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

১০.১৫ ওআইসি-এর সফলতা (Success of OIC)

প্রথমত, মুসলমানদের যে জাতিগত ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান, তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনা করে। ওআইসি-এর সদস্যরাষ্ট্রগুলো তাদের শত বিভক্তি সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও বিশিষ্ট অস্তিত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ সংগঠনটি বিভিন্ন সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেকোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। এ প্রতিবাদ কার্যকর প্রমাণিত না হলেও মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে।

তৃতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য ওআইসি বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ, প্রস্তাব, কমিটি গঠনসহ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সকল প্রচেষ্ঠাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যাবে না।

মূল্যায়ন (Evaluation)

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ওআইসি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কতটা সফল হলো তা গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে একে আরো সুসংহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতার বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল দূর করে তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করতে পারে, এবং ওআইসি.-এর অধ্যবসায় সার্থক হতে পারবে।

১০.১৬ বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক (Relation between Bangladesh and OIC)

মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ধারাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটির সূচনা হয় বাংলাদেশের জন্মের সাথে সাথে এবং তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতির মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছে ১৯৭৫ সালের আগস্টের পর থেকে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

প্রথম পর্যায়ে (১৯৭১ ডিসেম্বর - ১৯৭৫ আগস্ট) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানের নামে প্ররোচনার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়ে সত্য ন্যায়ের পথ থেকে দূরে অবস্থান করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামিক কনফারেন্সে বাংলাদেশের যোগদানের পর থেকে প্রকৃত পক্ষে মুসলিম দেশসমূহের শুভ বুদ্ধির উদয় হয় এবং তারা বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে আরম্ভ করে। একে একে ইরাক, মিসর, কুয়েত, সিরিয়া বাংলাদেশের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. **স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সম্পর্ক :** বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন পাকিস্তানের প্রচারণায় মুসলিম বিশ্ব ছিল বিভ্রান্ত। ফলে মুসলিম বিশ্ব পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। মুসলিম বিরোধী রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন করায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানকে সমর্থন করে। কাজেই এ সময় মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল নেতিবাচক।

২. **আর্থিক অনুদান :** ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে কোনো আরব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি। ঐ বছর মার্চ মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশকে ফ্রেন্ডশিপ বিমান কেনার জন্য আর্থিক আনুদান দেয়।

৩. **বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য :** আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের পূর্বে মিসর, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ প্রাপ্তিতে বাংলাদেশকে সাহায্য করে। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেন এবং ১৯৭৩ সালে মিসর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে।

৪. **অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক :** ১৯৭৪ সালের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মিসর, কুয়েত ও ইউ,এ,ই সফর করেন। বাংলাদেশ ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়তার হাত সম্প্রসারিত করে। ফলে ইসলামি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৭৫ আগস্ট এর পর থেকে বর্তমান) : ১৯৭৫ সালে এক গণঅভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হন। তাই এ সময় দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব থেকে তেমন কোনো সাহায্য পায় নি। পরবর্তীকালে গঠিত সরকারগুলোর চেষ্টায় মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক হয়। এ পর্যায়ের যেসব দিকগুলো পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ :

১. **সৌদি আরবের স্বীকৃতি :** ১৯৭৫ সালের আগস্টে সরকার পরিবর্তিত হলে লিবিয়া ও সৌদিআরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এর পর থেকে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২. **ওআইসি.-এর সদস্য হিসেবে সম্পর্ক :** বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সকল অধিবেশনে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় বাংলাদেশের ভূমিকার জন্যে চতুর্দশ

http://thejobstudy.com Go to Contents

ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ঢাকায় ইসলামি সম্মেলন সংস্থার কারিগরি প্রতিষ্ঠানটি ও সংস্থার কারিগরি প্রতিষ্ঠানটিও স্থাপিত হয়।

৩. **মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠা :** মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি স্থাপনে, ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের, বসনিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে, কসোভা সংকটে বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্রের পাশে থেকে নৈতিক সমর্থন, সীমিত সম্পদ ও শক্তি কাজে লাগিয়ে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করেছে।

৪. **জনশক্তি রপ্তানি :** বর্তমানে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সুসম্পর্ক রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে এবং ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে প্রচুর জনশক্তি রপ্তানি হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। তা ছাড়া এসব দেশে বাংলাদেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। তাদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

ওআইসি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কতটা সফল হলো তা গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে একে আরও সুসংহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতার বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। তবেই ওআইসি তার কর্মে সফলতার ভূমিকা পালন করতে পারবে। ধনী - দরিদ্র ব্যবধানকে কমিয়ে আনতে হবে। একই সঙ্গে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র যাতে মজবুতভাবে রুখে দেয়া যায় তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০.১৭ ওআইসি -এর কার্যক্রম মূল্যায়ন (Evaluation of the activities of OIC)

ওআইসি মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ তথা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ওআইসি যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে লক্ষ্য অর্জনের তেমন কোনো সফলতা লাভ করতে পারি নি। ইসলামি দেশগুলোর বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালে তা অনুভব করা যায় বিভেদ আর অনৈক্যে ইসলামী দেশগুলো বিভক্ত। পরাশক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এজেন্ট হিসেবে মুসলিম দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদা বিরোধিতা করেছে। দীর্ঘ মেয়াদী ইরান ইরাক যুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে ওআইসি তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত জেরুজলেম শহর, প্যালেষ্টাইন শহর ও আরব ভূখণ্ড আজ ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওআইসি সম্প্রসারণবাদী ইসরাইল এর বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোর কোনো ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে না।

ইসরাইলে পারমানবিক নীতির বিরুদ্ধে ওআইসি'র তেমন কোনো ভূমিকা নেই। লিবিয়ায় মার্কিন বিমান হামলার বিরুদ্ধে ওআইসি কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণ ক্ষেত্রে ওআইসি ছিলো নীরব দর্শক।

বর্তমান বিশ্বের মুসলমান বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। বসনিয়া হ্যারজেগোনিয়া সংকট, কসোভা সমস্যা, কাশ্মির সমস্যা সমাধান, চেচনিয়া সংকটের ক্ষেত্রে ওআইসি, তেমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। বসনিয়ার সার্ব কর্তৃক মুসলিম নিধন এর ক্ষেত্রে ওআইসি.-এর ভূমিকা অনেকটা যুদ্ধাংদেহী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু ওআইসি, বাস্তবে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল ও পরবর্তী ঘটনা ওআইসিকে আরও দুর্বল করেছে।

বিপুল জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ওআইসি সমষ্টিগতভাবে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে রয়েছে বড় রকমের পার্থক্য। ওআইসি দুটি সংস্থা ইসলামি বার্তা সংস্থা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামি ইনস্টিটিউট প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। অথচ কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম শীর্ষ সম্মেলন এর জন্য ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

লেবাননের গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি অবসানের ক্ষেত্রে ওআইসি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। তবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্যিক লেনদেন ও সংস্কৃতির অঙ্গনে এ সংস্থার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। ইসলামী কমন মার্কেট গঠন করার জন্য ওআইসি জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ওআইসি যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল দূর করে তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করতে পারে তবে ওআইসি তার অগ্রযাত্রা স্বার্থক করতে পারবে।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. ওআইসি এর পুরো নাম কী?
উত্তরঃ Organization of Islamic Co-oparation.

২. জাতিসংঘ কবে ইসরাইলকে তার সদস্যপদ গ্রহণের সুযোগ দেয়?
উত্তরঃ ১৯৪৯ সালে।

৩. মিশর কত সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে?
উত্তরঃ ১৯৫৬ সালে।

৪. ফিলিস্তিনিরা কবে পি.এল.ও গঠন করে?
উত্তরঃ ১৯৬৪ সালে।

৫. জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে ইসরাইল কবে অগ্নিকাণ্ড ঘটায়?
উত্তরঃ ২১ আগস্ট ১৯৬৯ সালে।

৬. ওআইসি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে।

৭. ওআইসি এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তরঃ ২৫।

৮. ওআইসি এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তরঃ ৫৭।

৯. ওআইসি এর সাংগঠনিক কাঠামোতে কয়টি অংশ রয়েছে?
উত্তরঃ ৩টি। ক. রাষ্ট্র প্রধানদের কনফারেন্স, খ. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন এবং গ. ইসলামি সেক্রেটারিয়েট।

১০. বিশ্বের মোট তেল সম্পদের কতভাগ ইসলামি ব্লকে রয়েছে?
উত্তরঃ ৬০ ভাগ।

১১. ওআইসি এর প্রথম মহাসচিব কে?
উত্তরঃ টেংকু আব্দুর রহমান, মালয়েশিয়া।

১২. ওআইসির সচিবালয় কোথায় অবস্থিত।
উত্তরঃ সৌদি আরবের জেদ্দায়।

১৩. ওআইসি এর অর্জন কী?
উত্তরঃ ক. ঐক্যবদ্ধতা, খ. নির্যাতনের প্রতিবাদ, গ. অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং ঘ. মানবিক সাহায্য।

১৪. ওআইসি এর ব্যর্থতা কী?
উত্তরঃ ক. ফিলিস্তিন সংকট, খ. আফগান সংকট এবং গ. উপসাগরীয় সংকট।

১৫. ইসলামি ব্লকের সম্মিলিত আয় বিশ্বের মোট উৎপাদনের কত ভাগ?
উত্তরঃ ৫% এর চেয়েও কম।

১৬. বাংলাদেশ কবে ওআইসি সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তরঃ ১৯৭৪ সালে।

১৭. ওআইসি এর শীর্ষ সম্মেলন কত বছর পর অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তরঃ ৩ বছর।

১৮. ওআইসি এর মহাসচিবের কার্যকাল কত বছর?
উত্তরঃ ৫ বছর।

১৯. ওআইসি এর সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল সংস্থা কোনটি?
উত্তরঃ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন।

২০. ওআইসি এর সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তরঃ আইভরিকোস্ট।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক) ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গঠনের পটভূমি কী?
খ) ওআইসি এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

২. ক) ওআইসি এর সাফল্য কী কী?
খ) ওআইসি এর ব্যর্থতার বিবরণ দাও।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ওআইসি'র ভূমিকা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ? ওআইসিকে আরো কার্যকর করার জন্য কী কী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ?

২. সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে OIC ভূমিকা নিরূপন করুন ?

৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুসলিম বিশ্ব রক্ষায় ও আইসি'র ভূমিকা আলোচনা করুন?

৪. ওআইসি'র ব্যর্থতা ও সফলতা সম্পর্কে লিখুন? বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক আলোচনা করুন?

KEY TO B C S
&
WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ১১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি
The Foreign Policy of the United States

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১১.১ ভূমিকা
১১.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি
১১.৩ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিসমূহ
১১.৪ ট্রুম্যান যুগ (১৯৪৫-১৯৫৩)
১১.৫ আইসেনহাওয়ার যুগ (১৯৫৩-১৯৬০)
১১.৬ কেনেডী যুগ (১৯৬০-১৯৬৩)
১১.৭ জনসন যুগ (১৯৬৩-১৯৬৮)
১১.৮ নিক্সন যুগ (১৯৬৯-১৯৭৬)
১১.৯ কার্টার যুগ (১৯৯৭-১৯৮০)
১১.১০ রিগান যুগ (১৯৮১-১৯৮৮)
১১.১১ জর্জ ওয়াকার বুশের যুগ (১৯৮৯-১৯৯৩)
১১.১২ বিল ক্লিন্টন
১১.১৩ জর্জ বুশ
১১.১৪ বারাক ওবামা প্রথম যুগ
১১.১৫ বারাক ওবামা দ্বিতীয় যুগ(২০১২- বতর্দমান)
১১.১৬ ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
১১.১৭ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য
১১.১৮ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ব্যার্থতা
১১.১৯ বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল্যায়ন
১১.২০ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি
১১.২১ মধ্যপ্রাচ্য নীতি
১১.২২ চীন
১১.২৩ পাকিস্তানও ভারত
১১.২৪ শ্রীলংকা
১১.২৫ এশিয়ান মুসলিম রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি

Go to Contents
http://thejobstudy.com

১১.১ ভূমিকা (Introduction)

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল একটি ঔপনিবেশিক শক্তি। আধুনিক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির সর্বাপেক্ষা নির্ভরস্থল। এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের নিয়ন্ত্রক। বিশ্বব্যাপি মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

মনে রাখার Technique & Tips

- যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে-১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হতো মনরোনীতি দ্বারা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধ আসলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রোধ করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্বে একক আধিপত্য বজায় রাখতে সামরিক কৌশল ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

পরিবর্তনের ধারায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে ৪ টি ধাপে বিভক্ত করা হয়-

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি।
খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি।
গ. স্নায়ু যুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি।
ঘ. বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি।

যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বের ৪টি অঞ্চল গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

১. পশ্চিম ইউরোপে : NATO এর মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার।
২. মধ্যপ্রাচ্য : ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণ, মধ্যপ্রাচ্যে তেলের উপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় রাখা, দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ইরানকে ভীত রাখা।
৩. পূর্ব এশিয়া : জাপানে মার্কিন স্বার্থ বজায় রাখা, চীনের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য চাপে রাখা, উত্তর কোরিয়াকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ঘোষণা করে বৈরি বানানো পূর্ব এশিয়ার বিশাল এলাকায় সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
৪. দক্ষিণ এশিয়া : দক্ষিণ এশিয়ায় এবং ভারত মহাসাগরে চীনের কর্তৃত্ব কমিয়ে মার্কিন কর্তৃত্ব বৃদ্ধির জন্য মিয়ানমার ও তারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।

১১.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি (The Foreign Policy of the United States)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, বিশ্বের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল।

বিশ্বের সব শক্তিশালী দেশগুলোর মত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বহুলাংশে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক ক্ষমতা, অন্যান্য রাষ্ট্রের নীতি ও বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির গতিশীলতা বিগত ৫০ বছরে বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনশীল ধারার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ওপর ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব লক্ষণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-গোলার্ধের সব দেশ থেকে সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উনবিংশ শতকে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করেছে। তবে মনরো নীতির আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে তার একাধিপত্য বিস্তারে তৎপর ছিল।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ওপর সে দেশের জাতীয় চরিত্রের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। বহু জাতি ও বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ। অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল আমন্ড পররাষ্ট্র বিষয়ে মার্কিন জনগণের মনোভাবের অস্থিরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, অনেক জরুরি অবস্থায় মার্কিন জনগণ চরম পরস্পর বিরোধি মনোভাব পোষণ করেছে। অধ্যাপক পামার ও পারকিনসের মতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন জনগণের চরম পরস্পর বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল, অপর একদল ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক আক্রমণ জোরদার

করার সপক্ষে মত দিয়েছিল, অপর একদল ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সামরিক সৈন্য প্রত্যাহার সমর্থন করেছিল। অনেক লেখক নৈতিক নীতির প্রতি মার্কিন জনগণের অত্যধিক আসক্তিরও উল্লেখ করেছে। জর্জ কেনান বলেছিলেন যে "অতীতে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনগত-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি"।

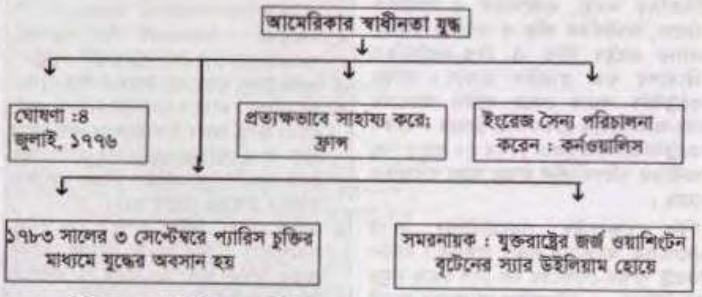
মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ওপর মার্কিন আভ্যন্তরীণ নীতির প্রভাবও লক্ষণীয়। অনেক আন্তর্জাতিক বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি তাদের আভ্যন্তরীণ নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। তবে বহু ক্ষেত্রে সরকার তার ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির বিপরীত আভ্যন্তরীণ নীতিও অনুসরণ করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ওপর বহু স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবও লক্ষণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের লবিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় ও অন্যান্য সংগঠন ও চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী পররাষ্ট্রনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ওপর কয়েকটি সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতা লক্ষণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মার্কিন সংবিধানের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতির সম্পাদিত কোন চুক্তি কার্যকর করা যায় না। বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির দলের সঙ্গে কংগ্রেসের মত-পার্থক্যের জন্য পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোও পররাষ্ট্রনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আর একটি অসুবিধা হলো পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিরাট সংখ্যক দপ্তর ও এজেন্সির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা।

সবশেষে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ওপর তার বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর এবং অন্যান্য দেশের প্রভাবও লক্ষণীয়।



১১.৩ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ (Basic Principles of American Foreign Policy)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমূল দিক পরিবর্তন হয়। অনেকের মতে বিশ্বের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও কৌশল পরিবর্তন করেছিল।

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতি পরিত্যাগ করে। যুদ্ধের পরই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যে পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছিলেন তার মূলনীতি ছিল বিশ্বে কমিউনিজমের প্রসার প্রতিরোধ করা। এ নীতির মূল সূত্র ছিল Containment। বিশ্বের যেসব দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বাইরে কমিউনিজমের প্রভাব প্রতিরোধই এ নীতির মূল লক্ষ্য।

এ Containment নীতি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে NATO জোট, মধ্যপ্রাচ্যে CENTO ও দক্ষিণ এশিয়াতে SEATO জোট গঠন করেছিল। তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সামরিক চুক্তিও সম্পাদন করেছে।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ল্যাটিন আমেরিকাতে সোভিয়েত ও অন্যান্য শক্তির প্রভাব প্রতিরোধ করা। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করে এ অঞ্চলে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। আফ্রিকাতে, মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়াতে কমিউনিজমের সম্প্রসারণ প্রতিরোধ ও ভারত মহাসাগরে রাশিয়ার সামরিক প্রভাব খর্ব করাও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য।

৩. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিশ্বের Super-power হিসেবে নিজ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা। এ উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিশাল আণবিক অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছিল। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

৪. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অপর লক্ষ্য হলো, বিশ্বে মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারিত করা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য।

৫. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটা লক্ষ্য হলো, "Co maintain an international strategic environment conductive to historic American purposes and principles." এ উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ ও তার সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করেছে।

৬. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অপর লক্ষ্য হলো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন দান ও বিশ্বজনগণের স্বাধীনতা ও মানব অধিকার রক্ষা করা। বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) প্রতিরোধ করাও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য।

৭. সাম্প্রতিক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কিন দায়-দায়িত্ব হ্রাস বা সীমিত করতে উৎসুক। রাষ্ট্রপতি নিক্সন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মার্কিন হস্তক্ষেপ সীমিত করার নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন "Our interests must shape our commitments rather than the other way round"

৮. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল তৃতীয় বিশ্বে মার্কিন প্রভাব সম্প্রসারিত করা। এ উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিগান তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে INF চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জর্জ বুশও INF চুক্তি সমর্থন করে রাসায়নিক ও Biological অস্ত্র হ্রাস করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

১১.৪ ট্রুম্যান যুগ (১৯৪৫-১৯৫৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করেন। যুদ্ধ শেষে পশ্চিমা শক্তিবর্গ পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তারে ভীত হয়ে ওঠে ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্রীস, ইরান ও তুরস্কে প্রভাব প্রতিরোধের জন্য মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা করেন। তার প্রত্যুত্তরে, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান Containment নীতি ঘোষণা করেন। ঐ নীতিই পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। ট্রুম্যান নীতি বিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা ঘোষণা করে। ট্রুম্যান ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্শাল প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য দান করেন। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার জন্য NATO জোট গঠন করা হয়।

১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন সমর্থিত উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে এবং এশিয়াতে আমেরিকার দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

১১.৫



আইসেনহাওয়ার যুগ (১৯৫৩-১৯৬০)

রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার Containment-এর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার প্রতি দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হলেও পৃথিবীতে নতুন কোন অঞ্চলে রাশিয়া ও কমিউনিজমের প্রসারণ প্রতিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপর হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজমের প্রভাব প্রতিরোধের জন্য আইসেনহাওয়ার নীতি ঘোষণা করা হয়। জর্ডান ও লেবানন (১৯৫৮) সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ নীতি প্রয়োগ করেছিল। আইসেনহাওয়ার তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোতে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধের জন্য মার্কিন অর্থ সাহায্য দান কর্মসূচিও গ্রহণ করেন।

১১.৬ কেনেডী যুগ (১৯৬০-১৯৬৩)

রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডী ঘোষণা করেন যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হলো, "To maintain an international strategic environment conducive to historic American purposes and principles." তিনি Containment-এর নীতিই অনুসরণ করেন ও তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক সাহায্য দান কার্যসূচি প্রসারিত করেন। তিনি সুদৃঢ় ভাবে কিউবা সমস্যার মোকাবিলা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৩ সালে আণবিক পরীক্ষা নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর করে। কেনেডি ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি অধিকতর বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন।

১১.৭ জনসন যুগ (১৯৬৩-১৯৬৮)

রাষ্ট্রপতি জনসনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাঁর আমলে ফ্রান্সের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব-বিরোধী নীতি গ্রহণ করলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব হ্রাস পায়।

১১.৮ নিক্সন যুগ (১৯৬৯-১৯৭৬)

রাষ্ট্রপতি নিক্সন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন আনেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব হ্রাস করা। তাঁর উদ্যোগে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। নিক্সন-কিসিঞ্জার কূটনীতির ফলে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি

রাশিয়ার সঙ্গে SALT-I চুক্তি স্বাক্ষর করেন। রাশিয়ার সঙ্গে কয়েকটি ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতা স্থাপিত হয়।

১১.৯ কার্টার যুগ (১৯৭৭-১৯৮০)

রাষ্ট্রপতি কার্টার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন নৈতিক ধারণা প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হলো মানব অধিকার রক্ষা। তিনি মানব অধিকার রক্ষা, SALT আলোচনা ও তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর উৎসাহে ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনি পানামার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে পানামা খাল-সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর আমলে চীনের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে তাঁর আমলে অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেনে ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির ফলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

১১.১০ রিগান যুগ (১৯৮১-১৯৮৮)

রাষ্ট্রপতি রিগান ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আণবিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করেন। তিনি আফগান বিদ্রোহীদের সাহায্য দানের জন্য প্রচুর সামরিক অস্ত্র সাহায্য দান করেন। রিগান মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধে সফল হন। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঋণ-সমস্যার মোকাবিলার জন্য রিগান ঋণভারগ্রস্ত দেশগুলোকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দান করেন। তবে নিকারাগুয়া ও এল সালভেডোরে কমিউনিস্ট প্রভাব প্রসারণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভীত হয়ে পড়ে। আফ্রিকাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশুভ আঁতাতের জন্য আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই ক্ষুব্ধ হয়। রিগান তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে অসম্মত হলে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত রাষ্ট্রগুলো নিরাশ ও ক্ষুব্ধ হয়।

রিগান দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার পরে রাশিয়ার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া সৈন্য অপসারণে সম্মত হলে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। রাশিয়ার

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

- ১৯৪৫-৫৩ ট্রুম্যান যুগ) : ট্রুম্যান নীতিতে বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। পশ্চিম ইউরোপে মার্শাল প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাহায্য দান। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম ইউরোপে ন্যাটো জোট গঠন।
- ১৯৫৩-৬০ (আইসেন হাওয়ার যুগ) : মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজমের ও সোভিয়েতের প্রভাব প্রতিরোধের জন্য মার্কিন অর্থ সাহায্যদান কর্মসূচী গ্রহণ করেন।
- ১৯৬০-৬৩ (কেনেডি যুগ) : তিনি ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিউবা সমস্যা সমাধান করেন।
- ১৯৬৩-৭৬ (জনসন যুগ) : তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব হ্রাস করা চীন ও রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়।
- ১৯৭৬-৮০ (কার্টার যুগ) : তার পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল মানব অধিকার রক্ষা। এজন্য মানব অধিকার রক্ষা, (SALT) আলোচনা, তৃতীয় বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন গুরুত্ব দেন।
- ১৯৮১-৮৮ (রিগান যুগ) : তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আণবিক শক্তি বৃদ্ধির বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব প্রতিরোধে সফল হন।
- ১৯৮৮-৯৩ (জিমিয়র জর্জ ওয়াকার বুশ) : তিনি রিগান এর পর পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করেন। রিগান এর রাশিয়ার সঙ্গে (INF)। চুক্তি সমর্থন করেন এবং নিরস্ত্রিকরণের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক ও Bollogical অস্ত্র হ্রাসের নীতি গ্রহণ করেন।
- ১৯৯৩-২০০০ (বিল ক্লিনটন) : ঠান্ডাযুদ্ধ শেষ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপ বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য পায়। বিশ্বায়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরিক কোম্পানিগুলো সামনে রেখে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেন।
- ২০০১-২০০৯ (জুনিয়র জর্জ ওয়াকার বুশ) : সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব জাহির একগুয়েমী যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারণে অর্থনৈতিক সংকটে দেখা দেয়। আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকটে বুশের সব রকম পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ হয়।
- ২০০৯-বর্তমান (বারাক ওবামা) : মধ্যপ্রাচ্যে ও ইসরায়েল নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ নীতি এবং তেল সম্পদের প্রতি একক কর্তৃত্ব বজায় রাখা। নব্য অর্থনৈতিক শক্তি চীন, ভারত, রাশিয়ার অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করা।

সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র INF চুক্তি সম্পাদন করে। তবে ইউরোপের শান্তিকামী জনগণ রিগানের প্রস্তাবিত SDI প্রকল্পের বিরোধিতা করেন।

১১.১১ জর্জ ওয়াকার বুশের যুগ (১৯৮৯-১৯৯৩)

পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াকার বুশ ক্ষমতা অধিগ্রহণের পরে রিগানের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত INF চুক্তি সমর্থন করেন ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রাসায়নিক ও Biological অস্ত্র হ্রাসের নীতিও ঘোষণা করেন। তিনি বিশ্ব জনগণের স্বাধীনতা, মানব অধিকার ও শান্তিরক্ষা করাকেই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য রূপে ঘোষণা করেন।

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে বারাক ওবামার প্রথম মেয়াদের চালচিত্র

- ২০০৯ সালে স্বাস্থ্যসেবার আওতার বাইরে- ৫০.৭ মিলিয়ন মার্কিনি।
- ২০১১ সালে স্বাস্থ্যসেবার আওতার বাইরে- ৪৮.৬ মিলিয়ন মার্কিনি।
- ২০০৯ সালে দারিদ্র্যতার সংখ্যা ছিল- ৪৩.৬ মিলিয়ন।
- ২০১১ সালে দারিদ্র্যতার সংখ্যা ছিল- ৪৬.২ মিলিয়ন।
- ২১ জানুয়ারি, ২০০৯ ক্ষমতাগ্রহণকালে জাতীয় ঋণ- ১০.৬ ট্রিলিয়ন ডলার।
- ২০ জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত জাতীয় ঋণ-১৬.৪ ট্রিলিয়ন ডলার।
- ২০০৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ বেকারত্বের হার- ৭.৩ শতাংশ।
- ২০১২ সালের ডিসেম্বরে বেকারত্ব-৭.৮ শতাংশ।

১১.১২ বিল ক্লিন্টন (১৯৯৪-২০০০)

ঠাণ্ডাযুদ্ধ শেষ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপ বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য পায়। বিশ্বায়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সামনে রেখে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেন। বিশ্বশান্তির জন্য বিভিন্ন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে মার্কিন অর্থ সাহায্য দান করেন।

১১.১৩ জর্জ ডব্লিউ বুশের পররাষ্ট্রনীতি (২০০১-২০০৯)

তিনি নতুন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে কৌশল সমূহ নির্ধারণ করেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা আনতে বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালান। যে সমস্ত দেশ মার্কিন কার্যক্রমকে সমর্থন করে তাদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। যে সমস্ত শত্রু ও দুস্থ রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ, তাদের নিরস্ত্র করার জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১১.১৪ বারাক ওবামার প্রথম যুগ (২০০৯- ২০১২)

২০০৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বারাক ওবামা জর্জ বুশকে পরাজিত করে ৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। তার বিজয়ের পূর্বশর্তই ছিল বিশ্বব্যাপী জর্জ বুশের আগ্রাসী মনোভাব পরিহার। কিউবায় আবুগারী কারাগার বন্ধ ঘোষণা,ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার,মুসলিম বিশ্বে সম্পর্ক উন্নয়ন,ফিলিস্তিনির স্বাধীনতা,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ বহুবিধ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি উল্লেখ ছিল। ওবামা ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।

১. বিশ্বব্যাপী একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা রাখা অর্থাৎ সর্বত্র মার্কিন কর্তৃত্ব বজায় রাখা।
২. মধ্যপ্রাচ্য ইসরালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তেল সম্পদের উপর একক কর্তৃত্ব বজায় রাখা। মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা।
৩. নব্য অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে চীন, ভারত,রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রসরমানতাকে বাধাগ্রস্ত করা।
৪. দরিদ্র্য রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা,সামরিক কর্তৃত্বের সাথে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বও প্রসার করা।
৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
৬. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গনতন্ত্রের প্রসার করা।

১১.১৫ বারাক ওবামার দ্বিতীয় যুগ (২০১২- বর্তমান)

২০১২ সালের নভেম্বর মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বারাক ওবামা দ্বিতীয়বারের জন্য ৪৫তম মার্কিন

প্রেসিডেন্ট হিসেবে পূর্ণনির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২০তম সংশোধনী অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি, ২০১৩ সালের দুপুর থেকে প্রেসিডেন্টের চার বছরে মেয়াদ শুরু হয়। ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্যাপিটাল হিলে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ গ্রহণ করেন ওবামা। বারাক ওবামা দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্বপালনকারী ৪১তম প্রেসিডেন্ট। ২০১৩ সালে ওবামার শপথ অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল- " আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা"। বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দ্বিতীয় মেয়াদকালে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ৪৭তম ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে জো বাইডেন দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ৬৮তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী (Secretary of State) পদে দায়িত্ব পালন করছেন ম্যাসাচুসেটসের সিনেটর জন কেরি। তিনি সিনেটর পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২১ ডিসেম্বর, ২০১২ বারাক ওবামা তাকে মনোনিত করেন। ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কেরি। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী (Secretary of Defence) হলেন চাক হেগেল। ১৯৪৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর Department of Defence প্রতিষ্ঠার পর তিনি ২৪তম প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বারাক ওবামার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীনীতির সাথে আরো যে সকল নীতি লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হলো :

১. **পররাষ্ট্রনীতি :** পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ওবামার পূর্ব অবস্থান তাকে অনেক সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানা ইস্যুতে তার পথ চলা হয়ে উঠবে কন্টকাকীর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের নব উত্থিত আরব রাষ্ট্রসমূহ ইপ্সিত গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের শুরু দায়িত্ব বর্তাবে তার উপর এবং ঐসব আরব রাষ্ট্রসহ গণতান্ত্রিক পৃথিবী তার নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবে প্রভূত পরিমাণে। সমস্ত পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ গণতন্ত্রের স্বার্থেই মনোজাগতিকভাবে ওবামার বিজয়ের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন। আর সে কারণে ওবামার প্রতি তাদের প্রত্যাশাও বেড়ে গেছে বহুগুনে। বিশ্ব জনগণের সেই স্বপ্ন পুরণে আরব বিশ্বসহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মুক্ত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ নিতে কতটুকু সক্ষম হবেন ওবামা? এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দুটো বিকল্প যুদ্ধ দামামা এবং শান্তিময় সংলাপ। রিপাবলিকানদের প্রথম পছন্দ হলো স্যান্ডির তান্ডবে প্রথমেই আঘাত হানা, আর ওবামার প্রথম পছন্দ হলো সংলাপ চালিয়ে সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা করা। তবে তিনিও যুদ্ধের বিকল্প টেবিলে রেখেই আলোচনা চালানোর পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে যুদ্ধ বিকল্প এখন আমেরিকানদের কাছে অনেকটা অপাংক্তেয় হয়ে উঠছে। সেই স্নায়ুযুদ্ধকালীন সোভিয়েত হুমকির অবসানের পর তারা এখন শান্তির পৃথিবীতে বসবাসের নানা

মনে রাখার Technique & Tips

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ

১. বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা।
২. বিশ্ব ব্যাপী সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার লক্ষ্যে সামরিক বাজেটের বিশাল বৃদ্ধি, ওয়াটার ওয়ার ডিফেন্স কর্মসূচি গ্রহণ, CTBT থেকে সরে আসা।
৩. মধ্যপ্রাচ্যে একক কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য পূর্বের ন্যায় ইসরাইলকে সর্বত সমর্থন দান। তবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ফিলিস্তিনি অধিন ভূ-খন্ডে ইসরাইলের বসতি নির্মানের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমকে ওবামা সমর্থন করে নি। মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের ফলে তিনিসিয়া, মিসর, লিবিয়ায় যে সরকার পরিবর্তন ঘটেছে ওবামা প্রশাসন সেখানে স্বাগত জানিয়েছে।
৪. অর্থনীতির ক্ষেত্রে WTO- কে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করা।
৫. রাশিয়ার সাথে ওবামা প্রশাসন স্নায়ুযুদ্ধ পূর্ববর্তী যুদ্ধাবস্থায় না থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়াকে বহুহীন এবং রাশিয়ার মতামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরন করে যাচ্ছেন।
৬. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন,গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরন সহ পারমানবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিগুলোতে মার্কিন স্বার্থ বহাল রাখার পক্ষে ওবামা প্রশাসন।
৭. ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সহ তেল বিক্রীর উপর অবরোধ আরোপ করেছে ওবামা প্রশাসন। ইরানের পরমানু কর্মসূচি বাতিল না করলে সামরিক হামলা হতে পারে বলে হুমকি। তবে তিনি আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানে আগ্রহী।

বিকল্প নিয়ে ভাবছেন। অনেক যুদ্ধ বিরোধি আন্দোলন দিন দিন দুর্বার হচ্ছে উন্নয়নের জন্য যুদ্ধ বর্জন আবশ্যক-এমনি ধারণা নতুন প্রজন্মের মগজে জেঁকে বসেছে। এখন ওবামার জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ হলো তিনি কিভাবে সেই শান্তির সংলাপ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন? এ কাজে ব্যর্থ হলে তার টেবিলে রাখা বিকল্প ব্যবহারে তাকে বাধ্য হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে রিপাবলিকান পররাষ্ট্রনীতির প্রতি জনগণের যে অনীহা তৈরি হয়েছে এবং যা ওবামাকে দ্বিতীয়বার নির্বাচনে সহযোগিতা করেছে, সেই যুদ্ধ বিকল্প প্রয়োগ করে ওবামা কি সেই গণ অনীহার শিকারে পরিণত হবেন না? তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের হতাশাক্লিষ্ট জনগণকে তিনি পুনঃনিরাশ করার অপবাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন কোন কৌশলে? এমন সব অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে নতুন প্রেসিডেন্টকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কঠিনতম চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে হবে।

২. **সিরিয়া সংকট :** সিরিয়ায় যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাকে যুক্তরাষ্ট্র তেমন পাত্তা দিচ্ছে না বলে কোন কোন মহলে অভিযোগ উঠছে এবং বিপ্লবীরা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ ভূমিকার দিকে তাকিয়ে আছে। সিরিয়ার ভূমধ্যসাগর রাজ্যে রাশিয়ার যে বিমানঘাঁটি আছে, তার স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় নিয়ে এবং পার্শ্ববর্তী ইরানের সিরিয়ায় সরকার সমর্থক ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে ওবামাকে সিরীয় নীতি অবলম্বন করতে হবে। বিপ্লবীরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় যে প্রত্যাশা করে আসছেন, তার অবমূল্যায়ন না করে একটি গণতান্ত্রিক সিরিয়ার পুনর্গঠনে সিরিয়ার সরকার এবং বিপ্লবীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য, ন্যায়ানুগ রাজনৈতিক সমাধান আনয়নে সহযোগিতা করা নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

৩. **ইরান সংকট :** ইরানের প্রতি অব্যাহত ইসরাইলি যুদ্ধ হুমকির মুখে ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক দরকষাকষির পথ যেভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের জন্য একদিকে যেমন নতুন প্রেসিডেন্টকে ইসরাইলের যুদ্ধ মত্ততা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অন্যদিকে ইরানের পারমাণবিক ইস্যুর গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করতে হবে। ইরানিরা স্পষ্ট জানিয়েছে, পারমাণবিক উচ্চাভিলাষ থেকে তারা কখনো নিবৃত্ত হবে না। আবার সম্প্রতি জাতিসংঘ পরিষদের ভাষণে ইসরাইলের নেতানিয়াহু স্পষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলেছেন, সময়সীমা পার হলেই ইরানকে আর নিরস্ত্র করা সম্ভব হবে না অর্থাৎ তার আগেই ইরানকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এখন ওবামা এ দুয়ের মাঝে কিভাবে তার পররাষ্ট্রনীতির সফল বাস্তবায়ন ঘটাবেন এটাই এখন তার জন্য অন্যতম কঠিন পররাষ্ট্রনীতিক চ্যালেঞ্জ।

৪. **চীন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক :** চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে শক্তিসাম্য লড়াই, যে নিরন্তর অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা, যে স্ট্যাটেজিক সুবিধার্জনের প্রতিদ্বন্দ্বীতা, সে ক্ষেত্রে ওবামার কোন কৌশল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হবে, তার স্বরূপ নির্ধারণ এ মুহূর্তে ওবামার যুক্তরাষ্ট্র চীন নীতির বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া জাপান, চীন, হংকং এর মধ্যকার বিতর্কিত দ্বীপ-দ্বন্দ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, ভারত-বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি, পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রে বিতর্কিত ড্রোন হামলা এবং যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে ওবামা অনেক নতুন নতুন সমস্যার মুখে পড়বেন, একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহারের পরে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তাহীনতা ও সামরিক ধ্বংস, ইরাকের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুদৃঢ়করণে যুক্তরাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা থেকে গ্রহণীয় যুগোপযোগী ও ইরাক বান্ধব নীতির প্রণয়ন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানা জটিলতা ওবামার আগামি চার বছরের শুরু দায়িত্ব পালনে আরো নতুন নতুন বাস্তবতা ও কাঠিন্য যোগ করবে। সেই কন্টকাকীর্ণ পথ চলতে গিয়ে প্রয়োজনীয় দুরদৃষ্টি ও রাজনীতিক যোগ্যতা ওবামাকে প্রদর্শন করতে হবে। এ কাজে তিনি কতটুকু যোগ্যতা ও পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে পারবেন, এখন সেটাই দেখার বিষয়। আমাদের প্রত্যাশা, বিজয়ের এ মুহূর্তে পৃথিবীর অত্যাচারিত জনগণের, শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পৃথিবী গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তার যোগ্যতা প্রমাণ দিবেন।

৫. **ওবামার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং নীতি :** বর্তমানে ওবামা ইরানের পরমানু কর্মসূচি নিয়ে চ্যালেঞ্জের

http://thejobstudy.com
Go to Contents

সম্মুখীন হতে হবে। জাতিসংঘে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরান তাদের পরমানু কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার করেছে। শনিবার ইরান সিরিয়ার ওপর হামলা প্রতিরোধ করার হুমকি দিয়েছে। ইসরাইল চাইবে ইরানের ওপর হামলা করার। ইসরাইলকে এ কাজ থেকে বিরত রাখাটাও ওবামার জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। ফিলিস্তিন এবং ইসরাইল সংকট দীর্ঘদিনের। এ সংকট তিনি কিভাবে মোকাবিলা করেন সেটাই দেখার বিষয়। আফগানিস্তান থেকে আগামি ২০১৪ সালের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। ২০১১ সালে পাকিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের হত্যা পাকিস্তান আফগান সীমান্তে ড্রোন হামলার ঘটনায় দেশটির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি লক্ষ্য করা গেছে। আফগান সীমান্তে তালেবানের হামলা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে ওবামাকে।

১১.১৬ ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি
The Foreign Policy of America during Post-cold War Period

১৯৯০ এর দশকে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বের শক্তি কাঠামো ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী দশকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করতে পারেন নি। ক্লিন্টন প্রশাসন পররাষ্ট্র ব্যাপারে মূলত কয়েকটি সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যেমন -

- ইউরোপে ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি রক্ষা করে ঐসব অঞ্চলে সামরিক ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখা।
- আণবিক অস্ত্রের প্রসারণ বোধ করা।
- বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে মার্কিন স্বার্থ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির সক্রিয় উদ্যোগে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্লিনটনের উদ্যোগে উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিল ক্লিনটনের পররাষ্ট্রনীতি বহু দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

১. তিনি ১৯৯৩ সালে হাইতি ও কেনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর ঐ পদক্ষেপের পক্ষে আভ্যন্তরীণ সমর্থন ছিল না।
২. বিল ক্লিন্টন পশ্চিম ইউরোপ, চীন, জাপান ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সফল হন নি।
৩. ল্যাটিন আমেরিকার সম্পর্কেও তিনি কোন বিচক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন নি।
৪. আফ্রিকা বিষয়েও মার্কিন প্রশাসন কোন প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করে নি।
৫. মধ্য প্রাচ্যে শান্তি স্থাপনেও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সফল হয় নি।

সেই সময় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিল। বিশ্বের বহুদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করেছে। আফগানিস্তানের তালেবানদের ওপর আক্রমণ ও নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জর্জ বুশ বহু রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বব্যাপী সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে ওঠেছে। জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া সহ ইউরোপের বহু দেশই ঐ আক্রমণের নিন্দা করেছে। ইরাক যুদ্ধ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রসী নীতির প্রকাশ বলে অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধিক্কার দিয়েছে।

বস্তুত বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানে নতুন সরকার স্থাপনের পর সেখানে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য কোন সুসংবদ্ধ কার্যসূচী গ্রহণ করে নি। ফলে সন্ত্রাসবাদীরা আবার সংগঠিত হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত বাণিজ্য নীতিও সিয়াটেলে, কানকুনে ও দোহা সম্মেলনে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে।

সম্প্রতি (২০১২) মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা সমালোচনা, বাদবিবাদ এবং মূল্যায়ন চলছে।

বিতর্ক চলছে-শক্তি বনাম নীতিকে কেন্দ্র করে, বাস্তববাদ বনাম আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে, আন্তর্জাতিকতাবাদ বনাম বিচ্ছিন্নতাবাদকে ঘিরে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বের তিনটি ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে পররাষ্ট্রনীতির কৌশল নির্ণয়ে ব্যস্ত। এ তিনটি ধারা হলো-

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

- বিশ্বের বৃহৎ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাস।
- বিশ্ব রাজনীতিতে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরব উপস্থিতি ও প্রতিবাদীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।
- বিশ্বে অরাষ্ট্রীয় ও অতিজাতীয় সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রসার।

বারাক ওবামার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো -

- মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্ব-অর্থনীতি পরিচালনা।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতন্ত্রের প্রসার সাধন।
- বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে সমাধানের সঠিক কৌশল অনুসরণ।

Stanly Hoffmann-এর মতে, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত প্রাধান্য দীর্ঘদিন বজায় থাকবেনা।

হেনরি কিসিঞ্জার বলেছেন যে, এমন এক অদ্ভুত সময় এসেছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারছে না বিশ্বকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেও রাখতে পারছে না।

হেনরি কিসিঞ্জারের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে।

Ernst Hass এর মতে, বিশ্বের বহুমুখী আদান-প্রদান ও বহুপাক্ষিকতাকে (multilateralism) এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে এ পাক্ষিক আদান-প্রদান প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

Gardner, Nye ও Hoffmann এর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন যুগের Catalyst-এর ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে হবে।

১১.১৭ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য (Success and Failures of American Foreign Policy)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলো সাফল্য লক্ষণীয়, যেমন-

- মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ঐ দেশের রাজনৈতিক শক্তি, মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির বলে অতি বৃহৎ শক্তি (Super power) রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি তার অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধনে সফল হয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকাতে তার একাধিপত্য বজায় রাখতে সফল হয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্কোচন নীতির (Policy of Containment) সাহায্যে বিশ্বে কমিউনিস্ট প্রভাব প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করেছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য দান কর্মসূচি বহু দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছে।
- মার্কিন সাহায্যের সুবাদে জাতিসংঘ বিশ্বের উন্নয়নশীল অঞ্চলে বহুবিধ অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক কার্যসূচি পরিচালনা করেছে।

১১.১৮ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা (Failure of American Forign Policy)

- মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে নেতিবাচক নীতি বলে অনেকে সমালোচনা করেছেন।
- মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে অনেকেই সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রকাশ বলে অভিযোগ করেছেন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ চালাচ্ছে এবং দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো ঐ শোষণের শিকার।
- মার্কিন সামরিক নীতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক জোট গঠন করে ও ঘাঁটি স্থাপন করে বিশ্বে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছে ও ঠাণ্ডাযুদ্ধ জনিত উত্তেজনা ও বিরোধ বৃদ্ধি করেছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সংকীর্ণ স্বার্থসাধনের জন্য বহু স্থানে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দিয়েছে।
- চীন সম্পর্কে মার্কিন নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বহু দশক ধরে চীন সম্পর্কে আমেরিকা অন্ধ বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯৮০-এর দশকে চীনের সঙ্গে

মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।

- আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রতি মার্কিন সমর্থনের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণও সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ক্ষুব্ধ ছিল।
- মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে বলা হয়েছে, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে তার সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলো উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার (North-South dialogue) ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয় মনোভাব ও দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রতি উদাসীনতার জন্য ক্ষুব্ধ।
- ভিয়েতনাম ও নিকারাগুয়াতে হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন।
- মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে বলা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অস্ত্র বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। তার ফলে বিরোধরত ঐ সব দেশে অস্ত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র দেশগুলো তাদের অপর্যাপ্ত সম্পদ উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছে।
- ১৯৯১ সালে ইরাকের উপর আমেরিকার নিষ্ঠুর আক্রমণের জন্য বিশ্ববাসী ক্ষুব্ধ।
- মার্কিন আণবিক নীতির সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে চুক্তি বৈষম্যমূলক ছিল। কারণ ইহা আণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখতে তৎপর ছিল।
- অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, পরস্পরবিরোধী নীতি বলে অভিযোগ করেছেন। আমেরিকা গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান হলেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তার অনুগত একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে প্রশ্রয় দিয়েছে।
- সমালোচকদের মতে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতির দ্রুত ও আমূল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচক্ষণ ও গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারেনি।
- ইরাকের ওপর মার্কিন আক্রমণের পর মার্কিন নীতি বিশ্বব্যাপী তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন। ইরাক যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর দুর্বলতাও সুস্পষ্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বলপ্রয়োগ করে বিশ্বের তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।

তার এ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি বিশ্বব্যাপী ধিক্কৃত হয়েছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেও ব্যর্থ হয়েছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত কানকুন শীর্ষ আলোচনায় (সেপ্টেম্বর, ২০০৩) মার্কিন বাণিজ্য নীতি ও সংরক্ষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

অনেকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কোন সম্ভাব্য শক্তি বা শক্তিজোটের উত্থান প্রতিহত করতে ব্যস্ত।

১১.১৯ বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল্যায়ন

- মধ্যপ্রাচ্যে একক কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য পূর্বের ন্যায় ইসরাইলকে সর্বত সমর্থন দান। ফিলিস্তিনদের ন্যায়সঙ্গত অধীকার ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনে অঙ্গীকার। তবে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেই। তবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ফিলিস্তিনি অধিন ভূ-খণ্ডে ইসরাইলের বসতি নির্মানের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমকে ওবামা সমর্থন করে নি। মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের ফলে তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়ায় যে সরকার পরিবর্তন ঘটেছে ওবামা প্রশাসন সেখানে স্বাগত জানিয়েছে।
- পূর্বশত্রু সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ভিতরে বাহিরে সবদিক দিয়েই ওবামার প্রচেষ্টা অব্যাহত। ভিতরে আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র সমর্থন দিয়ে আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বাইরে পশ্চিমা বিশ্ব এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে অবরোধ সহ সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি এগিয়ে নেয়।
- ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সহ তেল বিক্রীর উপর অবরোধ আরোপ করেছে ওবামা প্রশাসন। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বাতিল না করলে সামরিক হামলা হতে পারে

বলে হুমকি। তবে তিনি আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানে আগ্রহী।

- দক্ষিণ এশিয়ায় এবং ভারত মহাসাগরে চীনের কর্তৃত্ব কমিয়ে মার্কিন কর্তৃত্ব বৃদ্ধির জন্য মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।
- চীনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য চীনা কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত করে চীনের প্রতি চাপ অব্যাহত রাখা। তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি এবং সামরিক চুক্তি করে চীনকে চাপে রাখার কৌশল যথারীতি পূর্বের মত। ওবামা চীনের তিব্বত নীতিরও বিরোধী।
- ইরাক থেকে মার্কিন সহ বহুজাতিক সৈন্য প্রত্যাহার রাখা, আবুগারিব কারাগার বন্ধের ঘোষণা ওবামা প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরন সহ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিগুলোতে মার্কিন স্বার্থ বহাল রাখার পক্ষে ওবামা প্রশাসন।
- আফগানিস্তানের কর্তৃত্ব সেখানকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তর করে ২০১৪ সালের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে NATO সহ সকল সৈন্য প্রত্যাহার, ২০১১ সাল থেকে এ প্রক্রিয়া শুরু।
- লাদেনকে পাকিস্তানে আশ্রয়, আফগানিস্তানে অবস্থানরত ন্যাটোর রসদ সরবরাহের পথ খুলে দেওয়া, পাকিস্তানে ড্রোন হামলা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের অবনতি।
- উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের নীতি বহাল, নিরস্ত্রীকরণ লক্ষ্যে ছয় জাতি আলোচনা।
- রাশিয়ার সাথে ওবামা প্রশাসন স্নায়ুযুদ্ধ পূর্ববর্তী যুদ্ধাবস্থায় না থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়াকে বন্ধুহীন এবং রাশিয়ার মতামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

এ সকল উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, পশ্চিম এশিয়াসহ আফ্রিকাতে ওবামা নীতি পূর্বের নীতিকে বহাল রেখেছেন।

১১.২০ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি (Forign Policy of USA in Asia)

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর তুলনায় এশিয়ায় নিজের আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থ সংরক্ষণে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গবেষণা দফতরের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব উইলসন লর্ড-এর মতে, There is no region in the world more importance for the USA than Asia-Pacific.

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করা

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তৃতি ঘটেছে। এসব দেশের মধ্যে এশিয়ার রাষ্ট্রের সংখ্যা তুলনামূলক বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উত্তর কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইরাক, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় যে কোন সময়ে ধ্বসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অস্ত্র উৎপাদন ও আমদানির ক্ষেত্রেও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে যা এশিয়ায় সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সিরিয়ার বর্তমান ভূমিকাতে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার পরমাণু ও সামরিক অস্ত্র সীমিতকরণ ও নির্মূলে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১১.২১ মধ্যপ্রাচ্য নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া বিষয়ক নীতিতে মধ্যপ্রাচ্য সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এর কারণ একদিকে মূল্যবান তেলসম্পদ এবং অন্যদিকে ইসরাইলের সমর্থন। তাই দেখা যায়, ইরাককে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণ চেষ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের প্রতি আগ্রহ। তাই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুদিনের প্রতীক্ষা। ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। ফলে জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনীর সহযোগীতায় উপসাগরীয় যুদ্ধের পরেই যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সাথে সামরিক সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে লোহিত সাগর ও পারস্য

http://thejobstudy.com Go to Contents

উপসাগরে স্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সুযোগ পায়। ২০০৩ সালে ইরাকে পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্র আছে এ অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখল করে নেয়।

সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

- ইরান-ইরাক-সিরিয়াকে এক ঘরে করে রাখা।
- মিশরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখা।
- যেসব রাজতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সেসব দেশের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করা।
- আরবরা যাতে ইসরাইলকে আক্রমণ না করে সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান সম্পদ জ্বালানি তেলের বিশ্ব বাজারে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।
- সর্বোপরি ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

১১.২২ চীন

যদিও বর্তমানে চীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার তা সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের হত্যা এবং মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকে মিসাইল হামলা থেকে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন একটি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Anti Ballistic Missile-ABM) গড়ে তোলে। যার ফলে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরো অবনতি হবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। চীন বর্তমানে বৃহৎ সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। দেশটিতে রয়েছে ১৩৫ কোটি লোকের বিশাল বাজার। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও আপোসমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে।

১১.২৩ পাকিস্তানও ভারত

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তান ও ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিবেচনা করছে। কেননা রাজনৈতিকভাবে, ভারত, আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে। ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তার পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য জোর তৎপরতা চালায়, যুক্তরাষ্ট্র এতে সমর্থনও দেয়। কেননা এশিয়ার নতুন শক্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে নিবৃত্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার প্রথম মেয়াদে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষত ভারতের সাথে এবং একই সঙ্গে পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ভারত এ অঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অধিকারী। আর পারস্য উপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে নিজস্ব প্রভাব বলয় তৈরির জন্য পাকিস্তান যোগ্যসঙ্গী। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসলীলা এ নীতিতে চালিত হওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এবং আফগানিস্তান যুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন দান করে, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে পাকিস্তান অধিক লাভবান হয়েছে।

পাকিস্তানের রয়েছে মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশেষত উপসাগরীয় তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে নিজের আয়ত্তে আনা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশীয় নীতিকে উপসাগরীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ পর্যন্ত বিস্তৃত করে। সাম্প্রতিক আফগান যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানিস্তানে মার্কিন সমর্থিত পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান স্বার্থ তার প্রাকৃতিক সম্পদ। আফগানিস্তান থেকে তেল, গ্যাস আরব সাগরে মার্কিন তরীতে আনতে হলে পাকিস্তান ভিন্ন পথ নেই। কারণ আফগানিস্তানের অপর প্রতিবেশী ইরান যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত দুবৃত্তরাষ্ট্রের তালিকাভূক্ত। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১.২৪ শ্রীলংকা

বিপুল প্রাণহানি ও মানবতার মর্মান্তিক কষ্টভোগের বিনিময়ে শ্রীলঙ্কায় ২৬ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে। এলটিটিই'র প্রতিষ্ঠাতা তেলুপিল্লাই প্রভাকরণের জীবনাবসান (১৮ মে, ২০০৯)

এর মাধ্যমে অবসান ঘটেছে এলটিটিই যুগের-গেরিলামুক্ত হয়েছে শ্রীলঙ্কা। দেশটি স্থিতিশীল পরিবেশ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সহায়ক। বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি ছাড়াও ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি নির্মাণকেন্দ্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। ১০ এপ্রিল, ২০০৮-এ নেপালে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে মাওবাদী সরকার ক্ষমতায় আসে। মে, ২০০৯ এ মাওবাদী সরকারের পতন ঘটে ও কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র মাওবাদীদের প্রতিহত করার জন্য (M16s-1 M4s ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করছে। বর্তমানে সরকার ও সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্বের মূল কারণ হচ্ছে M16 যুদ্ধাস্ত্র।

১১.২৫ মায়ানমার

মায়ানমারের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ দায়িত্ব গ্রহণ করেন থিয়েন সেন। তিনি ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশটির ৪র্থ ঊর্ধ্বতন জেনারেল ছিলেন। তিনি মায়ানমার পার্লামেন্টের ২০১০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথম বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি মায়ানমারের রাজনৈতিক দল Union Solidarity & Development Party" থেকে নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশীয় নীতির মধ্যে গণতান্ত্রিক নেত্রী অংসান সূচী'র মুক্তি লাভ উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মায়ানমারের গণতন্ত্রায়নে মার্কিনী প্রভাব ও প্রচেষ্টা সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে।

১১.২৫ এশিয়ান মুসলিম রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি (Forign Policy of USA in Asian Muslim Contries)

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র যে সমস্যাটির বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তা হলো মৌলবাদ। ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের মৌলবাদ প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র জোটবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে যতদিন রুশ বাহিনী ছিল ততদিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামপন্থী গেরিলা দলগুলোকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছিল। পাকিস্তানের প্রতিও মার্কিন নীতি ছিল অনমনীয়। ১৯৮৯ সালে রুশ সৈন্য আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের পর যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ননীতি গ্রহণ করে। এমনকি উপদলীয় কোন্দল থামানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে দ্বৈতনীতির প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া বর্তমানে পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি সন্ত্রাস দমনের যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াস এবং ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা পরিবর্তনের আভাস।

মূল্যায়ন

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ব্যাপক জনঅধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়া তার বাজার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও এশীয় নীতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথাপি দক্ষিণ এশিয়া এ অঞ্চল দুটির মধ্যবর্তী হওয়ায় তার গুরুত্বও কম নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশীয় নীতির ভবিষ্যত অনেকটাই নির্ভর করবে মধ্যপ্রাচ্য, ইরান-ইরাক সংকটে দক্ষিণ এশীয় বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানের কার্যক্রম, চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক গতিবিধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব ব্যবস্থার নীতিমালায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর সাড়া প্রদানের ওপর।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন?
২. ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরবর্তী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিষদভাবে তুলে ধরুন; এর সফলতা ও ব্যার্থতা আলোচনা করুন।
৩. আপনি কী মনে করেন বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি কতটুকু ফলপ্রসু ও যুক্তিযুক্ত?
৪. ১৯৮০-এর দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এ নীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে বলে আপনি মনে করেন।
৫. সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
৬. এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বর্তমান ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

অধ্যায় ১২

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি
The Foreign Policy of India

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১২.১ ভূমিকা
১২.২ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ
১২.৩ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ
১২.৪ ভারতের সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতি
১২.৫ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা

১২.১ ভূমিকা (Introduction)

ভারতের সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি প্রবণতা হলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেয়ে বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের আগ্রহ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কিছু অমিমাংসিত ইস্যুর সমাধানে ভারতকে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে না। নেপাল, ভুটান ও শ্রীলংকায় ভারতের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ দেশগুলোর উপর ভারতের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলেই প্রতীয়মান হয়। চীনের সাথেও সীমান্ত সহ বিভিন্ন অমিমাংসিত ইস্যু সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। বরং ভারত বহু দূরের দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তৎপর। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইলের সাথেও সম্প্রতি সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এ প্রবণতা দক্ষিণ এশিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

১২.২ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ (Determinants)

কোনো দেশের জাতীয় নীতির যে অংশ বহির্বিষয়ক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত তাকেই পররাষ্ট্রনীতি বা বৈদেশিক নীতি বলা হয়। সব দেশের পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়। পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণকারী বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-১. অভ্যন্তরীণ বিষয়, ২. বহির্বিষয়ক পরিস্থিতি। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর বহু অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয় ও পরিস্থিতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভৌগলিক পরিস্থিতি, অবস্থান, আয়তন, সীমান্ত, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও আদর্শ, জাতীয় সামরিক শক্তি ও জাতীয় চরিত্র, জনমত রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

আন্তর্জাতিক বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর অনুসৃত নীতি ও বিশ্বজনমত।

ভৌগোলিক অবস্থান : ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান তার পররাষ্ট্রনীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। এশিয়া মহাদেশে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রক্ষা করেছে। সেদিক থেকে ভারত পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধন করছে। সেই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ের বিশ্ব কূটনৈতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে ভারত এশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।



ভারতীয় উপমহাদেশ

সাম্প্রতিককালে ভারত আন্তর্জাতিক জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ও উত্তর-দক্ষিণের আলোচনার ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আয়তন: ভারতের বিশাল আয়তনের জন্য ভারতকে উপমহাদেশ বলা হয়। এ বিশাল আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা হয় যে, ভারত অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছে মাথা নত করবে না ও বিশ্বে স্বাধীন শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

সীমান্ত : ভারতের উত্তরে বিশাল হিমালয় ও কারাকোম পর্বতশৃঙ্গ ভারতকে বেষ্টন করে রয়েছে। এ পর্বতমালা ভারতের উত্তর সীমান্তের সঙ্গে এশিয়ার অপর অংশের সহজ যোগাযোগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। উত্তর সীমান্তে নেপাল ও ভুটানের স্বাধীন সত্তা ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, ভারতের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারত মহাসাগর দিয়েই ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। ভারত মহাসাগরে বিদেশি শক্তির উপস্থিতি তার নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এজন্য ভারত মহাসাগরে রাশিয়া ও আমেরিকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভারত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এ এলাকাকে শান্তির এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত, ভারত-চীন সীমান্ত ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যুদ্ধ পরিহার করা।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ব্যাপক দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নই ভারতের মূল লক্ষ্য। এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়নের ব্যাপারে ভারত বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম

লক্ষ্য হলো বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ। ভারত তাই সব দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানগত ঋণ সংগ্রহ করা। ভারত সরকার পূর্ণভাবে সচেতন যেকোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নিলে সেই ঋণ ও সাহায্যের পিছনে ঋণদানকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চাপ ও দূরভিসন্ধি থাকতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো যত বেশি সম্ভব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত করা।

ভারত মনে করে যে যুদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অপর লক্ষ্য হলো যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি বজায় রাখা। জহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেছিলেন, "We cannot afford war and its devastation. We want to build up our strength in peace and under the shelter of neutrality". অর্থনৈতিক উন্নয়নের কূটনীতিই ভারতকে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণে প্রণোদিত করেছে।

রাজনৈতিক ঐতিহ্য : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর তার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার সুপ্রাচীন সভ্যতা, ব্রিটিশ শাসনের অভিজ্ঞতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও গান্ধীবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কয়েকটি বিশেষ দিক হলো–

১. রাজনীতি ও শক্তি সম্বন্ধে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি,
২. আন্তর্জাতিকিতার প্রতি আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি,
৩. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি ও বর্ণবৈষম্য বিরোধি দৃষ্টিভঙ্গি,
৪. এশিয়ানিজম। এসব ঐতিহ্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করেছে।

সামাজিক পরিস্থিতি : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর তার সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব রয়েছে। ভারতের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ বাস করে। এসব বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারত আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে।

জাতীয় চরিত্র : ভারতের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীলতা। ভারতের জনগণ বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রতি সহনশীল ও সেইসব মতবাদের মধ্যে যেসব সত্য নিহিত আছে তা গ্রহণ করতে উন্মুখ। ভারত একদিকে যেমন পশ্চিমী গণতন্ত্রের উদারনৈতিক মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তেমনি কমিউনিজমের সাম্যের বাণী গ্রহণ করতে আগ্রহী। এ সহনশীলতার জন্যই ভারত পৃথিবীতে দুই বিবদমান শিবিরের উভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে উদ্যোগী ছিল। ভারতের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাকে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে প্রণোদিত করেছে।

জনমত : ভারতের পররাষ্ট্রনীতি জনমতের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে। ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি নীতি ও বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী নীতির পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন লক্ষ্য করা যায়। জনমত সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের জনপ্রিয়তা রয়েছে।

রাজনৈতিক দল : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ও প্রতিটি দলই সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

স্বার্থগোষ্ঠী : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবও লক্ষণীয়। এসব স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সেনাবাহিনী, শ্রমিক সংঘ। ভারতে বহু লবি আছে ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক Galbraith বলেছেন, "Foreign Policy like domestic policy is a reflection of the fundamental instincts of those who make it." ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে জহরলাল নেহেরু

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরিশেষে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর আমলা ও সমর বিশারদদের সুগভীর প্রভাব লক্ষণীয়।

আন্তর্জাতিক বিষয়

আন্তর্জাতিক বিষয়ের মধ্যে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুই অতি বৃহৎ শক্তির অনুসৃত নীতি ও প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্ব জনমত উল্লেখযোগ্য। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অন্যান্য বিষয় যেমন বিশ্বের দ্বিমেরু-ভিত্তিক বিভাজন, বহুকেন্দ্রিকতার প্রবণতা, আণবিক অস্ত্রের দ্রুত প্রসার ও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাব প্রভৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর অনুসৃত নীতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত।

১২.৩ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ (Basic Objectives of India's Foreign Policy)

যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলো মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এসব উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন :

১. কেন্দ্রীয় লক্ষ্য,
২. মধ্যবর্তী লক্ষ্য,
৩. দূরবর্তী লক্ষ্য।

কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা। মধ্যবর্তী লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি। দূরবর্তী লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ ও স্বপ্ন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা,
২. সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা,
৩. বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরোধিতা,
৪. আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান,
৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান,
৬. জোট-নিরপেক্ষতা,
৭. উন্নয়নশীল বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে ধারণাটি অত্যন্ত জটিল। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অর্থ হলো:

১. আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা,
২. সার্বভৌমিকতা রক্ষা ও
৩. জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা। পররাষ্ট্রনীতি মূলত বাহ্যিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবে বাহ্যিক নিরাপত্তার সঙ্গে যদি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকে তবে সেটিও পররাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয়।

জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার সাধন ও উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য।

জাতীয় স্বার্থের ধারণার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ধারণাও জড়িত। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যদি অধিকতর সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কার্যসূচি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেই কারণে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো এমন এক অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও ব্যবস্থা গড়ে

http://thejobstudy.com Go to Contents

তোলা যাতে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যহত না হয়।

- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। ভারত বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ও নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ সফল করে তুলতে আগ্রহী। এ উদ্দেশ্যে ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আবেদন জানিয়েছে ও সামরিক জোট-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে।
- সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করাও ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে নামিবিয়ার জনগণের সংগ্রাম ও প্যালেস্টাইন মুক্তিবাহিনীর সংগ্রামকেও সমর্থন করা হয়েছে।
- বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি বিরোধিতা করা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের অনুসৃত বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে Front Line রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্যের জন্য একটি সাহায্য তহবিল গঠন করেছিল।
- সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ভারত জাতিসংঘের ঘোষিত নীতি ও আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছে। ভারত আফগানিস্তানের সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্যও আবেদন জানিয়েছে।

১২.৪ ভারতের সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of Contemporary Era)

সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কতকগুলো বাস্তবসম্মত ও বিচক্ষণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি ও সময়ের প্রেক্ষিতে বিদেশ নীতির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

১. বিদেশি নীতিতে অর্থনৈতিক বিষয়ের অগ্রাধিকার
২. পূর্বমুখী নীতি Look East Policy।
৩. সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে আঞ্চলিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষা।
৪. বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধির উদ্যোগ।
৫. আঞ্চলিক সন্ত্রাস দমনের উদ্যোগ।
৬. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সমস্যায় সরাসরি হস্তক্ষেপ না করার কৌশল।
৭. ভারত-মার্কিন পরমাণু (অসামরিক) চুক্তি সম্পাদন।

- ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক (পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান) স্থাপন করে একটি অনুকূল নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। জুলাই ২০১০ এ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তান সফরে যান। এতে করে দীর্ঘদিন স্থবির হয়ে থাকা ভারত-পাকিস্তান শান্তি আলোচনা পুনরায় চালু হবার পরিবেশ তৈরি হয়।
- ভারত চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিষয়ক বিবাদ মীমাংসার জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করেছে।
- চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বৃদ্ধির জন্যও কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে ও অর্থনৈতিক বাজারে চীন যে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সে ব্যাপারেও ভারত সচেতন ও সতর্ক।
- ভারত ASEAN-এর সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। APEC ও ASEAN-এর সদস্যদের সঙ্গে ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত করতে আগ্রহী। তার ফলে, ভারতের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও দক্ষতা লাভ করবে। সেই শিক্ষাই ভারতীয় কৃষি ও শিল্প এবং সমগ্র উৎপাদন ক্ষেত্রকে বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সাহায্য করবে।
- ভারত আরব বিশ্বের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকটি নতুন বাণিজ্যিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ভারত ইসরাইলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সামরিক ও প্রযুক্তিগত কয়েকটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ভারত ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ। কতকগুলো নতুন বাণিজ্যিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ভারত রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে Strategic Partnership গড়ে তুলতে আগ্রহী। উভয় রাষ্ট্রই বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যার (আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বহুজাতিক অপরাধচক্র, মাদক দ্রব্যের বে-আইনী চলাচল, পরিবেশগত ভারসাম্যের বিনাশ) সমাধানের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছে। উভয় রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোকে মজবুত ও জাতিসংঘকে আরও সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
- ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক বজায় রেখে নতুন ভারসাম্য গড়ে তুলতে চাইছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রযুক্তিমূলক আদান-প্রদান ও সহযোগীতা প্রসারিত হয়েছে। তবে ভারত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করে নি। সম্প্রতি ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধমত ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করেছে। বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য ভারত আমেরিকাকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে আমেরিকার দ্বিমুখী সমালোচনা করতেও দ্বিধা করে নি। ভারত বিশ্ব নিরাপত্তা বিষয়ে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে আগ্রহী।
- ভারত সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধিবেশনগুলোতে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির বৈষম্যমূলক ধারাগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। অন্যান্য দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারত অসম বাণিজ্য শর্ত ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য জোর দাবি পেশ করেছে। সম্প্রতি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক কৃষি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের মতামত ও দাবি কিছুটা মেনে নিয়েছে।
- ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সম্প্রসারিত করে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। দক্ষিণ-এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয় ব্যাংক গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। ভারত সার্কের সঙ্গে আসিয়ানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে।
- ভারত ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Area) গঠনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।
- ভারতে আর্থিক সংস্কার নীতি গ্রহণের পর বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বিদেশি প্রযুক্তি আমদানির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই কারণে অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Diplomacy) প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। ধনী দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারণের নিরন্তর চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ও পারমাণবিক চুক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে লাল ফিতের (Red Tape) বাঁধন শিথিল করার কথা বলা হয়েছে।
- ভারত পূর্বমুখী বিদেশ নীতি গ্রহণ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে ও পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারিত করতে আগ্রহী। সেই উদ্দেশ্যে আশিয়ান (ASEAN) ও এপেক (APEC) এ অন্তর্গত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বমুখী বিদেশনীতির সফলতার জন্য জাপানের সহযোগিতার প্রয়োজন। ভারত তাই জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির প্রয়াস গ্রহণ করেছে। শুধু অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে ভারত-জাপান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সীমিত থাকবে না। ভারত জাপানের সঙ্গে সামরিক বন্ধনও গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিরোধ উভয় দেশের মনের ইচ্ছা।
- ভারতের নৌশক্তি ও বিমানবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে শক্তিশালী করে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য আঞ্চলিক শক্তিগত ভারসাম্য রক্ষা করা।
- বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ অর্জনের জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব পদের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে ভারতীয় প্রতিনিধি হেরে যান।

- ভারত এ উপমহাদেশে ও তার চারপাশে সন্ত্রাসদমনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ও সীমানা অতিক্রমকারী জঙ্গি কাজকর্ম (Cross-border Terrorism) কাশ্মীর, আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের শান্তি বিপন্ন করেছে। ভারত বারবার সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে আবেদন জানাচ্ছে।
- ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দমনের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করে নি। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ভারত বারবার ঐ ধরণের কাজকর্ম বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে অনুরোধ করছে।
- আফগানিস্তানের সমস্যা নিয়েও ভারত বিব্রত। সেখানে NATO বাহিনীর সঙ্গে তালিবানদের যুদ্ধ চলেছে।
- সম্প্রতি ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু সহযোগিতা (অসামরিক) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তার ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে অনেকে মনে করেছেন।

১২.৫ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা

১. বিভিন্ন সংকটের সময় ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৬২ সালে চীন যুদ্ধের সময়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৮০ সালে আফগান সমস্যার ক্ষেত্রে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি পুনরায় সমালোচিত হয়েছে।
২. অনেকে ভারতের পারমাণবিক নীতির সমালোচনা করেছে।
৩. ভারতের পাকিস্তান সম্পর্কিত নীতিও সমালোচিত হয়েছে।
৪. ভারত দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করে নি। সম্প্রতি ভারত এ ত্রুটি দূর করে ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রসারিত করেছে।
৫. ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে নি। সম্প্রতি মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগি হয়েছে।
৬. ভারত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলেও বিচক্ষণ নীতি গ্রহণ করে নি।
৭. ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়েও ভারত সূচিন্তিত পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করে নি।
৮. ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরবর্তী কালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে গতিশীল ও সক্রিয় করে তোলার জন্য ভারত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে নি।
৯. সাম্প্রতিক কালে ভারতের জোটনিরপেক্ষতা নীতি বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের মতে এ নীতির কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই।

মূল্যায়ন (Evaluation)

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কতকগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের মধ্যে তীব্র ঠাণ্ডাযুদ্ধ শুরু হয়। সেই সময় ভারত কোনো শিবিরেই যোগদান না করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। জোট-নিরপেক্ষতাকেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভারত পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এ বলে যে ভারত তার জোটনিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে এসেছে।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করুন। ঠাণ্ডা লড়াই এর অবসানের ফলে এক্ষেত্রে কী ধরণের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন।
২. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনাকারী নীতিসমূহ নির্দেশ করুন। আপনি কি মনে করেন এ নীতিগুলোর পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে? আপনি উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
৩. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ কি কি? ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা মূল্যায়ন করে দেশটির পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনাগুলো উল্লেখ করুন।

অধ্যায় ১৩

পররাষ্ট্রনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

Foreign Policy:Bangladesh Perspective

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৩.১ ভূমিকা
১৩.২ পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা
১৩.৩ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাংবিধানিক মূলনীতি
১৩.৪ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভৌগোলিক ও ভূরাজনৈতিক ভিত্তি
১৩.৫ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উপাদান
১৩.৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভৌগোলিক ভিত্তি
১৩.৭ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১৩.৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভূরাজনৈতিক ভিত্তি
১৩.৯ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন
১৩.১০ মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির প্রভাব
১৩.১১ শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭২-১৯৭৫)
১৩.১২ জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭৬-১৯৮১)
১৩.১৩ হোসেইন মোহম্মদ এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৮২-১৯৯০)
১৩.১৪ বেগম খালেদা জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি (১৯৯১-১৯৯৫)
১৩.১৫ শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি (১৯৯৬-২০০১)
১৩.১৬ ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদের পররাষ্ট্রনীতি (২০০৭-২০০৮)
১৩.১৭ শেখ হাসিনা বা মহাজোট সরকারের পররাষ্ট্রনীতি (২০০৯-বর্তমান)
১৩.১৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বল দিক

১৩.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান যুগে প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। এ স্বার্থ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত নীতি থাকা প্রয়োজন। পররাষ্ট্রনীতি হলো জাতীয় নীতির সেই অংশ যা তার বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে এক দেশ অপর দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। আধুনিক বিশ্বে সকল রাষ্ট্রের জন্য পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের সাফল্য, উন্নতি, অর্থনৈতিক অর্জন, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করে সফল পররাষ্ট্রনীতির ওপর । বাংলাদেশও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরী করতে পররাষ্ট্রনীতি একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করতে হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলোচনা করা দরকার।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতিই ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গঠিত প্রবাসী সরকারের বিদেশনীতি, পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত ৪২ বছরে দেশটির পররাষ্ট্রনীতি নানা উত্থান পতনের মধ্য

দিয়ে আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগতরাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এদেশের নিরীহ জনগণের ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণার পর পরই তিনি পাকিস্তানি জান্তা কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান কারাগারে বন্দী থাকেন। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়, শরণার্থীদের আশ্রয়ের জন্য একটি সংগঠিত কার্যক্রম জরুরি হয়ে পড়ে।

১৩.২ পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা (Definition of Foreign Policy)

'পররাষ্ট্র' হলো অন্য রাষ্ট্র এবং 'নীতি' হলো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণীত কার্যাবলি। সাধারণভাবে পররাষ্ট্রনীতি হলো একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিমালা। পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থের সেই অংশ যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বিশ্বব্যবস্থায় সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় নীতিরই অনিবার্য অনুষঙ্গ। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ নানা মত প্রদান করেছেন–

- মার্শালের মতে, রাষ্ট্র যে সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করছে বা করতে চাইছে, তাদের সমষ্টিকে পররাষ্ট্রনীতি বোঝায়।
- জোসেফ ফ্রাঙ্কেলের মতে, পররাষ্ট্রনীতি বলতে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত বা ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিকে বোঝায় যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।
- রাসেট এবং স্টার এর মতে, রাষ্ট্র তার সীমানার বাইরে অন্য রাষ্ট্রের জনগণ, কর্ম ও স্থানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে গাইডলাইন প্রদান করে তাই পররাষ্ট্রনীতি।
- লিস্কনের মতে, কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ যা তার বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- হার্টম্যানের মতে, দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র যে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নীতি অনুসরণ করে তাই পররাষ্ট্রনীতি।

উপরিউক্ত মতামতসমূহের আলোকে আমরা একথা বলতে পারি, পররাষ্ট্রনীতি একটি রাষ্ট্রের গৃহীত সে সব বিধি ও কৌশল যা দেশটির জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে এবং নিজ দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে সকল নীতি অনুসরণ করে বা করতে চায় সেগুলোই সেই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে পরিগণিত।

১৩.৩ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সংবিধানিক মূলনীতি (Constitutional Principles of Bangladesh Foeign Policy)

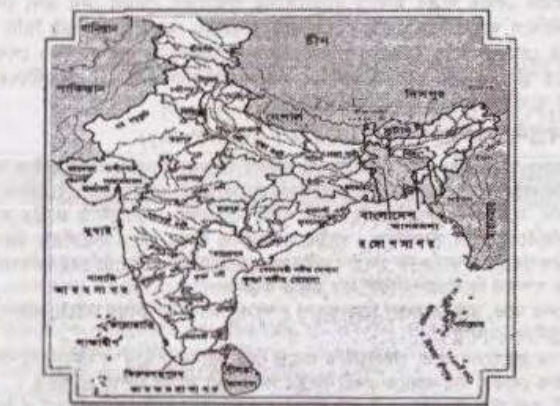
বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। এছাড়া বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনেরও সদস্য। স্বাভাবিক কারণে জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালাও মেনে চলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাংবিধানিক মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

১. জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
২. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ।
৪. সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
৫. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকারের প্রতি সমর্থন।

৬. ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ ও জোরদার করা।



বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

এছাড়াও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কিরূপ হবে তার একটি ধারণা আমরা পাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন বক্তব্যে। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে পৌঁছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কিরূপ হবে তা বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "We are samll country, we want friendship to all and malice to none" এছাড়া বাংলার মাটিতে পা রাখার পর বিমান বন্দরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, I would like Bangladesh to become the Switzerland of the East. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি এ-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব জাতীয় সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে সকলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী এবং কারো প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে না।

১৩.৪ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভৌগোলিক ও ভূরাজনৈতিক ভিত্তি

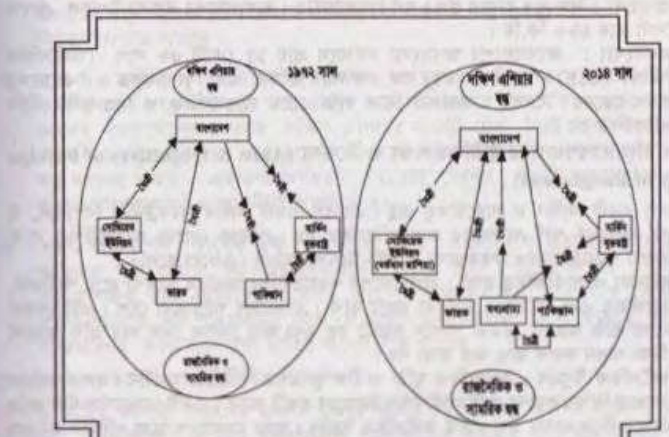
বিশ্বব্যাপী আন্তঃ নির্ভরশীলতার যুগে কোন জাতিই বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে কিছু পরিমান সম্পর্ক বজায় রাখে। সাধারনত পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

নীতি হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বিত কিছু কার্যক্রম। একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি দুই প্রকারের (ক) আভ্যন্তরীন নীতি , (খ) বৈদেশিক নীতি। সাধারনভাবে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদেশিক নীতিকেই পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানও একটি উপাদান।

১৫.৫ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উপাদান

জাতীয় শক্তি দানকারী প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুর করেও খাদ্য, শক্তি, শিল্প, সামরিক মতা,

অধিবাসীদের নেতৃত্ব , জাতীয় নৈতিকতা ,সরকারের গুনগতমান কূটনীতি প্রভৃতি এর অন্তর্গত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ক্ষমতাসীন দল দ্বারা প্রভাবিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষীক সম্পর্ক নির্ভর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ,চীন এমনকি পাকিস্তানের সাথে এই দুটি দেশের সম্পর্কের ওপর । এই প্রেক্ষিতে ১৯৭২ -এর পররাষ্ট্রনীতি এবং ২০১৪ সালের পররাষ্ট্রনীতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :



১৯৭২ এবং ২০১৪ এর পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক মডেল চিত্র

http://thejobstudy.com Go to Contents

বাংলাদেশের মুখ্যনীতি

১. পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাথে বন্ধুত্ব এবং কারও সাথে শত্রুতা নয় - এইনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার মনোভাব পোষন করে । এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি মেনে চলে।

২. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি মেনে চলা । এই নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, এবং নিজেদের অভ্যন্তরীন বিষয়ে কোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না।

৩. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে ঘনিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলে।

৪. ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন এবং ইসলামী দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

৫. কমনওয়েলথ এর কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

৬. সব বিরোধের শান্তিপূর্ন নিষ্পত্তি এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্ধারনের অধিকার সমর্থনকরে।

৭. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরন এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে জীবনযাত্রার

মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগীতা ।

১৩.৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভৌগোলিক ভিত্তি

(ক) অবস্থান : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ন স্থানে অবস্থিত । পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে দূরত্ব সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দেশটিকে সমগ্র দনি পূর্ব এশিয়া বিশেষ স্থান দিয়েছে।

(খ) আয়তন : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোরিডোর হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগর বরাবর উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৮০ কি.মি ।

(গ) জনসংখ্যা : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি ৫৮ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪)। জাতীয় আয় কম, সম্পদ সীমিত এবং অনাবিকৃত । এদেশের জনসাধারনের ব্যাপক মঙ্গলের দিকে লক্ষ রেখে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন নীতি পরিচালিত হয় ।

১৩ .৭ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims & Objectives of Foreign Policy of Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র। এদেশে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বিদ্যমান, যা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিচালিত হয়। প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতির মতো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিরও কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হলো :

১. **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা :** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা। বাংলাদেশ শান্তিকামী দেশ। এটা কোনো দেশের প্রতি আগ্রাসী ভূমিকা পালনে আগ্রহী নয় এবং অন্য কোনো দেশ তার প্রতি আগ্রাসী ভূমিকা পালন করুক তাও তার কাম্য নয়।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত ভূখণ্ডগত স্বাধীনতা অর্থহীন। মূলত বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি আসে। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যও চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অথচ বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম উন্নয়নশীল দেশ। তাই আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা :** স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে সহযোগিতার বিশ্ব। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না। শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তার জন্যও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এটিও একটি উদ্দেশ্য।

৪. **অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক :** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। তবে কারো অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করা বাংলাদেশের কাম্য নয়।

৫. **ভৌগোলিক অখণ্ডতা :** ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য বহিঃশক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করতে দরকার পররাষ্ট্রনীতি।

৬. সকল প্রকার বর্ণবাদ, ইহুদিবাদ, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদ দূরীকরণ এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এর অপর একটি উদ্দেশ্য।

৭. নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও তার প্রয়োগ।

৮. একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা হিসেবে টিকে থাকা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য।

১৩.৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভূরাজনৈতিক ভিত্তি

ক. **অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব :** বাংলাদেশের তিন দিক ভারত দ্বারা বেষ্টিত, নিঃসন্দেহে এটা একটা দূর্বলতা । অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ নাজুক হলেও এর সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা চলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ৯০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র স্থপন করলে আশে পাশের ৪৮২৭ কি.মি পর্যন্ত ধ্বংসলীলা সম্ভব হবে। সুতরাং বাংলাদেশ অবস্থায় সামরিক দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন।

খ. **পানি সীমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব :** এর মতে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মহীসোপানকে স্বর্ণখনি বলা হয়েছে। কারণ এখানে প্রচুর গলদা ও বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায়, যা রপ্তানীর মাধ্যমে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে ।

গ. **পানি সীমার সামরিক গুরুত্ব :** বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা একটি ত্রিভূজ আকৃতির সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে একমাত্র দিয়াগো গার্সিয়া ছাড়া এর আশে পাশে আর কোনো মার্কিন সামরিক ঘাটি নাই। বাংলাদেশের পানি সীমার এই ত্রিভুজ এলাকার উপর যে বৃহৎ শক্তি নিয়ন্ত্রন রাখতে পারবে, সে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পানি সীমার ওপরও নিয়ন্ত্রন রাখতে পারবে।

ঘ. **দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থান :** আঞ্চলিক সমঝোতা, বানিজ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত । এই বাস্তবতা থেকেই বাংলাদেশের নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে সার্ক নামে একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করা হয়েছে।বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ধরনের বিজয় । এছাড়াও আসিয়ান, সিয়াটো, সেন্টো , প্রভৃতি রাজনৈতিক গোষ্ঠি দ্বারাও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়।

ঙ. **বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের দ্বন্দ্ব :** স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের টানা পোড়েনেই সৃষ্টি। স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রুরা আজ বাংলাদেশের মিত্র , আর সাহায্যকারীরা দূরে সরে গেছে। অতীতের সরকারগুলোর পট পরিবর্তনের ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, তা বৃহৎ শক্তিগুলোর সম্প্রসারনবাদী নীতির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে

১৩.৯ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি লাভসহ যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। কিন্তু কালক্রমে বদলেছে বিশ্বরাজনীতির গতি-প্রকৃতি, অবসান ঘটেছে স্নায়ুযুদ্ধের। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার মসনদেও ঘটেছে একের পর এক পরিবর্তন। অবশেষে সারা বিশ্ব ভেসেছে বিশ্বায়নের স্রোতে। এসব পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল বিশ্বরাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতেও এসেছে নানা পরিবর্তন, ঘটেছে বিবর্তন। যা হোক, নিম্নে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যে বিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা আলোচনা করা হলো :

১৩.৯(১) মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy in the Period of Liberation War)

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই একদিকে যেমন জরুরি হয়েছিল বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় অন্যদিকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট হাইকমান্ড। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তাজউদ্দিন আহমেদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন; তখন থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। মূলত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা কূটনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য একটি প্রবাসী সরকার গঠন করার তাগিদ অনুভব করেন ইন্দিরা গান্ধী ও তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। দিল্লিতে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতারা আলোচনা করে একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলা মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার শপথ নেয়। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের একটি বৈধ সংগঠিত প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভ, বাংলাদেশের দাবি প্রচার, স্বীকৃতি নিয়ে দরবার করার পথ সুগম হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকার একদিকে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছেন অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের দাবি তুলে ধরে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। এদের মধ্যে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ছাত্র, জনতা সবাই ছিলেন। প্রবাসীরা সারা দুনিয়ায় অতি দ্রুত বাংলাদেশের দাবি পৌঁছাতে শুরু করেন, প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল একটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ উদ্দেশ্যে ভারতকে সন্নিবেশিত করা, বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকে বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা বোঝানো, সর্বোপরি বিশ্ব দলমত গঠন। কাজটি স্নায়ুযুদ্ধের সময় খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে চীন-মার্কিন অক্ষের পাকিস্থানপন্থী ভূমিকার কারণে। এছাড়া তখনকার সময়টা ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়। বিশ্বের দেশগুলো দুটি পরিষ্কার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যার প্রভাবে পড়ে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। দুই ভাগের একভাগে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং অন্যভাগে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও পুজিবাদী দেশগুলোর ভাগে নিজেকে যুক্ত করেছিল। পাকিস্তান ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর দলে আর ভারত ছিল সমাজতন্ত্রীদের দলে। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব ছিল ফলে এদের উভয়ের সাথে ভারতের ছিল বৈরিতা। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার লড়াইতে যুক্ত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ অবস্থায় তিনটি পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট পরাশক্তিগুলো এবং ভারত নিজেদের অবস্থান থেকে ভূমিকা ব্যাখ্যা চালিয়েছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রবাসী সরকারকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হয়েছিল। পররাষ্ট্রনীতির সফলতার ওপরই মুখ্যত স্বাধীনতা নির্ভর করছিল। এমনকি সামরিক সাফল্যও। পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ছাড়া সামরিক সাফল্যের প্রশ্ন খুবই জটিল হয়ে পড়ত। কারণ শুধু সামরিক সাফল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন অনেকটা দুরূহ ব্যাপার ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও এর সাফল্যের পেছনে ভারতের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য ছিল। সংগত কারণেই ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আর সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ৪টি কারণ চিহ্নিত করা যায়-১. চির শত্রু পাকিস্তানকে শায়েস্তা করা

২. আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নীতিগত মিল

৩. মানবিক কারণ

৪. পাকিস্তানের উগ্র এবং দায়িত্বহীন আচরণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য ইউরোপ আমেরিকার জনসমর্থন ও সরকারগুলোর সাহায্য খুবই জরুরি ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তার প্রথম পর্যায়ের এ কূটনীতিতে দারুণ সাফল্য দেখায়। খোন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এপ্রিলের শেষদিক থেকে প্রবাসী সরকার সংগঠিত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। এপ্রিল মাসের শেষদিক থেকে প্রবাসী সরকার বিশ্বের জনগন ও সরকারগুলোর সমর্থন লাভে নিরন্তর প্রচেষ্টা শুরু করে। বিশেষ প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সারা বিশ্বের প্রবাসী বাঙালিরা দেশে দেশে সভা সমাবেশ, জনসংযোগ ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু সংখ্যক রাজনীতিবিদকে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল করানো সম্ভব হয়। এসব অঞ্চলের জনগণ তাদের সরকারের ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের পক্ষ নেওয়ার জন্য। পত্র-পত্রিকাগুলো পাকিস্তানের কঠোর সমালোচনা শুরু করে। এমতাবস্থায় পশ্চিমা সরকারগুলো বেশ অসুবিধায় পড়ে যায় পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার ক্ষেত্রে। মুক্তিযুদ্ধের সফলতার জন্য প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধিরা বিশ্বের নানা দেশে বাংলাদেশের পক্ষে অবিরাম প্রচার প্রচারণা চালিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের সহনুভূতি আদায় করা সম্ভব হয়; দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো পশ্চিমা দেশ পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন থেকে বিরত হয়ে যায়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে পাকিস্তানকে নানা কারণে সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য দিচ্ছিল, তার-ই একাধিক সিনেটর-কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। এ ছিল বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা স্বচক্ষে দেখার জন্য পূর্ব

http://thejobstudy.com Go to Contents

পাকিস্তান এবং কলকাতার শরণার্থী শিবিরে আসেন। তিনি মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের হয়ে নিরন্তর লড়াই করেছেন। তার মতো আরো অনেক সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানের চাপের মুখে সিনেট-কংগ্রেসে পাকিস্তান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন সাব-কমিটিতে এ নিয়ে শুনানি হয়েছে। ফলে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তান নীতির ক্ষেত্রে অনেকটা সংযত হয়েছে।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে। বিচারপতি চৌধুরী প্রবাসী সরকারের নির্দেশ পেয়ে নিউইয়র্ক যান। সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। বেলমাণ্ট প্লাজা হোটেলে অফিস বানিয়ে নিরলসভাবে প্রতিনিধি দল কাজ শুরু করেন। তারা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে, বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে নিরলসভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র দফতর সহানুভূতিশীল অনুকূল সাড়া পেলেও মধ্য প্রাচ্যের দেশ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। পাকিস্তানের প্রতি অনুগত এ সকল রাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানিদের নারকীয় আচরণের বিরোধিতা করতেও আগ্রহী ছিল না। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বিদেশে পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। কূটনৈতিক ভাবে যা ছিল খুবই তৎপর্যপূর্ণ। প্রবাসী সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে কলকাতায় হোসেন আলী, ইরাকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবুল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত কূটনৈতিক এনায়েত করিম, সৈয়দ আনোয়ারুল করিম। এ. এম. এ মুহিত প্রমুখসহ আরো অনেক বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেন। কূটনীতিকদের একে একে দলত্যাগ পাকিস্তানের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এতে করে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো সহজ হয়। ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভারত সরকারের সমর্থন, সাহায্য এবং বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় রাখা। এক্ষেত্রে ভারতের ওপর প্রবাসী সরকারের চাপ ও কৌশল সফলই ছিল। বাংলাদেশের আহবানে সাড়া দিয়ে ভারত সরকার তার পররাষ্ট্রনীতিতে এমন কৌশল অবলম্বন করে যাতে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দাবির প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্টোবর নাগাদ বিশ্বব্যাপী এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বাংলাদেশের মানুষ যৌক্তিক স্বাধীনতার জন্য যৌক্তিকভাবেই লড়ছে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। প্রবাসী সরকার ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য শুরু থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্রমাগত ভারতের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল পাকিস্তানের ওপর দ্রুত ব্যবস্থা নিতে। বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রচারণা কূটনৈতিক তৎপরতার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী। ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের চুক্তির কারণে ভারতের সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং জাতিসংঘে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সোভিয়েত ভেটোর নিশ্চয়তা। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পাকিস্থান পশ্চিম ফ্রন্টের বিভিন্ন ভারতীয় বিমান বন্দরে হামলা চালালে ভারত প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক সফলতার যেটি ছিল চরম সাফল্য। যুদ্ধের শেষ দিকে প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা এবং বাংলাদেশের উদ্দেশ্য সফল করা। বহির্বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোকে ভারতই সামাল দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা ছিল তবে সহায়ক শক্তি হিসেবে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে ভূমিকা ছিল বিশ্ব জনমত গঠন, লবিং, সম্পর্কে স্বাধীনতার দাবী তুলে ধরা। ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী যখন বিজয়ের দ্বার প্রান্তে, তখন মার্কিনীরা সামরিক উপায়ে হলেও পাকিস্তান রক্ষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহবান করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য জাতিসংঘেও বাংলাদেশের পক্ষে অনমনীয় ছিল। ৪ ডিসেম্বর এবং ১৩ ডিসেম্বর দু দফা ভেটো দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব ভণ্ডুল করে দেয়। পাকিস্তানের মৃত্যু অনিবার্য এবং মার্কিন-চীন কূটনীতির ভরা-ডুবি হয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘে পাকিস্তানের পরাজয়ের সংবাদ দেন। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার শেষদিকে এ জটিল আন্তর্জাতিক ক্ষমতার লড়াইতে ভারতের পাশাপাশি যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছিল।

প্রবাসী সরকার যখন নিশ্চিত হলো, স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ জরুরি এবং এক প্রকার অনিবার্য। তখনই তারা ভারত সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতা এবং সম্ভাব্য দ্রুত ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতের স্যাড়া ছিল ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণেই স্বাধীনতার পর ভারতের পক্ষে দ্রুত সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। ভারতের সঙ্গে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং পরবর্তীতে তা কার্যকর হওয়া প্রবাসী সরকারের বড় কূটনৈতিক সাফল্য ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সফল ছিল স্বাধীন বাংলাদেশই তার প্রমাণ। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় প্রবাসী সরকার এক পত্রে বলেছিল বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ বিরোধি নীতি অনুসরন করবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের এ পররাষ্ট্রনীতি ছিল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় পথপ্রদর্শক। **সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR) কর্তৃক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটোর তালিকা :**

প্রস্তাবের ক্রমিক নম্বর	তারিখ	ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র	বিষয়
১১৬	০৪/১২/১৯৭১	সোভিয়েত ইউনিয়ন	ভারত-পাকিস্তান (বাংলাদেশ) যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব (Cease Fire)
১১৭	০৫/১২/১৯৭১	সোভিয়েত ইউনিয়ন	ভারত-পাকিস্তান (বাংলাদেশ) যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব (Cease Fire)
১১৮	১৩/১২/১৯৭১	সোভিয়েত ইউনিয়ন	ভারত-পাকিস্তান (বাংলাদেশ) যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব (Cease Fire)

১৩.১০ শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭২-১৯৭৫) (Sheikh Mujibur Rahman's Foreign Policy- 1972-1975)

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব ছিল অসামান্য। স্বাধীনতা লাভের পরপরই প্রবাসী সরকার দেশে ফিরে দেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে জোটনিরপেক্ষ এবং স্বাধীন কূটনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরেন ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তার সরকার যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছে তাতে তার ব্যক্তি অবস্থান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সদ্য স্বাধীন ক্ষুদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব পররাষ্ট্রনীতির জন্য অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের কাছে দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল (১) একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি আদায় এবং (২) অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কূটনীতির লক্ষ্য ছিল স্বীকৃতি ও সমর্থন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক সংকট প্রকট আকারে দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সংকট দূর করা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায় একসঙ্গে চলতে থাকে। মুজিব সরকার প্রথম দিকে কিছু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররাসহ অনেক দেশেরই তখনও স্বীকৃতি পাওয়া যায় নি। স্বীকৃতি আদায়ে প্রথম দিকের গতি সুখ থাকলেও পরবর্তীতে গতি বৃদ্ধি পায়। এতে করে একে একে অনেক দেশ ও সংগঠনের স্বীকৃতি মিলতে থাকে দ্রুত। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দেয়, ভুটান ৭ ডিসেম্বর, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ পোল্যান্ড (৬ষ্ঠ তম), পূর্ব জার্মানি, মোঙ্গলিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর স্বীকৃতি আসতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয় ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ । ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানির স্বীকৃতির মাধ্যমে

পশ্চিমা স্বীকৃতি শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় ৪ এপ্রিল, ১৯৭২। মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলিম দেশগুলো স্বীকৃতি দিতে শুরু করে সর্বপ্রথম ইরাক ৮ জুলাই, ১৯৭২ এবং মিসর স্বীকৃতি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশসহ ইউরোপ আমেরিকার প্রায় সকল দেশই ১৯৭২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পাকিস্তান ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুসলিম বিশ্বের বাকি দেশগুলোর স্বীকৃতি পাওয়া সহজ হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনেরও সদস্য পদ লাভে সক্ষম হয়। যদিও জাতিসংঘের সদস্যপদের লাভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চীনের ভেটোর কারণে প্রথমবার সদস্যপদ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করে চীনের অবস্থান বাংলাদেশের অনুকূলে আনা সম্ভব হয় ফলে চীন পরবর্তীতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদে আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের বিরোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়েছিল। দুটি পরস্পরবিরোধী দেশের দ্বন্দ্বের কারণে যাতে বাংলাদেশের সদস্য প্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে কূটনৈতিক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কূটনৈতিক উদ্যোগ ছিল ১৯৭২ সালের ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ তার অবস্থান নিশ্চিত এবং স্বীকৃতি আদায় কূটনীতির আওতায় ঐ চুক্তিটি করেছিল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা । ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল বাংলাদেশের আগ্রহে। দুটি কারণে হয়েছিল প্রথমত, বাংলাদেশ বিশ্বকে স্বাধীন স্বত্তার অস্তিত্ব জানান দিতে হয়েছিল, দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ভারতের সামরিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা লাভ। ১৯৭২ সালে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হয়। বাংলাদেশের জন্য চুক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সফরে গেলে তাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল তা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতর ক্ষেত্রে বড় সাফল্য। মার্চে ইন্দিরা গান্ধীও বাংলাদেশ সফরে আসেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুগপৎভাবে জটিল এবং সম্পর্কাতর ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম দিকের প্রায় দু'বছর দু'দেশের কোনো কূটনৈতিক যোগাযোগই ছিল না। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কূটওয়াল্ডহেম বাংলাদেশে আসেন। তার সঙ্গে আলোচনাতেও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধবন্দী বিনিময় ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশে আটক পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ মুসলিম বিশ্বের প্রচণ্ড চাপ ছিল বাংলাদেশের ওপর। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের অনুরোধ নিয়ে ওআইসি মহাসচিব তোহামী ৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে আসেন। তারপর আসেন কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওআইসি প্রতিনিধি দল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ওআইসিতে যোগদান করে। সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম দেশ যুদ্ধপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে বাংলাদেশে আটক পাকিস্তানি যুদ্ধপরাধীদের (১৯৫ জন) মুক্তি দিতে রাজি হয়। বাংলাদেশের কূটনীতির এটা ছিল একটি বড় ধরনের পরাজয়। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে আসলেও ৫ লক্ষ আটকে পড়া পাকিস্তানি ফেরত নেয়া বা সম্পদ বন্টনের বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি হয় নি।

১৯৭২ সালে পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সাহায্য ও স্বীকৃতি এনে দিতে পারে নি। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে এবং পশ্চিমাদের নিকট থেকে তা পেতে হলে পাকিস্তানের সঙ্গে একরকম সমঝোতা জরুরি ছিল। ফলে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে পরিমার্জন করতেই হয়েছে। পশ্চিমা ঘেষা ড. কামাল হোসেনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার তাজউদ্দিন সাহেব মন্ত্রিত্ব হারান। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন আওয়ামী লীগকে বিশেষ কোনো সুবিধা এনে দিতে পারে নি। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ পশ্চিমাদের দিকে সরে যাচ্ছিল। চোরাচালান, তারতের বড়ভাই সুলভ আচরণ, পানি সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা প্রভৃতি কারণে ভারতের সাথে সম্পর্কের দূরত্বও তৈরি হচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সলের মে মাসে শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সফরে যান এবং সেখানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে করে ভারতের সাথে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মেটাতেও সক্ষম হয়। গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়েও মুজিব আমলে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে

ভারতের সাথে । ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল ভারতের সাথে এ নিয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই মুখ্যত মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমাদের দিকে মুখ ফেরাতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বীকৃতি আদায়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতি অনুসরণ করছিল। ফলে পররাষ্ট্রনীতিতে পশ্চিমাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রবণতা শুরু হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমাদের সু-সম্পর্ক স্থাপনের কেন্দ্রস্থলে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘে ভাষণ দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ভারতে যান। ঐ সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সঙ্গে তার এক স্বল্পস্থায়ী বৈঠকও হয়। মার্কিনিদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। জাপানের সঙ্গে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেকটাই ফলপ্রসূ হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে শেখ মুজিব জাপান সফরে যান। যমুনা সেতু নিয়ে জাপান সরকারের সাথে নীতিগত সমঝোতা হয়। জাপান দ্রুত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী দেশে পরিণত হয়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জাপান নয় পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরা বাংলাদেশকে সাহায্য দানের জন্য গড়ে তোলে এইড টু বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য।

১৯৭২ সালে আফ্রো এশীয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণ হত্যার নিন্দা জানানো হয় এবং ঐ সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনে বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়। মূলত এ সংস্থার যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় বাংলাদেশের । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হবার সময় বাংলাদেশ মিসর, ইরাক, ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সমর্থন লাভ করে। বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো থেকে সাহায্য আসতে শুরু করে। এ অর্থ বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক অনটনের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। মুজিব সরকার বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এক জটিলতা নিয়ে আসেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে এসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি একটি সংকটে পড়ে যায়। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ, ওআইসি, কমনওয়েলথ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ প্রায় সবকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভে সক্ষম হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল অফিসার কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থমকে যায়। যার ফলশ্রুতিতে পররাষ্ট্রনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর খন্দকার মুশতাক ক্ষমতায় আসেন। খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় এসে দেশকে ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে আসেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হয়ে যায় এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পদ ভাগ এবং বিহারীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে দেন দরবারে আগ্রহী নয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য এটি ছিল বিরাট বিপর্যয়। কারণ বাংলাদেশ তখন ঐ দুটি অতি প্রয়োজনীয় দাবি আদায়ের বিষয় অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে ছিল । ক্রমেই বাংলাদেশ পশ্চিমা প্রভাবিত একটি দেশে পরিণত হয়। পররাষ্ট্রনীতিতে উল্টোধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।

মূল বক্তব্য (Key points)

১. ১৯৭২ সালে চীন ছাড়া বাকি ৪টি পরাশক্তিসহ অধিকাংশ দেশের স্বীকৃতি আদায়।
২. ১৯৭৪ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তজাতিক সংস্থা ওআইসি, কমনওয়েলথ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করা।
৩. ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটে।
৪. সোভিয়ত ইনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন।
৫. অর্থনৈতিক সাহায্যে প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।
৬. সেই সময়ের দক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রিচুক্তি, ভারত-বাংলা সিমান্ত চুক্তি, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
৭. জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনীতির কারণে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা বাংলাদেশকে সাহায্যদানের জন্য এইড টু বাংলাদেশ কনসোটিয়াম গড়ে তোলে।

১৩.১১ জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭৬-১৯৮১)(Ziaur Rahman's Foreign Policy)

শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর খোন্দকার মোশতাক তিন মাসের জন্য ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত) ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর ভেতর একাধিক ক্যু এবং পাল্টা ক্যু এর ফলশ্রুতিতে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অসীন হন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপের এক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। তবে তিনি খোন্দকার মোশতাকের পররাষ্ট্রনীতিরই পূর্ণতা দেন। জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হচ্ছে চীন ও পশ্চিমা পুঁজিবাদীদেশগুলোর সঙ্গে সু-সম্পর্ক। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ঘনিষ্ঠ করা এবং বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করা। এর বাইরে সব থেকে বড় নীতিটি ছিল অর্থনৈতিক কূটনীতি অনুসরণ । অর্থনৈতিক কূটনৈতিকের ক্ষেত্রে জিয়া সরকারও পূর্ববর্তী মুজিব সরকারের নীতিগত মিল ছিল। সেনা শাসন জারি এবং শেখ মুজিবের মত মহান ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুনভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। জিয়াউর রহমান ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশের ভাবমূর্তি উদ্ধার এবং সময়োপযোগী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের উদ্যোগ নেন। তার পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারত ও তার সমাজতান্ত্রিক মিত্রদের ব্যতিরেকে পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের দিকে ঝুঁকে যাওয়া। পরবর্তী সময়ের পররাষ্ট্রনীতিতে এবং চিন্তায় এর প্রতিফলন দেখা যায়। জিয়ার আমলে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল স্মরণকালের সর্বাপেক্ষা খারাপ। কিন্তু তারপরও ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, ক্ষমতা, জনসংখ্যা সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিয়া সরকারকে তাই ভারতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হয়েছিল। কারণ সব সময়ের জন্যই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক। জিয়ার শাসনামলে অন্তত তিনটি প্রধান সমস্যা ভারতের সঙ্গে বিরাজমান ছিল। এগুলো হচ্ছে গঙ্গার পানি বণ্টন, সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ। ১৯৭৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলের ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যাটির আন্তর্জাতিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। ১৯৭৬ সালের আগস্টে কলম্বোর জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনেও প্রশ্নটি তোলা হয়। কিন্তু এখানে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৩১ তম অধিবেশনে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিভিন্ন কূটনীতিতে আলোচনা এবং বাদ- প্রতিবাদের পর বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। যদিও ভারত এবং রাশিয়াসহ তার সমাজতান্ত্রিক মিত্ররা বিষয়টির তীব্র বিরোধিতা করেছিল। বাংলাদেশের মত একটি দুর্বল নবীন দেশের ভারতের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ছিল বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। ২০ নভেম্বর ১৯৭৬ জাতিসংঘ দু'দেশের ঐকমত্যের পরামর্শ দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ের অগ্রগতি জানাতে বলা হয় ৩২ তম অধিবেশনে ফারাক্কা প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাংলাদেশের পক্ষ নেয়া দেশের কূটনীতির জন্য

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে জিয়াউর রহমানের শাসনামল

- মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেন।
- সংবিধানের ২৫ (২) নং অনুচ্ছেদ সংযোজন করেন। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়- "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।" [N.B: ১৫তম সংশোধনীতে উপ অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়।
- সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তবে চীনের সাথেও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- গণতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা হয়।
- ১০ নভেম্বর ১৯৭৯: বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে।
- বাংলাদেশ ইরান ইরাক যুদ্ধের মধ্যস্থতা করে।
- ফারাক্কা সমস্যা আন্তর্জাতিক কোরামে উত্থাপন করা হয়।
- দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় করতে বাংলাদেশ 'সার্ক' প্রতিষ্ঠায় স্বপ্ন ছড়িয়ে দেয় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ গুলোর মাঝে।

বিরাট বিজয় ছিল। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করে মোরারজী দেশাই সরকার গঠন করেন। তার সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ফারাক্কা প্রশ্নে একটি চুক্তি হয়। পরে ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আরও যে সকল বড় সমস্যা ছিল তার মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সমস্যা। তালপট্টি সমস্যারও তেমন কোনো অগ্রগতি হয় নি দেশের বিরোধী দলগুলো জিয়া সরকারের তালপট্টি নিয়ে নতজানু নীতির জন্য সমালোচনা করেছিল। জিয়া সরকারের সময় একটি বড় দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ছিল চাকমা সমস্যা। ভারতীয় সরকার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চাকমা বিদ্রোহীদের নিয়মিত সাহায্য দিত। বাংলাদেশ ঐ সময় বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চালিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। তাঁর সময় মায়ানমার-বাংলাদেশ সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে হঠাৎ করে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। জুন মাসের মধ্যে প্রায় দু'লক্ষাধিক শরণার্থী এসে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশের পক্ষে এ বিপুল শরনার্থী সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাহায্য কামনা করলে ইউএনএইচসিআর এর মাধ্যমে সাহায্য আসতে থাকে। পরবর্তীতে দুই দেশের সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ১৯৭৮ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরুর কথা বলা হয়। যদিও এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। ১৯৭৯ সালের মে মাসে মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি নে উইন বাংলাদেশ সফরকালে ২৩ মে দু'দেশের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি হয়। দুই একটি ঘটনা ছাড়া বাংলাদেশ মায়ানমার সম্পর্ক ঐ সময় মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা বজায় ছিল। জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের জুলাইতে সৌদি আরব সফর করেন। যদিও প্রথমে সৌদি আরবে যাবার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাজনীতি। তার সফরের সঙ্গে এসব দেশের সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো দিন দিন বাংলাদেশের দিকে সাহায্যের হাত বেশি পরিমাণে প্রসারিত করছিল। মাধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনি সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছিল আরবদেশের একনিষ্ঠ সমর্থক। ওআইসিতে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। জিয়া সরকারের সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত অক্ষের বৈরীতা এবং পুঁজিবাদীদের সু-সম্পর্ক তার মধ্যপ্রাচ্য নীতির সহায়ক ছিল। মধ্যপ্রাচ্য সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজনই ছিল মুখ্য। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথাও জিয়া সরকার এক্ষেত্রে মনে রেখেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য জিয়া সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে মোশতাক সরকারের শুরু করা ঘনিষ্ঠতা বহাল রাখেন; ভারত-সোভিয়েত অক্ষ বিরোধি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা শুরু করা হয়। সংবিধানের মূল চারনীতি বদলে ফেলা হয়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর প্রতি অসীম আস্থা সংবিধানে জুড়ে দেওয়া হয়। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যোগ করা হয়। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে যেখানে দেশের বিদেশনীতির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেখানে নতুন ধারা যোগ করা হয় মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ লাভবান হয়েছিল। বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৮ সালে ডাকারের ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন থেকে বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন পায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য। বাংলাদেশ আলকুদস কমিটির সদস্যপদ ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের স্থায়ী সদস্যপদ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য গঠিত ওআইসি প্রতিনিধি দলের সদস্যপদ প্রভৃতি লাভ করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে জিয়া সরকারের নীতি ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সমীকরণ জিয়া সরকারের আমলের। প্রয়োজনে বাংলাদেশ চীন ও সোভিয়েত পক্ষের ভেতর অধিকতর পশ্চিমাঘেষা ভারত বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনকে বেছে নিয়েছিল। এর পেছনে পরিষ্কার দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সামরিক সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও নিরাপত্তা আন্তর্জাতিকভাবে নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক রাজনীতিতে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা পাওয়ার ব্যালেন্সের প্রয়াস এবং দেশের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহের সুযোগ নিশ্চিত করা। চীনের সঙ্গে সু-সম্পর্ক পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কের অনুকূল ছিল। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের

http://thejobstudy.com
Go to Contents

কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছিল। জিয়া সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পাশাপাশি জিয়া সরকারের স্বীকৃতি দেশের নিরাপত্তা প্রভৃতি কারণেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সমান্তরাল। বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ (NPT) চুক্তি স্বাক্ষর করে জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে।

দঃ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিকে সংগঠিত করতে জিয়া সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। জিয়াউর রহমান দঃ এশিয়ায় একটি আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে সার্ক গঠন করার উদ্যোগ নেন। তার উদ্যোগের সফলতা আসে ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর সার্কের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের মাধ্যমে। জিয়া সরকারের সময় বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন ছিল নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়া। ১৯৭৮ সালের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে ঐ পদে আসীন হয়। একটি নবীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এটি অনেক বড় অর্জন। জিয়া সরকারের মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমা কূটনীতি বহুলাংশে সফল থাকলেও ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপক শীতলতা লক্ষ করা যায়। আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের সাথে সাথে ভারতের সমস্যাগুলোর সমাধান এ সময় অগ্রগতি খুব সামান্যই লক্ষ করা যায়। ভারতের সাথে সম্পর্ক শীতল থাকলেও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৯৭৭ সালের ২১-২৩ ডিসেম্বর ২ দিন ব্যাপী পাকিস্তান সফরের মাধ্যমে জিয়া সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সেনা শাসক জিয়াউল হক সরকারের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত তা বহাল ছিল। সম্পদ ভাগাভাগি আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যার্পণ প্রভৃতি বিষয়ের কোনো সমাধান জিয়া সরকার করতে পারেন নি। যা ছিল পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গতানুগতিক তবে অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমুখী কূটনীতির ক্ষেত্রে তার সফলতা ব্যাপক বলা যায়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে তিন মাসের ভেতর তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। সাত্তার সরকার জিয়ার নীতিতেই চলছিলেন। তিনি উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু করতে পারেন নি।

মনে রাখার Technique & Tips

এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-৯০)

- তিনিই সর্বপ্রথম প্রথম বিশ্ব ও দ্বিতীয় বিশ্বের সাথে একই সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় সফল হন।
- ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫: ঢাকায় ৭ জাতির 'সার্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনে (১৯৮৬) সভাপতিত্ব করে।
- সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশ 'ফিলিস্তিনি'কে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সভাপতির আসন লাভ।

মূল বক্তব্য (Key points)

জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল- ৩টি যথা :

ক. মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বাড়ানো।
খ. চীনের সাথে এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করা।
গ. আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মহলে কাজ করা। এছাড়াও-

১. ১৯৭৭ সালে ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদন।
২. ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান এবং মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি নে উইন এর মধ্যে দুইটি চুক্তি হয় একটি সীমানা চিহ্নিতকরণ, দ্বিতীয় রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সমাধান হয়।
৩. গণতান্ত্রিক বিশ্ব ও ইসলামি দুনিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ।
৪. যুক্তরাষ্ট্রসহ চীন, জাপান, সৌদি আরব প্রভৃতি বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৫. জাতিসংঘ, ওআইসি ও অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় কার্যকর ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হওয়া।

৬. ইরাক-ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন ও প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান।

৭. বাংলাদেশের সফল কূটনীতির স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকায় আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (IIT) ও সিরডাপের সদর দপ্তর স্থাপন।

৮. দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিত সংস্থা (সার্ক) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

১৩.১২ হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৮২-১৯৯০) (Foreign Policy in Regime)

বাংলাদেশের তৎকালীন সেনাপ্রধান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি অবিলম্বে সামরিক প্রধানের পদ থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেন। এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি মূলত জিয়াউর রহমান অনুসৃত নীতিরই প্রতিফলন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় যদিও একটু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কারণ তার পূর্বসূরি জিয়ার আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এরশাদের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো বা সমীকরণ আগেই তৈরি হয়েছিল। জিয়া-মুজিব আমলে অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর জিয়ার সময়ে পররাষ্ট্রনীতির যে নীতি লক্ষ্য অনুসৃত হয় তা ততদিনে স্থায়ী পররাষ্ট্রনীতিতে রূপ নিয়েছে। এরশাদ ঐ নীতিতেই অগ্রসর হয়েছেন। তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার প্রক্রিয়াতে। এজন্য ক্ষমতা দখলের পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য তিনি ভারতকে বেছে নেন। কিন্তু বাংলাদেশের মূল পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভারতের প্রতি নীতির যথেষ্ট স্ব-বিরোধিতা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভেতর চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিষয় ছিল। শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক নীতিটি এমন ছিল যে, তা বহাল রেখে ভারতের সঙ্গে সু-সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন ছিল। ভারত ছিল সোভিয়েতজোটে, বাংলাদেশ ছিল মার্কিনজোটে। সুতরাং এরশাদ ভারতের সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক রক্ষায় সক্ষম হলেও দু'দেশের ভেতর বিদ্যমান সমস্যাগুলোর একটিরও জট খুলতে সক্ষম হন নি। ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল, সীমান্ত বিরোধের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যাও পূর্বের ন্যায় এরশাদের সময়ও বহাল ছিল। ভারতের সঙ্গে এরশাদের সময় অর্থনৈতিক যোগাযোগ বেড়েছিল অনেক। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে এরশাদ সরকারের সম্পর্ক জিয়া সরকারের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছিল। তবে ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ফিলিস্তিনি সমস্যা, আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বেশ কৌশলী হতে হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষপাতিত্ব ছিল ইরাকের দিকে, ফিলিস্তিনি প্রশ্নে বাংলাদেশের সমর্থন বরাবরই আরবের পক্ষে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব ঘটার পর স্বভাবতই বাংলাদেশ এর জোরালো প্রতিবাদ জানায়। জাতিসংঘেও বাংলাদেশ আফগানদের পক্ষে অবস্থান নেয়। সৌদি আরবের সঙ্গে এরশাদ সরকার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অর্থাৎ আরও বেশি সাহায্য লাভ। সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। তবে সৌদি রাজপরিবারের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশি সৈন্য নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোর নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যথাযথ স্বাভাবিকই ছিল। বাংলাদেশের জন্য গঠিত এইউ কনসোটিয়াম ও তার দায়িত্ব পালন করেছে সাব-লীলভাবে। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করে ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। ফলে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিনীদের সাহায্যের হাত পুরো এরশাদের সময়কাল ধরে সম্প্রসারিত ছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এরশাদের সময় ছিল জিয়া সরকারের অনুরূপ।

চীনের প্রতি ছিল পক্ষপাতিত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বৈরিতা। বাংলাদেশ জাতীয়স্বার্থ এবং নিরাপত্তার জন্য চীনের পক্ষ নিয়েছিল। অন্যদিকে চীন ও আধুনিক রাজনীতিতে ভারত-সোভিয়েত বিরোধী মিত্র পেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভেতর চীনকে বেছে নেওয়া মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার অনুকূল ছিল। বাংলাদেশ, চীন, তাইওয়ান, ফরমুলা পর্যন্ত সমর্থন করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পরস্পরকে সমর্থন দান এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে একমত পোষণ করায় দেশ দুটির ভেতর এক ধরনের পরস্পর নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন বাংলাদেশকে একটি সাহায্য দানকারী দেশ। সামরিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ চীনের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। চীন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় সামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহকারী দেশ হিসেবে আশির দশকে আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কৌশলগত কারণে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে চীনকে প্রাধান্য দিতে হয়েছিল। এরশাদ আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর। তখন ঢাকায় সোভিয়েত সংস্কৃতিক কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৪ জন সোভিয়েত কূটনৈতিককে বাংলাদেশ অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এরশাদের শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক তেমন স্বাভাবিক ছিল না।

এরশাদের শাসনামলে অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে। প্রথমত, ঢাকায় ইসলামি সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক, দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নেতৃত্বে সার্ক গঠিত হওয়া এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশের প্রতিনিধি জাতিসংঘের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ইসলামি সম্মেলন সংস্থার ১৪তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ সরকার এবং বাংলাদেশের এটা ছিল বড় ধরনের সাফল্য। সম্মেলনে বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্বের সাথে বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয় এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার সাত জাতি বৈঠকের মাধ্যমে সার্ক আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। সার্কের যাত্রা শুরু বাংলাদেশের জন্য বিশেষ কূটনৈতিক সফলতা। এরশাদের সময় অন্য একটি বড় অর্জন ছিল তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতিসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া। এটি ছিল এরশাদের সময়ে অন্যতম বড় কূটনৈতিক সাফল্য।

মূল বক্তব্য (Key points)

১. ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্সসহ ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে EU থেকে GSP লাভ করা সম্ভব হয়।

২. মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে উষ্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

৩. ফিলিস্তিন ও বর্ণবাদ সমস্যা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির সমর্থন।

৪. একই সাথে সোভিয়েত, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৫. ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের জন্ম লাভ।

৬. ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সভাপতির আসন লাভ এবং

৭. ইরাক-কুয়েত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দান ও তাদের পক্ষে সৈন্য প্রেরণের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩.১৩ বেগম খালেদা জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি (১৯৯১-১৯৯৫) (Foreign Policy Khaleda Zia Regime)

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে। ১৯৯১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন.পি) ক্ষমতায় আসে। খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে তার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনটি মূলনীতির কথা বলেন। প্রথমত, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মুসলিম উম্মার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং তৃতীয়ত, দেশের প্রয়োজনে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। খালেজা জিয়া পররাষ্ট্রনীতির তেমন কোনো পরিবর্তন না করে জিয়া অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিই অনুসরণ করতে থাকে। ফলে তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায় নি। গতানুগতিক ধারায় পরিচালিত হয়েছে পররাষ্ট্রনীতি। মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকেছে। ভারত এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অনেকটা শীতল। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে খালেদার জিয়ার পররাষ্ট্রনীতি ছিল সফল ভারতের সঙ্গে এক ধরণের সহাবস্থানের নীতি খালেদা সরকার বহাল রেখেছিলে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলোর কোনো সমাধানে ঐ সময় খালেদার সরকার করতে পারে নি। বিশেষ করে ফারাক্কা সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, উপজাতীয় সমস্যাসহ বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। ফারাক্কা সমস্যা দ্বি-পাক্ষিকভাবে সমঝোতা না হওয়ায় খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর জাতিসংঘের ৪৮তম অধিবেশনে তার বক্তৃতায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের ঐ আবেদন বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নি। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল উপজাতীয় সমস্যা। খালেদা জিয়া সরকারের আমলে বাংলাদেশ-ভারত এবং শান্তিবাহিনী ঐ ত্রিপাক্ষীয় আলোচনার সমস্যা সমাধানে বেশ অগ্রগতি হয়। তবে স্থায়ী সমাধান হয় নি। নতুন সমস্যা তৈরি হয় সীমান্তে ভারত কর্তৃক পুশব্যাক ও কাটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে। তবে একটি বড় অগ্রগতি হয়েছিল সে সময় তিন বিঘা করিডোর উন্মুক্ত করে দেয়ায়। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিএনপি আমলে বিশেষ কোনো উত্থান-পতনের শিকার হয় নি। মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সৈন্যদের অবস্থান বহাল ছিল খালেদা জিয়ার আমল জুড়ে। ফিলিস্তিনি সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তার অকুণ্ঠ সমর্থন ফিলিস্তিনীদের প্রতি বহাল রেখেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে পর্যাপ্ত জনশক্তি রপ্তানী বহাল ছিল।

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জিয়ার আমলের মতই সাবলীল ছিল। পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের বিভিন্ন সাহায্য এবং বাংলাদেশের জন্য গঠিত এইড কনসোর্টিয়ামের সাহায্য মিলিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ খালেদা সরকার পেয়েছিল নিয়মিত। পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় ছিল পুরো শাসনামল। বাংলাদেশের অন্যতম দাতা দেশ জাপানের সাথেও ভাল সম্পর্ক বজায় ছিল। বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা অব্যাহত রেখেছিলেন। খালেদা সরকারের সময় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের তেমন ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে খালেদা জিয়া এক্ষেত্রে এরশাদের তুলনায় কিছুটা সামনে এগোতে পেরেছিলেন। চীনের সঙ্গে চিরাচরিত সম্পর্কটা বহাল ছিল। নিকট প্রতিবেশীদের ভেতর খালেদা জিয়ার আমলে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক হঠাৎ করেই ঘটেছিল-রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এমনকি যুদ্ধাবস্থারও সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর ঘটে নি। দু'দেশের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান হয়। প্রতিবেশীদের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের তেমন পরিবর্তন হয় নি। পূর্বের মত খালেদা জিয়ার আমলেও বাংলাদেশের প্রাপ্ত সম্পদ বা আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফেরতের বিষয়ে বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয় নি। বাকিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক। খালেদা জিয়ার আমলে দাতা দেশের সরকার বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ফোরামের দক্ষ কূটনীতির স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে হারারে এবং ১৯৯৩ এর অক্টোবরে সাইপ্রাসে ১১ ও ১২তম কমনওয়েলথ সম্মেলনে বাংলাদেশ ভালো ভূমিকা রাখে। খালেদা জিয়া তার শাসনামলে তিনবার জাতিসংঘ সম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দেন। বাংলাদেশের দিক থেকে এটি ইতিবাচক কূটনীতি ছিল। ১৯৯৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে

http://thejobstudy.com Go to Contents

পরের বছরের জন্য সংস্থা দুটির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। অর্থনৈতিক কূটনীতির দিক থেকে বিচার করলে এটি বড় ধরণের সাফল্য ছিল। ১৯৯৩ সালে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১০ এবং ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দু'বছর পিছিয়ে সম্মেলনই অনিশ্চিত-হয়ে পড়ে ছিল। খালেদা জিয়া সার্কের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে সার্ককে গতিশীল করেন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতির মূল অর্জন ছিল অর্থনৈতিক কূটনীতি। অর্থনৈতিক কূটনীতির ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়।

মূল বক্তব্য (Key points)

১. জিয়াউর রহমানের আমলে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির কৌশল অব্যাহত রাখার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার।
২. দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কূটনীতি গ্রহণ।
৩. দুর্বল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেন্দ্র করে মিয়ানমারের সাথে সীমন্ত সংঘর্ষ ও উত্তেজনা দেখা দিলেও কৌশলে উসকানিমূলক সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়ানো।
৫. ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ। প্রথম দিকে ভারতের সদিচ্ছার কারণে তিনবিঘা করিডোর সমস্যার সমাধান
৬. সাপটা প্রবর্তনের উদ্যোগ ও সফলতা লাভ।

মনে রাখার Technique & Tips

শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬-২০০১; ২০০৯-বর্তমান):
- পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- BIMSTEC (১৯৯৭), উন্নয়ন ত্রিভুজ ও উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠিত হয়।
- ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯: 'বাংলা ভাষার সম্মানে ২১শে ফেব্রুয়ারি' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ D-8 এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।
- মিয়ানমার, জাপান, স্কান্ডেনেভিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দেশ সমূহের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে।

১.১৪ শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি (১৯৯৬-২০০১)(Foreign Policy in Sheikh Hasina Regime)

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। আওয়ামীলীগ নীতিগতভাবে তার পূর্বসুরী অন্য সরকারগুলোর তুলনায় ভিন্ন আদর্শের দল। সময় এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কারণে আওয়ামীলীগ সরকার তার বিদেশনীতি মুজিব সরকারের অনুরূপ করতে পারে নি। বরং মুজিব পরবর্তী সরকারগুলোর বিদেশনীতির সঙ্গেই তার মিল ছিল বেশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং এককেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার কোনো বিকল্প ছিল না। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখা জরুরি ছিল। উদীয়মান পরাশক্তি চীন বাংলাদেশের অন্যতম সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী। তাকে ইচ্ছে করলেই পাশ কাটানো সম্ভব ছিল না। প্রতিবেশী ভারতের সাথে ৭৫ সালের পর থেকেই সম্পর্ক শীতল চলে আসছিল। হাসিনা সরকার এ বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগই ছিল পররাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক পরিবর্তন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার নিকট থেকে সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দুটি পরিবর্তন ছাড়া আওয়ামীলীগকে তার বিপরীত ধর্মী আদর্শের পূর্বসুরীদের পথ-ই অনুসরণ করতে হয়েছে। ভারতের সাথে সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক না থাকায় ৭৫ সালের পর থেকে ৯৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত তথা আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাগুলোর তেমন কোনো অগ্রগতি ছিল না। সরকার গঠনের পর ভারতের সঙ্গে উচ্চ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিবদমান সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয় আওয়ামী লীগ। তাদের এ নীতি সময়োপযোগী এবং ইতিবাচক ছিল। বাংলাদেশ পানি সমস্যা, চাকমা সমস্যা, সীমান্ত চিহ্নিত করণ

সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন সংকটের মধ্যে ছিল। এসব সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ বড় ধরণের সাফল্য দেখাতে পেরে তাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মাইলফলক তৈরি হয়েছে। ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে অগ্রসর হতে থাকে। এক্ষেত্রে তারা প্রধান দুটি সমস্যা গঙ্গার পানি বণ্টন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহ সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শেখ হাসিনার ভারত সফরের শেষ পর্যায়ে ১২ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় এবং শেখ হাসিনা কাঙ্ক্ষিত পানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি পানি বণ্টন সমস্যার একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধান ঘটাতে সক্ষম হয়। অন্য যে বড় সমস্যাটি আওয়ামী লীগ সরকার দূর করতে সক্ষম হয়েছিল তা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় সমস্যা। ক্ষমতাসীন হয়েই আওয়ামী লীগ সমাধানের উদ্যোগ নেয়। চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যা সমাধান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল। তা ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থে সমস্যাটির দ্রুত নিষ্পত্তি জরুরি ছিল। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময়ে ৭ দফা আলোচনার পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং শান্তি বাহিনীর ভেতর চুক্তি হয়। ১৯৯৭ সালে চুক্তি সম্পাদিত হবার পর উপজাতীয় বিদ্রোহীরা যেমন অস্ত্র সমর্পন করে, তেমনি সকল উদ্বাস্তু দেশে ফিরে আসে। বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার যবনিকাপাত ঘটে। উপজাতীয় সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারা আওয়ামীলীগ সরকারের জন্য অত্যন্ত বড় কূটনৈতিক সাফল্য ছিল। এ দুটি সমস্যা সমাধান হলেও ভারতের সাথে আরো অনেক দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা রয়েই গিয়েছিল।

এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সীমান্ত সমস্যা, চোরাচালান সমস্যা, দু'দেশের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি যা ছিল বাংলাদেশের প্রতিকূলে। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগ সরকার তার পূর্বসুরিদের পথ অনুসরণ করেছে। সামরিক এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে চীনের সাথে সম্পর্ক পূর্বের মতো বহাল ছিল। হাসিনা সরকার এ পর্যায়ে একটি ব্যতিক্রম দেখাতে পেরেছিলেন ভারত ও তার পূর্ব ইউরোপের মিত্রদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক এবং চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একই সঙ্গে বহাল রাখা স্বাধীনতার পর এমনটি আর কখনো সম্ভব হয় নি। সব সরকারকেই চীন ও পশ্চিমা বিশ্ব অথবা ভারত ও তার পূর্ব ইউরোপের মিত্রদের যে কোনো এক পক্ষকে বেছে নিতে হত। আওয়ামীলীগ সরকারকে সেটি করতে হয় নি। এটি আওয়ামীলীগের কূটনৈতিক সফলতা ছিল অনেক বেশি। চীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সু-সম্পর্ক এবং সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের নীতি বহালে রেখে আওয়ামী লীগ সরকার অস্ত্র সংগ্রহের নতুন উৎসের দিকে ঝুঁকে যায়। এটিকে পররাষ্ট্রনীতির নতুন মেরুকরণ না বলা গেলেও নতুনত্বের ইঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘদিনের শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে শেখ হাসিনার সরকার রাশিয়ার নিকট থেকে বিমান বাহিনীর জন্য বহুল আলোচিত ৮টি মিগ-২৯ ক্রয় করে। উত্তর কোরিয়ার নিকট থেকে ক্রয় করে নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ তার সমরাস্ত্রের জন্য মুখ্যত চীন এবং আংশিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যকোন সূত্রের কথা তারা বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে চিন্তাই করতে পারত না। শেখ হাসিনার সরকার পরিবর্তিত বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভিন্ন চিন্তার সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতায় হাসিনা সরকার ৭৫ পরবর্তীতে তৈরী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হলেও তারা যে নীতি ও আদর্শের দিক থেকে পূর্বসূরীদের চেয়েও ভিন্ন তা প্রমাণ হয়ে যায় পশ্চিমা বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্য চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর রাখার পাশাপাশি ভারত, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন, নিরাপত্তা, বিশ্ব-রাজনীতিসহ নানা কারণে ৭৫ সালের পর পশ্চিমা ঘেষা পররাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসে বাস্তব কারণেই ঐ নীতি থেকে সরে আসে নি। তবে এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকার পশ্চিমা বিশ্বের পাশাপাশি তার পুরনো বন্ধু বিশেষ করে ভারতসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দেশগুলোর সাথে পুনরায় ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। ফলে বাংলাদেশের সামনে পররাষ্ট্রনীতির একটি নতুন কৌশল উন্মোচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এবং তার মিত্রদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ১৯৭৫ সালের পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই ভাল। শেখ হাসিনার আমলেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন, এককেন্দ্রিক বিশ্বে দেশের নিরাপত্তা, বিশ্ব রাজনীতিতে দেশের স্বার্থ সবকিছু মিলিয়ে পশ্চিমা ঘেষা নীতি অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার সরকার সেই পথেই

হেঁটেছে। জাপান বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের নিকটতম সাহায্যকারী এবং উন্নয়ন মিত্র। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই জাপান সফর করেন। তার সময়কালে জাপানের সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতা হয়। জাপান ছাড়াও অন্য পুঁজিবাদী মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল সে সময়। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের ৫১তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের সঙ্গেও স্বাক্ষাৎ করেন। এতে বাংলাদেশ মার্কিন সম্পর্ক যেমন ভাল হয়, তেমনি নতুন সরকারের নিকট মার্কিনীদের প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক সুদৃঢ়ই ছিল। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত নিদর্শণ হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ২০০০ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসেন। বাংলাদেশে তার সফর ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর নিঃসন্দেহে শেখ হাসিনার সরকারের কূটনৈতিক সফলতার নিদর্শণ। বিশেষ করে রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া থেকে অস্ত্র ক্রয়ের প্রেক্ষাপটে ঐ সফর দক্ষ কূটনীতির স্বাক্ষ্য বহণ করে। শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে বাংলাদেশে জ্বালানিখাতে প্রচুর মার্কিন বিনিয়োগ হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের তথা মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে শেখ হাসিনার সরকারের তার পূর্বসূত্র নীতিই বহাল রাখেন। দুপক্ষের সম্পর্ক ছিল স্থিতিশীল। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তানে সেনা শাসন জারির পর। এছাড়া দু'দেশের সম্পদ ভাগ এবং আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসন নিয়ে জটিলতার কোনো অগ্রগতি হয় নি। বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। বিভিন্নস্থানে জাতিসংঘের শান্তি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করার নীতি বহাল রেখেছে। সোচ্চারভাবে বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিমসটেক, ডি-৮ জোট গঠনে অংশগ্রহণ বিশ্ব ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান ও বাংলাদেশকে পরবর্তী সম্মেলন স্থল হিসেবে স্বীকৃতি আদায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক পর পর কয়েকটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর উত্তেজনা হ্রাসে শেখ হাসিনা ঐ বছরের মে মাসে দেশ দুটোর রাজধানী সফর করে কিছুটা হলেও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। শেখ হাসিনার সময় সীমায় বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে সিটিবিটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাদৃত হয়। এ সময় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত 'সোফা' চুক্তি (স্ট্যাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট) প্রত্যাখ্যান করলেও 'হানা' চুক্তি (স্ট্যাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষর করেন ১৯৯৮ সালের ২৯ জুলাই। এ সময়ে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। এতকিছু অর্জনের পরও শেখ হাসিনার সরকারের কিছু কূটনৈতিক ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের প্রার্থীর কমনওয়েলথ মহাসচিব পদে তরাডুবি কূটনৈতিক অদক্ষতার পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। মানবাধিকার রিপোর্টের বিতর্ক মন্তব্য এবং শাসনামলের শেষদিকে ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে বিশ্বের শীর্ষ দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াটা শেখ হাসিনার সরকারের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষুন্ন করেছে। মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে কুয়েত ও কাতারে জনসম্পদ রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করতে না পারা শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক কূটনীতির ব্যর্থতা হিসেবে মনে করা হয়।

মূল বক্তব্য (Key points)

১. ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের মাধ্যমে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচনে জাপানের পরিবর্তে ভারতকে ভোট প্রদান।
২. ডি-৮, বিমসটেক, উপ-আঞ্চলিক জোট, উন্নয়ন ত্রিভুজ প্রভৃতি অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কূটনীতির সফল প্রয়োগের প্রচেষ্টা।
৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, কোরিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগ গ্রহণ।
৪. মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর।
৫. ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তি সম্পাদন।
৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

৭. দ্বিতীয়বারের মতো জাতিসংঘের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচিত হওয়া। এবং
৮. একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মান লাভ।

১৩.১৫ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শাসনামল (২০০১-২০০৬) (Foreign Policy in Khaledazia Regime)

২০০১ সালে খালেদা জিয়া পুনরায় দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সরকার গঠন করে। যদিও খালেদা জিয়ার দল বি.এন.পি ছাড়া জামায়াত ইসলামসহ কয়েকটি মুসলিম সংগঠনের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে। ফলে সে সময়ে খালেদা জিয়ার সরকারকে জোট সরকার বলা হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার এ মেয়াদে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর তা হচ্ছে পূর্বমুখি পররাষ্ট্রনীতি। যদিও অন্য ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতিতে তার পূর্ববর্তী নীতিগুলোই প্রাধান্য পায়। পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাদেশের পূর্বের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। কারণ এতদিন পূর্বের দেশগুলোতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি উপেক্ষিত ছিল। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের উন্নয়নের জন্য পূর্বমুখী নীতি ছিল সময়োপযোগী। পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, থাইল্যান্ড সহ অনেক দেশ। এ অঞ্চলে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী অধিষ্ঠিত বাজার। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারে রয়েছে পর্যাপ্ত তেল, গ্যাস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাজনা ও কৃষিজ সম্পদের মজুদ। পূর্ব এশিয়ায় রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম আঞ্চলিক জোট ASEAN (আসিয়ান) এ অঞ্চলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুললে তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য একটাই তা হচ্ছে আসিয়ান বাজারে প্রবেশ করা। জোট সরকারের আমলে এ লক্ষেই বাংলাদেশ আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম বা ARF এর সদস্যপদ অর্জন করেছিল। নিয়ম অনুযায়ী আসিয়ান এর সরাসরি সদস্য হওয়া যায় না। সদস্যপদ পেতে হলে প্রথমে এআর এফ এর সদস্য হতে হবে। এরপর ডায়ালগ পার্টনার তারপর সদস্যপ্রাপ্তি। জোট সরকারের আমলে এ. আর. এফ এর সদস্য প্রাপ্তি ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বড় সাফল্য। বিশ্বের বৃহত্তম জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এ অঞ্চলে রয়েছে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন, এবং তৃতীয় বৃহত্তম পরাশক্তি জাপানসহ উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। কেননা মিয়ানমারে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে তা সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এবং চীন সফর করে বেশ কিছু চুক্তি সই করেন। যা বাংলাদেশের পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। জোট সরকারের সময় ভারতের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাগুলোর কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। বিশেষ করে সীমান্ত সমস্যা, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ব্যার্থতা ছিল উল্লেখ করার মতো। বরং জোট সরকারের সময় ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যায় পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্র নীতি নির্ধারণী শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের গতির মাত্রা একটু অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। চীনের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় ছিল।

মূল বক্তব্য (Key points)

ক. পূর্বমুখী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাচ্য বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ ও এসব দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
খ. মার্কিন নীতির প্রতি প্রব্যাহত সমর্থন প্রদান।
গ. বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক বৈদেশিক বিনিয়োগ আনয়ন।
ঘ. প্রতিবেশী ভারতের সাথে একটি কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা নেয়া।

ঙ. পূর্বের সরকারের তুলনায় মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে জোরদর্শে প্রচেষ্টা গ্রহণ।
চ. সার্ক, কমনওয়েলথ, ওআইসি, ন্যাম, জি-৭৭ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন।
ছ. পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন ও প্রথম কোনো পাকিস্তানি নেতা হিসেবে ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের গভীর দুঃখ প্রকাশ।

১৩.১৬ ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদের পররাষ্ট্রনীতি (২০০৭-২০০৮)

২০০৭ সালে বাংলাদেশে ব্যপক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যদিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের সমঝোতার ভিত্তিতে ফখরুদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ফখরুদ্দিন আহম্মেদ সরকার পররাষ্ট্রনীতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আনেন নি বরং পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অনুসরণ করে গেছেন। বিশেষ করে জোট সরকারের আমলে অনুসৃত পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। তবে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা- কোলকাতা রেল চলাচল চালুর ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর পরীক্ষামূলক ট্রেনও চালু হয়। সরকার প্রধান হিসেবে ফখরুদ্দীন আহম্মেদ ২০০৭ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০০৭ এর সেপ্টেম্বর সাফটা চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ থেকে ৬০ লাখ পিস শার্ট আমদানি করার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নি। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় বিমসটেক এর ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটির বৈঠক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি গুরুত্বপূর্ণ-সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ কর্তৃক আন্তঃএশীয় রেল যোগাযোগ চুক্তিতে স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত। এর ফলে এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ বাড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব, চীন, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য সহ মুসলিম বিশ্বগুলো, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দেশগুলোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্পর্ক ছিল অপরিবর্তনীয়। নীতিগতভাবে রুটিন ওয়াকই ছিল তাদের কাজের অংশে। এসকাপ সূত্রে জানা যায়, আন্তঃএশীয় রেল যোগাযোগ চুক্তিটি কার্যকর হলে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ও তুরস্ক পর্যন্ত ট্রেন সংযোগ গড়ে উঠবে। তবে এ সময়ে অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া লক্ষ্য করা যায়। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স ব্যাংকিংএ ২০০৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫ ধাপ নিচে নেমে যায় পূর্ববর্তী বছর থেকে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ১৩১টি দেশের মধ্যে ১০৭তম স্থান এবং ২০০৬ সালে ১২৫টি দেশের মধ্যে ৯২তম স্থান অর্জন করে। অপরদিকে বিজনেস কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স বাংলাদেশ ১৯ ধাপ নিচে নেমে ১৩১টি দেশের মাপে ১১৮তম হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফলতার পাল্লা খুব বেশি ভারি ছিল না। তবে এখন মনে রাখতে হবে তত্ত্বাবধায় সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার। এ সরকারের পক্ষে নীতিগতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়বদ্ধতা থেকে তত্ত্বাবধায় সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সরকারের সফলতাগুলো পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার অবশ্যই মূল্যায়ন করবে। যদিও পররাষ্ট্রনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনে নি। তাদের দুই বছরের শাসনামলে ছিল শুধু মাত্র পূর্ববর্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। নীতিগতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের না থাকায় পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বিষয়বস্তুতে গুনগত তেমন কোনো পরিবর্তন আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১৪.১৭ বর্তমান শেখ হাসিনা বা মহাজোট সরকারের পররাষ্ট্রনীতি (২০০৯-বর্তমান)(Foreign Policy in Sheikh Hasina Regime)

২০০৯ সালের শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে তাদের অনুসৃত পূর্ববর্তী

পররাষ্ট্রনীতির পথেই হাটতে থাকে। অর্থাৎ জোট সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ভারতসহ রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন মিত্রদেশ-গুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাবিশ্ব, চীন, জাপানসহ মধ্যপ্রাচ্যের সাথে পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় কম ছিল না। জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফোরামে শেখ হাসিনাকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় দেখা যায়; বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যুক্ত থেকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রের মডেল উপস্থাপন পররাষ্ট্রনীতির আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভারতের সাথে অমিমাংসিত সমস্যাগুলোর সুষ্ঠ সমাধানের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা ২০১০ সলের ১১ জানুয়ারি দিল্লি সফর করেন। সেখানে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ৫০ দফা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণায় সন্ত্রাস দমন, ট্রানজিট, সীমান্ত বিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় পানি বণ্টন, বাণিজ্য বৈষম্য বিলোপ ও বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের রেল, সড়কসহ যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নদী পুনঃখনন প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় ঋণ সহায়তার আওতায় ভারত সরকার কর্তৃক ১০০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। এ ঋণ বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, রেলের ইঞ্জিন, বগি, রেলওয়ে কারখানা সংস্কার, পাশাপাশি বাকি ৮০ কোটি ডলার ঋণের সুদের হার কমিয়ে ১.৭৫% থেকে ১% করা হয়েছে। এছাড়া এ ঋণের অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৮৫% যন্ত্রাংশ ভারত থেকে আনার শর্ত ছিল তাও শিথিল করা হয়েছে। সিএনজি চালিত বাস কেনা ও নদী পুনঃখনন প্রকল্পের জন্য প্রদান করা হয়। ভারত সরকার ইতোমধ্যে ১০০ কোটি ডলার ঋনের মধ্যে ২০ কোটি ডলার ঋণ অনুদান হিসেবে ঘোষণা করেছে। ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশকে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির আওতায় উভয়দেশ একে অন্যের দেশে নৌ ও স্থল ও রেল ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা ১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্ত চুক্তির আলোকে সমন্বিত উপায়ে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ঐকমত্য স্থাপন করেছিল। এতে করে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত সমস্যাসহ ছিটমহল সমস্যার অনেক সমাধান হয়। ভারত ২৪ ঘন্টার জন্য তিনবিঘা করিডোর খুলে দিয়েছে সীমান্তে চোরাচালান রোধে দুই সরকার উভয় দেশের সীমান্তে সীমান্ত বাজার চালু করে চোরাচালান রোধ এবং উভয় দেশের জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয়তা দ্রব্যের সহজ আদান প্রদানের ব্যবসা করে দিয়েছে। দুদেশ সন্ত্রাসবাদ বিস্তার রোধেও চুক্তি করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থল সীমানার মতো সমুদ্রসীমা নিয়েও দীর্ঘ দিনের জটিলতা রয়েছে। উভয় দেশের সরকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে এক সমঝোতা স্মারকে দুই সরকার জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত সনদের ৭ ধারার কার্য বিবরণির আলোকে এ সমস্যার সমাধান করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সমঝোতা স্বাক্ষরে দুই দেশের ভূখণ্ডকে কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ, নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীরা যাতে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সমঝোতা স্বাক্ষরে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারতের অভিন্ন নদীগুলোর সমস্যা নিরসনে ভারত ঐকমত্য প্রকাশ করেছে। তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির চূড়ান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি টিম টিপাইমুখ বাঁধ পরিদর্শনের অনুমতি দিয়েছে ভারত সরকার। এছাড়া বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করবে না ভারত সরকার। বাংলাদেশকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে ২০১৩ সালের মধ্যে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ বিনিময় নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করতে উভয় দেশ সমঝোতা স্মারকে ঐকমত্য স্থাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বাঘেরহাটের রামপালে একটি ২৯৩৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের

উদ্যোগ নিয়েছে। এর বাইরে নেপাল, মায়ানমার, ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির প্রক্রিয়াও চলছে। উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ভারত তার দেশে বাংলাদেশকে ৪৬টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে। ভারতের বাঁজারে বাংলাদেশি পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে যৈ শুল্ক এবং অশুল্ক বাঁধা রয়েছে তা দূর করতে ভারত সরকার রাজি হয়েছে। এতে করে ভারতের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ সহজতর হবে। এতে করে ভারতের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্য বৈষম্য বিলোপ হবে। এছাড়া ভারত, বাংলাদেশ যৌথ সমঝোতা স্বাক্ষরে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন, বন্দর উন্নয়ন ও ব্যবহারসহ দ্বি-পাক্ষিক বহুবিধ বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন করেছে। যা বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশ তার অর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অপর প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সাথে জল-স্থল সীমানাসহ সকল দ্বি-পাক্ষিক ইস্যু সমাধান করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল সমুদ্রসীমা নিয়ে। মিয়ামারের সাথে বিগত ৪০ বছর এ সমস্যাটি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় কোনো সমাধানে পৌছানো সম্ভব হয় নি। বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকার সমস্যাটির সুষ্ঠ এবং দ্রুত নিস্পত্তির জন্য ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর বিষয়টি আন্তর্জাতিক সালিশে নিয়ে যায়। দীর্ঘ আড়াই বছর সালিশী প্রক্রিয়া শেষে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল (ITLOS) গত ১৪ মার্চ ২০১২ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় দেয়। এতে করে বাংলাদেশ সমদ্রসীমায় তার দীর্ঘ দিনের দাবীকৃত এলাকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। যা শেখ হাসিনার সরকারের এক বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। তবে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মায়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা হলেও এখন অগ্রগতি উল্লেখ করার মত নয়। শুধু ভারত-মিয়ানমারই নয় শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর প্রতিবেশী নেপাল,ভুটান, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান সহ অন্যান্য নিকট প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীন সফর করেন উদ্দেশ্য চীন-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সমস্যার সমাধান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের সহযোগিতা জোরদার করা এবং দু'দেশের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা। কারণ চীন বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং পরবর্তী সুপার পাওয়ার। চীন বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে রাজি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে চীন বাংলাদেশ সমঝোতা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে মায়ানমার হয়ে চীনের কুনমিং পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে সরকারের দ্রুত কূটনৈতিক পদক্ষেপের কারণে পদ্মসেতু নির্মাণের অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে যে বাঁধা ছিল শেখ হাসিনার সরকারের দীর্ঘ কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা অনেকটা দূর হতে যাচ্ছে বলা যায়। ৪জুন, ২০১২ মালয়েশিয়ার একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে সেদেশে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট প্রক্রিয়ায় জনশক্তি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া দেশটি তাদের শ্রম বাজারের জন্য বাংলাদেশকে 'উৎস দেশ' করার কথা ভাবছে বলেও প্রতিনিধি দলটি জানায়।

পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তম দাতা এবং বন্ধুরাষ্ট্র জাপান। জাপান বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জাপান বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণে জাপানের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর পদ্মা সেতু নির্মাণে যে সকল বৈদেশিক সহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে একক দাতাদেশ হিসেবে জাপান সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরকালে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতার আহবান জানালে জাপান সরকার সেই আবহানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। জাপানের বাজারে বাংলাদেশের তৈরীপোশাক, চামড়াজাতদ্রব্য, চিংড়ি, সিরামিকসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়ে জাপানের সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে। কুয়াকাটায় গভীর সমদ্রবন্দর

নির্মাণ, নতুন ঢাকার অদূরে নতুন বিমান বন্দর নির্মাণ, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে জাপান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিদ্যুৎ অবকাঠামো নির্মান, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবহন, টেক্সটাইল, জ্বালানিসহ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে জাপান বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া ৩ মে ২০১২ জাপানের উপ প্রধানমন্ত্রী কাতসুয়া ওকাদা বাংলাদেশ সফরকালে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ মেট্রোরেল প্রকল্পের জন্য জাপান সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে শেখ হাসিনার সরকারের স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারও আন্তর্জাতিক জলবায়ু ইস্যু সহ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাও গণতন্ত্রের চর্চার বৃদ্ধিতে শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ভূমিকাকে সমর্থ জানিয়েছে। এসকল বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য বিশেষ করে তৈরী পোষাকের রপ্তানি কোঠা বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে গ্রামীন ব্যাংক থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের বিদায়ের ঘটনাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের সরকারের ওপর অসন্তষ প্রকাশ করেছিল। এছাড়া শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামের হত্যা রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোষাক রপ্তানিতে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে। এ একটি ঘটনা থেকে হাসিনার সরকারের সাথে মার্কিন সরকারের টানাপোড়েন সৃষ্টি করলেও সম্পর্কের অবনতির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি। এর সব চাইতে বড় প্রমান মার্কিন প্রশাসনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাধর ব্যক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন গত ৫ মে ২০১২ বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, দ্বি-পাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক অমিমাংসিত বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে একসাথে কাজ করবে।

শেখ হাসিনার সরকার দেশে একটি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া গ্যাস উত্তোলনের জন্য রুশ কোম্পানি গ্যাজ প্রমএর সাথেও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায়ই রয়ে গেছে। যদিও মধ্য প্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানীতে যে ভাটা পড়েছিল তাতে এখনও জোয়ার লক্ষ্য করা যায় নি। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে বিশেষ করে লিবিয়া, মিসরে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরবর্তীতে সহিংসতার রূপ নিয়ে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। সৌদি আরব, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোতেও জনশক্তি রাপ্তানির গতি স্লথ। তবে গত ৯ জুন, ২০১২ সৌদি যুবরাজ বাংলাদেশ সফর করে এদেশে অবকাঠামো, জ্বালানি ও পর্যটন খাতে সৌদি আরবের বিনিয়োগ করার প্রস্তাব রাখেন।

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে শেখ হাসিনার সরকার পররাষ্ট্রনীতির দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। সার্ক এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জল। শিশু জন্ম ও মৃত্যুর হার কমানো, নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ থেকে সাউথ সাউথ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে না পারলেও জ্বালানী ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল আশানুরূপ। তবে উৎপাদনমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক বিনিয়োগের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের পররাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয় দিকেই এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

১৮ জানুয়ারি ২০১৩ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারত পালিয়ে থাকা অপরাধিদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজতর করতে 'বন্দি প্রত্যর্পন চুক্তি' সই করেছে। তবে 'রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী' ও 'রাজনৈতিক অপরাধের' দায়ে অভিযুক্ত লোকজনকে এ চুক্তির আওতায় হস্তান্তর করা যাবে না। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা এর আওতায় পড়বেন। এ ছাড়া দুই মন্ত্রী সংশোধিত ভিসা ব্যবস্থা (রিভাউজড ট্রাভেল অ্যারেজমেন্ট-আরটিএ) বিষয়ক দলিলেও সই করেছেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪-১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ সালে সরকারি সফরে রাশিয়া যান- মূলত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অব্যর্থ সমর্থন ও সাহায্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ যে সুগম করেছিল তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ সফর । যদিও ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম রাশিয়া সফর করেন। এছাড়া ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে আততায়ীর হাতে নিহত যাওয়ার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ধারা সম্পূর্ণরূপে উল্টোদিকে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী সরকারগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের চির শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।

বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতির দেশ হিসেবে যে নেতিবাচক পরিচয় ছিল তা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি অগ্রসরমান গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেকটা উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অর্থনৈতিক কমিটির সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মামলায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয় হয়েছে। এ রায়ে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ব্যুরো বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে জলদস্যুতার ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন ত্রিদেশীয় সংযোগ সড়ক বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে এ অঞ্চলের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের ৪৬টি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে। দহগ্রাম আঙ্গুর পোতায় যাতায়াতের জন্য ভারত তিনবিঘা করিডর সার্বক্ষণিক খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্য সার্ক রিজিওনাল মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডির আওতায় সড়ক ও রেলপথ উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এছাড়া এ সরকারের কূটনৈতিক প্রয়াসের ফলে বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালয় এবং সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের সদর দফতর ঢাকায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালে তার মস্কো সফরকে পরাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বীজ বপনের প্রয়াস হিসেবে অভিহিত করে বলেন দুদেশে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ও রাশিয়া পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করতে পারে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের অভিযাত্রা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য সংযুক্ত করতে পারলে দুদেশের এবং জনগনের সমৃদ্ধি অগ্রগতি অর্জনে আমাদের এ বন্ধুত্ব অবিরত জোরদার হবে। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে বাংরাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বর্তমান সরকার জনশক্তি রপ্তানিকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন শ্রম বাজারের মধ্যে পোল্যান্ড, পাপুয়া, নিউগিনি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এঙ্গোলা ও কঙ্গোয় জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে জনশক্তি রপ্তানির চেষ্টা চলছে। মালয়েশিয়ায় প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশিকে বৈধ করা হয়েছে। সেখানে আরো নতুন শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে।

মূল বক্তব্য (Key points)

১. পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।
২. আঞ্চলিক পর্যায়ে সমুদ্র ও বিমান বন্দর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।
৩. শেখ হাসিনার সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে সুদৃঢ় করেন এবং ভারতের সাথে ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর।
৪. ১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্তচুক্তির আলোকে সীমান্ত বিরোধ নিরসনে ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ

সীমান্তে যৌথ জরিপ এবং সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ঐকমত্য স্থাপন করেন।

৫. ২০১২ সালে ১৪ মার্চ মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের মীমাংসার রায় পাওয়া।

৬. চীন বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ করা।

১৩.১৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বল দিক (Weak Point of Bangladesh Forign Policy)

কোনো রাষ্ট্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা, জাতীয় নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে নিজের অর্থনীতি বিকাশের প্রয়োজনে তার বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে জাতীয় স্বার্থই প্রশ্নটি বারবার ফিরে আসে। এক্ষেত্রে সবসময় যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে তা বলা যাবে না। বাংলাদেশের গত চার দশকের বৈদেশিক নীতি যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে মূলত তিনটি ধারা আমরা প্রত্যক্ষ করি। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত একটি ধারা। দ্বিতীয় ধারার সূচনা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের আগস্টের পর, যা অব্যাহত থাকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় ধারার সূচনা হয়েছে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বল দিকসমূহ

কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি দেশটির সংবিধান, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবর্তিত ঘটনা প্রবাহ, রাষ্ট্রীয় জনসমর্থন, সম্পদ প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে প্রণীত হয়। এ বিষয়গুলোর সাথে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকলে তবে তাকে সফল পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এ বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় নি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সঠিক পররাষ্ট্রনীতির অভাবে নিজেদের অবস্থানকেও সুদৃঢ় করতে পারে নি। তাই প্রায়শই শোনা যায় বাংলাদেশ নতুজানু পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করলে যে দুর্বল দিকগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো :

১. **প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের লেজুরবৃত্তি :** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন সময়ে রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রাপ্তির বিষয়ে এ তিনটি দেশের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল বা আছে। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বিভিন্ন সময়ে এ তিন দেশকে সন্তুষ্ট করতে দেখা গেছে। এতে করে অনেক সময় রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২. **প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যর্থতা :** ভারত ও মায়ানমার বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এছাড়া নিকট প্রতিবেশী হিসেবে রয়েছে নেপাল, ভূটান, থাইল্যান্ড ও চীন। ভারতের সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন থেকে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের যথেষ্ট উত্থান পতন হয়েছে। ভারত নিজেদের দাবী আদায়ে বিভিন্ন কৌশলে বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করলেও বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ ইস্যুর তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট প্রাপ্তির যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল সাম্প্রতিক সময়ে সেটি পাওয়ার চূড়ান্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী ভারত থেকে আসা বিভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশ এখনও নিশ্চিত করতে পারে নি। একটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরও চুক্তি অনুযায়ী পানির প্রাপ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নিকট প্রতিবেশী নেপাল ও ভূটানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের নির্ধারণ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের ব্যর্থতা পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতাই প্রমাণ করে। চীন ও থাইল্যান্ডের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় প্রায়শই ব্যবচ্ছেদ ঘটে।

৩. **রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় ব্যর্থতা :** পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়শই হুমকির সম্মুখীন হয়। সমুদ্র সীমানায় ভারত ও মায়ানমারের আগ্রাসী আচরণ,

তেল গ্যাস সম্পদের ওপর বিদেশি কোম্পানিগুলোর দখলদারিত্ব স্থাপনের চেষ্টা, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভারতের আগ্রাসী আচরণ তাই প্রমাণ করে।

৪. **পররাষ্ট্রনীতির দৃঢ়তার অভাব :** বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মতো উচ্চাভিলাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করবে এটা কাম্য নয়। তবে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতিতে দৃঢ়তার অভাব থাকবে তাও কাম্য নয়। বিভিন্ন প্রভাবশালী রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাপের কাছে বাংলাদেশ প্রায়ই নতি স্বীকার করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নেতিবাচক বিষয় বলে মনে করা হয়।

৫. **অর্থনৈতিক কূটনীতিতে সফলতা অর্জনে ব্যর্থতা :** সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির এককেন্দ্রীকরণ হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনে অন্যতম প্রধান প্রবণতা হলো অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও কার্যকর নীতি প্রণয়নের অভাবে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয় নি। বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভূটান, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজার দখলে তেমন সফলতা আসে নি।

৬. **আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিজেদের অধিকার আদায়ে ব্যর্থতা :** বাংলাদেশ জাতিসংঘ, ন্যাম, কমনওয়েলথ, ওআইসি, বিমসটেক, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, সার্ক প্রভৃতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য। এ সংস্থাগুলোতে বাংলাদেশ নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার মাধ্যমে অধিকার আদায়ে খুব একটা সফল হয় নি। বরং বিভিন্ন প্রভাবশালী সদস্যদের লেজুরবৃত্তি করে নিজেদের অবস্থানকে আরো দুর্বল করে তুলেছে।

৭. **জনশক্তির বাজার দখলে ব্যর্থতা :** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতার জন্য বিশ্ব জনশক্তি বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের বাজার ছোট হয়ে আসছে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদিআরব ও কোরিয়ার জনশক্তি বাজার বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য প্রায় হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

মূল্যায়ন

কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দক্ষ ও যোগ্য লোকবলের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে না পারলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। রাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের তত্ত্ব ও নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করে কার্যকরী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

http://thejobstudy.com Go to Contents

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. **পররাষ্ট্রনীতি কি ?**
উত্তর : যে নীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাই পররাষ্ট্রনীতি।

২. **"The extension of domestic policy if foreign policy."-কে বলেছেন ?**
উত্তর : বিসমার্ক।

৩. **পররাষ্ট্রনীতির চারটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

উত্তর : নিরবচ্ছিন্নতা, সমৃদ্ধি অর্জন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগীতা ও নিরাপত্তা।

৪. পররাষ্ট্রনীতির চারটি উদ্দেশ্য লিখ।
উত্তর : জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, ভাবমূর্তি ও সহযোগীতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

৫. হোলস্টি পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন?
উত্তর: তিন শ্রেণীতে। যথা: মূলনীতি ও স্বার্থ, মাঝারী উদ্দেশ্য এবং সর্বজনীন ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য।

৬. পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের চারটি উপায় উলে-খ কর।
উত্তর: ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, সামরিক শক্তি ও সামর্থ্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ।

৭. পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া কয়টি?
উত্তর: দু'টি। যথা: সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ও অধি-সাংবিধানিক প্রক্রিয়া।

৮. পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কোনগুলো?
উত্তর : রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আইনসভা, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ।

৯. পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের অধি-সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কোনগুলো?
উত্তর: জনমত, সামরিক বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ, রাজনৈতিক দল, অর্থনৈতিক সংস্থা।

১০. CIA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Central Intelligence Agency।

১১. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূলকথা কি?
উত্তর : "সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে শত্রুতা নয়।"

১২. "পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগীতাই আমাদের বৈদেশিকনীতির মূলকথা।"-কে বলেছেন ?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৩. "আমরা বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই।"-কার উক্তি?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৪. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির চারটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : বন্ধুত্বের নীতি, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, সম-মর্যাদার নীতি, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি।

১৫. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি নীতিমালার উলে-খ রয়েছে?
উত্তর: ২৫ নং অনুচ্ছেদে।

১৬. মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ছিল?
উত্তর: সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন, ভারতের নির্ধারক ভূমিকা, পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা।

১৭. জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিক কি ছিল ?
উত্তর: মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, চীনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সোভিয়েত-ভারত বিমুখতা।

১৮. এরশাদ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিক কি ছিল?
উত্তর : ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা, সোভিয়েত বিমুখতা, চীনের উপর নির্ভরশীলতা এবং ভারতের সাথে নমনীয়তা।

১৯. খালেদা জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিক কি ছিল ?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন, ভারতের সাথে সমঝোতা এবং সার্ককে কার্যকরীকরণ।

২০. শেখ হাসিনার সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিক কি ছিল?
উত্তর : ভারতের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন, রাশিয়ার সাথে সম্প্রীতি তৈরী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

২১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির তিনটি নির্ধারকের নাম লিখ।
উত্তর : বৃহৎ শক্তিধর ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমর্থন, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

২২. পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান কী?
উত্তর : যেসব উপাদান পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নকালে পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাই পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান।

২৩. পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর করার অর্থনৈতিক উপায়গুলো কী কী ?
উত্তর : ক. এম্বার্গো, খ. শুল্ক নিয়ন্ত্রণ এবং গ. বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

খ-বিভাগ (Part – B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (Short Questions)

১। (ক) পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা দাও।
(খ) পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ কি কি ?
২। (ক) সংকটকালীন পররাষ্ট্রনীতি কি?
(খ) পররাষ্ট্রনীতির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য কি?
৩। (ক) পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের উপাদানসমূহ কি কি?
(খ) পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াগুলো লিখ।
৪। (ক) পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের অধি-সাংবিধানিক প্রক্রিয়াগুলো উলে-খ কর।
(খ) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলনীতিসমূহ কি কি?
৫। (ক) শেখ মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা কর।
(খ) জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা কর।
৬। (ক) শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
(খ) বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বর্তমান দিক কি?
৭। (ক) বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক লিখ।
(খ) বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (Part-C)

১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ কী কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বর্তমান ধারা আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন? দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি কী যথার্থ ছিল ?
৪. সামরিক শাসদের মধ্যে কোনো শাসকের পররাষ্ট্রনীতি দেশের জন্য বেশি কল্যাণ বয়ে এনেছিল বলে আপনি মনে করেন?
৫. বেগম খালেদা জিয়া সরকারের দুই সময়ের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন?
৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ড. ফখরুদ্দিন এর সময়ের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন?
৭. আওয়ামি লীগ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন? আপনি কি মনে করেন বিএনপি সরকারের চেয়ে আওয়ামিলীগ সরকারের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি দেশের কল্যাণ বয়ে এনেছে?
৮. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন।
৯. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় আলোচনা করুন।

করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পাকিস্-ান ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করে। এ নীতি সর্বতোভাবেই নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির নীতি ছিল। তারা বলেন যে, পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো বন্ধু, সীয়াটো-২:** সেন্টোর ৩(SEATO-CENTO) সদস্য। সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি পাকিস্তান ছিল চীনের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনে দুতিয়াল। ড. হেনরী কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়া সম্বন্ধে তার নিজস্ব বিচার বিবেচনাকেই প্রাধান্য দেন। তিনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উত্তরণের প্রক্রিয়া চলতে পারতো বলে মনে করতেন। তাঁর এ সুচিন্তিত মতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের সহয়তা তাকে খুবই ক্ষুব্ধ করে।

বাংলাদেশে বিরোধী মার্কিন নীতি ছিল একান্তই হোয়াইট হাউজের-প্রেফ নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি দাবি করেন যে বাংলাদেশের সংকটে তাদের অনুসৃত কৃতিত্ব ছিল। তাদের দাবি অনুযায়ী এ কৃতিত্বসমূহ নিম্নরূপ :

১. তারা শরণার্থীদের ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালিদের সাহায্য দিয়েছেন।
২. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্যনবেক্ষণে ত্রাণ কাজ ও খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা তাদেরই প্রভাব সম্ভব হয়।
৩. বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন তারা প্রতিষ্ঠা করে এবং শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করে।
৪. তাদের হস্তক্ষেপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষা পায়।
৫. পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য তারা একটি ব্যবস্থা করেন।
৬. শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করে।
৭. সপ্তম নৌবহর এবং এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরে পাঠানো হয় মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য।

১৪.২.৫ মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি পর্যায়ে ভূমিকা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউজ নিক্সন-এর প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি হিসেবে মার্কিন সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় সর্বস্-রের মার্কিন জনগন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পে ভূমিকা পালন করছিল । কংগ্রেসে বাংলাদেশের জন্য সমর্থন ছিল শক্তিশালী। পত্রপত্রিকা ও প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। এমনকি অনেক আমলাও বাঙ্গালির সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জর্জ হ্যারিসনের 'বাংলাদেশ কনসার্ট' ছিল বাংলাদেমের মুক্তিযুদ্ধেও জন্য একটি বিরাট অনুপ্রেরনা। এভাবে মার্কিন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। মার্কিন নাগরিকরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে গঠন করে বিভিন্ন সংগঠন। তাদের বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা পাকিস্তান পন্থী মার্কিন প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। মার্কিন রাজনীতিবিদ বিশেষ করে কয়েকজন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছেন ম্যাসাচুয়েটসের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর সাক্সবে, নিউজার্সির সিনেটর কিফোর্ড কেইস, কংগ্রেসম্যান গ্রাস হেলপান ও গালাগার, ওকলাহোমার সিনেটর ফ্রেড হ্যারিস, সিনেটর মাস্কী, ৫ মিনেসোটার ডেমোক্রেট সিনেটর ওয়াল্টার মনডেল ও এডওয়ার্ড ক্রুক প্রমুখ।

সুতরাং দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করা হলেও বেসরকারী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল ব্যপক সহানুভূতি। কংগ্রেস, সুশীল সমাজ ও প্রচার মাধ্যমে সর্তকতা এবং প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানকে যতোটা সমর্থন করতে চেয়েছিল ঠিক ততটা করতে সক্ষম হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙ্গালী মহল সর্বতোভাবে মুক্তিযুদ্ধের নানা রকমে সহায়তা করেন। এক পর্যায়ে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত সব বাঙ্গালী বাংলাদেশের পক্ষে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেন। দেশের সর্বত্র মার্কিনীরা বাঙ্গালীদের বন্ধু অথবা সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে জনমত গঠন করে এবং প্রবাসী বাংলাদশে সরকার এবং শরণার্থী কেন্দ্রে বাঙ্গালিদের জন্য নানা ধরনের সাহায্য প্রদান করে। ৬ মার্কিণ মুলুকে বসবাসকারী পাকিস্তান মহল বাংলাদেশকে সমর্থন করে। পাকিস্তান স্টুডেন্টস নামে একটি ছাত্র সমিতির মুখপাত্র এপ্রিল মাসে সামরিক শাসনের অবসান ও বাংলাদেশের দাবি মানার আহ্বান জানায়। কাওকাব সিদ্দিকী ছিলেন এ কাগজের সম্পাদক।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

১৪.৩ মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

তৎকালীন পরাশক্তির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই বাঙ্গালী গণহত্যাকে প্রথমে নিন্দা জানায়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী জুলুম অত্যাচার শুরু করার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্ণি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে এক বার্তায় হত্যাকান্ড এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের বন্দি ও নির্যাতন করার উদ্বেগ প্রকাশ করে। পত্রে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধ করা জন্য, সে খানকার মানুষের উপর নিপীড়নের অবসানের জন্য এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে (জে. আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান) সর্নিন্দ অনুরোধ করছি। ৮ সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত তথা বাংলাদেশের মুক্তিযেদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল।

তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি সব সময় একই গতিতে প্রবাহিত হয় নি। সময় ও বাস্তবতার সাথে সাথে বিভিন্ন সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতিতে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির তিনটি পর্যায় ছিল। এ পর্যায়গুলো হচ্ছে।

১৪.৩.১ সোভিয়েত নীতি প্রথম পর্যায় (মার্চ ১৯৭১-জুন ১৯৭১) : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির প্রথম পর্যায়ে সর্তকতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালের ৩০ শে মার্চ সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২৪ তম কংগ্রেসে লিউনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ (জীবনকাল ১৯০৬-১৯৮২) তাঁর ভাষণের পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার কথা উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নি ১৯৭১ সালে ২ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে পাঠানো একটি পত্রে জরুরী ভিত্তিতে রক্তপাত ও নির্যাতন বন্দি করে শান্তিপূর্ণ সামাধান খুঁজে বের করার জন্য পাকিস্তানকে আহবান জানান। ১৯৭১ সালের ৬-১০ জুন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাংলাদেশের ইস্যুতে আরে সক্রিয় হবার আহবান জানান। যদিও এ পর্যায়ে সোভিয়েত নীতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের পক্ষে আবর্তিত হয়। জনু মাস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি এ ধারায় চলে।

১৪.৩.২ সোভিয়েত নীতির দ্বিতীয় পর্যায় (জুলাই ১৯৭১-নভেম্বর১৯৭১): ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের ৯-১২ তারিখে মার্কিন পররাষ্টমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জারের পাকিস্তান হয়ে চীন সফর হয়ে চীন সফর করা পরই দণি এশিয়া উপমহাদেশের কূটনৈতিক বিপ্লব ঘটে। তিনি পিকিং থেকে ফিরেই ঘোষণা করেন ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে চীন হস্তক্ষেপ করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাহায্য না ও এগিয়ে আসতে পারে। এর ফলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হয় সোভিয়েত ভারত মৈত্রি চুক্তি। এ চুক্তি পাকিস্তানকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এতো দিন বিবৃত্তি ও পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের যে নীতিতে ছিল সে অবস্থান থেকে সরে এসে ভারতের পক্ষে সক্রিয় নীতির দিকে অগ্রসর হয়। পরের মাসে অর্থাৎ, ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্দীর (১৯১৭-১৯৮৫) মস্কো সফরের পর সোভিয়েত নীতির এ অবস্থান আরো দৃঢ় হয়। সোভিয়েত নীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালী বিরোধী যেকোন আন্তার্জাতিক সমাধানের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎপর হয়ে ওঠে।

১৪.৩.৪ সোভিয়েত নীতির শেষ পর্যায় (৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ -স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত) : পাকিস্তান ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান ব্যর্থ হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বও চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধেও জন্য সরাসরি পাকিস্-ানকে দায়ী করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সীমান্ত রক্ষা ও নৈতিক সমর্থন দিলেও সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাবে সীমান্ত রক্ষা ও জাতীয় স্বার্থে নিক্রিয় থাকবে না বলে হুমকি দেয়। যদিও জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বাইরে ভারতকে কূটনৈতিক সমর্থন দিলেও সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বড়

ধরনের যুদ্ধে জড়াতে চায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ পর্যায়েও বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধির (আওয়ামী লীগ) কাছে হস্তান্তরকে প্রধান্য দেয়। পাকিস্তান এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেন ভারতীয় বাহিনী সামরিক বিজয়ের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। নিরাপত্তা পরিষদের পরিবর্তে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৭ ডিসেম্বও একটি যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব উথাপিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয়বারের মতো ভেটো (Veto) প্রয়োগ করে। ভারতীয় বাহিনী ঢাকা দখল করা পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোন প্রকার যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে বানচাল করাই ছিল এ ভেটো দানের উদ্দেশ্য। আর তাই ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পন করার পর নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ভেটো প্রয়োগ না করায় শেষ পর্যন্ত ২১ ডিসম্বে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবে দেখা যায়, সোভিয়েত নীতি আগাগোড়া মধ্যপন্থী হলেও মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগত কারণে বাংলাদেশপন্থী নীতি গ্রহণ করে। তবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস গণহত্যার বিরুদ্ধে ও বাঙ্গালীর ন্যায়সঙ্গত দাবির স্বপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমিকা রাখে।

১৪.৪ মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ হাওয়ার পরই চীন সরকার কট্টর পাকিস্তানের ঘেষা নীতি অনুসরণ করে। যা স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালি বিশেষ করে বামপন্থীদের জন্য গভীর হতাশা সৃষ্টি করে। প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মুক্তিযুদ্ধে চীনের অনুসৃত নীতি দুটির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ্য করেন।

প্রথমত, চীন বাঙ্গালির সংগ্রাম ও সরকারী নির্যাতনের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখানো থেকে সুচিন্তিতভাবে বিরত থাকে।

দ্বিতীয়ত, চীন সরকার দ্ব্যর্থহীনভাবে পাকিস্তান সামরিক চক্রের অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। মুক্তিযুদ্ধে চৈনিক নীতির দুটি পর্যায় ছিল এ পর্যায়গুলো হচ্ছে।

১৪.৪.১ চৈনিক নীতির প্রথম পর্যায় (এপ্রিল ১৯৭১-নভেম্বও ১৯৭১) : চীন গোড়া থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সর্ম্পকের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিষয়ে তার নীতি নির্ধারণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যার সূচনার পর প্রায় ১৫ দিন মৌন থাকলেও ১১ এপ্রিল চীন প্রথম সরকারি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। ওইদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে দেয়া এক পত্রে চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই (১৮৯৮-১৯৭৬) পাকিস্তানে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদেও' বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় চীন সরকার ও জনগণের সকল সময় সমর্থনের আশ্বাস দেন। পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাকে তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে চীন সরকার চিহ্নিত করে পাকিস্তানের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির একমাত্র শর্ত হিসেবে পাকিস্তানের দু অংশের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধে চৈনিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হতাশ পিকিংপন্থীদের মধ্যে ভাসানীপন্থী ন্যাপসহ আরো কয়েকটি ছোট গ্রুপ বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেও চীনের এ ভূমিকার কারণে পিকিংপন্থী গ্রুপগুলোর বড় অংশ প্রকাশ্যে, গোপনে এবং সশস্ত্র কর্মকান্ডের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী অবস্থান নেয়। যদিও চীন মুক্তিযুদ্ধে আগাগোড়া অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা নেয়। তবে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রকাশ্যে পাকিস্তান সমস্যা সর্ম্পকে মন্তব্য করে নি। এ সময় পাকিস্তানকে গোপনে সামরিক ও নৈতিক সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। জুলাই মাসে ড. হেনরি কিসিঞ্জার এর পিকিং সফরের ফলে চীন পাকিস্তানপন্থী নীতিতে আগের চেয়ে সক্রিয় হয়। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিত চীন শংকিত হয়ে পড়ে এবং সেপ্টেম্বরে চীন পাকিস্তানকে নতুন করে আশ্বস্ত করে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামে পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। যদিও বরাবর পাকিস্তানের অনুরোধ সত্ত্বেও চীন পাকিস্তানের সাথে কোনো সামরিক চুক্তিতে অবদ্ধ হয়নি। তবে বরাবরের মতো পাকিস্তানের প্রতি চৈনিক সামরিক, নৈতিক সহায়তা অব্যাহত থাকে। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন নিয়েন পাক-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতকে দায়ী করেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে এর পরের

মাসেই চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা চিয়ান কুয়ান দুয়া দক্ষিণ এশিয়ার উত্তেজনার জন্য সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তিকে দায়ী করেন। ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এ নীতি চীন অব্যাহত রাখে।

১৪.৪.২ চৈনিক নীতি দ্বিতীয় পর্যায়ে (৩-১৬ ডিসেম্বর) : ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে চীন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। চীন জাতিসংঘে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করে একে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। এর ফলে বাংলাদেশের ইস্যু নয়, সোভিয়েত-চীন দ্বন্দ্বই প্রকট হয়ে ওঠতে থাকে। ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি প্রস্তাব উথাপন করে। প্রস্তাবগুলোর লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করা। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে। ৫ ডিসেম্বর চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে। ৫ ডিসেম্বর চীন এক প্রস্তাবে ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন এক প্রস্তাবে ভারতকে আক্রমনকারী হিসেবে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন এক বিবৃতিতে তথাকথিত বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তীব্র সমালোচনা করে।

এভাবে দেখা যায় যে, চীন-বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থী নীতি গ্রহণ করে। নৈতিক সমর্থন ছাড়াও গোপনে প্রচুর অস্ত্র পাকিস্তানকে সরবরাহ করে। পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণের পর যে সকল অস্ত্র বাংলাদশে উদ্ধার করা হয় এর ৬০% চৈনিক এবং ৪০% মার্কিন ছাপ যুক্ত অস্ত্র। এর থেকে নিপীড়িত জনগণের বন্দু হিসেবে দাবিদার চীনের হীন ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাক ভারত যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নবিন সদস্য হয়েও বারবার পাকিস্তানের পক্ষ ভূমিকা রাখে। এমনকি ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ঐ দিনই চীন সরকার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশকে সোভিয়েত-ভারতের সৃষ্টি বলে মন্তব্য করে।

ড. সৈয়দ আনোয়ারা হোসেন উল্লেখ কলেছেন ১০ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি চীনের এ নীতির কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাখাসমূহ হলো :

১. **চীন একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র :** চীন নিজেই একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। চীনা, মঙ্গোল, তিব্বতী, তুর্কী, ইউঘুর ইত্যাদি অনেক জনগোষ্ঠী নিয়ে চীনের রাষ্ট্রীয় সত্তা গড়ে ওঠেছে এবং আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রশ্নে চীনে এখনও অনেক সমস্য বিরাজ করছে। কাজেই অন্য একটি একাধিক জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রে সংগ্রামরত বিচ্ছিতন্নতাবাদী জনগোষ্ঠীকে সমর্থন করা চীনের পক্ষে সুবিবেচনা ছিল না। কারণ, এতে তার অভ্যন্তরীণ সংহতির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া চীন নিজেই তাইওয়ানকে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য সচেষ্ট।

২. **স্বতঃস্ফুর্ততা প্রসঙ্গ :** মুক্তিযুদ্ধকে চীন স্বতঃস্ফুর্ত সংগ্রাম হিসাবে বিবেচনা করে নি। চীনের দৃষ্টিতে ভারত ও সোভিয়েত সমর্থন পুষ্ট হয়ে কিছু বিভ্রান্ত বাঙ্গালি নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে এ কারণে চীন এ সংগ্রামকে সমর্থন করে নি।

৩. **সত্যিকারের গণযুদ্ধ নয় :** চীনের বিবেচনায় এ মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থে কৃষক-শ্রমিক জনতার সমর্থন পুষ্ট একটি গণযুদ্ধ ছিল না, কিছু সংখ্যক বুর্জোয়া নেতা শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল মাত্র।

৪. **মাওবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় :** চীন এমন কোন প্রমাণ পায় নি যে, বাঙ্গালী মুক্তিবাহিনী মাওসেতুং এর লাল বই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

৫. **আওয়ামী নেতৃত্বের ভারতপন্থি কর্মকান্ড :** আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দেও প্রকাশ্যে ভারতপন্থি কর্মকান্ড থেকে চীন যর্থাথই অনুধাবন করেছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তা হবে ভারতের প্রভাবাধীন একটি রাষ্ট্র এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রটি রুশ-ভারত আতাতে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

৬. **রুশ প্রভাব মোকাবিলা :** দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমপ্রসারমান রুশ প্রভাব মোকাবিলা করা জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সহযোগীতা করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে আগস্ট

মাসে ভারত সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল।

৭. মিত্র রাষ্ট্রকে সহায়তা : পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করার পেছনে চীনের নিজস্ব কিছু কারণও ছিল। পাকিস্তান ছিল চীনের ঘনিষ্ট মিত্র রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম। সঙ্কটকালে চীন যদি পাকিস্তানের পাশে না দাঁড়ায় তাহলে চীনের অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের মনে চীনের বন্ধুত্ব সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হতো।

১৪.৫ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়ে গবেষক ও রাজনীতিবিদের মধ্যে দু'ধরণের মতামত রয়েছে। একদল এতই আবেগপ্রবণ যে, তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না স্বীয় জাতীয় স্বার্থে (Own national interest) ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে। দ্বিতীয় একদল বলতে চান বাংলাদেশ প্রক"তপক্ষে ভারতের সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেনো তাদের মানবিক, সামরিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা যে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে নিঃ সন্দেহে তা বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় নীতির তিনটি পর্যায়গুলো হচ্ছে।

১৪.৫.১ ভারতীয় নীতির প্রথম পর্যায় (এপ্রিল-জুলাই) : এ পর্যায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে কিংবা বাংলাদেশকে সরাসরি সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে ভারতের সরকারী মহল আগ্রহী ছিল না। এ পর্যায়ে ১. ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়। ২. প্রবাসী বাংলাদেশে সরকারকে অবাধে ভারতীয় এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দেওয়া। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় দিনে গড়ে ২০-৪৫ হাজার অসহায়, নিরস্ত্র মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। জুন পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ লক্ষ এপ্রিলের শেষ নাগাদ বাঙ্গালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া শুরু হয় ভারতের মাটিতে এছাড়া ভারত এ সময় হালকা অস্ত্রও দেয়। মে মাসে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা'র (Research and Analysis wing) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় 'মুজিব বাহিনী'। জুনে এদের ট্রেনিং শুরু হয় এবং নভেম্বর পর্যন্ত ট্রেনিং চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং শরণার্থীদের আশ্রয়ের পাশাপাশি কলকাতার প্রবাসী সরকার গঠন ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপন ভারত সহায়তা করে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ড. হেনরি কিসিঞ্জার ভারত সফর করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতা প্রত্যাহারের অনুরোধ করলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মধ্যস্থতার পথ রুদ্ধ হয় এবং এর ফলে ভারত তার নিজস্ব বিবেচনায় চলতে থাকে।

১৪.৫.২ ভারতীয় নীতি দ্বিতীয় পর্যায় (আগষ্ট-নভেম্বর) : জুলাই মাস থেকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি নিয়মিত ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ মাসে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান সমঝোতায় পৌছালে ভারতের নীতি ও কর্মসূচির পরিবর্তন দেখা যায়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করলে মস্কো- দিল্লী চুক্তির আওতায় ভারতেকে সহায়থার আশ্বাস দেয়া হয়। ২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর ঘোষনা দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৪.৫.৩ ভারতীয় নীতির তৃতীয় পর্যায় (৩-১৬ ডিসেম্বর) : মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। ভারত স্থল, নৌ ও বিমান পথে যুদ্ধ শুরু করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তওে প্রবেশ করে। পাকিস্-ান সেনাবাহিনী প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়। এবাবে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়েও তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের হাতে তুলে দিলো। যা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডাররা একান্ত ভাবেই কামনা করেন নি। ১১ ভারতীয় জেনারেলের নেতৃত্বে যৌথ কমান্ড গঠন ভারতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথকে একান্ত ভাবেই কামনা করেন নি। ১১ ভারতীয় জেনারেলের নেতৃত্বে যৌথ কমান্ড গঠন ভারতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথকে আরো খোলাসা করেছিল। ১২ ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও বাঙ্গালি মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা পৌছে। ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর অধিনায়ক লে.জে. আমির আব্দুলাহ খান নিয়াজী যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে/ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ড. সৈয়ন আনোয়ার হোসেন লিখেছেন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শরণার্থীদের চাপ আও সামাধনে আগ্রহী পাশাপাশি অন্য একটি কারণও ভারতের বিবেচনায় ছিল। মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হলে বা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে তা বামপন্থী চেতনায় প্রভাবিত হবার সম্ভবনা ছিল। বলা বাহুল্য, এমন

সম্ভবনা সঙ্গত কারণে ভারতে কাছে অনভিপ্রেত ছিল। সুতরাং সামরিক সমাধানের মাধ্যমে প্রলম্বিত মুক্তিযুদ্ধের ইতি ঘটানো ছিল কাম্য।

১৪.৫.৪ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বেসরকারী সহযোগিতা

ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করে। সহকারি দল কংগ্রেস ছাড়াও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), সোস্যালিস্ট পার্টি ভারতীয় কমিউনিষ্ট পাঠি এবং জনসংঘ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন জানায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠন ও শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য দিয়ে সহায়তা করে সর্বস্তরের ভারতীয় জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বুদ্ধিজীবীরা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি গঠন করে অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও জনমত সৃষ্টিতে অবদান রাখেন। ভারতীয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবি শঙ্কর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেলসে বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে ১০ লক্ষ ডলার ভারতের শরণার্থী শিশুদের জন্য দান করেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বাংলাদেশে সেবা সংঘ স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রাম সহায়তা সমিতি নামে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। ভারত সরকার শরণার্থীদের খরচ সংগ্রহের জন্য যে শরণার্থী কর ভারতীয়দের ওপর আরোপ করে নির্দিধায় তারা দিয়ে বাংলাদেশের প্রতি মমতার বহিঃ প্রকাশ ঘটায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের যে সব ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছাড়াও বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক আমলা ছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন পররাষ্টসচিব টি এন কল, দূর্গা প্রসাদ ধর, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পি এ হাকসার, জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল জে আর এফ জ্যাকব, ১৪ জেনারেল শ্যাম মানেকশ, জে এন দিক্ষিত প্রমুখ। ১৫ এভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস শরণার্থীদের আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনে সহায়তা করে, আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করে, সর্বোপরি চূড়ান্ত পর্বে সরাসরি যুদ্ধ অংশ নিয়ে ভারত- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখে। ভারত সরকারের ত্রান মন্ত্রনালয়েরর হিসেবে শরণার্থীদের পেছনে ভারতের খরচ হয় ৩৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ১৭০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া বাকি ১৯৭ মিলিয়ন ডলার ভারত নিজে বহন করে। প্রশিক্ষণ, রশদ, অস্ত্র খাতে ব্যয়ের পরিমান ছিল দ্বিগুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য চাব হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ানের আত্মত্যাগ ও ভারতীয় সহমর্মিতা, ভালবাসার মূল্যমান হিসেবের বাইরে থেকেছে। ভারত সরকারের নীতিতে কিছু স্বার্থবাদী দিক থাকলেও এগুলো ছিল অকৃত্রিম। মোট কথা, একমাত্র দেশ ভারত যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর সদ্য স্বাধীন এদেশে ভারতীয় বাহিনীর লোভী ভূমিকা এদেশবাসীকে হতবাক করে দেয়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের শেষ ভাগে লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী, রাও ফরমান আলী খান প্রমুখকে হেলিকপ্টারে করে কলকতায় নিয়ে ফোর্ট ইউলিয়ামকে বন্দি করে রাখা হয়। অন্যান্য যুদ্ধ বন্দিদেরকেও ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। যুদ্ধ বন্দিদেরকে ভারতে স্থানান্তর ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। আর স্থল পথে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ও বহুবিধ সামরিক সাজ সরঞ্জাম।

১৪.৬ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রভাব

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশের গত একশ বছরের ইতিহাসের চারটি ঘটনা সবচেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টিকারী, যুগ প্রবর্তক ও গভীর প্রভাব বিস্তারক। এক ১৯০৫ সালের ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গঠন দুই, ১৯৪০ সালের লাহোর পস্তাব তিন, ১৯৪৭ সালে জাতি স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জন এবং চার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। ১৯০৫ সালে বিশাল 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী' ভাগ করে যে এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, সে এলাকা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রীয়

সত্তাত্মক উপস্থাপিত হয় ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ মাতার অখন্ডত্ব রক্ষার নামে যারা নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন তাদেরই প্রবল দাবির মুখে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিখন্ডিত হয়ে ১৯৪৫ সালের বাংলা বিভাগের সময়কার আদলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়। ১৯৭১ সালের এই অংশটিই লাহোর প্রস্তাবের মূল কাঠামোর আওতায় স্বতন্ত্র স্বাধীন নামে পূর্ণ জাতি রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করে। ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন এবং বাতিল, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রদেশরূপে এবং ১৯৭১ সালে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশর অভ্যুদয় ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ :

১. **নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সম্মুখে এগিয়ে চলা :** ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র (Nation Stati) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র হিসেবে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগুতে হয় স্বাধীনতা উত্তর কালে। ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও অস্থিরতা দেখা দেয়। নানা রাজনৈতিক টানাপোড়ানের মধ্যদিয়ে বিশ শতকের নব্বই এর দশকের শুরুতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আসে স্থিতিশীলতা। নির্বাচনের মতে গণতন্ত্রের অতীব প্রয়োজনীয় যে প্রতিষ্ঠান জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল তা আবার শক্তি ফিরে পায়। ক্ষমতা পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ উপায় হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু হয় সাংবিধানিকভাবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে পরপর তিনটি আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণ যোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবার অস্থিরতা। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ বাংলাদেশের প্রতিটি সংকটে ভূমিকা রেখেছে। তদুপরি, একবিংশ শতাব্দির বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুনগত পরিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের সংঘাতময় সমাজ ও রাজনীতিকে ভেতরে বাইরে থেকে সামাল দিতে হচ্ছে পরিবর্তন ও পালাবদলের তীব্র গতিবেগকেও। ফলত ঃ এমন সঙ্কুল ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি থেকে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধান স্থলে উত্তরণের পথ-সন্ধান এদেশের চিন্তাশীল ও ভাবুক সমাজের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য আমাদের হতে হবে ভবিষ্যত মুখী, তেমনী হতে হবে অতীত অনুসন্ধানী।

২. **বিশ্বের নির্যাতিত-মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস :** বাংলাদেশ এক সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে অর্জিত এদেশবাসীর স্বাধীনতা বিশ্বের মুক্তিকামী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশে অভ্যুদয়ের প্রভাবে অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং বিশ্বের অনেক ভূখন্ডের জনগণ এখনও স্বাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিয়োজিত হয়েছে।

৩. **মুসলিম বিশ্বে বিশেষ স্থান :** অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারী তার স্বপ্নের স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এসে দ্ব্যর্থহীণ কণ্ঠে বাংলাদেশকে প"থিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসবে ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে এবং সংগতকারণে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

৪. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপূর্ব শক্তি অর্জন :** অভ্যুদয়ের পর ধীরে ধীরে বাংলাদেশ একটি অপূর্ব শক্তি অর্জন করেছে। সেটি হল ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। সাগরতীরবর্তী ও নদী অববাহিকার বদ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে নানা প্রকৃতিতে দুর্যোগ আঘাত হানে হানে বাংলাদেশে। বন্যা, সাইকোন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, আইলা অনেক সময় খর - নিঃস্ব করে দেয় দেশের মানুষকে। এ নিঃস্ব অবস্থা থেকে আবার ঘুঁড়ে দাঁড়ায় তারা।

৪৫ বছর আগে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ছিলো ১০০ ডলারের নিচে সে আয় এখন ১১৯০ মার্কিন ডলার। মালয়েশিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়াসহ যে সব রাষ্ট্র এক সময় বাংলাদেশের মতো ছিল তারা অনেক দুর এগিয়ে এখন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সে সাফল্য বাংলাদেশের নানা কারণে পায় নি। তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অন্য অনেক রাষ্ট্রের চেয়ে ভালো। সাধারণভাবে শুধু ডলারের হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের আয় বেড়েছে এমন নয়। একই সাথে সমক্রয় ক্ষমতা হিসেবে মাথাপিছু আয়ের যে হিসাব করা হয় তাতেও এ দেশের

মানুষের আয় বেড়েছে। অর্থনৈতিক অন্যান্য সূচকেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি এসেছে। দেশের অর্থনৈতিক আকার বেড়েছে। ইউরোপ আমেরিকার চেইন শপগুলোতে স্থান করে নেয়ার মতো পণ্য রফতানী করেছে বাংলাদেশে। বৈদেশিক বাণিজ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ফোরামে বাংলাদেশ পরিচিত পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি প্রবাসী হয়ে উপার্জিত অর্থ দেশে প্রেরণ করছেন। সামষ্টিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যক্তি জীবনেও দেখা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অনেক এগিয়েছে। সাধারণত গার্মেন্টস শ্রমিক অথবা শ্রমজীবী কৃষি বা শিল্প দিনমজুর, নগর মহানগর-সিটি করপোরেশনের রিকশাচালক, যাদের খালি পায়ে, ছেড়া জামায় শ্রম বিক্রি করতে দেখা যেত, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণভাবে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ বাজার বড় হয়েছে। নানা শিল্প গড়ে উঠেছে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে কেন্দ্র করে। দেশের অর্থনৈতিক আকার অনেক বেড়েছে। এদেশের অর্থনীতি ধরে রেখেছেন দেশের তৈরী পোশাক শিল্পের শ্রমিক, প্রবাসী বাংলাদেশী আর কৃষকেরা। জীবন বুকির মধ্যে ফেলে দেশী ও প্রবাসীকর্মজীবীরা বছরে প্রায় ৬০০০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে নিয়ে আসেন। এ প্রবাহ না থাকলে লুটেরাদের দাপটে অনেক আগেই ধ্বংস নামত অর্থনীতিতে

৫. **কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি :** বাংলাদেশের অর্থনীতি হলো মূলত কৃষিভিত্তিক। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি এদেশবাসীর কাছে যথেষ্ঠ বিবেচনা পাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ কৃষিকাজকে কখনো খাটো করে দেখেনি বা এখনও দেখে না। আবহাওয়া-নির্ভর বাংলাদেশ কৃষি জাপান ভিয়েতনামের মতো উন্নতি করতে পারে নি। বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ ধান উৎপাদক দেশ। এদেশের কৃষকরা ধান উৎপাদন করেন অনেক কম খরচে। এর প্রশংসা না করে পারা যায় না। স্বাধীনতার উষালগ্নে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য যে খাদ্য ঘাটতি ছিল তা এখন জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হওয়ার পরও সে ঘাটতি শেষ হয়ে স্বনির্ভরতার দ্বার প্রান্তে পৌছে গেছে। বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সুপার রাইস গবেষণায় অনেকদুর এগিয়েছে। এক্ষেত্রে সাফল্য বাংলাদেশকে চাল রফতানীকারক দেশে পরিণত করেছে। মৎস ও পশু সম্পদ খাতেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। ভেতরে ভতরে মৎস চাষে বিপ্লব এসেছে। চাল বা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও ডালারের হিসেবে দামের বড় ধরনের হেরফের দেখা যায় না। মানুষের জীবন যাত্রার র ব্যয় বেড়েছে অনেক, তবে তা মূলত টাকার চলতি মূল্যে। বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতি কখনোই অবহেলিত হয় নি।

৬. **সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি :** সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে যেখানে 'বাস্কেট কেস' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই বাংলাদেশকে অণুসরণ করে আফ্রিকান দেশগুলোকে এগিয়ে যাবার অহব্বান জানিয়েছেন সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান (মেয়াদকাল ১.১.১৯৯৭-৩১.১২.২০০৬)। অভ্যুদয়ের লগ্নে এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছরের কোঠায় ছিল তা এখন ৬৯.২ বছর পেরিয়ে গেছে। সাক্ষরতার হার, শিশু মৃত্যুর হার, স্কুলে ভর্তি, বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তি, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার, মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার, মাথাপ্রতি ফোন বা মোবাইল এসব বিবেচনায় গত চার দশকে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন? দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি কী যতার্থ ছিল ?
২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা লিখুন?
৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন?
৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতিতে চীনের ভূমিকা আলোচনা করুন?

অধ্যায় ১৫

দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক : বাংলাদেশ ও বৃহৎ শক্তিসমূহ
By-Lateral Relation : Bangladesh & Major Power

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৫.১ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
১৫.২ মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্পর্কে
১৫.৩ সীমান্ত সম্পর্ক
১৫.৪ স্থলসীমান্ত চুক্তির Key Point
১৫.৫ পানিবন্টন
১৫.৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক
১৫.৭ বাংলাদেশ-ভারত দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয়
১৫.৮ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক
১৫.৯ বাংলাদেশ-মায়ানমার সম্পর্ক
১৫.১০ বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক
১৫.১১ চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক (China-Bangladesh Relationship)
১৫.১২ বাংলাদেশ-আমেরিকা সম্পর্ক (Bangladesh-American Relationship)
১৫.১৩ বাংলাদেশ-রাশিয়া সম্পর্ক
১৫.১৪ বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক
১৫.১৫ বাংলাদেশ-জার্মানী সম্পর্ক

http://thejobstudy.com Go to Contents

১৫.১ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। আর সেটা হলো অবিশ্বাস ও শত্রুতা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। জিয়া সরকার পাকিস্তান ও চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। তারই ফলশ্রুতিতে, উভয় দেশের মধ্যে অভিন্ন সীমান্ত সংঘর্ষ ফারাক্কার পানি স্বাভাবিক প্রবাহ ভারত বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ১৯৭৭ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক বেশ তিক্ততার ছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এলে উভয় দেশের মধ্যে আবার সম্পর্ক উন্নতির দিকে যেতে থাকে। ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান ভারত সফর করেন কিন্তু দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তেমন কোনো উন্নতি হয় নি। ১৯৮২ সালে এরশাদ ভারত সফর করেন এবং ভারতের সাথে ফারাক্কার ব্যাপারে আরো একটি নতুন চুক্তি করেন। আবার ১৯৮৪ সালে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়।

প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর আমলে ১৯৮৫ সাল থেকে সার্কের চেতনায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের অনেকটা উন্নতি হয়। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক নদী সমস্যা সমাধানের জন্য নেপালে অন্তর্ভুক্তকরণের

প্রস্তাব ভারত মেনে নেয়। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এরপর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'সার্ক' সম্মেলনেও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সহানুভূতি জানাতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আবার বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক ভালো হয়। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভারত সফর করেন। ১৯৯২ সালে ২৮ মে ভারতের সাথে একটি চুক্তি হয় এবং এ চুক্তি অনুযায়ী ২৬ জুন ১৯৯২ বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডোর প্রথমে ২ ঘন্টা পরে ৬ ঘন্টা করে খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় শীর্ষ বৈঠকের মধ্য দিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ থেকে তিনবিঘা করিডোরটি ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের একটি সাময়িক বিরোধের অবসান ঘটে।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশ ফারাক্কা পানিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এপ্রিল মাসে চাকমা শরণার্থীরা এদেশে আসতে শুরু করে। অবশেষে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভারত সরকার তার সেভেন সিস্টারস রাজ্যগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বাংলাদেশের কাছে ট্রানজিট দাবি করে আসছে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়টি নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে পরস্পর স্বার্থ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সাম্প্রতিক কালের কর্মচাঞ্চল্যও ভারতের সরকারি কাঠামো ও জনগণের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য দাগ কাটতে পেরেছে বলে মনে হয় না। প্রায় একই চিত্র বাংলাদেশেও। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফরের পরে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা গেছে, এমন দাবি করা কঠিন। তবে এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে এ ধরনের কিছু উপাদানের উপস্থিতি থাকতে পারে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে আবেগ বা আদর্শিক অবস্থানের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষণীয়। কখনো কখনো তা ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়কে ঘিরে, কখনো কখনো তা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে, দুই দিক থেকেই এমন প্রবণতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে প্রভাবিত করে চলেছে। এর অর্থ এ নয় যে, প্রায়োগিক উপযোগিতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনোই অবদান রাখে নি। তবে বিবর্তনশীল সম্পর্কে তা যে পরিমাণে ক্রিয়াশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা হয় নি, সে কথা নিশ্চিত করে বলা চলে; যার ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক একধরনের ভারসাম্যহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তবে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে বিভাজন ক্রমহ্রাসমান হওয়া নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের আবির্ভাব, সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপরি জনগণের মধ্যে যোগাযোগের গভীরতা বৃদ্ধি দ্বি-পক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে এক নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থানও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের নেতৃত্বে অভিলাসের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাংলাদেশ যে অবস্থানে আছে, তাতে সেই দেশটির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করা ভারতের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া ২৮ অক্টোবর-৪ নভেম্বর ২০১২ সালে ৭ দিনের দিল্লি ভ্রমণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ দেখা দিয়েছে। এ অবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককেও নতুন কাঠামোয় বিন্যস্ত করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

১৫.২ মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্পর্কে (Relationship During the Liberation war)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ এত দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে শরনার্থী হিসেবে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে আশ্রয় প্রদান করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে

যৌথ মিত্র বাহিনী গড়ে তোলে। পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতের ভূখন্ডে আক্রমণ চালালে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। মিত্র বাহিনীর আক্রমণে পর্যদুস্ত হয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে) ৯৩ হাজার সৈন্যসহ পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ দলিলে পাকিস্তানের পক্ষে জেনারেল এ.কে. নিয়াজী এবং যৌথ বাহিনীর পক্ষে জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা স্বাক্ষর করেন। স্বাধীনতার পর দু দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারতের দিল্লিতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন স্থাপিত হয়। ১৭ মার্চ, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। যা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল ঘটনা।



বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত ইস্যু

১৫.৩ সীমান্ত সম্পর্ক (Boarder Relationship)

ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা বর্তমানে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘলায় ও আসাম, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার। বাংলাদেশের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য ৫,১৩৮ কিলোমিটার। তার মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানার দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার। মাত্র ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত করা যায় নি। তারপরও দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমানা নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার অন্যতম কারণ হল সিটমহল সমস্যা বলে। বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের ১১১টি এবং ভারতের মধ্যে ৫১টি সিটমহল রয়েছে। বাংলাদেশে থাকা ভারতের ১১১টি সিটমহলের আয়তন ১৭১৫৮.০৫ একর এবং ভারতের মধ্যে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি সিটমহলের আয়তন ৭১১০২ একর। ভারতের অধিকাংশ সিটমহলগুলো বাংলাদেশের পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলায় অবস্থিত। অন্যদিকে বাংলাদেশের ৫১টি সিটমহলের ৪৭টি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মাধ্যমে সিটমহল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও এখন পর্যন্ত তা সমাধান হয় নি।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সীমান্ত হত্যা। ২০১২ সালে ৩ জানয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা গ্লোবার পোষ্ট Bangladesh India Border : Wall of Death' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে ভারতে বাংলাদেশের কাঁটাতারের বেড়াকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও রক্তঝরানো বেড়া বলে উল্লেখ করা হয়। এ সীমান্ত ২০০৭ সালে ১২০ জন, ২০০৮ সালে ৬২ জন, ২০০৯ সালে ৯৮ জন, ২০১০ সালে ৭৪ জন, ২০১১ সালে ৩১ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করা হয়। প্রতিবেদনে ২০০০ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৯৯২ জন বাংলাদেশী নাগরিক BSF কর্তৃক হত্যা করা হয় বলে উলে-খ করা হয়। তাছাড়া গুলিবিদ্ধ হয় ৯৮৭ জন এবং অপহরণের শিকার হয়েছে অন্তত ১০০০। ২০১১ সালের জানুয়ারী BSF-এর গুলিতে নিহত ফেলানীকে কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড়ে উঠে।

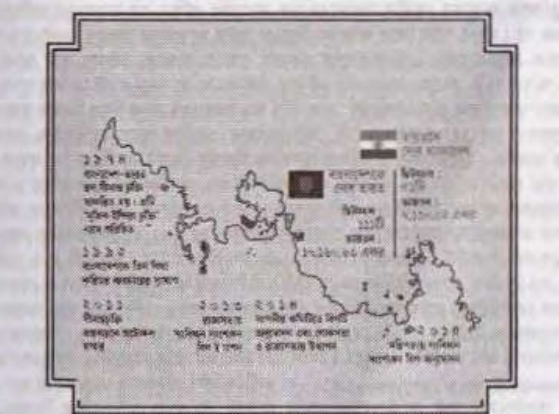
১৫.৪ স্থলসীমান্ত চুক্তির Key Point

১৯৭৪ সাল : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অপদখলীয় ভূমি ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষরিত ওই চুক্তিটি ঐতিহাসিক 'মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি' নামে পরিচিত। চুক্তি অনুযায়ী, দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলে যাওয়ার জন্য ভারত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডর শর্তসাপেে ব্যবহার করতে দিতে রাজি হয়।

১৯৯২ সাল : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সরকার বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডর ব্যবহারের সুযোগ দেয়। প্রাথমিকভাবে, দৈনিক ১২ ঘন্টা করে ব্যবহারের সুযোগ পায় বাংলাদেশিরা।

২০১১ সাল : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ঢাকা সফরের সময় তিন বিঘা করিডর বাংলাদেশিদের সার্বণিক ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার ও তাৎণিকভাবে তা কার্যকরের ঘোষণা দেন। ওই সফরেই ১৯৭৪ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে একটি প্রটোকল স্বার করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ড. মনমোহন সিংয়ের উপস্থিতিতে প্রটোকলে স্বার করেন উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয় যথাক্রমে ডা. দীপু মনি ও এস এম কৃষ্ণা।

২০১৩ সাল : স্থলসীমান্ত চুক্তি ও এর প্রটোকল বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকার ভারতের সংসদের উচ্চ রাজ্যসভায় সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন করে। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি আর পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতায় তা আটকে যায়।



বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত বিনিময় চিত্র

২০১৪ সাল : নভেম্বর মাসে ভারতের বিদেশবিষয়ক সংসদীয় কমিটি সর্বসম্মতিতে স্থলসীমান্ত চুক্তি ও এর প্রটোকল বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধন বিল অনুমোদন করে। ১ ডিসেম্বর ওই বিলটি ভারতের সংসদের উভয় কক্ষে লোকসভা ও রাজ্যসভায় উত্থাপন করা হয়।

২০১৫ সাল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের মন্ত্রিসভা ৫ মে স্থলসীমান্ত চুক্তি ও এর প্রটোকল বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধন বিল অনুমোদন করে।

যেসব ধাপ বাকি : ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন হতে হবে। এরপর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করলেই সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

১৫.৫ পানিবণ্টন (Water Management Relationship)

ভারত বাংলাদেশের উজানে অবস্থিত। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর উপস্থিতল হল ভারত। বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎস বা উৎপত্তি স্থল ভারতে। ১৯৫১ সালে ভারত বাংলাদেশের পদ্মার ভারতীয় অংশ গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। আর তখন থেকেই ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। ১৯৭২ সালে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভারতীয় নদীর সমালোচনা করলেও বিষয়টির সুরাহা হয় নি। ১৯৭৬ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে ভারত বাংলাদেশ পানি বন্টনের বিষয়টি OIC, NAM ও জাতিসংঘে উপস্থাপন করে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে নি। এরপর ১৯৭৭ সালে ৫ বছর মেয়াদি এবং ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যার সাময়িক সমাধান ঘটে।

ভারত বাংলাদেশ পানিবণ্টন চুক্তির বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাই মুখ বাঁধ নির্মাণ ও তিস্তা পানি বণ্টন। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত ১২০০ কি.মি. দীর্ঘ কৃত্রিম নদীর মাধ্যমে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ পানি প্রত্যাহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এতে করে বাংলাদেশ চুক্তি অনুসারে পানির ন্যায্য হিস্যা না পেলেও পানি পাবে ভারতের মরু অঞ্চল। ভারত বরাক নদীতে যে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে করে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দেবে। তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মত থাকলেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনীহার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। মূলত পানি নিয়ে ভারতের বিমাতা সুলভ আচরণের কারণে বাংলাদেশ তার প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মরুময় সৃষ্টি হচ্ছে, আবার অপ্রয়োজনে অধিক পানি প্রবাহের ফলে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা বা বন্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে সমুদ্র নিয়ে বিরোধ চলছে। সমুদ্র বিরোধের সূত্রপাত হয় ১৯৭৪ সালের "দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোস অ্যাক্ট-১৯৭৪"-এর মাধ্যমে। মূলত মৎস ও খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই এ বিরোধের সূচনা। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয় আর্ন্তজাতিক ট্রাইবুনালে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের মামলায় বাংলাদেশ জয়ী হয়েছে। এতে বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল সমুদ্র অঞ্চলের উপর একচ্ছত্র অধিকার পেয়েছে। বিরোধপূর্ণ এলাকা ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের প্রাপ্তি ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার। ভারতের প্রাপ্তি ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। মামলাটি ৪-১ ভোটে পাস। ট্রাইবুনালের (৫) বিচারক রুণ্ডিগার উলফ্রাম (জার্মানি) জঁ পিয়েরে কত (ফ্রান্স), টমাস এ মেনশাহ (ঘানা) ইভান শিয়ারার (অস্ট্রেলিয়া) প্রেসারাজ শ্রীনিবাসা রাত (ভারত)। করও বেশি সময় ধরে, আলোচনার পর নিস্পত্তি না হওয়ার ৮ অক্টোবর সালিসি আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারনের জন্য জার্মানির হামবুর্গে ইটলযে আর ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারনের মামলা দ্যা হেগের Permenent Court of Arbritratio (PCA) বা স্থায়ী সালিসি আদালতে দায়ের করা হয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে যে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটেছে, তা হলো অমীমাংসিত বিরোধ এই রায় বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই। ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার- যে যা-ই থাকুক

http://thejobstudy.com Go to Contents

না কেন, প্রতি দেশ নিজ নিজ সমুদ্র সীমায় এ রায়ের বদৌলতে নিষ্কণ্টক।

১৫.৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক (Economic and Commercial Relationship)

ভারত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭২ সালে। দু'দেশের মধ্যে Inland Water Transit and Trade Protocol স্বারের মধ্যদিয়ে ভারত নৌ চলাচলের সুবিধা আদায় করে নেয়। এ পর্যন্ত এ চুক্তি ১১ বার নবায়ন করা হয়েছে। তবে ভারতের প্রধান আগ্রহ বাংলাদেশের স্থলে বন্দর ব্যবহার বা Transit-এর প্রতি। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে দু দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাণিজ্য ঘাটতি। বাংলাদেশ প্রতি বছর যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আমদানি করে। ফলে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য প্রতিকূলতা দেখা দেয়। ২০০৮-৯ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ২৮৬৮ মিলিয়ন ডলার বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ডলার। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য ঘাটতির পরিমান ছিল ২৯১ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩০১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানির বিপরীতে রপ্তানি ছিল মাত্র ৩৫৯.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত বলেও বাস্তবে কোন ফল পাওয়া যায় নি। ফলে দু দেশের মধ্যে চোরাচালান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চোরাচালানকে কেন্দ্র করে তৈরী হচ্ছে সীমান্ত সমস্যা।

১৫.৭ বাংলাদেশ-ভারত দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় (Measures Taken to Improve Bi-lateral Relatoin)

ভারত ও বাংলাদেশ দুটি বন্ধুপ্রতিম দেশ। দেশ দুটির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধেও ভারতের রয়েছে উল্লেখ করার মতো অবদান। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানে ভারতকে আর আন্তরিক মনে হচ্ছে না। ফলে যেসব সমস্যা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান হওয়ার কথা ছিল,সেসব সমস্যা দীর্ঘ ৩৯ বছরেও সমাধান হয় নি। তাছাড়া কিছু আচরণ, যেমন-তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর, দক্ষিণ তালপট্টি দখল করে নেয়া, বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে বাংলাদেশের অনুরোধে কর্ণপাত না করা, সীমান্তে বিএসএফের গুলিবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা ভারতের আগ্রাসী নীতির পরিচয় বহন করে। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ভারত সরকারকে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে এবং বাংলাদেশ-ভারত দ্বি-পাক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১. ভারতের কংগ্রেসের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাই এ দুটি দলকে উভয় দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সীমান্ত ব্যাবস্থাপনা, নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ নিরসনে উভয় দেশকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত ভারতের বাজারে যাতে বাংলাদেশি পণ্য অবাধে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য শুল্ক ও অশুল্ক বাঁধাসমূহ দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা পুনঃনির্ধারণ, ছিটমহল ও বিরোধপূর্ণ সম্পত্তি বিনিময় এবং সমুদ্রসীমা নির্নয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা।

৪. বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড থেকে বিদ্রোহী তৎপরতার ব্যাপারে ভারতের অভিযোগ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. ভারত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি, ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশের রেলওয়ে খাত আধুনিকায়ন এবং দুই দেশের মধ্যকার রেল সেবাকে আরও জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা।

৬. দুই দেশের ব্যবসায়ী, রোগী, শিক্ষার্থী ও সরকারি কর্মকর্তাদের যাতায়াতের প্রয়োজনে ভিসা কার্যক্রম সহজীকরণ এবং সীমান্তে হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৭. ন্যায্যতার ভিত্তিতে তিস্তা ও ফেনী নদীর পানি বণ্টন করতে হবে যাতে দুই দেশই এর

উপকারভোগী হয়।

৮. শিক্ষাও সংস্কৃতি খাতে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে হবে। ভারতের কাপালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো টেন প্রচারিত হয়। সেজন্য দুই দেশের সহযোগিতা আবশ্যক।

৯. বি,এস,এফ কর্তৃক সীমান্তে নিরীহ বাঙালিদেরকে হত্যা বন্ধে দুই দেশকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিক বন্ধন তাছাড়া একই ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থানের দরুন দেশ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় বিদ্যমান। সুতরাং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে, সেগুলো দূরিকরণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। এক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় কূটনৈতিক তৎপরতা ও বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। সেক্ষেত্রে উভয়দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে দৃষ্টিদিয়ে সম্পর্ক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

১৫.৮ বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক (Important Aspects of Bangladesh-India Relation)

➞ ভূ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা (Geo-political Compulsion) : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দিককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এ কারণে যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভারতের মুখামুখি হয়ে পড়েছে। তথাপি বাংলাদেশকে India locked countryও বলা হয়।

➞ বাংলাদেশের তিনদিকে ভারতের সাথে ভূ-সীমান্ত রয়েছে ৪১৫৬ কিলোমিটার। অন্যদিকে রয়েছে বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)।

➞ বঙ্গোপসাগরে ভারতের নৌশক্তি কে (naval force) আধুনিকীকরণ এবং তাদেরকে Blue water Navy এ রূপান্তর করা হচ্ছে। যার কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশকে নিয়ে বাংলাদেশের নীতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

➞ Lower riparian country হিসেবে বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত ও নিয়মিত পানির জন্য ভারতের ওপর নির্ভর করতে হয় ৫৪/৫৫টি নদীর মাধ্যমে।

ভৌগোলিক বাস্তবতা বাংলাদেশকে ভারতের চাহিদা ও নীতির চাপে থাকতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গার পানি বণ্টনের মাধ্যমে ভারত ভৌগোলিকভাবে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ ততটা পাচ্ছে না।

➞ অবৈধ অভিবাসনের জন্য ভারতের দোষারোপ অথবা সীমান্ত অঞ্চলে ভারত বিরোধিতাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত করা হয় ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে। তথাপি বাংলাদেশের তিনদিকে ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

১৫.৯ বাংলাদেশ-মায়মানমার সম্পর্ক (Bangladesh Maymenmer Relationship)

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সম্পর্ক মূলত দুটি ইস্যু দ্বারা প্রভাবিত। প্রথমটি রোহিঙ্গা সমস্যা এবং অপরটি হল সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ। রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠী আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী আরকানের মুসলিম অধিবাসী। এরা ১৯৭৮ সাল থেকে মিয়ানমার সীমান্তে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন আরাকান রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা সংখ্যারিষ্ঠ। দ্বিতীয় সংখ্যারিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমান। মুসলমানরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে মধ্যযুগে আরাকানে বসতি স্থাপন শুরু করে। আরকান রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানরা রোয়াইঙ্গা, যান্ডুইকা, কামানাচি, জেরবাদি ও দিন্নেত এই পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। রোয়াইঙ্গাজাতিগোষ্ঠীই রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব সম্পর্কে মতভেদ সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্য মতো হলো, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আরকান রাজ্যে বসতিস্থাপনকারী চট্টগ্রামি পিতার ঔরসজাত ও আরাকানি মাতার গর্ভজাত বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা।

আরাকানে বৌদ্ধ মগ ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গার ফলে ১৯৪০ সাল থেকে,

বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার স্বাধীনতা লাভের পর বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলমান আরকান ত্যাগ করে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয় ১৯৪২ সালে। এই দাঙ্গায় প্রায় এক ল রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করা হয় বলে উলে-খ রয়েছে। ফলে বহুসংখ্যক রোহিঙ্গা আরাকান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসে। রোহিঙ্গা মুসলমানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও পরবর্তীতে গোপন পথে অস্ত্র সংগ্রহ করে মগদের বিরুদ্ধে মোজাহেদ বাহিনী গঠন করলেও তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে উ নু-র শাসনামলে ৯০ ভাগ মগদের সমন্বয়ে গঠিত বার্মা টেরিটোরিয়া ফোর্স (বি.টি.এফ) সন্দেহজনক নাগরিক অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ অভিযান চালায়। ওই সময়ে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে মিয়ানমার সরকার তাদের কিছু অধিকার প্রদান করে। রোহিঙ্গারা বার্মার একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৬২ সালে রোহিঙ্গারা পুনরায় নিপড়ীন, নির্যাতন ও উচ্ছেদের শিকার হয়। জেনারেল নে-উইন প্রধানমন্ত্রী উ নু-কে মতাচ্যুত করেন। আরকানকে বৌদ্ধশাসিত অঙ্গরাজ্যের মর্যদা দেওয়া হয়। জেনারেল নেউইন এর সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে রোহিঙ্গাসহ আরাকানের অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গা প্রকটতর হয়। নেউইন এর বৈষম্যমূলকত আচরণ এবং জাতিগত আন্দোলন দমনে বর্মীকরণ নীতি বাংলাদেশের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের বিস্তার ঘটায়।

বার্মার নাগরিক হিসেবে যে সকল রোহিঙ্গা মুসলমান জেনারেল নেউইন ও স মং এর শাসনকালে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা। জেনারেল নেউইন আরকানে জাতিগত আন্দোলন দমনের জন্য ১৯৭৮ সালে নাগামিন অপারেশন চালায়। আরকান ন্যাশনাল লিবারেশন পার্টির সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমানদের সম্পৃক্ততার কারণে নির্বিচারে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়। নাগামিন ড্রাগন অপারেশনের ফলে প্রায় ২ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান উদ্বাস্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানের মত আর্থসামাজিক অবস্থা বাংলাদেশের ছিল না। উদ্বাস্তু সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ কামনা করে। জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামের চাপের মুখে নেউইন সরকার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়। দুদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ৬ অক্টোবর থেকে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে যায়। অবশ্য ২২ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান ১৯৮৩ সালের পর বার্মায় আগত রোহিঙ্গাদের ভাসমান নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে বার্মায় রোহিঙ্গাদের সম্পত্তি অর্জন, রাজনৈতিক অধিকার ও অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রোহিঙ্গাদের উপর নতুন করে নির্যাতন শুরু হয়। নেউইনের বিবর্তনমূলক নীতির ফলেই ১৯৯১ সালে পুনরায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯০ সালের মে মাসে সাধারণ নির্বাচনে অং সাং সূচীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির প্রার্থীরা ৯০ ভাগ আসনে জয়ী হয়। উক্ত নির্বাচনে আরকানের রোহিঙ্গা মুসলমানরা অং সাং সু চি-র প্রার্থীদের সমর্থন করে। আরকানের ২৩টি নির্বাচনী এলাকায় ন্যাশনাল লীগ ফল ডেমোক্রেসি একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করে। জেনারেল স মং নির্বাচনে বিজয়ী দলের কাছে মতা হস্তান্তর না করে অং সাং সূচী-কে গৃহবন্দী করন এবং সুচি-র প্রতি একচেটিয়া সমর্থন প্রদানের কারণে স মং-এর নির্দেশে সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত রাখাইনদের উপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। নব্বইয়ের নির্বাচনী ফলাফল ও রোহিঙ্গা বিরোধী অপারেশনের ফলে ১৯৯১ সালের ২৬ জুনের মধ্যে ২,৫০,৮৭৭ জন রোহিঙ্গা মুসলমান আরকান থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৯টি শরণার্থী শিবির এবং শিবিরের বাইরের ২,৫০,৬৬১ জন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু আশ্রয় নেয়। মিয়ানমার সরকার ২,৩১,২৭৯ জন রোহিঙ্গাকে তাদের দেশের নাগরিক বলে স্বীকার করে। দুদেশের সরকারের মধ্যে ১৯৯২ সালের ২৮ এপ্রিল এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯২ সালের ১৫ মে থেকে ৬ মাসের মধ্যে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করলেও অদ্যাবধি প্রায় ২২ হাজার শরণার্থী প্রত্যাবসনের অপোয় কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানাধীন কুতুপালং এবং টেকনাফ থানাধীন নয়াপাড়া শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছে।

মিয়ানমার সরকার এই ২২ হাজার শরণার্থীর মধ্যে মাত্র ৭ হাজার রোহিঙ্গাকে তাদের নাগরিক বলে

স্বীকার করে। শরণার্থীদের নাগরিকত্বের প্রশ্নে মিয়ানমার সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা এবং স্বদেশে যেতে রোহিঙ্গাদের ভীতি শরণার্থী প্রত্যাবসন প্রক্রিয়াকে স্থবির করে রেখেছে। ১৯৯৭ সালে প্রত্যাবাসনের বিপরে প্রাণসমূহ এবং বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের পর দীর্ঘ ১৬ মাস শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ থাকে। অতঃপর ১৯৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে পুনরায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াও অনেক আগে থেমে গেছে। ২০১২ সালের জুন-জুলাই মাসে পুনরায় রোহিঙ্গারা আবার বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। জাতিসংঘ এদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করলেও, বাংলাদেশ তা প্রত্যাখান করে। এতে দু'দেশের মাঝে সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হয়েছে। অন্যদিকে সমুদ্রসীমা নিয়ে যে বিরোধ তার একটি সমাধান (২০১২) পাওয়া গেছে ইটলস-এর রায়ে। রায়ে বাংলাদেশ অতিরিক্ত জলসীমা পেয়েছে বলে দাবি করলেও, বাংলাদেশের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে কম জলসীমা পেয়েছে। রায় নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ দুটি পক্ষ তৈরি হয়েছে। সমুদ্রে অধিকার বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। সমুদ্র সম্পদ আমাদের জাতীয় উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারে। বিশেষ করে সমুদ্রে তেল ও গ্যাসের প্রাপ্তি আমাদের অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে। গভীর সমুদ্রে EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ) এর ৮টি ব-ক ও CONTINENTAL SHELF এর ২০টি ব-কের অনুসন্ধানের জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত ও মিয়ানমার এই পার্শ্ববর্তী ব-কগুলোর উপর তাদের দাবি জানায়। অতি সম্প্রতি ভারতের উড়িষ্যা ও মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের ভূ-খন্ডগত বিরোধ সৃষ্টি হয়, যার মূল কারণ CONTINENTAL SHELF এর প্রচুর হাইড্রোকর্বন এর প্রাচুর্যতা। UNCLOS III এর ৭৬(৪) ধারায় এবং অনুচ্ছেদ ৭ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যমান সমস্যাটির সমাধান চেয়েছিল। এখন ভবিষ্যৎই বলবে ইটলস-এর রায়ে আমরা কতটুকু উপকৃত হয়েছি।

দীর্ঘদিন মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন এর কিছু কিছু সংস্কার কর্মসূচির কারণে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে মিয়ানমারের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রথমত, মিয়ানমারের জ্বালানি সম্পদ ও দ্বিতীয়ত, চীনকে ঘিরে ফেলার মার্কিন উদ্যোগ। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে ২০২০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনীর প্রায় ৬০ শতাংশ রণতরী এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মোতায়েন করা হবে। পর্যবেকদের ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য একটিই । আর তা হচ্ছে চীনের বিরুদ্ধে একটা অ্যালায়েন্স গড়ে তুলতে এই অঞ্চলের দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাতলে একত্রিত করা। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে সাফল্যও পেয়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা এ অঞ্চলে তার অবস্থান শক্তিশালী করেছে। এখন মিয়ানমারকে যদি এই প্রক্রিয়ায় আনা যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা হবে এক বড় 'বিজয়'। ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামার মিয়ানমার সফর, মিয়ানমারে পুনরায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সুচীকে মুক্তি দিয়ে তাকে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো চীন যে খুব ভাল চোখে দেখবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। তাই মিয়ানমারের ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি থাকবে। থেইন সেইন একটি সংস্কার প্রক্রিয়া চালু করেছেন। এই সংস্কার প্রক্রিয়া মিয়ানমারকে কোথায় নিয়ে যায় সেটাই দেখার বিষয় এখন।

১৫.১০ বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক

এশিয়ার বৃহত্তম ও বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হল চীন। যদিও পাকিস্তানের সাথে চীনের সুসম্পর্কের কারণে চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিরোধীতা করেছে কিন্তু স্বাধীনতার পর চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দিন দিন উন্নতি লাভ করছে। চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রধান করণ হল বাণিজ্যিক, ভূ-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র কর। চীনের সাথে ভারতের বিরোধ বাংলাদেশ চীনের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের দিকে প্রসারিত করছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বেসরকারি সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সাহায্যের মধ্যদিয়ে। ১৯৭৫ সালে দু দেশের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশেল সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চীন সফরের মধ্যদিয়ে চীন-বাংলাদেশ

http://thejobstudy.com
Go to Contents

সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। ফলে চীন হতে বাংলাদেশ সামরিক সাহায্য পেতে শুরু করে। ১৯৮১ সালে চীনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সফরে আসলে ৬টি বিষয়ভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এগুলো হলো- সাহিত্য, ভিজ্যুয়াল ও পারফরমিং আর্টস, শিক্ষা ও গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মিডিয়া ও খেলাধুলা।

এরশাদ শাসনামলে দু'দেশের মধ্যে "যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন" গঠিত হয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধ করলে বাংলাদেশের সাথেসম্পর্ক উন্নয়নে চীনও উৎসাহ দেখায়। চীন বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, কুটির শিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, তৈরী পোষাক আমাদানি করে এবং বাংলাদেশে মূলত ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী রপ্তানী করে। তবে প্রতিবছর বাংলাদেশে বাণিজ্যিক প্রতিকূলতা দেখা দেয়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক চীন সম্পর্ক নতুন দিগন্ত সূচনা করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়ই চীন সফর করেন। বাংলাদেশর পররাষ্ট্র নীতির পূর্বমুখী নীতির অংশ হিসেবে চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের প্রতি আগ্রহ স্থাপনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর ও চীনের ভাইস প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর দু'দেশের সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে।

২০০৯ সালের জানুয়ারীতে সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় সফরে চীন গিয়েছিলেন, তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করার পর তিনি আবার চীনে গেলেন। ধারনা করা হচ্ছে ছয়টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে চীনের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি হয়েছে। এসব মেগা প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সোনদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি, এর বাইরে পদ্মা বহুমুখী সেতু/যমুনা নদীর উপর দিয়ে বঙ্গবন্ধু রেল ব্রীজ কর্ণফুলী টানেল ও একই নদীর ওপর তালুর ঘাট কেলওয়ে ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পে অর্থায়ন। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখেও চীন তথা ব্রিকস ভূক্ত দেশ গুলোর সঙ্গে সর্ম্পক উন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবে বাংলাদেশ এই পরিবর্তনের বাইরে থাকতে পারে না । বর্তমান চীনের ঋণের ক্ষেত্রে পরিশোদের মেয়াদ ১০ থেকে ১৩ বছর এছাড়া আরো তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২০ বছরের পাশাপাশি গ্রেস পিরিয়ড ৫ বছর বৃদ্ধি করার দাবী জানান। বাংলাদেশ ও চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। বাংলাদেশ ও চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাণিজ্য চীনের অনুকূলে। বাংলাদেশ যে পরিমান পণ্য রপ্তানী করে তার চেয়ে ১৩.৮ গুন পণ্য বেশি আমদানি করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশ রপ্তানী করেছে ৪৮.৫১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, আমদানী করেছে ৫৯২.৬৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। ২০০১-০২ সময়সীমায় ৬১গুণ বেশি পণ্য আমদানি করতে হয়েছিল (১১.৬৭ মিলিয়নের বিপরীতে ৭০৮.৯৪ মিলিয়ন ডলার) ২০১২-২০১৩ সালে রপ্তানী ৪৫৮.১২ মিলিয়ন আমদানী ৬৩২৪ মিলিয়ন ডলার। চীনের কাছে আর্থিক সাহায্য বেশি ২০০৫ সালে চীন ঋণ দিয়েছিল ১৮১ মিলিয়ন ডলার যা ছিল সুদ মুক্ত। ৭৫ মিলিয়ন কম সুদে ৭৬৪ মিলিয়ন সাপ্লাইয়র্স ক্রেডিট ও ৩২.৯৪ মিলিয়ন অনুদান। ২০১৩ সালে চীন তার নিজদেশে ৫০০০ আইটেমের বাংলাদেশি পণ্য শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিয়েছিল। চীনে বিনিয়োগের যে পরিসংখ্যান দেখা যায়, ২০০৯ সালে চীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ করে ৮৮ মিলিয়ন ডলার আর ২০১৩ সালে এসে ১৮৬ জন উদ্যোক্তা বাংলাদেশ বিনিয়োগ করে ৩২০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জন্য ব্যবহৃত ৭৫ শতাংশার উৎস হচ্ছে চীন।

১৫.১১ বাংলাদেশ-আমেরিকা সম্পর্ক (Bangladesh-American Relationship)

বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সহযোগিতা না করলেও ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তবে আমেরিকা ও বাংলাদেশ সম্পর্ক যতটানা বাণিজ্যিক তারচেয়েও বেশি রাজনৈতিক। কারণ বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশের কাছ থেকে লাভবান হবার কোন সম্ভাবনা আমেরিকার নেই। কারণ দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য নেই বললেই চলে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয়। বাংলাদেশের

রপ্তানী আয়ের ৩৩% আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সম্প্রতি রানা প-াজা ধ্বংসের কারণে মার্কিন থেকে প্রচুর ঋণ, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে চলছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য Operation Sea Angel পরিচালনা করে। ২০০৭ সালে সিডরে আক্রান্ত মানুষের জন্য পরিচালিত ত্রাণ ও সাহায্যের নাম ছিল Operation Sea Angel-2। বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে ১৯৯৮ HANA (Humanitarian Assistance Needs Assesment) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য দু'দেশের মধ্যে PISCES ev Personal Identification Secure Comparision and Evalution System চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাছাড়া ২০০২ সালের ১৯ জুলাই দুইদেশ TIP ev Terrorist Interdiction Program গ্রহণ করে। ২০০৪ সালের ১৮ মে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিষ্টিনা রোকা বাংলাদেশ সফর করেন। PISCES চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ অতন্ত্র চোরাচালান প্রতিরোধ, সীমান্ত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ মোকাবেলাসহ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের অনুকূলেই ছিল।

আমেরিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংক্ষেপে ইউএসএ নামে সুপরিচিত। গোটা পৃথিবীর মোড়ল, মাতুব্বরি, খবরদারি প্রশ্নে যে দেশটির অবস্থান শীর্ষে সে দেশটিই হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি হিসেবে যে দেশটির নাম সর্বাগ্রে উ"চারিত হয়, সে দেশটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ শতকের শেষ দশকের শুরুর লগ্ন পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টক্কর ও মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একক পরাশক্তির মর্যাদায় উন্নীত ও ভূষিত করেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার পুরনো বন্ধু পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিলেও মার্কিন জনগণ, সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভসের অনেক সদস্য, মার্কিন মিডিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য সবচেয়ে বেশী খাদ্য ও অন্যান্য জরুরী সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পরেই ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্র দু'টি বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। এর প্রথমটি হলো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ; আর দ্বিতীয় হলো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের দ"ৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাবে। কিন্" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনরূপ ইতিবাচক ঘোষণা ছাড়াই বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। তবে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পর মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে আনীত একটি প্রস্তাব পাস হয়। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তৎকালীন মার্কিন মন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স তার বিব"তিতে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে তারা আগ্রহী এবং ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে বিপর্যস্ত বাংলাদেশকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে চায়। স্বীকৃতি প্রদানের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেকে আবির্ভূত হয়। প্রধানমন্ত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে স্বাগত জানায় এবং আশাবাদ ব্যক্ত করে

যে, এ স্বীকৃতি দু'টি জাতিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মার্কিন জনগণের সমর্থনের জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানানোর সুযোগটিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ উপলক্ষ্যে গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান: স্বীকৃতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে। ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন সাহায্যের পরিমান ছিল ৪৩৩ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থকে প্রাপ্ত মোট বৈদেশিক সাহায্যের এক তৃতীয়াংশ। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের মাধ্যমে ১১৫ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি সাহায্য বাংলাদেশকে প্রদান করেছিল। মজার ব্যাপার হলো এই যে, বাংলাদেশ কর্তৃক মার্কিন সাহায্য গ্রহণ বিষয়ে শেখ মুজিব সরকারের মধ্যে বেশ বিতর্ক ছিল। সরকারের ভেতরে মস্কোপন্থী বামপন্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সাহায্য প্রাপ্তি ছিল খুবই জরুরী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব খোলাখোলিভাবে ঘোষণা করলেন যে, বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে প্রাপ্ত যে কোন বৈদেশিক সাহায্যকে স্বাগত জানাবে। লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে সর্বমোট ৪৫১.৯৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সর্ব"হৎ একক ঋণদাতা দেশে পরিগণিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক-উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালের হেমন্তে তিনি ওয়াশিংটন ও নিউইউর্ক সফর করেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদারকরণের লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এ যে, শেখ মুজিব এ আশাতে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন যার মাধ্যমে তিনি দ্বৈত মৈত্রী বন্ধন ভেঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একক জোট গড়ে তুলবেন এবং ১৯৭১ সালের অপমান ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ বিরোধী জোট গঠন ও তৎপরতার করার রচনা করবেন। সফরকালে শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড রুডলফ ফোর্ড (শাসনকাল ৯.৮.১৯৭৪-২০.১.১৯৭৭) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যা ১৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন যিনি ওয়াশিংটন সফরে শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলেন-তাঁর মতে, মুজিবের প্রতি প্রদত্ত প্রটোকল ও রাষ্ট্রীয় সম্মানে স্পষ্টতই মার্কিনীদের শীতল অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফর: বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর সেখানে থেকে বাংলাদেশেও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সফর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকা এসেছিলেন; কিসিঞ্জার শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনায় অংশ নেন এবং শেখ মুজিবকে 'A man of vast conception' বলে অভিহিত করেন। বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে মার্কিন অনুদানলাভের আশায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) কত"ক রাজনৈতিক সহকর্মীকে বাদ দিয়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন। মার্কিনীদের তুষ্ট করার জন্য বঙ্গবন্ধু কিসিঞ্জারের ঢাকা সফরের প্রাক্কালে ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর বাম ঘেঁষা বলে চিহ্নিত প্রভাবশালী নেতা তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দেন।

২০০৬ সালের অক্টোবরের পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন উদ্বেগ: ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ থেকে স"ষ্ট পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার বার উদ্বেগ প্রকাশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন, মানবাধিকার রক্ষা, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায় সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের যুক্তরাষ্ট্র সফর: ২০০৭ সালের ১২ জুলাই ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৭সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ সফরের সময় তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ (শাসনকাল ২০.১.২০০১-২০.১.২০০৯) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মহাজোট সরকারের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক : ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এ সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আসে। নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী কিনটনের বাংলাদেশ সফর: ২০১২ সালের ৫-৬ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী কিনটন বাংলাদেশ সফর করেন। হিলারী কিনটন তাঁর সফরকালে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং দেশের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে বৈঠক করেন। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির সাথে যৌথ অংশীদারিত্বমূলক সংলাপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই, সহিংস চরম পন্থা এবং মাদক, অস্ত্র চোরাচালান ও জলদস্যুতার মত আন্তঃদেশীয় অপরাধ রোধ ও নিরাপত্তা সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। হিলারী কিনটনের বাংলাদেশ সফর ছিল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা স্থগিতকরণ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারনীকৃত অগ্রাধিকার ব্যবস্থা Generatised System of Preferences- GSP জিএসপি সুবিধা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধার মাধ্যমে বাংলাদেশ ৫৬ মিলিয়ন ডলার আয় করে, যার মধ্যে পোশাক খাতে ১০ মিলিয়ন ডলার। আর্থিক বিবেচনায় বিষয়টি যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বহিঃরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নেতিবাচক অবস্থান প্রকাশ হওয়া। ১৯১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরীন ফ্যাশনে আগুনে ১১২ জনের প্রানহানি এবং ২০১৩ সারে ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে ১১৩২ জনের মৃত্যুর ঘটনায় বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনার পর ২০১৩ সালের ২৭ জুন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার (জিএসপি) সুবিধা স্থগিত করে দেশটি। এটি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজ যথেষ্ট নষ্ট করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন এএফএলসিআইও ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন বাণিজ্য দফতরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিবেদন দাখিল করার পর এ আশঙ্কা আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। বাস্তবতা আঁচ করতে পেরে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেছেন, জিএসপি ফেরত পওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে নতুন নতুন শর্ত দিয়ে চলেছে তাতে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত পূরণ করলেও তাদের শর্ত শেষ হবে না। জিএসপির আড়ালে চলছে রাজনীতি আর কথার ফুলঝুর। যুক্তরাষ্ট্র সরকার জিএসপি নিয়ে কোন মন্তব্য করলে এর জবাব দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। এ দিকে জিএসপি ফিরে পেতে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সাথে শ্রম পরিবেশ নিয়ে কোন ধরনের বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য সতর্কও করে দিয়েছে দেশটি।

নিশা দেশাই বিসওয়ালের বাংলাদেশ সফর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর প্রথম বারের মত বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সময় তিনি ঢাকায় নির্বাচন কালীন সরকার নিয়ে হরতাল, অবরোধ ও রাজনৈতিক সহিংসার মধ্যে সমস্যা সমাধানে সংলাপের চেষ্টা করেছিলেন। ২০১৪ সালে নভেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফর করেন।

নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাংলাদেশ আগমন: ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারির নয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন্স বুম বার্ণিকাট বাংলাদেশে পৌঁছেন। মার্সিয়া বার্ণিকাট বিদায়ী মার্কিন রাষ্টদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনার স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন। নয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত এমন এক সময় আসলেন যখন বাংলাদেশে সব দলের অংশ গ্রহণের নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট অবরোধ কর্মসূচী পালন করছে। বার্ণিকাট হলেন বাংলাদেশ উপযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাদশ রাষ্ট্রদূত। তিনি একজন পেশাদার কূটনীতিক। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে কেমন সম্পর্ক বিদ্যমান তা নিয়ে দুই ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে। দেশের বিপরীতমুখী প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বা জোটের নেতা-

কর্মীদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তবে এক দল বলবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুই না। আমরাই একমাত্র পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলতে। আরেক দলের নেতাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমন্ত্রীকে যে ভাষায় কটাক্ষ করা হয়েছে এবং বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপে আছে। বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্টই মাথা ঘামায় এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ ও আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে কার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে কার সাথে শীতল এবং কাকে টাইটে রাখতে হবে এ নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

১৫.১২ বাংলাদেশ-রাশিয়ার সম্পর্ক

রাশিয়া এক প্রাচীন জনপদ। বর্তমানে সরকারি নাম রুশ ফেডারেশন। রাশিয়া প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ও ধনী প্রজাতন্ত্র। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট আয়তনের ৭৫ ভাগই ছিল রাশিয়া। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই ছিল রাশিয়ায়। আয়তনে এখন প্রথিবীর বড় দেশ রাশিয়া। ভৌগলিকভাবে রাশিয়া, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত। রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত বেরিং প্রণালী ও পশ্চিম সীমান্ত আটলিক সাগর স্পর্শ করেছে। পশ্চিমে বাল্টিক সাগর থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তরে আর্কটিক সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর, ককেশাস, আলতাই পর্বতমালা ও আমুদরিয়া পর্বতমালা পর্যন্ত রাশিয়া বিস্তৃত। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় ১৯৯১ সালের ২৪ আগস্ট রাশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সোভিতে ইউনিয়নের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্তি ঘটেছিল একটি ইতিহাসের সে ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা। জড়িয়ে আছে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের ইতিহাস। স্পষ্টতই রাশিয়া হচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকল্প নাম। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হচ্ছে এ দেশটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে গণ্য হয়। কমিউনিস্ট শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল:

১. প্রথিবীর সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সাহায্য ও উৎসাহ দান;
২. সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী জনসাধারণকে সমর্থনদান, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে।
৩. সাম্যবাদী আদর্শের ব্যাপক প্রসার;
৪. সংঘর্ষ ও সহাবস্থানের নীতি;
৫. বিশ্বের সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান;
৬. অনুন্নত রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান;
৭. মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

কমিউনিজমের সৌধ ভেঙ্গে পড়ার পর রাশিয়া এখন নিজ অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন/ রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংঙ্গে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের তথা বর্তমান রাশিয়ার ভূমিকা ছিল অনবদ্য। সেভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সমর্থক রাষ্ট্র ও সহায়তাদানকারী। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার অনুযায়ী এবং নিজস্ব দক্ষিণ এশীয় নীতির আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রকৃতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সন্তুষ্ট ছিল এবং বঙ্গবন্ধুর এ সংক্রান্ত অঙ্গীকারে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান: বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কিছুকাল পরেই ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃত প্রদান করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম এগিয়ে আসে। এই স্বীকৃত প্রদানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশ খুব নিবিড় কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সোভিয়েত ইইনয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন: স্বাধীনতার উত্তর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন। এ সময় লিনিদ ইলিচ ব্রেনেভ জীবনকাল (১৯০৬-১৯৮২), শাসন কাল (১৯৬৪-১০ নভেম্বর, ১৯৮২) প্রণীত যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির প্রতি সমর্থন, সে সময়ের দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের দফা দাবির প্রতি সমর্থন, ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা শীর্ষক সম্মেলনের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি কারণে পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বে একটি ধারণার জন্ম হয়েছিল যে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের জোটে যোগ দিয়েছে। সোভিয়েত কূটনীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্রেজনেভের এশিয়ার নিরাপত্তা পরিকল্পনার অধীনে আনা।

বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর: স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের পহেলা মার্চ পাঁচ দিনের জন্য প্রথম মস্কো সফর করেন। এই সফর দু'রাষ্ট্রের সম্পর্ককে সম্পর্ককে ঘনিষ্টতর করে। ১৯৭২ সালের এ সফর শেষে যুক্ত বিব"তিতে আরব ভূখন্ডে চলমান ইসরাইলী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মতৈক্য এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে দায়িত্বপালনরত বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েতনাম প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ভারতীয় বক্তব্যের চাইতেও আরও বেশি স্পষ্ট, খোলামেলা ও সোভিয়েত ঘেঁষা ছিল। এর ফলে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করেছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ১৯ মার্চে পুনরায় মস্কো সফর করেন। চিকিৎসা ও রাষ্ট্রীয় সফরে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি মস্কো থাকেন। এ সফরের পর যুক্ত বিবৃতিতে এবং পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট চুক্তি সমূহে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিভিন্ন প্রকার সাহায্যদানে সম্মত হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা উল্লেখ্যযোগ্য।

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক: সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সুনামকে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টির মোড়কে বাংলাদেশের মতো একটি সদ্য স্বাধীন দেশের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টায় পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদত্ত ব"ত্তির ব্যাপক সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সহায়তা: সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য এক স্কোয়াড্রন বিমান সরবরাহ করে, যে সব বিমানের পাইলটদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বভার তারা নিজেরাই গ্রহণ করে।

চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির প্লান্ট স্থাপন: সোভিয়েত সহায়তায় চট্টগ্রামে জি এম প্লান্ট নামে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির প্লান্ট স্থাপন করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর সচলে সহায়তা: সোভিয়েত সহায়তার সবচেয়ে বড়ো দৃশ্যান প্রকল্প ছিল চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কার্যকর করা। চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল করার প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে হাতে নেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক পরিমাণ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বন্দর দিয়ে প্রবেশ করানো। অধিকন্তু চট্টগ্রাম বন্দর পরিষ্কার করা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে চট্টগ্রাম বন্দরের অগ্রণী অবদান অনস্বীকার্য।

অর্থনৈতিক সহায়তা: সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। তবে বাংলাদেশের জন্যে দেয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির খুব বেশী ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে ১৮ মিলিয়ন পাউন্ডের মধ্যে অপর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল। একথা বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যক্ষ দান ও ঋণ হিসেবে দেয় সোভিয়েত অর্থ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ব্যাপক প্রয়োজনের নিরীখে পর্যাপ্ত ছিল। লক্ষণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে মোট ১৩৮.৮৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে ঋণদাতা দেশ হিসেবে পঞ্চম অবস্থানে ছিল। উল্লেখ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদত্ত অপর্যাপ্ত সাহায্যের কারণেবঙ্গবন্ধুকে অ-সোবিয়েত বলয়ের দিকে ঝুঁকে

http://thejobstudy.com Go to Contents

পড়তে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধৈর্য্যচ্যুতি বহু ক্ষেত্রে বিশাল অংকের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার পটভূমিতে সোভিয়েত-বাংলাদেশ চলমান সম্পর্ক মুখ থুবড়ে পড়ে।

বাংলাদেশের সোভিয়েত অক্ষ থেকে বেরিয়ে আসা: ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ এর দুঃখজনক ঘটনার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদের শাসনামলে সোভিয়ের ইউনিয়নের সাথে আর আগের সম্পর্ক থাকেনি। এটি স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ সোভিয়েত অক্ষ থেকে বের হয়ে আসছে। সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্র এসময় বাংলাদেশে অপছন্দনীয় মাতাদর্শে পরিণত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া: রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের মাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সমরাস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

সোভিয়েত আগ্রাসনের ব্যাপারে বাংলাদেশের কঠোর মনোভাব: জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকাল (২৪ মার্চ ১৯৮২-৬ডিসেম্বর ১৯৯০) পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতি কঠোর মনোভাব। তবে সোভিয়েত নেতা লিনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ ১৯৮২ সালের ১০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

রাশিয়ায় বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির চেষ্টা: রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়। এ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গিয়ে বিশ্ব শক্তি হিসেবে রাশিয়া ভূলাভিষিক্ত হয়। এ সময়কালে বাংলাদেশের টার্গেট হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়াতে নিজ দেশের রফতানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ।

রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম সরকার এর আমলে (১৯৯৬-২০০১) রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। এ সময় রাশিয়ার সাথে নিবিড় কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে রুশ প্রেসিডেন্টের বৈঠক : ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ইতালীর মিলানের সাল দেলে কেরিয়াভিডি প্রাসাদে ইতালীর প্রেসিডেন্ট জর্জিও নেপলিতানোর দেয়া জমকালো নৈশভোজের সময় এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে দু'নেতা যৌথভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৫.১৩ বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক

জাপান বাংলাদেশের বৃহত্তম উন্নয়ন সহযোগী দেশ। গত ৪০ বছরে বাংলাদেশকে জাপান আনুমানিক ১২ বিলিয়ন ডলার আর্থিকসহায়তা দিয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্ণগঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের পর কয়েকটি দেশ সাহায্য করেছে। তাদের মধ্যে জাপান অন্যতম। ১৯৭৩ সালের ১৭ অক্টোবর এক সপ্তাহের সফরে প্রথম বারে মতো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাপান সফর করেন। সেই সফরে একাধিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্মাত পত্র স্বাক্ষর হয়েছিল। যার মধ্যে অন্যতম ছিল যমুনা নদীর উপর বহুমুখী সেতু নিমাণের অর্থনৈতিক ও কারীগরি সম্ভাব্যতা যাচাই সেই সফরের সময় বঙ্গবন্ধু টোকিওর জাতীয় প্রেমকাবে এক জনাকনি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। স্বাক্ষর করেন তাদের অতিথি বইয়ে। ২০১৪ সালের ২৫ থেকে ২৮ সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার জাপান সফর কালে জাপানের কাছ থেকে আগামী ৫ বছরের ৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬০০ বিলিয়ন ইয়েন সাহায্যের নিশ্চয়তা নিয়ে বলেছেন। ৩৫তম ওডিএ (Official Development Assistance) প্যাকেজ হিসেবে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে লোন চুক্তি এসময় স্বাক্ষরিত হয়। যা দিয়ে কক্সবাজারে মাত্তার বাড়ীতে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কৃষি খামার উন্নয়ন প্রকল্প, হাওর অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার কথা রয়েছে। ২০১২ তে চীনে জাপানের বিনিয়োগ্য ছিল ১৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার ২০১৩ তে তা অর্ধেকে নেমে এসে দাড়ায় ৬.৫ বিলিয়নে পর্যায়ক্রমে ও দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে জাপান বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে চায় মনে করা হচ্ছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিছু নিশ্চয়তা চেয়েছেন যেমন:- বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ কর মওকুফ সুবিধা জাপানের কূটনীতিকে ইকোনোমিক ডিপ্লোমেসি বা ট্রেড

অরিয়েন্টেড ডিপ্লোমেসি বলা হয়। জাপানের কাছে অনুমান যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মধ্যেআয়ের দেশে পরিণত হতে আর কোন দেরি নেই। এই বাজারে বিক্রি করলে যে লাভবান হওয়া যাবে সে হিসেব জাপান কষে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ পরিণত হওয়ার যে লক্ষস্থির করেছে জাপান তার সহযোগী হাত চায়। সম্ভবত এ কারণেই জাপান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের সময়ে ৬০০ বিলিয়ন ইয়েন সহযোগীতার ঘোষনা প্রদান করে। জাপান বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার মে মাসের সফরের সময় নতুন পর্যায়ে উন্নীত করার জন জাপান বাংলাদেশ পাটনারশীপ ষ্ট্যাটেজি নেয়া হয়েছে। তারে এ সম্ভবনা গুলোর সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কয়েকই বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

প্রথমত : বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করত হবে। খেলায় রাখতে হবে জাপানি কোম্পানী গুলো যেন বাধার সম্মুখীন না হয়।

দ্বিতীয় : বাংলাদেশ জাপান ও চীনের সাথে একই সালে সম্পর্ক গড়াতে যাচ্ছে ভৌগোলীক বিবাদে লিপ্ত দুটি দেশের উন্নয়ন সহযোগী বানানো সঠিক হচ্ছে কিনা।

তৃতীয়তঃ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপান সফর করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো জাপানের সাথে বাণিজ্যি সম্পর্ক জোর দার করা। তিনি বলেছেন ভারতে গেলে জাপানের বিনিয়োগ ভোরীরা কাল ফিতার দৌরাত্ব নয় লাল গালিচার সংবর্ধনা পাবে জাপান এ অঞ্চলের চারটি দেশ মিয়ানমার বাংলাদেশ, ভারত, ও শীলংকায় তারা বিনিয়োগ করবে।

জাপান সফরে প্রধানমন্ত্রীঃ ২০১৪ সালের ২৫-২৮ মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফর করেন। ২৬ মে ২০১৪ টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের সাথে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । দুই নেতার শীর্ষ বৈঠকের পর ঢাকা ও টোকিওর ২১ দফা সম্বলিত একটি যৌথ ইশতেহার প্রকাশিত হয়। যৌথ ইশতেহারে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ব"দ্ধি, আঞ্চলিক সম"দ্ধি অর্জন এবং সাংস্কৃতিক ও জনগণের মধ্যকার যোগাযোগ ব"দ্ধিতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

জাপানোর প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের বাংলাদেশ সফরঃ ২০১৪ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে বাংলাদেশ সফর করেন। দীর্ঘ ১৪ বছর পর তথা ২০০০ সালের পর একবিংশ শশতকে এটিই কোনো জাপানী প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর। সফরকালে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাপানোর প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে ২৫ দফা যৌথ বিব"তিতে সাক্ষর করেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে পরাষ্টসবি পর্যায়ে সংলাপ চালু করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন উভয় দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে আগামী তথ্য বিনিময়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদন খাতেও উভয় দেশ সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করে। নীল সমুদ্র অর্থনীতির ধাণার প্রসারেও উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিলিস্তনের গাজায় ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলায় নারী ও পুরুষ সহ বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে উভয় প্রধানমন্ত্রী অস্ত্রবিরতি চুক্তিকে স্বাগত জানান। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিও তারা সমর্থন জানান । জাপানের সমর্থনে প্রার্থতা প্রত্যাহারের মাধ্যমে বন্ধুত্বের অনন্য নজির স্থাপন করল। জাপান ও সে দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা বিবেচনা করে এ ত্যাগ যথোচিত হয়েছে বলা যায়। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বন্ধুত্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো । জাপানের প্রধানমন্ত্রী একে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'গুরুত্বপূর্ণ মোড়ল বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশের জন্য তা ইতিবাচক সুফল বয়ে আনবে। বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের মূল ভিত্তি আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর এ সফর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঘনিষ্ট করলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কঃ অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপান বর্তমান বিশ্বের অন্যতম দাতা দেশ। বিশ্বের শীর্ষ ঋণ প্রদানকারী দেশ জাপান। জাপানের অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মূলনীতিই জাপানকে এ পর্যায়ে নিয়ে এনেছে।

জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র। একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই জাপান

বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহত জোরালো সহযোগিতা করে আসছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাপানসর্বদাই বাংলাদেশের পাশেই ছিল। ১৯৭২ সাল থে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জাপান উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বাংলাদেশকে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে। জাপানের উন্নয়ন সহায়তার মূল লক্ষ্য হ"ছে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন।

জাপান বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার। বাংলাদেশ জাপানের কাছ থেকে যে সহায়তা পেতে চায় জাপান সে সহায়তাই করতে প্রস্তুত। জাপান বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়ার বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনায় চারটি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই খাতগুলো হচ্ছে:

১. কৃষি, পল্লী উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন বা উৎপাদন ক্ষমতা ব"দ্ধি;
২. সামাজিক খাতের উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা;
৩. বিনিয়োগের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও রফতানি উন্নয়ন এবং
৪. দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা বা দুর্যোগ প্রস্তুতি।

এই চার খাত ছাড়াও জাপান মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জনকেও জাপান গুরুত্ব দিচ্ছে।

এই খাতগুলোর বাস্তবায়ন কর্মকান্ডে জাপানিজ ইনটারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা) দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে জাইকা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হ"ছে ম্যানুফ্যাকচারিং মিল্প। জাপান এ খাতকেও সহায়তা দি"ছে। অন্যতম প্রধান উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে জাপান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ জাপানী বিনিয়োগঃ জাপান বাংলাদেশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দি"ছে। বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ একদম কম নয়। বিনিয়োগ বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া এবঙ যুক্তরাজ্যের পরেই জাপানের অবস্থান। জাপানের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিনিয়োগনীতির প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য জাপান আন্তরিক বলে ঘোষণা করেছে। জাপানের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতি এবং বাংলাদেশী শ্রমিকদের নিষ্ঠা , কমিটমেন্ট ও কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট । তবে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ এখনও জাপানী বিনিয়োগকারীদের কাছে অপরিচিত।

ইপিজেডে জাপানী বিনিয়োগঃ জাপানের ১৩টি কোম্পানী বাংলাদেশের চট্টগ্রামের রফতানি প্রক্রিয়াজাত জোন-সি ইপিজেডে বিনিয়োগ করেছে। ইপিজেডে জাপান দ্বিতীয় বৃহত্তর বিনিয়োগকারী দেশ।

ইপিজেডের বাইরে বিনিয়োগঃ ইজিজেডের বাইরে বাংলাদেশে জাপানের ৪০টি কোম্পানী বিনিয়োগ করেছে।

আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণঃ আর্সেনিক সমস্যার জন্য বাংলাদেশের জনগণের একটা বড় অংশ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে জাপান বাংলাদেশের যশোর, ঝিনাইদহ এবং চুয়াডাঙ্গায় নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে।

যমুনা সেতু প্রকল্প সহযোগিতাঃ যমুনা সেতু প্রকল্পে জাপান বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশে জাপানী পুঁজি বিনিয়োগের বড় সমস্যা হ"ছে এখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রশাসনিক জটিলতা, শ্রমিক সংগঠন সমূহের রাজনীতি জাপানী বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করেছে। জাপানী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে দীর্ঘ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে চায়। বাংলাদেশকে জাপানী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের কাছে লোভনীয় করতে হলে এখানে পুঁজি বিনিয়োগের পরিস্থিতি উন্নত করতে হবে। জাপান তার দেশের সহায়তা কৌশলপত্রে বাংলাদেশের জন্য ককেটি বিষয়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এগুলো হ"ছে : বড় দুলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত, সরকারি নীতির অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, মানবাধিকার লংঘন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে জাপানী সাহায্যঃ জাপান বাংলাদেশে অন্যতম সাহায্যদাতা দেশ। বাংলাদেশের সাথে শিল্পোন্নত দেশ জাপানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আলোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ হ"ছে জাপানের সাহায্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। ২০১১ সালে জাপান সুনামির আঘাতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হলেও বাংলাদেশে তার সাহায্য অব্যাহত রাখার কথা ঘোষনা করেছে।

১৫.১৪ বাংলাদেশ-জার্মানী সম্পর্ক

জার্মানী ইউরোপের একটি শক্তিশালী দেশ। বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশটি বর্তমানে বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি (পশ্চিম জার্মানি), জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (পূর্ব জার্মানি) ও বার্লিন আনুষ্ঠানিভাবে মিলিত হয়ে বর্তমান জার্মানি গঠন করে। একীভূত জার্মানির আয়তন ৩,৫৭,০৪১ বর্গ কি.মি। পশ্চিম ইউরোপের এ দেশটির মাটি উর্বর, আবহাওয়া মনোরম ও খনিজ সম্পদ প্রচুর। নানা প্রয়োজন ও অজুহাতে বিভিন্ন দেশে যখন বাঙ্কার নির্মাণ ও বন্দুক নির্মাণ হচ্ছে, ঠিক সেই সময় বিশ্বে সবচেয়ে সবুজ দেশ হিসেবে জার্মানির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাজধানী বার্লিন বন থেকে বার্লিনে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে। ৯টি দেশ ও বাল্টিক সাগরের সাথে জার্মানির সীমান্ত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে বন্ডিত জার্মানি ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর মধ্যরাতে পুনরায় একত্রিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ১৯৯০ সালের ১ অক্টোবর বার্লিনসহ সমগ্র জার্মানির ওপর তাদের সকল অধিকার স্থগিত ঘোষণা করায় দুই জার্মানির একত্রীকরণ দ্রুত সম্ভব হয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানির নাম হয় ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি। পশ্চিম জার্মানির পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, মুদ্রা বহাল রাখা হয়। পূর্ব জার্মানির সরকার, সেনাবাহিনী, পুলিশ, কূটনৈতিক সার্ভিসসহ সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ জার্মানির ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় পূর্ব জার্মানির বিলুপ্তির মাধ্যমে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ইতোমধ্যেই। বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জার্মানি এখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। একত্রীকরণের ফলে সমগ্র জার্মানবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। উন্নয়নের জন্য সকল জার্মান ঐক্যবদ্ধ। আধুনিক ইতিহাস শান্তিপূর্ণভাবে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার দুটি রাষ্ট্রের একীভূত হওয়া এক অনন্য ঘটনা।

জার্মানির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক: জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা পূর্ব জার্মানি ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পশ্চিম জার্মানিও ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দেয়ার পর পরই বাংলাদেশ ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কূটনীতিক হুমায়ন রশীদ চৌধুরী ১৯৭২ সালে পশ্চিম জার্মানিতে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে সুইজারল্যান্ড, ভ্যাটিক্যান সিটি এবং অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের দূতের দায়িত্বও দেয়া হয় তাঁকে। ১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী লফথ্থানসা বিমানে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে পশ্চিম জার্মানি পৌঁছেন। তিনি পশ্চিম জার্মানির প্রেসিডেন্ট মি. লুবকির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন। তখন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেল (প্রধানমন্ত্রীর মতো পদ) ছিলেন উইলি ব্রান্ট (শাসনকাল ১৯৬৯-১৯৭৪)। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াল্টার কিড। চ্যান্সেলর ইউলি ব্রান্টের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ হলো। প্রথম সাক্ষাতেই চ্যান্সেলর বললেন, জার্মানি বাংলাদেশকে সাহায্য করতে আগ্রহী। তবে শর্ত হচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অর্ধেক কর্জ শোধ করতে হবে।

বাংলাদেশে জার্মানির সহযোগিতা: বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের ঐকান্তিক চেষ্টায় জার্মান চ্যান্সেলর মত পাল্টালেন। ১৯৭২ সালেই জার্মান প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। ঢাকায় তারা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। ঢাকাতেই জার্মান প্রতিনিধিদল ঘোষণা দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে দেনার প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখেই জার্মান সরকার বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে ৫০ বছর মেয়াদি ঋণ দিবে। ১০ বছর থাকবে অতিরিক্ত সময়। সুদ শতকরা ১০ ভাগ। সর্বমোট ৭০ মিলিয়ন ডলার। এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা। অর্থনৈতিক কূটনীতির সাফল্য তো বটেই। সবচেয়ে সুলভ ঋণ ছিল এটি।

বাংলাদেশে জার্মানির প্রধান সহযোগির ক্ষেত্রেগুলো নিম্নরূপ:

১. পরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন;
২. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ;
৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়ন;

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ;
৫. কৃষি উন্নয়ন;
৬. পল্লী উন্নয়ন;
৭. সাইকোন শেল্টারস ও স্কুল নির্মাণ;
৮. বেসরকারী খাতের উন্নয়ন এবং
৯. বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন।

পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর: ১৯৭৪ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী হোস্ট ঝিতারম্যান চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশের সাথে পূর্ব জার্মানির ১৯ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক: ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর এক জার্মানির আত্মপ্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশের সাথে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশ গুরুত্ব দান: যুক্ত জার্মানি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গঠনমূলক ভূমিকার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জার্মানি বাংলাদেশের এ ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

উন্নয়ন সহায়তা: যুক্ত জার্মানি বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন সহায়তা দিচ্ছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জার্মানি অন্যতম প্রধান দাতা দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশকে জার্মানির সহায়তা প্রদানের খাতগুলো হচ্ছে: এমএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন, শিল্পের পরিবেশ সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণ, জ্বালানি চাহিদা পূরণ, মানবাধিকার, সুশাসন প্রভৃতি। স্বাস্থ্য খাত ও উন্নয়ন সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

২১.১৫ বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্ক

OIC, NAM, কমনওয়েলথ, D-৮ এবং ARF এর মত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া উভয়ই বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের লক্ষ্যে কাজ করছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি শান্তি প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও সম্পর্কের মূল্যায়ন এদের মূল লক্ষ্য। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অর্থনৈতিক ভাবে তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। এখানে বৈধ ও অবৈধ শ্রমিকের সংখ্যা ২.৬ মিলিয়ান। প্রায় ২ লক্ষ বাংলাদেশী মালয়েশিয়াতে কর্মরত। দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলো হল অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলী সহায়তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমিক বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, শিক্ষা বিনিময়, পর্যটন, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা প্রযুক্তিত হস্তান্তর এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। ASEAN-এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে মালয়েশিয়া। ২০০৭ সালে ৫৯টি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খাত হলো টেলিযোগাযোগ, শক্তি, টেক্সটাইল ও অর্থনৈতিক খাত। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশ মালয়েশিয়াতে ১৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি এবং ৩.৮৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। দ জনশক্তি রপ্তানিতে দুটি দেশের সহযোগিতার অবস্থান দৃঢ় হলে ২০০৭ সা সম্পর্কের অবনতি ঘটলে মালয়েশিয়া শ্রমিক আমদানি বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের শ্রমিকরা পাওনা আদায়ে কুয়ালালামপুরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলেও পরবর্তীতে দুই সরকারের হস্তক্ষেপে তা নিরসন হয়। ২০০৭ সালেই বেশ কয়েক হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসন সনদপত্র পায়। Free Trade Agreement-এর আওতায় বাণিজ্য পরিচালনা এবং গার্মেন্টিক্যালস্ রপ্তানি উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্যের বিভিন্ন দিকসহ শক্তি উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়নে মালয়েশিয়া বাংলাদেশে কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণে ১.২ বিলিয়ন ডলার প্রদানের আশ্বাস শক্তি উৎপাদন ও বন্দর উন্নয়নে সহযোগিতার কথা দেয় মালয়েশিয়া। বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীরতর হচ্ছে। দু'দেশের মাঝে সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব তুন রাজাকের বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে (১৮ নভেম্বর ২০১৩)।

অনুশীলনী (Exercise)

ক-বিভাগ (part-A)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (নতুন নিয়ম অনুযায়ী)
(Brief Questions & Answer)

১. ট্র্যাক-২ কূটনীতি কী?
উত্তর : বিবাদ মিটাতে সুশীল, মিডিয়া, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবহারকে ট্র্যাক-২ কূটনীতি বলে।
২. ট্র্যাক-৩ কূটনীতি কী?
উত্তর : দাতাগোষ্ঠী যেমন IMF, WB, ADB, JICA ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যমান বিবাদের মীমাংসা।
৩. মাল্টিট্র্যাক কূটনীতি কী?
উত্তর : যখন কূটনীতিতে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়।
৪. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি কী?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে।
৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি কী?
উত্তর : সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয় (Friendship to all and malice to none)।
৬. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখ।
উত্তর : আত্মরা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি।
৭. ভারত-বাংলাদেশকে কত তারিখে স্বীকৃতি প্রদান করে।
উত্তর : ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর।
৮. বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় কত তারিখে?
উত্তর : ১৭ মার্চ, ১৯৭২।
৯. বাংলাদেশের কয়দিকে ভারতের অবস্থান?
উত্তর : তিন দিকে। যথা: পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব।
১০ মায়ানমারের কয়দিকে ভারতে অবস্থান?
উত্তর : পূর্ব।
১১. সিট মহল কী?
উত্তর : একদেশের ভূমি অন্যদেশে থাকলে তাকে সিটমহল বলে।
১২. বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের কয়টি সিট মহল আছে?
উত্তর :১১১টি।
১৩. ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের কয়টি সিট মহল আছে?
উত্তর : ৫১টি
১৪. মুজিব ইন্দিরা চুক্তি কতসালে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৪ সাল।
১৫. "Bangladesh Inc Border Wall of Death"- মন্তব্যটি কে করেছেন?
উত্তর : রাষ্ট্রভিত্তিক বাদ সংস্থা Global Post.
১৬. কোন বাংলাদেশীকে Bo হত্যা করে কাটাতারে ঝুলিয়ে রাখলে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে?
উত্তর : ফেলনী।
১৭. কতসালে ফারাক্কা বাঁধ ণি করা হয়?
উত্তর : ১৯৫১ সালে।
১৮. ফারাক্কা বাঁধ কোন নদীর ব অবস্থিত?
উত্তর : পদ্মা/গঙ্গা।
১৯. ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ কে?
উত্তর : মাওলানা আব্দুল হামিদ ন ভাষানী।
২০. ফারাক্কা সমস্যা কত সালে জাতি ঘ উপস্থিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

Go to Contents
http://thejobstudy.com

২১. ভারত বাংলাদেশ পানিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।
২২. ভারত কোন নদীর মোহনায় টিপাই মুখ বাঁধ নির্মাণ করতে চাচ্ছে?
উত্তর : বরাক নদীতে।
২৩. বাংলাদেশের জন্য ভারতের কোন প্রকল্পটি সবচেয়ে ক্ষতিকর হবে?
উত্তর : আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প।
২৪. ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৭২ সালে।
২৫. বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা কত সালে?
উত্তর : ১৯৭৫ সালে।
২৬. বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি প্রথম চীন সফর করেন?
উত্তর : জিয়াউর রহমান।

খ-বিভাগ (Part-B)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions)

১. ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদানগুলো কী কী?
খ. বাংলাদেশ ভারত যুদ্ধকালীন সম্পর্ক লিখ।
২. ক. বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত সম্পর্ক লিখ।
খ. বাংলাদেশ ভারত পানি বণ্টন লিখ।
৩. ক. বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক লিখ।
খ. বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক লিখ।
৪. ক. বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক লিখ।
খ. বাংলাদেশ মায়ানমার সম্পর্ক লিখ।
৫. ক. বাংলাদেশ আমেরিকা সম্পর্ক লিখ।
খ. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

গ-বিভাগ (Part-B)

১. বাংলাদেশ-ভারতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিস্তা আলোচনা করুন?
২. বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর?
৩. বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কী করণী আছে বলে আপনি মনে করেন?
৪. বাংলাদেশ ও চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আলোচনা করুন?
৫. বাংলাদেশ ও জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আলোচনা করুন

অধ্যায় ১৬

বহু-পাক্ষিক সম্পর্ক
Multilateral Relation

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

১৬.১ ভূমিকা:
১৬.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কিউবার সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ ও সম্ভাব্য গতি প্রকৃতি
১৬.৩ এক নজরে যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:
১৬.৪ সম্পর্ক উন্নয়ন ও কিউবা-যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি
১৬.৫ সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বৈধকে মার্কিন-কিউবা নেতৃত্ব

১৬.১ ভূমিকা:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রতি বারাক ওবামা গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ কিউবার রাষ্ট্রপতি রাউল ক্যাস্ট্রোর সাথে টেলিফোনে আলোচনার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ জোরালো করেন। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা দ্বন্দ্বের জন্ম ১৯৫৯ সালে। ২৬ জুলাইয়ের বিপ্লবী দল মার্কিন সমর্থিত বাতিস্তাকে হটিয়ে দিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইজেনহাওয়ার কিউবার বিরুদ্ধে প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপের নতুন যুগের সূচনা করেন। সেই থেকে বিভিন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে নিষেধাজ্ঞার মাত্রা বৃদ্ধির দিকেই যেতে থাকে। মার্কিন যুক্তরা এবং কিউবার মধ্যে মাত্র নব্বই মাইল সমুদ্র দূরবর্তী দেশ হিসাবে তাদের ঐতিহাসিক বন্ধন অত দৃঢ় ছিল।

১৬.৫ সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বৈধকে মার্কিন-কিউবা নেতৃত্ব

কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠাবিহীন অবস্থাতেও সীমিত আকারে 'ইন্টারেস্ট সেকশানের" মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। পূর্নাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে তা দু'দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে এবং বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে উদার মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার পূর্নাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৬০ সালে বিশ্বে শীতল যুদ্ধাবস্থায় যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তা পুনঃস্থাপন হচ্ছে। মাঝে ৫৩টি বছর কিন্তু কম সময় নয়।

১৯৮২ সালে কিউবাকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল। তবুও দু'দেশের মধ্যে ঘোষিত ও অঘোষিত ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে বিদ্যমান ছিল তেমনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা থেকে হরহামেশা আসা আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও ভ্রমণকারীরা কিউবায় যেত। ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিউবায় ৭৪৮,৭৪৭,২৯৩ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স কিউবায় গেছে।

১৬.৩ এক নজরে যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

১৯৫৯→ ৯ হাজার গেরিলা যোদ্ধা নিয়ে হাভানায় অপারেশন চালান ফিদেল ক্যাস্ট্রো। যুক্তরাষ্ট্রে
↓ প্রেসিডেন্ট ফুলগোনিকো বাতিস্তা পালিয়ে যান এবং ক্যাস্ট্রো প্রধানমন্ত্রী হন।
১৯৬০→ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করেন ক্যাস্ট্রো। ওয়াশিংটন হাভানার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।
↓
১৯৬১→ নির্বাসিত কিউবানরা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় পিগস উপসাগরে অভিযান চালায়। ক্যাস্ট্রো
↓ কিউবাকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোট করেন।
১৯৬২→ কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েনে ক্যাস্ট্রো রাজি হলে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে
↓ উত্তেজনা তৈরি হয় ও পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকা তৈরি হয়।
১৯৮০→ ফিদেল ক্যাস্ট্রো নির্বাসিনের সুযোগ নিলে দেশটির ১ লাখ ২৫ হাজার নাগরিক কিউবা
↓ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেয়।
১৯৯৬→ মার্কিন কংগ্রেস কিউবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে Helma- Burton আইন পাস করে।
↓
২০০০→ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ কিউবার ওপর নতুন করে অবরোধ আরোপ করেন।
↓
২০০১→ হারিকেন মিশেল আঘাত হানার পর কিউবা সরকারের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য সহায়তা
↓ পাঠায়। ৪০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কিউবার খাদ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্র।
২০০২→ ক্যাস্ট্রো ক্ষতায় আসার পর প্রথম কোনো মার্কিন নেতা হিসেবে কিউবা সফর করেন সাবেক
↓ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। কিউবায় জৈব অস্ত্র বহির অভিযোগ দেশটিকে "শয়তানের অক্ষ' তালিকাভূক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র।
২০০৩→ জর্জ ডব্লিউ বুশ কিউবার সমাজতান্ত্রিক শাসন উৎখাতের ঘোষণা দেন।
↓
২০০৪→ কিউবার ডলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। বাণিজ্যির ক্ষেত্রে একমাত্র স্থানীয় মুদ্রা পেসোকে
↓ বাধ্যতামূলক করা হয়।
২০০৬→ ফিদেল ক্যাস্ট্রো অসুস্থ হয়ে অস্ত্রোপাচারের জন্য ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
↓ করেন।
২০০৯→ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কিউবায় পারিবারিক ভ্রমণ ও রেমিটেন্সের ওপর থেকে
↓ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।
২০১১→ ইউএসএইড কর্মী মার্কিন নাগরিক অ্যালান গ্রসকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ১৫ বছরের
↓ কারাদন্ড দেয় কিউবা। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কিউবার সম্পর্কের ম[illegible] টানাপোড়েন শুরু হয়।
২০১৪→ ১৬ ডিসেম্বর ১৮ মাস ধরে চলা গোপন আলোচনার পর এক[illegible] ফোনালাপে যুক্তরাষ্ট্র ও
↓ কিউবার প্রেসিডেন্ট বন্দি বিনিময় করাসহ নানা বিষয়ে এক[illegible] হন। এসবের মধ্যে রয়েছে
একে অন্যের দেশে দূতাবাস খোলা, বাণিজ্যের ওপর থে[illegible] নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া এবং
সম্পর্ক উন্নত করা।
২০১৪→ ১৭ ডিসেম্বর কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভা[illegible] করার ঘোষণা দেন মার্কিন
↓ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা
২০১৫→ ২১ জানুয়ারি কিউবার রাজধানী হাভানায় কিউবা[illegible]ষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাথে দুই দিন ধরে
বৈঠক করেন মার্কিন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা।

রপ্তানি হয়েছে। ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স কিউবায় গেছে।

১৬.৫ সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বৈধকে মার্কিন-কিউবা নেতৃত্ব

১. **বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার:** বস্তুত শীতল যুদ্ধের অবসান শেষে ১৯৯১ এর পর থেকে তৎকালীন অখন্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কিউবার ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকায় বাণিজ্য ঘাটতি আরো বাড়তে থাকে। ফলে কিউবায় প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন তেল, খাদ্য, ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা যায়। তাই কিউবা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানিয়েছে। অবশ্য কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ওবামা প্রশাসনের পক্ষে হট করে বাণিজ্যের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া সম্ভব নয়।

২. **কিউবার পর্যটন শিল্পের প্রসার:** কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেলে কিউবার পর্যটন খাতের বিকাশ সাধিত হবে। কিউবার পর্যটকের সংখ্যা ৫ লাখ থেকে ১০ লাখে প্রতিবছর উন্নীত হতে পারে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে এ খাতের সাথে সংযুক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নৌ ভ্রমণ ব্যবস্থা, বিমান খাতে, হোটেল- মোটেল- রিসোর্টের আধুনিকায়ন বাড়বে। ফলে পর্যটনকে কেন্দ্র করে কিউবার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে। মোট জাতীয় আয় বাড়বে। আর্থিকভাবে কিউবা অনেক বেশি লাভবান হবে।

৩. **কিউবার তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটবে:** ওবামা প্রশাসন ১৩ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিসমূহকে কিউবায় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে কিউবার ফাইবার অপটিকস ক্যাবল স্থাপন এবং বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি কিউবার অভ্যন্তরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহন করে। কিন্তু মার্কিন কোম্পানীরা এ খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সে সময়ে বেশ কয়েকটি কারনে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পাশাপাশি আবার কিউবায় বিনিয়োগ করলে রাজনৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনাও ছিল। কেননা সেখানে বামপন্থিমতবাদ ধীরে ধীরে হ্রাস পেলেও যদি একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তবে মূলধনসহ তাদের বিনিয়োগ হারাতে হতে পারে। ফলে আবার আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়ায় কিউবার কঠোর মনোভাব অনেখানি হ্রাস পাবে।

৪. **যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খাদ্য বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে:** খাদ্য চাহিদার ৮০% কিউবা বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। ২০০৮ সাল হতে এর অধিকাংশ এসে থাকে আমেরিকা থেকে। ২০১৩ সালে আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্য বাবদ কিউবা আমদানি পরিশোধ করেছে ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পণ্যসমূহের মধ্যে শীর্ষ তিনটি সামগ্রী হচ্ছে হিমায়িত মুরগী, সয়াবিন মিল পশুর খাওয়ার ইত্যাদি। দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী ও বন্ধনের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজাতপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করবে।

৫. **বাণিজ্য খরচ হ্রাস পাবে:** যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ আমেরিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রপ্তানি পর আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি হওয়া সহজতর করবে। বর্তমানে পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমেরিকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূর্বেই নগদ অর্থে পেতে হয় এবং লেনদেন সংঘটিত হয় তাকে তৃতীয় কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এর ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের খরচ বেশি যায়। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে দু'দেশের মধ্যে সরাসরি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হবে ত করে দুই দেশের বাণিজ্য খরচ হ্রাস পাবে।

৬. **কিউবায় মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আশা করছে যে, কৃষি, এবং জ্বালানি খাতে কিউবায় তাদের বর্তমানে যে

লেনদেন রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে বাড়বে। কিউবার এখন বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। ব্রাজিলের পুঁজি সহায়তার মাধ্যমে কিউবা তার সমুদ্র বন্দর বিনির্মাণ করছে। আমেকিার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সমুদ্র বন্দরের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে মার্কিন কোম্পানিগুলো আগ্রহী হবে।

৭. **কিউবার মুক্ত বাণিজ্যের পথ সুগম হবে:** চীনের সাথে কিউবার সম্পর্ক সম্প্রতি বেশ উষ্ণ হচ্ছিল। ২০১৪ সনের জুলাইতে চীনের রাষ্ট্রপ্রতি এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রতি পৃথকভাবে কিউবা সফর করেন। তাঁরা উভয়েই কিউবার সাথে সম্পর্ক আরো গভীর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। চীন ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনস্থাপনকে স্বাগত জানিয়ে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য বলেছেন। মুক্ত বাণিজ্য শুরু করা গেলে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থায় কিউবার অর্থনীতি লাভবান হবে।

৮. **দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে:** কিউবার অর্থনীতিতে অর্ধেকের বেশি রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে চিনি ও মধু। এছাড়াও রয়েছে নিকেল, মাছ, টোবাকো, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও ওষুধ সামগ্রী। আমদানিতব্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে পিট্রোলিয়াম, খাদ্য মেশিনারীজ এবং ক্যামিকেলস। বর্তমানে কূটনৈতিক জগতে ব্যবসা-বাণিজ্যই মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন হলে দুই দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মূল্যায়ন: মার্কিন জনগণের পাশাপাশি কিউবার জনগণও দেখেছে যে দু'টো দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলে তা উভয় দেশের জন্যে ডরহ-ডরহ অবস্থায় সৃষ্টি করবে। তাই ৫৩ বছরের মধ্যে শেষ দশ বছরে নিষেধের দেয়াল একটু একটু করে সরেছে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক মতবাদের কাছে পরাস্ত হয়। ভৌগোলিক কারণেই দু'টো দেশের সম্পর্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবার অভিবাসীরা সবসময়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে। মার্কিন-কিউবা সংলাপ তাৎক্ষনিকভাবে বিরাট পরিবর্তন আনবে, এমন বলা কঠিন। হাভানায় মার্কিন দূতাবাস স্থাপনসহ মার্কিনী নিষেধাজ্ঞাগুলোর অপসারন না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন- কিউবা সম্পর্ক স্বাভাবিক অবস্থান আসতে পারবে না।

১৬.৫ সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বৈধকে মার্কিন-কিউবা নেতৃত্ব

১০-১১ এপ্রিল ২০১৫ পানামার রাজধানী পানামা সিটিতে উত্তর দণি আমেরিকার দেশগুলোর দুই দিনব্যাপী ৭ম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালের পর এবার ই প্রথম কোনো কিউবান প্রেসিডেন্টকে Summit of the Americas (SOA)-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়। (SOA) সম্মেলনে কমিউনিস্ট কিউবার অংশগ্রহণ ছিল এবারই প্রথম। এ সম্মেলনের ফাঁকেই ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার নেতারা।

১. **পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক:** যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে ৫৭ বছর পর মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৯ এপ্রিল ২০১৫। এ দিন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ও কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেস-এর মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে দুই দেশের মন্ত্রীপর্যায়ের সর্বশেষ বৈঠকটি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে।

২. **ওবামা-ক্যাস্ত্রোর বৈঠক:** ১০ এপ্রিল ২০১৫ কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সাথে ঐতিহাসিক করমর্দন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এর আগে একবারই দুই নেতা করমর্দন করেছেন-২০১৩ সালে দণি আফ্রিকায় দেশটির কিংবদন্তি নেতা প্রায়ত নেলসন ম্যান্ডেলার এক স্মরণসভায়। এরপর ১১ এপ্রিল মিলিত হন। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও কিউবার বিপ-বী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মধ্যে দেখা হওয়ার পর এটাই ছিল

চিরবৈরী দুটি দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রথম বৈঠক। বন্ধুত্বের নতুন অ প্রবেশ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা। অর্ধশতাব্দী পর প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুদশের কূটনৈতিক সম্পর্ক। মার্কিন-কিউবা সম্পর্কের গতিবিধি তুলে ধরা হয়েছে এ আয়োজনে।

মূল্যায়ন

'কালো তালিকা' থেকে বাদ কিউবা সন্ত্রাসবাদে মদদ দেয়ার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের করা 'কালো তালিকা' থেকে কিউবার নাম বাদ দিতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ১৪ এপ্রিল ২০১৫ কালো তালিকা থেকে কিউবার নাম বাদ দেয়ার বিষয়ে কংগ্রেসকে অবহিত করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ওবামার এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে মার্কিন আইনপ্রণেতারা ৪৫ দিন সময় পাবেন। অন্যথায় তা বাস্তবায়নের দিকে গড়াবে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে মদদ দেয়ার অভিযোগে কিউবাকে ১৯৮২ সালে কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে কিউবাকে এতোদিন অর্থনৈতিক ও অস্ত্র রফতানির ওপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকতে হয়েছে। সেই সাথে বিশ্ব ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থঋণের বিষয়ে বিভিন্ন বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। কিউবা বাদ গেলে ওয়াশিংটনের কালো তালিকায় থাকবে আরও তিন দেশ-ইরান, সুদান ও সিরিয়া।

সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions)

১. কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের বহুপাক্ষিক সম্পর্ক আলোচনা করুন?
২. কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের বহুপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে কোন দেশ কে আপনি নমনিয় দেখছেন?
৩. কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সম্পর্কের মধ্যে কিউবা কি কোন রকম সুবিধা পাবে?

অধ্যায় ১৭

সাজেশন্স : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোর

- **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলনে গৃহীত "বালি প্যাকেজ" বাংলাদেশের কোন কোন খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে?**

উত্তর: বালি প্যাকেজের ফলে বাংলাদেশের যেসব খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সেগুলো হল:

১. তুলা রপ্তানিকারক আফ্রিকার কয়েকটি স্বল্পোন্নত দেশের তুলা রপ্তানি সহজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ তুলা রপ্তানির ওপর ভর্তুকি প্রত্যাহার করবে। এর ফলে বিশ্ববাজারে তুলা ও সুতা আমদানি করতে বাংলাদেশকে আগের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করতে হবে।
২. জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নয়নশীলদেশগুলোকে আরো সুবিধা দেয়া হয়েছে। এজন্য দেশগুলোকে খাদ্য মজুদ করে ভর্তুকি মূল্যে তা বাজারে সরবরাহের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশকে খাদ্য আমদানি করতে হলে আগের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে হবে।
৩. বালি প্যাকেজে রপ্তানি ভর্তুকি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। যার ফলে দেশের পোশাক শিল্প তির সম্মুখীন হবে।

- ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প মোট ৩৭টি নদীকে ৩০টি সংযোগ খালের মাধ্যমে যুক্ত করবে। ৩০টি সংযোগ খালের মোট দৈর্ঘ্য হবে আনুমানিক ১২ হাজার কিলোমিটার। পরিকল্পনা অনুযায়ী সংযোগ খালগুলো ৫০-১০০ মিটার প্রস্থ ও প্রায় ৬ মিটার গভীর হবে। এর ফলে আমাদের দেশে যেসব তিকর প্রভাব দেখা যাবে সেগুলো নিচে উলে-খ করা হলো:

১. মরুকরণ
২. ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিভাগের পানিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাবে।
৩. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাবে ফলে সেচ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে
৪. কৃষি ক্ষেত্র ধ্বংস হবে
৫. আর্সেনিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে
৬. নৌ পরিবহন ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হবে
৭. জীব বৈচিত্র্য ধ্বংশ হবে
৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে
৯. মাছের আবাসস্থল নদী, নালা, খাল, বিল, জলাশয় ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়ায় মাছের সব প্রজাতি বিনষ্ট হবে
১০. পৃথিবীর সবচাইতে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন বিলুপ্ত হয়ে যাবে ও
১১. নদীতে পানির প্রবাহ কমে গেলে পলিমাটি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের উপর আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবগুলো বিশে-ষণ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় এই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য হুমকীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

- **বাংলাদেশকে বিশ্বের পরবর্তী এগারো উত্থানশীল অর্থনীতির অন্যতম দেশ হিসেবে বিবেচনা করার কারণগুলো কি কি?**

উত্তর: বাংলাদেশকে বিশ্বের পরবর্তী এগারো উত্থানশীল অর্থনীতির অন্যতম দেশ হিসেবে বিবেচনা করার কারণগুলো নিচে উলে-খ করা হল:

১. ক্রমহ্রাসমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি
২. বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের উপর নির্ভরতা হ্রাস

৩. বাণিজ্য ভারসাম্য অনুকূলতা
৪. কৃষিখাতের উন্নয়ন
৫. জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি
৬. রপ্তানী বৃদ্ধি
৭. ক্রমবৃদ্ধিমান রেমিটেন্স প্রবাহ
৮. ক্ষুদ্রঋণের ইতিবাচক প্রভাব
৯. নারীদের কর্মসংস্থান ও
১০. এমডিজির ল্যামাত্রা অর্জনে সফলতা।

● আসেমের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন ?

উত্তর: ইউরোপের ৩০টি দেশ এবং এশিয়া-ওসেনিয়ার ২১ টি দেশ নিয়ে সৃষ্ট এ জোট বর্তমানে বিশ্বের ৬২ শতাংশ মানুষ, বিশ্ব জিডিপির ৫৬ শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ৬৩ শতাংশের বেশি প্রতিনিধিত্ব করে। এই জোটে বাংলাদেশ, মিয়ানমার, লাওস ও কম্বোডিয়া ছাড়া আর সবই উন্নত ও উদীয়মান বিশ্বের সদস্য। এ কারণেও গ্রুপটির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। আসেম গঠনের মধ্যদিয়ে এশিয়া ও ইউরোপের হাজার হাজার বছরের রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক, ও সামাজিক সম্পর্কে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে । দুই মহাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতাকে গভীরতর করার সুযোগ স"ষ্টি হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য এড়ানোর একটি কার্যকর কৌশল হিসেবেও আসেম একটি উত্তম ফোরাম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আসেমের প্রধান গুরুত্ব হল:

১. এশিয়া-ইউরোপের কানেকটিভিটি বৃদ্ধি ;
২. আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি ;
৩. শ্রমের অবাধ প্রবাহের সুযোগ সৃষ্টি ;
৪. বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও
৫. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এশিয়া ও ইউরোপের প্রভাব প্রতিষ্ঠা।

● BCIM চালু হলে বাংলাদেশে কিভাবে উপকৃত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার যে BCIM নামে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্ববহন করে। ২০১৩ সালের মে মাসে বিসিআইএম- এর আওতায় ইকোনোমিক করিডোর গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

BCIM আঞ্চলিক ইকোনমিক করিডোর চালু হলে বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হবে। এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত চীন এবং ভারতের অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংরাদেশ বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা প্রত্যাশা করতে পারে। এগুলো হল:

১. বাণিজ্য বৃদ্ধি
২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তি আমদানি
৩. বিনিয়োগ প্রাপ্তি
৪. প্রযুক্তি সহায়তা প্রাপ্তি
৫. স্বল্পমূল্যে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি
৬. সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি
৭. পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব থেকে মুক্তি ও
৮. কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি

● বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতকে ট্রানজিট প্রদান করার পূর্বে কি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত?

উত্তর: ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া উচিত:

১. বিবাদমান ইস্যুসমূহ সমাধানে প্রতিশ্রুতি আদায় করা;
২. ট্রানজিট কানেক্টিভিটিতে বাংলাদেশের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করা
৩. অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
৪. জাতীয় নিরাপত্তা বিবেচনায় রাখা
৫. ট্রানজিট ফি বা মাশুল নির্ধারণ করা
৬. জাতীয় সংসদে চুক্তিটি আলোচনায় আনা ও
৭. জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

● SDGs এর লক্ষ্যসমূহ কি কি?

উত্তর: ২০১২ সালের জুনে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘ আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে এমডিজি'র ওপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলাস (এসডিজি) গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ঝউএং এ লক্ষ্যমাত্রা যেগুলো হবে বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলো হল:

১. খাদ্য নিরাপত্তা
২. সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা
৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানী
৪. টেকসই এবং স্বাভাবিক শহর

৫. স্বাস্থ্যকর এবং উৎপাদনশীল সাগর
৬. প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতা উন্নয়ন
৭. সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা এবং টেকসই উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণ এবং
৮. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

● SDGs ও MDGs এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: সহস্রাব্দ উন্নয়ন ল্য বা এমডিজি এবং তৎপরবর্তী শুরু হতে যাওয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি দুটিই বৈশ্বিক উন্নয়নের রূপকল্প। এমডিজি শেষ হবে ২০১৫ সালে আর এসডিজি শুরু হবে ২০১৬ সাল থেকে। কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে এসডিজি ধারনাটি এমডিজি থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়। যেমন, এমডিজি'র আটটি লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র একটি পারিবেশিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে জড়িত। অন্যদিকে এসডিজি টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি দিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবেশিক উন্নয়ন ল্য নিয়ে গঠিত। যার মাধ্যমে পরিবেশাভাবাপন্ন দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে। দ্বিতীয়ত এমডিজির ল্যগুলো প্রধানত উন্নয়নশীল দেশকেন্দ্রিক, যেখানে এসডিজি উন্নয়নশীল ও উন্নত বা বিশ্বের সব দেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া যেখানে এমডিজির ল্যগুলো অপোকৃত দ্রুত একীভূত যদিও কয়েকটি লক্ষ্যে এর অর্জন প্রত্যাশিতরূপেই প্রতিফলিত, সেখানে ল্য অর্জন, বিবদমান বিষয়ে ভারসাম্য আনয়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে পূরণে এসডিজি গভীরভাবে বিশে-ষিত প্রণীত হওয়ার পথে। তবে এসডিজি সার্বিকভাবে এমডিজিকে নতুনভাবে বিশ্বে বহমান রাখার নতুন রূপকল্প।

● বিকস (BRICS) কি?

উত্তর: বিশ্বের পাঁচটি উদীয়মান অর্থনীতির জোট ব্রিকস্। ২০০১ সনে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন মিলে গড়ে তোলে ব্রিকস। ২০১০ সনে আফি"কা এই জোটে যোগ দিলে জোটটির নামকরণ হয় ব্রিকস। এই জোটের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ার ইকটেরিনবার্গে। সমতা, গণতান্ত্রিক ও বহুপীয় বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা এ জোট করেছে বলে ঘোষণা দেয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্য, রাজনীতিতে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে উৎসাহ প্রদান এবং এই ক্রেগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা। ব্রিকসের সব সদস্য রাষ্ট্রগুলোই উন্নয়নশীল এবং নব্য শিল্পায়িত দেশ। ৫টি সদস্য দেশেরই রয়েছে বৃহৎ এবং দ্র"ত উন্নয়নশীল অর্থনীতি। এছাড়াও ব্রিকসের সদস্য দেশগুলোর আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। উলে-খ্য এই জোটের সব সদস্য রাষ্ট্রই জি- ২০ এর সদস্য।

● আসেম কি ?

উত্তর: একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক , সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সহযোগিতামূলক সম্পর্কের গভীরতা নিশ্চিত করতে ১৯৯৬ সালে থাইল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (আসেম) । প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। ৪৯ টি রাষ্ট্র ছাড়াও 'ইউরোপিও কমিশন' ও 'এশিয়ান সেক্রেটারিয়েট ' আসেমের সদস্য হিসেবে কাজ করছে। দু'বছর অন্তর পালাক্রমে এশিয়া-ইউরোপে আসেম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।২০১২ সালে বাংলাদেশের পাশাপাশি নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড আসেমের সদস্যপদ লাভ করে। তখন এই তিনটি দেশ , দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক জোট আসিয়ানের ১০টি দেশ , ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এর ২৭ টি দেশ ছাড়াও চীন, জাপান, দক্ষিন কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজল্যান্ড, রাশিয়া, এবং ইউরোপীয় কমিশন ও আসিয়ান সেক্রেটারিয়েট নিয়ে এ গ্রুপের সদস্যসংখ্যা ৫১ এ উন্নিত হয়েছে।

● ব্রিকস থেকে বাংলাদেশের কীকী প্রাপ্তির সম্ভাবরনা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: ব্রিকস সদস্যভূক্ত ৫টি রাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়া, চীন ও দনি আফি"কার সাথে বাংলাদেশের গভীর সর্ম্পক রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং নিকট প্রতিবেশী চীনের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীনতার পর রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক সহযোগীতা প্রদান করেছে। এই জোটের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে বেশ কিছু সুবিধা ব্রিকস থেকে প্রত্যাশ্যা করতে পারে। এগুলো হল:

১. বাজারে প্রবেশাধিকার
২. বিনিয়োগ আকর্ষণ

৩. শ্রমশক্তি রপ্তানি
৪. প্রযুক্তি সহায়তা প্রাপ্তি
৫. সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি ও
৬. পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব থেকে মুক্তি।

● **ব্রিকসের অগ্রগতিতে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।**

উত্তরঃ বর্তমান বৈশ্বিক প্রোপটে বিশ্ব অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচিত। ব্রিকস এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি ভবিষ্যত বিশ্ব অর্থনীতিতে এই জোটের অবস্থানে যথেষ্ট সুদৃঢ় করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিকসের অবস্থান সুদৃঢ় হলে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পরিবর্তনের যে মাত্রাগুলো দেখা যেতে পারে সেগুলো হলো:

১. বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের একক কর্তৃত্ব হ্রাস;
২. বিশ্ব অর্থনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বের বিপরীত ব্রিকসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা;
৩. আন্তর্জাতিক ফোরামে পশ্চিমা বিশ্বের একক প্রভাব হ্রাস;
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে অনুন্নত দেশগুলোর ওপর পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্য হ্রাস;
৫. বিশ্ব বাজারে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে দখলদারিত্ব কমে যাওয়া;
৬. ডলার ও উত্তর আধিপত্য খর্ব হবে;
৭. বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগে পশ্চিমা বিশ্বের নিয়ন্ত্রন হ্রাস
৮. প্রযুক্তি, কৃষি ও শিল্পে ব্রিকসের আধিপত্য বৃদ্ধি
৯. আঞ্চলিক শক্তির নতুন মেরুকরণ এবং
১০. বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস।

● **সাফটা চালু হবার পরও বাংলাদেশ ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে না পারার কারণগুলো কি কি?**

উত্তরঃ ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সব সদস্য দেশ সাফটা চুক্তি অনুমোদন সম্পন্ন করার পর ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি কাগজে- কলমে এটি কার্যকর হয়। ২০০৬ সালের ১ জুলাই শুল্ক কাঠামো কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবরূপ লাভ করে সাফটা। সাফটা চালু হবার পরও ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে না পারার কারণগুলো হল:

১. অশুল্ক বাধা তথা পণ্যের মান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ইস্যুসহ নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে ভারত বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করছে।
২. শুল্কমুক্ত সুবিধার বাইরে থাকা স্পর্শকাতর পণ্যের বিশাল তালিকাও ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে বড় বাধা।
৩. ভারতের তৈরী রপ্তানী অযোগ্য পণ্যের তালিকা
৪. ভারত কর্তৃক প্রতিশ্রুতিনা করা
৫. বাংলাদেশ কর্তৃক দরকষাকষির ব্যর্থতা ও
৬. বাণিজ্যিক সংগঠন গুলোর অনাগ্রহ।

● **নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্য গুলো কি কি ?**

উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ। ব্রেটন উডস সম্মেলন পরবর্তী সময়ে বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠন সবচেয়ে বড় ঘটনা। ব্রিকসের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল ঃ

১. সদস্য রাষ্ট্রগুলো অর্থনীতি এবং বাজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ;
২. সদস্য রাষ্ট্রের সমান ভোটাধিকার অর্থাৎ প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ;
৩. বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফের বিকল্প আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করা;
৪. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর পশ্চিমাদের প্রভাব হ্রাস করা;
৫. বিশ্ব বাজারে ডলারের একক আধিপত্য ভেঙে দেওয়া;
৬. বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের গুরুত্ব কমিয়ে আনা ও
৭. ঋনের খাত সম্প্রসারিত করা।

● **বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে "নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক " এর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা করুন ?**

উত্তরঃ ব্রিকস তাদের ব্যাংকের কার্যক্রম যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করবে বলে বলছে তাতে করে ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যে প্রভাবগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে সেগুলো হল:

১. জি-৭৭ এবং জি-২০ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে ব্রিকসের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

২. আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক থেকে জি-৭৭ এবং জি-২০ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো ঋণ এবং আর্থিক সহায়তা গ্রহণ বন্ধ করে দিবে।
৩. বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিকসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।
৪. বিশ্ব বাণিজ্য এবং বিশ্ব বাজারে ব্রিকসের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে।
৫. উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে ব্রিকসের অর্থনৈতিক , বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।
৬. বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফের একক প্রাধান্য হ্রাস পাবে।
৭. প্রতিযোগিতা এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ পুর্নগঠিত হতে পারে।
৮. দি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারে এবং
৯. বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব যথেষ্ট ক্ষুন্ন হবে।

● **সার্ককে কার্যকর করতে ভারতের অনাগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণগুলো কি কি ?**

উত্তরঃ সার্ককে কার্যকর করতে ভারতের অনাগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণগুলো হল:

১. পাকিস্তানের সাথে ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘদিনের বৈরীতা ও ভারতের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের অভিযোগে পাকিস্তানের নির্লিপ্ততা;
২. বাংলাদেশের সাথে ট্রানজিট, অভিন্ন নদীর পানি বন্টন, ছিটমহল ও সীমান্ত সমস্যাসহ বিবিধ অমীমাংসিত সমস্যা;
৩. তামিল নেতা প্রভাকরনের মৃত্যুর পর শ্রীলংকায় ভারতের নিয়ন্ত্রন হ্রাস;
৪. নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের সাথে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাপক প্রসারের সীমাবদ্ধতা;
৫. ভারতের সার্বিক অর্থনৈতিক লাভবান হবার সম্ভাবনা কম;
৬. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাণিজ্যিকা সর্ম্পক উন্নয়ন করতে গেলে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভারতকে কিছুটা ছাড় দিতে হতে পারে ইত্যাদি।

● **কি কি কারণে ভারত আসিয়ানের সদস্য পদ গ্রহণে আগ্রহী বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তরঃ ভারত বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেকে পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এক্ষেত্রে সার্কের সদস্যদের চেয়ে আসিয়ানের সদস্যদের সাথে একীভূত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলে ভারত অনেক লাভবান হবে বলে মনে করে। ভারত সার্ককে কার্যকর করার চেয়ে আসিয়ানের সদস্যপদ লাভে অধিক আগ্রহী হবার অন্যতম প্রধান কারণগুলো হল:

১. আসিয়ানের অধিকাংশ সদস্য দেশের উন্নত অর্থনীতি যেখানে থেকে ভারত বেশ কিছু সুবিধা লাভ করতে পারবে ;
২. বিশাল বাজার প্রাপ্তি সম্ভাবনা;
৩. উদীয়মান পরাশক্তি হিসেবে অবস্থান দৃঢ় করতে আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া;
৪. জনশক্তির নতুন বাজার তৈরী;
৫. সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারলে ভারত অপরাপর সদস্য দেশ থেকে সহজেই বিনিয়োগ আনতে পারবে;
৬. আন্তর্জাতিক সর্ম্পক উন্নয়ন ও
৭. চীনকে প্রতিহত করা ইত্যাদি।

● **কী কী কারণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সর্ম্পক উন্নয়ন হয়নি বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তরঃ রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্বের আঞ্চলিক কাঠামোতে সবচেয়ে সম্ভাবনার জায়গাটি হলো দণি এশিয়া। যার মাঝখানে ভবিষ্যতে পরাশক্তি ভারত আর চারপাশে উন্নয়নশীল শ্রীলংকা ও পাকিস্তান। আছে উদীয়মান দেশ বাংলাদেশ আর নেপাল, ভুটান আর মালদ্বীপের মতো বাজার, যাদের সম্ভাবনা এখনো যাচাই করা হয়ে ওঠেনি ঠিক মতো। আছে আফগানিস্তানের মত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দেশ। যেসব কারণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্য বাণিজ্যিক সর্ম্পক উন্নয়ন হয়নি বলে ধরা হয়ে সেগুলো হল:

১. ভারতের বাজারের আকার আর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিশালতা;
২. স্পর্শকাতর পণ্য তালিকা;

৩. রাজনৈতিক অবিশ্বাস;
৪. দূর্বল আন্তঃযোগাযোগ কাঠামো ও
৫. সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা

● **কি কি কারণে সার্ক সফল হতে পারেনি বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তর: সার্ক প্রতিষ্ঠার পর দেড় যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে সার্কের সফলতা আর ব্যর্থতা খতিয়ে দেখার। সার্কের সনদের অভ্যন্তরীণ কিছু দুর্বলতাও আছে, যার ফলে সার্ক এর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বহু বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে দণি এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার সংগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সহযোগিতার হাত আর সম্প্রসারিত হয়নি বরং দিনে দিনে এ হাত সংকুচিতই হচ্ছে। যেসব কারণে সার্ক সফল হতে পারেনি বলে মনে করা হয় সেগুলো হলো :

১. পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব;
২. দ্বিপাকি সমস্যা;
৩. রাজনৈতিক অস্থিরতা
৪. সার্কের সনদে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাকি সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না এমন বিধান থাকা;
৫. রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুপস্থিতির কারণে যাতে সম্মেলন বাধাগ্রস্থ না হয় সে জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা সার্ক সনদে না থাকা
৬. সার্ক সনদে কোনটা বহুপাকি, কোনটা বহুপাকি নয় সে সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকা ইত্যাদি।

● **সার্ক কার্যকরী হলে বাংলাদেশে কি কি সুবিধাগুলো পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তর : সার্ক কার্যকর হলে বাংলাদেশ যেভাবে উপকৃত হতে পারে বলে ধারণা করা হয় সেগুলো হলো:

১. বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ
২. আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি
৩. দারিদ্র বিমোচন
৪. প্রযুক্তি হস্তান্তর বা বিনিময়
৫. পর্যটনের প্রসার
৬. বহুমুখী বাণিজ্য বৃদ্ধি
৭. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন

● **WTO প্রতিষ্ঠার সময় উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে কি কি সুবিধা প্রদান করার অঙ্গীকার করেছিল?**

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্য উদ্যোগে ও উন্নত বিশ্বের সমর্থনে বিশ্ব বাণিজ্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে সু-পরিকল্পিতভাবে ১৯৯৫ সালে WTO প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র দেশগুলোকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের লোভ দেখিয়ে ও চাপ প্রয়োগে করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে WTO-র বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবাদ করতে থাকে। এই প্রতিবাদের প্রত্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কানকুন সম্মেলনে। উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে যে সুবিধাগুলো প্রদান করার অঙ্গীকার করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল:

১. উন্নত বিশ্বের বাজারে তৃতীয় বিশ্বের পন্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার;
২. কৃষিতে উন্নত বিশ্ব কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা;
৩. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে পর্যালোচনা পূর্বক ট্যারিফের হার নির্ধারণ;
৪. আমদানী পণ্যে কর ও বিধি নিষেধ সংক্রান্ত সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান ও
৫. সমতার নীতিতে বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি।

● **WTO কে কার্যকরী করার সুপারিশমালা পেশ করুন।**

উত্তর: বিশ্ব বাণিজ্যকে শৃঙ্খলিত করা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে ধনী দরিদ্র সব রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে WTO গঠিত হয়েছিল। সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হবার জন্য সংস্থাটির কার্যকরীতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাড়িয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই বাণিজ্যিক সংগঠনটি কার্যকর করতে হলে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

১. বিশ্ব বাণিজ্যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ সংরণ করতে হবে;
২. বিশ্ব রাজনৈতিক সংকট দূরীভূত করে বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে;
৩. ধনী রাষ্ট্রগুলোর বাজারে তৃতীয় বিশ্বের পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৪. উন্নত দেশগুলো কর্তৃক কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান বন্ধ করতে হবে;
৫. বিশ্ব বাণিজ্যের প্রধান ও বৃহৎ অংশীদারদের দায়িত্বশীল হতে হবে;
৬. বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;
৭. শ্রমের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে;
৮. মেধাস্বত্ত্ব আইন কার্যকর করার পূর্বে সকল দেশের স্বার্থ সংরণ নিশ্চিত করতে হবে;
৯. বাণিজ্য বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ সংরক্ষেণ নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে;
১০. সংস্থার কর্মকর্তাদের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে ও
১১. নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

● **বাংলাদেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কি কি প্রভাব পড়ছে বলে আপনি মনে করেন ?**

উত্তর: বাংলাদেশের উপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবই বেশী। এগুলো হল :

১. বিদেশী বিশাল পুঁজির সাথে দেশের ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্প কারখানাগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না।
২. কৃষি উপকরণে সরকারী ভর্তুকী হ্রাস করার ফলে আমাদের কৃষি ধ্বংসের মুখোমুখো দাঁড়াচ্ছে।
৩. মেধাস্বত্ত্ব আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ নিজস্ব প্যাটেন্ট আইন অনুযায়ী অনেক ঔষধ আর উৎপাদন করতে পারবে না।
৪. বাংলাদেশের জন্য গৃহঘ ও কোটা সুবিধা উঠে যাওয়ায় দেশের পোশাক শিল্প ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে।
৫. বাজার উন্মুক্তকরণ হওয়ায় আমাদের বাজারে অবাধে বিদেশী পণ্য প্রবেশ করছে।
৬. বিদেশী বিনোদন পণ্য যেমন- সিনেমা, গানের সিডি, ক্যাসেট অবাধে প্রবেশ করায় প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না আমাদের বিনোদন শিল্প।

● **ন্যামকে অধিক কার্যকরী করার জন্য সুপারিশমালা পেশ করুন।**

উত্তর: ন্যামকে অধিকর কার্যকরী করার জন্য কতিপয় সুপারিশমালা নিম্নে উলে-খ করা হলঃ

১. স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন
২. সকল বৃহৎ শক্তির সাথে সুসর্ম্পক স্থাপন
৩. সকল সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
৪. মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলা;
৫. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রায় কার্যকরী ভূমিকা রাখা
৬. সামরিক জোটকে সযত্নে এড়িয়ে চলা;
৭. স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসর্ম্পক রাখা;
৮. আণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;
৯. নিরাপত্তা পরিষদে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করা;
১০. মানব উন্নয়নে ন্যামের ভূমিকা পালন করা;
১১. দ্বন্দ্ব সংঘাতময় এলাকায় রাজনৈতিক মীমাংসায় ভূমিকা নেওয়া ও
১২. সকল প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

● **তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিসসা না পাওয়ায় বাংলাদেশের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা করুন।**

উত্তর: ভারতের সিকিম রাজ্যের পাহুনির পা তিস্তা কংসে গ্লেসিয়ার থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি। নদীটি সিকিমের অধিকাংশ এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপেক্ষা নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সীমান্ত নদী হিসেবে বিবেচিত হয়ে বাংলাদেশে নীলফামারী জেলা দিয়ে প্রবেশ করে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হয়েছে। তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০৯ কিলোমিটার।

তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিসসা না পাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজের জন্য ভূ ভাগের উপরের পানি ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছে, নদীর নাব্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, নদীর বিশাল এলাকা জুড়ে জেগে উঠেছে বালুচর এবং দ্রুততর হচ্ছে মরুকরন প্রক্রিয়া । পক্ষান্তরে, ভারত বর্ষাকালে সমস্ত পানি বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়ে বন্যায় ভাসিয়ে দেয় সমগ্র উত্তরবঙ্গ। তিস্তা

নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে না পারলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য যে নেতিবাচক প্রভাব গুলো পড়বে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সেগুলো হল :

১. রংপুর বিভাগের ৫টি জেলায় মরুকরণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।
২. পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এই অঞ্চলে সেচের অভাবে কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৩. পানির অভাবে এই অঞ্চলে মৎস সম্পদ শূন্য হয়ে পড়বে ফলশ্রুতিতে মৎস সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগন কর্মহীন হয়ে পড়বে।
৪. এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র বিনষ্ট হবে।
৫. বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং
৬. উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

● ভারত তিস্তা নদীর উপর কী কী প্রকল্প গ্রহণ করেছে ?

উত্তর: তিস্তার উজান বা পার্বত্য প্রবাহের সব অংশই ভারতের অন্তর্ভুক্ত । এর ফলে ভারত এ নদীকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পর্বত সংকুল এলাকা দিয়ে প্রবাহিত নদীতে ভারত বাঁধ নির্মাণ করছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারত যে দুটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সে দুটি হল :

১। তিস্তা-ভিম ড্যাম : প্রকল্পটি ২০০৭ সনে বাস্তবায়ন করা হয়; এটি ৫১০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত হয়েছে।

● তিস্তা নদীর ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর: বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের ৫ টি জেলার প্রায় ১ কোটি লোকের ভাগ্য এবং অত্র অঞ্চলের কৃষি, সেচ, মৎস্য সম্পদ এবং পরিবেশ তিস্তা নদীর পানির প্রাপ্যতার সাথে জড়িত। তাই কোন ভাবেই তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় থেকে পিছপা হওয়া যাবে না । এ জন্যে বাংলাদেশকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২০১০ সনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে যান। ঐ সফরের সময় তিস্তা নদীর ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের অনুরোধ জানান । ২০১১ সনের নভেম্বরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতার কারনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় তিস্তার পানি বন্টণ সংক্রান্ত কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। তিস্তা নদীর ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করণে বাংলাদেশের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহন করা উচিৎ :

১. আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন করা ;
২. সরকারের সদিচ্ছা এবং দৃঢ়তা নিশ্চিত করা;
৩. দ্বপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা;
৪. ভারতের জনগনের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা ও
৫. জাতিসংঘের দ্বারস্ত হওয়া।

● চিন ও জাপানের মধ্যে দ্বীপ বিরোধ সর্ম্পকে সংক্ষেপ আলোচনা করুন।

উত্তর: চীনের সঙ্গে বিরাধপূর্ণ দ্বীপগুলো ১৮৯৫ সালে জাপানের অন্তর্ভুক্ত হয়। জাপান জানায়, দশ বছর ধরে জরিপ চালিয়ে তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, এই দ্বীপগুলো তাদের মালিকানায়। সেনকাকু নামসেই সোতো দ্বীপের অংশে পরিণত হয় যা রিয়োকু দ্বীপ নামে পরিচিত এবং এটা বর্তমানে ওকিনাওয়া প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫১ সালের সানফ্রান্সিসকো চুক্তি অনুযায়ী জাপান তাইওয়ানসহ কিছু এলাকার দাবি পরিত্যাগ করে। তবে নামসেই সোতো দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের অধীনে আসে। ১৯৭১ সালে এই দ্বীপকে ফেরত দেয় যুক্তরাষ্ট্র। জাপান জানায়, চীন সানফ"ান্সিসকো চুক্তির সময় কোনো আপত্তি জানায়নি। ১৯৭০ সালে যখন এখানে তেল এবং গ্যাস আছে বলে জানা যায়, তখন থেকেই চীন এবং তাইওয়ান এই দ্বীপপুঞ্জের দাবি করে আসছে। অন্যদিকে চীন দাবি করে, প্রাচীনকাল থেকে দিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ ভৌগোলিকভাবে তাদের দেশের অংশ। তাদের অন্যতম প্রদেশ কাইওয়ান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এটি। ২০১২ সালে যখন জাপান বেসরকারি মালিকানা থেকে তিনটি দ্বীপ কিনে নেয় তখন থেকে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায় যা এখনো চলছে। সম্প্রতি বেইজিং ঘোষণা দেয়, সমুদ্রসীমা রায় তারা ভূ- তাত্ত্বিক জরিপ চালাবে। সাম্প্রতিক সময়ে উভয় দেশ দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব দাবি করছে এবং চীন পূর্ব এবং দণি চীন সাগরে তাদের দাবি আরো জোরালো করেছে।

◆ বিভাগ ঃ ঘ

বিবিধ

Miscellaneous

অধ্যায় : ১ গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা/টিকা
- সাম্প্রতিক আলোচিত টীকা
- আলোচিত ব্যক্তিত্ব
- বিশ্বের জাতিগত দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সমস্যা
- বিশ্বে ভূমির জন্য সংঘাত
- জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠন
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট
- অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট
- সামরিক জোট
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা
- আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা
- আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক চুক্তি ও সনদ
- আলোচিত গণমাধ্যম
- আলোচিত গেরিলা সংগঠন
- আন্তর্জাতিক সীমারেখা, গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী, খাল, দ্বীপপুঞ্জ
- আলোচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- আরোচিত মারণাস্ত্র ও পারমাণবিক বিশ্ব
- আলোচিত বিশ্বযুদ্ধ
- আলোচিত বিখ্যাত কেলেংকারি
- আলোচিত রাজনৈতিক বিষয়
- আলোচিত কূটনৈতিক

অধ্যায় : ২ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

অধ্যায় : ৩ বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলী

অধ্যায় : ৪ বিগত বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পরীক্ষার প্রশ্নাবলী

অধ্যায় ১

সংক্ষিপ্ত আলোচনা/টীকা

১ সাম্প্রতিক আলোচিত টীকা

ইসলামিক স্টেটস (আইএস)

ইরাকে সুন্নীপন্থী বিদ্রোহী সংগঠন ইসলামিক স্টেট এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ইরাকের উত্তরাঞ্চলে নিনেভাহ প্রদেশের ইয়াজিদি সম্প্রদায়। এর কারণ হলো ইয়াজিদের ধর্ম বিশ্বাস। আইএসের ধারণা, ইয়াজিদির ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার (৬৪৭-৬৮৩) বংশধর। ইয়াজিদ উমাইয়াদের কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি। এছাড়া ইয়াজিদিরা দৈনিক পাঁচবার যে মালেক তাউসের প্রার্থনা করে সেই মালেক তাউসের অন্য নাম শয়তান। আরবিতে যার অর্থ 'অশুভ আত্মা' তাই আইএসের ধারণা, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে ইয়াজিদিদের সম্পর্ক নেই। এ শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ ইজিদিস থেকে। যার অর্থ 'ঈশ্বরের পূজারি'। ইরাক ছাড়াও ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের লোকরা সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় বসবাস করে।

আইএসএর উত্থানে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতি সহায়তা করেছে। ইরাক ও সিরিয়ার আঞ্চলিক পরিস্থিতি সংগঠনটিকে এক বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সেজন্য প্রায় ৩০,০০০ সদস্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন ও বহাল রাখা সম্ভব হচ্ছে। গোড়াতে আইএসকে অবশ্য বিদেশি অর্থ বিশেষত সৌদি আরব ও কাতারের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় আইএস এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর আইএস জঙ্গিরা স্থানীয়দের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছে। আইএস এর সম্পদের অন্যতম বড় উৎস তেল। এক হিসাব মতে, ইরাকের আইএস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অন্তত ৪টি তেলক্ষেত্র ৪০-৭০টি তেলকূপ রয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ২৫,০০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন হয়। বাজার দরের অনেক কম মূল্যে (২০-৬০ ডলার) বিক্রি করেও দৈনিক আয় ১.২ মিলিয়ন ডলার।

আর এই প্রতিপত্তির জোরেই ইরাক ও সিরিয়ার একটি বড় অংশে আই এস তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে যেখানে খিলাফতের প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে।

আগস্ট ২০১৪ জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনের গত ২০ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ২৫ জুলাই, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সিরীয় সরকার ও বিরোধী অন্যান্য গোষ্ঠীর সংঘঠিত মানবতা বিরোধী ও যুদ্ধপরাধের ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। আই এস যোদ্ধারা সিরিয়ায় 'গণ নৃশংসতা' চালিয়েছে এবং তাদের সদস্য হিসাবে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাছাড়া তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে সমসমাবেশ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ঘটনা একটি সাধারন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় আইএস যোদ্ধারা ১৫ বছর বয়সী কিশোরদেরও শিরচ্ছেদ, অঙ্গহানি ও বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি দিচ্ছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটস (আইএস) জঙ্গীদের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযানের জন্য সহযোগী দেশ খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আই এস বিরোধী অভিযানের জন্য ২৫-৩০টি দেশে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তবে ২০০৩ সালের ইরাক অভিযানের তিক্ত স্মৃতির জন্য United Kingdom France Australia মতো পরীক্ষিত মিত্রদের সাড়া পাওয়া যাওয়া নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে আইএসকে দুর্বল ও ধ্বংশ করতে নতুন কৌশল প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আরএই পরিকল্পনার আলোকেই ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হামলা চালানো হয়।

মার্কিন সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের বিবৃতিতে ইরাকের বাগদাদে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্য বস্তুতে বিমান হামলা চালানোর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সিনজারে বিমান হামলা করে আই এস এর ৬টি যানবাহন ধ্বংশ করা হয়েছে।

এদিকে সিরিয়ার রাকা অঞ্চলে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আইএস যোদ্ধারা একটি জঙ্গী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে বলে জানিয়েছে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (Syrian Observatory form Human Rights)। বিবিসির এক বিশ্লেষনে বলা হয়েছে ওয়াশিংটনের প্রথম মিত্র হিসাবে আইএস এর প্রথম মিত্র হিসাবে আইএসকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা শুরু করেছে ফ্রান্স। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের কার্যালয় থেকে উত্তর-পূর্ব ইরাকের আই এস দপ্তর লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানোর কথা বলা হয়েছে। গত আগস্ট ২০১৪ থেকে এ পর্যন্ত ১৭০ টির বেশি বিমান হামলা চালানো হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৪ প্যারিসে ৩০ এর অধিক দেশের প্রতিনিধিরা আইএস গোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে সামরিক অভিযানের বিকল্প নেই বলে ঐকমত্য প্রকাশ করে। প্যারিস বৈঠক এবং কয়েকদিন আগে দেওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভাষনে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক এই কোয়ালিশনের লক্ষ্য হচ্ছে আইএসএর ক্ষমতা হ্রাস ও ধ্বংশ সাধন। বর্তমানে ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আল কায়েদা, জামাত আল তাওহীদ ওয়া আল জিহাদ, মুজাহিদিন শুরা কাউন্সিল ওআইএসআই এই সংগঠনগুলোর জঙ্গীদের সমন্বয়ে আইএসআই এল গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আগ্রাসন চলাকালে কট্টরপন্থি এই সংগঠন ইরাকে বিস্তার লাভ করে আইএসআইএল বাহিনীতে সাদ্দাম শামনামলেন সেনা কর্মকর্তারাও রয়েছেন। দলের শীর্ষ নেতা আবু বকর আল বাগদাদী, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল কৌশলী কমান্ডার হিসেবে খ্যাত তবে তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। বর্তমানে সংগঠনটির কোন আঞ্চলিক সীমারেখা নেই। আইএসআইএলের সদস্যরা সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আসাদ শিয়া ধর্মাবলম্বী এবং ইরানের ঘনিষ্ঠ ব। আর এ কারণেই ইরাকে সুন্নী চরমপন্থিদের উত্থান গোটা ঐ অঞ্চলের জন্য বড় মাথাব্যাথার কারণ।

IS রোধে আন্তর্জাতিক জোট

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ যুক্তরাজ্যের ওয়েলসে ২৬তম ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরাক ও সিরিয়া থেকে মুসলিম বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (Islamic State) বা আইএস দমনে আন্তর্জাতিক জোট গঠনের ঘোষণা দেন। এ জোট আইএস দমনে দুটি দীর্ঘ কৌশল অবলম্বন করবে-ইরাক ও সিরিয়ায় জোটভুক্ত দেশগুলোর ভূমিতে যুদ্ধের সক্ষমতা বাড়ানো এবং এ সময় বিমান থেকে জঙ্গিগোষ্ঠির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত বোমা বর্ষণ চলবে। আইএস বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ কৌশলে যুদ্ধ চলবে। আইএসের বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ কৌশলে যুদ্ধ চলবে। আইএসের বিরুদ্ধে অভিযানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটে প্রথম পর্যায়ে ৯টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশগুলো হল-যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়, জার্মানি, কানাডা, তুরস্ক, ইতালি, পোল্যান্ড এবং ডেনমার্ক। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইসলামিক স্টেট (আইএস)র বিরুদ্ধে সমন্বিত সামরিক অভিযান চালানোর লক্ষ্যে আরব মিত্রদের সাতে যুক্তরাষ্ট্র একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। মিসর, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, সৌদি আরব ও কাতার-এ ছয়টি উপসাগরীয় রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। আবর রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমন্বিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সুন্নি বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) কাছ থেকে ইরাক ও সিরিয়ার বিশাল অঞ্চল পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে সহায়তা করবে।

সিল্ক রোড

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীন তার নিকটতম প্রতিবেশী বিশেষ করে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার সঙ্গে সিল্ক রোডের মাধ্যমে ভালভাবেই সংযুক্ত। আর এ সিল্ক রোডের দু'টি অংশ রয়েছে। এর একটি ওভারল্যান্ড বা স্থল সিল্ক রোড (ওএসআর) ও মেরিটাইম বা সামুদ্রিক সিল্ক রোড (এমএসআর)। ২০০ খ্রিষ্টপূর্ব রাজবংশের শাসনামলে জিয়ান থেকে রোম পর্যন্ত প্রায় ১০০০ কি.মি. পর্যন্ত এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। চীন থেকে শুরু হওয়া সামুদ্রিক এই সিল্ক রোডটিই সেসময় দক্ষিণ চীন সাগর থেকে ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সাগর মহাসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম রোড হিসেবে বিবেচিত হতো।

বেইজিং এখন পুরান সেই সিল্ক রোডটিকে পুনরায় চালু করে ইতিহাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধন ঘটাতে চায়। এশিয়ার ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতির কারণে চীনের কাছে সিল্ক রোডটির গুরুত্ব তেমন একটা ছিল না। কিন্তু একুশ শতকের পরাশক্তি হিসেবে চীন সাম্প্রতিকালে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী এই রোডটিকে পুনরায় চালু করতে আগ্রহী। বেইজিং আশা করছে, নতুন এই সিল্ক রুটের আওতায় ২০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ২১ শতকের সিল্ক রোড হবে দক্ষিণে চীনা পোর্ট থেকে দক্ষিণ চীন সাগর হয়ে মালাক্কা প্রণালী, লম্বক, সন্দা, তৎসংলগ্ন উত্তর ভারত

মহাসাগর, পারস্য উপসাগর, রেড সি ও এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত।

বৈশ্বিক বাণিজ্যের ঐতিহ্যবাহী রেশমী সড়ক (Silk Route) এবং ভারত মহাসাগরের তীরস্থ দেশগুলোক জুড়ে গঠিত একবিংশ শতাব্দীর সামুদ্রিক রেশমী সড়ক (Twenty First Century Maritime Silk Route) এর চীনের বহিঃবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কূটনীতির মূল চালিদা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই ৫টি দেশের জোট হল ব্রিকস। ব্রাজিলের ফোরতালেজায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ব্রিকস সম্মেলনে পাঁচ জাতির জোট ব্রিকস ১৫ জুলাই ২০১৪ দি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামে একটি নতুন ব্যাংক গঠনের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রেটন উডস সম্মেলন পরবর্তী সময়ে বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় ঘটনা। ২০১৩ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ব্রিকসের ৫ম সম্মেলনে ব্রিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। জোটটির ৬ষ্ঠ সম্মেলনে নাম পরিবর্তন করে দি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামে নতুন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।

- ফান্ড : প্রাথমিকভাবে ব্যাংকটি ৫হাজার কোটি ডলার নিয়ে শুরু করলেও এর মোট পুঁজি হবে ১০ হাজার কোটি ডলার। সদস্য প্রতিটি দেশ এক হাজার কোটি ডলার প্রদান করবে। অনুমোদিত মূলধনের বাইরে ১০ হাজার কোটি ডলারের একটি কন্টিনজেন্ট রিজার্ভ এ্যারেঞ্জমেন্টও থাকবে। এই তহবিলে চীন ৪ হাজার ১শত কোটি ডলার একটি কন্টিনজেন্ট রিজার্ভ এ্যারেঞ্জমেন্টও থাকবে। এই তহবিলে চীন ৪ হাজার ১শত কোটি ডলার প্রদান করবে। রাশিয়া, ব্রাজিল ও ভারত ১ হাজার ৮শ কোটি ডলার করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদান করবে ৫শ কোটি ডলার।
- সদর দপ্তর : সংহাই, চীন।
- প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ড : ব্যাংকটির প্রথম প্রেসিডেন্ট হবেন ভারতীয়, পরিচালনা পর্ষদের প্রথম চেয়ারম্যান হবেন ব্রাজিলিয়ান এবং বোর্ড অব গভর্নেন্সের প্রথম চেয়ারম্যান হবেন রাশিয়ান।
- কার্যক্রম শুরু : ২০১৬ সনে ব্যাংকটি ঋণদান কার্যক্রম শুরু করবে এবং নতুন সদস্য গ্রহণ শুরু হবে। তবে বর্তমান ৫সদস্যের অংশীদারিত্ব ৫৫শতাংশের নিচে আসবে না।

বিটকয়েন

বিটকয়েন (Bitcoin) হলো গুপেন সোর্স ক্রিপ্টোগ্রাফি প্রটোকলের মাধ্যমে লেনদেন হওয়া ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল মুদ্রা। এটি লেনদেনের জন্য কোনো ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা নিকাশ ঘরের প্রয়োজন হয় না। ২০০৮ সালে সাতোশি নাকামোতো (Satoshi Nakamoto) এ মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি এ মুদ্রাব্যবস্থাকে পিয়ার-টু-পিয়ার লেনদেন নামে অভিহিত করেন। ৩ জানুয়ারি ২০০৯ বিশ্ব মুদ্রাবাজারে বিটকয়েনের আবির্ভাব ঘটে। এটি অনেকটা শেয়ারের মতো লেনদেন হয়। তাই এর বিনিময়মূল্য সবসময় ওঠানামা করে। বর্তমানে এক বিটকয়েন সমান ৪৯৩ মার্কিন ডলার। বর্তমানে এক কোটি ২৪ লক্ষ বিটকয়েন প্রচলিত আছে, যার মোট বাজারদর এখন ৬২০ কোটি ডলার। প্রত্যেক চার বছর পর পর বিটকয়েনের মোট সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যাতে করে বাস্তব মুদ্রার সাথে সামঞ্জস্য রাখা যায়। একটি লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে নতুন বিটকয়েন উৎপন্ন হয়। ২১৪০ সাল পর্যন্ত নতুন বিটকয়েনগুলো প্রত্যেক চার বছর পরপর অর্ধেকে নেমে আসবে। ২১৪০ সালের পর ২১ মিলিয়ন বিটকয়েন তৈরি হয়ে গেলে আর কোনো নতুন বিটকয়েন তৈরি করা হবে না।

বিগ-বি

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাপান সরকারে প্রস্তাবিত বঙ্গোপসাগরের তীরে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা : (Bay of Bengal Industrial Growth belt-BIG-B) বিগ-বি নামে পরিচিতি। মূলত ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় শিল্পায়নকে সামনে রেখে বিগ-বি উদ্যোগটির পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দেশের এ অঞ্চলটি বেশ সম্ভবনাময় বলে মনে করে জাপান। ২৫-২৮ মে ২০১৪ টোকিওতে প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতে বৈঠকের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে বিগ-বি ধারণাটি তুলে ধরেন। এরপর জুনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এ ধারণাটি তুলে ধরেন। এরপর জুনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এ ধারণাটির ব্যাখ্যা দেন জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (JAICA) প্রেসিডেন্ট আকিহিকো তানাকা।

বিগ-বি ধারণাটি তিনটি স্তম্ভের ওপর তৈরী করা হয়েছে:

- প্রথম স্তম্ভ : শিল্প ও বাণিজ্য । বহুদিন ধরেই আকাড়িখত একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণকে কেন্দ্র করে এ স্তম্ভটি। এ বন্দর বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ এশিয়ার সাথে এশিয়ার অন্যান্য অংশের মধ্যে বাণিজ্যিক সদর দরজা হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশ।

- দ্বিতীয় স্তম্ভ : জ্বালানি। এটি মাতারবাড়ী প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে শুধু বিগ-বি আওতাভুক্ত এলাকাই নয়, পুরো বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে আবশ্যিক গতি সঞ্চার করা যাবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শুরু হয়ে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২২ -২৩ অর্থবছরে ১২ আগষ্ট ২০১৪ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বিগ-বি উদ্যোগের আওতায় অনুমোদিত হয় দেশর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- তৃতীয় স্তম্ভ : পরিবহনব্যবস্থা। দেশের বৃহত্তম শিল্প, বাণিজ্য ও জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পরিবহন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা উচিত। এমকি তা প্রতিবেশী দেশগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

বিগ-বি ধারণাটি বাংলাদেশে নতুন হলেও থাইল্যান্ড ও জাপানে এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হয়েছে। বিগ-বির আওতায় বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্রবন্দরের মতো অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের মধ্যকার সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ খাতের ব্যাপক উন্নয়ন হলে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ আসবে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশের মতো বাড়তে পারে।

ওবামার ভারত সফর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ২৫-২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তিন দিনের রাষ্ট্রর সফরে ভারতে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তার এ সফরকারে প্রটোকল ভেঙ্গে বিমান বন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রটোকল অনুযায়ী, অন্য কোনো রাষ্ট্রনেতাকে বিমান বন্দরে খোদ প্রধানমন্ত্রীর স্বাগত জানানোর রীতি নেই। ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাম্প্রতিক ভারত সফরে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হয়। সফরের প্রথম দিন ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক শেষে এ নতুন যাত্রা সুরু করতে ছয় বছর ধরে বাস্তবায়িত না হয়ে ঝুলে থাকা পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরসহ অন্য যেসব বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১০ বছরের জন্য দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত প্রতিরক্ষা চুক্তির নবায়ন, মোদি-ওবামা এবং দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের মধ্যে হটলাইন চালু ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইকে সর্বাত্মক করে তোলা। ওবামার ভারত সফরে মূল উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার চীনের প্রভাব হ্রাসে ভারতকে কাজে লাগানো। এশিয়ায় চীনের একক আধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে মিত্র হিসেবে কাছে পেতে চাইছে।

শার্লি হেবদো

ফ্রান্সের ব্যাঙ্গাত্মক সাপ্তাহিক শার্লি হেবদো (Charlie Hebdo)। বিতর্কিত একটি রাজনৈতিক কার্টুনের সূত্র ধরে শার্লি হেবদোর আবির্ভাব ঘটেলিল ১৯৭০ সালে। চালর্স দ্যা গলের মৃত্যুকে নিয়ে একটি কার্টুন ছেপে বিপাকে পড়েছিল সেই সময়ের জনপ্রিয় কৌতুক সাপ্তাহিক হারা-কিরি। বিতর্কের জেরে হারা-কিরি বন্ধ হয়ে গেলে পত্রিকার সাথে যুক্ত সাংবাদিক -কার্টুনিষ্টরা যুক্তরাষ্টের চার্লি ব্রাউন ধরনের কার্টুনের চিন্তা মাথায় রেখে চালু করেছিলেন শার্লি (চার্লির ফরাসি উচ্চারণ) দেবদো। সাপ্তাহিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হেবদো চার্লি ব্রাউনের প্রথম অংশের সাথে যুক্ত করে নিয়ে পত্রিকার নামকরণ করা হয় শুরু থেকেই শার্লি হেবদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজনৈতিক বিষয়াবলির কার্টুন। পত্রিকাটি বিষয়বস্তুর জন্য পরিচিতি হয়ে উঠলেও এর পাঠক কাটতি কখনোই সে রকম বেশি ছিল না। ২০০৭ সালে মহানবী (স) কে ব্যঙ্গ করে আকাঁ ড্যানিশ পত্রিকার একটি কার্টুন পুনর্মুদ্রণ করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে শার্লি হেবদো। ২০১১ সালে মহানবী (স)-কে কটাক্ষ করে একটি লেখা ছাড়া হয় পত্রিকাটিতে। ২০১২ সালে মহানবী (স) এর অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে পত্রিকাটি। ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিশ্বকে চরম ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত করে।

৭ জানুয়ারি ২০১৫ ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত এ সাময়িকীর অফিসে ঘটে এক হামলার ঘটনা। এ হামলার নিহত হন সাময়িকীটির প্রধান সম্পাদক স্টিফেন সর্বোনার, ৩জন কার্টুনিষ্ট ও ২ পুলিশসহ মোট ১২জন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কার্টুন প্রকাশ করায় এ হামলা হয় এবং হামলার দায় স্বীকার করে আল কায়েদার ইয়েমেনী শাখা। এটাকে ফ্রান্সের মাটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা বলে উল্লেখ করা হয় ঘটনার পর দিন ফরাসি নিরাপত্ত বাহিনীর অভিযানে নিহত হন পত্রিকা হামলাকারী ভ্রাতৃদ্বয় সাইদ কোশি ও শরীফ কোশি।

শার্লি হেবদো তার অফিসে হামলা-পরবর্তী সংখ্যায় আবারো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে নিয়ে ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করে। ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ প্রকাশিত সাময়িকীটির ১৭৮তম সংখ্যার প্রচ্ছদে এ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়।

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

www.freesoftpdfdownload.blogspot.com

বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি চীন

১৮৭২ সালে যুক্তরাজ্যকে পেছনে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতির এক নম্বর আসনটি দখল করে নিয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১৪২ বছর ধরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) সাম্প্রতিক এক জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্ব অর্থনীতির শীর্ষ পরাশক্তি হচ্ছে চীন। Parchasing Power Parity (PPP) বা জীবন মানের খরচের ভিত্তিতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সামর্থ্যের অনুসারে আইএমএফ চীনকে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসেবে ঘোষণা করে।

২০১০ সারে জাপানকে পিছনে ফেলে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর এবার দখল করে নিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশের মুকুট। আইএমএফের পর্যবেক্ষণ আনুযায়ী অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশ-১. চীন ২. যুক্তরাষ্ট্র, ৩. ভারত, ৪. জাপান, ৫. জার্মানি, ৬. রাশিয়া, ৭. ব্রাজিল, ৮. ফ্রান্স, ৯. ইন্দোনেশিয়া, ১০. যুক্তরাজ্য।

চীনের বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ১.৮৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ২.৪৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। চীনের রপ্তানি লব্ধ আয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১.৯৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিমাণ হচ্ছে ১.৫৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। চীনের মাথাপিছু মোট দেশজ সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ৯,১০০ মার্কিন ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৫১,৭০০ মার্কিন ডলার। চীনের জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৭.৭% যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ২.৮%। চীনে ১৩.৮% লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫.১% লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে থাকে। চীনে সরকারি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে জিডিপি-র ৩১৭% যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিডিপি-র ৭০%। চীনে বেকারত্বের হর হচ্ছে ৬.৫% এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮.১% (DrmtAvBGgGd)

ছাতা বিপ্লব

৩১ আগষ্ট ২০১৪ চীন সর্তসাপেক্ষে ২০১৭ সারে প্রধান নির্বাহী নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়। যাতে বলা হয়, নির্বাচনে চীন তাদের পছন্দের প্রার্থীদের মনোনয়ন দিবে। হংকংবাসীকে তাদের মধ্যে থেকেই নেতা নির্বাচন করতে হবে। চীনের এমনতর ঘোষণার প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ছাত্ররা সন্ত্রাহব্যাপী-ক্লাস বর্জন কর্মসূচি শুরু করে, ২৬ সেপ্টেম্বর এ আন্দোলন গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বর অকুপাই সেন্টাল আন্দোলনকারী এবং ছাত্ররা যৌথভাবে হংকংয়ের কেন্দ্রস্থল দখল করে নেয় বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই হংকংয়ের পরবর্তী নেতা নির্বাচিত করতে হবে। এছাড়া ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনে যে কোনো নাগরিককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়ার দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীদের রাজপথে অবস্থান কর্মসূচির ফলে অনেকটাই অচল হয়ে পড়ে হংকংয়ের বাণিজ্যিক কর্মকান্ড। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো এ আন্দোলনকে Unbrella Revolution বা ছাতা বিপ্লব নামে অভিহিত করেছে। ২৫ বছর আগে ১৯৮৯ সারে চীনের মূল ভূ-খন্ড তিয়েন আনমেন স্কয়ারে ছাত্র আন্দোলনের পর সাম্প্রতিক হংকং আন্দোলনের মতো এতবড় বিক্ষোভ আর হয় নি।

হংকংয়ের সাম্প্রতিক ছাতা বিপ্লব আন্দোলনের নায়ক ১৭ বছর বয়সী ইউথ অ্যাকটিভিষ্ট জোসুয়া ওয়াং। তার আদর্শ নেতা হচ্ছেন ওয়াং ড্যান, যিনি ১৯৮৯ সালে তিয়েন আনমেন স্কয়ারে নেতা ছিলেন। ১৫৬ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর হংকংয়ের আকাশে ১ জুলাই ১৯৯৭ আবার উড়ে চীনা পতাকা, অর্থাৎ হংকং একীভূত হয় চীনের সাথে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে হংকং এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব চীনের হাতে তুলে দেয়া হয় ৩০ জুন ১৯৯৭ সোমবার রাত ঠিক ১২টায়। সে হিসেবে হংকং চীনের অধীন হয় ১ জুলাই ১৯৯৭।

বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার করিডর (BCIM)

বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশ-চায়না-ইন্ডিয়া-মিয়ানমার (BCIM) অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণে দীর্ঘদিন থেকেই ৪টি দেশ কাজ করছে। ২০১৩ সালের মে মাসে বিসিআইএম-এর আওতায় ইকোনোমিক করিডোর গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ব্যাপারে একটি সমীক্ষা পরিচালনায় একমত হয়েছে চীন ও ভারত। নতুন এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাটি বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মিয়ানমার (BCIM) নামে অধিক পরিচিত। কানেকটিভিটির মাধ্যমে এশিয়ার এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এক সময় মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন এ রুটে পণ্য বলতে সিল্কের আনাগোনা ছিল। সে কারণে মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ রুট ইতিহাসে সিল্ক রুট নামে পরিচিতি। কালের পরিক্রমায় রাজনৈতিক বিবর্তনে সিল্ক রুট এখন নেই। তবে

এশিয়ায় চীনের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উত্থানে এবং ভারতে পুঁজির বিকাশের ধারায় সেই সিল্ক রুট নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। মন্দায় আক্রান্ত বিশ্বে এশিয়াকেই আগামী অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে সিল্ক রুট নিয়ে চীনের অগ্রসর হওয়ার সাথে পশ্চিমারা যুক্ত না হলেও নতুন সিল্ক রুটের ধারণা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ ধারণায় ভারত ও যুক্ত হয়েছে। (BCIM) দেশগুলোতে জনগোষ্ঠীর বসবাস ২.৮ বিলিয়ন এবং অর্থনীতির আকার ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

করিডোরের রুট: ডিসেম্বরে ৪টি দেশের প্রতিনিধিরা চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে একটি যুগ্মত্ত জপরেখা প্রণয়ন করে। ঐ আলোচনার সময়ই মূলত রুটটি ঠিক করা হয় এবং ৪টি রুটটির ব্যাপারে সম্মত হয়। রুটটি হলো চীনের কুনমিং থেকে মিয়ানমারের মান্দালয় ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হয়ে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত।

বিমসটেক সচিবালয়

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (BIMSTEC) স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় উদ্বোধন করা হয়। এটি হল ঢাকায় স্থাপিত প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থান পূর্ণাঙ্গ সচিবালয়। ১-৪ মার্চ ২০১৪ মিয়ানমানের নাইপিদোতে অনুষ্ঠিত বিমসটেকের তৃতীয় সম্মেলনে স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় স্থাপনের ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতদিন জোটভুক্ত বিভিন্ন দেশে কর্মক্রম পরিচালিত হলেও ২০১৪ সালের জুন থেকে ঢাকায় এ জোটের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৬জুন ১৯৯৭ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বে অফ বেঙ্গল ইকনমিক কোঅপারেশন অগানাইজেশন গঠিত হয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ইতালির বোলনিয়ায় যখন ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, নালন্দার বয়স তখনই ৬৫০ বছর। ইতিহাসবিদদের মতে, ৪২৭-১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ছিল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্র এখানকার কয়েকটি সৌধ মৌর্য সম্রাট প্রথম অশোক নির্মাণ করেছিলেন। গুপ্ত সম্রাটরাও এখানকার কয়েকটি মঠের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন। এরপর সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের (৪১৫-৪৫৫) রাজত্বকারে নালন্দা মহাবিহারের বিকাশলাভ ঘটে। খ্যাতির মধ্যাগনে থাকাকালীন চীন, গ্রিস ও পারস্য থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করতে আসতেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ১১৯৩ সালে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হয়ে যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, বলতে গেলে মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রার আরেক নাম। বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক।

৮০০ বছরের ও বেশি সময় পর ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে পাঠদানের মাধ্যমে আবারো চালু হয় ভারতের বিহার রজ্যের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। পঞ্চম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা ছুটে আসতেন। সেই ইতিহাসকে স্বাক্ষী রেখে ৫ছাত্রীসহ মোট ১৫ জন শিক্ষার্থী ও ১১ জন শিক্ষক নিয়ে ইকোলজি, পরিবেশবিদ্যা এবং ইতিহাস বিভাগের ক্লাশ শুরুর মধ্য দিয়ে পুনরায় চালু হয় এর শিক্ষা কার্যক্রম। বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাজগির শহরে একটি অস্থায়ী ক্যাম্পাসে এ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। শহরটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান। সেখান থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে আজও দাঁড়িয়ে আছে দ্বাদশ শতকের প্রাচীর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টির ধ্বংসাবশেষ। তুর্কি বাহিনীর এক অভিযানের সময় সেটি ধ্বংসে হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টির নতুন যাত্রা ভারত সরকার ও পূর্ব সম্মেলনভুক্ত (EAS) ১৮টি দেশের উদ্যোগের ফসল। ২০১৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ব্রুনাই সফরকালে অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুরসহ EAS ভুক্ত সাতটি দেশের সাথে যুক্তিবদ্ধ। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামেরও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে ২৮ মার্চ ২০০৬ তিনিই প্রথম নালন্দাকে পুনর্জন্ম দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে পাস করা হয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, যা কার্যকর হয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০। এতে প্রস্তাব রাখা হয় নতুন আকারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাতে পড়ানো হবে ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, পররাষ্ট্রনীতি, পরিবেশবিদ্যা ও বৌদ্ধ দর্শনের মতো নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়। ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নোবেলজয়ী অধ্যপক অমর্ত্য সেন বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান চ্যান্সেলর।

AIIB (বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প)

এশিয়ার দেশগুলোর বিভিন্ন অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প হিসেবে গঠিত হয়েছে চীনের নেতৃত্বাধীন নতুন ব্যাংক এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক। (Asian

http://thejobstudy.com Go to Contents

Infrastructure Investment Bank-AIIB) ২৪ অক্টোবর, ২০১৪ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশসহ ২১টি দেশ (চীন, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ওমান, কুয়েত, কাতার, ভিয়েতনাম, উজবেকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, কাজাকিস্তান, কম্বোডিয়া, লাওস ও মঙ্গোলিয়া) চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী দেশগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্ট (AOA) স্বাক্ষর ও অনুমোদন করবে। AOA স্বাক্ষরের পর নতুন ব্যাংকটি ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে, যার মূলধন হবে ১০ বিলিয়ন ডলার। AOA -তে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো এআইআইবি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মর্যাদা পাবে। প্রাথমিক অবস্থায় বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সড়কের উন্নয়নসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগে মনোযোগী হবে ব্যাংকটি।

AIIB-এর সদর দপ্তর হবে বেইজিংয়ে। ব্যাংকটির প্রধান পদের নাম হবে প্রেসিডেন্ট। আর ব্যাংকটির কাঠামো ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে- ১. বোর্ড অব গভর্নর্স ২. বোড অব ডিরেক্টর্স ও ৩. ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা। ব্যাংকের সব ক্ষমতা থাকবে বোর্ড অব গভর্নর্সের কাছে। এ কমিটি যেকোনো দেশের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে। এছাড়া কোনো দেশকে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবও পাস করবে এ কমিটি। একই সাথে যত ধরনের নীতিমালা করা হবে, তা এ বোর্ড অব গভর্নর্স তৈরি করবে।

কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থান

নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ক্ষমতায় আসার সাথেই সাথেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক যেই আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। বন্ধুত্বের সব আবহ কেটে যায় আগস্টে, ২০১৪ সালে। ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার ছুরিয়াতের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক করার পর ভারত হঠাৎ করেই দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনা বাতিল করে। ভারতের তড়িঘড়ি করে এ আলোচনা বাতিল নওয়াজ শরীফ পাকিস্তানে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। ফলে পাকিস্তানের সামগ্রিক বলয়ে ভারতের প্রতি ঘৃণা আরো বেড়েছে।

তারপরও ভারত এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে জাতিসংঘ অধিবেশনের সময় নরেন্দ্র মোদী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে মিলিত হবেন না। আর এখন দুই দেশ কাশ্মীরে একে অপরের বিরুদ্ধে কামান দাগাচ্ছে।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে কাশ্মির ইস্যুতে ভারত খুবই আক্রমণাত্মক। ২০১৪ এর শেষে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকা কাশ্মির (ভারত-অংশ) ঘুরে এসে নরেন্দ্র মোদী মুছলিম কাশ্মিরি নেতা ও দেলগুলোর বিরুদ্ধে হিন্দু অনুভূতি উসকে দিয়েছেন। এমনকি তিনি সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করার কথা বলেছেন যেখানে বলা হয়েছে কাশ্মির ভারতে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করবে।

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ভারত পাকিস্তান প্রশ্নে দুটি বিপরীতধর্মী সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত কট্টর হিন্দু বাদী হওয়ায় মোদী পাকিস্তানের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেবেন দ্বিতীয়ত (শান্তিকামীদের মতে) মোদী একজন ব্যবসাবান্ধব ব্যক্তি হওয়ায় পূর্বসূরী বাজপেয়ি ও আদভানির মতো তার দেশ প্রেমিক ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রার চেষ্টা করবেন।

পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল হওয়ায় নওয়াজ শরীফ যথেষ্ট দুঃখ পান। কেননা ২০১৩ সালে শপথ নেওয়ার পরই ভারতের প্রতি নিঃশর্ত বন্ধুতার হাত বাড়ান নওয়াজ। যে সময়ের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তা প্রত্যাক্ষাত হয়। এরপর ভারত-পাকিস্তান মুক্তি বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার কথা থাকলে এ বছর ২০১৪ ভারতের নির্বাচনের কারনে স্থগিত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনা শিগগিরই প্রশমত হচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদী ভালো কর্মে থাকলেও পাক সামগ্রিক বলয়ে নওয়াজ শরীফের গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোটায় এসে ঠেকেছে।

ক্রিমিয়া সংকট

২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউক্রেনের রুশপন্থী প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটি বাণিজ্যচুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর থেকেই ইউক্রেনে বিরোধীদলের আন্দোলন উত্তাল হয়। পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, দেশ ত্যাগ এবং পশ্চিমা-রাশিয়া দ্বন্দ্বের সূত্রধরে রুশ সীমান্তে অবস্থিত ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়ায় সেনা মোতায়েন করে রাশিয়া। সর্বশেষ

জনগণের ভোটে রাশিয়া ফেডারেশনে যোগ দেয় ক্রিমিয়া।

কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ছোট কেটি উপদ্বীপ ক্রিমিয়া। শতকের পর শতক ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয় ভূখণ্ডটি। সবচেয়ে বেশি সময় অবস্থান করে, তার্কিভাষি মোঙ্গোলিয়া। তারা স্থানীয়দের মধ্যে মিশে গিয়ে "ক্রিমিয়ান তাতার" জাতিগোষ্ঠীর প্রবর্তন করে। "গোল্ডেন হার্ড" থেকে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এটি তুর্কি উপনিবেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতকে হতে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ের পর হতে রাশিয়ার প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৭৪ সালে "কুচুক কাইনায়াজ শান্তিচুক্তি" তে ক্রিমিয়া রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয় এবং ইউরোপ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক) মাঝে সংঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ক্রিমিয়া, বিংশ শতকে ক্রিমিয়া পরিণত হয় রাশিয়ান, ক্রিমিয়ান, তাতার, ইউক্রেন ও ইহুদিদের মিলিত আবাসভূমিতে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ক্রিমিয়ায়ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অনেক ক্রিমিয়ান তাতার জার্মান দোসরে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও বিতাড়িত হয় বহু তাতার। তবে অনেক কমিউনিস্ট নেতার সমর্থনে আশির দশকে তাতাররা আবার ক্রিমিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ পায়।

১৯৫৪ সালে একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে ইউক্রেন প্রশাসনকে উপহার দেন। তবে উপদ্বীপটির সেভাস্টোপোল শহরে রাশিয়ান নৌঘাঁটি রেখে দেয়া হয়। নব্বইয়ের দশক থেকেই এ নৌঘাঁটি রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করতে থাকে।

১৬ মার্চ ২০১৪ ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৬.০৬ শতাংশ ভোটার রাশিয়ার সাথে একীভূত হয়ে যাবার পক্ষে রায় দেয়। ঐ গণভোটের পর ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ১৭ মার্চ ২০১৪ নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেয় এবং রুশ ফেডারেশনে যোগ দেয়ার আনুষ্ঠানিক আবেদন জানায়। ক্রিমিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে ডিক্রী জারি করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তারপর ১৮ মার্চ রাশিয়ায় ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে রুশ প্রেসিডেন্টও ক্রিমিয়ার নেতারা। এর মাধ্যমে একদিনের স্বাধীন ক্রিমিয়ায় স্বাধীন অস্তিত্ব আর সম্ভবত এটাই হচ্ছে ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্পায়ু স্বাধীন রাষ্ট্র। ২১ মার্চ ২০১৪ ফেডারেল অ্যাসেম্বলির উচ্চকক্ষে ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তিটি সর্বসম্মত ক্রমে অনুমোদিত হয়। নতুন আইন অনুযায়ী, ক্রিমিয়ায় এখন রুশ শাসিত দুটো নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল গঠিত হলো-ক্রিমিয়া এবং বন্দর নগর সেভাস্তোপোল।

MDG-এর পর SDG

জাতিসংঘে ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)- এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১৫ সালে। তবে এর আগেই সেপ্টেম্বর ২০১৪ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ সাধরণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক 'টেকসই উন্নন লক্ষ্যমাত্রা' (Sustainable Development Goals-SDGs) এর ঘসড়া চূড়ান্ত হবে। ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে এস লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হওয়ার পর ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এসডিজির মেয়াদ শুরু হবে। দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবসম্পদ উন্নয়নকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরে এ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ৪৭টি সূচক ও ১৭০টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

গাজা সংকট ও বিশ্ব মানবতা

এক বৃহৎ কারাগার ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যাকা। এ উপত্যাকা নিয়ন্ত্রকারী ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাস। ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হামাস। তাই হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গাজা উপত্যকায় বারবার অভিযান চালায় ইসরায়েল। পর ৮ জুলাই ২০১৪ থেকে আরেকটি রক্তাক্ত ও বর্বর অভিযান শুরু করে তারা। ফিলিস্তিন সংকট বহু পুরানো। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব প্রায় ৭ দশক সংকটের বাইরে নয়। কিন্তু ইসরায়েল-বিরোধী সংগঠন হামাস ২০০৬ সালে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে এ সংকট নতুন মাত্রা লাভ করে। এরপর থেকে গাজা উপত্যকায় বারবার অভিযান চালায় ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) 'যুদ্ধাপরাধে'র অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২৫ জুলাই, ২০১৪ ফিলিস্তিনের আইনমন্ত্রীর পক্ষে অভিযোগটি দায়ের করেন ফরাসি আইনজীবী গিল ডেভার্স। 'অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ' নামে জুন ও জুলাই মাসে ফিলিস্তিনের ইসরায়েলি

সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধ প্রমাণ করাই এ অভিযোগ দায়ের মূল লক্ষ্য।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলাকালে হামাস ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধপরাধের বিষয় তদন্তের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেলের প্রধান করা হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক কানাডীয় অধ্যাপক উইলিয়াম স্ক্যাবাসকে। প্যানেলের অন্য সদস্যরা হলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সেনেগালের দৌদে দিয়িনি এবং লেবানিজ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী আমল আলামুদ্দিন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'স্বাধীন' এ দলটি গত ১৩ জুন, ২০১৪ থেকে গাজায় সামরিক অভিযানের সময় আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি-না তা তদন্ত করে।' ভৌগোলিকভাবে ইসরাইল ও মিসরের মাঝখানে অবস্থিত গাজা উপত্যাকা ২০০৬ সাল থেকে কার্যত অবরুদ্ধ। এ সময়কালে ইসরাইল গাজায় এবার নিয়ে তিনবার পূর্ণমাত্রায় সামরিক আগ্রাসন ও গণহত্যা চালায়। অভিযানগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান-

অপারেশন কাস্ট লিড ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮-১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয় ১৩৯১ জন, যার মধ্যে ৭৫৯ জনই বেসামরিক। নিহতদের মধ্যে ৩৪৪জন শিশু ও ১১০ জন নারী। ইসরাইলের নিহত হয়। ৯ জন অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স ১৪ নভেম্বর ২০১২-২১ নভেম্বর ২০১২, ১৬৭জন ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত, যার মধ্যে ৮৭জনই বেসামরিক নাগরিক। ইসরাইলে ক্ষেত্রে ২ জন সেনা ৪ জন বেসামরিক নাগরিকসহ মাত্র ৬ জন নিহত হয়। অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ ৮ জুলাই, ২০১৪ চলমান ২১০৬ জন ফিলিস্তিনি মারা যায়, যার ৮০ শতাংশই বেসামরিক নাগরিক। অন্যদিকে ইসরাইলে ৬৪ জন সেনা সদস্য ৩ জন বেসামরিক নাগরিক ও ১ জন থাই কর্মী নিহত হয়।

প্রাণঘাতি ভাইরাস ইবোলা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও আতঙ্কিত ভাইরাস 'ইবোলা'। সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকার চারটি দেশ- গিনি, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও নাইজেরিয়ায় ইবোলা ভাইরাস রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। ইতোমধ্যেই এ রোগের ২৪ অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত তিন সহস্রাধিক লোক আক্রান্ত হয় এবং সহস্রাধিক লোক মারা যায়। রোগটির ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকায় ইতোমধ্যেই ৬-৭ আগস্ট, ২০১৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সভা করে এ রোগের Concern হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে।

ইবোলা ভাইরাস রক্তপ্রদাহজনিত জ্বর (Ebola hemorrhagic fever (EHR) হিসেবেই সমাধিক পরিচিত ছিল। ইবোলা মূলত একটি আর এন এ ভাইরাস। এটি একটি ফাইলো ভাইরাস, দেখতে আঁশ বা সুতার মতো। সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার একটি ভগ্নাংশের সমান আকারের ভাইরাসটি প্রায় অনুবীণিক।

সঠিকভাবে ইবোলা ভাইরাসজনিত রোগের উৎপত্তি কোথায় বা কীভাবে, তা জানা না গেলেও ধারণা করা হয় বাদুরের দেহ অভ্যন্তরে এ রোগের ভাইরাস বংশবিস্তার করে। পরবর্তীতে মানুষ বা অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন- গরিলা, আফ্রিকান শিম্পাঞ্জি, সজারু ও মৃগ-এর মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে। ও সুদানে প্রথম ইবোলা শনাক্ত করা হয়।

বলা হয়ে তাকে বাদুরের খাওয়া ফল থেকেই ইবোলা ভাইরাস মানুষের দেহে প্রথম প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে শুরু করে। এ ফ্লু ও অন্যান্য বায়ুবাহিতে রোগের মতো ছড়ায় না, আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে না আসলে এ রোগের সংক্রমিত হবার ভয় নেই। ইবোলা আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে নিরীহ ফ্লু'র মতো হালকা জ্বর, মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা অনুভব করে। কিছুদিন পর তীব্র মাতা ব্যথা, জ্বর, শরীর ব্যথা, ত্বকে দানা দানা ওঠা, মুখে ঘা, ডায়রিয়া এবং মারাত্মক বমি শুরু করে।

ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ

বিরোধপূর্ণ এলাকা ২৫.৬০২ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের প্রাপ্তি ১৯.৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার। ভারতের প্রাপ্তি ৬.১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। মামলাটি ৪-১ ভোটে পাস। ট্রাইবুনালের (৫) বিচারক রুণিডগার উলফ্রাম (জার্মানি) জঁ পিয়েরে কত (ফ্রান্স), টমাস এ মেনশাহ (ঘানা) ইভান শিয়ারার (অস্ট্রেলিয়া) প্রেসারাজ শ্রীনিবাসা রাত (ভারত)। করও বেশি সময় ধরে, আলোচনার পর নিস্পত্তি না হওয়ার ৮ অক্টোবর সালিসি আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারনের জন্য জার্মানির হামবুর্গে ইটলসে আর ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারনের মামলা দ্যা হেগের Permenent Court of Arbritratio (PCA) বা স্থায়ী সালিসি আদালতে দায়ের করা হয়।

২০১৩ সালের ৯-১৮ ডিসেম্বর সমুদ্রসীমা নির্ধারনের পরে বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে। গুনানি পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই রায়ের ফলে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৬৭ কি. মি) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে। এর ফলে বিরোধ পূর্ণ সমুদ্র এলাকার বিপুল অংশে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের আর কোন বাধা থাকল না। এরিয়ে গভীর সমুদ্রে প্রস্তাবিত ১০টি তেল গ্যাসই পড়েছে বাংলাদেশের সীমানায়। তবে পানির নিচে তলিয়ে যায় দক্ষিণ তালপট্টি। তলিয়ে যাওয়া দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ আদালতে গুরুত্ব পায়নি, পড়েছে ভারতে: ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রায় ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার ভাটার সময় ১০০০০ বর্গ কি. মি. যুক্তরাষ্ট্রের ল্যান্ড রিসোর্স স্যাটেলাইট ১৯৭৪ তথ্য সূত্র আয়তনের একটি নতুন দ্বীপ জেগে ওঠে। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় এ চরে নাম দক্ষিণ তালপট্টি (ভারতের দেওয়া নাম পূর্বাশা বা নিউমুর)। ১৯৮৫ সালে উড়িরচরের ঝড়ের পর দ্বীপটি আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে স্যাটেলাইটে ধারন করা ছবিতে এ দ্বীপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি। সমুদ্রসীমা নির্ধারনের বিষয়টি ১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফের মানচিত্রের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারিত হওয়া দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি আদালতে গুরুত্ব পায় নি।

৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখে নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক ভারত বাংলাদেশ সমুদ্রসীমানা বিরোধের মামলার রায় প্রদান করা হয়। ভারতের দাবি ছিল বাংলাদেশ ঘোষিত ১৮০ (আজুমাথ) লাইনের পরিবর্তে ১৬০ লাইনকে সীমানা হিসাবে চিহ্নিত করা। কিন্তু আদালত ১৭৭ লাইনকে সীমানা হিসাবে চিহ্নিত করে। আদালত ভারতের দাবিকৃত সমদূরত্বের (Equidistance) নীতি অনুসরন না করে ন্যায্যতার (Equity) ভিত্তিতে নীতি অবলম্বন করে।

এই রায়ে বাংলাদেশ সম্যকভাবে লাভবান হয়। সমুদ্রসীমা বিষয়ে ২০১২ সালের ও ২০১৪ সালের রায়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয়টি রায়টির বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। এই বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে ভারতের জাতীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান ওনজিসি (ONGC) বেশ সাফল্য পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই অংশে ভারতের বিশেষ আকর্ষণ থাকার কারণ হলো এর পশ্চিমে মহানদী বেসিন এলাকায় আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলো। এই সম্ভাবনা এখন বাংলাদেশের হাতে। একই ভাবে মিয়ানমারের আরাকান সমুদ্র উপকূলে যে সিউ-ফিউ মিয়া গ্রাসগেন্ডলোর আবিষ্কৃত হয়েছে, তা মিয়ানমার সংলগ্ন বাংলাদেশী ব্লকগুলোর জন্য ইতিবাচক সংকেত বহন করবে।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে যে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটেছে, তা হলো অমীমাংসিত বিরোধ্ এই রায় বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই। ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার- যে যা-ই থাকুক না কেন, প্রতি দেশ নিজ নিজ সমুদ্র সীমায় এ রায়ের বদৌলতে নিষ্কণ্টক।

স্কটল্যান্ডের গনভোট

দীর্ঘ ৩০৭ বছর যুক্তরাজ্যের সাথে থাকার পরে স্কটল্যান্ডের জনগন যুক্তরাজ্য থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ একটি গনভোটের আয়োজন করে। গনভোটে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪২ লাখের কিছু বেশি। প্রদত্ত ভোটের হার ৮৪.৬%। স্কটল্যান্ডের স্বাধীন হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল-১৮৫২৮২৮টি ভোট। স্বাধীনতার পক্ষে হ্যাঁ ভোট পড়ে ১৬ লাখ ১৭ হাজার ৯৮৯ ভোট না ভোট পড়ে ২০ লাখ ১৯২৬টি ভোট। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে থেকে যাওয়ার পরে অংশটি স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে শতাংশের হিসাবে ৫৫-৪৫ ব্যবধানে জিতে যায়। ফলে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা স্কটিশদের কাছে অধরাই রয়ে গেল। স্কটল্যান্ডের এই স্বাধীনতা প্রত্যাশী আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন অ্যালেক্স স্যামন্ড।

আন্তর্জাতিক নদীধারা সনদ কার্যকর

১৭ আগস্ট, ২০১৪ কার্যকর হয় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদীধারা সনদ (United Nations Convention on the law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses)

আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি প্রবাহ ব্যবহারের একটি মানদন্ড, এতে অভিন্ন নদীগুলোর পানি ব্যবহারের সার্বিক নির্দেশনা রয়েছে। সনদটি কার্যকর হওয়ায় কোনো দেশ পানির ন্যায্য হিসাব না পেলে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারবে এবং নদী বিষয়ক অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

ক. ৩৫ তম দেশ হিসাবে ভিয়েতনাম এতে অনুস্বাক্ষর করে ১৯ মে, ২০১৪।
খ. অনুসমর্থন করার ৯০তম দিনে ১৭ আগস্ট, ২০১৪ তা কার্যকর হয়।
গ. জাতিসংঘের যে কোন কনভেনশন কার্যকর করতে অনুস্বরের প্রয়োজন হয়-অন্তত ৩৫টি সদস্য দেশের।

নতুন সামরিক কৌশল এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশের বিপক্ষে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর পরিকল্পনা করে সে সময় পাকিস্তানের পরম মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র। তখন থেকেই বাংলাদেশের মানুষের কাছে সপ্তম নৌবহর এক আতঙ্কের নাম। সম্প্রতি ভারতীয় এক পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠাচ্ছে। এ খবরে তোলপাড় পড়ে যায় দেশ জুড়ে। এর পরপরই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই এ খবরকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেট্টা জানান মূল ঘটনাটি। যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চায় বাজেট সংকট সত্ত্বেও পেন্টাগন এশিয়ায় মার্কিন উপস্থিতি বৃদ্ধির নতুন কৌশল বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। ২ জুন, ২০১২ সালে সিঙ্গাপুরে একটি সামরিক বিষয়ে সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরাক্ষামন্ত্রী লিওন পেনেট্টা ঘোষণা করেছেন, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রায় ৬০ ভাগ রণতরী এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। এখন ৫০ ভাগ রণতরী রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়। যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যাবস্থাকে স্নায়ুযুদ্ধের পর কৌশলগতভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন বাঁক হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চ্যালেন্জ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের PF- এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে তা হলো :

১. ফিলিস্তিনিদের সাধারণ পরিষদের পর্যবেক্ষনের মর্যাদা লাভ,
২. আরব বসন্ত এবং মৌলবাদিতার বিকাশ,
৩. সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ,
৪. উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মকাণ্ড।

এ নতুন পদক্ষেপ একটি নামও দিয়েছেন 'pivot' যার অর্থ হলো একটি আবর্তকেন্দ্র। অর্থাৎ এখন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সমরসজ্জা আবর্তিত হবে।

নাসাকা বাহিনী

দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর দায়িত্বপালনকারী সীমান্তরক্ষী নাসাকা (Nasaka) বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ১২ জুলাই, ২০১৩ সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি থেইন সেইনের ৫৯/২০১৩ আদেশ বলে এ বাহিনীর কার্যক্রম বিলুপ্ত করা হয়।

নাসাকা বাহিনী : রাখাইন রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা বরাবর ১২টি সেক্টর নিয়ে ১৯৯১ সালে তৎকালিন সীমান্তরক্ষী বাহিনী লুনথিন (Lunthin)- এর স্থলে নাসাকা বাহিনীকে সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯১ সালে লুনথিন বাহিনী রেজুপাড়ায় তৎকালিন বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ, হামলা, লুটপাট চালানোর মতো বেপরোয়া কার্যক্রম বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় শুরু করে। ঐ ঘটনায় দুই জন বিডিআর সদস্য ও একজন স্থানীয় কৃষক প্রাণ হারায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ঐ বছরেই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯২ সালের মার্চ পর্যন্ত আড়াই লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এরপর সীমান্ত গোলযোগের ঘটনায় মিয়ানমার

http://thejobstudy.com Go to Contents

সরকার লুনথিন বাহিনীকে সরিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ, কাস্টমস ও বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করে বিশেষায়িত 'নাসাকা বাহিনী'। বাংলাদেশের নাইক্ষ্যংছড়ির লেমুছড়ির বিপরীতে অটোলা ১নং নাসাকা সেক্টর শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে রাখাইন রাজ্যের রাজধানী ক্যাকটাউ পর্যন্ত ১২টি সেক্টর এবং মংডুর কাউয়ার বিলস্থ হেড কোয়ার্টার নিয়ে নাসাকা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

যে কারণে বিলুপ্ত : সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের একাধিক সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। এসব ঘটনায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নাসাকা ও পুলিশ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বিশেষ করে নাসাকা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যর্থতার পাশাপাশি নানা ধরনের অভিযোগও উত্থাপিত হয়। এতে আন্তর্জাতিকভাবেই নাসাকার কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে আন্তর্জাতিক বহুমাত্রিক চাপের মুখে পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে ১১ জুলাই, ২০১৩ রাতে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট জেনারেল থেইন সেইন এক আদেশে নাসাকা বাহিনীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধপূর্বক বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১২ জুলাই থেকে সীমান্তের নিরাপত্তায় নিয়োজিত নাসাকা বাহিনী আউট পোস্টগুলো থেকে তাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে ব্যারাকে ফিরে যায়। মিয়ানমার সরকার নাসাকা বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার পর নাসাকার বদলে বাংলাদেশ সীমান্তে সেদেশের আধা-সামরিক বাহিনী লুনথিনকে বসানো হয়। লুনথিন বাহিনীর সদস্যদের সাথে সম্প্রতি আত্মসমর্পণ করা বিচ্ছিন্নতাবাদী এএলপি'র আরো বেশ কিছু সদস্য যোগ করে বর্ডার গার্ড ফোর্স (বিজিএফ) নাম দিয়ে নতুন একটি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী গঠন করবে মিয়ানমার।

GSP সুবিধা ও বাংলাদেশের শ্রম আইন

GSP এর পূর্ণরূপ Generalized System of Preference. GSP একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুবিধার নাম। GSP মূলত সাধারণীকৃত অগ্রাধিকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ অগ্রাধিকার পায় তাকেই বলে GSP। উল্লেখ্য যে, GSP পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত পায়। USA এবং EU বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা অব্যহত রাখার জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করছে তার মধ্যে অন্যতম-

১. গার্মেন্টস শিল্পের পরিবেশ
2. Trade Union
৩. শ্রমিকদের কল্যাণে করণীয়।

২৭ জুন ২০১৩ USA বাংলাদেশকে প্রদত্ত অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করেছে। বাংলাদেশে কেন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করল। যেমন:-

১. শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা,
২. সংগঠনের অধিকার,
৩. কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা,
৪. পোশাক কারখানায় একের পর এক দুর্ঘটনাসহ কয়েকটি কারণে জিএসপি স্থগিত করা হয়েছে।

শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা, ১২ মে ২০১৩ মন্ত্রীপরিষদে বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ আইনে-

১. শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
২. যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ১০০ শ্রমিক রয়েছে সেখানে জীবন বিমা বাধ্যতামূলক।
৩. গামেন্টস শিল্পের লভ্যাংশের ৫% শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

আশা করা হচ্ছে, এগুলো বাস্তবায়িত হলো GSP-র সুবিধা অব্যহত রাখার বাধা কেটে যাবে।

ইউরোপের নতুন জিএসপি

জিএসপি (GSP) একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিকভাবে সুবিধার (Preferential trade concession) নাম। ইউরোপিয়ন ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তাদের দেশে আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধা বা জিএসপি (GSP) সংশোধন করেছে। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন এ জিএসপি বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে ১৭৬টি উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত দেশ ও ভূ-খণ্ড ইইউতে অগ্রাধিকার সুবিধা পায়। নতুন স্কিমে এখন থাকছে ৮৯টি দেশ। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশেরসহ ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশ এবং

ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ ৪০টি উন্নয়নশীল দেশ। বাকি ৮৭টি দেশ ও ভূ-খণ্ডের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ইইউ (EU) তাদের অগ্রাধিকার সুবিধা দেয়ার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সব সুবিধা আগের মতো থাকবে। অর্থাৎ জিএসপি সুবিধার আওতায় অস্ত্র ছাড়া সবকিছুই ইইউতে রপ্তানি করতে পারবে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে কিছু নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শর্ত দিয়েছে ইইউ। যেমন, শ্রম ইস্যুতে ইইউ এখন থেকে কেবল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-র মানদণ্ডের ওপরই নির্ভর করবে না, নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করবে। তার ভিত্তিতে জিএসপি সুবিধা দেওয়া হবে।

ইইউ সর্বপ্রথম জিএসপি বাস্তবায়ন করে। ইইউ-এর জিএসপি ১৯৭১ সালে চালু হয়। শুরুতে তা শিল্পজাত পণ্য ও প্রায় সব কৃষিপণ্যের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ২০০১ সালের মার্চ মাস হতে জিএসপি সুবিধা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য ছাড়া সব পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। বর্তমানে যে জিএসপি চলছে, তা প্রণীত হয়েছে ২০০৮ সালে।

তেলেঙ্গানা: ভারতের নতুন রাজ্য

ছয় দশকের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতের কংগ্রেস দল ৩০ জুলাই, ২০১৩ তেলেঙ্গানাকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ ভেঙ্গে প্রথম তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন করা হচ্ছে। পৃথক রাজ্যের ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে তেলেঙ্গানা হবে ভারতের ২৯তম রাজ্য। অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ আগামী ১০ বছর দুই রাজ্যেরই রাজধানী থাকবে। ১০ বছর পর অন্ধ্র প্রদেশের জন্য নতুন রাজধানীর বিষয়টি পর্যালোচিত হবে। হায়দরাবাদকে ইউনিয়ন টেরিটরি করা হতে পারে এবং দুটি রাজ্যের যৌথ রাজধানী হিসেবে এটি কাজ করবে। একজন লে. গভর্নর এ টেরিটরি পরিচালনা করবেন। হায়দরাবাদের লে. গভর্নর পদাধিকারবলে তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রশাসক হবেন। তবে, ক্ষমতাসীন দলের এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তেলেঙ্গানাপন্থী নেতারা তাদের অবিভক্ত একক রাজধানী হিসেবে হায়দরাবাদের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেছেন। হায়দরাবাদ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী চণ্ডীগড়ের মতো নয়। চণ্ডীগড় দুই রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হলেও হায়দরাবাদ তা নয়। তাই, ১০ বছর পর অন্ধ্র প্রদেশকে নতুন রাজধানী দেওয়া হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নদীর পানি, বিদ্যুতের ভাগাভাগি ও দুই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে। এ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য করার বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করবে। এছাড়া, অন্ধ্র প্রদেশের বিধানসভায় এর মতামত জানাতে বলা হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী একটি কমিটি গঠন করে দেবেন। এ কমিটির কাজ হবে রাজ্যের তিনটি অঞ্চলের রাজস্ব ও পানি বণ্টনের মতো বিষয়গুলো কীভাবে সমাধান করা হবে, সে ব্যাপারে একটি মতৈক্যে পৌঁছানো। এরপর পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষে নতুন রাজ্য গঠনের বিষয়ে বিল উত্থাপন ও পাস করতে হবে। আগামী ৬ আগস্ট পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিল উত্থাপিত হবে। রাজ্য গঠনের এ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে আগামী বছরের শুরুর দিকে। পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য করার দাবিতে পাঁচ দশক ধরে আন্দোলন চলে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার আকস্মিকভাবে ঘোষণা দেয় যে, নতুন তেলেঙ্গানা রাজ্য করার বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও রায়ালসীমা এলাকায় সহিংস বিক্ষোভ শুরু হলে সরকার পিছু হটে। অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকা এবং রায়ালসীমা অঞ্চলে শান্তি রক্ষায় ১২০০ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আবার এবারের অন্ধ্র প্রদেশকে ভাঙ্গার প্রতিবাদে কয়েকজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা জানিয়েছে, তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হলে তারাও পৃথক গোর্খাল্যান্ড আদায় করে ছাড়বে। উল্লেখ্য, আসামে পৃথক বোড়োল্যান্ডের দাবি মাঝেমধ্যেই ওঠে, আবার পৃথক বিদর্ভ রাজ্যের দাবিও বহু পুরোনো।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এ সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এ সংস্থার সক্রিয় অংশীদার। বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষণ মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে তার পদযাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে যৌথ বাহিনীতে অংশগ্রহণকৃত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে। এরপর থেকে বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক বাহিনী এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক হারে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং সৈন্য প্রেরণ শুরু হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে বিগত ২৫ বছরে বাংলাদেশের ভূমিকা দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ চলমান ১৫টি মিশনের মধ্যে ৯টি মিশনসহ মোট ৩৬টি শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সৈন্য যোগানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মে ২০১৫ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে বাংলাদেশের ৮৮৭৮ জন শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত।

মিয়ানমারে কাচিন বিদ্রোহ

১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই মিয়ানমারের নানা অংশে বিভিন্ন বিদ্রোহি গোষ্ঠী তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। তার মধ্যে অন্যতম উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য কাচিনে জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহী কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্গানাইজেশন (KIO)। ১৯৬১ ফেব্রুয়ারি ৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত KIO স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করে। তবে পরে সেখান থেকে সরে এসে তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে 'তাতমাদাও' নামে পরিচিত মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও KIO-এর মিলিটারি উইং কাচিন ইন্ডিপেনডেন্স আর্মির (KIO) মধ্যকার ১৭ বছরের শান্তিচুক্তি ২০২১ সালের জুনে ভেঙে যায়। এরপর থেকেই দু'পক্ষের লড়াই চলছে নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত কাচিন রাজ্যে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ বিদ্রোহী সংগঠন কাচিন স্বাধীনতা সংস্থার (KIO) সামরিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বিমান হামলা চালিয়ে দখল করেছে সামরিক বাহিনী। ফলে কাচিন বিদ্রোহ নতুন করে মাত্রা পায়। বর্তমান মিয়ানমার সরকার দেশটির নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদের বিদ্রোহি সংগঠন কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্গানাইজেশন (KIO) সাথে সাত দফা ভিত্তিক অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে পৌঁছেছে। কোচিন প্রদেশের মিতকিনায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

দক্ষিণ এশীয় ট্রাঙ্কফোর্স

এশিয়ার ৩২টি দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের ESCAP প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ যে আন্তঃএশীয় মহাসড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেটিই প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে নামে পরিচিত। এশিয়ান হাইওয়ের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পূর্ব দিকে চীন, মঙ্গোলিয়া ও ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিম তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ; দক্ষিণ দিকে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার, দক্ষিণ-পূর্বদিকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউএন-এসকাপ) এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০০৪ সালের এপ্রিলে চীনের সাংহাইয়ে ইউএন-এসকাপের ৬০তম অর্থনৈতিক সম্মেলনে জাপানের টোকিও থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ৩২টি দেশের মধ্য দিয়ে এ সড়ক প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশের মধ্যে এশিয়ান হাইওয়ের তিনটি গতিপথ বা রুট ঠিক করেছে এসকাপ। প্রথমটি বেনাপোল-যশোর-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল। দ্বিতীয়টি বাংলাবান্ধা-হাটিকুমরুল-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল। তৃতীয়টি হচ্ছে মংলা-যশোর-হাটিকুমরুল-(কুষ্টিয়া লালন শাহ ও যমুনা সেতু হয়ে)-ঢাকা-কাঁচপুর-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ। এর মধ্যে প্রথম দুটি গতিপথ ভারতের মধ্যে থেকে এসে ভারতে শেষ হবে। তিন নম্বর পথটি শুধু মিয়ানমার সীমান্তে শেষ হয়েছে। বর্তমান সরকার সম্প্রতি (২০০৯) জানায় এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত না হলে রুট নির্মাণে বিশ্বব্যাংক অর্থ দেবে না। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে এ সড়ক নির্মাণ সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়বে। কিন্তু বাংলাদেশের একাংশ যারা এসকাপের প্রস্তাবিত রুট সংশোধন করে মিয়ানমার হয়ে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের সংযুক্তি চায় তাদের মতে এসকাপের প্রস্তাবিত রুটটি মূলত ভারতকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে করিডোর করে দেয়ার একটি নীলনকশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হারাক

দক্ষিণ ইয়েমেনের গণজাগরণ স্থানীয়ভাবে 'হারাক' নামে পরিচিত। ২০০৭ সাল থেকে এ হারাক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদের লক্ষ্য নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা। তবে কবে নাগাদ এ পরিকল্পনা সফল হবে তার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা তারা ঠিক করে নি। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ সুদান সুদানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করায় দক্ষিণ ইয়েমেনের বিদ্রোহীরা দারুণ আশাবাদী হয়ে ওঠেছে। দক্ষিণ ইয়েমেনের জনগণের মতে, আমাদের একটি নতুন সরকার ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন আছে। নতুন দেশটি হবে উদার ও সামাজিক গণতন্ত্রের। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দর্শনের আলোকে দেশটি গড়ে তোলা হবে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখলেও দক্ষিণ ইয়েমেনে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সামরিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে নি এখনো। এমনকি প্রেসিডেন্ট সালেহকে চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো ক্ষমতা ও রসদ নেই বিদ্রোহীদের। কিন্তু তারপরও জেনারেল আসাদী আশাবাদী কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জনের জন্য।

কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি

কূটনৈতিক মিশন, কূটনীতিক ও তার পরিবারের সদস্যরা এবং নির্ভরশীলরা বিদেশে অথবা স্বাগতিক দেশে ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশনস (১৯৬১)-এর আওতায় দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। যেমন-মিশন অফিস ও রাষ্ট্রদূতের বাসা অনতিক্রমণীয়। পূর্ব অনুমতি ছাড়া এসব স্থানে বা অন্যান্য স্বদেশভিত্তিক প্রশাসনিক ও কারিগরী স্টাফদের বাসায় (স্বাগতিক দেশে বিশেষ করে) প্রবেশ করা যায় না। তারা যে রাষ্ট্রে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাদের ওপর সে রাষ্ট্রের আদালতের এখতিয়ার থাকে না। কোনো গুরুতর অভিযোগে অবাঞ্ছিত (Persona non grata) ঘোষনা করে বহিষ্কার করতে পারে কিন্তু তারা জেল জরিমানা হতে মুক্ত থাকবেন। তাদের স্বদেশে প্রেরিত ও তাদের কাছে স্বদেশ থেকে আগত কোনো চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি স্বাগতিক রাষ্ট্রের কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি বা তল্লাশি চালানো যায় না। মিশন ও কূটনীতিকরা সবধরনের আইনগত সুবিধা তারাই ভোগ করবেন যারা গ্রহণকারী রাষ্ট্রে কূটনৈতিক মর্যাদার অধিকারী হবেন অথবা যারা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিট করে দেন কর্মস্থল থেকে ফেরা বা যোগদানের পথে। অধিকন্তু যদি একজন কূটনীতিককে একটি বাধ্যবাধকতাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া যায় যা স্বাগতিক দেশের দেওয়ানী আইনের আওতায় পড়ে এবং সেক্ষেত্রে কূটনৈতিক দায়মুক্তি দাবি করে সেক্ষেত্রে স্বাগতিক রাষ্ট্র প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট কূটনীতিক কর্তৃক পালনীয় বাধ্যবাধকতা পূরণে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেরণকারী দেশ সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকের দায়মুক্তি প্রত্যাহার করতে পারে।

বঙ্গোপসাগরে সম্পদ আহরণ

সমুদ্র ঐতিহাসিক কাল থেকেই সমুদ্র মানব সভ্যতার বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম ছাড়াও জানা-অজানা বিপুল সম্পদের আধার হিসেবেও সমুদ্র বরাবরই জাতিসমূহের বিরোধের কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। সীমানা নির্ধারিত না থাকার ফলে বিগত চার দশক যাবত বাংলাদেশের জনগণ সমুদ্রতলদেশের সম্পদ (যেমন তেল, গ্যাস) আহরণে কোনো উদ্যোগ নিতে পারে নি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট সীমানার অভাবে এ দেশের জেলে সম্প্রদায় যেমন মৎস্য আহরণে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তেমনি আমাদের মৎস্য সম্পদ অন্য দেশের জেলেরা অবাধে শিকার করেছে। তাই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ অধিক জরুরি ছিল। বিগত ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গস্থ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইবুন্যাল তথা ইটলস কর্তৃক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল ও রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর নানাবিধ সম্পদে ভরপুর। মৎস্য, ঝিনুক, মুক্তা, কাকড়া, ইউরেনিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল-এ সকল সম্পদের মধ্যে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস চিংড়ী, কাকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি আহরিত হচ্ছে।

এমডিজি ও বাংলাদেশ (MDGs and Bangladesh)

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৪টি এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal-MDG) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষাপটে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট সহ সব ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন-CPD সহ অন্যান্যরা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং চলমান পরিস্থিতিতে এ লক্ষ্য অর্জন আশানুরূপ নয় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যসমূহ হলো :

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।
লক্ষ্য-২ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
লক্ষ্য-৬ : এইডস,ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল (ITLOS)

ITLOS-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি International Tribunal for the Sea। তৃতীয় সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর এটি 'সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন'-এ স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানির হামবুর্গভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমুদ্র বিষয়ক বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। বিভিন্ন দেশে ২১ জন বিচারক নিয়ে এ ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত। বর্তমানে ১৬০টি দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) এ প্রতিষ্ঠানটির অধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ মার্চ ২০১২ এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় প্রদান করে।

ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে গঠিত হয়েছে নতুন সংস্থা ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস (UNASUR বা UNASUL)। সংগঠনের স্প্যানিশ নাম Union de Naciones Suramericans-এর শব্দসংক্ষেপ UNASUR। সংগঠনের পর্তুগিজ নাম Uniao de Nacoes Sul-Americanas-এর সংক্ষিপ্ত রূপ UNASUL. এটি একটি বহুজাতিক এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা, যা দুটি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সংস্থার সম্মিলিত রূপ। বাণিজ্যিক সংস্থা দুটি হচ্ছে মারকোসার ও আন্দিয়ান কমিউনিটি। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গঠিত এ সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ লাভ করে ২৩ মে ২০০৮। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে অনুষ্ঠিত দক্ষিন আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের তৃতীয় সম্মেলনে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পরই গঠিত হয় ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস, যার পূর্বসূরী ছিল সাউথ আমেরিকান কমিউনিটি অব নেশনস (CSN)। ২০০৭ সালের ১৬ এপ্রিল প্রথম দক্ষিন আমেরিকান জ্বালানি সম্মেলনে এটি বিলুপ্ত হয়।

সদর দপ্তর কুইটো (ইকুয়েডর) এবং কোচাবাম্বা (বলিভিয়া)। ব্যাংকের নাম ব্যাংক অব দ্য সাউথ (কার্যক্রম শুরু ৯ ডিসেম্বর ২০০৭)। সদস্য দেশ ১২টি; দেশগুলো হচ্ছে: আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া,

ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়ানা, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা। পর্যবেক্ষক দেশ পানামা ও মেক্সিকো। অফিসিয়াল ভাষা ৪টি (ডাচ, ইংরেজি, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ)।

হামাস-ফাতাহ ঐতিহাসিক ঐক্যচুক্তি

গাজায় নিয়ন্ত্রণকারী হামাস ও পশ্চিম তীরের ক্ষমতাসীন ফাতাহ আন্দোলনসহ ফিলিস্তিনের ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩ মে, ২০১১ এক সমঝোতা চুক্তি করে। বিদ্যমান দুটি পক্ষই একটি স্বাধীন সরকার গঠনে রাজি হয়েছে। এক বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টারি নির্বাচন সম্পন্ন করাই হবে এ সরকারের প্রধান কাজ। দুই পক্ষের নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়েই এ সরকার গঠন করা হবে। প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিরোধ নিরসনে ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে চলা ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে হামাস ও ফাতাহ'র বিরোধ মেটানো ছাড়াও আগামী এক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মিসরের রাজধানী কায়রোতে এ চুক্তি হয়। ৪ মে, ২০১১ এক অনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়। আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মার্কিন বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা এবং গোটা আরব বিশ্বে রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝে স্বাক্ষরিত এ সমঝোতা চুক্তিতে ফিলিস্তিন সুশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ও ফাতাহ নেতা মাহমুদ আব্বাস এবং হামাসের পক্ষে সংগঠনটির নেতা খালেদ মেশাল। উল্লেখ্য, হামাস ২০০৭ সাল থেকে দেশটির একাংশ 'গাজা ভূখণ্ড' নিয়ন্ত্রণ করছে। অপর অংশ 'পশ্চিম তীর' নিয়ন্ত্রণ করছে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ।

নেভি সিল

নেভি সিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে অভিজাত কমান্ডো বাহিনীগুলোর অন্যতম। এ বাহিনী গঠিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। বিশ্বের সবচেয়ে 'দামি মাথার' মালিক ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে মার্কিন দুর্ধর্ষ কমান্ডো বাহিনী 'নেভি সিল' গোটা বিশ্বে কৌতূহলের পাত্র হয়ে গেছে। নেভি সিল সদস্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক ও আফগানিস্তানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অসংখ্য সফল অভিযান চালিয়েছে। এ বাহিনীর কাজকর্ম এমন, যা অনেক সময় উপন্যাসের গোয়েন্দা কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। এরা এমনভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে পানিতে, শূন্যে কিংবা ভূমিতে সমান ক্ষিপ্রগতিতে (কাউন্টারটেরিজম) অভিযানে অংশ নিতে পারে। চরম ঝুঁকির মধ্যেও এ বাহিনীর ব্যর্থতার নজির খুব কম। নেভী সিল এর সদস্য সংখ্যা ২ হাজার ৪০০। ১১টি ভাগে বিভক্ত এ বাহিনীর সদর দফতর ক্যালিফোর্নিয়া ও ভার্জিনিয়াতে। নেভি সিল সদস্যরা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রসজ্জে সজ্জিত। তারা প্রত্যেকেই এক একটি টিভি সম্প্রচার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করেন। তাদের শরীরে টিভি ক্যামেরা থাকে যা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার দেখেন। এ নেভি সিলের একটি ছোট দল ২ মে ২০১১ রাতে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অভিযান চালিয়ে লাদেনকে হত্যা করেছে। তারা চারটি চিনুক হেলিকপ্টারে চড়ে লাদেনের বাড়ির নিকট গিয়ে রশি বেয়ে নিচে নামে। এরপর ক্ষিপ্র গতিতে সফল অভিযান চালায়। তবে যে সদস্যরা লাদেন হত্যায় অংশ নিয়েছিলেন, নিরাপত্তার কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাম প্রকাশ করবে না।

অ্যাবোটাবাদ

আল-কায়েদার শীর্ষনেতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু ওসামা বিন লাদেন নিহত হওয়ার পর বিশ্বের সব গণমাধ্যমগুলোতে ছানটি অ্যাবোটাবাদ শিরোনামে চলে আসে। এর ফলে বিশ্ববাসীর কাছে অ্যাবোটাবাদ পরিচিতি লাভ করে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে প্রচেষ্টা চালানোর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ নামক স্থানের একটি বাড়িতে হত্যা করতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ১৭৫ কিলোমিটার দূরে অ্যাবোটাবাদের অবস্থান। এখানে পাকিস্তানের সামরিক একাডেমিটিও অবস্থিত। অ্যাবোটাবাদের পাকিস্তান সামরিক একাডেমির সন্নিকটে একটি বাড়িতে ওসামা বিন লাদেন ২০০৫ সন থেকে অবস্থান করে আসছিলেন বলে জানা যায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ঐ বাড়িতে লাদেনের অবস্থান নিশ্চিত করার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা লাদেন হত্যার অভিযান পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেন। ২ মে, ২০১১ যুক্তরাষ্ট্রে নৌ বাহিনীর কমোন্ডো দল অভিযান চালিয়ে অ্যাবোটাবাদের ঐ বাড়িতে লাদেনকে হত্যা করে। লাদেন নিহত হওয়ার খবর প্রচারের সাথে সাথে সংগত কারণেই অ্যাবোটাবাদ বিশ্ববাসীর নজরে চলে আসে।

অপারেশন জেরোনিমো

ওসামা বিন লাদেনকে ধরার অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল জেরোনিমো। জেরোনিমো হচ্ছে সবেচেয়ে পরিচিত অধিবাসী আমেরিকানের নাম। উনবিংশ শতকের ভাগের বীর আপ্যাচি যোদ্ধার নাম উচ্চারণমাত্রই বিশ্বজুড়ে অনেক মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে 'আমেরিকান ওয়াইল্ড ওয়েস্টের' চিত্র। সে ছবি মূলত বসতি গড়া সাদা মানুষ আর সেখানকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের নিরন্তর এবং প্রায়শই রক্তক্ষয়ী-সংঘাতের ছবি। মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সেনাদের হাতে ওসামা বিন লাদেন নিহত হয়েছেন এ খবরটি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে দেওয়া হয়েছিল এ শব্দ দুটি দিয়ে : 'জেরোনিমো ইকেআইএ' (Geronimo EKIA)। এখানে ইকেআই এর বিশদ হচ্ছে 'এনিমি কিল্ড ইন অ্যাকশন'-অভিযানের শত্রু খতম। আফগানিস্তানের গুহায় পরিপূর্ণ পর্বতরাজি আর বিপদসংকুল গিরিখাতের সঙ্গে হাজার হাজার মাইল দূরে সত্যিকারের জেরোনিমোর লীলাভূমি সিয়েরা মাদ্রে পর্বতমালা মিল খুঁজে পেতে তেমন কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়না। আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় মার্কিন সেনাবাহিনীর সাফল্যের সম্ভাবনার বিষয়ে মেরিন কোরের অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ও ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলান আর মিলেট ২০০১ সালে বলেছিলেন, এটা হচ্ছে জেরোনিমের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার মতো। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপাচি আদিবাসীদের একটি সংগঠন লাদেনের সঙ্গে জেরোনিমোর তুলনা করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বোয়াজিজি

তারেক আলতাইব মোহাম্মদ বিন বোয়াজিজি তিউনিসিয়ার নাগরিক ছিলেন যার আত্মাহুতি আরব বিশ্বে আগুন গণআন্দোলনের সূত্রপাত করে। ২৬ বছর বয়সি যুবক মোহাম্মদ বোয়াজিজি। তিউনিসিয়ার ফুটপাতের শিক্ষিত সবজি বিক্রেতা সারা দিন সবজি বিক্রি করে যা লাভ করতো তা দিয়ে তার আট সদস্যের পরিবার নিয়ে কোনো রকম খেয়ে না খেয়ে জীবন যাপন করতো। কিন্তু রাজধানীর সৌন্দর্যবর্ধনের কাজে নিয়োজিত পুলিশ হঠাৎ একদিন তার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ফুটফাতের দোকান উচ্ছেদ করলে তার প্রতিবাদস্বরূপ সে তার নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেয়। তিউনিসিয়ার ঐ বেকার যুবকের লাগিয়ে দেওয়া আগুন শুধু তার শরীরকেই ক্ষত-বিক্ষত করেনি আরব বিশ্বের শাসকদের ক্ষমতার ভীতও কাঁপিয়ে দিয়েছে। বোয়াজিজি হয়ে ওঠেছে আরব বিপ্লবের প্রতীক। বোয়াজিজি ২৯ মার্চ, ১৯৮৪ তিউনিসিয়ার সিদি বৌজিদ-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং তার মৃত্যু হয় ৪ জানুয়ারি, ২০১১।

Jasmine Revolution

১৯৮৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিস্তৃত ২৩ বছরের পথপরিক্রমণে বেন আলী তিউনিসিয়ায় আবির্ভূত হন স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর এক উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক মোহাম্মদ বোয়াজিজি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ায় পুলিশের বাধা পেয়ে আত্মহত্যার জন্য গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর থেকে বিক্ষোভ ব্যাপকমাত্রায় শুরু হয়। তীব্র বেকারত্ব, দুর্নীতি, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যসহ জনজীবনের আরও বিভিন্ন সংকটের জের ধরে বিন আলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ পরিণত হয় জনরোষে। জনতা রাস্তায় নেমে আসতে থাকে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে কাজে লাগান বেন আলী। করে যায় শতাধিক প্রাণ। জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য দেশে জারি করা হয় জরুরি অবস্থা। বিক্ষোভ-দাঙ্গায় উত্তাল হয়ে ওঠে তিউনিশিয়া। মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে তিনি চেষ্টা করেন পরিস্থিতি সামলানোর। কাজ না হলে বিলুপ্ত করেন পার্লামেন্ট। ছয় মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন বেন আলী। বললেন ২০১৪ সালের মধ্যে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। আর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন না। শেষ পর্যন্ত সহিংস বিক্ষোভ ও হাঙ্গামায় টালমাটাল তিউনিসিয়ার বীর জনতার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে বেন আলী ১৪ জানুয়ারী ২০১১ সৌদি আরবে পালিয়ে যান। তিউনিসিয়ার এ অভ্যুত্থান Jasmine Revolution বা জুঁই বিপ্লব নামে পরিচিতি পায়।

খালিদ সাইদ

প্রায় ৩০ বছর ধরে মিশরের ক্ষমতার মসনদে ছিলেন একনায়ক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। তার উৎখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ২৮ বছর বয়সি খালিদ সাইদ নামের এক তরুণ। ফেসবুকে সরকারের অপকর্ম প্রকাশের দায়ে প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারের পেটোয়া বাহিনী পিটিয়ে হত্যা করে খালিদ সাইদকে। এ হত্যাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় সরকার পতন আন্দোলন। পুলিশের রক্ত চক্ষুতে প্রাণ হারানো খালিদ সাইদের নামে তার বন্ধুরা মিলে তৈরি করে ফেসবুকের একটি গ্রুপ, যার নাম 'খালিদ সাইদ মেমোরিয়াল ফেস'। We are Khalid Sayed নামের ফেসবুকের এ পেজে স্মরণ করা হয়েছিল খালিদ সাইদকে। আর ফেসবুকে আপলোড করা দৃশ্যে দেখানো হয় পুলিশের হামলায় সাইদের বিকৃত লাশের ছবি। এ ভিডিওটিই মোবারক-বিরোধী আন্দোলনে বিষবাষ্প ছড়ায়। আর খালিদ হয়ে ওঠে মিশরের চে গুয়েভারা। তার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উই আর অল খালেদ সাইদ' (আমরা সবাই খালেদ সাইদ) নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনে ইসলামি ভাবাপন্ন তরুণ থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী, জামাল আবদেল নাসেরের অনুসারী, উদারপন্থি ব্যক্তিরা যোগ দেন। এর সাথে যুক্ত হন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সাবেক মহাপরিচালক ও নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ এলবারাদি। সংগঠনটির মুখপাত্র হিসেবে তিনি ভূমিকা রাখেন।

তাহরির স্কয়ার

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে যে গণবিক্ষোভ হয় তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাহরির স্কয়ার। আরবিতে ডাকা হয় ময়দান আল তাহরির, ইংরেজিতে 'লিবারেশন স্কয়ার'। এটিই কায়রোর গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থল। জায়গাটিকে আগে ডাকা হতো ইসমাইলিয়া ময়দান নামে। উনিশ শতকের শাসক খেদিভ ইসমাইলের শাসনক্ষমতা অর্পণের মধ্য দিয়ে সেখানে নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠে। এরপর ১৯১৯ সালে ইজিপ্ট বিপ্লবের পর এ স্কয়ার হয়ে ওঠে তাহরির স্কয়ার। কিন্তু ১৯৫২ সালে ইজিপ্ট বিপ্লব পর্যন্ত তাহরির স্কয়ার নামটি সরকারিভাবে ছিলনা। কোনো সংগঠনের সদস্য না হয়েও ইন্টারনেটে সরকার বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে গেছে, এমন অনেক তরুণের একজন আহমেদ শাহাই। ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার আগে সে তার ১২২ জন ফেসবুক বন্ধুকেও তার সাথে তাহরীর স্কয়ারে যেতে আমন্ত্রণ জানায়। ইন্টারনেট-আন্দোলনের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে মিশর সরকার ২৭ জানুয়ারি ২০১১ সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো। লোকজন তখন কম্পিউটার ছেড়ে তাহরির স্কয়ারে জমায়েত হয়।

গ্রিন স্কয়ার

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রিন স্কয়ার, যার পূর্ব নাম স্বাধীনতা স্কয়ার। এটি লিবিয়ার ৪১ বছরের শাসক গাদ্দাফীর পতনের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তিউনিসিয়া ও মিসরের গণবিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী হয়ে লিবীয় জনগণ বিশ্বের দীর্ঘকালীন স্বৈরশাসক গাদ্দাফিকে উৎখাত করতে আন্দোলন শুরু করে। বিপুল তেল সম্পদের অধিকারী দেশটির একনায়ক গাদ্দাফির পতনের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে শুরু হয় এ গণআন্দোলন। গণআন্দোলনে লিবিয়া কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বাঞ্চল গাদ্দাফির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে সেখানে একটি 'মুক্তাঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে রাজধানীসহ পশ্চিমাঞ্চল, অর্থাৎ ত্রিপোলি ও তার আশেপাশের অঞ্চলে গাদ্দাফির নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

অপারেশন ওডিসি ডন

তিউনিসিয়া ও মিসরের গণ বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী হয়ে লিবিয় জনগণ ৪১ বছরের স্বৈরশাসক গাদ্দাফিকে উৎখাত করতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে গণআন্দোলন শুরু করে। গাদ্দাফি তার অনুগত সেনাবাহিনী এবং নিজ গোত্রের সমর্থকদের নিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। গণআন্দোলনে লিবিয়া কার্যত পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চল এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বাঞ্চলের দখল নেয় গাদ্দাফি বিরোধি জনগণ। প্রথমে ফ্রান্স গাদ্দাফি বিরোধীদের সরাসরি সমর্থন ও বিকল্প সরকার গঠনে সহযোগিতা করে। পরবর্তীতে লিবিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে ১৭ মার্চ ২০১১ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করানো হয়। প্রস্তাবটিতে লিবিয়ার গণতন্ত্রকামী ও নিরীহ লোকদের বাঁচাতে জাতিসংঘের অনুমোদনক্রমে ১৯ মার্চ ২০১১ ন্যাটো বাহিনী সামরিক অভিযান শুরু করে। গাদ্দাফির বিরুদ্ধে ন্যাটো বাহিনী পরিচালিত এ সামরিক অভিযানের নামকরণ করা হয় 'অপারেশন ওডিসি ডন'।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

"Green Book"

১৯৭২ সালে ঘোষিত গাদ্দাফি তাঁর "Third Universal Theory" বা বিশ্বজনীন তৃতীয় মতাদর্শ যে গ্রন্থে বিধিবদ্ধ করেছেন সেটিই তার "Green Book" নামে খ্যাত। এটি ইতিহাস নির্ভর একটি সাধারণ সামাজিক দর্শন যা ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। এটি তিনটি অংশে বিভক্ত

১. গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান (১৯৭৬),
২. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান (১৯৭৮) এবং
৩. বিশ্বজনীন তৃতীয় মতাদর্শ (১৯৭৯)।

এ গ্রন্থে গাদ্দাফি কখনো বৈপ্লবিক কখনো বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। তবে এসব আদর্শ তিনি বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে পারে নি। এমনকি নিজের দেশ লিবিয়াতেও তা সম্ভব হয় নি। গাদ্দাফি তাঁর "Green Book" -এ মানবিক সমাজের সমস্যাবলি সমাধানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে একজন ব্যক্তি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকভাবে তখনই মুক্ত হবেন যখন সে সুখী হবে। "Green Book" -এর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে একজন ব্যক্তি কীভাবে সুখী হবেন সে সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ইতিহাসের বিবর্তনের কথা তৃতীয় অংশে বিধৃত হয়েছে। গাদ্দাফি তাঁর গ্রন্থে সাম্যবাদ (কমিউনিজম) এবং পুঁজিবাদকে প্রত্যাখান করেছেন। একই সঙ্গে গণতন্ত্রের উত্তরণের জন্যে ইতোপূর্বে গৃহীত সকল পন্থাকেও একইভাবে সমালোচনা করেছেন। লিবিয়ার প্রতিটি নাগরিকের "Green Book" পাঠ করা বাধ্যতামূলক। গাদ্দাফি তাঁর "Green Book"-এ ফ্রি অফিসারদের চিন্তা বা আদর্শের কথা বলেছেন। এগুলো হল-স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং ঐক্য। তৃতীয় বিশ্বজনীন মতবাদে তিনি 'স্বাধীনতা'র যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেন-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া, বিদেশিদের হাত থেকে এবং অভ্যন্তরীণ নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকাই হবে মূল লক্ষ্য। গাদ্দাফির পররাষ্ট্রনীতি তাঁর সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ থেকে উৎসারিত। "Green Book" এ তিনি তাঁর পররাষ্ট্রনীতিও উপস্থাপন করেছেন।

আফগান শান্তি পরিষদ

আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আনতে সে দেশের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই শান্তি পরিষদ গঠন করেছেন। তালেবান ও অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনার জন্য এ পরিষদ উদ্যোগ নেবে। বাছাই করা ৭০ ব্যক্তি নিয়ে ৭ অক্টোবর, ২০১০ সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভবনে কারজাই আফগান শান্তি পরিষদ উদ্বোধন করেন। ১০ অক্টোবর, ২০১০ আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানিকে তালেবানদের সাথে যুদ্ধ অবসানের প্রচেষ্টায় গঠিত শান্তি পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। তিনি ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর-২২ ডিসেম্বর এবং ১৯৯২ সালের ২৮ জুন-১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আফগান শান্তি পরিষদ তালেবান সহ বিবাদমান অন্যান্য দল ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে চলমান আফগান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পরিষদ কয়েকটি গ্রুপের সাথে বৈঠক করেছে।

ভাষা কোরো

পেনসিলভ্যানিয়ার সোয়ার্থমোর কলেজের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড হ্যারিসন তার দ্য লাষ্ট স্পিকারস গ্রন্থে নতুন একটি ভাষার তথ্য দিয়েছেন। তার দেয়া এ তথ্য অনুযায়ী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চালের অরুনাচল প্রদেশে প্রাপ্ত এ নতুন ভাষার নাম কোরো। তিব্বতী-বার্মিজ ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিলুপ্তপ্রায় ভাষাটি মাত্র ৮০০ লোকের মুখে মুখে টিকে আছে। এ ভাষার নেই কোনো বর্ণমালা, নেই কোনো লেখ্য রূপ। এটা ত্রুসো-আকা ভাষার আঞ্চলিক বা সহোদর কোনো রূপন নয়। যদিও ত্রাসো বা কোনো ভাষাগোষ্ঠীর লোকজন এটাই মনে করেন। ভাসার জগতের কৃষ্ণগহ্বর হিসেবে পরিচিত অরুণাচল প্রদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভাষা 'কোরো' কে নিয়ে বিশ্বের মোট ভাষার সংখ্যা এখন ৬৯১০টি।

Isolationism বা নিঃসঙ্গবাদ

মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়তে থাকে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র

মালালা ইউসুফজাঈ

পাকিস্তানের নারী শিক্ষা ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণে সফল ১৪ বছর বয়সি কিশোরী মালালা ইউসুফজাঈ। তালেবানদের হামলার শিকার পাকিস্তানের নারীশিক্ষা আন্দোলনের অকুতোভয় কিশোরী মালালা ইউসুফজাঈ। পাকিস্তানে নারী শিক্ষা ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় লড়ে যাচ্ছিলেন। এ কিশোরী তালেবানী শাসনে পড়াশোনা না করতে পারার যন্ত্রণা এবং তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকার মানুষের জীবনযাপন নিয়ে ২০০৯ সালে বিবিসি'র ওয়েব ব্লগে উর্দু সংস্করণে লেখা শুরু করে মালালা। 'গুল মাকাই' ছদ্মনামে তার লেখা I am afraid শিরোনামে ব্লগ লেখার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকভাবে সবার নজর কাড়ে মালালা। এরই প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয় সে। নারী শিক্ষার পক্ষে সোচ্চার এ কিশোরীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ৯ অক্টোবর ২০১২ মিঙ্গোরো শহরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে গুলি করে জঙ্গিরা। কিন্তু কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যায় মালালা। পরবর্তীতে মালালাকে ঘিরে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১০ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সারা বিশ্বে মালালা দিবস পালন করে। এছাড়া বিশ্বের সব মেয়েশিশুকে ২০১৫ সালের মধ্যে স্কুলগামী করতে পাকিস্তান এবং ইউনেস্কো নতুন মালালা পরিকল্পনা ঘোষণা করে। নারী শিক্ষায় সহায়তায় গঠিত হয় ইউনেস্কো মালালা ফান্ড। এমনকি ২০১৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদানের জন্য তার পক্ষে আনুষ্ঠানিক আবেদন করে বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ। ২০১২ সালের ওয়ার্ল্ড পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি ফাউন্ডেশনের 'সাহসিকতা পুরস্কার' লাভ করেন মালালা ইউসুফজাঈ। তার সম্মানে তার বাবা জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাঈকে জাতিসংঘের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। 'ডটার অব পাকিস্তান' ঘোষণার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস করে দেশটি সরকার। তৎকালিন ক্ষমতাশীল দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির আইনপ্রণেতা রবিয়ান সাদাত কাইমখানি জাতীয় পরিষদে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী

দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রীক দেশ ভারত। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক এ দেশটিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় ১৯ জুলাই, ২০১২। এ নির্বাচনে ভারতের সাড়ে ছয় দশকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন বাঙালি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে সংযুক্ত প্রগতি শীল মোর্চা (UPA) প্রার্থী প্রণব কুমার মুখার্জী, জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (UPA) এর প্রার্থী পিএ (পূর্ণ আজিটেক) সাংমাকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। ২৫ জুলাই ২০১২ রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি ভারতের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের স্থলাভিষিক্ত হন। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী দেশটিতে সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতি। তিনি দেশটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সব নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় দেশটি পার্লামেন্টর উভয় কক্ষ লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিরুদ্ধে সমন জারি করতে পারেন। এমনকি যে কোনো পরিস্থিতিতে পার্লামেন্ট স্থগিত করতে পারেন। ভেঙ্গে দিতে পারেন লোকসভাও। প্রতিবার পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হওয়ার কিংবা নতুন পার্লামেন্টে পাস হওয়ার যে কোনো বিলে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রপতির। তার স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিলই আইনে পরিণত হবে না। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের বাছাইকৃত ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন করেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ নেন রাষ্ট্রপতি। ভারতের সব আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে। পদবলে দেশটিকে সামরিক বাহিনীর চিফ অব কমান্ডারও হন তিনি। রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময় যুদ্ধের এবং শান্তির ঘোষণা দিতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন- জাতীয়, প্রাদেশিক এবং অর্থনৈতিক।

ট্রায়বন মার্টিন

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ১৭ বছর বয়স্ক আফ্রো আমেরিকান ট্রায়বন মার্টিন সাম্প্রতিক সময়ে

আলোচিত একটি নাম। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ মার্টিন ২৮ বছর বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ হিসপেনিক জর্জ জিমারম্যান-এর গুলিতে নিহত হয়। সম্প্রতি এ হত্যা মামলায় জিমারম্যানকে নির্দোষি বলে আদালত কর্তৃক মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ এ রায়কে বর্ণবাদের দোষে দুষ্ট বলে দাবি করে প্রতিবাদ করে। অনেকের ধারণা মার্টিন যদি কৃষ্ণাঙ্গ না হত তা হলে হয়ত এ ধরনের রায় হত না। মার্টিনের রায়কে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদ নীতি দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক সমালোচিত হয়। বিক্ষোভকারীরা জর্জ জিমারম্যানের বেকসুর খালাসের বিষয়ে একটি ফেডারেল নাগরিক অধিকার তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, তাদের দাবি পূরণ হবার আগ পর্যন্ত তারা এ লড়াই চালিয়ে যাবেন। এ হত্যা মামলাটিকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্নেয়াস্ত্র, বর্ণ-সম্পর্ক এবং আত্মরক্ষা আইন নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নিউইয়র্কের এক সমাবেশে নিহত কিশোরের মা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে আইন পরিবর্তনের আহবান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রান্তের এ বিক্ষোভকারীরা ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছেন। তবে এসব বিক্ষোভের সংগঠকরা বলছেন, এটি তাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত নাগরিক অধিকার কর্মী রেভারেন্ড আল শার্পটন বলেন, আত্মরক্ষার বর্তমান আইনটি পরিবর্তন করতে হবে। এমন কোনো আইন থাকতে পারে না, যে আইনে আপনি কোনো মানুষকে হুমকি বলে মনে করলে তাকে হত্যা করার অধিকার রাখেন। বিক্ষোভে অংশ নিতে নানা শ্রেণী এবং পেশার মানুষ আসছেন। নিউইয়র্কের একটি সমাবেশে সমর্থন জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন সঙ্গীত তারকা জে-জি এবং বেয়োন্সেও। সেই সমাবেশেই বক্তব্য রাখেন ট্রায়বন মার্টিনের মা সিবরিনা ফুলটন।

ট্রায়বন মার্টিনের এ মামলাটি যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণ সম্পর্ক এবং আত্মরক্ষা আইন নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও এ সপ্তাহে এক বক্তব্যে আদালতের রায়ে মানুষের হতাশার প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ৩৫ বছর আগে হলে এ পরিণতি আমারও ভোগ করতে হতে পারতো। মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য এটি বিরল একটি ঘটনা।

Mein Kampf

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা হিটলার তার আত্মজীবনী লিখেছিলেন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ারও অনেক আগে। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় এবং তার আত্মহত্যার পর বিশ্বের অনেক দেশেই তার আত্মজীবনী নিষিদ্ধ করা হয়। দীর্ঘ ৬৫ বছর পর সেই তালিকায় নাম লেখালো রাশিয়া। হিটলারের লেখা আত্মজীবনী 'Mein Kampf' বা 'আমার সংগ্রাম' বইটি নিষিদ্ধ করেছে রাশিয়া। বইটিতে উগ্রবাদী লেখার কারণে ২৬ মার্চ, ২০১০ দেশটির সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, হিটলারের এ আত্মজীবনীতে কেবল জার্মানদের জন্য একটি আলাদা ভূ-খণ্ডের কথা বলা হয় যাতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশও পড়ে। এতে স্লাভিক জনগণকে নীচু জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন স্বৈরশাসক হিটলার। রাশিয়ার মানবাধিকার সংগঠন মেমোরিয়াল-এর ঐতিহাসিক ইয়ান রাচিনস্কি হিটলারের এ বইটিকে রুশ বিপ্লবী নেতা লেনিন এবং স্বৈরশাসক ষ্ট্যালিনের লেখা বইগুলোর সাথে তুলনা করেছেন। এসব বইয়ে সাবেক এ দুই রুশ নেতা ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের আহবান জানান।

আরাফাত ও পলোনিয়াম বিতর্ক

'পলোনিয়াম ২১০' বিশ্বের বিরলতম পদার্থগুলোর একটি। ১৯৯৮ সালে বিজ্ঞানী দম্পতি মেরি ও পিয়েরে কুরি এ পদার্থটি আবিষ্কার করেন। এ বিজ্ঞানীদ্বয়ের দেশ পোল্যান্ডের নাম অনুসারে সেই পদার্থের নাম রাখা হয় পলোনিয়াম (Polonium)। ভূ-পৃষ্ঠের শক্ত আবরণে খুব নিম্ন ঘনত্বে প্রাকৃতিকভাবেই এ পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে। তবে পারমাণবিক চুল্লিতেও কৃত্রিমভাবে এটির উৎপাদন সম্ভব। শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি স্থির বিদ্যুৎমুক্ত করতে অল্প পরিমাণে এ পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৮৪ এবং প্রতীক Po। পলোনিয়াম একটি বিষাক্ত উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় উপাদান। লণ্ডনে এক সাবেক কেজিবি গোয়েন্দাকে মারতে ব্যবহৃত হওয়ায় ২০০৬ সালে পলোনিয়াম নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার ঝড় ওঠে। পরবর্তীতে পলোনিয়ামের আলোচনা তুঙ্গে ওঠে সম্প্রতি ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের কাপড়ে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ায়। এরপর আরাফাতের বিধবা স্ত্রী সুহা আরাফাত তার স্বামীর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে তা পরীক্ষার দাবি

জুলাই সামরিক জান্তা তাকে গৃহবন্দী করে। গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৯০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তার জোট বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেন। কিন্তু সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাকে গৃহবন্দী করে রাখে। গণতন্ত্রের জন্য তার ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯১ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সুচিকে মুক্তি দিয়ে প্রবাসে পাঠাতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা মেনে নেননি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রত আর গণতন্ত্রের মুক্তির কথা ভেবে তিনি নীরবে বন্দী জীবন মেনে নেন। দীর্ঘ ৬ বছর গৃহবন্দী থাকার পর ১৯৯৬ সনের ১০ জুলাই তিনি মুক্তি পান। সামরিক জান্তা তাঁকে আবার ২৪ জুলাই গৃহবন্দী করে এবং ৬ মে ২০০২ সালে তাকে দেশের অর্থনীতির বিরূপ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক চাপ কমানো ও সাহায্য পাবার আশায় মুক্তি প্রদান করে। ২০০৩ সালের ৩০মে সূচীর গাড়ি বহরে আততায়ীরা চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। এ ঘটনায় আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করলে সূচীকে আবার গৃহবন্দী করা হয়। সরকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯ সালের মে মাসে সূচীর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সূচীর বাড়িতে একজন মার্কিন নাগরিকের অনুপ্রবেশের অভিযোগে তার গৃহবন্দিত্বের মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়। অবশেষে ১৩ নভেম্বর ২০১০ গণতন্ত্রের মানসকন্যা মুক্তি লাভ করে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো

বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান নেতা কিউবার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো। ১৯২৬ সালের ১৩ আগস্ট কিউবার ওরিয়েন্ট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। স্পেনের অভিবাসী অ্যাঞ্জেল ক্যাস্ট্রো এবং কিউবার লিনারুজের সাত সন্তানের মধ্যে ফিদেল ক্যাস্ট্রো তৃতীয়। ১৯৫৯ সালে ৩২ বছর বয়সে কিউবার সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্যাস্ট্রো ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তখন থেকে তিনি একটানা ৪৯ বছর সমাজতান্ত্রিক কিউবার নেতৃত্ব দেন। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বিশ্বে। কমিউনিষ্টদের অভিভাবক সোভিয়েত ইউনিয়নেরও পতন হয়েছে। কিন্তু ঘরের পাশের চিরশত্রু সুপার পাওয়ার আমেরিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে টিকে ছিলেন তিনি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ক্যাস্ট্রো একসময় উন্নয়নশীল বিশ্বের সার্বভৌম শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠেন। কারণ দুনিয়া জোড়া মার্কিন আধিপত্যের যুগে তিনি কিছুটা হলেও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। মার্কিন ভূখণ্ডের মাত্র ১৪৪ কিলোমিটার দূরে ক্যাস্ট্রোর কিউবা যেন মার্কিনিদের গালে বড় গলার কাঁটা। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁরই ছোট ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোকে কিউবার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন।

সাদ্দাম হোসেন

সাদ্দাম হোসেন ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট। বর্তমান বিশ্বের আলোচিত একটি নাম। ১৯৩৭ সালের ২৮ এপ্রিল ইরাকের তিকরিত শহরে আওজা গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তার জন্ম। তিনি আল-বু-নাসির উপজাতি গোত্রের লোক। তার পিতার নাম হোসেন আল মজিদ। ১৯৪৬ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে সাদ্দাম গ্রাম ছেড়ে বাগদাদে যান মামা খায়রুল্লাহ ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী। সাদ্দাম তার কাছ থেকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির দীক্ষা নেন। তিনি ১৯৫৬ সালে আরব বাথ সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় সরকার বিরোধী তৎপরতার দায়ে ১৯৫৮-৫৯ সালে সাদ্দাম হোসেন ৬ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মামাতো বোন সাজেদা তুলফাকে বিয়ে করেন। তিনি ১৯৬২ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে গ্রাজুয়েশন করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি প্যান-আরব বাথ পার্টির জাতীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি ইরাকি বাথ পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হাসান আল বকরকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৬ জুলাই ইরাকি বাথ পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল, বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ইরাক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি এরপর দিনই ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হন। একই বছর প্যান আরব বাথ পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। সত্তরের দশকে বাথ পার্টি এক স্বেচ্ছাতন্ত্র গড়ে তোলে। তবে আশির দশকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দেশের বিপর্যয় ডেকে আনে। সাদ্দামের আমলেই ইরাকের অর্থনীতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। তিনি ১৯৯০ সালে কুয়েত দখল করলে ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাকের নেতৃত্ব দেন। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইজা-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করলে প্রথম দিকে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিন্তু দখলদার বাহিনীর সাথে না পেরে উঠায় তিনি আত্মগোপন করেন। দীর্ঘ আট মাস তল্লাশীর পর ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩, মার্কিন বাহিনী তার নিজ শহর

তিকরিতের একটি খাবারবাড়ির ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ থেকে গ্রেফতার করে। ২৮ জুন ২০০৪ ইরাকে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হলে সাদ্দাম হোসেনকে তার বিগত দিনের কৃতকর্মের বিচারের সম্মুখীন করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ সাদ্দামের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়।

অমর্ত্য সেন

যে কয়েকজন ব্যক্তি বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম অমর্ত্য সেন। তিনি ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর শান্তি নিকেতনে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মগতভাবে তিনি ভারতীয় হলেও তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন বাংলাদেশে। তাঁরা বাবা আশুতোষ সেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে ঢাকার ওয়ারীর লারমেনী স্ট্রিটে মামার বাড়িতে। তার শিক্ষা জীবনের একটি অংশ অতিবাহিত হয় পুরাতন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সনে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে মাস্টার পদে যোগ দেন। ১৯৯৮ সনে অর্থনীতিতে নোবেল পদক পান। ১৯৯৫ সনের পর অর্থনীতিতে এককভাবে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন একজন প্রথম এশীয় হিসেবে উক্ত নোবেল পান। কল্যাণ অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। সুইডিশ নোবেল একাডেমি তাদের এ নির্বাচনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে নতুন এক নৈতিক মাত্রা সংযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং তাদের বিশ্লেষণে অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে মৌলিক সমস্যার সাথে দর্শন ও নীতি শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে গেছেন। অমর্ত্য সেন হচ্ছেন ষষ্ঠ ভারতীয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় বাঙালি যিনি দুর্লভ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। অমর্ত্য সেনের জ্ঞানগর্ভ বইয়ের সংখ্যা ২০টি এবং বিজ্ঞান জার্নালে ইতোমধ্যে তার দুই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মূলত: যে বইটি অমর্ত্য সেনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছে তা হলো 'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ঃ স্বত্বাধিকার ও বঞ্চনার একটি রচনা', খাদ্যের যোগান কম হলে দুর্ভিক্ষ হয় এ চিরায়িত সত্যটি তিনি ভুল প্রমাণিত করেছেন। জিএনপি এর বদলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বিকল্প সূচক তিনি উদ্ভাবন করেন যেখানে আয়ের বন্টনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যায় শাসন, সামাজিক বঞ্চনা ও দুর্বল অধিকার প্রভৃতি দূর করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৯৮ সালে ভারত ও বাংলাদেশ 'প্রতীচী ট্রাস্ট' গঠন করেন।

সিদ্ধার্থ শংকর রায়

সিদ্ধান্ত শংকর রায় ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। তিনি ৬ নভেম্বর ২০১০ ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় কলকাতার ভবানীপুরে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছল ৯০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ভূমিকা নিয়ে সিদ্ধার্থ শংকর রায় একটি বই লিখেছিলেন। তার এ বই অসমাপ্তই রয়ে গেল। তার বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার সুশীল কুমার রায়। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর হাসারা গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম অপর্ণা দেবী। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পড়াশোনা এবং বেড়ে ওঠা লন্ডনে। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পড়ার পরে কলকাতায় ফিরে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৬৭-৭২ সময়কালে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা যখন কলকাতা আসতেন তখন সিদ্ধার্থ শংকর তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করার উদ্যোগ নিতেন। তার উদ্যোগেই কলকাতা বেতার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সালে তিনি আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। প্রয়াত কমিউনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসুর চেয়ে বয়সে ছোট হলেও রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমতের এ দুজন ছিলেন অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু।

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউট আন্দোলনের নেতা ও স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের জন্ম ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১২ ফেব্রুয়ারি, লন্ডনের স্ট্যানহোপ স্ট্রীটের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ব্যাডেন পাওয়েলের প্রকৃত নাম ছিল রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল। ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম স্কাউট ক্যাম্প স্থাপন করেন ব্রাউনসি দ্বীপে। ১৯০৮ সালে স্কাউটদের জন্যে রচনা করেন 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি এবং ঐ বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে বয়েজ স্কাউটের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাডেন পাওয়েলের ছোট বোন অ্যপনেস ব্যাডেন

পাওয়েল বড় ভাইয়ের সহযোগিতায় ১৯১০ সালে বয় স্কাউটের অনুরূপ মেয়েদের জন্য একটি সংগঠন গার্লস গাইড মুভমেন্ট গড়ে তোলেন। ১৯২০ সালে অলিম্পিয়াতে সারা পৃথিবীর স্কাউট ও গার্লস গাইডদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাবেশ জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়। এ জাম্বুরিতেই ব্যাডেন পাওয়েলকে 'চীফ স্কাউট অব দি ওয়ার্ল্ড' এর সম্মান দেওয়া হয়। কেনিয়াতে ১৯৪১ সালে ৮ জানুয়ারি বিশ্বের শান্তির দূত লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল পরলোক গমন করেন।

কমলাপ্রসাদ বিশ্বেশ্বর

কমলাপ্রসাদ বিশ্বেশ্বর সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। সাধারণ নির্বাচনে জিতে অনন্য ইতিহাস গড়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী কমলাপ্রসাদ বিশ্বেশ্বর। তিনি শুধু সে দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত সরকারপ্রধান হিসেবেও প্রথম। ২৪ মে ২০১০ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তার পাঁচদলীয় জোট বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতাসীন দল পিপলস ন্যাশনাল মুভমেন্ট দলের ৪৩ বছরের শাসনের অবসান ঘটায়। ২৬ মে, ২০১০ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কমলা প্রসাদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই নাতির দাদি কমলা একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু। তিনি দেশের প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল। আইনবিষয়ক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। কমলা প্রসাদের পূর্বপুরুষ ভারত থেকে শ্রমিক হিসেবে ত্রিনিদাদে আসেন। ১৯৬২ সালের ৩১ আগস্ট যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে তেলসমৃদ্ধ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর থেকেই ক্ষমতায় ছিল পিপলস ন্যাশনাল মুভমেন্ট।

মাদার তেরেসা

যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপিয়ে নগরীতে এক ব্যবসায়ী পরিবারে তার জন্ম হয় এবং তার প্রকৃত নাম মারি তেরেসা বোয়াখিউ। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মাদার তেরেসা ৯৭-র ৫ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতের কোলকাতায় পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। দুস্থ মানবতার সেবার জন্য তিনি ১৯৭৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি 'ভারত রত্ন' উপাধিও লাভ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে কোলকাতায় বস্তিবাসীর জন্য প্রথম স্কুল চালু করেন। ফ্রান্সের সেন্ট থেরেসের নামানুসারে তিনি তেরেসা নাম গ্রহণ করেন। তবে ভারতে তিনি শুধু মাদার তেরেসা নামে পরিচিত।

- ১৯৭৯: নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯৮২: বৈরুত অবরোধের সময় তিনি শিশুদের উদ্ধার করার জন্য দু'পক্ষকে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করাতে সক্ষম হন।
- ১৯৮৫: ভারতের রাষ্ট্রপতির 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত হন।
- ১৯৯৪: গর্ভপাতবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ব্রিটিশ প্রামাণ্যচিত্র 'হেলস এনজেল' এ তার সমালোচনা করা হয়।
- ১৯৯৭: মিশনারিজ অফ চ্যারিটির প্রধানের পদ ত্যাগ করেন। কোলকাতায় তার সদর দপ্তরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানানা গুসমাও

জানানা গুসমাও তিমুর লেসেথের সাবেক প্রেসিডেন্ট। গেরিলা নেতা থেকে এ পর্যায়ে ওঠে আসতে তাকে অনেক রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। জেল-জুলুম ও জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও তার স্বপ্ন-স্বাদ ছিল তিমুর লেসেথের স্বাধীনতা। ৫৫ বছর বয়স্ক কবি ও সাবেক গেরিলা নেতা গুসমাও ১৯৭৮ সালে তিমুর লেসেথের স্বাধীনতাকামী সংগঠন 'রেভ্যুলেশনারি ফ্রন্ট ফর ইন্ডিপেন্ডস ইন ইষ্ট তিমুর' (সংক্ষেপে ফ্রেটিলিন)-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মূল দলের সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৮১ সালে। ১৯৯১ সালের ১২ নভেম্বর দিলিতে ইন্দোনেশীয় সৈন্যরা দুই শতাধিক লোককে হত্যা করে। তিমুর লেসেথের স্বাধীনতাকামী নেতা জানানা গুসমাওয়ের নেতৃত্বে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে; ১৯৯২ সালের ২০ নভেম্বর বিদ্রোহের অভিযোগ গুসমাওকে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে এ দণ্ড কমিয়ে ২০ বছর করা হয়। তিনি ছয় বছরেরও বেশি সময় গৃহবন্দি ও কারাবাসে কাটিয়ে মুক্ত হন।

http://thejobstudy.com Go to Contents

৩ বিশ্বের জাতিগত দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সমস্যা

জিনজিয়াং- এর স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৯৪৯ সালে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে জিনজিয়াং অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর জুলুম নিপীড়ন শুরু হয়। আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে জিনজিয়াংয়ের মুসলমানরা যেম সমাজতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আস্থা পোষণ করে নি, তেমনি চীনা শাসকগোষ্ঠীরও মুসলমানদের সমাজতন্ত্রের শত্রু হিসেবে দেখে আসছে। জিনজিয়াং প্রদেশ বহুকাল তুর্কি শাসনাধীনে ছিল। তুর্কি সালতানাতের পতনের যুগে ১৯৪০ এর দশকে এর গৃহবিবাদের সময় চীন জিনজিয়াং দখল করে নেয়। এর পরের বছর চীনের সাথে জাপানের যুদ্ধের সুবিধা গ্রহণ করে এ প্রদেশের মুসলিম নেতারা পূর্ব তুর্কিস্থান প্রজাতন্ত্র নাম দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এ সময় তারা জাতীয় সঙ্গীত ও চাঁদতারা খচিত পতাকা তৈরি করে। তাদের স্বপ্ন ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ১৯৫০ সালে চীনের গণমুক্তি ফৌজ জিনজিয়াংয়ে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়। তারপর ১৯৬৬-৭৬ সালে মধ্যে চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহু সমজিদ বন্ধ এবং ধ্বংস করা হলেও ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৯৯০ সালে স্বাধীনতার দাবিতে গণজাগরণ দেখা দিলে চিনা সৈন্যরা ৫০ জন স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করে গণজাগরণ দমন করে। অতঃপর ১৯৯৭ সালের ৪ ৫ সালের ফেব্রুয়ারি ২০০ জন মুলসমানকে চীনা সরকার গ্রেফতার করে। এর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জিনজিয়াংয়ে বিক্ষোভ ও সংঘাত শুরু হয়। ফলে চীনা বাহিনীর হাতে নিহত হয় প্রায় ১ হাজার স্বাধীনতাকামী। ঐ সংঘর্ষের পর স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করার দায়ে ৪ হাজার মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অপসারণ করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় আরো প্রায় দু'হাজার লোককে। বহু কুরআন শিক্ষা স্কুল বন্ধ ও লক্ষ লক্ষ কপি ইসলামী বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। এভাবে চরম দমননীতি সত্ত্বেও জিনজিয়াং এর স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে নীরবে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে। অবস্থান : জিনজিয়াং চীনের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এর আয়তন ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। জনসংখ্যার ৭১ শতাংশই মুসলিম। মূল সমস্যা : মুসলমানদের ওপর জুলুম ও নিপীড়ন।

আচেহ স্বাধীনতা আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া এ প্রদেশটি দখলে নিতে পারে নি। ১৯৪৯ সালে ডাচরা দেশটি ছেড়ে চলে যাবার পর ইন্দোনেশিয়া আচেহ প্রদেশকে স্বশাসন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর কখনোই রাজ্যটিকে স্বশাসন দেয়া হয় নি। তাই ১৯৪৯ সালে থেকেই আচেহবাসী 'মারদেকা' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে স্বশাসন দাবি তোলে। এরপর গঠিত ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট নামক সংগঠন। এ সংগঠনটি প্রথমদিকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানালেও পরে দেশটির ধর্মনিরপেক্ষ সেনাবাহিনীর দমনাভিযানের প্রেক্ষিতে ইসলামপন্থীরা ১৯৭০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দেয়। এরপর সরকারের দমননীতির কারণে বিদ্রোহী নেতা টেংকু হাসান ডিতিরো সুইডেন পালিয়ে যান এবং সেখানে থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর শাসননামল থেকেই আচেহ বিশেষ অঞ্চল-এর মর্যাদা ভোগ করে আসছে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নন আচেহের জনগণ। ১৯৯৮ সালের মে মাসে সুহার্তোর পতন হলে আচেহ প্রদেশের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। তারা ১৯৯৯ সালের ৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকি দেয়। ইন্দোনেশিয়ার সরকার স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাখান করে। গত কয়েক দশকের আন্দোলনের সেখানে প্রায় ৬ হাজার লোক নিহত হয়েছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সরকারের সাথে আচেহ মুভমেন্টের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৫ আগস্ট, ২০০৫ সালে।

অবস্থান ও পরিচিতি : আচেহ ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ। এর রাজধানীর নাম বান্দা আচেহ। লাখ ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এ রাজ্যের জনসংখ্যা ৪৩ লাখ। প্রদেশটি তেল, গ্যাস, তামা ও রাবারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতির সম্পদে ভরপুর।

আন্দোলনের কারণ : ইন্দোনেশিয়ার মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ আসে আচেহ দেশের

তেল গ্যাস থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রদেশটির জনগণ দরিদ্র। এ বৈষম্যের কারণে আছে দেশের জনগণ কেন্দ্রীয় শাসনের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কুর্দীদের স্বাধীনতা আন্দোলন

মধ্যযুগে অনেক কুর্দী যুবরাজের নিজস্ব জায়গীর ছিল। ১৯১৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন একটি কুর্দী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুরস্কের আপত্তির কারণে তা ব্যর্থ হয়। সারা বিশ্বের কুর্দীদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ। এদের মধ্যে ১ কোটির বেশি রয়েছে তুরস্কে, ইরাকে ৪০ লাখ, ইরানে ৫০ লাখ ও সিরিয়ায় ১০ লাখ। কুর্দী সমাজ সাধারনভাবে খুবই সনাতন ও উপজাতীয়। মুস্তফা বারজানি ইরাক ও ইরানে এ রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। আদর্শগত বিরোধ ও আঞ্চলিক বিরোধের কারণে কুর্দীদের অসংখ্য রাজনৈতিক গ্রুপ রয়েছে। অধিকাংশ গ্রুপই সশস্ত্র। পার্টিয়ায়ে কারাকারনায়ে কুর্দীস্থানই (পিকেকে) হচ্ছে একমাত্র দল যারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আবদুল্লাহ ও কালাম ১৯৭৮ সালে এ দল গঠন করেন। পিকেকে মূলত সিরিয়া ভিত্তিক সংগঠন। কুর্দীরা তুরস্কে স্বাধীন কুর্দী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কল্পে মার্কসবাদী বিদ্রোহী গ্রুপ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টিতে (পিকেকে) সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। ইরাকের কুর্দীরা অপেক্ষাকৃত ধনী এবং শিক্ষিত। এদের রয়েছে পাশ্চাত্য সমর্থন। ইরাক ১৯৭০ সালে ইরাকী কুর্দীদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যকর হয় নি। ইরাকী কুর্দীদের সমর্থনে অনেক গেরিলা গ্রুপ এবং রাজনৈতিক দল রয়েছে। অধিকাংশই একটি স্বাধীন কুর্দী রাষ্ট্র প্রত্যাশা করে। ১৯৯১ সালে তুর্কী কুর্দীরা সরকারিভাবে নিজেদের মধ্যে তাদের ভাষায় কথা বলার, কুর্দী গান শোনার কুর্দী সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ পায়।

কুর্দী : এমন একটি জাতি যাদের নিজস্ব পরিচয় আছে কিন্তু কোনো দেশ নেই। রাষ্ট্রহীন একটি বিশাল জাতি কুর্দীরা।

কুর্দীদের রাজনৈতিক গ্রুপলাগুলোর আদি সংগঠন : কুর্দিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

কুর্দী জাতির আবাসস্থল : সিরিয়া, ইরাক ও তুরস্কের সীমান্তের মিলনরেখায়।

কুর্দীদের ভাষা : আঞ্চলিক পার্সী।

ইরিয়ানা জায়ার স্বাধীনতা আন্দোলন

স্বাধীনতাকামীদের প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে ইন্দোনেশিয়া সরকার প্রদেশটিকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। গত ২২ অক্টোবর, ২০০১ সংসদে স্বায়ত্তশাসন বিল অনুমোদিত হয়। ইরিয়ান জায়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ করতেই মেঘবর্তী সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছিল। সাবেক ডাচ পরিবেশের ওপর ইন্দোনেশিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে সেখানে ফ্রি পাপুয়া মুভমেন্ট নামে একটি দল গঠিত হয়। তারপর থেকে দলটি ছোটখাটো বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে। কিন্তু সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক শক্তিশালী সরকারি বাহিনীর সঙ্গে কখনোই তারা পরে ওঠেনি। তবে ২০০১ সনের অক্টোবর মাসে সরকারি বাহিনীকে পরাজিত করে তারা প্রথমবারের মতো প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চরের একটি জেলা শহর দখল করে নেয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারে অনেক নড়ে এবং স্বায়ওশাসন প্রদানে সম্মত হয়। কিন্তু এতেও বিদ্রোহীরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বিদ্রোহীরা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। ইন্দোনেশিয়ার সরকার স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সাথে সাথে প্রদেশটির নামও পরিবর্তন করেছে। অবস্থান: ইন্দোনেশিয়ার পূর্বপ্রান্তীয় প্রদেশ ইরিয়ানা জায়া।

দারফুর সংকট

অনেক দিন ধরে দারফুরে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। অবশেষে সুদানের সহিংসায় জর্জরিত দারফুর অঞ্চলে আশা দেখা দিয়েছে। ৫ মে, ২০০৬ নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় স্বাক্ষরিত এ চুক্তির অন্যতম দুটি শর্ত হলো বিদ্রোহীদেরকে তাদের দল ভেঙ্গে ফেলে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে এবং সরকারপন্থী জানজাবিদ মিলিশিয়াদের অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। এ চুক্তি এখন বাস্তবায়িত হলে আগামী ৪ বছরের মধ্যে দারফুর অঞ্চলে নির্বাচন হবে এবং সেখানকার লোকজন কতটা স্বায়ত্তশাসন চায় তা দেখার জন্য গণভোট হবে। তবে তাতে স্বাধীনতার কোনো কথা থাকবে না এবং সেখানকার তিনটি রাজ্যকে একত্রিত করে অখন্ড একটি এলাকা গঠন করতে দেওয়া হবে না। সুদানের সংসদ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান চালাতে দারফুরের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, কিন্তু ভাইস

প্রেসিডেন্ট পদ দেওয়া হবে না। এ চুক্তির মাধ্যমে দারফুরে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হচ্ছে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। তবে চুক্তির বিরোধী অন্য একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী জাষ্টিস এন্ড মুভমেন্ট (জেইএম) এবং আদদেল ওয়াহেদ আল নূরের নেতৃত্বাধীন এসএলএম চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। এ দুটি দল দারফুরে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি। তাই সুদানের শান্তির বাতাস কতদিন দীর্ঘস্থায়ী হবে তা এখনই স্পষ্ট করে বলা কঠিন।

পরিচিতি : সুদানের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ।

অবস্থান : প্রতিবেশী চাঁদ ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সীমান্তে অবস্থিত।

লোকসংখ্যা : প্রায় ৬০ লাখ।

সংকটের কারণ : কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের ওপর বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ।

বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত বাহিনীর নাম : জানমালিক মিলিশিয়া।

মিন্দানাউয়ের আন্দোলন

মিন্দানাউয়ের জনগণ দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। ফিলিপাইনে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র মুসলমানরাই লড়াই অব্যাহত রাখে। মুসলমানদের এ লড়াই ১৫৭০ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি চলছে। বিদেশি আধিপত্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ৪০০ বছরের অধিককাল লড়াই চালিয়ে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। ইতিহাসে আর কোনো জাতিই এতো দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে পারে নি। প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ বার্কোসের শাসনামলে স্বাধীনতাকমীদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের শাসনামলে স্বাধীনতাকমীদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট মার্কোস দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং মুসলমানদের আন্দোলন দমনের জন্য সেনাবাহিনী দিয়ে মিন্দানাউয়ে ব্যাপক গণহত্যা চালান। ফলে ১৯৭৩ সালে অধ্যাপক নূর মিসৌরির নেতৃত্বে গঠিত হ্যাসান ডিভিয় Moro National Liberation Front (MNLF)। এরপর থেকে মুসলমানরা নতুনভাবে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। ১৯৮৬ সালে এক গণঅভ্যুত্থানে মার্কোসের পতন ঘটলে ক্ষমতায় আসেন কোরাজন একুইনো। তিনিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমনাভিয়ান চালান। ১৯৯২ সালে ফিদেল রামোস আচেহ প্রদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হন। অবশেষে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফীর মধ্যস্থতায় ফিলিপাইন সরকার সে চুক্তি পালন করে নি। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার সরকার প্রেসিডেন্ট জোসেফ এস্ত্রাদা ক্ষমতায় এসেই চুক্তির বরখেলাপ করেন এবং মুসলমানদের ওপর নতুন করে হাজার লোক দমনাভিয়ান শুরু করেন। এস্ত্রাদার পতনের পর নতুন প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া ম্রাকাপাগালও দমনাভিয়ান শুরু করেন। এতে আবু সায়াফ গ্রুপের (এএসজি) সাথে সরকারি সৈন্যদের যুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করে। ফিলিপাইনের বেশ কিছু সংগঠন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। এর মধ্যে Morro National Liberation Front সবচেয়ে শক্তিশালী। নুর মিসৌরী মিন্দানাউয়ের মেয়রের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি সরকারের সাথে বিরোধ ঘটলে নুর মিসৌরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে সরকার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বিদ্রোহ দমন করে। নুর মিসৌরি পালিয়ে মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেন এবং সেখানে কারারুদ্ধ রয়েছেন। ফিলিপাইনের ১৪টি প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মিন্দানাউয়ে শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলিম। সব এলাকাতেই চলছে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন।

৪ বিশ্বে ভূমির জন্য সংঘাত

ওয়ারবা ও বুবিয়ান

ওয়ারবা ও বুবিয়ান পারসবিস্য উপসাগরে ইরাকের সমুদ্রে প্রবেশের কৌশলগত স্থান। শাতিল আরব নিয়ে ইরানের সাথে বিরোধের ফলে ইরাকের সরাসরি সমুদ্রে প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়ায় বিকল্প পথ বের করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সমুদ্রে অবাধ প্রবেশ করতে হলে ওয়ারবা ও বুবিয়ান নামক ক্ষুদ্র ভূ-খন্ড ইরাকের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই ইরাক এই দুটি ভূ-খন্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল থেকে করে আসছে। কিন্তু কুয়েত এ স্থানের অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। কেননা ভূ-খন্ড দুটিতে ইরাকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে তা কুয়েত ও তার পশ্চিমা মিত্রদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা

দেবে। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ইরাক কুয়েতকে এ দুটি ভূ-খন্ড তাকে হস্তান্তরের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। অবশেষে ইরাক ১৯৯০ সালে শক্তি প্রয়োগ করে স্থান দুটি দখল করে নেয়। উল্লেখ্য ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকের কুয়েত আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ওয়ারবা ও বুবিয়ান ভূ-খন্ডের নিয়ন্ত্রন লাভ করা। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর নিকট ইরাক পরাজিত হওয়ায় স্থান দুটির ওপর আবার কুয়েতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনো স্থান দুটি নিয়ে বিরোধ অব্যাহত রয়েছে।

দিয়োগা গার্সিয়া

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাটি। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল এবং প্রস্থে ৪ মাইল। যুক্তরাষ্ট্র ও মরিশাস উভয়েই দ্বীপটির দাবিদার। প্রথমে এটি ছিল মরিশাসের। পরবর্তিতে দখল করে নেয় ফ্রান্স। ১৯ শতকে দখল কের বৃটেন। বৃটেনের কাছ থেকে লিজ নেয় যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৬)। যুক্তরাষ্ট্রের লিজ শেষ হবে ২০১৬ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এর কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। এই ঘাঁটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগীর উপকূলবর্তী দেশসমূহ, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার ওপর কড়া নজর ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করছে। তাছাড়া প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সকল সামরিক ও বেসামরিক চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ঘাঁটি ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ফিলিপাইন থেকে মার্কিন ঘাঁটি প্রত্যাহারের ফলে দিয়েগো গার্সিয়ার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। এ ঘাটি থেকেই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ইরানে মার্কিন জিম্মি উদ্ধারের ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এ ঘাঁটি থেকে মার্কিন যুদ্ধবিমান বি-৫২ উড়ে গিয়ে ইরাকের ওপর আঘাত হানে। ২০০৩ সালের ইরাক-মার্কিন যুদ্ধের এ ঘাঁটি থেকে মার্কিন বিমান ইরাকে আঘাত হানে। বর্তমানে দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপরে মূল মালিক মরিশাস দ্বীপটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের দেশগুলো বিশেষ করে ভারত মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনে উদ্বিগ্ন।

লায়লা বা পেরেজিল দ্বীপ

এটি ভূমধ্যসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এটি মরক্কোর উপকূল থেকে ২০০ মিটার দূরে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত। এ দ্বীপে মরক্কোর মাত্র দুটি পরিবার বাস করে। দ্বীপটির আয়তন মাত্র ৩২০ একর। এ দ্বীপটির দাবিদার রাষ্ট্র মরক্কো ও স্পেন। এ দ্বীপটির মরক্কোর দেয়া নাম লায়লা এবং স্পেনের দেয়া নাম পেরেজিল। সাম্প্রতিকালে দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে স্পেন ও মরোক্কোর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ২০০২ সালের ১১ জুলাই মরোক্কোর এ দ্বীপে তার আধা সামরিক বাহিনী পাঠায়। কিন্তু স্পেন এ কার্যক্রমকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলারূপে চিহ্নিত করে পেরেজিল পুর্ণদখলের জন্য হামলা চালায়। ১৭ জুলাই স্পেনের সৈন্যরা মরক্কোর সৈন্যদের বিতাড়িত করে দ্বীপটি দখল করে নেয়। পরে বিরোধ নিরসনে উভয় দেশের মধ্যে ২২ জুলাই একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে দেশ দুটির কেউই আপাতত সেখানে পতাকা উড়াতে পারবে না বা নিজেদের মালিকানা প্রকাশ করতে পারবে না।

পোর্ট আর্থার

পোর্ট আর্থার উত্তর-পূর্ব চীনে পেচিলি উপসাগরের মুখে অবস্থিত। এটি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে চীন ও জাপানের। এর চীনা নাম লু-শন-কাউ। একজন নৌ সেনাপতির নামানুসারে ১৮৬১ সালে পোর্ট আর্থার নামকরণ করা হয়। ১৮৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় জাপান পোর্ট আর্থার দখল করে। তবে রাশিয়া, জার্মানিসহ কয়েকটি দেশের চাপে বন্দরটি চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর রুশ নৌবহরের একটি অংশ পোর্ট আর্থারে শীতের সময় রাখার জন্য রাশিয়া চীনের কাছ থেকে পোর্ট আর্থারের স্বত্ব ২৫ বছরের জন্য আদায় করে। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপান পোর্ট আর্থারের রুশ নৌবহরকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে এবং জাপান ৯৯ বছরের জন্য এ পোর্টের ইজারা দাবি করে। চীনের প্রেসিডেন্ট য়ুয়ান-শি-কাই এ দাবি মেনে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ে পর সোভিয়েত সৈন্য পোর্ট আর্থারকে জাপানের অধিকার থেকে মুক্ত করে। পরে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একচুক্তিতে স্থির হয় যে, উভয় দেশই পোর্ট আর্থারকে নৌঘাটি রূপে ব্যবহার করবে। চীন পোর্ট আর্থারের প্রশাসনের দায়িত্ব এবং রাশিয়া তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে। ১৯৫৫ সালে রাশিয়া পোর্ট আর্থারের বন্দরটি চীনের নিকট সমর্পণ করে। বর্তমানে এটি চীনের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও

http://thejobstudy.com
Go to Contents

জাপান এর অধিকার এখন ফিরে পেতে চায়।

ওকিনাওয়া

প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান ও তাইওয়ানের মধ্যবর্তী স্থানে এ দ্বীপটি অবস্থিত। ৭৩৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট দ্বীপটি পর্বত সঙ্কুল। এখানকার অরণ্যে বিভিন্ন জাতের মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে এ দ্বীপটি বিবাদ বিদ্যমান। ১৮৭২ সালে এই দ্বীপপুঞ্জটি জাপানের অধিকারে আসে। জাপান ওকিনাওয়াকে একটি প্রদেশ ঘোষণা করে। তখন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এটি জাপানের অধিকারে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ২১ জুন আমেরিকা জাপানের কাছ থেকে দ্বীপটি দখল করে নেয়। অবশ্য পরে ১৯৭১ সালের জুন মাসে এক চুক্তির মাধ্যমে ৩২ কোটি ডলারের বিনিময়ে আমেরিকা জাপানকে দ্বীপটির অধিকার ফিরিয়ে দেয়। বর্তমানে ওকিনাওয়া দ্বীপটি জাপানের অধিকারে রয়েছে।

হানিস দ্বীপপুঞ্জ

লোহিত সাগরে অবস্থিত এ দ্বীপটি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়ার সাথে। এটি ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়া উপকূল থেকে প্রায় সমান দূরত্ব লোহিত সাগরে অবস্থিত। দ্বীপগুলো দুটি দেশের জন্য কৌশলগত দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েমেন ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে শুধু হানিস (বড় হানিস ও ছোট হানিস) দ্বীপ বিরোধ নয়, জ্যাবলে জোগার নামক আরেকটি দ্বীপ নিয়েও বিরোধ রয়েছে। একসময় উক্ত দ্বীপগুলো তুর্কি উসমানিয়া খেলাফতের অধীনে ছিল। পরে আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিকভাবে এ দ্বীপগুলোর মালিকানা নির্ধারিত না হওয়ায় বিরোধ থেকেই যায়। আজও সেই বিরোধ মেটেনি, বরং ১৯৯৫ সালে হানিস দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে দুটি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৯৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর ইরিত্রিয়া বড় হানিস দ্বীপটি দখল করে নেয়। পরে ২৫ ডিসেম্বর দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়।

বায়ফ্রা

নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে বায়ফ্রা অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের এ অঞ্চলের স্বাধীনতাকামরি বায়ফ্রা নামকরণ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। এ অঞ্চলের সংখ্যাগুরু ইবু উপজাতির লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওজুকোর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৭-৮০ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের এটাই প্রধান কারণ। প্রায় তের বছর বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার পর ১৯৮০ সালে ওজুকো দেশ থেকে পলায়ন করেন এবং বায়ফ্রাবাহিনী নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। গৃহযুদ্ধকালে তানজানিয়া ও গ্যাবন বায়ফ্রাকে স্বীকৃতি দেয়।

স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ

দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ৭০ হাজার বর্গমাইল আয়তনের মোট ৩৩টি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জটি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এই দ্বীপপুঞ্জটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে কৌশলগত স্থানে অবস্থিত বলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জাপান তার প্রয়োজনীয় জ্বালানির প্রায় ৬৫ শতাংশ এই পথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দ্বীপপুঞ্জ কৌশলগত যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। জাপান এ দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব অংশের ইতুইরা দ্বীপে তখন শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ায় সেই সামরিক ঘাঁটি তুলে নিতে বাধ্য হয়। পরে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৮ সালে এ দ্বীপকে কেন্দ্র করে চীনের সাথে ভিয়েতনামে সামরিক সংঘাত ঘটে। বর্তমান দ্বীপপুঞ্জের বেশিরভাগ অঞ্চল চীনের দখলে এবং বাকি অংশ ভিয়েতনামের দখলে রয়েছে। স্প্রাটালি দ্বীপপুঞ্জের মালিকানার বিরোধ আন্তর্জাতিকভাবে এখনো নিস্পত্তি হয় নি।

নাগোর্নো কারাবাখ

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি বিতর্কিত ছিটমহল। এটি পূর্বে আর্মেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯২৩ সালের তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির লেনিন প্রশাসনিক সুবিধার্থে একে আজারবাইজানের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং নাগোর্নো কারাবাখের স্বায়ত্তশাসন ও প্রদান করা হয়। ১৯৮১ সালে এ অঞ্চলের মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘাত বাধে। ফলে মুসলিম অধ্যুষিত আজারবাইজান ও খ্রিষ্টান অধ্যুষিত আর্মেনিয়ার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯১

সালের ২৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার প্রেক্ষিতে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। উভয় দেশের ছিটমহলের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোত। ফলে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে প্রায় পনের সহস্রাধিক লোক নিহত হয়। বর্তমানে যুদ্ধ বন্ধ রয়েছে কিন্তু ছিটমহলটির মালিকানা প্রশ্নে কোনো নিষ্পত্তি হয় নি।

৫ আলোচিত স্থান

ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্ব

১৪ সালের মধ্যে ফিলিস্তিন দ্বিতীয়বারের মতো জাতিসংঘ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মর্যদা দাবি করে প্রস্তাব তোলে ২৯ নভেম্বর, ২০১২। এর আগে ২০১১ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পূর্ণাঙ্গ সদস্য রাষ্ট্রের আবেদন করলে পরিষদের ১৫ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েও যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর এবার তোলা হয় সাধারণ পরিষদে 'অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র' মর্যাদা পাওয়ার দাবি। ফিলিস্তিনিদের সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়ার পক্ষে বিপুল রায় দেয় সদস্য দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে কূটনৈতিক পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন করে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র করার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ১৩৮ দেশ। মাত্র ৯টি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মাইক্রোনেশিয়া, নাউরু, পালাউ এবং পানামা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ভোট দানে বিরত ছিল ৪১টি সদস্য দেশ। অনুপস্থিত ছিলেন ৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। জাতিসংঘে মর্যাদা বৃদ্ধির পরপরই ফিলিস্তিনের নাম পরিবর্তন করার কাজ শুরু হয়। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ তাদের দাপ্তরিক নাম বদলে করেছে 'ফিলিস্তিন'। ৩০ নভেম্বর, ২০১২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ থেকে State of Palestine রাষ্ট্রের নামফলক পায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ।

ফিলিস্তিন এতদিন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে 'পর্যবেক্ষক ভূ-খণ্ড' হিসেবে যোগ দিত। এখন তারা সদস্য নয় এমন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাবে। এটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ব সংস্থার পরোক্ষ স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে পূর্ণ সদস্য হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেল ফিলিস্তিন। ২০০২ সালে পূর্ণ সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার আগে সুইজারল্যান্ডও সদস্য নয় এমন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘে ছিল। বর্তমানে ফিলিস্তিনের সাথে এমন মর্যাদা ভোগ করছে ভ্যাটিকান সিটি। ফিলিস্তিনের এ নবলব্ধ মর্যাদা দেশটিকে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো দেবে:

১। পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং পূর্ব জেরুজালেমকে নিয়ে গঠিত ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের পরোক্ষ স্বীকৃত।
২। দ্বিরাষ্ট্রীয় সমঝোতা আলোচনায় ইসরাইলের বিপরীতে ফিলিস্তিনের শক্ত অবস্থান।
৩। এখন থেকে ফিলিস্তিন প্রতিনিধি জাতিসংঘের অধিবেশনে বিতর্কে অংশ নিতে পারবেন।
৪। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICC) যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।
৫। এ স্বীকৃতির কারণে ফিলিস্তিন বেশ কয়েকটি অঙ্গ-সংগঠন যেমন : আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত, সেখানে ফিলিস্তিন-ইসরাইলি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

নাথুলা পাস

'নাথুলা পাস' ভারত-চীনের মধ্যে সংযোগকারী একমাত্র স্থল সীমান্ত পথ। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর ৬ জুলাই ২০০৬ ঐতিহাসিক এ বাণিজ্য পথ খুলে দেওয়া হয়। হিমালয়ের ১৪ হাজার ৪২০ ফুট উঁচুতে নাথুলা পাসে ভারতের সিকিম রাজ্যের সীমান্তের সাথে চীনের তিব্বতের সীমান্ত মিলেছে। ১৯৬২ সালে চীনের সাথে ভারতের যুদ্ধের পর এ গিরিপথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ১৮ জুনের চুক্তি অনুযায়ী এ পথ দিয়ে প্রতি বছরে জুনের ১ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখ পর্যন্ত দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলবে। বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের ২৯টি এবং চীনের ১৫টি পণ্য রপ্তানির কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সুযোগ পাবে টেক্সটাইল এবং কম্বল, কৃষিজাত দ্রব্য, মদ, সিগারেট, চা, বার্লি, চাল, ভেষজ তেল ও স্থানীয় বনৌষধি রপ্তানি করার। অন্যদিকে চীন দেবে ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বনপরুর লেজ ও পশম, ছাগলের চামড়া, উল এবং র-সিল্ক।

গিলগিট-বালতিস্তান

পাকিস্তান তার বিতর্কিত গিলগিট-বালতিস্তান এলাকা চীনের কাছে ৫০ বছরের জন্য ইজারা দেয়ার কথা বিবেচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে টান টান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে তার মিত্র দেশ চীনের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক এড়াতে এ ধরণের পরিকল্পনা হাতে নেয়। পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসিত গিলগিট-বালতিস্তান এলাকাটি আগে উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা নামে পরিচিত ছিল। পরে এ নামকরণ করা হয়। এটি এমন একটি এলাকা যার সাথে পশ্চিমে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন খা প্রদেশের সাথে উত্তরে আফগানিস্তানের ওয়াখান করিডরের সাথে, পূর্ব ও উত্তর পূর্বে চীনের সাথে, দক্ষিণ-পশ্চিমে আজাদ কাশ্মীর এবং দক্ষিণ-পূর্বে ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মিরের সাথে সীমান্ত রয়েছে। এর মোট আয়তন ৭২,৯৭১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১ লাখ। এর রাজধানী গিলগিট। এখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার রয়েছে যার বর্তমান প্রধান হচ্ছেন সৈয়দ মেহেদী শাহ। গভর্নর পীর করম আলি শাহ। স্বায়ত্তশাসিত এ এলাকায় একটি আইনসভা রয়েছে। সেখানে আসন রয়েছে ৩৩টি। আজাদ কাশ্মিরের মতো। গিলগিট-বালতিস্তান এলাকাটিকেও পাকিস্তানের একটি বিতর্কিত এলাকা হিসেবে মনে করা হয়।

দক্ষিণ ওশেটিয়া

জর্জিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল (প্রদেশ) দক্ষিণ ওশেটিয়া ১৯৯০-এর দশক থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে আসছে কিন্তু বরাবরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা লাভের দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর ২০০৬ এখানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে ৯৯ শতাংশ লোক স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। দক্ষিণ ওশেটিয়া স্বাধীনা ঘোষণা করে ২৮ নভেম্বর ১৯৯১। এর রাজধানীর নাম তাসখিন ভ্যালি এবং মুদ্রা রুবল। ২০০৮ সনের আগষ্টে দক্ষিণ ওশেটিয়ার স্বাধীনতা প্রশ্নে জর্জিয়ার সাথে রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দক্ষিণ ওশেটিয়া বিশ্ব সংবাদ শিরোনামে ওঠে আসে।

আবু গারীব

ইরাকে যে কয়েকটি মার্কিন নিয়ন্ত্রিত কারাগার রয়েছে আবু গারীব কারাগার তাদের মধ্যে অন্যতম। এটি বাগদাদে অবস্থিত। ২০ মার্চ ২০০৩ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে দখলদারী অভিযান শুরু করলে সেখানকার বিদ্রোহী জনগণকে ধরে ধরে এ সকল কারাগারে বন্দি করা হত। এপ্রিল ২০০৪ এর শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস টেলিভিশনে ইরাকের আবু গারীব কারাগারে বন্দি নির্যাতনের ছবি প্রচার করার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী মানুষ আবু গারীব কারাগারের কথা জানতে পারে। টেলিভিশনে দেখানো হয় ইরাকি বন্দিদের বিবস্ত্র করে মাথায় থলি পরিয়ে নগ্নভাবে দৈহিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মার্কিন প্রশাসনেও এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড র‍্যামসফিল্ড এর পদত্যাগ দাবী করেন। এদিকে আবু গারীব কারাগারে বন্দিদের ওপর মার্কিন বাহিনীর নির্যাতনে আন্তর্জাতিক রেডক্রস যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে অত্যাচার নিপীড়িন হয়েছে ব্যাপকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে নির্যাতনও বলা যেতে পারে। এখানকার চিত্র থেকে দেখা যায় যে মার্কিন সৈন্যরা কারাগারের ইরাকি বন্দিদের ইসলাম ধর্মকে নিন্দা করতে বাধ্য করত। তাদের জোর করে শূকরের মাংস ও মদ খেতে দিত। তাদের নানাভাবে যৌন নির্যাতন করত। এসব নির্দেশ না শুনলে তারা বন্দিদের মুখে ও বুকে নির্দয়ভাবে আঘাত করত। এ সময় তাদের মাথা থলের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা হত এবং এভাবেই তাদের ঘুমাতে হত। টয়লেটে ফেলে দেওয়া খাবার তুলে খেতেও বন্দিদের বাধ্য করত দখলদার বাহিনীর সৈন্যরা। মানবাধিকারের এমন চরম লংঘন একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছে।

সুবিকবে

দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌ-ঘাটির নাম ছিল সুবিকবে। বর্তমানে এটি ফিলিপাইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ নৌ-ঘাঁটির ফলে এ অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য বিরাজমান ছিল। ১৯৯২ সালে ফিলিপাইনে যে জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটে তার ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্র ঐ ঘাঁটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিশ্বের সামরিক শক্তিতে চীনের অগ্রসরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ ঘাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিশ্বের সামরিক শক্তিতে চীনের অগ্রসরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় এ ঘাটিটি ব্যবহারের কথা ভাবছে। ফিলিপাইন সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সুবিকবে-কে নৌ-ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের সরাসরি অনুমতি না দিলেও বন্দর হিসেবে ব্যবহারের

অনুমতি দিয়েছে। এশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এ ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারলে কৌশলগত দিক থেকে দক্ষিণ চীন ও চীন সাগরের ওপর নজর রাখা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সহজ হবে।

গুয়াম

জাতিসংঘের 'অস্বায়ত্তশাসিত বা উপনিবেশ' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা বিশ্বের ১৬টি এলাকার একটি হচ্ছে গুয়াম। এর লোকসংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার। তাদের ৪০ শতাংশ স্থানীয় সামোরো, ২৭ শতাংশ ফিলিপাইন, ১২ শতাংশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য এলাকার এবং বাকিরা ককেশীয় ও অন্যান্য। অর্থনীতি মূলত পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। চার হাজার বছর আগে থেকে দ্বীপটিতে মানুষের বসবাস চলে এলেও কখনো স্বাধীন ছিল না সেখানকার লোকজন। সম্প্রতি জাপানের ওকিনাওয়া নৌ-ঘাঁটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ৮ হাজার নৌ-সেনা সরিয়ে গুয়ামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় চরম নাখোশ গুয়ামবাসী। স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়ামের মানুষ। ১৮৯৮ সালে স্পেন-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের পর স্পেন গুয়াম নামের দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সেনারা গুয়ামের দখল নেয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ- সেনারা গুয়াম মুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এটি 'অস্বায়ত্তশাসিত এলাকা' হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 'অস্বায়ত্তশাসিত এলাকা' নামে দ্বীপটির বাসিন্দাদের সবাই মার্কিন নাগরিক, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের কোনো ভোটাধিকার নেই।

হেইজিআইজি

চীন ও রাশিয়ার সীমান্তবর্তী উসুরা ও আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কতগুলো বিতর্কিত দ্বীপ হেইজিআইজি নামে পরিচিত। এ দ্বীপগুলোর হেইজিআইজি নাম করেছে চীন। রাশিয়ার কাছে এ দ্বীপগুলো তমারভ ও বলসাই উসুরিআস্ক নামে পরিচিত। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে এ দ্বীপগুলোর মালিকানা নিয়ে বিতর্ক চলছে ১০০ বছর ধরে। এ দ্বীপগুলোর পাশেই অবস্থিত রাশিয়ার খাবারোভস্ক শহর। রাশিয়ার কাছে এ শহরের কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এ শহরের ওপর দিয়ে স্থাপিত আছে রাশিয়ার বিখ্যাত রেলপথ ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলওয়ে।

ফালুজা

ফালুজা ইরাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। গত ২০ মার্চ '০৩ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ শুরু করলে প্রথমে তারা বাগদাদ, কারবালা, বসরা, কিরকুকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে এবং প্রায় প্রতিটি শহরেই মার্কিন বাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণের বিস্তার ফালুজা শহরে বিস্তৃতি ঘটলে গত মার্চ-এপ্রিল '০৪ এখানে মার্কিন বাহিনী ও ইরাকি গেরিলাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কিন্তু সংঘর্ষে মার্কিন বাহিনী সুবিধা করতে না পেরে ৩০ এপ্রিল ২০০৪ ফালুজা ত্যাগ করে এবং ফালুজার নিরাপত্তার দায়িত্ব সাদ্দাম হোসেনের সাবেক জেনারেল জসিম মোহাম্মদ সালেহ এর হাতে অর্পণ করে। ফালুজাতে ইরাকি গেরিলা বাহিনীর এ সাফল্য সমগ্র ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরাকিদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

সেভেন সিস্টার

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার বলে। ৭টি রাজ্য হল আসাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মেঘালয়। ভারতের সেভেন সিস্টার খ্যাত এ ৭টি রাজ্য আসাম ভেঙ্গে গঠিত হয়েছে। এ ৭টি রাজ্যের সাথে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের সাথে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এ ৭টি রাজ্যের সাথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিকূলতা তৈরি করেছে। ভারত সরকার বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে একটি ট্রানজিট সড়ক চালুর ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতাকামী গেরিলা সংগঠনগুলোর গেরিলা তৎপরতার জন্য এ সাতটি রাজ্য ব্যাপক আলোচিত। স্বাধীনতাকামী এ গেরিলা সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশ সরকার মদদ দিচ্ছে বলে ভারত সরকার অভিযোগ করে আসছে।

গাজা

ভূ-মধ্যসাগরের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট গাজা এলাকাটি ১৯৪৮ সালে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবশিষ্ট ফিলিস্তিনী অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মিশর এলাকাটি নিয়ন্ত্রণে রাখে

এবং ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ইসরাইল এটি দখল করার আগ পর্যন্ত সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করে। ১৯৮৭ সালে এক দুর্ঘটনা গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এটাই পরবর্তী পর্যায়ে ফিলিস্তিনীদের 'ইনতিফাদা' বা গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। রক্ষণশীল গাজা ভূ-খণ্ড যদিও ইয়াসির আরাফাতের সমর্থকরাই প্রভাবশালী থেকে যায়। তথাপি সেখানে মুসলিম মৌলবাদী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৭ মে, ১৯৯৪ ইসরাইলীরা গাজা ফিলিস্তিনীদের কাছে হস্তান্তর করে এবং এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়। ইনতিফাদার পর সেখানে সৃষ্ট হামাস গ্রুপ পিএলও এর শাসনে অসুবিধা সৃষ্টি করার মত যথেষ্ট শক্তি ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে।

- **অবস্থান:** ইসরাইল ও মিশরের সিনাই মালভূমির মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী ৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী গাজা ভূ-খণ্ড বিস্তৃত।
- **জনসংখ্যা :** গাজা এলাকায় প্রায় সাড়ে ১০ লাখ ফিলিস্তিনি ও ৪ হাজার ইহুদী বাস করে। ফিলিস্তিনীদের প্রায় অর্ধেকই ১৯৪০ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় হতে উদ্বাস্তু।
- **ধর্ম :** গাজা ভূখণ্ডের প্রায় সকল ফিলিস্তিনীই সুন্নী মুসলমান।

হোয়াইট হাউস

হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। ভবনটির মূল স্থপতি একজন আইরিশ শিল্পী, নাম তার জেমস্ হোবান। ধূসরবর্ণের পাথরে নির্মিত এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৮০০ সালে। এর ১৪ বছর পরে যুদ্ধ চলাকালে ১৯১৪ সালের ২৪ আগস্ট ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ভবনটি পুড়িয়ে দেয়। ভবনটির একটি ক্ষুদ্র অংশই তখন রক্ষা পায়। জেমস্ হোবানের নক্সা অনুযায়ী ভবনটি আবার পূর্ণনির্মাণ করা হয়। ভবনটির বিভিন্ন স্থানে ধূয়া এবং আগুনের লেলিহানের দাগ মুছতে এর দেওয়ালগুলোতে সাদা প্রলেপ লাগানো হয়। সেই থেকে লোকে ভবনটি হোয়াইট হাউস বলে ডাকত। ১৯০২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ নামটির স্বীকৃতি দেন।

গ্রাউন্ড জিরো

সগর্বে নিউইয়র্ক শহরের আকাশ ছুঁতে চাওয়া বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ১১০ তলাবিশিষ্ট টুইন টাওয়ার এখন শুধুই স্মৃতি। ৫০ হাজারের বেশি মানুষের কর্মচাঞ্চল্যে মুখর ভবন দুটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

ওই হামলা, ধ্বংসযজ্ঞ আর প্রাণহানি গর্ব জাগানো টুইন টাওয়ারের আঙ্গিনাকে দিয়েছে 'গ্রাউন্ড জিরো' নামে নতুন পরিচিতি, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বজনহারা মানুষের শোক, তাদের প্রতি গোটা দেশবাসীর সমবেদনা, ভালোবাসা, দেশপ্রেম আর নতুন করে হামলার আতঙ্ক ও ভীতি।

তিকরিত

তিকরিত ইরাকের একটি তেল সমৃদ্ধ শহর। ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং একনায়ক সাদ্দাম হোসেন ১৯৩৭ সালে এখানকার আওজা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত সাদ্দাম হোসেনের জন্মস্থান হওয়ার সুবাধে তিকরিত ইরাকে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করলে তিকরিতের জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং দখলদার বাহিনীর তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তিকরিত সাদ্দাম হোসেনের জন্মস্থান হওয়ায় ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীও এখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সাথে প্রথম দিকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেও পরবর্তীতে সাদ্দাম পরাজয় নিশ্চিত জেনে আত্মগোপন করে। তিনি তার নিজ শহর তিকরিতে ১৫ কি. মি. দক্ষিণে আদদাত্তর আবাসিক এলাকায় একটি খামারবাড়ি ছয় থেকে আট ফুট গভীর ভূ-গর্ভস্থ একটি কক্ষে আত্মগোপন করেন। দীর্ঘ আট মাস তল্লাশীর পর অবশেষে নাটকীয় এক অভিযানের মাধ্যমে মার্কিন বাহিনী ২০০৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করে। মূলত সাদ্দামের এ গোপন আস্তানার খবর তখন বিশ্বব্যাপী প্রকাশ হয়ে পড়লে তিকরিত বিশ্ব জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কারবালা

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের উপকণ্ঠে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা নামক ঐতিহাসিক নগর অবস্থিত। ইতিহাসের সবচাইতে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এ কারবালা নামক স্থানে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর দৌহিত্র মুসলমানদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শহীদ ইমাম হোসেন (রাঃ) এর শাহদাতের স্মৃতি

বিজড়িত এ শহর। তাই মুসলমানরা এর নাম স্মরণ করেন অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে। ৬৮০ সালে খলিফা আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন (রাঃ) খেলাফতের অধিকার দাবি করেন। এদিকে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। পরিণতিতে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইমাম হোসেন (রাঃ) তাঁর অনুগত মুষ্টিমেয় মুসলমানকে (১১ জন) সঙ্গে নিয়ে ইয়াজিদের রাজধানী অভিমুখে রওনা হলে পথিমধ্যে এ কারবালার মরু প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী তাঁর গতিরোধ করে। অতপর উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইমাম হোসেন সঙ্গী ও পরিজনসহ শত্রুদের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ৬৮০ সালে ১০ অক্টোবর। ইসলামের ইতিহাসে কারবালা যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। ৬৮০ সালের পর ২০০৩ সালে কারবালা আর একবার ইরাকে হামলার পর কারবালাতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস চালায়। ফোরাত নদীর পানিকে ইরাকি জনগণের রক্তে রক্তিম করে তোলে।

তিব্বত

তিব্বত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাহাড়, মালভূমি ও তুষারবৃত্ত একটি দেশ। দেশটি এশিয়ার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এর বেশির ভাগই উঁচু ঠাণ্ডা মালভূমি। এ দেশ বহুদিন স্বাধীন থাকলেও বর্তমানে চীনের অংশবিশেষ। বৌদ্ধ ভিক্ষু (যাঁদের 'লামা' বলা হয়) তিব্বতের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। দালাইলামা ভারতে পালিয়ে যান। ১৯৬৫ সালে চীন তিব্বতকে কিছু স্বায়ত্তশাসন দিলেও ১৯৬৭ সালে আবার তিব্বতকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তিব্বতের আয়তন প্রায় ১২,০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ২৪.৪ লক্ষ। এর বেশির ভাগ মানুষ দেশের দক্ষিণাংশে বাস করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিব্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৫০০০ মিটার এবং অসংখ্য হ্রদ, অনুর্বর পাহাড়, নুড়ি পাথর ইত্যাদি দ্বারা এটি আবৃত। এশিয়ার অনেক নদী, যেমন- ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মেকং, সালইউন, ইয়াংসি প্রভৃতি নদনদীর উৎপত্তি এখান থেকে। ১৯৫৭ সালে তিব্বতে কয়লা, জিপসাম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির সন্ধান লাভ করে। তাছাড়া এখানে সোনা, সোহাগা, লবণ ইত্যাদিও আছে। মাটি অনুর্বর ও ঠাণ্ডা বলে এখানে কৃষিকাজ ভালো হয়। বৃষ্টিপাত ২৫ সে.মি. এর কম। তাপমাত্রা শীত ও গ্রীষ্মে ৪ ডিগ্রি থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করে। তিব্বতীদের ভাষা বর্মীদের মতো এবং তিব্বতিয়রা বেঁটে ও শক্তিশালী। এদের বেশির ভাগই যাযাবর। মেষপালক, কৃষক ও শ্রমিক সব ধরনের লোকই তিব্বতে দেখা যায়। প্রধান খাদ্য বার্লি এবং চীনা চা প্রধান পানীয়। ইয়াক প্রাণী তিব্বতীদের খুব কাজে লাগে। তার থেকে তারা দুধ, মাখন ও মাংস পায় এবং বোঝা বহনের কাজেও ব্যবহার করে। লাসা তিব্বতের রাজধানী এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। দালাইলামার মঠ পতোলা দেখতে প্রাসাদের মতো এবং এতে প্রায় হাজারটি কক্ষ আছে।

নাগাসাকি

নাগাসাকি জাপানের একটি শিল্পনগরী। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে ৯৫০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্ব চীন সাগরের তীরে কিউশুর পশ্চিম সৈকতে এ নগরী অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের যে দুটি শহরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, নাগাসাকি তার মধ্যে দ্বিতীয় ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট মিৎসুবিশি জাহাজ নির্মাণঘাঁটি ধ্বংস করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং এর আঘাতে নাগাসাকির প্রায় অর্ধেক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এতে প্রায় ৭৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। নিহতদের স্মরণে এখানে একটি শান্তি উদ্যান নির্মিত হয়েছে। নাগাসাকি জাপানের একটি পুরানো বন্দর। ষোল শতকে এ বন্দর দিয়েই পাশ্চাত্য বণিকেরা প্রথম জাপানে প্রবেশ করে। ১৬০৯ সালে হল্যান্ড এখানে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৮৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এবং ১৮৫৮ সালে ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ শক্তির জন্য এ বন্দর উন্মুক্ত হয়। নাগাসাকিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন কারখানা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা, কয়লাখনি ও মৎস শিকার কেন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রচুর কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়।

গোলান মালভূমি

গোলান মালভূমি অবস্থানগত দিক থেকে ইসরাইল, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ মালভূমির মালিকানা ছিল সিরিয়ার। ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধে গোলান মালভূমি ইসরাইলের দখলে চলে যায়। জর্ডান নদীর তীরে অবস্থিত গোলান মালভূমি সিরিয়াকে

http://thejobstudy.com Go to Contents

ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সিরিয়া ও ইসরাইলের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এখনো এ ব্যাপারে কোনো চুক্তি না হওয়ায় গোলান মালভূমি সিরিয়া ফেরত পায়নি। আশা করা যায় শীঘ্রই এ ব্যাপারে একটি মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব হবে এবং আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইসরাইল সিরিয়াকে গোলান মালভূমি ফেরত দানে বাধ্য হবে

ম্যাকাও

চীনের দক্ষিণে অবস্থিত এ ক্ষুদ্র উপনিবেশটি প্রায় সাড়ে ৪০০ বছর ধরে পর্তুগালের অধীনে ছিল। ১৯৮৭ সালের ১৩ এপ্রিল চীন ও পর্তুগালের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ম্যাকাও চীনের অধিভুক্ত হয়। ম্যাকাওয়ের আয়তন ৬.৮৭ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪ লাখ। দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত ম্যাকাওয়ের অধিবাসীদের প্রায় ৯৫ শতাংশই চীনা ও বাকি ৫ ভাগ পর্তুগিজ। অফিসিয়াল ভাষা পর্তুগিজ ও চীনা। ম্যাকাওয়ের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৫১৩ সালে জর্জ আলভরিস নামক এক পর্তুগিজ নাবিক প্রথম এখানে অবতরণ করে এবং ১৫৫৭ সালে সরকারিভাবে পর্তুগিজ শাসনাধীন আসে। ১৮৪৬ সালে ম্যাকাওয়ের গভর্নর জোয়াও ফেরেরা দ্য আমারাল ম্যাকাওকে শুল্কমুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ম্যাকাও সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত। ১৯৫১ সাল থেকে ম্যাকাও পর্তুগালের একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল।

মাজার-ই-শরীফ

মাজার-ই-শরীফ উত্তর-আফগানিস্তানের একটি বিখ্যাত শহর। রাজধানী কাবুল থেকে প্রায় ১৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত এ শহরটি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। পূর্বে শহরটি ছিল তালেবান বিরোধী আব্দুল রশীদ দোস্তাম ও আহমেদ শাহ মাসুদের শক্ত ঘাঁটি। ১৯৯৭ সালের মে মাসের এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে তালেবান বাহিনী এ শহরটিকে দখল করে নেয়। এ সময় উভয় পক্ষের ব্যাপক সৈন্য হতাহত হয়। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর তালেবানরা মাজার-ই-শরীফে ৯ জন ইরানি কূটনীতিককে হত্যা করে। এ নিয়ে দু'দেশ প্রায় যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সহায়তায় তালেবান সরকার নতি স্বীকার করে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয়। ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে এ শহরটি আফগানিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াটার লু

'ওয়াটার লু' বেলজিয়ামের ব্যাসেলস থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এটি একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন ব্রিটেনের নিকট পরাজিত হয়ে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ এলাকাতে নির্বাসিত হন। পরে সেখান থেকে পলায়ন করে তিনি পুনরায় ফ্রান্সে প্রবেশ করেন এবং লিজির যুদ্ধে ব্লুশারকে পরাজিত করেন। কিন্তু অচিরেই ওয়াটার লু নামক স্থানে ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে নেপোলিয়ন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। এ দ্বীপে ১৮২১ সালের ৫ মে তার জীবনাবসনা ঘটে। নেপোলিয়ন ও ওয়েলিংটনের সংঘটিত ওয়াটার লু যুদ্ধই এ স্থানের নাম অমর করে রেখেছে।

হিরোশিমা

হিরোশিমা জাপানের হোনশু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে উপসাগরের তীরবর্তী ব-দ্বীপ আকৃতির একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে প্রথম পরমাণু বোমা ফেলা হয়। হিরোশিমার আয়তন ২৫৩ বর্গমাইল বা ৬৫৬ বর্গ কি.মি.। ওসাকা থেকে এটি ১৭৫ বা ২৮০ কি.মি পশ্চিমে অবস্থিত। এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে জাপানের অন্যতম সুন্দর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় কুরে। হিরোশিমা ষোড়শ শতকের শেষভাগে দুর্গ শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালে মেইজি রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটলে হিরোশিমাকে জাপানের সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হিরোশিমা তা-ই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিনাশর্তে জাপানকে আত্মসমর্পন করানোর জন্য ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমায় পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে। এতে শহরের ৬০ ভাগ এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ৭৫ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং এর দ্বিগুণ লোক আহত হয়। নিহতদের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ এখানকার মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এ নজিরবিহীন মানবতাবিরোধী ঘটনা স্মরণে এখানে একটি পিস মেমোরিয়াল পার্ক নির্মিত হয়েছে। প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের করুণ পরিণতির জন্য হিরোশিমা

বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমে পর্যটনকেন্দ্রের পরিণত হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে এখানে পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী একটি বার্ষিক বিশ্ব সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৫০ সাল থেকে বিধ্বস্ত হিরোশিমাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়। হিরোশিমা এখন জাপানের অন্যতম প্রধান আধুনিক শিল্পকেন্দ্র। যাবতীয় ভারি লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীসহ এখানে প্রচুর বস্ত্র ও বাজারজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

বাস্তিল দুর্গ

ফরাসি বিপ্লবের সূতিকাগার হলো বাস্তিল দুর্গ। ফরাসীবাসীদের বহু ঘটনার স্বাক্ষী ও জাতীয়তাবাদের প্রতীক হলো বাস্তিল দুর্গ। প্যারিসের প্রাচীন 'সেন্ট এন্থনি' গেটের নিকট একটি সামরিক দুর্গ হিসেবে সর্বপ্রথম এ বাস্তিল ব্যবহৃত হতো। ১৩৭০ সালে রাজা পঞ্চম চার্লস বাস্তিলের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৩৮২ সালে তা সমাপ্ত হয়। প্রথমে একটি নগর দুর্গ হিসেবে নির্মিত হলেও পরে তা রাষ্ট্রীয় কারাগারে পরিণত হয়। অনেক নির্যাতন ও অত্যাচারের ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে আছে এ কারাগার। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির দিন কেটেছে এখানে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন-"জাক দ্যা আমানিয়াক", অবলিনম এর ডিউক, ভল্টেয়ার, নান্নী তোলেন্দাল এবং বার্ণার পলিসে। পরবর্তীতে দিদারো, ভল্টেয়ার ও রুশো বাস্তিল দুর্গকে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা প্যারিসবাসীদের মনে বিপ্লবের চেতনাও দ্রুত জাগাতে থাকে। ফলে ১৪ জুলাই ১৭৮৯ সালে ন্যাশনাল গার্ডের সহযোগিতায় প্যারিসের ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে দেয় এবং বন্দীদের মুক্ত করে। বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংসই প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত এবং এ থেকেই বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়। মূলত ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার পেছনে ছিল বাস্তিলের পতন। তাই ফরাসি জনগণ ও তাদের অনাগত বংশধরদের জন্য এটি আজও স্বৈরাচারের প্রতীক ও স্বাধীনতার লাল সূর্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তখন থেকেই তারা ১৪ জুলাইকে তাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। বাস্তিল দিবস রীতিমত আজ এক মহান ঐতিহ্য ও একটি রুটিনে পরিণত হয়েছে।

চীনের প্রাচীর

মঙ্গোলিয়া ও চীনের বিশাল সীমান্ত জুড়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিস্ময় চীনের প্রাচীর। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন অথচ অক্ষয় এ কীর্তি প্রথম নির্মিত হয় খ্রীস্টপূর্ব ২২১-২০৬ অব্দে। প্রাচীরটি নির্মাণ করেন তৎকালীন 'চ' ইন (Ch. in) যার নামানুসারে 'চীন' নামকরণ হয়েছে। বর্তমান চীনের প্রাচীরটি কিন্তু চ'ইন সাম্রাজ্যের সেই পুরানো প্রাচীর নয়। পরবর্তীকালে বহু সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের ফলে বর্তমান প্রাচীরটি নতুনরূপ পরিগ্রহ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বহু স্থানে সংস্কার করে একে আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে সমান্তরাল করে একটি বা দুটি প্রাচীরও গড়ে তোলা হয়েছে। সে সময় প্রাচীরটিকে আরো বিস্তৃত করে প্রায় ১৫০০ মাইল (২৪০ কিলোমিটার) দীর্ঘ করা হয়। চীনের প্রাচীরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন পদার্থে তৈরি। কোথাও দেখা যায় গ্রানাইট পাথর আবার কোথাও শুধু মাটি। ১৫ থেকে ৫০ ফুট উচ্চ এবং মাটির ওপর ১৫ থেকে ৩০ ফুট চওড়া প্রাচীরটির উপরের বিস্তার প্রায় ১২ ফুট।

হেরবন মসজিদ

২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৪ ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিমতীরে হেবরন শহরে ইব্রাহিম মসজিদে ফজরের নামাজ আদায়কারীদের লক্ষ্য করে উগ্র ইহুদিরা গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে ৬৩ জন নিহত ও তিন শতাধিক আহত হন। হেবরনের দুই হাজার বছর পুরাতন এ মসজিদ ভবনটি মুসলমান ও ইহুদি উভয়েরই নিকট এক মহাপবিত্র স্থান। এ হত্যাকাণ্ডের প্রধান বারুচ গোল্ড স্টেইন একজন ডাক্তার ও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর রিজার্ভ ফোর্সের একজন ক্যাপ্টেন। আমেরিকা বংশোদ্ভূত এ ইহুদি ১১ বৎসর পূর্বে ইসরাইলে আসে এবং এ হত্যাকান্ডের পর জনতার গণধোলাইয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একজন আরববিরোধী কট্টর ইহুদি কাঁচ আন্দোলনের সদস্য। ফিলিস্তিন সহ সারা বিশ্ব এ হত্যাকাণ্ডে নিন্দা জ্ঞাপন করে। ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ইসরাইল পশ্চিমতীর দখল করার পর এটি হচ্ছে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা যা পিএলও এবং ইসরাইলের স্বায়ত্বশাসন চুক্তিতে প্রবল প্রভাব ফেলে।

হযরতবাল মসজিদ

হযরতবাল মসজিদটি ভারতের অজারাজ্যে ভূ-স্বর্গ নামে খ্যাত কাশ্মীরে অবস্থিত। ১৯৯৩ এর ১৫ই

অক্টোবর থেকে ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মিরি মুসলমানদের প্রিয় এবাদতকেন্দ্র এ হযরতবাল মসজিদ ৩২ দিন ব্যাপী অবরোধ করে রাখে। ভারতীয় সৈন্যরা মসজিদটির ভিতরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যক জঙ্গী সশস্ত্র মুজাহিদকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে মসজিদটি অবরোধ করে। এ অবরোধের ফলে প্রায় ৮০ জন মুসলমান মসজিদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৬ই নভেম্বর' ৯৩ মুজাহিদরা ভারতীয় সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পন করে। আত্মসমর্পনের ফলে হযরতবাল মসজিদের ৩২ দিন ব্যাপী অবরোধের অবসান ঘটে। এ মসজিদ অবরোধ করার ফলে শুধু কাশ্মির নয় ভারতসহ সারা বিশ্বে মুসলমানদের ভিতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

আল আকসা মসজিদ

আল আকসা মসজিদ মুসলমানদের কাছে পৃথিবীর দ্বিতীয় পবিত্রতম মসজিদ। এ মসজিদটি ফিলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন মসজিদ, যা হযরত সুলাইমান (আঃ) নির্মাণ করেছিলেন। এর ধ্বংসাবশেষের স্থানে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশে ৬৪১ বা ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এ মসজিদের পবিত্রতার কারণেই মূলত জেরুজালেম নগরীর গুরুত্ব মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত বেশি। মক্কা নগরী থেকে জেরুজালেমের দূরত্বের কারণেই এ নামকরণ করা হয়েছে। জেরুজালেম নগরীটি ইহুদিদের কাছে পবিত্রতম স্থান। তাই জেরুজালেম নিয়ে মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। আল আকসা মসজিদের আদি নাম ছিলো বাইতুল মোকাদ্দাস। মহানবী (সাঃ)-এর ইসলামি যুগ থেকে এর নাম হয় আল আকসা মসজিদ। কাবা ঘরকে কেবলা করার আগে মুসলমানরা এর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। এখান থেকে মহানবী (সাঃ) মি'রাজে রওয়ানা দেন বলে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

চারাই-ই-শরীফ

এটা মুসলমানদের একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। এ মসজিদটি ভারত অধিকৃত কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থিত। এটা পনেরো শতকের পুরানো একটি মসজিদ এবং এর পাশেই রয়েছে ইসলাম প্রচারক ও দরবেশ শেখ নূরউদ্দীন ওয়ালী (রঃ)-এর মাজার শরীফ। এ মসজিদটিতে কাশ্মীরের জঙ্গি মুসলমান গেরিলারা আশ্রয় নিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী সেখানে আক্রমণ চালায়। ফলে মসজিদ প্রাঙ্গণে সশস্ত্র হামলায় মসজিদ ও মাজারের ক্ষতি সাধিত হয় এবং কয়েকজন জঙ্গী মুসলমান মারা যায়। এ নিয়ে ভারতের তথা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বাবরী মসজিদ

ভারতের একটি সুপ্রাচীন মসজিদ বাবরী মসজিদ। মুঘল আমলে ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫২৮ সালে) সম্রাট বাবর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় এটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দু মৌলবাদীরা এটি ভেঙ্গে ফেলে। তাদের মতে, যেখানে মসজিদটি ছিল সেখানে নাকি যুগাবতার রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে একটি রামমন্দির ছিল। তবে রামমন্দিরের অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি বর্তমানে বিতর্কের বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মসজিদের ধ্বংসলীলা নিন্দার সৃষ্টি করে। বাবরী মসজিদের ঘটনা ভারতে এবং প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ব্যাপক সহিংসতার জন্ম দেয় এর ফলস্বরূপ বহু প্রাণহানি ঘটে।

আইফেল টাওয়ার

ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার আলেকজান্ডার গুস্তভ আইফেল প্যারিস প্রদর্শনীর জন্য একটি বিশ্বখ্যাত টাওয়ার নির্মাণ করেন। তাঁরই নামানুসারে এর নামকরণ হয় আইফেল টাওয়ার। একদিক্রমে দুই বৎসর দুই মাস দুই দিন কাজ করার পর ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ মার্চ এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ লৌহময় তোরণটির উচ্চতা ৩০০ মিটার এবং ওজন ৭২২৪ টন। এর ওপরে একটি দূরদর্শন স্তম্ভ স্থাপিত হওয়ায় এর মোট উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৩২০.৭৫ মিটার। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ এন্টেনা বসানো হয়। বেতারবার্তা ও দূরদর্শন সম্প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তোরণটিকে ব্যবহার করা হয়। তোরণটিতে সিঁড়ির ধাপ আছে ১৯৭২টি। নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ৭৭,৯২,৪০১ ফ্রাঁ ৩৬ সেন্টিম, চতুর্দিকে ৭৫ কিমি পর্যন্ত একনজরে দেখে নেওয়া যায়। ফ্রান্স সরকারের ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নির্মিত প্রতীক মিনার আইফেল টাওয়ার।

'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'

স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে মূর্তিটি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পর জর্জ

ওয়াশিংটন-এর নেতৃত্বে ১৭৭৬ সালে বর্তমান বিশ্বে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালিত হয়। এ স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ফ্রান্সের জনগণ এ বিশাল মূর্তিটি আমেরিকাবাসীকে উপহারস্বরূপ প্রদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক উপসাগরের মধ্যে লিবার্টি আইল্যান্ডে বিখ্যাত এ 'ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি' অবস্থিত।

'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' তাম্র নির্মিত বৃহদাকার নারী মূর্তি, হস্তে তার আলোক বর্তিকা, মস্তকে স্বাধীনতার সপ্তরশ্মি বিকিরণকারী মুকুট। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীকরূপে মূর্তিটি সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার আহবান জানাতে রত। মূর্তিটির হস্তে উত্তোলিত আলোক বর্তিকা সততা ও ন্যায় বিচারের প্রতীক। মুকুটের সপ্ত রশ্মি বিশ্বের সাতটি মহাদেশ ও সপ্তসাগরের প্রতীক। মূর্তিটি বিশ্ববাসীকে সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় শুভাগমনের আহবান জানাচ্ছে। প্রখ্যাত স্থপতি মিঃ ফ্রেডারিক আগস্ট বার্থলডি মূর্তিটির ডিজাইন অঙ্কন করেন। এটি নির্মাণে বিশ বছর সময় লাগে বলে জানা যায়।

আমেরিকার সরকার নির্মিত ১২তলা বেসের ওপর 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' প্রতিষ্ঠিত। বেসের উচ্চতা ১৫০ ফিট। মূর্তিটির পদতল থেকে উচ্চতা ১৫২ফিট। মূর্তিটির ভিতরে ফাঁপা এবং মস্তক পর্যন্ত আরোহণের জন্যে সিঁড়ি রয়েছে। বেসমেন্টের বারতলা পর্যন্ত লিফটের সাহায্যে উঠানামার ব্যবস্থা আছে। মূর্তিটির অভ্যন্তরস্থ দশতলা সিঁড়ি বেয়ে গেটে উঠতে হয়। স্ট্যাচু অব লিবার্টি স্থাপনের কারণেই দ্বীপটির নাম 'লিবার্টি দ্বীপ'। মূর্তিটির বেসমেন্টে একটি জাতীয় ইতিহাস মিউজিয়াম, রেষ্টুরেন্ট, গিফট শপ, রেষ্টরুম (ল্যাট্রিন) ইত্যাদি রয়েছে।

৬ জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গ সংগঠন

জাতিসংঘ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা মানবজাতিকে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে দারুণভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য করে। এরই পটভূমিতে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সংগঠন 'লীগ অব নেশনস্' বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু লীগ নানাবিধ কারণে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা অনেক মারাত্মক কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময় ছিল। বিশ্বযুদ্ধের এ লোমহর্ষক ও মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা সমগ্র মানবজাতিকে আতঙ্কিত করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবতা শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ সংস্থার মধ্যে সাধারণ পরিষদ অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ সংস্থার মধ্যে সাধারণ পরিষদ অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভা স্বরূপ। একে বিশ্বের মহাসভা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। গত (১৯৪৫-২০১৫) ৭০ বছরে সাধারণ সভার কার্যাবলি ও ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ সভার গুরুত্ব ও প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর শান্তিকামী মনীষী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা শুরু করেন। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের বৈঠকের পর ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে আটলান্টিক সনদ ঘোষিত হয়। এ সনদে মানবজাতিকে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কতকগুলো সাধারণ নীতি নির্ধারিত হয়। এতে বলা হয়, প্রত্যেক জাতি ইচ্ছা মতো সরকার গঠন করে সার্বভৌম ভূখণ্ডের মালিক হতে পারবে। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে কোনো রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগ নীতি অবলম্বন করতে পারবেনা। সকল জাতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শ্রমের উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের জন্য সমানভাবে সহযোগিতা করবে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ১৯৪৩ সালের মস্কো ঘোষণার একটি বিশ্ব সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত ও স্বীকৃত হন। প্রথমে গ্রেটব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) এ ঘোষণার স্বাক্ষর দান করে। পরে বিশ্বের আরও অনেক রাষ্ট্র এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাম্বারটন ওকস শহরে বিশ্ব সংস্থা গঠনের জন্য ১৯৪৫ সালে এক অধিবেশন ডাকা হয়। এ অধিবেশন বিশ্ব সংস্থা গঠনের নিমিত্তে কতকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতিমালা গৃহীত হয়। ডাম্বারটন ওকসের প্রস্তাবলীর ওপর ভিত্তি করে

http://thejobstudy.com Go to Contents

যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৪৫ সালে ২৬ জুন এক বিশেষ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্স বা সম্মেলনে মোট ৫০টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গ প্রস্তাবিত বিশ্ব সংস্থার সনদ রচনা করার জন্য স্বাক্ষর দান করেন এবং পরে ৫১টি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত সনদ অনুমোদিত হয়। অতঃপর ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবিত বিশ্ব সংস্থার সনদটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বুকে বিশ্ব সংস্থা হিসেবে জন্ম নেয় সম্মিলিত জাতিসংঘ বা UN। জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইর্য়ক শহরে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দু'টি প্রধান শাখা রয়েছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস বহন করে বিশ্ব শান্তির সুমহান লক্ষ্যে গঠিত সম্মিলিত জাতিসংঘ শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

'ভেটো' ক্ষমতা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো প্রস্তাবে ভোট গ্রহণের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কোনো সদস্য যদি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি বাকি ১৪ জন সদস্যও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন তাহলেও সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবের বিপক্ষে এরূপ ভোট দেয়ার ক্ষমতাকে ভেটো বলে। পরিষদের সব সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে। কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫টির মধ্যে ন্যূনপক্ষে ৯টি ভোট স্বপক্ষে থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের ভোটসহ ৯টি ভোট প্রয়োজন হবে, এটি হচ্ছে 'বৃহৎ শক্তির ঐকমত্য' যা সাধারণত 'ভেটো' ক্ষমতা নামে পরিচিত। পাঁচ স্থায়ী সদস্যের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। কোনো স্থায়ী সদস্য যদি কোনো সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে না চায়, আবার ভেটো প্রয়োগ করে তা বানচাল করতেও অনিচ্ছুক হয়, সেক্ষেত্রে ভোট দানে বিরত থাকতে পারে। সদন অনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতিসংঘের অন্যান্য সংগঠন সরকারসমূহের কাছে কেবল সুপারিশ পেশ করতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের একারই ক্ষমতা রয়েছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যা সনদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো পালনে বাধ্য থাকবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

ILO (International Labour Organizaiton). লীগ অব নেশনস-এর সহযোগী একটি স্বয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির অধীনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ এবং আইএলওর মধ্যকার সম্পর্কবিষয়ক চুক্তি ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর অনুমোদিত হয় এবং এ চুক্তির মধ্য দিয়ে আইএলও জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম বিশেষ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আইএলও শ্রমজীবী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। কাজ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এ সংস্থা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৮৫টি। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় এবং এর মহাসচিব জুয়ান সোমাবিয়া। এটি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় ১৯৬৯ সালে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)

জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল। বর্তমানে একটিকে United Nations Children's Fund বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের শিশুদের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে এ তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সালে এটি জাতিসংঘের স্থায়ী অঙ্গ সংস্থায় পরিণত হয়। বর্তমানে এটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আওতাধীন একটি সংস্থা। এর অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে বিশ্বের নারী ও শিশুদের সাহায্য করা। বাংলাদেশেও এর আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত। এ সংস্থার প্রধান Anthony Lake।

এ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলো হলো:

১. বিশ্বব্যাপী শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
২. শিশু ও মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ।
৩. শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ ও বণ্টন।

৪. হাসপাতাল ও প্রসূতি সদন নির্মাণ।
৫. মাতা ও শিশুদের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন।
৬. শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা।
৭. শিশু অধিকার, মাতৃকল্যাণ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO-Food and Agriculture Organization)-গঠিত হয় ১৬ অক্টোবর ১৯৪৫। এর সদর দপ্তর অবস্থিত ইতালির রোমে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩। গভনিং বডির সদস্য ৪৯ জন। প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। তার মেয়াদকাল ৬ বছর। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ক. বিশ্বের খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করা, খ. উন্নত জাতের বীজ সরবরাহকরণ, গ. খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ঘ. পোকার আক্রমণ থেকে শস্যকে রক্ষা করা, ঙ. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি। বর্তমান প্রধান জোসে গ্রাজিয়ানো দ্যা সিলভা। বাংলাদেশ FAO এর সদস্যপদ লাভ করে ১৩ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

জাতিসংঘের ২৬টি দেশ কর্তৃক এর গঠনতন্ত্র অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম WHO। এর পূর্ণরূপ World Health Organization। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সকল উপায়ে সকল মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা। WHO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৪টি। ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী বোর্ডের মাধ্যমে এ সংস্থাটি পরিচালিত হয়। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। WHO-এর প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। বর্তমান ও সপ্তম মহাপরিচালক হংকংয়ের ড. মার্গারেট চ্যান।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)

WTO-এর পূর্ণরূপ World Trade Organization বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানে সমাজতন্ত্রের বিপরীতে পুঁজিবাদী শক্তির বিনা রক্তপাতে বিরাট বিজয় সূচিত হওয়ার ফলে এ সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশসমূহ এক স্বীকৃত আইনভিত্তিক প্রয়োগসম্মত কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই উরুগুয়ে রাউন্ড পরিসমাপ্তির পর GATT রূপান্তরিত হয় WTO। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি WTO আত্মপ্রকাশ করে এবং GATT চুক্তিগুলো পালন করার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এ সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার সৃষ্টি করা। এ মুক্তবাজার সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিশ্বে ব্যবসা বাণিজ্য যে বেড়েছে এতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবচিত্র হলো অর্থনৈতিক কাঠামোগতভাবেই এর সুফল ভোগ করছে ধনী দেশ এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং সুফল ভোগের ক্ষেত্রে তাদেরই হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এ সংস্থা। WTO-এর সদরদপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। মোট সদস্য সংখ্যা ১৫৫টি।

ইউএনডিপি (UNDP)

জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা UNDP। এর পূর্ণ নাম "United Nations Development Programme"। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। বিভিন্ন দেশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য UNDP একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে। বহুজাতিক কারিগরি, প্রাক-বিনিয়োগ সহযোগিতা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করাই এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। এর প্রধান কর্মসূচি হচ্ছে বিশেষ তহবিল এবং কর্মসূচি পরিচালনা করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জনকল্যাণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, লোক প্রশাসন, যোগাযোগ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা। এর উল্লেখযোগ্য তহবিল হচ্ছে:

১. জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল।
২. জাতিসংঘ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তহবিল।

৩. জাতিসংঘ ঘূর্ণায়মান তহবিল।
৪. জাতিসংঘ ট্রাস্ট তহবিল ইত্যাদি।

UNDP-এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। জাতিসংঘের সকল সদস্যই এ সংস্থার সদস্য। UNDP স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিশেষ তহবিল থেকে অনুদান ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণও মঞ্জুর করে থাকে।

সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল

১৯৮২সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন UNCLOS-III নামে পরিচিত। এ আইনটিকে সমুদ্রের সংবিধান বলা হয়। UNCLOS-এর অধীনে সমুদ্র আইনের বিভিন্ন দিকের আলোকে তিনটি বিশেষ সংস্থা রয়েছে। এ সংস্থাগুলোর অন্যতম হলো International Tribunal for the Law of the Sea বা সংক্ষেপে ILOS. সমুদ্রসীমা বিষয়ক এ সংস্থাটি ১৯৯৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর গঠন করা হয় এবং ১৯৯৬ সালের ১৮ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। জার্মানীর হামবুর্গ ভিত্তিক এ আদালতের বিচারকের সংখ্যা ২১ জন। আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা বিষয়ক বিভিন্ন সংকট এ বিচারালয় মীমাংসা করে। গত ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে ILOS তার ১৬ তম মামলার রায় অর্থাৎ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় প্রদান করে। বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশসহ আরো ৩টি মামলা এ আদালতে বিচারাধীন।

UN Women

বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ও লিঙ্গীয় বৈশম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা হিসেবে ২০১০ সালে জন্ম নেয় UN Women. ২০১০ সালের ২রা জুলাই সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটির মাধ্যমে গঠিত এ সংস্থাটির অফিসিয়াল নাম United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Woman.২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে UN Women. তার কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থাটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। প্রথম প্রধান চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল বাশেলেট। ৯ জুলাই, ২০১৩ UN Women.-এর দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুমজাইল মিশেল বাশেলেটের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs)

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium DevelopmentGoal-MDG) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট সহ সব ধরণের উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন-CPD সহ অন্যান্যরা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং চলমান পরিস্থিতিতে এ লক্ষ্য অর্জন আশানুরূপ নয় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যসমূহ হলো:

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।
লক্ষ্য-২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)

১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য দেশভিত্তিক PRSP -Poverty Reduction Strategy Papers কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার বাংলা করা হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। এখানে ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি' যেসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের টার্গেট নিয়েছে তার বাস্তবায়নের পথ সুগম করার কথা বলা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, যা মূলত সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থায়ীকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোর দেয়। এটি মূলত ৮টি বিষয়ের ওপর জোর দেয়, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের বড় সমস্যা। এগুলো হলো: ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২. পুষ্টি, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৪. সুশাসন, ৫. মাতৃ স্বাস্থ্য, ৬. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৭. দুর্নীতি দমন, ৮.সবসময় তদারক করা (ওপরের বিষয়গুলো)। প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে ২৩ অক্টোবর ২০০৮ শিক্ষা ও কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে সরকার। এ পিআরএসপির মেয়াদ তিন বছর, অর্থাৎ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত। তিন বছর মেয়াদি এ দলিলকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক জাতীয় পরিকল্পনার বা দারিদ্র্য বিমোচনের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পর জুলাই ২০১২ থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, যাকে সংক্ষেপে ইউনেস্কো বলা হয়। UNESCO-এর পূর্ণরূপ United Nations Educational, Scientific and Cul;tural Organization. প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৬। সদর দপ্তর প্যারিস, ফ্রান্স। কার্যনির্বাহী বোর্ড ৫৮ সদস্যবিশিষ্ট। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৫ এবং অ্যাসোসিয়েট সদস্য ৬টি। প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ক. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, খ. নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)

ICAO-এর পূর্ণরূপ International Civil Aviation Organization। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল। এর সদর দপ্তর অবস্থিত কানাডার মন্ট্রিলে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯১। ICAO-এর অ্যাসেম্বলি গঠিত হয় ১৫৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে। প্রতি তিন বছর অন্তর একবার এর সভা গঠিত হয়। এ পরিষদ সংস্থার নির্বাহী অঙ্গ। সংস্থাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচলের মান ও বিবিধমালার উন্নয়ন সাধন করা এবং নিরাপদে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচলে সহযোগিতা করা।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA)

আইএইএ (IAEA) বলতে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থাকে বোঝায়। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৯ জুলাই ১৯৫৭ সালে। জাতিসংঘভুক্ত হয় ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭। এর সদরদপ্তর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থিত। আইএইএ-র উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সকল দেশের আণবিক শক্তিকে শান্তি ও প্রগতির কাজে লাগানো, এ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য কোনো সদস্য রাষ্ট্র যেন তার সামরিক খাতে ব্যবহার করতে না পারে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। প্রতিবছর একবার এর বৈঠক হয়। এর ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। এর প্রধান মহাসচিব। জাপানের নাগরিক ইউকিয়া আমানো ৩০ নভেম্বর ২০০৯ সালে এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বোর্ড অব গভর্নসের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে নির্বাচিত হন। আইএই-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫৯।

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)

UPU-এর পূর্ণরূপ Universal Postal Union। ১৯৭৮ সালের ৯ অক্টোবর বার্ন চুক্তির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু হয় ৫ জুলাই, ১৮৭৫। এটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। সংস্থাটি পরিচালিত হয় ৪০ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ দ্বারা। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের বার্নে অবস্থিত। এর সদস্য সংখ্যা ১৯২। UPU-এর প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। সংস্থাটির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো বিশ্ব ডাক কংগ্রেস। এ কংগ্রেস প্রতি পাঁচ বছরে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। কংগ্রেস কর্তৃক UPU-এর নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪০। নির্বাহী পরিষদ বছরে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। এছাড়া কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)

ITU-এর পূর্ণরূপ International Telecommunication Union। ১৮৬৫ সালে প্যারিসে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৬ মে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। প্রধানের পদবি মহাসচিব। সদস্য সংখ্যা ১৯৩। ITU পরিচালিত হয় ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি Administrative Council দ্বারা। এর প্রধান চারটি অঙ্গ হলো: ক. সাধারণ সচিবালয়, খ. আন্তর্জাতিক ফ্রিকোয়েন্সি নিবন্ধীকরণ বোর্ড, গ. আন্তর্জাতিক বেতার উপদেষ্টা কমিটি এবং ঘ. আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্বে টেলিফোন, রেডিও ও টেলিগ্রাফ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যয়হ্রাস করা ও নির্বিঘ্নতা নিশ্চিতকরণ।

জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)

UNIDO-এর পূর্ণরূপ United Nations Industrial Development Organisation। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি। সদর দপ্তর অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। সংস্থার প্রধানের পদবী মহাপরিচালক। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও শিল্পোন্নয়নে জাতিসংঘ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। UNIDO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৭২।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)

WMO-এর পূর্ণরূপ World Meteorological Organization। এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৭৩ সালে এবং জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৫১ সালে। WMO-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উন্নতি বিধান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৫। প্রধানের পদবি মহাসচিব। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এছাড়া ৬টি আঞ্চলিক সংগঠন আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর ও কেন্দ্রীয় আমেরিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ অঙ্গ হলো বিশ্ব আবহাওয়া কংগ্রেস। সাধারণত সকল সদস্য রাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগের প্রধানগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। প্রতি চার বছরে একবার এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬ জন পরিচালক সমন্বয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিষদ গঠিত। এ পরিষদ বিশ্ব আবহাওয়া কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন তদারক করার লক্ষ্যে বছরে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। এছাড়া এর ৮টি কারিগরি কমিশন রয়েছে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)

IFAD-এর পূর্ণরূপ International Fund for Agricultural Development। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ নভেম্বর। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো ও পুষ্টি বিকাশের জন্য সম্পদ সংগ্রহ। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬৯। সদর দপ্তর ইতালির রোমে। প্রধানের পদবি প্রেসিডেন্ট। একটি পরিচালনা পরিষদ এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এ পরিষদ গঠিত হয়। আর্থিক অবস্থার ওপর IFAD-এর

সদস্যসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ক. উন্নত দেশ, খ. তেল রপ্তানীকারক উন্নয়নশীল দেশ, গ. উন্নয়নশীল দেশ। এ তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে ৬জন করে মোট ১৮ জন নির্বাহী পরিচালক এবং ১৮ জন বিক্রয় পরিচালক নিয়ে মোট ৩৬ জনের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO)

IMO-এর পূর্ণরূপ International Maritime Organization. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭ মার্চ, ১৯৫৮। সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যের লন্ডন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৭০ ও তিনটি সহযোগী সদস্য। প্রধানের পদবি মহাসচিব। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিতকরণ এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো অ্যাসেম্বলি, যা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। অ্যাসেম্বলি দুই বছরের জন্য ৩২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করে। এছাড়া IMO-এর চারটি প্রধান কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো ক. সামুদ্রিক নিরাপত্তা কমিটি, খ. আইন সংক্রান্ত কমিটি, গ. সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি এবং ঘ. কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত কমিটি।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)

ICC এর পূর্ণরূপ হলো-International Criminal Court. বিশ্বের প্রথম স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) কাজ শুরু করে ২০০২ সালের ১ জুলাই থেকে। ১৯৯৮ এ গৃহীত রোম চুক্তির মাধ্যমে এ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬০টি দেশের চূড়ান্ত অনুমোদনের (Ratify) পরই। ১২ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত ৬৬টি দেশ চূড়ান্তভাবে এ চুক্তি অনুমোদনের পর ৬০ দিনের মধ্যে ICC কাজ শুরু করে; যদিও ১৯৯৮ সালের রোম চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৩৯টি দেশ। এর বর্তমান সদস্য দেশ ১১৯টি। এ আদালতের এখতিয়ারে থাকবে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং আগ্রাসন অপরাধ। এ আদালতে গুরুতর অপরাধে দোষী প্রমাণিতরা অনধিক ৩০ বছর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, অথবা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। এ আদালতের অতীতের অপরাধগুলো বিচারযোগ্য নয়, ফলে চিহ্নিত অনেক রক্তপিপাসু, শাষক, গণহত্যাকারীদের এ আদালতের দ্বারা আটকানো যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও বিশ্বে এ প্রথম ফৌজদারি বিষয়ে একটি স্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আইসিসিকে মানতে চাচ্ছে না, কারণ এ আদালতের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন মুরুব্বিয়ানা ক্ষুণ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে মার্কিন সৈন্যদের ১ বছরের জন্য এ আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ICC যদি স্বাধীন ও পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করতে পারে, তবে শ্যারন বা মিলোসেভিচের মতো দানবীয়, বর্বরবাদী গণহত্যাকারীসহ মানবতার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধকারীই এখন থেকে আর বিচার ছাড়া স্বদর্পে ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)

UNHCR-এর পূর্ণরূপ United Nations High Commissioner for Refugees। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে জেনেভায়। প্রধানের পদবি মহাসচিব। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করাই এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU)

UNU-এর পূর্ণরূপ United Nations University। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে এবং কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭৫ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মসূচি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি জাপানের টোকিওতে অবস্থিত। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে এবং বছরে একবার এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

NUFPA

NUFPA-এর পূর্ণরূপ ছিল United Nations Found for Population Activities। ১৯৮৭ সালে এর নামকরণ করা হয় United Population Found। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা উদ্দেশ্যে। আর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ হচ্ছে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শাখা। এ বিভাগের ওপর শান্তিরক্ষা কার্যক্রম তদারকি করা, দিক নির্দেশনা দেওয়া, সুপারিশ করা, পরিকল্পনা করাসহ নানাবিধ দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এ বিভাগটি জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এর সাংগঠনিক কাঠামো Office of Operations Support এ দু ভাগে বিভক্ত। Office of Operations Support এর অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ, লোকবল বিভাগ প্রভৃতি। বিভাগীয় প্রধান মহাসচিবের পক্ষে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করেন; কার্যক্রমের নীতিমালা ও নির্দেশনা তৈরি করে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মহাসচিবকে পরামর্শ দেন।

এসকাপ (ESCAP)

এসকাপ (ESCAP) এর পূর্ণরূপ হচ্ছে United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific অর্থাৎ জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন। এটি জাতিসংঘভুক্ত একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা। এ আঞ্চলিক সংস্থাটির পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রয়েছে তুরস্ক, পূর্বে রয়েছে কিরিবাতি, উত্তরে রয়েছে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড। এসকাপ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এর সদরদপ্তর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে। এসকাপ সচিবালয় প্রধানকে বলা হয় নির্বাহী মহাসচিব। এর অধীনে ৭টি বিভাগ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রাধান্য দেয়া। এর অধীনে ৮টি কমিটি রয়েছে। যে কমিটিগুলো আঞ্চলিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করে, চিহ্নিত করে কোনো কোনো স্থানে কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার; আঞ্চলিক সংলাপের আয়োজন করে, পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা প্রভৃতি।

পূর্ব তিমুরে সমাপ্ত জাতিসংঘ মিশন

জাতিসংঘের সর্বশেষ সেনা দলটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পূর্ব তিমুর ত্যাগ করেছে। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে সংস্থাটির শান্তিরক্ষা মিশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট আয়োজনসহ ১৩ বছর ধরে নতুন দেশটির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে জাতিসংঘ। বহু রক্তপাতের পর স্বাধীনতার প্রশ্নে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় পূর্ব তিমুর। মাঝখানে দেশটি থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হলেও ২০০৬ সালে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশটিতে জাতিসংঘ মিশন আবার ফিরে আসে। পূর্ব তিমুরের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর ২০১২ সালের অক্টোবর থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রত্যাহার শুরু হয়। ২০০২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরুর দিন থেকেই দেশটি সরাসরি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ছিল। সংস্থার প্রায় দেড় হাজার সেনা অবস্থান করছিল দেশটিতে। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্সের (ISF) সেনাও দেশটিতে মোতায়েন ছিল। অস্ট্রেলিয়ার সেনারা ২০১২ সালের নভেম্বরে পূর্ব তিমুর ছাড়ে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

১৯৯৮ সালে রোমে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে ঐ বছরই ১৭ জুলাই একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংবিধান গৃহীত হয়। ঐ সম্মেলনে ১৬০টি দেশের

প্রতিনিধি অংশ নেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি গঠনের পক্ষে ১২০টি দেশ ভোট প্রদান করে এবং ৭টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়। ২১টি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে। এবং ১২টি দেশ ভোটে অংশ নেয়নি। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর এটি কার্যকর করার জন্য ন্যূনতম ৬০টি দেশের অনুমোদন লাভের শর্ত রাখা হয়েছিল।

- বিশ্বের প্রথম স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কার্যক্রম শুরু হয় ৯ নভেম্বর ২০০৬। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে এ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা, জাতিসংঘ আদালত হয়।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) প্রথম মামলার শুনানি শুরু হয়-গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের বিদ্রোহী নেতা থমাস লুবাঙ্গার, ৯ নভেম্বর ২০০৬ (শিশুদের ভয়াবহ যুদ্ধের নিয়োগের অভিযোগে)।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বিচার করে : ক. গণহত্যা অপরাধ; খ. মানবতাবিরোধী অপরাধ; গ. যুদ্ধাপরাধ ও ঘ. আগ্রাসন অপরাধের। আদালতে বিচারক সংখ্যা- ১৮ জন (৭ জন নারী, ১১ জন পুরুষ)।
- আইসিসির বিচারব্যবস্থা ৩ ভাগে বিভক্ত- (প্রাক-বিচার বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আপিল বিভাগ)। ২০১০ পর্যন্ত ১১৩টি দেশ আইসিসি চুক্তি অনুমোদন করে।

৭ আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক জোট

সার্ক (SAARC)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো ১৯৮০'র দশকে সার্ক (SAARC) অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) গঠিত হয়। সরকারি নাম হল: আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশিয়া সমিতি বা সার্ক। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ সার্কের সনদে স্বাক্ষর করেন। যে সমস্ত দেশকে নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছে তারা হলো ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ। পরবর্তীতে অবশ্য আফগানিস্তানকে সার্কের পূর্ণ সদস্য পদ দেওয়ায় বর্তমানে সার্কের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ এ। এ ৮টি দেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিশেষ অঞ্চলে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এদের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তসম্পর্ক জোরদার ও উন্নয়নকে সন্নিহিত করার নিমিত্তে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্লাটফর্ম হিসেবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সার্ক গঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন ১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লিখে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। চিঠিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগিতা কাঠামো যেমন– ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC), ল্যাটিন আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশন (লাফটা), আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC), এসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN) এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করা এবং এ লক্ষ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এর সাথে তিনি কয়েকটি সহযোগিতার বিষয়ও তুলে ধরেন। যেমন– আবহবিদ্যা, টেলিযোগাযোগ, যাতায়াত, শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যা, কৃষি যৌথ উদ্যোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, জাহাজ চলাচল, নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার ইত্যাদি। তাঁর এ প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্য ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে একটি সংস্থা গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে যৌথ বা একীভূত কর্মসূচি নামে একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে ৯টি সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের

মার্চ মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই সার্কের জন্ম হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহে চলতে থাকা উপনিবেশ -উত্তর রাজনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা,অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং সাম্প্রদায়ীক বিরোধ ও জাতিভেদ হিংসা দক্ষিণ এশিয়ায় যে সার্বিক পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী ছিল তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ও একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার জরুরি প্রয়োজন ছিল। এতদঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় ৭টি দেশের সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তৃক সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থার জন্ম হয়।

সার্ক গণতন্ত্র সনদ

সার্ক চার্টার অব ডেমোক্রেসি বা সার্ক গণতন্ত্র সনদ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃসার বৈঠক। বৈঠক শেষে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ সার্ক গণতন্ত্র সনদের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। সার্ক সনদের মূলনীতি, শান্তি, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন ও সমাজে সবার সমান অধিকার, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে এ সনদ চূড়ান্ত করা হয়। ২০১০ সালের ২৯-৩০ এপ্রিল ভুটানে অনুষ্ঠিত ষোড়শ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সার্ক চার্টার অব ডেমোক্রেসি তথা সার্ক গণতন্ত্র সনদ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। সার্ক গণতন্ত্র সনদের মূলপ্রতিপাদ্য হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সরকারের পরিবর্তন নিশ্চিত হতে হবে। এর মধ্যে কোনো দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছেদ পড়লে অবিলম্বে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে সোচ্চার হবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো। গণতন্ত্র ব্যাহত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেবে এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক সব শক্তি।

সার্ক অ্যাওয়ার্ড

২০০২ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সার্ক পদকের নামকরণ করা হয় সার্ক অ্যাওয়ার্ড। প্রথম সার্ক অ্যাওয়ার্ড ২০০৪ প্রদান করা হয় সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। ১২ নভেম্বর ২০০৫ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্কের বিদায়ী চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের হাতে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। সার্ক অ্যাওয়ার্ডের মূল্যমান একটি স্বর্ণপদক, ২৫ হাজার ডলার এবং একটি সম্মাননা পত্র।

সার্ক ফুড ব্যাংক

জরুরি খাদ্য সংকট, খাদ্য ঘাটতি এবং দুর্যোগ মোকাবিলা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চতুর্থদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ ব্যাংকে থাকবে দুই লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ মেট্রিক টন চাল ও গম। আপাতত সার্ক সচিবালয় ব্যাংকের বোর্ড সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ এ ফুড ব্যাংকে ৪০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য জমা দেবে। এছাড়া ভারত এক লাখ ৫৩ হাজার ২০০ মেট্রিক টন, পাকিস্তান ৪০ হাজার মেট্রিক টন, ভুটান ১৮০ মেট্রিক টন, শ্রীলঙ্কা ৪ হাজার মেট্রিক টন, নেপাল ৪ হাজার মেট্রিক টন এবং মালদ্বীপ ২০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য দেবে। তৃতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন থেকে সার্ক ফুড ব্যাংক নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও তা দ্বাদশ সম্মেলনে এসে পূর্ণতা পায়।বাংলাদেশে সরকার ১৮ মার্চ, ২০০৭ সালে সার্ক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়টি অনুমোদন করে ।

SAIC

সার্কভুক্ত দেশসমূহের কৃষি সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের আধুনিক কলা-কৌশল আদান-প্রদান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAARC Argicultural Information Centre বা SAIC)। সার্কের ৮ সদস্য বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ঢাকায় (ফার্মগেটস্থ খামারবাড়ি সংলগ্ন) অবস্থিত। সার্ক কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান লক্ষ্য হলো:

১. সদস্যভুক্ত দেশসমূহের কৃষি তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।

২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম, লাগসই প্রযুক্তি ও উন্নত কৃষি কৌশল সম্পর্কীয় বই-পুস্তক প্রকাশনা।

৩. কৃষি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক পত্র-পত্রিকা, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা।

৪. কৃষকদের নিকট তথ্যাদি পৌঁছাবার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা।

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে। এর আগে বিহারের নালন্দা, ভুটান এবং ঢাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য প্রস্তাব আসে। তবে সার্কের একটি টেকনিক্যাল কমিটি সব দিক বিবেচনা করে শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। ৩ এপ্রিল ২০০৭ নয়াদিল্লীতে সার্ক সম্মেলন শুরু হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বহন করবে সার্ক সচিবালয়। বিশ্বভারতীর পাশাপাশি সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। পাঠ্যসূচি প্রণীত হবে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। থাকবে সংগীত-কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য থেকে তথ্যপ্রযুক্তির নানা পাঠ্যক্রম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য সার্ক দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীদের কোটা সংরক্ষিত থাকবে। গত বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তাব দেন। ঢাকার সার্ক ঘোষণাপত্রে প্রস্তাবটি গৃহিত হয়।

আসিয়ান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হল আসিয়ান। এ এলাকার দেশসমূহ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অঞ্চলের দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার, অর্থনৈতিক কাঠামো পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি বিশাল স্থান দখল করে আছে। ১৯৬৭ সালে ASEAN গঠিত হওয়ার পর থেকে বিগত ৪৮ (১৯৬৭-২০১৪) বছরে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদের আদান প্রদান বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ASEAN ভুক্ত প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভীতের ওপর দাড় করিয়ে দিয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আসিয়ানের সদস্য রষ্টের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ব্যাংকক ঘোষণা (Bankok Declaration) স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংগঠন হলো Association of South-East Asian Nations (ASEAN). পাঁচটি দেশ নিয়ে আসিয়ান যাত্রা শুরু করেছিল সেগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন,

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে জোট ও সংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠাকালীন সাল

১৮৬৪ → রেডক্রস
↓
১৯০৫ → রোটারি ইন্টারন্যাশনাল
↓
১৯০৭ → বয়স্কাউট
↓
১৯০৮ → এফ. বি. আই
↓
১৯১৭ → লায়ন্স ক্লাব
↓
১৯১৯ → আইসিসি
↓
১৯২৩ → ইন্টারপোল
↓
১৯৪৫ → আরব লিগ
↓
১৯৪৬ → পিএলও, মানবাধিকার কাউন্সিল
↓
১৯৪৭ → মার্শাল পরিকল্পনা, সিআইএ
↓
১৯৪৯ → ন্যাটো, কমনওয়েলথ
↓
১৯৫০ → কলম্বো পরিকল্পনা
↓
১৯৫১ → আনজুস
↓
১৯৫৩ → আফ্রিকান ইউনিয়ন
↓
১৯৫৮ → ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি, বেনেলাক্স, সিএসিএম
↓
১৯৬০ → লাফটা, ইফটা, ওপেক
↓
১৯৬১ → ন্যাম, ইসকো, ওইসিডি, আশা,এএসএ
↓
১৯৬৪ → জি-৭৭
↓
১৯৬৬ → এডিবি

http://thejobstudy.com
Go to Contents

সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি উন্নয়নকামী দেশ নিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আসিয়ান সেই সকল অঞ্চলের একটি। তাই বিশ্বরাজনীতিতেও বর্তমানে আসিয়ানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে চিন্তা না করে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে আসিয়ানকে বলা হয় Rising Dragon. সে জন্য আঞ্চলিক জোট হিসেবে আসিয়ানের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আরব লীগ (League of Arab States)

আরব রাষ্ট্রগুলোর সংহতিমূলক সংগঠন হলো আরব লীগ। ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ এ সংগঠনের সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্যসংখ্যা ছিল ৭টি। কিন্তু বর্তমানে এ সংখ্যা ২২ এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৮ সালে মিসর-ইসরায়েল শান্তি-চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আরব লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। মিসর আরব লীগ ত্যাগ করে এবং এর সদর দপ্তর কায়রো হতে তিউনিসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে মিসর পুনরায় আরব লীগে যোগ দেয় এবং পুনরায় সদর দপ্তর কায়রোতে স্থাপিত হয়। এর বর্তমান মহাসচিব হচ্ছে আর আরাবী। এর সর্বশেষ সম্মেলন হয় লিবিয়ার সার্থে। আরব লীগের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. আরব রাষ্ট্রসমূহের ভৌগোলিক সংহতি রক্ষার জন্য সমন্বিগতভাবে কাজ করা।

২. বিদেশি শক্তির দখল থেকে আরব জনগণ তথা আরব ভূখণ্ডকে মুক্ত করা।

৩. আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ত্বরান্বিত করা।

৪. আরব রাষ্ট্রসমূহের আন্তবিরোধসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবলীগ তার উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এখনো আরব দেশসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে জটিলতা ও মতবিরোধ বিরাজমান রয়েছে।

বিমসটেক (BIMSTEC)

বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দক্ষিণ-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ জুন ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডকে নিয়ে এ সংস্থার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-শ্রীলংকা-থাইল্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন বা বিস্টটেক (BISTEC) । একই বছরের ডিসেম্বরে মায়ানমার এ সংস্থার যোগ দিলে M (এম) যোগ করে নতুন নাম হয় বিমসটেক (BIMSTEC) । এ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রথম দিকে নেপাল এবং ভুটান এ সংস্থায় যোগ দেয়। ফলে বিমসটেকের নাম বার বার পরিবর্তিত হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ৩১ জুলাই, ২০০৪ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের Ministry of

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে জোট ও সংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠাকালীন সাল

১৯৬৭ → আসিয়ান
↓
১৯৬৯ → ওআইসি
↓
১৯৭৩ → কারিকম
↓
১৯৭৫ → ইএসএ, আইডিবি
↓
১৯৭৭ → ইফাদ
↓
১৯৭৯ → সিরডাপ
↓
১৯৮০ → লায়লা
↓
১৯৮১ → জিসিসি
↓
১৯৮২ → অরবিস
↓
১৯৮৫ → সার্ক, জি-৮, প্রিনসিস
↓
১৯৮৯ → এপেক, এ.এফ.আই.সি
↓
১৯৯১ → সিআইএস, ইবিআরডি
↓
১৯৯২ → সিবিএসএ, ইকো, আকটা
↓
১৯৯৩ → নাফটা, সাপটা, সাফটা, কমেসা
↓
১৯৯৪ → কমেসা, আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম
↓
১৯৯৫ → ই.ইউ
↓
১৯৯৭ → বিমসটেক, ডি-৮
↓
১৯৯৯ → এএমিদি
↓
২০০২ → আফ্রিকান ইউনিয়ন, এসিডি
↓
২০০৬ → সেপটা

Foreign Affairs – এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে এ সংস্থার নাম পরিবর্তন না করে নামের অর্থের পরিবর্তন করা হয়। পাঁচটি দেশের আদ্যাক্ষরের বদলে নতুন নাম হবে Bay of Bengal (B) Initiative (I) for Multi (M) Scetoral (S) Technical (T) and Economic (E) Co-operation (C) এতে সংক্ষিপ্ত নাম বিমসটেক (BIMSTEC) অপরিবর্তিতই থাকল। আগে মূলত অর্থনৈতিক বিষয়টির কথা উল্লেখ্য করা হলেও এখন এর প্রেক্ষিত হচ্ছে বহুমুখী। BIMSTEC এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। পারস্পরিক সহযোগিতার চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলো বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য চাষ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ঔষধ, বস্ত্র, চামড়া, কৃষি প্রভৃতি খাতে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ। তাছাড়া সম্প্রতি সম্মেলনে সাতজাতির নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস, HIV/এইডস, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

সি আই এস

CIS-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Commonwealth of Independent States. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১২টি দেশ মিলে সি. আই. এস. গঠন করে। ১৭ আগস্ট, ২০০৯ জর্জিয়া CIS-ত্যাগ করায় বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১১টি দেশ। সদস্য দেশগুলো যথাক্রমে-আর্মেনিয়া, আজারভাইজার, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, মলদোভা, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেন ও উজবেকিস্তান। CIS-এর সদর দপ্তর বেলারুশের রাজধানী মিনস্ক।

উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)

GCC-এর পূর্ণরূপ Gulf Co-operation Council. সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫ মে ১৯৮১। এর সদস্য সংখ্যা ৬। সদস্য দেশগুলো হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত ও ওমান। সদর দপ্তর রিয়াদ, সৌদি আরব। সংস্থার প্রধান মহাসচিব। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো : ১. আরব দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান ঐক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করা, ২. সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, ৩. আন্তঃবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা নিশ্চিত করা, ৪. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, ভৌগোলিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভূমিকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৫. অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতি সংহতি প্রকাশ করা।

আমেরিকান দেশসমূহের সংস্থা (OAS)

আমেরিকা মহাদেশের ৩৫টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা হলো OAS বা 'Organisation of American States' ১৯৪৮ সালের ৩০ এপ্রিল কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় এক আন্ত আমেরিকান সম্মেলনের মাধ্যমে এ সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। এর সদস্য সংখ্যা ৩৫টি। সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি। অন্য উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. আমেরিকা মহাদেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা।

২. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

৩. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা।

৪. বিদেশি আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষতা বা নির্জোট আন্দোলন একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র, যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন প্রধানত 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর দুনিয়ায় বৃহৎ কোনো শক্তিজোট যোগ না দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বব্যাপী এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ হলো এ আন্দোলন। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তারা হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ড. আহমেদ সুকর্ণ এবং মিসরের রাষ্ট্রপতি জামাল আবদেল নাসের। ১৯৬১ সালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয় বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলনে। এ সম্মেলনে ২৫টি রাষ্ট্র যোগ দেয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত-চীন সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য পাঁচটি এ নীতি 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। পঞ্চশীল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পথ আরও ত্বরান্বিত করেছিল।

এ পাঁচটি নীতি হলো :

১. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান;
২. ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা;
৩. অনাগ্রাসন;
৪. অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা;
৫. সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা।

কমনওয়েলথ

জাতিসংঘের পর কমনওয়েলথই বিশ্বের কার্যকরী সংগঠন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন দেশগুলোকে নিয়ে কমনওয়েলথ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। কমনওয়েলথ তার বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সংরক্ষণ করেছে। কমনওয়েলথের পূর্ব নাম ছিল কমনওয়েলথ অব নেশনস্। ৫৪ সদস্য দেশ বিশিষ্ট কমনওয়েলথ বিশ্ব রাজনীতির নানা ওঠাপড়ার মধ্যেও তার অস্তিত্ব ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

কমনওয়েলথের উৎপত্তি সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ে ঘটে নি। ১৭৭৩ সালে আমেরিকা এবং পরে কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই ধীরে ধীরে এর জন্ম হয়। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যেভাবে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে জোটবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, সেখানে কমনওয়েলথের অবস্থান ছিল ভিন্ন। কমনওয়েলথ এক ভিন্ন আঙ্গিকে গড়ে ওঠেছিল। এক সময়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলো, যারা পরবর্তী স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তারাই মধ্য ষাটের দশকে কমনওয়েলথকে সংগঠিত করে। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল উপনিবেশগুলো স্বাধীন হলেও তাদের সাথে একটা সম্পর্ক রক্ষা করা, বিশেষ করে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার ব্যাপারটা ছিল মুখ্য। ১৯৬৫ সালে আজকের কমনওয়েলথ লন্ডনে তার সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ব্রিটেনের অন্তর্গত উপনিবেশগুলোতে যখন স্বাধীনতার চেতনা দানা বাঁধছিল, তখন এ ধরনের একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ব্রিটিশরা। আর এ লক্ষ্যেই ১৯২৬ সালে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়া উপনিবেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বৈদেশিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও সাংবিধানিক সংশোধনী। এ বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে 'ডোমিনিয়ন' নামে পরিচিত একই উপনিবেশসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ধীরে ধীরে লোপ পায়। অতঃপর ১৯৬২ সালে এ উপনিবেশগুলো ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অভিন্ন আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনের সদস্য হিসেবে মূলত কমনওয়েলথের গোড়াপত্তন ঘটায়। বিশেষত ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন 'স্ট্যাচু অব ওয়েস্ট মিনিস্টার'-এ ডোমিনিয়নগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। তবে ১৯৪৫ সালের পরই অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্র কমনওয়েলথে যোগ দেয়। এভাবেই ধীরে ধীরে কমনওয়েলথ একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে।

কমনওয়েলথ-এর নতুন সনদ

১১ মার্চ ২০১৩ কমনওয়েলথ-এর ঐতিহাসিক এক সনদে স্বাক্ষর করেন সংস্থার প্রধান ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। রানি যে সনদে স্বাক্ষর করেন তাতে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ১৬টি সাধারণ বিশ্বাসকে কমনওয়েলথ-এর সমন্বিত মূল্যবোধ বা সংস্থার মৌলিক নীতিমালা হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়। এগুলো হলো-গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা, সব ধরণের বৈষম্য বিলোপ, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, সুশাসন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা ও সমঝোতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরিবেশ রক্ষা এবং চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার ইত্যাদি। এছাড়াও কমনওয়েলথে তরুণ ও সুশীল সমাজের ভূমিকাকে ঐ সনদে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রানি নিজেই তার বক্তব্যে ঐ সনদকে

কার্যকরীভাবে প্রচলন শুরু করে। EU কে ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়া ২০০৭ সালে EU তে যোগদান করে। ১ জুলাই, ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়া ২৮তম সদস্যপদ হিসেবে সর্বশেষ যোগদান করে। এশিয়া ইউরোপের মাঝামাঝি থাকা তুরস্কও EU তে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণের পরিপূর্ণতা যে খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে তা অনেকটা নিশ্চিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো একক জাতিসংঘের রূপ নেওয়ার মানে হলো ইউরোপের সকল পুঁজি, বাণিজ্যিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক শক্তির একটি সুদূর প্রসারি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমন্বয়। এ জাতিসংঘের সকল সদস্য হচ্ছে উন্নত জীবন যাত্রা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রভূত পুঁজির মালিক। বিশ্ব অর্থনীতি যে বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর অঙ্গুলি হেলনে চলে তাদের ব্যবস্থাপনার একটি বড় অংশ আসছে এসব দেশ থেকে।

ইউরোপীয় মুদ্রা 'ইউরো'

১৯৯৩ সালের নভেম্বর থেকে মাসট্রিস্ট চুক্তি বলবৎ হয়। ইউরোপীয় মনিটরি ইউনিয়ন (EMU) ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এর ২য় পর্যায় শুরু করে। এ সময় সদস্য দেশগুলোর কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্নরদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইউরোপীয় মনিটরি ইনস্টিটিউট (EMI) যা পরবর্তীতে ইউরোপীয় কেন্দ্রিয় ব্যাংকে পরিবর্তিত হয়। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ একটি একক ইউরোপীয় মুদ্রার নামের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান এবং এর নামকরণ করেন "ইউরো"। ১৯৯৫ সালের মাদ্রিদ কাউন্সিলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি "ইউরো" চালু করা হবে এবং ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি বাজারে নোট ও মুদ্রা ছাড়া হয়। ইউরোপীয় কেন্দ্রিয় ব্যাংক অবস্থিত ফ্রাংকফুট, জার্মানি।

ইউরো হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশসমূহের একক সরকারি মুদ্রা। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি এ মুদ্রা চালু হয়। ২০০২ সালে জানুয়ারি মাসে ইউরোর নোট চালু হয়। ১৯৯৯ সালে ১১টি দেশে ইউরো চালু হয়। গ্রীস পরে এটিতে যোগ দেয়। বর্তমানে ১৭টি দেশে ইউরো চালু আছে। ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও সুইডেন এখনও ইউরোতে যোগ দেয়নি। সুইডেন এখনও ইউরোতে যোগ দেয় নি। সুইডেনে EURO-তে যোগ না দেয়ার পক্ষে যায়। ডেনমার্ক এর সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয় নি। মূলত ইউরোপ আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার এবং অখণ্ড ইউরোপের গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতেই ইউরো চালু হয়েছে।

আকু (Asian Clearing Union)

বাংলাদেশসহ নয়টি দেশের অলিখিত বাণিজ্য জোট আকু। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজ করা ও পারস্পরিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর জন্য ১৯৭৫ সালে আকু গঠন করা হয়। একে পরোক্ষভাবে একটি বাণিজ্যিক জোট হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। আকুতে মার্কিন ডলারের পাশাপাশি ইউরোর মাধ্যমেও লেনদেন নিষ্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। সদস্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এ লেনদেনের প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করে থাকে। আর এ লেনদেনের হিসাবটি আকুতে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের আকারে সম্পন্ন করা হয়। যারা ঋণ গ্রহণ করে তাদের একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়। গ্রহণকে আমদানি ও ঋণ প্রদানকে রপ্তানির সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়। সদস্য দেশগুলোর প্রত্যেকেই ঋন নেয় আবার ঋণ প্রদানও করে। ঋণ প্রদানের চেয়ে ঋণ গ্রহণ বেশি হলে সুদ দিতে হয়। উল্টোটি হলে সুদ পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির জন্য আকু গঠন করা হলেও বাংলাদেশের লেনদেন হ্রাস অব্যাহত রয়েছে জুন ২০১২ পর্যন্ত। মূলতঃ আকুর অন্যতম বৃহৎ দেশ ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস পাওয়াতেই আকুতে বাংলাদেশের মোট লেনদেন কমেছে। এর কারণ হিসেবে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের নানা ধরণের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সদস্য দেশগুলোকে ইরানের সঙ্গে লেনদেনে নিরুৎসাহিত করেছে। যদিও বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ সরাসরি ইরানের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য করে না। আকুর সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশ, ইরান, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপ। ইরানের রাজধানী তেহরানে আকুর সচিবালয় অবস্থিত।

ASEM

বিশ্বের ৪৬টি দেশের আন্ত আঞ্চলিক জোন এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (Asia – Europe Meeting) এর পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা পাচ্ছে বাংলাদেশ। ৮-৯ নভেম্বর, ২০১২ ভিয়েতনামের লাওসে অনুষ্ঠিতব্য

http://thejobstudy.com Go to Contents

আসেমের নবম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দিবে। শীর্ষ সম্মেলনের আগেই বাংলাদেশ 'গো অব দ্য চেয়ার' হিসেবে আসেমের বৈঠকসহ অন্য অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতে পারবে। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ২০১২ সালের মার্চ মাসে আসেমের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বৈঠকে বাংলাদেশকে জোটের পূর্ণ সদস্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আসেম গঠিত হয়। আসেমে মূলত রাজনৈতিক সংলাপ, নিরাপত্তা ও অর্থনীতি এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আলাপ প্রাধান্য পায়। বর্তমানে এজোটের সদস্য সংখ্যা-৪৬-ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য রাষ্ট্র, আসিয়ানের ১০টি সদস্য রাষ্ট্র, আসিয়ান প্লাস থ্রি (চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া) ভারত, মঙ্গোলিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া এবং নিউজিল্যান্ড

৮ অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক জোট

৭৭ জাতিগোষ্ঠী

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন হলো ৭৭ জাতিগোষ্ঠী। মূলত উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে জেনেভায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি আঙ্কটাড (ANC-TAD) "United Nations Conference on Trade and Development" নামে পরিচিত। এ আঙ্কটাডের মূল বিষয়কে কেন্দ্র করেই বিকাশমান বিশ্বের সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে ৭৭ জাতিগোষ্ঠী হয়। আঙ্কটাডের সব কয়টি সম্মেলনে এ গোষ্ঠী একটি অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রেখে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে থাকে। তবে প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যই এ সংস্থা মূল ভূমিকা পালন করে। এ গোষ্ঠীর মূল সম্মেলনের পূর্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় তিনটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে এ তিন বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমন্বয় করে ৭৭ জাতিগোষ্ঠীর ঘোষণায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সংস্থার কোনো সাংগঠনকি কাঠামো কিংবা সদর দপ্তর নেই। বিশ্বের ১৩২টি উন্নয়নশীল দেশ এ গোষ্ঠীর সদস্য।

G-20

G-20 প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। এটি বিশ্বে ধনী দেশগুলোর সংগঠন। এর সদস্য সংখ্যা-২০টি যথা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া, বৃটেন, তুরস্ক, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন এবং জাপান।

জি-৮ (G-8)

G-8 বা Group of 8 বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের জোট। সংস্থাটি গঠিত হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৭৫। এর পূর্ব নাম G-7 বা ৭ জাতি গোষ্ঠী। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি দেশ। সদস্যগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও রাশিয়া। অষ্টম সদস্য হিসেবে রাশিয়া যোগ দেয় ১৫ মে ১৯৯৮। সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

ডি-৮ (D-8)

ডি-৮ বা Developing-8 হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগঠন। ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডি-৮ এর প্রস্তাবক তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাসুদ আসতামাস। ডি-৮ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর জনগণের শান্তি, সংলাপ, সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নয়ন সাধন। এর সদর দপ্তর ইস্তাম্বুল, তুরস্ক। ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন প্রতি দুই বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। ডি-৮ সদস্যভুক্ত ৮টি দেশ হলো তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া এবং বাংলাদেশ। ৮ জুলাই, ২০১০ নাইজেরিয়ার আবুজায় ডি-৮ সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক, সামাজিক ও ভাষাগত মিল নেই তবে এদের মধ্যে ধর্মীয় সাদৃশ্য ও মূল্যবোধ বিদ্যমান।

উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)

GCC-এর পূর্ণরূপ Gulf Co-operation Council. সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫ মে ১৯৮১। এর সদস্য সংখ্যা ৬। সদস্য দেশগুলো হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত ও ওমান। সদর দপ্তর রিয়াদ, সৌদি আরব। সংস্থার প্রধান মহাসচিব। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ১. আরব দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান ঐক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করা, ২. সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, ৩. আন্তঃবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা নিশ্চিত করা, ৪. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, ভৌগোলিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভূমিকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৫. অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতি সংহতি প্রকাশ করা।

ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (EFTA)

EFTA এর পূর্ণরূপ হলো European Free Trade Association. পূর্ব ইউরোপের একমাত্র অর্থনৈতিক সংস্থা হচ্ছে EFTA। ১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারি এ সংস্থা গঠিত হয় এবং একই সালের ৩ মে হতে কার্যকর হয়। নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, বাইসল্যান্ড ও লিচেনস্টাইন এর সদস্য। EFTA-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সদস্যদেশসমূহের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কাস্টম শুল্ক হ্রাস করা এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে সংখ্যাত্মক বিধিনিষেদ আরোপ করা। ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর শিল্পের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ও ধার্যকৃত শুল্ক রহিত করা সম্ভব হয়। ১৯৭২ সালে এ সংস্থার সদস্যরা EFTA-এর সাথে শিল্প শুল্ক রহিতকরণ চুক্তিতেও যোগদান করে।

ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি

ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা। ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশসমূহ এবং ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ৫টি আফ্রিকান রাষ্ট্র নিয়ে ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে এ সংস্থার জন্ম হয়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ৮টি। সদস্যদেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য ভূমিকা পালন এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া নিজেদের নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইকো (ECO)

Economic Co-operation Organisation বা ECO একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা যা ১৯৬৫ সালে তেহরানের এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ১০। ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, আজারবাইজান, তুর্কেমেনিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান। এর সদর দপ্তর ইরানের রাজধানী তেহরানে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক সংগঠন ওঠার প্রেক্ষাপটে এ সংস্থা গড়ে ওঠেছিল। এর বিস্তৃতি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্বে চীন ও উত্তরে রাশিয়া। এ সংস্থাটিকে অনেক পর্যবেক্ষক একটি ইসলামিক ব্লক হিসেবে গণ্য করে। অর্থণৈতিক বিকাশ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে এখানে। সংস্থাটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা বৃদ্ধি। তা ছাড়া এর সদস্যদেশগুলোর মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সম-আদর্শের কারণে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহমর্মিতাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওপেক (OPEC)

বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংগঠন হলো OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countrices)। ভেনিজুয়েলার উদ্যোগে রাজধানী কারাকাসে ১৯৬০ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর তেল রপ্তানিকারক ৫টি দেশের সমন্বয়ে এ সংস্থা গঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত এবং পদক্ষেপের ভিত্তিতে একে একটি আন্তসরকারি সংস্থা হিসেবে গঠন করা হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তেলনীতির সমন্বয় সাধন, একত্রীকরণ এবং সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার উৎকৃষ্টতম পন্থা নির্ধারণ করাই হচ্ছে, নিজেদের স্বার্থে সদস্য দেশগুলো তেলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা ও অপরিশোধত তেলেরও মূল্য নির্ধারণ করা। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা-১২।

এপেক

এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন বা APEC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সনে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠার সময় এ্যাপেকের সদস্য সংখ্যা ছিল ১২। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ এ। এ্যাপেকের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের এক বিশাল এলাকা গড়ে তোলা। এ্যাপেকের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রায় ২২০ কোটি জনসংখ্যার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতিকে গতিশীল করা এবং কমিউনিটির বন্ধন বৃদ্ধি করা এ্যাপেক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। মূলত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতি গতিশীল রাখার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিকে সহযোগিতা করার ওপর APEC গুরুত্ব প্রদান করে। তাই বিশ্ব অর্থনীতিতে এ্যাপেকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৯ সামরিক জোট

ন্যাটো (NATO)

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জোটবদ্ধ হয়ে আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করে। ফলে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনাকালে সামরিক জোট হিসেবে ন্যাটো গড়ে ওঠে এবং তার কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান বিশ্বরাজনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যাটোর কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সহযোগী দেশগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক জোট বন্ধনের আগে ১৯৪৮ সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পর একটি স্মারক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। সেই সময় এ ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা মাথায় রেখে একত্রিত হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালেই ব্রাসেলসে ইউরোপের আরও তিনটি দেশ সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্রেমবার্গ ভবিষ্যতে সোভিয়েত আক্রমণের আশংকাতেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কূটনৈতিক চালে ৫ টি দেশকেই একই ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ই মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক বিবৃতিতে ইউরোপের সামরিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা বলেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল ইউরোপের সহযোগী দেশগুলো একটি উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিল। এ সংস্থার ১৯ টি সদস্য রাষ্ট্র হলো, কানাডা গ্রীস,গ্রেট ব্রিটেন,তুরস্ক,ফ্রান্স,নেদারল্যান্ডস,ফেডারেল, রিপাবলিক অব জার্মানি, লুক্রেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল,বেলজিয়াম,ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি ও স্পেন, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র। চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে ২১-২২ নভেম্বর, ২০০২ অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে নিম্নোক্ত ৭টি দেশ কে ন্যাটোর সদস্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আনজুস (ANZUS)

ANZUS এর পূর্ণরূপ Australia, New Zealand and United States. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ১৯৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বর এ সংস্থা গঠিত হয়। এটি একটি সামরিক সংস্থা। সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করা এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া যৌথ সামরিক মহড়া, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও এ সংস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। যুক্তরাজ্য এ সংস্থার সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত। ANZUS-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বয় কমিটি রয়েছে। এ কমিটি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার যেকোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যেকোনো সময় বৈঠক আহবান করতে পারে।

১০ আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বিশ্ব ব্যাংক

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ঋণ বা আর্থিক সহায়তা একান্ত অপরিহার্য। দেশের

নাগরিক সুবিধা ও অবকাঠামোগত আর্থিক সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমূহ দূর করতে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো বা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। এ প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই বিশ্বের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিকভাবে অর্থ প্রবাহের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঐক্যমত স্থাপন করেন। মূলত এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হবে অধিক পুঁজির এলাকা থেকে কম পুঁজির এলাকায় পুজির প্রবাহ বা স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তেজোপড়া অর্থনীতি ও অবকাঠামোর পুর্নগঠনই ছিল এর প্রাথমিক লক্ষ্য। বিশ্বের খ্যাতনামা অর্থনীতিবীদ এবং বিশ্ব ব্যাংক ও IMF এর প্রতিষ্ঠাতা জন মেইনার্ড কেইনসের নেতৃত্বে World Bank এবং IMF গড়ে তোলার জন্য আলোচনা শুরু হয়। ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটন উডসএ ৪৪টি দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এবং আর্থিক কাঠামোগত ধরে রাখার জন্য ২টি প্রতিষ্ঠান। সামষ্টিকভাবে ব্রিটন উড্স ইনস্টিটিউশন নামে এ দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচিত-এ দুটি প্রতিষ্ঠান হলো :

১. International Monetary Fund বা IMF

২. International Bank for Reconstruction and Development বা IBRD বা সংক্ষেপে World Bank/বিশ্বব্যাংক বলা হয়।

মাত্র ৪৪টি দেশ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮।

ব্যাংকের উদ্দেশ্য

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সাহায্য করা।

২. পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করা। এ জন্য ব্যাংক, সদস্য অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশগুলোর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম গতি বৃদ্ধিতে এবং কোনো দেশে যাতে বৈদেশিক দেনা পাওনার হিসাবে অসামঞ্জস্যতা না ঘটে তার ব্যবস্থা করা।

- মূলধন : প্রত্যেক সদস্য দেশ নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা প্রদান করে।
- সদর দফতর : ওয়াশিংটন ডি.সি. (যুক্তরাষ্ট্র)।

আইএমএফ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যামশায়ারের ব্রেটন উডস শহরে ১-২২ জুলাই, ১৯৪৪ সনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে ২৯টি রাষ্ট্র আইএমএফ- এর প্রথম চার্টারে স্বাক্ষর করে। তবে আইএমএফ- এর আর্থিক কাজ কর্ম শুরু হয় ১ মার্চ, ১৯৪৭ সন থেকে।

আইএমএফ (International Monetory Fund) কোনো দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন ব্যাংক নয় কিংবা কোনো বিশ্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকও নয়, এটা একটি বহুদেশীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। আইএমএফ (IMF)- এর মূল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। বিনিময় হার স্থিতিশীল ও সুসংহত করা এবং মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়নের প্রবণতা রোধ করা। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বহুজাতিভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সহায়তা প্রদান এবং বিশ্ব বাণিজ্য প্রসারের পথে অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা। সদস্য দেশসমূহের সাময়িক দেন-দেন ভারসাম্য (balance of payment) ঘাটতি মোকাবেলায় আস্থা প্রদানের জন্য সম্পদ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা; যাতে তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকে। আইএমএফ সদস্য দেশগুলোর ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সার্বক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করে তা উত্তরণের জন্য শলা-পরামর্শ দিয়ে থাকে; যাতে করে তারা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাবলীল প্রবাহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিনিময় হার সমন্বয় করার আয়োজন করে।

১৯৪৪ সনে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনে আইএমএফ (IMF) এর ৩টি প্রধান কার্যাবলি স্থির করা হয়:

১. আইএমএফ এর সদস্যদের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ও বাণিজ্যিক দায় পরিশোধের জন্য চলতি

হিসাবের লেনদেন বিধি-নিষেধ আরোপ সংক্রান্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব;

২. প্রথমোক্ত শর্ত পালন করতে গিয়ে সদস্য দেশগুলো যদি কোনো আর্থিক অসুবিধায় পতিত হয় তবে তাকে প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগানের ব্যবস্থা করা;

৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থ-লেনদেনের ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ প্রদান করা।

আইএমএফ- এর তহবিলের উৎস : আইএমএফ এর মূল তহবিলের উৎস হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর চাঁদা। প্রত্যেক সদস্যকে তার কোটার সমপরিমাণ চাঁদার হার বাড়াতে হয়। প্রয়োজনে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়াও অন্য যে কোনো বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উৎস থেকে ধার নিতে পারে। তবে এ প্রাইভেট উৎস থেকে যদি কোনো একটি দেশের মুদ্রা ধার করে, সে ক্ষেত্রে সংশি-ষ্ট দেশের অনুমতি নিয়েই তা করে থাকে। এ পদ্ধতিকে বলে। এর আওতার বড় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হলো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও জাপান।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর ম্যানিলায় এশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর বৈঠক বসে। ইকাফ যা বর্তমানে-এর সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রিবর্গ এতে যোগ দেন। এ সম্মেলনের সূত্র ধরে ১৯৬৫ সালে ওয়াশিংটন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আর একটি বৈঠক বসে। বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৫ সালে এশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার সম্মেলনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩১টি দেশ এ ব্যাংক স্থাপনে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে। ১৯৬৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাংকের কাজ শুরু হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সভাপতির মেয়াদকাল ৫ বছর। এর সদর দপ্তর ম্যানিলায় (ফিলিপাইন)।

বিশ্ব অর্থ সংস্থা

জাতিসংঘের একটি বিশেষজ্ঞমণ্ডলী ১৯৯৮-র ২৩ জুলাই বিশ্বের অর্থ বাজার শাসনে রাখার লক্ষ্যে নতুন একটি নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনের কর্তৃপক্ষ 'বিশ্ব অর্থ সংস্থা' গঠনের সুপারিশ করে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এ মন্ডলী গঠিত হয়।

'বিশ্ব অর্থ সংস্থা' (ওয়ার্ল্ড ফাইনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন) হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) -এর অনুরূপ। বাণিজ্য প্রবাহের বদলে এ সংস্থা অর্থ প্রবাহের নিয়ম ও বৈধতা নিয়ে কাজ করবে। বিশেষজ্ঞমণ্ডলী অর্থখাত ব্যবস্থাপনা ও মূলধন প্রবাহের আন্তর্জাতিক মান ও বিধি রচনা করবে এবং বিধি প্রয়োগে 'বিশ্ব অর্থ সংস্থা' শাসন করবে। বিশ্ব অর্থ সংস্থা (WTO) হিসাব রক্ষণ ও অর্থ প্রদানের আন্তর্জাতিক বিধি নির্ধারণ করবে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করবে, শেয়ার, সিকিউরিটিজ, বীমা ও অর্থ প্রতিষ্ঠানের জোট চক্র ইত্যাদির প্রতি নজরদারি করবে।

ব্রিকস (BRICS)

বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুসংহত রেখে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত, রাষ্ট্রে পরিণত হতে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন ২০০১ সালে গড়ে তোলে ব্রিক। বর্তমানে সংগঠনটির সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দেওয়াতে এর সদস্য সংখ্যা-৫ এবং নতুন নাম BRICS.২০১২ সালে জোটটির চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে যেখানে বিশ্বব্যবস্থায় সদস্য দেশগুলোর অংশিদারিত্ব বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হয়। অর্থনৈতিক জোট হিসেবে ব্রিকস এর সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। গত তিন বছর ধরে বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ৫০ শতাংশের বেশি আসছে ব্রিকস থেকে। তাই আইএমএফ পূর্বাভাষ দিয়েছে ২০১২ সালের বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ৫৬ শতাংশ আসবে ব্রিকসের দেশগুলো থেকে। বিশেষজ্ঞরা এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ববাজার মূলধনের প্রায় ৫০ শতাংশের মালিক হবে ব্রিকস। ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বরাজনীতি ও আধিপত্য বিস্তারে নেতৃত্ব দানে সহায়তা করবে। ব্রিকসের অবস্থান বিশ্বরাজনীতিতে যেভাবে সুদৃঢ় হচ্ছে তাতে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের একক কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে। এর ফলে বিশ্ববাজারে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দখলদারিত্ব কমে যাবে, ডলার ও ইউরোর আধিপত্য হ্রাস পাবে অপরপক্ষে, কৃষি প্রযুক্তি ও শিল্পে ব্রিকসের আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে। ব্রিকস

সদস্যভুক্ত ৫টি রাষ্ট্রের সাথেই বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে। যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে পারবে। ব্রিকস বিশ্ববাজারে একটি বড় অংশ দখল করে আছে। বাংলাদেশ এ বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানী বাণিজ্যে অনেক অগ্রসর হতে পারবে। এতে বাংলাদেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে এবং এ দেশ থেকে শ্রমশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বাংলাদেশের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে অনেকাংশে।

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক

১৮ ডিসেম্বর (Islamic Development Bank) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে ১০ আগস্ট ১৯৭৪ ওআইসি-র অর্থ মন্ত্রীরা সৌদি আরবের জেদ্দায় দ্বিতীয়বারের মত বৈঠকের জন্য একত্রিত হলে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক গঠনের বিষয়ে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৫ এর ২৩ এপ্রিল চুক্তিটি কার্যকর হয়। তারপর ১৯৭৫ সনের জুলাই মাসে প্রথমবারের মত পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সৌদি আরবের রিয়াদে। তবে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক তার আর্থিক কার্যক্রম শুরু করে অক্টোবর ১৯৭৫।

ই বি আর ডি

ইবিআরডি (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯১ সালের ১৫ এপ্রিল। এ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বাজার অর্থনীতি চালু করা এবং বেসরকারি শিল্প উদ্যোগ বৃদ্ধিকরণ। এর মোট সদস্য সংখ্যা ৬২টি। ইউরোপীয় কমিউনিটি ও ইউরোপীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং সদস্য রাষ্ট্র ৬০টি। ইবিআরডির সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত।

কার্যক্রম : ব্যাংকটি যেসব দেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে তন্মধ্যে ২২টি দেশে ব্যাংকের ৩৪টি আবাসিক (Resident Office) অফিস রয়েছে। ইবিআরডি মূলত যে ২৬টি দেশকে তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে সে দেশগুলো হলো : ১। আলবেনিয়া, ২। আর্মেনিয়া, ৩। আজারবাইজান, ৪। বেলারুশ, ৫। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ৬। বুলগেরিয়া, ৭। ক্রোয়েশিয়া, ৮। চেক রিপাবলিক, ৯। এস্তোনিয়া, ১০। মেসিডোনিয়া, ১১। জর্জিয়া, ১২। হাঙ্গেরী, ১৩। কাজাকিস্তান, ১৪। কিরগিজিস্তান, ১৫। লাটভিয়া, ১৬। মলদোভা, ১৭। পোলান্ড, ১৮। রুমানিয়া, ১৯। রাশিয়া, ২০। শ্লোভাক রিপাবলিক, ২১। শ্লোভেনিয়া, ২২। তাজিকিস্তান, ২৩। তুর্কমেনিস্তান, ২৪। ইউক্রেন, ২৫। উজবেকিস্তান ও ২৬। লিথুনিয়া।

ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB)

ECB এর পূর্ণরূপ হলো European Central Bank. নতুন মুদ্রা ইউরো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তি অনুসারে এ ব্যাংকের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে। ECB সদস্যদেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে সাথে নিয়ে European System of Control Bank (ESCB) গঠন করে। পরিচালনা পর্ষদ ও নির্বাহী বোর্ড দ্বারা ESCB পরিচালিত হয়। নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয় একজন প্রেসিডেন্ট, একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চারজন সদস্য নিয়ে। সদস্যরা তাদের আর্থিক/ব্যাংকিং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইউরোপীয় পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও পরিচালনা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে নির্বাচিত হবেন। নির্বাহী পরিষদের কার্য মেয়াদ ৮ বছর। অন্যদিকে পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সদস্যদেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরদের নিয়ে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এ পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ-১০৭) ECB স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ নির্বাহী পরিষদকে পদচ্যুত করতে পারবে না। চুক্তিতে আরো বলা হয়েছে, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই হবে ECB-এর প্রাথমিক কাজ (অনু-১০৭)। ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তিতে বর্ণিত ইউরোপীয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. একক বাজারের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ, সুদের হার নির্ধারণ করা;
২. ব্যাংক নোট ও কয়েন ইস্যু করা;
৩. মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;

৪. পরিচালনা পরিষদের কাজ হলো মুদ্রানীতি তৈরি করা;
৫. মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতিমালা অনুসারে মুক্ত প্রতিযোগিতা বজায় রাখার মাধ্যমে সম্পদের অধিকতর দক্ষ বণ্টনে সহায়তা করা।
৬. মূল্য স্থিতিশীলতাকে কোনোরূপ প্রভাবিত না করে ইউরোপীয় কমিউনিটির সাধারণ আর্থিক নীতিমালাকে সমর্থন জানানো।

১১ আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা

রেডক্রস (Red Cross)

বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা রেডক্রস। প্রতিষ্ঠিত হয় ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ সালে। সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হেনরি ডুনান্ট এর প্রতিষ্ঠাতা। সংস্থাটি ৩টি নামে পরিচিত। মুসলিম বিশ্বে রেড ক্রিসেন্টের প্রতীক অর্ধাকৃতি চাঁদ, ইসরাইলে এর প্রতীক রেড ক্রিস্টাল আর বাকি বিশ্বে রেডক্রস প্রতীক লাল ক্রস। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। সুইজারল্যান্ডের ২৫ জন নাগরিক নিয়ে এর আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত। যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধাহত, বাস্তুহারা, রুগ্ন ও যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষকে উদ্ধার করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এছাড়া ব্লাড ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণসহ পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দান করে থাকে এ সংস্থাটি। এ সেবা সংস্থাটি ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।

অরবিস ইন্টারন্যাশনাল

'উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল' নামে খ্যাত আন্তর্জাতিক চক্ষুরোগ নিবারণকারী সংস্থা অরবিস ইন্টারন্যাশনাল। উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করে দেশে দেশে চক্ষুরোগীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের কারণে বিশ্বব্যাপী 'অরবিস' উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল হিসেবেই পরিচিত। ১৯৮২ সালে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১২৭টি দেশে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতালের আগমনের মধ্য দিয়ে এ দেশে অরবিসের কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর ১৯৯২, ১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে অরবিসের উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল এ দেশে অবতরণ করে বেশ কিছু চক্ষুরোগীকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়। বাংলাদেশে সংস্থার কার্যক্রম জোরদার এবং অর্থবহ করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে ঢাকায় খোলা হয় অরবিসের 'কান্ট্রি অফিস'। ২০০২ সালে চার সপ্তাহের জন্য অরবিসের উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবতরণ করে।

টুইসডে গ্রুপ

টুইসডে গ্রুপ হলো বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও উন্নয়ন অংশীদারগণের একটি ইনফরমাল ক্লাব। এ সদস্যসংখ্যা ১৪, যার মধ্যে ঢাকাস্থ দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও রয়েছে। সদস্যদেশগুলো হলো: যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ও ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রদূতগণ ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী। ২০০৪ সালে সর্বপ্রথম এ গ্রুপটি গঠন করা হয়। গঠনের পর থেকে এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে এমনকি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তাদের এ মনোভাব কূটনৈতিক শিষ্টাচার সম্পর্কিত ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বাংলাদেশ সরকার তাই তাদের এ উদ্যোগ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল বলে মনে করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

রোটারি ক্লাব

রোটারি ক্লাবের পূর্ণ নাম 'রোটারি ইন্টারন্যাশনাল'। ১৯০৫ সালে এ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম পল.পি.হ্যারিস। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও ধনী ব্যবসায়ীদের পরস্পরিক সহযোগিতা ও স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রোটারি ক্লাবের শাখা রয়েছে।

রোটারি ক্লাবের একটি সেক্রেটারিয়েট এবং নির্দিষ্টসংখ্যক জনবল নিয়ে এটি পরিচালিত হয়। এর প্রধান হলেন একজন সেক্রেটারি জেনারেল।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International)

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহের অন্তর্গত সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৮ মে ১৯৬১। এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ আইনবিদ পিটার বেনেনসন। সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বিরোধী যে কোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। এছাড়া সারা বিশ্বে যেসব নারী ও শিশু নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হচ্ছে সে ব্যাপারেও এ সংস্থা সোচ্চার। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বর্তমান মহাসচিব ভারতের সলিল শেঠি। তিনি বাংলাদেশের আইরিন খানের স্থলাভিষিক্ত হন। সংস্থাটি ১৯৭৭সালে নোবেল শান্তি পুরুস্কার এবং ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কার লাভ করে।

মানবাধিকার কমিশন

'মানবাধিকার' কথাটির মূল্যায়ন সুদূর প্রসারী। এর মধ্যে জড়িত রয়েছে মানব জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত, তার জীবনযাত্রার গতি-প্রকৃতি, তার মৌলিক চাহিদা, সামাজিক পরিবেশগত আকাঙ্খা, দেশীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তার ভূমিকা, আন্তর্জাতিক পরিধিতে তার বিস্তৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগত বাসনা, সামাজিক অবস্থা দেশীয় শাসন ব্যবস্থা ও তার সঠিক মূল্যায়ন সংরক্ষণ বিষয়ক মানব মনের গভীর অনুভূতিকে যেমন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য নয়, তেমনি মানুষের সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাও বাস্তবে কঠিন ও জটিল বিষয়। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণে ১৯৬১ সালে লন্ডনে অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গঠিত হয়। অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সারা পৃথিবীতে যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ কারণ উদঘাটনের জন্য 'মানবাধিকার কমিশন' গঠন করে। মানবাধিকার কমিশন বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তার কারণও নিরসনে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অভিহিত করে।

১২ আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা

ইন্টারপোল (Interpol)

ইন্টারপোল (Interpol)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে International Criminal Police Organization. International Police Commission হিসেবে ১৯২৩ সালে এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ১৯৫৬ সালে এর নামকরণ করা হয় ইন্টারপোল। এটি পুলিশের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থা গঠিত হয়। এর মাধ্যমে যে কোনো দেশ থেকে খুনীদের গ্রেফতার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে প্রত্যার্পন করা যায়। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৭। বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালে ইন্টারপোলের সদস্য হয়। ইন্টারপোলের বার্ষিক বাজেট ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর সদর দফতর ফ্রান্সের লিও (Leon) শহরে অবস্থিত।

এফবিআই (FBI)

এফ বি আই যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। এটি ১৯০৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিউডোর রুজভেল্ট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে এ সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের দস্যু ও পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধীদের দমন করা। বর্তমানে এ সংস্থাটিতে প্রায় ৬ হাজার স্পেশাল এবং ৪ হাজার অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। শৃঙ্খলাপূর্ণ এ বিশাল বাহিনীর প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী যুদ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার ও অপরাধের কলাকৌশল পরীক্ষা আইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকারীদের নাৎসী গোয়েন্দাদের রহস্য উদঘাটন এবং পরবর্তীকালে সাবেক সোভিয়েত গোয়েন্দাদের নির্মূল করার ব্যাপারে এ গোয়েন্দা সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আই.এস.আই

পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের পুরো নাম ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ আইবির কর্মচ্যুত পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নিয়ে আইবি পুনর্গঠিত হয়। জানা

যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আইএসআই বা ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভুট্টোর সে আশা পূরণ হয়নি। পরে ক্রমান্বয়ে আইএসবি আন্তর্জাতিক মানের গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। এ সংস্থার প্রধান কার্য এলাকা ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে এ সংস্থার তৎপরতা আছে বলে জানা যায়। আসামের বিদ্রোহী গ্রুপ 'উলফার' সঙ্গে আইএসআইর যোগাযোগ আছে বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে আফগান, তালেবান এবং বাংলাদেশের মৌলবাদী বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)

১৯৪৭ সালের ২৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি' বা সিআইএ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা গুপ্তচর-বিভাগ। সিআইএ'র পত্তন হয়েছিল মূলত ব্রিটিশদের দৌলতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকার কোনো কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর সংস্থা ছিল না। ১৯৪২ সালে ব্রিটেনের চাপে পড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রঙ্কলিন রুজভেল্ট ওএসএস অর্থাৎ 'অফিস অব দা স্ট্রাটেজিক সার্ভিস' গড়ে তোলেন দেশের গোয়েন্দাদের কাজে সংহতি ও সমন্বয় আনার উদ্দেশ্যে। এটি পরিচালনার ভার ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত যোদ্ধা ও প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম ডোনোভান-এর ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ওএসএস'কে সরকারিভাবে ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু চাকরিতে বহাল থাকেন এর অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এদের নিয়েই প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের উদ্যোগে রিয়ার এডমিরাল সিডনি সৌয়ার্স-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ। এদের কাজ ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে গুপ্ত খবর একত্র করে ব্যাখ্যা করা। ১৯৪৭ সালে সারা পৃথিবীতে শীতল যুদ্ধ হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত সংঘের অধীনে চলে যায়। আমেরিকাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন সৃষ্টি করে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হয়। 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি' করা হয়। এ নতুন সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে গোয়েন্দাগিরি করা এবং মূল্যবান গুপ্ত সংবাদ একত্র করে তার বিশ্লেষণ করা। এর প্রথম নির্দেশক ছিলেন এডমিরাল রোসকো হিলেন কোয়েটার। এ সংস্থায় যারা কর্মরত তাদের ভাষায় এর নাম 'দ্য কোম্পানি'। এর সদর দপ্তর অবস্থিত ভার্জিনিয়ার ল্যাংগলে শহরে। দ্বিতীয় সদর দপ্তরও ভার্জিনিয়াতেই, ম্যাকলিন অঞ্চলে। এদের বেশির ভাগই নিয়মিত কাজের জন্য প্রকাশ্যে নিযুক্ত। এরা ঘটনা বা খবরাখবরের বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করেন। গোপন কাজে নিয়োজিত গোয়েন্দা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছু জানতে পারে না। এদের চাকরি প্লানস ডিভিশন বা পরিকল্পনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এরাই পরিচালনা করে আমেরিকান দূতাবাসগুলোর সিআইএ দপ্তর, যার সাংকেতিক নাম 'স্টেশন'।

১৩ আন্তজাতিক, আঞ্চলিক চুক্তি ও সনদ

টিকফা (TICFA)

TICFA পূর্ণরূপ হলো Trade and Invesment Co-Operation Framework Agreement. যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের সাথে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে ২০০২ সালে বাংলাদেশের সাথে 'ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (টিফা)' করার আগ্রহ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম চুক্তির প্রস্তাব পাঠায়। উভয় দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয় ২০০৩ সালে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করায় ২০০৫ সালের মাঝামাঝি টিফার খসড়া কিছুটা সংশোধিত হওয়ার পরও খসড়ার কয়েকটি ধারা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। পরে ৭টি দফা, ১৯টি প্রস্তাবনাসহ টিফা চুক্তির খসড়া বাংলাদেশকে দেওয়া হয়। টিফা চুক্তি নিয়ে সমালোচনা হওয়ায় Co-Operation যুক্ত করে TICFA করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় বসার মাত্র দুই মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৭ সালের মার্চে তৃতীয়বারের মতো টিকফার ফাইল সচল হলেও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আলোচনার পর অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি TICFA স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। ১৭ জুন, ২০১৩ প্রস্তাবিত এ চুক্তির খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। এখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সময় ঠিক করে এ চুক্তি সই করা হবে। এ TICFA চুক্তির মূল বিষয় চারটি। যেমন-

১. নিরাপত্তা

২. পারস্পরিক বিনিয়োগ সুরক্ষা
৩. মেধাস্বত্ব অধিকার
৪. শ্রম হস্তান্তর নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর না করার নীতি নিয়ে এগুচ্ছিল। এমন সময় USA বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা বাতিল করবে বলে ঘোষণা করে। এরপর বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডান মজিনা জানিয়ে দেন যে, TICFA চুক্তি স্বাক্ষর করলে বাংলাদেশকে GSP সুবিধা দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে GSP সুবিধা স্থগিত এবং মনে করা হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এ চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হচ্ছে।

১. নিরাপত্তা : বাংলাদেশে আমেরিকার বিনিয়োগের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনী আসতে পারে।
২. স্বল্পোন্নত দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : যদি স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে দ্বিপক্ষিয় চুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করা যায় তবে আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক ফোরাম আমেরিকার তার আধিপত্যবাদী বাণিজ্য নীতি বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। এর পূর্বে পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, ইরানসহ ৩০টির বেশি দেশের সাথে TICFA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৩. মেধাস্বত্ব : টিকফা চুক্তির অন্যতম দিক হচ্ছে মেধাস্বত্ব। TICFA চুক্তির ১৫ নং প্রস্তাবে বলা আছে, বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার এবং অন্যান্য প্রচলিত মেধাস্বত্ব আইনের যথাযথ এবং কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
এ আইনটি উন্নত দেশগুলোর মালিকানাধীন বহুজাতিক কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। মেধাস্বত্ব বা TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) এর মাধ্যমে তারা চায় অবশিষ্ট বিশ্ব প্রযুক্তির উৎপাদনের জন্য তাদের ওপর নির্ভরশীল রাখতে। এর অর্থ হলো যে যা উৎপাদন করবেন এটি তার মেধাস্বত্ব বলে পরিগনিত হবে। এ স্বত্ব অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। যদি করতে হয় তাহলে মেধাস্বত্বের অধিকারীকে ফি দিতে হবে। মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে আইন গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ আইন কে বলা হয় Patent Law।

চুক্তিটির সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাধাসমূহ দূরীকরণ। যেমন-
১. বৃহত্তর বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যাপক রপ্তানিমুখী আয়। ২. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি। ৪. বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ।
৫. দু'দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে আন্তঃচুক্তি উৎসাহিতকরণ।

বাংলাদেশের সাথে এ চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রও বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমঝোতায় উন্নীত হতে পারলেও, বিশেষজ্ঞদের অভিমতে সমস্যাটি হলো-বাংলাদেশ প্রধানত চার রকম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এগুলো হলো :

১. এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হলে ডব্লিউটিও'র মেধাস্বত্বের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে রেয়াতি সুবিধা বাংলাদেশ লাভ করে তা থেকে বঞ্চিত হবে।
২. পরিবেশ দূষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত দরকষাকষির সুযোগ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে।
৩. শ্রমমান সংক্রান্ত চুক্তির কারণে রপ্তানি শিল্প হুমকির মুখে পড়বে।
৪. বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

লিসবন চুক্তি

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন সংস্কার চুক্তি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে ১৮-১৯ অক্টোবর ২০০৭ সংস্থাটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পর্তুগালের লিসবনে। ইতালি ও পোল্যান্ড এ চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও পরবর্তীতে তারা কিছু শর্তসাপেক্ষে পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ আনুষ্ঠানিকভাবে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় কাউন্সিলে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'লিবসন চুক্তি' নামে পরিচিত এ চুক্তির প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ সদস্য অনুমোদন দিয়েছে। ২০০৮ সালের মধ্যে সকল দেশকে এ চুক্তি অনুমোদনের সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি এ চুক্তি কার্যকর হয়। এ চুক্তিটি ইউরোপিয়ান সংবিধানের স্থলাভিষিক্ত হবে।

চুক্তির উল্লেখ্যযোগ্য দিক

- কাউন্সিল অফ মিনিস্টারস (ইইউ গভর্নমেন্টস) পুনর্গঠিত
- পার্লামেন্টকে আরো বেশি ক্ষমতা দান;
- নতুন অধিকার ও পলিসি;
- মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ইইউ চার্টার;
- নতুন কমন পলিসি;

- তুলনামূলক ছোট ইউরোপিয়ান কমিশন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ ও ভেটো ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে ও
- আরো প্রতিনিধিত্বমূলক ভোট।

অস্ত্র বাণিজ্য রোধে জাতিসংঘ চুক্তি

বিশ্বে প্রতিবছর ৭ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বাণিজ্য হয়। অস্ত্র ব্যবহার করে সংঘটিত সহিংসেতায় বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন মানুষের মৃত্যু হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রচলিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যের রাশ টেনে ধরতে জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলো একটি আন্তর্জাতিক অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২-২৭ জুলাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি খসড়া সম্মেলন হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন এ ব্যাপারে সময় চাইলে সম্মেলনটি ভেস্তে যায়। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ নতুন করে সম্মেলন আহবান করে, যার নাম দেওয়া হয় জাতিসংঘ অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক সম্মেলন (UN Conference on the Arms Trade Treaty)। ২০১৩ সালের ১৮-২৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ইরান, উত্তর কোরিয়া ও সিরিয়ার বিরোধীতার কারণে সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তিটির অনুমোদন হওয়া আটকে গেলে তা পাঠানো হয় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের কাছে। এরপর বান কি মুন তা ভোটাভুটির জন্য সাধারণ পরিষদে পাঠান।

বিশ্বে প্রচলিত অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ২ এপ্রিল ২০১২ ঐতিহাসিক চুক্তি অনুমোদন করে ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। এ চুক্তির আওতায় বিশ্বে বছরে সাত হাজার কোটি ডলারের অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। চুক্তির পক্ষে ১৫৪ এবং বিপক্ষে পড়ে তিন (ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়া) ভোট। ভোটদানে বিরত থাকে ২৩ সদস্য।

সাধারণ পরিষদে গৃহীত : ২ এপ্রিল ২০১৩।
স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত : ৩ জুন ২০১৩।
চুক্তিটি আইনে পরিণত হওয়ার জন্য অন্তত ৫০টি দেশের অনুসমর্থন লাগবে।

সিডো

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). সুদীর্ঘকাল ধরে নারীবাদী আন্দোলনকারী ব্যক্তিত্ব ও সংস্থাসমূহের নিরলস সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলশ্বরূপ ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর নারীর মানবাধিকারের এ মাইলফলক দলিলটি কার্যকর হয়।

"নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ" শীর্ষক এ চুক্তির প্রস্তাবনাতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই পরিপূর্ণ এবং সুষম উন্নয়নের জন্য সকল ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে নারী পুরুষের অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। দেশ গঠনে নারীর যোগ্যতা ও দক্ষতার এ স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে প্রস্তাবনার শুরুতেই নারীকে মানুষ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, নারীর মানবাধিকার রক্ষার্থে জাতিসংঘ সনদ, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয় এ চুক্তিতে। এতে মোট ৩০টি ধারা সন্নিবেশিত আছে। প্রথম ১৬টি ধারা হল নারীর মর্যাদা এবং আইন সংক্রান্ত, ধারা ১৭তে চুক্তির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধায়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ধারা ১ থেকে ১৭-এর ওপরে চোখ ফেললেই নারীর অধিকারের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠায় একে নারীর মানবাধিকারের দলিল বলা হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সংক্রান্ত সনদ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর গৃহীত প্রতিবন্ধী অধিকার সংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষর শেষে বর্তমানে অনুস্বাক্ষর (র‍্যাটিফিকেশন) প্রক্রিয়া চলছে। ৩০ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত ৮১টি দেশ সনদে স্বাক্ষর করে। আরও অন্তত ১৯টি দেশ অনুস্বাক্ষর করলে এটি কার্যকর হবে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হবে। প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে অনুস্বাক্ষর করেছে জ্যামাইকা। বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ৯ মে ২০০৭।

সাপটা ও সাফটা

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান এবং আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সাপটা স্বাক্ষরিত হয়। SAPTA-এর পূর্ণরূপ হল SAARC Preferential Trading Arrangement স্বাক্ষরিত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৯৩ (ঢাকা, বাংলাদেশ) এবং কার্যকর ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ : সাপটাভুক্ত দেশ ৮টি। যথা-বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান।

সাফটা (SAFTA) হল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার একটি সমঝোতা চুক্তি। SAFTA-র পূর্ণরূপ হচ্ছে South Asian Free Trade Area. এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৬ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্কের ১২ তম সম্মেলনে। SAFTA কার্যকর হয় ১ জুলাই ২০০৬ থেকে। এ চুক্তির আওতায় সদস্য দেশসমূহ যে সকল সুবিধা ভোগ করবে-

ক. চুক্তি বাস্তবায়নের ৩ বছরের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা জোটের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার-০-৫% হ্রাস করবে।

খ. অপরদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোও ১০ বছরের মধ্যে শুল্ক হার ০-৫% হ্রাস করবে।

গ. স্বল্পোন্নত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত বড় আকারের সেনসেটিভ লিস্ট প্রণয়ন করে অভ্যন্তরীণ বাজার ও শিল্প সংরক্ষণ করার সুযোগ পাবে।

ঘ. অপরদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলো রপ্তানি স্বার্থসংশ্লিষ্ট পণ্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সেনসেটিভ লিস্টভুক্ত না করার জন্য ডেরোগেশন চাইতে পারবে।

ঙ. সাফটার চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহে টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রদান করবে।

নাফটা (NAFTA)

NAFTA এর পূর্ণরূপ হলো-North American Free Trade Agreement. উত্তর আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা) হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার মধ্যে সম্পাদিত একটি বাণিজ্য চুক্তি। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট কার্লোস সেলিনাস ডি গোরটারি প্রথম ১৯৯১ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে দুদেশের মধ্যে বিবাদমান বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীকালে বিল ক্লিনটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। দীর্ঘ ১৪ মাস আলোচনার পর ১৯৯২ সালের ১২ আগস্ট দেশ ৩টির মধ্যে নাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর চুক্তিটি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে অনুমোদিত হয়। চুক্তির ফলে কৃষি ও উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর মার্কিন এবং মেক্সিকোর শুল্ক ও কোটা বিলোপ করা হবে। কতকগুলো ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছর এবং কতকগুলো ক্ষেত্রে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে শুল্ক ও কোটা বিলোপ সাধন করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এ চুক্তি করায় সর্বাধিক উপকৃত হবে মেক্সিকো। মেক্সিকোর সস্তা শ্রম মজুরির জন্য মার্কিন শিল্পপতিরা সেখানে পুঁজি খাটাতে উৎসাহিত হবে এবং এর ফলে বহু বেকার মেক্সিকান চাকরি লাভ করবে। আশা করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঋণদান ও সাহায্য সংস্থাগুলো মেক্সিকোর যে পুঞ্জীভূত দেনার দায় বহন করছে, বাণিজ্যের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারলে মেক্সিকো সে দায় থেকে অবমুক্তির যোগ্যতা অর্জন করবে। এ চুক্তি ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে।

আফটা (AFTA)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সংস্থা আসিয়ানের সদস্য দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল হচ্ছে AFTA. AFTA এর পূর্ণরূপ হলো ASEAN Free Trade Area. ১৯৯২ সালের ২৮ জানুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীরা এ অবাধ বাণিজ্য এলাকা গঠনের বিষয়ে একমত হন। তারা এক সাথে এক হাজারের বেশি পণ্যের ওপর থেকে ট্যারিফ হ্রাস করে একটি অভিন্ন ট্যারিফ হার নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ তাদের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৫% হারে অভিন্ন ট্যারিফ হার নির্ধারণ করে। ১৯৯৫ সালের ২৮-২৯ এপ্রিল থাইল্যান্ডের ফুকেত শহরে আসিয়ানভুক্ত ৬টি দেশের অর্থমন্ত্রীদের দু'দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

লাফটা (LAFTA)

LAFTA-এর পূর্ণরূপ Latin Americal Free Trade Association. স্বাক্ষরিত ও কার্যকর ১৯৬০ সালে। লাফটাভুক্ত দেশ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা ও কিউবা।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি

১৯৭২ এর ১৯ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিরপেক্ষতা, শান্তি পূর্ণ সহ অবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এ

চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্ত। বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করার অঙ্গীকারও এ চুক্তিতে রয়েছে। ১৮ মার্চ ১৯৯৭ এ চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হয়।

চুক্তির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১. দুই দেশের সাধারণ স্বার্থে উভয় দেশ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলবে এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর কমপক্ষে একবার করে আলোচনায় বসবে।

২. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর অববাহিকা উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে।

৩. শান্তির ক্ষেত্রে আণবিক শক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করবে। দুই দেশই সাহিত্য শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধূলা স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে।

৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন করবে।

৫. এ দেশ দুটির যে কোনো একটির নিরাপত্তা কিংবা সংহতি বিপন্ন হলে, নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উভয় দেশ যথাসত্বর আলোচনায় বসবে।

৬. একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না।

৭. উভয় রাষ্ট্রই তাদের বিরুদ্ধাচারী কোনো সামরিক জোটে যোগদান করবে না।

৮. দুই দেশই তাদের যেকোন এক পক্ষের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় বা সামরিক ক্ষতি হয় তেমন কোনো কাজে তাদের নিজ নিজ এলাকাকে ব্যবহৃত হতে দিবে না এবং উভয় পক্ষই একে অপরকে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে।

৯. যদি কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র হামলা চালায় তা হলে এ দুই পক্ষের উভয়েই তৃতীয় পক্ষকে কোনোরূপ সাহায্য দান করবে না।

সিমলা চুক্তি

এটা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। ১৯৭২ সালে ৩রা জুলাই পাক-ভারত যুদ্ধ সমাপ্তির (১৯৭১) পর ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো:

- ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই উভয় দেশের জাতীয় সংহতি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দিবে, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী উভয়ই পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করবেনা।
- উভয়েই তাদের নিজ নিজ সৈন্যদের স্ব স্ব দেশের আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে সরিয়ে নিবে এবং ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এর যুদ্ধ-বিরতির ফলে জম্মু ও কাশ্মিরে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ রেখাকে মেনে নিবে।
- দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলবার জন্য ধাপে ধাপে ডাক, তার স্থল ও আকাশ পথে উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে বৈরী প্রচার বন্ধ করবে।
- দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহ দেওয়া হবে না। উভয়ের সমস্যাদি আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে দুই দেশে প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হবেন।
- এ চুক্তি কোনো দেশই একতরফাভাবে বদলাতে পারবে না।

এ চুক্তির পরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা থাকলেও সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দু'দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়।

ম্যাসট্রিসট চুক্তি (Maastricht Treaty)

১৯৯২ সালের ৯-১১ ডিসেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১২টি দেশের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিচট শহরে একক ইউরোপ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এটি 'ম্যাসট্রিচট চুক্তি নামে অভিহিত। আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল ভিত্তি হল এ চুক্তি। এ চুক্তিটি ২১ মে ১৯৯৩-এ এ অনুমোদিত হয়। এ চুক্তির প্রধান দিকগুলো নিম্নরূপ :

- ১৯৯২ সালের মধ্যে চুক্তিভুক্ত দেশগুলো একক মুদ্রা "ইউরো" (EURO) প্রচলন করবে। এজন্য তাদের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে। ব্যাংকটি স্থাপন করা হবে জার্মানীতে।
- সদস্য দেশগুলো একক পররাষ্ট্র চালু করবে।
- সদস্য দেশগুলোর একক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।

http://thejobstudy.com Go to Contents

- আন্তর্জাতিক মঞ্চে সদস্য দেশগুলো ঐকমতের ভিত্তিতে বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।
- ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের ক্ষমতা সামান্য বৃদ্ধি করা হবে।
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দরিদ্রতম ৪টি দেশ, যথা-অস্ট্রিয়ান্ড, গ্রীস, স্পেন ও পর্তুগালকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাহায্য প্রদান করা হবে।

ম্যাগনাকার্টা

ম্যাগনাকার্টা ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ মহান সনদ। ইংল্যান্ডের রাজা জন সেখানকার ভূ-স্বামী ব্যারনদের দাবিতে ১৫ জুন ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে-ওই সনদে স্বাক্ষর করেন। এটা উগ্র ধরনের কোনো দলিল ছিলনা। এটি ছিল রাজ্যের সরকারের স্বীকৃত ও মৌলিক কতকগুলো নীতি, যা দিয়ে রাজা ও ব্যারনদের সেগুলো প্রতিপালনের চুক্তিতে আবদ্ধ করা যায়। এর প্রধান বিষয়গুলো ছিল:

- বিচারকের সামনে বিচার ব্যতিরেকে কোনোও ব্যক্তিকে শাস্তিদান করা যাবে না।
- পুরানো আমলের স্বাধীনতা বজায় থাকবেও
- ভূ-স্বামীগণ তাদের অধীন জমির মালিকদের কাছ থেকে স্বীকৃত বিষয়াদির বহির্ভূত কোনোও কিছু সালিশি সংস্থাকে না জানিয়ে দাবি করতে পারবে না।

পরবর্তীকালে ম্যাগনাকার্টা ইংল্যান্ডের স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকারের আইনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বব্যাপী ম্যাগনাকার্টা এখনো এরূপ মর্যাদা পেয়ে থাকে।

(ATT)

বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্যে স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত এক দশকের মধ্যে প্রথম বড় ধরণের চুক্তি বিবেচনা করা হচ্ছে ATT-কে। চাইলেই অস্ত্র বেচা-কেনা করা যায়-প্রচলিত এ ধারণার ইতি টানবে এ চুক্তি। অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ (ATT) নামের এ চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ৩ জুন ২০১৩। উন্মুক্ত করার প্রথম দিনই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ৬৭টি দেশ। চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ আর্জেন্টিনা। চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরের জন্য অন্তত ৫০টি দেশের অনুমোদন লাগবে। যেসব দেশ এ চুক্তি অনুমোদন করবে, অস্ত্র বেচাকেনা সংক্রান্ত যেকোন চুক্তির আগে তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, এসব অস্ত্র আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের কাজে এবং সন্ত্রাস বা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে না। এর জন্য দেশগুলোকে অস্ত্র বিনিময় সংক্রান্ত নিজস্ব আইনও সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। তবে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ অস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা পরিবর্তন করতে হবেনা।

বিশ্বে প্রচলিত অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ২ এপ্রিল ২০১৩ ঐতিহাসিক চুক্তি অনুমোদন করে ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। এ চুক্তির আওতায় বিশ্বে বছরে সাত হাজার কোটি ডলারের অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। চুক্তির পক্ষে ১৫৪ এবং বিপক্ষে পড়ে তিন (ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়া) ভোট। ভোটদানে বিরাত থাকে ২৩ সদস্য।

ট্রিপস

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর আওতায় মেধাস্বত্বধারীর অধিকার সংরক্ষণের চুক্তি ট্রেড রিলেটেড আসপেক্ট অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস-ট্রিপস (Trade Related Aspects of intellectual Property Rights-TRIPS)। ১৫ এপ্রিল ১৯৯৪ ট্রিপস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার মেধাস্বত্ব যেমন ট্রেডমার্ক, কপিরাইট এবং পেটেন্ট ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ে মেধাস্বত্বধারীর অধিকার সংরক্ষণ প্রদানে একটি শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, যাতে এগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। ১৯৯৫ থেকে কার্যকর এ চুক্তির ৬৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এ চুক্তির বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য ১০ বছর সময় দেওয়া হয় এবং ২০০৫ সালে ক্রান্তিকালীন সেই সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরো সাড়ে সাত বছরের জন্য তা বাড়ানো হয়, যা ২০১৩ সালের ৩০ জুন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে হাইতি এবং নেপাল আবারো সময় বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। এ চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা কৃষি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল পেটেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ১১ জুন ২০১৩ ট্রিপসের মেয়াদ আরো ৮ বছর বাড়ানো হয়, যার মেয়াদ শেষ হবে ১ জুলাই, ২০২১। ট্রিপস চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ কপিরাইট মেধাস্বত্বের শর্ত বাস্তবায়নে আরো আট বছরের সময় পেল।

মার্কিন প্রিজম কর্মসূচি

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের গোপনে তথ্য সংগ্রহ করার কর্মসূচির নাম PRISM (Planning tool for Resource Intergration, Synchronization & Management)। এটি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ডাটা টুল, যা যুক্তরাষ্ট্রের সার্ভারগুলোতে থাকা সব ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন ও টেলিফোনে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করছে। সম্প্রতি তাদের বড় একটি অভিযানের খবর ফাঁস করে তোলপাড় তুলে দিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট ও গার্ডিয়ান পত্রিকা। ৬ জুন, ২০১৩ বিবিসিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধারণা করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৭ সালের পর থেকেই প্রিজম নামের এ গোপনে আড়িপাতা কর্মসূচি চালু হয়। টুইন টাওয়ারে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই গোপনে আড়িপাতার এ কর্মসূচি চালু করেছিলেন। জর্জ বুশের নেয়া সেই কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আরও শক্তিশালী করেন। ওয়াশিংটন পোস্টের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রিজম কর্মসূচির অংশ হিসেবে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্ভারে প্রবেশ করে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (NSA) সেগুলো হল- মাইক্রোসফট, ইয়াহু, গুগল, ফেসবুক, পালটক, এওএল, স্কাইপ, ইউটিউব ও অ্যাপল। এগুলোর পাশাপাশি ড্রপবক্সের মতো নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোও নজরদারির তালিকায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার ইন্টারনেট নজরদারির কর্মসূচির গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া ব্যক্তি হলেন সিআইএ'র সাবেক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড স্নোডেন।

নতুন আসিয়ান সনদ

আসিয়ান সব সময়ই ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো নিজেদের একক একটি কমিউনিটি গঠনের চেষ্টা চালিয়ে থাকে। এরই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ২০০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এ সময় ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় তারা একটি নতুন সনদ গ্রহণ করে। এর ফলে আসিয়ান একটি শিথিল সংস্থা থেকে রাজনৈতিক নিরাপত্তা সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতার স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল একটি কমিউনিটিতে পরিণত হয়। আগে আসিয়ান শুধু অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেও নতুন সনদে তারা গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সুশাসন, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ সনদ প্রথম গ্রহণ করা হয় ২০০৭ সালে আসিয়ানের ত্রয়োদশ সম্মেলনে। এ সনদে ৫৩টি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মদিনা সনদ

মদিনা সনদ বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম লিখিত চুক্তি ও সংবিধান। ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাসূলাহ (সঃ) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময় সেখানে তিন শ্রেণির মানুষ ছিল, যথা: পৌত্তলিক, ইহুদি ও নবদীক্ষিত মুসলমান। এদের মধ্যে ছিল গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ। তাই সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও সুশাসন সুনিশ্চিত করতে মহানবী (সঃ) ৫৩টি ধারা সম্বলিত একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধানই মদিনা সনদ নামে পরিচিত। মদিনা সনদের প্রথম ১০ ধারায় বলা হয় মুহাজিরগণ, বনু আউফ, বনু সাইদা, বনু হারিস, বনু আউস পূর্বাহ্নে রক্তপণ আদায় করবে এবং মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মনীতি এবং ন্যায়বিচার ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দিদের মুক্ত করবে। ১১ থেকে ২০ ধারায় মুমিনদের পারস্পরি সম্পর্ক সম্পর্কিত আইন বিধৃত হয়। ২১ থেকে ২৬ ধারায় কোনো মুমিনকে হত্যাকারীর শাস্তি, কোনো মুমিন কোনো অন্যাকারীকে আশ্রয় দিলে তার শাস্তি, কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তার মীমাংসা পদ্ধতি, ইহুদিগণ কর্তৃক যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহ ও ইহুদিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ক আইন সন্নিবেশিত হয়। ২৭ থেকে ৩৬ ধারায় সন্নিবেশিত হয় বিভিন্ন ইহুদি গোত্রের স্বরূপ সম্পর্কিত বিধান। পরবর্তী ধারাসমূহ রাসূলুল-াহ (সঃ)- এর অনুমতি ব্যতীত ইহুদিদের যুদ্ধে না যাওয়া, কোনো নাগরিকের ক্ষতির প্রতিশোধ, নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহ, এ সনদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে তার ব্যাপারে ব্যবস্থা, নারীর আশ্রয়, আল্লাহই যে রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ (সঃ)-ই যে আল্লাহর রাসূল প্রভৃতি ঘোষণাসম্বলিত বিধিসমূহ সন্নিবেশিত হয়।

১৪ আলোচিত গণমাধ্যম

আল জাজিরা

সাম্প্রতিকালে বিবিসি, সিএনএন প্রভৃতি চ্যানেলকে ছাপিয়ে যে স্যাটেলাইট চ্যানেলটি বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে, তার নাম 'আল জাজিরা'। আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার ছবি সরাসরি

সম্প্রচার করতে পারা একমাত্র এ টিভি চ্যানেলটির যাত্রা শুরু ১৯৯৬ সালে। 'আল জাজিরা' শব্দটির বাংলা অর্থ উপদ্বীপ। আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবানের সঙ্গে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর যে দ্বন্দ্ব, সে সম্পর্কে সবচেয়ে আকর্ষণীয় রিপোর্ট প্রচার করছে কাতারভিত্তিক এ 'আল জাজিরা' স্যাটেলাইট চ্যানেলটি। এ টিভি চ্যানেলটি একমাত্র বিদেশি সম্প্রচার মাধ্যম যেটিকে আফগানিস্তানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ৮ অক্টোবর, ২০০১ আফগানিস্তানের বিমান হামলা শুরু হলে একমাত্র এ টিভি চ্যানেলটি ওসামা বিন লাদেনের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রসার করতে সক্ষম হয়। সিএনএন ও বিবিসির মতো চ্যানেলকে আফগানিস্তানে ও ইরাকে যে হামলা হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ ছবি পরিবেশনের জন্য আল জাজিরার ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ধারণ করা দৃশ্য সারা দুনিয়ায় পরিবেশন করছে এপি, এএফপি, রয়টার্স প্রমুখ বার্তা সংস্থা। আল জাজিরা ইতোমধ্যে অসংখ্য এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট প্রচার করতে সক্ষম হয়। কাতারের আমির পরিবারের অর্থ সাহায্য ছাড়াও বিজ্ঞাপন এবং দর্শকদের ট্যাক্সের টাকায় চ্যানেলটির সব ব্যয় নির্বাহ হয়। সম্প্রতি তারা যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য স্কাই টিভির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চ্যানেলটির জনপ্রিয়তা প্রথমত সংবাদের কারণে, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি যৌন বিষয়ে টক শো প্রচারের জন্য। সব মিলিয়ে পেশাদার সাংবাদিকতার আচরণের কারণেই আল জাজিরা টিভি চ্যানেলটি আলোচনায় এসেছে।

আল হুররা

মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে মার্কিন কংগ্রেসের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত আল হুররা টিভি চ্যানেলকে মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন সৌদি আরবের একজন বিচারক। রিয়াদের ইসলামি আদালতের বিচারক শেখ ইব্রাহীম এ ফতোয়া দেন। উল্লেখ্য যে কাতার ভিত্তিক আল জাজিরা এবং দুবাই ভিত্তিক আল আরাবিয়া টিভি চ্যানেলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ভাবধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল হুররা চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বিবিসি

বিবিসি লন্ডন ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম। এর পূর্ণরূপ হল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। পূর্বে এর নাম ছিল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। এটি পাবলিক কোম্পানিতে পরিণত হয় ১৯২৩ সালে। বিবিসি প্রথম দিকে কেবল সন্ধ্যার দিকে অল্প সময়ের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করত। বর্তমানে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বিবিসি প্রথম বহির্দেশীয় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৮ সালে। উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে প্রথম হিন্দি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে ১১ মে, ১৯৪০ সালে। বিবিসিতে বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৯৪১ সালের ১১ অক্টোবর বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের লিখিত একটি বার্তালিপি সম্প্রচারের মাধ্যমে। বর্তমানে ইংরেজি সহ মোট ৩৬টি ভাষায় বিবিসি অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এর সদর দপ্তর লন্ডনের WC2B-এর 'বুশ হাউস'-এর।

ভয়েজ অব আমেরিকা

ভয়েস অব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালে। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ইউএস-এর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এজেন্সির অর্ন্তভুক্ত ছিল। ১৯৮৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১০৯টি ট্রান্সমিটার স্থাপন করে। ভয়েস অব আমেরিকা ৩৮টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে। সপ্তাহে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ৪২০ ঘন্টা (২১১ ঘন্টা ইংরেজি, ৯৮ ঘন্টা রুশ ৬৩ ঘন্টা চিনা ভাষায়) ও ৩৮ ঘন্টা অন্যান্য ভাষায়।

সিএনএন

সিএনএন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি সংবাদ চ্যানেল। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জুন, ১৯৮০। এর প্রতিষ্ঠাতা টেড টার্নার। CNN-এর পূর্ণরূপ হল Cable News Network. সিএনএন এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এর প্রথম সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়। এ টেলিভিশন চ্যানেলটির মালিকানা বেসরকারি। এটি ২৪ ঘন্টাই সংবাদ প্রচার করে। সিএনএন যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯০টি দেশে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ চ্যানেলটির বিদেশে সম্প্রচারের প্রস্তাবক কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো। সিএনএন প্রথম বিদেশে সম্প্রচার করে শুরু ১৯৮৫ সালে। বাংলাদেশে প্রথম সিএনএন-এর অনুষ্ঠান সম্প্রসার শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

রয়টার্স

রয়টার্স লন্ডন ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম। এর নামকরণ করা হল পল জুলিয়াস রয়টার্সের নামানুসারে (জার্মানি)। এটি যাত্রা শুরু করে ১৮৪৫ সালে। রয়টার্স-এর প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। পরবর্তীতে কার্যক্রম স্থান স্থানান্তরিত করা হয় জার্মানিতে। বর্তমানে এর সদর দপ্তর লন্ডন, যুক্তরাজ্যে। প্রথমে এর কাজের ধরন ছিল ফরাসি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদ পত্রে প্রেরণ করা। টেলিগ্রাফ লাইন চালুর পূর্ব পর্যন্ত রয়টার্স সংবাদ আদান-প্রদান করতো পায়রার মধ্যমে। বর্তমানে ২০০টি দেশের কয়েক হাজার সংবাদপত্রে রয়টার্স সংবাদ সরবরাহ করে।

আল জাজিরা ইন্টারন্যাশনাল

১৫ নভেম্বর ২০০৬ এ টিভি চ্যানেল তার দোহা ষ্টুডিও থেকে 'আল-জাজিরা ইন্টারন্যাশনাল' নামে ২৪ ঘন্টার ইংরেজি ভাষার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। আল জাজিরা ভবিষ্যতে কুয়ালালামপুরের বুরিয়াস, দোহা, লন্ডন এবং ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ২৪ ঘন্টার সম্প্রচার শুরু করবে। ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটি ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করছে যার মধ্যে সরাসরি প্রোগ্রাম ১২ ঘন্টা। নতুন এ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে প্রথম আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে স্যার ডেভিড ফ্রস্টের উপস্থাপনায় সাক্ষাত প্রদান করেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। খ্যাতিমান সাংবাদিক ফ্রস্ট চলতি ঘটনাবলীর ওপর যে অনুষ্ঠান আল জাজিরায় উপস্থাপন করেন তার নাম দেওয়া হয়েছে।

১৫ আলোচিত গেরিলা সংগঠন

ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (PLO)

ইসরাইলের দখলদারিত্ব থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গঠিত সংগঠন হল পিএলও বা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন। এর অবিসংবাদিত নেতা হলেন ইয়াসির আরাফাত।

১৯৬৪ সালে মিশরে প্রব্যত গেরিলা কমান্ডার ইয়াসির আরাফাত স্বদেশভূমি উদ্ধারের লক্ষ্যে এ সংগঠন গড়ে তোলে। প্রথমে বৈরুতে, পরে তিউনিশিয়ায় এবং বর্তমানে ফিলিস্তিনে এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮ সালে ইসরাইল মিসরসহ সমন্বিত আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভ করে জেরুজালেমসহ প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়। অতঃপর ১৯৫৬, ৬৭ এবং ১৯৭৩ সালের সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধেই ইসরাইল আরবদেরকে পরাজিত করে। পিএলও ইসরাইলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে এবং ১৯৮৮ সালে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। ইয়াসির আরাফাত এ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। পরবর্তীতে জাতিসংঘ পিএলও-কে স্বীকৃতি দেয় ও ইসরাইলকে অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দেবার জন্য ২৪২ নং প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর উভয়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এখনো সেখানে পূর্ণাঙ্গ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং বিদ্বেষ, বিশৃংখলা ও হানাহানি প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে।

হামাস

হামাস শব্দের অর্থ 'সজীবতা এবং উদ্দীপনা'। ১৯৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর শেখ আহমেদ ইয়াসিন যিনি শেখ ইয়াসিন নামে পরিচিত তিনি ফিলিস্তিনে হামাস প্রতিষ্ঠা করেন। হামাস একটি ফিলিস্তিনি জঙ্গী সংগঠন। ইসরাইলের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকারী একটি সংগঠনের নাম হামাস। হামাস প্রতিষ্ঠার পরই শেখ ইয়াসিন হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচিত হন। তিনি নির্বাচিত হন। তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরে হামাসকে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রামে যুক্ত করেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে না গিয়ে সশস্ত্র উপায়ে দাবি আদায়ের কৌশল বেছে নেওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী হামাস একটি জঙ্গী এবং সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। হামাস ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীকার আদায়ে এবং ইসরাইলি ধ্বংসযজ্ঞের জবাব দিতে ইসরাইলের স্বার্থ এবং স্থাপনার ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ইসরাইলের লোক ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ইসরাইলের দৃষ্টিতে হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন আবার ফিলিস্তিনি জনগণের দৃষ্টিতে হামাস একটি স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সংগঠন।

ফাতাহ

'ফাতাহ' শব্দের অর্থ 'বিজয়'। ইসরাইলি নিপীড়নে সর্বহারা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনি যুবক এবং ছাত্রদের নিয়ে ১৯৫৯ সালের ১০ অক্টোবর 'ফাতাহ' সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন ইয়াসির আরাফাত, সালাহ খালাফ এবং খলিল আল ওয়াজির। তখন ফাতাহ একটি সাময়িকী প্রকাশ করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে আরাফাত বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য কুয়েত ত্যাগ করে জর্দান চলে আসেন। ১৯৬৫ সালের তিনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে 'ফাতাহ' আন্দোলন জোরদার করে তোলেন। সংগঠনটির সদর দপ্তর তখন জর্ডানে হওয়ায় ইসরাইল সেখানে বিমান হামলা চালায়। ফাতাহ-র বর্তমান প্রধান হলেন মাহমুদ আব্বাস।

হিজবুল্লাহ

'হিজবুল্লাহ' শব্দের অর্থ আল্লাহর দল। এটি লেবাননে শিয়া মুসলিমদের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে ইরানের আর্থিক সহায়তায় লেবাননে হিজবুল্লাহ পথচলা শুরু।

হিজবুল্লাহর স্বপ্ন ছিল লেবাননকে ইরানের মতো একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। হিজবুল্লাহর গেরিলারা ১৯৮৩ সালে বৈরুতে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ২৪১ জন মার্কিন মেরিন সেনাকে হত্যা করে। বর্তমানে লেবাননের পার্লামেন্টে হিজবুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি রয়েছে। তারা দেশটিতে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে জনগণের বিপুল সমর্থন আদায় করেছে।

হিজবুল্লাহর বর্তমান মহাসচিব শেখ হাসান নাসরুল্লাহ। ১৯৯২ সালে তৎকালীন মহাসচিব আব্বাস আল মুসাবী ইসরাইলি বাহিনীর হাতে নিহত হলে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। হিজবুল্লাহ পরিচালিত টেলিভিশন কেন্দ্রের নাম আল মানার টেলিভিশন কেন্দ্র।

আল কায়েদা

বহুল আলোচিত, নন্দিত-নিন্দিত ওসামা বিন লাদেনের (সম্প্রতি নিহত) সংগঠনের নাম 'আল কায়েদা'। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই আল কায়েদার সদস্য আছে বলে ধারণা করা হয়। বসনিয়া, চেচনিয়া, তাজিকিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও কসোভোতে মুসলিম যোদ্ধাদের সমর্থন, সাহায্য ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আল কায়েদার সদস্যরা। আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ সংগঠনটির জন্মের পটভূমি। ১৯৮৮ সালের দিকে আল কায়েদা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করা এবং ইসলামি দেশসমূহ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিম নামধারী শাসকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যে সরকার শরীয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। সৌদি ধনকুবের লাদেন তাঁর সম্পত্তির একটা বিরাট অংশ ব্যয় করতেন আল কায়েদার সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা আল কায়েদার জন্য সাহায্য পাঠিয়ে থাকে। এ সকল সাহায্য সবই আসে ব্যক্তি পর্যায় থেকে। ইসলামের বাস্তবপন্থী মুসলিমরা আল কায়েদার জন্য আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য যুগিয়ে থাকে।

তালেবান

১৯৯৪ সালের আগস্টে 'তালেবান' জঙ্গি গোষ্ঠীর আফগানিস্তানে আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'তালেবান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় 'ছাত্র'। কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সি একদল গোঁড়া, ধর্মভীরু, ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বাসী মাদ্রাসা ফেরত ছাত্র নিজেদের বিপ্লবী ধর্মযোদ্ধা হিসেবে প্রতিপন্ন করে। সে সেনাদল কেবল সত্যকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকে অর্থাৎ সত্যান্বেষণ ফৌজ বা নামেই গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে তারা বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। গাল ভর্তি দাঁড়ি, মাথায় কালো পাগড়ি, আলখাল্লা পোশাকে হাতে সব সময়ই কোরান ধরা ধর্মীয় ভাবাবেগ সম্পন্ন ছাত্রদের একজোট করতে মুখ্য ভূমিকা নেন ৩২ বছর বয়সি মোল্লা মহম্মদ ওমর। দক্ষিণাঞ্চলে কান্দাহার প্রদেশ থেকেই ১৯৯৪ সালে তালেবানদের উত্থান ঘটে। অস্ত্রখানের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে তালেবানরা আফগানিস্তানের ৩২টি প্রদেশের মধ্যে দশটিই নিজেদের দখলে আনে। সদর দফতর কান্দার থেকে কাবুলে নিজেদের বুনিয়াদ শক্ত করে ৩২টি প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যে ২০টিতেই নিজেদের অবস্থা মজবুত করেছিল।

খেমাররুজ

কম্বোডিয়ার চীনপন্থি কমিউনিস্ট সংগঠনের নাম 'খেমাররুজ'। এক সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খেমাররুজ বাহিনী জয়লাভ করে। আবার ভিয়েতনাম বাহিনী আগ্রাসন চালালে খেমাররুজরা

তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করে। খেমাররুজরা ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কম্বোডিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময়ে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দেশ তথা জনগণকে শাসন করেছে। খেমাররুজরা কম্বোডিয়ার 'প্রতিরোধ বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। খেমাররুজ নেতা সমাসম পরিবার পরিজনসহ নিহত হলে খেমাররুজ নেতা পলপটকে এজন্য দায়ী করা হয় এবং খেমাররুজ দল ভেঙ্গে গিয়ে তার একটি অংশ সরকারের সাথে হাত মিলায়। ৯৮-র তাদের নেতা পলপট হৃদরোগে মারা যান। বর্তমানে খেমাররুজদের শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে এসেছে।

উলফা

আসাম উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার আগে আসামের আয়তন ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার ৫৯০ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে আয়তন ৭৮ হাজার ৪৩৮ বর্গকিলোমিটার। লোক সংখ্যা ২ কোটি ২৩ লাখ। এ রাজ্যের রাজধানীর নাম দিসপুর। আসামের অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে ১৯৬০ সালে। এ বছর বিদেশি বিতাড়নের শ্লোগানের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে 'অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' বিদেশি বিতাড়নের শ্লোগানে পুনরায় আসমীয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। অতঃপর ১৯৭৯ সালে ৭ এপ্রিল আসামীরা তাদের নববর্ষের দিনে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম (উলফা) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এরপর থেকে অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ও ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম যুগপৎভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রাখে পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এর মাধ্যমে আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন স্বাধীনতা আন্দোলন ছেড়ে ভারতীয় শাসন মেনে নেয়।

১৯৮৫ সালের নির্বাচনে আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত গণপরিষদ (AMC) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তারা আসাম চুক্তির মাধ্যমে ভারতের অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে আসামের অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করে নেয়। এ পর্যায়ে উলফা 'IVk'-এর সরকারকে বিশ্বাসঘাতক ও ভারতীয় দালাল আখ্যায়িত করে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। তারা অস্ত্র সংগ্রহ ও সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। ফলে ভারতের পুতুল সরকার বলে পরিচিত 'IVk'র নেতা-সমর্থকরা উলফাদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। অবশেষে ভারত সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে। পাঁচ মাসব্যাপী এ অপারেশন চালিয়ে ভারত উলফাদের দমাতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে আসাম কংগ্রেস সরকার 'অপারেশন রাইনো' নামে নতুন সেনা অভিযান চালায়। বর্তমানে উলফা গেরিলারা তাদের অবস্থান আরো শক্ত করেছে এবং সুযোগ বুঝে সশস্ত্র আঘাত হানছে। বহুবিধ দমননীতি ও কৌশল প্রয়োগ করেও ভারত সরকার উলফাদের দমাতে পারে নি। ১৯৯৫ সালে উলফার উদ্যোগে আসামের ১২টি জাতির সমন্বয়ে সিকিউরিটি ফোর্স গঠিত হয়। বর্তমানে উলফাদের আন্দোলন আরো সহিংস রূপ লাভ করেছে।

এলটিটিই

বিশ্বের যেসব দুর্ধর্ষ গেরিলা সংগঠন বর্তমানে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা দাবি করে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল শ্রীলংকার এলটিটিই তাদের অন্যতম। LTTE-এর পুরো নাম 'Liberation Tiger of Tamil Eelam'। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে শ্রীলংকা স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকেই তামিলদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে এবং সেই প্রেক্ষাপট থেকেই শুরু হয় তামিল বিদ্রোহ। যে কারণে তামিলরা ক্ষিপ্ত ছিল :

- ১৯৪৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।
- শ্রীলংকার সরকার তামিলদের প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মত ব্যবহার করে, ফলে তারা জ্বলে ওঠে।
- ১৯৭২ সালে শ্রীলংকাকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং
- সিংহলী ভাষাকে ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করা হয়।

১৯৭৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে তামিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট তাদের নাম পরিবর্তন করে ইউনাইটেড লিবারেশন নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ১৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮টিতে জয়ী হয়ে বৃহত্তম বিরোধী দলে পরিণত হয়। ১৯৭৫ সালেই তামিলরা পৃথক স্বাধীন রাজ্যের দাবি উত্থাপিত করে। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জে আর জয়বর্ধন তামিলদের দাবি ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেও পরবর্তীতে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয় এবং তামিলদের আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে। এলটিটিই প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ মাত্র ১৬ বছর বয়সে থেকে গেরিলা সংগঠন গড়ে ১৯৭৫ সাল থেকে সংগঠন প্রধান হিসেবে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে শ্রীলংকার সামরিক বাহিনী

তামিলদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন ১৮ মে প্রভাকরণকে হত্যার মধ্য দিয়ে তামিল বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। ফলে এলটিটির ২৬ বছরের বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট

ভারত নিয়ন্ত্রিত একটি অঙ্গরাজ্যের বিপ্লবী সংগঠনের নাম জম্মু-কাশ্মির লিবারেশন ফ্রন্ট। ভারত সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, শোষণ, নির্যাতন আর মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিশ্ব রাজনীতির আসরে নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে এ সংগঠন। ১৯৯৮ সালে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে কাশ্মীর কোনো দেশের সঙ্গে থাকবে তার একটি গণভোটের কথা থাকলেও পরবর্তীতে ভারত সে চুক্তি থেকে সরে আসে এবং ১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের ১ নং ধারা মোতাবেক কাশ্মিরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে একীভূত করা হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় বিদ্রোহ এবং সর্বশেষ-JKLF এর আবির্ভাব।

যে কারণে জম্মু কাশ্মির লিবারেশন ফ্রন্ট ব্যর্থ হচ্ছেঃ

- যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত সে রাষ্ট্রের চেয়ে সামরিক দিক থেকে অধিক শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্রের সমর্থন পায়নি।
- JKLF-এর একটি অংশ এবং কাশ্মিরের হিন্দুরা ভারতের সঙ্গেই থাকতে আগ্রহী।
- ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাশ্মিরের একটি অংশ স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী। অর্থাৎ কাশ্মীরীরা রাজনৈতিক ত্রিধারায় বিভক্ত।
- কাশ্মির সমস্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নীরবতা স্বাধীন কাশ্মির গঠনের প্রধান অন্তরায়।
- ক্ষমতা হারানো বা জনসমর্থন কমে যাওয়ার ভয়ে পাকিস্তান বা ভারত কেউই কাশ্মিরের ব্যাপারে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিচ্ছে না।

১৬ আন্তর্জাতিক সীমারেখা,গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী, খাল, দ্বীপপুঞ্জ

সপ্তদশ অক্ষরেখা (17th Parallel)

সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। ভিয়েতনামে দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল উত্তর ভিয়েতনামে। সমগ্র ভিয়েতনামের দখল গ্রহণের জন্য দুই ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বন্দ চলে আসছিল। এ অবস্থায় এ ভিয়েতনামের মাঝখানে এ অক্ষরেখা দিয়ে সীমান্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সমগ্র যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিন ভিয়েতনাম সরকারের পতন ঘটে এবং সমগ্র ভিয়েতনামে বামপন্থী সরকার গঠিত হয়।

সপ্তদশ অক্ষরেখা

সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখাকে বলা হয় সপ্তদশ অক্ষরেখা। ১৯৫৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ডানপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল এবং উত্তর ভিয়েতনামে গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট বামপন্থী সরকার। ১৯৫৩ সালে সমগ্র ভিয়েতনাম দখল করার জন্য শুরু হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এ অবস্থায় দুই ভিয়েতনামকে বিভক্ত করার জন্য নির্ধারণ করা হয় সীমান্তরেখা, যা সপ্তদশ অক্ষরেখা নামে পরিচিত। কিন্তু পরবর্তীতে যুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত হলে ১৯৭৩ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ডানপন্থী সরকারের পতন ঘটে এবং সমগ্র ভিয়েতনামে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সীমারেখাটি আর নেই।

৩৮তম অক্ষরেখা

এটা উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়ার মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোরিয়া একক রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হলে সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনী কোরিয়া দখল করে। উত্তর কোরিয়ার বিশাল অংশ দখল করে সোভিয়েত রেড আর্মি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অংশ দখল করে মার্কিন সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়া ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দুই পরাশক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অংশে সরকার গঠন করতে উদ্যোগ নেয়। এ অবস্থায় কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে

দুই দুই পরাশক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোরিয়াকে ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর সমান্তরাল করে বিভক্ত করা হয়। ১৯৫০ সালে এ বিভক্তি রেখা অতিক্রম করাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বর্তমানে এ অক্ষরেখার মাধ্যমে বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

ম্যাকমোহন লাইন

ভারতের ১১২৬.৫৪ কিলোমিটার বা ৭০০ মাইলব্যাপী অরুণাচল প্রদেশ এবং তিব্বতের সুবন সিঁড়ি, সিয়াং ও লোহিত সীমান্তজুড়ে অবস্থিত ম্যাকমোহন লাইন। ১৯১৪ সালে সিমলায় ব্রিটিশ সরকার এবং তিব্বত ও চীনের সরকারের মধ্যে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেষে তাদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার আওতায় হিমালয়ের সর্বোচ্চ অংশ বরাবর সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। আলোচনায় ব্রিটিশ পক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন স্যার ম্যাকমোহন এবং তার নামানুসারে এ সীমারেখার নামকরণ করা হয় ম্যাকমোহন লাইন। বর্তমানে ভারত এ লাইনকে ভারত-চীন সীমানা বলে গণ্য করছে, কিন্তু চীন এখনো এ সীমারেখা স্বীকার করে না। ফলে দীর্ঘদিন এ অঞ্চল নিয়ে ভারতের সাথে চীনের বিরোধ চলে আসছে এবং চীন অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের রাজ্য হিসেবে মেনে নিতে চায় নি। এর ফলে ১৯৬০ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ ঘটে। তবে এখন অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অন্যতম একটি প্রদেশরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পারস্য উপসাগর (The Gulf Sea)

এটা সৌদি আরবের পূর্বে ও ইরানের পশ্চিমে অবস্থিত। পারস্য উপসাগর ভারত মহাসাগরের (Indian Ocean) একটি অংশবিশেষ। উত্তরে সাত-এল আরব মোহনা থেকে দক্ষিণে হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। এ উপসাগরের চারদিকে ৮টি রাষ্ট্র অবস্থিতঃ বাহরাইন, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কুয়েত, ওমান ও কাতার। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৮০% ইরান ও ইরাকে বাস করে।

গুরুত্বঃ পারস্য উপসাগর অতি প্রাচীনকাল থেকেই একটি বাণিজ্যিক পথরূপে খ্যাতি অর্জন করে আসছে। পারস্য উপসাগর ভূমধ্যসাগরের সংগে ভারতসহ বহু রাষ্ট্রের সংযোগ সাধন করেছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, অফুরন্ত তেল সম্পদ এবং সামরিক গুরুত্বের কারণে পারস্য উপসাগর এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে বৃহৎ শক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের মূলে ছিল পারস্য উপসাগরের ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব। পারস্য উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে ইরান ও ইরাকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উভয় দেশের তেল উৎপাদন ক্ষেত্র এবং প্রধান বাণিজ্যিকেন্দ্র এ অঞ্চলে অবস্থিত। ইরাকের বসরা এবং ইরানের খুররমশহর এ অঞ্চলে অবস্থিত। ইরানের সর্বাপেক্ষা তৈল শোধনাগার আবদানও এ অঞ্চলে অবস্থিত।

হরমুজ প্রণালি

হরমুজ প্রণালি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের অর্থাৎ ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদিআরব, বাহরাইন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমীরাত প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোর উপসাগর পার হয়ে সমুদ্রে পৌঁছাবার একমাত্র পথ। তাছাড়াও বিদেশি জাহাজগুলোর তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে হলে আরব সাগর থেকে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে হয়।

গুরুত্বঃ হরমুজ প্রণালির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যুগে যুগে বহুযুদ্ধের ইন্দন যুগিয়েছে। এ সব যুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তি জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। তার কারণ এ প্রণালীটি ৬০ কি.মি. এর বেশি চওড়া না হলেও এ পথ দিয়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি তেলবাহী ট্যাংকার বের হয়ে আসে। এ তেল সারা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় তেলের ৬২%। এ তেল জাপানের প্রয়োজনীয় তেলের ৫০%, পশ্চিম ইউরোপীয়দের প্রয়োজনীয় ৪০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৫%। হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে সরবরাহকৃত তৈল পাশ্চাত্য দেশসমূহের উন্নয়নশীল কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

অন্যদিকে হরমুজ প্রণালির প্রবেশ পথে আবু মুসা বড় টাম্ব এবং ছোট টাম্ব দ্বীপগুলোর অবস্থানের কারণে প্রণালির গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে গেছে। এ দ্বীপগুলো হরমুজ প্রণালির একেবারে কাছাকাছি বলে এদের গুরুত্বের সংগে তুলনা করা যেতে পারে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ পথ জিব্রাল্টার অথবা লোহিত সাগরের প্রবেশপথ এডেন এর গুরুত্বের। হরমুজ প্রণালিসহ এ দ্বীপগুলো যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে সে শক্তির নিকট এর অঞ্চলটির রাজনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাভজনক হবে। সব দিক থেকে এ ৩টি দ্বীপ এবং হরমুজ প্রণালির পরস্পরের পরিপূরক।

হরমুজ প্রণালির এ গুরুত্বের কারণে ইরানের শাহ এ প্রণালির তীরে বিশেষ করে ওমানের সমুদ্র উপকূলে কোনো বিদেশি শক্তিকে ঘাটি করতে দেন নি। ১৯৭১ এর শেষ দিকে যখন ইংরেজরা পারস্য উপসাগর থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিল ইরানের সৈন্যরা তখন ওই প্রণালী এবং অন্যান্য দ্বীপ ৩টি দখল করে নেয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধের মূলে রয়েছে এ প্রণালির ওপর কে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে সে কারণটি। ইরান হরমুজ প্রণালির ওপর দিয়ে বিদেশে জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে পারস্য উপসাগরীয় কিছু দেশের সাথে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়।

সুয়েজ খাল (Suez Canal)

এটা পৃথিবীর দীর্ঘতম সামুদ্রিক খাল। খালটি উত্তরে ভূমধ্যসাগরের সাথে দক্ষিণে লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৬ কিলোমিটার, প্রস্থ ৫৯ মিটার এবং গভীরতা ১০ মিটার। খালটি অতিক্রম করতে প্রতিটি জাহাজের ১০ থেকে ১২ ঘন্টা সময় লাগে। এ খালটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪৫টি জাহাজ চলাচল করে। এ খালটির প্রবেশ পথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পোর্ট সৈয়দ এবং সুয়েজ উপসাগরের প্রবেশ পথে পোর্ট সুয়েজ অবস্থিত।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্ড ডি-লেপেপ্স এ খালটি খননের পরিকল্পনা করেন এবং প্রায় ১০ বছর পরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এর খননকার্য শেষ হয়। ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের খালটি জাতীয়করণ করলে ইঙ্গ মার্কিন ও ইসরাইলের সাথে মিশরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরে ১৯৭৫ সালে ৫ জুন পর্যন্ত এ খালটির পথ বন্ধ ছিল। বর্তমানে এ খালটি সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ (Suez Canal Authority) নামক একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন পরিচালিত হচ্ছে।

গুরুত্ব :

ক. এ খাল বোম্বাই ও লন্ডনের মধ্যে ৭০০০ কিঃ মিঃ পথ কমিয়ে দিয়েছে।

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এ খালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

গ. এ খালপথে যে সকল জাহাজ চলাচল করে তাদের জ্বালানীর কোনো অভাব ঘটে না।

ঘ. সুয়েজখাল কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ খাল বন্ধ থাকলে মধ্যপ্রাচ্য এ এশিয়ার কোনো অঞ্চলে সামরিক বা বাণিজ্য জাহাজের আগমন করতে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসতে হবে।

ঙ. সুয়েজ খালটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি আক্রমণাত্মক প্রণালী হিসেবে বিবেচিত।

পানামা খাল (Panama Canal)

এ খালটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত একটি যোজক খাল। এটি আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। ১৯০৪ সালে খালটির খনন কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১৪ সালে খালটি জাহাজ চলাচলের জন্য সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হয়। পানামা খালের দৈর্ঘ্য ৮০ কিঃ মিঃ, প্রস্থ ৯০ হতে ৩০০মিটার এবং গভীরতা ১৩ মিটার। খালটি অতিক্রম করতে প্রায় ৭-৮ ঘন্টা সময় লাগে। এ খালের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৫০টি জাহাজ যাতায়াত করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক খালটির মালিকানা ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পানামার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

গুরুত্ব:

ক. এ খাল ইউরোপ হতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দূরত্ব যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস করেছে।

খ. এ খালের জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

গ. এ খালের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ খালের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন সময়ে আটলান্টিক মহাসাগর হতে প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ পাঠানো সম্ভব।

ঘ. এ খালটি খননের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।

পক প্রণালি

এটা শ্রীলংকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এ প্রণালীর মাধ্যমে আরব সাগর হতে বঙ্গোপসাগরে অতি সহজ পথে চলাচল করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে এ প্রণালির গুরুত্ব অনেক। এ প্রণালির মাধ্যমে আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের

দেশগুলোর সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক জাহাজ সহজে চলাচলের অধিকার পায়। ভারত এ প্রণালির সাহায্যে অনায়াসে শ্রীলংকায় পৌঁছতে পারে। বিভিন্ন সময়ে ভারত থেকে এ প্রণালী পার হয়ে লোকজন শ্রীলংকায় প্রবেশ করেছে। ভারতের তামিলনাড় রাজধানী মাদ্রাজের সাথে এ প্রণালির মাধ্যমে শ্রীলংকার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী গ্রুপ যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

লোহিত সাগর

এটা সৌদি আরবের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের সাথে সুয়েজ খাল দ্বারা সংযোজিত। এ সাগরের তীরে সৌদি আরব, সুদান, ইয়েমেন, মিশরসহ কতিপয় রাষ্ট্র অবস্থিত। এ সমুদ্রের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগর হতে বিভিন্ন নৌযান আরব সাগরে ও ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করে থাকে। লোহিত সাগর সামরিক ও বাণিজ্যিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে লোহিত সাগরের মাধ্যমে যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজগুলো অতি সহজে এশিয়ার দেশ সমূহে সহজে পৌঁছতে পারে।

সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ

পূর্বচীন সাগরে ৮টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ। ১১ জুলাই ২০১২ জাপানের নিয়ন্ত্রণে থাকা এ দ্বীপপুঞ্জের জলসীমানায় চীনা টহল নৌকা প্রবেশ করে। এ নিয়ে দুদেশের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিরোধপূর্ণ এ দ্বীপপুঞ্জটি জাপানে 'সেনকাকু' নামে পরিচিত থাকলেও চীনে এটি 'দিয়াও' নামে পরিচিত। জাপানের দিক দিয়ে এর অবস্থান ওকিনাওয়া জেলার দক্ষিণে এবং তাইওয়ানের উত্তর-পূর্বে; অন্যদিকে চীনের মূল ভূ-খণ্ড থেকে পূর্বে এ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। ৭ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ অঞ্চলে কোনো জনবসতি নেই। কৌশলগত অবস্থানের কারণে জাহাজের নোঙর ফেলার সুবিধা, মাছের ব্যাপকতা ও খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনার কারণে এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৫ সালের ১৪ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তা জাপানের মালিকানাধীন হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ জাপানের নানসেইশুতো দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে দ্বীপগুলো ওকিনাওয়া জেলার রুইয়োকুইয়ো দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত পায়। দ্বীপগুলো জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও চীন দাবি করে আসছে এ অঞ্চলটির অবস্থান তার দেশের ভূখণ্ডের ভেতরে।

চাগোস দ্বীপপুঞ্জ

৬৫টি দ্বীপ নিয়ে ভারত মহাসাগরের অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ চাগোস। এক সময় এটি মারিশাসের অংশ ছিল। পরে চাগোসসহ পুরো মারিশাস ব্রিটিশ উপনিবেশ ভুক্ত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় দ্বীপের নাম দিয়াগো গার্সিয়া। ঘাটের দশকে সেখানে ঘাঁটি স্থাপনে আগ্রহ দেখায় যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ৫০ বছরের জন্য এ দ্বীপপুঞ্জ ইজারা দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রকে। ২০১৬ সালে সে মেয়াদ পূর্ণ হবে। ইজারার মেয়াদ আরো ২০ বছর বাড়াতে দুই পক্ষের মধ্যে আবারো আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে ব্রিটেনের এ খবরদারিকে এবার আর মানতে চাইছে না স্বাধীন প্রজাতন্ত্র মারিশাস। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে তারা। প্রতিকার চেয়েছে ব্রিটিশ হাইকোর্টের কাছেও। মারিশাস সে নির্বাসিত দ্বীপবাসী দ্বীপে ফেরার অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০০ সালে ইউরোপের মানবাধিকার আদালতে মামলা করেন নির্বাসিতরা। মার্কিন ঘাঁটি নিয়ে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই মারিশাসের।

ফকল্যান্ড

আর্জেন্টিনা থেকে প্রায় ৪০০ মাইল পূর্বে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ হলো ফকল্যান্ড। রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলি দ্বীপপুঞ্জটির আয়তন ২,১৯৬ বর্গ কি.কি.। দীর্ঘদিন ধরে এটি ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে তাদের দখল রয়েছে। ব্রিটেন ১৭৭১ সালে স্পেনের নিকট থেকে দ্বীপপুঞ্জটি দখল করে নেয় এবং ১৮৩৩ সালে দ্বীপপুঞ্জটির ওপর নিজের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, ১৮২০ সাল থেকে আর্জেন্টিনা এ দ্বীপটির ওপর মালিকানা দাবি করে আসছে এবং তারা এটিকে ম্যারভিনাস দ্বীপপুঞ্জ নামে ডাকে। ১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দখল করে নেয়। পরে ব্রিটেন ১৯৮২ সালের ১৩ জুন আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে ফকল্যান্ড পুনরুদ্ধার করে। ১৯৮৯ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনা এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সম্মত হলেও দৃশ্যত গত ১৩ বছরে একেবারেই কোনো অগ্রগতি হয় নি। আর্জেন্টিনার সাথে সার্বভৌমত্ব বা অন্য যে কোনো কিছু ভাগভাগি করে নিতেও তারা এক কথায় নারাজ। ব্রিটেনও দ্বীপটির সার্বভৌমত্ব নিয়ে আর্জেন্টিনার সাথে কোনো রকম আপোস করতে

নারাজ। এ অঞ্চলে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত সম্ভাবনা এবং নৈসর্গিক দৃশ্য।

জাফনা দ্বীপ

শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলীয় শহর জাফনা এলটিটিই গেরিলা বিদ্রোহীদের অঘোষিত রাজধানী এবং তাদের কার্যক্রমের মূল ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে দীর্ঘ দিন থেকে। ১৯৭৫ সালে জাফনার তৎকালীন তামিল মেয়র আলফ্রেড দুরিয়াপ্পাকে গুলি করে হত্যার মধ্যে দিয়ে ১৯৭৮ সালে Liberation Tiger of Tamil Elam বা LTTE গেরিলা বাহিনীর উদ্ভব। ১৯৯০ সালে সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে তামিল গেরিলার জাফনা দখল করে। ১৯৯৫ সালে অক্টোবরে জাফনায় শেষ অভিযান শুরু হয়। ৪৭ দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের আড়াই হাজার লোকের প্রাণহানী ঘটে। যুদ্ধে ১৯২৫ জন তামিল এবং ৫০০ জন সরকারি সৈন্য নিহত হয়। অবশেষে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সালে জাফনার পতন ঘটে। পুনরায় গেরিলা বাহিনী জাফনা দখল করে নেয়। ২০১০ সালে শ্রীলংকা সরকার জাফনতে সামরিক অভিযান চালালে জাফনা গেরিলাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

পাঁচশোরও বেশি ছোটবড় দ্বীপ নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে গড়ে ওঠেছে ভারতের অধীন আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর ও রাজধানী পোর্টব্লেয়ার। আটাশটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানের আয়তন ৬৩৪৪ বর্গ কি.মি.। নিকোবার ১৯৫৩ বর্গ কি.মি.। আন্দামান ও নিকোবার এ দুই অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ মাউন্ট হ্যারিয়েট। আন্দামানের যে কোনো দ্বীপ মানেই পাহাড়ের চূড়া। নিউগিনি থেকে শুরু করে, বোর্নিও, বালি, সুমাত্রা পার হয়ে গ্রেট নিকোবার দিয়ে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত ৭০০ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃতি দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর চূড়াগুলোই আইল্যান্ড আর্ক বা দ্বীপশৃঙ্খল রূপে পরিচিত। সমুদ্রতল থেকে চূড়াগুলোর গড় উচ্চতা ৪,০০০ ফুট। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল না। পর্তুগীজরা এখানে প্রথম পদার্পণ করে। এর পর পর্তুগিজদের ডাচরা সরিয়ে দিলেও এ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ছিল না। ব্রিটিশরা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে। তারা প্রথম এ দ্বীপটিকে কাজে লাগায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্বাসনের পাঠানোর জন্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসীদের পাশাপাশি একটি উপনিবেশ গড়ে তোলা। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জকে ভারতের রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়।

আবু মুসা দ্বীপ

পারস্য উপসাগর সংলগ্ন প্রাণালীর সন্নিকটে হরমুজ প্রণালির সন্নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ হল 'আবু মুসা দ্বীপ'। ধনাঢ্য উপসাগরীয় কয়েকটি দেশের প্রবেশ দ্বার হিসেবে পরিচিত আবু মুসা দ্বীপ। দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ১৯৭১ সালে শারজাহতে অনুষ্ঠিত এক সমঝোতা বৈঠকে শারজাহ চুক্তির মাধ্যমে ইরান এর অধিকাংশ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীপের পার্শ্ববর্তী 'লেসার টম্ব' এবং 'গ্রেটার টম্ব' অঞ্চল দুটি দখল করে সম্প্রতি ইরান ঘোষণা দেয় যে, ইরানই হচ্ছে আবু মুসা দ্বীপের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। ইরান এ দ্বীপকে একটি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং হরমুজ প্রণালির ওপর নজর রাখতে সক্ষম হচ্ছে। দ্বীপটির একতরফা নিয়ন্ত্রণের কারণে ইরানের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরোধ স্থায়ী হয়েছে।

স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ

দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ৭০ হাজার বর্গমাইল আয়তনের মোট ৩৩টি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জটি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এ দ্বীপপুঞ্জটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে কৌশলগত স্থানে অবস্থিত বলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জাপান তার প্রয়োজনীয় জ্বালানির প্রায় ৬৫ শতাংশ এ পথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দ্বীপপুঞ্জ কৌশলগত যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। জাপান এ দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব অংশের ইতুইবা দ্বীপে তখন শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ায় সেই সামরিক ঘাঁটি তুলে নিতে বাধ্য হয়। পরে এ দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৮৮ সালে এ দ্বীপকে কেন্দ্র করে চীনের সাথে ভিয়েতনামের এক সামরিক সংঘাত ঘটে। বর্তমান দ্বীপপুঞ্জের বেশিরভাগ অঞ্চল চীনের দখলে এবং বাকি অংশ ভিয়েতনামের দখলে রয়েছে। সম্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জের মালিকানার বিরোধ আন্তর্জাতিকভাবে এখনো নিষ্পত্তি হয় নি।

http://thejobstudy.com Go to Contents

১৭ আলোচিত মারণাস্ত্র ও পারমাণবিক বিশ্ব

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি

২০১০ সনে জাতিসংঘ ইরানের ওপর অবরোধ আরোপ করায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পুনরায় আলোচনায় ওঠে আসে। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার পর যুক্তরাষ্ট্রও পৃথকভাবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করেছে। ৯ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় পারমাণবিক দিবসে ইরান তাদের প্রথম জ্বালানি উৎপাদন কেন্দ্র বা ফুয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (FMP) উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের জন্য সর্বাধুনিক নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষাও চালায়। মধ্য ইরানের ইস্ফাহান শহরের কাছে এ পরমাণু জ্বালানি উৎপাদন কেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। এটি একশ ভাগ ইরানি প্রযুক্তিতেই তৈরি হয়েছে এবং এখান থেকে আরাকের হেভি ওয়াটার চুল্লির জন্য জ্বালানি উৎপাদন করা হবে। শান্তিপূর্ণ এবং জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিচালিত ইরানের এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইরান সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডকে ইউরেনিয়াম ডাই অক্সাইডের পাউডারে পরিণত করবে। পরে এ পাউডারকে আরো প্রক্রিয়াকরণ করে জ্বালানি দণ্ডে রূপান্তর করা হবে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পশ্চিমাদের সৃষ্ট সংকট সমাধানের জন্য তাদেরই উদ্যোগে গঠন করা হয়েছিল ৫ + ১ গ্রুপ। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্য দেশ ও জার্মানিকে নিয়ে এ গ্রুপ গঠন করা হয়। গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে ইরানের সাথে যোগাযোগ রাক্ষা করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা জ্যাভিয়ার সোলানা। আর ইরানের পরমাণু কর্মসূচির বিষয়ে তেহরানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা উচ্চ পরিষদের সচিব সাঈদ জালিলি। সম্প্রতি ৬ বিশ্ব শক্তি ইরানের পরমাণু কর্মসূচির বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। ৮ এপ্রিল ২০০৯ লন্ডনে প্রকাশিত এ বিবৃতিতে ইরানি কর্মকর্তা সাঈদ জালিলিকে তাদের সঙ্গে আলোচনার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জ্যাভিয়ার সোলানার প্রতি আহবান জানায়। ইরান তার পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার নীতিতে অটল থাকার কারণে পশ্চিমা দেশগুলো হুমকির পরিবর্তে তেহরানের সাথে সরাসরি আলোচনায় বসার নীতি গ্রহণ করে। ২২ এপ্রিল ২০০৯ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান তার শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচির ব্যাপারে ৬ বিশ্ব শক্তির বিবৃতির আনুষ্ঠানিক জবাব দিয়ে বলেছে, পরমাণু বিষয়ক গঠনমূলক আলোচনায় বসতে তেহরান প্রস্তুত রয়েছে।

পরমাণু প্রকল্প

- ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান পরমাণু তৎপরতা প্রথমবারের মতো শুরু করে ১৯৫৬ সালে।
- ১৯৬৭ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণু কেন্দ্রে পাঁচ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি পরমাণু চুল্লি চালু করার মাধ্যমে ইরানের বাস্তব পরমাণু তৎপরতা শুরু।
- ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা কাজ শুরু করে ১৯৭৪ সালে।
- ইরানের পরমাণু চুল্লি ও পারমাণবিক স্থাপনা রয়েছে মুশাহর, দারখুবিন, ইস্পাহান ও কেন্দ্রীয় প্রদেশে।
- ইরানের নাতাঞ্জে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প চালু হয় ২০০৬ সালে।
- ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার প্রযুক্তি আয়ত্ত করে ২০০২ সালে।
- ইরান ১৯৯৬ সালে এনপিটি থেকে সরে আসলেও পুনরায় তা বিবেচনা করে তাতে স্বাক্ষর অনুমোদন করে।
- ইরান পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা চুক্তি বা সিটিবিটি এবং রাসায়নিক অস্ত্র বিস্তার রোধ সংক্রান্ত চুক্তি সিডব্লিউসি'র মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি

বিশ্বের অষ্টম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ উত্তর কোরিয়া দ্বিতীয়বারের মতো পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালায় ২৫ মে ২০০৯। ৩ অক্টোবর ২০০৬ উত্তর কোরিয়া প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়েছিল। ১৯৮৯ সনে উত্তর কোরিয়ার ইয়ংবিয়ন কমপ্লেক্সের পরমাণু স্থাপনার স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করে আমেরিকা। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ উত্তর কোরিয়া, ইরাক ও ইরানকে 'শয়তানের অক্ষশক্তি' ঘোষণা করেছিলেন জানুয়ারি ২০০২। ১০ জানুয়ারি ২০০৩ উত্তর কোরিয়া নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন ট্রিটি বা এনপিটি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়। প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়া ৯ অক্টোবর ২০০৬ পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষা চালায়। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সহযোগিতার বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া পরমাণু কর্মসূচি বন্ধে সম্মত হয়। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে পরমাণু কর্মসূচির

বিস্তারিত তথ্যের ঘোষণা হস্তান্তরে ব্যর্থ হয় উত্তর কোরিয়া। ২৬ জুন ২০০৮ চীনের কাছে পরমাণু কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য হস্তান্তর করে। ২৭ জুন, ২০০৮ উত্তর কোরিয়ার প্রধান পরমাণু স্থাপনা ধ্বংস করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রবল চাপ উপেক্ষা করে ৫ এপ্রিল ২০০৯ দূরপাল্লার একটি রকেট উৎক্ষেপণ করে। কক্ষপথে যোগাযোগ স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য কোয়াংমিয়ংসু-২ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের পর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব অভিযোগ করে যে, রকেটের আড়ালে উত্তর কোরিয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রই উৎক্ষেপণ করেছিল। ১৩ এপ্রিল, ২০০৯ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার রকেট উৎক্ষেপণের নিন্দা করে। ১৪ এপ্রিল, ২০০৯ উত্তর কোরিয়া ৬ দেশীয় আলোচনা প্রক্রিয়া বর্জন এবং পরমাণু কর্মসূচি আবার শুরু করার ঘোষণা করে। ১৬ এপ্রিল, ২০০৬ উত্তর কোরিয়ার নির্দেশের মুখে রাজধানী থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে স্থাপতি প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্র ইয়ংবিয়ন পারমাণবিক কেন্দ্র ইয়ংবিয়ন পরমাণু কেন্দ্রে বিযুক্ত জাতিসংঘের পরমাণু অস্ত্র পরিদর্শক দল পিয়ং ইয়ং ছাড়ে। ২৫ এপ্রিল, ২০০৯ পুনরায় কর্মসূচি শুরু করে। পরমাণু অস্ত্র স্থাপনায় প্লুটোনিয়াম সংগ্রহের কথা জানায় উত্তর কোরিয়া। ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে সহায়তার অভিযোগে উত্তর কোরিয়ার তিনটি প্রতিষ্ঠানের ওপর জাতিসংঘের নতুন করে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘন্টা পর এ পরমাণু কর্মসূচি শুরু করা হয়। ২৫ মে, ২০০৯ দ্বিতীয়বারের মতো উত্তর কোরিয়ার পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষা। উত্তর কোরিয়াকে জ্বালানি সাহায্য দেওয়া হবে-এমন চুক্তির বিনিময়ে ২০০৭ সালে দেশটি পরমাণু কর্মসূচি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল।

জীবানু অস্ত্র

ইজা-মার্কিন প্রচারণা ছিল যে সাদ্দামের কাছে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু অস্ত্র আছে। সাদ্দামের কাছে জীবাণু অস্ত্র আছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে কিছু মারাত্মক জীবাণু অস্ত্র বিভিন্ন দেশ এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কাছে আছে। যেসব জীবাণু অস্ত্র সম্বন্ধে এ পর্যন্ত জানা যায় সেগুলো হলো:

- অ্যান্থ্রাক্স : এটা এক প্রকার রোগ। এ জীবাণু এক ধরনের বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া। এর নাম Bacillu Unthracis, এ ব্যাকটেরিয়া এক ধরণের বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে যা রক্তে মিশে রক্তক্ষরণ ঘটায় এবং টিস্যু খসে পড়ে।
- প্লেগ : ইয়ারসিনিয়া পেস্টেস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়।
- রিসিন : এটা এক ধরনের বিষ। সাধারণত ক্যাস্টর তেল কারখানা থেকে উপজাত হিসেবে তৈরি হয়।
- গুটিবসন্ত : ভ্যারিওলা ভাইরাসের কারণে এ মারাত্মক রোগটি হয়। শত্রুপক্ষের ওপর মিসাইল, রকেট কিংবা অন্য কোনো স্পেস মাধ্যমে এ জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

WMD-গণবিধ্বংসী অস্ত্র

যে অস্ত্রের দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী নিহত হয় তাই গণবিধ্বংসী অস্ত্র বা WMD নামে পরিচিত। WMD এর পূর্ণরূপ হলো Weapons of Mass Destruction। সবচেয়ে মারাত্মক WMD হলো পারমাণবিক ও হাইড্রোজেনসহ অন্যান্য বোমা এবং রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র যা দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানী সম্ভব। মার্কিন ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন এ্যাক্ট, পাবলিক আইন-১০৪-২০১ ধারায় বলা হয়েছে WMD গণ বিধ্বংসী এমন সব অস্ত্র বা ডিভাইস যাতে থাকে-বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, রোগজীবাণু ও তেজস্ক্রিয়তা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বা তীব্রতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, ব্যাপক হতাহত ও প্রচুর সম্পদ বিনষ্টকারী অস্ত্র হলো WMD। শুধু পারমাণবিক, জীবাণু, তেজস্ক্রিয়তা ও রাসায়নিক উপাদানেই গণবিধ্বংস অস্ত্র সীমাবদ্ধ নয়। বরং মারাত্মক বিস্ফোরণ দ্রব্যও এর অন্তর্ভুক্ত। ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এ অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদেশের সমর্থন নিয়ে ইরাক আক্রমণ করে। পরবর্তীতে মার্কিন ব্যাপক তল্লাশীর পরও ইরাকে কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া না গেলে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র সমালোচনার মুখে পড়ে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাও তাদের তথ্যে ভুল ছিল বলে স্বীকার করে নেয়।

এনএমডি

এনএমডির পূর্ণরূপ হলো- National Missile Defence- বিশ্বের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি যাতে হুমকি না হতে পারে সে জন্য মার্কিন কংগ্রেস এ NMD পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উইলিয়াম কোহেল কংগ্রেসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন এ প্রস্তাবটি রাশিয়াসহ অন্য রাষ্ট্রের জন্য কোনোরূপ হুমকি নয় এবং ১৯৭২ সালে এন্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল চুক্তির বিপক্ষেও নয়। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন এ উদ্যোগে

সফল না হলেও জর্জ বুশ এ পরিকল্পনার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন। এ পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গ রাজ্যেই কার্যকর করা হয়। ২০০৫ সালেই NMD বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ উদ্যোগে সরাসরি বিরোধীতা করে চীন ও রাশিয়া। চীন মনে করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পরিকল্পনার দ্বারা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। পশ্চিমা বিশ্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ পরিকল্পনা বেশ সমালোচিত হয়েছে।

১৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ঈশ্বর কণার সন্ধানে

৪ জুলাই ২০১২ পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে গত কয়েক দশকের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একদিন। ৪৮ বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে রহস্যময় কণার সন্ধানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন, ৪ জুলাই সেই অধরা কণার অনুরূপ কণার আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইউরোপের প্রভাবশালী বিজ্ঞান সংস্থা European Organization for Nuclear Research (CERN) জেনেভা ও লন্ডনে পৃথক সম্মেলনে এ আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়।

ঈশ্বর কণা কী? : ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী পিটার হিগস ১৯৬৪ সালে শক্তি হিসেবে এমন একটি কণার ধারণা দেন, যা বস্তুর ভর সৃষ্টি করে। এর ফলে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। হিগস-এর এ গবেষণা এগিয়ে নিয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কণা পরিসংখ্যান তত্ত্ব। তাই হিগস ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম যোগ করে ঐ কণার নাম দেওয়া হয় 'হিগস বোসন কণা'। পরবর্তীতে 'অধরা' বিবেচিত হবার কারণে ধীরে ধীরে তা God Particle বা 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে পরিচিত পেতে থাকে।

ঈশ্বর কণার গুরুত্ব: পদার্থ বিজ্ঞানে এ কণার গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। কেননা এ বিশ্বে বস্তুর ভর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কণার ভর না থাকলে তা ছুটত আলোর গতিতে, জোট বাঁধত না কারও সাথে। জমাট বাঁধত না কোনো বস্তু। অথচ এ বিশ্বজুড়ে মেলে বস্তুর পাহাড়। গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্ররাজি সবই বস্তু। পৃথিবী নামক এক গ্রহে আবার নদী-নালা, গাছ-গাছালি, পাহাড় পর্বত কত কিছু। সর্বোপরি মানুষ। এককথায়, সব কিছুই বস্তু। কণার ভর না থাকলে, এসব কিছুই থাকে না। সুতরাং পদার্থে ভরই সব। অনেক কিছুর সঙ্গে মানুষেরও অস্তিত্বের মূলে এ ভর। অতএব, ভর-রহস্য ভেদ মানে, মানুষের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার সমাধান। ঈশ্বর কণা বা হিগস-বোসন এমনই এক কণা, তা জন্ম দেয় এ ভরে। বিজ্ঞানের মতে, প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে জন্ম হয় এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের। কিন্তু কোথা থেকে আকার-আয়তন পেল এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ! কীভাবেই-বা স্থিতি লাভ করল! এমন প্রশ্নের জবাব মিলবে ঈশ্বর কণার আবিষ্কারের ফলে; বিজ্ঞানীরা অন্তত তাই মনে করেন।

নাসা(NASA)

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হল নাসা (NASA)। নাসার পূর্ণরূপ National Aeronautics and Space Administration- NASA প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। -এর সদর দফতর ওয়াশিংটন ডিসিতে। নাসার কয়েকটি নভোখেয়া যান হল কলাম্বিয়া, চ্যালেঞ্জার, ডিসকভারি, আটলান্টিস, এন্ডেভার। নাসা কর্তৃক প্রেরিত আটলান্টিসে দ্বিতীয়বারের মত মহিলা কমান্ডার হলেন কর্ণেল পামেলা।

WWW

WWW এর পূর্ণরূপ হচ্ছে World wide web. WWW হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা web page. WWW ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হাজার কম্পিউটারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ডকুমেন্ট ব্যবহারকারীর গ্রহণ উপযোগী হিসেবে উপস্থাপনের কাঠামো। তথ্য, চিত্র এবং শব্দ এ তিনের মিলনে WWW-ইন্টারনেট জগতে যোগাযোগ ও তথ্যের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করে। WWW এর সূচনা হয় ১৯৮৯ সালে ECRN (The European Centre for Nuclear Research)-এ। বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে www ব্যবহার করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Explorer, Netscape, Mozilla ইত্যাদি।

Galice'Project

Galice'Project যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA কর্তৃক গৃহীত একটি অনুসন্ধানী প্রকল্প বৃহস্পতির বিভিন্ন উপগ্রহে আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল ভূপ্রকৃতিতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা প্রভৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে NASA কর্তৃক 'Galileo'মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে এটি

বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার কক্ষপথে পৌঁছে ইউরোপার প্রচুর ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ইউরোপায় শুধু পানি নয়, রীতিমতো একটা মহাসমুদ্রের আলামত খুঁজে পেয়েছেন। আর পানি মানেই জীবনের অস্তিত্ব। ইউরোপা আমাদের চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট। ব্যাস ৩ হাজার ২০০ কিলোমিটার। বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জীবনের অস্তিত্ব থাকার মতো সব ধরনের উপাদানই রয়েছে ইউরোপার পানিতে। সুতরাং উদ্দেশ্যগত দিক থেকে NASA-এর Galileo প্রচেষ্টা সফল একটি প্রজেক্ট ছিল।

ফেসবুক

ইন্টারনেটে সামাজিক সম্পর্কের শক্তিশালী এক নেটওয়ার্ক হচ্ছে ফেসবুক। দূরে থাকা বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন কিংবা আপনজনদের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায় এর মাধ্যমে। পুরনো বন্ধুদের সাথে নতুন করে পরিচয় ও বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখতে, নতুন বন্ধু খুঁজে পেতে, বিভিন্ন নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে যুক্ত থাকতে, সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজে ফেসবুকের কোনো জুড়ি নেই। জনপ্রিয় এ সাইটে রয়েছে নানা আয়োজন। ছবি শেয়ারিং, ভিডিও শেয়ারিং, বন্ধুকে ছবিতে ট্যাগ (চিহ্নিত) করা, বন্ধুর ছবিতে কমেন্ট করা, বিশেষ দিবস উপলক্ষে কার্ড, গিফট পাঠানো, নিজের প্রিয় বিষয়গুলোকে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করা, প্রিয় কারো নামে ফ্যান ক্লাব খোলা, নিজেদের প্রিয় কোনো বিষয় নিয়ে গ্রুপ করে যে-কোনো ছবি, ভিডিও শেয়ার থেকে শুরু করে আলোচনাসহ সবকিছুই সম্ভব। বন্ধুকে দেওয়ার জন্য সব কিছুই রয়েছে ফেসবুকে। মার্ক জুকারবার্গের হাত ধরে ফেসবুকের জন্ম। তিনি ২০০৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ফেসবুকের পুরো নির্দেশনা এবং কর্মকৌশল তিনিই প্রথম তৈরি করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহায়ক 'কোর্সম্যাচ' নামে একটি সফটওয়্যার তৈরী করেন। এরপর তৈরি করেন 'ফেসম্যাশ' নামের আরেকটি সফটওয়্যার। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা ছবি ও তাদের সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করেন মার্ক জুকারবার্গ। এ পরিকল্পনা থেকেই জুকারবার্গের হাতে জন্ম নেয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হার্ভার্ডের ডরমিটরিতে ফেসবুকের যাত্রা শুরু। বর্তমানে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫৫ কোটিরও বেশি। আর এর সম্পদের পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলার।

মজিলা ফায়ারফক্স

'ফায়ারফক্স' একটি মুক্ত সোর্স ওয়েব ব্রাউজার। মজিলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারা বিশ্বের অনেক প্রোগ্রামারের প্রচেষ্টায় এটি তৈরি করা হয়েছে। ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকায় অনেক ব্যবহারকারী বর্তমানে 'ফায়ারফক্স' ব্যবহার করে থাকেন। প্রাথমিকভাবে এটি মজিলা অ্যাপ্লিকেশন স্যুইট-এর অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল।, কিন্তু বর্তমানে এটি মজিলা ফাউন্ডেশনের প্রধান সফটওয়্যারে পরিণত হয়েছে। ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর ফায়ারফক্সের প্রথম ভার্সনও বাজারে আসে। সাইবার বিশ্বকে চমকে দেয়া মজিলা ফায়ারফক্সের জনক হিসেবে পরিচিত ব্রেইক রস ও ডেভ হায়াত।

ব্লগিং

'ব্লগ' (Blog) হচ্ছে এক ধরণের অনলাই জার্নাল বা ওয়েবসাইট। যিনি ব্লগে পোস্ট করেন তাকে ব্লগার বলা হয়। ব্লগাররা প্রতিনিয়ত তাদের ওয়েবসাইটে কনটেন্ট যুক্ত করেন আর ব্যবহারকারীরা সেখানে তাদের মন্তব্য করতে পারেন। অনলাইন দিনপত্রী 'ওয়েবলগ' লব্দটি জোম বার্গার ১৯৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রথম ব্যবহার করেন। শব্দটার ছোট সংস্করণ 'ব্লগ' চালু করেন পিটার মেরহোলজ। তিনি তার ব্লগ পিটারমি.কম (PeterMe.com)-এর সাইডবারে ১৯৯৯ সালে ওয়েবলগ (weblog) শব্দটা ভেঙ্গে উই ব্লগ (We blog) হিসেবে লেখেন। তার ঠিক পরপরই ইভান উইলিয়ামস 'ব্লগ' শব্দটা বিশেষ্য এবং ক্রিয়া দুটো হিসেবেই ব্যবহার করা শুরু করেন এবং ব্লগার শব্দটা জনপ্রিয় করে তোলেন। এ কারণে তাকে ব্লগিং-এর জনক বলা হয়।

উইকিলিকস

উইকিলিকস মূলত ইন্টারনেটে থাকা একটি সাধারন অয়েবসাইট। কিন্তু এ অয়েবসাইটটির সব কাজ অসাধারন, সাইটটিতে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক গোপন নথি ফাঁস করে দেওয়া হয়। আর এ জন্যই সাইটটির নাম 'লিকস'। তবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো মানুষ যাতে গোপন যে কোনো নথি সাইটটির সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারে এ জন্য ইন্টারনেটের মুক্ত বিশ্বকোষ

http://thejobstudy.com
Go to Contents

উইকিপিডিয়ার আদলে এখানে প্লাটফরম দাঁড় করানো হয়েছে। তথ্য মহাসড়কে উইকিলিকসের আবির্ভাব ঘটে ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে। উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ।

Twitter

Twitter হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ ও মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইট। টুইটার ব্যাবহারকারীরা সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের বার্তা আদান-প্রদান ও প্রকাশ করতে পারেন। এ বার্তাগুলোকে টুইট বলা হয়ে থাকে। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য নিবন্ধন করেছে, তাদেরকে বলা হয় অনুসারী। টুইট লেখার জন্য সদস্যরা সরাসরি টইটার ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন। টুইটারের মূল কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে। ২০০৬ সালের মার্চ মাসে টুইটারের যাত্রা শুরু হয়। তবে ২০০৬ সালের ১৫ জুলাই জ্যাক ডোরসে আনুষ্ঠানিক এর উদ্বোধন করেন। এর প্রতিষ্ঠাতা বা জনক হচ্ছে জ্যাক ডোরসে, নোয়া গ্লাস, ইভান ইউলিয়ামস ও বিজ স্টোন।

গুগল প্লাস (Google Plus)

গুগল প্লাস (Google Plus) গুগল ইনকরপোরেনের সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট। গুগল এর আরেক সামাজিক সাইট অরকুট জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় নতুন এ সামাজিক নেটওয়ার্কের সাইট নিয়ে আসলো তারা। এখন দেখার বিষয় ফেসবুকের সাথে এটা কতটা পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। তবে গুগল প্লাসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা জিমেইল থেকে ব্যবহার করা যায়, ফলে নতুন করে লগইন করতে হবে না। অনেকটাই ফেসবুকের আদলে তৈরী এ গুগল প্লাস। এখানে ফেসবুকের মতো সার্কেল তৈরী করা যাবে আর ছবি এবং ভিডিও আপলোড করা যাবে। এতে রয়েছে ফটো ট্যাব, ভিডিও ট্যাব, +১ ট্যাব, বাজ ট্যাব। যাদের গুগল প্লাস একাউন্ট নেই তারাও অন্যের গুগল প্লাস প্রোফাইল দেখতে পারবেন যেমনটি হয় না ফেসবুকে। আর এসবই গুগল সার্চে দেখাবে কিনা তা নির্ধারন করা যাবে প্রোফাইলে। ২০১১ সালের ২৮ জুন গুগল প্লাস যাত্রা শুরু করলেও সকলের জন্য উন্মুক্ত হয় ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১।

ইউটিউব (You Tube)

ইউটিউব (You Tube) একটি ভিডিও আদান প্রদান করার ওয়েবসাইট। ওয়েব ২.০ এর অন্যতম কর্নধার ইউটিউব বর্তমান ইন্টারনেট জগতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং সাইট যা এর সদস্যদের ভিডিও আপলোড, দর্শন, আর আদান- প্রদানের সুবিধা দান করে আসছে। এ সাইটটিতে আরো আছে ভিডিও পর্যালোচনা ও অভিমত প্রদানসহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় সুবিধা। ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির জনক পে প্যাল প্রতিষ্ঠানের তিন প্রাক্তন চাকরীজিবী হারলি, স্টিভচ্যান আর বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত জাভেদ করিম।

Electronic Voting Maching (EVM)

EVM এর পূর্নরূপ Electronic Voting Maching . এটি ই-ভোটিং মেশিন নামেও পরিচিত। এর মাধ্যমে ব্যালট পেপারে সিল দেওয়ার পরিবর্তে ইলেকট্রকি পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া হয়। এ যন্ত্রে প্রতিটি প্রার্থীর নাম ও তার প্রতিকের পাশে একটি করে সুইচ এবং যেকোন একটি ভোট সুইচ চাপলেই ভোট দেয়া হয়ে যাবে। এটিতে ব্যবহার হয় পেপার ব্যালটের বদলে ইলেকট্রনিক ব্যালট। এর আরেক নাম 'ডাইরেক্ট ইলেকট্রনিক মেশিন'। সংক্ষেপে ডিআরআই। ডিআরআই ভোট ব্যবস্থা একটি ডাইরেক্ট রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক ভোট মেশিন ভোট রেকর্ড করে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রো অপটিক্যাল উপায়ে প্রদর্শিত হয় একটি ব্যালট ডিসপ্লেতে। আর ভোট মেশিন চালু করে ভোটার নিজে। বোতাম টিপে বা টার্চ স্ক্রিনে স্পর্স করে মেশিন চালু করা যায়। পাবলিক নেটওয়ার্ক ডিআরআই ভোট ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি নির্বাচন ব্যবস্থা, যেখানে ইলেকট্রনিক ব্যালট ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভোট ডাটা স্থানান্তর করা হয় ভোট গ্রহণের স্থান থেকে অন্য কোনো স্থানে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে ইভিএম : ২০০৭ সালে ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবের কার্যকরী সদস্যের নির্বাচনে এ পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করা হয়। ছোট নির্বাচনে সফলতার পর ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে জমা দেন এর উদ্ভাবক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ও আইআইসিটির পরিচালক ড. এসএম লুৎফুল কবির। এর

প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পাইল্যাব বাংলাদেশ। ২০১০ সালের ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জামালখান ওয়ার্ডের ১৪ টি কেন্দ্রে প্রথম EVM ব্যবহার করা হয়। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় জীবন হয়ে ওঠেছে আরো সহজ ।

ভিওআইপি

ভিওআইপির পূর্ণরূপ হচ্ছে Voice-over-Internet Protocol. এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোন বা মোবাইল দিয়ে বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে কথা বলা এমনকি একই দেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কথা বলার একটি পদ্ধতি বিশেষ। তবে অবশ্যই ইন্টারনেট থাকতে হবে। এ পদ্ধতিতে দেশ থেকে বিদেশে কথা বললে অরিজেনেশন এবং বিদেশ থেকে বাংলাদেশে কথা বললে টারমিনেশন হয়। বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে কল করলে ইন্টারনেটের খরচসহ ঐ দেশের লোকাল কলের মূল্য না থাকে তবে ফ্রি কল করা যায়। এতে নামমাত্র ইন্টারনেট বিল আসে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

পরমাণু বা অ্যাটম বা সাব-অ্যাটোমিক জগতের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ১৯০০ সালে কৃষ্ণকায় বস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করার সময় জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) প্রথম কোয়ান্টাম ধারণা পোষণ করেন। কোনো শক্তির বিকিরণ অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয় না বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ হিসেবে নির্গত হয়। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছকে কোয়ান্টাম বলা হয়। যেমন আলোর কোয়ান্টাম হলো ফোটন। ১৯০৫ সালে আলোক তরিৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সময় আইনস্টাইন প্রমান করেন যে, বিকিরণ শুধু নির্গত হওয়ার সময় কোয়ান্টাম আকারে নির্গত হয় না, বরং স্থানান্তর গমনের সময়ও গুচ্ছাকারেই গমন করে। পরবর্তীকালে নীলস বোর পরমাণু মডেল তৈরি করার সময় লক্ষ্য করলেন, বস্তুকনা মাত্রই স্থির অবস্থায় যেখানে সেখানে থাকে না, বরং সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তর বা কোয়ান্টাম স্তরে থাকে। এভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানির অবদানে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বর্তমানে সাব অ্যাটোমিক স্কেলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে বিস্তৃত বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়। বরং কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে ইলেক্ট্রনিক্সের বিশাল সম্ভবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে, বর্তমান মহাবিশ্বের সকল বস্তু এক সময় একটি বীজাকারে একত্রিত অবস্থায় ছিল। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বা দুই হাজার কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে (Big bang) এ মহাবিশ্বের সুচনা। বিস্ফোরণের প্রথম তিন মিনিটে বিশ্বসৃষ্টির নানা উপাদান গঠিত হয় এবং তা চারপাশে ছরিয়ে পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে বিস্ফোরণের সাথে পরিচিত, বিগ ব্যাঙ এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেখা বিস্ফোরণে বস্তুসমূহ ইতোপূর্বে বিদ্যমান স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিগ ব্যাঙ এর সময় কোনো স্থান ছিল না। বরং বিস্ফোরণের ফলে বস্তুসমূহ ছরিয়ে পড়ার কারণে স্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির এ আধুনিক তত্ত্বের স্বপক্ষে তিনটি জোরালো প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত, এ মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমান। এ থেকে বোঝা যায়, এক সময় এগুলো একত্রিত অবস্থায় ছিল। দ্বিতীয়ত, বিগ ব্যাঙ এর সময় মহাবিশ্বের উষ্ণতা ছিল অনেক-কয়েক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার ফলে বর্তমান ঐ বিকিরন কমে এসে প্রায় ২.৭ কেলভিন হওয়ার কথা। ১৯৬৪ সালে দুইজন বেতার প্রকৌশলী এ নেপথ্য বিকিরণ আবিষ্কার করেন। তৃতীয় প্রমাণটি হলো বর্তমান মহাবিশ্বে হাইড্রজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের পরিমান। এ দুয়ের পরিমাণ বিগ ব্যাঙ তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯ আলোচিত বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী যুবরাজ ফার্ডিনেন্ডের হত্যার এক মাসের মধ্যে যখন অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে, তখন অষ্ট্রিয়া রাশিয়াকে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য দলে টানে এবং জার্মানী মাঠে নামে অস্ট্রিয়াকে সমর্থন দেওয়ার জন্য এ কারণে যে তার একটা বিশেষ স্বার্থ ছিল তুরস্কে এবং সেজন্য জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অতঃপর ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ একের পর এক এ যুদ্ধে জাড়িয়ে পড়ে।

শুরু : ২৮ জুলাই, ১৯১৪।
শেষ : ১১ নভেম্বর, ১৯১৮।
যুদ্ধের কারণ : অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনেন্ড-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জুলাই তারিখ।

যুদ্ধের পক্ষসমূহ

এ যুদ্ধের এক পক্ষ ছিল অক্ষ শক্তি- জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া এবং
অপর পক্ষে মিত্র শক্তি- ইংল্যান্ড , ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সার্বিয়া এবং অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্র। এ মিত্র শক্তির সাথে রাশিয়া যোগ দেয়। ১৯১৫ সালে এবং ইটালি যোগ দেয় ১৯১৭ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা জার্মানিকে দুর্বল করে ফেলা হয়। এ সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে ভীষণ মন্দা দেখা যায় এবং তাতে সমাজে সামগ্রিক হতাশা বিরাজ করতে থাকে। এতে জার্মানিতে একটা ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি আবার জেগে ওঠে। হিটলার জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগদান করে ১৯১৯ সালে। এ পার্টিটি পরবর্তীতে 'ন্যাশনাল সোসালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি' (নাজি পার্টি) নামে আখ্যায়িত হয়। হিটলার নিজেকে জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং শীঘ্রই একজন ডিক্টেটরে পরিণত হন। পরবর্তী বৎসরে জার্মানির প্রেসিডেন্ট জন হিনডেনবার্গের মৃত্যুর পর হিটলার জার্মানির প্রেসিডেন্ট হন। হিটলার ইটালির নেতা মুসোলিনীর সাথে মিলিত হন এবং ভার্সাই চুক্তি বাতিল করতে উদ্যত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ফ্রান্সের কাছ থেকে রাইনল্যান্ড ছিনিয়ে নেন এবং ১৯৩৬ সালে মার্চ মাসে ভিয়েনা ও অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সাথে সংযুক্ত করে নেন। ১৯৩৯ সালে জার্মানি সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে। হিটলারের এরূপ অগ্রাভিযানে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তিনি ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী ডিক্টেটর হিসেবে পরিগণিত হন এবং প্রুশিয়ার সাথে জার্মানির সংযুক্তির জন্য একটা 'করিডোর' দাবি করেন। তিনি ডানজিগ বন্দরও জার্মানির কাছে ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু তার এ প্রস্তাব পোল্যান্ড প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স পোলান্ড কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তারা ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

শুরু : ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।
শেষ : ১৪ আগষ্ট, ১৯৪৫।
যুদ্ধের কারণসমূহ : ১৯১৯ সালের অযৌক্তিক ভার্সাই চুক্তি, ফ্রান্সের অসৌজন্য আচরণ, জার্মানিতে নাজি পার্টির আবির্ভাব, ভার্সাই চুক্তিতে ইটালির অসন্তুষ্টি, জাপানের সম্প্রসারণ নীতি এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ।

যুদ্ধের প্রধান পক্ষসমূহ

- অক্ষশক্তি বা কেন্দ্রীয় শক্তি- জার্মানি, ইটালি ও জাপান, এক পক্ষ; এবং
- অপর পক্ষ মিত্রশক্তি- ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড ও বেনেলাক্স (বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস্ ও লুক্সেমবার্গ) দেশসমূহ।

বেলফোর ঘোষণা

মহান আল্লাহর নিকট ইব্রাহীম (আঃ) 'কেনান' অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য ওহী লাভ করেন। এ 'কেনান' অঞ্চলই হল ইহুদীদের 'প্রমিজল্যান্ড'। এটি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইল-ফিলিস্তিন অঞ্চলে অবস্থিত। এ ভূখণ্ড মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র। মুসলমানদের দখলে আসার পর এ অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য খ্রিষ্টানরা বেশ কয়েকবার ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ অংশ নেয়। পরবর্তীতে ইহুদীরা এ অঞ্চলে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালালেও তুর্কি সাম্রাজ্যের শাসনাধীন এ ভূখণ্ড উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্রিটেনের অস্তি

ত্ব রক্ষার আহবান জানান। ইহুদী বিজ্ঞানী চীন ওয়াইজম্যান গি-সারলের বিকল্প 'এসিটোন' আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্রিটিশদের সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। পুরস্কার স্বরূপ ওয়াইজম্যান প্রমিজল্যান্ডে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর প্রমিজল্যান্ড অঞ্চলে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা দেন সেটিই বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত।

নুরেমবার্গ আদালত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য দুটি অপ্রচলিত আদালত বসে। জাপানের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য টোকিওর আন্তর্জাতিক আদালত এবং জার্মান যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য নুরেমবার্গ আদালত। নুরেমবার্গ জার্মানির যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করা হয় এবং মোট ২১ জনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। আটককৃত অবস্থায় ২ জন আত্মহত্যা করে এবং বাকী ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। একই সাথে নাৎসী সংগঠন ও তার রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।

২০ বিশ্বের বিখ্যাত কেলেংকারী

ওয়াটারগেট

ওয়াশিংটনে পোটোম্যাক নদীর তীরবর্তী ওয়াটারগেট নামক ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক দলের সদর দপ্তর অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ১৭ জুন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, রিপাবলিকান দল ডেমোক্রেটদের গোপন আলোচনা ও নির্বাচনী কৌশল জানার জন্য তাদের সদর দপ্তরে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। এ ব্যাপারে ৫ জন হাতেনাতে ধরা পড়ে। রিপাবলিকান শীর্ষ নেত্রীবৃন্দ তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়। কিন্তু মার্কিন পত্র-পত্রিকা এর রহস্য উদঘাটন করতে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল ও হোয়াইট হাউস স্টাফ চিফসহ উচ্চতম পর্যায়ের ব্যক্তির এঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এদের মধ্য থেকে হোয়াইট হাউসের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা জন ডিন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঘনিষ্ট সহকর্মী ম্যাকগ্রোবার সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দেন। ১৯৭৩ সালে ৯ নভেম্বর আদালত অভিযুক্ত ৭ জনের ৬ জনকে কারাদণ্ড দেয়। ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ৬৪টি টেপ তলব করে। ১৯৭৪ সালের ২৭-২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত জুডিশিয়ারি কমিটির সভার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি দায়ে অভিশংসন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায় ৫ আগস্ট নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সকল দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেন এবং ৯ আগস্ট পদত্যাগ করেন।

ইরান-কন্ট্রা

নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী কন্ট্রা গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের নিকট প্রচুর অস্ত্র বিক্রয় করে। এ অস্ত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মার্কিন সরকার তৎকালীন নিকারাগুয়ার সরকারের বিরুদ্ধে কন্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্য প্রদান করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী। এ ঘটনা মার্কিন ইতিহাসে ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত। এ কেলেঙ্কারির তথ্য ১৯৮৭ সালে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানসহ সিআইএ প্রধান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র প্রমুখ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব অভিযুক্ত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেলেঙ্কারির বিষয়টি তদন্তের জন্য সিনেটর জন টাওয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। মিশনের রিপোর্টে ঘটনার সত্যতা এবং প্রেসিডেন্টের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়। কমিশনের রিপোর্টে জানা যায়, পদচ্যুত জাতীয় নিরাপত্তা সহকারী অলিবার নর্থ কেলেঙ্কারি নায়ক। অবশেষে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান কংগ্রেস ও সিনেট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

হাওয়ালা

হাওয়ালা অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা হুন্ডি কারবার। ১৯৯১ সালের মে মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) হুন্ডি ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র কুমার জৈন-এর বাসভবনে ও অফিসে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র ও একটি ডায়েরি জব্দ করে। এ ডায়েরি থেকে জানা যায়, সুরেন্দ্র জৈন ও তার ভাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রায় ৬৫ কোটি রুপি ঘুষ প্রদান করেন। এ ডায়েরিতে ১১৫ জনের নাম পাওয়া যায়, যার ৬৭ জনই রাজনীতিবিদ এবং বাদবাকিরা আমলা ও অন্যান্য পেশার লোক। এতে দেখা যায়, স্বয়ং রাজীব গান্ধীও জৈন ভ্রাতাদের কাছ থেকে ৮ লক্ষ ডলার ঘুষ নিয়েছেন।

১৯৯৬ সালের ১৬ জানুয়ারি সিবিআই প্রাথমিকভাবে ১০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। এ কেলেঙ্কারির দেশ-বিদেশে প্রবল তোলপাড় শুরু হয়। এ কেলেঙ্কারিই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের রাজনৈতিক পতনের অন্যতম কারণ।

লাকহীড

লকহীড হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমান কোম্পানি। এ কোম্পানি মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে এর বিমান নেদারল্যান্ড, জাপান, ইতালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ের চেষ্টা চালিয়ে থাকে। এ কোম্পানির অস্ত্র যাতে অন্যান্য দেশেগুলো কিনে সেজন্য ক্রেতা দেশের সরকার প্রধান, মন্ত্রী ও প্রথম শ্রেনির রাজনৈতিক নেতাদেরকে মোটা অঙ্কের ঘুষ প্রদান করা হয়ে থাকে। সত্তর দশকে এ লকহীড কোম্পানি কর্তৃক ঘুষ প্রদানের ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে পড়ে জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাজুই তানাকা, পশ্চিম জার্মানির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং নেদারল্যান্ডের রানির স্বামীসহ পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ। ১৯৮৩ সালের ১২ অক্টোবর কোর্টের রায়ে লকহীড কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার দায়ে জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ৪ বছরের জেলসহ ২০ লক্ষ ডলার জরিমানা করা হয়।

বোফোর্স

১৯৮৭ সালে ভারত সরকার এক কেলেঙ্কারির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুইডেনের একটি বিশাল অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বোফোর্স কোম্পানি। ভারতে ১৩০ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের ব্যবসা পাওয়া আশায় এ কোম্পানি প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদের ৪০ মিলিয়ন ডলার ঘুষ প্রদান করে। কিন্তু ঘটনা যখন সর্বস্তরে পত্রিকা মারফত প্রকাশিত হয় তখন ভারত সরকার ও বোফোর্স কোম্পানি উভয়েই এটা স্বীকার করেন। এছাড়া পশ্চিম জার্মানি থেকে ৪৩০ কোটি রুপি মূল্যের সাবমেরিন ক্রয়ের এক চুক্তিতে জনৈক ভারতীয় এজেন্ট ৪৩০ কোটি রুপি দালালি হিসেবে কমিশন লাভ করে। এ ঘটনা সাংবাদপত্রে আসার আগেই তৎকালিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এ কারণেই পরবর্তীতে রাজীব গান্ধী দেশে-বিদেশে তথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। বোফোর্স কেলেঙ্কারি শুধু রাজীব গান্ধীর পতনই ঘটায় নি, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান ও বিজেপির উত্থানেরও একটি বড় কারণ ছিল। এ কেলেঙ্কারীর প্রধান অভিযুক্তরা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ গ্রেফতার হন।

ব্ল্যাকওয়াটার কেলেঙ্কারি

মার্কিন বেসরকারি নিরাপত্তা কোম্পানি ব্ল-্যাকওয়াটারের সদস্যরা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ বাগদাদে বিনা উস্কানিতে ১৭ জন নিরীহ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ ঘটনার আহত হয় ২৪ জন। তাদের হাতে নিরীহ ইরাকিদের এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। ঘটনার পর ব্ল্যাকওয়াটারের নিরাপত্তা কর্মীরা একে নিজেদের রক্ষার্থে পাল্টা আক্রমণ বলে ঘোষণা দিলেও ইরাকি প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকির গঠিত তদন্ত কমিটি এ ঘটনার ব্ল্যাকওয়াটারের মিথ্যাচার খুঁজে পায় এবং এ কোম্পানি বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মার্কিন প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। এরপর ব্ল্যাকওয়াটারের বিরুদ্ধে শুরু হয় এফবিআই-এর তদন্ত। এটাই সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ব্ল-্যাকওয়াটার কেলেঙ্কারি।

আজাদ কাশ্মির

কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম অংশ শাসন করে পাকিস্তান। এ অংশই আজাদ কাশ্মির নামে পরিচিত। এর আয়তন ৮৪,১৬০ বর্গ কিঃ মিঃ ও জনসংখ্যা ২৮ লক্ষ। আজাদ কাশ্মিরের নিজস্ব আইনসভা, কাউন্সিল, হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্ট আছে। এখানে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু। প্রশাসনিক প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। সাংবিধানিক প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। সরকারের সদর দফতর অবস্থিত মুজাফফরাবাদে।

নোম্যানস ল্যান্ড

দুটি সার্বভৌম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট অঞ্চল, যেখানে কার্যত কোনো রাষ্ট্রেরই নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাকে নো-ম্যানস ল্যান্ড বলে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের বেনাপোলে যেমন ক্রসিং গেট রয়েছে, তেমনি ভারতের হরিদাসপুরেও একটি ক্রসিং গেট রয়েছে। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীরা গেটে প্রহরায় নিয়োজিত এ দুটো গেটের মধ্যবর্তী প্রায় ২০ গজ এলাকায় কোনো দেশেরই নিয়ন্ত্রণ নেই। এ

অংশটুকুই হলো নিরাষ্ট্র ভূমি বা নোম্যানস ল্যান্ড।

তৃতীয় বিশ্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে দু'ধরনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সমাবেশ ঘটেছিল। এর একটি হল ঠান্ডা লড়াই রাজনীতি। অন্যটি হলো তৃতীয় বিশ্বের আত্মপ্রকাশ। তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয় একদিকে যেমন ঔপনিবেশিকতার সংকোচন ও অবসান এর ঐতিহাসিক পরিণতি, অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির বিরুদ্ধে এক সহজাত প্রতিক্রিয়া। এ বিষয়ে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টোফার ক্র্যাপহাম বলেন, "বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত।" এ সমস্ত জাতির মধ্যে বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিগত এক শতাব্দীকাল ধরে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলো একই গোষ্ঠীভুক্ত হবার নানারকম প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। ইউরোপের শিল্পোন্নত সমাজের সংস্পর্শে এসে এ সমস্ত দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এরা এক এক করে স্বাধীন হতে শুরু করে। বিষয়টিকে এভাবে বলা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার ফলে যারা শোষিত এবং বিকাশের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারাই আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশ নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, আজকের দিনে যে সমস্ত দেশকে তৃতীয় বিশ্বের আওতায় আনা হচ্ছে, জনসংখ্যা ও আয়তনের বিচারে তারা আদৌ তাৎপর্যহীন নয়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ও মোট ভূ-খন্ডের অর্ধেকের অনেক বেশি তৃতীয় বিশ্বের এখতিয়ারে এসে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল, সমস্ত আফ্রিকা, এশিয়াস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও চাপান ছাড়া গোটা এশিয়া মহাদেশে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছাড়া মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত।

তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য :

- তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দেশগুলোই কোনো কোনো সময়ে ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এ দেশগুলো অনুন্নত এবং জীবনযাত্রার মান নিম্ন।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও নয়া উপনিবেশবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক শক্তির সাহায্যে তাদের নতুন ধাচের ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।
- তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলো সাধারণতঃ কৃষি নির্ভর। বৈদেশিক বাণিজ্য কৃষি ও খনিজদ্রব্য রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কোনো শক্তি জোটের মধ্যে না থেকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী। তাই তারা প্রায় সকলেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে জড়িত।

চতুর্থ বিশ্ব

চতুর্থ বিশ্ব এক নয়া ধ্যানধারণা, অথবা বলা চলে বিশ্বের সমস্যা সমাধানের নতুন আন্দোলন পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বলা হয়ে থাকে 'দ্বিতীয় বিশ্ব' আর বাদবাকি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর নাম 'তৃতীয় বিশ্ব' যেমন-ভারত, ব্রাজিল, মেক্সিকো, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম কিছু দেশকে সবচেয়ে স্বল্পোন্নত দেশ বা চতুর্থ বিশ্ব নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন বাংলাদেশ এলডিসি'র অন্তর্ভুক্ত একটি দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশ। অষ্ট্রিয়ার শিক্ষাবিদ লিওপোল্ড কোহর এসব দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নাম দিয়েছেন 'চতুর্থ বিশ্ব'। তাঁর ধারণার মূল কথা Small is beauty অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রই সুন্দর'। ছোট কোনো কিছুর মধ্য দিয়েই বর্তমান দুনিয়ার জটিল সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। বিশাল সব দেশ, রাজ্য ও রাষ্ট্র থেকে ছোট কমিউনিটিতে ফিরে যাওয়াই হলো 'চতুর্থ বিশ্বে'র লক্ষ্য।

উন্নত বিশ্ব

বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নানা অভিধায়ে বিভক্ত। সম্পদ ও প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে গোটা বিশ্ব প্রধানত উন্নত ও অনুন্নত এ দুই ভাগে বিভক্ত। অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নে অগ্রসর দেশগুলো উন্নত দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলো অনুন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত। যে সকল দেশ শিল্প, প্রযুক্তি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং মাথাপিছু আয় বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলক অনেক বেশি উন্নত এবং প্রযুক্তি ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত।

http://thejobstudy.com Go to Contents

জি-৮ ভুক্ত দেশসহ পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলোকেই সমন্বিতভাবে উন্নত বিশ্ব বলা হয়। অর্থাৎ বিশ্বের সবচাইতে শিল্পোন্নত, শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন দেশগুলো উন্নত বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশই বিশ্ব অর্থনীতির এবং বিশ্ববাণিজ্যের সিংহ ভাগের নিয়ন্ত্রক। উন্নত বিশ্ব অনুন্নত বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশ বা তৃতীয় বিশ্বকে ভোক্তা দেশে পরিণত করে রেখেছে। বর্তমানে উন্নত বিশ্ব অনুন্নত বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষণ করছে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের মাপকাঠি বলতে সর্বোচ্চ আয়ের দেশগুলো বা উচ্চ আয়ের দেশগুলোকে বুঝায়। উচ্চ আয়ভুক্ত দেশ নিরুপণ করা হয় ঐ দেশের Gross National Income (GNI) বা স্থূল জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ যেসব দেশের GNI ৯২০৬ মার্কিন ডলার থেকে উর্ধ্বগামী সে সকল দেশই উন্নত বিশ্ব। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্সসহ আরও অনেকগুলো দেশ উন্নত বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।

লয়া জিরগা

লয়া জিরগা হলো আফগান জাতির সর্বোচ্চ মহাপরামর্শ পরিষদ। স্বাধীনচেতা আফগানরা বিগত এক হাজারের বেশি সময় ধরে লয়া জিরগার মাধ্যমে জাতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু গত চার দশক ধরে কখনো বিদেশি শাসন আর কখনো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কারণে লয়া জিরগার ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত লয়া জিরগার বর্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ১ হাজার ৬৫০ জন। ৩০০ বছর আগে লয়া জিরগার সদস্য ছিল মাত্র ৩০ জন। উল্লেখ্য, ৯৭৭ বছর আগে গজনি প্রদেশে লয়া জিরগা প্রথম একজন তাতার ক্রীতদাস নাসিরুদ্দিনকে দেশের বাদশাহ নির্বাচন করেছিল। সেখান থেকে গজনি সালতানাতের উন্মেষ।

কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা

পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত বরাবর কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ রেখা প্রসারিত। কারগিল ও দ্রাস এ নিয়ন্ত্রণ রেখার নিকটবর্তী দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর যার কাছ দিয়ে চলে গেছে শ্রীনগর-লেহর সংযোগকারী ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ন্যাশনাল হাইওয়ে। ১৯৯৯ সালের মে মাসের একদল জঙ্গী কাশ্মিরী মুক্তিকামী গেরিলা কাশ্মিরের এ নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে কারগিল পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় সেনাদের ওপর আক্রমণ চালালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে যায়। পরে মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ বিশ্ব নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের এ যুদ্ধের অবসান ঘটে স্বল্প সময়ের মধ্যে।

'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি

১৯৯৭ এর ৩০ জুন মধ্যরাতে অর্থাৎ ১ জুলাই হংকং একশ বছর পর ব্রিটেনের কাছ থেকে চীনের অধিভুক্ত হয়। হংকং-এ মুক্তবাজার অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। এ প্রেক্ষাপটে চীনের সিদ্ধান্ত হলো হংকং-এ পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং পশ্চিমা ধাচের রাজনীতি আগামী পঞ্চাশ বছর অব্যাহত থাকবে। এদিকে মূল চীনের কমিনিস্ট শাসন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু থাকবে। এ ব্যবস্থাকে বলা হয় এক দেশ দুই নীতি। চীনের অন্তর্ভুক্তির পরে একইরূপ অর্থনীতি ব্যবস্থা রয়েছে। অপরদিকে চীনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হংকং-এ পূর্বের অবস্থা বহাল রয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, হংকং চীনের অন্তর্ভুক্ত হলেও হংকং-এ এক নীতি আর চীনে অন্য নীতি প্রচলিত। এ জন্যই চীনকে 'একদেশ দুই নীতির' দেশ বলা হয়।

সাম্যবাদ

এটি এক শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা যাতে উৎপাদন বা ভোগে কোনোরূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের সমগ্র জীবন ও কর্মধারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে তার নির্ধারিত কার্যসম্পন্ন করে এবং রাষ্ট্র তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণের ফলে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা, ব্যবসায় চক্র বা শ্রমিক মালিক বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটে। সাম্যবাদ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের পরিপূর্ণ ফলিত রূপ, যে রূপ পরিগ্রহণ কেবল মাত্র বল পূর্বক সামাজিক বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই বাস্তবে রূপায়িত হয়। অন্যান্য সমাজতন্ত্রের সাথে সাম্যবাদের পার্থক্য এ যে সাম্যবাদীগণ সংঘাতময় বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপর পক্ষে বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্রীগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।

কনফেডারেশন

নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনকে বলা হয় কনফেডারেশন। এখানে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য কতকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের একত্রিকরণ ঘটে। সদস্য দেশগুলোর ওপর ইউনিয়নের কিছু ক্ষমতা থাকলেও নাগরিকদের ওপর ইউনিয়ন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি পৃথক থাকে।

ফেডারেশন কনফেডারেশনের প্রত্যেকের একটি করে কেন্দ্রীয় সরকার থাকে। কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে এবং তারা অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করতে পারে কিন্তু ফেডারেশনে তা সম্ভব নয়। কনফেডারেশনের যেকোন সদস্যের যেকোন সময় বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা আছে কিন্তু ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সেই ক্ষমতা নেই।

একনায়কতন্ত্র

এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা একটি ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। একনায়কতন্ত্র 'একজাতি, একদল ও একনেতা' এ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রে জনগণের অধিকার অস্বীকার করা হয় এবং এ ব্যবস্থায় জনগণ একনায়কের নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য থাকে। একে অনেকে স্বৈরতন্ত্রও বলে। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক বিরোধী দলকে নির্মমভাবে দমন করা হয় অথবা বেআইনী ঘোষণা করা হয়। বাকস্বাধীনতা বা সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয় এবং জনমত গঠনের সমস্ত উপাদান রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মৌলিক অধিকার

একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সংবিধানে গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী কতকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে অপরিহার্য এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। জীবন রক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, ধর্মের অধিকার, জনসভা করার অধিকার, বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, সরকারি কার্যে নিযুক্ত হবার অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের প্রধান বিষয়। এ মৌলিক অধিকারকে সাধারণত ঃ পৌর অধিকার (Civil Right) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Right) এ দুই প্রকার অধিকারে ভাগ করা যায়।

২১ আলোচিত কূটনীতি

প্রোটোকল

কূটনৈতিক পরিভাষায় একে সাধারণ আন্তর্জাতিক দলিলপত্র বুঝায়। আন্তর্জাতিক সভা-সমিতির কার্যবিবরণী। কোনো সন্ধির প্রাক্কালে প্রাথমিক চুক্তি এবং অনুমোদন প্রয়োজন নেই। এরূপ চুক্তি কখনও কখনও প্রোটোকল দ্বারা সন্ধির সমপর্যায়ভুক্ত চুক্তিও বুঝায়। কূটনৈতিক প্রোটোকল দ্বারা কূটনৈতিক বিভাগীয় কর্মচারীদের শিষ্টাচারভিত্তিক চালচলন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত প্রত্যেক সরকারি অফিসে প্রোটোকলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকেন।

কোয়েটট অন দ্য মিডল ইস্ট

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারী গ্রুপ-এর নাম কোয়র্টট অন দ্য মিডল ইস্ট (Quartet on the Middle East)। ২০০২ সালে স্পেনের মাদ্রিদে এ গ্রুপ আত্মপ্রকাশ বা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোয়ার্টেট অন দ্য মিডল ইস্ট ডিপ্লোম্যাটিক কোয়ার্টেট (Diplomatic Quarrteet) বা মাদ্রিদ কোয়ার্টেট (Madrid Quartet) নামেও পরিচিত। গ্রুপের সদস্য হলো ৪টি দেশ ও সংস্থা। এগুলো হচ্ছে-জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কোয়ার্টেট গ্রুপের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন ২০০৮ সালে। ২০১০ সালের মার্চে দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেমে নতুন বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিলে ১৯ মার্চ ২০১০ রাশিয়ার মস্কোতে কোয়েটেটের মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে

ইসরাইলের বসতি স্থাপনে নিন্দা এবং ফিলিস্তিন ও ইসরাইলকে শান্তি আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে অনুমোদন গ্রহণের জন্য এটিই ছিল প্রধান দলিল। বেইজিং সম্মেলনে পেশ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের মার্চে জাতিসংঘ নারী মর্যাদা কমিশনের ৪৯তম অধিবেশনে ৩৬১ অনুচ্ছেদের এ খসড়া দলিলটি অনুমোদন করা হয়। নাইরোবিতে ৩য় জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে গৃহীত ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী সমাজের অগ্রগতি বিষয়ক ভবিষ্যৎমুখী কর্মকৌশল অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকে নারী সমাজের অর্জিত অগ্রগতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এতে তুলে ধরা হয়। খসড়ায় জরুরি কর্মপন্থায় ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা তৈরি করা হয়। এসব বিষয় নারী সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত। বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও বেসরকারি খাতের কী কী করণীয় এবং যথাযথ কর্মকৌশলগত লক্ষ্য সে সবই এ কর্মপন্থায় স্থান পায়।

PFA-এর আলোকে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ঃ ১. দারিদ্র্য, ২. শিক্ষা, ৩. স্বাস্থ্য, ৪. নির্যাতন, ৫. সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত, ৬. অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, ৭. ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেশিনারি, ৯. মানবাধিকার, ১০. গণমাধ্যম, ১১. পরিবেশ ও উন্নয়ন এবং ১২. কন্যা শিশু।

Mein Kampf

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা হিটলার তার আত্মজীবনী লিখেছিলেন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ারও অনেক আগে। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় এবং তার আত্মহত্যার পর বিশ্বের অনেক দেশেই তার আত্মজীবনী নিষিদ্ধ করা হয়। দীর্ঘ ৬৫ বছর পর সেই তালিকায় নাম লেখালো রাশিয়া। হিটলারের লেখা আত্মজীবনী Mein Kampf বা 'আমার সংগ্রাম' বইটি নিষিদ্ধ করেছে রাশিয়া। বইটিতে উগ্রবাদী লেখার কারণে ২৬ মার্চ ২০১০ দেশটির সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, হিটলারের এ আত্মজীবনীতে কেবল জার্মানদের জন্য একটি আলাদা ভূখন্ডের কথা বলা হয়, যাতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশও পড়ে। এতে স্লাভিক জনগণকে নীচু জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন স্বৈরশাসক হিটলার। রাশিয়ার মানবাধিকার সংগঠন মেমোরিয়াল-এর ঐতিহাসিক ইয়ান রাচিনস্কি হিটলের এ বইটিকে রুশ বিপ্লবী নেতা লেনিন এবং স্বৈরশাসক স্ট্যালিনের লেখা বইগুলোর সাথে তুলনা করেছেন। এসব বইয়ের সাবেক এ দুই রুশ নেতা ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের আহ্বান জানান।

Poor Colonial Club

বিশ্বের যে দেশগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে সেই দেশগুলোর সংগঠন হল কমনওয়েলথ। বর্তমানে এ সংগঠনটির সদস্য ৫৪টি রাষ্ট্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমনওয়েলথ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ খুবই দুর্বল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা পেয়ে কমনওয়েলথ গঠন করে বিভিন্ন সময়ে কিছু আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠান করা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য সহযোগিতামূলক কার্যক্রম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়াও বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে কমনওয়েলথের তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। তাই সমালোচকরা কমনওয়েলথকে 'Poor Colonial Club' বলে থাকেন।

আয়রন কার্টেন

কমিউনিষ্ট দেশ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির বহিঃপ্রকাশ রোধ করার জন্য সংবাদ মাধ্যমে, বিদেশিদের আগমন ইত্যাদির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে আয়রন কার্টেন বা লৌহযবনিকা বলা হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম আয়রন কার্টেন (Iron Curtain) নীতি প্রবর্তন করে। চীন কর্তৃক গৃহীত এ ব্যবস্থাকে Bamboo Curtain বলা হয়।

পিং পং কূটনীতি

১৯৭১ সালে চীনের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল (পিং পং) দল চীন সফর করে। এ জন্য এটার নামকরণ হয়েছে পিং পং কূটনীতি। পিং পং কূটনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Shuttle Diplomacy 'পিং পং কূটনীতি' চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। এর পর থেকে দু দেশ

কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালেই বেইজিং সফর করেন এবং দু বছর পর ১৯৭৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন নিজেই চীন সফর করেন। এতে দু দেশের মধ্যে বৈরিতার অবসান ঘটে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক চীনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলে চীন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য লাভ করে। পক্ষান্তরে তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বাদ পড়ে।

নিক্সন ডকট্রিন

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন চীন-মার্কিন সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে Money and arms not man to help Asian nations to military self sufficient নীতি গ্রহণ করেন। নিক্সনের এ নীতিই ডকট্রিন নামে পরিচিত। সমাজতান্ত্রিক চীন ও পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'নিক্সন ডকট্রিন' একটি উল্লেখযোগ্য নীতি। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এশিয়ার ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড সফর করেন। চীনের দাবির প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র উক্ত দেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। যদিও ট্রুম্যানের নীতি ছিল সৈন্য রাখার পক্ষে। নিক্সনের এ নীতির ফলে চীন-মার্কিন সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল।

ডোমিনো থিউরি

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ডালেস ডোমিনো থিউরির প্রবর্তক। চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর প্রভাব ও বিস্তৃতি প্রতিরোধের পন্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈরী দেশ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চীনের প্রভাব মুক্ত রাখার লক্ষ্যে আসিয়ান গঠনের অনুপ্রেরণা যোগায়। ডোমিনো থিউরি সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতি রোধ করা যায় নি। অবশ্য ডোমিনো থিউরিকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থায়িত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। এ থিউরিতে বলা হয় যে, যদি একটি দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্লকে চলে যায় তবে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দেশেও এর বিস্তৃতি ঘটবে।

ট্রুম্যান ডকট্রিন

১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গ্রিসে ও তুরস্কে সাহায্যের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার দানের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করে। তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বলেন,'...আমি (ট্রুম্যান) বিশ্বাস করি যে, মুক্ত জাতিগুলো যাতে তাদের নিজেদের মতো করে ভাগ্য জয় করতে পারে তার জন্য আমাদের সহায়তা করা উচিত'। এটাই ট্রুম্যান ডকট্রিন। এ ডকট্রিনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায় ট্রুম্যান ডকট্রিন হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের পক্ষ অবলম্বন করার নীতি। ১৯৪৪ সালে গ্রিসে সমাজতন্ত্রী এবং রাজতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ব্রিটিশরা রাজতন্ত্রীদের সাহায্য করে। ১৯৪৬ সালে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় সোভিয়েত ব্লক পশ্চিমা রাষ্ট্র জোটের বিরোধিতা করে। শুধু ব্রিটেনের পক্ষে গ্রিসের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্রিটেন মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা করে।

অপারেশন হাস্কি

ইতালির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের যৌথ অভিযানের নাম 'অপারেশন হাস্কি'। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটিশ বাহিনী ইতালির সিসিলি এবং সার্দিনিয়া দ্বীপের ওপর বিমান হামলা শুরু করে। অক্ষশক্তির ১ লাখ ৬৭ হাজার এবং মিত্রশক্তির প্রায় ৩২ হাজার সৈন্য নিহত হয় ঐ যুদ্ধে। সিসিলি থেকে পালিয়ে বেঁচে যায় লক্ষাধিক জার্মান সেনা। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ৩৯ দিনের মধ্যে পতন ঘটে সিসিলির।

অপারেশন বারবারোস

রাশিয়ার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আগ্রাসী জার্মানির সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন বারব্যারোস'। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি হঠাৎ করে রাশিয়া আক্রমণ করে। ২৯ লাখ জার্মান সৈন্য এ অভিযানে অংশ নেয়। বিশাল এ বাহিনী ঝড়ের বেগে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরোধ ভেঙ্গে এগুতে থাকে। প্রায় দু হাজার মাইল ফ্রন্ট লাইনে এ আক্রমণ চালানো হয়। প্রথম দিকে এ অভিযানে জার্মান বাহিনী সাফল্য পায় এবং রাশিয়ার বহু অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু পরে শীতকাল আসায় জার্মানদের বিজয় পরাজয়ের গ্লানিতে পরিণত হয়। প্রচণ্ড শীতে এবং খাদ্যের অভাবে জার্মান বাহিনী মারাত্মক সংকটে পড়ে। এ অভিযানে শুধু ক্ষুধার কারণে মারা যায় প্রায় ১০ লাখ জার্মান সৈন্য। অবশেষে প্রচণ্ড শীতে ও পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে জার্মান বাহিনী পরাজয় বরণ করে।

ক্রীড়াতত্ত্ব

ক্রীড়াতত্ত্ব বা Game Theory হলো বিশ্ব রাজনীতির একটি বিশেষ কৌশল, যা দ্বারা নানা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশেষভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ১৯২১ সালে ফরাসি অঙ্কশাস্ত্রবিদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম এ তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেন। অস্কার সর্গেনস্টার্ন (জার্মানি) প্রমুখ এ তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধন করেন। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে এ ক্রীড়াতত্ত্বটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো বিশ্ব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অধীনস্থ বিষয়। কূটনীতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কের বিশ্লেষণ নিয়েই এ রাজনীতির বিষয়বস্তু গঠিত। কারো কারো মতে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিও এক ধরনের ক্রীড়াবিশেষ এবং এসব ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল ও স্ট্রাটেজির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল, ও স্ট্রাটেজির যথার্থ মূল্যায়ন এবং এ তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার ওপর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এ তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন। বস্তুত এ তত্ত্বের প্রয়োগ রীতি হচ্ছে আঙ্কিক সমীকরণের মাধ্যমে।

শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব

'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' বা 'The Uniting for Peace Resolution' হল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব। ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ এটি অনুমোদন করে। জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কোনো সদস্য পরিষদে আলোচিত কোনো প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করলে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়না। তাই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের মতানৈক্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং তার প্রতি ভীতি প্রদর্শন বা আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে এ প্রস্তাবের ক্ষমতা বলে সাধারণ পরিষদ ২৪ ঘন্টার মধ্যে জরুরি সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মতবিরোধ দেখা দিলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ পরিষদ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুতরাং বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

শ্বেতাঙ্গদের বোঝা

বিকৃত জাতীয়তাবাদে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টিকারী দেশসমূহ নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনে করার সাথে সাথে অনুন্নত, অসভ্য ও অনগ্রসর জাতিকে সভ্য করার মানসিকতা প্রদর্শন করতে থাকে। এ মানসিকতায় তারা এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। ব্রিটিশদের মধ্যে তখন এরূপ অহংবোধ কাজ করতো যে, পৃথিবীর সব অসভ্য ও অনুন্নত জাতগোষ্ঠীকে উন্নত, সভ্য ও সংস্কৃতিবান করার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলোকে শাসন করার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। আর এ ধ্যানধারণা থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে মনে করা হতো 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' (White man's burden)। প্রকৃতপক্ষে, পররাজ্য লোলুপতা, অন্য জাতির প্রতি ঘৃণার ভাব সঞ্চারিত করা এবং অন্য জাতি ও দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারকে তারা শৌর্য্য ও আত্মপরিমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমরূপে বিবেচনা করে। উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ এরূপ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালক্রমে এ উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় মুক্তি, স্বদেশপ্রীতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে অনুপ্রেরণাও সৃষ্টি করে।

আধিপত্যবাদ

এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কোনো দুর্বলতার সুযোগে সে রাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালালেই তাকে আধিপত্যবাদ বলা হয়। যখন এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ বা খর্বিত করে সেসব রাষ্ট্রের সরকার, প্রশাসন, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদির ওপর নিজের প্রাধান্য বা প্রভাব চাপিয়ে দিতে চায়, তখনই প্রথম রাষ্ট্র কর্তৃক আধিপত্যবাদের সূচনা হয়। সাধারণত কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অপর রাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রের ওপর তার আধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়ে থাকে।

গণতান্ত্রিক কূটনীতি

একটি দেশের সরকারের ক্ষমতা চর্চার পিছনে যেমন গণসমর্থনের প্রয়োজন; তেমনি সরকারের

কূটনীতির পিছনেও জনসমর্থন প্রয়োজন এটাই গণতান্ত্রিক কূটনীতির মূল বক্তব্য। বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কূটনীতির পরিচালনা পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক ভূমিকায় নানা পরিবর্তনের সাথে সাথে কূটনৈতিক চিন্তা-ধারায় স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা লক্ষ্য করা যায়। অতীতের গোপনীয় বা লুকায়িত কূটনীতির পরিবর্তে এখন কূটনীতিতে এসেছে গণতান্ত্রিক ধারা এরূপ ধারার কূটনীতিকেই গণতান্ত্রিক বা প্রকাশ্য কূটনীতি বলা হয়। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত রাজারা বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি করলে তা জনসমক্ষে অপ্রকাশিতই থেকে যেত। এরূপ গোপনীয়তা রাষ্ট্রের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব তৈরি করত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রের জোয়ারে জনগণের সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে। আর জনগণের এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করায় প্রকাশ্য কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী

স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)-এর সময় যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা চতুর্দিক থেকে মাদ্রিদ আক্রমণ করে, তখন ফ্রাঙ্কোর বিশ্বস্ত অনুচরেরা ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি শক্তিকে সরকারেরই অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। এ গোপন বাহিনী ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এ শব্দটির দ্বারা সাধারণত এমন বিশ্বাসঘাতকদের বোঝানো হয়ে থাকে, যারা স্বীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের শত্রুদের স্বার্থে কাজ করে।

গার্ডিয়ান কাউন্সিল

ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গার্ডিয়ান কাউন্সিল। ইরানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পশ্চিমা ধাঁচের সরকার ব্যবস্থা থেকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী। রক্ষণশীলরা নিয়ন্ত্রণ করেন এ কাউন্সিল। এটি ৬ জন ধর্ম বিশেষজ্ঞ এবং ৬ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত। ধর্ম বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেন প্রধান ধর্মীয় নেতা এবং বিচারকদের মনোনীত করেন প্রধান বিচারক। পরে পার্লামেন্ট তা অনুমোদন করে। কাউন্সিলের সদস্যরা দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হন। পার্লামেন্ট থেকে পাসকৃত সব বিল কাউন্সিলকে অনুমোদন করতে হয়। তবে বিলটি যদি সংবিধান ও ইসলামি আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে কাউন্সিল তাতে ভেটো দিতে পারে। কোনো নির্বাচনে প্রার্থিতা বাদ দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে গার্ডিয়ান কাউন্সিল।

সুপ্রিম লিডার

ইরানের সংবিধানের সুপ্রিম লিডার বা ধর্মীয় নেতার ক্ষমতা সাবেক নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রধান ধর্মীয় নেতাই দেশটির বিচার বিভাগীয় প্রধান গার্ডিয়ান কাউন্সিলের ৬ জন সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার, জুমার নামাজের খতিবসহ রেডিও, টেলিভিশনের প্রধানদের নিয়োগ দেন। ধর্মীয় নেতাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিশ্চিত করেন। গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমিনি ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯-০৩ জুন ১৯৮৯ ১৯৮৯ পর্যন্ত এবং গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনি ৪ জুন ১৯৮৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুপ্রিম লিডারের দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যর্থ রাষ্ট্র

ব্যর্থ রাষ্ট্র হলো এমন এক ধরনের রাষ্ট্র, যা উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে অর্থনৈতিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি পেলেও নিজেদের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টাতে পারে নি। পাল্টাতে পারেনি নিজেদের জিডিপি, জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা; রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীলতার মধ্যে যাদের বসবাস, কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছাড়াই দিনের পর দিন চলছে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এসব দেশে অস্তিত্বহীন, তারা সর্বাত্মকভাবে ব্যর্থ একটি দেশ।

প্যারেস্ত্রাইকা

তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্ভাচেভের একটি আলোচিত নীতি ছিল 'প্যারেস্ত্রাইকা'। 'প্যারেস্ত্রাইকা' শব্দের অর্থ হল পুনর্গঠন। গর্ভাচেভ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চেয়েছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি এ নীতি প্রবর্তন করেন। বিশ্ব রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে 'প্যারেস্ত্রাইকা' নীতির ফলেই ১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়।

ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত সে দেশগুলোকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বলা হয়। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের নেতৃত্বে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্ব ব্যাংকের মতে যে

দেশগুলোর মাথাপিছু জিএনপি ১০,০০০ মার্কিন ডলারের উপরে সে দেশগুলো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের অন্তর্গত। বিশ্বের বর্তমান এরূপ দেশ রয়েছে ৬৬টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুধু পশ্চিমা বিশ্বকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড হিসাবে অভিহিত করা হলেও বর্তমানে ইষ্ট এশিয়ান টাইগারস্ এর সদস্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ দেশগুলোতে বাজার অর্থনীতি চালু রয়েছে। বর্তমানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড শব্দটি কম ব্যবহৃত হয়। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডভুক্ত দেশগুলোকে বোঝাতে উন্নত বিশ্ব শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্রাক কূটনীতি

বর্তমানে কূটনীতিতে কর্মকর্তাদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ট্রাক ওয়ান (Track-I), ট্রাকটু (Track-II), ট্রাক থ্রি (Track-III), মাল্টি ট্রাক কূটনীতি শুরু হয়ে গেছে। ট্রাক ওয়ান কূটনীতি মূলত সরকার ও আন্তঃসরকারধর্মী কূটনৈতিক উদ্যোগ। এ ধরনের কূটনীতি সরকারি ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও চ্যানেলগুলোর সাথে সংযুক্ত। ট্রাক টু কূটনীতি বা Second Track Diplomacy বলতে বুঝায়- বিবাদ মিটাতে সুশীল সমাজ। ট্রাক-থ্রি কূটনীতি হল-দাতা, গোষ্ঠীর যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা যখন বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিবাদ নিরসনে আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে উদ্যোগ নেয়। এ ধরনের বিভিন্নমুখী কূটনৈতিক উদ্যোগকে যখন বিভিন্ন ট্রাকে একই সাথে চালিয়ে যাওয়া হয় তাকে মাল্টি ট্রাক কূটনীতি বলে।

সাইডলাইন কূটনীতি

বর্তমানে করিডোর বা সাইড লাইন কূটনীতি (Coridor/sideline diplomacy) -র কথা কোনো যায়। এটি মূলত বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে ঘটে থাকে। মূল আলোচনার বাইরে এ সমস্ত আলোচনা অনানুষ্ঠানিকভাবে হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের বিষয় আসতে পারে। মূল কনফারেন্সে যাবার আগে তাদের মনোভাবও এসব কূটনীতির দ্বারা জানা যায়।

ব্যক্তিগত কূটনীতি

বর্তমানে "Personal Diplomacy" বা ব্যক্তিগত কূটনীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। কূটনীতিক নয় এমন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সুনাম ও খ্যাতির দ্বারা এ কূটনীতি পরিচালনা করে। সেটাকে অনেক ক্ষেত্রে "Good Office Role" ও বলা হয়। কফি আনান, নেলসন ম্যান্ডেলা এ কূটনীতির সাথে জড়িত।

টেলিফোন কূটনীতি

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে কূটনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর ফলে গতানুগতিক দূতদের দ্বারা কূটনীতি বা সরাসরি কোন দেশে গিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো এরকম ধারণায় পরিবর্তন এনেছে। প্রযুক্তির যুগে সরাসরি গিয়ে কূটনীতিক তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে "টেলিফোন কূটনীতি" একটি বহুল আলোচিত বিষয়। অর্থাৎ কূটনীতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে।

প্রতিযোগিতায় ভাল ফলাফল করতে হলে লেখকের অন্যান্য বইয়ের সহযোগিতা নিবেন:-

- বাংলাদেশ স্টাডিস (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : সমস্যা ও সম্ভাবনা)
- জ্ঞানের বিশ্ব (বাংলাদেশ)
- জ্ঞানের বিশ্ব (আন্তর্জাতিক)
- সহজরূপে বাংলাদেশের সংবিধান
- BCS জিস্ট (প্রিলিমিনারি)
- BCS জিস্ট (লিখিত)
- বিসিএস ভাইভা সহায়িকা
- বিবিএস মডেল টেস্ট

KEY TO B C S

&

WAY TO INTERNATIONAL RELATION

অধ্যায় ২

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

Important Information & Short Questions

বিশ্বের মহাদেশ পরিচিতি

মহাদেশের নাম	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	পৃথিবীর আয়তনের শতকরা হার	স্বাধীন দেশ	জাতিসংঘ ভুক্ত দেশ
এশিয়া	৪,৪৫,৭৯,০০০	৩০%	৪৪	৪৪
আফ্রিকা	৩,০০,৬৫,০০০	২০%	৫৪	৫৪
উত্তর আমেরিকা	২,৪২,৫৬,০০০	১৬.৫%	২৩	২৩
দক্ষিণ আমেরিকা	১,৭৮,১৯,০০০	১২%	১২	১২
ইউরোপ	৯৯,৩৮,০০০	৬.৮%	৪৮	৪৬
ওশেনিয়া	৭৬,৮৭,০০০	৫.৩%	১৪	১৪
এ্যান্টার্কটিকা	১,৩২,০৯,০০০	৮.৯%	-	-
মোট	১৪,৮৬,৪৭,৯৯০	১০০%	১৯৫	১৯৩

মহাদেশের নাম	পৃথিবীর লোক সংখ্যার %	সর্বোচ্চ স্থান (মিটার)	সর্ব নিম্নস্থান (মিটার)
এশিয়া	৬১.১ %	মাউন্ট এভারেস্ট(৮,৮৫০)	মৃত সাগর(-৪০০)
ইউরোপ	১১.৫ %	এল ব্রাস (৫৬৩৩)	কাস্পিয়ান সাগর(-২৮)
উত্তর আমেরিকা	৭.৯ %	এ্যাকনকাগুয়া (৬১৯৪)	ডেড ভ্যালি (-৮৭)
দক্ষিণ আমেরিকা	৫.৬ %	ম্যাককিনলি (৬৯৫৯)	পেনিনসুলা (-৪০)
আফ্রিকা	১৩.৪ %	কিলিমাঞ্জারো(৫৯৬৩)	লেক আসাল (-১৫৬.১)
ওশেনিয়া	০.৫ %	কোসিয়াস্কো (২,২৩০)	লেক আয়ার(-১১৬)
এ্যান্টার্কটিকা	-	ভিসন ম্যাসিক (৪৮৯৭)	বেন্টলে সাবগ্লাসিয়াল ট্রেঞ্চ(-২৫৫৫)

উৎস : ওয়ার্ল্ড আল ম্যানাক - ২০১৫।

বিশ্ব ইতিহাস (এশিয়া মহাদেশ)

⇨ **এশিয়ার অবস্থান :** ১৩° ডিগ্রী উত্তর হতে ১৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ২৫° পূর্ব হতে ১৭০° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।
⇨ **মোট রাষ্ট্র :** ৪৬ টি (ফিলিস্তিন ও তাউওয়ান স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলেও স্বাধীন নয়)।

http://thejobstudy.com Go to Contents

⇨ **মোট স্বাধীন রাষ্ট্র :** ৪৪ টি (সর্বশেষ পূর্ব তিমুর)।
⇨ **দক্ষিণ এশিয়া :** বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান ও মায়ানমার (৯টি)।
⇨ **দক্ষিণ-পূর্ব পূর্ব এশিয়া :** লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ব্রুনাই ও পূর্ব তিমুর (১০ টি)।
⇨ **দূরপ্রাচ্য :** চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ান (৬টি)।
⇨ **মধ্যপ্রাচ্য :** বাহরাইন, ইরান, ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিন (১৫ টি)। (নোট : ফিলিস্তিন স্বাধীন রাষ্ট্র নয়)।
⇨ **মধ্য এশিয়া :** তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরঘিজিস্তান, কাজাখিস্তান ও উজবেকিস্তান (৫ টি)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

⇨ **আয়তন :** ৪,৪৪,৭৯,০০০ বর্গ কি.মি.।
⇨ **পৃথিবীর মোট আয়তনের :** ৩০.০%, স্থলভাগের : এক তৃতীয়াংশ, জনসংখ্যার ৬১.১% ভাগ।
⇨ **সর্ব উত্তরের বিন্দু :** চেলুসকিনের অগ্রভাগ।
⇨ **সর্ব পশ্চিমের বিন্দু :** বেবা অন্তরীপ।
⇨ **সর্ব পূর্বের বিন্দু :** পূর্ব অন্তরীপ।
⇨ **সর্বনিম্ন বিন্দু :** লোহিত সাগর।
⇨ **সর্বোচ্চ বিন্দু :** মাউন্ট এভারেস্ট।
⇨ **এশিয়ার দীর্ঘতম নদী :** ইয়াং সিকিয়াং।
⇨ **বৃহত্তম হ্রদ :** কাস্পিয়ান সাগর।
⇨ **উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ :** এভারেস্ট (উচ্চতা ৮৮৫০ মি.)
⇨ **উচ্চতম পর্বত শ্রেণি :** হিমালয়।
⇨ **জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ :** চীন।
⇨ **বৃহত্তম টাউডাল বন :** সুন্দরবন।

অঞ্চলভিত্তিক এশিয়া

⇨ **দক্ষিণ এশিয়া :** ৯টি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মায়ানমার, আফগানিস্তান) (সবগুলো দেশ এক সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল)।
⇨ **দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া :** ৯টি দেশ (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ব্রুনেই ও পূর্বতিমুর) (থাইল্যান্ড কখনো কোন দেশের উপনিবেশ ছিল না)।
⇨ **দূরপ্রাচ্য :** ৭টি দেশ (চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান)।
⇨ **মধ্যপ্রাচ্য :** ১৫টি দেশ (লেবানন ও সিরিয়া বাদে সবগুলো দেশ ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল)।
⇨ **নিকট প্রাচ্য :** ৪টি দেশ (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরাইল)।
⇨ **মধ্য এশিয়া :** ৫টি দেশ (সবগুলো দেশ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল)।
⇨ **ইন্দোচীন :** ৩টি দেশ (ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া, লাওস)।
⇨ **জিসিসি ভুক্ত দেশ :** ৬টি (সৌদি, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন)।
⇨ **পারস্য উপসাগরীয় দেশ :** ৮টি (ইরান, ইরাক, সৌদি, ইউএই, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও ওমান)।
⇨ **একমাত্র খৃষ্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র :** ফিলিপাইন।
⇨ **একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র :** নেপাল।
⇨ **একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্র :** শ্রীলংকা।

তথ্য কণিকা : দূরপ্রাচ্য

⇨ চতুর্দিক পর্বত বেষ্টিত মালভূমি : মঙ্গোলিয়া।
⇨ অধিকাংশ অধিবাসী যাযাবর : মঙ্গোলিয়া।
⇨ সর্বত্র মরুময় দেশ : উত্তর কোরিয়া।
⇨ এশিয়ায় ইউরোপের প্রাচীনতম উপনিবেশ ছিল : ম্যাকাও (পর্তুগাল উপনিবেশ ছিল)।
⇨ জাপান : সূর্যোদয়ের + ভূমিকম্পের + সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ।এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দেশ। বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ সাহায্যদাতা দেশ। প্রথম যন্ত্র শিল্পের সূচনাকারী দেশ।

- বিশ্বের দীর্ঘতম রেল সুরঙ্গ : তান্না অবস্থিত।
- প্রাচীন রাজধানী : কিটো।
- বর্তমান রাজধানী : টোকিও (বিশ্বে লোকসংখ্যায় বৃহত্তম শহর)।
- ১৭তম বিশ্বকাপ ফাইনাল (২০০২) অনুষ্ঠিত হয় : ইয়াকোহামা।
- চীন : সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশ (আয়তনে বিশ্বে তৃতীয়)।
- সর্ব প্রথম কয়লা ব্যবহার বা প্রচলনকারী দেশ।
- বিশ্বের সর্বাধিক রেশম, গম, তামাক, ধান উৎপাদিত দেশ।
- ১৭তম বিশ্বকাপ ফুটবলে এশিয়ার একমাত্র নতুন যোগদানকারী দেশ।
- প্রাচীন সন্তমাশ্চার্য : চীনের প্রাচীর (৩৪৬০ কি. মি.)।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ সেতু নির্মাণে সহায়তাদানকারী দেশ।

তথ্য কণিকা : মধ্য প্রাচ্য

- প্রাচীন সপ্তম আশ্চর্যের একটি : ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান (ইরাকে)।
- মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান খনিজ পদার্থ : পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য।
- শীতল মরু জলবায়ুর অন্তর্গত দেশ : ইরান।
- ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত দেশ : প্যালেস্টাইন।
- উষ্ণ মরু জলবায়ুর অন্তর্গত দেশ : জর্ডান।
- মধ্যপ্রাচ্যের ঘনবসতিপূর্ণ দেশ : লেবানন।
- আয়তনে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় দেশ : সৌদি আরব।

তথ্য কণিকা : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশটি কখনো কোন দেশের উপনিবেশ ছিল না : থাইল্যান্ড
- এশিয়া তথা বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম (জনসংখ্যায়) দেশ : ইন্দোনেশিয়া।
- পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ রাবার উৎপন্ন হয় : মালয়েশিয়া।
- বিশ্বে দ্বীপ রাষ্ট্র বলে খ্যাত : ইন্দোনেশিয়া।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নগর রাষ্ট্র বলে খ্যাত : সিঙ্গাপুর।
- প্রাচ্যের ভেনিস : থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক।
- ১৯২তম স্বাধীন দেশ : পূর্ব তিমুর (ইন্দোনেশিয়া + পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল)।

দক্ষিণ এশিয়া

- দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা : সিন্ধু সভ্যতা।
- দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে নোবেল পান : অমর্ত্য সেন (১৯৯৮ সালে)
- দক্ষিণ এশিয়ার সর্ব প্রথম সাহিত্যে নোবেল পান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩ সালে)।
- দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জাতিসংঘ মহাসচিব : উথান্ট, মায়ানমার (১৯৬১-১৯৭১ সাল)।
- দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বিকেএসপি, বাংলাদেশ।
- দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তির এলাকা ঘোষিত মৈত্রী চুক্তি : আসিয়ান (১৯৭৬ সালে), বাংলাদেশ এর সদস্য নয়।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী : শ্রীমাভো বন্দরানায়েকে (শ্রীলংকা)।
- ইসলামি বিশ্বের প্রথম মহিলা সরকার প্রধান : বেনজীর ভুট্টো।

এশিয়ার পাহাড়/পর্বত

- মাউন্ট এভারেস্ট (সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ) : চীন-নেপাল সীমান্তে।
- সর্বপ্রথম এভারেস্ট বিজয়ী : তেনজিং শেরপা, মহিলা-জুনাকো তাবেই (জাপান)।
- হিমালয় (সর্ব বৃহৎ পর্বত শ্রেণি) : নেপাল ও ভারতের কিছু অংশ।
- গড উইল অস্টিন (২য় বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ) : ভারত পাকিস্তান সীমান্তে।
- কারাকোরাম পর্বত শ্রেণি : এশিয়ার সাতটি দেশের সীমান্তে।
- সোলেমান ও খিরথর : পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে।
- অন্নপূর্ণা পর্বত : নেপাল।
- পামীর মালভূমি : চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারত সীমান্তে।

এশিয়ার প্রণালি

- বেরিং প্রণালি : এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা (পৃথক করেছে) উত্তর সাগর ও বেরিং সাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- সান্দা প্রণালি : সুমাত্রা ও জাভা (পৃথক করেছে)।
- ভারত মহাসাগর ও জাভা সাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- পক প্রণালি : ভারত ও শ্রীলংকা (পৃথক করেছে)
- বঙ্গোপসাগর ও মান্নার উপসাগর (সংযুক্ত করেছে)
- তাইওয়ান (সাবেক ফরমোজা) প্রণালি : চীন ও তাইওয়ান (পৃথক করেছে) পূর্ব চীন সাগর ও দক্ষিন চীন সাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- ১০ নং চ্যানেল : আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে পৃথককারী।
- মালাক্কা প্রনালি : সুমাত্রা ও মালয়েশিয়াকে পৃথককারী।
- কোরিয়া প্রণালি : জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথককারী
- পূর্ব চীন সাগর + জাপান সাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- ম্যাকাসার প্রণালি : বোর্নি ও সেলিবেসকে পৃথক করেছে সেলিবিস সাগর ও জাভা সাগরকে (সংযুক্ত করেছে)।

এশিয়া দ্বীপ

দ্বীপ	অবস্থান
হোক্কাইডো + কিনশু ও হনশু	জাপান
মিন্দানাও	ফিলিপাইন
স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ	দক্ষিণ চীন সাগর
চীন	বোর্নিও + জাভা + সুমাত্রা + জাফনা
ইন্দোনেশিয়ালাক্ষ দ্বীপ	ভারত মহাসাগর
দিয়াগো গার্সিয়া	ভারত মহাসাগরে, (মার্কিন সামরিক ঘাটি)
ভলকানো দ্বীপপুঞ্জ	প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত জাপানের দ্বীপপুঞ্জ
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	ভারত মহাসাগর (ভারত)
দক্ষিণ তালপট্টি (পূর্বাশা/নিউমুর)	বাংলাদেশ, ভারত
দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলংকা	ভারত মহাসাগর
মান্নারদ্বীপ	ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যবর্তী জলরাশিতে
বাহরাইন দ্বীপ	পারস্য উপসাগর
কোরিয় উপদ্বীপ	জাপান সাগর ও পীতসাগর এর মধ্যে অবস্থিত.
বৃহত্তম লবণ হ্রদ (ঘনত্বে)– ডেড সি–	জর্ডান ও ইসরাইলের মাঝে।
বলখাস হ্রদ	কাজাকাস্তান।
মরুসাগর	প্যালেস্টাইন।
পৃথিবীর দীর্ঘতম খাল	গ্রান্ড ক্যানেল (চীনে)।

এশির অন্তর্গত কী, কোথায় অবস্থিত

- ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান : ইরাক, নেবুচাদ নেজার কর্তৃক নির্মিত, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে।
- চীনের প্রাচীর (গ্রেট ওয়াল) : চীনে, মহাকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠের এ অংশ দেখা যায়।
- পবিত্র কাবা ঘর : মক্কা, সৌদি আরব।
- পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার : কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
- ডেমোক্রেসি স্টাচু স্মৃতি সৌধ : বেইজিং, চীন।
- রাইটার্স বিল্ডিং : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যালয়।
- সিংহ দরবার : কাঠমুন্ডু, নেপাল, নেপাল সরকারের সদর দপ্তর।
- ব্লু হাউস : সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া, প্রেসিডেন্ট-এর বাস ভবন।
- মালকানাং প্রাসাদ : ম্যানিলা, ফিলিপাইন, প্রেসিডেন্ট-এর বাস ভবন।
- বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত তীর্থস্থান তক্ষশীলা : পাকিস্তান।
- স্ট্রাচু অব পিস : নাগাসাকি, জাপান, (৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র এখানে বোমা ফেলে)।

- স্ট্রাচু অব ডেমোক্রেসি : হংকং, সিঙ্গাপুর।
- গণতন্ত্র চত্বর (ডেমোক্রেসি স্কয়ার) : নমপেন, কম্বোডিয়া।
- অজন্তা ও ইলোরা : ভারতের মহারাষ্ট্র (গুহা শিল্পের জন্য বিখ্যাত)।
- সিয়াচেন প্রদেশ : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে।
- গ্রেট হল : বেইজিং, চীন।
- তিয়েন আনমেন স্কয়ার : বেইজিং, চীন।
- বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ক্যান্ডি : মধ্য শ্রীলংকা।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতা : ইরাকে, পঞ্জিকা প্রথার প্রচলক।
- জনপথ রোড : নয়াদিল্লী, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন।
- পাতাল প্রাসাদ : তিব্বত।
- খোদাইবিয়া রাজপ্রাসাদ : বাহরাইন।
- মালাবার হিল : মুম্বাই, ভারত।
- ম্যাকাও : এক সময়ের পর্তুগীজ কলোনী, বর্তমানে চীনের অঙ্গীভূত।
- মাজার-ই-শরীফ : আফগানিস্তান।
- স্বর্ণ মন্দির + কুতুবমিনার + তিন মূর্তি ভবন : দিল্লী।
- শাত আল আরব : ইরাক ও ইরানের মাঝে অবস্থিত।
- গোলান মালভূমি : সিরিয়া ও ইসলাইলের বিতর্কিত ভূমি।
- সিমলা : ভারত (হিমাচল প্রদেশের রাজধানী)।
- আল আকসা মসজিদ : জেরুজালেম।
- মিন্দানাও দ্বীপ : ম্যানিলা, ফিলিপাইন (মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপ)।
- আনন্দভবন : এলাহাবাদ।
- গোলযোগপূর্ণ অনন্তনাগ : কাশ্মীর।
- সালান গিরিপথ: আফগানিস্তানের উত্তর : দক্ষিণাঞ্চলীয় পৃথককারী মহাসড়ক।

এশিয়ার স্মরণীয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিকর্ম

নাম	দেশ	যা দ্বারা বিখ্যাত
হযরত মোহাম্মদ (সঃ)	মক্কা	ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল
আল বেরুনী	ইরাক	ভূগোলবিদ
ইবনেসিনা	ইরাক	রসায়নবিদ,চিকিৎসাবিদ,গণিতবিদ,জোতির্বিদ, দার্শনিক ও ভাষাবিদ
আল্লামা ইকবাল	পাকিস্তান	সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু কবি
সি. ভি. রমন	ভারত	রমনএফেক্ট আবিষ্কার করেন/ উপমহাদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী
হো-চী-মিন	ভিয়েতনাম	ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	পশ্চিম বাংলা, ভারত	পূর্ববঙ্গতথা পাকিস্তানের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী
হাসন রাজা	বাংলাদেশ	মরমী কবি
সত্যজিৎ রায়	ভারত	প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা
শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক	বাংলাদেশ	প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত, ঋণসালীসি বোর্ডের প্রবর্তক বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
সুভাষচন্দ্র বসু	ভারত	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।
শ্রী চৈতন্যদেব	পশ্চিম বাংলা, ভারত	বৈষ্ণব মতবাদের প্রবর্তক
স্যার সৈয়দ আহমেদ	ভারত	বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক
শেরপা তেনজিং	নেপাল	সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয় (১৯৫৩ সালে)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারত	বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক
ওমর খৈয়াম	ইরান	পারস্যের বিখ্যাত কবি ও জোতির্বিদ

http://thejobstudy.com Go to Contents

জওহরলাল নেহেরু	ভারত	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী
স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	বাংলাদেশ	উদ্ভিদের জীবন আবিষ্কারক
জয়নুল আবেদীন	বাংলাদেশ	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী
গোল্ডামেয়ার	ইসরাইল	ইসরাইলের সাবেক মহিলা প্রধানমন্ত্রী
আহমেদ সুকর্ন	ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট
জেনারেল সুহার্তো	ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট
আলেকজান্ডার	গ্রিস	মেসিডেনিয়ার সম্রাট
অশোক	ভারত	ভারতীয় রাজা
রাজা রামমোহন রায়	ভারত	ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা
ফা-হিয়েন	চীন	চীনা পরিব্রাজক
স্বামী বেবেকানন্দ	ভারত	হিন্দু ধর্মযাজক ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা
গৌতমবুদ্ধ	নেপাল	বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক
সম্রাট বাবর	ভারত	ভারতে মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
গুরু নানক	পাকিস্তান	শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	ভারত	ভারতের জনক
আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী	ইরান	ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট
টেংকু আবদুর রহমান	মালয়েশিয়া	মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা
আবুল কালাম আজাদ	ভারত	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা

এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রীয় বিবরণ ঃ পরিচিতি,রাজনীতি ও অর্থনীতি

দক্ষিণ এশিয়া

১. ভারত, ২. বাংলাদেশ, ৩. মায়ানমার, ৪. পাকিস্তান, ৫. আফগানিস্তান, ৬. শ্রীলঙ্কা, ৭. নেপাল, ৮. ভুটান, ৯.মালদ্বীপ।

Note : দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্র ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ভারতের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটেনের নিকট স্বাধীনতা লাভ করে।
- ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় : ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে।
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু।
- ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী।
- ভারতে মোট রাজ্যের সংখ্যা : ২৯টি (সর্বশেষ তেলেঙ্গানা)।
- ভারতের লোকসভার আসন সংখ্যা : ৫৪৫ টি।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন সংখ্যা : ২৯৫টি।
- কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯৪৭ সালে।
- ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল হলেন ১৫তম রাষ্ট্রপতি(মহিলা হিসেবে প্রথম)।
- ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
- ভারতের ইতিহাসে প্রথম অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হন : ড. মনমোহন সিং।
- ভারতে কতজন মুসলিম প্রেসিডেন্ট ছিল : ৩ জন (১ম-জাকির হোসেন, ২য়-ফখরুদ্দিন আহমদ, ৩য়-এ.পি.জে. আবুল কালাম আজাদ)।
- জাতিসংঘের প্রথম মহিলা সভানেত্রী ছিলেন : বিজয় লক্ষী পণ্ডিত।
- ভারতের জম্মু কাশ্মির রাজ্যের রাজধানী : শ্রীনগর-গ্রীষ্মকালীন,জম্মু-শীতকালীন।
- ভারতের বর্তমান লোকসভার ২১তম স্পিকার (২য় নারী): সুমিত্রা মহাজন(১ম নারী স্পিকার-মীরা কুমার)।
- ঐতিহাসিক 'নাথুলা' পাস যে দুটি দেশের সীমান্ত বাণিজ্য পথ : ভারত-চীন
- 'নাইটেঙ্গেল অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন : সরোজিনী নাইডু।
- উপমহাদেশের রাজনীতিতে 'লৌহমানবী' নামে পরিচিতি : ইন্দিরা গান্ধি।
- ভারতের মিসাইল ম্যান বলা হয় এ. পি. জে. আবুল কালামকে।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চালুকৃত ট্রেনের নাম সমঝোতা এক্সপ্রেস।
- ভারতের প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন।
- 'লাদাখ' নিয়ে চীনের সাথে দ্বন্দ্ব আছে।

- ভারতের সংবিধান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান।
- ভারত একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে স্বাধীনতার পর থেকে গণতন্ত্র চালু আছে।
- সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে।
- ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধির হত্যাকারীর নাম নলিনী তিনি LTTE-এ সদস্য ছিলেন। নলিনীর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য আবেদন করেন রাজিবগান্ধির স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী, নলিনীর দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার পরবর্তী বেড়ে উঠার জন্য।
- ভারত প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সালে এবং সর্বশেষ বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৯৮ সালে।
- নোবেল জয়ী মাদার তেরেসা মৃত্যুবরণ করেন : ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সালে।
- মাদার তেরেসা প্রতিষ্ঠিত 'মিশনারি অব চ্যারিটিজ' প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৫০ সালে।
- ১৯৭৯ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী 'মাদার তেরেসা' নাগরিকত্ব লাভ করেন : ভারতের।
- ১৯৯৮ সালে চলচ্চিত্রে অস্কার বিজয়ী সত্যজিৎ রায় : ভারতের নাগরিক।
- ভারতের বিখ্যাত বোফোর্স কেলেংকারীর সাথে জড়িত ছিলেন : রাজীব গান্ধি।
- বিশ্বের সপ্তাচার্যের অন্যতম ভাস্কর্য তাজমহল অবস্থিত : আগ্রা, ভারত।
- ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয় কবে : ১৫২৮ সালে।
- ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নির্মাতা : সম্রাট বাবর।
- অযোধ্যার ঐতিহাসিক 'বাবরী মসজিদ' মৌলবাদী হিন্দু কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে।
- ভারতের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় গঠিত কমিশনের নাম : লিবারহ্যান কমিশন।
- ভারত তথা বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত বহুল স্থানের নাম : চেরাপুঞ্জি, ভারত।
- 'সেভেন সিস্টারস' : ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য (অরুনাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, আসাম, মনিপুরি)।
- ভারতের সাংবিধানিক ভাষার সংখ্যা : ১৯টি।
- ভারতের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা : বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঠিত কমিশনের নাম : কল্যাণ রুদ্র কমিশন।
- ২৪ নভেম্বর ২০১১ নিহত হওয়া ভারতের সিপিআই (মাওবাদী) নেতা কিষেনজির প্রকৃত নাম : মালাওজুলা কোটেশ্বর রাও।
- 'ব্রহ্মপুত্রের কবি' হিসেবে কাকে ডাকা হতো : ভূপেন হাজারিকা।
- ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ ভারতের কোন রাজ্য সরকার বাংলাকে সেখানকার দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় : ঝাড়খন্ড।
- ভারতের দুর্নীতিবিরোধী সমাজকর্মী আন্না হাজারে কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ : ১৫ জুন ১৯৩৭, মহারাষ্ট্র, ভারত (তার আসল নাম কৃষাণ বাবুরাও হাজারে)।
- ভারতে কোন রাজ্যগুলো রেড করিডোর নামে পরিচিত : অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ড।
- শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দির অবস্থিত : ভারতের কেরালায়।
- ভারতের ক্ষমতাসীন দলের নাম : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।
- ভারতীয় মুদ্রা রুপির প্রতীক : এর নকশাকার - উদয় কুমার।
- ভারতের প্রথম মুসলমান প্রধান নির্বাচন কমিশন (CEC) : শাহাবুদ্দিন ইয়াকুব কোরাইশি।
- ২১ মার্চ ২০১০ বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে ভারত কোন হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল পরীক্ষা চালায় : ব্রহ্ম।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মারা যান কবে : ১৭ জানুয়ারি ২০১০।
- জ্যোতি বসুর পিতৃপুরুষের আদি নিবাস : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের বারদীতে।
- ভারত কর্তৃক নির্মিতব্য টিপাইমুখ বাঁধ কোন নদীর ওপর : বরাক নদী।
- টিপাইমুখ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত : মণিপুর।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে পাকিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটেনের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় : ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে।
- পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল-করাচি (১৯৪৭-১৯৫৯)। এটি দেশের বৃহত্তম শহর।
- পাকিস্তান ধারণাটির রুপরেখা প্রণয়ন পেশ করেন : কবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল।
- পাকিস্তানের জাতীয় প্রতিকের নাম : অর্ধচন্দ্র।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম : ইস্কান্দার আলী খাঁন।

- পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন : লিয়াকত আলী খাঁন।
- পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ (১৮ তম)।
- পাকিস্তানের জাতির পিতা : কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক : আব্দুল কাদির খাঁন।
- Daughter of the East নামে খ্যাত বেনজির ভুট্টো : ২৭ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে নিহত হন।
- ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক বোমার সফল বিস্ফোরন ঘটায়।
- পাকিস্তানের শান্তি রক্ষিবাহিনীর নাম : রেঞ্জার্স।
- বিখ্যাত সোয়াত উপত্যকা : পাকিস্তানে।
- করাচীকে পাকিস্তানের প্রবেশদ্বার বলা হয়।
- হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল।
- পাকিস্তান তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম : বেনজির ভুট্টো। (নিহত হন ২২ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে।)
- পাকিস্তানের প্রথম গর্ভনরের নাম : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক : ড. কাদির খান।
- পাকিস্তান সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় : ২৮ ও ৩০ মে, ১৯৯৮ সালে।
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের নাম : পাকিস্তান (৯৭% মুসলিম)।
- পাকিস্তানের প্রবেশ দ্বার বলা হয় : করাচিকে।
- পাকিস্তানের অঙ্গ রাজ্য কয়টি : ৪টি, পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব বেলুচিস্তান ও সিন্ধু।
- বৌদ্ধ সভ্যতার জন্য বিখ্যাত তক্ষশীলা কোথায় : পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে।
- শিয়ালকোর্ট বিখ্যাত : খেলাধুলার দ্রব্য সামগ্রীর জন্য।
- বিশ্বখ্যাত সিন্ধু সভ্যতা কোথায় অবস্থিত : পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে।
- লস্কর-ই-তৈয়বা এবং লস্কর-ই-জাগবী কোন দেশের নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন : পাকিস্তানের।
- 'ইন দ্য লাইন অব ফায়ার' : পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের একটি আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ।
- পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে : ২১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে (ফিরে আসে- ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ সালে)।
- 'সিক্রেট পাকিস্তান' কী : প্রামাণ্য চিত্র। বিবিসি'র দুই পর্বের এ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব প্রচারিত হয় ২৬ অক্টোবর ২০১১।
- পাকিস্তানের সংবিধানের ১৮তম সংশোধনী অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে : খাইবার পাখতুনখ্বা (অর্থ : পাখতুন ভুখন্ডের খাইবার অংশ)।
- পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের নতুন রাজনৈতিক দলের নাম : অল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (APML)।
- পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ধ্বংসে ভারত কোন আক্রমণাত্মক মতবাদ গ্রহণ করেছে : কোল্ড ষ্টার্ট ওয়ার ডক্ট্রিন
- পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় পরিচালিত তালেবান বিরোধি অভিযানের নাম : Operation Black Thunderstorm.

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে আফগানিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে : ১৯৭৩ সালে।
- আফগানিস্তানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯ জুলাই, ১৯৭৩ সালে।
- আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন : দাউদ খাঁ।
- আফগানিস্তানের শেষ বাদশাহর নাম : জহির শাহ (মৃত- জুলাই, ২০০৭ সালে)।
- আফগানিস্তানের মোট প্রদেশের সংখ্যা : ৩৪টি।
- এটি land locked country.
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পপি উৎপন্ন হয় এখানে।
- আফগানিস্তান সার্কের ৮ম সদস্য।
- আফগানিস্তানের জাতীয় প্রতীক ৩০ পরী।
- তালেবান নামক বিদ্রোহী গোষ্ঠী এখানে রয়েছে।
- আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম : দ্যা আফগানিস্তান ব্যাংক।
- আফগানিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি।
- ২০০১ সালে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে।

- সম্প্রতি আফগানিস্তানে অপারেশন অ্যানাকোন্ডা ও খঞ্জর চালানো হয়।
- আফগানভিত্তিক সংগঠন হাক্কানি নেটওয়ার্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা : জালাল উদ্দিন হাক্কানি। (১৯৮০ সালে হাক্কানি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। তখন থেকেই এ গোষ্ঠী আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাত)।
- NATO : ২০১৪ সালে আফগানিস্তান ত্যাগ করে।
- আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে তালেবান দমনে দখলদার মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী কোন অপারেশন শুরু করে : অপারেশন মুশতারাক (মুশতারাক-এর অর্থ 'ঐক্যবদ্ধ') ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ শুরু হয়।
- আফগানিস্তান বিষয়ক দ্য লন্ডন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় : ২৮ জানুয়ারি ২০১০।
- আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম : নোশক (উচ্চতা- ৭,৪৯০ মিটার)।
- বিশ্বের একক বৃহত্তম শরণার্থীর দেশের নাম : আফগানিস্তান।
- ওসামা-বিন-লাদেনের সংগঠন আল-কায়েদা আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে : ১৯৮৮ সালে।
- বর্তমান বিশ্বের কতটি দেশে আল-কায়দার নেটওয়ার্ক আছে : ৩৩ টি দেশে।
- আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন ঘটে : ৭ ডিসেম্বর, ২০০১ সালে।
- আফগানিস্তানে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয় : ১৯৭৮ সালে।
- লয়া-জিরগা কি : আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নাম।
- আফগানিস্তানের প্রধান ভাষার নাম : পশতু।
- আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা : ২৪৯ টি।
- মধ্য এশিয়ার স্থল বেষ্টিত দেশের নাম : আফগানিস্তান।
- আফগানিস্তানে যোগাযোগের কোনপথটি নেই : রেলপথ।
- আফগানিস্তানের জাতীয় বীরের নাম : বুরহানুদ্দিন রাব্বানী।
- আফগানিস্তানে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একমাত্র মহিলা প্রার্থীর নাম : ড. মাসুদা জালাল।
- আফগানিস্তানের পল্লী উন্নয়নে কাজ করে কোন সংস্থা : ব্র্যাক, বাংলাদেশ।
- আফগানিস্তানের উপর জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করে : ১৪ নভেম্বর ১৯৯৪।
- আফগানিস্তানের জাতীয় পতাকা সংবিধানে গৃহীত হয় : ১৯৬৪ সালে।
- গজনি আফগানিস্তানে অবস্থিত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে নেপালের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- নেপালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৫১ সালে।
- নেপালে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় : ১৯৯০ সালে।
- নেপালে ১ম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় : ১১ মে, ১৯৯১ সালে।
- নেপালে জাতীয় সংসদ (কংগ্রেস) আসন সংখ্যা : ২০৫ টি।
- নেপালে পঞ্চায়েত প্রথার বিলোপ ঘটে : ১৯৯০ সালে।
- ১৮তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : কাঠমুন্ড, ২০১৪ সালে
- মাওবাদী গেরিলা সংস্থা : নেপালের।
- প্রজাতান্ত্রিক নেপালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন : মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দাহাল প্রচন্ড।
- নেপালের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম : শীতল নিবাস।
- প্রজাতান্ত্রিক নেপালে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় : ২১ জুলাই, ২০০৮ সালে (৬০১ আসনের মধ্যে ডা. রামবরণ যাদব এর নেপালি কংগ্রেস পান ৩০৮টি ভোট)।
- নেপাল সরকার দাস শ্রম প্রথা বিলুপ্ত করেন : ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সালে।
- নেপালের বর্তমান ও প্রথম প্রেসিডেন্ট : ডা. রামবরণ যাদব।
- নেপালের সমুদ্রবন্দর না থাকায় কোন দেশের সমুদ্রবন্দর দিয়ে বাণিজ্য পরিচালনা করে : ভারত।
- ভারতীয়দের যে দেশে প্রবেশের জন্য কোন পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় না : নেপাল।
- ২০০৬ সালের ১৮ এপ্রিল নেপাল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই কোন সম্প্রদায়ের লোক : গুর্খা সম্প্রদায়।
- নেপালে দীর্ঘ ২৩৯ বছর রাজতন্ত্র চালু ছিল।
- নেপালের শেষ রাজা জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ।
- নেপালকে হিমালয়ের কন্যা বলা হয়।
- নেপালিরা হিমালয়কে সাগর মাতা বলে ডাকে।
- নেপালের কাঠমুন্ডতে সার্কের সচিবালয় অবস্থিত।

- নেপালে পঞ্চায়েত প্রথার বিলোপ ঘটে : ১৯৯০ সালে।
- নেপাল প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে : ৭ আগস্ট, ২০১১।
- ২০ জানুয়ারি ২০১০ কোন দেশকে কুষ্ঠরোগমুক্ত ঘোষণা করা হয় : নেপাল।
- জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে নেপাল সরকার মাউন্ট এভারেস্টে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন : ৪ ডিসেম্বর, ২০০৯।
- নেপালের মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠে সেপ্টেম্বর-০৭ থেকে কীসের ছবি থাকবে : এক পৃষ্ঠে চাষরত একজন কৃষক ও অপর পৃষ্ঠে মাউন্ট এভারেস্ট : এর ছবি।
- মাওবাদী গেরিলাদের তৎপরতা রয়েছে : নেপালে।
- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওবাদীরা আন্দোলন শুরু করে : ১৯৯৬ সালে।
- সরকারিভাবে ঘোষিত বিশ্বের একমাত্র হিন্দু প্রধান দেশের নাম : নেপাল।
- সার্কভুক্ত কোন দেশটির আয়তন প্রায় বাংলাদেশের সমান : নেপালের (১,৪৭,১৮২ বর্গ কি.মি.)।
- নেপালের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে : পর্যটন শিল্প থেকে।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত : নেপালে।
- নেপালের দীর্ঘতম নদীর নাম : কালীগন্ডক।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে শ্রীলংকার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- শ্রীলংকা স্বাধীনতা লাভ করে ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে (বৃটেনের নিকট থেকে)।
- শ্রীলংকায় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় : ২২ মে, ১৯৪৮ সালে (পার্লামেন্টের আসন- ২২৫ টি)।
- শ্রীলংকায় গ্রহযুদ্ধ শুরু হয় : ১৯৮৩ সালে।
- শ্রীলংকা সরকার ও তামিল টাইগারদের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী নরওয়ের শান্তিদূতের নাম : জন হান সেন।
- শ্রীলংকার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম : সলোমন বন্দর নায়েকে (১৯৫৬-১৯৫৯ পর্যন্ত)।
- শ্রীলংকা তথা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম : শ্রীমাভো বন্দর নায়েকে (১৯৬০-১৯৬৬)।
- শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের মেয়াদ : ৬ বছর।
- 'টেম্পল ট্রি' : শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
- এশিয়ার একমাত্র বৌদ্ধ রাষ্ট্রের নাম : শ্রীলংকা।
- শ্রীলংকার বৌদ্ধদের তীর্থ ক্ষেত্রের নাম : অনুরাধাপুর।
- শ্রীলংকায় অ্যাডামস ব্রীজ রয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের কোন গেরিলা সংস্থাকে শীর্ষ সন্ত্রাসবাদী এবং বিশ্বের জন্য হুমকি বলে ঘোষণা করে : LTTE .
- বিশ্বের কোন গেরিলা সংস্থার নিজস্ব বিমান, নৌ ও সেনা সদস্য রয়েছে : LTTE
- সম্প্রতি আলোচিত মুসলমান অধ্যুষিত শহর 'সত্তর' কোন দেশে অবস্থিত : শ্রীলংকা।
- শ্রীলংকা সরকার ও LTTE এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : থাইল্যান্ডে।
- অনুরাধাপুর কোথায় অবস্থিত : শ্রীলংকায়। (এটি শ্রীলঙ্কার অন্যতম প্রাচীন রাজধানী)।
- মা মেয়ে একসাথে ক্ষমতায় ছিল : শ্রীলংকায়।
- শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট : মাইত্রিপালা সিরিসেনা।
- এশিয়ার একমাত্র দেশ যেখানে প্রায় সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় : শ্রীলংকায়।
- শ্রীলংকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে : পক প্রণালি।
- আদম ব্রীজ এবং মুসলমান অধ্যুষিত মান্নার দ্বীপটি কোথায় : শ্রীলংকায়।
- আলোচিত 'Elephant pass' কোন দেশে অবস্থিত : শ্রীলংকায়।
- বিশ্বের কোন দেশে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি : শ্রীলংকায় (প্রতি হাজারে ৫৬ জন)।
- বিশ্বের একমাত্র সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গেরিলা সংগঠনের নাম : এলটিটিই।
- শ্রীলংকার এলটিটিই গেরিলা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে : ১৯৭৮ সালে।
- শ্রীলংকা সরকার ও এলটিটিইর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : থাইল্যান্ডে।
- শ্রীলংকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম : পদ্রো তালাগালা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ভুটানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- বজ্রপাতের দেশ বলা হয় : ভুটানকে।
- ভুটানের স্থানীয় নাম : ড্রাক ইউল।
- ড্রাগন মানুষের দেশ হিসাবে পরিচিত : ভুটান।
- ভুটানের পার্লামেন্টের নাম : মোংদু।

- বর্তমান বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাজা : ভুটানের বর্তমান রাজা জিগমে খেসার নামগিয়াল ওয়াংচুক।
- বিশ্বের প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ : ভুটান
- ভুটানকে কীসের দেশ বলা হয় : বজ্রপাতের দেশ।
- ভুটান ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম : সিনচুলা চুক্তি(১৮৬৫সালে)।
- G.N. H এর পূর্ণরুপ : Gross National Happiness.
- G.N.H সূচক উদ্ভাবন করেন : ভুটানের সাবেক রাজা জিগমে ওয়াংচুক (১৯৭২)
- ১৬তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ভুটানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ভুটানের জাতীয় খেলা : তিরন্দাজী।
- সার্কভুক্ত কোন দেশে কোন রাজনৈতিক দল গঠনের কোন অধিকার নেই : ভুটানের।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে মালদ্বীপের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইউম বাংলাদেশের কোথায় পড়াশোনা করেছেন : ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
- মালদ্বীপ কোন সাগরে অবস্থিত : ভারত মহাসাগরে।
- এশিয়ার আয়তনে ছোট দেশ : মালদ্বীপ (জনসংখ্যায় ছোট-মালদ্বীপ)।
- সার্কভুক্ত কোন দেশের শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি : মালদ্বীপ।
- সার্কভুক্ত কোন দেশের দূতাবাস নেই বাংলাদেশে : মালদ্বীপের।
- নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই কোন দেশের : মালদ্বীপ ।
- মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নাশিদ কামাল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ক্ষমতায় আসেন : ড. হাসান মালিক।
- মালদ্বীপের একমাত্র বিমানবন্দর : গন।
- মালদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : আব্দুল ইয়েমেন।
- মালদ্বীপে মামুন আব্দুল গাইউম টানা : ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে মায়ানমারের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- মায়ানমারের নতুন সরকারি নাম : দ্য রিপাবলিক অব দ্য ইউনিয়ন অব মিয়ানমার।
- মায়ানমার দেশের সরকারি নাম, পতাকা ও জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করে : ২২ অক্টোবর, ২০১০ সালে।
- মিয়ানমারে চলমান সামরিক শাসন শুরু হয় : ১৯৬২ সালে।
- বার্মার নাম মিয়ানমারে রূপান্তির করা হয় : ১৯৮৯ সালে।
- মিয়ানমার ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় : ১৯৩৭ সালে।
- মিয়ানমার ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত হয় : ১৮৮৬ সালে।
- আকিয়াব কোন দেশের সমুদ্র বন্দর : মিয়ানমারের।
- মিয়ানমারের বিরোধী দলীয় নেত্রীর নাম : অং সান সুচী।
- অন সান সুচীর রাজনৈতিক দলের : এনএলডি (গঠিত হয়-১৯৮৮ সালে)।
- রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা কোন দেশের অধিবাসী : মিয়ানমারের।
- বর্ডার গার্ড পুলিশ (BGP) সীমান্ত বাহিনী : মিয়ানমারের।
- স্বাধীনতার জন্য কোন দেশে 'কারেন বিদ্রোহীরা' যুদ্ধরত : মিয়ানমারে।
- 'গর্ডস-আর্মি' কোন দেশের অন্যতম গেরিলা সংগঠন : মিয়ানমারের।
- মিয়ানমারের পরিবর্তিত নতুন রাজধানীর নাম : নাইপিদো।
- মিয়ানমারের দীর্ঘতম নদীর নাম : ইরাবর্তী।
- মায়ানমারের সামরিক জান্তা কী নামে পরিচিত : স্টেট 'ল' এন্ড অর্ডার রেস্টরেশন কাউন্সিল।
- রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা কোন দেশের অধিবাসী : মায়ানমারের।
- অং সান সুচীর রাজনৈতিক দল NLD কে মায়ানমারের জান্তা সরকার বিলুপ্ত ঘোষণা করেন : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সালে।
- সম্প্রতি মিয়ানমারের নতুন সংবিধানের জন্য কবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় : ১০ মে, ২০০৮ সালে।
- মায়ানমারের বর্তমান সামরিক জান্তা প্রধানের নাম : থান শোয়ে।
- সম্প্রতি মায়নামারের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আন্দোলন কী নামে পরিচিত : জাফরানি বিপ্লব
- এশিয়ার কোন দেশে গণতন্ত্রায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয় : মিয়ানমারে।
- মায়ানমারের সামরিক জান্তার সংগঠনের নাম : State Peace and Development Council (SPDC).
- মংডু সীমান্ত শহরটি কোথায় অবস্থিত : বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তে।
- বৃটিশ উপনিবেশ হয়েও মিয়ানমার কোন সংস্থার সদস্য নয় : Commonwealth.

http://thejobstudy.com Go to Contents

- মায়ানমারের আইন সভার নাম : পিদাংসু হুততাও (Pyidaungsu Huttaw).
- ইংরেজি নাম : ইউনিয়ন অ্যাসেম্বলি।
- মিয়ানমারের আইন সভা কত কক্ষবিশিষ্ট : দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট
- অংসান সুচীর দেড় দশকের গৃহবন্দিত্ব থেকে কবে মুক্ত হন : ১৩ নভেম্বর ২০১০ সালে।
- মিয়ানমারের বর্তমান সামরিক জান্তা কবে ক্ষমতা দখল করে : ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে।
- ২য় বিশ্ব যুদ্ধের সময় মায়ানমারে বোমা হামলা করে : জাপান।
- জাতিসংঘের ৩য় মহাসচিব উথান্ট মায়ানমারের অধিবাসী।
- মায়ানমারের গণতন্ত্রীপন্থী নেত্রী অংসান সুচী : ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।
- কুখ্যাত ইয়ানসেন কারাগারটি : মায়ানমারে।
- মায়ানমার অবস্থিত : ইরাবতী নদীর তীরে।
- বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মধ্যে বিভক্তকারী নদী : নাফ নদী।
- কারেন বিদ্রোহী গোষ্ঠী মায়ানমারের।
- গর্ডস আর্মি মায়ানমারের।
- সোনালী প্যাগোডার দেশ বলা হয় : মায়ানমারকে।
- অং সান সুচীর দল NLD নির্বাচিত হয়েও ক্ষমতায় যেতে পারে নি : ১৯৯০ সালে
- NLD এর পূর্ণ নাম হচ্ছে : National League for Democracy.
- মিয়ানমার স্বাধীনতা লাভ করে : ১৯৪৮ সালে (বৃটেনের কাছ থেকে)।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

১. ইন্দোনেশিয়া, ২. মালয়েশিয়া, ৩. সিঙ্গাপুর, ৪. থাইল্যান্ড, ৫. ফিলিপাইন, ৬. ব্রুনাই, ৭. পূর্ব তিমুর, ৮. ভিয়েতনাম, ৯. কম্বোডিয়া, ১০. লাওস।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে : ১৭ আগস্ট ১৯৪৫ সালে। (নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে)।
- বহুল আলোচিত স্বাধীনতাকামী দ্বীপ 'আচেহ প্রদেশ' ও 'ইরিয়ান জায়া' অবস্থিত : ইন্দোনেশিয়া।
- ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ গুলো : সুমাত্রা, জাভা, কালিমান্টান, সুলাভেসি ও ইরিয়ান জায়া।
- জেনারেল সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা দখল করেন : ১৯৬৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
- বিচ্ছিন্নকারী আচেহ প্রদেশের গেরিলা বাহিনীর নাম : ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট।
- ইন্দোনেশিয়ায় পার্লামেন্ট পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার রায় অনুমোদন করে : ১৯৯৯ সালে ২০ অক্টোবর।
- ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের সারি নাইট ক্লাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে : ১২ অক্টোবর ২০০২ সালে (বালি দ্বীপ-একটি পর্যটন শিল্প দ্বীপ)।
- বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া হতে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন চায় কোন দুটি দেশ : ইরিয়ান জায়া এবং আচেহ।
- বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপদেশ : ইন্দোনেশিয়া।
- এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ : বোর্নিও, ইন্দোনেশিয়া।
- জাতিসংঘ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে : ইন্দোনেশিয়া (১৯৬৫ সালে)।
- ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ : পূর্ব তিমুর।
- ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুর দখল করে : ১৯৭৫ সালে।
- জাতিসংঘের অধীনে পূর্ব তিমুরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৯৯ সালে।
- পশ্চিম তিমুরের বর্তমান মর্যাদা : ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ।
- ইন্দোনেশিয়া সরকারের পক্ষে কে কবে পূর্ব তিমুর-এর স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে : মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী, ১৫ আগস্ট, ২০০১ ইং।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দ্বীপবেষ্টিত রাষ্ট্র ১৩ হাজার ৫০০ দ্বীপ রয়েছে।
- ইন্দোনেশিয়া পূর্বে নেদারল্যান্ডের কলোনী ছিল।
- 'গারুদা' ইন্দোনেশিয়ার বিমান সংস্থার নাম।
- 'আনতারা' ইন্দোনেশিয়ার বার্তা সংস্থা।
- ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ASEAN এর সদর দপ্তর রয়েছে।
- ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান সুমিলো বামবাং ইয়োধোয়ানো।
- ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নাম ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া।
- ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক আহমেদ সুকর্ণ।

- জনসংখ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশের নাম : ইন্দোনেশিয়া।
- মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্টের নাম : মেঘবর্তী সুকর্নপত্রী।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্টর নাম : ড. আহমেদ সুর্কন (ক্ষমতা গ্রহণ ১৯৬৭ সালে)।
- ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা : ৪৬০ টি।
- ওপেকের অনাবর মুসলিম এশিয়া দেশের নাম : ইন্দোনেশিয়া।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ কোন দেশে অবস্থিত : ইন্দোনেশিয়ায় (টোবা জ্বালামুখ)।
- বিশ্বের একক বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র অবস্থিত : ইন্দোনেশিয়ায়।
- বান্দুং অবস্থিত : ইন্দোনেশিয়ায়।
- ইন্দোনেশিয়ায় প্রদেশের সংখ্যা : ৩৩টি (সর্বশেষ - সোলায়েসি দ্বীপ)।
- বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ মুভমেন্ট অবস্থিত : ইন্দোনেশিয়ায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে মালয়েশিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- মালয়েশিয়ার জাতীয় দিবস কবে : ৩১ আগস্ট।
- মালয়েশিয়ার রাজা নির্বাচিত : রাজ্যের সুলতানদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে।
- মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানীর নাম : পুত্রজায়া।
- মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : নাজির তুন-রাজ্জাক।
- আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ পদত্যাগ করেন : ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সলে।
- মাহাথির বিন মোহাম্মদ ক্ষমতায় ছিলেন : ২২ বছর (তিনি ১৯৮১ সালে ক্ষমতায় আসেন) (১৯৮১-২০০৩)।
- মাহাথির মোহাম্মদ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাকে কী সম্মানে ভূষিত করা হয় : মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ পুরস্কার 'সেরি মহারাজা মানকু নেগারা (তাঁর স্ত্রী সিতি হাসমাহ মোহাম্মদকে দেয়া হয় 'সেরি সেতিয়া মাহকোতা মালয়েশিয়া)।
- মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব পাওয়ার পর এখন কী নামে সম্বোধন করা হবে : 'তুন'।
- 'বার্নাম' কোন দেশের সংবাদ সংস্থার নাম : মালয়েশিয়া।
- মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ ভবনের নাম : পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার (বিশ্বে ২য়)।
- মালয়েশিয়ার জাতীয় খেলা : ব্যাডমিন্টন।
- মালয়েশিয়ার টেংকু আব্দুর রহমান NAM : এর অন্যতম সংগঠক।
- মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বেশি রাবার উৎপন্ন হয়।
- মালয়েশিয়ার অঙ্গরাজ্য রয়েছে : ১৩টি।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় গুহা 'সারাওয়াক চেম্বার' অবস্থিত : মালয়েশিয়া।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে থাইল্যান্ডের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- থাইল্যান্ড সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের রূপ লাভ করে : ১৯৩২ সালে।
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একমাত্র কোন দেশ কারোর শাসনাধীনে ছিল না : থাইল্যান্ড।
- থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ: মুক্ত ভূমি।
- থাইল্যান্ডের পূর্বনাম : শ্যামদেশ।
- থাই ভাষায় শ্যাম দেশের অর্থ : স্বাধীন।
- শ্যামদেশের নাম থাইল্যান্ড রাখা হয় : ১১ মে, ১৯৩৯ সালে।
- বিশ্বের প্রথম নারিকেল তেলের অয়েল স্টেশন নির্মিত হয় : থাইল্যান্ডে।
- থাইল্যান্ডকে সাদা হাতির দেশও বলা হয়।
- থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাজা।
- থাইল্যান্ডে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক।
- বিখ্যাত সুবর্ণ ভূমি বিমান বন্দরটি থাইল্যান্ড।
- বিখ্যাত 'পাতোয়া' সমুদ্র বন্দরটি এখানে।
- প্রিয়া বিহার নিয়ে কম্বোডিয়ার সাথে থাইল্যান্ডের দ্বন্দ্ব আছে।
- থাইল্যান্ডে ESCAP : এর সদরদপ্তর অবস্থিত।
- থাইল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনোয়াত্রা।
- থাইল্যান্ডে সরকারের সমর্থক দলের নাম হলুদ শার্ট এবং থাকসিন সিনাওয়াত্রার দল বা সমর্থক দলের নাম লাল শার্ট।
- ব্যাংককে প্রাচ্যের ভেনিস বলা হয়।

- 'ডেমোক্রেসি মনুমেন্ট' অবস্থিত : ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
- বিশ্বের কোন দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা 'লাল শার্ট' বাহিনী নামে পরিচিত : থাকসিন সিনাওয়াত্রা (থাইল্যান্ড)।
- 'হলুদ শার্ট' বাহিনী : থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার বিরোধী গ্রুপ।
- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করার কৃতিত্ব থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবলের।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সিঙ্গাপুরের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- সিঙ্গাপুরে কবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিণত হয় : ১৯৬৪ সালের ৯ আগস্ট।
- সিঙ্গাপুর কবে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল : ১৯৬৩ সালে।
- সিঙ্গাপুরে প্রথম সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল : ১৯৯৩ সালের ২৯ আগষ্ট
- সিঙ্গাপুর পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা : ৮৩।
- পৃথিবীর নগর রাষ্ট্র : সিঙ্গাপুর।
- এশিয়ার গার্ডেন সিটি : সিঙ্গাপুর।
- সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপ থেকে কোন প্রণালি দ্বারা পৃথক : জহুর প্রণালি দ্বারা।
- বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : লী হিয়েন লং
- সিঙ্গাপুরকে মুক্ত বন্দর বলা হয়।
- ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের পাশে সুবিক বে নামক স্থানে নৌঘাঁটি স্থাপন করে।
- APEC এর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরের আলেকজান্দ্রিয়া পয়েন্টে।
- বিখ্যাত মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালটি সিঙ্গাপুরে।
- সিঙ্গাপুরে সরাসরি প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে ।
- বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বন্দরের নাম : সিঙ্গাপুর।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ফিলিপাইনের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ৭১০০টি দ্বিপের সমন্বয়ে ফিলিপাইন রাষ্ট্র গঠিত
- ফিলিপাইনে ADB এবং IRRI এর সদরদপ্তর অবস্থিত।
- মিন্দানাও নামক মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপটি ফিলিপাইনে।
- এখানকার স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নাম Moro National Liberation Front (MNLF).
- ফিলিপাইনের কোরাজান আকুইনো এশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।
- স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নাম অনুসারে এই দেশের নামকরণ করা হয়।
- ফিলিপাইন আমেরিকার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে-১৯৪৬ সালে ৪ঠা জুলাই।
- ফিলিপাইনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : বেনিগানো নয়নয় অ্যাকুইনো (১৫তম)
- ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল : ৬ বছর।
- ফিলিপাইনের 'সুবিক বে' থেকে মার্কিন নৌঘাঁটি স্থানান্তরিত করা হয় : সিঙ্গাপুরে।
- মুসলিম মরো বিদ্রোহীদের সাথে ফিলিপাইন সরকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।
- Moro National Liberation Front (MNLF) কোন দেশের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নাম : ফিলিপাইনের।
- মুসলিম মরো বিদ্রোহীদের সঙ্গে ফিলিপাইন সরকার কবে অস্ত্র বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর : ৭ আগস্ট ২০০১।
- 'আবু সায়াফ' কোন দেশের গেরিলা সংগঠনের নাম : ফিলিপাইনের।
- মিন্দানাও দ্বীপের ১৪টি অঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে : ১৯৯৯ সালে।
- মুসলিম আন্দোলনকারীরা কোন নেতার নেতৃত্বে মিন্দানাও দ্বীপে আন্দোলন সংঘটিত করেছিল : নুর মুসলিম।
- এশিয়ার প্রথম নারী তথা ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট কোরাজন অ্যাকুইনো মারা যান : ১ আগস্ট, ২০০৯ সালে।
- ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করে কে এবং কখন-ম্যাজেলন : ১৫২১ সালে।
- ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেন দখল করে : ১৫৪২ সালে।
- মুসলিম অধ্যুষিত মিন্দানাও দ্বীপটি অবস্থিত : ফিলিপাইনে।
- স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপাস নামাঙ্কিত দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যায় : ১৮৯৮ সালে।
- ফিলিপাইনে ২য় নারী প্রেসিডেন্ট : গ্লোরিয়া ম্যাকাপাগাল অ্যারোইয়া।
- ফিলিপাইন স্বায়ত্বশাসন লাভ করে : ১৯৩৪ সালে
- এশিয়ার 'লৌহ্য মানবী' বলে খ্যাত : গ্লোরিয়া ম্যাকালপাগাল অ্যারোইয়া।
- ফিলিপাইন কোন মহাসাগরে অবস্থিত : পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে

⇨ এশিয়ার ক্যাথলিক খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ : ফিলিপাইন
⇨ ফিলিপাইনের আইনসভা কত কক্ষ বিশিষ্ট : দুই কক্ষ বিশিষ্ট
⇨ আপার হাউজের সদস্য সংখ্যা : ২৪ জন এবং হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ সদস্য ২০০ জন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ব্রুনাইয়ের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ ব্রুনাই কত সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের শাসনাধীনে ছিল : ১৯৮৩ সালের, ৩১ ডিসেম্বর।
⇨ ব্রুনাই ব্রিটেনের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হয় : ১৯৮৮ সালে।
⇨ ব্রুনাই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে : ১জানুয়ারি, ১৯৮৪ সালে।
⇨ বিশ্বের কোন দেশে কোন আইন সভা নেই : ব্রুনাই।
⇨ ব্রুনাইয়ের সরকার প্রধান : সুলতান।
⇨ ব্রুনাই এর জনসংখ্যার বেশির ভাগ : মালয়ী।
⇨ চিকিৎসার জন্য কোন অর্থ পরিশোধ করতে হয় না কোন দেশে : ব্রুনাই
⇨ ব্রুনাই এর রাষ্ট্রপ্রধানকে সুলতান বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে পূর্ব তিমুরের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ পূর্ব তিমুর সাবেক পর্তুগীজ কলোনী।
⇨ ১৯৭৫ সালে পর্তুগীজরা চলে গেলে ইন্দোনেশিয়া এটি দখল করে নেয় এবং ২৭তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে।
⇨ পূর্ব তিমুর ২০০২ সালের ২০মে ইন্দোনেশিয়ার নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
⇨ ২০০২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৯১তম সদস্য পদ লাভ করে।
⇨ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক জানানাগুসামাও (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী)।
⇨ পূর্ব তিমুর চন্দন কাঠের জন্য বিখ্যাত।
⇨ এক বিংশ শতাব্দীর প্রথম স্বাধীন দেশের নাম : পূর্ব তিমুর।
⇨ জাতিসংঘের কোন মিশন পূর্বতিমুরের কাজ করছে : UNAMET.

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ভিয়েতনামের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ ভিয়েতনামকে Tiger of Bicycle বলা হয়।
⇨ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে ১৭০ অক্ষরেখা এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত ম্যাকনামারা ইলেকট্রনিক বেস্টনী রয়েছে।
⇨ ASEAN এর ১৬তম তথা সর্বশেষ সম্মেলন ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত হয়।
⇨ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক হোচি মিন।
⇨ উত্তর দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামক পৃথক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে : ১৯৫৪ সালে।
⇨ কোন সালে উভয় ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় : ১ নভেম্বর ১৯৫৫-৩০ এপ্রিল,১৯৭৫ পর্যন্ত
⇨ ভিয়েতনামের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান : State Conucil
⇨ কবে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম একত্রিত হয় : ১৯৭৬ সালের ২ জুলাই।
⇨ ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী নেতা : নাগো দিন দিয়েম।
⇨ ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল : ১৯ বছর ৫ মাস ৪ সপ্তাহ ১দিন।
⇨ লী ডাক থো ছিলেন : ভিয়েতনামি নেতা।
⇨ ভিয়েতনাম একটি পর্বতময় রাষ্ট্র।
⇨ হো চি মিন নামটি জরিত ভিয়েতনামের সাথে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে কম্বোডিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ কম্বোডিয়ার পূর্ব নাম কম্পুচিয়া।
⇨ একে খেমার প্রজাতন্ত্র বলা হয়।
⇨ কম্বোডিয়ার নাগরিকদের পলপট বলা হয়।
⇨ প্রিন্স নরোদম সিহানুক কম্বোডিয়ার রাজতন্ত্র বিলোপ ঘটান।
⇨ 'গণতন্ত্র চত্বর' কম্বোডিয়ায় অবস্থিত।
⇨ কম্বোডিয়া আসিয়ানের সদস্য পদ লাভ করে ১৯৯৯ সালে।

⇨ কম্বোডিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৫সালে।
⇨ খেমারুজ কম্বোডিয়ার রাজনৈতিক দল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে লাওসের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ লাওস land locked country.
⇨ লাওসে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছে : ১৯৭৫ সালের, ২ ডিসেম্বর।
⇨ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশ : লাওস।

দূর প্রাচ্য

১. চীন, ২. জাপান, ৩. উত্তর কোরিয়া, ৪. দক্ষিণ কোরিয়া, ৫. মঙ্গোলিয়া, ৬. তাইওয়ান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে চীনের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চীনা সমাজতন্ত্রের জনক মাওসেতুং তিয়েন আন মেন স্কয়ারে দাড়িয়ে চীনকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৮৯ সালে কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এখানে দাড়িয়ে চীনকে গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণা দেয়।
⇨ চীনে প্রদেশের সংখ্যা : ২৯টি।
⇨ চীনে দাস প্রথার বিলোপ ঘটে : ১০ মার্চ, ১৯১০ সালে।
⇨ চীনে দু'হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে : ১০ অক্টোবর, ১৯১১ সালে।
⇨ চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম : সান ইয়াৎ সেন (১৯১১ সালে)।
⇨ চীনের মহাপ্রাচীর নির্মিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২১৪ সালে যার দৈর্ঘ্য : ২৪০০ কি. মি. বা ১৫০০ মাইল।
⇨ হোয়াংহো নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয়।
⇨ এশিয়ার বৃহত্তম নদী ইয়াং সিকিয়াং চীনে।
⇨ চীন একমাত্র বৃহৎ শক্তি যে WHO এর সদস্য নয়।
⇨ চীন ১৯৬৪ সালে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।
⇨ চীন সর্বাধিক সীমান্তবেষ্টিক দেশ। ১৪টি দেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে।
⇨ হংকং এবং ম্যাকাও এর কারণে চীনে 'এক দেশ দুই নীতি' প্রচলিত আছে।
⇨ চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : জি জিনপিং।
⇨ চীনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : লিকে কিয়ান।
⇨ লাদাখ 'ভূখণ্ড নিয়ে ভারতের সাথে চীনের যুদ্ধ হয় : ১৯৬২ সনে।
⇨ চীনের ভিন্নমতাবলম্বী নেতা লিও জিয়াবো ২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
⇨ জাতিসংঘ চীনের সদস্য পদ বাতিল করে : ১ আগস্ট ১৯৫০ সালে
⇨ ১৯৭১ সালে চীন জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ পুনরায় লাভ করে।
⇨ চীনের জাতীয় প্রতীক সিসাম গাছ।
⇨ নিষিদ্ধ নগরী 'লাসা' চীনের তিব্বতে।
⇨ হংকং চীনের সাথে একত্রিত হয় : ১ জুলাই, ১৯৯৭ সালে।
⇨ হংকং কত বছর বৃটেনের অধীনে ছিল : ১৫৬ বছর।
⇨ হংকং ও চীনের মধ্যে এক দেশ দুই পদ্ধতি চালু থাকবে ২০৪৭ পর্যন্ত।
⇨ হংকং এর শেষ গভর্নর ক্রিস প্যাটেন।
⇨ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জ্বালানি ব্যবহারকারী গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী এবং শক্তি সম্পদ ব্যবহারকারী দেশ : চীন।
⇨ আইট্রআর ই-কাগজ (i2r e-Paper)-এর আবিষ্কারক দেশ : তাইওয়ান।
⇨ ১০ আগস্ট, ২০১১ কোন দেশ প্রথমবারের মতো বিমানবাহী রণতরী চালু করে : চীন।
⇨ তাইওয়ানের 'গণতন্ত্রের জনক' : লি তেঙ হুই।
⇨ তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : লবস্যাং সাঙ্গে।
⇨ 'জে-২০' কোন দেশভিত্তিক যুদ্ধ বিমান : চীন (১১ জানুয়ারি, ২০১১ প্রথম উড্ডয়ন করে)।
⇨ 'তিয়ানজিং' গভীর সমুদ্রবন্দর কোন দেশের : চীন।
⇨ চীন কোন নদীর উৎসমুখে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে : ইয়ারলুং সাংপো।
⇨ চীনে নির্মিতব্য বিশ্বের দীর্ঘতম (Cross-sea) সমুদ্র সেতুর নাম : হংকং-সুহাই-ম্যাকাউ-সেতু।

- চীনের কোন প্রদেশে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করে : জিনজিয়াং প্রদেশ।
- 'তিয়েন আন মেন স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত : চীনে (ছাত্র বিক্ষোভ হয় - ১৯৮৯ সালে)।
- গ্রেট হল কোথায় অবস্থিত : চীনে।
- চীনের কাছে রাশিয়া মানচুরিয়া হস্তান্তরিত করে : ১৯০২ সালের ১৮ জুলাই।
- পর্তুগাল 'ম্যাকাও' দ্বীপকে চীনের নিকট হস্তান্তর করে : ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে।
- ম্যাকাও পর্তুগালের অধীনে ছিল : ৪৪২ বছর।
- এশিয়া মহাদেশে ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বশেষ উপনিবেশের নাম : ম্যাকাও।
- বিশ্বের কোন দেশে 'এক সন্তান নীতি' চালু আছে : চীনে।
- দালাইলামা কোন দেশের ধর্মীয় নেতা : চীনের।
- ফালুন গং': চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন।
- চীনের দুঃখ বলা হয় : হোয়াংহো নদীকে।
- চীনের পূর্ব নাম ক্যাথে।
- জাতিসংঘ গঠনে এশিয়া থেকে প্রস্তাবকারী দেশ চীন
- চীন আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ।
- চীনের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী চীনা কংগ্রেস ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে জাপানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- জাপানকে বলা হয় খণ্ডিত রাষ্ট্র।
- জাপানকে বলা হয় সূর্যদয়ের দেশ।
- বিখ্যাত নারিতা বিমানবন্দর জাপানে।
- "The United Nation University" : জাপানে অবস্থিত।
- জাপানের ৯৪তম প্রধানমন্ত্রী : নাওতো কান।
- জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট পারমাণবিক বোমা ফেলে।
- ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ এ নিক্ষিপ্ত বোমার নাম হল লিটল বয় এবং ৯ আগস্ট ১৯৪৫ এ নিক্ষিপ্ত বোমার নাম হল ফ্যাটম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন দেন।
- G-8 ভুক্ত এশিয়ার একমাত্র দেশ জাপান।
- জাপানের সাহায্য দাতা সংস্থার নাম জাইকা।
- জাপানকে বলা হয় ভূমিকম্পের দেশ।
- জাপানের পূর্ব নাম ছিল নিপ্পন।
- জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট।
- জাপানের ফুজিয়ামাকে পবিত্র পাহাড় বলা হয়।
- জাপানের ওসাকোকে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার বলা হয়।
- জাপানকে বলা হয় প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন।
- ২০১১ সালে ২১-২৩ জুলাই জাপানের কোন শহরকে সামাজিক ব্যবসার নগর (সোশ্যাল বিজনেস সিটি) ঘোষণা করা হয় : ফুকুওয়াকা শহর।
- কোন দেশে ৮.৯ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে : জাপান (১১ মার্চ, ২০১১)।
- ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় : জাপানে।
- জাপানের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নাম : কান্তেই।
- জাপানের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নাম : ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জাপান।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্টক এক্সচেঞ্জকেন্দ্র অবস্থিত : জাপানে।
- কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনে জাপান প্রধান ভূমিকা পালন করে : WTO (World Trade Organization)।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতা দেশ হিসেবে পরিচিত : জাপান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে উত্তর কোরিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- পৃথিবীর সর্বশেষ পারমাণবিক রাষ্ট্র (৮ম)
- ২০০৬ সালে পারমাণবিক বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটায়।
- উত্তর কোরিয়ার পশ্চিমে কোরিয়া উপসাগর।
- উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে পানমুনজাম গ্রাম রয়েছে।
- উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে সানশাইন পলিসি চালু আছে।
- উত্তর কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।
- উত্তর কোরিয়ার আইনসভার নাম পিপলস অ্যাসেম্বলি।
- উত্তর কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল নিহত হন ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ সালে।
- উত্তর কোরিয়ার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ নেতা কিম জং ইল মারা যান : ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ (জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২)।
- উত্তর কোরিয়ার বর্তমান নেতা : কিম জং উন।
- উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের নাম : ওয়ার্কার্স পার্টি।
- উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার নাম : রোডং সিনমুন।
- নর্দন লিমিট লাইন কোন দুটি দেশের বিরোধপূর্ণ স্থান : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- জাতিসংঘের ৮ম মহাসচিব বান কি মুন দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী।
- দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাস ভবনের নাম "ব্লু হাউস"।
- দক্ষিণ কোরিয়ার পশ্চিমে রয়েছে পীতসাগর (The yellow sea)
- দক্ষিণ কোরিয়া পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল।
- বুসান বন্দরটি দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া জাপানের অধীনে ছিল।
- ৩৮০ অক্ষরেখা : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে বিভক্তকারী সীমারেখা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে মঙ্গোলিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- এশিয়ার সবচেয়ে বড় মরুভূমি গোবি এখানে।
- দুর্ধর্ষ 'হুন' জাতি মঙ্গোলিয়ার।
- মঙ্গোলিয়ার ২ জন কুখ্যাত নেতা চেঙ্গিস খাঁ ও হালাকু খাঁ।
- ১২৫৮ সালে হালাকু খাঁ বাগদাদ নগরী ধ্বংস করে।
- এটি Land locked country.
- মঙ্গোলিয়ার পার্লামেন্টের নাম খুরাল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে তাইওয়ানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- তাইওয়ানের পূর্ব নাম ফরমোজা যার অর্থ সুন্দর।
- এখানে দীর্ঘ ৪৩ বছর জরুরি অবস্থা চালু ছিল যার অবসান ঘটে ১৯৯১ সালে।
- ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
- ১৯৭১ সালের ২৫ অক্টোবর জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কৃত হয়(নিজেদের প্রকৃত চীন বলে দাবী করার জন্য)।
- চীন জাপান থেকে তাইওয়ানকে পুনরুদ্ধার করে - ১৯৪৫ সালে।
- দ্বৈত রাজনৈতিক দেশ হিসাবে অভিহিত করা হয়- তাইওয়ানকে।
- 'অ্যারো রিজিনরা' কোন দেশের অধিবাসী-তাইওয়ানের।
- তাইওয়ান চীনের সাথে যুক্ত হয় -১৬৮৩ সালে।
- কোন দেশটি পূর্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই-তাইওয়ান।

মধ্যপ্রাচ্য

১. সৌদি আরব, ২. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩. ইরান, ৪. ইরাক, ৫. কুয়েত, ৬. কাতার, ৭. ওমান, ৮. লেবানন, ৯. জর্ডান, ১০. সিরিয়া, ১১. ইয়েমেন, ১২. বাহরাইন, ১৩. তুরস্ক, ১৪. ফিলিস্তিন, ১৫. ইসরাইল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সৌদি আরবের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- সৌদি আরবের জাতীয় সংসদ এবং সংবিধান নেই।
- সৌদি আরবের জাতীয় প্রতীক খেজুর গাছ।
- সৌদি আরবের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় না।
- সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দর পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানবন্দর।
- বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণ কারখানা অবস্থিত : জেদ্দা, সৌদি আরব।
- সৌদি আরবের প্রথম রাজনৈতিক দলের নাম : ইসলামি উম্মাহ পার্টি।
- সৌদি আরবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নারী : পুরুষের এক সঙ্গে পড়ালেখার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (উদ্বোধন করা হয় ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৯)।
- প্রস্তাবিত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবনের নাম : কিংডম টাওয়ার (জেদ্দা, সৌদি আরব) ; উচ্চতা ১২৮০ ফুট বা ১ কিমি।
- সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেন : আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুর রহমান আল ফয়সাল আল সাউদ (১৯২৬ সালের ৮ জানুয়ারি)।
- সর্বপ্রথম সৌদি আরবে কবে নাগাদ নির্বাচনের ঘোষণা দেয় : অক্টোবর ২০০৪।
- এই প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ সে দেশে আগত বিদেশি নাগরিকদের আঙুলের ছাপ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে : সৌদি আরব।
- সৌদি আরবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই : ভ্যাটিকানের সাথে।
- সৌদি আরবের বর্তমান বাদশাহ : সালমান বিন আব্দুল আজিজ।
- সৌদি আরবে মন্ত্রিসভার প্রথম মহিলা মন্ত্রী নির্বাচিত হন : নোরা আল ফাইজা (শিক্ষা অধিদপ্তরের উপমন্ত্রী)।
- সৌদি আরবের সরকার গঠন কী ধরণের : রাজতন্ত্রীয়।
- সৌদি আরবের জাতীয় সংগীত : আসসালাম আল মালাকি।
- সৌদি আরবের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় : কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে।
- আয়তনে মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম দেশ : সৌদি আরব।
- সৌদি আরবের পতাকায় কী লেখা অঙ্কিত রয়েছে : কালেমা তাইয়্যেবা।
- বিশ্বের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী ও মজুদকারী দেশ : সৌদি আরব।
- বর্তমানে সৌদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা : আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ইরাকের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ইরাকের পূর্ব নাম মেসোপটেমীয়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা।
- ইরাকের রাজধানী বাগদাদ টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত।
- ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান ইরাকে।
- ২০০৩ সালের ২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে।
- ইরাকের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদী।
- উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক কর্তৃক দখলকৃত 'খলজি' শহরটি : সৌদি আরব।
- বহুজাতিক বাহিনী ইরাকের উপর হামলা চালায় : ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাগদাদ নগরীর পতন ঘটে : ২০০৩ সালের ৯ এপ্রিল।
- ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'রিপাবলিকান গার্ড' কোন দেশের সুসজ্জিত বাহিনী : ইরাকের।
- উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত 'স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রটি কোন দেশের : ইরাকের।
- সাফওয়ান সীমান্ত শহরটি অবস্থিত : ইরাকে।
- উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুল আলোচিত বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র প্যাট্রিয়ট : যুক্তরাষ্ট্রের।
- ইরাকে তেলের বিনিময়ে খাদ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ১৯৯৬ সালে।
- ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধ কোন দ্বীপ নিয়ে : আবু মুসা দ্বীপ।
- ইরাকে দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত অভিযানের নতুন নাম : Operation New Dawn

(কার্যকর হয় ১ সেপ্টেম্বর ২০১০)।
- Operation New Dawn এর পূর্ব নাম : Operation Iraqi Freedom.
- ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ যুয়াদ মাসুম কোন সম্প্রদায়ের লোক : কুর্দি সম্প্রদায়।
- ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : মোহাম্মদ যুয়াদ মাসুম (২৪ জুন ২০১৪– বর্তমান)।
- ইরাকের শিয়াপন্থি মার্কিন বিরোধী সংগঠনের নাম : মেহেদী আর্মি।
- ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।
- ইরাক কুয়েত দখল করে নিয়েছিল : ২ আগস্ট, ১৯৮৮।
- ইরাক জাতিসংঘের সকল শর্ত মেনে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ঘোষণা করে : ৫ মার্চ, ১৯৯১।
- ইরাক কুয়েতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে : ১০ নভেম্বর, ১৯৯৪।
- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম কী : ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা।
- অপারেশন ডেজার্ট ফক্স : ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সালে ইরাক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সামরিক অভিযান হচ্ছে অপারেশন ডেজার্ট ফক্স।
- উপসাগরীয় যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল : ৮৬ দিন।
- ইরাক ২৮-৮-১৯৯০ তারিখে কুয়েতকে তার কততম প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করেছিল : ১৯তম।
- ইরাক-ইরান যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে।
- জাতীয় পতাকায় 'আল্লাহু আকবর' লেখা থাকে : ইরাকের।
- ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচারে ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয় : ৫ নভেম্বর ২০০৬ সালে (দুজাইল হত্যা মামলায়)।
- ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচারের রায় ঘোষণা করেন : বিচারক রউফ রশিদ আব্দুর রহমান।
- মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনী আবু গরিব কারাগার ইরাক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে : ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সালে।
- অপারেশন রেড ডন : ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ধরার জন্য মার্কিন বাহিনী পরিচালিত অভিযান।
- মার্কিন বাহিনী কোন তারিখে সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করে : ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে।
- ইরাক কবে স্বাধীনতা লাভ করে : ১৯৩২ সালে।
- ইরাকের পালামেন্টের আসন সংখ্যা : ২৭৫টি।
- সাদ্দাম হোসেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন : ১৯৭৯ সালে।
- ইরান-ইরাক যুদ্ধের সংঘটিত হয় : ১৯৮০-১৯৮৮ পর্যন্ত।
- ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ সংঘটিত হয় : ২ আগস্ট, ১৯৯০ সালে।
- ইরাকে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে : ১৫ ডিসেম্বর, ২০১১।
- ইরাক যুদ্ধ তদন্তে ব্রিটিশ সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির নাম : চিলকট তদন্ত কমিটি (১৫ জুন, ২০০৯-এ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়, যার চেয়ারম্যান স্যার জন চিলকট)।
- ইরাকে নিযুক্ত জাতিসংঘ মিশনের নাম : ইউএন অ্যাসিসটেন্স মিশন ইন ইরাক।
- ইরান-ইরাক যুদ্ধের কারণ- শাত-ইল-আরব জলাধার কে কেন্দ্র করে।
- ইরাকে বর্তমান প্রদেশের সংখ্যা : ১৮টি।
- এশিয়ার শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত দেশের নাম : ইরাক।
- বর্তমান ইরাক কোন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল : ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের।
- ইরাকের সর্বোচ্চ শিয়া ধর্মীয় নেতার নাম : আয়াতুল্লাহ আলী সিস্তানী।
- আরব দেশ গুলোর পাশ্চাত্যের উপর তেল আবরোধ করে : ১৯৭৩ সালে।
- ইরাকের তেল সমৃদ্ধ নগরীর নাম : তিরকিত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ইরানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ইরান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯২৫ সালে (বৃটেনের কাছ থেকে)।
- ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়- ১ এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে।
- ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৯৭৯ সালে।
- ইরানের পূর্ব নাম পারস্য।
- ইরানের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় না কারণ পতাকাতে কালেমা তাইয়্যেবা লেখা রয়েছে।
- Asian clearing union এর সদর দপ্তর ইরানে।

- Economic Cooperation Organszation এর সদর দপ্তর ইরানে।
- ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানী।
- কোন দেশের উপসাগরীয় তটরেখায় হরমুজ প্রণালি অবস্থিত -ইরান।
- ইরানের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র 'বুশেহর' চালু হয় : ২১ আগস্ট, ২০১০।
- জানদাল্লাহ সুন্নি বিদ্রোহী গ্রুপ কোন দেশভিত্তিক : ইরান।
- ইরানের দ্বিতীয় ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শোধনাগার কোন শহরে : কোম (উল্লেখ্য, প্রথমটি নাতাঞ্জ শহরে)।
- নোবেল শান্তি বিজয়ী শিরিন এবাদি পরিচালিত মানবাধিকার সংস্থা : Defenders of Human Rights Center
- নাতা পারমানবিক কেন্দ্রটি ইরানে।
- বিখ্যাত আব্বাস নগরী ইরানে।
- 'আবাদান বন্দরটি ইরানে।
- ইরানের জাতীয় প্রতীক গোলাপ।
- তেলের জন্য বিখ্যাত খুররম শহর ইরানে।
- শান্তিতে নোবেল জয়ী প্রথম মুসলীম নারী : শিরিন এবাদি।
- ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানের নাম : গার্ডিয়ান কাউন্সিলর।
- গার্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা : ২২।
- ইরানের সফল নির্বাচনের আয়োজন করে : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- শিয়া ধর্মকে ইরানের রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় : ১৫০১ সালে।
- ইরানের সশস্ত্র বাহিনী কয়টি ধারায় বিভক্ত : ২টি। বিপ্লবী/রেভ্যালিউশনারি গার্ড, নিয়মিত সেনা।
- রেভ্যালিউশনারি গার্ড গঠন করা হয় : ১৯৭৯ সালে।
- ইরানের জাতীয় পারমাণবিক দিবস : ৯ এপ্রিল।
- ইরান তেহরান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে : ১৯৫৯ সালে।
- ইরান NPT স্বাক্ষর করে : ১৯৬৮ সালে।
- 'বুশাহর, দারখুনিয়া, ইস্পাহান : ইরানের পরমাণু চুল্লির নাম।
- ইরানের নাতাঞ্জে ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প চালু হয় : ২০০৬ সালে।
- ইরান ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধ করার প্রযুক্তি আয়ত্ব করে : ২০০২ সালে।
- ইরানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম : বুশাহর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট (প্রতিষ্ঠা-১ মে, ১৯৭৫)।
- ইরানে ইসলামি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন : আয়তুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী।
- ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে কোন দ্বীপ নিয়ে : আবু মুসা।
- ফ্রিডম মুজমেন্ট কোন দেশের সংগঠন : ইরানের।
- ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী : ফারাহ খোশরাভি।
- ইরানের কোন কট্টরপন্থি সংগঠন সালমান রুশদিকে হত্যার জন্য এক লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে : জেনারেল স্টাফ ফর দ্য গ্লোরিফিকেশন অব মারটায়ার্স অব দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড।
- সম্প্রতি ইরানের জাতীয় পতাকায় সংযুক্ত করা হয় : কলেমা তাইয়েবা-আসশাহাদুয়ান লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।
- ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের পর প্রথমবারের মতো মহিলা মন্ত্রী নির্বাচিত হন : মারজিয়া জাহিদ (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)।
- কোন দেশে বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার অবস্থিত : ইরানে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ইয়েমেনের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ সালেহ।
- ইয়েমেনের দক্ষিণে এডেন সমুদ্রবন্দর এবং এডেন উপসাগর রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ওমানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ওমানের পাশে ওমান উপসাগর রয়েছে।
- ওমান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৫১ সালে।
- ওমানের প্রদেশ সংখ্যা - ৪১টি।

http://thejobstudy.com Go to Contents

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে দুবাই পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- একে সাত শেখ শাসিত রাষ্ট্র বলা হয়।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন বুর্জ দুবাই আবুধাবীতে।
- ICC এর সদর দপ্তর আবুধাবীতে।
- বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন বুর্জ দুবাই, উচ্চতা : ১৬০৮ ফুট।
- এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর দুবাই অবস্থিত : সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে কুয়েতের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মুদ্রা কুয়েতি দিনার।
- ১৯৯০ সালে কুয়েত দখল করে ইরাক এবং ইরাকের ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে।
- ইরাক কুয়েত দখল করলে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯১ সালে ইরাক আক্রমন করে যা উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।
- কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে : ১৯৬১ সালে (বৃটেনের কাছ থেকে)।
- কুয়েতের সংসদের আসন সংখ্যা : ৫০টি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সিরিয়ার পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- বিখ্যাত গোলান মরুভূমি সিরিয়ায়।
- সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে : ১৯৪৬ সালে।
- সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম হল : সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্র।
- সিরিয়ার আয়তন : ২১৯০৬০০০ বর্গ কি. মি. (৫৪তম)।
- সিরিয়ার রাজধানী : দামেস্ক।
- সিরিয়ার লোকসংখ্যা : ১,৮০,১৬,৮৭৫।
- সিরিয়ার ভাষা : আরবি।
- সিরিয়ার মুদ্রা : পাউন্ড।
- সিরিয়া ১৯৫৮ সালে যোগ দিয়েছিল : মিশরের সঙ্গে।
- সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মূল অভিযোগ : মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম জঙ্গীদের সহায়তা প্রদান।
- সিরিয়া ২৬ বছর পর ২১ নভেম্বর, ২০০৬ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে : ইরাকের সাথে।
- সিরিয়ার সংবাদ সংস্থার নাম : সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (SANA)।
- বিশ্বের প্রথম বর্ণমালা পাওয়া যায় : সিরিয়ার উগারিটে।
- বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহর : দামাস্কস,সিরিয়া।
- সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয় : সিরিয়াকে।
- ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (Free Syrian Army) : সিরিয়ার সেনাবাহিনী থেকে দলত্যাগী সৈন্যদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (২৯ জুলাই, ২০১১- বর্তমান)
- সিরিয়ার বাশার আল আসাদবিরোধী প্রধান গ্রুপের নাম : সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল (এটি সিরিয়ান ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সিরিয়া নামেও পরিচিত।
- সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হয় : ২১ আগস্ট, ২০১১।
- সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল এর সদর দপ্তর : ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- সিরিয়ান প্রেট্রিয়টিক গ্রুপ গঠিত হয় : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২।
- সিরিয়ায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে " ফ্রেণ্ডস অব সিরিয়া" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তিউনিস,তিউনিসিয়া।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে লেবাননের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- লেবাননের স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৯৪১ সালে।
- লেবাননের স্বাধীনতা প্রাপ্তি : ২২ নভেম্বর, ১৯৪৩ সালে।
- লেবাননের রাষ্ট্রীয় নাম : প্রজাতন্ত্রী লেবানন।
- লেবাননের রাজধানী : বৈরুত।
- লেবাননের আয়তন : ১০৪৫৩ বর্গ কি. মি.।
- লেবাননের লোকসংখ্যা : ৪২২৪০০০ (১২৪তম)।

⇨ লেবাননের ভাষা : আরবি।
⇨ লেবাননের মুদ্রা : পাউন্ড।
⇨ লেবাননে সাংবিধানিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ক্ষমতার শরিক : মারোনাইট খ্রিস্টান ও সুন্নী মুসলমান।
⇨ ম্যারোনাইট খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হয় : সংবিধান অনুযায়ী লেবাননের প্রেসিডেন্ট।
⇨ সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হয় : সংবিধান অনুযায়ী লেবাননের প্রধানমন্ত্রী।
⇨ লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ নদীর নাম : ওয়াজনি নদী।
⇨ লেবাননে হিজবুল্লাহ গেরিলা সংগঠন রয়েছে যার প্রধান : হাসান নাসরুল্লাহ।
⇨ লেবাননে হিজবুল্লাহ গেরিলা সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে : একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা।
⇨ হিজবুল্লাহ গেরিলা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত টেলিভিশন কেন্দ্রের নাম : আল মানার টেলিভিশন কেন্দ্র।
⇨ মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে এখনো কোন স্থায়ী প্রশাসন গড়ে উঠে নি : লেবাননে।
⇨ লেবাননের উপর সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে : সিরিয়ার।
⇨ হিজবুল্লাহ শব্দের অর্থ : আল্লাহর দল।
⇨ হিজবুল্লাহর পথচলা শুরু হয় : ইরানের আর্থিক সহায়তায়; ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে জর্ডানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ জর্ডান স্বাধীনতা লাভ করে- ১৯৪৬ সালে।
⇨ জর্ডানের সরকারি নাম - জর্ডান হাসেমী রাজতন্ত্র।
⇨ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পরিচিত ছিল - ট্রান্স জর্ডান নামে।
⇨ জর্ডানের প্রথম মহিলা মন্ত্রীর নাম- রিমা খালিফ (বাণিজ্য মন্ত্রী)।
⇨ মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা করতে অধিকার দেওয়া হয় - ২০০৩ সাল থেকে।
⇨ জর্ডান - ইসরাইল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ২৬ অক্টোবর, ১৯৯৪ সালে।
⇨ জর্ডান - ইসরাইলের মধ্যে ৪৬ বছর পর সীমান্ত পরাপার শুরু হয় - ২৬ জুলাই, ১৯৯৪ সালে।
⇨ বিখ্যাত 'ডেড সি' জর্ডানে অবস্থিত। এর অপর নাম মরুসাগর।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে তুরস্কের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ তুরস্ককে এশিয়ার মাইনর বলা হয়। যেখানে পৃথিবীর প্রথম লোহা আবিষ্কৃত হয়েছিল।
⇨ ঐতিহাসিক ট্রয় নগরী ইস্তাম্বুল যা দুই মহাদেশে অবস্থিত যার পূর্ব নাম কনস্ট্যান্টি নোপল।
⇨ তুরস্কের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রিসেপ আহমেদ দাবোতোগলু।
⇨ আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয় কামাল পাশাকে।
⇨ তুরস্কের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তানসুসিলার।
⇨ তুরস্ক একমাত্র এশিয়ান রাষ্ট্র হিসাবে NATO : এর সদস্য।
⇨ তুরস্ক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় : ১৯২৩ সালে।
⇨ কার নেতৃত্বে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় : মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের।
⇨ তুরস্কে প্রথম সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে : ২৭ মে, ১৯৬০ সালে।
⇨ তুরস্ক ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝামাঝি জায়গায় বসফরাস প্রণালিতে এশিয়া ও ইউরোপকে যুক্ত করেছে।
⇨ পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্র দুটি মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত : তুরস্ক ও রাশিয়া।
⇨ পৃথিবীর কোন নগরী/শহর দুই মহাদেশে অবস্থিত : ইস্তাম্বুল।
⇨ একমাত্র কোন দেশ উত্তর সাইপ্রাসের তুর্কি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে : তুরস্ক।
⇨ তুরস্কে ইসলামি দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় : জানুয়ারি, ১৯৯৮ সালে।
⇨ ইউরোপের 'রুগ্ন মানুষ' বলা হয় : তুরস্ককে।
⇨ তুরস্কের অবস্থান : দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরে।
⇨ প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র : আনাতোলিয়া।
⇨ ইস্তাম্বুলের পূর্ব নাম : কনস্টানটিনোপল।
⇨ তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে : ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৫।
⇨ অটোমানরা তুর্কি দখল করে নিয়েছিল : ১৪৫৩ সালে।
⇨ তুরস্ক গ্রিস ও সংযুক্ত বাহিনীর মধ্যে লুসানে চুক্তি সম্পাদিত হয় : ১৯২৩ সালের, ২৯ অক্টোবর।
⇨ বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল : তুরস্ক।
⇨ ইস্তাম্বুল থেকে রাজধানী স্থানান্তর করা হয় : ১৯২৩ সালে।

⇨ গ্রে উলফ নামে পরিচিত : কামাল আতাতুর্ক।
⇨ তুরস্কে নবজাগরণের সূত্রপাত করেন : মুস্তফা কামাল পাশা।
⇨ ইস্তাম্বুলের পূর্ব নাম ছিল : বাইজেনটাইন ও কনস্টানটিনোপল।
⇨ ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী অবস্থিত : তুরস্কে।
⇨ বিখ্যাত 'সোফিয়া মসজিদ' অবস্থিত : তুরস্কে।
⇨ তুরস্কের আইনসভার সদস্য সংখ্যা : ৫৫০।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ফিলিস্তিনের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

⇨ ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত।
⇨ ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।
⇨ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা করা হয় : ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮ সালে।
⇨ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশের নাম : আলজেরিয়া।
⇨ তিন ধর্মের পবিত্র ভূমি বলা হয় : জেরুজালেমকে।
⇨ PLO (Palestine Liberation Organization) গঠিত হয় : ১৯৬৪ সালে (প্রথম প্রধান- ইয়াসির আরাফাত এর নেতৃত্বে)।
⇨ বর্তমান PLO : এর প্রধান মাহমুদ আব্বাস।
⇨ PLO-এর সদর দপ্তর অবস্থিত : রামাল্লায় (ওরিয়েন্ট হাউজ)।
⇨ ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ১৯৭৮ সালে।
⇨ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মিসরকে বহিস্কার করে : আরব লীগ ও ও.আই.সি
⇨ ক্যাম্পডেভিড অবস্থিত : যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড।
⇨ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্যোক্তা : জিমি কার্টার।
⇨ ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমিতে কখন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় : ১৯৪৮ সালে।
⇨ কোন ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে বসবাস করার সুযোগ পায় : ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে।
⇨ ফিলিস্তিনে স্বায়ত্বশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে।
⇨ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এ পর্যন্ত সংঘটিত হয় : চার বার (১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩)।
⇨ পিএলও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম আমন্ত্রণ পায় : ১৯৭৪ সালে।
⇨ ইয়াসির আরাফাতের দলের নাম : আল ফাতাহ।
⇨ হামাস কোন দেশের গেরিলা সংগঠন : ফিলিস্তিনের।
⇨ ১৯৮৮ সালে PLO স্বাধীন ফিলিস্তিনের ঘোষণা দিলে জাতিসংঘে স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয় : ফিলিস্তিনকে।
⇨ ফিলিস্তিনের জাতীয় দিবস : ১৫নভেম্বর।
⇨ কোন দেশের প্রেসিডেন্ট পদটি প্রতীকী : ফিলিস্তিন (কারণ দেশটিতে এখনো প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নি)।
⇨ PLO এর সদর দপ্তর অবস্থিত : তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে।
⇨ UNRWA : ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থা।
⇨ PLO এর আল ফাতাহ গ্রুপ গঠিত হয় : ১০ অক্টোবর, ১৯৫৯সালে।
⇨ হামাস প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে।
⇨ হামাস এর প্রতিষ্ঠাতা : শেখ আহমদ ইয়াসিন।
⇨ ইয়াসির আরাফাত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান : ১৯৯৪ সালে।
⇨ ইয়াসির আরাফাতের ডাক নাম : আবু আমর।
⇨ মাহমুদ আবব্বাসের ডাক নাম : আমু মাজেন।
⇨ 'কোয়ার্টেট অন দ্যা মিডল ইস্ট' : মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারী গ্রুপ এর নাম।
⇨ 'কোয়ার্টেট অন দ্যা মিডল ইস্ট' অন্য কী নামে পরিচিত ডিপ্লোমেটিক কোয়ার্টেট (Diplomatice Quartet বা মাদ্রিদ কোয়ার্টেট (Madrid Quartet).
⇨ UNGA এর ফিলিস্তিন সম্পর্কে গৃহীত ২৪২ নং প্রস্তাবের অর্থ : ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া।
⇨ Willing Wall অবস্থিত : ফিলিস্তিনে।
⇨ বিশ্বে নিজ দেশে পরাধীন : ফিলিস্তিনিরা।
⇨ আরব বিশ্বে The Great Survivo'r হিসেবে খ্যাত ছিলেন : ইয়াসির আরাফাত।
⇨ ইয়াসির আরাফাত জন্মগতভাবে কোন দেশের নাগরিক : মিসরের।

- ক্ষমতাসীন দল হামাসের পূর্বের নাম -'হরকত আল মোকাম ওমাহ : আল ইসলামীয়া'।
- PLO ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে।
- 'ওয়াই রিভার শান্তি' (Y-River treaty) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ১৯৯৮ সালে।
- প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা ও ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দান করে : ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে।
- ওয়াফা : ফিলিস্তিন রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা।
- UNESCO কোন শহরকে শান্তির শহর বলে ঘোষণা করে : হেবরনকে।
- পিএলও (PLO) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় : তিউনিশিয়ায়।
- স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরকারীগণের নাম-ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজ এবং পিএলও এর নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহমুদ আব্বাস।
- ফিলিস্তিনীদের নিকট জেরিকো শহর হস্তান্তর করা হয় : ১৩ মে, ১৯৯৪ সালে।
- আল ফাতাহ দিবস : ১ জানুয়ারী, ১৯৬৫ সালে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা পিএলও এ আল ফাতাহ গ্রুপ গঠিত হয়। তাই এ দিনটি ফাতাহ দিবস নামে খ্যাত।
- পশ্চিম তীরের বাণিজ্যিক রাজধানীর নাম : রামাল্লাহ।
- ফিলিস্তিনে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় : ২০ জানুয়ারি, ১৯৯৬।
- আরব-ইহুদিদের মধ্যে 'শেকের দেওয়াল' নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে : ১৯৩০ সালে।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ কবে একটি অন্তর্বর্তী ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রূপরেখা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত নতুন নীতি ঘোষণা করেন : ২৪ জুন, ২০০২।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : মাহমুদ আব্বাস।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : সালাম ফায়েদ।
- ফিলিস্তিনে হামাসকে নিষিদ্ধ করে অধ্যাদেশ জারি করা হয় : ১৭ জুন, ২০০৭ সালে।
- সম্প্রতি বিশ্বের বহুল আলোচিত রোডম্যাপ : ইসরাইল ও ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা যার মধ্যে সড়ক মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় গঠিত রোডম্যাপ প্রণয়ন করে : যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ইসরাইলের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয় : ১৫ মে, ১৯৪৮ সালে।
- ইসরাইলের পার্লামেন্টের আসন সংখ্যা : ১২০ টি।
- ইসরাইল মিশর আক্রমণ করে : ১৯৫৬ সালে।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম মুসলিম দেশে নাম : মিশর।
- জেরুজালেমের বর্তমান মালিক : ইসরাইল।
- এশিয়ার ইহুদি বসতী রাষ্ট্রের নাম : ইসরাইল।
- ইহুদিবাদের প্রবক্তা : থিউডোর হার্জেল।
- "Wailing Wall" অবস্থিত : ইসরাইলে (এটি ইহুদিদের একটি পবিত্র স্থান)।
- 'মোশাদ' : ইসরাইলের একটি গোয়েন্দা সংস্থা।
- ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনয়ামিন নেতা নিয়াহু।
- ইসরাইলের পার্লামেন্টের নাম নেসেট।
- ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।
- ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র।
- ইসরাইল ১৯৬৭ সালে পূর্ব জেরুজালেম দখল করে।
- বেলফোর ঘোষণা : ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেলফোর কর্তৃক ঘোষণা।
- বেলফোর ছিলেন : ব্রিটেনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
- ফিলিস্তিন ভূমিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে : ইসরাইল'রা।
- সিমলাইন : ইসরায়েল কর্তৃক গাজা উপত্যাকায় নির্মিত বেষ্টনী।
- লেবার ও লিকুদ পার্টি রাজনৈতিক দল : ইসরাইলের।
- গোলান মালভূমি অবস্থিত : গ্যালিলিও সাগর উপকূলে।
- গোলান মালভূমি নিয়ে বিরোধ : সিরিয়া-ইসরায়েল।

- হেবরন হত্যাকান্ড ঘটান : ডা. গোল্ড স্টেইন।
- বৈরুতের কসাই বলা হয় : ইসরায়েলী সাবেক প্রধানমন্ত্রী অরিয়াল শ্যারন কে।
- জাতিসংঘের কত নং প্রস্তাবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় : ২৮১নং প্রস্তাব।
- বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোন টেলিযোগাযোগ নেই : ইসরায়েল।
- 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তি স্বাক্ষর করেন : মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দত ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনাহেন বেগিন।
- ইতিহাসে কোন যুদ্ধটি 'সুয়েজ সংকট' নামে পরিচিত : ১৯৫৬ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ।
- ইসরাইলের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম : গোল্ডামেয়ার।
- কার নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের জন্ম হয় : তেল আবিবের জাদুঘরে ডেভিড বেনগুরিনের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের জন্ম হয়।
- ইসরায়েল-প্যালেস্টাইনের মধ্যে হেবরন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৭ সালে।
- ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী বলে ঘোষণা করে১৯৮০ সালে ইরাক : ইরানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইসরায়েল এ সুযোগে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে।
- ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি' চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় : ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮।
- ইসরায়েলের কোন প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৫ এর ৪ নভেম্বর আততায়ীর গুলিতে প্রথম নিহত হন : আইজ্যাক রবিন।

উত্তর পশ্চিম এশিয়া

১. কাজাকিস্তান, ২. কিরগিজস্তান, ৩. উজবেকিস্তান, ৪. তাজিকিস্তান, ৫. তুর্কমেনিস্তান, ৬. আজারবাইজান, ৭. নাগার্নো কারাবাখ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে কাজাকিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- Father of Apple tree বলা হয় : কাজাকিস্তানের রাজধানী 'আলমাআতা'কে।
- মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র।
- কাজাকিস্তানকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বলা হয়।
- কাজাকিস্তানে রাশিয়া আধিপত্য বিস্তার করে : ১৮৬১ সালে।
- ভার্জিন ল্যান্ড : কাজাকিস্তানের স্তেপ অঞ্চল।
- সাবেক সোভিয়েন ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ প্রজাতন্ত্র ছিল : কাজাকিস্তান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে তাজিকিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- তাজিকিস্তানের জাতীয় দিবস ২৫ ডিসেম্বর।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৯২ সালের ২ মার্চ।
- মাথাপিছু আয় ১০৫০ মার্কিন ডলার।
- তাজিকিস্তান land locked country.
- তাজিকিস্তানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ : কমিউনিজম পিক।
- তাজিকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে আসে : ১৯২৪ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে কিরগিজিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- কিরগিজিস্তানে জালালাবাদ বিমানবন্দর রয়েছে।
- কিরগিজিস্তানে টিউলিপ বিপ্লব সংঘটিত হয়।
- বিখ্যাত 'ওস' শহরটি এখানে।
- স্বাধীনতার পর প্রথম প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভ।
- কিরগিজিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আলমাজবে আতামবায়েভ।
- কিরগিজস্তানের অবস্থান : মধ্য এশিয়ায়।
- কিরগিজস্তান সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল : ১৯৩৬ সালে।
- এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বলা হয় : কিরগিজস্তানকে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে উজবেকিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- বিখ্যাত 'লাভোরি' বিমানবন্দরটি উজবেকিস্তানে।
- ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ নিরসনে তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- উজবেকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট : ইসলাম কারিমভ।
- City of Fountains বলা হয় : উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দকে।
- রাশিয়া উজবেকিস্তান দখল করে : ১৯১৭ সালে।
- উপজবেকিস্তানে তুলা পরিচিত : শ্বেতস্বর্ণ নামে।

তুর্কেমেনিস্তানের পরিচিতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি

- তুর্কেমেনিস্তান জাতীয় দিবস ২৭ অক্টোবর।
- মাথাপিছু আয় ১০৫০ মার্কিন ডলার।
- জীবনের নদী বা River of Life বলা হয় : শরাকোরাম খালকে।
- রাজধানী আসখাবাদের স্থানীয় নাম : পলটোরিটিকে।
- কারাকুম মরুভূমি অবস্থিত : তুর্কমেনিস্তানে।
- ৮০% জুড়ে কারাকোরাম মরুভূমি অবস্থিত-তুর্কমেনিস্তানের।

ইউরোপ ভৌগোলিক বিবরণ

- **ইউরোপের অবস্থান :** ৭১০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৩৫০ উত্তর অক্ষাংশ এবং পশ্চিমে ১০০৩০ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৬৬০ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **মোট স্বাধীন রাষ্ট্র :** ৪৮টি।
- **পূর্ব ইউরোপ :** ১. আর্মেনিয়া, ২. বেলারুশ, ৩. জর্জিয়া, ৪. আজারবাইজান, ৫. লাটভিয়া, ৬. লিথুনিয়া, ৭. ইউক্রেন, ৮. এস্তোনিয়া, ৯. মলদোভা প্রজাতন্ত্র, ১০. রাশিয়া।
- **দক্ষিণ ইউরোপ :** ১. আলবেনিয়া, ২. অ্যানডোরা, ৩. বসনিয়া হার্জেগোভিনা, ৪. বুলগেরিয়া, ৫. ক্রোয়েশিয়া, ৬. গ্রিস, ৭. ইটালি, ৮. মেসিডোনিয়া ৯. পর্তুগাল, ১০. রুমানিয়া, ১১. স্যান ম্যারিনো, ১২. স্লোভেনিয়া, ১৩. মাল্টা, ১৪. স্পেন, ১৫. ভ্যাটিকান, ১৬. সার্বিয়া, ১৭. মন্টিনিগ্রো।
- **মধ্য ইউরোপ :** ১. অস্ট্রিয়া, ২. হাঙ্গেরি, ৩. স্লোভাকিয়া, ৪. চেক রিপাবলিকপ্রাগ, ৫.পোল্যান্ড।
- **উত্তর ইউরোপ :** ১. ডেনমার্ক, ২. নরওয়ে, ৩. সুইডেন, ৪. ফিনল্যান্ড ৫. আইসল্যান্ড।
- **পশ্চিম ইউরোপ :** ১. বেলজিয়াম, ২. ফ্রান্স, ৩. জার্মানি, ৪. নেদারল্যান্ড, ৫. আয়ারল্যান্ড, ৬. লিচেনস্টাইন, ৭. লুক্সেমবার্গ, ৮. মোনাকো, ৯. সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য

তথ্য তরঙ্গে ইউরোপ মহাদেশ

- **দীর্ঘতম নদী :** ভলগা (দৈর্ঘ্য ৩,৬৮,৭ কি.মি.)।
- **বৃহত্তম সমভূমি :** মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি।
- **বৃহত্তম দেশ (আয়তনে) :** রাশিয়া।
- **বৃহত্তম দেশ (জনসংখ্যায়) :** রাশিয়া।
- **ক্ষুদ্রতম দেশ (আয়তন ও জনসংখ্যায়) :** ভ্যাটিকান সিটি।
- **ঘন বসতিপূর্ণ দেশ :** নেদারল্যান্ড।
- **কম ঘন বসতিপূর্ণ দেশ :** আইসল্যান্ড (৩ জন প্রতি)
- **পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ মৎসচারণ ক্ষেত্র :** ডগাস ব্যাংক।
- **দীর্ঘতম পর্বতমালা :** আল্পস।
- **বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথ :** ইউরো টানেল।

ইউরোপের প্রণালি

- ডোভার প্রণালি : লন্ডন ও ফ্রান্স (পৃথক করেছে)। ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- জিব্রাল্টার প্রণালি : ইউরোপের স্পেন ও আফ্রিকার মরক্কো (পৃথক করেছে)। ভূ-মধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- মেসিনো প্রণালি : ইতালি ও সিসিলি (পৃথক করেছে)।

- বসফরাস প্রণালি : এশিয়া ও ইউরোপ (পৃথক করেছে)।
- ইংলিশ চ্যানেল : ফ্রান্স ও বৃটেন (পৃথক করেছে)।
- আটলান্টিক সাগর ও উত্তর সাগর (সংযুক্ত করেছে)।
- নর্থ চ্যানেল : স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড (পৃথক করেছে)।
- ওট্রান্টো প্রণালি : ইতালি ও আলবেনিয়া (পৃথক করেছে)।

ইউরোপের নদ-নদী

নাম	দেশ	উৎপত্তিস্থল	পতিতস্থল
ভলগা	রাশিয়া	ভলদাই পাহাড়	কাস্পিয়ান সাগর
দানিয়ুব	ইউরোপের৬টি দেশ	ব্লাক ফরেস্ট	কৃষ্ণ সাগর
লেনা	রাশিয়া	উত্তর মহাসাগর	বৈকাল হ্রদ
রাইন	জার্মানি	-	আল্পস পর্বতমালা
ওব	রাশিয়া	আলতাই পর্বতমালা	-
ইনিসি	রাশিয়া	আলতাই পর্বতমালা	উত্তর পর্বতমালা
পো	ইতালি	আল্পস	আড্রিয়াটিক সাগর
রোন	ইতালি	আল্পস	ভূ-মধ্যসাগর
লব	জার্মানী	এর্জ পর্বত শ্রেণি	কাস্পিয়ান সাগর

ইউরোপের দ্বীপ

দ্বীপ	অবস্থান
কোলা উপদ্বীপ	ফিনল্যান্ড ওরাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে ব্যারেন্ট সাগরে অবস্থিত।
রোডস দ্বীপপুঞ্জ	ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত তুরস্কের দ্বীপপুঞ্জ
সাইপ্রাস	ভূ-মধ্যসাগরের নিকট অবস্থিত ইউরোপের দ্বীপ রাষ্ট্র।
অর্কনি দ্বীপপুঞ্জ	বৃটেনে (উত্তর সাগরে অবস্থিত)।
সেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ	নরওয়ে সাগরে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের দ্বীপ।
এলবা	ভূ-মধ্যসাগরে (কর্সিনকো ও ইতালির মাঝে) নেপোলিয়ানের প্রথম নির্বাসনস্থল।

বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাস (ইউরোপ)

- আধুনিক জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা : অটো ফন বিসমার্ক।
- মার্শাল টিটো : যুগোশ্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট।
- জার্মানির প্রধানমন্ত্রীর পদবী : চ্যান্সেলর।
- কার্ল মার্কস : সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক রচয়িতা।
- বার্লিন প্রাচীর : ১৯৬১ সালে দুই জার্মানি পৃথকীকরণের লক্ষ্যে পূর্ব জার্মানি কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর।
- ইউরোপের লৌহ মানবী : মার্গারেট থ্যাচার।
- চ্যান্সেলর অব একচেকার : বৃটেনের অর্থমন্ত্রীর উপাধি।
- লিখিত সংবিধান নেই : বৃটেন/কমনওয়েলথ।
- ট্রেড ইউনিয়ন জোট 'আলফা' : রোমানিয়ার।
- অখণ্ড ইউরোপের প্রবক্তা : মিখাইল গর্ভাচেব।
- ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষরিত হয় : ১২১৫ সালে রাজা জন কর্তৃক।
- পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক : স্টালিন (দেশ রাশিয়া)।
- গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের মালিকানা : ডেনমার্ক।
- নাৎসী বাহিনীর প্রবর্তক : হিটলার।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনী : গেস্টাপো।

- বিশ্বের প্রথম মহিলা স্পিকার : ইনগেগার্ড টোয়েডস মন (সুইডেন)।
- গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নীতির প্রবর্তক : মিখাইল গর্ভাচেভ (১৯৮৫ সালে প্রবর্তিত)।
- রাশিয়ার প্রতীক বর্তমানে কাস্তে হাতুরীর পরিবর্তে : দুই মাথাযুক্ত ঈগল।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয় : ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে।
- ইন্টারফ্যাক্স : রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা।
- ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত হয় : বাস্তিল দুর্গ (ফ্রান্স) ভাঙ্গার ফলে।
- হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন : ১৯৩৩ সালে।
- ইউরোপের মানচিত্রে অন্যতম মুসলিম প্রজাতন্ত্র : চেচনিয়া (রাজধানী-গ্রোজনী)।
- বুটেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার : বুকার।
- বুটেনের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল : কনজারভেটিভ পার্টি(প্রধান বিরোধীদল: লেবার পার্টি)।
- দ্বিদ্বারিত রাষ্ট্র বলা হয় : ইতালিকে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দেয় : ফ্রান্স।
- নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের বলা হয় : ডাচ।
- নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী : মাওরী।
- মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের আদি অধিবাসী : ককেশয়েড।
- একক ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে রোমচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় : ১৯৭৫ সালে।
- সর্বপ্রথম মহিলারা পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করে : নিউজিল্যান্ডে।
- জাপান ও রাশিয়ার বিরোধপূর্ণ দ্বীপ : কুরিল দ্বীপপুঞ্জ।
- বিখ্যাত টেনিস খেলোয়ার স্টেফিগ্রাফ : জার্মানির।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যকার বিরূপিত সীমারেখা : ওডেরনিস লাইন।
- বুটেনের পতাকার নাম : ইউনিয়ন জ্যাক।
- ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সংবাদ সংস্থা : রয়টার।
- কমনওয়েলথ সচিবালয় : মালবরো হাউস, লন্ডন।
- পাহাড় পর্বতবেষ্টিত ইউরোপীয় দেশ : আলবেনিয়া।
- ফ্রান্সের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত অঞ্চল : অ্যান্ডোরা (নিজস্ব কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই)।
- আজারবাইজান (মুসলিম অধ্যুষিত) এবং আর্মেনিয়া (খৃষ্টান অধ্যুষিত) রাষ্ট্রের মধ্যে নর্গানো কারখানা নিয়ে বিরোধ বাঁধে : ১৯৯২ সালে (এখনো চলছে)।
- বসনিয়ায় জাতিসংঘ ঘোষিত নিরাপদ এলাকা : বিহাট ছিটমহল।
- ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ অধিকৃত দ্বীপাঞ্চল : চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ।
- মধ্য ইউরোপের একটি স্থলবেষ্টিত দেশ : চেক প্রজাতন্ত্র।
- ডেনমার্কে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন : রাজা হ্যারেল্ড দ্বিতীয়।
- আগ্নেয়গিরির লাভা জমে সৃষ্ট ২২টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত দ্বীপপুঞ্জ : ফারও
- অধিকাংশ নাগরিক মার্টিন লুথার এর মতানুসারী : ফিনল্যান্ডের।
- ফ্রান্স মোট চারবার প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় : যথাক্রমে ১৯৭২, ১৮৪৮, ১৮৭০ এবং ১৯৪৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর।
- বসনিয়া-হার্জেগোভিনার শান্তি আলোচনায় জাতিসংঘের বিশেষ দূত : সাইরাস ভ্যান্স।
- জার্মানির প্রাচীন রাজাদের উপাধি : কাইজার।
- জার্মানির বর্তমান চ্যান্সেলর : এ্যাঞ্জেলা মার্সেল (সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি)।
- রুমানিয়ার সিংহাসনচ্যুত রাজা মাইকেল নির্বাসিত রয়েছে : সুইজারল্যান্ড।
- ওয়াটার লু'র যুদ্ধে পরাজিত হন : নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।
- ওয়াটার লু'র যুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতি : ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- নেপোলিয়ানকে প্রথম নির্বাসন দেওয়া হয় : এলবা দ্বীপে এবং দ্বিতীয়বার নির্বাসনে দেওয়া হয় আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত বৃটিশ মালিকানাধীন দ্বীপ সেন্ট হেলেনায়। ১৮২১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- কসোভো নগরীর সাথে সার্বিয়দের স্পর্শকাতর সুসম্পর্কের কারণ : মুসলিম বিদ্বেষ প্রবণতা।
- ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় : অষ্টাদশ শতাব্দীতে।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু : নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।
- লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রেরণা দানকারী দু'জন দার্শনিক : রুশো ও ভলতেয়ার।
- ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল : (১৩৩৮-১৪৫৩)।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী : হেনরি অ্যাসকুইথ।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

- ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত : বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মধ্যদিয়ে।
- ম্যাগনাকার্টা : বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল।
- উত্তর আয়ারল্যান্ড পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে বৃটেনের শাসনাধীনে আসে : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ সালে।
- ফ্যাসিজম-এর প্রবর্তক : মুসোলিনী (ইতালি)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট : স্টালিন।
- রাশিয়ার নতুন সংবিধান চালু হয় : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সালে।

কি, কোথায় অবস্থিত ইউরোপ

- সেন্ট সোফিয়ার মসজিদ : ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)।
- অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি : গ্রিস।
- হ্যালিকারনেসের সমাধি : তুরস্ক।
- নানকিনের চিনামাটির মিনার : রোম।
- ডায়নার মন্দির : তুরস্ক।
- আইফেল টাওয়ার : প্যারিস, ফ্রান্স।
- বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি 'মাদারল্যান্ড' : রাশিয়া।
- এলিসি প্রাসাদ : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাস ভবন, প্যারিস।
- ফ্লিট স্ট্রিট : সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বিখ্যাত, লন্ডনে।
- ভ্যাটিকান : মহামান্য পোপের বাসভবন, ইতালির রোমে।
- হোয়াইট লজ : রাজ্য অষ্টম এডওয়ার্ডের জন্মভূমি, ইংল্যান্ড।
- রেড স্কোয়ার : রাজনৈতিক, উন্মুক্ত বক্তৃতাস্থল, মস্কো।
- নুরেমবার্গ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীনের বিচারস্থাল, জার্মানি।
- ট্রাফালগার স্কয়ার : ট্রাফালগার যুদ্ধ বিজয় স্তম্ভ, লন্ডন।
- স্টালিন গ্রাড : রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে এই স্থানে পরাজিত করে, রাশিয়া।
- বিবিসির অফিস : BBC office : Broadcasting house in portland place।
- হোয়াইট হল : বৃটিশ সরকারের কার্যালয়, লন্ডন।
- বাকিংহাম প্যালেস : বৃটেনের রানির বাসভবন, লন্ডন।
- গ্রিনিচ : মান মন্দির, মূল মধ্যরেখা অতিক্রান্ত স্থল, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার স্থল।
- ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবে : বৃটেনের বিখ্যাত ব্যক্তি ও অজ্ঞাতনামা যোদ্ধাদের সমাধিস্থল, লন্ডন।
- ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট : ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন।
- ভ্যাজি- পাটি শিল্পের জন্য বিখ্যাত, স্কটল্যান্ড।
- ওয়াটার লু : বেলজিয়াম, বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র।
- সিসিলি দ্বীপ : ইতালির দ্বীপ, সালফারের জন্য বিখ্যাত।
- বিখ্যাত হাইড পার্ক : লন্ডনে।
- নার্গানো কারাবাখ গিরিপথ : আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মাঝে বিতর্কিত মহাসড়ক।
- পিসার হেলানো মিনার : ইতালি।
- ভার্সাই : ফ্রান্সের প্যারিস।

ইউরোপের স্মরণীয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিকর্ম

নাম	দেশ	যা দ্বারা বিখ্যাত
আর্কিমিডিস	ইটালির সিসিলি দ্বীপ	বিখ্যাত গণিতবিদ, পদার্থবিদ গবেষক
আলবার্ট আইনস্টাইন	জার্মানি	থিওরি অব রিলেটিভিটি
নিকোলাস কোপার্নিকাস	পোল্যান্ড	তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে
আলেকজান্ডার ফ্লেমিং	ইংল্যান্ড	পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন
পল আলিক	জার্মানি	সিফিলিস রোগের ঔষধ "সালভারসন" আবিষ্কার করেন
জুলিও কুরি	ফ্রান্স	আনবিক শক্তির আবিষ্কারক
মেরী মাদাম কুরি	পোল্যান্ড	রেডিয়াম আবিষ্কাররক, পদার্থবিদ
আল্বে মালরো	ফ্রান্স	দার্শনিক, সাহিত্যিক, কর্মবীর
ক্রিস্টোফার কলম্বাস	ইটালি	বিশ্ববিখ্যাত নাবিক, আমেরিকা আবিষ্কার করেন

নাম	দেশ	যা দ্বারা বিখ্যাত
কার্লমার্কস	জার্মানি	দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ, সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক
হেনরি ক্যাভেন্ডিস	যুক্তরাজ্য	হাইড্রোজেন ও পানির উপাদান আবিষ্কারক
গ্যালিলিও গ্যালিলি	ইটালি	বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, টেলিস্কোপ আবিষ্কারক
এডলফ হিটলার	জার্মানি	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা ও জার্মানির নেতৃত্বদানকারী
জোসেফ প্রিস্টলি	ইংল্যান্ড	অক্সিজেন আবিষ্কার করেন
প্লেটো	গ্রিস	দার্শনিক
স্যার আইজ্যাক নিউটন	ইংল্যান্ড	পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। আলোকতত্ত্ব, মহাকর্ষ তত্ত্ব ও ক্যালকুলাসের আবিষ্কারক
চালর্স ডারইউন	ইংল্যান্ড	প্রকৃতিবিজ্ঞানী, "দি অরিজিন অব স্পেসিস" এর লেখক
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	ফ্রান্স	পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমর নায়ক ও প্রতিভাবানদের মধ্যে অন্যতম
আলফ্রেড বার্নাড নোবেল	সুইডেন	ডিনামাইট আবিষ্কারক
রুডলড ডিজেল	জার্মানি	ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক
ডন ডাল্টন	যুক্তরাজ্য	রাসায়নিক ও পদার্থবিদ
লুই পাস্তুর	ফ্রান্স	জীবাণুবিদ্যার জনক
পিথাগোরাস	গ্রিস	জ্যামিতিক সূত্র প্রদান করেন
মাইকেল ফ্যারাডে	যুক্তরাজ্য	ডায়নামার আবিষ্কারক
উইনস্টন চার্চিল	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের সাবেক-প্রধানমন্ত্রী ও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত
ড. হ্যানিম্যান	জার্মানি	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উদ্ভাবক
স্যার রোনারাজ্য	-	ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কারক
ভন ল্যাভয়েশিয়ে	ফ্রান্স	আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক
কনরাড রঞ্জেন	জার্মানি	এক্স-রে আবিষ্কারক
ইউলিয়াম হার্ভে	ইংল্যান্ড	শরীরবিদ্যার জনক
অ্যাডাম স্মিথ	ইংল্যান্ড	অর্থনীতির জনক
সক্রেটিস	গ্রিস	বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক
মার্কনি	ইটালি	বেতার আবিষ্কারক
রাদারফোর্ড	যুক্তরাজ্য	রসায়নবিদ
এমিল ফন বেহরিং	জার্মানি	ডিপথেরিয়ার টিকা আবিষ্কারক
জন বেয়ার্ড	যুক্তরাজ্য	টেলিভিশন আবিষ্কারক
আলেসান্দ্রো ভোল্টা	ইটালি	ভোল্টার বিদ্যুৎ কোষ আবিষ্কারক
মেন্ডিলিফ	রাশিয়া	পিরিয়ডিকল এর প্রতিষ্ঠাতা
জোসেফ স্টালিন	রাশিয়া	রাশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও লাল বাহিনীর সর্বময় কর্তা
হোমার	গ্রিস	গ্রিসের মহাকবি, তাঁর খেতাব হলো Cdafx Caix
সেক্সপিয়ার	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার
জ্যাঁ জ্যাক রুশো	ফ্রান্স	ফরাসি দার্শনিক
রবার্ট ম্যালথাস	ইংল্যান্ড	প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ
মাদার তেরেসা	যুগোশ্লাভিয়া	ভারতেরনাগরিকত্ব(১৯৪৮) রোমান ক্যাথলিক ও ধর্মযাজিকা ও বিশ্ববিখ্যাত সেবিকা
প্রিন্সেস ডায়ানা	বৃটেন	প্রিন্সেস অব ওয়েলস
প্যাসকেল	ফ্রান্স	প্যাকেলের সূত্র আবিষ্কার করেন
মার্টিন লুথার	জার্মানি	ধর্মযাজক ও প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের উদ্যোক্তা
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি	ইটালি	পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী
ইউরি গ্যাগারিন	রাশিয়া	সর্বপ্রথম মহাশূন্য ভ্রমণ করেন
ম্যাক্সিম গোর্কি	রাশিয়া	রুশ ঔপন্যাসিক
মহামতি লেনিন	রাশিয়া	সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
গ্যালভানি	ইটালি	গ্যালভ্যানোমিটারের আবিষ্কারক
জেম্‌স ওয়াট	স্কটল্যান্ড	বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারক
দ্য গল	ফ্রান্স	ফরাসি সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ
বেনিটা মুসোলিনী	ইটালি	ফ্যাসিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা
আলেকজান্ডার	গ্রিস	মেসিডেনিয়ার সম্রাট

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন	যুক্তরাজ্য	স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর ও ভারতে নিযুক্ত শেষ ভাইসরয়
ষোড়শ লুই	ফ্রান্স	ফ্রান্সের সাবেক সম্রাট
জোসেফ ব্রোজ টিটো	যুগোশ্লাভিয়া	যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট যুগোশ্লাভিয়া
মার্গারেট থ্যাচার	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ইউরোপের লৌহ মানবী
টেড হিউজ	ইংল্যান্ড	শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চারণ কবি

আফ্রিকা মহাদেশ

- আফ্রিকার অবস্থান : ৩৭০ ডিগ্রি উত্তর হতে ৩৫০ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১৭০ পশ্চিম ও ৫১০ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মোট রাষ্ট্র : ৫৪টি।
- মোট স্বাধীন রাষ্ট্র : ৫৪টি যথা-১. আলজেরিয়া, ২. অ্যাঙ্গোলা, ৩. বেনিন, ৪. বতসোয়ানা, ৫. মিশর, ৬. জিম্বাবুয়ে, ৭. জাম্বিয়া, ৮. বুরুন্ডি, ৯. ক্যাপভারদি, ১০. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, ১১. চাঁদ, ১২. ক্যামেরুন, ১৩. কঙ্গো, ১৪. জিবুতি, ১৫. গায়ানা, ১৬. ইথিওপিয়া, ১৭. ইরিত্রিয়া, ১৮. গ্যাবন, ১৯. ঘানা, ২০. দক্ষিণ আফ্রিকা, ২১. কেনিয়া, ২২. নাইজেরিয়া, ২৩. নাইজার, ২৪. আলজেরিয়া, ২৫. সুদান, ২৬. মৌরিতানিয়া, ২৭. আইভরিকস্ট, ২৮. লিসোথা, ২৯. সাইবেরিয়া, ৩০. লিবিয়া, ৩১. মালি, ৩২. মালাগাসি, ৩৩. মালাবি, ৩৪. মৌরিতাস, ৩৫. মরক্কো, ৩৬. মোজাম্বি, ৩৭. নামিবিয়া, ৩৮. রুয়ান্ডা, ৩৯. সেনেগাল, ৪০. সিসিলিস, ৪১. সোমালিয়া, ৪২. সিয়েরালিওন, ৪৩. সোয়াজিল্যান্ড, ৪৪. তানজানিয়া, ৪৫. তিউনিসিয়া, ৪৬. উগান্ডা, ৪৭.টোগো, ৪৮. আপার ভোল্টা, ৪৯. গিনি, ৫০. জায়ারে, ৫১. সাওটোমে ও প্রিন্সিপে, ৫২. মালাওয়ি, ৫৩. কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ।

তথ্য তরঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশ

- আয়তন : ২,৯৮,৫৪০,০০০ বর্গ কি.মি.।
- আয়তনে পৃথিবীর : দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ, এশিয়ার ছোট কিন্তু ইউরোপের প্রায় আড়াইগুণ।
- লোকসংখ্যা : ৯২ কোটি ৫৫ লক্ষ।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব : ১৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
- সর্বোচ্চ বিন্দু : কিলিমাঞ্জারো (তানজানিয়া)।
- সর্বনিম্ন বিন্দু : লেক আসাই (জিবুতি)।
- আফ্রিকার মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রান্ত রেখা : বিষুব রেখা।
- পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম হ্রদ : ভিক্টোরিয়া (জিম্বাবুয়ে)।
- পৃথিবীর একক দীর্ঘতম নদী : নীলনদ (মিশরে)।
- পিরামিডের দেশ : মিসর।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজধানী : কায়রো, মিশর।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি : সাহারা।
- পৃথিবীর বৃহদাকার চিড়িয়াখানা : আফ্রিকা মহাদেশে।
- আয়তনে আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ : সিসেলিস।
- লোকসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ : নাইজেরিয়া।
- আফ্রিকার বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর : ডারবান।
- সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ : দক্ষিণ আফ্রিকা।
- আফ্রিকার একমাত্র প্রণালি : মোজাম্বিক প্রণালি (মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কারকে পৃথক করেছে, ভারত মহাসাগরে অবস্থিত)।
- পৃথিবীর সুবিস্তৃত মালভূমি : আফ্রিকা।
- প্রাচীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ : আফ্রিকা।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বকায় জাতি : পিগমী (কঙ্গোর অধিবাসী) উচ্চতা ১.৪ মি.।
- পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ সোনা উত্তোলন করা হয় : কিম্বালী খনি থেকে (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

বিশ্ব পরিমণ্ডলে আফ্রিকা

- পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ : আফ্রিকা।
- পৃথিবীর সুবিস্তৃত মালভূমি : আফ্রিকা।
- প্রাচীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ : আফ্রিকা।

- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বকায় জাতি : পিগমী (কঙ্গোর অধিবাসী)।
- পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম হ্রদ : ভিক্টোরিয়া (জিম্বাবুয়ে)।
- পৃথিবীর একক দীর্ঘতম নদী : নীলনদ (মিশরে)।
- পিরামিডের দেশ : মিশর।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজধানী : কায়রো, মিশর।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি : সাহারা।
- পৃথিবীর বৃহদাকার চিড়িয়াখানা : আফ্রিকা মহাদেশ।

আফ্রিকার অন্তরীপ, মরুভূমি এবং পর্বত

- গান্ধাফুই অন্তরীপ : সোমালিয়ার অগ্রভাগ, ভারত মহাসাগরে পড়েছে।
- ক্রস ও ফ্রিড অন্তরীপ : নামিবিয়ার অগ্রভাগ, দ: আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।
- সেন্ট ফ্রান্সিস অন্তরীপ : দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারত মহাসাগরে পড়েছে।
- উত্তমাশা অন্তরীপ : দক্ষিণ আফ্রিকায়, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।
- আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ : কিলিমাঞ্জারো (তাঞ্জানিয়া)।
- সাহারা মরুভূমি (পৃথিবীর বড়) : উত্তর আফ্রিকায়।
- কালাহারি মরুভূমি : দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানার মধ্যবর্তী স্থানে।
- অ্যাটলাস পর্বতমালা : উত্তর আফ্রিকা ও মরক্কোর পশ্চিমাংশে।
- আফ্রিকার সর্বোচ্চা পর্বতমালা : ক্যামেরুন।
- আফ্রিকার লবণাক্ত পানির হ্রদ : চাঁদ ও নাগমী।
- কোরিয়া, সুদান, তানজানিয়া ও জিম্বাবুয়ের বিশাল তৃণভূমির নাম : সাভানা।
- আফ্রিকার বিখ্যাত দ্বীপ : মাদাগাস্কার (মালাগাছি), ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

কী, কোথায় অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশ

- পিরামিড : মিসর।
- আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর : মিসর।
- কুবে প্যালেস : ১৮৬০ সালে নির্মিত মিসর সরকারের কার্যালয়।
- রোবেন দ্বীপ : ২৭ বছর ব্যাপী নেলসন ম্যান্ডেলার নির্বাসনস্থল।
- ভাসমান মসজিদ : কাসাব্লাংকা, মরক্কো।
- কিম্বার্লি : দক্ষিণ আফ্রিকা, হীরার খনির জন্য বিখ্যাত।
- পোর্ট সৈয়দ : মিসর, বিখ্যাত আড়তদারী বন্দর।
- খার্তুম : সুদানের রাজধানী, ব্লু নীল ও হোয়াইট নীল সংযোগস্থলে অবস্থিত।
- সিটি অব ডেড/ভ্যালি অব দি কিংস : মিসর/ প্রাচীর মিসরীয়দের সমাধিস্থল।
- জোহান্সবার্গ : দক্ষিণ আফ্রিকা, স্বর্ণখনি ও স্বর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র।
- কেপটাউন : দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃহত্তম বন্দর ও পাতাশ্রয়, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্ট।
- তুগেলা (২য় উচ্চতম জলপ্রপাত) : দক্ষিণ আফ্রিকা।
- আজিজিয়া : লিবিয়া, পৃথিবীর উষ্ণতম জায়গা।
- বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র আল আমিন : মিসর।
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা : নীলনদের তীরে, এ সভ্যতার নতুন লিখন পদ্ধতি হায়রোগ্লি-ফিকস।
- ডারবান : আফ্রিকার বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর।
- স্ট্যানলি ও লিভিংস্টোন : জলপ্রপাত/নাম- বিশ্বের সাথে আফ্রিকাকে পরিচয় করিয়ে তোলে।
- ফেজ : মরক্কোর ঐতিহাসিক শহর, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কেন্দ্র।
- জাঞ্জিবার : লবঙ্গ দ্বীপ (ভারত মহাসাগরে অবস্থিত)।

বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাসে আফ্রিকা

- বর্ণবাদনীতির প্রবক্তা : জেমস হার্জল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আফ্রিকার স্বাধীন দেশ : ৩টি যথা- (ক) মিসর (খ) ইথিওপিয়া এবং (গ) লাইবেরিয়া।
- নেলসন ম্যান্ডেলা নামটি জড়িত : দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে।
- বিশ্ব জনমতের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেন : ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ সালে।
- ১৯৯৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ম্যান্ডেলার এএনসি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' গ্রন্থের রচয়িতা : নেলসন ম্যান্ডেলা।
- দীর্ঘ ২৭ বছর (১৯৬২-১৯৯০) রোবেন দ্বীপে নির্বাসিত (কারারুদ্ধ) ছিলেন : নেলসন ম্যান্ডেলা।
- নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পান : ১৯৯৪ সালে।
- বর্ণবাদী আইন বাতিল করেন : প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক (১৯৯০ সালে)।
- দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান সমস্যা : বর্ণবাদ।
- দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা : ১৯৬১ সালে (বৃটেন থেকে)।
- দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান : ১৯৯৪ সালে।
- দক্ষিণ আফ্রিকার অঙ্গরাজ্য : নাটাল, কেপপ্রোভিন্স, অরেঞ্জ, ফ্রি স্টেট, ট্রান্সভাল।
- দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ শাসিত অঞ্চল : বফোথসোয়ানা, ট্রান্সকিই, সিসকেই, ভেন্ডা।
- দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল স্টেট : গাজানকুল, কানগুয়ান, কুয়ানডেবেলে, কুয়াজুলু, লেবোয়া, কুয়াকুয়া।
- দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী : ২টি (ক) কেপটাউন এবং (খ) প্রিটোরিয়া।
- ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করে : ১৯৯৩ সালে (ইথিওপিয়া হতে)।
- ইথিওপিয়ার গৃহযুদ্ধ : ৩০ বছর স্থায়ী।
- মিশরে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে : ১৯৫২ সালে।
- বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল কৃষ্ণাঙ্গ দেশ : ডেনিজুয়েলা।
- দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ ত্যাগ করে : ১৯৬১ সালে।
- দক্ষিণ আফ্রিকা পুনরায় কমনওয়েলথে যোগদান করে : ১ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে।
- আফ্রিকার তথ্য বিশ্বের গরীব দেশ + সর্বাধিক এইডস আক্রান্ত দেশ + বৃটিশ উপনিবেশ না হয়েও কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্র : মোজাম্বিক।
- সম্প্রতি কমনওয়েলথ থেকে এক বছরের জন্য সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত দেশ : জিম্বাবুয়ে।
- কফি আনান : জাতিসংঘের সপ্তম এবং একমাত্র মুসলিম মহাসচিব, ঘানা।
- আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা : সাম নুজোমা।
- ফাঁসিতে নিহত বেঞ্জামিন মোলাইসি : দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা।
- এ্যাঙ্গোলা : পর্তুগাল উপনিবেশ ছিল, ১১ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে স্বাধীন হয়।
- ইউনিটা, এমপিএলও, এফএনএলএ : এ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতাকামী সংগঠন।
- দক্ষিণ আফ্রিকার উপর থেকে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার : ২৬ মে ১৯৯৪ সালে।
- আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য দিবস : ২১ মার্চ।
- দক্ষিণ আফ্রিকার আদি শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ : কেপ অব গুড হোপ।
- বর্ণবাদ ও বর্ণ বৈষম্য মোকাবেলায় প্রথম বিশ্ব সম্মেলন : জেনেভা, ১৯৭৮ সালে।
- দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বর্তমান নাম : নামিবিয়া (১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় নাম)।
- নামিবিয়ার স্বাধীনতা লাভ : ২০ মার্চ, ১৯৯০ সালে।
- পশ্চিম সাহারা : স্পেনের উপনিবেশ ছিল।
- ইসলামি নেতা শেখ আবদেস সালাম ইয়াসিন : মরক্কোর।
- ইবনে বতুতা : উত্তর আফ্রিকার মরক্কোর অধিবাসী।
- ঘানাকে বিদেশি শাসনমুক্ত করেন : কোয়েমে নক্রুমা।
- কঙ্গোকে বিদেশি শাসনমুক্ত করেন : প্যাট্রিস লুমুম্বা।
- প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী : আনোয়ার সাদত, (শান্তি) মিশর (১৯৭৮ সালে)।
- সর্বশেষ মুসলিম নোবেল বিজয়ী : কফি আনান, (শান্তি রক্ষা কার্যক্রম) ঘানা (২০০১ সালে)।

তথ্য তরঙ্গে ওশেনিয়া মহাদেশ

- আয়তন : ৭৬,৮২,৩০০ বর্গ কি.মি.।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মহাদেশ : ওশেনিয়া।
- ওশেনিয়ার মোট লোকসংখ্যা : দুই কোটি নব্বই লক্ষ।
- লোকসংখ্যার ঘনত্ব : প্রতি বর্গ কি. মি. ৩ জন।
- আয়তনে ও জনসংখ্যায় ওশেনিয়ার বৃহত্তম দেশ : অস্ট্রেলিয়া
- অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত রেখা : মকরক্রান্তি রেখা।

- অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ : কোসিয়াস্কো।
- দক্ষিণ মহাসাগরের সকল দ্বীপপুঞ্জের সমন্বিত নাম : ওশেনিয়া।
- অস্ট্রেলিয়ার শাব্দিক অর্থ : এশিয়ার দক্ষিণ দিক।
- ওশেনিয়ার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি : মনালোয়া।
- অস্ট্রেলিয়ার সর্বোনিম্ন বিন্দু : লেক আয়ার।
- অস্ট্রেলিয়ার প্রধান পর্বতমালা : গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ।
- ওশেনিয়ার বৃহত্তম হ্রদ : আয়ার।
- ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ : অস্ট্রেলিয়া।
- স্বাধীনতার আগে পাপুয়া নিউগিনি : অস্ট্রেলিয়ার অধীনে ছিল।
- পৃথিবীতে দ্বীপ মহাদেশ বলে খ্যাত : ওশেনিয়া।

অঞ্চল ভিত্তিক ওশেনিয়া মহাদেশ

- ওশেনিয়া মহাদেশের অঞ্চল : ৫টি যথা : (ক) অস্ট্রেলিয়া, (খ) নিউজিল্যান্ড, (গ) মাইক্রোনেশিয়া, (ঘ) মিলেনেশিয়া এবং (ঙ) পলিনেশিয়া।
- মাইক্রোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান প্রধান দ্বীপ : মেরিয়ানা, ক্যারোলিনা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ।
- মিলেনেশিয়ার অন্তর্গত দ্বীপ : ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, নিউ ক্যালিডোনিয়া, বিসমার্ক, সান্তুক্রুজ ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।
- পলিনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ : সামোয়া, টোঙ্গা, তমেতু, ইস্টার এবং তাহিতি।

বিশ্ব রাজনীতি ও ইতিহাস (ওশেনিয়া মহাদেশ)

- অস্ট্রেলিয়ার প্রতীকী প্রধান : বৃটেনের রানি (রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ)।
- অস্ট্রেলিয়া বৃটেনের সাথে সাংবিধানিক সম্পর্ক ছিন্ন করে : ১৯৮৩ সালে (প্রেসক্লামেশন অব অস্ট্রেলিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে)।
- ফিজি স্বাধীনতা লাভ করে : ১০ অক্টোবর, ১৯৭০ সালে।
- ফিজির ক্ষমতাচ্যুত ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই সরকার প্রধান : থমোসি ও মহেন্দ্র চৌধুরী।
- ফিজির সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক : জর্জ স্প্রেইট।
- অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যারেট।
- নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : জন কে।
- পৃথিবীতে নারীরা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার পায় : নিউজিল্যান্ডে।
- সলোমন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা লাভ করে : ৭ জুলাই, ১৯৭৮ সালে।
- মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র।
- মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে : ১৯৯১ সালে।
- টুভালুর পূর্ব নাম : এলিস।
- রিপাবলিক অব কিরিবাতির পূর্ব নাম : গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ।
- ক্যাঙ্গারুর দেশ : অস্ট্রেলিয়া।
- দক্ষিণের রাণী : সিডনি।
- দক্ষিণের গ্রেট বৃটেন : নিউজিল্যান্ড।

তথ্য তরঙ্গে উত্তর আমেরিকা

- **উত্তর আমেরিকার অবস্থান :** উত্তরে ৮৩° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৮° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং পূর্বে ৫২° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে প্রায় ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **মোট স্বাধীন রাষ্ট্র :** ২৩টি।
- **উত্তর আমেরিকা :** যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।
- **মধ্য আমেরিকা :** ১. কোস্টারিকা, ২. এল সালভেদর, ৩. গুয়াতেমালা, ৪. হন্ডুরাস, ৫. নিকারাগুয়া, ৬. পানামা, ৭. বেলিজ।
- **ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রসমূহ :** ১. বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, ২. বার্বাডোস, ৩. কিউবা, ৪. ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ৫. গ্রানাডা, ৬. হাইতি, ৭. জ্যামাইকা, ৮. ত্রিনিদাদ টোবাগো, ৯. বাহামা।

http://thejobstudy.com Go to Contents

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

- উত্তর আমেরিকার আয়তন : ২,৪৩,২০,১০০ বর্গ কি.মি.।
- পৃথিবীল মোট আয়তনের : ১৬.৫%
- আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত : নায়াগ্রা উচ্চতা ৫১ মিটার।
- লোকসংখ্যা : ৫৫ কোটি ১৩ লাখ ।
- পৃথিবীর মোট আয়তনের : ১৬.৫ শতাংশ।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব : প্রতি বর্গ কি.মি. ১৫ জন।
- লোকসংখ্যার বৃহত্তম দেশ : টার্কস ও কাইবাস।
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশ : বার্বাডোস (৪৩০ বর্গ কি.মি.)
- আয়তনে বৃহত্তম : কানাডা (৯৯,৩৬,১৪০ কি.মি.)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ : গ্রিনল্যান্ড।
- সর্বোচ্চ শৃঙ্গ : আলাস্কার ম্যাককিনলি (৬১৯৪ মি.)
- সর্বোচ্চ বিন্দু : ম্যাককিনলি (৬১৯৪ মি.)।
- সর্বনিম্ন বিন্দু : ডেথ ভ্যালি (-৮৬ মি.)।
- পৃথিবীর বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ : সুপিরিয়র হ্রদ।
- দীর্ঘতম নদী : মিসিসিপি (৬২৭০ কি.মি.)।
- সর্বোচ্চে আগ্নেয়গিরি : পোপেক্যাটপেল।
- বৃহত্তম পার্ক : কানাডার উড বাফেলো।
- উষ্ণতম স্থান : ডেথ ভ্যালি।
- গভীরতম গিরিখাত : গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।
- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে বিচ্ছিন্নকারী খাল : পানামা।
- কলম্বিয়াকে দুই মহাদেশের করিডোর বলা হয় ।

বিশ্ব পরিমণ্ডলে উত্তর আমেরিকা

- পৃথিবীর বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ : সুপিরিয়র হ্রদ।
- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রধান দেশ : যুক্তরাষ্ট্র।
- পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্র।
- পৃথিবীর জাঁকজমকপূর্ণ নগরী : নিউইয়র্ক।
- পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র : পিটসবার্গ।
- পৃথিবীর রুটির ঝুরি : প্রেইরি।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় তামাক উৎপাদনকারী দেশ : যুক্তরাষ্ট্র।
- প্লাটিনাম উৎপাদনে দ্বিতীয় + সোনা উৎপাদনে তৃতীয় রাষ্ট্র : কানাডা।

অঞ্চল ভিত্তিক উত্তর আমেরিকা

- তিনটি অঞ্চল : (১) মধ্য আমেরিকা (২) ক্যারিবিয়ান এবং (৩) উত্তর আমেরিকা।
- মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্র : কোস্টারিকো, এল সালভেদর, গুয়াতেমালা, হান্ডুরাস, নিকারাগুয়া, পানামা।
- উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো।
- ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্র : বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বার্বাডোস, কিউবা, ডোমকিান প্রজাতন্ত্র, গ্রানাউড, হাইতি, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।

এক নজরে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

- দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থান : ১৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ হতে দক্ষিণে ৫৬০ দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং পূর্বে ৩৪০ পূব দ্রাঘিমা হতে পশ্চিমে ৮২০ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মোট স্বাধীন রাষ্ট্র : ১২ টি।
- দক্ষিণ আমেরিকা : ১. ব্রাজিল, ২. প্যারাগুয়ে, ৩. পেরু, ৪. আর্জেন্টিনা, ৫. বলিভিয়া, ৬. সুরিনাম, ৭. উরুগুয়ে, ৮. কলম্বিয়া, ৯. ইকুয়েডর, ১০. চিলি, ১১. গায়েনা ১২. ভেনিজুয়েলা।

তথ্য তরঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

- আয়তন : ১,৭৫,৯৯,০৫০ বর্গ কি.মি.।
- পৃথিবীর মোট আয়তনের : ১১.৮%।
- জনসংখ্যা : ৪০ কোটি ৪০ লাখ
- সর্বোচ্চ বিন্দু : সেরো অ্যাকাঙ্কাগুয়া।
- সর্বনিম্ন বিন্দু : পেনিনসুলা।
- দীর্ঘতম নদী : আমাজান।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ : ব্রাজিল ১৮,৮৯,০০,০০০
- আয়তনে বৃহত্তম দেশ : ব্রাজিল (৮৫,১১,৯৬৫ বর্গ কি.মি.)
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ : সুরিনাম।
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশ : সুরিনাম।
- উচ্চতম পর্বত শ্রেণি : আন্দিস পর্বতমালা।
- উচ্চতম জলপ্রপাত : অ্যাঞ্জেল। (উচ্চতা ১০০০ মিটার।
- বৃহত্তম জলপ্রপাত : গুয়ারিয়া (ব্রাজিল)।
- উচ্চতম হ্রদ : টিটিকাকা।
- সর্বোচ্চ পর্বতমালা : আন্দিজ পর্বতমালা।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বত শ্রেণি : আন্দিজ পর্বতমালা।
- পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী : লাপাজ (বলিভিয়ার রাজধানী)।
- বৃহত্তম দেশ (আয়তন + লোকসংখ্যা) : ব্রাজিল।
- ক্ষুদ্রতম অঞ্চল (আয়তন + জনসংখ্যা) : ফকল্যান্ড দ্বীপ।
- আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ : সুরিনাম।
- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত : এ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত (ভেনিজুয়েলায় অবস্থিত)।
- পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি (৬০%) কফি উৎপাদন হয় : ব্রাজিলে।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় কফি উৎপাদনকারী দেশ : কলম্বিয়া।
- দক্ষিণ আমেরিকার ভাষা : স্পেনীয় (ব্রাজিল ছাড়া)।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী : আমাজান।
- পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী : আমাজান।
- পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা : আমাজান নদী অববাহিকা।
- দক্ষিণ আমেরিকার বনভূমির মোট আয়তনের : ৫২ শতাংশ।
- সর্বপ্রথম দ: আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশ : স্পেন।
- আদিম অধিবাসী ও স্পেনীয়দের সংমিশ্রণে দক্ষিণ আমেরিকার সৃষ্ট জাতির নাম : মেস্তিজো।
- দক্ষিণ আমেরিকার অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বনভূমির নাম : সেভলা বনভূমি।
- দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত রাষ্ট্র– ১২ টি যথা : (১) ব্রাজিল, (২) প্যারাগুয়ে, (৩) পেরু, (৪) আর্জেন্টিনা, (৫) বলিভিয়া, (৬) সুরিনাম (৭) উরুগুয়ে, (৮) কলম্বিয়া, (৯) ইকুয়েডর, (১০) চিলি, (১১) গায়েনা এবং (১২) ভেনিজুয়েলা।

বিশ্ব ইতিহাস ও রাজনীতি
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

- আমেরিকার আবিষ্কারক : ১৪৯৮ সালে ইটালির নাবিক কলম্বাস।
- উত্তর মেরু আবিষ্কারক : ১৯০৯ সালে কমান্ডার পিয়েরে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আলাস্কা প্রদেশ ক্রয় : ১৮৬৭ সালে (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে)।
- আমেরিকার স্বাধীনতা : ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে।
- আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা : জর্জ ওয়াশিংটন।
- ক্রীতদাস প্রথা বিলোপকারী : আব্রাহাম লিংকন (১৬তম প্রেসিডেন্ট), ১৮৬৩ সালে।
- আমেরিকায় গৃহ যুদ্ধ : ৪ বছর ব্যাপী (১৮৬১-১৮৬৫ সাল পর্যন্ত)।
- ফকল্যান্ড যুদ্ধ : ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের সাথে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করলে এ দ্বীপের সম্পূর্ণ মালিকানা ব্রিটেনের হাতে চলে যায়।
- মধ্য আমেরিকার স্থায়ী সেনাবাহিনীহীন দেশ : কোস্টারিকো।

- ওয়াটার গেট কেলেংকারী : ১৯৭২ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এর সাথে জড়িত। বর্তমানে ওয়াটার গেট একটি বাণিজ্য ভবন।
- সৎ প্রতিবেশী নীতির প্রবক্তা : রুজভেল্ট।
- কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট : জন এফ কেনেডি।
- যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পানামায় সামরিক অভিযান : ২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট : উড্রো উইলসন (২৮তম প্রেসিডেন্ট)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট : ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (৩২তম) এবং ট্রুম্যান (৩৩তম)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অংশগ্রহণ : ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় তারকা রাজ্য : হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের সেরা প্রেসিডেন্ট : আব্রাহাম লিংকন।
- মাদার ল্যাংগুয়েজ লার্ভাস গ্রুপ : কানাডার।
- পানামা খাল খনন : ১৯১৪ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনেস্কো ত্যাগ : ১৯৮৫ সালে (বর্তমানে পুনরায় যোগদানের তৎপরতা চলছে)।
- স্ট্যাচু অব লিবার্টি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্স উপহার হিসেবে দিয়েছে (যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত)।
- হোয়াইট হাউজ– মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাসভবন, স্থপতি : আইরিশ স্থপতি জেমস হোবান।
- ফেয়ার ফ্যাক্স : মার্কিন বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা।
- পেন্টাগন : মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ এখানে বিমান হামলায় এর অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়।
- লস এ্যাঞ্জেলস : চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী : জন কেরি।
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর : ভার্জিনিয়া।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা : ১৭৮৯ সালে জেমস মেডিসন কর্তৃক।
- ক্যাম্প ডেভিড : যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত স্থান। ১৯৭৮ সালে জিমি কার্টার এর উদ্যোগে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ কাল : চার বছর।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের সিনেটর : ২ জন।
- বেভারলি হিল : যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্থান।
- পানামা যোজক : দুই আমেরিকাকে সংযুক্তকারী প্রণালি।
- নতুন বিশ্ব বলা হয় : দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে।
- নদী বহুল মহাদেশ– দক্ষিণ আমেরিকা।
- হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম তারকা রাজ্য।
- ভ্যান কুভার দ্বীপ : কানাডায় অবস্থিত।
- কলিমা আপ্লেয়েপিরি : যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।
- গোল্ডেন গেইট সড়ক সেতু : সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধপূর্ণ নদী : রিওগ্রানাডে।
- জনসংখ্যায় বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্র।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আয়ের শহর : নিউজার্সি।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব নিম্ন আয়ের শহর : ভার্জিনিয়া।
- যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান উৎক্ষেপন কেন্দ্র : নাসা ।
- এল সালভাদরের মুক্তি সংগ্রামে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে সাহায্য করেছে : নিকারাগুয়া।
- কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারায় : ১৯৬৮ সালে।
- 'নেশন অব ইসলাম' পার্টির নেতা : লুই ফারাহ খান।
- আমেরিকার বিখ্যাত মূর্তি স্ট্যাচু অব লিবার্টির স্থপতি : ফ্রেদারিক অগাস্তে বার্থোলদি।
- যুক্তরাষ্ট্রের মহিলারা ভোটাধিকার পান : ১৯২০ সালে।
- মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও চোরাচালানের জন্য ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে আলোচিত দেশ : কলম্বিয়া।
- 'ফিদেল ক্যাস্ট্রো' কিউবার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন : ১৯৫৯ সালে।
- ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবার প্রেসিডেন্ট হন : ১৯৬০ সালে।
- কিউবার বর্তমান সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতি : সমাজতন্ত্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে হলে মোট ইলেকটোরাল ভোটের প্রায়োজন : ২৭০টি।
- 'যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেনটিভস'-এর সংখ্যা : ৪৩৫টি।

- প্রথম 'ফাস্ট লেডি' হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর : হিলারী ক্লিনটন।
- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদবী : Secretary of State
- 'ইলেকটোরাল কলেজ' : যুক্তরাষ্ট্রের একটি নির্বাচকমণ্ডলী।
- ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারীর মূল বিষয় : যুক্তরাষ্ট্র অবৈধভাবে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করে এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা কন্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্য হিসেবে দেয়। এ কেলেঙ্কারীর সাথে কর্ণেল অলিভার নর্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।
- মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিলোপের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন : রিগ্যান ও গর্বাচেভ।
- মার্কিন নিগ্রো অধিকার আন্দোলনের অহিংসবাদী নেতা : মার্টিন লুথার কিং।
- ডিজনী ওয়ার্ল্ড অবস্থিত : ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্রে।
- 'সিটিস অব দি ডেড' : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত কবরস্থান।
- ফ্রিডম হাউজ : আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনের নাম।
- ইতিহাসে বলা হয় : উড্রো উইলসন, ডেভিড লয়েড জর্জ, জর্জ ক্লিমেনশোও ভিটোরিও আর্লান্ডোকে।
- বিশ্ব ব্যাংক থেকে সদস্য পদ প্রত্যাহারকারী একমাত্র দেশ : কিউবা।
- মার্কিন মহাকাশ যানের প্রথম মহিলা কমান্ডারের নাম : আইলিস কলিন্স (যুক্তরাষ্ট্র)।
- ওয়াল্ড ওয়াচ' : ওয়াশিংটন ভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ সংস্থা।
- পৃথিবীর প্রথম ও একমাত্র কম্পিউটার যাদুঘর : যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়।
- কিউবার উপর যুক্তরাষ্ট্র অবরোধ আরোপ করে : ১৯৬২ সালে।
- বাংলাদেশের বর্তমানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত : মার্সিয়া স্টিফেন ব্রুম বার্নিকেট (৩য় মহিলা)।
- স্টিভেন স্পিলবার্গ : যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে জন এফ কেনেডি।
- স্টেট অব দ্যা ইউনিয়ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাৎসরিক শেষ ভাষণ।
- 'সানফ্রান্সিসিসকোর গোল্ডেন গ্রেট : একটি সংকীর্ণ জলপথ।
- ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে বলতে বোঝায় : চূড়ান্ত ভূমিকম্প।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা পাইলট : এ্যালেন শেফার্ড (যুক্তরাষ্ট্র)।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যে একমাত্র ডক্টরেটধারী ছিলেন : উড্রো উইলসন।
- গেটিসবার্গ শহরের সাথে বিখ্যাত মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম জড়িত : আব্রোহাম লিংকন।
- বর্তমান বিশ্বের দুই ইকোনমিক 'সুপার পাওয়ার' দেশ– : যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান।
- 'এয়ারফোর্স ওয়ান' : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান।
- 'ন্যাষ্টেড' কমান্ডো বাহিনী : যুক্তরাষ্ট্রের।
- বিখ্যাত তামা ও সীসা উৎপাদন কেন্দ্র 'সেন্ট্রোমিন' অবস্থিত : পেরুতে।
- বিশ্বে মাদকদ্রব্য কোকেন এর প্রধান সরবরাহকারী অঞ্চল 'হুয়ালাগা' অবস্থিত : পেরুতে।
- বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম : মারাকানা, ব্রাজিল।
- 'মোটর গাড়ির শহর' বলা হয় : যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রোয়েট শহরকে।
- 'মৃত্যু উপত্যাকা' অবস্থিত : আমেরিকা।

দেশ সম্পর্কিত ভৌগলিক তথ্য

- **সর্ববৃহৎ দেশ :** বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ রাশিয়া। আয়তন ১ কোটি ৭০ লাখ ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এটি পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ১১.৫ শতাংশ। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার ৯,৬০০ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে দেশটির দৈর্ঘ্য ৪,৮০০ কিলোমিটার।
- **সবচেয়ে জনবহুল দেশ :** বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন। লোকসংখ্যা ১৩৫ কোটি ৪১ লাখ। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২২% লোক এ দেশে বাস করে।
- **সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ :** বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৯০ জন। মোট লোকসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখ।
- **সবচেয়ে সরু দেশ :** বিশ্বের সবচেয়ে সরু দেশ চিলি। সংকীর্ণ ফিতার মতোই অপ্রশস্ত এবং পেরুর দক্ষিণ থেকে পুন্টা আরেনাস পর্যন্ত ৬১৫৫ কিলোমিটার বিস্তার লাভ করেছে। পুন্টা আরেনাস বিশ্বের সর্ব দক্ষিণের শহর।
- **অধিক দ্বীপরাষ্ট্র :** বিশ্বের সর্বাধিক দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত। প্রায় ১৭,৫০৮টি দ্বীপ রয়েছে এ দেশে। এর মধ্যে ৬,০০০ দ্বীপ মানব বসতিসম্পন্ন। দ্বীপপুঞ্জের বৃহৎ দ্বীপগুলো হলো সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সুলাভেসি ও ইরিয়ানা জায়া। [www.indonesia.gov.id]
- **The Tiger of Bicycle :** ভিয়েতনামকে The tiger of Bicyle বলা হয়। কারণ এ দেশে প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশটি অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র। লোকজন সাধারণ বাইসাইকেলে চড়তে পারে। এ জন্য অর্থনীতিবিদরা ভিয়েতনামকে এ নামে অভিহিত করেছেন।
- **সূর্যোদয়ের দেশ :** এশিয়ার পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জাপান অবস্থিত। পূর্ব গোলার্ধের একেবারে পূর্ব অবস্থিত বলে এ দেশে প্রথম সূর্যোদয় ঘটে। তাই জাপানকে উদীয়মান সূর্যের দেশ বলা হয়।
- **জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ :** পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম স্বাধীন দেশ হলো ভ্যাটিক্যান সিটি। ইতালির রাজধানী রোমের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ভ্যাটিকানের আয়তন মাত্র ১০৮.৭ একর(০.৪৪ বর্গ কিলোমিটার)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। লোকসংখ্যা মাত্র ১০০০ জন।
- **জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র :** বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্রের নাম নাউরু। আয়তন ২১.৩ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা মাত্র ১৩ হাজার। দেশটি ওশেনিয়া মহাদেশের অন্তর্গত প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটি দ্বীপরাষ্ট্র।
- **আয়তনে ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র :** আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র ভ্যাটিকান। আয়তন মাত্র .৪৪ বর্গ কিলোমিটার।
- **বিশ্বের সবচেয়ে সীমান্তবেষ্টিত দেশ :** বিশ্বের সর্বাধিক সীমান্তবেষ্টিত দেশ চীন। চীনের সাথে ১৪টি দেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে। সীমান্তবর্তী দেশগুলো হচ্ছে-রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ভারত, ভূটান, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও কাজাখাস্তান। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান ও ফিলিপাইনের সাথে জল সীমানা রয়েছে।
- **বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সীমান্ত দেশ :** রাশিয়া (৯২০,১৩৯ কি.মি)
- **সংক্ষিপ্ত সীমান্তবেষ্টিত দেশ :** বিশ্বের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সীমান্তবর্তী দেশ ভ্যাটিকান ও ইতালি। এ দুটি দেশের মধ্যে সীমান্তে দৈর্ঘ্য মাত্র ৪.০৭ কিলোমিটার।
- **স্থায়ী বসতিশূন্য মহাদেশ :** অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোনো স্থায়ী জনবসতি নেই। ১,৫২,০৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ মহাদেশটি দক্ষিণ মেরুর চতুর্দিকে অবস্থিত। এটি বরফাবৃত শীতলতম বিধায় এখানে কোনো জনবসতি নেই। শুধুমাত্র বিজ্ঞানী, গবেষক ও অভিযাত্রীদের অস্থায়ী বসতি রয়েছে।
- **সমুদ্র অভিযাত্রীদের দেশ :** পর্তুগালকে মহাসমুদ্র অভিযাত্রীদের দেশ (A Nation of Great Sea Farers) বলা হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পর্তুগীজরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে। সে সুবাদে তারা আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ দখল করে এবং ব্রাজিলে উপনিবেশ স্থাপন করে।
- **নিরপেক্ষ দেশ :** সুইজারল্যান্ডকে বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশ বলা হয়। ১৮১৫ সাল থেকেই এ দেশটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ যাবত যতো যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তা থেকে সব সময় দেশটি দূরে ছিল। সম্প্রতি জাতিসংঘে যোগ দিয়েছে।
- **ছিটমহল :** কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড যা তার শাসনাধীন নয় তাকে ছিটমহল বলে। যেমন-ভারতের মধ্যে অবস্থিত বাংলাদেশের ভূখণ্ড আঙ্গোরপোতা ও দহগ্রাম।
- **নিরাষ্ট্র ভূমি বা নোম্যানস ল্যান্ড :** দুটি সার্বভৌম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট অঞ্চল, যেখানে কার্যত কোনো রাষ্ট্রেরই নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাকে নো-ম্যানস ল্যান্ড বলে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের বেনাপোলে যেমন ক্রসিং গেট রয়েছে, তেমনি ভারতের হরিরামপুরেও একটি ক্রসিং গেট রয়েছে। উভয় দেশের সীমান্তরীরা গেটে প্রহরায় নিয়োজিত। এ দুটো গেটের মধ্যবর্তী প্রায় ২০ গজ এলাকায় কোনো দেশেরই নিয়ন্ত্রণ নেই। এ অংশটুকুই হলো নিরাষ্ট্র ভূমি বা নোম্যানস ল্যান্ড।
- **খন্ডিত রাষ্ট্র :** ভৌগোলিক দিক থেকে যেসব রাষ্ট্রের পরিসর পৃথক বা খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়, সেসব রাষ্ট্রকে খন্ডিত রাষ্ট্র বলে। যেমন-জাপান, ইন্দোনেশিয়া।
- **ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র :** যেসব রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিসরে অন্য কোনো রাষ্ট্রের অংশবিশেষ বা পুরো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে, সেসব রাষ্ট্রকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলে। যেমন-ইতালি। ইতালির অভ্যন্তরে সানমারিনো এবং ভ্যাটিকান সিটি দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র অবস্থিত।
- **বিভক্ত রাজধানী :** কোনো কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ একটি শহরে বিদ্যমান নয়। বরং বিভিন্ন শহরে বন্টিত। যেমন নেদারল্যান্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হেগ শহরে আইন পরিষদ অবস্থিত আমষ্টারডামে রাজকীয় প্রাসাদসহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর অবস্থিত। এ ধরনের রাজধানীকে বিভক্ত রাজধানী বলে।

বিভিন্ন দেশ ও স্থানের নামকরণের ইতিহাস

- **অস্ট্রেলিয়া :** 'অস্ট্রেলিয়া' শব্দের অর্থ হলো এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল। এই ভূখণ্ড এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বলে এর নামকরণ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
- **আমেরিকা :** আমেরিগো ভেসপুচি নামক নাবিকের নাম থেকে এই নামের উৎপত্তি। ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই মহাদেশে অবতরণ করে বহু অঞ্চল আবিষ্কার করেন।
- **ইকুয়েডর :** ইকুয়েডর শব্দের অর্থ নিরীয় অঞ্চল। এই দেশটি নিরীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ইকুয়েডর।
- **ইন্ডিয়া :** 'ইন্ডিয়া' শব্দটি এসেছে 'ইন্ডিগো' থেকে। ইন্ডিগো অর্থ নীল। ভারতে প্রচুর পরিমাণে নীল চাষ হতো বলে এরূপ নামকরণ করা হয়। কারো মতে, সিন্ধু নদ বা ইন্ডাস (অতঃপর) নাম থেকে এই নামের উৎপত্তি।
- **ওয়েস্ট ইন্ডিজ :** দ্বীপটির অবস্থান মেক্সিকো উপসাগরে। কলম্বাস ভারত অভিযানে বেড়িয়ে পশ্চিম দিকে নৌ-চালনাকালে প্রথম এখানে এসে পৌছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, তিনি হয়তো ভারতের পশ্চিমের কোনো দ্বীপে পৌছে গেছেন। তার এই ভ্রান্ত-ধারণাকেই মেনে নিয়ে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- **কলম্বিয়া :** কলম্বাসের নামানুসারে 'কলম্বিয়া' নামকরণ হয়েছে।
- **কুইন্সল্যান্ড :** 'কুইন্সল্যান্ড' শব্দের অর্থ রানির দেশ। নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে পৃথক করার সময় ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়া এই নামকরণ করেন।
- **গ্রিনল্যান্ড :** এই দ্বীপের সৈকতে সবুজ পত্রবিশিষ্ট এক প্রকারের ছোট ছোট গাছ জন্মায়। এই গাছের সবুজ পাতার রং থেকেই গ্রীনল্যান্ড নামের উৎপত্তি।
- **পাকিস্থান :** পাকিস্তান শব্দের অর্থ হলো পাকস্থান বা পবিত্র স্থান। কবি ইকবাল এই নাম প্রস্থান করেন। পাঞ্জাবের P, আফগানের A, কাশ্মিরের K, সিন্ধুর S, বেলুচিস্তানের Tan দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে পাকিস্তান।
- **নিউজিল্যান্ড :** ডাচ নাবিক তাসমান ১৬৪৬ সালে এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন এবং হল্যান্ডের একটি প্রদেশ জিল্যান্ড-এর নামানুসারে এর নামকরণ করেন নিউজিল্যান্ড।
- **বাল্টিক সাগর :** বেল্ট থেকে প্রবেশ করেছে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে বাল্টিক সাগর।
- **বাবেল মান্দেব :** আরবি শব্দ বাবেল মান্দেবের অর্থ মৃত্যুর দরজা। এই প্রণালি আফ্রিকা থেকে এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এখানে প্রতি বছর অসংখ্য নৌযান ডুবির কারণে এর নাম হয়েছে।
- **ব্লাক সী :** কৃষ্ণ সাগর। শীতকালে এই সাগর ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ব্লাক সী।
- **বেলজিয়াম :** এ দেশে বসবাসরত 'বেলজা' নামক একটি প্রাচীন গোত্রের নামানুসারে এই নাম হয়েছে।
- **ফ্রান্স :** এ দেশে বসবাসরত একটি প্রাচীন গোত্র 'ফ্রাঙ্ক' থেকে ফ্রান্স নামের উৎপত্তি।
- **ফিলিপাইন :** স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে এই দেশের নামকরণ করা হয়েছে ফিলিপাইন।
- **মর্মর সাগর :** বিখ্যাত মর্মর (মার্বেল) দ্বীপ এই সাগরে অবস্থিত বলে এই সাগরের নামকরণ করা হয়েছে মর্মর সাগর।
- **মেক্সিকো :** প্রাচীনকালে এই দেশে বসবাসকারী আজিকাস সম্প্রদায়ের রণদেবতার নাম 'মেক্সিকো' থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে।
- **মেডিটারেনিয়ান :** ভূ-মধ্যসাগর। আদিকালে এই স্থানকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলে মনে করা হতো। সে কারণে এর নাম হয় মেডিটারেনিয়ান বা ভূ-মধ্যসাগর।
- **মেসোপটেমিয়া :** দুটি গ্রিক শব্দ থেকে এই নামের উৎপত্তি। 'মেসো' অর্থ মধ্যস্থান আর 'পটেনস' অর্থ নদী-অর্থাৎ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান। নদী দুটির নাম ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস।
- **স্পেন :** আদি নাম হাসপানিয়া থেকে এই নামের উৎপত্তি হয়েছে।
- **বাংলাদেশ :** প্রাচীনকালে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল বং নামে পরিচিত ছিল। বং থেকে বঙ্গ। পরবর্তী বঙ্গ এর সঙ্গে আল যোগ হয়ে বাংলা নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়।
- **ভারত :** রামায়ণে প্রাচীন ভারতের নাম রাম, লক্ষ্মণ,ভরত,ও শত্রুঘ্ন নামে চার ভ্রাতার উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ভরত ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। ভরত থেকে পরবর্তীতে ভারত নামকরণ করা হয়েছে।
- **শ্রীলংকা :** শ্রীলংকার পূর্ব নাম ছিল সিংহল। ১৮৭২ সালে সিংহল থেকে শ্রীলংকা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে বিজয় সিংহ নামে একজন শাসক একদা এ অঞ্চল জয় করেছিল বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল সিংহল।

- **রাশিয়া :** হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র রোশ থেকে রুশ জাতির নাম করণ। পরবর্তীতে রুশ জাতির আবাস রাশিয়া নামে পরিচিত হয়।
- **আফ্রিকা :** আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব পরিচয় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। অনেকের মতে Apreca থেকে আফ্রিকা নামকরণ করা হয়েছে। যার অর্থ রৌদ্রদীপ্ত।
- **থাইল্যান্ড :** থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। বস্তুত এ দেশ কখনো পরাধীন ছিল না। তাই এদেশটির নাম এইরূপ হয়েছে।
- **ইংল্যান্ড :** অ্যাঙ্গলেসের নামানুসারে ইংল্যান্ডের নামকরণ করা হয়েছে। গ্রিক ও রোমানরা ইংল্যান্ডকে এলবিরন বলে ডাকতো। এটি ল্যাটিন শব্দ এলবাস থেকে এসেছে। এলবাস শব্দের অর্থ হলো সাদা। ধারণা করা হয় রোমানরা ইংল্যান্ডে পদার্পণ করে সর্বপ্রথম এখানকার শ্বেতকায় আদিম অধিবাসীদের দেখেছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি

- রেড ইন্ডিয়ান : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বত এবং মিসৌরি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী জাতি। তারা যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসী।
- আফ্রিদি : পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরস্তানের উপজাতি।
- শেরপা : নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে বসবাসকারী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসী।
- দ্রাবিড় : দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকায় বসবাসকারী অনার্য জাতি।
- আইজাকেলস : পাকিস্তানের যুদ্ধপারদর্শী উপজাতি।
- এস্কিমো : গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা, ল্যাব্রাডার এ সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি জাতি বিশেষ।
- এবোর : আসাম ও ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবাসী মঙ্গোলীয়জাত অধিবাসী।
- এ্যাংলো-স্যাক্সন : ইংল্যান্ড ও কানাডার অধিবাসী এবং ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ানদের বলা হয় 'এ্যাংলো-স্যাক্সন'।
- ককেশীয় : আরব, পার্সী, ইহুদী ও ইউরোপের অধিবাসীবৃন্দ।
- কসাক : পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেনের কৃষকগণ।
- কুর্দি : তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া ও ইরানের অন্তর্ভুক্ত কুর্দিস্তানের উপজাতি।
- কোজাকস : রাশিয়ার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি।
- কাফির : দক্ষিণ আফ্রিকার যোদ্ধা জাতি।
- জুলু : দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশের অধিবাসী।
- খাসিয়া : আসামের খাসিয়া এলাকার উপজাতি। বাংলাদেশের সিলেটেও খাসিয়া উপজাতিরা বসবাস করে।
- চাকমা : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী।
- টোডা : ভারতের নীলগিরি পর্বত এলাকার অধিবাসী।
- তাতার : সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান, চেচনিয়া ও স্টেপস অঞ্চলের জাতি।
- নর্ডিক : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপ এবং বাল্টিক সাগরের তীরে বসবাসকারী ককেশীয় জাতির একটি শাখা।
- নাগা : ভারতের নাগাল্যান্ডের পাহাড়ী উপজাতি।
- নিগ্রো : মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ।
- বেদুঈন : আরবের যাযাবর জাতি। তারা উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।
- বোয়ার : দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ বংশধরগণ, বিশেষ করে ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে বসবাসকারী ওলন্দাজ বংশধরগণ।
- বান্টু : সেন্ট্রাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদেরকে বান্টু বলা হয়।
- মোপলা : ভারতের কেরালার এবং মালাবারের একটি মুসলমান উপজাতি।
- মালয় : মালয় উপদ্বীপের অধিবাসী।
- মুর : উত্তর আফ্রিকার বসবাসরত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা।
- পিগমী : আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের বেটে মানুষ।
- সাঁওতাল : ভারতের উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের অধিবাসী
- হ্যামাইটস : উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কালো চামড়ার অধিবাসী।
- এবরজিন : অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ও উপজাতি।
- হটেন্টট : দক্ষিণ আফ্রিকার আদি উপজাতি।
- মাঞ্চু : পূর্ব এশিয়ার টাঙ্গু উপজাতি।
- কিরগিজ : কিরগিজস্তান ও কাজাখস্তান অঞ্চলের অধিবাসী।
- হান : চীনের একটি উপজাতি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

⇨ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ২৮ জুলাই, ১৯১৪- ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ ।
⇨ পরোক্ষ কারণ : জার্মানি নীতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের
⇨ মূল কারণ: ১৮৬২ সালে প্রিন্স অটোমান বিসমার্ক প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন । তার দুটি উদ্দেশ্য ছিল :
ক. জার্মানির পুন : একত্রীকরণ
খ. শক্তিশালী গড়ে তোলা
⇨ ১৭৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র জার্মানি ছিল রোম সম্রাটের দখলে । অস্ট্রিয়াকে "সেকেন্ড ক্যাপিটাল" বানিয়ে শাসন করত । তখন সমগ্র জার্মানি ৩৬০ টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল ।
⇨ ১৭৯৭ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন জার্মানি দখলের মাধ্যমে এখান হতে রোম শাসনের অবসান ঘটান । তিনি সমগ্র জার্মানিকে ৩৯ টি রাজ্যে বিভক্ত করেন । এর মধ্যে শক্তিশালী ছিল প্রুশিয়া এবং অস্ট্রিয়া । নেপোলিয়ন ৩৯ টি রাজ্যকে নিয়ে পৃথিবীর প্রথম "কনফেডারেশন" গঠন করেন ।
⇨ ১৮১৫ সালে ওয়াটার লু যুদ্ধে সম্মিলিত ইউরোপিয় বাহিনীর নিকট পরাজিত ও বন্দী হলে নেপোলিয়নকে "সেন্ট হেলেনা" দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয় ।
⇨ ফরাসি সম্রাটের শাসন হতে জার্মানি মুক্ত হওয়ার পর "কনফেডারেশন" ভেঙ্গে যায় । এভাবে বিভক্ত জার্মানির অংশগুলোকেই বিসমার্ক পুনঃ একত্রীকরণ করতেও চেয়েছিলেন ।
⇨ জার্মানির পুনঃ একত্রীকরণের জন্যে বিসমার্ক কে তিনটি যুদ্ধ হয় :
-প্রথম ১৮৬৪ সালে ডেনমার্কের সাথে
-দ্বিতীয় ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়ার সাথে
-তৃতীয় ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের সাথে
⇨ ফ্রান্সকে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিসমার্ক পুনঃ একত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় । এরই মাধ্যমে আধুনিক জার্মানের যাত্রা শুরু হয় ।
⇨ ১৮৭১ সালে আধুনিক জার্মানের প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন অটোভন বিসমার্ক ।
⇨ জার্মানির পুনঃ একত্রীকরণ করতে পারার সুবাদে জার্মান জাতি বিসমার্ককে "ফাদার অব দ্য নেশন" আখ্যায়িত করেন ।
⇨ প্রথম উইলিয়াম জার্মানির প্রথম কাইজার (সম্রাট) নিযুক্ত হন ।
⇨ জার্মানিকে ঐক্য বদ্ধ করার জন্যে যুদ্ধ করলেও শক্তিশালী জার্মানি গড়ে তোলার জন্যে যুদ্ধ না করার নীতি গ্রহণ করেন । এই লক্ষ্যে কৌশলী বিসমার্ক ইউরোপীয় রাজনীতি হতে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পান । তিনি বিদ্যমান শক্তি সমুহের সাথে জোট গঠন অথবা মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন ।
⇨ দ্বৈত মৈত্রী চুক্তি : ১৮৭৯ সালে অস্ট্রো- হাঙ্গেরির সাথে চুক্তির মাধ্যমে বিসমার্ক দ্বৈত মৈত্রী চুক্তির জন্ম দেন ।
⇨ ত্রিপক্ষীয় মৈত্রী চুক্তি : ১৮৮২ সালে দ্বৈত মৈত্রী চুক্তির সাথে ইতালি যোগ দিলে জোটের সদস্য হয় তিন ।
⇨ এরপর তুরস্ক , রোমানিয়া যোগ দেয় । এইভাবে বিসমার্ক শক্তিশালী জোট গঠনের মাধ্যমে কার্যত ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন ।
⇨ কারজাই প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যু : ১৮৮৮ সালে তিনি মারা যান । অতপর তার পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম কারজাই নিযুক্ত হন ।
⇨ সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব : বিসমার্কের সাথে দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বন্দ্বের কারণে ১৮৯০ সালে বিসমার্ককে বরখাস্ত করা হয় । তার স্থলে কাপ্রিভিকে চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হয় ।
⇨ জোটের মধ্যে দ্বন্দ্ব : সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে রাশিয়া ১৮৯৩ সালে জার্মানির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে ।
⇨ নতুন শক্তি জোটের আবির্ভাব : রাশিয়া বের হয়ে আসার সাথে সাথে তার সাথে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যোগ দিলে আরেকটি শক্তি জোটের আবির্ভাব ঘটে ।
⇨ বলকান সংকট : বলকান হলো পর্বত মালার নাম । ইউরোপের পূর্বের অংশে এই পর্বত মালার পাদদেশে বিধায় এই অঞ্চলকে 'বলকান' অঞ্চল বলে । এর মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া , আলবেনিয়া, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি ।
⇨ ১৯০৭ সালে বলকান অঞ্চলের বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অস্ট্রো- হাঙ্গেরি দখল করে নেয় । তখন বসনিয়া ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত । বসনিয়া দখলের পর সৃষ্ট সংকটকে বলকান সংকট বলে ।
⇨ উল্লেখ্য যে, বসনিয়া দখলের বাসনা সার্ভিয়াদেরও ছিল । সার্বিয়া দখল করতে না পেরে অস্ট্রো-

হাঙ্গেরিকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । এই লক্ষ্যে " ইউনিটি অর ডেথ" নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে ।
⇨ "ব্লাক হ্যান্ড" উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে এই নামে একটি গুপ্ত বাহিনী গঠন করা হয় ।
⇨ ২৬ জুন, ১৯১৪ অস্ট্রো- হাঙ্গেরির যুবরাজ প্রিন্স আর্ক ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড এবং মিসেস ফার্ডিনান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়াবোতে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাওয়ার পথে 'ব্লাক হ্যান্ড" এর সদস্য গ্যাব্রিলো প্রিন্সিপ দুজনকেই হত্যা করে । এই হত্যাকান্ড যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ।
⇨ অস্ট্রো- হাঙ্গেরি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খুনীকে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন । সার্বিয়া তা করে নি । অতঃপর অস্ট্রো- হাঙ্গেরি ১ মাসের সময় সীমা বেঁধে দেন । তখনও সার্বিয়া তা করে নি । এই প্রেক্ষাপটে ২৮ জুলাই, ১৯১৪ অস্ট্রো- হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । এইবার জার্মানি অস্ট্রো- হাঙ্গেরীর এবং রাশিয়া ব্রিটেন সার্বিয়ার পক্ষ নিলে সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয় । ৩ আগস্ট, ১৯১৪ এই যুদ্ধ শুরু হয় । যা ইতিহাসে "প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ" নামে পরিচিত ।
⇨ যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি , যুদ্ধকালীন নেতৃবৃন্দ , যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বা প্যারিস শান্তি সম্মেলন :
-নভেম্বর ১৯১৪ তুরস্ক জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করে ।
-মে ১৯১৫ ইতালি জার্মানির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মিত্র পক্ষে যোগ দেয় ।
-এপ্রিল ১৯১৭ আমেরিকা মিত্রপক্ষের যুদ্ধে যোগ দেয় ।
⇨ অক্টোবর বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর সে যুদ্ধ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে ।
⇨ ৮ জানুয়ারি, ১৯১৮ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো- উইলসন মার্কিন সিনেটে গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণে " চৌদ্দ দফা" উপস্থাপন করেন । যা "ফোরটিন পয়েন্টস" নামে খ্যাত । এই ১৪ দফা পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে ।
⇨ ৯ নভেম্বর, ১৯১৮ জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পালিয়ে হল্যান্ড চলে যান ।
⇨ ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ ফ্রান্সে একটি রেলগাড়ির বগিতে জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করেন । ফরাসি জেনারেল মার্শাল ফস্ এর নিকট এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে ।
⇨ এই যুদ্ধে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ নিহত হন এবং ১৮৫ ডলার ব্যয় হয় ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বিশ্ব

⇨ বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর ২ নভেম্বর, ১৯১৭ এক বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেন ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে । তার এই ঘোষণাকে ইতিহাসে "বেলফোর" ঘোষণা নামে খ্যাত ।
⇨ ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার সময় প্যালেস্টাইন ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত । উল্লেখ্য যে , ১৫১৭ সালে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্য পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইন দখল করে নেয় ।
⇨ ৯ ডিসেম্বর ,১৯১৭ লর্ড এলেনবীর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী প্যালেস্টাইন অঞ্চল দখল করেন । অবসান ঘটে তুর্কি সাম্রাজ্যের ।
⇨ ১৯১৯ সালে লিগ অব নেশন গঠনের পর প্যালেস্টাইনের শাসনভার দেওয়া হয় ব্রিটেনকে । এর মেয়াদ ছিল ১৪ মে, ১৯৪৮ পর্যন্ত । ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের ১৮১ নং প্রস্তাবে প্যালেস্টাইন অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন নামের দুটি স্বাধীন দেশ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় । এই প্রস্তাব কার্যকর হয় নি ।
⇨ ১৪ মে, ১৯৪৮ প্যালেস্টাইন অঞ্চল হতে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট এর অবসান ঘটলে ঐ রাতেই ইসরাইলের ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় । "টীম ওয়াইজম্যান" ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ।
⇨ শুরু হয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ : এ পর্যন্ত মোট চারটি যুদ্ধ হয়েছে ।
- প্রথম : ১৯৪৮ সালে, দ্বিতীয় : ১৯৫৬ সালে,
- তৃতীয় : ১৯৬৭ সালে, চতুর্থ : ১৯৭৩ সালে

ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম

⇨ ২৫ জানুয়ারি, ১৯১৯ প্যারিসে মিত্র ও সহযোগী শক্তির ৩২ টি দেশের প্রতিনিধিরা যুদ্ধজয়ের বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি সম্মেলনে মিলিত হন ।
⇨ সম্মেলনের দুটি লক্ষ্য ছিল :
ক. নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা

খ. অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

- নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর নামকরণ ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে।
- তিনি নামকরণ করেন "লিগ অব নেশন্স" এবং ১২ দফা বিশিষ্ট্য গঠনতন্ত্র বা চুক্তি পত্র প্রণয়ন করেন।
- ২৮ এপ্রিল, ১৯১৯ প্যারিসে উপস্থিত ১৯ টি দেশের প্রতিনিধিরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন লীগের জন্ম হয়।
- ১০ জানুয়ারি, ১৯২০, লন্ডনে এর প্রথম সম্মেলনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়। লীগের সদর দপ্তর করা হয় জেনেভায়। লীগের তিনটি অঙ্গ সংগঠন রাখা হয়।

ক. সাধারণ সভা খ. নিরাপত্তা সভা গ. দপ্তর

- ১৯১৯ সালে আইএলও এবং ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার পর দুটিকেই লীগের অঙ্গ সংগঠনে পরিনত করা হয়।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিগ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই লিগের সদস্য পদ গ্রহণ করেন নি। ১৯৩৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন লিগের বাইরে ছিল।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে অংশ না নেওয়ার কারণ ছিল মনরো ডকট্রিন।
- ১৯৩৫ সাল হতে লিগ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। যদিও এপ্রিল ১৯৪৬ আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।
- অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা : প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ২৮ জুন, ১৯১৯ থেকে ১০ আগস্ট, ১৯২০ পর্যন্ত অক্ষশক্তির পাঁচটি দেশের সাথে চুক্তির মাধ্যমে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ভার্সাই সন্ধি : জার্মানির সাথে মিত্রশক্তির ২৮ জুন, ১৯১৯।
- সেন্ট জার্মাইন সন্ধি : অস্ট্রিয়ার সাথে মিত্রশক্তির ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯।
- নিউলি সন্ধি : বুলগেরিয়ার সাথে মিত্রশক্তির ২৭ নভেম্বর, ১৯১৯।
- ত্রিআনন সন্ধি : হাঙ্গেরির সাথে মিত্রশক্তির ৪ জুন, ১৯২০।
- সেভের সন্ধি : তুরস্কের সাথে মিত্রশক্তির ১০ আগস্ট, ১৯২০।

রুশ বিপ্লব

- ভার্সাই সন্ধি : ইতিহাসে ভার্সাই সন্ধি দুটি।
- প্রথম ভার্সাই সন্ধি ১৭৮৩ সালে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে আমেরিকার স্বাধীনতা চুক্তি বলে।
- দ্বিতীয় ভার্সাই সন্ধি : ২৮ জুন ,১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানির সাথে মিত্রশক্তির। এই চুক্তির ১৫ টি অংশ ৫৪০টি ধারা।
- ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি মার্শাল ফস্ মন্তব্য করেছিলেন " এই চুক্তিকে শান্তি চুক্তি না বলে বিশ বছরের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি বলা যেতে পারে।"
- রুশ বিপ্লব : ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লব , সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লব , এর মাধ্যমে মহামতি লেলিন রাশিয়ার সোভিয়েত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন।
- এরই মাধ্যমে বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে এবং "আদর্শিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়।"
- সোভিয়েত গৃহযুদ্ধ : ১৯১৮- ১৯২৪ সোভিয়েত ইউনিয়ন লেলিনের রেড আর্মির সাথে ক্ষমতাচ্যুত জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তার সামন্তদের সাথে যুদ্ধ হয়। এই গৃহ যুদ্ধকে "কাউন্টার রেভ্যুলেশন" বলে। এই সময় লেলিনের বিরুদ্ধের শক্তিকে বৃটেন , ফ্রান্স ও আমেরিকা সর্বাত্মক সহায়তা করে।
- উইমার রিপাবলিক (ভাইমার প্রজাতন্ত্র) : ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষে ফেডরিক এ্যাবেট এর নেতৃত্বে জার্মানিতে সরকার গঠন হয়। জার্মানির এলব নদীর তীরে উইমার শহরে এই সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা করে। বিধায় তাকে "উইমার রিপাবলিক" বলে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে হিটলার চ্যান্সেলর হওয়া পর্যন্ত এই সরকার অব্যাহত ছিল।
- নৌবল চুক্তি : জানুয়ারি ১৯২২ ওয়াশিংটনে আমেরিকা এবং বৃটেন এবং জাপান এর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক আমেরিকা এবং বৃটেন এবং জাপান যথাক্রমে ৫:৫:৩ নৌ শক্তির অধিকারী হতে পারবে বলে স্থীর করা হয়।
- র‍্যাপালো চুক্তি : ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বা হুমকি দাঁড় করানো। র‍্যাপালো জার্মানীর একটি জায়গার নাম।
- লোজন চুক্তি : ১৯২৩ সালে তুরস্কের সাথে মিত্র শক্তির এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৩ সালে মোস্তফা কামাল তুরস্কের গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন করেন। ফলে তুরস্কের সালতানাতের শাসন বা খেলাফতের অবসান ঘটে। এ কারণে মোস্তফা কামাল কে আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয়। ১৯৩৭

সালে তাকে "আতাতুর্ক" বা তুর্কী বীর বলে আখ্যায়িত করা হয়।

- ডয়েস প্লান : ১৯২৪ সালে জার্মানির নিকট হতে ক্ষতিপূরনের অর্থ আদায় করার উপায় বের করার জন্যে অর্থনীতিবিদ মি. ডয়েস কে নিয়োগ করা হয়। তিনি যে পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন তা "ডয়েস প্লান " নামে খ্যাত।
- তিনি তার পরিকল্পনায় জার্মানিকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলে। বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থের সঙ্কালন হলে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ অর্থ বাবদ প্রতি সেকেন্ডে ৮০ মার্ক করে অনন্তকাল দিতে হবে।
- সুইজারল্যান্ডের লোকর্নতে ১৯২৫ সালে মিত্র শক্তির সাথে জার্মানির এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- বার্লিন চুক্তি : ১৯২৬ সালে সোভিয়েতের সাথে জার্মানির এই চুক্তির মাধ্যমে ১৯২২ সালের চুক্তির ধারাবাহিকতায় বজায় রাখার কথা বলা হয়।
- ইয়ং প্লান : ১৯২৯ সালে অপর মার্কিন অর্থনীতিবিদ মি. ইয়ং জার্মানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করেন। ডয়েস প্লানকে হুবহু রেখে শুধুমাত্র অনন্তকালের পরিবর্তে ৫৯ বছর' নির্দিষ্ট করেন।
- মহামন্দা : ১৯২৯-৩০ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অতিমাত্রায় খাদ্য উৎপাদন এবং শেয়ার বাজার ফুলে ফেপে উঠার কারণে ধস নামে। এর প্রভাব ইউরোপসহ অন্যান্য অঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়। একারণে এই সময়কার মন্দাকে ইতিহাসে "মহামন্দা" বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলার

- জন্ম ও প্রথম জীবন : ১৮৮৭ সালে অস্ট্রিয়ার ব্রুনাই- আম- ইন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা এলিয়ান হিটলারের ব্যবসা ছিল মুচির কাজ। হিটলার সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তার প্রথম জীবন শুরু হয় "কমার্শিয়াল আর্টিস্ট" হিসেবে (অর্থ হল যার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই)।
- বিমান বাহিনীতে যোগদান : অস্ট্রিয়া থেকে জার্মানিতে এসে তিনি জার্মান বিমান বাহিনীতে "কর্পোরাল" (বিমান বাহিনীর সবচেয়ে ছোট পদ) হিসেবে যোগ দেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন।
- ১৯১৯ সালে হিটলার "জার্মান ন্যাশনাল সোসালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টি"তে যোগ দেন।
- ১৯২০ সালে হিটলার নিজেই "জার্মান সোসালিস্ট পার্টি বা 'নাজি' পার্টি বা নাৎসী দল গঠন করেন।
- ১৯২৩ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ে হিটলারের নেতৃত্বে মিউনিখ অভিযান পরিচালিত হয়। লক্ষ্য ছিল উইমার রিপাবলিক প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করা।
- যুদ্ধত্তোর জার্মানিতে ফ্রেডরিক এ্যাবেটের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয় সেই সরকার জার্মানির এলব নদীর তীরে ভাইমার শহরে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে।
- মেইন ক্যাম্ফ : এর অর্থ আমার সংগ্রাম। হিটলার ল্যান্ডসবার্গ কারাগারে ১৩ মাস বন্দি জীবন কাটানোর সময় আত্মজীবনী মূলক যে বই রচনা করেন তার নাম "মেইন ক্যাম্ফ "।
- হিটলারের নেতৃত্বে তার নাৎসী দল ১৯২৮ সালে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং পরাজিত হন। ডিসেম্বর ১৯৩২ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে জানুয়ারি ১৯৩৩ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- এর মাধ্যমে অবসান ঘটে উইমার রিপাবলিক। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত হিটলারের শাসনামলকে বলা হয় "থার্ড রাইখ "। (২১ তম বিসিএস লিখিত)
- জানুয়ারি ১৯৩৩ হিটলার ক্ষমতায় আসেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তার নেতৃত্বে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এরকম একটি যুদ্ধ সংঘটনের জন্য প্রস্তুতি ও যুদ্ধ পরিচালনা তাৎপর্যের বিষয়। এজন্য হিটলার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনাকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করার কৌশল অবলম্বন করেন তা আলোচনার বিষয়।
- লীগ অব নেশনস ত্যাগ : অক্টোবর ১৯৩৩ হিটলার লিগের সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন।
- বৃটেন-জার্মানী নৌ চুক্তি : জুন ১৯৩৬ ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে সম্পাদিত নৌবল চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন জার্মানিকে তার সমগ্র নৌ শক্তির ৩৫% এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাবমেরিন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সুযোগ দেয়।
- রাইন অঞ্চল দখল : হিটলার ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ড দখল করে নেয়। উল্লেখ্য যে , জার্মানির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রাইন নদীর দুই পাড়ের পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বেসামরিকরণ করা হয়েছিল। যা লিগ অব নেশনের ম্যান্ডেটে ফরাসির প্রশাসনে অধীনে ছিল।
- মুসোলিনীর আবিসিনিয়া দখল : ১৯৩৬ সালে ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসক মুসোলিনী আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখল করে নেয়।

- ডানজিক দাবি : ডানজিক হলো পোল্যান্ডের শিল্পাঞ্চল। সোভিয়েত- জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি : ২৩ আগস্ট, ১৯৩৯, স্টালিন এবং হিটলারের মধ্যে দশ বছরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ৩ এপিল, ১৯৩৯ হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেন তার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় "হোয়াইট প্লান"। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে হিটলার পোল্যান্ডের সাথে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে। উল্লেখ্য যে, ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৪ পোল্যান্ডের সাথে জার্মানির দশ বছরের মেয়াদি একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- আগস্ট ১৯৩৯ সোভিয়েতের সাথে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি তাকে যুদ্ধ বাধাতে সহায়তা করে।
- পোল্যান্ড আক্রমণ : ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে।
- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, সোভিয়েত বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে।
- ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, পোল্যান্ড জার্মানির কাছে আত্মসমর্পন করেন।
- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, সোভিয়েত জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি মোতাবেক পোল্যান্ড পরস্পরের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।
- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, ব্রিটেন ও ফ্রান্স আনুষ্ঠানিক ভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
- ডেনমার্ক দখল : ৯ এপ্রিল, ১৯৪০ হিটলার ডেনমার্ক দখল করে নরওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।
- ১২ মে, ১৯৪০ জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করে ফ্রান্সকে আক্রমণ করেন।
- ১০ জুন, ১৯৪০, ইতালি, ফ্রান্স ও ব্রিটেন এর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ঘোষণা করে।
- ২২ জুন, ১৯৪০ ফ্রান্স আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।
- ২৪ জুন, ১৯৪০, এই চুক্তির মাধ্যমে ইতালি ফ্রান্সের কাছ থেকে ৮৩২ বর্গ কিলোমিটার ভূ খন্ড অধিকার করে নেয়।
- ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর " জেনারেল চার্লস দ্য গল" লন্ডনে "স্বাধীন ফ্রান্স নামে" দেশ প্রেমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সেপ্টেম্বর ১৯৪১, সোভিয়েত সরকার দ্য গলকে স্বাধীন ফ্রান্সের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- অপারেশন লায়ন অব সি ' বা সাগরের সিংহ : ১৬ জুলাই, ১৯৪০, হিটলার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করেন। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় "অপারেশন লায়ন অব সি' বা সাগরের সিংহ।
- অপারেশন ঈগল : সেপ্টেম্বর ১৯৪০, জার্মানির বিমান বাহিনী বৃটেনের আকাশ পথে যে আক্রমণ পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম হলো "অপারেশন ঈগল"।
- অপারেশন বারবারোসা : জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের সাংকেতিক নাম। ২১ জুন, ১৯৪১, ভোর ছয়টায় সোভিয়েতের পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে জার্মানি ও তার তাবেদার বাহিনী আক্রমণ শুরু করে।
- জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ২২ জুন, ১৯৪১, সোভিয়েত নেতা মার্শাল স্টালিন অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত ভাঙ্গার অভিযোগ এনে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা : পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার পরদিন ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপান তথা অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
- ১৩ জুলাই, ১৯৪৩, রাজা মুসোলিনীকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। অতঃপর তাকে ইতালির আবরুজি অ্যাপিনাইন পর্বতের একটি হোটেল কক্ষে তাকে বন্দী রেখে ঘোষণা করা হয় যে, মুসোলিনী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে আফ্রিকায় চলে গেছেন।
- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, মিত্র বাহিনী ইতালি আক্রমণ করলে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ইতালি আত্মসমর্পণ করেন।
- হিটলার মুসোলিনীকে উদ্ধার করার জন্য যে অভিযান পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম ছিল "অপারেশন অক "।
- ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, অপারেশন অক এর অধিনায়ক মেজর স্কোরজেনী মুসোলিনীকে উদ্ধার করে অস্টমার্কের (অস্ট্রিয়া) রাজধানী ভিয়েনায় নিয়ে আসেন।
- ৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫, হিটলার সুপ্রীম কমান্ডারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তার ডেপুটি গোয়েনিৎসকে। ১ মে, ১৯৪৫ তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন।
- ৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫, হিটলার প্রেমিকা ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। অতপর তিনি প্রথমে ইভাকে দ্বিতীয় বার তার পোষা কুকুরকে গুলি করে হত্যা করে। অতপর তিনটি মৃত দেহ সহ যুদ্ধকালীন হিটলারের যাবতীয় ডায়েরী এবং দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়। এ কারনে হিটলারের ব্যবহৃত ডায়রী অথবা কোন উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

- ৭ মে, ১৯৪৫ গভীর রাত ৯ মে জার্মানী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন।
- জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল গ্রহণ করেন সোভিয়েত ডেপুটি জেনারেল গিয়োর্গী জ্যকভ এবং জার্মানীর পক্ষে হস্তান্তর করেন গোয়েনিৎস। এভাবে হিটলার এবং জার্মানির পতনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের মুক্তি অর্জন হয়।

জানা- অজানা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক টুকিটাকি

- **বার্সিলোনা :** স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। ১৯৭১ সালে এখানে প্রথম বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ২৪তম অলিম্পিকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এখানে অনুষ্ঠিত হয়।
- **শাখালিন :** জাপান সাগরে অবস্থিত। এটি রাশিয়ার দ্বীপ ও সামরিক ঘাঁটি। ১৯৮৩ সালে ১ সেপ্টেম্বর এ স্থান থেকে রাশিয়ার প্রেরিত মিসাইলের আঘাতে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমান (বি-৭৪৭) ভূপাতিত হয়। ফলে বিমানের সকল যাত্রী নিহত হয়।
- **সেন্টলুইস :** মিসিসিপি, মিসৌরী ও ইলিয়ন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বৃহৎ নৌবন্দর, রেলজংশন ও শিল্প কেন্দ্র। এ শহর হতে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য রফতানি করা হয়।
- **নাগার্নো কারাবাখ :** আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী একটি বিতর্কিত ছিটমহলের নাম নাগার্নো কারাবাখ। এই ছিটমহলটি আর্মেনিয় বংশোদ্ভুত খ্রিস্টান অধ্যুষিত। এক সময় এটা আর্মেনিয়দের দখলে ছিল। ১৯২৩ সালে তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লেনিন প্রশাসনিক সুবিধার্থে একে আজারবাইজানের অংশ হিসেবে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে পরিণত করেন।
- **তাসখন্দ চুক্তি :** ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মির ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই তাসখন্দ চুক্তি। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর দুটি দেশের মধ্যে কোন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। ফলে তাদের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শেষে ১৯৬৫ সালে আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধ ১৭ দিন স্থায়ী থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধ বিরতিতে ভূমিকা রাখে এবং তাসখন্দে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি করাতে সক্ষম হয়। এই শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব খান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নরে প্রধানমন্ত্রী কোসিগান।
- **পিএলও- ইসরাইল শান্তি চুক্তি :** ১৯৯৩ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর পিএলও এবং ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কাজ শুরু হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী জর্ডান নদীর তীর ও গাজায় ফিলিস্তিন স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনিরা শিক্ষা ,সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কর ব্যবস্থা, ও পর্যটনের উপর কর্তৃত্ব পায়। পানি বিদ্যুৎ জ্বালানি অর্থ বন্দরসহ যোগাযোগ বাণিজ্য শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ পরিবেশ প্রতিরোধ এবং গণমাধ্যমের ব্যাপারে ইসরাইল ফিলিস্তিন যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়। এছাড়া স্থায়ী বসতি ও অন্যান্য বিষয়ে চুক্তি হয়। মূলত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র আজও প্রকৃত স্বায়ত্বশাসন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।
- **মহাশূন্য চুক্তি :** মহাশূন্য চুক্তি মহাশূন্য আবিষ্কার বা অভিযানে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৬৭ সালে ১০ অক্টোবর হতে এ চুক্তি কার্যকর হয়। চাঁদে বা মহাশূন্যে কোন গ্রহে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন না করা এবং শান্তিপূর্ণভাবে মহাকাশ অভিযান ও মহাকাশ গবেষণার কাজ করার জন্য পরস্পরের সহযোগিতার অঙ্গীকারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি মহাশূন্যে অভিযান ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহের কার্যপ্রণালী নীতি সম্বন্ধীয় চুক্তি। এ চুক্তি মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্র বহন এবং চাঁদে বা অন্যান্য গ্রহে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন নিষিদ্ধ করে। এ চুক্তি মহাশূন্য অভিযানে বিশ্বের প্রতিটি দেশের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নিয়মাবলী প্রদান করে।
- **স্টাচু অফ লিবার্টি :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক উপহার স্টাচু অফ লিবার্টি। এটি যুক্ত লিবার্টি আইল্যান্ডের নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়ে স্থাপিত। এটি বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হয়। ১৮৮৪ সালে ৪ জুলাই ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার দেয়। ফরাসি স্থপতি ফ্রেডরিক আগস্ট বার্থোলডির ডিজাইন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা হয়। এ মূর্তিটির ওজন ২শত ২৫ টন এবং ভূমি থেকে এর উচ্চতা ৪৮ মিটার। স্বাধীনতা ও মুক্তির স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে এর মাথার অংশ অনবরত দীপ্যমান। মূর্তিটি যে দ্বীপে স্থাপিত তার আয়তন মাত্র ১২ একর। ১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

- **ফ্লোরিডা প্রণালি :** মেক্সিকো উপসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। পৃথক করেছে কিউবা এবং ফ্লোরিডাকে।
- **বেরিং প্রণালি :** এশিয়া ও আমেরিকাকে পৃথক করেছে এবং যুক্ত করেছে বেরিং সাগর ও চুমকি সাগরকে।
- **বসফরাস প্রণালি :** যুক্ত করেছে মর্মর সাগর ও কৃষ্ণসাগরকে এবং পৃথক করেছে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশকে।
- **জিব্রাল্টার প্রণালি :** জিব্রাল্টার প্রণালি উত্তর আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরকে যুক্ত করেছে এবং পৃথক করেছে আফ্রিকা ও ইউরোপকে।
- **দিয়াগো গার্সিয়া :** ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ শাসিত প্রবাল দ্বীপ। ব্রিটেন এই দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ১৯৭৪ সালে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করে এবং শর্ত আরোপ করে যে, প্রয়োজনে ব্রিটেনের এই ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে। ১৯৭৬ সালের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রবাল দ্বীপটিকে পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র সজ্জিত মার্কিন নৌ ও বিমান বহরের বৃহৎ ঘাঁটিতে রূপান্তর করে।
- **ভ্যালি অব দ্য কিংস :** নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত উপত্যকা। প্রাচীন মিশরের শাসকবর্গের সমাধি ক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত। এটাকে "সিটি অব ডেড" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- **ফ্লাসিং মিডোস :** নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সভাস্থল।
- **ডানজিগ :** ডানজিগ বাল্টিক উপসাগরে অবস্থিত। পোল্যান্ডের একটি বিখ্যাত বন্দর।
- **ডোবার প্রণালি :** যুক্ত করেছে ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরকে এবং পৃথক করেছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনকে।
- **জিগফ্রিড লাইন :** জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমারেখা।
- **র‍্যাডক্লিফ লাইন :** ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নিরূপিত সীমা লাইন।
- **ট্রারলেভ লাইন :** এ লাইন ইসরাইলিদের ম্যাজিনো লাইন নামে পরিচিত। এ লাইন বিশ্বের অন্যতম সুরক্ষিত রক্ষাব্যূহ। এ দুর্ভেদ্য লাইনের জন্য ইসরাইল প্রায় ৩৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার ব্যয় করে।
- **ম্যাকমোহন লাইন :** স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক ভারতের অরুণাচল রাজ্য এবং তিব্বতের সুবন সিরি , সিয়াং এবং লোহিত সীমান্ত জুড়ে চিহ্নিত সীমারেখা। এ রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১১২৬.৫৪ কিলোমিটার। এটি ভারত ও চীনের সীমানা নির্দেশক লাইন।
- **ম্যাজিনো রেখা :** এটি জার্মানি ও ফ্রান্সের সীমান্তে নির্মিত চিহ্নিত সুরক্ষিত রেখা। মূলত জার্মানির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি নির্মিত হয়।
- **৩৮তম অক্ষরেখা :** উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।
- **৪৯তম অক্ষরেখা** যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।
- **সপ্তদশ অক্ষরেখা :** সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। ভিয়তনামে দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ডানপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে এবং রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল উত্তর ভিয়েতনামে। সমগ্র ভিয়েতনামের দখল গ্রহণের জন্য দুই ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এ অবস্থায় দু ভিয়েতনামের মাঝখানে এ অক্ষরেখা দিয়ে সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরে যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পতন হয় এবং সমগ্র ভিয়েতনামে বামপন্থী সরকার গঠিত হয়।
- **হরমুজ প্রণালি :** হরমুজ প্রণালি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশ ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্তআরব আমিরাত প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোর উপসাগর পার হয়ে সমুদ্রে পৌঁছার একমাত্র পথ হচ্ছে এই হরমুজ প্রণালী। তাছাড়া বিদেশি জাহাজগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে হলে আরব সাগর থেকে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করতে হয়।
- **সুয়েজ খাল :** মিসরে অবস্থিত। জাহাজ চলাচলের জন্য পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম খাল। এ খাল লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। এ খালের এক পাশে পোর্ট সৈয়দ এবং অন্য পাশে সুয়েজ বন্দর অবস্থিত। এই খালের দৈর্ঘ্য ১৯২ কিলোমিটার (১২০ মাইল) গভীরতা ১০ মিটার প্রস্থ ৫৯ মিটার। এ খাল দিয়ে একটি জাহাজ পার হতে সময় লাগে ১৫ ঘন্টা। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনান্ড ডি লিসেপস এ খাল খনন করেন। ১৮৬৯ সালে এর কাজ সমাপ্ত হয় এবং চলাচলের জন্য প্রথম খোলে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে মিসর এটি জাতীয়করণ করেন। এক হিসেব মতে এই খাল নির্মাণের সময় ১ লাখ ২০ হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধের ফলে এ খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে জাহাজগুলোকে উত্তম আশা অন্তরীপ ঘুরে চলাচল করতে হত। এই খাল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরোপ থেকে নিকটবর্তী তেল সমৃদ্ধ দেশ লিবিয়া ও

আলজেরিয়ার গুরুত্ব বেড়ে যায়। পরে ১৯৭৫ সালে সুয়েজ খাল আবার খুলে দেওয়া হয়। ইউরোপের উন্নত দেশগুলো থেকে এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াতে এ খালের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে এই খাল দিয়ে বিশ্বের প্রায় ৭.৫ শতাংশ সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৫ এর জুলাই থেকে ২০০৬ মে পর্যন্ত এই খালটি আয় করেছে ২২৭২২ কোটি টাকা।

- **ফ্রিডম টাওয়ার :** ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের প্রায় তিন বছর পর একই স্থানে নির্মাণ করা আকাশচুম্বী আরেকটি নতুন ভবন। যার নাম ফ্রিডম টাওয়ার। মূল ভবনের উচ্চতা ১ হাজার ৫০০ ফুট হলেও প্রকৃত উচ্চতা হবে ১ হাজার ৭৭৬ ফুট। ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। সেই অনুযায়ী এই টাওয়ারের উচ্চতা ১৭৭৬ ফুট করা হয়েছে। ৩ নভেম্বর, ২০১৩ সালে এটি উদ্বোধন হয়।
- **পেট্রোনাস টাওয়ার :** মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এটি অবস্থিত। উচ্চতা ৪৫৩ মিটার অর্থাৎ ১৪৮৩ ফুট। টাওয়ার ভবনটি দ্বি- চূড়াবিশিষ্ট।
- **সিয়ার্স টাওয়ার :** আমেরিকার শিকাগো নগরীতে অবস্থিত। সিয়ার্স টাওয়ারের উচ্চতা ৪৪৩ মিটার অর্থাৎ ১৪৫৩ ফুট। এটি নির্মিত ১৯৭৪ সালে।
- **সিএন টাওয়ার :** এটি নিজের উপর নিজেই শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এ সেলফ টাওয়ারটি কানাডার টরেন্টোতে অবস্থিত।
- **আইফেল টাওয়ার :** ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত। এর উচ্চতা ৩০০ মিটার অর্থাৎ ৯৮৪ ফুট। অত্যন্ত আর্কষণীয় এ টাওয়ারটি নির্মিত হয় ১৮৮৯ সালে। টাওয়ারের মোট ওজন ৭৬০০ টন। ৩০০ কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় ২ বছর ৪ মাসে এটি নির্মিত হয়।
- **পিরামিড :** পিরামিড মিশরে অবস্থিত। উচ্চতা ১৪৭ মিটার অর্থাৎ ৪৮১ ফুট। ৪৫০০ বছর আগে রাজা কুফুর সমাধির উপর অবস্থিত।
- **সেন্ট পিটার্স :** ইতালির রাজধানীর রোমে অবস্থিত। এর উচ্চতা ১৩৭.৫ মিটার বা ৪৫১ ফুট। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ চার্চ।
- **টাওয়ার অব পিসা :** এটি ইতালিতে অবস্থিত। উচ্চতার বিচারে কনিষ্ঠ । এ টাওয়ারটির উচ্চতা ৫৫ মিটার বা ১০৮ ফুট।
- **চীন-জাপান যুদ্ধ প্রথম :** ১৮৯৪-৯৫ কোরিয়ার প্রশ্নে জাপানের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে। ফরমোজা ও কোরিয়া হস্তগত করে।
- **চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় :** ১৯৩১-৩৩ মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ফলে জাপান মাঞ্চুরিয়ার মাঞ্চুকুয়ের নামে একটি রাজ্য স্থাপন করে।
- **চীন-জাপান যুদ্ধ তৃতীয় :** ১৯৩৭-৪৫ জাপান এ যুদ্ধে বিপুল শক্তি সহযোগে চীন আক্রমণ করে। প্রথম জাপান জয়লাভ করে। কিন্তু জাপানের বিস্তীর্ণ এলাকা গেরিলা আক্রমণের সম্মুখীন হয়-এবং বন্যার প্রবণতা জাপানের অনেক ক্ষতি হয়। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান আত্মসমর্পণ করার পূর্বেই সমস্ত রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়।
- **চীন-ভারত যুদ্ধ :** ১৯৬২ সালে চীন ভারতের লাদাখ অঞ্চল আক্রমণ করে। সেই থেকে যে সূচনা হয় তাই চীন ভারত যুদ্ধ নামে খ্যাত । এই যুদ্ধে চীন ভারতের কিছু অংশ দখল করে নেয়। পরে যুদ্ধ বিরতি হলে চীন তার সৈন্য অপসারণ করে নেয়। অবশ্য এ যুদ্ধে দখলকৃত কিছু এলাকা আজও চীনারা নিজেদের বলে দাবি করে।
- **ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধ :** ১৬১৮-১৬৪৮ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপ জার্মানির ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ফ্রান্স, সুইডেন ও ডেনমার্ক কর্তৃক সমর্থিত প্রোটেস্ট্যান্ট জার্মান রাষ্ট্রের সাথে স্পেন ও অস্ট্রিয়ার হাপসবার্গ পরিবারবর্গ ও ক্যাথলিকদের সংঘর্ষ ত্রিশ বছর ব্যাপী চলছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারে জন্য হাপসবার্গ রাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্ট ফালিয়ার শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা এতে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সুইজারল্যান্ড এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হয়।
- **পুলিৎজার পুরস্কার :** যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজার ১৯১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া অর্থ থেকে প্রতি বছর সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং সংগীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯১৭ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান চালু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- **ক্যান্টন :** চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর এবং প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর। স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের জন্য বিখ্যাত।

- **গোদা মরুভূমি :** চীন ও মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত ৪৫০০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট মধ্য এশিয়ার বিশাল মরুভূমি।
- **সান্দা প্রণালি :** যুক্ত করেছে ঐরত ও ভারত সাগরকে এবং পৃথক করেছে সুমাত্রা ও জাভাকে।
- **তক্ষশিলা :** পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির অদূরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে প্রাচ্যের অন্যতম বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তক্ষশিলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।
- **মেসোপটেমিয়া :** টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন দেশ। ইউফ্রেটিস (ফোরাত) ও টাইগ্রিসের দোয়াব অঞ্চলকেই মেসোপটেমিয়া বলা হয়। মেসোপটেমিয়া বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। মেসোপটেমিয়া প্রাচীন ব্যাবিলীয়ন সভ্যতার লীলাভূমি।
- **বেনগাজি :** লিবিয়ায় অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। ১৯৭৩ সালে ২৫ জুলাই লালফৌজ সদস্যরা এখানে একটি জাপানি জাম্বো জেট বিমান ধ্বংস করে দেয়।
- **পোর্ট স্টানলি :** ব্রিটিশ উপনিবেশ ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। ১৯৮২ সালে ২ এপ্রিল আর্জেনন্টিনা এটি দখল করে নেয়। পরে ১৯৮২ সালের ১৪ জুন এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটেন এটি পুনরুদ্ধার করে।
- **পিএল-৪৮০ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইন। যে আইনের আওতায় দরিদ্র দেশগুলোকে খাদ্য সাহায্য দেয়।
- **ওভাল এবং ওভেল অফিস :** ওভাল হলো একটি ক্রিকেট মাঠ । ওভেল অফিস হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অফিস।
- **যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্যতা :** রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে হলে তার বয়স ন্যূনতম ৪৩ বছর হতে হবে। আমেরিকায় জন্ম গ্রহণকারী নাগরিক হতে হবে। একটানা ১৪ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী হতে হবে।
- **থার্ড রাইখ :** থার্ড রাইখ বলা হয় হিটলারের শাসন আমলকে। সেকেন্ড রাইখ বলা হয় ১৮৭১ বা বিসমার্ক থেকে ১৯১৮ বা কাইজার দ্বিতীয় নিকোলাসের ক্ষমতা ত্যাগ পর্যন্ত।
- **দাঁতাত :** স্নায়ুযুদ্ধের এক পর্যায়ে আমেরিকা ও সোভিয়েতের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে ষাটের দশকে শুরু থেকে উভয়ের মধ্যে নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাঁতাত বলে অভিহিত করে এবং সোভিয়েত "শান্তি সহবস্থান" নামে অভিহিত করে।
- **পরিবেশ :** ১৯৭২ সালে স্টকহোমে 'মানব পরিবেশ সংক্রান্ত' প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইউএনইপি গঠন করা হয়। একই বছর ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সে মোতাবেক ১৯৭৩ সাল থেকে যথারীতি দিবসটি পালিত হচ্ছে।
- **মন্ট্রিল প্রটোকল :** ১৯৮৭ সালে ওজন স্তরের ক্ষয়রোধ চুক্তি। ১৯৮৩ সালে প্রথম বৃটিশ এ্যান্টার্টিকা সার্ভে ওজন স্তরের শূন্য হওয়ার তথ্য আবিষ্কার করে।
- **ধরিত্রী সম্মেলন :** ১৯৯২ সালে জুন মাসে ১০৮ টি দেশের সরকার / রাষ্ট্রপ্রধানগণ এই সম্মেলনে অংশ নেয়। এই সম্মেলনে ১৭২ টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেয়। এই সম্মেলনে স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য এজেন্ডা-২১ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশ সংক্রান্ত দু'টি কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এক-তাপমাত্রা প্রতিরোধ চুক্তি দুই- জৈব বৈচিত্র চুক্তি
- **গ্রিন টপটেন (১০) :** ১৯৯৭ সালে ৫ জুন পরিবেশ দিবসে বিশ্বব্যাংক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচিকে গ্রিন টপটেন বলা হয়।
- **বন সম্মেলন :** ২০০১ সালে জুলাই মাসে বনে বিশ্বের ১৮০ টি দেশের পরিবেশমন্ত্রীরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- **অপারেশন সার্চ লাইট :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি নিধন অভিযানের সাংকেতিক নাম হলো অপারেশন সার্চ লাইট। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া বাঙালি নিধন হুকুম নামায় স্বাক্ষর করে পাকিস্তানে চলে যান। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এক যোগে আক্রমণ। বিশেষ করে যেখানে বাঙালি সৈনিক অবস্থান করছিল তারা যাতে করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারে, এই কারণে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইপিআর (বিডিআর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে আক্রমণ চালায়।
- **অপারেশন জ্যাকপট :** ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর ১০ নং সেক্টরের সদস্যরা বিভিন্ন নৌবন্দরে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি নৌশক্তিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই আক্রমণের নাম দেওয়া হয় অপারেশন জ্যাকপট। এই আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিদের ৬০ টি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

- **বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি :** দিনাজপুরে ২৭ জুন, ১৯৯৪ সালে এই কয়লা খনির উদ্বোধন করা হয়। এই খনিতে ৩০ কোটি লক্ষ টন কয়লা মজুদ আছে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৯৮ সালে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করা হবে। এই কয়লার ৮৭% ব্যয় করা হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৩% ব্যয় করা হবে ইট ভাটায়।
- **মধ্যপাড়া কঠিন শিলা :** দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার হরিরামপুর ইউনিয়নে মধ্যপাড়া গ্রামে এই শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। ২০ অক্টোবর, ১৯৯৪ সালে কয়লা উত্তোলনের কাজের উদ্বোধন করা হয়। ২৭ মার্চ, ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ ও উত্তর কোরিয়ার সাথে কঠিন শিলা উত্তোলনের ব্যাপারে চুক্তি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তোলনের কাল ৩০ বছর। এর উৎপাদন ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯৭ কোটি টাকা।
- **বিজয় :** ২৯ হাজার ফুট উচ্চতা কেওক্রাডাং পর্বত ছিল এতদিন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সম্প্রতি এর চেয়ে বেশি উচ্চতা সম্পন্ন পর্বত শৃঙ্গ আবিষ্কার হয়েছে বান্দরবন জেলার রুমা থানায়। এই শৃঙ্গের নামকরণ করা হয়েছে 'তাজিংডং'। মারমা ভাষায় তাজিংডং এর অর্থ গহীন অরণ্যের পাহাড়। এর উচ্চতা ৩১৮৫ ফুট। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে 'বিজয়'।
- **কাস্টিং ভোট :** কাস্টিং ভোট হলো সভাপতির ভোট। যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সমসংখ্যক ভোট উভয় পেলে নির্ধারকের ভোট হিসেবে সভাপতির ভোট দেওয়াকে কাস্টিং ভোট বলে।
- **স্ট্র ভোট :** কোন বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা কোন সংস্থা বেসরকারিভাবে গৃহীত ভোটকে স্ট্র ভোট বলে।
- **গানবোর্ট ডিপ্লোমেসি :** শক্তির ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করাকে গানবোর্ট ডিপ্লোমেসি বলে ।
- **ইমপিচমেন্ট :** ইমপিচমেন্টের অর্থ হলো অভিশংসন বা নিন্দা প্রস্তাব। রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে তার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে অপসারণের জন্য এই প্রক্রিয়ায় মেজরিটি সদস্য যদি এই প্রস্তাবে মতামত দেয় তাহলে সরকার/রাষ্ট্র প্রধান তার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে বলে গণ্য করা হয়।
- **ইয়াল্টা সম্মেলন :** ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াল্টা শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাতিসংঘ গঠনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় ইয়াল্টা সম্মেলন। এই সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্টালিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উপস্থিত ছিলেন।
- **বাস্তিল দুর্গ :** ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীতে বিখ্যাত বাস্তিল দুর্গ অবস্থিত। এই দুর্গ বিপ্লবীদের শান্তির জন্য ব্যবহার করা হত। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে পতন ঘটানো হয়। এর ফলে ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ফরাসিরা তখন থেকে ভল্টেয়ারের লেখা স্বাধীনতা,সাম্য, মৈত্রী, বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
- **বাংলা একাডেমি :** আমাদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে ৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। বর্তমান বাংলা একাডেমির ভবনটি তখন বর্ধমান হাউজ হিসেবে পরিচিত ছিল । পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার এ একাডেমির উদ্বোধন করেন।
- **জাতীয় জাদুঘর :** ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘরই বর্তমান 'জাতীয় জাদুঘর " নামে পরিচিত। ২৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘরের নতুন ভবনে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমান ভবনটি ত্রিতলাবিশিষ্ট শাহবাগে অবস্থিত।
- **পানামা খাল :** আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগকারী খাল। এটি ৫০ মাইল দীর্ঘ ৫০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৪৫ ফুট গভীর।
- **ইংলিশ চ্যানেল :** উত্তর সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে।
- **এডিবিঃ** ১৯৬৬ সালে প্রাথমিকভাবে ইসিএএফই এর সহায়তায় এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩২টি দেশ ১৫টি আঞ্চলিক সদস্য নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত। ১৯৭৪ সালে সংস্থাটি দরিদ্র সদস্য দেশগুলোকে ঋণ সহায়তা শুরু করে। এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের ম্যানিলায়। এডিবির বর্তমান সদস্য ৬৪টি।
- **দক্ষিণ এশিয়া :** বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান , নেপাল , ভুটান , মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান ও মায়ানমার নিয়ে দক্ষিণ এশিয়া।
- **মধ্য এশিয়া :** কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরিথিজিস্তান নিয়ে মধ্য এশিয়া।
- **দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া :** লাওস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া।

⇨ **নিকট প্রাচ্য :** সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ইসরাইল এই চারটি দেশ নিয়ে নিকট প্রাচ্য।
⇨ **দূরপ্রাচ্য :** জাপান, চীন, তাইওয়ান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া নিয়ে দূরপ্রাচ্য।
⇨ **মধ্যপ্রাচ্য :** সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, জর্ডান, লেবানন, তুরস্ক, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইসরাইল নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য।
⇨ **ক্যারিবিয়ান অঞ্চল :** বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বার্বাডোজ, কিউবা, হাইতি, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ টোবাগো ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র নিয়ে ক্যারিবিয়ান অঞ্চল।
⇨ **স্কান্ডিনেভিয়ার দেশসমূহ :** নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড নিয়ে স্কান্ডিনেভিয়া।
⇨ **রবাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ :** লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া নিয়ে বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ।
⇨ **ওশেনিয়া :** অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিজি, টঙ্গো এবং পশ্চিম সামোয়া নিয়ে ওশেনিয়া।
⇨ **ল্যাটিন আমেরিকা :** ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি ও মেক্সিকোকে নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা।
⇨ **বলকান রাষ্ট্রসমূহ :** বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া হার্জেগোবিনা, ক্রোয়েশিয়া, শ্লোভেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, মেসিডোনিয়া ও গ্রীস নিয়ে বলকান রাষ্ট্রসমূহ।
⇨ **উইমার রিপাবলিক (ভাইমার প্রজাতন্ত্র) :** ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষে ফেডরিক এ্যাবেট এর নেতৃত্বে জার্মানিতে সরকার গঠন হয়। জার্মানির এলব নদীর তীরে উইমার শহরে এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে। বিধায় তাকে "উইমার রিপাবলিক" বলে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে হিটলার চ্যান্সেলর হওয়া পর্যন্ত এই সরকার অব্যাহত ছিল।
⇨ **নৌবল চুক্তি :** জানুয়ারি ১৯২২ ওয়াশিংটনে আমেরিকা এবং ব্রিটেন এবং জাপান এর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক আমেরিকা এবং বৃটেন এবং জাপান যথাক্রমে ৫:৫:৩ নৌ শক্তির অধিকারী হতে পারবে বলে স্থির করা হয়।
⇨ **র‍্যাপালো চুক্তি :** ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বা হুমকি দাঁড় করানো। র‍্যাপালো জার্মানির একটি জায়গার নাম।
⇨ **লোজন চুক্তি :** ১৯২৩ সালে তুরস্কের সাথে মিত্র শক্তির এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২৩ সালে মোস্তফা কামাল তুরস্কের গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন করেন। ফলে তুরস্কের সালতানাতের শাসন বা খেলাফতের অবসান ঘটে। এ কারণে মোস্তফা কামাল কে আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয়। ১৯৩৭ সালে তাকে "আতাতুর্ক" বা তুর্কি বীর বলে আখ্যায়িত করা হয়।
⇨ **ডয়েস প্লান :** ১৯২৪ সালে জার্মানির নিকট হতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করার উপায় বের করার জন্যে অর্থনীতিবিদ মি. ডয়েস কে নিয়োগ করা হয়। তিনি যে পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন তা "ডয়েস প্লান" নামে খ্যাত। তিনি তার পরিকল্পনায় জার্মানিকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলে। বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থের সঞ্চালন হলে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ অর্থ বাবদ প্রতি সেকেন্ডে ৮০ মার্ক করে অনন্তকাল দিতে হবে।
⇨ **লোকর্ন চুক্তি :** ১৯২৫ সুইজারল্যান্ডের লোকর্নতে ১৯২৫ সালে মিত্র শক্তির সাথে জার্মানির এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে-
  * জার্মানিকে লিগের সদস্য পদ প্রদান এবং
  * আর্থিক সহায়তা দান।

  এর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে সোভিয়েতের নিকট হতে দূরে সরিয়ে আনা। এই প্রেক্ষাপটে-
⇨ **বার্লিন চুক্তি :** ১৯২৬ সালে সোভিয়েতের সাথে জার্মানির এই চুক্তির মাধ্যমে ১৯২২ সালের চুক্তির ধারাবাহিকতায় বজায় রাখার কথা বলা হয়।
⇨ **ইয়ং প্লান :** ১৯২৯ সালে অপর মার্কিন অর্থনীতিবিদ মি. ইয়ং জার্মানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করেন। ডয়েস পানকে হুবহু রেখে শুধুমাত্র অনন্তকালের পরিবর্তে ৫৯ বছর নির্দিষ্ট করেন।
⇨ **অপারেশন লায়ন অব সি ' বা সাগরের সিংহ :** ১৬ জুলাই ১৯৪০, হিটলার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করেন। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় "অপারেশন লায়ন অব সি' বা সাগরের সিংহ।
⇨ **অপারেশন ঈগল :** সেপ্টেম্বর ১৯৪০, জার্মানির বিমান বাহিনী ব্রিটেনের আকাশ পথে যে আক্রমণ পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম হলো "অপারেশন ঈগল"। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলটন চার্চিল এর নেতৃত্বে এবং ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর তৎপরতা জনগণের মনোবল অটুট রাখতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধ শুরুর পর এটি ছিল হিটলারের প্রথম পরাজয়।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

⇨ **অপারেশন বারবারোসা :** জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের সাংকেতিক নাম। ২১ জুন, ১৯৪১ ভোর ছয়টায় সোভিয়েতের পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে জার্মানি ও তার তাবেদার বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। এই প্রেক্ষিতে- সোভিয়েতের যুদ্ধ ঘোষণা : জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ২২ জুন, ১৯৪১ সোভিয়েত নেতা মার্শাল স্টালিন অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত ভাঙ্গার অভিযোগ এনে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
⇨ **ব্লাক চেক :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এর প্রেক্ষাপট হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড দখল করার পর ২৩ আগস্ট, ১৯৩৯ জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেটিকে অনাক্রমণ চুক্তি বলে। এটি ছিল দশ বছর মেয়াদি চুক্তি। এর বিষয়বস্তু ছিল জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পর পরস্পরকে আগামী দশ বছর আক্রমণ করবে না। এই চুক্তি ছিল এতটা গোপনীয় যে সারা বিশ্ব এটি জানত না। পরবর্তী ২২ জুন, ১৯৪১, জার্মানি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে সোভিয়েতকে আক্রমণ করলে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মার্শাল স্টালিন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তিনি অভিযোগ করেন যে, জার্মানির সাথে তার যে দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি ছিল তা জার্মানি ভঙ্গ করে। যখন স্টালিন এই ঘোষণা দেন তখনই কেবল সারা বিশ্ব "অনাক্রমণ চুক্তি" সম্পর্কে জানতে পারে। জানতে পারার পরপরই এর নাম হয় "ব্লাক চেক"।

নিম্নের তথ্যগুলো অবশ্যই জেনে রাখা ভাল

⇨ **অকল্যান্ড :** নিউজিল্যান্ডের একটি দ্বীপ।
⇨ **ফকল্যান্ড :** দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটেনের একটি দ্বীপ।
⇨ **ফ্লিট স্ট্রীট :** লন্ডনে অবস্থিত সংবাদ পত্র প্রকাশনা।
⇨ **ওয়াল স্ট্রিটস :** নিউইর্য়কে অবস্থিত শেয়ার বাজার।
⇨ **হুইপ কি :** পার্লামেন্টের ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের সদস্যদের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোন বিষয়ে ভোটাভুটির সময় সদস্যদেরকে একত্রিত করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।
⇨ **ওভাল :** লন্ডনে অবস্থিত। ক্রিকেট খেলার জন্য বিখ্যাত।
⇨ **ওভাল অফিস :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়।
⇨ **হাভানা :** কিউবার রাজধানী।
⇨ **সাভানা :** আফ্রিকায় অবস্থিত বিশাল তৃণভূমি অঞ্চল।
⇨ **লন্ডন :** যুক্তরাজ্যের রাজধানী শহর।
⇨ **ইস্ট লন্ডন :** দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সমুদ্র বন্দর।
⇨ **বুশ হাউজ :** লন্ডনে অবস্থিত বিবিসি কার্যালয়।
⇨ **বুশ ম্যান :** বন্যসোয়ানায় বসবাসরত জাতি।
⇨ **বাফার স্টেট :** বিবাধমান দুইটি বৃহৎ মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।
⇨ **টাস্ক ফোর্স :** কোন দেশের স্থল বিমান ও নৌবাহিনী মিলিত দল হলো টাস্ক ফোর্স।
⇨ **রেফারেন্ডাম :** কোন বিতর্কিত বিষয় বা বিলের উপর জনগণের ভোট গ্রহণকে রেফারেন্ডাম বা গণভোট বলে।
⇨ **তৃতীয় বিশ্ব :** স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ।
⇨ **গ্রেট হল :** চীনের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়।
⇨ **ফেয়ার ফেক্স :** মার্কিন বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা
⇨ **হোয়াইট হল :** লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয়।
⇨ **হোয়াইট হাউজ :** মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন।
⇨ **ইউরোমানি :** লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জার্নাল।
⇨ **অধ্যাদেশ :** জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশ।
⇨ **ব্লু বুকস :** ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তক।
⇨ **হোয়াইট লজ :** ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড এর জন্মস্থান।
⇨ **ইয়েলো বুক :** ফ্রান্স ও চীনের ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তক।
⇨ **হোয়াইট বুক :** জার্মানি ও পর্তুগালের ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তক।
⇨ **গ্রিক বুক :** ইটালির ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তক।
⇨ **গ্রে বুক :** জাপানের ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তক।
⇨ **রুদ্ধদ্বার নীতি কি (ক্লস ডোর পলিসি) :** কোন একটি বা কয়েকটি দেশকে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা দান করে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যে বিশেষ শর্ত আরোপ করবার এবং এভাবে সকল দেশের

সাথে বাণিজ্য কার্যত : অসম্ভব করে তুলবার নীতি। (সূত্র : কূটনীতিকোষ)

⇨ **যৌথ নিরাপত্তা (কালেকটিভ সিকিউরিটি) :** একাধিক দেশ কর্তৃক বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি বা গৃহীত ব্যবস্থাকে বোঝায়। (সূত্র : কূটনীতিকোষ)

⇨ **ইশতেহার :** গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভার পরে জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহের সার সংক্ষেপ বা বিবৃতি।

⇨ **ফেডারেশন :** যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজ্য বা রাষ্ট্র বৈদেশিক বিষয় প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করে এবং অন্যান্য ক্ষমতা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ থাকে। এই রূপ রাষ্ট্র জোট , সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়নসমূহের জোটকে ফেডারেশন বলে। যেমন : ভারত, রুশ ফেডারেশন ইত্যাদি।

⇨ **কনফেডারেশন :** বিভিন্ন রাষ্ট্রের মৈত্রী বা মিত্র সংঘকে কনফেডারেশন বলে। যেমন : সার্ক , ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আশিয়ান ইত্যাদি।

⇨ **উত্তর -দক্ষিণ আলোচনা :** ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যাম এর শীর্ষ সম্মেলনে "নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার" প্রস্তাব গৃহীত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল উত্তরের ধনী বিশ্বের সাথে দক্ষিণের দরিদ্র বিশ্বের মধ্যকার বিশাল অর্থনৈতিক ব্যবধান হ্রাস করা।এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে উত্তরের সাথে দক্ষিণের যে আলোচনা শুরু হয় তাকে উত্তর -দক্ষিণ আলোচনা নামে অভিহিত করা হয়। এক কথায় উত্তরের সাথে দক্ষিণের অর্থনৈতিক ব্যবধান হ্রাস সংক্রান্ত আলোচনার নামই হলো উত্তর -দক্ষিণ আলোচনা।

⇨ **সাউথ কমিশন :** "নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার" গৃহীত হলে উত্তর দক্ষিণের অর্থনৈতিক ব্যবধান হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালালেও উত্তরের অনমনীয় মনোভাবের কারণে তা সফল হয় নি। এ কারণে ন্যাম ১৯৮৬ সালে 'সাউথ কমিশন' গঠন করে। যার উদ্দেশ্য হলো উত্তর দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা।

⇨ **ছিটমহল :** কোন দেশের নিজস্ব ভূখন্ড হতে বিচ্ছিন্ন ভূখন্ড যা অন্য দেশের মধ্যে অবস্থিত। তাহাই ছিটমহল।

⇨ **নো ম্যানস ল্যান্ড :** যে স্থান দু'টি পাশাপাশি রাষ্ট্রের মাঝে থাকে এবং উভয় রাষ্ট্র তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু কেউ মালিকানা দাবি করতে পারবে না। তাকেই নো ম্যানস ল্যান্ড বলে।

⇨ **গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল :** মিয়ানমার , থাইল্যান্ড, সম্পুচিয়া , লাওস হয়ে মাদক দ্রব্য পাচারের রুটকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বলে।

⇨ **সিলভার ক্রিসেন্ট :** ইরান , পাকিস্তান , আফগানিস্তানের যে অঞ্চল দিয়ে মাদক দ্রব্য পাচার হয় তাকে সিলভার ক্রিসেন্ট বলে।

⇨ **নিরপেক্ষ রাষ্ট্র :** যে দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সম্পর্কে সকল বৃহৎ শক্তি স্থায়ীভাবে গ্যারান্টি দেয় সেটাকে বলা হয় নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পৃথিবীতে এরূপ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একমাত্র উদাহরণ সুইজারল্যান্ড। ১৮৭৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস সুইজারল্যান্ডকে উক্ত রূপ গ্যারান্টি দিয়ে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।

⇨ **কনডমিনিয়াম :** কোন একটি দেশের উপর যখন দুই বা ততোধিক বহিঃশক্তি যৌথভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন ঐ দেশটিকে কনডমিনিয়াম বলা হয়। সামগ্রীক ভাবে বহিঃশক্তিগুলোর প্রভূত্ব যৌথভাবে দেশটির শাসন ব্যবস্থার উপর কায়েম থাকলেও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রভূ দেশগুলো পৃথক পৃথক বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

⇨ **সামন্ত রাজ্য :** সামন্ত রাজ্য হলো সেই রাজ্য যা সাধারণত অন্য একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। পররাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাপারে বিশেষত অভিভাবক রাষ্ট্র দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

⇨ **গালফ :** যে জলভাগ সংকীর্ণ চ্যানেলের মাধ্যমে মহাসাগরের সাথে যুক্ত হয় অর্থাৎ মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং সেটির পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্থ নয় তাকে গালফ বলে। যেমন : গালফ অব মেক্সিকো

⇨ **বে' :** যে জলভাগ মহাসাগরের সাথে বৃহৎ চ্যানেলের মাধ্যমে যুক্ত হয় অর্থাৎ মহাসাগরে যার প্রবেশের পথ থাকে উন্মুক্ত ও প্রশস্থ তাকে বে বলে। যেমন বে অব বেঙ্গল।

⇨ **নীতি :** নীতি হলো দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতার শর্ত ভেঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে ব্যবহার করা হয় তাকে দুর্নীতি বলা যায়।

⇨ **বিকল্প ভোট :** একটি বিশেষ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি । এ পদ্ধতিতে একজন ভোটার একটি ব্যালট পেপার পান এবং এত তার পছন্দের ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের পাশে ১,২,৩,৪, ইত্যাদি সংখ্যা বসান। যাকে বেশি পছন্দ করেন তাকে প্রথম পছন্দ (১) তারপর দ্বিতীয় পছন্দ (২) এভাবে প্রার্থীদের নামের পাশে লিখে দেন। ভোট গণনা করে যদি দেখা যায় কোন প্রার্থী একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ ভোট পাননি তাহলে তালিকার একেবারে নিচে অবস্থিত প্রার্থীর ভোট বাকি

প্রার্থদের মধ্যে পুনবন্টন করে দেওয়া হয়। তখন এ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ পড়েন। তার একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলে নিচের দিক থেকে পরবর্তী জনের ভোট পুনবন্টন করা হয় । অস্ট্রেলিয়ায় এ পদ্ধতি প্রচলন আছে। এক অগ্রাধিকার ভিত্তিক ভোট বা "প্রিফারেশিয়াল ভোট"ও বলে।

⇨ **সেকেন্ড বা দ্বিতীয় ব্যালট :** দ্বিতীয় ব্যালট হচ্ছে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা সিম্পল মেজরিটির বদলে একজন প্রার্থী প্রকৃত সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট (অর্থাৎ অন্তত ৫০%+ ১) পাচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করার একটি পদ্ধতি। যেমন ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আছে যে, কোন নির্বাচণী এলাকায় কোন প্রার্থীই যদি মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০% এর বেশি না পায় , তা হলে ঐ নির্বাচনী এলাকায় পুনরায় ভোট হবে এবং প্রথম নির্বাচনে যারা ১২.৫% এর কম ভোট পেয়েছিল তারা দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা বা দ্বিতীয় ব্যালটের সময় প্রার্থী বলে গন্য হবে না। অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স,পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যালটের ব্যবস্থা আছে। তার ফলে কোন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ৫০% এর বেশি ভোট না পেলে প্রথম নির্বাচনে শীর্ষস্থান ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর মধ্যে আবার নির্বাচন হবে। দ্বিতীয় ব্যালটের সুফল হল এই যে, প্রথম ব্যর্থ বা তাৎপর্যহীন প্রার্থীর ভোটাররা পুনরায় একজন যথার্থ ব্যক্তিকে ভোট দানের সুযোগ পায়। ৫০% এর বেশি ভোট পাওয়ার জন্য সমমনারা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। যারা নির্বাচিত হন তারাও দাবি করতে পারেন যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

⇨ **ট্রানশিপমেন্ট :** প্রতিবেশি দেশ থেকে অথবা একটি দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য ব্যবহারের জন্য তৃতীয় দেশের পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকেই ট্রানসিপমেন্ট বলে।

⇨ **গ্রিন পলিটিক্স :** পরিবেশের সুরক্ষা এবং সংরক্ষনের লক্ষ্যে যখন রাজনীতি কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে গ্রিন পলিটিক্স বলে। ১৯৭২ সালে নিউজিল্যান্ডে ভ্যালুস পার্টি নামে প্রথমে পরিবেশবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

⇨ **টেনিস কোর্টের শপথ :** থার্ড এস্টেট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ গঠনের সাথে সাথে রাজা পরিষদ ভেঙ্গে দেন। এর প্রতিবাদে থার্ড এস্টেট এর প্রতিনিধিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মিরাবোর নেতৃত্বে একটি টেনিস কোর্টে শপথ গ্রহণ করে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। এই শপথকে টেনিস কোর্টের শপথ বলে।

⇨ **জানজাবিদ :** সুদানের পশ্চিমাঞ্চলের একটি এলাকার নাম দারফোর। এখানে কৃষ্ণাঙ্গ সুদানিরা বসবাস করে। অন্যদিকে রয়েছে আরব অধিবাসিন। দারফুরের কৃষ্ণাঙ্গ সুদানীরা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এই নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলে সূচীত হয় বিদ্রোহের। এই বিদ্রোহ দমনে সুদান সরকার আরবদের নিয়ে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে। এই মিলিশিয়াদের বলা হয় জানজাবিদ।

⇨ **ক্ষমতা :** বস্তুগত , মানবিক, বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকেই ক্ষমতা বলে।

⇨ **নারীর ক্ষমতায়ন :** নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে।

⇨ **বিকেন্দ্রীকরণ :** সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্থানান্তর ও হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।

⇨ **রাষ্ট্র :** রাষ্ট্র মূলত একটি বিমূর্ত ধারণা। তবে ভূখণ্ড, জনগণ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এই চারটির সমন্বয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তাই রাষ্ট্র। ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এই দুটি উপাদান কখনই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে না। জনগণ ও সরকার দুটি মূলত রাষ্ট্রের সক্রিয় উপাদান। অর্থাৎ সরকার ও জনগণের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট চরিত্র ফুটে উঠে। এই চরিত্রেই রাষ্ট্রের পরিচয় ফুটে উঠে।

⇨ **সরকার :** সরকার হলো একটি সংগঠন। যা রাষ্ট্রকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করে।

⇨ **সরকারি লোক :** মূলত রাজস্ব খাত থেকে যাদের বেতন ভাতা নির্বাহ করা হয় তারাই সরকারি লোক। এই অর্থে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী সভার সদস্যগণ, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই সরকারি লোক।

⇨ **অর্থ বিল :** সরকারি বা সরকারের সাথে সংশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে বিল উত্থাপন করা হয় তাকে অর্থ বিল বলে। অর্থাৎ রাজস্ব আয় থেকে সরকার কে খরচ করতে হয় এ সংক্রান্ত বিল কে অর্থ বিল বলে।

⇨ **সার্টিফিকেট কেইজ :** রাষ্ট্রের পক্ষে পাওনা আদায়ের জন্য জেলার পর্যায়ে যে কেইজ করেন এবং উপজেলা পর্যায়ে এসিল্যান্ড যে কেউজ করেন তাহাই সার্টিফিকেট কেইজ।

⇨ **সাংবিধানিক পদ বা প্রতিষ্ঠান :** রাষ্ট্রের যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংবিধানে বর্ণিত শপথ বা ঘোষণা পাঠ করতে হয় । সেই সকল পদকে সাংবিধানিক পদ এবং প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

বলে। শপথ গ্রহণ করার বিধান না থাকলেও সেই প্রতিষ্ঠান সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ থাকে এমন প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন : এ্যান্টনি জেনারেল (এটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও শপথ গ্রহণ করানো হয় না।)

- **সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল :** সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি কমিটি যা বিচারকদের কাজের তদারকি করবে। তাহাই হলো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল।
- **পেট্রোবাংলা :** একমাত্র দেশিয় কোম্পানি, বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও উন্নয়ন ও উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত।
- **সবুজ বিপ্লব :** কৃষিকাজে উন্নতি, আবাদি জমিতে উন্নতমানের সার বীজ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাই হলো সবুজ বিপ্লব।
- **বামপন্থী :** প্রগতিশীল মতবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বামপন্থী বলা হয়।
- **মার্কসবাদ :** কার্ল মার্কসের মতে, রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সমাজে বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নীতিকেই মার্কসবাদ বলা হয়।

বিশ্ব কূটনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক পরিভাষা

- **কূটনীতি:** কূটনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের মতামত প্রকাশের মাধ্যম। সরকারি বিবৃতি, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সরকারি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ডিপ্লোমেসি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যাতে বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তির পূর্বে শত্রুতার উদ্যোগ না করে আলোচনা বা চুক্তির ব্যবস্থা করার কার্য বা কৌশল সঠিকভাবে হয়।
- **রাষ্ট্রদূত :** এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ শ্রেণির কূটনৈতিককে রাষ্ট্রদূত বলা হয়।
- **অ্যাটাচী :** রাষ্ট্রদূতের সহকারীদের মধ্যে একজন সদস্য যিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামরিক, শ্রম ইত্যাদি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে দেখাশুনা করে থাকেন তাকে অ্যাটাচী বলে।
- **চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স :** একজন রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে নিযুক্ত মিশনের অস্থায়ী প্রধান। সাধারণতঃ মিশনের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকেই এই পদে নিয়োগ করা হয়।
- **কনসুল :** রাষ্ট্র কর্তৃক বিদেশে নিযুক্ত প্রতিনিধি যিনি সেখানে স্বদেশি নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করেন এবং বিদেশের সহিত নিজ রাষ্ট্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাহায্য করেন।
- **কূটনীতি :** বিভিন্ন দেশের সহিত চুক্তির পূর্বে শত্রুতার উদ্রেক না করে আলোচনা বা চুক্তির ব্যবস্থা করার কার্য বা কৌশল।
- **ডিপ্লোমেটিক ইলনেস :** যখন কোন রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি কোন অনুষ্ঠান বা সভায় যোগদান করতে যেকোন কারণে অনিচ্ছুক থাকেন তখন তিনি তাঁর অনুপস্থিতি যাতে কেউ খারাপ চোখে না দেখেন সেইজন্য অসুস্থতার অজুহাত দেখান। এই অসুস্থতাকেই কূটনৈতিক অসুস্থতা বলা হয়।
- **অভিজাততন্ত্র :** সকলের স্বার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। এই সরকারের শাসন ব্যবস্থা কতিপয় লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই সকল ব্যক্তি নির্বাচন বা বংশানুক্রমে শাসন মতায় অধিষ্ঠিত হন। ধনগত অভিজাত শ্রেণীও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন।
- **রাজনৈতিক আশ্রয় :** যখন কোন রাজনৈতিক শরণার্থী অন্য কোন দেশে আশ্রয় নেন তখন তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন বলে ধরা হয়।
- **অথরিটেরিয়ান গভর্ণমেন্ট :** ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধিকারী সরকার। একে এক ধরণের একনায়কতান্ত্রিক সরকারও বলা যায়।
- **শক্তির ভারসাম্য রক্ষা :** কোন বিবাদ এড়াইয়া শান্তি আনয়নের জন্য দুটি শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ইউরোপের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **ব্লাক সার্ট :** ইটালীর মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট দল।
- **ব্লু বুকস :** নীল মলাটে বাঁধানো ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপক সভার বা খাস রাজ সভার বিবরণী পুস্তক। ফ্রান্স এবং চীনের এই পুস্তককে 'ইয়েলো বুক,' জার্মানি এবং পর্তুগালের বইকে 'হোয়াইট বুক', ইটালীর বইকে 'গ্রিন বুক' এবং জাপানের বইকে 'গ্রে বুক' বলা হয়।
- **বলশেভিক :** রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা কার্ল মার্ক্সের মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সফল করেন। বস্তুত রুশ বিপ্লব বলশেভিক দলের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়।
- **বুর্জোয়া :** মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়; মার্কসিস্টদের মতে যারা শ্রমিক শ্রেণিকে পছন্দ করে না এবং তাদের শোষণ করে তারাই বুর্জোয়া। বুর্জোয়া বলতে অপরদিকে ধনিক শ্রেণি, শিল্পপতি এবং অনুরূপ অন্যান্য শ্রেণীকে বুঝায়।
- **আমলাতন্ত্র :** আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার। যেখানে সরকারি কর্মচারীগণ শাসন যন্ত্রের

অঙ্গীভূত না হয়ে নিজেদেরকে এক শ্রেণীর শাসন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করেন এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনমতকে অগ্রাহ্য করে শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

- **ধনতন্ত্রবাদ :** এ মতবাদে সরকারের অধীনস্ত জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন ও বন্টনের উৎস, কার্যে নিয়োগ এবং শ্রমের পারিশ্রমিক মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের দ্বারা বিন্যিত হয় এবং বস্তুত তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **ক্যাপিচুলেশন :** শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের নিকট শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করা। এ আত্মসমর্পণে অপমানজনক শর্ত আরোপ করা হয়।
- **সেন্ট্রালিজম :** যে সরকারে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য ইউনিটগুলির হাতে নগণ্য ক্ষমতা থাকে।
- **উগ্র স্বদেশিকতা :** এই উগ্র স্বদেশিকতার বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যান্য অঞ্চল বা দেশের নাগরিকগণকে ঘৃণা করে। ফ্রান্সের সৈন্য নিকোলাস শোভিনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।
- **কোয়ালিশন সরকার :** বিভিন্ন মতাবলম্বীর রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্রিত করে মন্ত্রীসভা গঠন। এই মন্ত্রীসভা বিভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে অথবা সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা করতে সকল সময় সমর্থ হয় না।
- **কমিউনিজম বা সাম্যবাদ :** এটি এক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা যাতে উৎপাদন বা ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের সমগ্র জীবন ও কর্মধারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে তার নির্ধারিত কার্যসম্পন্ন করে এবং রাষ্ট্র তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণের ফলে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা, ব্যবসায় চক্র বা শ্রমিক মালিক বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটে।
- **কনফেডারেশন :** নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য কতকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের একত্রিকরণ। সদস্য দেশগুলোর উপর ইউনিয়নের কিছু ক্ষমতা থাকলেও নাগরিকদের উপর ইউনিয়ন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো পৃথক থাকে। ফেডারেশন ও কনফেডারেশনের প্রত্যেকের একটি করে কেন্দ্রীয় সরকার থাকে। কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে এবং তারা অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করতে পারে কিন্তু ফেডারেশনে তা সম্ভব নয়। কনফেডারেশনের যেকোন সদস্যের যেকোন সময় বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা আছে কিন্তু ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সেই ক্ষমতা নেই।
- **ক্রশ ভোটিং :** শাসকদল অথবা বিরোধী দলের সদস্যগণ যখন দলগত বাধা এবং সমর্থন ভঙ্গ করে বিপক্ষদলকে ভোট দেন।
- **ডী-ফ্যাক্টো :** বাস্তবিক পক্ষে নতুন সরকার অথবা রাষ্ট্রের রীতিসিদ্ধ স্বীকৃতির পূর্বেই যেকোনো ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য বিধিবদ্ধ আইন।
- **ডীজুরি :** আইনমত নূতন সরকার বা রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।
- **গণতন্ত্র :** গণতন্ত্রের মূল অর্থ জনগণের ক্ষমতা। এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যাতে প্রত্যেক নাগরিক অংশ গ্রহণ করে। গণতন্ত্রের মূল বস্তু হলো জনমতের প্রাধান্য স্বীকার করা এবং জনমত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা। গণতন্ত্র অর্থ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে 'জনগণের কল্যাণার্থে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের সম্বন্ধে শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়।'
- **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ :** কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকগণের বস্তুবাদ যা দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্ব এবং ইতিহাসকে পরস্পর বিরোধী মতবাদ ও সমাধান বুঝায়।
- **ডায়ার্কী :** যে সরকারের প্রধান ক্ষমতা দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের উপর ন্যস্ত থাকে। এটি একটি দ্বৈত সরকার এবং এটি জনপ্রিয় নয়।
- **একনায়কতন্ত্র :** এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। একনায়কতন্ত্র 'একজাতি, একদল ও একনেতা' এই নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রে জনগণের অধিকার অস্বীকার করা হয় এবং এই ব্যবস্থায় জনগণ একনায়কের নির্দেশ কার্যকরী করতে বাধ্য থাকে। একে অনেকে স্বৈরতন্ত্রও বলে। এই শাসন ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক বিরোধী দলকে নির্মমভাবে দমন করা হয় অথবা বেআইনী ঘোষণা করা হয়। বাক স্বাধীনতা বা সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয় এবং জনমত গঠনের সমস্ত উপাদান রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **পঞ্চম বাহিনী (Fifth colum) :** যে জনতা গোপনে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শত্রুকে

সাহায্য করে।

⇨ **মৌলিক অধিকার :** একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সংবিধানে গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী কতকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনে অপরিহার্য এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

⇨ **ঘেরাও :** ধর্মঘটী জনতা কর্তৃক দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে এক বা একাধিক লোককে ঘরে আবদ্ধ রাখার কৌশল।

⇨ **ইমপিচমেন্ট :** রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের জন্য রাষ্ট্রের প্রধান বা কোন মন্ত্রীর পার্লামেন্ট অথবা এজন্য গঠিত উচ্চ ট্রাইব্যুনালে বিশেষ বিচার।

⇨ **জান্টা :** একটি স্বগঠিত সমিতি যা গোপনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিলিত হয়।

⇨ **গণভোট :** কোন বিতর্কিত প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্য ভোট।

⇨ **প্রোটোকল :** কূটনৈতিক পরিভাষায় একে সাধারণ আন্তর্জাতিক দলিলপত্র বুঝায়। আন্তর্জাতিক সভা-সমিতির কার্যবিবরণী। কোন সন্ধির প্রাক্কালে প্রাথমিক চুক্তি এবং অনুমোদন প্রয়োজন নেই। এরূপ চুক্তি কখনও প্রোটোকল দ্বারা সন্ধির সমপর্যায়ভুক্ত চুক্তিও বুঝায়। কূটনৈতিক প্রোটোকল দ্বারা কূটনৈতিক বিভাগীয় কর্মচারীদের শিষ্টাচারভিত্তিক চালচলন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাধারণত বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত প্রত্যেক সরকারি অফিসে প্রোটোকলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকেন।

⇨ **স্ট্রো ভোট :** কোন বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক বেসরকারিভাবে গৃহীত ভোট।

⇨ **তৃতীয় বিশ্ব :** স্বাধীনতা প্রাপ্ত বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ।

⇨ **মার্কসবাদ :** কাল মার্কস-এর মতবাদ। ধনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করাই এর লক্ষ্য।

⇨ **মাও-এর মতবাদ :** চীনে প্রচারিত মাও সে তুং-এর মতবাদ। মাও-এর মতবাদ অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামই কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।

⇨ **জাতীয়তাবাদ :** কোন জাতি বা সমাজের রাজনৈতিক সংহতি বজায় রাখাকে জাতীয়তাবাদ বলে।

⇨ **বামপন্থী :** প্রগতিশীল মতবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বলা হয় বামপন্থী।

⇨ **সাম্রাজ্যবাদ :** অপর রাষ্ট্র দখল করে শক্তি বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি করার নাম সাম্রাজ্যবাদ।

⇨ **ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ :** এই মতবাদের মূলনীতি ব্যক্তি স্বাধীনতা।

⇨ **গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা :** গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন পূর্বক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি।

⇨ **গণভোট :** বিতর্কিত কোন বিষয়ে বিশেষ করে আইন পরিষদের কোন বিতর্কিত বিলের উপর জনগণের ভোট গ্রহণকে গণ ভোট বলে।

⇨ **স্বায়ত্তশাসন :** স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা।

⇨ **বাফার স্টেট :** বিবাদমান দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

⇨ **টাস্ক ফোর্স :** কোন দেশের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর সম্মিলিত সৈন্যদল।

⇨ **শ্বেত পত্র :** একই রাষ্ট্রে দুই শক্তির শাসন ব্যবস্থা।

⇨ **হুইপ :** পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান এবং কোন বিষয়ে ভোটাভুটির সময় সদস্যগণকে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি।

⇨ **অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন :** মেয়াদ কাল অতিক্রম হওয়ার আগেই কোন কারণবশত: পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

⇨ **ইয়োলো ফ্ল্যাগ :** সংক্রমিত রোগ আছে, এটা নির্দেশ করার জন্য ইয়োলো ফ্ল্যাগ ব্যবহার করা হয় অথবা আটক রাখা জাহাজেও ইয়োলো ফ্ল্যাগ প্রদর্শিত হয়।

⇨ **অ্যাসাইলাম :** রাজনৈতিক আশ্রয়। রাজনৈতিক কোন্দল বা অন্য কোন কারণে যখন কোন রাজনৈতিক শরণার্থী অন্য কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তারা এ আশ্রয় গ্রহণকে অ্যাসাইলাম বলে।

⇨ **ক্যামোফ্লেজ :** ক্যামোফ্লেজ বলতে গাছপালা, ডালপালা, লতাগুল্ম ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারা সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার পদ্ধতিকে বুঝায়।

⇨ **ব্লু-লজ :** ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে যে আইন সেটাই ব্লু লজ। এ আইন আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

⇨ **ব্রেনগান :** হালকা মেশিনগান। এর সাহায্যে দ্রুত গুলি ছোড়া যায়।

⇨ **ইউনিটারি গভর্নমেন্ট :** যে সকল ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই মূলত সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং

http://thejobstudy.com Go to Contents

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তার ইচ্ছানুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলোর উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এই ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট বা এককেন্দ্রীয় সরকার বলা হয়। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা নি:সন্দেহে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত।

⇨ **ক্রিডেনশিয়ালস :** এক দেশ কর্তৃক অপর দেশে প্রেরিত দূতাবাসের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পরিচয়পত্র। বিদেশি নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে এ পরিচয় পত্র সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পেশ করতে হয়।

⇨ **স্যাটেলাইট স্টেট :** প্রতিবেশী বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবাধীন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে স্যাটেলাইট স্টেট বলে। যেমন: ভ্যাটিকান সিটি, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি।

⇨ **বাফার স্টেট (Buffer state) :** বিবদমান দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বাফার স্টেট বলা হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে এ ধরনের রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী দেশ বেলজিয়াম বাফার স্টেট হিসেবে বিবেচিত হয়। চায়না+ইন্ডিয়া=নেপাল।

⇨ **ভার্চুয়াল স্টেট :** যে রাষ্ট্রের সবকিছু টেকনোলজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

⇨ **হার্ড স্টেট (Heard State) :** যে রাষ্ট্র উগ্রপন্থীয়/বিপ্লবের মাধ্যমে সবকিছু অর্জন করতে চায় তাকে হার্ডস্টেট বলে। যেমন: উত্তর কোরিয়া।

⇨ **সফট স্টেট (Soft state) :** যে রাষ্ট্র আইডলোজিকলি (Idelogically)/আদর্শ দর্শন দ্বারা তার লক্ষ্য অর্জন করে/করতে চায় তাকে সফট স্টেট বলে। যেমন: নরওয়ে।

⇨ **জনকল্যানমূলক রাষ্ট্র (Welfare state) :** যে রাষ্ট্র পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম। Welfare state-৭টি, পৃথিবীর প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে ।

⇨ **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র/Secular state :** রাষ্ট্র কোন ধর্মকে লালন করবে না, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক যার যার ধর্ম স্বাধীন ভাবে পালন ও প্রচার করতে পারবে, রাষ্ট্রের সব নাগরিক অহিংসা, প্রেম ও ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

⇨ **ধর্মীয় রাষ্ট্র/Theocratic state :** ধর্মীয় ideology ভিত্তিক, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যেমন: ইরান Welfare organization: Individualis বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে আগ্রহী নয়। এরা শুধু বিদেশি আগ্রাসন প্রতিহত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং চুক্তি অনুমোদনসহ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলে। যেমন-ভারত ও ইংল্যান্ড।

⇨ **পুলিশি রাষ্ট্র :** যে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রীক অধিকার, মৌলিক অধিকার, এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে না, রাষ্ট্রের ইচ্ছাই জনগণের ইচ্ছা বলে ধরা হয়।

⇨ **সিতরাতি রাষ্ট্র :** একটি স্বাধীন দেশের ভিতরে যদি অন্য আর একটি স্বাধীন দেশ থাকে, সেক্ষেত্রে বড় দেশটি কে সিতরাতি রাষ্ট্র বলে। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সোয়াজিল্যান্ড মধ্যখানে লেসেতু এবং ইতালি ও সানমেরিনো মধ্যখানে ভ্যাটিকান সিটি অবস্থান।

⇨ **এ্যাটাশে (Attache) :** রাষ্ট্রদূতের সহকারি সদস্য। দক্ষ ব্যক্তি যিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামরিক শ্রম ইত্যাদি বিষয়গুলোর মধ্যে যে কোন একটি বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন একজন আটাশে।

⇨ **ফ্রি অন বোর্ড :** বিক্রেতা তার বিক্রিত দ্রব্য নিজ খরচে জাহাজে তুলে দেন কিন্তু জাহাজের ভাড়া ক্রেতা দিয়ে থাকেন। এ পদ্ধতিই হচ্ছে ফ্রি অন বোর্ড।

⇨ **গানবোট ডিপ্লোম্যাসি :** গানবোট ডিপ্লোম্যাসি হচ্ছে একটি দেশের প্রতি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, শক্তি বা অন্যান্য মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি ও ভয় দেখানো। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত-বাংলাদেশ মিত্রশক্তির সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ বিরতির চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল।

⇨ **হিন্টারল্যান্ড :** সমুদ্র বা নদীর তীর এলাকার পাশ্চাদবর্তী জেলাগুলোকে হিন্টারল্যান্ড বলা হয়। এগুলো পোর্ট কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

⇨ **ম্যান অব ওয়ার :** যুদ্ধ জাহাজ। এ জাহাজ নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উপযোগী।

⇨ **প্লেনিপটেনশিয়ারি :** রাজদূত। যাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

⇨ **সাইয়েন্টিফিক সোসালিজম :** কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলা হয়। কারণ এটি কল্পনা বা ধারণার ব্যাপারে নয় বরং এটি ঐতিহাসিক বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। তিনি পুঁজিবাদকে আক্রমণ করে সমাজতন্ত্র শ্রেণি সংগ্রামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তত্ত্বের মূল কথা হলো- ১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ২. উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব, ৩. ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ, ৪. শ্রেণি সংগ্রাম, ৫. সামাজিক বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েৎদের একনায়কত্ব এবং শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের অবসান।

⇨ **ট্যারিফ বা মূল্য তালিকা :** আমদানি ও রপ্তানির উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত কর নির্দিষ্ট করে

দ্রব্যের তালিকা করাকে ট্যারিফ কর বলে।

⇨ **অ্যাম্ব্যাসাডর বা রাষ্ট্রদূত :** একটি রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ শ্রেণির কূটনীতিকগণকে রাষ্ট্রদূত বলে।

⇨ **ক্যান্টনমেন্ট :** যেখানে সৈন্যরা থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকের থাকার বা প্রবেশাধিকার থাকে না।

⇨ **গ্যারিসন :** যে সব ক্যান্টনমেন্ট রেসিডেন্ট/বসবাস এর সুবিধা থাকে।

⇨ **Persona non-grata :** কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রাহক রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে যেমন গুপ্তচর বৃত্তি, ঐ গ্রাহক রাষ্ট্র তাকে তখন অবাঞ্ছিত ঘোষণা বা বহিষ্কার করতে আদেশ দিতে পারে।

⇨ **প্রটোকল :** প্রটোকল শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন: ১. রাষ্ট্রাচার অর্থে এক দেশের সরকার প্রধান কে অন্য দেশের সরকার প্রধানকে দেওয়া সম্মান। ২. পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি অর্থে, ৩. আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া, ৪. মূল চুক্তির Technical দিক বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়ক চুক্তি।

⇨ **Second Track Diplomacy :** বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেশগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উপর যে কূটনীতি প্রয়োগ করে তাকে ' Second Track Diplomacy ' বলে। এ নীতি প্রয়োগ করে শক্তিশালী দেশগুলো অনুন্নত ও দুর্বল দেশগুলোকে তাদের ওপর নির্ভরশীল করার প্রচেষ্টা চালায়।

⇨ **Dean of Deplomatic corps :** স্বাগতিক দেশের কূটনীতিবিদদের নেতাকে বলে। যেমন টুয়েজডে গ্রুপ।

⇨ **State department :** USA এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে Secretary of state বলে।

⇨ **bouth block :** ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে External affair's ministry বা বিদেশমন্ত্রী।

⇨ **North Block :** ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

⇨ **দাতাঁত (Detente) :** দুটি পরস্পর বিরোধী বৈরী রাষ্ট্রের মধ্যকার উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে বলে।

⇨ **সফট ক্যারেন্সি :** যে মুদ্রার চাহিদা কম এবং বিনিয়োগের জন্য সহজে পাওয়া যায় তাকে সফট ক্যারেন্সি বলা হয়। সাধারণত রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ যে দেশে বেশি, সেই দেশের মুদ্রার সফট কারেন্সিতে পরিণত হয়।

⇨ **ট্রান্সন্যাশনাল প্রোটেকশন :** কোন রাষ্ট্রকে আশ্রয় দান না করে সেই রাষ্ট্রের কোন সম্প্রদায়কে আশ্রয় দান করাকে ট্রান্সন্যাশনাল প্রোটেকশন বলে। প্রাচ্যের অটোম্যান সম্রাজের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের এ ধরনের আশ্রয় দান করা হয়।

⇨ **থার্ড ওয়ার্ল্ড (তৃতীয় বিশ্ব) :** স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল ও উন্নয়নকামী দেশসমূহ।

⇨ **প্রাইজ কোর্ট :** কোন দেশ কর্তৃক স্থাপিত কোর্ট, যা যুদ্ধের সময় সমুদ্র থেকে দখলকৃত শত্রুপক্ষের জাহাজের বিচার করে থাকে।

⇨ **হাইকমিশনার :** হাইকমিশনার হচ্ছে একটি কমনওয়েলথ রাষ্ট্র থেকে অপর কমনওয়েলথ রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ শ্রেণির কূটনৈতিক প্রতিনিধি। যে সকল রাষ্ট্র কমনওয়েলথভুক্ত নয় সে সকল রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রদূত বলা হয়।

⇨ **আর্নেস্টমানি :** ক্রেতা দ্রব্যের দরাদরি বা দরকষাকষির পূর্বে বিক্রেতা যে বায়না করে তাকে আর্নেস্ট মানি বলে।

⇨ **ইনভয়েস :** বিক্রিত পণ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যের নামের তালিকা। এখানে বিক্রিত পণ্যের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকে।

⇨ **লবিং (Lobbying) :** Lobbying শব্দটি এসেছে ইংরেজি Lobby থেকে, যার অর্থ কোন ভবনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত অন্য অংশ। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে Lobbying শব্দটির অর্থ হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের পক্ষে আনার প্রয়াস।

⇨ **মোটেল :** গ্লানাগারসহ শয়নকক্ষ, গ্যারেজ ইত্যাদি সুবন্দোবস্তসহ নির্মিত পর্যটকদের জন্য এক প্রকার হোটেল। এই হোটেল সাধারণত মোটরিস্টদের জন্য নির্মাণ হয়। হোটেল হচ্ছে খাওয়া দাওয়া ও থাকার ব্যাবস্থা আছে কিন্তু পার্কিং সুবিধা নেই এমন।

⇨ **এনভয় :** বিদেশে প্রেরিত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণের মাঝে রাষ্ট্রদূত এবং চার্জ বা এফেয়ার্সদের মাঝামাঝি পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এনভয় বলে।

⇨ **ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড :** দামের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রাকে ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার সামান্য পরিবর্তন এবং বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়।

⇨ **ইন্টারন্যাশনাল প্রোটেকশন :** ইন্টারন্যাশনাল প্রোটেকশন হচ্ছে একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অপর একটি নির্ভরশীল রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট সরকারদ্বয়ের মাধ্যমে আশ্রয় দান করা। ভারতের উপর সিকিম নির্ভরশীল ছিল। এ নির্ভরশীলতাই ইন্টারন্যাশনাল প্রোটেকশন।

⇨ **ইয়োলো জার্নালিজম :** অবাস্তব ও চাঞ্চল্যকর সংবাদ অথবা ছবি যখন কোন সংবাদপত্রে প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হয় তখন সে অবস্থাকে ইয়োলো জার্নালিজম বলে।

⇨ **ওয়ারেন্ট বা পরওয়ানা :** ওয়ারেন্ট হচ্ছে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশনামা। কাউকে গ্রেফতার করে কোন

কিছু তল্লাশী করার জন্য এই আদেশনামার প্রয়োজন হয়।

⇨ **কাস্টিং ভোট (Casting vote) :** কোন নির্বাচনে দু'দল একই সমান সর্বাধিক ভোট পাওয়ার পর ক্ষমতা গ্রহণ নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন সে অচলাবস্থা দূর করার জন্যে সভাপতি নিজে একটি ভোট প্রদান করেন। এ ভোট গ্রহণের পদ্ধতিকে কাস্টিং ভোট বলা হয়ে থাকে।

⇨ **কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প (Concentration camp) :** একনায়ক শাসকের রাজনৈতিক বন্দিশালা। এখানে রাজনৈতিক বন্দিদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। তাদের কোন বিচার হয় না ও আত্মরক্ষার কোনরূপ সুযোগ দেয়া হয় না।

⇨ **অটক্রাসি (Autocracy) :** যে সরকার জনমত উপেক্ষা করে নিজের মন মত দেশ চালায় অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্র।

⇨ **এমব্যাসি বা দূতাবাস (Embassy) :** যেখানে রাষ্ট্রদূত ও তার কর্মচারীবৃন্দ থাকেন।

⇨ **কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি (Qualition Ministry) :** বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বিভিন্ন দলের সদস্য থাকার দরুন কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

⇨ **ব্লকেড (Blockade) :** যে সৈন্য বাহিনী বা জাহাজ শত্রুর শহর বা বন্দরের মালামাল সরবরাহ বন্ধ রাখার কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের ব-কেড বলা হয়।

⇨ **রিয়াল গার্ডস (Real Guards) :** সৈন্যদলের পেছনের অংশের শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য যে দল নিয়োজিত থাকে তাকে রিয়াল গার্ডস বলে।

⇨ **ট্রেজারি বিল (Treasury Bill) :** সরকার যে লিখিত দলিলের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন তাকে ট্রেজারি বিল বলে।

⇨ **ফোর্থ স্টেট (Fourth State) :** দেশের সংবাদপত্রকে ফোর্থ স্টেট বা চতুর্থ শক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

⇨ **স্কারমিশ (Skirmish) :** পরস্পর বিরোধী দুটি ছোট দলের মধ্যে যুদ্ধ।

⇨ **ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board) :** ইহা সরকার কর্তৃক গঠিত বোর্ড, ইহা দেশি শিল্পকারখানা দেখাশুনা করে এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে।

⇨ **স্যাবট্যাস (Sabotage) :** সন্ত্রাসবাদী কার্য চালানোর জন্য দেশের সম্পদ স্বার্থ নষ্ট করা অর্থাৎ আত্মঘাতী কাজ।

⇨ **শেভিনিজম (Chauvinism) :** অন্ধ দেশাত্মবোধ। এ কারণে এক দেশের মানুষ অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ঘৃণা করে এবং নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। ফ্রান্সের সৈন্য নিকোলাস শোভিনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।

⇨ **জিও-পলিটিক্স (Geo–Politics) :** জিও-পলিটিক্স হচ্ছে ভূখন্ড নির্ভর রাজনীতি। একটি দেশের রাজনীতি, অর্থ, পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বে তার অবস্থান অনেকাংশে জিও পলিটিক্স এর উপর নির্ভর করে।

⇨ **র‍্যাডিকেলিজম (Radicalism) :** অতি দ্রুত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের বিশ্বাসকে র‍্যাডিকেলিজম বলা হয়।

⇨ **পারসন্যালিটি কাল্ট (Personality Cult) :** কোন নেতা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের নিকট অধিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অধিকারী হন তখন সে অবস্থাকে পারসন্যালিটি কাল্ট বলা হয়।

⇨ **প্লেবিসাইট (Plebiscite) :** কোন বিতর্কিত প্রশ্নের সমাধান করার জন্য রাষ্ট্রের ভোটারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোট গ্রহণ করার নিয়মকে গণ ভোট বলা হয়।

⇨ **ফ্যাসিজম (Fascism) বা ফ্যাসিবাদ :** বেনিতামুসোলিনি ইতালিতে এ মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রই জনগণের পরিচালক, প্রভু এবং ত্রাণকর্তা এবং জনগণকে দাস সেজে বিনা প্রতিবাদে রাষ্ট্রের উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এক কথায় ফ্যাসিবাদের মূলনীতি জনগণের জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্য জনগণ। রাষ্ট্রই সকল মতার অধিকারী, ব্যক্তি নয়।

আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি

সংগঠনের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	প্রতিষ্ঠা সাল	সদর দফতর	সদস্য সংখ্যা
জাতিসংঘ	UN	১৯৪৫, ২৪ অক্টোবর	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৯৩
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা	ILO	১৯১৯	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৮৫
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	FAO	১৯৪৫, ১৬ অক্টোবর	রোম, ইতালি	১৯৭
ইউনেস্কো	UNESCO	১৯৪৫, ৪ নভেম্বর	প্যারিস, ফ্রান্স	১৯৫
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	WHO	১৯৪৮, ৭ এপ্রিল	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৯৪
আই বি আর ডি	IBRD	১৯৪৪, ১ জুলাই	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	১৮৮
আই ডি এ	IDA	১৯৬০, ২৪ সেপ্টেম্বর	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	১৭৩
আই এফ সি	IFC	১৯৫৬, ২০ জুলাই	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	১৮৪
মিগা	MIGA	১৯৮৮, ১২এপ্রিল	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	১৮০
আইসিএসআইডি	ICSID	১৯৬৬, ১৪ অক্টোবর	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	১৫০
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল	IMF	১৯৪৪, ২৭ ডিসেম্বর	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	১৮৮
বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা	ICAO	১৯৪৭, ৪ঠা এপ্রিল	মন্ট্রিল, কানাডা	১৯১
বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন	UPU	১৮৭৪, ৯ অক্টোবর	বার্ণ, সুইজারল্যান্ড	১৯২
বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা	WMO	১৯৫০, ২৩ মার্চ	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৮৮
আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা	IMO	১৯৪৮, ১৭ মার্চ	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	১৭১
বিশ্ব মেধা সংরক্ষণ সংস্থা	WIPO	১৯৭০	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৮৭
ইফাদ	IFAD	১৯৭৭, ডিসেম্বর	রোম, ইটালি	১৭৩
ইউনিডো	UNIDO	১৯৬৬	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	১৭১
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা	WTO	১৯৯৫, ১ জানুয়ারি	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৬০
আণবিক শক্তি এজেন্সি	IAEA	১৯৫৭, ২৯ জুলাই	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	১৬২
ইউনিসেফ	UNICEF	১৯৪৬	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৯০
ইউএনডিপি	UNDP	১৯৬৫	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৬৬
ইউনেপ	UNECEF	১৯৭২	নাইরোবি, কেনিয়া	১৯০
জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম	UNFPA	১৯৬৯	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৪০
জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক কার্যক্রম	UNHCR	১৯৫৭	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১২৫
আঙ্কটাড	UNCTAD	১৯৬৪	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৯৪
জাতিসংঘ সেচ্ছাসেবক সংস্থা	-	১৯৭০	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৪০
UNCFHS	-	১৯৭৮	নাইরোবি, কেনিয়া	–
ইউনিফেম	-	১৯৭৬	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	–
UNICRI	-	১৯৬৭	রোম, ইটালি	–
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল	IFAD	১৯৭৭	রোম, ইটালি	১৭৩
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত	ICC	১৯৪৬	হেগে, নেদারল্যান্ড	১২২
কমনওয়েলথ	Commonwealth	১৯৪৯	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	৫৩
ন্যাম	NAM	১৯৬১	বান্দুং, ইন্দোনেশিয়া	১২০
ও আই সি	OIC	১৯৬৯, ২৫ সেপ্টেম্বর	জেদ্দা, সৌদি আরব	৫৭
আরব লিগ	LAS	১৯৪৫, ২২ মার্চ	কায়রো, মিসর	২২
আফ্রিকার ইউনিয়ন	AU	১৯৬৩, ২৫ মে	আদ্দিস আবাবা,ইথিওপিয়া	৫৪
উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা	GCC	১৯৮১, ২৫ মে	রিয়াদ, সৌদি আরব	০৬

সংস্থার নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদর দফতর	সদস্য সংখ্যা
সিআইএস	CIS	১৯৯১, ২১ ডিসেম্বর	মিনস্ক, বেলারুস	০৯
ই ইউ	EU	১৯৯৫, ১ জানুয়ারি	ব্রাসেলস,বেলজিয়াম	২৮
ফ্রেঞ্চ কমিটিউনিটি	-	১৯৫৮	প্যারিস, ফ্রান্স	১০
সার্ক	SAARC	১৯৮৫	কাঠমান্ডু, নেপাল	০৮
ইকো	ECO	১৯৮৫	তেহরান, ইরান	১০
আসিয়ান	ASEAN	১৯৬৭, ৮ আগস্ট	জাকার্তা	১০
নাফটা	NAFTA	১৯৯৩	–	০৩
ইফটা	EFTA	১৯৬০, ৩ মে	জেনেভা	০৪
বেনেলাক্স	BENELUX	১৯৫৮	ব্রাসেলস,বেলজিয়াম	০৩
বিমসটেক	BIMSTEC	১৯৯৭, ৬ জুন	ঢাকা, বাংলাদেশ	০৭
লাফটা	LAFTA	১৯৬০	–	১২
আফটা	AFTA	১৯৯২	–	১০
ক্যারিকম	CARICOM	১৯৭৩, ৪ জুলাই	জর্জটাউন, গায়েনা	১৫
কমেসা	COMESA	১৯৯৪, ডিসেম্বর	লুসাকা, জাম্বিয়া	২১০
সিএসিএম	CACM	১৯৫৮	গুয়েতেমালা	০৫
ইকসো	EASCO	১৯৬১	নাইরোবি, কেনিয়া	০৩
আনজুস	ANZUS	১৯৫১, ১ সেপ্টেম্বর	ক্যানবেরা,অস্ট্রেলিয়া	০৩
সিয়াটো	SEATO	১৯৫৪, ৮ সেপ্টেম্বর	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	০৮
ন্যাটো	NATO	১৯৪৯, ৪ এপ্রিল	ব্রাসেলস,বেলজিয়াম	২৮
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	ADB	১৯৬৬, ২২ আগস্ট	ম্যানিলা, ফিলিপাইন	৬৭
ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক	IDB	১৯৭৫, ২০ অক্টোবর	জেদ্দা, সৌদি আরব	৫৬
ইউরোপীয় পুনর্গঠন ব্যাংক	EBRD	১৯৯১,১৫ এপ্রিল	লন্ডন,যুক্তরাজ্য	৬৩
জি-৮	G-8	১৯৭৫, ১৫ নভেম্বর	–	০৮
ডি-৮	D-8	১৯৯৭, ১৫ জুন	– ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	০৮
এপেক	APEC	১৯৮৯, নভেম্বর	সিঙ্গাপুর	২১
জি-৭৭	G-77	১৯৬৪, ১৫ জুন	–	১৩২
ওইসিডি	OCD	১৯৬১, ৩০ সেপ্টেম্বর	প্যারিস, ফ্রান্স	৩৪
সিরডাপ	CIRDAP	১৯৭৯, ৬ জুলাই	ঢাকা, বাংলাদেশ	১৫
ওপেক	OPEC	১৯৬০, ১৪ ডিসেম্বর	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	১২
রেডক্রস	RED CROSS	১৮৬৩, ৯ফেব্রুয়ারি	জেনেভা,সুইজারল্যান্ড	১৮৮
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	AMNESTY INT.	১৯৬১,	লন্ডন, যুক্তরাজ্য	১৫০
রোটারি ইন্টারন্যাশনাল	ROTARY INT.	১৯০৫২ফেব্রুয়ারি	শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র	১৮৯
বয় স্কাউট	BOY SCOUT	১৯০৭	জেনেভা	১৬১
ক্যারিবিয়ান অর্গানাইজেশন	CARIBIAN ORG	১৯৬১	–	০৪
ইএসআর ও	ESRO	১৯৬৪	–	০৯
আসপাক	ASPAC	১৯৬৬	–	০৯
ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সমন্বয় সংগঠন	UC	১৯৯৫, ১ জানুয়ারি	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	৫৫
এএপিপি	AAPP	১৯৯৯, ৪ সেপ্টেম্বর	ঢাকা, বাংলাদেশ	৪০
ইন্টারপোল	INTER POLL	১৯২৩	ফ্রান্স, প্যারিস	১৯০
এশিয়া সহযোগিতা সংস্থা	ACD	২০০২,১৮ জুন	-	৩১
গ্রিন পিস	-	১৯৭১	আমস্টারডম, নেদারল্যান্ড	৩৬

বিখ্যাত সামরিক অভিযান

পরিচালিত অপারেশন	পরিচালিত অপারেশনের সন	কেন পরিচালিত হয়
অপারেশন সার্চলাইট	২৫ মার্চ, ১৯৭১	তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পাক শাসনের গদ বেড়াজালে রাখা এবং পাকিস্তান সেনাশাসক ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকবাহিনী আকস্মিকভাবে বাঙ্গালিদের উপর বর্বর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।
অপারেশন মাল্লা	২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধনের পর ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা পরিচালিত হয়।
অপারেশন সি এঞ্জেল	২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	কক্সবাজার সহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লাখ মানুষ মারা যায় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে 'অপারেশন সি এঞ্জেল' নামে মার্কিন টাস্কফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অপারেশন ক্লিন হার্ট	১৬ অক্টোবর, ২০০২	বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান 'সন্ত্রাস ও নাশকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করে দেশে শান্তি ও ১৩ জানুয়ারি, ২০০৩ (৮৭দিন স্বস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌথ-বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হয়।
অপারেশন জিঞ্চি উদ্ধার	১৩ মার্চ, ২০০১	ড্যানিশ প্রতিষ্ঠান ক্যাপম্যাক্রো ইন্টারন্যাশনালের তিন প্রকৌশলীকে রাঙামাটির নানিয়ারচর বেতছড়ির গুলিয়াপাড়ার উপজাতীর সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। ৩ মার্চ অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৬ মার্চ রাতে সেনা কমান্ডোদের ঝটিকা অভিযানে উদ্ধার হয়।
অপারেশন পুশ ব্যাক	১৯৯২ এর আগস্ট	ভারত সরকার কর্তৃক জবরদস্তিমূলক একতরফাভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর একটি অপচেষ্টা।
অপারেশন হাস্কি	১৯৪৩ সালের জুলাই	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইতালির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের যৌথ অভিযান।
অপারেশন রেস্টোর হোপ	১৯৯২	সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে সেখানে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে এবং দুঃস্থ ও পীড়িতদের খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান চালায়।
অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম	১৯৯১	ইরাক আকস্মিকভাবে কুয়েত দখলে নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটানোর জন্য পরিচালিত হয়।

অপারেশন ডেজার্ট ফক্স	১৯৯৮,১৬ ডিসেম্বর	ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের সাংকেতিক নাম। এই অভিযান ৪ দিন পরিচালিত হয়।
অপারেশন সি লায়ন	সেপ্টেম্বর, ১৯৪০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের ওপর আগ্রাসী জার্মানির সামরিক অভিযানের নাম।
অপারেশন সাসাইন	১৭ অক্টোবর, ১৯৯৫	শ্রীলংকার সরকার কর্তৃক তামিল গেরিলাদের ওপর পরিচালিত হয়।
অপারেশন লিপ	৮ জানু, '০৩ শান্তিচুক্তি	শ্রীলংকার ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক স্বাধীনতাকামী তামিলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। স্বাক্ষরিত হয় ১৯ এপ্রিল ২০০৩ যুদ্ধ বিরত লঙ্ঘন করে।
অপারেশন বারবারোস	২২ জুন, ১৯৪১	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রাশিয়ার ওপর আগ্রাসী জার্মানির বিরুদ্ধে অভিযান হয়।
গ্যালিলিও পিস	৬ জুন, ১৯৮২	আধিপত্যবাদী ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক লেবাননে পরিচালিত হয়।
এনডিউরিং ফ্রিডম	১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১	যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার ও তালেবান মিত্র ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।
অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম	২০ মার্চ, ২০০৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।
অপারেশন রেড ডন	১৪ ডিসেম্বর, ২০০৩	সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারের জন্য মার্কিন বাহিনীর যৌথ বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন নাগামি ড্রাগন	১৯৭৮	রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সরকার কর্তৃক অভিযান।
অপারেশন পি.জে.	১৯৯১	রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সরকার কর্তৃক অভিযান।
অপারেশন রেসকিউ	১৯৪৭-৪৮	জুম্মু ও কাশ্মীরে উপজাতীয়দের হানা। স্থল ও বিমান বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় সে অধিকার মুক্ত হয়।
অপারেশন পোলো	১৯৪৮	পাঁচ দিনের মধ্যে নিজামকে পরাজিত করে হায়দ্রাবাদ উদ্ধার করা হয়।
অপারেশন ব্লু স্টার	৫ জুন ১৯৮৪	খালিস্তানে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন ব্লাক থান্ডার	১-৩০ এপ্রিল, ১৯৮৬	স্বর্ণ মন্দির দখল মুক্ত করার জন্য।
অপারেশন ব্লাক থান্ডার	২-১২ মে, ১৯৮৮	স্বর্ণ মন্দির দখল মুক্ত করার জন্য।
অপারেশন মেঘদূত	১৯৮৪	পাকিস্তানী আগ্রাসন মোকাবিলায় পরিচালিত।
অপারেশন পুসালাই	১৯৮৭-৯০	শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপ। প্রথমে খাদ্য সাহায্য পরে সামরিক সাহায্য।
অপারেশন ক্যাকটাস	৩ নভেম্বর, ১৯৮৮	মালদ্বীপের ক্যাবিনেট কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছয় ঘন্টার মধ্যে জাহাজ উদ্ধার ও বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা হয়।
অপারেশন সফেদ সাগর	১৯৯৯	পাকিস্তান কর্তৃক আক্রমণ হওয়ার পর ভারত কারগিল উদ্ধারের জন্য এই অভিযান চালায়।

তথ্য কনিকায় ভূ-রাজনীতি

- ভূ-রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল ও রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
- আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অন্তঃসম্পর্কে ভূগোলের প্রভাব (মানুষ ও অবকাঠামোতে) সম্পর্কিত বিষয়ই ভূ-রাজনীতি।
- বৈদেশিক নীতিমালা পর্যালোচনা করার অন্যতম পদ্ধতি হলো ভূ-রাজনীতি।
- যেসকল ভৌগোলিক উপাদানসমূহ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে তা হলো:
  ক. রাষ্ট্রের অবস্থান, খ. রাষ্ট্রের আকৃতি, গ. জলবায়ু, ঘ. জনসংখ্যা, ঙ. প্রাকৃতিক সম্পদ, চ. প্রযুক্তিগত অগ্রসরতা/অগ্রগতি
- Living Space তত্ত্ব ভূ-রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখায়।
- Roudolf Kjellen হচ্ছেন একন সুইডিস ভূ-গোলবিদ। তিনি ভূ-রাজনীতি ও রাজনৈতিক ভূগোলের মধ্যে পার্থক্য দেখান।
- ভূ-রাজনীতির অবসানের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের সম্পদরাজি/শক্তি কীভাবে রাষ্ট্রকে পরাক্রমশালী করতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করা।
- মধ্যপ্রাচ্যকে বলা হয় বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।
- দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র যদি তাদে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক কোন জোট, ঐক্য বা সহযোগিতা গড়ে তোলে তাহলে সেটা ভূ-রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।
- EU, ASEAN, SAARC, BENELUX ইত্যাদি ভূ-রাজনীতির ফলে গড়ে উঠেছে।
- উপনিবেশিক শাসন ভূ-রাজনীতির প্রত্য ফলাফলের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ফরাসি ভূ-রাজনীতি মানব জাতির কর্মের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বহুরূপী অঞ্চল বিবর্তনে বিশ্বাসী।
- রাশিয়ান ভূ-রাজনীতি ইউরোপ ও এশিয়া ঐতিহ্যে কেন্দ্রীভূত এবং নিজের মত প্রদর্শনে সদা সচেষ্ট।
- Non Interventionism হচ্ছে রাজনীতির সেই নীতি যেখানে রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জোট এড়াতে চায় যাতে নিজেকে কোন যুদ্ধে জড়াতে না হয়।
- Meta-geopolitics হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে একটি বহুমাত্রিক সম্পর্ক।
- বন্যাস নির্ধারিত হবে বিজিত ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। Friedfrch Ratgel তাই রাষ্ট্রকে জৈবিক সত্তার সাথে তুলনা করেছেন থাকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।
- ভূগোল ও রাজনীতির সম্পর্ক নির্ধারনের উপদানগুলো হল Political Power, Political action ও Geogrphical setting.
- মন্টেস্কু- (Montesquieu) দার্শনিক ভূগোল ও আবহাওয়াকে রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান নির্নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেন।
- Friedrich List হচ্ছেন একজন ভূ-রাজনীতি বিশারদ। List এর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম The Natural System of Political Economy (১৮৪০).
- ভূ-রাজনীতি বিষয়ে Friedrich List এর বিখ্যাত তত্ত্বের নাম Living Space বা Lebensraum.
- মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এত বেশি কারণ স্থল, নৌ, ও বিমান এ তিন পথেই বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র পথ মধ্য প্রাচ্য।
- মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব একটি কারণ হচ্ছে বিপুল তৈল সম্পদ; অন্য একটি কারণ সুয়েজ খাল নৌপথে যোগাযোগ মূল পথ। অন্য আরেকটি কারণ হচ্ছে পারস্য উপসাগর।
- পারস্য উপসাগর কৌশলগত গুরুত্ব বেশি কারণ এটি তৈলবাহী জাহাজ চলাচলের একমাত্র পথ।
- পারস্য উপ-সাগর ইরানের দখলে।
- মধ্যপ্রাচ্য ১৯৭৩ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে তৈল অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল।
- বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল রাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে টিকিয়ে রাখতে চায় কারণ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে সেখানে মার্কিন ঘাটি প্রয়োজন।
- বিশ্বের মোট মজুদ তেল সম্পদের ২৫% অবস্থিত সৌদি আরবে। সৌদি আরবের বৃহত্তম তৈল কোম্পানি পাওয়ার।
- হরমুজ প্রণালী অবস্থিত ওমান সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে গোলান মালভূমি মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘাতের কারণ।

http://thejobstudy.com Go to Contents

- দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এখানে চীন ও ভারতের মত শক্তিশালী ও পারমানবিক শক্তিধর দেশের সীমান্ত রয়েছে।
- ভারত মহাসাগর কৌশলগত দিক থেকে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারত মহাসাগরের উপর ভারতের কর্তৃত্ব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সহ চীন ও অন্যান্য পরাশক্তিগুলো ভারত মহাসাগরের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল কাশ্মির নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে। চীন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। ভারতের মোকাবেলায় চীন বাংলাদেশকে তাদের বলয়ে নিতে আগ্রহী। ভারত এ ব্যাপারে সতর্ক। বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপে এ কারণেই চীন গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করতে চায়।

বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (Geographical Characteristics of Bay of Bengal)

- বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশ স্বাদু পানি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। কারণ এই অংশে বৃহৎ কিছু নদী যেমন: গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ইরাবতী, গোদাবারী, কৃষ্ণ ইত্যাদির পানি প্রবাহিত হয় বঙ্গোপসাগরে। প্রায় ১,২২২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি রিলিজ করে।
- বঙ্গোপসাগরের উপরিভাগের পানির গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৮০c। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০০ c (মে মাসে) এবং সর্বনিম্ন ২৫০ c (জানুয়ারি -ফেব্রুয়ারিতে)।
- বঙ্গোপসাগরের খোলা অংশের লবনাক্ততা ৩২%-৩৪.৫% (PPT বা Parts per Thousand) গড় লবনাক্ততা ৩৫ PPT।
- বঙ্গোপসাগরের পানির স্বচ্ছতা খুবই বেশি (৪০-৫০মি)।
- বঙ্গোপসাগরের স্রোত ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে এবং ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘোরে অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- বঙ্গোপসাগরের তলদেশে একটি ফিয়েচার আছে যার নাম জাভা ট্রেঞ্চ (Java Trench) এবং এটি ভূমিকম্প ঘটাতে বেশি ভূমিকা রাখে।

বঙ্গোপসাগরের সম্পদ (Resources of Bay of Bengal)

- বঙ্গোপসাগরের আলাদা কিছু Marine ecosystem আছে উত্তরাংশে যেখানে রয়েছে জলাশয়, বিল ও ম্যানগ্রোভ যেগুলো মাছ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী স্থান।
- বাণ্ডসরিকভাবে যে চিংড়ি ধরা হয় তা থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। আরও নানান রকমের মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের সুষম খাদ্যের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়ায়।
- বঙ্গোপসাগর থেকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার করা যায়।
- এখানের হাইড্রোকার্বন সম্পদ খুবই উপকারী।
- বঙ্গোপসাগরের অন্যতম একটা সম্পদ হচ্ছে পে-ছার ডিপসিট (Placer Deposit)। যেমন টাইটানিয়ামের পে-ছার ডিপসিট।
- ভারী খনিজ বালু (Heavy Mineral Sand) পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগরে যার প্রধান উপাদান হচ্ছে ইলমেনাইট, গারনেট, জিরকন, এবং ম্যাগনেটাইট (Ilmenite, Garnet, Zircon, Rutile and Magnetite)।

আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কুটনীতি

- বিগত ১০০ বছরে সমুদ্রে পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বেড়েছে।
- CFC এর পূর্ণরূপ– Chloro-Flore-Carbon
- জাতিসংঘে ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সপ্তম লক্ষ্য ছিল– জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সপ্তম লক্ষ্যে ছিল 'টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ'।

- ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়েটো প্রটোকল অনসমর্থিত হলেও কাজাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃক দুটি দেশ দ্বারা প্রটোকল অনসমর্থিত হয় নি।
- টেকসই উন্নয়ন- টেকসই উন্নয়ন কথাটি পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি আধুনিক ধারণা। মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষা অব্যাহত রাখাকে টেকসই উন্নয়ন বলে।
- IPCC -এর পূর্ণরূপ Intergovernmental Panel on Climate Change বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল।
- পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বায়ুমন্ডলে গ্রীণহাউজ গ্যাস পুঞ্জিভবনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে বলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- টেকসই উন্নয়ন কিসের উপর নির্ভর করে সম্পদের ভিত্তি, টেকসই ভোগের স্তর এবং টেকসই উৎপাদনের উপর।
- বাংলাদেশে পানির উৎস তিনটি। যথা- (ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি (খ) ভূ-নিম্নস্থ পানি (গ) বৃষ্টির পানি
- COP এর পূর্ণরূপ- Conference of the Parties
- BCCAPN Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
- CDM -Clean Development Mechanism\
- SADKN এর পূর্ণরূপ-South Asian Disaster Knowledge Network.
- BDKN এর পূর্ণরূপ-Bangladesh Disaster Knowoledge Network.
- CASE এর পূর্ণরূপ- Clean Air Sustainable Environment.
- গ্রিণ হাউজ ইফেক্ট এর পরিণতি হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি।
- জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমন্ডলে CO_2 এর ফলে গ্রিণ হাউজ গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাসেল কনভেনশনের পুরো নাম-Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
- জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত রূপরেখা কনভেশন-বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোকাবিলায় জাতিসংঘ কনভেনশন।
- কিয়োটো প্রটোকল হলো-ভূমন্ডলের তাপবৃদ্ধি ও আবহাওয়া মন্ডলের পরিবর্তন রোধ বিষয়ক প্রটোকল।
- কিয়োটো প্রটোকল ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭; কিয়োটা, জাপান (কার্যকর হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)গৃহীত হয়।
- কিয়োটো প্রটোকলের পুরো নাম হচ্ছে- Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
- কার্টাগেনা প্রটোকল হলো-জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার করা পরিমার্জিত প্রাণের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রটোকল। অর্থাৎ জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল।
- ভিয়েনা কনভেনশন ২২ মার্চ ১৯৮৫; ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (কার্যকর হয় ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮) গৃহীত হয়। ভিয়েনা কনভেনশনের পুরো নাম Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer ।
- গ্রিন পিস পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ।
- জীববৈচিত্র সংক্রান্ত কনভেনশন ৫ জুন ১৯৯২; রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল, ব্রাজিল (কার্যকর হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩) স্বাক্ষরিত হয়। জীববৈচিত্র সংক্রান্ত কনভেনশন জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষন, এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার বিষয়ক কনভেনশন।
- ধরিত্রী সম্মেলন রিওডিজেনিরিও শহরে অনুষ্ঠিত হয়। "ধরিত্রী সম্মেলন"-এ ১৭৯ দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন জোয়ান্সবার্গে অনুষ্ঠিত হয়।
- মন্ট্রিল প্রটোকলের পুরো নাম Monntreal Protocol on Substance that Deplete the Ozone Layer; এটি বায়ুমন্ডলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষা বিষয়ক প্রটোকল। এটি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭; মন্ট্রিল, কানাডা (কার্যকর হয় ১ জানুয়ারি ১৯৮৯) গৃহীত হয়।

- বাসেল কনভেনশন হল বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কনভেনশন। এটি ২২ মার্চ ১৯৮৯; রাসেল, সুইজারল্যান্ডের (কার্যকর হয় ৫ মে ১৯৯২) গৃহীত হয়।
- বাসেল কনভেনশনের পুরো নাম Vasel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. \
- জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত রূপরেখা কনভেনশন বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোকাবিলায় জাতিসংঘ কনভেনশন। জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত রূপরেখা কনভেনশনের পুরো নাম United Nations Framework Convention on Climate Change.
- কিয়োটা প্রটোকল ভূমন্ডলের তাপবৃদ্ধি ও আবহাওয়ামন্ডলের পরিবর্তন রোধ বিষয়ক প্রটোকল। এটি ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭; কিয়োটা, জাপান (কার্যকর হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫) গ্রহীত হয়। কিয়োটা প্রটোকলের পুরা নাম Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Changte.
- কিয়োটা প্রটোকল, ১৯৯৭ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত একটি চুক্তি।
- কার্টাগেনা প্রটোকল জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা পরিমার্জিত প্রাণের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রটোকল। অর্থাৎ জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল। এটি ২৯ জানুয়ারি ২০০০; মন্ট্রিল, কানাডা (কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩) গৃহীত হয়। এ প্রটোকলের পুরো নাম Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diverity.
- ইউরোপিয়ান পরিবেশ এজেন্সি (EEA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯০ সালে (কার্যকর ১৯৯৩ সালে)। এর কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯৪ সালে (সদর দপ্তর কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক)
- বিশ্ব জলবায়ু কনফারেন্স- এর আয়োজক বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) সংস্থা।
- জাতিসংঘের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ২০১৬ ওয়ারশ অনুষ্ঠিত হবে।
- ২০০৭ সালের বিশ্ব পরিবেশবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কিয়োটোয়।
- ই-৮ পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ।
- এজেন্ডা ২১, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত একটি দলিল।
- গ্লোবাল ফোরাম বলতে ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনের সমান্তরালভাবে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত এনজিওদের সম্মেলন বোঝায়।
- 'ইকোলজি' গ্রিক ভাষার শব্দ। 'ইকোলজি' শব্দটি জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল (Ernst Heckle); ১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন।
- পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সমন্ধীয় বিদ্যাকে ইকোলজি বলে।
- 'গ্রিক হাউস ইফেক্ট' বলতে তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি বোঝায়। 'গ্রিণ হাউস প্রভাব' কথাটা প্রথম সুইডিশ রসায়নবিদ সোভনটে আরহরিণয়াস, ১৮৯৬ সালে ব্যবহার করেন।
- গ্রিন হাউস ইফেক্ট এর পরিণতি তাপমাত্রা বৃদ্ধি। গ্রিণ হাউজ প্রতিক্রিয়া ঘটার জন্য মানুষ দায়ী।
- CO, H_2S, N_2O গ্রিক হাউস গ্যাস। গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড থাকে।
- গ্রিণ হাউস গাছপালা জন্মানোর জন্য তৈরি করা হয়।
- গ্রিণ হাউস প্রতিক্রিয়া এ দেশের জন্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এর ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে। গ্রিণ হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে বন্যা বেশি হতে পারে।
- আগামী ৪৪০ বছরের মধ্যে এন্টার্কটিকা মহাদেশের সব বরফ গলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- সি-এফ-সি গ্রিন হাউস ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক।
- 'গ্রিন হাউস এফেক্ট'-এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে যে মারাত্মক ক্ষতি হবে তা হলো উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে।
- গ্রিন হাউসে গাছ লাগানো হয় অত্যধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য।
- জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিণ হাউজ গ্যাসের পরিমান

সবেচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিন হাউজ প্রভাবের মাধ্যমে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটির ভূমিকা সর্বোচ্চ।

- গ্রিন হাউস প্রভাব কানাডার জন্য সাফল্য বয়ে আনবে।
- বায়ুমন্ডলের ওজনোস্ফিয়ার স্তরে সবচেয়ে বেশি ওজোন পাওয়া যায়। ওজোন স্তরের ক্ষয় হল ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
- ওজোন স্তরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস। ওজোন স্তরে ছিদ্র সৃষ্টির করা বিজ্ঞানীরা কবে প্রথম ১৯৮৩ সালে জানতে পারেন।
- নিত্য ব্যবহার্য বহুল 'এরোসোলের' কৌটায় এখন লেখা থাকে 'সিএফসি' বিহীন। সিএফসি গ্যাস ওজন স্তরে ফুটো সৃষ্টি করে ক্ষতি করে।
- Chlorofluro Carbon Prof. T. Midgley আবিষ্কার করেন। বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তর অবক্ষয়ে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাসটির ভূমিকা সর্বোচ্চ।
- Stratosphere- এ ওজোন হ্রাসের কারণ CFC থেকে উৎপন্ন CI এর বিক্রিয়া। ক্লোরিন গ্যাসটি ওজোন গ্রাসকে ভাঙ্গতে সাহায্য করে।
- বায়ুমন্ডলের ওজোন উপাদান অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে। সিএফসি বায়ুমন্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরের ক্ষতি করছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের পানীয় জলে আর্সেনিক/ প্রতি লিটার ০.০৫ মিলিগ্রামে পরিমাণের বেশি হলে তা পান করার দূষন সমস্যাকে হিপোক্রিটাস চিহ্নিত করেন।
- বায়ু দূষণের জন্য CO গ্যাস দায়ী। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কার্বন ডাই-অক্সাইড।
- ডিজেল জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে আসে। প্রতিদিন গড়ে ১২০ কোটি পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশে।
- মাটি পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার।
- গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কার্বন মনোঅক্সাইড বিষাক্ত গ্যাস থাকে।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান নিরায়ক বায়ু, পানি, গাছপালা। মানুষ ও প্রকৃতি উপর পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে।
- প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হবার দুটি উপায় বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস।
- লা নিনা স্পেনীয় ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা দূরন্ত বালিকা অর্থে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা বুঝায়।
- সুনামি (Tsunami) - এর কারণ হলো সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প।
- মেরু অঞ্চলের বরফ অবমুক্ত হলে পৃথিবীর ৪০ শতাংশ মানুষের দূর্ভোগ বাড়বে।
- পৃথিবী উষ্ণায়নের ফলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মোট জনসমষ্টির ২০ শতাংশ অধিবাসীর সরাসরি ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দেবে।
- জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে বিশ্ব তাদের উৎপাদিত শস্যের বাড়তি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে।
- জাতিসংঘের তথ্য মতে, আগামী ৫০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে।
- জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘতর হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া।
- জাতিসংঘের তথ্য মতে, আগামী ৫০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে।
- ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়ার ১০০ কোটি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
- বাংলাদেশের বার্ষিক পার ক্যাপিটা গ্রিন হাউজ দূষন-০.৯০।
- বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা সবচেয়ে বন্যা কবলিত দেশ বাংলাদেশ।
- দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিনে চার স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের মধ্যে বায়ুর দূষণ দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের বেশি।
- পরিবেশের শব্দ দূষণ দূষণের ফলে প্রধানত উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে।

http://thejobstudy.com
Go to Contents

বিশ্ব রাজনীতিতে সংঘাত সৃষ্টিকারী নদ-নদী

- **গঙ্গা :** বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বড় দ্বন্দ্ব এই গঙ্গার পানি নিয়ে। বাংলাদেশের পুরো উত্তরাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা এই গঙ্গার পানির ওপর নির্ভরশীল। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে তার সীমান্তের সামান্য ভিতরে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে শুকনো মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ১৯৯৬ সালে ৩০ বছর ব্যাপী গঙ্গা পানি চুক্তির পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।
- **নীল নদ :** পৃথিবীর দীর্ঘতম এ নদটি ১০টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মিসরের সামগ্রিক পানি চাহিদার ৯৭ শতাংশ মিটে থাকে নীল নদের পানি দিয়ে। ইতোমধ্যে নীল নদের পানি নিয়ে উজানের দেশসমূহ-সুদান, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া ও জায়ারের মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেছে।
- **রিও গ্রেনডে :** দীর্ঘ খরার পর এ নদীর পানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে দ্বন্দ্ব চলছে। মেক্সিকো তার অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য আরও পানি চাচ্ছে। আর এর বিরোধিতা করছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকরা।
- **সিন্ধু :** পাকিস্তান প্রধানত এই নদটির ওপরই নির্ভরশীল। সিন্ধুর দু'টি উপনদী প্রবাহিত হচ্ছে ভারতের মধ্য দিয়ে। ভারতের শস্যভান্ডার বলে পরিচিত পাঞ্জাবের কৃষি ক্ষেত্রের জন্য এই নদের পানি অপরিহার্য। এ নদের পানি নিয়ে দু' দেশের মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব।
- **ব্রহ্মপুত্র :** এ নদের পানি নিয়েও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ চলছে। ভারত উজানে ফারাক্কার মতো বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা করছে বলে শোনা যাচ্ছে।
- **জর্দান :** এ নদীটি প্রবাহিত হয়েছে জর্দান, সিরিয়া, ইসরাইল আর লেবাননের মধ্যে দিয়ে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইসরাইল যে ভূখণ্ড দখল করে নেয় সেখান দিয়ে প্রবাহিত এ নদী থেকেই তাদের পানির পুরো চাহিদার ৪০ শতাংশ মিটে যায়। বর্তমানে শান্তি আলোচনায় যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণও অংশত এই পানির ব্যবহার নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে যায়।
- **টাইগ্রীস-ইউফ্রেটীস :** তুরস্ক সিরিয়া আর ইরাক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ৩৩টি বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তুরস্ক দু'টি নদীর ওপরই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাটির দেশ সিরিয়া ও ইরাকের কৃষি সম্পূর্ণই নির্ভরশীল ইউফ্রেটীস নদীর পানির ওপর। এর মধ্যে আবার সিরিয়া এ নদীর পানি আটকে তার সেচ পদ্ধতি জোরদার করতে চাইছে। সে রকম হলে আরও বেশি সমস্যায় পড়ে যাবে ইরাক।
- **মেকং :** লাওস, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিককালের দ্রুত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এ নদীটিকে পারস্পরিক বিরোধের বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে।
- **জাম্বেসী :** জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আরও ক'টি দেশ এ নদীর পানি ব্যবহার করে থাকে। এই সব ক'টি দেশেই লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, সে কারণে একই হারে বাড়ছে তাদের পানির চাহিদা। এর মধ্যে আবার দক্ষিণ আফ্রিকা পরিকল্পনা করছে নদীর পানির দিক পরিবর্তনের। তাদের পরিকল্পনা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে অন্য দেশগুলোকে।

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

চুক্তির নাম	স্বাক্ষরের তারিখ	স্বাক্ষরের স্থান	চুক্তির পক্ষসমূহ
ভার্সাই চুক্তি (প্রথম)	১৭৮০	ভার্সাই, ফ্রান্স	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
প্যারিস চুক্তি	১৮১৪	-	ফ্রান্স ও ব্রিটেন।
ভার্সাই চুক্তি (দ্বিতীয়)	১৯১৯	ভার্সাই, ফ্রান্স	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি ও জার্মানী।
মুনিখ চুক্তি	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮	-	জার্মানী, ইটালী, বৃটেন ও ফ্রান্স।
বৃটন উডস চুক্তি	জুলাই, ১৯৪৪	নিউহ্যাম্পশ, যুক্তরাষ্ট্র	বিশ্বের ৪৪টি দেশ।
জেনেভা কনভেনশন	১২ আগস্ট, ১৯৪৯	-	বিশ্বের ৫৮টি দেশ।
জেনেভা চুক্তি	২০ জুলাই, ১৯৫৪	-	ফ্রান্স ও ভিয়েতনাম।
তাসখন্দ চুক্তি	১০ জানুয়ারী, ১৯৬৬	তাসখন্দ, উজবেকিস্তান	ভারত ও পাকিস্তান।
হট লাইন চুক্তি	২০ জুন, ১৯৬৩	-	যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
মহাশূন্য চুক্তি	১০ অক্টোবর, ১৯৬৭	-	বিশ্বের ১০৩টি রাষ্ট্র।
পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি	১৯৬৮	-	বিশ্বের ১৩৮টি দেশ।
বুন-জার্মান চুক্তি	৭ অক্টোবর, ১৯৭০	-	জার্মানী ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
সল্ট্রাস পারমাণবিক অস্ত্রসীমিতকরণ চুক্তি	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১	-	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি	৯ আগস্ট, ১৯৭১		ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি	১৯ মার্চ, ১৯৭২	নয়াদিল্লী, ভারত	বাংলাদেশ ও ভারত।
সল্ট-১ চুক্তি	২৭ মে, ১৯৭২	-	যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
সিমলা চুক্তি	৩ জুলাই, ১৯৭২	সিমলা, ভারত	ভারত ও পাকিস্তান।
প্যারিস শান্তি চুক্তি	১৯৭৩	প্যারিস, ফ্রান্স	যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	১৭ নভেম্বর, ১৯৭৮	ক্যাম্প ডেভিড	ইসরাইল এবং মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সল্ট-২ চুক্তি	১৮ জুন, ১৯৭৯	-	যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
অস্ত্র হ্রাস চুক্তি	১৯৮০	-	বিশ্বের ১৩৮ রাষ্ট্র।
ভারত-শ্রীলংকা শান্তি চুক্তি	২৯ জুলাই, ১৯৮৭	নয়াদিল্লী, ভারত	ভারত ও শ্রীলংকা।
মাঝারি পাল্লার অস্ত্র বিরোধ চুক্তি	৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
নামিবিয়া চুক্তি	১৯৮৮	ব্র্যাজভিল, কঙ্গো	কিউবা, এঙ্গোলা ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
ম্যাসট্রিচট চুক্তি	১৯৯২	-	বিশ্বের ১২টি ইউরোপীয় দেশ।
জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন চুক্তি	১৪ জুন, ১৯৯২	-	বিশ্বের ১৭৮ দেশ।
স্টার্ট-২ চুক্তি	৩ জানুয়ারী, ১৯৯৩	মস্কো, রাশিয়া	যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।
ফিলিস্তিন-ইসরাইল স্বীকৃতি চুক্তি	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানইজেশন
গ্যাট চুক্তি	১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪	মারকোশো (মরক্কো)	বিশ্বের ২৫টি দেশ।
বসনিয়া মুসলিম-ক্রোট ফেডারেশন চুক্তি	১ নভেম্বর, ১৯৯৫	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।
পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি	৪ মে, ১৯৯৪	-	পিএলও ও ইসরাইল।
চীন-জাপান পারমাণবিক নিরাপত্তা চুক্তি	৬ মে, ১৯৯	-	চীন ও জাপান।
বেইজিং-সিউল চুক্তি	৩১ অক্টোবর, ১৯৯৪	-	চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া।
ডেটন চুক্তি (বসনিয়া শান্তি চুক্তি)	২৩ নভেম্বর, ১৯৯৫	যুক্তরাষ্ট্র	বসনিয়া হারজেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া ও সর্বিয়া।
পরমাণু অস্ত্র বিলোপ চুক্তি	২৫ মার্চ, ১৯৯৬	-	ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি	১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬	দিল্লী, ভারত	বাংলাদেশ, ভারত।
হেবরন চুক্তি	১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৭	ইরেজক্রিস	ইসরাইল ও ফিলিস্তিন।
বুশ-মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রসীমিতকরণ চুক্তি	১৯৯৯	-	রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র
পিয়ংইয়ং চুক্তি	জুন, ২০০০	পিয়ংইয়ং, উ: কোরিয়া	উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।
ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া শান্তিচুক্তি	১২ ডিসেম্বর, ২০০০	আলজিয়ার্স	ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া।

এক নজরে বিশ্বের প্রধান ধর্ম, প্রবর্তক ও ধর্মগ্রন্থ

ধর্ম	প্রবর্তক	ধর্মগ্রন্থ	প্রার্থনা কেন্দ্র	পবিত্র স্থান
মুসলমান	হযরত মুহাম্মদ (স:)	কুরআন	মসজিদ	মক্কা ও মদীনা
খ্রিস্টান	যিশু খ্রিস্ট	বাইবেল	গির্জা	জেরুজালেম
হিন্দু	আর্য ঋষিগণ	বেদ	মন্দির	গয়া-কাশী
বৌদ্ধ	গৌতম বুদ্ধ	ত্রিপিটক	প্যাগোডা	বুদ্ধ গয়া
ইহুদি	হযরত মুসা (আ:)	তাওরাত	সিন্যাগোগ	জেরুজালেম
শিখ	গুরু নানক	গ্রন্থসাহেব	গুরুদুয়ারা	অমৃতসর

এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ

যুদ্ধের নাম	সাল	জয়লাভ	বিরুদ্ধে
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ	১৭৭৬-৮৩	১৩টি রাজ্য	ব্রিটেন
আমেরিকান গৃহ যুদ্ধ	১৮৬১-৬৫	১১ উত্তরাঞ্চলের রাজ্যসমূহ	১১ দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ
আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (৪বার)	১৯৪৮-৪৯, ৫৬, ৬৭ ও ৭৩ইসরাইল		আরব দেশসমূহ -মিশর সিরিয়া, জর্দান
চীন-জাপান যুদ্ধ (৩ বার)	১৮৯৪-৯৫	জাপান	চীন
	১৯৩১-৩৩	জাপান	চীন
	১৯৩৭-৪৫	চীন	জাপান
ইংল্যান্ডের সিভিল যুদ্ধ	১৬৪২-৫১	আইনসভা	প্রথম চার্লস
ক্রিমিয়ান যুদ্ধ	১৮৫৩-৫৬	ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্যার্ডিনা, তুরস্ক	রাশিয়া
শতাব্দির যুদ্ধ	১৩৩৭-১৪৫৩	ফ্রান্স	ইংল্যান্ড
কোরিয়ান যুদ্ধ	১৯৫০-৫৩	দ: কোরিয়া ও জাতিসংঘের সৈন্য	উত্তর কোরিয়া এবং চীনের সৈন্যসমূহ
মেক্সিকান-আমেরিকান যুদ্ধ	১৮৪৬-৪৮	যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো
নেপোলিয়ান যুদ্ধ	১৭৯২-১৮১৫	অষ্ট্রিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়া, স্পেন ও সুইডেন্ফ্রান্স	
অপিয়াম যুদ্ধ	১৮৩৯-১৮৪২	ব্রিটেন	চীন
পেলোপ্যানীশনের যুদ্ধ	৪৩১-৪০৪ খ্রীষ্টপূর্ব	স্পার্টা পরিচালিত পেলো প্যানীশনলীগ	এথেন্স পরিচালিত দেলিয়ানলীগ ক্যারথ্যাজ
রুশ-জাপান যুদ্ধ	১৯০৪-০৫	জাপান	রাশিয়া
সাতবৎসরের যুদ্ধ	১৭৫৬-৬৩	ব্রিটেন, প্রাগ ও হাভানা	অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও রাশিয়া
স্পেনীয় উত্তরাধিকারী যুদ্ধ	১৭০১-১৪	ইংল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাগ ও হল্যান্ড	ফ্রান্স, ব্যাভারিয়া, ম্যানটুয়া ও স্যাভয়
ভিয়েতনাম যুদ্ধ	১৯৫৭-৭৫	উত্তর ভিয়েতনাম	দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্র
অষ্ট্রিয়াবাসীর উত্তরাধিকারী যুদ্ধ	১৭৪০-৪৮	অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ব্রিটেন, হল্যান্ড	ব্যাভারিয়া, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, প্রুশিয়া, স্যারডিনা, স্যাক্সোনি ও স্পেন
আফগানিস্তান যুদ্ধ	২০০১	বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	আফগানিস্তান
ইরাক যুদ্ধ	২০০৩	বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ইরাক

এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাসভবন

বাসভবন	অবস্থান	যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়
নিরাপদ ভবন	নয়াদিল্লী, ভারত	ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন
ইকোলজি হাউজ	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রোসফট মালিক বিল গেটসের বাসভবন
বাকিংহাম প্যালেস	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের রাজা ও রাণীর সরকারী বাসভবন
ব্লু-হাউস	সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া	দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
রিপাবলিক প্যালেস	বাগদাদ, ইরাক	সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সরকারি বাসভবন।
এলিসি প্রাসাদ	প্যারিস, ফ্রান্স	ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
প্যাসেলিও দ্য নারিনো	বোগোতা, কলম্বিয়া	কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
উইন্টার প্যালেস	সেন্টপিটার্সবার্গ, রাশিয়া	সাবেক জারদের শীতকালীন অবকাশ কেন্দ্র।
দ্য নিউ স্টেট হাউস	মালাবি	মালবির প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
ক্রেমলিন	মস্কো, রাশিয়া	রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
বালমোরাল প্যালেস	স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের রাজা ও রাণীর স্কটল্যান্ডের সরকারী বাসভবন।
হোয়াইট হাউজ	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
বে-য়ার হাউস	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অতিথি বাসভবন।
পাপেল প্যালেস	ভাটিক্যান সিটি	পোপের বাসভবন।
টেম্পল ট্রি	কলম্বো, শ্রীলংকা	শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
মারদেকা প্রাসাদ	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
বোগোর প্রাসাদ ভবন।	ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মকালীন সরকারি বাস-
নারায়ণ হিতি প্রাসাদ	কাঠমণ্ডু, নেপাল	নেপালের রাজার সরকারি বাসভবন।
মালকানাহ প্রাসাদ	ম্যানিলা, ফিলিপাইন	ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন।
১০নং ডাউনিং স্ট্রিট	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর পূর্বকালীন সরকারী বাসভবন। বর্তমানে অর্থমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
১১নং ডাউনিং স্ট্রিট	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সরকারী বাসভবন।

এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থাপনা

স্থাপনার নাম	অবস্থান	যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়
ফ্রিডম হাউস	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের স্থানে প্রস্তাবিত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন।
দ্য পিলার অব শেইম	হংকং	১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রের দাবিতে তিয়েনমেন স্কোয়ারে গণহত্যার স্মৃতিস্তম্ভ।
হাগিয়া সোফিয়া	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	ইস্তাম্বুলের অন্যতম জাদুঘর।
ইন্ডিপেন্ডেন্স হল	যুক্তরাষ্ট্র	৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার স্থান।
আল হামরা প্রাসাদ	গ্রানাডা, স্পেন	মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন।
ভিয়েনার বার্গ	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত নাট্যশালা।
সিটি হল	জর্জটাউন, গায়ানা	গায়ানার বিখ্যাত মিলনায়তন।
ওয়েন সেসলাস স্কয়ার	প্রাগ, চেক রিপাবলিক	সোভিয়েত হতে মুক্তি সংগ্রামকারীদের স্মরণে স্মৃতিচারণক্ষেত্র।
হোয়াইট লজ	লণ্ডন, ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের রাজা অস্টম এডওয়ার্ডের জন্মস্থান।
বন্ড স্ট্রিট	লণ্ডন, ইংল্যান্ড	টেইলারিং ও জুয়েলারি দোকান।
ফ্লিট স্ট্রিট	লণ্ডন, ইংল্যান্ড	সংবাদপত্র প্রকাশনা কেন্দ্র।
ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে	লণ্ডন, ইংল্যান্ড	বিখ্যাত ব্যক্তি ও অজ্ঞাতনামা যোদ্ধাদের স্মরণে সমাধিক্ষেত্র।
বাংলা টাউন	লণ্ডন, ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের বাঙালী অধ্যুষিত আবাসিক এলাকা।

এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়সমূহ

কার্যালয়ের নাম	অবস্থান	যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়
জাতীয় সংসদ	ঢাকা, বাংলাদেশ	বাংলাদেশ সরকারের পার্লামেন্ট ভবন।
রাইটার্স/মহাকরণ বিল্ডিং	কোলকাতা, ভারত	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয়।
হায়দারাবাদ হাউস	নয়াদিল্লী, ভারত	ভারতের সভাকেন্দ্র।
সিংহ দরবার	কাঠমণ্ডু, নেপাল	নেপাল সরকারের সদর দপ্তর।
ওয়েস্ট মিনিস্টার	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ব্রিটিশ সরকারের পার্লামেন্ট ভবন।
হোয়াইট হল সাবেক বাসভবন)।	লন্ডন, ইংল্যান্ড	ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক সদর দপ্তর (রাণীর
মালবারো হাউস	লন্ডন, ইংল্যান্ড	কমনওয়েলথের কার্যালয়।
বুশ হাউস	লন্ডন, ইংল্যান্ড	বিবিসি'র সদর দপ্তর।
ইন্ডিয়া হাউস	লন্ডন, ইংল্যান্ড	লণ্ডনে ভারতের দূতাবাস।
ওরিয়েন্ট হাউস	ফিলিস্তিন	পি.এল.ও'র সদর দপ্তর।
জুপিটার মন্দির	ভেনিজুয়েলা	ভেনিজুয়েলার পার্লামেন্ট ভবন।
স্টেটস জেনারেল	হেগ, নেদারল্যান্ড	নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভবন।
পিস প্যালেস	হেগ, নেদারল্যান্ড	আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর।
কুবে প্যালেস	কায়রো, মিশর	মিশর সরকারের সচিবালয়।
পেন্টাগন বিল্ডিং	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর।
ওভাল অফিস	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়।
ফ্লাশিং মিডোস	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	জাতিসংঘের সভাস্থল।
ওয়ালস্ট্রিট	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের স্টক এক্সচেঞ্জ।
কেপ কেনেডি কেন্দ্র।	ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র	নাসা'র সদর দপ্তর এবং মহাকাশযান উৎক্ষেপণ

এক নজরে বিখ্যাত প্রণালীসমূহ

সংযুক্ত করেছে	পৃথক করেছে	সংযুক্ত করেছে
আমেরিকা		
বেরিং সাগর →	বেরিং প্রণালী	← চুকসি সাগর
এশিয়া		
ভারত		
আরব সাগর →	পক প্রণালী	← ভারত সাগর
শ্রীলংকা		
ইউরোপ (স্পেন)		
উত্তর আটলান্টিক →	জিব্রালটার প্রণালী	← ভূমধ্যসাগর
আফ্রিকা (মরক্কো)		
মালয়েশিয়া		
বঙ্গোপসাগর →	মালাক্কা প্রণালী	← জাভা সাগর
সুমাত্রা		
ইরান		
ওমান সাগর →	হরমুজ প্রণালী	← পারস্য সাগর
সংযুক্ত আরব আমিরাত		
যুক্তরাজ্য		
ইংলিশ চ্যানেল →	ইংলিশ চ্যানেল	← উত্তর সাগর
ফ্রান্স		
ফ্লোরিডা		
মেক্সিকো উপসাগর →	ফ্লোরিডা প্রণালী	← উ. আটলান্টিক
কিউবা		
সুমাত্রা		
ভারত মহাসাগর →	সুন্দা প্রণালী	← জাভা সাগর
জাভা		
গ্রেসিংটন নিউজিল্যান্ড		
তাসমান →	কুক প্রণালী	← দ: প্রশান্ত মহাসাগর
নিউজিল্যান্ড		
পাপুয়া নিউগিনি		
আরাফুরা সাগর →	টরেস প্রণালী	← কোরাল সাগর
অস্ট্রেলিয়া		
বর্নিও ইন্দোনেশিয়া		
জাভা সাগর →	মাকাসার প্রণালী	← সেলেবিস সাগর
সেলেবিস, ইন্দোনেশিয়া		
মোজাম্বিক		
ভারত মহাসাগর →	মোজাম্বিক প্রণালী	← আরব সাগর
মাদাগাস্কার প্রণালী		

	পানামা	
প্রশান্ত মহাসাগর →	প্যানামা খাল	← ক্যারিবিয়ান সাগর
	পানামা	
	মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া	
ভারত মহাসাগর →	বাস প্রণালী	← তাসমান সাগর
	তাসমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া	
	ইস্তাম্বুল (এশিয়া)	
ইজিয়ান সাগর →	দোরাস প্রণালী	← কৃষ্ণসাগর
	তুরস্ক (ইউরোপ)	
	কানাডা	
হাডসন উপসাগর →	হাডসন প্রণালী	← আটলান্টিক
	মহাসাগর	
	কানাডা	
	চীন	
দক্ষিণ চীন সাগর →	ফরমোজা প্রণালী	← পীত সাগর
	তাইওয়ান	
	ডেনমার্ক	
বাল্টিক সাগর →	কিয়েল প্রণালী	← উত্তর সাগর
	সুইডেন	
	সুন্দা (ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ)	
ভারত মহাসাগর →	সুন্দা প্রণালী	← জাভা সাগর
	ইন্দোনেশিয়া	
	গ্রীনল্যান্ড	
বেরিন উপসাগর →	ডেভিস প্রণালী	← লাব্রাডার
	কানাডা	

পৃথিবীর মহাসাগরসমূহ

মহাসাগরের নাম	আয়তন (কোটি বর্গকিমি)	গড় গভীরতা (মিটারে)	সর্বোচ্চ গভীরতা (মিটারে)
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬.৮০	৪,০৭৯	১১,০৩৩
আটলান্টিক মহাসাগর	৮.১৬	৩,৯২৬	৯৩০০
ভারত মহাসাগর	৭.৩৪	৩,৯৬২	৭,২৪৮
সুমেরু মহাসাগর	১.৪৩	১,২৮০	৫,১১২
এ্যান্টার্কটিকা মহাসাগর	১.৯৪	-	-
আর্কটিক মহাসাগর	১.৪৯	১,২৮০	-

http://thejobstudy.com
Go to Contents

অধ্যায় ৩

বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলী
Privious BCS Written Question

বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলী
৩৪তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘন্টা
পূর্ণমান : ১০০

১. যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিনঃ- ৪x৫=২০
ক. জেনেভা কনভেনশন কি এবং এর মূল উদ্দেশ্য কি?
খ. ট্রারিফ ও ট্যাক্স এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
গ. সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কাজ কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?
ঘ. কূটনীতিকগণ কর্মরত অবস্থায় কোনো দেশে কি ধরনের সুবিধাদি ও দায়মুক্তি (Immunities) পেয়ে থাকেন?
ঙ. Balance of Power বলতে কি বুঝায়?
চ. উপনিবেশবাদ এবং নব-উপনিবেশবাদ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।
ছ. কিয়োটা চুক্তি কি? এ চুক্তিটি কি উদ্দেশ্যে, কোথায় স্বাক্ষরিকত হয়েছিল?

২. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) ঃ- ৪x৫=২০
ক. জাপানের আইনসভা
খ. বিশ্বায়ন (Globalization)
গ. এশিয়ান হাইওয়ে
ঘ. এ্যামব্যাসেডর ও হাইকমিশনার
ঙ. 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি
চ. নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশের ভূমিকা
ছ. World Economic Forum

৩. ক. বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দা (Great Depression)কখন শুরু হয় এবং এর পিছনে কি কি কারণ ছিল? ১০
খ. নুরেমবার্গ বিচার বলতে কি বুঝায়? এখানে কাদের বিচার করা হয়? ১০

৪. ক. ষোড়শ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? ৪
খ. বিশ্ব রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভূমিকা ও কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১০
গ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিগুলো লিখুন। ৬

৫. ক. APEC কি? এ সংস্থাটি কত সালে, কাদের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়? ৪
খ. APEC এর মূল তিনটি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ৪x৩=১২
গ. APEC কর্তৃক অনুসরিত নীতিমালাগুলো সদস্য দেশগুলোর জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেছে কি? করে থাকলে পয়েন্ট আকারে লিখুন। ৪

৬. ক. অর্থনৈতিক কূটনীতির সংজ্ঞা দিন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন। ১০
খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকগুলো সাম্প্রতিক সময়ের আলোকে বিশ্লেষন করুন। ১০

৭. ক. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ সৌদি আরব কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো আলোচনা

করুন। ১০
খ. পণ্য বিনিময় বা বার্টার অব কমোডিটিস বলতে কি বুঝায়? কোন পরিস্থিতিতে পন্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়? ১০
৮. ক. সন্ত্রাসবাদ কি? "মুসলিম বিশ্ব সন্ত্রাসের শিকার"-এ বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? ব্যাখ্যা দিন। ১০
খ. জাতিগত সংঘাত বলতে কি বুঝায়? এই সংঘাত সৃষ্টি মূল কারণগুলো বর্ণনা করুন। ১০

বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলী
৩৩তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘন্টা
পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য:-ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরসহ মোট **আটটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দিন:- নম্বর ২x১০=২০
ক. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দুইটি দেশের নাম কি। স্বীকৃতি প্রদানের তারিখ কত?
খ. প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কি কি? তন্মধ্যে বিশ্বব্যাংক এর প্রতিশ্রুতির পরিমান কত?
গ. বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতা করার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতা মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা দেয়া হয়? এটি কে গ্রহণ করেন?
ঘ. থ্রি জি (3G) বলতে কি বুঝায়? সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠান 3G চালু করে?
ঙ. NATO এর সদর দপ্তর কোথায়? এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম লিখুন।
চ. ২০১২ সালে সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কে কে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তারা কোন দেশের নাগরিক?
ছ. টি-২০ বিশ্বকাপ বর্তমান চ্যাম্পিয়ান কে? ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ কোথায় হবে?
জ. সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে বরারক ওবামা নির্বাচিত হলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বি কে ছিলেন? তিনি কোন দলের প্রার্থী ছিলেন?
ঝ. WTO Ministerial conference কত দিন পরপর হয়? ২০১৩ সালের কোথায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে?
ঞ. UNFCC বলতে কি বুঝায়? কবে কোথায় এটি স্বাক্ষারত হয়?
ট. BRICS কি ? কবে, কোথায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়? কোন কোন দেশ এর সদস্য?
ঠ. D-8 (ডি-৮) এর সদস্য দেশসমূহের নাম লিখুন।
ড. সর্বশেষ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন কোথায় ও কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে?
২. টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- ৫x৪=২০
ক. মালালা ইউসুফজাই; খ. আন্না হাজারে ও ভারতের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন;
গ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল; ঘ. রোহিঙ্গা সমস্যা ও রামু ইস্যু;
ঙ. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; চ. BIMSTEC
৩. বাংলাদেশ ওভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বন্টন সমস্যার উপর আলোচনা করুন। পানি বন্টন ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে আপনার মতামত উল্লেখ করুন। ১০
৪. "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জল নক্ষত্র"- আলোচনা করুন। ১০
৫. MDG কি? MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। ১০
৬. "বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা"- আলোচনা করুন। বেশী ক্ষতগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এপর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন।১০
৭. নেপালের নদীতে জলবিদ্যুতের বিশাল সম্ভাবনাকে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল জ্বালানী সংকট নিরসনে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে তা আলোচনা করুন। ১০
৮. গ্রীসের অর্থনৈতিক মন্দার কারণসমূহ আলোচনা করুন। এ সংকট নিরসনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আলোচনা করুন। ১০
৯. ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কি কি ধরনের সংকট আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন? জ্বালানী বাজারে এর কি প্রভাব পড়তে পারে? ১০

১০. "বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কমকাণ্ড"-আলোচনা করুন এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ১০
১১. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপয়োগিতার বিষয়টি আলোচনা করুন। ১০
১২. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন SAARC এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। ১০

৩২তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি(আবশ্যিক)

১. যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দিন:- নম্বর ২x১০=২০
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, যা সাধারণ ভাবে শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত, কত তারিখে কোন সনে সম্পাদিত হয়?
খ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ কোনটি? কোন তারিখে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়?
গ. ফেসবুক (Face book) কি? এর আবিষ্কারক কে?
ঘ. ICIMOD কি? এই সংস্থার সদস্য কারা?
ঙ. ভারতীয় পার্লামেন্টের কক্ষ দুটির নাম কি?
চ. কিয়াটো প্রটোকল কোথায় গৃহীত হয়? এর মেয়াদ কখন শেষ হবে?
ছ. 'Witness to Surrender'এবং Surrender at Dhaka' বই দুটির লেখক কারা?
জ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন কোন সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে?
ঝ. কোন সনে বাংলাকে ভাগ করা হয়? ঐ সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
ঞ. ওসামা বিন লাদেনকে হত্যাকারী মার্কিন বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের নাম কী?
ট. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান মহাসচিব কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?
ঠ. বিখ্যাত গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতা (Gettysburg Address) কে, কখন প্রদান করেন?

২. টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):-
ক. জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs), খ. আরব বসন্ত (Arab Spring), গ. জলবায়ু পরিবর্তন(Climate Change), ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন (PRSP), ঙ. বিশ্বায়ন (Globalization)
চ. ইন্টারপোল (Interpol)
৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? উভয় দেশের পানি বন্টন সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে আলোচনা করুন।
৪. স্নায়ুযুদ্ধ কি? স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানা পোড়ন পর্যালোচনা করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নায়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে লিখুন।
৬. আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম হিসাবে সার্ক এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন।
৭. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করুন।
৮. গ্রীসের অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোজোনে কি বিরূপ প্রভাব ফেলেছে? সংকট উত্তরণে ইউরোজোনের কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

৩১তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি(আবশ্যিক)

১. যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দিন:- নম্বর ২x১০=২০
ক. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? যে কোন প্রধান দুটি নদীর নাম করুন?
খ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা কত এবং বর্তমানে (২০১১ সালে) কোন কোন দেশ এই পরিষদের অস্থায়ী সদস্য?
গ. নিম্নলিখিত দেশসমূহের যে কোন দুটির রাজধানীর নাম লিখুন:-
১. এঙ্গোলা; ২. হাইতি; ৩. ফিজি; ৪. উরুগুয়ে।
ঘ. জাতিসংঘ সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রাগুলো কি কি?
ঙ. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কত তারিখে কোথায় শপথ গ্রহণ করেণ এবং সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কারা ছিলেন?
চ. ASEAN এর সদস্য রাষ্ট্র কারা?
ছ. ডুরান্ড লাইন কি? এ লাইন কোন কোন দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে?
জ. ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কি? এর বার্ষিক সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ঞ. গুগল কি? এটি কোন কাজে লাগে?
ট. ১৯৪৭ সালে নতুন স্বাধীনপ্রাপ্ত ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান কে ছিলেন?
ঠ. ২০১২ সালের অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? ২০০৮ সালের অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

২. টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি)

ক. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ; খ. দোহা রাউণ্ড বাণিজ্য আলোচনা;
গ. নরম্যান্ডির যুদ্ধ; ঘ. আরব বসন্ত; ঙ. কিয়াটো প্রটোকল; চ. আন্তর্জাতিক বিচার আদালত।

৩. বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ জনিত সমস্যার উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন। সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
৪. ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর শেষে ঘোষিত যৌথ ইশতেহার এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লে-খ করুন। এরপর বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?
৫. দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে? এ সংকট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোন ভূমিকা আছে কি? আলোচনা করুন।
৬. আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্রের দাবীতে গণ-অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত লিখুন।
৭. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন।
৮. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে কি বুঝেন? বাংলাদেশ এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
৯. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও কমনওয়েলথ এর কার্যক্রমের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও কমনওয়েলথ কি যথার্থতা হারিয়ে ফেলেছে?
১০. গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বলিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে?
১১. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১২. প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করুন।

৩০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি(আবশ্যিক)

১. যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দিন:- নম্বর ২x১০=২০

ক. BIMSTEC- এর বর্তমান পূর্ণরূপ কি? আগে এর পূর্ণরূপ কি ছিল?
খ. জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে? জাতিসংঘ দিবস কবে?
গ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? এই ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়?
ঘ. ২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?
ঙ. বাংলাদেশ ককাস কি/ এটি কোন দেশের আইন সভায় পঠিত হয়?
চ. বর্তমান বিশ্বে কোন দেশে চারটি রাষ্ট্রধর্ম রয়েছে? ধর্মগুলো কি কি?
ছ. African Union (AU) এর পর্ণরূপ কি ছিল? AU-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
জ. জি-৮ এর সদস্য দেশগুলোর নাম কি? জি-৮ এর সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ঝ. ইন্টারপোল (Interpol)-এর পূর্ণরূপ কি? এর সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ঞ. বর্তমানে বিশ্বে LDC দেশ কতগুলো? LDC তালিকাভুক্তি থেকে বের হবার জন্য ন্যনতম বার্ষিক মাথাপিছু আয় কত হওয়া দরকার?
ট. ভারতে "সেভেন সিস্টার্স" বলতে কি বুঝায়? "সেভেন সিস্টার্সের নাম গুরো কি কি?
ঠ. European Union কবে প্রতিষ্ঠিত হয়/ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
ড. লেবাননের বর্তমান প্রেসিডেন্টর নাম কি? তিনি কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক/
চ. ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম মহাসচিবের নাম কি? তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
ণ. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সাফারি পার্কের নাম কি? এটি কোথায় অবস্থিত?

২. টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- ৪x৫=২০

ক. সাপটা এবং সাফটা; খ. কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্ত; গ. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত;
ঘ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল; ঙ. ম্যাগনা কার্টা; চ. ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা; ছ. ফরাসী বিপ্লব।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের উপর একটি রচনা লিখুন।
৪. বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বেশ প্রকোট, এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত? এর জন্য আল কায়েদা কতটুকু দায়ী? আলোচনা করুন।
৫. বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বি?
৬. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করুন। মন্দা প্রতিরোধ ওবামা প্রশাসনের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন কি?
৭. সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করুন। পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
৮. দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক ব্যবসা ও তার নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা করুন।
৯. দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির গুরুত্ব ও প্রভাব কি? ওবামা প্রশাসনের আফগান নীতি পর্যালোচনা করুন।

২৯তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি(আবশ্যিক)

১. যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দিন:- নম্বর ২x১০=২০

ক. আসিয়ান (ASEAN) -এর সদর দপ্তর কোথায়?
খ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানকারী দেশগুলোর নাম কি?
গ. গ্রিণ পিস কি?
ঘ. WTO কখন আজ শুরু করে?
ঙ. স্টেট অব দি ইউনিয়ন কি?
চ. ভারতের প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রপতির নাম কি?
ছ. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC) -এর সদস্য কারা?
জ. IAEA -এর পুরো নাম কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?
ঝ. জাতিসংঘের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেলের নাম কি?
ঞ. ডি-৮ এর সদস্যগুরোর নাম কি?
ট. কোন কোন দেশ CTBT স্বাক্ষর করেনি?
ঠ. Aila শব্দের অর্থ কি? এটি কোন ভাষার শব্দ?
ড. পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?
ঢ. Vighur জাতি কারা এবং এদের বাসস্থান কোথায়?
ণ. কিয়াটো (Kyoto) প্রটোকলের মেয়াদ কবে শেষ হবে?

২. টীকা লিখুন (যে কোন **পাঁচটি**):- ৪x৫=২০

ক. ওআইসি; খ. সিডো; গ. সিরডাপ; ঘ ড. এপিজে আব্দুল কারাম; ঙ. ওপেক।

৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখিন হবে-এই মন্তব্যটি বিশ্লে-ষণ করুন।
৫. বিশ্বায়ন সুযোগ এবং আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। দক্ষ জনগোষ্ঠির জন্য আশঙ্কা। এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন।
৬. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মসূচিতে অন্যতম প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।
৭. মধ্য এশিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করুন।
৮. সদস্যাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন।
৯. স্বার্থ সংরক্ষণ কূটনীতিকের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লিখুন।

২৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি(আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন: ২x১০=২০

ক. ICRC- সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
খ. প্রথাগতভাবে বছরের কোন দিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়?
গ. কোন দুইটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড(Camp David) চুক্তি স্বাক্ষরের ফলশ্রুতিতে

ইসরাইলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে?
ঘ. বাংলাদেশকে 'তলাহীন ঝুড়ি' বলে কে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন?
ঙ. "তাসখন্দ চুক্তি" কখন এবং কোন দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
চ. "সেভেন সিস্টার্স"(Seven Sisters) বলতে ভারতের কোন রাজ্যগুলোকে বোঝায়?
ছ. BIMSTEC এর পূর্ণনাম কি এবং এর সদস্য কোন কোন দেশ?
জ. আরব বিশ্বের বাহিরে ওপেক(OPEC) দেশগুলোর নাম কি?
ঝ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের(NAM) এর প্রধান উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?
ঞ. ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় দিবস কোন তারিখে উদযাপিত হয়?
ট. আইসল্যান্ড ও মৌরিতানিয়ার রাজধানির নাম কি?
ঠ. ওআইসি(OIC) -এর বর্তমান মহাসচিবের নাম কি?
ড. চাঁদে অবতরণকারী প্রথম দুই মহাশূন্যচারীর নাম কি?
ঢ. আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের(ICC) সদর দফতর কোথায়?

২. যে কোন **পাঁচটি** উপর সংক্ষেপে লিখুন: ৪x৫=২০

ক. ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন(WTO)
খ. ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক (Micro-Credit and Grameen Bank);
গ সিআইএস (CIS)
ঘ. White House এবং White Hall;
ঙ. নেলসন ম্যান্ডেলা; চ. Amnesty International
ছ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব (Two- Nation Theory)

৩. যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪. মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ ওআইসির ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।
৫. উন্নয়নশীল দেশে শিশু অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও সুরক্ষায় প্রতিবন্ধকতা কি?
৬. গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বলতে কি বুঝায়? এর ফলে পরিবেশ ও কৃষিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে?
৭. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৮. প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করুন।

২৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি(আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন: ২x১০=২০

ক. গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায়?
খ. বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয় কত তারিখে?
গ. NAFTA- এর সদস্য দেশ কয়টি?
ঘ. কখন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর কার্যক্রম শুরু হয়?
ঙ. আকিয়ার কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
চ. মাইক্রোসফট কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নির্বাহীর নাম কি?
ছ. জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য কোন দেশ?
জ. UNIIMOG কী?
ঝ. NASA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ট. মায়ানমারের বার্তা সংস্থার নাম কী?
ঠ. উন্নয়নশীল দেশসমূহের নতুন জোট ডি-৮ এর সদস্য কারা?
ড. গ্রীনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় কত ঘন্টা আগে?

২. যে কোন পাঁচটি ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: ৪x১৫=২০

ক. জন হাওয়ার্ড, খ. ১৩তম নাম সম্মেলন, গ. সিডিসি(CDC), ঘ. ফারাক্কা বাধ
ঙ. এপেক(APEC), চ. সাফটা(SAFTA), ছ. ন্যাম(NAM)

৩. 'বিশ্বায়ন' প্রত্যাটির আর্থ- সামাজিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

http://thejobstudy.com Go to Contents

৪. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন?
৫. শক্তির ভারসাম্য রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা কী অনিবার্য বাস্তবতা?
৬. অর্থনৈতিক কূটনীতি কেন গুরুত্ব পেয়েছে তা আলোচনা করুন?
৭. সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন?
৮. নিরস্ত্রীকরণ করন কি? ইহা কতটুকু সত্য যে, নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির পূর্ব শত?
৯. বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন?
১০. স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট কী? বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন?

২৫তম বি.সি.এস, ২০০৪
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ২x১০=২০

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ও এর সদস্য সংখ্যা কত?
খ. CEDAW-এর পুরো নাম কি?
গ. Agenda-21 কি?
ঘ. রুয়ান্ডার গণহত্যায় জড়িত জনগোষ্ঠী দুটোর নাম কি?
ঙ. LOC বলতে কি বোঝায়?
চ. Loya Jirga কি?
ছ. Patriot Act-এর উদ্দেশ্য কি?
জ. SAGQ কি?
ঝ. CARICOM কি?
ঞ. OSCE কবে গঠিত হয়েছিল?
ট. ২০০৭ সালে কোন দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে?
ঠ. আর্জেন্টিনা কত সালে ফকল্যান্ড দ্বীপ দখল করে নিয়েছিল?
ড. কম্বোডিয়ার নতুন রাজার নাম কি?

২. যে কোনো পাঁচটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ৪x৫=২০

ক. জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defense)
খ. Operration Enduring Freedom
গ. গণহত্যা নিরোধ ও শান্তি বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন।
ঘ. Galilieo Project
ঙ. জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন।
চ. ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংকট।
ছ. দারফুর সংকট।

৩. প্রস্তাবিত দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন একটি ভিন্নতের ইউনিয়ন। এর সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিল ও অমিল কোথায় আলোচনা করুন।
৪. এই বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে-আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।
৫. যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদান কি ভূমিকা পালন করেন?
৬. বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলোর মোকাবেলার জন্য কি কি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে?
৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এর পটভূমি ও কার্যসম্পাদনের সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।
৮. বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিভিন্নপ্রকার মেরুকরণের কারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল আলোচনা করুন।

২৪তম বি.সি.এস, ২০০৪
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ২x১০=২০

ক. জাতিসংঘের সনদ কোথায় ও কখন স্বাক্ষরিত হয়?
খ. WTO কখন কাজ শুরু করে?
গ. ইরান ও থাইল্যান্ডের পূর্ব নাম কি?
ঘ. UN Fourth World Conference On Women কখন ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ঙ. 'রিও প্যাক্ট' কোথায় ও কখন স্বাক্ষরিত হয়?

চ. 'Dayton Accord'-এর মাধ্যমে কোন সমস্যার সুরাহা হয়?
ছ. NAM-এর বর্তমান সভাপতি কে?
জ. HIPC-এর পুরো নাম কি?
ঝ. কোন শহর World Conference Against Racisim-এর আয়োজক?
ঞ. OIC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
ট. IJO-এর সদর দপ্তর কোথায়?
ঠ. IAEA-এর পুরো নাম কি?

২. যে-কোন পাঁচটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ৪x৫=২০

ক. International Court of Justice
খ. The Durand Line
গ. কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম (SAP)
ঘ. রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি
ঙ. Truth and Reconciliation Commission
চ. INTERPOL
ছ. Operation Defensive Sield

৩. মধ্য এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন।
৫. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও এর সম্প্রসারণ সম্পর্কে লিখুন।
৬. মার্কিস যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রণীত মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির রোড ম্যাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন দিন।
৭. ওপিইসি তার সদস্য দেশগুলোর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পেরেছে বিশ্লেষণ করুন।
৮. সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত Samuel P. Huntinginon এর থিসিসের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে।

২৩তম (বিশেষ) বিসিএস, ২০০১
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ২x১০=২০

ক. ন্যাটো কোন্ সালে গঠিত হয়েছিল?
খ. কোন্ শহরের নাম বিগ অ্যাপেল?
গ. কোন্ রেখা দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দ্বি-খন্ডিত?
ঘ. Fifth Republic কি?
ঙ. ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্র কোন্ মহাদেশে?
চ. গোবি মরুভূমি কোথায় অবস্থিত?
ছ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
জ. যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্যের হার কত?
ঝ. কোন সংস্থাটির পরিবর্তে WTO গঠিত হয়েছে?
ঞ. 'বিশ্বগ্রাম' ধারণার প্রবক্তা কে?
ট. গণচীন কখন ম্যাকাও'র উপর সার্বভৌমত্ব পায়?
ঠ. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের মর্যাদা কি?

২. নিম্নের যে-কোন পাঁচটির উপর টীকা লিখুন। ৪x৫=২০

ক. Perchasing Power Parity; খ. এডামস্ পিক; গ. গুন্টার গ্রাস; ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি; ঙ. WWW চ. SAIC, ছ. জেনারেল ডি গাউল, জ. WTO

৩. শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি পর্যালোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যালোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি তার পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে?
৪. বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।
৫. চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করুন।
৬. দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নের সার্কের ভূমিকা কতটুকু উজ্জ্বল?
৭. বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কি অবদান রাখতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

২২তম বি.সি.এস, ২০০০-২০০১
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ২x১০=২০

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টরাল কলেজে কতজন নির্বাচক থাকেন?
খ. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
গ. 'সাইক' (SAIC) কি এবং কোথায় অবস্থিত?
ঘ. বাংলাদেশ কোন্ বছর সিটিবিটি (CTBT) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে?
ঙ. UNHCR কি এবং এর সদর দফতর কোথায়?
চ. "আল-কুদস" (AL-Quds) কি?
ছ. "আল-আক্সা ইন্তিফাদা" কি?
জ. 'ওয়ার্ল্ড ব্যাংক" এর সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
ঝ. 'ন্যাম ট্রয়কা (NAM-Troika) বলতে কি বোঝায়?
ঞ. 'সাপটা' (SAPTA)-র পুরো নাম কি?
ট. 'সিএফসি' (CFC) বলতে কি বোঝায়?
ঠ. 'ওজোন স্তর' (Ozone layer) কি জন্য প্রয়োজন?
ড. সুয়েজ খালের দুই প্রান্তে কোন্ কোন্ জল রাশি অবস্থিত?

২. যে-কোন পাঁচটির উপর টীকা লিখুনঃ ২x১০=২০

ক. "গ্রীণ হাউস ইফেক্ট (Green House Effect), খ. ডব্লি-উটিও (WTO)
গ. কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (LOC), ঘ. বিমস্‌টেক (BIMSTEC), ঙ. জি.এস.পি (GSP),
চ. সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন, ছ. 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি, জ. সুশীল সমাজ।

৩. মূল চীনের সঙ্গে তাইওয়ানের একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু লিখুন। প্রসঙ্গক্রমে এই সম্ভাব্য সংযুক্তির পক্ষের ও বিপক্ষের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করুন।
৫. সাফটা কি? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা নিয়ে কি কারণ সমস্যা ও বিলম্ব ঘটেছিল? শেষ পর্যন্ত কিভাবে সমস্যার নিস্পত্তি হয়? সংশ্লিষ্ট উল্লে-খযোগ্য ঘটনা পরম্পর সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৭. ম্যাড কাউ রোগ কি? এ সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।
৮. ওপেক কি? সদস্য দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে এই সংগঠন সাধারণত কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে? জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি একটি তেল আমদানিকারী স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে?

২১তম বি.সি.এস, ১৯৯৯-২০০০
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক. জাতিসংঘে বর্তমানে কয়টি ভাষায় সরকারী কাজকর্ম চলে?
খ. ফারাক্কার পানি বন্টন চুক্তি প্রথম কখন সম্পাদিত হয় এবং এটাতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে কে কে স্বাক্ষর করেন?
গ. ৩৮তম অক্ষ রেখার বিশেষ গুরুত্ব কি?
ঘ. Maginot Line কি?
ঙ. যৌথ নিরাপত্তা কি?
চ. ভূ-অর্থনীতি কি?
ছ. Third Reich কি?
জ. Second-track diplomacy কি?
ঝ. অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলতে কি বুঝায়?
ঞ. কোন্ যুক্তি দেখিয়ে ভারত এখনও পর্যন্ত CTBT-তে স্বাক্ষর করেনি?
ট. Asian Development Bank-এর সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?

ঠ. Dayton Agreement কোন আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনের জন্য সম্পাদিত হয়েছিল?

২. নিম্নের যে কোন পাঁচটির উপর টীকা লিখুন।

ক. বার্লিন দেয়াল, খ. প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি, গ. Wye River চুক্তি
ঘ. কারগিল যুদ্ধ, ছ. আসিয়ান, জ. সার্বজনীন মানবাধিকার
ঙ. সম্প্রতি সিয়াটলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধিবেশন ভেস্তে যাবার কারণসমূহ আলোচনা করুন।
৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত প্রদান করুন।
৫. দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতির ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি প্রভাব ফেলেছে বলে আপনার মনে হয়?
৬. স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কতটুকু উজ্জ্বল?
৭. আপনি কি অদূর ভবিষ্যতে দুই কোরিয়ার পুনঃ একত্রীকরণের কোন সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন? যদি করেন তবে এ পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প কি হতে পারে?

২০তম বি.সি.এস-১৯৯৮-৯৯
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার কখন প্রবর্তন করা হয়? ১৯৯৮ সালে পুরস্কারটি কে পেয়েছেন?
খ. SAPTA ও SAFTA কি?
গ. White Hall এবং Kremlin কি?
ঘ. ডুরান্ড লাইন ও ম্যাকমোহন লাইন কি?
ঙ. "ইউরো" কি এবং কোন্ কোন্ দেশে "ইউরো" চালু হয়েছে?
চ. কখন ও কোথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ছ. বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ শীর্ষ সম্মেলন কবে ও কোথায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল? বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণের সাথে বাংলাদেশের নাম কেন জড়িত?
জ. Indemnity কি?
ঝ. কসভো সংকটের কারণগুলি কি ছিল?
ঞ. নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত?
ট. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দফতর কোথায় এবং এর বিচারপতিদের সংখ্যা কত?
ঠ. তিয়েনমেন স্কোয়ার কি এবং কোথায় অবস্থিত?

২. যে-কোন পাঁচটির উপর টিকা লিখুন।

ক. গ্রীন হাউস এফেক্ট।
খ. বিশ্ব স্থল মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি?
গ. ক্রীড়া তত্ত্ব (Game Theory)?
ঘ. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ?
ঙ. গুজরাল ডকট্রিন?
চ. ভারত ও পাকিস্তানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ?
ছ. সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী
জ. প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র।
ঝ. 'নিরাপত্তা' এবং 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' বলতে কি বুঝায়? নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত?
ঞ. রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট দেশটিকে পুনরায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে- আপনি কি এই মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করেন? আলোচনা করুন।
ট. এ্যাপেক কি? মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়েলালামপুরে সদ্যসমাপ্ত এ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলনের আলোকে বিশ্ব রাজনীতিতে এ্যাপেকের ভূমিকা আলোচনা করুন।
ঠ. আঞ্চলিক সহযোগিতা কি? আঞ্চলিক সহযোগিতা কি বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক? আলোচনা করুন।
৭. বাংলাদেশের নিরাপত্তার সমস্যাটি মূলতঃ সামরিক নয়-এটি বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

http://thejobstudy.com Go to Contents

এবং পরিবেশগত বিষয় আলোচনা করুন।
৮. পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতির আলোকে চীনের সাথে জাপান ও রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।

১৮তম বি.সি.এস-১৯৯৫-৯৬
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান দপ্তর কোথায় এবং এর সদস্য সংখ্যা কত?
খ. সেভেন সিস্টার্স বলতে কোন্ কোন্ ভারতীয় রাজ্যগুলিকে বুঝায়?
গ. ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাটিটির নাম কি এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত যে মার্কিন বিমান ঘাটি বন্ধ করা হয়েছে ইহার নাম কি ছিল?
ঘ. যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল দলের বর্তমান নেতার নাম কি? জাপানের পার্লামেন্টের নাম কি?
ঙ. তৃতীয় বিশ্ব থেকে অস্ত্র ব্যবসায় লিপ্ত ৪টি দেশের নাম লিখুন?
চ. 'একদেশ, দুই নীতি' বলতে কি বুঝায়? দেশটির নাম কি?
ছ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হতে বাদ পড়েছে কোন্ কোন্ দেশ?
জ. তুরস্ক ও ইরানের যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রীর ও রাষ্ট্রপতির নাম লিখুন।
ঝ. বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সম্পর্ক কি এবং এদের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ঞ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষুদ্রতম দেশ এবং এর শাসকের নাম লিখুন।
ট. একাধিক দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত তিনটি নদীর নাম দেশসহ লিখুন।
ঠ. ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণের কারণগুলি কি ছিল?

২. যে কোন পাঁচটির উপর টীকা লিখুন।

ক. এক মেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা, খ. মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন নীতি, গ. ছিট মহল,
ঘ. বঙ্গোপসাগরে সম্পদ আহরণ, ঙ. নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন।
চ. মানবিক অধিকার।
ছ. ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত।
৪. বিশ্বব্যাপী গোত্রগত দ্বন্দ্বের কারণগুলো আলোচনা করুন। আগামীতে বর্তমান রাষ্ট্র ধারণা পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রসংখ্যা বেড়ে যাবে কি?
৫. সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ওআইসির ভূমিকার পর্যালোচনা করুন।
৬. অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৭. বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কিভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়?
৮. ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গঠনে কিভাবে প্রভাবান্বিত করছে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১৭তম বি.সি.এস-১৯৯৫-৯৬
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

ক. ডি ডে'র পূর্ণ নাম কি ?
খ. ১৯১৮ সালে বিশ্ব শান্তির জন্য "চৌদ্দ দফা"কে উপস্থাপন করেছিলেন?
গ. ECO কি ?
ঘ. ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনের প্রধান অংশগ্রহণকারী কারা ছিলেন ?
ঙ. স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অনুসৃত ধারক নীতির হাতিয়ার হিসেবে যে সকল আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে তুলেছিল তার মধ্য থেকে কমপক্ষে চারটির নাম উল্লেখ করুন।
চ. হেবরণ হত্যাকাণ্ড কে সংঘটিত করেছিল ?
ছ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চারজন প্রধান উদ্যোক্তাদের নাম কি?
জ. পূর্ব তিমুর কিসের জন্য বিখ্যাত ?
ঝ. ফরাসী দেশের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রীর নাম লিখুন।

ঞ. মাইন ক্যাম্প কি ?
ট. উপমহাদেশ থেকে যারা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কমপক্ষে দু'জনের নাম লিখুন।
ঠ. খেমাররুজ বলতে কি বুঝেন ?

২. নিম্নের যে কোন পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন :

ক. পুলিওজার প্রাইজ, খ.আইডী লীগ, গ. ম্যাসট্রিচ চুক্তি, ঘ. ন্যাটোর পুনর্গঠন,
ঙ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, চ.টেনিসি উইলিয়াম।
ছ. ১৯৯৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক মহিলা মন্ত্রীদের সম্মেলন।

৩. জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কর্মকান্ডের সফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করুন।
৪. দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গোটা ইউরোপের পরিবর্তন এবং পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে বিবেচনা করবেন?
৪. ক. রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (ধরিত্রী সম্মেলন) মূল্যায়ন করুন।
খ. সম্প্রতি বেইজিং এ অনুষ্ঠিত মহিলা বিষয়ক জাতিসংঘের এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং এর প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা করুন।
৫. জাতিসংঘকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারনা কি তা বিবৃত করুন।
৬. দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আগ্রহ সম্পর্কে একটি সমালোচনা মূলক নিবন্ধ লিখুন।
৭. বর্তমান রুশ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান প্রধান দিক আলোচনা করুন।

১৫তম বি সি এস-১৯৯৩-৯৪
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)
১. যে - কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন:

ক. ইউনিফেম- এর পূর্ণ নাম কি?
খ. 'ওয়াটার গেইট' কেলেঙ্কারী কি?
গ. জাতিসংঘের চারজন মহাসচিবের নাম লিখুন?
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীদের সরকারী পদ কি? তাঁদের নাম উলে-খ করুন।
ঙ. চীন ও জাপানের পার্লামেন্টের নাম উল্লে-খ করুন?
চ. কোন্ সালে এবং কোন্ মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল?
ছ. বর্তমানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে?
জ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ঝ. আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যম চারটি সংস্থার নাম লিখুন?
ঞ. কমনওয়েলথ বলতে কি বুঝেন? কমনওয়েলথ দেশভুক্ত চারজন প্রধানমন্ত্রীর নাম লিখুন
ট. বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে সভাপতিত্বয়ের নাম কি?
ঠ. সাহিত্যে ১৯৯১, ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম কি?

২. নিম্নের যে-কোন পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুনঃ

ক. সাপটা (SAFTA) ও সাফটা (SAPTA), খ. জেরিকো, গ. হযরতবাল মসজিদ।
ঘ. জেনারেল ফারাহ্ আইদিদ, ঙ. সারায়েভো, চ. অপারেশন সী এঞ্জেল।
ছ. সাফ গেমস -১৯৯৩, জ. ভার্সাই চুক্তি।
৩. বসনিয়া হার্জেগোভিনার সমস্যার পটভূমি কি? সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের মূল্যায়ন করুন।
৪. ভেটো ক্ষমতা কি? আপনি কি মনে করেন যে, একটি পুনর্গঠিত জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের রীতির বিলুপ্তি ঘটানো উচিত? যৌক্তিকতা সহ আলোচনা করুন।
৫. পিএলও ইসরাইল চুক্তিটির বিষয়বস্তু বিশ্লে-ষণ করুন।
৬. ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে বাংলাদেশ এবং ভারতের পারস্পরিক অবস্থানের পেছনে যে সকল

নির্ধারক কাজ করছে তা মূল্যায়ন করুন। দু'টি দেশের মধ্যে একটি স্থায়ী সমঝোতায় উপনীত হবার অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করুন।
৭. আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্তগুলো কি? সার্ক সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত ঢাকা ঘোষণা উল্লে-খ করুন।
৮. বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ নির্ণয় করুন। এই অভ্যুদয়ের ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের নিরাপত্তা নীতিতে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?
৯. বাংলাদেশ ও চীন সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লে-ষণ করুন।

১৩তম বিসিএস-১৯৯১-৯২
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে কোন দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন :

ক. UNCTAD-এর পূর্ণ নাম কি?
খ. ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী কে? তিনি কোন্ রাজনৈতিক দলের সদস্য?
গ. নিম্নলিখিতগুলি কিসের সংগে সম্পর্কিত ফ্লীট স্ট্রীট, ওয়াল স্ট্রীট।
ঘ. ইনোসিস কি?
ঙ. নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম এশীয় কে? তিনি কোন্ দেশের নাগরিক?
চ. ১৯৯১ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্র প্রধান কে কে ছিলেন?
ছ. গাম্বিয়া ও জাম্বিয়ার রাজধানীগুলো কি?
জ. লোকসংখ্যায় জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম সদস্য রাষ্ট্র কোন্টি? সেটি কোন্ মহাদেশে অবস্থিত?
ঝ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান কোন্ তারিখে পার্ল হারবার আক্রমণ করে? পার্ল হারবার কোথায়?
ঞ. কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিব কে?
ট. নিম্নলিখিতগুলোর সদর দফতর কোথায়ঃ
আফ্রিকীয় ঐক্য সংস্থার ; উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ।
ঠ. নিম্নলিখিত দেশগুলোর অধিবাসীদের প্রধান ভাষা কি?
শ্রীলংকা ; ফিলিপাইনস্।

২. নিম্নের যে কোন পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুনঃ

ক. পেন্টাগন ; খ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ; গ. খেমাররুজ ; ঘ. পশ্চিম তীর ; ঙ.সল্ট-১ ;
চ. ইরিত্রিয়া ; ছ. সার্বিয়া।
৩. তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির প্রভাব বিশ্লে-ষণ করুন।
৪. কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।
৫. মুসলিম বিশ্বের প্রধান সংহতি স্থাপনকারী ও সংহতি বিনষ্টকারী শক্তিগুলি কি? আপনি কি মনে করেন যে মুসলিম বিশ্ব ঐক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখান?
৬. ১৯৭২ সাল থেকে চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।
৭. বিশেষ এজেন্সীসমূহ বলতে কি বুঝায়? উন্নয়নশীল দেশসমূহকে আর্থিক সহায়তাদানকারী এরূপ একটি এজেন্সীর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
৮. জাতিসংঘকে আরো কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত করার উদ্দেশ্যে আপনি কি সংস্থাটির সনদের কিছু সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন? আলোচনা করুন।
৯. আপনি কি মনে করেন যে, আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্তরায়? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

১২তম বি সি এস
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে-কোন দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন : ২x১০=২০

ক. গত কয়েক দশক যাবৎ প্রতি বৎসর জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ১৬ অক্টোবর ও ১০ ডিসেম্বর উদযাপন করে থাকে। অল্প কথায় এ দুই দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উল্লেখ করুন।
খ. জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের নাম কী?
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাবসি প্রেসিডেন্ট কে? তিনি কার স্থলাভিষিক্ত হন/
ঘ. পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের নাম কি/

ঙ. UNESCO-এর চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।
চ. আরব-বিশ্বের বহির্ভূত চারটি OPEC-এর সদস্য রাষ্ট্রের নাম লিখুন।
ছ. অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, ইরাক ও ইসরাইলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর নাম কী?
জ. ব্রিটন উডস কোতায় অবস্থিত? এ স্তানের সঙ্গে কোন দুটি সংস্থার নাম জড়িত?
ঝ. নিম্নলিকিত ঘটনাগুরো কোন সালে সংঘটিত হয়?
বান্দুং সম্মেলন, ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু, প্রেসিডেন্ট চসেস্কুর পতন, নামিবিয়ার স্বাধীনতা লাভ।
ঞ. নরডিস পরিসদের সদস্য দেশগুলোর নাম লিখুন।
ট. ওআইসির মহাসচিব কে?
ঠ. ১৯৬৮ সালের এনপিটি চুক্তিতে এখনও স্বাক্ষর করেনি এমন চারটি রাষ্ট্রের নাম লিখুন।

২. নিম্নের যে কোন পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: ৪*৫=২০

ক. নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ; খ. হরমুজ প্রণালী; গ. বায়াগ্রা; ঘ. হংকং; ছ. কুইবেক; জ. উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভবনা।

৩. নেলসন মেন্ডেলার মুক্তির পর দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতিতে কি কি প্রধান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আলোচনা করুন।
৪. ১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় সঙ্কটকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার বিস্তারিত পর্যালোচনা করুন।
৫. ১৯৮৯ সালে সরকার পরিবর্তনের পর যেসব নতুন সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে প্রবাবিত করে সেগুলো আলোচনা করুন।
৬. একটি আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্তগুলো কি? আপনি কি মনে করেন যে আসিয়ান ও সার্ক এ পূর্বশর্তগুলো পূরণ করেছে?
৭. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৮. বর্তমান বিশ্বে যেসব প্রধান পরিবেশতগত সমস্যার সম্মুখিন সেগুলো কি? আপনার মতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা কোনটি? এ সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ লিখুন।

একাদশ বি সি এস '৯০-৯১
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. যে-কোন দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন :

ক. গত কয়েক দশক যাবৎ প্রতি বৎসর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৬ ই অক্টোবর ও ১০ ই ডিসেম্বর উদ্‌যাপন করে থাকে। অল্প কথায় এ দুই দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উল্লে-খ করুন।
খ. জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের নাম কি?
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট কে? তিনি কার স্থলাভিষিক্ত হন?
ঘ. পোলাণ্ডের প্রেসিডেন্টের নাম কি? রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তিনি কোন্ রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (নাম ইংরেজীতে লেখা চলিবে।)
ঙ. ইউনেসকো'র চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।
চ. আরব বিশ্বের বহির্ভূত চারটি ওপেক সদস্য রাষ্ট্রের নাম লিখুন।
ছ. অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন, ইরাক ও ইসরাইলের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির নাম কি?
জ. বৃটন উডস্ কোথায়? এই স্থানের সঙ্গে কোন্ দু'টি সংস্থার নাম জড়িত?
ঝ. উল্লে-খিত ঘটনাগুলি কোন্ সালে সংঘটিত হয়ঃ বান্দুং সম্মেলন, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, প্রেসিডেন্ট চসেস্কুর পতন, নামিবিয়ার স্বাধীনতা লাভ।
ঞ. নরডিক পরিষদের সদস্য দেশগুলির নাম লিখুন।
ট. ওআইসি-এর মহাসচিব কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?
ঠ. ১৯৬৮ সালের পারমাণবিক বিস্তার রোধ চুক্তিতে এখনও স্বাক্ষর করেনি এমন চারিটি রাষ্ট্রের নাম লিখুন।

২. নিম্নের যে কোন পাঁচটি সম্পর্কে টীকা লিখুন :

ক. নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ, খ.হরমুজ প্রণালী, গ. ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি,
ঘ. জেরুজালেম, ঙ. বায়ুগ্রা, চ. হংকং, ছ. কুইবেক।
জ. উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা।

৩. নেলসন মেন্ডেলার মুক্তির পর দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতিতে কি কি প্রধান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? আলোচনা করুন।

৪. ১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় সঙ্কটকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বিস্তারিত পর্যালোচনা করুন।
৫. ১৯৮৯ সালে সরকার পরিবর্তনের পর যেসব নতুন সমস্যা ভারতের আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেগুলি আলোচনা করুন।
৬. পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে জার্মান পুনঃএকত্রীকরণের প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
৭. একটি আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্তগুলি কি? আপনি কি মনে করেন যে আসিয়ান ও সার্ক এই পূর্বশর্তগুলি পূরণ করেছে?
৮. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৯. বর্তমান বিশ্ব যেসব প্রধান পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখিন সেগুলো কি? আপনার মতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা কোনটি? এই সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ দেন।

দশম বিসিএস-৮৯-৯০
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (আবশ্যিক)

১. নিম্নলিখিত চারটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন :

ক. পি.এল-৪৮০
খ. স্বল্পোন্নত দেশসমূহ
গ. কলম্বো পরিকল্পনা
ঘ. মার্শাল পরিকল্পনা
ঙ. ৭৭-জাতি গোষ্ঠী
চ. বিশেষ গ্রহণ অধিকার

২. ক. যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীদের নাম কি? তাঁদের সরকারী পদবী কি ?
খ. কিভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব নিযুক্ত হন? বর্তমান ও পূর্বের সকল মহাসচিবের নাম ও তাঁদের জাতীয়তা কি?

৩. মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতার কতিপয় উদাহরণ দিন। এসব অধিকার কিভাবে জাতিগঠন ও বিশ্বশান্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?
৪. কিভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব নিযুক্ত হন? বর্তমান ও পূর্বের সকল মহাসচিবের নাম ও তাদের জাতীয়তা কি?
৫. পূর্ব ইউরোপে ১৯৮৯ সালের শেষদিকে সংঘটিত রাজনৈতিক গণউত্থানসমূহের প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। পশ্চিমী দুনিয়ায় এবং তৃতীয় বিশ্বের এসবের কি কোন তাৎপর্য রয়েছে?
৬. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কাঠামো সংক্ষেপে আলোচনা করুন। মুসলিম বিশ্বে ঐক্য ও সংহতি উন্নয়নে এই সংস্থার ভূমিকা কি?
৭. দক্ষিণ এশিয়ায় প্রধান আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ কি? এগুলোর একটির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন এবং কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে উল্লে-খ করুন।
৮. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৯ম বিসিএস

[প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে-কোন তিনটি ইত্তর দিতে হবে প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. নিম্নলিখিত শব্দ-সংক্ষেপগুলো বলতে কি বুঝায়?

ক. ইউএসএসআর; খ. পিয়ারসি; গ. আইএফসি; ঘ. ইউপিইউ; ঙ. আইবিআরডি; চ. সিরডাপ; ছ. সিয়াইএ; জ. জিএটিটি; ঝ. এফএও; ঞ. আইসিএও।

২. নিম্নলিখিতগুলো কি ও কোথায়?

ক. জাঞ্জিবার; খ. কাটাঙ্গা; গ. বায়াফ্রা; ঘ. লাদাখ; ঙ. মালাক্কা; চ. ওয়াখান; ছ. ওডার-নীস; জ. সাখালীন; ঝ. সিনাই; ঞ. গাজা।

৩. আপনি কি মনে করেন যে গত এক বৎসরে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক উন্নত হয়েছে? আপনার মতামতের সমর্থনে যুক্তি দেখান।
৪. জাতিসংঘের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।

৫. সোভিয়েত-চীন বিরোধের প্রধান কারণগুলো কি কি?
৬. বিশ্ব রাজনীতিতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ভূমিকা ও গুরুত্ব পরীক্ষা করুন।
৭. নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? আলোচনা করুন।
৮. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গঠন ও ঋণদান নীতি আলোচনা করুন।

৮ম বিসিএস

[প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে-কোন তিনটি উত্তর দিতে হবে প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. নিম্নলিখিত শব্দ-সংক্ষেপগুলো বলতে কি বুঝায়?
ক. এসডিআই; খ. ইউনিটা; গ. এইডস; ঘ. এমএনএলএফ; ঙ. সিরডাপ; চ; আইসিবিএম; ছ.এলডিসিজ; জ. ইউনেস্কো; ঝ. ইইসি; ঞ. নাসা।

২. নিম্নলিখিতগুলো কি ও কোথায়?
ক. ম্যাকমোহন লাইন; খ. পেন্টাগণ; গ. ক্রেমলিন; ঘ. আল-আকসা; ঙ. হোয়াইট হাউজ; চ. কারবারা; চ. স্বর্ণ-মন্দির; জ.হোয়াইট হল; জ. ওয়াটার গেট; ঞ. ডুরাণ্ড লাইন।

৩. উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা এবং ওয়ারস চুক্তি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক আলোচনা করুন। মিখাইল গরবাচেভ ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে আপনি কি কোন নতুনত্ব লক্ষ্য করেন। আলোচনা করুন।

৪. ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্ব দক্ষিণ-এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ? আলোচনা করুন।

৫. মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইসরাইলী বিরোধের অবসানকল্পে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. কম্পুচিয়া সমস্যা সৃষ্টিতে ভিয়েতনাম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

৭. অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে সাম্প্রতিককালে জাপানের অসাধারণ সাফল্যের কারণ কি? অনেকে মনে করেন যে, জাপানের বর্তমান অর্থনীতি অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আপনি কি একমত? আলোচনা করুন।

৭ম বিসিএস

[প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে-কোন তিনটি উত্তর দিতে হবে প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. নিম্নলিখিত শব্দ-সংক্ষেপগুলো বলতে কি বুঝায়?
ক. আসিয়ান; খ. ইসিই; গ. আইবিআরডি; ঘ. আইসিজে; ঙ. ওএইউ; চ. ওআইসি; ছ. ওপেক; জ. সল্ট; এসডিআর; ঞ. ইউএসএসআর।

২. সংক্ষেপে নিম্নলিখিত যে কোন চারটি ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করুন:
ক. দিয়াগো গর্সিয়া; খ. দানিয়ুব; গ. জিব্রাল্টার; ঘ. হংকং; ঙ. মিন্ডানাও; চ. সুয়েজ কাল; ছ. ৩৮ অক্ষরেখা।

৩. জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রধান কার্যাবলী আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে তার ভূমিকা সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে ব্যাপকতর হয়েছে?

৪. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আঞ্চলিকতাবাদ কি কি কারণে বিকাশ লাভ করে? আপনি কি মনে করেন যে, আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থি?

৫. জোট নিরপেক্ষতা কি? তৃতীয় বিশ্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণ কি?

৬. আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফলাফল আলোচনা করুন। আপনার মতে এর সম্ভাব্য সমাধান কি?

৭. প্যালেস্টাইন সমস্যার উদ্ভবের কারণগুলো নির্ণয় করুন। এ সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের জন্য আপনি কি পদক্ষেপ সুপারিশ করবেন?

৮. নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত দাবির প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ৪

বিগত বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

Previous Question for promotion to the senior scales of defferent cadres of the Bangladesh Civil Service

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট-২০১৪

বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি

প্রথম পত্র

পূর্ণমান - ১০০ পাস নম্বর-৫০ নির্ধারিত সময়-৩ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্যঃ ইংরেজি অথবা বংলা যে-কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে।]

ক বিভাগ -বাংলাদেশ বিষয়াবলি ৪x১৫=৬০

১. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে এ অঞ্চলে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে? আলোচনা করুন।

২. জনসংখ্যা সমস্যাকে কিভাবে জনশক্তিকে রূপান্তরিত করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে বাস্তবায়নযোগ্য কৌশলসমূহ আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এর স্তরসমূহ আলোচনা করুন। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুপ্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও এ সরকার ব্যবস্থার ভিত্তি কোন মজবুত হয় নি?

৪. ২০১২ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন? উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি কি?

৫. ভূমির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো ভূমি ব্যবহার নীতিমালা বা (Land use policy) প্রণীত হয় নি ফলে ক্রমেই কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এ ব্যবস্থা রোধকল্পে কৃষি ও অকৃষি জমি ব্যবহারে কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে একটি ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত?

৬. নবায়নযোগ্য শক্তি কি? বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদের সম্ভাবনা কতটুকু?

খ বিভাগ-আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

(মান-১০x৪=৪০)

৭. টীকা লিখুন (যে কোন দুইটি)
(ক) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), (খ) অসিয়ান (ASEAN), (গ) MDG; (ঘ) ক্রিমিয়া সংকট।

৮. বাংলাদেশ বিশ্ব উষ্ণায়নের কিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহ কি কি হতে পারে? এ ক্ষেত্রে সরকারের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন?

৯. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে কি বুঝায়? নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব কেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে? আলোচনা করুন।

১০. সিরিয়া ও ইরাক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের ভবিষ্যৎ কূটনৈতিক সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

১১. "চীনের অর্থনৈতিক উত্থান বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে খর্ব করেছে"। - মতামত দিন।

১২. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে বিরাজমান মূল সমস্যাসমূহ কি কি? আলোচনা কর।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি-২০১৪
বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি
প্রথম পত্র

পূর্ণমান - ১০০ পাস নম্বর-৫০ নির্ধারিত সময়-৩ ঘন্টা

ক বিভাগ -বাংলাদেশ বিষয়াবলি ৪x১৫=৬০

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনেকেই পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও মাত্র সিকি শতাব্দির মাথায় তাঁদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন করতে হলো কেন ? উপযুক্ত তথ্যাদি/ ঘটনাবলি উল্লেখ পূর্বক আলোচনা করুন।

২. বিগত চার দশকে কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এর পেছনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি'র (BADC) যে ভূমিকা রয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ১০টি রপ্তানি পন্য ও এ সকল পন্য আমদানিকারী দেশের নাম উল্লেখ পূর্বক বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বর্তমান চিত্র তুলে ধরুন।

৪. ব্যাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা উল্লেখপূর্বক এ শিল্পের বিকাশে করণীয় সম্পর্কে আলোচান করুন। ১৫

৫. পৃথিবীর বহুদেশেই জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও জনসংখ্যা ব"দ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিক কী হওয়া উচিত ? যথাযথ পরিসংখ্যানেয়ন ভিত্তিতে আলোচনা করুন।

৬. পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে বাধাসমূহের বিবরণ দিন। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হলে সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তার বিবরণ দিন।

৭. পঁচিশ বছর পূর্তিতে একজন গণকর্মচারীকে গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(২) ধারামতে সরকার কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চুক্তি হতে অবসর প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ পূর্বক এ ধারাটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতামত দিন।

খ বিভাগ-চলতি বিষয়াবলি

(৮ নং প্রশ্ন ও বাকী প্রশ্নের মধ্য হতে যে কোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

মান-৪০

৮. টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) ঃ ৫X ৪ =২০
(ক) ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট :
(খ) আরব বসন্ত
(গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন :
(ঘ) বিশ্বায়ন (Globalization)
(ঙ) এলডিসি (LDC)
(চ) বিশ্ব ব্যাংক (Workd Bank)

৯. প্রতিষ্ঠাকাল, গঠন, সদর দপ্তর, সদস্য সংখ্যা গঠনের উদ্দেশ্যাবলি ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক OIC সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

১০. বৃহৎ শক্তির (Big Powers) বলে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোর স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে টিকে তাকা সম্ভব কী ? আলোচনা করুন।

১১. সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ প্রদানপূর্বক মধ্য এশিয়ায় এর প্রভাব বর্ণনা করুন ।

১২. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট-২০১৩
বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি
প্রথম পত্র

পূর্ণমান - ১০০ পাস নম্বর-৫০ নির্ধারিত সময়-৩ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্যঃ ইংরেজি অথবা বংলা যে-কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে।]

ক বিভাগ -বাংলাদেশ বিষয়াবলি ৪x১৫=৬০

১. জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনা করুন।

২. নারী শিক্ষার প্রসারে বাংলাদেশ সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? দেশের অর্থনীতি এবং সমাজজীবনে এর প্রভাব কি?

৩. দেশের চাকুরীক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি কবে প্রচলিত হয়? এর সুফল কি কি? কোন কুফল আছে কি?

৪. যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জিএসপি সুবিধা স্থগিত করার কারণ কি? এই সুবিধা পুনর্বহাল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কি কি শর্ত আরোপ করেছে? কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য?

৫. গার্মেন্টস শিল্পের অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা কি কি?

৬. মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ কি কি সুবিধা পেয়েছে? ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসিত হলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে?

খ বিভাগ-আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
(মান-১০x৪=৪০)

৭. আরব বসন্তের স্বরূপ এবং ফলাফল কি?

৮. যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা কত? এদের সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান কি?

৯. সার্ক এবং আশিয়ানের তুলনামূলক সাফল্যগাঁথা বর্ণনা করুন।

১০. পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে গণতন্ত্রায়নের স্বরূপ এবং সম্ভাবনা কি কি?

১১. বিশ্বমন্দার বর্তমান গতি প্রকৃতি কি? এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি কি?

১২. টীকা লিখুনঃ- (ক) ILO (খ) ADB

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি-২০১৩
বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি
প্রথম পত্র

পূর্ণমান - ১০০ পাস নম্বর-৫০ নির্ধারিত সময়-৩ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্যঃ ইংরেজি অথবা বংলা যে-কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে।]

ক বিভাগ -বাংলাদেশ বিষয়াবলি ৪x১৫=৬০

১. বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কি কি? ১৯৭২ সালে সংবিধানের সাথে এর কোন পার্থক্য আছে কি থাকলে তা কোথায়?

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে চীন, রাশিয়া (তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী ছিল? এরা কে কবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেন?

৩. বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ কি কি? এগুলো অর্জনে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? উক্ত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কি কি?

৪. পদ্মা সেতু প্রকল্প অর্থায়নে যে সব জটিলতা দেখা দিয়েছে তা উল্লেখ করুন এবং আপনার মতে পদ্মা

সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কিভাবে অর্জন করা সম্ভব?

৫. শাহবাগ তরুন প্রজন্ম চত্বরের গণজাগরণের আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? এর সুদুর প্রসারি ফলাফল কি হতে পারে।

৬. টিকা লিখুন : ক. রায়ের বাজার বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধ, খ. বাংলাদেশের মূল্যস্ফিতি, গ. বাংলাদেশের প্রবাসি রেমিটেন্সসমূহ।

খ বিভাগ-আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

(মান-৪০) ৪x১০=৪০

৭. জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির স্বপক্ষে আপনার মতামত তুলে ধরুন। কোন কোন দেশ নতুন স্থায়ী সদস্যপদ হতে পারে এবং কেন?

৮. চীন-ভারত এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯. বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা সংযোগ এবং কোন পর্যায়ে রয়েছে এর ভবিষৎ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

১০. বিশ্ব উষ্ণায়ণের রোধে আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহনের অন্তরায়সমূহ কি কি? আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশের বিশ্ব উষ্ণয়ণে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার কি ফলাফল হতে পারে।

১১. ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সিংগেল মার্কেট লক্ষ্যমাত্রা কি কি? এর কতটুকু অর্জন হয়েছে?

১২. টিকা লিখুন: ক. WTO খ.IMF

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট-২০১২

বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি

প্রথম পত্র

পূর্ণমান - ১০০ পাস নম্বর-৫০ নির্ধারিত সময়-৩ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্যঃ ইংরেজি অথবা বংলা যে-কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ক-গ্রুপ থেকে তিনটি ও খ-গ্রুপ থেকে দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

ক বিভাগ -বাংলাদেশ বিষয়াবলি

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের অবদানের জন্য কি কি উপাধি কতজনকে দেয়া হয়েছিল? এদের মধ্যে মহিলা এবং বিদেশী খেতাব প্রাপ্তদের নাম উল্লেখ করুন।

২. ২০১২ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে সরকার। এই লক্ষ্য অর্জনে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও পরাশক্তি দেশগুলির ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. ক্ষুদ্র পৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন কবে পাশ করা হয়? উক্ত আইন অনুসারে কোন কোন প্রতিষ্ঠান পৃ-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত? আইনে কতটি ক্ষুদ্র পৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণী জনগণের নাম ভুল-খ করা হয়েছে? এগুলো কি কি?

৫. নবায়নযোগ্য শক্তি কি? বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদের সম্ভাবনা কতটুকু?

খ বিভাগ-আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

(মান-৫০)

১. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে কি বুঝায়? নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব কেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের সঙ্গে কোন কোন দেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে এবং বিরোধের কারণ কি? বিরোধের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি?

৩. আরব বসন্ত বলতে কি বুঝায়? সিরিয়ায় যে অস্থিরতা বিরাজ করতে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

৪. টিকা লিখুন ঃ ক. NATO, খ. Public Law 480 বলতে কি বুঝায়? গ. New silk route কি? ঘ. NASA, ঙ. Bermuda Triangle কি?

সহায়ক গ্রন্থাবলী

বাংলা বই

১. জাতিসংঘ সনদ
২. সার্ক সনদ
৩. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সনদ : ঢাকাস্থ আই. এল ও দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন।
৪. জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত: "আজকের জাতিসংঘ"
৫. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : প্রাণগোবিন্দ দাশ
৬. সাম্যসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : রাধারমন চক্রবর্তী, সুকল্পা চক্রবর্তী
৭. আন্তর্জাতিক পরিক্রমা : ড: লিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি : শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়
৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : ড: প্রাণগোবিন্দ দাশ
১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস : অসিত কুমার সেন
১১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য
১২. আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমকালীন বিশ্ব : আনোয়ার মাহমুদ
১৩. আধুনিক বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (১৯১৯-১৯৪৫) : গৌরী শংকর বন্দোপাধ্যায়
১৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা : পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য
১৫. সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : বাণী প্রসাদ সেন
১৬. আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচিতি : প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মণ
১৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : নির্মলকান্তি ঘোষ
১৮. আন্তর্জাতিক সংগঠন : ড. শাহ আলম
১৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা
২০. তামিয় কুমার বাগচী : বিশ্বায়ন- ভাবনা% দূর্ভাবনা
২১. অলককুমার ঘোষ : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব
২২. বিশ্বায়ন ডলার ও বিকল্প বিশ্বের সন্ধানে : মুরালি ঘোষ
২৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতি : ড: সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
২৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপরেখা : প্রফেসর সৈয়দ ফজলুল্লাহ্
২৫. নয়া বিশ্বব্যাবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি,
২৬. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও সমকালীন বিশ্ব : তারেক শামসুর রহমান

http://th bstudy.com Go to Contents

English

1. United Nations : Nicholas
2. The United Nations : Luard
3. F.L Schuman : International Politics
4. Saare Potitical Economy : Dr. Atiar Rahman
5. Palmar and Perkins : International Relation
6. Saare: and Indian Perspective : P. Chopra
7. An Outline of International institutation : Dr. Nurul Monem
8. NATO and the Future of Europe : Moore Ben T.
9. Michacl P. Sullivan International Relations: Theories and Evidince
10. Encyclopaedia of the social sciences
11. The Third World and the International economic order : Mahbabul Haque
12. The politics of international Economic Relation : Joan edclman Speno
13. International Relations : J.W. Bwton
14. Politics Among nations : Hans. J. Morgenthau .
15. This age of conflict : F.P Chambers
16. The middle east crisis : guy wint and peter
17. The middle east for world affairs : George Lenezawaki
18. D.F Fleming : the cold war and its orgin
19. John E. Keiffer : Realities of world power
20. Ivor matanle : World war II
21. The Golf Crisis : A.M.H Abidi, K.R Sing
22. The Imperial Republic :The United State and the World: R. Aron
23. The parsian Oil Crisis : R. Bullard
24. The American Deal : M. Bassett
25. American Forian Policy : T.L. Brower
26. Euro Communism and the State : Carrillo, Santiago.

Go to Contents
http://thejobstudy.com